ইতিহাস অনুসন্ধান ১৫

সম্পাদনা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * * * ২০০১

ITIHAS ANUSANDHAN - 15

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০১, কলিকাতা

প্রকাশক ঃ ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ ঃ
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

মূল নিবন্ধ

১) সেকাল ও একাল — তপন রায় চৌধুরী ১

বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ

২) সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ও সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র — কুমকুম রায় ১৬

৩) প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলাঃ মুঘল যুগের একটি অধ্যয়ন — শিরিন মুসভি ২৬

৪) নেতৃত্বের দন্দ্বে বাঙলার অভিজাত ও অনভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, ১৯৩৬-'৪৬ — চণ্ডীপ্রসাদ সরকার ৪৩

বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

১) প্রত্নক্ষেত্র ইনামগাঁও ঃ কৃষিপ্রধান বসতির উদ্ভব ও বিকাশ — সুদর্শনা চৌধুরী (ভাদুড়ী) ৬৬

২) অভিলেখ সাক্ষ্যের আলোকে প্রাচীন বাংলার কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি — চিত্তরঞ্জন মিশ্র ৭০

৩) বাসমতী ধান ঃ উৎপত্তি ভূমি ভারত প্রত্ন - নিদর্শন ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোকে — শুভ্রদীপ দে ৭৬

৪) জমির চাহিদা, যোগান ও তার পরিমাপ ঃ প্রাচীন বাংলা — মলয় কুমার দাস ৮২

৫) প্রাচীন বাংলার উৎপন্ন সম্ভার ও বৈদেশিক বাণিজ্য — অরবিন্দ মাইতি ৯৫

৬) প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সচেতনতা - একটি প্রতিবেদন — শুভেন্দু পাল ৯৯

৭) প্রাচীন ভারতে প্রাণী সুরক্ষায় কিছু শাস্ত্রীয় বিধান — অনিতা বাগচী ১০৬

৮) প্রাচীন বঙ্গের জলবায়ু ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন — অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ১১২

৯) প্রাচীন ভারতের রাজ্যবর্ষ ঃ সংশ্লিষ্ট সমস্যা — সত্যসৌরভ জানা ১২২

১০) প্রাচীন মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের সামরিক সংগঠন ও সমাজ ঃ একটি ইতিহাসতত্ত্বীয় ব্যাখ্যা — শৌভিক মুখোপাধ্যায় ১২৬

১১) বৈদিক ভারতে নিয়োগ প্রথার অবস্থিতি — চিরকিশোর ভাদুড়ী ১৩১

১২) আর্য এবং দ্রাবিড় নামের উৎস সন্ধানেঃ ইতিহাস আশ্রয়ী ভূগোল — রাজকুমার জাজোদিয়া ১৩৬

১৩) সিন্ধু সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার যুগে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা — তপন কুমার মন্ডল ১৩৮

১৪) একটি প্রাচীন কাহিনীর অভিপ্রয়াণ — সুচন্দ্রা ঘোষ ১৪০
১৫) প্রাচীন বাঙালী রমণী — শাহানারা হোসেন ১৪৩
১৬) সম্রাট অশোক ও তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ঃ একটি পুণর্মূল্যায়ন — জিনবোধি ভিক্ষু ১৪৮
১৭) কুষাণ রাজাদের ঐশ্বরিকতা ঃ রবাতক লেখ'র সাক্ষ্য — দূর্ব্বা আইন ১৫৫
১৮) বঙ্গদেশে ব্রহ্মোপাসনা — শম্ভুনাথ কুন্ডু ১৫৮
১৯) ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দুর্গাপ্রতিমা ঃ কিছু প্রশ্ন — শুভজিৎ দাশগুপ্ত ১৬৪
২০) দেবী কালী ঃ তার উদ্ভব ও অস্তিত্ব — সুমিত বিশ্বাস ১৬৮
২১) লক্ষ্মীর বাহন — সরিতা ক্ষেত্রী ১৭৪
২২) আদি মধ্যকালীন ভারতে দুই শৈবাচার্য ঃ ত্রিপুরান্তক ও বিশ্বেশ্বর শম্ভু — কৃষ্ণেন্দু রায় ১৭৮
২৩) পরমারকালীন মন্দিরশিল্পের অনুপম নিদর্শন ঃ উনগ্রাম — স্বাতী দাস (মন্ডল অধিকারী) ১৮৫
২৪) খিজিঙ্গকোট্টের শিল্প ইতিহাস ও রমাপ্রসাদ চন্দ — রাজশ্রী মুখোপাধ্যায় ১৯০

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

২৫) বাসুদের সার্বভৌম ঃ একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব — সুলেখা রায় ১৯৫
২৬) বাঙালীর পীর পূজা ঃ হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত — প্রদোত কুমার মাইতি ২০০
২৭) চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের রাষ্ট্রভাবনা — খন্দকার মুজাম্মিল হক ২০৬
২৮) বর্ধমানে পীর বাহরামেব সমাধি ভবন (১৬৬২-১৬৬৩ ইং সন) — রাশেদা ওয়াজেদ ২১২
২৯) মধ্যকালীন বাংলার নদী-বন্দর ইন্দ্রাণী — দীনেশ ঘোষ ২১৬
৩০) মেদিনীপুরে বৈষ্ণবীয় মেলা উৎসব ও মেলা — রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ২২৯
৩১) মেদিনীপুর জেলার গড় ও দুর্গ — রাজর্ষি মহাপাত্র ২৩৮
৩২) মধ্যযুগের রাজগীরে একটি জৈন মন্দির — কাকলী রায় ২৪৯
৩৩) আলঙ্গিরী ঃ একটি আর্থ-সামাজিক গ্রাম সমীক্ষা — দেবমাল্য খুঁটিয়া ২৫২
৩৪) মধ্যযুগের পারসীক বিবরণে কোচবিহারের কোচেরা — পরিমল ব্যাপারী ২৫৯
৩৫) মধ্যযুগে বাংলার মহিলা মন্দির নির্মাতা — প্রভাত কুমার সাহু ২৬৬
৩৬) মুর্শিদকুলী খানের বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ একটি আলোচনা — অনিরুদ্ধ রায় ২৭৩
৩৭) শোভা সিংহ ও সমকালীন নথিপত্র — প্রণব রায় ২৮২
৩৮) শিমলাবাজার; নান ও মিত্র পরিবার ঃ একটি এলাকার পরিবর্তনের ইতিহাস — উত্তরা চক্রবর্তী ২৯৭

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক - উত্তর যুগের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক

৩৯) বাংলার সামাজিক ইতিহাস ঃ বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতক সন ১৩০১ -১৩০৫ — বাসব সরকার ৩০৭

৪০) উত্তরবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক বৈচিত্র্য এবং নস্য শেখ সম্প্রদায় - একটি আলোচনা —বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩১৩

৪১) কলকাতার ইতিহাসে ইহুদিরা — ডালিয়া রায় ৩২০

৪২) খিলাফততন্ত্রের অবসান ঃ যুক্তিতর্কে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ — কাজী সুফিউর রাহমান ৩২৬

৪৩) ব্রিটিশ আমলে নগরায়ণ ও পৌর প্রশাসন — কুমকুম চট্টোপাধ্যায় ৩৩৩

৪৪) হ্যামিলটনের গোসাবা সমবায় সমিতি ঃ একটি ভাবনা — সুতপা চট্টোপাধ্যায় সরকার ৩৪০

৪৫) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে চব্বিশ পরগণার লবণ শ্রমিক (১৭৬৫-১৮০০) — পুষ্পরঞ্জন সরকার ৩৪৬

৪৬) প্রবর্তক জুট মিলস্ (লি:) ঃ একটি স্বদেশী শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা (১৯৩৫-১৯৪০) — অমিয় ঘোষ ৩৫০

৪৭) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতি (১৯৪৭-৭০) একটি পর্যালোচনা — চন্দন বসু ৩৫৭

৪৮) কলকাতা শেয়ার বাজারে মারওয়াড়ীদের আগমন ঃ বিশৃঙ্খলা না শৃঙ্খলার সূচনা — প্রবাল বাগচী ৩৬১

৪৯) শেরপা ও সাহেব ঃ পর্বতারোহণের আদি পর্বের সামাজিক বিভাজন — দীপাঞ্জন দত্ত ৩৬৯

৫০) বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ (১৮৫৭-১৮৭৭) — অনিরুদ্ধ দাস ৩৭৪

৫১) উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একটি অনধীত চরিত্র ঃ ইতিহাস পঠনের সীমাবদ্ধতা — গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮০

৫২) উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী কেরানী চরিত্র চিত্রণ — অনামিকা নন্দী ৩৮৭

৫৩) বার্দ্ধক্যে বাস্তুচ্যুতি ঃ বাংলার দেশভাগজনিত দুর্ভোগের একটি দিক — ত্রিদিব সন্তপা কুন্ডু ৩৯১

৫৪) পান্থশালার কথা ঃ নৈহাটীর পান্থশালা ও পুরসভা — মৃণালকুমার বসু ৩৯৮

৫৫) ছাত্র সমাজে আড্ডার চরিত্র বদল ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর এক সমীক্ষা — মহুয়া পাত্র ৪০৫

৫৬) স্যার ডি. এম হ্যামিলটনের গোসাবা — দীপক মন্ডল ৪০৬

৫৭) ঔপনিবেশিক যুগে অরণ্যবিষয়ক গবেষণার আদিপর্ব - সাম্রাজ্যবাদীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানতৃষ্ণা না সাম্রাজ্যের চাহিদা — শুভাশিষ বিশ্বাস ৪১১

৫৮) ইতিহাসের আলোকে খেজুরী — প্রতীক মাইতি ৪১৪

নারী ইতিহাস

৫৯) 'রায়বাঘিনী' ভবশঙ্করীদেবী - ইতিহাসে উপেক্ষিতা এক নারী — শুভ্রাংশু রায় ৪২৩

৬০) ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও ভারতবর্ষ — ঝরনা গোরলে ৪২৮

৬১) নারীবাদী আঙ্গিকে সরোজিনী নাইডু — হাসি ব্যানার্জী ৪৩৪

৬২) মিসেস এম. রহমান ঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব — তাহ্মিনা আলম ৪৩৭

৬৩) সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় লালবাগের শিয়া এবং জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জের জৈন মহিলাদের ভূমিকা — দেবশ্রী দাশ ৪৪৩

৬৪) উত্তরবঙ্গের মহিলা জমিদার — ধনঞ্জয় রায় ৪৪৯

৬৫) সহবাস সম্মতি আইন ঃ উনিশ শতকে বাঙালী নারীর প্রতিক্রিয়া — জয়শ্রী সরকার ৪৫৭

৬৬) উত্তরবঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ঃ স্বদেশী থেকে তেভাগা — রত্না রায় সান্যাল ৪৬৪

৬৭) ভোটাধিকার থেকে আসন সংরক্ষণ ঃ ভারতীয় মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস — রাজশ্রী দেবনাথ ৪৭৩

৬৮) প্রসঙ্গ ঃ নারীমুক্তি 'ভারতী'তে স্বর্ণকুমারী — মধুময় রায় ৪৭৯

৬৯) অন্তঃপুরের নারীভাবনা — চিত্তব্রত পালিত ৪৮৪

৭০) ইতিহাসের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষা — পীযুষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮৮

৭১) উনিশ ও বিশ শতকের ইতিহাসের দর্পণে রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি নারী চরিত্র — তপতী দাশগুপ্ত ৪৯১

৭২) বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী — জাহানারা রায় চৌধুরী ৪৯৮

৭৩) ঊনবিংশ শতকের আধুনিকতা ও বাংলা নাটকে নারী প্রসঙ্গ — নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৫

৭৪) ঊনবিংশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া — রণবীর নাথ ৫১০

৭৫) ক্রীড়া জগতে বাংলার মেয়েরা (১৯০৫-১৯৪৭) — সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য ৫১৬

৭৬) শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ ঃ নারীবাদ ও মানবতাবাদ — কল্যাণী মন্ডল ৫২১

৭৭) আধুনিক মধ্যবিত্ত মননে নারী স্বাধীনতা — ইন্দ্রাণী লাহিড়ী ৫২৮

৭৮)	মেদিনীপুরের ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা — শ্যামল বেরা	৫২৯
৭৯)	দুশো বছর পরেও অমলিন আলোকবর্তিকা ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণি — রাজীব কুন্ডু	৫৩৩
৮০)	সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান - ত্রিবেণী এবং বাঁশবেড়িয়া — শমিতা সিংহ	৫৪২
৮১)	'দার্জিলিং-এ নেপালী ভাষার প্রাসার ও পরশমণি প্রধান' — প্রবাল সেনগুপ্ত	৫৪৯
৮২)	পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) ও বাঙালীর ইতিহাস চিন্তা — করবী মিত্র	৫৫৯
৮৩)	সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা — অমল দাশ	৫৬৪
৮৪)	ডিরোজিওর অ-গ্রন্থিত কবিতার সন্ধানে — শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	৫৭১
৮৫)	"ভারতমিত্র" ঃ কলকাতার এক অবলুপ্ত হিন্দী পত্রিকা — সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫৭
৮৬)	মুসলিম বিয়ের গান ঃ সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ — শেখ মকবুল ইসলাম	৫৮৮
৮৭)	আত্মমূল্যায়নের তাগিদে মুসলিম সমাজ ঃ উনিশ ও বিশ শতকের কিছু পুস্তিকার আলোকে — অনমিত্রা ক্রীষ্টিয়ান	৬০০
৮৮)	বাংলার মুসলিম সমাজ আধুনিক শি ক্ষা বিস্তাবের ইতিহাস (১৯০১-১৯১১) — ইমরান হোসেন	৬০৮
৮৯)	উইলিয়াম এ্যাডামের এদেশবাসীর শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা — ভবতোষ কুণ্ডু	৬২০
৯০)	বেথুন সোসাইটি ঃ একটি পর্যালোচনা — কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়	৬২৭
৯১)	শ্রীনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস — নন্দিনী শৈল দাশগুপ্ত	৬৩২
৯২)	রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান — অসিত দত্ত	৬৩৭
৯৩)	চিত্তরঞ্জন ঃ ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা — মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়	৬৪১
৯৪)	উনিশ শতকে বাঙালির পরিচয়ের সংকট ঃ মধুসূদন (১৮২৪ - ১৮৭৩) — শ্যামলী সুর	৬৪৯
৯৫)	বিবেকানন্দ - একটি অনুসন্ধান — গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৫৭
৯৬)	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব — সতী দত্ত	৬৬৫
৯৭)	রাধাকমলের তাত্ত্বিক অর্থনীতি ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা — অশ্রুরঞ্জন পান্ডা	৬৭০
৯৮)	ঔপনিবেশিক বাংলার নারী, জাতপ্রথা ও কয়েকটি জরুরী সামাজিক প্রশ্ন - শরৎচন্দ্রের লেখায় — গার্গী নাগ	৬৭৭
৯৯)	ইতিহাসের ব্যাখ্যা ঃ কার্লমার্ক্স ও শ্রী অরবিন্দ — হীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার	৬৮১
১০০)	নজরুল রচনায় ইতিহাসবোধ — মোশাররফ্ হোসাইন ভূঁইয়া	৬৮৫
১০১)	বাংলায় গণসংগীতের জোয়ার ঃ ষাট ও সত্তরের দশক — জলি বাগচী	৬৮৯

১০২) বোলান গানের রঙ পাঁচালীতে সমাজভাবনা — অসীম কুমার পাল ৬৯৭
১০৩) 'ফ্রেন্ডস্ অব সোভিয়েট ইউনিয়ন' ঃ বাঙালীর আন্তর্জাতিক মননের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় (১৯৪১-৪৭) — সুস্নাত দাশ ৭০৬
১০৪) সমরবাদ ঃ স্থান-কাল-পাত্রে — চৈতালী চৌধুরী ৭১৮
১০৫) ওষুধের উপনিবেশবাদ ও আধুনিক বাংলা — সুব্রত পাহাড়ী ৭২২
১০৬) স্বাধীনতা-পূর্ব ডুয়ার্স এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা — তনয় মন্ডল ও দেবাশিস নন্দী ৭৩২
১০৭) পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন — সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৭৪১
১০৮) ভারতে জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থার উদ্ভব ও বিকাশ — অঞ্জন বেরা ৭৪৮
১০৯) ভগৎ সিং এর চেতনায় প্রেম — প্রগতি মাইতি ৭৫৭

বিভাগ ঃ ভারত-বহির্ভূত

আন্দোলন ও সমাবেশের ইতিহাস

১১০) বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — দিলীপ ঠাকুর ৭৫৮
১১১) বিপিন চন্দ্র পাল ও স্বদেশী আন্দোলন — ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় ৭৬৪
১১২) সাপুরজী সাকলাৎওয়ালা (১৮৭৪-১৯৩৬) - একটি মূল্যায়ন — অশোক মুস্তাফি ৭৭৩
১১৩) কাঁথি মহকুমায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন (১৯৩২) — বিমল কুমার শীট ৭৭৭
১১৪) মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩২-৩৪) — সাহানা খাতুন ৭৮৩
১১৫) "বাংলায় মুসলিম লীগ রাজনীতি ঃ ১৯৩৭-১৯৪৭" — বিশ্বরূপ ঘোষ ৭৯৩
১১৬) ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ গান্ধীর রণকৌশল — গিরিশচন্দ্র মাইতি ৮০১
১১৭) ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রীসমাজ এবং মহিলাদের ভূমিকা — কল্লোল ব্যানার্জী ৮১২
১১৮) সংগঠিত রাজনীতি ও গণবিদ্রোহ - মেদিনীপুরে ভারতছাড়ো আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি — শুভেন্দু বিকাশ সৎপথী ৮২০
১১৯) মেদিনীপুরে '৪২-এর গণ আন্দোলন : অহিংস এবং সহিংস ধারার সহবস্থান ও সংঘাত — হরিপদ মাইতি ৮৩২
১২০) ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থী' প্রবণতা ঃ একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন — অমিতাভ চন্দ্র ৮৪৩
১২১) স্বাধীনতার প্রাক্কালে টাটানগরের শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৫-৪৭) — নির্বাণ বসু ৮৫৫
১২২) কাট্‌রা মস্‌জিদ অভিযান, ১৯৮৮ - গণহত্যা : কিছু প্রশ্ন — বিষাণ কুমার গুপ্ত ৮৬৫
১২৩) একবিংশ শতকে বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদের পরিণতি ঃ উগ্র সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস — রাসবিহারী মিশ্র ৮৭৩

বাংলাদেশ

১২৪) বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৮৭৬

১২৫) চট্টগ্রাম মগ - ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য — মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ৮৮৪

১২৬) পাকিস্তানের প্রথম দশকে (১৯৪৭-১৯৫৭) পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি — এ টি এম আতিকুর রহমান ৮৯২

১২৭) ভাষা আন্দোলন ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাববীজ — মাহবুবুল হক ৮৯৯

১২৮) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-১৯৭৫) — মর্ত্তুজা খালেদ ৯০৫

১২৯) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম ঃ প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্ব — মোহাম্মদ মাহবুবুল হক ৯১১

১৩০) মুক্তিযুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা — সুনীল কান্তি দে ৯১৯

১৩১) বাংলাদেশে '৯০ - এর গণ-অভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ভূমিকা — মোঃ রেজাউল করিম ৯২৬

১৩২) বাংলাদেশ-দর্শন ঃ বাঙালীর দর্শন - চর্চার ইতিহাস সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ — এন. এইচ্. এম. আবুবকর ৯৩৪

১৩৩) প্রবাসী পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের স্বাস্থ্য চিত্র — মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ৯৪৫

১৩৪) বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যক্তিনাম সংস্কৃতি ঃ একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান — গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া ৯৫০

১৩৫) বাংলাদেশে প্রথম গবেষণা জাদুঘর — মোঃ আতাউর রহমান ৯৫৫

বাংলাদেশ বহির্ভূত বিভাগ

১৩৬) প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নারী — দোয়েল দে ৯৬৪

১৩৭) নাথপন্থ ও সংস্কৃতির বিস্তার — গৌরীশংকর দে ৯৬৮

১৩৮) ব্রহ্মদেশের বাঙালী সমাজ (১৮৮৬-১৯৬৩ খ্রীঃ) — হিমাংশু চক্রবর্তী ৯৭৩

১৩৯) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখন্ড ঃ এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কেন্দ্র ঃ ১৯০০-১৯১৫ খ্রীঃ — পারমিতা দাস ৯৭৮

১৪০) থাই ইতিহাসের আলোকে নারী ও পেশার জগৎ — তপতী রায় চৌধুরী ৯৮৪

১৪১) ভারত-ভুটান সম্পর্ক ও উলফা - বোড়ো আতঙ্কবাদী সমস্যা — দেবমিত্রা মিত্র ৯৮৮

১৪২) চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রকাশ — হরপ্রসাদ রায় ৯৯২

১৪৩) চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা — ফেরদৌসি খাতুন ৯৯৪

১৪৪) ইসলামীয় মতাদর্শে 'ইজতিহাদ' - এর প্রাসঙ্গিকতা — শুকুর আলি মন্ডল ১০০২

১৪৫) মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পৌরোহিত্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা — শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ১০০৯

১৪৬) আইরিশ ঈষ্টার অভ্যুত্থান ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তার প্রভাব — সোফিয়া হাইত ১০১১

১৪৭) রেনফ্রুশায়ারে (স্কটল্যান্ড) শিল্প বিপ্লব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১৮৩০-৭২) — সামিনা সুলতান নিশাত ১০১৭

১৪৮) ভারত-চর্চায় লেনিন — প্রদোষ কুমার বাগ্‌চী ১০২৫

১৪৯) তাজিক জনমানস ও রাজনীতি সচেতনতায় ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রভাব (সোভিয়েত যুগ) — নন্দিনী ভট্টাচার্য্য (চট্টোপাধ্যায়) ১০৩৩

১৫০) NATO- এর বেলগ্রেড আক্রমণ - মানবাধিকার রক্ষা না সার্বপুঁজিপতিদের দমন — সৈকত গুহ ১০৪০

১৫১) বিশ্বসঞ্চার ব্যবস্থাব ইতিহাস — প্রবীর কুমার লাহা ১০৪৪

সেকাল ও একাল

তপন রায়চৌধুরী

আমার আজকের বক্তব্যের প্রধান সূত্র হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন (বিশেষত গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর)। ১৯৯৭ সালে যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হল তখন সবাই লক্ষ্য করেছেন, দেশে কোথাও এই স্বাধীনতা নিয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ নেই। ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন যাদের স্মরণ আছে তারা জানেন সমস্ত দেশে কি প্রচণ্ড উৎসাহ, আবেগ দেখা গিয়েছিল। পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে আবেগ আর নেই কেন, এবং সেই আবেগ না থাকার আমাদের জাতীয় জীবনে তাৎপর্য কি? এটাই আজকে আমার আলোচ্য বিষয়।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে '৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হল সে দিনটি কি সময়টি আমাদের খুব সুখের সময় ছিল না। রক্তাক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতার মুখ দেখলাম। বহু লোকের জীবন, সম্পত্তি, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু সেই দুঃখের মুহূর্তেও আনন্দের,উচ্ছ্বাসের কোন অভাব হয়নি। সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস পঞ্চাশ বছরে কোথায় মিলিয়ে গেল, কেন মিলিয়ে গেল? এর নানা ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয় দেশব্যাপী দুর্নীতি, দারিদ্র্য, আমাদের আর্থিক উন্নতি, প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, সাম্প্রদায়িক ও জাতিভিত্তিক ঝগড়া মারামারি এই সব কিছুতে স্বাধীনতার গৌরব আর অম্লান নেই। এসব কথাই হয়তো সত্য কিন্তু অন্য একটা সার্বিক পরিবর্তনের দিকেও যথেষ্ট ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতা দিবসের যে প্রচণ্ড উল্লাস তার প্রধান কারণ জাতীয়তাবোধের সার্বিক আবেদন। যে আবেদন শ্রেণীর গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বশ্রেণীর কাছে পৌঁছেছিল। আজ সেই আবেদন ক্ষীণ। অন্য আদর্শ ও চিন্তা তার জায়গা নিয়েছে। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র আর উৎসাহের খোরাক জোগায় না। যে আদর্শ একদিন আমাদের রক্তে আগুন ধরাতো, [এক বিদেশী পর্যবেক্ষক আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন — it was a fire in the blood] সেই আদর্শ আজ বিপন্ন,নির্জীব।

জাতীয়তাবাদ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের প্রধান ধর্ম। জাতীয়তাবাদ খুব প্রাচীন ধর্ম নয়। আঠার শতকের মধ্যভাগে পঃ ইউরোপ এবং ভবিষ্যতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম। ক্রমে সেই আদর্শ অন্য পাঁচটা আদর্শের মত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার পাশাপাশি আরও নানান শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক আদর্শ মানুষের জীবনে এসেছে। কিন্তু একথা বললে বোধহয় সত্য হয় যে গত দু'শো আড়াইশো বছর ধরে, বিশেষ করে উনিশ শতকের মানুষের প্রধান রাজনৈতিক ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় জাতীয়তাবাদ। তার মানেই জাতীয়তাবাদ যে সর্বত্র খুব বাঞ্ছনীয় তা বলছি না। আজকের মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে দেখেন, যুগোশ্লাভিয়ায় যা হচ্ছে চিন্তা করেন, তার আগে জাতীয়তাবাদের নামে জার্মানী, ইতালিতে যা হয়েছে সে সব ঘটনা স্মরণ করেন তাহলে জাতীয়তাবাদকে খুব একটা ভাল জিনিস বলে মনে হয় না। কতকটা এই কারণেও পৃথিবীর সর্বত্র বুদ্ধিজীবী, উদারনীতিতে বিশ্বাসী, মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে জাতীয়তাবাদ ম্লান হয়ে গেছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেও, বিশেষ করে যাঁরা চরম বামপন্থী তাঁরা জাতীয়তাবাদকে একটা নিন্দাসূচক শব্দ বলে মনে করেন। এসবই সত্যি কিন্তু একথাও মানতে হবে যে এখনো এই একটি আদর্শের জন্য ঠিক হোক বা ভুল হোক, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ স্বেচ্ছায় অস্ত্র তুলে নেয়, মরতে প্রস্তুত হয়। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বা ধর্মের প্রতি মানুষের যে আনুগত্য ছিল উনিশ/কুড়ি শতকে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি সেই আনুগত্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে জাতীয়তাবাদের বীভৎস রূপ আমরা দেখেছি। তার ফলে তার গৌরব অস্তমিত। জাতীয়তাবাদ আজ তাই নির্বোধ ও পরজাতি বিদ্বেষের ধর্ম। তার প্রধান প্রকাশ জাতিগত বিশুদ্ধকরণ বা এথনিক ক্লিনসিং। ফলে যাঁরা চিন্তা করেন, তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আজ হৃতগৌরব। আগ্রাসী স্বার্থবোধ, অন্য মানুষের সর্বনাশ করে নিজের বৈভব বাড়ানোর ইতিহাস, তার চরম প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদে। তার সঙ্গে অন্য জাতি, ধর্ম বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষও আছে। অবশ্য সে বিদ্বেষ অনেক সময় জাতীয়তাবাদ নিরপেক্ষ। এই সব কারণে আজ অনেক চিন্তাশীল মানুষ জাতীয়তাবাদের অবসান হওয়া মঙ্গলজনকই মনে করেন। আমাদের দেশে কিছু চরমপন্থী এই শুভ পরিণাম এখনও ঘটে নি বলে চিন্তিত। অপরপক্ষে কিছু পশ্চিমী পণ্ডিত দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা বলেন— শুভ ও অশুভ। মোট কথা তাদের চোখে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির জাতীয়তাবাদ প্রথম পর্যায়ের। এশিয়া, আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ বিকৃত বিদ্বেষ প্রসূত আদর্শ। তার উৎস প্রাগ্রসর জাতিগুলির প্রতি ঈর্ষাবোধ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ যার ফলে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক বলেছেন, এই সব পণ্ডিতদের চোখে দুধরনের জাতীয়তাবাদ আছে। আমার জাতীয়তাবাদ যা ভাল, তোমার জাতীয়তাবাদ তা খারাপ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

নেতিবাচক দিক অবশ্যই ছিল। বিশেষত অন্য জাতি বা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ গৌণ হলেও তার অঙ্গ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলতঃ এই উপমহাদেশের জীবনে জাতীয়তাবাদের অবদান শুভ। তার প্রধান মঙ্গলদায়ক দিক জাতিধর্মনির্বিশেষে এই উপমহাদেশের সব মানুষকে এক বিরাট মহাজাতি কল্পনা করা। ভবিষ্যত রাষ্ট্র এই অক্ষপথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার অন্যতর ভিত্তি হবে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে উচু নৈতিক মান। পূর্বযুগের রাজনৈতিক বা সমাজ নেতারা এই কল্পনাই করেছিলেন। এই আদর্শ জাতীয় আন্দোলনকে গৌরব ও মহত্ব দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে আজ তাতে এই তুষারশুভ্র আদর্শ অনেকাংশেই বিপর্যস্ত। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে উৎসাহ যে নিভে গেছে তার একটি কারণ এই। কিন্তু এই নিরুৎসাহতার অন্যতর পরিণাম রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নীতিবোধের অবসান। সেই সংস্কৃতি ক্রমেই প্রায় সম্পূর্ণভাবে নীতিনিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থসিদ্ধিই তার একমাত্র না হলেও অনেকাংশেই মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত দেশের গত পঁচিশ/তিরিশ বছরের রাজনীতিকে অনেকেই এই চোখে দেখেন। জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রকৃতির দান নয়। ভাষা বা সংস্কৃতিগত ঐক্য ছাড়াও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। বিশ্ব ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এর জন্ম। জন্ম পশ্চিমী জগতে, পরে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে এই ইতিহাসের চেহারার মিল আছে। এক সংস্কৃতি ও ভ.ষা ছাড়া জাতি হয় না, এ চিন্তা সাম্রাজ্যবাদীরা চালু করেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। তাদেরই সুর ধরে, আজকাল কোন কোন দেশীয় পণ্ডিত বলছেন, কৌম বা কমিউনিটি মানুষের স্বাভাবিক গোষ্ঠী। ইউরোপের ইতিহাসে এই তত্ত্বের বহু ব্যতিক্রম রয়েছে। জার্মানী ও ব্রিটেন রাষ্ট্রের জন্ম সংঘাতের মধ্যে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র কোন এক কৌমের রাষ্ট্র নয়। "যুক্ত রাজ্য" অন্তত তিনটি কি চারটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও ভাষাভাষী লোক নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জার্মানীর ইতিহাস ষোল-সতের শতকে ধর্মভিত্তিক মারামারির ইতিহাস। তা সত্ত্বেও সেখানে সংহত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। ব্রিটেনের ইতিহাসের শিক্ষা এই যে ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য থেকে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আরও বিচিত্র। সেখানে জাতীয়তাবাদ সংহত হয় গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

ভাষা বা সংস্কৃতিগত ঐক্য যে জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদান নয়, তার অন্যতম প্রমাণ আবার এই 'নতুন জগতে'র ইতিহাস থেকেই দেখতে পাই। যখন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করল তখন সীমান্তের অপরপারে আরও কতগুলি রাজ্য ছিল যারা ইংরাজিভাষী এবং ইংরাজের শাসনের অধীনে। তারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেনি। কেন? ভাষাগত সংস্কৃতিগত ঐক্য থেকেই যদি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তাহলে কানাডা কেন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হল না? ভাষাগত সংস্কৃতিগত ঐক্য থেকেই যদি জাতীয়তাবাদ সংহতি লাভ করে তাহলে উনিশ শতকের শেষার্ধে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রচন্ড গৃহযুদ্ধ হল কেন? সুতরাং এই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষেও এই জাতীয়তাবাদের সংহতি এইভাবে হয়েছিল। এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অস্বাভাবিক বা মেকি না। এটা যে মেকি তা উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদীরা বলতেন। আজকে অদ্ভুতভাবে প্রগতিবাদীরাই সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে একথা বলতে শুরু করেছেন। বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্বে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ মিথ্যে হয়ে যায় নি। এপ্রসঙ্গে উপমহাদেশের সংস্কৃতিগত ঐক্য বা মুঘল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একীকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আজ সে আলোচনায় যাবো না। আমার বক্তব্য উনিশ এবং বিশ শতকে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়, যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের এই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেটা তার প্রাচীন ইতিহাস নিরপেক্ষ। বিশেষ কতগুলি ঐতিহাসিক সংগঠনের মধ্যে থেকে এই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জন্ম। শুধু একটা কথার উপরে জোর দিতে চাই, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে দেশে জাতীয় ঐক্য ছিল না বলে কষ্টে অর্জিত জাতীয়তাবাদ বৃথা হয়ে যায় না। তবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের ফলে দেশ ও রাষ্ট্রে সংহতি সৃষ্টি ও রক্ষা যে সমস্যা সঙ্কুল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সব সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা যে ভারত রাষ্ট্রের আছে একথা এখনও অপ্রমাণ হয়নি।

ভারতবর্ষ কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সত্যিই অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে? অথবা যেমন ইংরাজ পণ্ডিতরা নানা প্রকারে পাকেচক্রে বারবার বলেন যে এই স্বাধীনতা উদার ইংরাজের দান সে কথাই সত্যি? কেউ কেউ আবার বলছেন, এটা উদার ইংরাজের দানও নয় আবার ভারতবাসীও এই স্বাধীনতা অর্জন করে নি। এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তির সাম্রাজ্যরক্ষা করার ক্ষমতা প্রায় চলে যায় এবং তারই ফলে তারা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারাই যে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদের শক্তি এবং নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে তার অবদানের প্রমাণ এইখানে। নতুন শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার উৎস স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের নেতৃত্ব। বিদেশী শাসকদের ভারতবর্ষে সহযোগীর অভাব কখনো হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রিসভা ইংরাজের অধীনে কখনো কখনো ইংরাজের প্রত্যক্ষ সমর্থনে রাজত্ব করে গেছে। প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস তখন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত। সেই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতারা কারাগারে। তার যে অর্থসামর্থ্য তা সমস্ত সরকার কেড়ে নিয়েছে। এসব সত্ত্বেও এই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতারা '৪৫ সালে কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েই ইংরাজের সাথে ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আহুত হলেন। কেন? ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫

পর্যন্ত যে সব ভারতীয় নেতারা বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিত্ব করেছেন তাদের না ডেকে এই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ডাকা হল কেন? সেই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে কোন অবদান আছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। অবদান এখানে জাতীয়তাবাদের । কারণ এই নেতৃত্বের ফলে যে আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় কংগ্রেসকে ডাকায় সেকথাই প্রমাণ হয়। 'ক্যারিশ্‌মা' বলে যে শব্দটি ইংরাজিতে ব্যবহৃত হয় তার সার্থক বাংলা অনুবাদ করা কঠিন। জাতীয় আন্দোলন যে ক্যারিশমা অর্জন করেছিল, তা নেতা ও কর্মীদের আত্মত্যাগের কতগুলি কর্মপদ্ধতি, কতগুলি প্রচারের ভিত্তিতে অর্জন করেছিল। সেই প্রচার এবং কর্ম যে সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছিল তার প্রমাণ, ইংরেজ যখন রাজ্য হস্তান্তর করবে তখন সাম্রাজ্যের শত্রু এই নেতাদেরই কারাগার থেকে ছেড়ে দিতে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হল। অনুগত সহযোগীদের ছেড়ে, নিতান্ত অনুগত রাজা মহারাজাদের পথে বসিয়ে এক বিদ্রোহী সংস্থার নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের হাতে এই জন্যই ক্ষমতা দিতে হল। কারণ জাতীয়তাবাদের পেছনে অধিকাংশ ভারতীয়ের সমর্থন তখন এসে গেছে। দেশীয় রাজ্য এবং অন্য ইউরোপীয় জাতি শাসিত অঞ্চলগুলিও এই নতুন ধর্মের আওতায় এসেছিল তার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাসে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শুরু ইংরাজিনবীশ মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের প্রথম যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক আদর্শের অঙ্গ ছিল। ক্রমেই সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজভক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। ইংরাজের জাতিবৈর সম্পর্কে তারা বিশেষ স্পর্শকাতর ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা ও জগতব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে গর্ববোধ তবুও তাদের চেতনায় দীর্ঘদিন সহাবস্থান করত। জাতীয়তাবাদের পেছনে যে গভীর আবেগ ছিল প্রথম যুগে তার ভিত্তি এইখানে। ১৮৭০-এর দশকে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতারা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এই আবেগকে সংহতি দিতে চেয়েছিলেন। নবজাত জাতীয়তাবোধের প্রকাশ সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। আবার সেই সব প্রতিষ্ঠানই জাতীয়তাবাদীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্টরূপ দিতে সাহায্য করে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সামাজিক খসড়া আঁকতে শুরু করে। নতুন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সেই উষাকাল আজকের আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ স্বাধীনতা যখন রাজনৈতিক সত্য হয়ে দেখা দিল জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইতিহাস তখন ৭০ বছর ছাড়িয়ে গেছে। এই কথাটির উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক নতুন স্বাধীনদেশ জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেরই স্বাধীনতা আন্দোলনের বা জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সময়ের হিসাবে অত্যন্ত হ্রস্ব, ভারতবর্ষে অন্তত সত্তর/আশি বছর ধরে এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে। এর আগেও চলে যাওয়া যায়। প্রায় ১৮৪০ সন থেকে আমরা দেখি কিছু কিছু মানুষের মনে এই চেতনার সঞ্চার হয়েছে।

মোট কথা, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কল্পনা প্রথমে অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে বহুদিন ধরে। আর আন্দোলনের মাধ্যমে এক বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে সেই দেশাত্মবোধ ছড়িয়ে গেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে। অর্থাৎ ১৯৪৭-এ সেই গণ চেতনার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯১৯ থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় তার মারফত জাতীয়তাবাদের আদর্শ শহর গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছেও পৌঁছায়। যেই প্রতিষ্ঠানটি সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ক্রমে জনগণের চোখে তা বিদেশী সরকারের বিকল্প হিসাবে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের একটি আলোচনা বা বিতর্ক উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক ক্ষমতাশালী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী বলছেন যে গণ আন্দোলনের নিজস্ব স্বাধীন চেতনা ছিল। জনগণ মধ্যবিত্ত নেতাদের কাছ থেকে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা নেয়নি। তাদের নিজেদের বিশিষ্ট প্রয়োজনবোধ ছিল, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। কথাটির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বঞ্চিত মানুষ যদি মনে না করতেন যে এই আন্দোলনগুলি তাঁদের জীবনে প্রাসঙ্গিক, তাহলে সে আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করতেন না। কিন্তু অন্যদিকে একটা কথা বলা প্রয়োজন, সমস্ত ভারতব্যাপী একজাতি বা দেশ আছে সেই ভারতব্যাপী জাতি বা দেশ এক সময় এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই চিন্তা পরস্পর বিছিন্ন গ্রামীণ জনগণের মনে জাতীয় আন্দোলনের আগে কখনো এসেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই না। সুতরাং শুধুমাত্র বঞ্চিত মানুষের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার ফলে তাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে একথা বললে রোমান্টিক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। জনগণের প্রতিও সুবিচার করা হয় না। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভাল বা মন্দ যাই হোক তারা যে একটা নতুন চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'ভারতমাতা' বলে শব্দটি জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষার অঙ্গ করে তুলতে পেরেছিলেন, সে ব্যাপারে তাঁদের দান অবহেলা করলে ইতিহাস বিকৃত করা হয়। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে ৭ টি প্রদেশে কংগ্রেসের জয় এই নতুন চেতনার দ্যোতক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজ সরকারের দুঁদে কর্মচারীরাও জাতীয়তাবাদের এই চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিলেন। এর আগে অবধি তাদের বিশ্বাস ছিল যে জাতীয়তাবাদ মুষ্টিমেয় ধান্দাবাজ ভদ্রলোকের কারসাজি মাত্র। তার পিছনে গণসমর্থন নেই। কিছু ইংরাজ ঐতিহাসিক ভাঙা রেকর্ডের মত এখনও এই বুলি কপচে যাচ্ছেন। তারা দেখাচ্ছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা জেলে গিয়েছিল তারা ভারতবর্ষের লক্ষ অংশেরও কম, অতি সামান্য কিছু লোক। এইভাবে বিচার করতে গেলে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে কজন যুদ্ধ করেছিল এবং তারা আমেরিকার জনসংখ্যার কত শতাংশ তা হিসেব করতে হয়। ১৯৩৭ অবধি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সত্যিই মনে করতেন যে গ্রামীণ ভারতবাসীর স্বাভাবিক আনুগত্য রাজা-জমিদার-তালুকদার সম্প্রদায়ের প্রতি। চাষীর চোখে তারাই নাকি মা-বাপ। আর সেই স্থানীয় মা-বাপের মাথার ওপরে আছেন

পরম পিতা ইংরেজ শাসক অর্থাৎ সরকার বাহাদুর। তাদের আরো বিশ্বাস ছিল ভারতীয় কৃষকদের কাছে রাজদ্রোহ নিতান্তই না পসন্দ। ১৮৫৭ সনটা মনে হয় তারা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক ভুল বোঝার ব্যাপারটা আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বিদেশী শাসনের যুগে শাসক গোষ্ঠীর ভারতচিন্তায় আত্মতুষ্টির চেষ্টা স্পষ্ট। ভারতীয় মানুষ আসলে তাদের জান দিয়ে ভালবাসে এই বিশ্বাস না থাকলে সাম্রাজ্যের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস টেঁকে না। পরের দেশের মানুষের উপর ছড়ি ঘোরান যে নিতান্ত নীতিসঙ্গত এমন কথাও নিজেদের বোঝানো যায় না। আজকে যে চরমপন্থীরা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে শুধু শোষণযন্ত্র বলে মনে করেন, তাদের চিন্তায়ও আবেগ আর কল্পিত সিদ্ধান্তর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চোখে পড়ে। ফলে যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটাও নিতান্ত মেকি এবং ধাপ্পা একথা তাঁরা বার বার ঘোষণা করছেন। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার কত কাছে তারা পৌঁছে গেছেন এই খেয়াল বোধহয় তাঁদের নেই। দুই গোষ্ঠীর কাছেই জাতীয়তাবাদ স্বার্থপর ধান্দাবাজের তৈরি ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে নির্বাচনের ইতিহাস অন্যকথা বলে। দেশের বঞ্চিত জনগণ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে অবান্তর মনে করেন নি। ১৯৩৭ সাল থেকে ভোটের ইতিহাস এই কথাই বলে এবং '৪৭-এর পরে গণভোটের যুগে তার সত্যতা আরও সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে বোধহয় ভারতবর্ষেই প্রথম স্বাধীনতার মুহূর্তে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। অন্য সব দেশে এই অধিকার পেতে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের দেশের রাজনীতির চেহারা বদলেছে ঠিকই এবং সে চেহারায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র সম্পর্কে উৎসাহের চিহ্ন প্রবল নয়। কিন্তু এই অনীহার কারণ কৌম বা কমিউনিটির প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য বা বহুসংস্কৃতি গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ফলে জাতীয়তাবাদের অসম্ভাব্যতায় খুঁজতে গেলে ভুল হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল ভারতবর্ষ শতশত খণ্ডে ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নি। রাষ্ট্রে বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। সম্পূর্ণ নীতিবর্জিত রাজনীতি বহুমানুষকে রাজনীতি সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ইন্ধন জুগিয়ে এবং তার সুযোগ নিয়ে গৈরিক দল ক্ষমতার প্রধান ভাগীদার হয়েছে। আঞ্চলিক আশা নিরাশার চাপে দেশ ভেঙ্গে যাওয়াই একমাত্র সম্ভাব্য বিপর্যয় নয়।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার স্বরূপ বুঝতে হলে স্বাধীনতার মুহূর্তে জাতীয়তাবাদের আবেদন কোথায় ছিল কেমন ছিল বোঝা দরকার। এই আবেদনের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, কোন একটি বিশেষ দলের নয়, তার নানারূপ আছে। গান্ধীবাদীরা অহিংস পথে আন্দোলনের চেষ্টা করেছেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের চোখে বিশেষ করে ১৯৩৭-এর পরে তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানটিকে ইংরেজ সরকারের বিকল্প এক ক্ষমতার উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু সুর ছিল। বামপন্থী নেতারা

যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁরা— এই সব বহু মানুষের আত্মদানে জাতীয়তাবোধ বহুলোকের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। আমরা জানি যে, যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয় সেই বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গান, ছড়া এখনও প্রচলিত। অর্থাৎ আমাদের যে সামাজিক চেতনা তারমধ্যে একটা রাষ্ট্রচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা যার ভিত্তি জাতীয়তাবাদী বহু মানুষের কর্মে ও জীবনে বহু শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিসেবে দেখানো হয়েছে যে ১৯১৯ সাল থেকে যে আন্দোলনগুলি হয়েছে তা মোটেই মধ্যবিত্তের আন্দোলন নয়। নীরদ চৌধুরী মশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ১৯২০ সনের কলকাতার বর্ণনা করেছেন। যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে তখনকার খিলাফত ভলান্টিয়ারদের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন একেবারে সমাজের যে নিম্নতম স্তরের মানুষ, "scum of the earth" অর্থাৎ সাধারণ হতদরিদ্র মানুষ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০-এর আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশে যাঁরা কারাগারে গিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর অর্থাৎ একথাটা একেবারেই সত্যি নয় যে জাতীয় আন্দোলন যখন সত্যিকার সংঘর্ষের পথে গিয়েছে তখন তার শরিক শুধু মধ্যবিত্তরা। একথা বলছি জাতীয়তাবাদের প্রশংসা করতে নয়। শুধু বোঝাতে যে আমাদের দেশে সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনায় জাতীয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যার প্রকাশ ১৯৪৭ সন মধ্য অগাষ্টে যেদিন দেশ স্বাধীন হল সেদিন দেশব্যাপী প্রচণ্ড উল্লাসে। এই চেতনা কতটা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছেছিল তার অন্যতর প্রমাণ ১৯৪২ সন। এসময় কংগ্রেস নেতৃত্ব আন্দোলন চালাবার জন্য কারাগারের বাইরে ছিলেন না। গান্ধী শুধু আন্দোলনের ডাক দিয়েই কারাগারে গিয়েছিলেন কিন্তু দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংরেজরা নিজেদের লেখায় স্বীকার করেছেন যে ১৮৫৭-র পরে এতবড় দেশব্যাপী আন্দোলন তারা কখনো দেখেন নি। তাঁরা প্রকৃতই ভয় পেয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের মধ্যে অনেক ভুল ছিল, হয়ত অনেক বীভৎসতাও ছিল কিন্তু তার থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে সাধারণ দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের মনেও দেশ, জাতি সম্পর্কে একটা আবেগ গভীর ভাবে শিকড় গেড়েছিল।

এখন আগের কথায় ফিরে আসি। দেশ স্বাধীন হল কি ভাবে? সত্যিই কি অসহযোগ আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হল, সত্যিই কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ. গড়ে তুললেন বলে ইংরেজরা ক্ষমতা ছেড়ে দিল? হয়ত নয়। আমেরিকার মত ভারতবর্ষে কোন ইংরেজ সেনাপতি গান্ধীজী বা নেতাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। তাহলে ইংরেজদের চলে যাওয়ার কারণটা কি? যিনি ইংরেজ সরকারকে মতিলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সাথে সমঝোতা করে তাদের হাতে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস তুলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই হেইলি বলছেন, যে ১৯৩০এর আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীরা যে দুঃখ বরণ করলেন, যে অসাধারণ তিতিক্ষার সঙ্গে তারা ইংরাজের সাথে লড়াই করলেন, তাতে "মেন অব গুড উইল" তাঁদের পক্ষে চলে যাচ্ছে। "মেন

অব গুড উইল'' বলতে ইংরাজের সপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ইংরাজের কর্মচারীরা। তিনি বলেছেন যে ইংরাজের উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীরা এই আন্দোলনের তিতিক্ষায় আত্মদানে গর্ববোধ করে। চল্লিশের দশকে ওয়াভেল বলছেন, যদি আবার আন্দোলন হয় তাহলে ভারতীয় কর্মচারী, ভারতীয় পুলিশ বা সেনার উপর নির্ভর করা যাবে না। এর অন্যতম প্রমাণ হল, বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহ। সুতরাং জাতীয়তাবাদ একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যখন যে সহযোগিতার উপরে ইংরাজের শাসন টিঁকে ছিল সেই সহযোগিতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলন তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করেনি। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বার বার দেখাতে চান গান্ধীর ডাকে এই আন্দোলনে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই চাকরি ছেড়েছে এবং আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এটা সত্যি কথা তবে পাথরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ে যেমন পাথরও ক্ষইয়ে দিতে পারে, ক্রমাগত আন্দোলন, প্রচার, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখে দেখে ভারতবর্ষের মানুষের মনে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতার উৎসাহ কমে যায়। ওয়াভেল সাহেব ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভাকে জানান যে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধরে রাখা আর সম্ভব না, এ চেষ্টা ছাড়তে হবে। তিনি এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন - আস্তে আস্তে ক্ষমতা গুটিয়ে আনার। যে প্রদেশগুলিতে জাতীয়তাবাদীরা নির্বাচনে জিতেছেন সে সব প্রদেশ তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক এবং দিল্লীকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চল তাতেই ইংরেজ শাসন সংহত করার চেষ্টা হোক। এই প্রস্তাব শুনেই অ্যাটলি পত্রপাঠ তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয় ভারত স্বাধীন হবার পরেও চার্চিল তা শুনে শঙ্কিত হয়েছিলেন, প্রস্তাব এসেছিল সেনা পাঠিয়ে ভারতবর্ষ পুনর্বার জয় করে নেওয়ার জন্য।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই যে জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার আরো প্রমাণ আছে। ১৯২০ সনে ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩০-এ তাঁদের অনেকেই আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন বোম্বাই-এর গভর্নর বলেছেন যে, এখন তারা জাতীয়তাবাদকে নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে কিছুটা আত্মত্যাগ করতে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজী। এই সময় অবশ্য বিড়লা এবং টাটার মধ্যে একটা মজার চিঠি বিনিময় হয় যেটা আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হবে। বিড়লাকে টাটা লেখেন যে দেশে সাম্যবাদের ক্ষমতা বাড়ছে, সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীরা শিল্পপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। এর জন্য আমাদের একত্র হওয়া দরকার— এদের ক্ষমতাকে রোধ করার জন্য। বিড়লার উত্তরটা গভীর অর্থবহ। তিনি বলেন জোটবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষমতা রোধ করতে শিল্পপতিরা পারবে না, একমাত্র স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রই এটা রোধ করতে পারবে। একদিকে যেমন সাধারণ বঞ্চিত মানুষ জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে এসেছেন, তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অন্যদিকে ১৯৩০ সালের পরে ভারতীয় শিল্পপতিরাও জাতীয়তাবাদের আওতায় এসেছেন। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে তাঁর একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, (এটা তাঁর সাবল্টার্ন গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আগের রচনা)

যে ১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ জাতীয়তাবাদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তিনি সে সময়কার উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসে ক্ষমতার সঙ্গে চীন দেশের মাও সে তুঙের সেই বিখ্যাত লং-মার্চের সময়কার, বা নতুন পরিকল্পনার সময়কার সোভিয়েত রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংখ্যাগত তুলনা করে দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে বহু শ্রেণী ও সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদের সমর্থক হলেও সবাই হয়নি। তার একটা কারণ, যে শ্রেণীর মানুষ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাঁদের পক্ষে সব শ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলি গভীর স্বার্থগত সংঘাত ছিল এবং আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা কত প্রবল কতগুলি ঘটনায় তা বোঝা যায়। কৃষকদের স্বার্থ বাঁচাতে স্বামী সহজানন্দ বিহার অঞ্চলে আন্দোলন করেছিলেন এবং গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্পষ্টত গান্ধীজীর বিপক্ষে কথা বলেন নি ততক্ষণ কৃষকরা তাঁর সঙ্গে ছিল যে মুহূর্তে তিনি সোজাসুজি বলেন যে, তিনি গান্ধীর পথ সমর্থন করেন না সেই মুহূর্তেই তিনি সমর্থন হারালেন। এ নয় যে কৃষকরা নিজেদের স্বার্থ বোঝে না। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে নিজেদের স্বার্থবিরুদ্ধ হলেও জাতির সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ সমর্থন করছে। সাধারণ মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদের আবেদন এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে তারা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বর সাথে হাত মেলাতে রাজি ছিল। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। এইজাতীয় জাতীয়তাবোধের উপরে ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে দেখিয়েছেন, কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তার প্রধান সমর্থক নীচুজাতের অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু রায়তরা। এরা পরবর্তীকালে দেশস্বাধীন হওয়ার পরে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ বঞ্চিত কৃষক তা সত্ত্বেও বহুদিন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানটির সমর্থন করেছে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক আবেগ জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের স্বার্থের দিকে তাকানো নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ১৯৩৭এ যে কংগ্রেস মন্ত্রী সভাগুলি প্রদেশে ক্ষমতাশীল হয়, তারা জমি বন্টনের বিষয়ে নীতি মৌখিক ভাবে গ্রহণ করলেও কার্যকরী করতে পারেন নি। আমি এটাই বলতে চাই যে জাতীয়তাবাদের বহু দুর্বলতা ছিল। বহুদিন তারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের সমর্থন করেছে। সর্বশ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলন করণে সবশ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব নয়। এজাতীয় আন্দোলনে বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রতি জনগণের প্রচণ্ড সমর্থন ছিল। আমাদের অল্পবয়সে যখন ইস্কুলে পড়ি, মনে আছে তখন প্রতিবছর কাগজে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা দেখতাম। রাষ্ট্রপতি মানে কংগ্রেস সভাপতি। সেই রাষ্ট্রপতিকে আমরা সত্যিকারের রাষ্ট্রপতি বলেই ভাবতাম। '৪৭ -এর পরে যখন সত্যিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির আসনে ভারতীয়দের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বসলেন তখন যে উদ্দীপক ছবি মানুষের মনে ছিল তা

আজ অনেকটাই হৃতশ্রী, বিগতগরিমা।

এবার সেকালের সাথে একালের পার্থক্য প্রসঙ্গে আসি। ১৯৪৭ সনে যখন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল তখন ভারতীয় জাতি যে গঠিত হয়েছে এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। এবং সেই রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদও প্রবলভাবে বর্তমান। কিন্তু জাতি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এর নানা কারণ ছিল। প্রথম কথা শিল্পপতি এবং শ্রমিক, যারা খাজনা দেন তাঁরা এবং ভূমিহীন কৃষক, ব্রাহ্মণ এবং অচ্ছুৎ এদের সকলকে নিয়ে একজাতি গড়ে তোলা সহজ কথা নয়। তাছাড়া আমরা জানি যে ১৯৪০-এর দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মুসলমানের সমর্থন হারায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেই জাতি গঠনের অসমাপ্ত কাজ, সেই সমর্থন সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টায় সাফল্য সীমিত। একথা বললে ভুল হবে যে ভারতরাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে যে সব মুসলমান নেতা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা প্রতীক মুসলমান মাত্র। যাঁরা আবুল কালাম আজাদ বা রফিউদ্দিন কিদওয়াইকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে এই সব মানুষকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এরা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের সমর্থন পান নি। কিন্তু পরবর্তী কালে আমাদের রাষ্ট্র গঠনে একটা প্রবল দুর্বলতা এই যে, কোন কোন সম্প্রদায়ে যে নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে এলেন তাঁরা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বর উপর জোর দিয়েছেন। এবং ভোটের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো এই সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। ফলে নানা দিক থেকে জাতি গঠনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আশ্চর্যের কথা এই যে আমাদের সাধারণ বঞ্চিত মানুষ এই অসম্পূর্ণ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি একটা আনুগত্য বোধ করে। এই রাষ্ট্রে যে তাদের অংশ রয়েছে সেটা তারা বিশ্বাস করে। এর চরম প্রমাণ দুটি ঘটনা— প্রথমত, যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন তখন নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া মাত্র ভারতবর্ষের দরিদ্রতম মানুষ তার বিরোধীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দু'বছর পরে জনতা সরকার যখন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা একেবারেই মেটাতে পারল না, তখন গণভোটে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলেন। অনেক সময় বলা হয় যে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ খেতে পরতে চায় তাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন উৎসাহ থাকে না। কিন্তু ৭০এর দশকের ইতিহাস এই ধরনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। দরিদ্রতম মানুষও একধরনের রাজনৈতিক শাসনে বিশ্বাস করে এবং সেই শাসন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে নির্বাচনের যেসব বিশ্লেষণ হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, যে সব গ্রামে শিক্ষা সাক্ষরতা নেই সেসব গ্রামে যে সংখ্যক লোক ভোট দেয় তার তুলনায় দিল্লী শহরে ভোট দেয় অনেক কম সংখ্যক লোক।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আলোচনা করতে চাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন আন্দোলনে নানা পথ, নানা মত দেখা

দিয়েছে তখন বিভিন্ন দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী, আগাগোড়াই চেষ্টা করেছে নিজেদের দলে আদর্শবাদী এবং যোগ্য মানুষকে টেনে আনার। এই প্রচেষ্টা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আর দেখা যায় না। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে শুধুমাত্র আত্মদানের ডাক আদর্শবাদী মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য ছিল। ফলে যে সব যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পরবর্তী যুগে নানা ক্ষেত্রে, চাকরী পেশা বা ব্যবসার ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবনের সুযোগ পেয়েছেন, বিদেশী শাসনে তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় সব মানুষ অনেকেই কর্মহীন বা অতি সামান্য কাজে জীবন কাটিয়েছেন। সব রাজনৈতিক দলই সেই সুযোগ্য আদর্শবাদী মানুষের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে পারত। আমি একথা বলছি না যে, চাকরি না পেয়ে লোক কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কথাটা এই যে আদর্শবাদের আবেদনে অনেক মানুষ সাড়া দিতে পেরেছিল কেননা তাদের কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। পরবর্তী যুগে নানা ভাবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে জীবিকায় যুক্ত থেকেও দেশের সেবা করার সুযোগ রয়েছে, অনুরূপ সুযোগ ইংরেজ আমলে দিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে নানা ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে অর্থনৈতিক সুযোগ খুলে যায়। বেকার সমস্যা ছিল এবং আছে। তা সত্ত্বেও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে তা নগণ্য নয়। ইংরাজীতে যেটাকে টারসিয়ারি সেক্টর বলে, সেই চাকরি-বাকরির জগতে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন হল। একটা হিসেব দিলে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল তখন সমস্ত উপমহাদেশে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০০টি কলেজ ছিল। তার ২০ বছর পরে সেই সংখ্যা দাঁড়াল সম্ভবত ৮৫-১২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০০০ কলেজ এবং সে সংখ্যা আজ আরও অনেক বেড়ে গেছে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরীর বাজারও অনেক গুণ বেড়ে গেল। ফলে যে বিরাট জনসংখ্যার কোন অর্থনৈতিক সুযোগ ছিল না তাদের একাংশ নানাধরনের চাকরি পেল। আদর্শবাদী বহু মানুষ স্বাধীনতার পরে নিজেদের আদর্শকে প্রকাশ করেছেন গঠনমূলক কর্মের মধ্যে। গঠনমূলক কর্ম রাজনৈতিক অর্থে বলছি না। একটা উদাহরণ দেই— ১৯৫০-এর দশকে বহু অর্থনীতিবিদ সরকারের চারপাশে এসে দাঁড়ালো এবং তাদের পরামর্শ দিল কিভাবে পরিকল্পনা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে। প্রযুক্তি, শিক্ষা, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী মানুষ কতগুলি কাজ করার সুযোগ পায়। খানিকটা এই কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এই নতুন যুগে বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের দলে উপযুক্ত লোক টানবার কোন চেষ্টা করেন নি। পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক দেশে একটা প্রথা আছে যে জীবনের সবক্ষেত্র থেকে অল্প বয়েসে লোক রিক্রুট করা হয়। ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, কর্মীদের মধ্যে থেকে অল্পবয়সেই রিক্রুট সংগ্রহ করা হয়। এই রিক্রুটটাই ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে উপরে ওঠেন, মন্ত্রী হন বা পার্লামেন্টের সভ্য হন। ভারতবর্ষে রিক্রুটমেন্টের

পুরানো ভাষাটা বদলালো না। সেই যে আত্মত্যাগের আবেদন স্বাধীনতার আগে ছিল, তা এখনো চলতে লাগল। এই আবেদন একটি স্বাধীন দেশে খুব অর্থবহ নয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক কর্ম অন্য পাঁচটা কাজ বা পেশার জীবন যাত্রার মত সম্পূর্ণ নীতি সঙ্গত অন্যতর পথ। তাতে মানুষের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা খোঁজে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদের কাছ থেকে সমাজেরও একটা প্রত্যাশাও থাকে। একটি মানুষ রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তির খাতে যে সব পুরস্কার পায় তার প্রতিদানে তাকে সমাজকে কিছু দিতে হয়। তুমি যদি পার্লামেন্টের সভ্য হও তাহলে তোমার নিজের কনস্টিটুয়েন্সিতে যাঁরা রয়েছেন তাদের প্রয়োজন দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে, তাদের জন্যে কাজ করতে হবে। এই জিনিসটা ভারতবর্ষের জীবনে হল না। একেবারে হয়নি বলা না গেলেও খুব কমই হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে দুটো জিনিস ঘটল। এক, পুরোনো নেতারা শাসনের কাজে এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে তাদের আদর্শ প্রচার ও তার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের আদর্শ গড়ে তোলার কাজ অবহেলিত হল। দ্বিতীয় কথা, যে পার্টিগুলি বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টি যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তারা গণচেতনা প্রবুদ্ধ করার কাজ, mobilisation-এর চেষ্টা প্রায় ছেড়ে দিলেন। দলীয় সংগঠন নির্বাচন জেতার যন্ত্রমাত্র হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে নানা দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তখনও রিক্রুট সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু এঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান স্থানীয় হতে পারেন নি। তাছাড়া পরবর্তী যুগে যখন ভারতীয়রা ক্ষমতার স্বাদ পেল তখন রিক্রুট যারা এল তারা দেশের স্বার্থে তত নয় যতটা নিজেদের স্বার্থে রিক্রুট হয়ে এলেন। ফলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বহু জায়গায় একটা ফাঁক রয়ে গেল। বুদ্ধি, যোগ্যতা, আদর্শ সম্পন্ন মানুষ রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যায় এলেন। ফলে যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেল তা ভরল অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় লোক দিয়ে। ভারতবর্ষের একটি অঞ্চলে হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে বিধানসভায় এবং পার্লামেন্টে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের শতকরা ৩০ ভাগের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কাজের প্রমাণ আছে। স্বাধীনতার কিছু পরে যখন দিল্লীতে কাজ করতাম, তখন একটা কথা খুব শুনতাম, যে ভারতের রাজনীতিতে দুরকম লোক আছে। এক, যাঁরা জেলে গিয়েছেন, আর দুই, যাঁদের জেলে যাওয়া উচিত। এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই ক্রমে বাড়তে থাকে।

তবে শুধু এই কথা বললে ভারতীয় রাষ্ট্রের যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে তার পুরো ব্যাখ্যা হয় না। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারের ফলে ঘোলাজলের মত অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার আমাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যে সব মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারত না যে তারা সত্যিই ক্ষমতার অংশীদার হবে, তারা ভারতের নানা জায়গায়

আজ ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা, আদর্শ হয়ত অত স্পষ্ট নয় কিন্তু এই পরিবর্তন বর্তমানের পক্ষে যতই কষ্টকর, দুর্নীতির কারণ হোক ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনের একটা শুভ অবদান আমাদের জীবনে আছে বলে মনে হয়।

শেষ কথা এই বলতে চাই যে নানা কারণে জাতীয়তাবাদ আমাদের জীবনে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট। সেই জন্যই ১৯৪৭এর ১৫ই অগাস্টে অত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অত আনন্দ উল্লাস দেখেছিলাম। পঞ্চাশ বছর পরে তার সাথে তুলনীয় দুঃখ কষ্ট আমাদের জীবনে নেই। কিন্তু তবু কেন উৎসাহ নেই। আজকে বিদেশীরা হিসেব করে দেখাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং অর্থবান মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কুড়ি কোটি লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। তবে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের উৎসাহ নেই কেন? সবাই শুধু সমালোচনা করেন কেন? কারণ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ তা থেকে যে কারণগুলির কথা আগে বলছি তা চলে গেছে। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, চাকুরিজীবী যারা তাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চাকরির সম্ভবনা অনেক বেশি, কৃষক জানেন সর্বভারতীয় বাজার স্থানীয় বাজারের তুলনায় তার উৎপাদনের বিপণনের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু এই জাতীয় স্বার্থবোধের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র সংহত থাকে সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যত খুব ভাল নয়। মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে, ঠিকই। এ প্রসঙ্গে বলা হয়— man is a rational animal, মানুষ যুক্তিবাদী জীব। কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আমরা rational animal না, we are animals occasionally capable of rationality, বেশীর ভাগ সময়ই আমরা যুক্তিবাদের পথে চলি না। আমরা বড়ই বোকা। চাকরী বা মুনাফা বাড়াতে আমরা জান কবুল করি না, কিন্তু যদি বলা হয় দেশ বিপন্ন, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অস্ত্র তুলে নেয়। এই বোকামিটা আজ আমাদের জীবন থেকে প্রায় চলে গেছে। এই বোকামির যে প্রয়োজন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে হিন্দুত্বের আবির্ভাব। যেখানে দেশাত্মবোধ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল, তার জায়গায় অন্য একটা আদর্শের প্রয়োজন ছিল। সে আদর্শ না পেলে তার জায়গা নেয় বিকৃত আদর্শবাদ। এক ইংরাজ পণ্ডিত গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলছেন যে এই ভারত রাষ্ট্র টিকতে পারে না। হাজারটা জাতি, ভাষা ধর্মের এত পার্থক্য নিয়ে রাষ্ট্র স্থায়ী হয় না। অনুরূপ বৈচিত্র্য সামাল দিতে না পেরে যখন রুশ রাষ্ট্র ভেঙে গেল তখন তাঁরা বললেন এবার ভারতবর্ষেরও একই অবস্থা হবে। কিন্তু কথাটা এক নয়। ভারতবর্ষের সংবিধান যখন গড়ে তোলা হয় সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় তাতে যোগ দেন। পরে যখন প্রদেশগুলিকে রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অহমিয়া পণ্ডিত সঞ্জীব বড়ুয়া দেখিয়েছেন যে তখন একেক ধরনের উপজাতীয়তাবাদ, স্থানীয় জাতীয়তাবাদ, দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের অংশ হিসাবে স্থান নিল। তারফলে দেশে ভেঙে যায় নি। অনেক সময় খুব উৎসাহী ভারত সমালোচকরা শিখদের কথা বলেন। আমাদের অনেক পণ্ডিতরাও বললেন যে সত্যিই জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বড় ভাল ব্যাপার

নয়, কৌমই ভাল। তারা কি চান বুঝতে পারি না। কৌমদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হলে কোন কমিউনিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে? হিন্দু-মুসলমান, কায়স্থ-ব্রাহ্মণ না উপজাতিগুলির হাতে? আর তাদের যে empower করা হবে, তাতে আঞ্চলিক শাসনের কি গতি হবে? রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, শিয়া মুসলমান, সাঁওতাল-ওঁরাও যে একই ভূমিখন্ডে বাস করে? ক্ষমতাপ্রাপ্ত কৌমগুলি কোথায় রাজত্ব করবে? সৈন্য বাহিনী, রেলপথ, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা কৌমগোষ্ঠীরা কি ভাবে করবেন তা তারা ভাবেন নি। সেকথার মধ্যে না গিয়ে শুধু এটাই বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন প্রাদেশিকতার আবেদন রয়েছে অনেক সময় তা জাতীয় কেকের অংশ কে কতটা পাবে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে। দুটি প্রমাণ দিই— তামিলরা মাদ্রাজের রাস্তায় মহা উৎসাহে ভারতীয় সংবিধান পোড়াতেন— যতক্ষণ না তাঁরা নির্বাচনে জিতে রাজ্যে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। যেদিন দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাড়গম নির্বাচনে জয়ী হলেন সেই দিনই তাঁরা ঘোষণা করল যে, যে সংবিধান তাঁরা আগের দিন অবধি পুড়িয়েছেন তাঁর প্রতি তাঁদের আনুগত্য অনন্তকাল থেকেই আছে এবং থাকবে। এ নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই।

শেষ কথা ভারত রাষ্ট্র ভেঙে যাবে বলে আমি মনে করি না। ভেঙে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। কখনো সৎ পথে, কখনো অত্যন্ত অসৎ পথে ক্ষমতা ব্যবহার করে এই রাষ্ট্রকে একত্র রাখার চেষ্টায় অধিকাংশ জনগণের সমর্থন আছে বলে মনে হয়। এটা সব সময় খুব ভাল কথা বলে মনে করি না কিন্তু এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ভেঙে যাওয়াই কোন রাষ্ট্রের পক্ষে একমাত্র চরম বিপর্যয় নয়। রাষ্ট্র ভেঙে না গিয়ে যদি রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদ অধিষ্ঠিত হয়, কোন সাম্প্রদায়িক আদর্শের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতি গড়ে ওঠে সেটা আমাদের পক্ষে আরও বেশি অমঙ্গলজনক বলে মনে করি। ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ১০টা স্বাধীন রাষ্ট্র যদি নিজেদের কল্যাণের পথে চলে, সেটা এক অর্থে সর্বনাশের কথা কিন্তু ভারতবর্ষে যদি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায় তাহলে তা মহত্তর। আরও একটা দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল পৃথিবীব্যাপী নতুন জীবনাদর্শ। আজকে পৃথিবীতে ঘোষিত হয়েছে— নতুন দেবতা মুনাফা। মুনাফার পথে কেউ বাধা দেবে না। বাধাবন্ধহীন মুনাফার ভিত্তি অন্তহীন লোভ। সেই লোভকে প্রশ্রয় দিলে তবেই মুনাফা বাড়বে। এর একটা মুশকিল আছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে শুধু লোভ এবং মুনাফার পথে দেশের উন্নতি হয়, দেশের ৩০ শতাংশ লোকের কাছে দৈনন্দিন জীবনধারণের উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার উপায় নেই। তার ফলে, বৈষম্যভিত্তিক অন্যধরনের সংঘাত এখানে গড়ে উঠতে পারে। বঞ্চিত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবের পথে যায় না, যায় নানা ধরনের বিকৃত আদর্শের পিছনে। আমাদের জীবনে সেই আশঙ্কা আজকে প্রবল এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ও সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র

কুমকুম রায়

মাননীয় সভাপতি, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সদস্য, সদস্যা ও বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে আপনাদের বার্ষিক সভায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে সভানেত্রীর পদে সম্মানিত করেছেন, তারজন্য জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তবে একই সময়ে আপনাদের আমার দুশ্চিন্তার কথা জানানো প্রয়োজন। এই দুশ্চিন্তার দুটি কারণ— প্রথমতঃ বাংলায় ভাষণ দেওয়ায় আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। ব্যক্তিগত ইতিহাসের ঘটনাচক্রে কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী এবং হিন্দীই ব্যবহার করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও মৌলিক। আমি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রী এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগও হয়েছে। তবে বাংলার বা বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কোন মৌলিক গবেষণা অথবা গভীর অধ্যয়ন করার দাবী করতে পারি না। আমার গবেষণায় আমি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার বিকাশকে প্রাসঙ্গিক ভাবে বোঝার চেষ্টা করছি। আপনাদের মধ্যে কেউকেউ হয়ত জানেন যে, এই প্রচেষ্টায় আমি gender relations বা লিঙ্গ সম্বন্ধের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক আধার ও স্বরূপ নিয়ে খানিকটা চর্চা করেছি। তাই, আপনাদের নিমন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে আমার অনধিকার প্রবেশকে বৈধতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে এক সুপরিচিত রচনা, সন্ধ্যাকর নন্দীর *'রামচরিতের'* বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য আপনাদের যা পেশ করব, তাকে শুধু মাত্র প্রাথমিক চিন্তা বলা যেতে পারে।

রামচরিত, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। *রামায়ণের* কোন্ রূপটি মৌলিক, এসম্বন্ধে বিদ্বতমন্ডলে মতানৈক্যের অভাব নেই। তবে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর আদর্শ যে *রামায়ণ,* তা সাধারণতঃ মহাকবি বাল্মীকির রচনা রূপেই স্বীকৃত। সন্ধ্যাকর যে এই রচনাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন

অবকাশ নেই। *রামচরিতে* সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ এর ইঙ্গিত। ভাষার প্রসঙ্গ আবার উঠবে। তবে সংস্কৃত *রামায়ণের* অনুপ্রেরণার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই গ্রন্থের উপসংহারে, কবি প্রশস্তিতে, যেখানে কবির রচনাকে কলিযুগের *রামায়ণ* এবং তাঁকে কলিকালের বাল্মীকি বলা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মত, বাল্মীকি *রামায়ণের* রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। *রামায়ণের* মৌলিক কাহিনী সম্ভবতঃ প্রাচীন— এর মূল হয়ত উত্তর বৈদিক যুগে নিহিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীতেই উত্তর ভারতে মৌখিক মাধ্যম ও লোকসাহিত্যে এর প্রচলন ছিল। তবে এই জনপ্রিয় কাহিনী মহাকাব্যে পরিণত হয় গুপ্ত যুগে অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে।

এক্ষেত্রে বাল্মীকি কর্তৃক রচিত *রামায়ণের* রূপরেখা সুপরিচিত হলেও, পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে। বালকান্ডের তিথি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা এটি মূলগ্রন্থের সঙ্গে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই কান্ডে উল্লিখিত স্বয়ম্বর সভা ও মৌর্য বংশীয় ইক্ষ্বাকুদের বংশাবলী সম্ভবত প্রাচীন। কারণ মূল কাহিনীর সঙ্গে এর সম্বন্ধ নিকট। তারপর অযোধ্যাকান্ডে পাই দশরথের রামকে নিজ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস, এবং রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনাভিমুখে যাত্রার বর্ণনা। এই বন সাধারণ বন নয়— এখানে রাক্ষসদের অনবরত উপদ্রব— বনের শান্ত পরিবেশে উপস্থিত হন রূপসী রাক্ষসী শূর্পনখা-আত্মনিবেদন করেন রাম এবং পরে লক্ষ্মণের কাছে, ফিরে যান অপমানিত হয়ে ভাই রাবণের কাছে। তারপর সীতাহরণের বর্ণন, রামের লঙ্কা যাত্রা, এবং বানরদের সাহায্যে রামের লঙ্কাজয় ও সীতাকে উদ্ধার করার বিবরণ। অবশেষে অযোধ্যায় পুনঃপ্রবেশ, রাজা রূপে রামের স্বীকৃতি এবং সীতার বনবাস ও পাতাল প্রবেশ।

রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আছে বিস্তার ও প্রসারের এক আদর্শ। এই আদর্শকে নানাস্তরে দেখা সম্ভব। প্রথমতঃ আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাই — হল নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার প্রসার— দেবরাজ চানানা মনে করেন সীতা নামটিই এর দ্যোতক। অর্থাৎ সীতার অপহরণ এবং পুনরুদ্ধারের কাহিনী উত্তর ও মধ্য ভারতে নতুন কৃষিব্যবস্থার প্রসারের রূপক। মনে রাখা প্রয়োজন যে হলের প্রয়োগ শুধুমাত্র নতুন উপকরণের প্রয়োগ নয় — এটা কৃষিব্যবস্থার বৃদ্ধি ও প্রসারতার এক প্রতীক। সঙ্গে জড়িত আছে কৃষিযোগ্য ভূমি সম্বন্ধে এক নতুন মূল্যবোধ, কৃষকদের শ্রমের উপর এক নতুন দাবি, সংক্ষেপে উৎপাদন ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন।

এক্ষেত্রে বানর রাজ্যে ও লঙ্কায় কৃষি ব্যবস্থার অপ্রচলন লক্ষণীয়। *রামায়ণের* আদর্শ আর্থিক ব্যবস্থা যেমন কৃষি নির্ভর, তেমনি সামাজিক স্তরে পাই বর্ণপ্রথার এবং পিতৃপ্রধান পারিবারিক ব্যবস্থার আদর্শ। এই পরিকল্পনায় রাজারা আদর্শতঃ ক্ষত্রিয় বংশীয়, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের নিকট সম্পর্ক। তারা ব্রাহ্মণদের রক্ষা ও পালন করেন, বিনিময়ে

ব্রাহ্মণরা তাঁদের দেন আশীর্বাদ ও উপদেশ। সামাজিক স্তরীকরণের এই আদর্শ পিতৃপ্রধান পারিবারিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত — এই আদর্শে পুত্র পিতার, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং পত্নী পতির অনুসরণ করে। এই দুই সামাজিক আদর্শ স্পষ্টতঃ পরস্পর সমার্থক।

আর্থিক ও সামাজিক আদর্শের পূরক হিসেবে আমরা *রামায়ণে* পাই এক রাজনৈতিক আদর্শ — এ আদর্শ রাজতন্ত্রের। রাজতন্ত্রের সমস্যা, উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, রাজ্যের বিস্তার মূল রচনার এক কেন্দ্রীয় ধারা। তৎসঙ্গে পাই *রামায়ণের* মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে যৌক্তিকতা ও বৈধতা প্রদান করার প্রচেষ্টা। এর একটি ধারা স্পষ্টত রামকে এক আদর্শ রাজারূপে প্রদর্শিত করা। তার সঙ্গেই দেখি রামের এবং যৌক্তিকতা অনুযায়ী অন্যান্য রাজার দৈবীকরণ। রামকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা বালকান্ডে ও উত্তরকান্ডে স্পষ্ট এবং অনেকেই মনে করেন যে, এই অবতারবাদ সম্ভবত পরবর্তীকালে সংযোজক/সংকলকদের অবদান। এই সম্ভাবনা স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি যে, এই দৈবীকরণ মূল কাহিনীর সমকালীন না হলেও প্রাচীন। অতএব প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত ও প্রচলিত *রামায়ণ,* রামকথা *রামচরিত* ইত্যাদিতে এই ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য। রাম, রাজা ও দেবতা যে সমতুল্য ও একই শক্তির প্রতীক এ ধারণা ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে নিকট সম্পর্কের নিদর্শন। *রামায়ণ* অবলম্বনে রচনার সংখ্যা অগণিত, অসংখ্য রচনা দেশে, বিদেশে, বিভিন্ন প্রদেশে, স্থানীয় ভাষায়, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটকে প্রচলিত। রামানুজন ও রিচম্যান এ ধরনের রচনার সংজ্ঞা দিয়েছেন "telling", যার আক্ষরিব অর্থ হল বলা বা আবৃত্তি করা। ওঁরা মনে করেন যে, প্রত্যেক "বলা"র-ই নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে । এই "বলা" স্বভাবতই সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত — এই পরিস্থিতি সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়। তাই প্রত্যেকটি আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে যে, এই আবৃত্তির মাধ্যমেই বক্তা অথবা রচয়িতা তাঁর সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজের ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেছেন।

রামচরিতের রচনাতিথি দ্বাদশ শতাব্দী, নায়ক রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদনপালের শাসন কালে। আমরা জানি যে, মদনপাল এই বংশের শেষ খ্যাতনামা শাসক। তাঁর শাসন অবসানের কিছু সময় পরেই পাই সেন বংশের স্থাপনের প্রমাণ। এবং সেই সঙ্গেই পাই সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিশেষতঃ বর্ণ/জাতি ব্যবস্থার স্থাপনা অথবা পুনরুত্থাপনের উল্লেখ। যদি স্বীকার করি যে, সামাজিক পরিবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং একটি ক্রমিক বিকাশ বা process, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, তার উৎস অন্তত কিছুটা অংশে পাল শাসনকালের অন্তিম কালে নিহিত। এই পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমি হয়ত *রামচরিতের* কবিকে প্রভাবিত করেছিল। তৎসঙ্গে কবি হয়ত এ রচনার সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের এক বিশেষ স্থান সৃষ্টি

করার চেষ্টা করেন। এই সম্ভাবনায় ফিরে আসব বক্তব্যের শেষে।

এই প্রসঙ্গে *রামচরিতের* ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার করা হয়ত প্রয়োজন। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই পালরাজ্যে (ও অন্যত্র) বাংলায় রচিত সাহিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে কবির সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। স্পষ্টতঃ সংস্কৃত রচনার শ্রোতা অথবা পাঠকের সংখ্যা তুলনায় সীমিত ছিল। তাছাড়া এঁরা এক বিশেষ বর্ণ অথবা বর্গ বা শ্রেণীর সদস্য। *রামচরিতের* রচনা কি তবে ব্রাহ্মণীকরণ ও সংস্কৃতকরণের নিদর্শন?

সংস্কৃতে রচিত হওয়া ছাড়াও *রামচরিতের* রচনাশৈলীর অন্য একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আমরা জানি যে, কাব্যটি দ্ব্যর্থক — অর্থাৎ একাধারে বর্ণিত হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ও রামপালের ইতিহাস। কবির রচনা সহজগম্য নয় — অলঙ্কার উপমা শ্লেষের ভারাক্রান্ত কাব্যটির মর্মোদ্ধার করা অনেক সময় দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রে বাল্মীকির *রামায়ণ* বা মধ্যযুগীয় তুলসীদাসী *রামচরিতমানস*, অথবা কৃত্তিবাসী *রামায়ণের* সঙ্গে *রামচরিতের* এক মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেখানে অন্য রচনাগুলির মাধ্যমে আমরা পাই *রামায়ণের* মূল কাহিনীর প্রচার ও প্রসার। সেখানে রামচরিতের কবি মূল কাহিনীটিকে সীমাবদ্ধ ও কিছুটা পরিবর্তিত করে এক বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।

রামচরিত থেকে নানা প্রকারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করার প্রচেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ঐতিহাসিক স্রোত থেকে সংগ্রহিত তত্ত্বের সমর্থন বা মূল্যায়ণ করতেও *রামচরিতের* প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সফলও হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, *রামচরিত* একটি স্বচ্ছ ঐতিহাসিক রচনা নয়। রচনাটির স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে মানতে হবে এটি কাব্য যার রচনা শৈলী এবং বিষয়বস্তু এটিকে এক বিশেষ মহত্ব প্রদান করেছে।

প্রত্যক্ষ আদর্শ গ্রন্থ, বাল্মীকির *রামায়ণের* তুলনায় *রামচরিতের* আকার অতি লঘু। *রামচরিতের* মূল পদসংখ্যা ২২০। এর মধ্যে শেষ চতুর্থাংশে পাই মদনপাল ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পরিচয়। অতএব প্রত্যক্ষভাবে ঘোষিত গ্রন্থের মূল বক্তব্য মাত্র ১৬৫ পদে সীমাবদ্ধ। গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবার চর্চা করার সুযোগ হবে।

রামচরিত ও *রামায়ণের* পার্থক্য শুধু আয়তনে নয় বিষয়বস্তুর প্রস্তাবনায়ও পার্থক্য লক্ষণীয়। স্পষ্টতঃ *রামায়ণের* সুপরিচিত রেখা অবলম্বন করে দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি প্রস্তুত করেছেন এক নতুন রামকথা, নিঃসন্দেহে এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত। *রামায়ণ* ও *রামচরিতের* সমানতা ও বৈষম্য হয়ত এই পরিস্থিতির অধ্যয়নে সহায়ক হতে পারে। *রামায়ণের* ভৌগোলিক আধার স্বভাবতই *রামচরিতের* ভূগোল থেকে পৃথক। উদাহরণতঃ কবি বর্ণনায় রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষ্বাকু ও কবি স্বীকৃত পালবংশের সংস্থাপক উভয়ই সমুদ্রব্যাপী খ্যাতির অধিকারী।

উভয় ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি হলেও সমুদ্রতীরবর্তী পালরাজ্যের শাসকের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপাধি হয়ত প্রযোজ্য। কিন্তু সরযূ নদীকেন্দ্রিক কোশল রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা অনুপযুক্ত বলেই মনে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কবি *রামায়ণের* ভৌগোলিক তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তবে এই তত্ত্ব রামপালের সম্বন্ধে প্রয়োগ করার কোন চেষ্টা করেন নি। যথা— রামের বিদেশ যাত্রার উল্লেখ আছে, তবে রামপালের ক্ষেত্রে এই উল্লেখ কবির মতে অনাবশ্যক। *রামায়ণের* দন্ডকারণ্যের পরিণতিও প্রায় একই রকম। *রামচরিতে* এর উল্লেখ পাই। তবে রামপালের ক্ষেত্রে এ মাহাত্ম্যের কোনও প্রমাণ নেই। পঞ্চবটী সম্বন্ধে কবি কল্পনা আরও বিচিত্র— রামপালের ক্ষেত্রে পঞ্চবটীর প্রস্তাবিত অর্থ হল পাঁচ কড়ি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালের শাসন কালে রামপালের দারিদ্রের নিদর্শন। সীতার সন্ধানে রামের বন ও পর্বতে ইতস্তত ভ্রমণ রামপালের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে সামন্তচক্রের সমর্থন প্রাপ্তির প্রয়াসে। এই সামন্তচক্রের সাহায্যেই রামপাল বিদ্রোহী ভীমের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজ পিতৃভূমির পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন।

রামায়ণের ভূগোলের আমূল পরিবর্তন পাই অযোধ্যার ক্ষেত্রে। অযোধ্যার উল্লেখ *রামচরিতে* বিরল। এর পরিবর্তে পাই রামপালের রাজধানী রামাবতীর উল্লেখ, যার তুলনা করা হয়েছে মুখ্যতঃ অযোধ্যার সঙ্গে নয়, লঙ্কার সঙ্গে। আরও লক্ষণীয় যে রাজ্যের আধার ভূমিকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় অবশ্য কবি মৌলিকতা বা নতুনত্বের পরিচয় দেন নি। অতি প্রাচীন সংস্কৃত রচনায় এই ধরনের রূপকের প্রয়োগ প্রচলিত। সম্ভবতঃ সংস্কৃতে পৃথিবী বা ভূমির এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচী অন্যান্য প্রতিশব্দ এই ধরনের কল্পনায় সহায়ক ছিল। এই পরম্পরা অনুসরণ করে সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনায় পাই রাজপত্নী ও রাজভূমির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ যাতে একে অপরের প্রতীকরূপে অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই রূপকের সর্বপ্রথম প্রয়োগ পাই সীতার স্বয়ম্বরের বর্ণনায়। রামপালের ক্ষেত্রে সীতা রূপান্তরিত হয়েছেন রাজলক্ষ্মীতে এবং জনক রামপালের পিতারূপে। একই সূত্র অবলম্বন করে রাবণদ্বারা সীতা অপহরণ পরিবর্তিত হয়েছে দিব্যদ্বারা জনকভূমি বা পিতৃভূমি হরণে। অতএব কবি কল্পনায় সীতা ও বরেন্দ্রী সমতুল্য।

এই তুলনার ব্যাপক রূপ পাই তৃতীয় পরিচ্ছদে যেখানে সীতার উদ্ধার রামপালের বরেন্দ্রী জয়েরই প্রতীক। উভয়ই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। আগেই দেখেছি *রামচরিতের* প্রথমার্ধে রামের বিভিন্ন যাত্রা সংক্রান্ত ভৌগোলিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, যা রামপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রচনার দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এক বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। এখানে পাই বরেন্দ্রীর বর্ণনা, তবে এ বর্ণনা সীতার বর্ণনায় নিহিত। তাই সীতার বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ পাই বরেন্দ্রীর জগদ্দল মহাবিহারের, স্কন্দনগর ও শোনিতপুরের, গঙ্গা, করতোয়া, বলভী ও কালী নদীর এবং বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির— বিভিন্ন প্রকারের ফল, ফুল, ধান, শস্য, বৃক্ষ ইত্যাদির। সীতার শারীরিক বর্ণনার মাধ্যমে

কবি পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির উপর বরেন্দ্রীর নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাই কুন্তল, অঙ্গ ও মধ্যদেশের উল্লেখ উভয়ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। অবশেষে নির্বাসিত সীতার ক্রন্দনের তুলনা করা হয়েছে বরেন্দ্রীর বর্ষার সঙ্গে।

বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সীতা ও বরেন্দ্রীর রূপকটি সর্বাধিক বিকশিত। তবে এটি স্ত্রী ও ভূমি পৃথিবীর একত্বের একমাত্র উদাহরণ নয়। *রামায়ণের* ইন্দ্র-দূষিতা ঋষিপত্নী অহল্যার উল্লেখ পাই পতিতা গোতমী হিসেবে। তবে রামপালের ক্ষেত্রে এই নামটির ব্যাখ্যা হয়েছে গো বা পৃথিবী অর্থে, যার উদ্ধারকর্তা রূপে শাসক কীর্তিত।

তবে সব স্ত্রীচরিত্রই ধরিত্রীর রূপকে পরিবর্তিত হন নি। আমরা উল্লেখ পাই বিগ্রহপালের কলচুরি বংশীয় পত্নী যৌবনশ্রীর। মনে হয় তাঁর নাম কবির দ্ব্যর্থক কাব্য রচনায় সহায়ক হয়েছিল বলেই উল্লিখিত।

রামায়ণে উল্লিখিত অন্যান্য স্ত্রীচরিত্রের *রামচরিতে* পরিণতি ও পরিবর্তন খানিকটা আশ্চর্যজনক। আমরা রামদ্বারা অটকা রাক্ষসী বধের উল্লেখ পাই। তবে রামপালের ক্ষেত্রে এই উল্লেখ রূপান্তরিত হয়েছে শরবিদ্ধ করে তালগাছ ছিন্ন করার এক অদ্ভুত ক্ষমতায়।

স্বয়ং সীতারও অন্য ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি বনবাসে সীতার শারীরিক ক্লেশের বর্ণনা করেছেন। এবং তার তুলনা করেছেন মহীপাল কর্তৃক কারারুদ্ধ রামপালের সঙ্গে। আরও পাই বন্দী রামপালের সঙ্গে বিধ্বস্ত শূর্পনখার তুলনা। এক্ষেত্রে কবির রচনায় সীতা ও শূর্পনখার উল্লেখ প্রায় সমতুল্য।

আমরা জানি যে, *রামায়ণে* সীতা সতীসাধ্বী, পতিব্রতা ধর্মানুসারিণী রূপে পরিকল্পিত ও প্রদর্শিত। তার বিপরীতে রাক্ষসীরা যৌনসম্বন্ধ এবং অন্যান্য বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিণী, অতএব নিন্দিত। জানকী সীতা এবং রাক্ষসী শূর্পনখার মধ্যে *রামায়ণে* ব্যবধান লুপ্ত না হলেও তুলনায় অস্পষ্ট, কারণ রাক্ষসীদের উল্লেখ মাত্র পাই। তাদের বিস্তৃত বর্ণনার অভাব লক্ষণীয়। অনুমান করা যেতে পারে যে, কবি এইধরনের বর্ণনাকে নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন।

এই নিষ্প্রয়োজনীয়তার কারণ সঠিক অনুসন্ধান করা মুশকিল। তবে দুই-একটি সম্ভাবনার চেষ্টা করা যেতে পারে। হয়ত *রামায়ণের* স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ ও কবির সমকালীন (অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার) আদর্শ ভিন্ন ছিল। তাই কবি *রামায়ণের* আদর্শ অনুকরণ বা অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। এই ভিন্ন আদর্শ কোনও বিশেষ বর্ণ বা জাতির বৈশিষ্ট্য না প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বলা সম্ভব নয়। তবে এর অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা পিতৃপ্রধান হলেও, হয়ত গুপ্তযুগীয় মধ্যদেশের আদর্শের তুলনায় শিথিল ছিল।

রাজ্য বা ভূমির পরিকল্পনা কবির রাজচরিত্র নিরূপণের এক মৌলিক অঙ্গ।

তবে স্পষ্টতঃ রাম এবং রামপালের চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে তফাৎ আছে। রাম নিজপত্নী উদ্ধারের প্রচেষ্টায় রত, রামপালের উদ্দেশ্য তুলনায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত। তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে পিতৃভূমির উদ্ধারের মহান ব্রতে নিযুক্ত।

তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই নায়কের চরিত্রে ও কার্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই উভয় আদর্শ রাজাই একই সঙ্গে সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির দ্বারা বিভূষিত — সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়ই তাদের প্রতি সদয়। তাছাড়া দুই রাজাই সৈনিক নেতা রূপে বর্ণিত হয়েছেন। আরও পাই উভয় রাজবংশের শাসকের ক্ষেত্রে বদান্যতার বর্ণনা।

রাজার অন্যান্য কর্তব্য ও কার্যের মধ্যে ধর্ম, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ধর্মেরও কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে রাম ও রামপালের বর্ণনার সামান্য পার্থক্যও লক্ষণীয়। রামের সম্বন্ধে বলা হয়েছে রাক্ষস বধ করে উনি বিপ্রদের সন্তুষ্ট ও সুরক্ষিত রেখেছিলেন। রামপালের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বর্ণনা রূপান্তরিত হয়েছে এক সাধারণ মন্তব্যে — উনি দন্ড প্রয়োগ করে পৃথিবীকে ধর্ম বিপ্লব থেকে রক্ষা করেন। এই পরিবর্তনটি কি তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত? বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পাল শাসকদের নীতি সুবিদিত। এক্ষেত্রে ধর্মের অর্থ বিচার্য। অনুমান করা যেতেপারে যে, পাল শাসকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা না করলেও, এর একাধিপত্যও স্বীকার করতেন না। এই বাস্তব পরিস্থিতির এক অস্পষ্ট ঝলক হয়ত ধরা পড়েছে কবির রচনায়। রাম ও রামপালের চরিত্রাঙ্কনে যে সাম্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শাসকদের বংশাবলীতে। দ্বাদশ শতাব্দীর বহুপূর্বেই রঘুবংশের বংশাবলীর রচনা এবং বিভিন্ন গ্রন্থে এর সঙ্কলনও সম্পন্ন হয়েছিল। অতএব কবির রচনায় এ সম্বন্ধে কোনও নতুন তত্ত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে নজর দিতে হয় কবি-সৃষ্ট পাল বংশাবলীর প্রতি।

গ্রন্থের আরম্ভেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এঁরা সমুদ্রবংশীয়। প্রথম উল্লিখিত শাসক ধর্মপালকে বলা হয়েছে সমুদ্রকুলদীপ। আদিমধ্যযুগীয় অভিলেখ এবং সাহিত্যিক সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বহু ছোট ও বড়ো রাজা নিজেদের সূর্যবংশীয় অথবা চন্দ্রবংশীয় (রাজপুতদের ক্ষেত্রে অগ্নিকুলোদ্ভব) বলে ঘোষণা করেন। এধরনের উল্লেখ বৈধতা প্রাপ্তির একটি সুপরীক্ষিত রণনীতি রূপে স্বীকৃত।

তবে পাল শাসকদের ক্ষেত্রে এধরনের প্রয়াসের প্রমাণ বিরল। প্রারম্ভিক চরণের পাল শাসকদের অভিলেখে প্রথম শাসক গোপাল এবং তাঁর পূর্বজন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তাঁদের মানব রূপেই প্রদর্শিত করা হয়েছে — কোন মহৎ প্রাকৃতিক ও দৈবী শক্তির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস হয়নি। মনে হয় এধরনের দৈবীকরণের প্রচেষ্টা পালশাসনের শেষ চরণেই সীমাবদ্ধ ছিল। *রামচরিত* এবং অন্যান্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, এটি ছিল সংকটের সময়। সমকালীন অভিলেখ থেকে জানা যায় পশ্চিমে চেদী বংশ এবং দক্ষিণে চোল বংশের প্রসারের কথা। তার ফলে পাল রাজ্যের সীমা সুরক্ষার সমস্যা সৃষ্টি হলো। তাছাড়া পাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে *রামচরিতে* উল্লিখিত পাল পিতৃভূমি

বরেন্দ্রীতে পাই দিব্য ও ভীমের নেতৃত্বে কবর্ত্ত বিক্ষোভের প্রমাণ।

তাহলে কি আমরা অনুমান করতে পারি যে, শাসকেরা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দৈবী বংশাবলীর প্রয়োজন ছিল না — যখন তারা নানারকম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যসমস্যার সম্মুখীন হলেন, তখনই প্রয়োজন হল দৈবীকরণের, দ্বাদশ শতাব্দীর কমৌলি অভিলেখে পাল শাসকদের মিহির অর্থাৎ সূর্যবংশীয় বলা হয়েছে। স্পষ্টতঃ পাল বংশের অতিমানবীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন একমত সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত ছিল না। বোধ হয়, এই পরিস্থিতিতেই খানিকটা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী অভিমত প্রকাশ সম্ভব হল।

রামচরিতের পাল বংশাবলীর কিছু অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। এই কাব্যে প্রথম পালশাসক গোপালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে বংশাবলী শুরু হয় তাঁর পুত্র ধর্মপালের নাম দিয়ে। গোপালের অনুল্লেখের কি কোন কারণ ছিল? অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, গোপাল শাসক রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ রাজ্যলাভে তাঁর কোনও বংশানুগত অধিকার ছিল না। তাছাড়া অষ্টম শতাব্দীর পাল শাসকদের বর্ণ বা জাতের কোন উল্লেখ নেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে হয়ত পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে শাসকদের এক নতুন ধরনের বংশাবলীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রত্যক্ষ দৈবীকরণ ও পরোক্ষ ক্ষত্রিয়করণ হয়ত এই পরিস্থিতিতেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্পষ্টতঃ *রামচরিতে* পাল বংশের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পূর্ণ বংশাবলী প্রস্তুত করা হয় নি। উল্লেখ পাই শুধু কয়েকজন শাসকের — ধর্মপাল, গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র রামপালের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক দ্বিতীয় মহীপাল। তাছাড়া গ্রন্থের চতুর্থ ও অন্তিম পরিচ্ছেদে পাই রামপালের উত্তরাধিকারীদের এক তালিকা যাতে কবির পৃষ্ঠপোষক মদনপালের প্রশস্তি মহত্ত্বপূর্ণ।

রামচরিতের বংশাবলীতে জনপ্রিয় প্রথম মহীপাল অনুল্লেখও লক্ষণীয়। বোধহয় কবির ধারণায় শাসকের বৈধতা ও মহত্ত্ব জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর না করে শক্তিশালী সামন্তবর্গের সমর্থন ও দৈবীকরণের উপর নির্ভরশীল ছিল।

রামচরিতের বংশাবলীর অন্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যে উত্তরাধিকার স্বীকৃতি পায়নি। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি বাল্মীকি *রামায়ণের* সঙ্গে এক মৌলিক পার্থক্য। বাল্মীকির রচনায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজনৈতিক অধিকারকে বৈধতা প্রদান করার প্রয়াস স্পষ্ট। *রামচরিতে* আমরা পাই সম্পূর্ণ বিপরীত এক পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে রামপাল পিতা বিগ্রহপালের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। *রামচরিতের* প্রমাণ অনুযায়ী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সম্ভবত সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী দ্বিতীয় মহীপাল সঙ্গে উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, রামপালের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হলেও হয়ত স্বীকৃত হয়নি। কবি এই ভ্রাতৃবিরোধকে ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘর্ষে রূপান্তরিত করে সম্ভবত সকল শাসক এবং তাদের বংশধরদের শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা

প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

একটি অন্য সামাজিক তত্ত্বের প্রতিও হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। *রামায়ণে এবং রামচরিতে* বর্ণিত বা উল্লিখিত ঘটনাবলীতে রামের সহায়করূপে আমরা পাই ভ্রাতা লক্ষ্মণকে। কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধী রামপালের ক্ষেত্রে এই ধরনের উল্লেখ স্পষ্টতই অনুপযোগী। তাই কবি ভ্রাতার পরিবর্তে রামপালের পুত্রেরই উল্লেখ করেছেন।

এই রূপান্তরের অন্য উদাহরণ পাই বানর সেনার ক্ষেত্রে। রামপালের সহায়ক তার সামন্ত বৃন্দ। তবে যেখানে রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রীবন্ধন বালীর অনৈতিক হত্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রামপাল ও তাঁর সামন্তদের সম্বন্ধ ভূমি ও বহুমূল্য দ্রব্যমানের দ্বারা সৃষ্ট। বাস্তব স্থিতির বর্ণনার সঙ্গে এক্ষেত্রে কি এক ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কবিকল্পনার নৈতিকতার আদর্শরূপে রামপাল রামচন্দ্রের তুলনায় অধিক মহান?

এই সামন্তবৃন্দ ও সমর্থকদের মধ্যে রামপালের মাতৃকুলের সাহায্য বিশেষভাবে বর্ণিত ও স্বীকৃত হয়েছে। মূল *রামায়ণের* পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় *রামচরিতে* এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সামান্য পরিবর্তন। *রামচরিতে* কৈবর্ত্ত নেতা ভীমের সঙ্গে পাল শাসকদের সংঘর্ষ এবং রামপালের বিজয়ের বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ। কবির বৃত্তান্ত অনুযায়ী এই সংঘর্ষ আরম্ভ হয় রামপালের পূর্বজ মহীপালের সময় থেকে। কবির ইঙ্গিত থেকে মনে হয় যে, মহীপাল এই সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম প্রমানিত হয়েছিলেন এবং সেই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই রামপাল প্রথমতঃ নিজেকে পাল শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর আত্মীয়স্বজন এবং সামন্তদের সাহায্য গ্রহণ করে ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন।

এই সংঘর্ষের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভীমের তুলনা করা হয়েছে অতুল সীমাহীন সমুদ্রের সঙ্গে। অতএব কবিকল্পনায় রামের সমুদ্র লঙ্ঘন ও ভীমের পরাজয় সমতুল্য। আরও লক্ষণীয় যে, কবি ভীমের গুণ কীর্তন করেছেন সবিস্তারে। তিনি শরণাগতদের রক্ষা করেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী উভয়ই তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তিনি বহুসৈন্য ও ধনরত্নের অধিকারী, বদান্যতায় তিনি কল্পতরুতুল্য এবং স্বয়ং নির্লোভি। অনেকে মনে করেন যে, এই বর্ণনায় আমরা কবির ঔদার্যের পরিচয় পাই। আমার নিজের ধারণা খানিকটা অন্য প্রকারের, তবে এপ্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

তার আগে সন্ধ্যাকর নন্দীর সমকালীন শাসক মদনপালের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রায়োজন। তাঁর ক্ষেত্রে আমরা পাই অভিষেকের উল্লেখ— অর্থাৎ তিনি রাজ্যের শাস্ত্রসম্মত উত্তরাধিকারীরূপে প্রদর্শিত। একই সঙ্গে উল্লেখ পাই তাঁর সমর্থক চন্দ্রের। *রামচরিতের* সম্পাদক ও অনুবাদক রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে ইনি ছিলেন পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যের শাসক। মদনপালের বর্ণনার এক অন্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। *রামচরিতে* পাল রাজাদের দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা এবং তাঁর মাধ্যমে তাদের দৈবীকরণের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণত রাম (এবং রামের) তুলনা করা

হয়েছে ইন্দ্র এবং অন্যান্য। লোকপাল দেবতাদের সঙ্গে তাছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা এবং অবতারদের স্পষ্ট উল্লেখের প্রমান পাওয়া যায়।

মদনপালের ক্ষেত্রেই এই ধরনের দৈবীকরণের প্রয়াস সর্বাধিক বিস্তৃত। যেখানে রামপাল ও লোকপালদের তুলনা একটি পদে সীমাবদ্ধ, সেখানে মদনপাল ও লোকপালদের তুলনা সাতপদব্যপী প্রশস্তি লাভ করেছে। স্বভাবতই উনি পুরুষোত্তম রূপে কল্পিত।

সমগ্র রচনার উপসংহার, অর্থাৎ কবি প্রশস্তির এক বিশেষ স্থান আছে। প্রশস্তি থেকে সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতৃ পরিচয় এবং জন্ম স্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পালবংশের অবস্থা, অস্পষ্ট বংশাবলীর তুলনায় এ তত্ত্ব স্বচ্ছ এবং বাস্তবিক।

এই বাস্তবিকতার কারণ বোধ হয় অনুসন্ধান যোগ্য। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন কবির পিতার সান্ধী (অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহিক) উপাধি, যা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর নিকট সম্পর্কের নিদর্শন। তাছাড়া পেশাগত বা জাতিগত ভাবে তাঁর করণ উপাধিও লক্ষণীয়। কবি স্বয়ং বর্ণিত হয়েছেন নন্দীকুলকুমুদ করণ পূর্ণেন্দু, কাব্য কলাকুল নিলয়, গুণমণিমেরু ও অশেষশ্লেষবিশারদরূপে।

বাল্মীকি *রামায়ণে* ও অন্যান্য প্রাচীন বা আদি মধ্যযুগীয় সংস্কৃত রচনায় এধরনের প্রশস্তি তুলনায় বিরল। এক্ষেত্রে প্রশস্তির কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চায় ব্রাহ্মণদের একমাত্র অধিকার ছিল। তবে কি সন্ধ্যাকরের প্রশস্তি (এবং রচনার) একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণিত করা যে, করণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সমতুল্য ছিলেন? এবং এই কারণেই হয়তস্পষ্ট বংশাবলীর প্রয়োজন ছিল। একটি অন্য সম্ভাবনাও আছে। করণেরা হয়ত স্বয়ং শাসকপদ অধিকার করতে পারতেন না, কিন্তু কোনরকম শাসকীয় পরিবর্তনকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং নতুন শাসকীয় ব্যবস্থার সঞ্চালনে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, সন্ধ্যাকর নিজের দক্ষতার পরিচায়ক রূপে এক প্রকার বিজ্ঞাপন রূপে এই কাব্যের রচনা করেন। আগেই দেখেছি যে, এই গ্রন্থে আমরা রামপাল এবং তার শত্রু ভীম, উভয়েরই প্রশংসা পাই, মদনপাল ও তাঁর সহায়ক রাজা চন্দ্রের সমতুল্য প্রশংসাও লক্ষণীয়। কবির এই নীতি, যাতে পাই প্রায় সব শাসকের সমান প্রশংসা, সম্ভবতঃ তৎকালীন দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। রাজবংশ, রাজা বা সামন্তবর্গের সদস্যদের উত্থান ও পতনের সঙ্গে করণ কবি তাঁর দক্ষতার মাধ্যমে সকল ব্যক্তির স্বীকৃতি দিতে পারতেন। স্বীকৃতি হয়ত ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি নাও হতে পারত, তবে সমাজের অল্প সংখ্যক সংস্কৃতভাষী প্রভাবশালী শাসকবর্গের জন্য এর মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। তাই *রামচরিত* থেকে হয়ত বিশেষ ঘটনার ইতিহাস উদ্ধার করার কিছু সমস্যা আছে। তবে এ গ্রন্থ থেকে তৎকালীন শাসকশ্রেণীর স্বরূপ, শাসকশ্রেণীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ প্রস্তুত করা হয়ত সম্ভব হতে পারে।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা : মুঘল যুগের একটি অধ্যয়ন

শিরীন মুসভি

মাননীয় সভাপতি, বন্ধুগণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে সে সম্পর্কে এবং বর্তমান শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে একটি বিশাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি মনে করছি যে বাংলার ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিকা পর্যালোচনার প্রয়াস আজকে হয়ত বিশেষভাবে উপযুক্ত হবে। এটি প্রথমত এই জন্য যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাসের উপর রচিত সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলি এধরণের একটি পুনর্বিচারের প্রয়াসকে সমর্থন করে। কিন্তু দ্বিতীয় একটি কারণও আছে; এবং সেটি হল মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা, যার সম্পর্কে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি দেখাতে পারব যে, বাংলায় যা ঘটেছিল তা মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিকার প্রকৃতি সম্বন্ধে মতামত তৈরীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

মুঘল রাষ্ট্রের প্রকৃতি উন্মোচন

ডব্লু.এইচ. মোরল্যান্ড থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনাগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। মুখ্যত ফারসি উপাদানের উপর নির্ভর করে, যার আয়তন সুবিশাল, যা জানা গেছে তা অন্যান্য সমসাময়িক সূত্র, বিশেষত ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসি, দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে সাক্ষ্য মিলেছে যে, বিশেষরূপে *মনসব* ও *জাগীর*

ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনেকাংশে কেন্দ্রীকরণ ও ব্যবস্থায়ন ঘটে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো তৈরী হয়ে ছিল। যদুনাথ সরকার, ইবন হাসান, প. সরন, ইরফান হাবিব ও এম. আথার আলীর রচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রধান দিকগুলি দেখানো হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল— ভাল বা মন্দ যাই হোক— যেমনটি বলেছেন জে.এফ. রিচার্ডস মুঘল সাম্রাজ্যের উপর তাঁর নিউ কেমব্রিজ হিস্ট্রি গ্রন্থে— সেটি একটি অন্য প্রশ্ন। বাণিজ্যের উপর সাম্রাজ্যের প্রভাব মোরল্যান্ডের মতে নেতিবাচক ছিল, অন্যদিকে অশীন দাশগুপ্তর ধ্রুপদী রচনায়— *ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ সুরাট*, ভাইজবাডেন, ১৯৭৯— দেখা যাবে তা যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল।

বিগত দুই দশকে একটি বিপরীত মত উঠে এসেছে। সাম্রাজ্যগুলিকে এখন কেবল নামমাত্র বা ক্ষণস্থায়ী কাঠামো হিসাবে দেখা শুরু হয়েছে, যার ভাল বা মন্দ কোন অস্তিত্বগত গুরুত্ব নেই। নিঃসন্দেহে, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হিসাবে মহান চোল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বিদ্যমান ধারণাগুলিকে বার্টন স্টাইনের সমালোচনা (*পেজান্ট স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮০) ভারত ইতিহাসে 'সাম্রাজ্য'কে ধারাবাহিকভাবে অপনোদনের ক্ষেত্রে একটি জোরালো সূচনা ছিল। রোমিলা থাপারও তার *মৌর্যস রিভিজিটেড*, কলকাতা, ১৯৮৭তে, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বাসযোগ্যতা দান করেছেন। ফ্রাঙ্ক পার্লিন 'মুঘল-কেন্দ্রীক' ঐতিহাসিকদের কিছুটা ভর্ৎসনা করে অঞ্চলকে (*ওয়াতন*) ভারতীয় রাজনীতিক সংগঠন ও সমাজের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে তার তত্ত্ব পেশ করেন ('স্টেট ফর্মেশন রিকনসিডার্ড', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খন্ড ১৯.৩ (১৯৮৫) পৃপৃ. ৪১৫-৮০), এবং আন্দ্রে উইঙ্ক *ল্যান্ড অ্যান্ড সভারেনটি ইন ইন্ডিয়া*, কেমব্রিজ, ১৯৮৬তে ১৮শ শতকের মহারাষ্ট্র নিয়ে অধ্যয়নে *ফিৎনা* শব্দটি তৈরী করলেন একটি পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করতে যেখানে মুঘল সাম্রাজ্য বাস্তবিক কোন ক্ষমতা ছাড়াই নামমাত্র আনুগত্য লাভ করে, এভাবে একটি সাম্রাজ্য উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে স্থান পেল। কিন্তু পার্লিন ও উইঙ্ক উভয়েই মুঘল সাম্রাজ্যকে দেখেছেন বাইরে থেকে। প্রয়াত বার্টন স্টাইন তার শেষ প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটিতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিকদের এক ধরণের "অবরোধ মনস্তত্ত্ব" রয়েছে, যারা তার "খন্ডীকৃত-রাষ্ট্র" বিশ্লেষণের প্রতি স্বল্পই মনোযোগ দিয়েছেন।

মুজাফফর আলম ও সঞ্জয় সুব্রামনিয়াম একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে (মুখবন্ধ, *দি মুঘল স্টেট*, ১৫২৬-১৭৫০, সম্পা. ম. আলম ও স. সুব্রামনিয়াম, দিল্লী, ১৯৯৮, পৃপৃ. ১-৭১) এর উত্তরে সাড়া দেন। তারা ঐতিহাসিকদের যেসব দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনা করেছেন সেগুলিকে অনেকাংশে ভুল বোঝা হয়েছে, কিন্তু তা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তাদের প্রধান যুক্তি হল যে, মুঘল কেন্দ্রীকরণ ও ব্যবস্থায়নের পদ্ধতিগুলি ছিল খুঁতযুক্ত ও অসম। নিশ্চিতভাবেই এ হল ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা, কেননা, খুঁত বা অসমতার কথা

কেউই অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাতে করে মূলগত প্রক্রিয়া সমূহের বাস্তবতা অপ্রমাণিত হয় না। যে ক্ষেত্রে আলম ও সুব্রামনিয়ামের প্রস্তাবের (যদিও নতুন কিছু নয়) সাথে যদি একমত হওয়া যায় তা হল আঞ্চলিক স্তরে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন। বাংলার ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব অভিযান চালিয়েছেন (পৃপৃ. ৩৯-৫৫), যদিও তা থেকে তারা কি সমর্থন পেলেন তা অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যায়। তবে, মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃততর প্রেক্ষিতে বাংলার গুরুত্বকে যে, স্বীকৃতিদান, তা সকলেই এক বাক্যে মেনে নেবেন। বাস্তবিক পক্ষে আমি আগেই বলেছি যে, এই দ্বিতীয় কারণেই মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে আমি এখানে বলতে চাই।

মুঘল জমানায় কৃষির স্বরূপ

পূর্ববর্তী জমানাগুলি যথা বাংলার সুলতানী ও আফগান রাজ্যগুলির তুলনায় মুঘল শাসন কোন কোন ভাবে পৃথক ছিল তা থেকে আলোচনা শুরু করা যুক্তিসঙ্গত হবে। একদিকে অবশ্যই এটি বহিরাগতদের দ্বারা স্থানীয় শাসক শ্রেণীকে অপসারিত করেছিল।

সপ্তদশ শতকের বাংলার কোন মুঘল নাজিম বা দিওয়ানের জন্ম বাংলায় হয়নি বা তাদের কর্মজীবন বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রয়াত ম. আথার আলীর সংগ্রহীত তথ্যে দেখা যাবে যে বাংলার নাজিমরা কেবল বহিরাগতই ছিলেন না, তারা এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা ইতোমধ্যে অন্যত্র নিজেদের কর্মজীবন তৈরী করেছেন এবং তখনও অন্যত্র নিযুক্ত হওয়ার আশা রাখেন। সা'ঈদ খান ও মান সিংহ ১৫৮৭-৮ তে যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের নাজিম নিযুক্ত হন; ছয় বছর পরে, ১৫৯৩-৪ তে, সা'ঈদ খান বিহারে বদলী হন; পরের বছর মান সিংহ বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৬০৬এ মান সিংহকে তার পদ থেকে ডেকে পাঠিয়ে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হয় তারপর বাংলার সাথে তিনি আর কোন যোগাযোগ রাখেন নি। শাহজাহানের সময়ে একজন ইরানী ইসলাম খান ১৬৩৮-৩৯ এ বাংলার নাজিম থেকে সাম্রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হন। তার উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ সুজা বাংলাকে প্রধানত তার সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার ভিত্তি হিসাবে দেখেন। ঔরঙ্গজেবের সময়ে আরেকজন ইরানী ইব্রাহিম খান দীর্ঘ আট বছর ধরে বাংলার নাজিমের পদে থাকার পর পদত্যাগ করে তখনই ঔরঙ্গজেবের ৪১তম রাজ্যবর্ষে সুবা এলাহাবাদের নাজিম হন। (দেখুন আথার আলী'র *অ্যাপারেটাস অফ এম্পায়ার,* দিল্লী, ১৯৮৫ পৃপৃ. ৩২-৪০। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জন্য, এবং ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ নাজিমদের

জন্য *মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া- এ; মিসেলানি;* এক, বোম্বাই, ১৯৬৯, পৃপৃ. ৯৬-১৩৩-এ তার প্রবন্ধ)।

আর্থিক আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে বাংলার সাথে চিরস্থায়ী যোগাযোগের একই রকম অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনৈক ইরানী মির্জা হুসেন বেগ মাশাদী ১৬১০-১১য় বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন (আথার আলী, *অ্যাপারেটাস* : উল্লেখ নং জে ৩৩৪), কিন্তু এরপর তিনি বাংলার বাইরে স্থানান্তরিত হন, ফলে পরবর্তী উল্লেখে (জে ৫৫৭) তাকে আমরা আবার দেখি কচ্ছের বখ্‌শী ও দেওয়ানের পদ পরিত্যাগ করতে ১৬১৫-১৬ সালে। অবশ্যই, একথা মনে হয় যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজপুরুষদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন দায়িত্বপালন করতে চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। *বাহারিস্তান-ই ঘায়েবী*'র লেখক মীর্জা নাথান ১৬১০-১১য় ৫০০ জাত / ২৫০ সওয়ার বিশিষ্ট মনসব নিয়ে বাংলায় তার দীর্ঘকালীন কর্মজীবন শুরু করেন, ১৬৪০-৪১ এ মৃত্যুকালে তিনি ঠিক ঐ একই মনসবের অধিকারী ছিলেন (*অ্যাপারেটাস*, পৃ. ১৮), কর্মজীবনে কখনই তিনি ৯০০ জাত, ৪৫০ সওয়ারের উপরে ওঠেননি। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বাংলায় কর্মজীবন সীমাবদ্ধ থাকা তার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল একথা পরিষ্কার।

মুঘল আমলাতন্ত্র ও শাসক শ্রেণীর সদস্যদের ক্ষেত্রে বাংলায় বিশেষ কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল না : এটি ছিল অন্য যেকোন দায়িত্বের মতই, যা থেকে তারা পদোন্নতি ও অন্য প্রদেশে বদলীর আশা করতেন, অবশ্যই যদি মুখল দরবারে বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য না পৌঁছাত।

এই ধরণের ব্যক্তিদের হাতে সরকার থাকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিকই ছিল, যেমন তপন রায়চৌধুরী মুঘল বিজয়ের সময়কার বাংলা সম্পর্কে তার পথপ্রদর্শক গবেষণাতে উল্লেখ করেছেন (*বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর*, মুখবন্ধ সহ ২য় মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৬৯, পৃপৃ. ৮০-৮৮)। ক্ষণস্থায়ী অবস্থিতির কারণে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুঘল রাজপুরুষদের উৎসাহের অভাব তাদেরকে অতীতের হুসেন শাহী শাসকদের তুলনায় অনেকাংশে পৃথক করেছিল। এর স্বাভাবিক ফল হল দেশীয় সাহিত্য "রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণার অভাবে পূর্বেকার যুগের বলিষ্ঠতা ও স্বতস্ফূর্ততা লাভ করেনি" (ত. রায়চৌধুরী, পৃ. ৮৭)।

কিন্তু এই সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক অভিঘাত ছাড়াও আরও একটি অস্থিতিকর বিষয় ছিল যার প্রতি ইরফান হাবিব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : কৃষির বিকাশের উপর জাগীর হস্তান্তরের নেতিবাচক প্রভাব (*অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া*, ১৫৫৬-১৬০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৯৯, পৃপৃ. ৩৬৪-৭৩)। বাংলায় যে মুঘল রাজপুরুষদের *জাগীর* ছিল তারা জানতেন তা সাময়িক দায়িত্ব, সুতরাং তাঁদের কার্যকলাপের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কথা না ভেবে শোষণ করার প্রলোভন তাদের থাকতে বাধ্য। সুতরাং, তাদের অত্যাচারের যে চিত্র রায়চৌধুরী

এঁকেছেন (পৃপৃ. ৮২-৮৫) তা কোনভাবেই অতিচিত্রণ নয়, এবং সম্ভবত রিচার্ড ইটন তার *রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*, ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৯৪, পৃপৃ. ১৯৪-২২৭ এ কৃষির বিকাশ ও শান্তির যে রঙীন ছবি এঁকেছেন তার সংশোধন হিসাবে এটিকে দেখা যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে সর্বক্ষণ বিঘ্নমূলক ব্যয়সাধ্য শক্তি প্রয়োগ না করে মুঘল শাসনকে টিঁকে থাকতে হলে স্থানীয় উপাদানের সাথে কিছু পরিমাণে আপোষ করার প্রাথমিক আবশ্যকতা ছিল। আমার মতে, একটি যথেষ্ট বিস্তৃত পরিকল্পনার সাহায্যে তখন *জমিনদার* আখ্যাপ্রাপ্ত স্থানীয় শক্তিধরদের সাথে বোঝাপড়া করা হল।

১৫৭৫-এর পর থেকে ১৬১৩ সালে নাজিম ইসলাম খানের মৃত্যুর পূর্বে অবসান হওয়া পর্যন্ত মুঘল বিজয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যে বিপুল শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার উপর বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে (উদা. রায়চৌধুরী,পৃপৃ. ৪৯-৫১, ইটন,পৃপৃ. ১৪২-১৫০)। যশোরের প্রতাপাদিত্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করে আফগান ও বার ভুঁইঞার সাথে মুঘলদের সংগ্রামের নানাদিক সম্প্রতি লিপিবদ্ধ করেছেন অনিরুদ্ধ রায় *অ্যাডভেঞ্চারস, ল্যান্ড ওনারস অ্যান্ড রেবেলস, সি. ১৫৭৫-সি. ১৭১৫*, দিল্লী, ১৯৯৮, পৃপৃ. ৩৩-৮২তে। পরবর্তী শান্তিস্থাপনের কারণ হিসাবে ইটন দেখিয়েছেন বিরোধীদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভেদ ও শাসননীতিস্বরূপ "শাসন ও সোহাগের এক বিচক্ষণ সংমিশ্রণ" (পৃ. ১৫৪) প্রদর্শন। এর জন্য তিনি খোলাখুলিভাবে আন্দ্রে উইঙ্কের *ফিৎনা* তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন।

যেকোন সাফল্যকামী আক্রমণকারীর মতই মুঘলদের দ্বারা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের বিষয়টি সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থার পিছনে দমন ও সমঝোতার উপর ভিত্তি করা একটি দীর্ঘকালীন আপোষ ছিল। আলী মহম্মদ খান ১৭৬০-এর দশকের শুরুতে তার বিখ্যাত গুজরাটের ইতিহাস লেখার সময় গুজরাটের *জমিনদাররা* যেসব সাধারণ আপোষের শর্তে আকবরের বশীভূত হন তার বর্ণনা দিয়েছেনঃ এর অন্তর্গত ছিল তাদের জমির এক-চতুর্থাংশ নিষ্কর রাখা বা তার বদলে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ছাড় দেওয়া (*মিরাৎই আহমদী*, সম্পা. নবাব আলী, খন্ড এক, বরোদা, ১৯২৭,পৃপৃ. ১৭৩-৪)। বাংলায় যা ঘটেছিল তার জন্য এটি যথেষ্ট তুলনীয় নজীর। গুজরাটের মত বাংলার *জমিনদাররা* মুঘলদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেতেন তা সাম্রাজ্যের 'কেন্দ্র' এলাকাগুলির অনুরূপ অংশের প্রতি ব্যবহারের তুলনায় ভিন্ন ছিল। মুঘল বাংলা সম্পর্কে সাম্প্রতিক আলোচনা সমূহে এই বিষয়ের প্রতি যতখানি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় বেশী এর প্রাপ্য।

কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে দিয়ে, *জমা*, যা সংগৃহীত খাজনার তুলনায় অনেক কম হত, সেই অনুযায়ী সরকার বা তার বরাতীদের (*জাগীরদার*) নিকট অর্থ জমা দিতে দিয়ে বাংলার *জমিদারদের* যে ছাড় দেওয়া হয়েছিল তা মুঘল শাসনতান্ত্রিক

ঐতিহ্য হিসাবে ইংরেজ কোম্পানীর আমলাদের নিকট বাহিত হয়। এর ভিত্তিতে জেমস গ্রান্ট যুক্তি দিয়েছেন যে আকবরের পরবর্তীকালে "জমা তুমারি" (*জমা'- ই-তুমারি*) সংশোধন করা হলেও "সমগ্র দেশ বিস্ময়করভাবে কমহারে মূল্যায়িত" ('অ্যান হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস অফ দি ফিনান্সেস অফ বেঙ্গল,১৭৮৬, *ফিফ্থ রিপোর্ট ফ্রম দি সিলেক্ট কমিটি অন দি অ্যাফেয়ার্স অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী,* লন্ডন, ১৮১২,পৃ. ২৬৫)। স্যার জন শোর তার ১৮ জুন ১৭৮৯-এর মিনিটে (*ফিফ্থ রিপোর্ট*, পৃপৃ. ১৬৯-২২০) মুঘল শাসনে রাজস্ব নিরূপণ কম হয়েছে গ্রান্টের এই ধারণার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু স্বীকার করেন যে জমিদারদের উপরে মুঘল শাসনের চাপ "তেমন গুরুভার [ছিল না] এবং দেশের সম্পদ সেই সময়কার দাবীর আন্দাজে পর্যাপ্ত ছিল"(পৃ. ১৭৩)।

মোরল্যান্ড বিশ্বাস করতেন যে, বাংলার দলিলসমূহ জালিয়াতির মাধ্যমে ভারতীয় অধস্তনদের দ্বারা ব্রিটিশরা প্রতারিত হয়েছে ('আকবর'স ল্যান্ড রেভেন্যু অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন বেঙ্গল', *জ র এ সো,* ১৯২৬, পৃপৃ. ৫১-২, এবং *ফ্রম আকবর টু ঔরঙ্গজেব,* লন্ডন, ১৯২৩,পৃ. ৩২৫), ইরফান হাবিব যুক্তি দিয়েছেন যে সন্দেহভাজন রাজপুরুষদের বাংলার রাজস্ব ইতিহাস সংক্রান্ত পাঠ, বস্তুত, পূর্বেকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন আবু'ল ফজল *আ'ইন-ই আকবরী* তে বলছেন যে, বাংলার জমা 'সম্পূর্ণ রূপে *নক্দি* ছিল তখন এই পরবর্তী শব্দটি "নগদে স্থিরীকৃত' এই অর্থ বহন করেছে, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট বার্ষিক নগদ অঙ্কে স্থিরীকৃত। *জমা*'র এই নির্দিষ্ট অঙ্কটি বহু বছর ধরে চলেছিল, যতদিন না নতুন করে নির্ধারণ করা হচ্ছে : ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথম যুগের দলিল এবং ১৬৯৮ এ কলিকাতা ক্রয়ের পর ইংরেজদের উপর চাপান *জমা*'র দলিল থেকে তা সমর্থিত হয় (*অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া,* ২য় পরি. সং., পৃপৃ. ২১৫-১৯)। *জমিনদার* শ্রেণীটির মধ্যে একত্রীভূত মধ্যসত্ত্বভোগী, স্থানীয় ক্ষমতাশালী, মোড়ল প্রমুখ যদি যথাযথ আচরণ করত, অনুগত থাকত ও তাদের *জমা'* বা নির্ধারিত কর জমা দিত, তবে সাধারণত এই নির্ধারণ বহুকাল অপরিবর্তিত থাকত। অবধ প্রভৃতি সুবাগুলিতে এ ব্যবস্থা *একেবারেই* অন্যরকম ছিল যেখানে প্রতি বছর *জমিনদারদের* উপর বার্ষিক কর-দাবীর পরিমার্জন বা পরিবর্তন করা হত (দেখুন তদেব, পৃ. ১৮৮, ১৬৭৬-৭ থেকে ১৬৮৫-৬ *সরকার* বাহ্রাইচ, অবধের একটি *পরগণার* চারটি গ্রামের নির্ধারিত বার্ষিক রাজস্বের সারণীর জন্য)। বাংলার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে জমিদারদের সহায়ক ছিল, কেননা, নির্দিষ্ট *জমা'* অঙ্কের ফলে মূল্য-পরিবর্তন বা কৃষির প্রসারের তুল্য রাজস্ব হয়ে উঠতে দীর্ঘসময় লেগে যেত।

রাজস্ব পরিসংখ্যান বিস্তৃতভাবে এই চিত্র তুলে ধরে। ১৫৯৫ ও তার আগে যখন *আ'ইন-ই আকবরী*তে বাংলার পরিসংখ্যান সংকলিত হচ্ছিল তখন সুবার পশ্চিমভাগের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলই মুঘল অধিকারে এসেছে। সুতরাং, এটিকে ভিত্তি রেখা স্থির করা ঠিক

হবে না। কেননা ভবিষ্যতের রাজস্ব-বরাতীদের প্রলুব্ধ করতে এতে পূর্ব-বাংলার *জমা*'কে কম করে দেখান হতে পারে। (এই কারণে ইটনের *রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*, পৃ. ১৯৯-এর সারণীতে প্রদর্শিত ১৫৯৫ থেকে ১৬৫-এর মধ্যে পূর্ব বাংলায় বিপুল প্রকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির চিত্রটি অবশ্যই কিছু সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, এছাড়া *দস্তুর'ল 'আমল-ই 'আলমগিরির* সারণীর রচনাকাল সম্ভবত আনুমানিক ১৭০০, ১৬৫৯ নয়)। বরং, *বায়াজ-ই খুশবু* ই এর অঙ্কগুলি যে সময়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ ১৬১৩র পরে কোন সময়, যেমন ১৬২৮-৩৬, তার সাথে আনু. ১৭০৭-এর পরিসংখ্যান তুলনা করা উচিত। ইরফান হাবিবের *অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম*, পৃ. ৪৫৬র সারণীতে আমরা দেখতে পাই যে সত্তর বছরের বেশী সময় (১৬৩৬-১৭০৭) ধরে ৪০.২৫ কোটি *দাম* থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৪৬ কোটি হয়েছে, অর্থাৎ মাঝারি আকারের ৩৩ শতাংশের সামান্য বেশী বৃদ্ধি। এর ফলে বাংলা বিহার ও অবধের সাথে একই শ্রেণীভূক্ত হলেও ইলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লী সুবার তুলনায় অনেক বিপরীত, যেখানে *জমা*'হারের যথেষ্ট উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি হয়েছে (সারণী দেখুন তদেব, পৃপৃ. ৪৫৪ থেকে)।

জমিনদারদের সাথে এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল ছিল। এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে কেন পূর্ব বাংলায় যখন *জমিনদার* জাতির (কায়স্থ) যোগাযোগ অবিচল ছিল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ত ছিল মুসলমান। ১৯৪৭ পর্যন্ত এই রকম একটি 'অসম্ভব' অবস্থা চলতে থাকে। আরো ব্যাখ্যা করা যায় যে, কেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ বছরগুলিতে শোভা সিংহের বিখ্যাত বিদ্রোহ সত্ত্বেও— যার সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ রায় এখন আমাদের এত বিশদ ও নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন (*অ্যাড্‌ভেঞ্চারস, ল্যান্ড ওনারস অ্যান্ড রেবেলস*, পৃপৃ. ৯৯ থেকে)— বাংলায় মুঘল জমানার ভিত শক্তিশালী ছিল ১৭৫৭ পর্যন্ত।

মুঘল সাম্রাজ্য, ইসলাম এবং "সীমানা"

পূর্ব বাংলায় মুঘল শাসনের সাথে রায়তদের ইসলামীকরণের সম্পর্ক (যার উল্লেখ আমি এই মাত্র করলাম) সম্বন্ধে শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিয়েছেন রিচার্ডএম. ইটন তার *রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*, ভারতীয় সং, দিল্লী, ১৯৯৪এ। সহমত হওয়ার মত অনেক কিছুই ইটনের লেখায় আছে, বিশেষত আজকের দিনে যে কেউ "দ্বিমুখিনতার" বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদকে অনুমোদন করবেন। আবার মুঘল শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার ধারণা— 'সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি', 'ইসলামের গৌরব' প্রচার নয় — ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু তার পেশ করা আদিকল্পে কিছু মৌলিক দুর্বলতা রয়ে গেছে

বলে আমার মনে হয়। এগুলি হল ইসলামের দিকে রায়তদের প্রধান সরণ ঘটে মুঘল যুগে, ১৭শ শতকের মধ্যে, ঐ পর্বের কৃষি 'সীমানা'র বিস্তারের সাথে এটি সম্পর্কিত, সুফী বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠান যেসব করিশ্‌মাযুক্ত ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে তাদের কেন্দ্র করে ঐ কৃষি বিস্তার ঘটেছিল, এবং শেষত, এধরণের 'করিশ্‌মা' কৃষকদের ধর্মান্তরকরণ করেছে। এই প্রত্যেকটি দাবীই ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার সাপেক্ষ।

প্রথমত, ধর্মান্তরকরণের সময়কালটি ধরা যাক। ইটন নিজেই সুবিধাজনকভাবে সমসাময়িকদের একগুচ্ছ মন্তব্য তুলে ধরেছেন যারা দেখেছিলেন কোন কোন বিশেষ এলাকার রায়তরা ইতোমধ্যেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল (পৃপৃ. ১৩২-৪)। ১৫৭৪এ সিজোর ফ্রেদেরিচি দেখেছিলেন বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বভাগে সন্দ্বীপ দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান। ১৫৯৯এ ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ অধুনা দক্ষিণ-পূর্ব ঢাকা জেলায় দেখেছিলেন যে, " জনগণের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান।" ১৬৬০ সালের ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের সরকারী ইতিহাস, মহম্মদ কাজিমের '*আলমগীরনামা*, অনুযায়ী কামরূপ ও কুচবিহারের সীমানস্থ উত্তর বাংলার বিশাল ঘোড়াঘাট *সরকারের* রায়তরা প্রধানত (*আকসর*) মুসলমান। যেহেতু পূর্ববঙ্গে মুঘল সরকার কেবল ১৬১৩তে এসেই দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, তাই ঐ প্রতিবেদনগুলির তারিখ থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে ঐ অঞ্চলে মান সিংহ ও ইসলাম খানের অধীনে মুঘল বাহিনী আসার আগেই ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 'কৃষি সীমানা'র সমস্যা এবং অরণ্য উৎসাদন ও নয়া আবাদ স্থাপনের সাথে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো ও বিশ্বাস-ব্যবস্থা কোন্ পথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইটন মহৎ কাজ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি কেবল বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই অকথিত নিহিতার্থটি অসার মনে হয়। উচ্চ গাঙ্গেয় অঞ্চলেরও নিজস্ব কৃষি সীমানা ছিল উত্তরে তরাই অরণ্য এবং দক্ষিণে বৃহৎ মধ্য ভারতীয় অরণ্যের দিকে, এছাড়া কৃষি অঞ্চলের মধ্যেও বহু অরণ্যসঙ্কুল এলাকা ছিল। অতএব মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত এসব অঞ্চলেও রাষ্ট্র ও গ্রামীণ-জনতা উভয়ের নিকটই অরণ্য ধ্বংস করে কৃষি এলাকার প্রসার ঘটান সম্ভবত একই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাছাড়া, পূর্ব বাংলা ছাড়া অন্যত্র কোথাও মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় অরণ্য উৎসাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়নি। অতএব এ প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে পূর্ববঙ্গের মুসলমান রায়তরা কৃষির প্রসারণে যুক্ত হয়েছিল এই কারণে নয় যে তারা ঐ কাজে বিশেষ উপযুক্ত ছিল, বরং এই জন্য যে, ইতোমধ্যেই ধর্মান্তরিত তারা ঐ অঞ্চলে বসবাস করত। মুকুন্দরামের *চণ্ডী-মঙ্গল* (আনু. ১৫৯০) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইটন মেনে নিয়েছেন যে পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান রায়ত উভয়েই একই রকম ভূমিকা রেখেছিল (পৃপৃ. ২১৩-১৫)।

এর থেকে ইটনের তৃতীয় আদিকল্পটিতে আসা যায় : সুফী আচার ও বিশ্বাস কি সত্যই পথপ্রদর্শকদের সংগঠিত করতে প্রয়োজনীয় "করিশ্‌মা" এনে দিয়েছিল? সমস্ত

প্রাগাধুনিক সংস্কৃতিতে যুদ্ধ থেকে শুরু করে মৎস্য শিকার কিংবা অরণ্যপ্রবেশ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপকে রক্ষা ও সমর্থন করার জন্য পৌরাণিক বা আপাত ঐতিহাসিক চরিত্রের দেবদেবী, আত্মা, সাধুসন্ত প্রমুখের দোহাই পাড়ার ঝোঁক দেখা গেছে। মুসলমান রায়তরা একইভাবে তাদের বিশেষ চাহিদার উত্তরদানকারী স্থানীয় *পীরদের* মুখাপেক্ষী হবে তা আশা করা যায়, এবং এর দ্বারাই ইটন পৃপৃ. ২০৭-২৭এ যে তথ্য দিয়েছেন তারও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এসব ঐতিহ্য ও কুসংস্কার থেকে একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক উৎসাদন প্রক্রিয়া যাতে সুফীপীরগণ উৎসাহদাতা ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন যে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা একদমই অন্য বিষয়। অনাবাদী জমিতে পবিত্র বা সম্মানিত ব্যক্তিদের জীবনধারণের জন্য ভূমিদান (*মাদাদ-ই মা'আশ*) করার সপক্ষে উত্তম তথ্য প্রমাণও নেই। এধরণের দান, বস্তুত, কেবল বাংলায় করা হয়নি অন্যত্রও হয়েছে (তু.ইরফান হাবিব, *অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া*, ২য় সং., দিল্লী, ১৯১৯, পৃ. ৩৪৭ ও টী.), মুখ্যত অকর্ষিত জমিতে, যেখান থেকে আগে রাজস্ব জমা পড়েনি। এই শেষেরটি করা হয়েছিল ভূমি-দানের বিচ্ছিন্নতার দ্বারা রাষ্ট্রের উপর সৃষ্ট ভার হ্রাসের জন্য। যেহেতু এধরণের দান করা জমি লাখেরাজ ছিল তাই আমরা বুঝতে পারি যে কেন মুঘল প্রশাসন এধরণের দান করতে সর্বদা রক্ষণশীল ছিল : রাজস্বের যোগান না দিলে ভোক্তাদের দ্বারা কৃষির প্রসার ঘটলেও তা অল্পই রাষ্ট্রের কাজে আসত। স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলার নাজিম শায়েস্'তা খান (১৬৬৫) *জাগীরের* মোট রাজস্বের মাত্র ২½% পর্যন্ত এধরণের দান হিসাবে *জাগীরদারদের* ব্যয়ের অনুমতি দিতেন (শিহাবু'দ্দিন তালিশ, *ফথিয়া'-ই-ইব্রিয়া*, পাণ্ডুলিপি, বোদলেয়ান ওর. ৫৮৯, এফ. এফ. ১১৭বি- ১২১ এ)। নিশ্চিতভাবেই এ প্রকারের ক্ষুদ্র দান খয়রাত কোন সময়ই 'কৃষি সীমানা'র তেমন কোন বিশাল পরিবর্তন ঘটায়নি।

শেষত যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সুফীরা, মোল্লারা আশরফ জমি উদ্ধার ও বন উৎসাদন সংগঠিত করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই যে তাদের উদ্যোগের জন্য কেবল মুসলমান রায়তদেরই তাদের প্রয়োজন ছিল, বা বাস্তবিকই তারা তা চেয়েছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তারা কোনপ্রকার ধর্মান্তরকরণ করেন। *গেজেটিয়ার* ও মৌখিক কাহিনীগুলি থেকে ইটন *পীর* পথপ্রদর্শকদের যে কিংবদন্তী ও ঐতিহ্য তুলে এনেছেন তাতে ধর্মান্তর লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। এটি মনে হয় সর্বদা ধরে নেওয়া হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট রায়তরা মুসলমান ছিল।

সংক্ষেপে, তাহলে, ইটন যে আপাত সত্য আত্ম-বিরোধটি তুলে ধরেছেন তেমনটি আমার মনে হয় না যে "বাংলার মুসলমান জনগণের এক বৃহৎ অংশ উত্থিত হয়েছে একটি জমানায় (অর্থাৎ, মুঘল জমানা) যেটি বাঙালীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসকে নীতি হিসাবে নেয়নি" (পৃ. পঁচিশ)। আমার ধারণা হল, যেমনটি আমি এইমাত্র দেখালাম, যে পূর্ববঙ্গের রায়তদের ইসলামীকরণ মুঘল সাম্রাজ্যে বাংলার

সংযুক্তিকরণের পূর্বেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, এবং এইরকম কোন প্রমাণ নেই যে কৃষিসীমানার প্রসারের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল। একথা স্বীকার করতে হবে যে ১৩শ - ১৬শ শতকে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা কেন এত বিশাল সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হল তার কোন তাৎক্ষণিক জবাব আমার কাছে নেই, গাঙ্গেয় সমভূমির অন্যত্র তারা এরকম করনি। কোনরকম দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত শক্তপোক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। বা, সম্ভবত কেউ আইরিশ বিপ্লবী জেমস কনোলি'র প্রতিবাদের আশ্রয় নিতে পারেন যে, যেকোন ঘটনা, তা নিজে থেকেই যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন (এখানে যেরকমটির কথা আমরা বলছি), ঐতিহাসিকরা সেটিকে অবশ্যম্ভাবী করে দেখতে পারেন কেননা তার জন্য কোন না কোন কারণ তাদের দেখাতেই হয়। রায়তদের ইসলামে ধর্মান্তর পূর্ববাংলার প্রাক্‌-মুঘল অতীতের বিষয় : এটি "অবশ্যম্ভাবী" নাকি কেবল আপতিক ছিল, তা আমরা একেবারেই জানি না।

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য

সকল বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেন যে সপ্তদশ শতকে বাংলার বাণিজ্যে এক অসাধারণ বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে বাংলার সংযুক্তি বৃহত্তর বাজারের সাথে সহজতর যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়ে বাংলার বাণিজ্যবিকাশের এক বিপুল সম্ভাবনা এনে দেয়। গুজরাট ও মধ্য এশিয়ার (ইরান সহ) সাথে স্থলপথে বাংলার বাণিজ্যে আগ্রা যানবদলের স্থান হয়ে উঠেছিল।

আমরা জানি যে ১৬শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা "সমগ্র ভারত" এবং সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য অঞ্চলে সূতীবস্ত্র, চাল সরবরাহ করত (র‍্যালফ ফিচ্‌, *আর্লি ট্র্যাভেলস ইন ইন্ডিয়া* (১৫৮৩-১৬১৯), সম্পা. ডব্ল্যু. ফস্টার, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ৩৮)। ১৬২৯এ মানরিক লেখেন যে, চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বোঝাই শতাধিক জাহাজ প্রতিবছর বাংলার বন্দরগুলি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় (*ট্র্যাভেলস্‌*, ১৬২৯-৪৩, এক. অনু., সি. ই. লর্ড ও এইচ হস্টেন, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ৫৬)। বার্নিয়ের (*ট্র্যাভেলস্‌ ইন দি মোঘল এম্পায়ার*, ১৬৫৬-৬৮, অনু. এ. কনস্টেবল, লন্ডন, পৃ. ৪৩২) দেখেছিলেন যে বাংলা সকল সন্নিহিত স্থানে এমনকি মসুলীপত্তম ও করোমন্ডল উপকূলবর্তী অন্যান্য অনেক বন্দরে চাল রপ্তানী করে। স্থলপথে বাংলার কালোত্তীর্ণ পণ্য সূতীবস্ত্রের বাণিজ্য আরও প্রেরণা লাভ করে যখন সাম্রাজ্যের সর্বত্র মুঘল অভিজাতবৃন্দ বাংলার তাঁতের তৈরী সূক্ষ্ম পণ্যের চটজলদি বাজার তৈরী করেন।

বাংলায় রেশম চাষের (তুঁতপোকাজাত) প্রথম নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে মধ্য - ১৫শ শতকে মা হুয়ানের রচনা থেকে। কিন্তু ১৭শ শতকের দ্বিতীয়ভাগে রেশমচাষ

সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। তাভারনিয়েরে মতে (১৬৬৬) কেবল কাশিমবাজার সরবরাহ করত ২০,০০০ গাঁট বা ২৪ লক্ষ পা. আভদুপ.। ওম প্রকাশ সঙ্গত কারণেই এই হিসাবের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে, (*দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকোনমি অফ বেঙ্গল*, ১৬৩০-১৭২০, প্রিন্সটন, ১৯৮৫,পৃ. ৫৪)। কিন্তু বাংলায় ওলন্দাজদের কেনাকাটার বিষয়ে তার নিজস্ব তথ্য থেকে দেখা যায় যে ইউরোপে কাঁচা রেশমের বৃহত্তম রপ্তানীকারক ছিল বাংলা। এটি হয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, যেখানে ১৬৫৫ সালে আগ্রার বণিকরা সাম্রাজ্যের দরবারে রপ্তানী করার জন্য ৬,০০০ গাঁট ক্রয় করেন; যে পরিমাণটি দু'বছর পরের ওলন্দাজদের ক্রয় পরিমাণের দ্বিগুণ (আর. ইটন, *দি রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার*, পৃ. ২০২ টি)। এছাড়া, বাংলার রেশমের বহুল চাহিদা ছিল গুজরাটের জরি শিল্পে, যে বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া যায় নি।

চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যুত্তর দেওয়ার মত যথেষ্ট ক্ষমতা বাংলার অর্থনীতির ছিল বলে মনে হয়। ইটন (পৃপৃ. ৯৬-৭) এবং অনিরুদ্ধ রায় ('মিডল বেঙ্গলী লিটারেচর : এ সোর্স ফর দি স্টাডি অফ বেঙ্গল ইন দি এজ অফ আকবর', *আকবর অ্যান্ড হিজ ইন্ডিয়া*, সম্পা. ইরফান হাবিব, দিল্লী, ১৯৯৭, পৃপৃ.২২৫-৪২) দেখিয়েছেন যে বাণিজ্যের একটি নির্দিষ্ট বিস্তার ('মুদ্রা-প্রসার' সহ) সুলতানী আমলে ঘটেছিল। কিন্তু রাজধানীর আয়তন যদি নগর বিকাশের বিস্তার সূচিত করে, তবে গৌড় ও ঢাকার তথ্য তুলনা করা যেতে পারে। একটি পর্তুগীজ সূত্র অনুসারে ১৫২৯এ সুলতানী রাজধানী গৌড়ের জনসংখ্যা ছিল ৪০,০০০। অন্যদিকে মুঘল সুবার রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা কমপক্ষে ২,০০,০০০ ছিল বলে ১৬৪০এ মানরিক দেখিয়েছেন : ইটন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই যুক্তি দিয়েছেন (*রাইজ অফ ইসলাম*, পৃ. ১৫৬) যে অন্তবর্তীকালীন বছরগুলিতে এই হারেই বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইউরোপীয় বণিকরা এবং কোম্পানীগুলি যে বাংলার সাগরপারের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানীর এশীয় ব্যবসায় বাংলা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৯০এর দশক থেকে ১৭১০এর দশক পর্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানীর সমগ্র এশীয় রপ্তানীর ৪০%, এবং ১৬৯৮-১৭০০য় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানীর ৪২% হয় এখান থেকে (ওম প্রকাশের প্রবন্ধ, এল. ব্লুজ ও এফ. গাস্ত্রা সম্পা., *অন দি এইটিনথ্ সেঞ্চুরি অ্যাজ এ ক্যাটেগরি অফ এশিয়ান হিস্ট্রি*, অল্ডারশট, ১৯৯৮, পৃ. ২৪৪)। মোরল্যান্ড (*ফ্রম আকবর টু ঔরঙ্গজেব*, লন্ডন, ১৯২৩), কে. এন. চৌধুরী (*দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অফ এশিয়া অ্যান্ড ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী*, ১৬৬০-১৭৬০, কেমব্রিজ, ১৯৭৮) এবং ওম প্রকাশ (*দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকোনমি অফ বেঙ্গল*, ১৬৩০-১৭২০)-এর অকথিত ধারণা যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় কোম্পানী গুলির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেটিকে এখন বিরোধিতা করা হয়েছে, এবং এশীয়, বিশেষত ভারতীয় বণিকদের

ক্রমাগত তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল, ১৬৫০-১৭২০,* কলকাতা,১৯৭৫, *ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লাইন।* ওম প্রকাশও মনে হয় এ বিষয়ে তার মত সংশোধন করেছেন (*অন দি এইটিনথ্ সেঞ্চুরি,* পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ. ২৩৭-২৬০)। সঞ্জয় সুব্রামনিয়াম বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন যে ১৬শ শতকে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যে পর্তুগীজদের একচেটিয়া অধিকার ছিল না, ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় বণিকরাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ('নোটস অন দি সিক্সটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল ট্রেড', ই ই *সো হি রি,* ২৪, ৩ (১৯৮৭) (পৃপৃ. ২৬৫-২৮৭)।

পণ্যদ্রব্য রপ্তানী থেকে ১৭শ শতকে বাংলা প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ধাতু অর্জন করে। ১৭শ শতকের চতুর্থ পাদে দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একাই বাংলায় কাঁচা রেশম ও সূতীবস্ত্র ক্রয়ের জন্য গড়ে বার্ষিক ১,৫০,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করত (*দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অফ এশিয়া,* ৫১০), এবং ১৬৬০ এর দশকে ওলন্দাজরা একই উদ্দেশ্যে বার্ষিক ১২.৮ লক্ষ ফ্লোরিন নিয়ে আসত। একই সময়ে "সাধারণভাবে এশিয়ার সব অঞ্চল থেকে ধারণাতীত সংখ্যক বণিকরা" বাংলা থেকে পণ্য ক্রয় করত "একমাত্র নগদেই অন্য কিছুর বিনিময়ে নয়" (স্ক্র্যাফটন, *রিফ্লেকশনস্ অন দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্দোস্তান,* সু. চৌধুরী দ্বারা উল্লেখিত,পৃ. ১৮)।

যে বিষয়টি ভাবায় তা হল মূল্যবান ধাতুর এই অন্তঃপ্রবেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের টাঁকশালের উৎপাদনের তুলনায় বাংলার মুদ্রানির্মাণে প্রতিফলিত হয় না। উত্তরপ্রদেশের মুদ্রাভান্ডারের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করলে ১৭শ শতকের শেষার্ধে সমগ্র মুঘল মুদ্রা নির্মাণের মধ্যে বাংলার টাঁকশালের অবদান ছিল নিম্নরূপ :

১৬৫৬-৬৫	১০.৩ %
১৬৬৬-৭৫	২৪.৬ %
১৬৭৬-৮৫	১৩.৪ %
১৬৮৬-৯৫	১১.৪ %
১৬৯৬-১৭০৫	৭.৭ %

(শি. মুসভী, 'দি সিলভার ইনফ্লাক্স, মানি সাপ্লাই, প্রাইসেস অ্যান্ড রেভেন্যু এক্সট্রাকশন ইন মুঘল ইন্ডিয়া', *জার্নাল অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অফ দ্য ওরিয়েন্ট,* ত্রিশ,পৃপৃ. ৫৬,৫৮)।

দেখা যাবে যে ১৬৬৬-৭৫ এ রূপার অন্তঃপ্রবেশ যখন ব্যতিক্রমী ভাবে কম ছিল, তখনই কেবল বাংলার টাঁকশালগুলি সাম্রাজিক রৌপ্য মুদ্রার এক চতুর্থাংশ উৎপাদন করে; অন্যথায় সেগুলির উৎপাদন ১৫% -এর অনেক নীচে ছিল।

এই কম পরিমাণে মুদ্রানির্মাণ (হ্যটনের তত্ত্বানুসারে উৎপাদনের ব্যাপক বিকাশ নয়, পৃ. ২০৬) ১৭শ শতকের শেষার্ধে বাংলায় মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য দায়ী ছিল

যা সুশীল চৌধুরী (*ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন*,পৃপৃ. ২৪১-৪৮) এবং ওম প্রকাশ (*ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকোনমি অফ বেঙ্গল*, পৃপৃ. ২৫১-৩) তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সুদের হারও একই কথা বলবে। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির (বিশেষত আগ্রা) ও গুজরাটের বাজারের থেকে বাংলায় সুদের হার বেশী ছিল। ১৭শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার হার মাসিক ১ ও ১½% এর মধ্যবর্তী ছিল। যেখানে অন্যান্য বাজারে তা ½ থেকে ৩/৪% এর মধ্যে ওঠানামা করত ('ইউজুরি ইন মেডিয়েভ্যাল ইন্ডিয়া', *কম্পারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি অ্যান্ড হিস্ট্রি*, ছয়(৪), ১৯৬৪)। এ থেকে আরও বলা যায় যে বাংলায় অতিরিক্ত মুদ্রার অন্তঃপ্রবেশ ঘটেনি যা সুদের হারের হ্রাস ঘটাত।

তাহলে এসমস্ত তথ্যের সাথে মূল্যবান ধাতুর অন্তপ্রবেশের প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে কেমনভাবে মেলান যাবে?

একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, আমার মনে হয়, হয় বাংলা অন্তর্দেশীয় বাজার থেকে একই হারে আমদানী বৃদ্ধি করেছিল, আমদানীকৃত মূল্যবান ধাতু দ্বারা যার দাম মেটানো হত, অথবা *খালিসা* থেকে মুঘল তোশাখানার চাহিদা ও মুঘল *জাগীরদারদের* প্রেরিত অর্থ পূরণ করতে তা ব্যয় হত। সম্ভবত দুটি কারণই সক্রিয় ছিল। স্থল পথে বাংলায় আমদানীকৃত দ্রব্যের বাজারকে খাটো করে দেখার দরকার নেই, যদিও এর চাহিদা তৈরী করে মুঘল আমলাতন্ত্র, তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এবং এক বৃহৎ পারসীক ভাবধারাজাত স্থানীয় শিরোমণি শ্রেণী। চাহিদার বস্তুগুলি হতে পারত ঘোড়া, জরি বা পশমী দ্রব্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ বিষয়ে আমাদের তথ্যাবলী খুবই কম, এমনটি আন্দাজ করা যায় মাত্র।

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে মূল্যবান ধাতু প্রেরণের অন্য সম্ভাব্য কারণ হল আর্থিক দাবী পূরণ। ১৮শ শতকে এই নির্গমন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখন ১৭৩৮এর পূর্বে কেবল সাম্রাজ্যিক কোষাগারে অর্থ প্রেরণের পরিমাণ বার্ষিক এক কোটি টাকায় পৌঁছয় (দেখুন শোর ফিফথ্ রিপোর্ট, পৃ. ১৮৩তে, এবং গ্রান্ট তদেব. পৃ.১৮৩)। সত্য যে, গ্রান্ট ও শোর উভয়েই স্বীকার করেছেন যে ঐ অর্থ ফেরৎ পাওয়া যেত বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ, বাংলার পণ্যক্রয়ের মাধ্যমে, কিন্তু এধরণের প্রত্যার্পণ, যদি হয়েও থাকে, তা অংশত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থা যে ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তাতে গুজরাটের মত বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূল্যবান ধাতু স্থলপথে নির্গত হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই পরিস্থিতিতে, কোম্পানীর বাণিজ্য মারফৎ বাংলায় মূল্যবান ধাতুর অন্তঃপ্রবেশের অভিঘাত সম্পর্কে কে. এন. চৌধুরীর ধারণাকে (*ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অফ*

এশিয়া, পৃ. ৪৬২) পরখ করে দেখা উচিত। এর মাধ্যমে বাংলা কখনই একটি "প্রধান শিল্পাঞ্চল" হয়ে উঠতে পারত না, কেননা আমরা দেখলাম মূল্যবান ধাতু বাংলায় থাকত না। কোম্পানীর বাণিজ্যে উদ্বৃত ৩৩.২লক্ষ টাকা (১৭০৯-১০ থেকে ১৭১৭-১৮ সময়কালে) বাংলার ক্ষেত্রে ৩৩৫.৪ লক্ষ টাকার মোট বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাত, ওম প্রকাশের এ ধারণাকে (*ই ই সো হি রি*, তের (২) পৃ পৃ. ১৬৯-৭৮) যুক্তিসঙ্গত ভাববার কোন কারণ নেই। এ বিষয়টিকে আমি অত্যধিক গুরুত্ব দিতে নারাজ, কেননা ওম প্রকাশের পরবর্তী কোন লেখাতে এ বিষয়টি উত্থাপিত হতে আমি দেখিনি। আমি নিশ্চিত তিনি এটাও দেখতেন যে কোম্পানীগুলি বাংলার উন্নয়নে এতটা মদত যদি কখন যুগিয়েও থাকে, তবে তা ১৭৫৭য় পলাশীতে এক আঘাতে নিশ্চিত হয়ে যায় যখন সমস্ত মূল্যবান ধাতুর অন্তঃ প্রবেশের অবসান ঘটে।

সুতরাং, মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে বাংলার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির কি তবে কোন হিসাবনিকাশ করা যায়? এটি পরিষ্কার যে, সাম্রাজ্যিক যোগাযোগের ফলে বাজার-কেন্দ্রীক কৃষি, কারিগরী উৎপাদন এবং বাণিজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না, এ ধারণা এক্ষেত্রে অচল। কিন্তু সাম্রাজ্যও তার প্রাপ্য উসুল করে নিয়েছিল : শাসক শ্রেণীর লিপ্সা পূরণ করতে হত, এবং সাম্রাজ্য বাংলাকে যে সম্পদ অর্জন করতে সহায়তা করেছিল তার একটি অংশ এভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নিজামত ও পলাশী

১৭১৩ র পর থেকে মুর্শিদকুলি খান একাধারে *দিওয়ান* (খাজনা নিয়ন্ত্রক) ও *নাজিমের* (প্রাথমিক ভাবে *নায়েব নাজিম*) দপ্তর একত্র করেন, ঐ সময়কে বাংলার নিজামতের (শব্দটি *নাজিম*, শাসনকর্তা, থেকে এইভাবে বলা যায় অথবা *নিজামত* [nizamat], ফারসিতে নাজিমের দপ্তর, তা থেকে 'নিজামত' বলা চলে; নিজামেট্ [nizamate] বানানটি শুদ্ধ নয়) প্রতিষ্ঠাকাল ধরা যায় (মহম্মদ হাদি কামওয়ার খান, *তাজকিরাৎ উ'স সালাতিন চাগতা*, সম্পা. মুজাফফর আলম, বোম্বাই, ১৯৮০, পৃ. ১৭৩, এরপর থেকে এই লেখায় তিনি শুধুই বাংলার নাজিম বলে উল্লেখিত)। এই দুটি দপ্তরের একত্রীকরণ তার ও তার উত্তরসূরীদের কার্যত বাংলার উপর পূর্ণ স্বশাসনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। বাংলার খালিসা (রাজকীয় জমি) থেকে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণ করে মুঘল দরবারকে সন্তুষ্ট রাখা হয়েছিল। এর অর্থ হল যে সাম্রাজ্যের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও বাংলায় মুঘল জমানা ক্রমাগত এক 'আঞ্চলিক' চেহারা নিচ্ছিল, যার প্রতি ফিল কৰিন্স সম্ভবত ১৯৭০-এ প্রথম দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিলেন- (*জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ*, ২৯, পৃপৃ. ৭৯৯-৮০৬)।

বিভিন্ন চিন্তাধারার ঐতিহাসিকরা নিজামতকে সহানুভূতির সাথে বিচার করেছেন। কয়েকজনের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ সত্ত্বেও এটি ক্রমাগত *জমিনদার*দের সঙ্গে সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। এটি ফারসি ভাষার সাথে পরিচিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আমলাতন্ত্রকে উঁচুপদে নিযুক্ত করে। উল্লেখযোগ্যভাবে পূর্বেকার সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের তুলনায় এর সাথে বণিক শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল; একটি বহুপ্রচলিত উদাহরণ হল মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তি। এই যুগটিকে, ব্রিটিশ যুগের বিপরীতে, বাংলার 'সমৃদ্ধির' যুগ মনে হয়। এর বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রুত অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্য ঃ এশীয় বণিকরা তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানীর (ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী) সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লেও তাদের বাণিজ্যের প্রসারতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি এখানে সুশীল চৌধুরীর বিস্তৃত গবেষণার কথা উল্লেখ করতে চাই, *ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লাইন ঃ এইটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫, এবং ওম প্রকাশের একটি প্রবন্ধ, 'ট্রেড অ্যান্ড পলিটিক্স ইন এইটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', এল. ব্লুস ও এমে গাস্ত্রা সম্পা. *অন দি এইটিনথ্ সেঞ্চুরি অ্যাজ এ ক্যাটেগরি অফ এশিয়ান হিস্ট্রি*, অন্ডারশট, ১৯৯৮, পৃপৃ. ২৩৭-৬০, যেখানে এই বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে।

নামমাত্র অস্তিত্ব থাকা ছাড়া নিজামতের অবসান ঘটল দুটি যুদ্ধে, পলাশী (১৭৫৭) এবং বক্সার (১৭৬৪)। এই ঘটনাবলী একটি বক্তব্যে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, "পলাশী বিপ্লব" দেশীয় শক্তির দ্বারা সংঘটিত এক বিদ্রোহের আকার নিয়েছে, যারা নিজামতের অবিচারের হাত থেকে ব্রিটিশদের সহযোগিতায় মুক্তি লাভ করে। সি.এ. বেইলি তার প্রভাবশালী গ্রন্থ, *রুলারস, টাউন্সমেন অ্যান্ড বাজারস্ ঃ নর্থ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইন দি এজ অফ ব্রিটিশ এক্সপ্যানশন*, ১৭৭০-১৮৭০, কেমব্রিজ, ১৯৮৩, পৃপৃ. ২-৪ এ প্রথমদিকের গবেষক জে. আর. সীলি'র মত লেখককে (*দি এক্সপ্যানশন অফ ইংল্যান্ড*, লন্ডন, ১৮৮০) উদ্ধৃত করেছেন এটি দেখাতে যে ইংরেজরা "১৭০৭এ মুঘল সাম্রাজ্য অবসানের (!) পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ" গ্রহণ করে "এবং তাও প্রধানত ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সহযোগিতায়।" এই বক্তব্যটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে একথা মেনে নিয়েও বেইলি বিশ্বাস করেন এর মূলগত যুক্তিতে এবং দাবী করেন [রোনাল্ড] রবিনসনের 'ইউরোপীয় বিস্তারের পদ্ধতি' ও 'দেশীয় সামাজিক রাজনীতি'র সংযোগ" পূর্ণমাত্রায় উদঘাটিত হোক। পরবর্তী একটি জনপ্রিয় গ্রন্থে, *ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড দি মেকিং অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার*, কেমব্রিজ, ১৯৮৮,পৃপৃ. ৪৯-৬০, বেইলি যুক্তি দিয়েছেন যে নিজামতের সময়ে শীর্ষস্থানীয় বণিক গোষ্ঠী যে সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছিলেন পরবর্তী কালে তাই তাদের নতুন 'নবাব' সিরাজদ্দৌল্লার "কামধেনুতে" পরিণত করেছিল, তাই তারা ইংরেজদের শরণ নেয়। তদুপরি, উৎপাদক ও ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের ভাগ্য 'ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সাথে মিলেমিশে গিয়েছিল"। এতটাই যে কলিকাতা

থেকে ইংরেজদের বহিস্কার ভারতীয় বণিক ও *জমিনদার* কারুরই "বেশীদিন সহ্য হয়নি"।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, রজতকান্ত রায়, 'কলোনিয়াল পেনিট্রেশন অ্যান্ড দি ইনিশিয়াল রেজিসটেন্স', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিয়্যু,* বার, ১৯৮৫-৮৬, পৃপৃ. ১-১০৫, এবং সুশীল চৌধুরী, 'সিরাজদ্দৌল্লা, দি ইংলিশ কোম্পানী অ্যান্ড দি প্লাসি কনস্‌পিরেসি', ঐ একই পত্রিকা, তের, ১৯৮৬-৮৭, পৃপৃ. ১০৯-৩৪-এর প্রবন্ধ সমূহে। এখানে আমি বেইলি'র বক্তব্যের কয়েকটি পরিস্কার অসঙ্গতির উল্লেখ করছি। প্রথমত, "ইংরেজ" ও "ইউরোপীয়" এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ১৭৩৮-৪০ সালে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সম্মিলিত এশীয় বাণিজ্য ইংরেজদের বাণিজ্যের থেকে বেশী ছিল (ওমপ্রকাশ, পূর্বোল্লিখিত এবং ওলন্দাজ বা ফরাসী কোন পক্ষই সিরাজদ্দৌল্লার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সুতরাং, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা থাকতে, যাদের স্বার্থ ইউরোপীয় বাণিজ্যের সাথে "মিলেমিশে" গিয়েছিল, ইংরেজদের কলিকাতা থেকে বহিস্কারে তারা নিজেদের অত বেশী অবহেলিত মনে করে নি।

তদুপরি, যদি নিজামতের শাসনে বৃহৎ বণিকদের সমৃদ্ধিই হয় তবে তারা কেন তা উৎখাত করে লাভের আশা করবে? নিশ্চিতভাবে, এর একটি সরলতর ব্যাখ্যা হল যে তারা জানত যে সিরাজদ্দৌল্লাকে উৎখাত করার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা ইংরেজদের আছে তাই সাবধানী ব্যক্তি হিসাবে ভবিষ্যতে যারা জিতবে তাদেরকে সমর্থন করা তাদের পক্ষে মানানসই হয়েছিল। ১৯৪০এ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাফল্য ভিশির সহযোগিতার জন্য হয়নি; বরং জার্মানীর সফলতার কাবণেই ভিশি সহযোগিতা করেছিল। যাইহোক, শীঘ্রই ব্রিটিশদের সহযোগিতাকারীগণ তাদের এই পছন্দের জন্য অনুতাপ করার কারণ পেয়েছিল। *ইন্ডিয়ান সোসাইটির*'র পৃষ্ঠায় বেইলি দেখাতে ভুলে গেছেন যে এই সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতীয় সহযোগীরা কি পেয়েছিল। আমীরচন্দকে ক্লাইভের প্রতারণাব উল্লেখ করা হয়নি, যদিও লঘুভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে "সত্য, জগৎ শেঠরা দ্রুত সুবার রাজস্ব ও বাণিজ্যের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব বিস্তার থেকে চ্যুত হলেন" (বেইলি, পৃ. ৫৩)। তাঁর যোগ করা উচিৎ ছিল যে *জমিনদাররা,* যদি কখনও ইংরেজদের জন্য তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়েও থাকে, তারাও শীঘ্রই আশাহত হয়েছিল। ১৭৬৫ তে দেওয়ানী লাভের পর তাদের উপর যে আর্থিক চাপ এল তা নিজামতের সময়ে দুঃস্বপ্নেও তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ : রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তির (মির জা'ফর থেকে শেষ পর্যন্ত নিহত নন্দকুমার) পক্ষ পরিবর্তনের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপণ করা নয়া জমানার সম্পূর্ণ নূতন দিকটির থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করেছে : একটি অভূতপূর্ব, নিঃশেষকারী শোষণ প্রক্রিয়া, যার প্রকৃতি ও পরিণতি লর্ড কর্নওয়ালিসের ৩ফেব্রুয়ারী, ১৭৯০-এর মিনিটে (*ফিফথ্ রিপোর্ট,* পৃ.

৪৯৩) এত ভালোভাবে সংক্ষেপিত যে তা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"[বাংলায়] ব্রিটিশদের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে তার [রাজস্ব থেকে] এক বিপুল বার্ষিক বিনিয়োগ ইউরোপে ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ, ক্যান্টনের কোষাগারে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দান [চীনা রেশম ও চা ক্রয়ের জন্য], এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সির তীব্র ও বিস্তৃত চাহিদার যোগান দেওয়ার সক্ষমতার উপর।

"উপরিউক্ত কারণে বিপুল ধননির্গমন এবং ব্যক্তিগত সম্পদ প্রেরণের ফল অতীতে বহু বছর ধরে এবং এখন তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে বর্তমান মুদ্রার বিশাল অভাব এবং *কৃষিব্যবস্থা ও দেশের সাধারণ বাণিজ্যের উপর প্রক্ষিপ্ত স্থবিরতা দ্বারা।*"

এই বক্তব্যকে অধিক বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই। কৃষি ও বাণিজ্য উভয়তেই প্রক্ষিপ্ত "স্থবিরতা" কোম্পানীর বাংলায় ভারতীয় বণিকদের জন্য অল্পই স্থান রেখেছিল।

পলাশী সূচনা করল একটি প্রকৃত মৌলিক বিচ্ছিন্নতার, এবং সহযোগিতা হোক না হোক ঐ নিয়তি নির্দিষ্ট যুদ্ধের পর থেকে বাংলার জনগণের জন্য সৃষ্টি হল সামান্য সুবিধা এবং বহুল দুরবস্থা।

ধন্যবাদ।

মূলের ভাষান্তর ঃ সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বাঙলার অভিজাত ও অনভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দ : বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, ১৯৩৬-'৪৬

চণ্ডীপ্রসাদ সরকার

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী, মাননীয়া অধ্যাপিকা কুমকুম রায়, মাননীয়া অধ্যাপিকা শিরীন মুসভি, মাননীয় অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপস্থিত ইতিহাস অনুরাগী ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহোদয়গণ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আমার মত একজন ইতিহাস অনুরাগীকে আধুনিক ভারত ইতিহাস বিভাগে সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানিয়ে আমাকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পরিচালক মণ্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি এখানে বলার জন্য যে বিষয়টি বেছে নিয়েছি সেটি হচ্ছে "নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বাঙলার অভিজাত ও অনভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দ : বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৩৬-'৪৬"।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* নেতৃত্বের পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। তার আগে পর্যন্ত নেতৃত্বে ছিলেন খাজা-নবাব-নাইট উপাধিধারী খানদানী অভিজাতরা এবং শহুরে অবাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী মুসলমানরা। ১৯১১-র ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদ্ হবার পর তাই রক্ষণশীল নেতৃত্ব দ্রুত তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাতে থাকেন। ক্রমশই তাদের স্থান দখল করতে থাকেন ইংরেজ-সরকার বিরোধী, বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান। এদের কেউ ছিলেন আইনজীবী, অথবা সরকারী চাকুরীজীবী, কেউ ছিলেন শিক্ষাবিদ্, কেউ কেউ বা সংবাদপত্রসেবী। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন একদল বাঙলা ভাষাভাষী মাদ্রাসায় শিক্ষিত উলেমা।

সংখ্যালঘু রক্ষণশীল অভিজাত নেতারা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার

উদ্দেশ্যে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ* নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেন। সেই কারণেই সর্বভারতীয় লীগের সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রেই বাঙালী মুসলমান-স্বার্থ বিরোধী হলেও প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, তাঁরা সর্বদাই সমর্থন করে এসেছেন। মনে রাখা দরকার, সর্বভারতীয় লীগ নেতৃত্ব প্রধানতঃ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাঙলা এবং পাঞ্জাবকে তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থেই ব্যবহার করতে চাইতেন এবং করতেনও। সেই কারণেই তারা বাঙালী মুসলমানদের আঞ্চলিক অবস্থানগত, অর্থনীতিগত এবং সংস্কৃতিগত নিজস্বতাকে কোন দিনই গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে দ্বিতীয়বার বাঙলা বিভাগের সময়কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে খাজা-নবাব-নাইট উপাধিধারী খানদানী ভূমিজ অভিজাত এবং শহুরে অবাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে প্রতিষ্ঠাবান মুসলমান নেতাদের বিরোধ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ রাজনীতির বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। এই বিষয়েই এখানে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

২

১৯১৫-তে ঢাকার নবাববাহাদুর সালিমুল্লাহের মৃত্যুর পর প্রাদেশিক লীগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতৃত্বের আবির্ভাবের সূচনা হয়। নূতন নেতৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। অভিজাত নেতারা ঐ সময় প্রাদেশিক লীগ বর্জন করে নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে *সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মহামেডান এসোসিয়েশন*কে পুনর্জীবিত করে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগে*র বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন হিন্দুদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* আর মুসলমান-স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।[১]

১৯২০ সালের পর সর্বদলীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে খিলাফৎ কমিটি এদেশে মুসলমানদের পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* নিষ্ক্রিয় হয়ে কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ*কে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন এই পর্যায়ে অভিজাত মুসলমানদের কেউই প্রাদেশিক লীগ নেতৃত্বে ফিরে আসার বা তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন চেষ্টাই করেন নি। তার কারণ, সে সময় সর্বভারতীয় *মুসলিম লীগ* জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য সচেষ্ট থাকায়, বাঙলার অভিজাত নেতৃবৃন্দ *মুসলিম লীগ* সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন।[২] কার্যতঃ বাঙলায় মুসলিম লীগ পুনর্জীবিত হয়েছিল ১৯৩৬-এ বাঙলায় বসবাসকারী দুজন অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী মির্জা হাসান ইস্পাহানি এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকীর প্রচেষ্টায়।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট একটু বলা দরকার।

১৯২৯-৩০-র মহামন্দায় বাঙলার কৃষকদের বিরাট অংশের সর্বনাশ হয়েছিল। বিশেষ করে মুসলমান-প্রধান উত্তর বাঙলা ও পূর্ব-বাঙলায় ছোট ছোট জোতের মালিকানা সরাসরি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার মুসলমান কৃষক বিরাট সংখ্যায় তাদের পূর্বেকার রায়তি জোতেই ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছিল। তবে সব কৃষক পরিবারই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা কিন্তু নয়। সংখ্যায় কম হলেও কিছু কৃষক যারা ছিল সম্পন্ন বা অর্ধসম্পন্ন, তারা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল। তাদের নিজেদের জমিতে উৎপন্ন প্রয়োজন-অতিরিক্ত ফসল গোলাজাত করে, নিষ্ফলা ঋতুতে সেগুলি চড়া দরে বিক্রী করে অথবা তাদের অভাগ্যবান প্রতিবেশীদের জমি নিজের কাছে বন্ধক রেখে ফসল ঋণ দিয়ে, পরে ফসল উঠলে সুদশুদ্ধ সেই ঋণ আদায় করে তারা বেশ সম্পন্ন কৃষক-জোতদারে পরিণত হয়েছিল। সেইসঙ্গে মহামন্দার পরবর্তী সময় গ্রামাঞ্চলে খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন শুরু হওয়ায়, তার সুযোগ নিয়ে ঐ সব সম্পন্ন কৃষক-জোতদাররা তাদের জমিদারকে প্রাপ্য খাজনা ও অন্যান্য 'দেয়' থেকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৩] বস্তুত, ত্রিশের দশকের শুরুতেই পূর্ব বাঙলার একটি বিশিষ্ট চিত্র হল, বাঙলার মুসলমান সমাজে যাঁরা ছিলেন নিম্নস্তরে তাঁদের অনেকের সমাজের উচ্চস্তরে উত্তরণ অথবা পুর্বে উচ্চস্তরে ছিলেন এমন অনেকের নিম্নস্তরে অবগমন। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে যে সব কাজ আশরফ বা অভিজাত শ্রেণীর কাজ নয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল, সেই সব কাজ আশরফ শ্রেণীভুক্তদের কারো কারোর করতে বাধ্য হওয়া, তাঁদের সমাজের নিম্নস্তরের দিকে গতিময়তারই পরিচায়ক। বলা যেতে পারে উচ্চ বংশে জন্ম নয়, ইংরেজী শিক্ষা এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যই বিশের দশকের মুসলমান সমাজে কৌলিন্যের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই অভিজাত শ্রেণীব রমরমা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছিল।[৪]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সম্প্রদায়গত চেতনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। পূর্ববাঙলার গ্রামীণ মুসলমানদের একাংশের মধ্যে বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে, অপরদিকে পূর্ববর্তী দুই দশকে পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক শ্রেণীর কৃষকরা সম্পন্ন কৃষকে পরিণত হয়। এদের ঘরে মুসলমান তরুণদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বৈত শাসনকালে সরকারের সমর্থনে মুসলমানদের রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারও মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার কিছুটা প্রসার এবং শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এসবের ফলে পূর্বেকার অভিজাত নেতৃবৃন্দের স্থানে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে তরুণ শিক্ষিত গ্রামীণ মুসলমান নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া, ১৯২৭-'৩৩ সময়কালে

বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ মুসলমান উত্তর ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানে মিশ্র নির্বাচন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫] আইন পরিষদে অভিজাত মুসলমান সদস্যরা কেবলমাত্র সরকারী আনুকূল্য নির্ভর হলেও মূলতঃ অনভিজাত মুসলমান সদস্যদের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য ১৯৩০-এ *বেঙ্গল রুরাল প্রাইমেরী এডুকেশন বিল*, ১৯৩২এ *মানিলেন্ডারস্ বিল*, ১৯৩৩-এ *বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ বিল* আইন পরিষদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে আইন পরিষদের ভিতরে-বাইরে কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী হিন্দু সদস্যদের এবং হিন্দু পত্র-পত্রিকার তীব্র বিরোধিতা, নূতন প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বিশেষ প্রয়োজন— এই বোধ তাঁদের মধ্যে দৃঢ়মূল হতে আরম্ভ করেছিল। এতকাল বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, আইন পরিষদ ইত্যাদিতে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধার সুব্যবস্থা করার ব্যাপারেই ছিলেন সরব। কিন্তু দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারকর্তৃক আর এক দফা সাংবিধানিক সংস্কারের সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে ভোটাধিকার সম্প্রসারণে সরকারী উদ্যোগ ইত্যাদি তাঁদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল।[৬]

এই সময়েই,১৯৩০-এ, ভোটাধিকার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভোটদাতার যোগ্যতার মান হ্রাস করার সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন অভিজাত সদস্য স্যার আবদেল করিম গজনভী ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বতন্ত্র মন্তব্যে লিখেছিলেন 'যারা অন্যূন ১০টাকা সেস্ বা ৫০টাকা রেভেনিউ দিবেন একমাত্র তাঁদেরই ভোটাধিকার দিতে হবে' অন্যদের নয়। তিনি আরও লিখেছিলেন, 'ইতিমধ্যে মুসলমান যুবকদের মধ্যেও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়ে গেছে। যোগ্যতার মান কমিয়ে ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়ালে ছোকরা উকিল, সাংবাদিক, সমাজে যাদের কোন ভিত্তি নেই, তাদের পক্ষে আইনসভায় আসা খুবই সহজ হবে।' গজনভী আসল কথাটি শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করেই বলে ফেলেছিলেন, 'ভোটাধিকার লাভের মান কমিয়ে দেওয়ার পর সমাজের খানদানী এবং প্রতিপত্তিশালী প্রধানদের দুর্দশার আর শেষ থাকবে না। কারণ তরুণরা এবং মোল্লা-মৌলভীদের দল তখন তাঁদের কাউন্সিলে যাওয়া অসম্ভব করে তুলবে।'[৭]

ভোটাধিকার মুলতঃ গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসাবিত হওয়ার ফলে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে বাঙলার শতকরা ১২.৬ জন মুসলমান ভোটাধিকারী হলেন, পূর্বে যেখানে ছিল শতকরা ২জন মুসলমান। ঐ শতকরা ১২.৬ জন মুসলমানের বেশীর ভাগ গ্রাম বাঙলার অধিবাসী হওয়ায়, আসন্ন নির্বাচনে গ্রামবাঙলার মুসলমান ভোটদাতাদের ভোট

পাওয়াই হয়ে দাঁড়াল মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ১১১টিই ছিল গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই অভিজাত-অনভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৩০-র দশকের শুরু থেকেই প্রতিবছর সারা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাসম্মেলন করার মধ্য দিয়ে রায়ত-প্রজাদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত গ্রামীণ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপদানে ১৯১৯-এ প্রতিষ্ঠিত *নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতি* যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিল। যেহেতু *প্রজাসমিতিই* ছিল কৃষক স্বার্থরক্ষার একমাত্র মুসলিম সংগঠন, সেই কারণে শহুরে মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই কৃষক-প্রজাদের ভোট লাভের আশার কৃষক নেতা হিসাবে নিজেদের জাহির করার জন্য *প্রজাসমিতিতে* যোগ দিয়েছিলেন।[৮] ১৯৩৫-এ *প্রজাসমিতির* সভাপতি নির্বাচন, ১৯৩৬-এ সমিতির নাম পরিবর্তন করে *কৃষক-প্রজাসমিতি* করণ এবং কিছু বামপন্থী দাবী সম্বলিত নির্বাচনী ইস্তাহার গ্রহণ— ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সমিতি দ্বিধা-বিভক্ত হয়। সমিতির দক্ষিণপন্থী নেতারা— মৌলনা আক্রাম খাঁ, খান বাহাদুর আবদুর রহিম প্রমুখেরা *প্রজা সমিতির* নামেই তাঁদের কার্যকলাপ চালাতে থাকেন।[৯]

কৃষক-প্রজাসমিতির নেতৃত্বে উত্তর ও পূর্ব বাঙলার মুসলমান কৃষক ও প্রজারা এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মুসলমানরা সংগঠিত হতে থাকায় অভিজাত মুসলমানরা আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের সাফল্য লাভ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মুসলিম ঐক্যের ধুয়া তুলে তাঁরা কলকাতার কয়েকজন তরুণ অবাঙালী ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টী* গঠন করেন।[১০] বাঙলার প্রায় সব অভিজাত ও উচ্চবিত্ত মুসলমান নেতারা ঐ দলে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ দলের সভাপতি হন ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ, সহ-সভাপতি জলপাইগুড়ি চা-বাগিচা মালিক ও জমিদার নবাব মোসারফ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হোসেন শহীদ সুরাবর্দি। গ্রাম বাঙলার নূতন ভোটদাতাদের ভোট পাওয়ার আশায় *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীর* নেতারা ঘোষণা করেন কৃষক-মজদুরদের অবস্থার উন্নতি সাধনই তাঁদের দলের লক্ষ্য, যদিও ঐ দলের প্রতিষ্ঠার সময় ঘোষণা করা হয়েছিল মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য। কিছুকাল ইতস্ততঃ করার পর *প্রজাসমিতির* অবলুপ্তি ঘটিয়ে মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ *প্রজাসমিতির* দক্ষিণ পন্থী নেতারা শেষ পর্যন্ত 'নাইট-নবাব-খাজা'দের ঐ দলে ঢুকে পড়েন।

কৃষক-প্রজাসমিতিতে ভাঙ্গন ধরাতে না পেরে *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীর* নেতারা *কৃষক-প্রজাসমিতির* সঙ্গে এক সমঝোতা বৈঠকে বসেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হবার পর সে দলের নেতা কে হবেন— এই প্রশ্নে ঐ বৈঠক ভেস্তে যায়। কারণ অভিজাত নেতৃবৃন্দ জানতেন আসন্ন নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যময়। এই প্রথমবার স্বদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে আইনসভা গঠিত হবে, এবং তাঁদেরই সংখ্যাধিক্যের মনোনয়নে মন্ত্রীরা

রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। ভোটাধিকারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিও ছিল। সংখ্যাধিক্য থাকায় বাঙলায় মুসলমানরাই কর্তৃত্ব করবেন এবং তাঁদেরই নির্বাচিত সদস্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্য পরিচালনা করবেন।[১১] এই তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই অভিজাতরা কিছুতেই অনভিজাত কৃষক-প্রজা নেতা ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বভাবতই অভিজাত ও অনভিজাত এই দুই দলের মধ্যে রেষারেষি চরমে উঠে।[১২]

৩

ইতিমধ্যে মহম্মদ আলী জিন্না *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের সর্বভারতীয় সংসদীয় বোর্ড গঠনের সভায় যোগদানকারী কলকাতার বসবাসকারী দুজন অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী মির্জা হাসান ইস্পাহানি এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকীকে জিন্না বাঙলায় *মুসলীম লীগকে* পুনর্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১৩] এঁদের আমন্ত্রণে জিন্না কলকাতায় আসেন বিবদমান ঐ দুই দলের বিরোধে মধ্যস্থতা করে তাদের *মুসলিম লীগের* পতাকাতলে সমবেত করতে।[১৪] *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীর* নেতৃত্ব *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* অংশ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা অবলুপ্তি ঘটিয়ে মুসলিম লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন।[১৫] হাসান ইস্পাহানির দেওয়া তথ্য অনুসারে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* সংসদীয় বোর্ডে জিন্না *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীর* আটজন নেতাকে— খাজা হবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা সাহাবুদ্দীন, হোসেন শহীদ সুরাবর্দি, মৌলানা আক্রাম খাঁ, আবদুল্লা এল.বাকী, স্যাব এ. এফ. রহমান এবং তজিমুদ্দীন খাঁ— মনোনীত করেন। তাছাড়া, জিন্না মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি, মির্জা হাসান ইস্পাহানি, কে.নুরুদ্দীন, এ. আর. সিদ্দিকী, আবুল আজিজ আনসারী, আবদুল্লা গাঙ্গী এবং সেকেন্দার দেহল্‌ভী— এই সাতজন কলকাতা বসবাসকারী অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীকেও *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* সংসদীয় বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেন। ঐ অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীরা তখন কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ঢোকবার চেষ্টা করছেন এবং খানিকটা সফলও হয়েছেন। নবাগত এই অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীরা বাঙলার ব্যবসা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় অবাঙালী কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের প্রতি বাঙলার *মুসলিম লীগের* যে অংশ অনুগত ছিলেন তাঁদেরই উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। তাঁদেরকেই ঐ অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীরা অর্থ-সামর্থ দিয়ে সমর্থন কববেন— মনে হয় এটাই জিন্না আশা করেছিলেন। এদের প্রতিনিধিস্থানীয়দের প্রাদেশিক লীগের সংসদীয় বোর্ডে মনোনীত করার মধ্য দিয়ে জিন্নার ধনিক প্রীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জিন্না *কৃষক-প্রজাসমিতি* থেকে ফজলুল হক, নৌশের আলী, হাসান আলী বোগরা, সৈয়দ বদরুদ্দা এবং এবং সামসুদ্দীন আহমেদ— মাত্র এই পাঁচজনকে সংসদীয় বোর্ডে গ্রহণ করেন। এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে *প্রাদেশিক*

মুসলিম লীগ সংসদীয় বোর্ডে খানদানী অভিজাত এবং অবাঙালী ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী নেতাদের প্রাধান্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংসদীয় বোর্ডের কর্মকর্তা নির্বাচন ও নির্বাচনী ইস্তাহার প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আহুত সভায় *কৃষক-প্রজাসমিতির* কর্মসূচী, বিশেষ করে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ এবং কোন প্রকার সেস্ আদায় না করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের দাবী প্রাদেশিক লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত করাতে ব্যর্থ হলে *কৃষক প্রজাসমিতির* সঙ্গে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিছু কাল পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে দেওয়া বক্তৃতায় ফজলুল হক ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার জন্য কলকাতায় বসবাসকারী অবাঙালী ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীদের দায়ী করেন। তাঁর মতে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগের সংসদীয় বোর্ডের জিন্না মনোনীত সদস্যরা সকলেই কলকাতার অবাঙালী ধনী ব্যবসায়ী। আর পূর্বতন *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির* থেকে যাঁদের সংসদীয় বোর্ডে নেওয়া হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি, যাঁর মধ্যে তিন জন হচ্ছেন ঢাকার নবাব পরিবারের। বাঙলার ভবিষ্যত অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে তিনি দেবেন না বলে ঐ সভায় ঘোষণা করেছিলেন।[১৭]

জিন্নার উদ্যোগে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* সংসদীয় বোর্ড যে ভাবে গঠিত হয়েছিল তাতে নিসন্দেহে বলা যায় জিন্না প্রাদেশিক লীগকে বাঙলার খানদানী অভিজাত পরিবার এবং শহুরে অবাঙালী ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন।[১৮] আসলে জিন্না চেয়েছিলেন তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে এমন এক প্রাদেশিক লীগ গঠন করতে। ফজলুল হক ছিলেন প্রকৃত অর্থে বাঙলার তৃণমূল মুসলমান নেতা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি জিন্নাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন— এই ভয় ও সন্দেহ জিন্নার ছিল। অপরদিকে *বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির* নেতাদের বেশীর ভাগের পায়ের তলায় মাটি না থাকায়, তাঁরা জিন্নার উপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা *মুসলিম লীগে* যোগ দিয়ে জিন্নার মতো সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাকে খুঁটি হিসেবে চেয়েছিলেন— পেয়েও ছিলেন। এরফলে ১৯৩৭-র নির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের সম্মুখীন হয়েছিলেন একদিকে খানদানী অভিজাত ও অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী নেতাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্প্রদায়িকতা সম্বল *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ,* অপরদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত *কৃষক-প্রজাসমিতি* যাতে যোগ দিয়েছিলেন অনেক খ্যাত অখ্যাত পল্লী বাঙলার নবীন ও প্রধান উকিল, মোক্তার, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা।[১৯]

১৯৩৭র নির্বাচনে ঢাকা নবাবদের শক্ত ঘাঁটি পটুয়াখালীতে *মুসলিম লীগ* নেতা তথা হবু মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের চরম পরাজয়ে মুষড়ে পড়েছিলেন কলকাতার অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তখনকার সরকারী ইউরোপীয় আমলারা এবং

তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত চটকলের সাহেবরা। শেষোক্তদের মর্মাহত হবার একটা বড় কারণ ছিল। এতকাল তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত জাঁদরেল আমলারাই আসলে বাঙলা শাসন করে আসছিলেন। সে অবস্থার যখন ছেদ পড়ল, তখন স্বভাবতই বিকল্প সন্ধানে তাঁদের চোখ পড়েছিল ইংরেজ বশংবদ খাজা নাজিমুদ্দীনের উপর। সুতরাং নাজিমুদ্দীনের পরাজয় তাঁদের কাছে শেল হিসাবেই দেখা দিয়েছিল।

৪

নির্বাচনের পর বাঙলার প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাৎক্ষণিক সরকারী কর্মসূচী বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা কোয়ালিশন সরকার গড়ে ওঠা সম্ভব না হওয়াতে অবাঙালী মুসলিম ব্যবসায়ী মহল ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহল কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাঙলায় কৃষক-প্রজা-লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় (১লা এপ্রিল, ১৯৩৭)। কিন্তু ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় *মুসলিম লীগ* মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র শহীদ সুরাবর্দি ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন জমিদার।[২০] ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় *কৃষক-প্রজা সমিতির* সম্পাদক সামসুদ্দীন আহমদ বাদ পড়ায় এবং তাঁর জায়গায় জলপাইগুড়ি চা-বাগিচা মালিক ও জমিদার মোসারফ হোসেনের অন্তর্ভুক্তি, ১৯৩৭-র অক্টোবরে ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদান এবং *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* সভাপতি পদ গ্রহণ এবং ১৯৩৮-র জুনে কৃষক-প্রজা নেতা নৌশের আলিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন ইত্যাদি ঘটনায় ফজলুল মন্ত্রিসভা কার্যতঃ অভিজাতদের দ্বারা সমর্থিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়।[২১]

উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৩৭র অক্টোবরে ফজলুল হক প্রাদেশিক লীগের সভাপতি হলেও প্রাদেশিক লীগ কার্যতঃ ছিল জিন্না-অনুগামী অভিজাত ও অবাঙালী মুসলমান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ দখলে। প্রাদেশিক লীগের তালিকা থেকে তা স্পষ্ট। ঐ সময় প্রাদেশিক লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ, দৈনিক আজাদ পত্রিকার মালিক-সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ, বিশিষ্ট অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী এবং চটকল মালিক মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি এবং স্যার হাজি আদমজী দাউদ, তাছাড়া ছিলেন রাগুল আমিন। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মির্জা হাসান ইস্পাহানি, সাধারণ সম্পাদক হোসেন শহীদ সুরাবর্দি।'[২২] মফঃস্বল বাঙলায় ফজলুল হক বাঙালী মুসলমানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা হওয়ায় সুরাবর্দি তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য জিন্নার বিশ্বস্ত অনুগামী নাজিমুদ্দীন-ইস্পাহানি চক্রে যোগ দিয়েছিলেন।

নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ফজলুল হকের সংঘাত শুরু থেকেই দেখা দেয়। ঐ সময়ে প্রায় ২৭০০ বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু তরুণ ছিলেন কারা প্রাচীরের অন্তরালে। নূতন আইনসভার অধিবেশন শুরু হতে না হতেই 'আন্দামান-বন্দীরা' অনশন শুরু করে রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অতীতের

অভিজ্ঞতায় ঐ দাবীর ব্যাপকতা ও ইউরোপীয় সদস্যদের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বাঙলার নূতন মন্ত্রিসভায় ঐ ইস্যুতে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি তাঁর অভিজাতসুলভ রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আইনসভায় বলেছিলেন, 'এদের নিয়ে এত মাথা ব্যথা করলে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো আর গো-হত্যার দরুণ যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা অথবা ধর্ম অথবা প্রফেটকে নিয়ে লেখালেখিতে যে সব লোক দণ্ড পায়, তাদের দাবীও মানতে হবে।' অপরদিকে ঐ একই ইস্যুতে ফজলুল হক বস্তুত নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই বিরোধী পক্ষের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ব্যক্তি স্বাধীনতা যাতেই ক্ষুণ্ণ হয় তা নিন্দনীয়। এক মুহূর্তের জন্যও ভাববেন না আপনারা যারা বিরোধী-আসনে বসে আছেন তাঁদের বিপরীত দিকে বসে আছি বলে আমরা আমাদের জাতি পরিবর্তন করেছি। একশ বছরের শাসন-ব্যবস্থাকে রাতারাতি পাল্টানো যায় না। আমি ইতিমধ্যে নিজদায়িত্বে কয়েকজনের মুক্তির আদেশ দিয়েছি।...... আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আশা করি সেই সময় দ্রুত আসছে যখন আমাদের কার্যকলাপকে আপনারা সন্দেহের চোখে না দেখে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের, দেশবাসীদের, আপনাদের ভাইদেব কার্যকলাপ হিসাবে দেখবেন। আমি বিশ্বাস করি, যদিও এই মুহূর্তে আমরা সরকার ও বিরোধী পক্ষে বিভক্ত, আমরা এবং আপনারা — সকলেই মহান বাঙালী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি এবং ডেটিনিউদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি হিন্দু সম্প্রদায়ের ডেটিনিউরা আমার নিজসম্প্রদায়ের তরুণদের মতই সমান প্রিয়ও স্নেহধন্য।[২২] ফজলুল হকের এই বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট যে তিনি রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের মুক্তি দানে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন রাজনৈতিক বন্দীদের অন্য কোন বন্দীদের থেকে পৃথক যে বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার করতেন না। বস্তুতঃ এঁদের এবং এঁদের দোসর ইউরোপীয় সদস্যদের বাধাদানের ফলে সেদিন রাজবন্দীদের জেল-ডেলিভারী দেওয়া সম্ভব হয় নি ফজলুল হকের পক্ষে।

প্রাদেশিক লীগের ভিতরে, আইনসভায় এবং মন্ত্রিসভায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের চাপে ফজলুল হক জনসাধারণের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ফলে *কৃষক-প্রজাসমিতির* সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্ক ক্রমশয়ই তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর মন্ত্রিসভায় বিরুদ্ধে আনীত *কৃষক-প্রজা* ও *কংগ্রেসের* অনাস্থা প্রস্তাব আইনসভায় শেষপর্যন্ত গৃহীত না হলেও হক মন্ত্রিসভা এবার কিছু জনপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। যেমন ১৯৩৮ সালের মধ্যেই ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করা হয়, ১৯৩৯ সালের মধ্যে *কৃষক প্রজা* দলের দাবী অনুযায়ী প্রজাসত্ত্ব আইন গৃহীত হয়। *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* দাবিমত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধন করে কলকাতা করপোরেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪০ সালের মধ্যে মহাজনী আইন, প্রাথমিক শিক্ষা বিল মোতাবেক স্কুল বোর্ড গঠন, আইন সভায়

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনয়ন ইত্যাদি আইন করে এবং করতে চেয়ে শুধু বাঙলার নয়, বাঙলার বাইরেও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কেবল ফজলুল হকই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন তাই নয়, বাঙলার মুসলিম জনমত প্রায় সম্পূর্ণভাবে *মুসলিম লীগের* পক্ষে চলে গেল।[২৩]

এর উপর ১৯৪০-র ২৩শে মার্চ *মুসলিম লীগের* লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হওয়ায় বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান দাবী ও *মুসলিম লীগের* জনপ্রিয়তা দুই বৃদ্ধি পায়।[২৪] সেই সুযোগে জিন্না-অনুগামী অভিজাত ও অবাঙালী মুসলমান শিল্পপতি ব্যবসায়ী নেতারা ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে *মুসলিম লীগকে* সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। অপরদিকে *মুসলিম লীগের* সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে জিন্না, বাঙলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্যকে সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস ও ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও ভবিষ্যতে ফজলুল হককে *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করতে পারে, এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েন। ফজলুল হকও অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারেন জিন্না পাকিস্তান প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা এবং পাকিস্তান আন্দোলনের যে ধারা প্রচলন করেছেন তা ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক। তার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের ঘোরতর অনিষ্ট হবে। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন বাঙালী মুসলমানের স্বার্থ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব জিন্না স্বীকার করেন না। বাঙলার মুসলমানদের স্বার্থকে সর্বভারতীয় মুসলিম স্বার্থের মাপকাঠি দিয়েই তিনি বিচার করেন এবং ভবিষ্যতে করবেন। বস্তুতঃ বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ফজলুল হক ১৯৪০ সাল পর্যন্ত *মুসলিম লীগকে* সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নামে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন করার সুযোগ নিয়ে অবাঙালী মুসলমান নেতারা বাঙলাকে হাতিয়ার করে অন্যান্য প্রদেশে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে ব্যস্ত, বাঙ্লার সর্বনাশ হলেও তাঁদের কিছু যায় আসে না, তখন থেকেই মুসলিম লীগ বাঙলাকে কোথায় নিয়ে চলেছে সে বিষয়ে ফজলুল হকের সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতেই, যুদ্ধজনিত বিশেষ অবস্থায় ভারত সরকারের জাতীয় সমরপরিষদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ফজলুল হকের পদত্যাগে অস্বীকৃতি (১০ই জুন, ১৯৪১) উপলক্ষ্যে জিন্না-হক বিরোধ প্রকাশ্যে আসে। *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* ওয়ার্কিং কমিটি ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ করে দশদিনের মধ্যে তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন (২৫শে অগাষ্ট, ১৯৪১)।[২৫] কিছু কাল পরে পদত্যাগ করলেও *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* সাধারণ সম্পাদক লিয়াকৎ আলি খানকে লিখিত পত্রে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১), ফজলুল হক ঐ পদত্যাগের নির্দেশের ভুলত্রুটি দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ওয়ার্কিং কমিটির নিন্দাপ্রস্তাবের

তীব্র সমালোচনা করেন ও প্রতিবাদ করেন। উষ্মার সঙ্গে তিনি জানান, "যদিও আমরা (বাঙলার মুসলমানরা) সমগ্র ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, আমার মনে হয় বাঙলার বাইরের লীগ রাজনৈতিক নেতাদের কর্তব্যের মধ্যে বাঙলা খুব একটা পড়ে না।"[২৬] *মুসলিম লীগ* সভাপতির হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদে ফজলুল হক *সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের* ওয়ার্কিং কমিটি ও লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করার কথাও ঐ পত্রে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪১-র ১৮ই অক্টোবর খোলা চিঠির আকারে ফজলুল হকের এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ঐ বিবৃতিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে *মুসলিম লীগে* ব্যক্তি বিশেষের ডিক্টেটরী চলতে থাকলে মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে বাঙলার যে মর্যাদা ও প্রভাব আছে তা আর থাকবে না। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন 'এভাবে *মুসলিম লীগ* পরিচালিত হলে পশ্চিমা রাজনীতিবিদের ইচ্ছামত মুসলিম বাঙলার ভাগ্য নির্ধারিত ও পরিচালিত হবে। সে অবস্থায় আসাম পূর্ব-পাকিস্তানের অংশ তো হবেই না বরং বাঙলাও বিভক্ত হবে।'[২৭] *মুসলিম লীগের* পশ্চিমা রাজনীতিবিদ্‌দের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ ছিল বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের হয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্ব ফজলুল হককে লীগ থেকে বহিষ্কার করতে আর বিলম্ব করেন নি।

ফজলুল হকের *মুসলিম লীগ* থেকে পদত্যাগের পর থেকে আইন সভার ইউরোপীয় সদস্যরা এবং গর্ভনর হারবার্ট স্বয়ং ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বাঙলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফজলুল হক আইনসভায় তাঁর অনুগামী কৃষক-প্রজা, সুভাষপন্থী *কংগ্রেস* এবং *হিন্দু মহাসভার* সদস্যদের নিয়ে *প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন* দল গঠন করেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১), সুমিত সরকার যেমন মন্তব্য করেছেন, "এক অভাবনীয় মোর্চা"[২৮] গঠন করে *মুসলিম লীগ* মন্ত্রিসভা স্থাপনের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

প্রাদেশিক লীগ নেতৃত্ব এরপর বাঙলায় লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং নূতন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা বিরোধী প্রচার অভিযান সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময় জিন্নাও বাঙলায় কেন্দ্রীয় লীগের হৃতগৌরব ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রথমতঃ নাজিমুদ্দীন এবং ঢাকার নবাব পরিবার, দ্বিতীয়তঃ হোসেন শহীদ সুরাবর্দির সাংগঠনিক ক্ষমতা ও তার সঙ্গে কলকাতায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি[২৯] এবং তৃতীয়তঃ বাঙলা লীগে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুগামী ইস্পাহানি ভ্রাতৃদ্বয়ের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করেছিলেন। স্বভাবতই তিনি সহজেই বাঙলার লীগ সংসদীয় দলকে তার কুক্ষিগত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী ইস্পাহানি ভ্রাতৃদ্বয় এবং নুরুদ্দীন, সাহাবুদ্দীনদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ঐ সময় লীগ থেকে বহিষ্কৃত ফজলুল হকের জায়গায় মৌলানা আক্রাম খাঁকে প্রাদেশিক লীগের সভাপতি করা হয়।[৩০]

ফজলুল হক-বিরোধী প্রচার অভিযানে হাসান ইস্পাহানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রকার অভিযান চালানোর জন্য এবং কলকাতার বাইরে মফস্বল বাঙলায় *মুসলিম লীগকে* সম্প্রসারিত করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার ব্যবস্থাও হাসান ইস্পাহানির জ্যেষ্ঠভ্রাতা মির্জা আহমদ ইস্পাহানি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪১-র ১৪ই ডিসেম্বর জিন্নাকে নাজিমুদ্দীন লিখেছিলেন: "আমাদের ভবিষ্যৎ সফলতা নির্ভর করছে সংগঠিত হওয়ার দক্ষতার উপর। কিন্তু তা সম্ভব হবে না অর্থ ছাড়া। ইস্পাহানি ভ্রাতৃদ্বয় দুজনই লীগপন্থী এবং তাঁরাই আমাদের প্রধান এবং বোধ হয় একমাত্র আশাভরসা। বাঙলায় *মুসলিম লীগকে* সংগঠিত করার জন্য ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি নিয়েছেন। তাঁর আশা ঐ পরিমাণ টাকা তিনি কলকাতার মুসলিম ব্যবসায়ী সমাজ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা ঐ টাকার সবটাই শেষপর্যন্ত তাঁকেই দিতে হবে।"[৩২] ঐ সময়ে *মুসলিম লীগের* অর্থ সংগ্রহের উৎস যে সাধারণ মুসলমানরা ছিলেন না, মুসলমান ব্যবসায়ী সমাজই যে ছিল মুসলিম লীগের ভরসা— এই চিঠি থেকে তা স্পষ্ট।

মুসলিম লীগের ফজলুল হক-বিরোধী প্রচার অভিযানে মুসলমান ছাত্রদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন শহীদ সুরাবর্দি। ঐ প্রচার অভিযান যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। তার ফলে *প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন* মন্ত্রিসভা এবং ব্যক্তিগত ভাবে ফজলুল হক স্বয়ং বাঙলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। আবুল হাশেম বলেছেন 'শের-ই-বাঙ্গালা' শেষ পর্যন্ত 'গদ্দার-ই-বাঙ্গলায়' পরিণত হন।[৩৩]

ফজলুল হকের ঐ 'অভাবনীয় মন্ত্রিসভা'র কি ছিল উদ্দেশ্য? আবুল মনসুর আহমেদ বলেছেন, 'ফজলুল হক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পশ্চিমী মুসলমান রাজনীতিবিদরা বাঙলার রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা এবং অন্যায় অবিচার করেছেন। আর হিন্দু-মুসলিম মাড়ওয়াড়ীরা বাঙলার অর্থনীতিতে চেপে বসেছে। এই দুই রাহুর কবল থেকে বাঙলাকে মুক্ত করাই ছিল হক সাহেবের নূতন মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য।[৩৪]

কিন্তু ফজলুল হকের ঐ নূতন মন্ত্রিসভা একবছর চার মাসেরও বেশী সময় ক্ষমতায় থাকলেও ঐ সময় তিনি বাঙলার মুসলমানদের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য কিছু করে উঠতে পারেন নি। বলা যায় মন্ত্রিসভাকে টিকিয়ে রাখতেই তাঁর বেশীরভাগ সময় ও ক্ষমতা ব্যয়িত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরিণামে মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী কয়েকটি অদূরদর্শী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, আইনসভার বিবেচনাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল স্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা, সিরাজগঞ্জে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে জিন্না কলকাতায় এসে পৌঁছালে তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারি এবং পরে প্রচন্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া (যা হক মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তাকেই হ্রাস করতে সাহায্য করেছিল) সর্বোপরি ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে মৈমনসিং জেলার কিশোরগঞ্জের জামে মসজিদের ভিতর পুলিশের গুলি চালানোর মত মারাত্মক ঘটনায়

নয়া হক মন্ত্রিসভার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করতে অস্বীকার করা ইত্যাদি। বিশেষ করে শেষোক্ত ঘটনায় শুধু মৈমনসিং জেলায় নয়, সারা বাঙলায় মুসলিম জনমত *প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন* মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চলে যায়।[৩৫] ক্রমে মুসলিম ব্যবসায়ী সমাজ এবং কলকারখানার মালিকরাও প্রায় সকলেই মন্ত্রিসভা-বিরোধী হয়ে উঠেন। মুসলিম ব্যবসায়ী এবং কলকারখানার মালিকরা , যারা তাদের চেয়েও ব্যবসা -বাণিজ্যে ও কলকারখানা পরিচালনার প্রতিযোগিতায় তুলনামূলক ভাবে অভিজ্ঞ হিন্দু ব্যবসায়ী ও হিন্দু কলকারখানা-মালিকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিলেন না, তারা মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে *প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন* সরকারের বিরুদ্ধে এবং *মুসলিম লীগ* ও পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলেন। মুসলিম সরকারী আমলারাও ঐ মন্ত্রিসভা-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন একমাত্র পাকিস্তান হলেই তাঁদের পদোন্নতি হবে, ঐক্যবদ্ধ ভারতে তার সম্ভাবনা খুবই কম, যেহেতু হিন্দু আমলারা বেশীর ভাগই কেবল তাঁদের চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নন, তাঁরা চাকুরীতেও তাঁদের চেয়েও সিনিয়র অর্থাৎ চাকুরীতে আগে যোগ দিয়েছেন।[৩৬]

এই প্রেক্ষিতে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে অর্থের ব্যবস্থাও হয়। এ ব্যাপারে ইস্পাহানিরা যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন জিন্নাকে লেখা হাসান ইস্পাহানির চিঠি থেকেই তা স্পষ্ট। ইস্পাহানি লিখছেন, 'ভোটের দাম এখন হাজার টাকা চলছে। আমরা আইনসভায় দিনদিন প্রবলতর হচ্ছি।'[৩৭] এরপর ২রা এপ্রিল (১৯৪৩) তিনি জিন্নাকে জানাচ্ছেন : 'নানা লোভ দেখিয়ে পনেরোজন cursed rascals কে পক্ষে আনা গেছে।'[৩৮] বোঝা যাচ্ছে তাঁর বিশ্বস্তদের এই ধরণের অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক কাজে জিন্নার পূর্ণ সমর্থন ছিল। শেষপর্যন্ত গভর্নরের সাহায্যে ফজলুল হককে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের অজুহাত দেখিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তারপর দলত্যাগী ঐ সদস্যদের সঙ্গে ইউরোপীয় ও তপশিলী সদস্যদের সমর্থন সংগ্রহ করে এবং মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিদের সংখ্যা পূর্ব মন্ত্রিসভার চেয়ে বাড়িয়ে এবং ১৬জন নূতন সংসদীয় সচিবের পদ সৃষ্টি করে নাজিমুদ্দীন আইনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়ে *মুসলিম লীগ* মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[৩৯] ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে খানদানী অভিজাতরাই হলেন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার প্রধান স্তম্ভ। যদিও এই মন্ত্রিসভায় শহীদ সুরাবর্দি মন্ত্রী হলেন, নাজিমুদ্দীনের পার্শ্বচরেরা—সাহাবুদ্দীন, নুরুদ্দীন প্রমুখেরাই প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকলেন। ফলে সুরাবর্দি-নাজিমুদ্দীন বিরোধ বেশ জমে উঠে। অবস্থা এমন হয় যে হাসান ইস্পাহানি জিন্নাকে কলকাতায় এসে ঐ বিরোধ হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করলেন, তা না হলে ইস্পাহানির আশঙ্কা হয়েছিল যে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা 'তাসের ঘরের মত' ভেঙ্গে পড়বে।[৪০]

ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থন বজায় থাকা সত্ত্বেও নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা আইনসভায় এবং প্রশাসন পরিচালনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেন

নি। কারণ তাঁর ইউরোপীয় আমলাদের নাজিমুদ্দীন কোন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি বরং তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার উপর ঐ মন্ত্রিসভার আমলেই ১৯৪৩এর অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় মন্ত্রিসভার সমস্ত কর্মক্ষমতা ব্যয়িত হয়েছিল।[৪১] দুর্ভিক্ষের সময় চাল সংগ্রহ এবং তার সংরক্ষণের একচেটিয়া আধিকার লাভ করেছিলেন এম. এ. ইস্পাহানি ফার্ম।[৪২] খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুরাবর্দি ইস্পাহানিদের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে ইস্পাহানিরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন। কামরুদ্দীন আহমেদ লিখছেন এরফলে সুরাবর্দির রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়। কারণ, জিন্নার বিশ্বস্ত অনুগামী হাসান ইস্পাহানি সুরাবর্দির বিরুদ্ধে জিন্নার কান ভারী করতে কসুর করেন নি।[৪৩] সুরাবর্দির প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্গে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* উপর যাতে দুর্ভিক্ষের দায় না পড়ে, সেই কারণে জিন্না নির্দেশ দেন লীগের কার্য-নির্বাহিক কেউই সরকারের কোন পদে থাকতে পারবেন না।[৪৪] সুরাবর্দি প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে মন্ত্রিপদ আঁকড়ে থাকলেন। লীগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহিক হিসাবে সুরাবর্দির অনুপস্থিতির সুযোগ নাজিমুদ্দীন *প্রাদেশিক লীগ* সংগঠন দখল করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এ সবের ফলে সুরাবর্দি নাজিমুদ্দীন উপদল দুটির কলহে *প্রাদেশিক লীগ* বিদীর্ণ হতে থাকে। ১৯৪৩এর নভেম্বরে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* বার্ষিক সম্মেলনে খাজাদের মনোনীত প্রার্থী সাতক্ষীরার আবুল কাশেমকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সুরাবর্দি-আত্মীয় বর্ধমানের আবুল হাশেম (যিনি এতকাল *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৪৫] ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী যাঁদের নাজিমুদ্দীনের "অবাঙালী রসদদার" বলেছেন, সেই হাজি আদমজী দাউদ এবং মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি— কেউই *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* সহ-সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন নি। হাসান ইস্পাহানি অবশ্য তাঁর কোষাধ্যক্ষের পদ দখলে রাখেন। সুরাবর্দি অনুগামীরা প্রত্যেকটি সহ সম্পাদকের পদ দখল করেন। এমন কি সর্বভারতীয় লীগ কাউন্সিলের ১০০ জন বাঙলার প্রতিনিধি যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাও ছিলেন কোন না কোন ভাবে সুরাবর্দির অনুগ্রহভাজন।[৪৬]

মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হকের পদত্যাগ ও বহিষ্কার এবং পরবর্তীকালে তাঁর *প্রগেসিভ কোয়ালিশন* মন্ত্রিসভার অপসারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের পক্ষে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ বেশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই তাঁদের অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। তাঁরা খানদানী অভিজাত ও অবাঙালী ধনী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে* উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৪৩এর নভেম্বরে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* বার্ষিক সম্মেলনে সাংগঠনিক নির্বাচনী ফলাফলে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর আবুল হাশেমের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে *মুসলিম লীগের* তীব্র সমালোচনা করে সেদিন আবুল হাশেম *প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে* একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলে

পরিণত করার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করেন।[৪৭] ১৯৪৪এর ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে আবুল হাশেম আহ্‌শান মঞ্জিল অর্থাৎ ঢাকার নবাব পরিবার, শক্তিশালী বাঙলা মুসলিম দৈনিক *আজাদের* মালিক-সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ এবং বাঙলার মুসলিম লীগের আর্থিক খুঁটি ইস্পাহানিদের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ঐ সভায় ছাত্রদের তিনি সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের আহ্বান জানান।[৪৮]

এতকাল *মুসলিম লীগের* আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বলতে অভিজাত মুসলমান নেতাদের গোপন চক্রান্তকেই বোঝাতো। আবুল হাশেমের ঘোষণায় এতকালের প্রায় এক তরফা 'নবাবী-আক্রামখানী' রাজনীতি এবং কলকাতা ভিত্তিক ইস্পাহানি-মার্কা 'অবাঙালী ব্যবসাদারী'[৪৯] কর্তৃত্ব এখন থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন নয়, সামাজিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্যও তিনি লীগ সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন এবং তা কার্যকরীও করেছিলেন। এর আগে বাঙলার কোন জেলাতেই *মুসলিম লীগের* অফিস ছিল না। সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর তিনি জেলা সদর ও সদর মহকুমায় মুসলিম লীগের পার্টি অফিস খোলার ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের পার্টি কর্মীরা পার্টির কাজে সদরে এসে যাতে থাকার ব্যবস্থা পেতে পারে সেজন্য জেলা ও মহকুমার লীগ নেতাদের 'পার্টি-হাউস' স্থাপন করার নির্দেশ দেন। যে সব জেলা ও মহকুমায় এই সব নির্দেশ সঠিক ভাবে পালন করা হবেনা সেই সব জেলা ও মহকুমা *মুসলিম লীগকে* প্রাদেশিক লীগের স্বীকৃতি দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়।[৫০] পূর্ববাঙলার জেলাগুলিতে *মুসলিম লীগকে* সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে হাশেম ঢাকা শহরে প্রাদেশিক লীগের একটি পৃথক দপ্তরও খোলেন।[৫১] ঢাকায় প্রাদেশিক লীগের ঐ দপ্তরে চারজন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মীকে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। এঁদের উদ্যোগে ঢাকা থেকে *'হুঁশিয়ার'* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও ঐ পত্রিকায় ইসলামের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হত।[৫২] কামরুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, ১৯৪৪এর অগাস্টের মধ্যেই *বাঙলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* দু'আনার দশ লক্ষ সভ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল।[৫৩] আবুল হাশেম অবশ্য ৫ লক্ষ সভ্য সংগৃহীত হয়েছিল বলে লিখেছেন।[৫৪] হাশেমের সাংগঠনিক গুণে ১৯৪৪-র ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকা নবাবদের খাস ঘাঁটী আহ্‌শান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত ঢাকা জিলা ও শহর *মুসলিম লীগের* দলীয় নির্বাচনে খাজাদের হম্বিতম্বি সত্ত্বেও নবাব পরিবারের হাত ছাড়া হয়ে যায়। যতদিনে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* পরবর্তী বার্ষিক নির্বাচন হয়েছিল, ততদিনে মফঃস্বল বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে *মুসলিম লীগের* প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের লোকজনেরা যথেষ্ট পর্যুদস্ত হয়েছিল। প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন তরুণ।[৫৫]

বস্তুত, বাঙলার মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বার্ষিক অধিবেশনের আগেই আদর্শের দিক থেকে লীগ স্পষ্টতঃ বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আক্রাম খান-নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীরা হাশেম ও তাঁর অনুগামীদের কমিউনিস্টপন্থী বলে আক্রমণ করেছিলেন।[৫৭] তবে এটা ঠিক যে হাশেমের অনুগামী বামপন্থী লীগ কর্মীদের অনেকেই *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির* সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে সহমতে এসেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, জিন্না-রাজাগোপালাচারী এবং পরে গান্ধী-জিন্না কথাবার্তার সফলতা কামনায় জনমত সৃষ্টিতে তাঁরা *কমিউনিস্ট পার্টির* সঙ্গে একত্রে সভা মিছিল করেছিলেন। *কমিউনিস্ট পার্টি* পাকিস্তান আন্দোলনকে জাতীয় সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্থাপনের আন্দোলন বলে মনে করে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৫৮] *কমিউনিস্ট পার্টির* সমর্থনের ফলে বাঙলায় পাকিস্তান আন্দোলন কতটা শক্তিশালী হয়েছিল, তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ থাকলেও শিক্ষিত তরুণ বাঙালী মুসলমানরা *কমিউনিস্ট পার্টির* সমর্থন পাওয়ায় সেদিন যে তাঁরা উদীপ্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাদেশিক লীগের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* কাউন্সিলের ১৯৪৪-এর ১৭ই নভেম্বরের অধিবেশনে। খাজা-নবাবরা অর্থাৎ অভিজাত ও অবাঙালী নেতারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন হাশেমকে দলীয় নির্বাচনে পরাজিত করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে শেষ করতে। সুরাবর্দিও ঐ সময় মনে করেছিলেন হাশেম-অনুরাগীদের জয় হলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর নিজেরই বিপদ ঘটতে পারে অতএব তিনিও হাশেম-বিরোধী ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ সুরাবর্দি কোনদিনই কোন আদর্শবাদের ধার ধারতেন না। খাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে তিনি মানসিকভাবে কোনদিনই প্রস্তুত ছিলেন না। আবার ক্ষমতার রাজনীতি তাঁকে নাজিমুদ্দীনের বিরোধিতা করতে এবং মুসলিম লীগের বামপন্থীদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে বাধ্য করত। স্বভাবতই তিনি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদেব মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতেন এবং ক্ষমতার লোভে যে কোন সময়েই যে কোন দিকে যোগ দিতে পারতেন।[৫৯] লীগ কাউন্সিলের ঐ নির্বাচনে হাশেম কিন্তু বিপুল ভোটে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন, সাংগঠনিক প্রভাব তাঁর এতই বেশী ছিল।[৬০] বস্তুতঃ এই সাংগঠনিক জয় ছিল হাশেম-সমর্থক বিপুল তরুণ কাউন্সিল সদস্যদের সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল।

নাজিমুদ্দীনের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে *মুসলিম লীগ* মন্ত্রিসভার চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ, সেই সঙ্গে লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে তাঁর ব্যর্থতা— এ সবের ফলে আইনসভার মুসলিম লীগের ধান্দাবাজ সদস্যরা বুঝতে পারছিলেন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার দিন ফুরিয়ে আসছে। তাঁদের অনেকে এখন ধীরে ধীরে সুরাবর্দির দিকে ঝুঁকতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৫এর ২৯শে মার্চ বাঙলায় জিন্নার প্রধান স্তম্ভ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে পড়ল। গভর্নর কেসি দলাদলি এড়াবার

জন্য ৯৩ ধারা প্রায়োগ করাই বিধেয় বলে মনে করেছিলেন।[৬১] কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৬এর মার্চ মাস নাগাদ সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৪৬এর নির্বাচনেও ইস্পাহানিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। জিন্না ১৯৪৫এর ২৪শে সেপ্টেম্বর কোয়েটা থেকে লেখা পত্রে হাসান ইস্পাহানিকে *মুসলিম লীগের* কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনী ফান্ডে 'প্রচুর সাহায্যে'র ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলে হাসান ইস্পাহানি তাঁর ২রা অক্টোবর জিন্নাকে লেখা পত্রে জানান, কলকাতায় ব্যবসায় নিযুক্ত 'আমাদের মোমেন বন্ধুদের' অর্থ সাহায্যের জন্য বলা হয়েছে। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাঙ্‌লা প্রদেশে তাঁরা নিজেদের 'প্রতিষ্ঠা' করেছে এবং যথেষ্ট 'অর্থ' করেছে। সুতরাং *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* নির্বাচনী ফান্ডে তাঁদের অর্থ সাহায্য করতেই হবে। এরপর ১১ই নভেম্বর হাসান ইস্পাহানি জিন্নাকে জানান যে, *প্রাদেশিক মুসলিম লীগের* নির্বাচনী ফান্ডে তখন পর্যন্ত টা. ১০০,০৩৭-২-০ জমা পড়েছে। আরও ষাট হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।[৬২]

অভিজাত-অবাঙালী ধনী ব্যবসায়ী নেতৃত্বের সঙ্গে আবুল হাশেম সুরাবর্দিদের দলাদলি থাকলেও হাশেমের প্রচেষ্টায়ই *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* অনেকটা ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৬এর ঐ নির্বাচনে বাঙলায় মুসলিম লীগের বিপুল সাফল্যের (মুসলমান আসনের শতকবা ৯৬.৭টি আসন) পশ্চাতে সেটা অবশ্যই একটা কারণ ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ ছিল বোধ হয় কমিউনিস্ট নিখিল চক্রবর্তীর সহায়তায় রচিত আবুল হাশেম কর্তৃক ১৯৪৫-র ২৪শে মার্চ প্রকাশিত *মুসলিম লীগ* নির্বাচনী ইস্তেহার। ঐ ইস্তাহারে 'ইসলামের মূল্যবোধ' ও 'শরিয়ত প্রতিষ্ঠার' পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির কথাও ছিল। মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি এবং পাকিস্তান পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলা-আসাম রাষ্ট্র গঠিত হলে ঐ অধিকার কার্যকরী করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল ঐ ইস্তেহারে। আরও বলা হয়েছিল ঐ নূতন রাষ্ট্র আইনের শাসনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল সক্ষম মানুষের কাজের গ্যারান্টি, পুরুষ ও মহিলাদের সমান সুযোগ দান, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে শিক্ষা ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সকল প্রকার একচেটিয়া অধিকার এবং জমি থেকে সর্বপ্রকার আর্থিক স্বার্থের অবসানের পাশাপাশি কৃষকদের সর্বপ্রকার অধিকারের স্বীকৃতি দান, প্রধান প্রধান শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার জাতীয়করণ, সর্বনিম্ন আয় নির্দিষ্টকরণ, বেকারী-ইনসুরেন্স এবং বার্ধক্যজনিত পেনশনের প্রবর্তন, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের স্বীকৃতি দান, যৌথ খামার ও সমবায় ভিত্তিক বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সর্বোপরি সংখ্যালঘু অমুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য স্বার্থ সুরক্ষার অঙ্গীকার করা হয়। বস্তুত ঐ ইস্তেহারটি ছিল উদীয়মান বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র-চিন্তার একটি দলিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ঐ ইস্তেহার ছাত্রযুবসহ বাঙলার মুসলমান সমাজের বিপুল অংশের মধ্যে সাড়া

জাগাতে পেরেছিল। খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখেরা কিন্তু *ঐ* ইস্তাহারকে কমিউনিস্টদের ইস্তেহার বলে সমালোচনা করেন। দক্ষিণপন্থীদের সংখ্যাধিক্য থাকায় *প্রাদেশিক মুসলিম লীগ* ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐ ইস্তেহার অনুমোদিত না হওয়ার সম্ভাবনায়, আবুল হাশেম প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলে বিপুল ভোটে অনুমোদন করিয়ে দক্ষিণপন্থীদের বাধাদান প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন।[৬৩] ১৯৪৫এর ৫ই সেপ্টেম্বর হাশেম রচিত নির্বাচনী পুস্তিকা *'চলুন আমরা জেহাদে যাই' 'Let us go to war'* প্রকাশিত হয়।[৬৪] সে সময় *মুসলিম লীগের* দক্ষিণ পন্থীদের মতাদর্শ ও বক্তব্যকে মৌলানা আক্রাম খাঁর প্রাত্যহিক *আজাদ* পত্রিকা মারফৎ প্রকাশিত হত। বামপন্থীদের মতাদর্শ ও বক্তব্যকে বাঙলার সাধারণ মুসলমানদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আবুল হাশেম ১৯৪৫-র ১৬ই সেপ্টেম্বর বাঙলা সাপ্তাহিকী *'মিল্লাত'* প্রকাশ করেন। *'মিল্লাত'* খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। একসময় এর বিক্রী সংখ্যা ৩৫,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৬৫]

নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলাকালে হাশেম-সুরাবর্দিরা বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত ও ছাত্রযুব এবং সাধারণ কৃষককুলের হৃদয় জয় করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলের ভূম্যধিকারীরা যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ', 'লাঙল যার জমি তার'[৬৬]— এই সব দাবী যেমন জিন্না-নাজিমুদ্দীনদের ভাল লাগে নি, গ্রামাঞ্চলের ভূম্যধিকারীদেরও ভাল লাগে নি—লাগবার কথাও নয়। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা-আসামের একটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার কথা হাশেম-সুরাবর্দিরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বে বাঙলার মুসলমানদের এতকাল নানাভাবে সঙ্কুচিত করে রাখার চেষ্টা হয়েছে, পাকিস্তান প্রস্তাব রূপায়িত হলে বাঙলা-আসামের মুসলমানদের ঐ অবস্থার অবসান হবে। পূর্ব ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমান তাঁদের নিজেদের রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারবেন। রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও লাভ করবেন—হাশেম সুরাবর্দিদের এই প্রচার সেদিন বাঙলার মুসলমানদের পাকিস্তানের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন বাস্তবে পাকিস্তানের অবয়ব কি হবে '৪৬-র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত *মুসলিম লীগের* কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদীয় সদস্যদের কনভেনশনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার কোন লীগ নেতারই কোন ধারণা ছিল না। আক্রাম খাঁ-নাজিমুদ্দীন-ইস্পাহানিরা যাঁরা ছিলেন জিন্নার আজ্ঞাবহ, তাঁরা তো কেউ এ সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রশ্ন তোলেন নি, এমন কি হাশেম-সুরাবর্দিদেরও এ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না বলেই মনে হয়। লীগের রাজনৈতিক নেতাদের এবং লীগ রাজনীতির উপর জিন্না কর্তৃত্বকে তাঁরাও কার্যতঃ নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। পাকিস্তান পরিকল্পনায়, বাঙলার মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন—ফজলুল হকের এই দাবী (যা *দি স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকায় ১৯৪৩এর ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত

হয়েছিল) সে সম্পর্কে কেউই উচ্চবাচ্য করেন নি।

কোন সন্দেহ নেই ১৯৪৬-এর নির্বাচনী ফলাফলে (৯৬.৭% আসনে জয়লাভ)[৬৭] মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতৃত্বের বিপুল জয় সূচিত হয়েছিল। কিন্তু হাশেম সুরাবর্দিদের বাঙলা-আসাম স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন যেমন '৪৬র এপ্রিলে দিল্লীতে আহূত *মুসলিম লীগের* কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদীয় সদস্যদের কনভেনশনে মুদ্রণ-প্রমাদের নাম করে Statesকে State বানিয়ে জিন্না এবং তাঁর উত্তর ভারতের পার্শ্ব-অনুচরেরা ধুলিসাৎ করে দিয়েছিলেন, তেমনি ১৯৪৭এর মার্চ-এপ্রিলে হাশেম-শরৎ বসুর স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার পরিকল্পনাও জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বানচাল করে দিয়েছিলেন। এক বছরের একটু বেশী সময়ের মধ্যে বাঙলা-বিভাগ এবং অভিজাত নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের আবির্ভাব তাঁদের এই বিরাট জয়কে পরাজয়ে পরিণত করেছিল। অবশ্য ঐ পরাজয় যে ছিল সাময়িক, ১৯৫৬-এ পূর্ব-পাকিস্তানে *মুসলিম লীগের* চূড়ান্ত ভরাডুবি তার সাক্ষ্য বহন করে। পূর্ব-বাঙলায় অভিজাত অবাঙালী ধনী ব্যবসায়ী মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭২-এ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যুক্ত বাঙলার আইন সভার বাঙালী মুসলমান জন প্রতিনিধিরা কেন বাঙলা বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন। ১৯৪৫-৪৬এর নির্বাচনের সময় বাঙালী মুসলমান এবং অভিজাতরা বাঙলা-বিভাগের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি, স্বাধীনতা যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই তাঁদের মধ্যে এই বোধ নিশ্চিত হতে থাকে যে *প্রাদেশিক কংগ্রেস* ও *হিন্দু মহাসভা* নেতৃত্বাধীন বাঙালী হিন্দু-নেতৃত্বের অধিকাংশই তাঁদের এতকালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উচ্চাসনে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনক্রমেই মুসলিম-প্রধান স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলা রাষ্ট্রকে নিজেদের রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করবেন না। অপরদিকে হিন্দু-প্রধান তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে মুসলিম-প্রধান বাঙলায় বাঙালী মুসলমানরা শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতারা স্বাধীন ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে বাঙলায় নেতৃত্বদানের প্রশ্নে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই মনে করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলিম মানসে এই ধোঁয়াশা, আরো তীব্রতা লাভ করে বাঙলার অভিজাত মুসলিম নেতাদের এবং পশ্চিমা মুসলিম নেতাদের ভারতবর্ষের দুইপ্রান্তের মুসলমানদের একত্রিত রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি প্রচেষ্টায়। ঐ তথাকথিত পবিত্র মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল অর্ধশিক্ষিত উলেমাদের ধর্মীয় জিগীর। বাঙলার নিরক্ষর মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ঐ ধর্মীয় জিগীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতাদের বিতর্ক ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারের চেয়েও বেশী কার্যকরী ছিল। এরই প্রেক্ষিতে বাঙলার মুসলমান জনসাধারণকে বাঙলা বাঙালীর— এই পুরাতন মূল্যবোধ প্রচারের পরিবর্তে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতাদের বেশীর ভাগই

ধীরে ধীরে বিপরীত চিন্তায় নিজেরাই আচ্ছন্ন হতে থাকেন। এই সেই চিন্তা যা ছিল তাঁদের উচ্চ আকাঙ্খা স্থানীয় শাসক অথবা শাসক নির্ধারক হবার ইচ্ছার সহায়ক— এই সেই চিন্তা যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালী অভিজাতদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের রাজধানী করাচী শক্তিকেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থানকারী মুসলিম নেতাদেরকে 'পাইয়ে দেওয়া'র নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসক-পদগুলি ক্রমশই পশ্চিমা মুসলমানদের দখলে চলে যেতে থাকে। যে ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতারা— পাকিস্তানেই আমাদের উন্নতি— এই অভিমত পোষণ করেছিলেন '৪৭-এ, ১৯৫৫-৫৬-তে তাঁরাই বুঝেছিলেন যে তাঁদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নূতন করে আন্দোলনের পথে যেতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকতে থাকতে পিছন থেকে সামনে হাঁটতে হলে তাঁদের হাতে আছে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করার একটিই অস্ত্র, আর তা হচ্ছে নিজেদের আইডেনটিটি বা স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত করা। ভাষা আন্দোলন সেই আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান নেতাদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) *রেসালাট* (কলিকাতা), ১৭এপ্রিল ১৯১৭, *রিপোর্ট অব দি বেঙ্গল নেটিভ প্রেস,* মে, ১৯২৬, এবং *গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া সিক্রেট হোম (পল) ডিপোজিট (প্রিন্টেড),* প্রগস্ জুলাই ১৯১৯, নং ৪৭, ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, ১৯১৯ এপ্রিল, দ্বিতীয়ার্ধ।

২) *দি মুসলমান ঃ* জানুয়ারী ২৪, ১৯২৬ পৃ.৪; *ঐ* এপ্রিল ৭,১৯২৪, পৃ ৪; *ঐ* জানুয়ারী ৩১,১৯২৫ পৃ. ৩। এবং *গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল হোম পল(সিক্রেট),* ফাইল নং ৪১/২৫ রিপোর্ট অন, ৭মার্চ ১৯২৫।

৩) পি. চ্যাটার্জি ঃ 'বেঙ্গল পলিটিক্স অ্যান্ড মুসলিম মাসেস' (এম. হাসান সম্পাদিত *ইন্ডিয়াস পার্টিশন, প্রসেস, স্ট্র্যাটিজি অ্যান্ড মবিলেজনস্* পৃ. ২৬৭-২৬৮) জে. চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ডিভাইডেড, হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন ১৯৩২-'৪৭* (কেম্ব্রিজ, ১৯৯৫) পৃ. ৬৭-৬৮।

৪) টি. এন. মুর্শিদ, *দি সেকরেড অ্যান্ড দি সেকুলার : বেঙ্গল মুসলিম ডিসকোর্সেস,* ১৮৭১-৭৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৯৫) পৃ. ৪২।

৫) এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সি. পি. সরকার, *দি বেঙ্গল মুসলিসম্ : এ স্টাডি ইন দেয়ার পলিটিসাইজেশন,* ১৯১২-১৯২৭, (কলিকাতা, ১৯৯১) পৃ. ২০৯-২১০।

৬) এস. সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল* ১৯৩৭-১৯৪৭ (নিউদিল্লী, ১৯৭৬) পৃ. ৭১।
৭) *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ. ৭৮৫।
৮) জে. চ্যাটার্জী, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৭৩।
৯) আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা,১৯৭০), পৃ. ১১০, কামরুদ্দীন আহমেদ, *দি স্যোশাল হিস্ট্রি অব দি ইস্ট পাকিস্তান* (ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৭) পৃ. ৩০।
১০) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত* পৃ. ৩২।
১১) কালীপদ বিশ্বাস, *যুক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়*, (কলিকাতা, ১৯৬৬) পৃ. ১১।
১২) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩।
১৩) এম. এইচ. ইস্পাহানি . *কায়েদে আজম জিন্না, অ্যাজ আই নিউ হিম*, (করাচী, ১৯৬৭) পৃ. ২৩।
১৪) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ ১১৫।
১৫) এস. সেন, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৭৬।
১৬) এম. এইচ. ইস্পাহানি, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৩১।
১৭) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ.৩৪-৩৫।
১৮) জে. চ্যাটার্জি ঃ প্রবোক্ত, পৃ. ৮২।
১৯) কালীপদ বিশ্বাস ঃ প্রবোক্ত, পৃ. ১৫।
২০) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ. ১৭৭-৭৮।
২১) ঐ, পৃ. ১৭২।
২১ক) এস. সেন, *প্রবোক্ত*, পৃ. ২৬২।
২২) কালীপদ বিশ্বাস, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৯১-৯২।
২৩) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ. ১৯০-৯১।
২৪) ঐ
২৫) ঐ, পৃ. ২১৯।
২৬) এস. সেন, *প্রবোক্ত*, পৃ.২৬৭।
২৭) আবুল মনসুর আহমেদ ঃ প্রবোক্ত, পৃ. ২৬৭।
২৮) সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত* ১৮৮৫-১৯৪৭ (কলিকাতা, ১৯৯৩) পৃ. ৪১৬।
২৯) অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭*, (কলিকাতা, ১৩৯৭), পৃ. ৩৩৯।
৩০) এস. সেন , *প্রবোক্ত*, পৃ. ১৬৭।
৩১) ঐ, পৃ. ১৬৬।
৩২) ঐ, পৃ. ২৬৮।

৩৩) আবুল হাশেম, *ইন রেট্রোস্পেকশন,* (ঢাকা, ১৯৭৫), পৃ. ২৪।
৩৪) আবুল মনসুর আহমেদ , *প্রবোক্ত,* পৃ. ২৩৪।
৩৫) ঐ, পৃ. ২৩০-৩২।
৩৬) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৫৯।
৩৭) জাইদি (সম্পা.), *করেস্পন্ডেস্ ইস্পাহানি টু জিন্না,* ১৩ই মার্চ ১৯৪৩, পৃ ৩২৫-২৬।
৩৮) ঐ
৩৯) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ২৩৪
৪০) জাইদি (সম্পা.), *করেস্পন্ডেস্ ইস্পাহানি টু জিন্না,* ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৩, পৃ ৩৫৪-৫৫।
৪১) এস. সেন, *প্রবোক্ত,* পৃ. ১৭৩।
৪২) স্টেটমেন্ট অব এইচ এস. সুরাবর্দি ইন বেঙ্গল এসেম্বলী, ৫ই জুলাই ১৯৪৩, *বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিং,* প্রগস্ ভলিউম্ এল এক্স ভি পৃ. ৮৯।
৪৩) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬১।
৪৪) আয়েষা জালাল, *প্রবোক্ত,* পৃ. ১০৩।
৪৫) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৩৪।
৪৬) অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৩৪০-৩৪১।
৪৭) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৩৪
৪৮) এস. সেন, *প্রবোক্ত,* পৃ. ১৮৫; কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬৪।
৪৯) অমলেশ ত্রিপাঠী, *প্রবোক্ত.* পৃ. ৩৭৩।
৫০) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৩৯।
৫১) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬৪।
৫২) টি. এন. মুর্শিদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ২০৮।
৫৩) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬৪।
৫৪) আবুল হাশিম ঃ প্রবোক্ত, পৃ. ৭৪।
৫৫) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬৪-৬৫।
৫৬) ঐ
৫৭) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৭৩-৭৮, কামরুদ্দীন আহমেদ ঃ প্রবোক্ত, পৃ. ৬৭।
৫৮) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৬৫।
৫৯) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত,* পৃ. ৭৯।
৬০) ঐ, পৃ. ৭৫
৬১) আয়েষা জালাল, *প্রবোক্ত,* পৃ. ১০৮।
৬২) এম.এইচ. ইস্পাহানি, *প্রবোক্ত,* পৃ. ১৫১-১৫২।

৬৩) আবুল হাশিম, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৭৯ এবং পৃ. ৮১।
৬৪) *ঐ*, পৃ. ৯৫।
৬৫) *ঐ*, পৃ. ৯৯।
৬৬) আবুল মনসুর আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ. ২৪৬।
৬৭) কামরুদ্দীন আহমেদ, *প্রবোক্ত*, পৃ. ৭০।

প্রত্নক্ষেত্র ইনামগাঁও : কৃষিপ্রধান বসতির উদ্ভব ও বিকাশ

সুদর্শনা চৌধুরী (ভাদুড়ী)

মহারাষ্ট্রের ভীমা নদের শাখা ঘোড় নদীর তীরে অবস্থিত প্রত্নক্ষেত্র ইনামগাঁও। বর্তমান ইনামগাঁও গ্রামটি থেকে এর দূরত্ব তিন কিলোমিটার।[১] পুনার ডেকান কলেজের এম কে ধাভালিকার, এইচ ডি সাঙ্কালিয়া, জেড ডি আন্সারির সুযোগ্য পরিচালনায় এই প্রত্নক্ষেত্রটির উৎখনন হয়। এর প্রতিবেদন "এক্সক্যাভেশন এ্যাট ইনামগাঁও" নামক গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুভূমিক পদ্ধতিতে উৎখনন করার দরুন জীবনযাত্রার নানাদিক অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকেই এখানে জনবসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যপ্রস্তর যুগের যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়েছে তা অতি সীমিত। এর থেকে প্রাচীন মানুষের খাদ্য উৎপাদক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার বিবর্তন অনুধাবন করা যায় না। তাম্রপ্রস্তর যুগে এখান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। এর থেকে আমরা একটি কৃষিপ্রধান বসতি সম্পর্কে জানতে পারি। তাম্রপ্রস্তর যুগে ইনামগাঁও এর বসতি দৈর্ঘ্যে ৫৫০ মিটার ও প্রস্থে ৪৩০ মিটার বিস্তৃত ছিল। এখানে তিন স্তরে বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রথম স্তরে (খ্রী পূ ১৬০০ ১৪০০ অব্দ) যারা বসবাস করত তারা ব্যবহার করত লালের উপর কালো রঙ করা মৃৎপাত্র। অনুরূপ মৃৎপাত্র মধ্য প্রদেশের মালব অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল।[২] দ্বিতীয় (খ্রী পূ ১৪০০ ১০০০ অব্দ) ও তৃতীয় (খ্রী পূ: ১০০০-৭০০ অব্দ) স্তরে যারা বসবাস করত তারা ব্যবহার করত হালকা এবং গাঢ় লাল রঙের উপর কালো রং দিয়ে চিত্রিত করা মৃৎপাত্র। এ ধরণের মৃৎপাত্র জোরওয়ে উপজাতির বাসস্থান মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায় পাওয়া গিয়েছিল।[৩] বস্ত্র বয়ন, মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্পে জোরওয়ে সংস্কৃতির স্রষ্টারা তাদের পূর্বসূরী মালব সংস্কৃতির ভুক্তমানুষদের জীবনযাত্রায় বহু বিষয় অনুকরণ করত।

ইনামগাঁওএ তাম্রপ্রস্তর যুগে ১৩৪টি গৃহ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে মালব সাংস্কৃতিক পর্বের ৩২টি গৃহ আর বাকি সব জোরওয়ে পর্যায়ে তৈরি। মালব সাংস্কৃতিক পর্বের ৩২টি গৃহের মধ্যে ২৮টি আয়তাকার। একটি গোলাকার এবং তিনটিতে মাটির মধ্যে গর্ত করে বসবাস করার ব্যবস্থা আছে। জোরওয়ে সাংস্কৃতিক পর্বের গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে সে সময় জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত সে সময়কার মানুষ কৃষ্ণভূমি কর্ষণ করে কৃষির উন্নতি করেছিল, যার প্রমাণ বহন করে সে যুগের প্রত্যেকটি গৃহ। জোরওয়ে পর্যায়ের গৃহগুলি মালবদের মত আয়তাকার হলেও নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত। বেশীর ভাগ বাড়িতেই একটি করে ঘর। খুব বড় বাড়ি হলে মাঝখানে দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা হত।

প্রত্যেকটি গৃহের মধ্যে একটি করে ডিম্বাকৃতি অগ্নিকূপ আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলি নীচু মাটির দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাড়ির বাইরে অপেক্ষাকৃত কিছুটা বড় অগ্নিকূপ (১ x০.৪ মিটার) পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ এগুলোতে জন্তুজানোয়ারের মাংস ঝলসে খাওয়া হত। বাড়ির ভিতরে খাবার সংরক্ষণের জন্য ১ থেকে ২ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার গর্ত পাওয়া গিয়েছে। খাবার সংরক্ষণে মৃৎপাত্র রাখবার জন্য ঘরের মধ্যে ১.৪ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ও ১০ সেমি উচ্চ মাটির মঞ্চ পাওয়া গিয়েছে। মালব বাড়িগুলোতে অনুরূপ অগ্নিকূপ এবং খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[৪]

ইনামগাঁওএ জোরওয়ে পর্যায়ভুক্ত দু'টি বৃহৎ বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। বাড়ি দু'টি প্রত্নক্ষেত্রের মধ্যস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত। প্রথম বাড়িটির একটিমাত্র ঘর ও তাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাড়িটির ভেতরের গঠন এবং এখান থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র থেকে মনে হয় এখানে কেউ বসবাস করত না। বাড়িটিব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটি ১.০৫ মিটার ব্যাস যুক্তও ৮০ সেমি গভীর গর্ত আছে। গর্তটির চারপাশ এবং ভিতর কাদা দিয়ে লেপা। গর্তটির নীচে নুড়ি পাথর রাখা আছে। হয়ত ইঁদুরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। এর ঠিক পাশেই খাবার সংবক্ষণের পাত্র রাখার জন্য ১.২৫ মিটাব ব্যাস বিশিষ্ট একটি মঞ্চ আছে। আরও উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি ২.১৮ মিটার লম্বা ৭৭ সেমি চওড়া ও ৪২ সেমি গভীর বৃহৎ আয়তাকার গর্ত আছে। এর ধারগুলি কাদা দিয়ে লেপা। সর্বক্ষণ আগুন জ্বালানোর ফলে এগুলি অনেকাংশে পুড়ে গিয়েছে। গর্তের মধ্যে জ্বালানি দেওয়ার জন্য পাশগুলি ঢালু করা আছে। একটি পরিবারের রান্নাব পক্ষে এই অগ্নিকূপ যথেষ্ট বড়। সম্ভবত গোটা জোরওয়ে সম্প্রদায়ের রান্না এখানে হ'ত। হয়ত এখানে খাদ্য বা মাংস ঝল্‌সে খাওয়া হ'ত। কারণ যে কোন রন্ধনের পাত্রের পক্ষে অগ্নিকূপটি বড় ছিল। উক্ত বাড়িটির নীচু খড়ের ছাদ খাবার ঝল্‌সানোর পক্ষে বিপজ্জনক। সম্ভবত এটি অগ্নিপুজোর জন্য ব্যবহৃত হ'ত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ইনামগাঁও এর আদি বাসিন্দা মালব উপজাতিরা অগ্নি উপাসনা করত। আলোচ্য অগ্নিকূপটির দক্ষিণ-পশ্চিমে আরেকটি অগ্নিকূপ আছে। এটি ১.৩১৩ মিটার লম্বা, ৭২ সেমি চওড়া ও ৩৫ সেমি গভীর। এর ধারগুলো খাড়া, শুধু পশ্চিম দিকটা ঢালু সম্ভবত জ্বালানি দেওযার জন্য। গর্তটি ছাই দিয়ে ভর্তি করা।[৫]

খাদ্য শস্য সংরক্ষণের গোলাকার গর্তটির পশ্চিমে ৩.৭৫ মিটার দূরত্বে অবস্থিত আরেকটি গর্ত পাওয়া গিয়েছে। এর ব্যাস এবং গভীরতা যথাক্রমে ১ মিটার ও ৬০ সেমি। এর দেওয়ালটি চুন দিয়ে লেপা এবং আগেরটির মত নীচে নুড়ি পাথর ভর্তি করে রাখা আছে।[৬]

আগেই বলা হয়েছে এই বড় বাড়িটিকে দু'টি ঘরে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাজন দেওয়ালের পরিবর্তে খাবার সংরক্ষণের পাত্র দিয়ে তৈরি। মাঝখানে দু'টি গোলাকার মঞ্চও আছে। দু'টিই খাবার সংরক্ষণের পাত্র রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। দুটির ব্যাস যথাক্রমে ৭২ সেমি ও ৮৬ সেমি। উত্তর পশ্চিম দিকে দু'টি গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। তাদের গভীরতা যথাক্রমে ২২৩ সেমি ও ৩০ সেমি। গর্ত দু'টির নীচ বালি দিয়ে ভর্তি। সম্ভবত ইঁদুরের উপদ্রবের জন্য এই ব্যবস্থা। দ্বিতীয় গর্তটির মধ্যে তিনটে ডিম্বাকৃতি গর্ত আছে। সেগুলি যথাক্রমে ৯০ x ৬০ x ২৫ সেমি, ৬৫ x ৫০ x ২০ সেমি এবং ৬৫ x ৫৫ x ২৫ সেমি। এই

গর্তগুলির নীচ নুড়ি পাথর দিয়ে ঠাসা। খাবার সংরক্ষণের পাত্র রাখার জন্য ঘরটির উত্তর-পশ্চিমে ২.১০ মিটার ব্যাস যুক্ত, ১৫ সেমি উঁচু একটি মাটির মঞ্চ আছে।[৭]

উৎখননের দ্বারা ইনামগাঁও-এ প্রধানত দু'ধরণের খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। প্রথমটি মাটির নীচে গর্ত করে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করা আর দ্বিতীয়টি গোলাকার নীচু মাটির মঞ্চের উপর মৃত্তিকার পাত্রের মধ্যে খাবার সংরক্ষণ করা। এই দু'ধরণের খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচলিত। বর্তমানে মাটির তলায় গর্তের মধ্যে জোয়ার সংরক্ষিত হয়। কারণ এটি মাটির তলাকার তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। মাটির উপর গম সংরক্ষণ করা হয়। তাম্রপ্রস্তর যুগে মাটির তলায় এই গর্তগুলোতে যব সংরক্ষিত হত। আর এখনকার মতন তখনও মাটির উপর মৃত্তিকার পাত্রে কম সংরক্ষিত হ'ত।

আলোচ্য গৃহটিতে বাসযোগ্য আসবাবের অভাব এবং বিশাল অগ্নিকূপের উপস্থিতি দেখে মনে হয় সম্ভবত এ'টি সমগ্র জনবসতির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। এই বাড়িটির মধ্যে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য গর্ত ও মৃৎপাত্র রাখার মঞ্চ দেখে মনে হয় এখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শস্য সঞ্চিত হ'ত। সম্ভবত এ'টি জোরওয়ে উপজাতির শস্যাগার ছিল। বিশাল অগ্নিকূপের উপস্থিতির জন্য এ'টি অগ্নি উপাসনালয় বলা যেতে পারে।[৮] ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য দানের রীতি অতি প্রাচীন। খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্যবস্তু এখানে সংরক্ষিত হ'ত। এর থেকে মনে হয় জোরওয়েদের ধর্ম সুসংগঠিত এবং তা পরিচালনা করার জন্য পুরোহিতের মত কোন ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন আছে যেখানে দেবালয়কে কেন্দ্র করে দুর্গ গড়ে উঠেছে কারণ দেবালয়ের সঞ্চিত ধন সুরক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত রক্ষী প্রয়োজন।

শস্যাগারের সংলগ্ন দ্বিতীয় বৃহৎ বাড়িটিতে পাঁচটি ঘর আছে। সম্ভবত এ'টি উপজাতি প্রধানের বাড়ি। শস্যাগারের পাশে অবস্থিত বলে মনে হয় শস্যাগারের যথেষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। কর হিসাবে আদায় করা বিভিন্ন শস্য এখানে সঞ্চিত হ'ত। কর আদায়ের উদ্দেশ্য দু'টি হতে পারে। প্রথমত দুর্ভিক্ষ বা খরার সময় খাদ্যের সংস্থান। দ্বিতীয়ত, কৃষি কার্যের প্রয়োজনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা।[৯]

রাজনৈতিক অবস্থা ছাড়াও সামাজিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে অনেকগুলো বাড়ির সমষ্টি দেখা যায়। এই সমষ্টির একটি মাত্র বাড়িতেই উনুন ও খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মনে হয় এই সমষ্টিতে একটি একান্নবর্তী পরিবার বাস করত।[১০] জোরওয়ে সাংস্কৃতিক পর্বের প্রথমদিকে কুম্ভকার, স্বর্ণকার ও অন্যান্য কর্মকাররা প্রত্নক্ষেত্রের পশ্চিম সীমান্তে বাস করত। বিত্তশালী কৃষক ও প্রধানের বাড়ি ছিল প্রত্নক্ষেত্রের মধ্যস্থলে। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রধানের বাড়ি প্রত্নক্ষেত্রের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল।[১১] এর থেকে সে যুগের সামাজিক বিভাজনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ শ্রেণীবিভাজন তাদের কবর দেওয়ার পদ্ধতিতেও স্পষ্ট। বেশীর ভাগ মরদেহরই হাঁটু দুটো ভাঙা। কিন্তু প্রধানের গৃহের মধ্যে যে মরদেহটি পাওয়া গিয়েছে তার হাঁটু দুটো অক্ষত।[১২]

অর্থনৈতিক দিক থেকেও কৃষিপ্রধান বসতি ইনামগাঁও যথেষ্ট উন্নত ছিল। জোরওয়ের উদ্বৃত্ত শস্য উন্নত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করত। বছরে দু'টি মরসুমে শস্য উৎপাদন হ'ত। শীতে

মুগ, কলাই এবং গ্রীষ্মে গম, যব, মুসুর, খেজুর ইত্যাদি চাষ হ'ত।[১৩] চাষের জন্য খাল ও সেচের ব্যবস্থা ছিল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বাবা জল পশ্চিমের কৃষ্ণ ভূমিতে নিয়ে আসা হ'ত' খালগুলির মধ্যে খাল গভীর এবং এগুলি এমনভাবে তৈরি যাতে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এ সময় অনাবৃষ্টি ও আর্দ্রতা কমে যাওয়ার কৃষিকার্য বিঘ্নিত হয়েছিল। এর প্রভার জোরওয়েদেব দৈনন্দিন খাদ্যের উপর পড়েছিল। স্থাপত্যের দিক থেকেও এ সময়কার বাড়িগুলো নিম্নমানের, প্রধানত মাটির কুঁড়ে ঘব দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দেব পর এইস্থানে বিশেষ কোন জোরওয়ে বসতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন কৃষি বসতির অধিকাংশই নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছে। নদীবাহিত পলিমাটি কৃষি কার্যের উপযোগী। কিন্তু তাম্রপ্রস্তর যুগের ইনামগাঁও এ কৃষ্ণ মৃত্তিকা কর্ষণ করা হ'ত। মালব সময় থেকেই কৃষিকার্যের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে জোরওয়ে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে কৃষিকে কেন্দ্র করে একটি সুসংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সভ্যতা কখনোই নগর সভ্যতায় উন্নীত হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পর অনাবৃষ্টি এবং শুষ্ক আবহাওয়া জোরওয়েদের জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। এ সময় তারা প্রধানত পশুপাখীর মাংসই ভক্ষণ কবত। এ সময় কুঁড়ে ঘর ও মৎপাত্রগুলি অতি নিম্নমানের। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের পর এই অঞ্চলের তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত অনাবৃষ্টি ও শুষ্ক আবহাওয়া এই স্থানে জোরওয়ে উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার মূল কারণ।

সূত্র নির্দেশ

১. ধাবালিকার .এম.কে, সানকালিয়া. এইচ.ডি, আন্সারি. জেড.ডি. (সম্পাদিত), এক্সক্যাভেসনস এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, প্রথম ভাগ, ডেকান কলেজ পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুনা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৫।

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪১।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬৭, ৪০৮, ৪১৭।

৪. এক্সক্যাভেসন এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১০০১-১০০৮।

৫. এক্সক্যাভেসন এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৩।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৩।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৩।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯৩।

৯. এক্সক্যাভেসন এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১০০১-১০০৮।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১০০১-১০০৮।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ১০০২।

১২. এক্সক্যাভেসন এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ২৭১ এর সাথে দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা ১০০১-১০০৮।

১৩. এক্সক্যাভেসন এ্যাট্ ইনামগাঁও, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৩১।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১০০৩।

অভিলেখ সাক্ষ্যের আলোকে প্রাচীন বাংলার কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি

চিত্তরঞ্জন মিশ্র

কৃষি ছিল প্রাচীন বাংলাব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ঐ সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের ইতিহাস পুনর্গঠন একটি কঠিন কাজ কারণ, প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাব। কিন্তু এ অভাব সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সূত্রের সহায়তায় যেমন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাহিত্য কর্ম ও বিদেশী ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের আলোকে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইতিহাস নির্ণয় কবা সম্ভব। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত সমস্ত উপাদানের মধ্যে লেখমালা'ই আমাদের প্রধান উপাদান। বর্তমান প্রবন্ধ মূলত: অভিলেখমালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই পুরাকালের বাংলার কৃষি ও ভূমিজাত উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বিবরণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অভিলেখ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার কষিজাত পণ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে মনে রাখা দরকার যে শিলালিপি বা তাম্রশাসনসমূহ তৎকালীন বাংলার উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলির প্রায়ই মূলত ভূমিদান-বিক্রয় দলিল। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, "প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের শর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে কাবণ সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধনসম্পদ এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"[১] অবশ্য সকল অভিলেখমালাতেই যে এধরনের উল্লেখ আছে তাও নয়। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর লেখ-খন্ড (আনুমানিক খৃ:পৃ: ৩য় থেকে ২য় শতকের মধ্যে) প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন লেখমালা বলে আজ পর্যন্ত স্বীকৃত। এই প্রস্তরলেখ ব্যতীত বাংলায় খৃষ্টীয় ৫ম শতক থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত সময়ের আরও অনেক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির কোথাও দানকৃত বা ক্রয়কৃত জমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে অবশ্য সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জয়নাগের (কর্ণসুবর্ণের রাজা) বপ্যঘোষবাট তাম্রশাসন ব্যতিক্রম কারণ, ঐ তাম্রপট্টে উল্লেখিত ঔদম্বারক বিষয়ের 'সর্ষপ-যানক' (সরিষাব ক্ষেত্র)-এব উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত বিষয়ের

অন্তর্গত বপ্যঘোষবাট গআমে সর্ষপ বা সবিষা ছিল ভূমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদির অন্যতম।

যাহোক, পাল, চন্দ্র ও সেন এবং অন্যান্য রাজবংশের তাম্রশাসনগুলিতে দানকৃত বা ক্রয়কৃত কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেব পট্টোলীগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমানও উল্লেখ আছে।[২] এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হচ্ছে ভূমিদান বা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে ভূমিজাত দ্রব্যাদির নামোল্লেখ বেশী গুরুত্ব লাভ করেছে, শিল্পজাত দ্রব্যাদিব উল্লেখ নেই বললেই চলে।[৩]

স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। কৃষি প্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কৃষি প্রকৃতপক্ষে ভূমি নির্ভর। সুতরাং কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে ভূমি ব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাসের উপর আলোকপাত প্রয়োজন। অভিলেখমালার সাক্ষ্যে আমরা প্রাচীন বাংলায় তিন ধরনের ভূমির সন্ধান পাইঃ 'বাস্তু', 'ক্ষেত্র' ও 'খিলক্ষেত্র'। যে ভূমিতে জনসাধারণ ঘরবাড়ি তৈরী কবে বসবাস করতো অর্থাৎ বসবাসের উপযোগী জমিই বাস্তুভূমি। যে ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন তাই ক্ষেত্রভূমি। কোন ভূমি কর্ষণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তা অকর্ষিত হতে পারে, অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ভূমি চাষের উপযুক্ত, কিন্তু যে কারণেই হোক, যখন যে ভূমি দান বা বিক্রয় করা হচ্ছে, তখন কেউ সে ভূমি চাষ করছে না, এই শ্রেণীভুক্তভূমিই খিলক্ষেত্র। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, "চাষ করিয়া যে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে ভূমি অনেক সময় দু'চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে এবং পরে তাহা আবার চাষযোগ্য হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব এই ধরনের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।"[৪] কেবলমাত্র খিল শ্রেণীভুক্ত জমি বলতে যে ভূমি কর্ষণের অযোগ্য তাকেই বোঝান হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার বেশীর ভাগ জনসাধারণ গ্রামে বসবাস করতো এবং গ্রামের চারপাশের জমি কর্ষণ করে নানা ধরনের শস্য ও ফলমূল উৎপাদন করতো।[৫] এ থেকে তৎকালীন বাংলার কৃষির ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। কারণ পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়ের তাম্রশাসন সমূহের তথ্যে প্রমাণিত হয় যে ভূমি লাভের জন্য আবেদনকারী বাস্তুভূমি অপেক্ষা খিলক্ষেতের জন্যই বেশী আবেদন করতো। এর উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তা সহজেই অনুমেয়। কৃষিপ্রধান প্রাচীন বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমির চাহিদাও বেড়ে যায়। অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহে আমরা 'ক্ষেত্রকরাণ' 'কর্ষকান', 'কৃষকান্' ইত্যাদির উল্লেখ পাই।[৬] তৎকালীন বাংলার কৃষি ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক জীবনে এই ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। নদীমাতৃক বাংলার ভূমি সাধারণত নিম্ন। বৃষ্টিপাত ছিল এখানকার কৃষির পক্ষে অনুকূল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণীতে বাংলার জমির উর্বরতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭] ভারত পরিভ্রমণ কালে তিনি বাংলা ভাষাভাষী জনপদেও আসেন এবং ঐ সমস্ত জনপদের শস্যভাণ্ডার সম্পর্কে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ঐ জনপদগুলির মধ্যে পুন্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপি, কর্ণসুবর্ণ ও কজঙ্গল অন্যতম।[৮]

প্রাচীন বাংলার কৃষিজাত উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান ছিল প্রধান। পূর্বোক্ত মহাস্থান প্রস্তর লিপিখণ্ডেই আমরা ধানের উল্লেখ পেয়ে থাকি। ডি. আর. ভান্ডারকার মনে করেন যে, এ প্রস্তর লিপিখণ্ডটির মাধ্যমে কোনও মৌর্য সম্রাট কর্তৃক পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে প্রজাকল্যাণমুখী দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা এ লিপির কিছু অংশ ভেঙ্গে যাবার কারণে প্রথম নির্দেশটি সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও দ্বিতীয়টি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা যায় তা হচ্ছে ঐ অঞ্চলে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় আক্রান্ত প্রজাদের রাজশস্যভাণ্ডার থেকে ধান্য ও বাজভাণ্ডার থেকে কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্য করবার নির্দেশ।[৯] সুতরাং মহাস্থান শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ খৃঃ পূঃ ৩য় থেকে ২য় শতকের মধ্যের সময়কালে বাংলায় এব চাষাবাদের ব্যাপারটি নিশ্চিত প্রমাণ করে। পরবর্তীকালের অনেক লিপিতে ধানেব উল্লেখ না থাকলেও সেটিই তৎকালীন বাংলার জনসাধারণের প্রধান উপজীব্য ছিল তা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে (১০ম শ্লোকে) রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণদেরকে অনেক গ্রাম দানের উল্লেখ আছে, যেসব গ্রামের জমিতে প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ হতো এবং সে সব গ্রাম ছিল নানা শস্যক্ষেত্র ও উপবন শোভায় সজ্জিত।[১০] কেশব সেনেব ইদিলপুর তাম্রশাসনে (২৪তম শ্লোকে) আমরা সুন্দর সমতল সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উল্লেখ পাই, যে সব ক্ষেত্রে প্রচুর ধান উৎপন্ন হ'ত। মহাকবি কালিদাস তার রঘুবংশ কাব্যে বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে রঘুর অভিযান সম্পর্কে কথা বলেছেন যে, ধানের চারাগাছ যেমন করে একবার উৎপাটন করে আবার রোপন করা হয়, রঘু তেমনি করে বাংলার রাজাদের একবার উৎখাত করে আমার প্রতিরোপিত করেছিলেন।[১১] প্রচিন বাংলার ধানচাষ প্রণালী বর্তমানকালের মতই ছিল।[১২] কাটা ধান মাড়াই করার পদ্ধতিও বর্তমানকালের মতই ছিল।[১৩] সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি প্রশস্তিতে প্রাচিন বাংলায় ধান মাড়াই করার স্থান বা খলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই খলায় কাটা ধান গোল করে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত এবং ঐ ধানের ওপর গরু-বলদ ঘুরে ঘুরে হেঁটে ধান মাড়াই করত।[১৪]

খুব প্রাচিনকাল থেকেই বাংলায় ইক্ষু বা আখের চাষের প্রচলন ছিল। ইক্ষুর রস থেকে প্রচুর পরিমাণে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হ'ত এবং বিদেশে তা রপ্তানি করা হত। কেউ কেউ এ কথা বলেন যে অধিক পরিমানে গুড় প্রস্তুত হত বলেই এদেশের নাম হয়েছিল গৌড়।[১৫] 'বামচরিত' কাব্য থেকে জানা যায় যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল এখানকার ইক্ষু ক্ষেত।[১৬] ইক্ষু ছাড়াও পুরাকালে বাংলায় যে সরিষার চাষের প্রচলন ছিল তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত বপ্যঘোষবাট তাম্রশাসনের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত। ধান, আখ ও সরিষা প্রভৃতি প্রধান শস্য ছাড়াও আমরা অভিলেখ সাক্ষ্যে প্রাচিন বাংলার আরও অনেক কৃষিজাত দ্রব্যের সন্ধান পাই। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের ৩৫তম পঙক্তির এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনের ৫২তম পঙক্তির সাক্ষ্য ছাড়াও বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, লক্ষ্মণ সেনের তর্পনদীঘি তাম্রশাসন, শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন (একাদশ শতাব্দী), ভোজবর্মনের বেলাব লিপি (দ্বাদশ শতাব্দী), লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন ও আনুলিয়া তাম্রশাসনসহ আরও অনেক তাম্রশাসনের অন্যতম আয়ের পথ ছিল ঝাট বিটপ ও গুবাক-নারকেল।[১৭] এ থেকে তখনকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গুবাক অর্থাৎ সুপারি এবং নারকেল

এর ব্যাপক উৎপাদনের কথা প্রমাণিত হয়। রামচরিতে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমি নারকেল চাষের অত্যন্ত উপযোগী ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] সুতরাং সুপারি ও নারকেল যে ধান ও সরিষা প্রভৃতি শস্যের পরই এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল তা উপরোক্ত তাম্রশাসনসমূহের উল্লেখে প্রতীয়মান হয়।

ত্রয়োদশ শতব্দীতে বিশ্বরূপ সেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসন দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির বিভিন্ন গ্রামে অনেক ভূমি দান করেছিলেন। এই তাম্রশাসনে বর্ণিত হয়েছে যে, সেন রাজাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল পানের বরজ।[১৯] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন বাংলায় পানের চাষের প্রচলন ছিল। এছাড়া অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের সমস্ত অভিলেখমালাগুলি বিশ্লেষণে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন বাংলায় অন্যান্য ভূমি ও কৃষিজাত দ্রব্য হচ্ছে আম্র বা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, ডালিম্ব বা দাড়িম্ব, পর্কটি, খর্জুর এবং বীজ।[২০] আমের চাষ বাংলায় প্রায় সর্বত্র কম বেশী ছিল। খালিমপুর তাম্রশাসন, প্রথম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন, শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন, ভোজবর্মনের বেলাব লিপিসমূহে আমের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গে বেশী পরিমানে মহুয়ায় চাষ হ'ত। ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে মহুয়া বা মধুকের উল্লেখ মেলে।[২১] পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলে পনসের উৎপাদনেব ইঙ্গিত পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙ লিখেছেন কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত পুণ্ড্রবর্ধন এলাকায়। [২২] বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে আম ও কাঁঠালের উল্লেখ আছে।[২৩] লক্ষণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে ডালিম্ব ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৪] পর্কটি গাছের উল্লেখ পাওয়া যায় ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে।[২৫] ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে বীজফল ও খেজুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] ফলমূলের মধ্যে প্রাচীন বাঙালীর অন্যতম প্রিয় ছিল কদলী বা কলা, যদিও কদলী বৃক্ষ বা ফলের উল্লেখ কোনও অভিলেখমালায় নেই। কিন্তু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তর চিত্রে বার বার ফলসহ কলাগাছের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।[২৭]

প্রাচীন বাংলায় অনেক রাজা ভূমি দান করার সময় শুধু ভূমির উপরের স্বত্বই নয়, বরং ভূমির নিচের স্বত্বও (সতলঃ) এবং গাছ গাছড়ার স্বত্ব ইত্যাদি সবই দান করে দিতেন। মাছের বিশেষ উল্লেখ কোন লিপি প্রমাণে না মিললেও একথা সত্য যে যখনই ভূমি দান করা হয়েছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল-বিল, নালা, দীঘি ইত্যাদির অধিকার ত্যাগ করা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তীকালে উৎকীর্ণ তামশাসনসমূহে সর্বত্রই এর প্রমাণ মেলে। এই 'সজল' ভূমিদানই 'সমৎস্য' দান।[২৮] এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই নদনদী-বহুল খাল-বিলাকীর্ণ প্রাচীন বাংলাদেশে মাছ ছিল প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ।[২৯] তাম্রশাসনসমূহে অনেক সময় অরণ্য, ঝাড়, বিটপেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, ঝাট অথবা ঝাড় হচ্ছে বাঁশের ঝাড়।[৩০] বাঁশের ব্যবসা এখনও বাংলার সর্বত্র সুপরিচিত। রামচরিতে উল্লেখ আছে যে বরেন্দ্রভূমিতে খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল। অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচামাল তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং বাঁশ ও কাঠ বর্তমানের মত পুরাকালেও বাংলার অন্যতম আয়েব উৎস ছিল, তা তথ্য-প্রমাণে প্রমাণিত।

প্রাচীন বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিবরণ প্রসঙ্গে লবণের কথা উল্লেখ করা যেতে

পারে। অনেক তাম্রশাসনে প্রাচীন বাংলায় লবণ উৎপাদনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লবণ সম্পর্কে আমরা প্রথম উল্লেখ পাই দশম শতাব্দীর কম্বোজ রাজাদের মধ্যে নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসনে।[৩১] এই তাম্রশাসন দ্বারা বর্ধমানভুক্তির দন্ডভুক্তিমণ্ডলের অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করা হয়। দন্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলাব দাঁতন। সমুদ্র তীরবর্তী অনেক স্থানই জোয়ারের সময় নোনা জলে ডুবে যায়। বড় বড় গর্ত করে লোকে সেই জল ধরে রাখে, পরে সে জল রৌদ্রে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে লবণ তৈরী করে। এ প্রথা যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল তা ইর্দা লিপিতেই জানা যাচ্ছে। শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে এবং ভোজবর্মনের বেলাব তাম্রশাসনে 'লবণাকর' (Salt Pit) সহ ভূমি দানের উল্লেখ আছে।[৩২] এখানে উল্লেখ্য যে, পাল বা সেন আমলে কোন তাম্রশাসনে লবণের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ থেকে মনে হয় যে চিনির মত প্রাচীন বাংলায় ব্যাপকভাবে লবণ উৎপাদন হ'ত না। এর উৎপাদন হয়ত ব্যাপক ভাবে না হয়ে কোন কোন অঞ্চলে সীমিত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী দেশে লবণ উৎপাদন কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, "Although the manufacture of salt was known and practised in certain places, at any rate from the Tenth century A.D. onwards, it had not developed into any considerable industry. The dampness of the climate and the large amount of fresh water discharged into the sea by the Ganges and the Brahmaputra might have hampered the growth of any large-scale salt manufacture."[৩৩]

প্রাচীন বাংলার কৃষিই ছিল প্রধান ধনসম্বল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীন বাংলায় কৃষি ব্যবস্থা আধুনিক কালের মত যান্ত্রিক না হলেও এর উন্নতি ছিল লক্ষণীয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী থেকে অর্থাগম তৎকালীন এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী থেকেই শিল্পজাত পণ্যের উদ্ভব। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে বাণিজ্যেরও প্রসার হয়। এরূপ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে তৎকালীন বাংলার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যও প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

সূত্র নির্দেশ

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলকাতা, ১৪০০, পৃ, ১৩৪।

২. ঐ, পৃ, ১৩৫।

৩. ঐ।

৪. ঐ, পৃ, ১৮৩।

৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ, ২৫৭।

৬. উদাহরণস্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তাম্রশাসনের ১৩তম শ্লোকের বিবরণে 'ক্ষেত্রকর' এর উল্লেখ আছে। দেখুন, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, রাজশাহী, বা. ১৩১৯ পৃ, ২৬।

৭. R. C. Majumdar (ed.), The History of Bengal, Vol. I. Hindu Period, Dacca, 1963, p. 649.

৮. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, কজঙ্গল অঞ্চল রাঢ় দেশের উত্তরখণ্ডের জঙ্গলময় উষর (অজলা) ভূভাগ যাহা রাজমহল ও সাঁওতালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৩৭।
৯. R. P.Mukherji and S. K. Maity (eds.), Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal, Calcutta, 1967, p. 39.
১০. N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol. III. Rajshahi, 1929, pp, 89-90.
১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৫৭।
১২. ঐ।
১৩. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৩৯।
১৪. Sandhyakara Nandi, Ramcharita, edited by R. C. Majumdar, R. G. Basak and N. G Banerjee, Rajshahi, 1939, (Hereafter mentioned as Ramcharita), Canto III, Verse-17, p.91.
১৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৫৭।
১৬. Ramcharita, Canto III, Verse 19, p. 91.
১৭. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-৪২।
১৮. Ramcharita, Canto III, Verse 19, p.93.
১৯. Lines 45-47 of the Calcutta Sahitya Parishad Copper-plate of Visvarupasena in N.G. Majumdar, op.cit., p. 146.
২০. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।
২১, See Lines 22-24 of the Ramganj Copper-plate of Isvaraghosha in N. G. Majumdar, op.cit., pp. 153-154.
২২. R. C. Majumdar, (ed.) op. cit., p. 651.
২৩. Lines 34-35 of the Barrackpur Copper-plate of Vijayasena in N. G. Majumdar, op.cit., p.63.
২৪. Lines 35-36 of the Govindapur Copper-plate of Lakshmanasena in ibid., p. 96.
২৫. Line 21 of the Faridpur Copper plate of Dharmaditya in R.P. Mukherji and S.K. Maity (eds.) op. cit., p. 80.
২৬. Line 32 of the Khalimpur Copper-plate of Dharmapala, in ibid., p. 99.
২৭. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।
২৮. ঐ, পৃ. ১৪০।
২৯. ঐ, পৃ. ১৪৪।
৩০. ঐ।
৩১. ঐ, পৃ. ১৪০।
৩২. Lines 24-25 of the Rampal Copper-plate of Sricandra and lines 39-40 of the Belava Copper-plate of Bhojavarman in N.G. Majumdar, op.cit., pp. 5 & 21.
৩৩. R. C. Majumdar, (ed.), op. cit., p. 656.

বাসমতী ধানঃ উৎপত্তি-ভূমি ভারত প্রত্ন-নিদর্শন ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোকে।

শুভ্রদীপ দে

বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় খাদ্যশস্যের বীজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত।[১] টেক্সাস-এর আলভায় অবস্থিত 'রাইসটেক' নামক একটি কোম্পানী বাসমতী ধানের সংরক্ষিত বীজ থেকে তিন ধরণের নতুন ধান উৎপাদন করেছে।[২] মার্কিনী কোম্পানীটি দাবী করেছে, তাব বাসমতী-৮৬৭, ভারত ও পাকিস্তানে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট জাতের বাসমতীর সমকক্ষ।[৩] উপরন্তু এই কোম্পানী তার উৎপাদিত চাউলকে 'কাসমতী', 'টেক্সমতী' ইত্যাদি নাম দিয়ে বাজার মাত করেছে এবং দাবী করেছে যে এই চাউল তাদের আবিষ্কার (invention) ![৪]

ধান একটি অতি প্রাচিন, গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। বিশেষত: ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে। এশিয়ার এই দেশগুলিতে ধান চাষ শুরু হয় প্রাগৈতিহাসিক কালে।[৫] চীনে ইয়ুং সাও নামক স্থানে খননকাজের মাধ্যমে খ্রীঃ পূঃ ২৬০০ বছর আগেকার ধানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৬] স্টুয়ার্ট পিগট মনে করেন চীনে ধান চাষ শুরু হওয়ার আগে ভারতে ধান চাষ শুরু হয়েছিল।[৭] গুজরাটের লোথালে খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ অব্দের অঙ্গারীভূত চাউল।[৮] কোলদিহাওয়া (উত্তর প্রদেশ) থেকে পাওয়া গেছে আঃ খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০ খ্রী: পূ: ১৬০০ অব্দে চাউলের নিদর্শন।[৯] গুজরাটের রঙ্গপুর থেকে পাওয়া গেছ খ্রী: পূ: ২০০০ থেকে খ্রী: পূ: ১৮০০ অব্দের ধানের অবশেস।[১০] ধানের নমুনা পাওয়া গেছে রাজস্থানের কালিবঙ্গান আর বিহারের নব্যপ্রস্তর যুগের চিরান্দ (খ্রী: পূ ২০০০-খ্রী: পূ: ১৩০০) থেকে।[১১] হস্তিনাপুর (উত্তর প্রদেশ) থেকে যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা খ্রী: পূ: ১০০০-খ্রী: পূ: ৭৫০ অব্দ সময়কার।[১২] উত্তরপ্রদেশের নভ্‌দাতোলি (খ্রী: পূ: ১৫৫০-১৪০০) ও অত্রঞ্জিখেরা (খ্রী: পূ: ১২০০-খ্রী: পূ: ৬০০) থেকে ধানেব নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।[১৩] বিহারের সোনপুরে উৎখনন চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে পোড়া ধান, যা কার্বন-১৪ পরীক্ষায় খ্রী: পূ: ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীর ফসল বলে নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম পর্বে ও পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর ফিকে লাল রঙের কিংবা ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের গায়ে ধান এবং ধানের খোসা অথবা শিসের ছাপ দেখা যায়। এই ধান কৃষি-ধান্যের শ্রেণীভুক্ত। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রাচীনতম অধিবসতি পর্বে কৃষি-জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধান-চাষ।[১৪] ভারতের প্রায় ৩৭টি প্রত্নস্থল থেকে খননের

মাধ্যমে ধানের নমুনা পাওয়া গেছে। বস্তুত ভারতের যে কোনো প্রত্নস্থলে খনন করলে প্রাচীন ধানের নমুনা পাওয়াই যেন স্বাভাবিক।

প্রাচীন মিশরের নথিপত্রে ধানের উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১৫] বাইবেলেও এই খাদ্যশস্যটির উল্লেখ নেই।[১৬] খ্রী: পূ: ৩২৮-৩২৭ অব্দে ভারত অভিযান শেষে আলেকজাণ্ডার গ্রীসে ধান নিয়ে যান।[১৭] তাঁর শিক্ষক বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টোটল হলেন প্রথম ইউরোপীয় যিনি তাঁর "De Animalibus" নামক গ্রন্থে ধানের উল্লেখ করেন।[১৮]

ভারতে প্রায় চার হাজার রকমের ধান উৎপন্ন হয়। এখনো এই ভূখণ্ডে দেখা যায় নানা রকমের বুনো ধান। এই সব বুনো ধান থেকে যুগ-যুগ ব্যাপী পরিব্যক্তি (mutation) ও নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভবত: আবাদী ধানের (Oryza saliva L.) উৎপত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। (এস. সেন : ইকনমিক বোটানী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২)।

ভারতে ধানের প্রাচীনত্বের আরো একটি প্রমাণ হল বিভিন্ন ধর্মীয় ও জন্ম থেকে মৃত্যু সমস্ত সামাজিক উৎসব ও ব্রতে বহু শতাব্দী ধরে ধানের ব্যবহার। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পঞ্চশস্যের (ধান, মাষকালাই, মুগ, তিল ও যব) অন্যতম ধান পবিত্র ও মাঙ্গলিক দ্রব্য।[১৯] দেবপূজায় ঘটের নিচে ধান দিতে হয়। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর আসনে ধান রাখতে হয়। ধানের অঙ্কুরযুক্ত স্থানে কার্তিকপূজা করার বিধান। মাটি ভরা সরায় ধানের চারা গজিয়ে সেই সরা কার্তিকের পাশে রাখা হয়।[২০] স্যার জে.জি. ফ্রেজার চারাভরা এই ধরণের পাত্রকে বলেছেন 'এডোনিসের উদ্যান' (Gardens of Adonis)।[২১] তাঁর মতে, উদ্ভিদের নবজন্ম ঘটাবার জন্য এ হলো এক ধরণের জাদু।[২২] যমপুকুর ব্রত, ইতুপূজা ইত্যাদি লৌকিক অনুষ্ঠানেও ধানের প্রয়োজন হয়।[২৩] মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।[২৪] গৃহ প্রবেশের সময় গৃহিণীকে ধানে ভরা কুলা মাথায় নিয়ে যেতে হয়।[২৫] ধান উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে (বোনা, কাটা, ঘরে আনা ইত্যাদি) বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়।[২৬] সব থেকে উল্লেখযোগ্য উৎসব নতুন ধানের চাল প্রথম ব্যবহারের উৎসব বা নবান্ন।[২৭] ধান্য উৎসবের মনোহর দৃশ্য সম্বলিত শুঙ্গ যুগের একটি মৃৎ ফলক চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।[২৮] একই স্থান থেকে পাওয়া গেছে একটি শীলমোহর যার উপরে উৎকীর্ণ ধান্য দেবীর মূর্তি।[২৯]

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও ভারতে ধানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়।[৩০] ঋগ্বেদে যব প্রধান খাদ্যশস্য হলেও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ধানের সমার্থক শব্দ 'ব্রীহি'র ব্যবহার রয়েছে।[৩১] 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'-য় বলা হয়েছে, ধানের বীজ বপনের অনুকূল ঋতু বর্ষা আর ফসল পাকার সময় হেমন্ত। কর্ণ ও অকর্ণ ধানের উল্লেখ ও এই গ্রন্থে আছে।[৩২] নাগসেন রচিত 'মিলিন্দ পঞ্হো' (মিলিন্দের প্রশ্ন) গ্রন্থে সাধারণ ধান (ব্রীহি) ও উৎকৃষ্ট ধানের (শালি) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩] বলা হয়েছে সব ফসলের সেরা হলো শালিধান। রক্তবর্ণ শালিধান রাজার আহারের উপযুক্ত, আর দাস ও কর্মকারদের জন্য অপরান্ত দেশের (কোঙ্কন উপকূল অঞ্চল) 'কুমুদভণ্ডিকা' ধানই প্রশস্ত।[৩৪] বোঝা যায়, সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য সরু ও মোটা, দামী ও সাধারণ চাউলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেকালেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্ন-নিদর্শন থেকে বর্তমান বাসমতী ধানের পূর্বসূরীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। 'কাশ্যপ সংহিতা' গ্রন্থে ২৬ রকমের 'শালি', 'কলম' ও 'যষ্ঠিক' ধানের উল্লেখ আছে।[৩৫] এর মধ্যে কিছু ধান ছিল সুগন্ধি।[৩৬]

মহেন-জো-দড়ো থেকে খননের মাধ্যমে যে পোড়া চাল পাওয়া গেছে তা প্রাচীন ভারতে উৎপাদিত প্রায় এক হাজার রকমের বাসমতীর একটি।[৩৭] এখনো পশ্চিম পাঞ্জাব বাসমতী ধান উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।[৩৮]

ড: বিষ্ণু মিটার মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক আহার (রাজস্থান) অঞ্চলে প্রাপ্ত চাউল, বিশেষত যেগুলি লম্বা দানা যুক্ত, তা সম্ভবত: বিখ্যাত ও সুগন্ধি দেরাদুন চাউলের পূর্বসূরী।[৩৯] এইস্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলির গায়ে এই ধরণের ধানের ছাপ যথেষ্ট পাওয়া গেছে।[৪০]

বিশ্ববিশ্রুত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩০-৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমরা পাই দুটি গ্রন্থে। এক, তাঁর নিজের রচনা সি-উ-কি ('পশ্চিমী দেশগুলির স্মৃতি')। দুই, তাঁর শিষ্য শমন হুই-লি রচিত তাঁর জীবনী।

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড: আর. কে মুখোপাধ্যায় সঠিক মন্তব্য করেছেন, অনুসন্ধানের ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার দিক থেকে তাঁর বিবরণ আধুনিক গেজেটিয়ার-এর অনুরূপ। তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল বৈজ্ঞানিকের মতো। তিনি মগধ দেশের এক বিশেষ ধরণের ধানের উল্লেখ করেছেন। এই ধান থেকে যে চাউল পাওয়া যেতো তা আকারে ছিল বড়ো, সুগন্ধি এবং তার স্বাদ ছিল চমৎকার। এর নাম ছিল 'মহাশালী' বা 'সুগন্ধিকা'। এই চাউলই বর্তমানে 'বাসমতী' নামে সুপরিচিত ও সমাদৃত। প্রাচীন মগধে সাধারণত: বিত্তবান ব্যক্তিরাই এই চাউলের অন্ন আহার করার সুযোগ পেতেন।[৪১]

হিউয়েন সাঙয়ের অনুগত শিষ্য শমন হুই-লি তাঁর মহান গুরুর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, চীনের এই মহাপর্যটক ও পণ্ডিত যখন নালন্দা মহাবিহারে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁকে সুগন্ধিকা বা মহাশালী চাউলের অন্ন পরিবেশন করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।[৪২] প্রতিদিন তাঁকে 'মহাশালী' চাউলের অন্ন পরিবেশন করা হতো। এই চাউল ছিল আকারে কালো কড়াইশুঁটির মতো বড়ো। রান্না করলে তার রং যেমন চকচকে হতো, তেমনি ছাড়ত মনোরম সুবাস।[৪৩] শমন হুই লি লিখেছেন, "এই চাউলের অন্ন কেবল রাজা বা অত্যন্ত বিশিষ্ট ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।"[৪৪] এখনো বিহারের নালন্দার গ্রামগুলিতে সুগন্ধি ধান জন্মায়; স্থানীয় অধিবাসীগণ একেই বলে 'বাসমত।'[৪৫]

'বাসমতী' নামটি কত প্রাচীন ? কখন এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ? নামটি কি নিতান্তই অর্বাচীন ? এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমান লেখক অন্তত আংশিকভাবে খুঁজে পেয়েছেন মধ্যযুগে রচিত একটি বাংলা গ্রন্থে। ধর্মঠাকুরের পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি সংকলন করেন।[৪৬] এই সংকলনের সম্পাদক প্রদত্ত নাম 'শূন্যপুরাণ।'[৪৭] রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল কিংবা গ্রন্থসংকলনের কাল কিছুই নিশ্চিতভাবে যায় না। তবে তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে

আবির্ভূত হন বলে অনুমান করা হয়।[৪৮]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'বৌদ্ধযুগের' রচনায় যেসব অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যায় তার একটি তালিকা দিয়েছেন। সেখানে বিভিন্ন ধরণের ধানের নামের মধ্যে 'বাসমতী' নামটিও পাওয়া যাচ্ছে। এই নামটির উল্লেখ আছে 'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থে।[৪৯]

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, 'শূন্য-পুরাণ' প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়, এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নানা প্রকার ধানের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। কৃষকগণ তাদের আদর করে নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করত। যেমন, 'মহীপাল', 'লালকামিনী', 'মৌকলস', 'খেজুরছড়া', 'রাজগড়', 'মুক্তাহার', 'মাধবলতা', 'সোনাখড়কি' ইত্যাদি।[৫০] আরেকটি নাম 'বাসমতী'। এই সব ধানের কথা আমরা এখন জানি না। 'শূন্যপুরাণ' এর কিছু অংশ অর্বাচীন হলেও, কিছু অংশ প্রাচীন। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থে 'বাসমতী'র উল্লেখ নি:সন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

হিউয়েন সাঙ-এর ভাবত-ভ্রমণের প্রায় এক হাজার বছর পরে পাঞ্জাবের কবি ওয়ারিশ শাহ ভারতে উৎপন্ন সুগন্ধি তণ্ডুলের কথা বলতে গিয়ে 'বাসমতী' নামের উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'হীররঞ্ঝা' (Heer Ranjha)। এর রচনাকাল ১৭৬৬। 'সায়েন্স রিপোর্টার' পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক আর.ডি. শর্মা দাবী করেছেন, এই কাব্যেই সর্বপ্রথম বাসমতীর উল্লেখ আছে। তাঁর দাবী ঠিক নয়। 'শূন্য পুরাণ' আরো আগে রচিত বাংলা কাব্য। সেখানে বাসমতীর উল্লেখ আছে।[৫১]

প্রণয়-আখ্যান 'হীররঞ্ঝা'র চারটি প্রাসঙ্গিক পংক্তি হলোঃ

"মুকী চাওলা দে ভরে হন বোধে
সোহি পর্টিরে ছিন্দকে ছন্দ দেনা,
বাসমতী, মুসাফরী, বেগমী সন,
হরীচন্দ নে জর্দিয়ে কবী দেনা।"

এর বাংলা তর্জমাটি এরকম:—

"ভান্ডারঘরগুলি ভ'রে আছে
সুগন্ধি তণ্ডুলের গন্ধে
খোসা ছাড়ানো, ঝাড়-পোছ করা
বাসমতী, মুসাফরী আর বেগমী[৫২]
এখানে হরিচন্দ[৫৩] এদের দিয়ে
বানিয়েছে জর্দিয়া[৫৪]।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় সাহিত্য, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বলা যায় বাসমতী ভারতেরই নিজস্ব অবদান। একে নিজের বলে দাবী করা অন্য যে কোনো দেশের পক্ষেই অযৌক্তিক।

সূত্র নির্দেশ

১. সায়েন্স রিপোর্টার, এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃ: ১৪।
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. সিং, পাণ্ডে, জৈন: এ টেক্সটবুক অব বোটানী, অ্যাঞ্জিয়োস্পারমস্, মীরাট, ১৯৯৪, পৃ: ১১
৬. সাম্বা মূর্তি: অ্যা টেক্সটবুক অফ ইকনমিক বোটানী, নিউ দিল্লী, পৃ: ২৬।
৭. স্টুয়াট পিগট্: প্রি-হিস্টোরিক ইন্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৬১, পৃ: ৪৩
৮. ডি.পি. অগ্রবাল: দি আর্কিয়োলজি অফ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৮২, পৃ: ৯৩
৯. ব্রিজেট অ্যাণ্ড আর অলচিন: দি রাইজ অফ সিভিলাইজেসন ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, নিউদিল্লী (ফার্স্ট সাউথ এশিয়ান এডিসন), ১৯৯৬, পৃ: ১১৮; ডি. কে. ভট্টাচার্য: অ্যান আউটলাইন অব ইন্ডিয়ান প্রিহিস্ট্রি, দিল্লী, ১৯৯০, ২য় সং, পৃ: ১৩৫।
১০. এম. এস. রণধাওয়া, অ্যা হিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম-১ নিউ দিল্লী, ১৯৮০, পৃ: ২৭১।
১১. ঐ।
১২. ঐ।
১৩. ঐ।
১৪. ঐ।
১৫. সিম্পসন অ্যাণ্ড ওগরজালি, ইকনমিক বোটানী, সিঙ্গাপুর, ১৯৮৬, পৃ: ১৬৪।
১৬. ঐ।
১৭. ঐ।
১৮. সায়েন্স রিপোর্টার. পূর্বে উল্লেখিত, পৃ: ১৪।
১৯. ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, পৃ: ১৩১।
২০. ঐ।
২১. জে. জি. ফ্রেজার, দি গোল্ডেন বাও (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ), লণ্ডন, ১৯৬৩, পৃ: ৪৪৯।
২২. ঐ।
২৩. ভারতকোষ, পূর্বে উল্লেখিত।
২৪. ঐ।
২৫. ঐ।
২৬. ঐ।
২৭. ঐ।
২৮. সংগ্রহ, জি. এস্. দে।
২৯. ঐ।
৩০. আর. এস. শর্মা, মেটেরিয়েল কালচার অ্যাণ্ড স্যোশাল ফর্মেশন ইন অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ: ৬১।
৩১. তদেব।
৩২. সায়েন্স রিপোর্টার, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ: ১১।

৩৩. রণবীর চক্রবর্তী: প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১২২।
৩৪. ঐ।
৩৫. রণধাওয়া, পৃ: ৪৮৫-৪৮৬।
৩৬. সায়েন্স রিপোর্টার, পৃ: ১১।
৩৭. ঐ।
৩৮. ঐ।
৩৯. রণধাওয়া পৃ: ১৫১।
৪০. ঐ।
৪১. প্রেমময় দাশগুপ্ত, হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ: ১০৬।
৪২. শমন লই-লি, দি লাইফ অফ হিউয়েন সাঙ, অনুবাদ: এস্ বিল, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ: ১০৯
৪৩. ঐ।
৪৪. ঐ।
৪৫. সায়েন্স রিপোর্টার, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ: ১১।
৪৬. ভারতকোষ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ: ৫০২।
৪৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ: ৬৫২।
৪৮. ভারতকোষ, পৃ: ৫০২।
৪৯. দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ: ১০২
৫০. ঐ, পৃ: ১০৮।
৫১. সায়েন্স রিপোর্টারে, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ: ১১-১৪।
৫২. বাসমতী, মুসাফরী ও বেগমী তিন ধরণের মহার্ঘ তণ্ডুল।
৫৩. হরিচন্দ রন্ধননিপুর একজন পাচকের নাম।
৫৪. 'জর্দিয়া' শব্দের অর্থ পোলাও।

জমির চাহিদা, যোগান ও তার পরিমাপ : প্রাচীন বাংলা

মলয় কুমার দাস

ভারতীয় অর্থনীতির মূল বুনিযাদ হোল কৃষি-ব্যবস্থা। সুদূব অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের জাতীয় আয়ের বেশীব ভাগ অংশই কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত হয়। গৃহীত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে কৃষির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১] সুতরাং আধুনিক গবেষকবা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন নুতন তথ্য ও তত্ত্বেব ভিত্তিতে কৃষি সংক্রান্ত এবং ভূমি-বিষযক অধিকাব গুলিব ব্যাপারে গবেষণা এবং পর্যালোচনা করছেন। একথা বলা যায় যে, পশুপালনের বদলে যখন প্রাচীন ভারতের অনেক স্থানে কৃষিই প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে, তখন থেকেই জমিব তাৎপর্য বেড়ে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থার যে শাখায় উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণেব তুলনায় জমির ব্যবহাব অনেক বেশী পরিমাণে করা হয়, সেই শাখাকে কৃষি বলে। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি যখন থেকে ভারতে শুরু হযেছে তখন থেকেই জমির গুরুত্ব যথার্থ অর্থে বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র কৃষিকাজ নয়, অন্য প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনেও ভূমির প্রতি মানুষের আকর্ষণ অধিক হয়।[২] জমিকে মূলত: কৃষি জমি; অ-কৃষি জমি; বন ও অন্যান্য জমি এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। জমি নিয়ে আলোচনা কবতে হলে অবশ্যই এব প্রধান বিষয়গুলি অর্থাৎ জমির চাহিদা, যোগান ও তার পবিমাপ এবং মালিকানা, বন্টন ব্যবস্থা, জমি ও ফসলের প্রশ্ন, শাসক শ্রেণীর কার্যকলাপ ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিব প্রতি যথাযথ অনুধাবন বা যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

প্রাচীন বাংলা বিশেষত গৌড় পুণ্ড্রদেশ, ববেন্দ্র, বঙ্গ ও বঙ্গাল, সমভট, হবিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সূক্ষ্ম, রাঢ, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি জনপদেব[৩] জমি মাপের আদি পদ্ধতিটি এই প্রবন্ধেব মুখ্য বিষয়। এর সঙ্গে জমি জরিপেব বিভিন্ন পদ্ধতিও আলোচিত হবে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিব আবাসভূমিকে 'বঙ্গদেশ' বলা হত। ইংরাজীতে বলা হত 'বেঙ্গল'। পর্তুগিজদের দেওয়া 'বেঙ্গল' শব্দ থেকে নিয়ে ইংরেজরা এই নামকরণ করেছিল। 'বেঙ্গল' শব্দটি আবার মুসলমানদেব দেওয়া 'বঙ্গালহ' শব্দেব রূপান্তব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুই বিদেশী পর্যটক মার্কোপোলো ও রশিদুদ্দিন তাঁদের বর্ণনায় 'বঙ্গাল' নামটা ব্যবহার করেন। মূলত সম্রাট আকবর যখন বাংলা অধিকার (১৫৭৬ খ্রী:) কবেন তখন আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গাল'-শব্দটা গৃহিত হয়।[৪] প্রাচীন কালের বাংলা বলতে বিশেষভাবে বোঝাত পুন্ড্রবর্ধন, বাঢ, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল-এই চাবটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সমষ্টি মাত্র।[৫] প্রাচীন বাংলায় ক্রয়-বিক্রয় যোগ্যপণ্য হিসাবে জমি কতটা গণ্য হোত তা অনুসন্ধান কবা আমাদেব আলোচনার অন্যতম বিযয।

ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদরা জমির বাজারের চাহিদা ও যোগান এই দুটি দিক বিশ্লেষণ করে বলার চেষ্টা করেছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে জমির বাজার বলে কিছু ছিল না। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী জমির বাজার ব্রিটিশ শাসনের বিশেষত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গড়ে ওঠে। এমনকি ইংরাজ শাসনকালে বিভিন্নভাবে ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যায়ণ করা হয়।[৬] আলোচ্য বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতটা সেটাও একঝলক পরখ করা হবে আজকে আলোচনার অঙ্গবিশেষ। যদি আমরা মার্কস এর 'এশীয় উৎপাদন-পদ্ধতি'-র তত্ত্ব মেনে নিই তাহলে বলতে হয় প্রাচীন ভারতে (প্রাচীন বাংলা সহ) জমির উপর যৌথ বা গোষ্ঠীগত বা সার্বজনীন মালিকানার প্রথাটি বজায় ছিল। এর ভিত্তি হোল গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজ, যেখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নেই অথচ শোষক ও শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে। এ এমন একটা সমাজ যেখানে ভূ-সম্পত্তির উপর যৌথ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী-শোষণের উদ্ভব ঘটেছে।[৭] মার্কস কার্যত ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতোই ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের অপরিবর্তিত চরিত্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার তত্ত্ব দ্বারা প্রাক্-আধুনিক সময়ের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন, ভারতের সমাজ পরিবর্তন বিমুখ, আবদ্ধ ও জড়বৎ। আলোচ্য তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ভারতে স্বনির্ভর গ্রামীর অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল অবিসংবাদিত; জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত ও রাষ্ট্রের দ্বারা গ্রাম সমাজ পুরোপুরি অবদমিত।[৮] একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলে বাখা দরকার তা হোল প্রাচীন ভাবতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় মার্ক্সীয় ভাবনার গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এই চিন্তা-চেতনা পববর্তীকালে ভারত ইতিহাস চর্চার পাথেয় হয়ে রয়েছে।[৯] ফলে নতুন বিতর্কের বাতাবরণ তৈবী হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্তআলোচনার নিরিখে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতে জমির কোন মালিকানা ছিল না। জমির অধিকার ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজা বা শাসক, রাষ্ট্র বা সরকারের। ইংরাজ পণ্ডিত জেমস মিল প্রথম ভারতে গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবনের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও অচল, অনড় সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেন।[১০] তিনি জমির উপর রাজার নিরঙ্কুশ মালিকানার স্বীকৃতির কথাও উল্লেখ করেন।[১১] বার্নিয়েও এই মতটি মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব নেই।[১২] মনে হয় ভোগ দখলের অধিকার ছিল বা ভূমিদাস প্রথা বহাল ছিল। এখন প্রশ্ন হোল, কথাগুলি কতদূর যুক্তিসম্মত ? সত্যই কি উক্ত ব্যবস্থা প্রাচীন বাংলা, এমনকি প্রাচিন যুগের ভারতে বজায় ছিল ? আবার সূত্রগুলি কিন্তু অন্য ধরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জরিপ, নিরীক্ষণ ও খননের সাহায্যে প্রাপ্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিশেষ করে উৎকীর্ণ লিপি বা লেখমালা ও তাম্রশাসন এবং প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে পরিষ্কার ভাবেই ভূমিব্যবস্থা, কৃষি অর্থনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থা সহ অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।[১৩]

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যেহেতু মানুষ কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিল না, তাই তখন জমির চাহিদা বলে কিছু ছিল না। কৃষি এমনই একটি কার্যকলাপ যেখানে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে প্রাকৃতিক

শক্তিসমূহ, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। কৃষিকার্য সম্পর্কে যখন মানুষের মনে ধারণা তৈরী হয় তখন থেকেই মনে হয় জমির চাহিদা ও যোগান এর বিষয়টি প্রাধান্য পায়। কৃষি উৎপাদনের ইতিহাসের দিকটিতে নজর নিক্ষেপ কবলে দেখা যায়-আদিম অবস্থায় মানুষ শিকার ও ফলমূল আহরণ করে জীবন ধারণ করতো। তাদের জীবন ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা, স্বল্লায়ু, এবং যাযাবর। আহরণ ভিত্তিক অর্থনৈতিক যুগে মানুষের কাজকর্মকে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করত। এরপর মানুষ যখন পশুপালন যুগে প্রবেশ করে তখনও সে, পুরোপুরি প্রকৃতিব নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এমনকি যাযাবর জীবনও সে ত্যাগ করেনি। অবস্থাব পরিবর্তন ঘটিযে এরপর শুভ মুহূর্ত এল। মানুষ শ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়ও বের করে। তারপর যাযাবর জীবন ত্যাগ করে কৃষিকর্ম ভিত্তিক আর্থ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করল।[১৪] কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি শুরু হওয়ায় যথার্থ অর্থেই ভূমিব গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অবশ্য প্রথম দিকে জনসংখ্যা কম থাকায়, রাষ্ট্রায়ণ না হওয়ায় এবং সামাজিক জীবনের জটিলতা কম থাকায় জমির চাহিদা ও যোগান নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কৃষি সভ্যতার বয়স যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে ফলে জমি ও তৎসহ বহুবিধ সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্ট্রীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস হল কৃষি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, বিকাশ, নগরায়ন কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি-র সূচনা ও সম্প্রসারণ এবং কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির ক্রমশ বিস্তার লাভ। এই পর্বেই বহু ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষণীয়।[১৫] আদি মধ্যযুগে বিশেষ করে ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র ভারতকে নিয়েই কৃষির সম্প্রসারণ দেখা দেয়। বিস্তীর্ণ অনাবাদী এলাকাকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে কৃষির অগ্রগতি যেমন প্রসাবিত হয় তেমনি নতুন জনপদের পত্তন হয় এবং জমি বা ভূমিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করতে দেখা যায়।[১৬] এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অগ্রহার ব্যবস্থা।[১৭] অনেক ঐতিহাসিক আবার এই যুগকে ভারতের সামন্ততন্ত্রের যুগ বলে উল্লেখ করেছে।[১৮] তবে প্রকৃত অর্থেই সামন্ততন্ত্র বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য ও বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অগ্রহার ব্যবস্থার মূল দিক হল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, বৌদ্ধবিহার ও জৈন দেবদেবীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূ-সম্পদ দান। ভূমির মালিকানায় হাত বদল, জমি ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি।

কৃষি অর্থনীতির নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য যেমন ভূ-সম্পদ হস্তান্তর, জমি মাপের একক, জমি পরিমাপ করার পদ্ধতি, জমিব নানা প্রকার ভেদ, জমির মালিকানা, জনবসতিহীন অনুৎপাদক এলাকাকে কাজে লাগিয়ে, কৃষি অর্থনীতির আওতায় আনার প্রচেষ্টা, নতুন জনপদ তৈরী বা নগরায়ন, অগ্রহার ব্যবস্থা বা ভাবতের সামন্ততন্ত্র, ভূ-সম্পদ দান, কৃষি সংক্রান্ত দপ্তর, জমিব চাহিদা, যোগান, জমির বাজার ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। কাবণ কৃষি ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ ও অবনতির (অবক্ষয় যদি হয়ে থাকে) এটাই ছিল সময়কাল। বাংলা তথা ভারতে প্রাপ্ত লেখমালা এবং তাম্রশাসনগুলি[১৯] অতীত ইতিহাসের (অর্থাৎ সমকালীন সময়ের) আলোচ্য বিষয়গুলির যথাযথ সত্য উদ্ভাসিত করে।

এবার আমরা অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে জমিব চাহিদা ও জমিব যোগান-বিষয় দুটি

আলোচনা করব। চাহিদা ও যোগানের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী দাম কমলে চাহিদা বাড়ে; দাম বাড়লে চাহিদা কমে। যোগানের ক্ষেত্রে বিপরীত নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে।[২০] ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে তবে জমির ক্ষেত্রে সূত্রটি অন্যভাবে রূপায়িত হয়। প্রাচীন ভারত, বিশেষ করে প্রাচীন বাংলায় প্রথম দিকে চাহিদার প্রশ্ন দেখা না দিলেও পরবর্তীকালে জমির চাহিদা বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তাম্রশাসন এবং লেখমালাগুলির তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে তখন ব্যাপকভাবেই জমির মালিকানার বদল হোত।[২১] জমির বাজারে জমি ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর হত।[২২] সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্য হিসাবে ভূমির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এছাড়া জমির ইজারার বাজারে সাময়িকভাবে রাজস্ব বা খাজনার বিনিময়ে ভূমি ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়।[২৩]এক্ষেত্রে কৃষিজমি, অ-কৃষিজমি এবং অন্যান্য জমি-এই তিন ভাগে বিভক্ত করে জমির বাজার গড়ে উঠত। আকর সূত্রগুলি ভালো করে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হয় সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে প্রাচীন বাংলা তথা প্রাচীন ভারতে জমির বাজার না থাকাটাই হবে অস্বাভাবিক ব্যাপার! সেই বাজারে একদিকে যোগান এবং অন্যদিকে চাহিদা থাকবেই-ই।

জমির চাহিদা মূলত কতগুলি কারণেব ফলে দেখা যায়। যেমন: (১) ব্যক্তি বা পরিবার জোতের আয়তন বাড়াবার জন্য জমি ক্রয়ে আগ্রহী হয়; (২) যার ইতিপূর্বে কোন জমি ছিল না, সে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য বা তার হাতে পূর্বের তুলনায় সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশী হওয়ায় জমি ক্রয় করতে পারে: (৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কৃষিকার্য এবং গৃহ নির্মাণের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে; (৪) কৃষি অর্থনীতির বিকাশের ফলে কৃষি জমির চাহিদা বাড়তে পারে; (৫) নগরায়ন বা নতুন নতুন জনপদ গঠনে উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে কৃষি জমি বন্টনের উদ্দেশ্য থাকলে; (৭) পূর্ণ অর্জনের জন্য ধর্মীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করার উদ্দেশ্যে কোন লোক জমি ক্রয় করতে পারে; (৮) ছোট ছোট গণ রাজ্য থেকে বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হওয়ার তাগিদ অনুভূত হলে; (৯) শিল্পায়ন ঘটলে এবং বাজার নির্মাণের প্রয়োজন হলে; (১০) কর্ম-সংস্থান এর সুযোগ বৃদ্ধি পেলে; (১১) ভূ-খণ্ড দখলের লড়াই; (১২) সুষ্ঠু-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমানা নির্দেশের কারণে; (১৩) পুকুর নির্মাণ বা পশুপালন ক্ষেত্র তৈরীর প্রয়োজনে; (১৪) উন্নত মানের জমির প্রতি লোভ; (১৫) ব্রাহ্মণদের বসতি সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম বা মূল্যায়ণ নিশ্চয়ই আছে তবে চাহিদার সাধারণ সূত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[২৪]

জমি প্রাকৃতিক সম্পদ তাই জমির যোগান সীমাবদ্ধ। তবুও কিছু ক্ষেত্রে জমির যোগান লক্ষ্য করা যায়। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে জমি স্থাবর অর্থাৎ জমিকে স্থানান্তর করা যায় না। জমির মালিকানার হস্তান্তরের মাধ্যমে জমির যোগান লক্ষ্য করা যায়।[২৫] যে সকল কারণগুলির ফলে জমির যোগানের ধারাবাহিকতা দেখা দেয় তাহা হল: (১) যারা জমি বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হন; (২) জমি হস্তান্তরের প্রয়োজন হলে; (৩) সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয় নির্বাহ অথবা পরিবারের প্রয়োজনে ভূ-সম্পত্তি বিক্রি হলে; (৪) বাসস্থান বা গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য

কোন গঠনমূলক কাজে অর্থের প্রযোজন হলে ব্যক্তিতার অতিরিক্তজমি বিক্রয় করতে আগ্রহী হয়। সেই ক্ষেত্রে জমির যোগান বাড়ে; (৫) জমি চাষে অক্ষমতা; (৬) রাজস্বের বোঝা অথবা ঋণের কাবণে; (৭) বাসস্থান থেকে জমির দূরত্ব থাকলে; (৮) ব্রাহ্মণ অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ও জৈন এবং হিন্দু দেবদেবীর মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্প্রদানের মাধ্যমে; (৯) ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজন; (১০) অনাবাদী এলাকাকে আবাদী এলাকায় পরিণত করলে; (১১) অতিবিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বাজা বা শাসক জমি হস্তান্তর করতে পারে ; (১২) কখনও কখনও রাজকোষাগারে আয় বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্র বা শাসক তার অধীন জমি বিক্রয় করে।[২৬]

মানুষ যখন পরিপূর্ণভাবে জমিকে কাজে লাগাতে শুরু করে এবং কৃষিবিদ্যা আয়ও করতে সক্ষম হয় তখন সে বারবার চেষ্টা করে কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম বা পদ্ধতি যেমন বীজবপন কখন করতে হবে, কখনই বা ফসল কাটতে হবে, জমির আয়তন বা পরিমাণ কত হবে, বাড়িব নক্সা, রাজ্যের সীমানা কিভাবে নির্ধাবিত হবে, বাজার বা নগর গড়ে ওঠার পরিকল্পনা, কার অধিকারে কতটা জমি থাকবে; জমি বন্টনের, বিক্রয় মূল্য, রাজস্ব নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। এ ক্ষেত্রে জমি জরিপ বা জমির পরিমাপ অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে। ইতিহাসের প্রচিন-মধ্যযুগে ভূমিরাজস্ব বা কর আদায়ের ক্ষেত্রে যেমন চাষযোগ্য জমির পরিমাপ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিচার্য হতো তেমনি ব্যক্তিগত বসত-বাটি, সামাজিক বিভিন্ন ভূ-সম্পত্তি ও রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা পরিসীমা বিষয়ক জরিপি ব্যবস্থা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে একটি সংহত রূপ লাভ করেছে। তবে আজো বাংলার মানুষ ভূমি সংক্রান্ত নানা সমস্যায় ক্লান্ত হচ্ছেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে পূর্বতন (প্রাচিন) বাংলার জরিপি ব্যবস্থার অনেক ত্রুটিপূর্ণ দিকেব পরিবর্তনসাধনের মাধ্যমে বর্তমানে জরিপি ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জমি মাপের সবচেয়ে ছোট একক হল ছটাক। অবশ্য ভূমি সংস্কার দপ্তরের খতিয়ানে শতক হল বর্তমানে জমি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক। জমির মাপের পরবর্তী একক গুলি হল কাঠা, বিঘা, একব, হেক্টর ইত্যাদি।[২৭] এমনকি বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতে এভাবে জমি পরিমাপ করা হয়। আধুনিক ইউরোপীয় স্টান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী জমি মাপের এককগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে;

১ শতক	=	৪৩৫.৬	বর্গফুট এবং	৪০.৪৭	বর্গ মিটার
১ ছটাক	=	৪৫	বর্গফুট এবং	৪.১৭	বর্গ মিটার
১ কাঠা	=	৭১৮.৭৪	বর্গফুট এবং	৬৬.৭৭	বর্গমিটার
১ বিঘা	=	১৪৪০০	বর্গফুট এবং	১৩৩৮	বর্গমিটার
১ একর	=	৪৩৫৬০	বর্গফুট এবং	৪০৪৭	বর্গমিটার
১ হেক্টর	=	১০৭৬৩৯	বর্গফুট এবং	১০০০০	বর্গমিটার

(অনুরূপভাবে ১ শতক = ৯.৭০৫ ছটাক, ১ ছটাক = ৪৫ বর্গফুট, ১ কাঠা = ১৬ ছটাক, ১ বিঘা = ২০ কাঠা, ১ একর = ৩ বিঘা ৮ ছটাক, এবং ১ হেক্টর বলতে ২.৪৭১০৫৪

একর বা ১০০০০ বর্গ মিটার পরিমিত স্থানকে বোঝায়।[২৮] জমি জরিপ বা পরিমাপের ক্ষেত্রে বর্তমানে কাঁটা কম্পাস, নির্দিষ্ট পরিমাপেব স্কেল, গজ বা ফিতে, নির্দিষ্ট মাপের লোহার চেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবার আমরা প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে জমির মাপ নেবার পদ্ধতি আলোচনা করব।

গুপ্তাব্দ ১১৩ থেকে ২২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪৩৩ অব্দ থেকে ৫৪৪ অব্দ পর্যন্ত সময়কালীন প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি থেকে জমি মাপের একক, জমি পরিমাপ পদ্ধতি এবং প্রকার ভেদ সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়। ইহা ব্যতীত তাম্রশাসন গুলি জমির মালিকানার খবর, ভূ-সম্পদ হস্তান্তরের খবর, ভূমিদানের কথা এমনকি জমি ক্রয়-বিক্রয় ও জমির মূল্যের কথাও বলে।[২৯] এই জাতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জমি সংক্রান্ত কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ দপ্তর ও জমির বাজারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জমি যে পণ্য হিসাবে প্রাচীন ভারতে গুরুত্ব লাভ করেছিল সেদিকেও কিছুটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে প্রাপ্ত গুপ্ত শাসকদের উৎকীর্ণ লেখ, বৈন্য গুপ্তের ঘুণাইঘর লেখ, বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা-বিক্রমপুর-ফরিদপুর অঞ্চলে গুপ্ত পরবর্তী শাসক যথা গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব-এর তাম্রশাসন, গুপ্ত সময়কালের দামোদরপুরে পাঁচটি তাম্রলেখ, দেবখড়গের আসরাফপুর লেখ, লোকনাথের টিপপারা শাসন, দামোদর দেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন, পাল-সেন যুগের তাম্রশাসন বিশেষ করে বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন এবং বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দাক্ষিণাত্যে বাকাটক এবং বলভীর মৈত্রক বংশের এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগৃহীত এরকম বহু লেখমালা এবং তাম্রশাসন থেকে কৃষি অর্থনীতি এবং জমি সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।[৩০]

প্রাচীন বাংলায় বিশেষত: 'আঢ়োবাপ', 'দ্রোণবাপ' ও 'কুল্যবাপ'[৩১] নামক এই তিনটি এককের সাহায্যে জমি মাপ করা হত। জমি মাপের সর্বোচ্চ একক হল 'পাঠক'।[৩২] পাঠকের সাহায্যে প্রাচীন বাংলায় ব্যাপক হারে জমি জরিপ করা হত একথা বলা যায়। পরবর্তীকালে একটি মাপক দণ্ড বা 'নল' জমির রৈখিক মাপ নেওয়ার একক হিসেবে ব্যবহৃত হোত।[৩৩] কখনও কখনও দুই বা দুয়ের অধিক নলের ব্যবহার জমি মাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হোত বলে মনে করা যেতে পাবে। কৃষি অর্থনীতির এক মুখ্য বিষয় হল ভূমি পরিমাপ ব্যবস্থা। মনে হয় এব্যাপারে প্রাচীন বাংলার মানুষ যথেষ্ট সচেতন ছিল। জমি মাপের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে হাতের আঙ্গুলের বিশেষ করে মধ্য আঙ্গুলের ব্যবহারও অজানা ছিল না।[৩৪] গুপ্ত লেখমালায় হাতের সাহায্যে (কনুই থেকে মধ্য আঙ্গুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত) জমি মাপের প্রচলন ছিল এ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৫] দাক্ষিণাত্যে 'পাদাবর্ত্ত' নামক একটি জমি মাপের এককের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৬] এর থেকে মনে করা যেতে পারে ভারতের এমন কি প্রাচীন বাংলায় ভূমি ব্যবস্থার আঞ্চলিক তারতম্যের জন্য বিভিন্ন রকম এককের প্রচলন ও সহাবস্থান ছিল। অবশ্য প্রযুক্তির (উৎপাদন-কৌশল) পরিবর্তনের ফলে বা বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা ভাবনার ফলে এসব সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিরও সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। 'বাপ' কথার অর্থ হল বপন। মনে হয় এক মুষ্টি ('দ্রোণ') বা এক ঝুড়ি ('কুল্য') পরিমাপ বীজ যে আয়তনের

পরিমাণে ছড়ালে কৃষির পক্ষে প্রশস্ত হত, ততটুকু পরিমাণ জমি দ্রোণবাপ ও কুল্যবাপ-এর একক হিসাবে গ্রহণ করা হত।[৩৭] আধুনিক মাপ অনুযায়ী ১ 'দ্রোণবাপ' = ১৬-২০ বিঘা, ১ 'কুল্যবাপ' = ১২৮-১৬০ বিঘা, ১ 'আঢ়বাপ' = ৪-৫ বিঘা, ১ 'পাঠক' = ৪০ 'দ্রোণবাপ' এবং পাঁচ 'কুল্যবাপ'[৩৮] মাপের রকমফের বিভিন্ন শাসনকালে হতে দেখা যায়। জনবসতির বৃদ্ধি, কৃষির প্রসারের ফলে জমির উপর চাপ ও চাহিদা দুই-ই বাড়ার ফলে মাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঘুগ্রাহাটির তাম্রশাসনের বিবরণ অনুযায়ী সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ৪০ দ্রোণে ১ পাঠক হত। কিন্তু তারপরে পাঠক ও দ্রোণের অনুপাতের সংকোচন হয়। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন অনুযায়ী দশম শতাব্দীতে ১০ দ্রোণে ১ পাঠক হয়। স্বাভাবিক ভাবেই পক্ষপাতিত্ব, কারচুপি, জমি বন্টনের তারতম্য পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবধান প্রভৃতি বিষয়গুলি এরপর থেকে বাংলায় বস্তুগত সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রাচীন বাংলার জমি মাপের আদি পদ্ধতিটি হল 'কোসবাপা' (KOŚAVĀPA)।[৩৯] এরূপ মাপের সাহায্যে জমিব ক্ষুদ্রতব একককে বোঝান হত। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হাদিপুরে প্রাপ্ত ৯০ গ্রাম বিভিন্ন ধরণের বীজ ধরে এরকম একটি মাটির পাত্র বা ছোট কলসীর কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। পাত্রের গায়ে খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী অক্ষরে 'বাপায়ে-যোস' (Vapaya yoŚa) কথাটি উৎকীর্ণ করা আছে। কুল্য বাপ ও দ্রোণবাপ কথাদুটির মধ্য দিয়ে 'কোসবাপা' কথাটির সমর্থন আদায় করা যায়। এক কোস পরিমাণ বীজ (৭০ গ্রাম) জমিতে যে আয়তনে ছড়ান হয় এবং কৃষির পক্ষে যতই প্রশস্ত হত, তাই 'কোসবাপ' জমিব একক হিসাবে পরিগণিত হত।[৪০] প্রাচীন বাংলার এটি হল প্রথম উদাহরণ। কুল্যবাপ বা দ্রোণবাপ-এর ক্ষেত্রে আনুমানিকভাবে পরিমাপ করা হত। বরং বলা যায় 'কুল্যবাপ' এর চেয়ে এটা অনেক বেশী স্বচ্ছতর ধারণা। এর পরে অবশ্য নল দ্বারা জমি-জরিপ চালু হয়। মুঘল যুগে আমরা জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে 'গজ-ই-সিকান্দরী', 'গজ-ই-ইলাহী', 'বিঘা-ই-দফতরী', এই তিন ধরণের পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাই।[৪১] স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে জমি জরিপ হয় ফিতের সাহায্যে (১৯৬২ খ্রী:)। এই সকল কার্যকলাপের ফলে মালিকানার হাত বদলের চিত্র, জমির ক্রয় বিক্রয়, জমির দাম তথা জমির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

পরিশেষে একথা স্বীকার কবতেই হবে যে প্রাচীন বাংলা তৎসহ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠন আর যাইহোক মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। তাম্র শাসনগুলির সাহায্যে ভূমি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাসের সামান্য বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয় যে জমি ও সম্পত্তির ওপর এজমালি মালিকানা[৪২] ছাড়াও নানা ধরণের মালিকানা প্রচলিত ছিল। সাধারণত: দেশের ভূ-সম্পত্তি তখন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজার খাস দখল এই তিন ভাগে বিভক্তছিল।[৪৩] সুতবাং জোরের সঙ্গে একথা বলা যায় যে রাজা দেশের সমস্ত আবাদী জমির মালিক ছিলেন না। প্রাচীন উপাদান গুলিতে পরিষ্কার ভাবেই মতামত পোষণ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম প্রধান এবং প্রজাদের রক্ষাকর্তা হিসেবেই দেশের রাজা রাজস্ব আদায় করেন, জমির মালিক হিসাবে তা কখনই নয়।[৪৪] খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্যক্তিগত ও ভূ-সম্পত্তির মালিকানার আরও প্রসার ঘটে। ঋগ্বেদ (সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ) এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে কৃষিজমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার

সামান্য আভাস পাওয়া যায়।[৪৫] 'মানব-ধর্মাশাস্ত্রে' বা 'মনুসংহিতায়' (সময়কাল, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে) জমির ওপর এজমালি দখলি স্বত্বের এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়।[৪৬] জমি বিক্রয়, দান এবং বন্ধক-এই ত্রিবিধ লক্ষণ গুলিই হল ব্যক্তিগত মালিকানার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'স্মৃতিশাস্ত্রে' ব্যক্তিমালিকানায় উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণের কথা উল্লিখিত।[৪৭] 'নারদ-স্মৃতি' (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় আর চতুর্থ শতাব্দীর), 'বৃহস্পতি-স্মৃতি'[৪৮] (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী), 'বৌধায়ণ ধর্মসূত্র', 'সংযুক্তনিকায়তে' এবং অর্থশাস্ত্রে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ইঙ্গিত দেয়।[৪৯] উক্ত সূত্রগুলি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভূমির দাবিদার হিসাবে স্বয়ং রাজারও অধিকার নেই ব্যক্তি-মালিকানার ভিত্তিকে লঙ্ঘন করার। যদি তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বাড়ি বা জমির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি এক ভূ-স্বামীর থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে দান করেন তবে তা আইন বিরুদ্ধ কাজ হবে।[৫০] ভূমির দাবিদার হিসাবে ব্যক্তিই প্রধান এরূপ ধারণার বৈদিক ও মৌর্যকালের সাহিত্য ঘাঁটলে প্রমাণ পাওয়া যাবে। বৈদিক যুগের সমাপ্তির পূর্ব থেকেই ভূমির উপর সার্বজনীন অধিকার নষ্ট হতে তাকে এবং মনে হয় যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা ক্রমশই উদ্ভূত হচ্ছিল। প্রাপ্ত লেখমালা ও তাম্রশাসনগুলি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থ তো বহন করেই। মুদ্রার প্রচলন, মহাজন শ্রেণী, ঋণগ্রস্ত কৃষক, জমি বিক্রয় ও বন্ধক এই শব্দগুলি আলোচ্য দাবী বা বক্তব্যকে আরও জোরদার করে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জমির ওপর এক সময় গোষ্ঠী মালিকানা ছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তিত হয়। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ভূমির অধিকারের প্রশ্নে রাজার কর্তৃত্ব থাকলেও পাশাপাশি সমষ্টি ও ব্যক্তির মালিকানা অবশ্যই বিরাজ করত। একথা প্রযোজ্য যে প্রত্যেক যুগেই, সে যুগের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী চিন্তাধারা, নিয়মকানুনের সৃষ্টি হয়। জমিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্নও তার ব্যতিক্রম নয়।

এতো গেল জমিব মালিকানা প্রসঙ্গ। প্রাচীন বাংলা এমন কি প্রাচীন ভারতে জমির বাজার আদৌ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে দু-চার কথার অবতারণা প্রয়োজন। ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকদের যুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন তাম্রশাসন এবং লেখমালা এবং আকর সূত্রগুলির উদ্ধৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা দান, বিক্রয়, বাঁধা রাখার অধিকারের মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার অকাট্য প্রমাণ পাই। আর অর্থনীতির কথানুসারে জমিতে উক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি হলে তবেই জমির বাজার তৈরী হয়। কারণ একমাত্র ভূ-মালিকেরই অধিকার আছে তাঁর জমি সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত (নিজের জমি বিক্রি, দান করতে, বন্ধক রাখতে কিংবা ইজারা দিতে) নেবার। ভারতীয় পুঁথিগুলিতে এব্যাপারে বহু সাক্ষ্য মেলে। ব্রাহ্মণের কাহিনী এ-প্রসঙ্গে বলা যায়। যিনি তাঁর জমির একাংশ অন্যকে দান করে দিচ্ছেন। অন্যত্র বর্ণনা আছে এক বণিক যুবরাজের কাছ থেকে একটি ফলের বাগান কিনছেন।[৫১] মনুসংহিতাতেই স্থাবর সম্পত্তির ক্রয় ও বিক্রয় এবং দান করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৫২] নারদ স্মৃতিতে ও যাজ্ঞবল্ক্যতেও দখলি স্বত্বের অধিকার নিয়ে অনেকখানি আলোচনা আছে। নারদস্মৃতিতে জমি বিক্রয় করার কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।[৫৩] শ্রেষ্ঠ অনাথ পিণ্ডকের কাহিনী আলোচনার

পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫৪] যিনি শ্রাবন্তীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে সুপরিচিত। তিনি জেতবন নামক এক সুন্দর বাগিচা বহু অর্থে ক্রয় করে 'বুদ্ধদেব' কে দান করেন। এক্ষেত্রে জমির দু-বার হাত বদল (বিক্রি, দান) ঘটে। এই ঘটনা জমিতে ব্যক্তিমালিকানা, জমি ক্রয়-বিক্রয়, এবং জমি লেনদেনের জন্য জমির বাজারের অস্তিত্বকেই সমর্থন করে। অন্য আর একটি উদাহরণ হল-মৌর্যোত্তর পর্বে ক্ষত্রপ নহপানেব জামাতা ঋষভদত্ত বারাহীপুত্র অশ্বিভূতি নামক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক জমির অংশ বিশেষ নগদ অর্থের বিনিময়ে কিনে বৌদ্ধ সংঘকে দান করে।[৫৫] এখানেও দুইবার হাত বদলের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। লেখমালায় উল্লিখিত 'হালিক'[৫৬] শব্দটির মধ্য দিয়েও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে অনেক সংবাদ জানা যেতে পারে। জমি পাবার জন্য নগদ মূল্যে কেনা বেচা ও ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তথ্য প্রাচীন বাংলায় বহু স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি থেকে যে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা বা প্রমাণ মনে হয় আর নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। হস্তান্তরযোগ্য জমির দাম কেমন ছিল সেই ইঙ্গিত ও বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে আছে।[৫৭] জমি ক্রয়-বিক্রয়, দান, ইজারা, ইত্যাদি বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ দলিল হোল প্রাচীন বাংলার গুপ্তকালীন তাম্রশাসনগুলি।[৫৮] প্রাচীন বাংলার লেখমালা ও তাম্রশাসন গুলি থেকে আরও জানা যায় যে রাষ্ট্র বা শাসক কৃষির প্রসারের লক্ষ্যে অনাবাদী পতিত ভূখণ্ড জাতীয় জমি বিক্রি করে তার অনাবাদী অঞ্চলের বোঝা কমাত। এমনকি রাজা তার প্রশাসনে তৎক্ষণাৎ নগদ অর্থ অর্জনের জন্য জমি বিক্রি করত।[৫৯] সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে প্রাচীন বাংলা তথা ভাবতে জমির বাজার ছিল। প্রাচীন উপাদান গুলি আরও বেশী করে গবেষণা করলে সত্য বক্তব্য বা ঘটনা আরও বেশী করে সকলের সামনে উন্মোচিত হবে। 'জমির বাজার' না থাকটাই হবে সেক্ষেত্রে বিস্ময়কর! জমির বাজার থাকলে সেখানে চাহিদা ও যোগান-এর সূত্রটি কার্যকরী হয়। জমির বাজার দুই রকম। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত জমির বাজার (Land Market) বলতে বোঝায়, যেখানে জমির মালিকানাস্বত্ব বদল হয়। অর্থাৎ যেখানে জমি বিক্রেতা মালিকানা হারায় আর যিনি জমি ক্রয় করছেন তিনি মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেন। অর্থ মূল্যের বিনিময়ে এবং অন্যান্য কারণে জমির অধিকার স্বত্ব বদল হওয়াকেই জমির বাজার বলে অভিহিত করা হয়।[৬০] একথায় দ্রব্যের (জমি ব্যতিত) বাজার বলতে বুঝি, যে স্থানে কোন পণ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্যের ভিত্তিতে কেনা বেচা হয়। জমির বাজারের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় মালিকানা স্বত্ব বদল হচ্ছে না কিন্তু খাজনার বা ভাড়ার বিনিময়ে জমির মালিক শুধু জমিটি ব্যবহার বা চাষ করার স্বত্ব অন্য একজনকে বা একাধিক জনকে দিচ্ছেন। এই বাজারকে জমি ইজারার বাজার বলে।[৬১] প্রাচীন বাংলায় এরূপ বৈশিষ্ট্যও বিশেষ লক্ষণীয়।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে বিষয় গুলিকে নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করলাম তা থেকে এই তত্ত্বই পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে ভারতে জমি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য হিসাবে আগে ছিল না ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিক (বিশেষত ব্রিটিশ) এর এরূপ চিন্তা ভাবনা অবশ্যই ভুল বলে প্রমাণিত হয়। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তথ্যাল্পতা এবং পূর্বানুমানের

আশ্রয়েই কী অদ্ভুত বিশ্লেষণ তাঁরা করেছেন তা অনুধাবন করা যায়। সঠিক বিশ্লেষণ পেতে হলে অবশ্যই সঠিক দূরদৃষ্টির সাহায্যে আবও বেশী মাত্রায় তাম্রশাসনগুলির গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলা এমন কি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমির মালিকানার বন্টন ব্যবস্থায় অসাম্য লক্ষ্য করা গেলেও ভূমিব উপর ব্যক্তির অধিকারের অনেক সাক্ষ্য বর্তমানে সহজলভ্য। সুদূর অতীতে আমাদের ভারতে জমির বাজার ছিল ঠিকই তবে তা কখনই পূর্ণাঙ্গ রূপে বিরাজ করেনি একথা আংশিক সত্য। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির আকার ও আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়। পরস্পর, পরস্পরকে মনে হয় ঠকাতে শুরু করে। জমি জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলনের ফলে 'কারচুপি' বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে থাকতে পারে। আধুনিক যুগে বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়। জমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে ভবিষ্যৎ গবেষণা হয়ত নতুন পথের সন্ধান দেবে।

সূত্র নির্দেশ

১. ডঃ রাধাকমল মুখার্জী, জনসংখ্যা ও কৃষির প্রান্তিক উৎপাদন, কলিকাতা। অরুণ কুমার সেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে জমির অবদান. কলিকাতা। এছাড়া এ বিষয়ে যে কোন ভালো অর্থনীতির বই যুক্তিপূণ আলোচনা পাওয়া যাবে।

২. জয়দেব সরখেল, আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা, কলিকাতা। অরুণ কুমার সেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে জমির অবদান, কলিকাতা।

৩. ড: দীনেশ চন্দ্র সরকার, পাল-পূর্ব যুগের বাংলানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ৩৮-৫৩।

৪. ড: অতুল সুব, বাংলা নামের উদ্ভব ও বিবর্তন, প্রবন্ধ, রবিবারের প্রতিদিন, ১লা আগষ্ট - ১৯৯৯

· ড: সুকুমার সেন, বাংলাদেশ ও দেশ নাম, প্রবন্ধ, রবিবারের প্রতিদিন, ১ আগষ্ট, ১৯৯৯।

৫. এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জীব সম্প্রতি প্রকাশিত বই-'বঙ্গ-বঙ্গাল-বাংলা', কলিকাতা, ২০০০, খুবই উপযোগী।
অমিতাভ ভট্টাচার্যের "হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফী অফ্ এনসিয়েন্ট এ্যাণ্ড আরলি মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল", কলিকাতা, ১৯৭৭, বইটি খুবই কার্যকরী।
রীতা ঘোষ রায়, সমতট-হরিকেলেব লেখমালায় ভূমির প্রকার ভেদ, প্রবন্ধ, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ১৫৫।

৬. অরুণ কুমার সেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে জমির অবদান, কলিকাতা।
অশোক রুদ্র ও অমর্ত্য সেন, "ফার্ম সাইজ এণ্ড লেবার ইউজ : অ্যানালিসিস এণ্ড পলিসি", ইকনোমি এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ইং প্রবন্ধ, বার্ষিক সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০।

৭. সুনীল মিত্র, মার্ক্সীয় দর্শন সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৫৩-৬৬।
রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৯৮, পৃ: ১৭-১৯।
গৌতম ভদ্র, মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, কলিকাতা-১৯৯১, পৃ: ১-১৩।

৮. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৯৮, পৃ: ১৭-১৮।
৯. ঐ, তদেব, পৃ: ১৮-১৯।
১০. সুনীল মিত্র, মার্ক্সীয় দর্শন সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৫৬।
১১. ঐ, তদেব, পৃ: ৫৬।
১২. ঐ, তদেব, পৃ: ৫৮।
১৩. উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল, এ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ১৯৩০।
এ. এল. ব্যাশাম, দ্য ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৫৪।
রোমিলা থাপার, এ হিস্ট্রি অভ ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, হার্মণ্ডসওয়ার্থ, ১৯৬৬।
রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাক্-পরিচয় অংশটুকু, কলিকাতা, ১৯৮০।
১৪. ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস : প্রাচীন যুগ, বাংলা অনুবাদ, মস্কো, ১৯৮৬ পৃ: ১৭-৩৬।
ই. বি. টেলর, প্রিমিটিভ কালচার, ১৮৭১, ১৮৯১।
পি.সি. বাগচী, প্রি-দ্রাভিড়িয়ান এ্যাণ্ড প্রি-এরিয়ান ইন ইণ্ডিয়া, ১৯২৯।
ডি.ডি কোশাম্বী, কালচার এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন অফ এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ১৯৫৬।
এল. টি. হবহাউস, সম্পাদিত, মেটিরিয়াল কালচার এ্যাণ্ড স্যোশাল ইনস্টিটিউশন অফ দ্যা সিমপলার পিপল, ১৯৩০।
১৫. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভাবতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ-১৩৯৮, পৃ: ৫৪-১১৯।
১৬. ঐ, তদেব, পৃ: ১৪০-২২০।
১৭. অগ্রহার হ'ল পুরোহিত সম্প্রদায় এবং ধর্মস্থানের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূমিদান। এই বিষয়ে রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, ১৩৯৮, বইটির, পৃ: ১৫৪-১৭৮-এ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা আছে।
১৮. এ বিষয়ে রামশরণ শর্মার বিখ্যাত গ্রন্থ ইণ্ডিয়ান ফিউডলিজম, বাংলা অনুবাদ, কলিকাতা, ১৯৮৫-তে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।
১৯. ড: দীনেশ চন্দ্র সরকার, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২, ঐ এপিগ্রাফিক ডিসকভারী ইন ইষ্ট পাকিস্তান, কলিকাতা, ১৯৭৩, এবং সিলেক্ট ইনসক্রিপসন দুটি খণ্ড, এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা বি.এন. মুখার্জী ও অন্যান্য সম্পাদিত, দীনেশ চন্দ্রিকা, দিল্লী, ১৯৮৩। রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ১৭৯-২২০।
২০. এ বিষয়ে (চাহিদা ও যোগান) অর্থনীতির যে কোন ভালো বই পড়লেই হবে।
২১. ডি.আর. ভাণ্ডাবকর, বাহাদুরচন্দ্র ছাবরা ও জি.এস.গাই সম্পাদিত, জে.এফ. ফ্লীবের করপাস ইন্সক্রিপসন ইণ্ডিকম, তৃতীয় খণ্ড, দিল্লী।
ডি.সি. সরকার, সিলেক্ট ইনসক্রিপসন।
রাধাগোবিন্দ বসাক, এপিগ্রাফিক ইণ্ডিয়া।
২২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।

২৩. ঐ, তদেব।
ডি.সি. সরকার, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ (১৯৮২) এবং সিলেক্ট ইনসক্রিপসন।
২৪. জমির চাহিদা প্রসঙ্গে ভালো বই (অর্থনীতি)-এ ব্যাপারে আলোচনা করা আছে। তৎসহ জয়দেব সরখেল, আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা এবং অরুণ কুমার সেন-এর ভারতীয় অর্থনীতি জমির অবদান, বই দুটি যথেষ্ট উপযোগী।
২৫. ঐ।
২৬. সমসাময়িক কৃষি অর্থনীতির উপর লেখা প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
২৭. মৃদুল শ্রীমানী, জমি জরিপ, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৩৯-৫৫।
২৮. ঐ, তদেব পৃ: ৫৪-৫৫।
২৯. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচিন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ১৫৮-১৬০।
শচীন্দ্র কুমার মাইতি, ইকনমিক লাইফ ইন নর্দান ইণ্ডিয়া ইন দ্যা গুপ্ত পিরিয়ড, দিল্লী, ১৯৭০।
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।
এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা, খণ্ড পঞ্চদশ, দামোদরপুর তাম্রশাসন (পাঁচটি)।
শ্রীমদ্গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত-অমর কোষ, ১৯৮৮।
৩০. কে. এম. শ্রীমালী, এ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার, দিল্লী।
রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এ.এস. আলটেকর সম্পাদিত, দ্যা বাকাটক গুপ্তএজ, বারাণসী, ১৯৫৪। এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা।
৩১. এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, দামোদর পুর তাম্রশাসন (পাঁচটি)।
রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ: ১৫৮-১৫৯১ প্রথম খণ্ড, পিটি-এক, ১৯৫৭, পৃ: ৯৮-১০৭।
৩২. রীতা ঘোষরায়, প্রাচীন বাংলায় পাঠকের হিসাব, ইতিহাস অনুসন্ধান-৮, পৃ: ১৯৯ থেকে সম্পূর্ণ অংশ।
৩৩. ঐ, আদি মধ্যকালীন বাংলায় নল দ্বারা জমি মাপের ব্যবস্থা, ইতিহাস অনুসন্ধান-১০, পৃ: ১৬৫-১৬৮।
৩৪. শচীন্দ্র কুমার মাইতি, প্রবন্ধ, 'ল্যাণ্ড মেসারমেন্ট ইন গুপ্ত ইণ্ডিয়া', পৃ: ৯৯-১০০।
৩৫. ঐ, তদেব, পৃ: ৯৯-১০০।
৩৬. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ: ১৫৯।
৩৭. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৮-১৫৯।
৩৮. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৯। এবং শচীন্দ্র কুমার মাইতির প্রবন্ধেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এবং রণবীর চক্রবর্তী, অভিন্ন দেবতা, ভিন্নমঠ: প্রাচীন শ্রী হট্টের একটি 'বজ্রাপুর'।
৩৯. বি.এন. মুখার্জী, খরোষ্ঠী অ্যাণ্ড খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপশনস্ ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল (ইণ্ডিয়া), ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ: ৩১।
৪০. ঐ, তদেব, পৃ: ৩১-৩৩।
৪১. ইরফান হাবিব, দ্যা এ্যাগেরিয়ান সিস্টেম অফ মোঘল ইণ্ডিয়া ১৫৫৬-১৭০৭, অক্সফোর্ড, নিউদিল্লী, ১৯৯৯, পৃ: ৪০৬-৪১৯।
৪২. কার্লমার্কস, ভারতবর্ষে জমি-সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা: প্রদীপ

বক্সি, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৫-২৮।
৪৩. কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোন্‌গার্দ-লেভিন, গ্রি. কতোভ্‌স্কি-সম্পাদিত ভারতবর্ষের ইতিহাস, বা:অনু:, মস্কো, ১৯৮২ পৃ: ১১৮।
৪৪. ঐ, তদেব, পৃ: ১২০।
৪৫. ঋগ্বেদ, বা: অনু:, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দ্য বেদিক এজ, বম্বে, ১৯৫১, পৃ: ৩৩০-৪৫০।
রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ৫১।
৪৬. কার্লমার্কস, ভারতবর্ষে জমি-সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে, বা:অনু: প্রদীপ বক্সী, কলকাতা- ১৯৯৯, পৃ: ১৫-২৬।
কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য সম্পাদিত, ভারত বর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন ভারত অংশে, বা অনু: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মস্কো, ১৯৮২, পৃ: ১১৮।
৪৭. ঐ, তদেব।
সুকুমার সিং, ভারতের গ্রামে সামন্ততন্ত্র, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ: ৮৪।
৪৮. কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ: ১১৯।
কার্লমার্কস, ভারতবর্ষে জমি-সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃ: ১৮-২৭।
নারদ স্মৃতি, অনু, জে. জলি সে.বু.ই., ১৮৮৯; বৃহস্পতি স্মৃতি, বরোদা।
৪৯. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে; কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ৭৬, ১০৩।
৫০. কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ: ১১৯।
৫১. ঐ, তদেব, পৃ: ১১৮-১১৯।
৫২. কার্লমার্কস, ভারতবর্ষে জমি-সম্পর্কের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃ: ২৪-২৯।
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।
৫৩. ঐ, তদেব।
৫৪. বণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ: ৭৬
৫৫. ঐ, তদেব, পৃ: ১০৪, ১২৮।
৫৬. ঐ, তদেব, পৃ: ১২২।
৫৭. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৯-১৬০।
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।
৫৮. ঐ, তদেব।
ডি.এন.ঝা, এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া: অ্যান ইন্ট্রোডাকটরী আউটলাইন, দিল্লী, ১৯৭৭।
ঐ, রেভিন্যু সিস্টেম ইন দ্য পোস্ট-মৌর্য অ্যাণ্ড গুপ্ত টাইমস, কলিকাতা, ১৯৬৭।
ডি.সি. সরকার, সিলেক্ট ইনসক্রিপশনস।
৫৯. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভাবতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ: ১৬৫।
৬০. জয়দেব সরখেল, আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা, কলিকাতা।
৬১. ঐ, তদেব।

প্রাচীন বাংলার উৎপন্ন সম্ভার ও বৈদেশিক বাণিজ্য

অরবিন্দ মাইতি

খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বৈদেশিক বাণিজ্যের পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি, বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল লক্ষ্যটা ছিল রপ্তানী। দেশের উৎপাদন পরিকাঠামো ছিল অত্যন্ত মজবুত। কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, খনিজ সম্পদের উৎপাদন ও বনজ সম্পদের সংগ্রাহয়ন ছিল অস্বাভাবিক বেশি। এই অসাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

১। কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ছিল ধান্য, ইক্ষু, তুলা, সর্ষপ, পান, গুবাক, নারিকেল, আম, মহুয়া ও অন্যান্য ফল, পিপ্পলী, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মশলা।

২। বনজ সম্পদ ছিল অগুরু, লাক্ষা, কস্তুরী, হস্তীদন্ত ইত্যাদি।

৩। খনিজ সম্পদের মধ্যে ছিল হীরা, সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি।

৪। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল বস্ত্রশিল্প, চিনি, গুড়, লবণ, দন্তশিল্প, মৃৎশিল্প, লৌহশিল্প ও মৎস্যশিল্প।

৫। বাংলার সমুদ্র ও নদীনালার জলাভূমি থেকে মুক্তা আহরণ করা হত। ঐ মুক্তা বিভিন্ন অলংকার শিল্পে ব্যবহৃত হত।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের উপযুক্ত জলবায়ুতেও ভূমিক্ষেত্রে কর্মঠ বাঙালী জনগণের কর্ম প্রচেষ্টায় ধান্য, ইক্ষু, সর্ষে, পান, গুবাক, নারিকেল ও অন্যান্য ফলমূল ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হত। এছাড়াও পিপ্পলী, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ বাংলার কৃষিসম্পদ হিসাবে উৎপাদিত হত। এই সমস্ত কৃষি সামগ্রীর বৈদেশিক রপ্তানী ও উল্লেখযোগ্য ছিল। রোমান গ্রন্থাকার টলেমী ও প্লিনির মতে এবং গ্রীক নাবিকদের লেখা "পেরিপ্লাস-ইরিথি-মারি" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে এই সমস্ত জিনিস (এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা ইত্যাদি দ্রব্য) মিশর, পূর্ব দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশগুলি এবং এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানী হতো, এক পাউণ্ড পিপ্পলের দাম পনের দিনার ছিল যা পনেরটি স্বর্ণ মুদ্রার সমান। এলাচ এবং লবঙ্গ রপ্তানীর মাধ্যমে লক্ষাধিক স্বর্ণমুদ্রা আমদানী হতো। বনজ সম্পদ কস্তুরী সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাচীন বাংলা একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করত। আরাকান (বহ্ম) অঞ্চল থেকে অগুরু আমদানী হত যা রপ্তানীর সামগ্রী ছিল। লাক্ষার উল্লেখযোগ্য উৎপাদনও ছিল। এটিও বিদেশের বাজারে রপ্তানী করা হত। বিভিন্ন শিলালিপিতে উল্লেখ আছে হস্তী শিকারের মাধ্যমে হস্তীদন্ত সংগ্রহ করা হত। ও তা দিয়ে নানান শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হত। যার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব হত।

খনিজ সম্পদ আহরণে প্রাচীন বাংলা যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। প্রাচীন বাংলার নদীগর্ভের বালুকা রাশি থেকে মূল্যবান সোনার উৎপাদন হত। এখানে স্বর্ণখনিও ছিল। নদীগুলির নাম স্বর্ণশব্দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা নি:সন্দেহ হই। কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রয়োগ হওয়ার জন্য লৌহশিল্পের এখানে বিকাশ ঘটেছিল। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে আকরিক লোহার ভান্ডারও অপ্রতুল ছিল না। অনুরূপভাবে তামার ব্যবহারও ছিল। এই উভয়ধাতু রাঢ় অঞ্চলের মৃত্তিকা থেকে পাওয়া যেত। খুব সম্ভবত তাম্র ধাতুর প্রাচুর্যের জন্য নিম্ন রাঢ় অঞ্চলকে তাম্রলিপ্ত বলা হত।

প্রাচীন বাংলার শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা, এই বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবক অষ্টিক জাতি বস্ত্রের প্রকার ভেদ চার প্রকার ছিল। দু-কূল, পর্ত্রোনা, ক্ষৌম ও কাপাসিক তুলা, রেশম এবং অন্য প্রকার তন্তু বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে চিহ্নিত হত। বৈদেশিক পর্যটকদের মতে এই শিল্পের সুবাদে ভারতবর্ষে তখন অন্যান্য সাম্রাজ্য থেকে স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ ভারতবর্ষে স্রোতাকারে আসত।

শশ্রুতে উল্লেখ আছে পৌণ্ড্রদেশে উৎকৃষ্ট ধরণের আখ, চিনি ও গুড় উৎপন্ন হত। যার বাজার সমগ্র ভারতবর্ষে তো ছিলই, বিদেশেও রপ্তানী হত। প্রাচীন বাংলার লবণশিল্প একটি অতিপুরাতন শিল্প। এই শিল্পের মাধ্যমে যে অর্থাগম হত তার প্রমাণ আমরা পরবর্তী কালের ইতিহাসে লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশের তরবারি যেমন ছিল শক্ত তেমনি ছিল ধারাল। উন্নত পর্যায়ের তরবারি বিদেশে রপ্তানি হত।

প্রাচীন বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের এই সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমি কেমন করে হলো, কেমন করে বাঙালিজাতি (সবর, নিষাদ-জনগণ) এমন একটি উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি করল তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এর কারণ অনুসন্ধানে বলা যায় বাঙালী জন সুদীর্ঘ সংকরায়ণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকরায়ণ যে কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হবে তা বলার সময় আজও আসেনি। প্রাচীনকাল থেকে নদীগামী নৌকা, সমুদ্রগ্রামী পোত নির্মান শিল্পে বাংলার একটি অসামান্য স্থান ছিল। তার প্রমাণ প্রাচীনবাংলার লিপিগুলিতে ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইত:স্তত ছড়িয়ে আছে। মৌখরীরাজ ঈশান বর্মের হাড়োয়া লিপিতে গৌড় দেশবাসীদের "সমুদ্র শ্রায়ম" বলা হয়েছে। এর অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়দেশ হতে পারে। অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্য যার আশ্রয় সেই গৌড়দেশও বোঝাতে পারে। পাল ও সেন বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (Fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ তো প্রায়শই উল্লেখ হয়েছে। এই সমস্ত প্রাচীন লিপি থেকে আমরা 'নবাতক্ষেণীর নৌ-দন্ডক' কথার উল্লেখ পাই। যার সম্ভাব্য অর্থ যথাক্রমে সমুদ্রপোত নির্মাণ বন্দর ও পোতাশ্রয় হতে পারে। এমনকি এই সকল লিপিমালা থেকে আমরা দুঃসাহসিক নাবিকেরও নাম উল্লেখ পাই। যেমন রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধ গুপ্তের কাহিনী। এত কিছু আলোচনার পরও আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে প্রাচীন বাংলাদেশের নৌবাণিজ্য তথা পূর্বভারতের নৌবাণিজ্য কোন কোন বন্দর দিয়ে সংগঠিত হত। এপ্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায় এই নৌবাণিজ্যের প্রধান অংশীদার ছিল গঙ্গা বন্দর ও তাম্রলিপ্ত; প্রাচীন বাংলার রাঢ় অংশের দক্ষিণ পূর্বে তাম্রলিপ্ত বন্দররাজ্য অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। এবং গঙ্গা বা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কোন স্থানে গঙ্গা বন্দর অবস্থিত ছিল এক

কথায় গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস-ইরিথি-মারি' গ্রন্থে এবং রোম থেকে আসা প্লিনি এবং টলেমী তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের দেশে নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্তের সঙ্গে সিংহল, চীনদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাম্রলিপ্তের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এমনকি উত্তর ভারতের কোন কোন বণিক সম্প্রদায় তাম্রলিপ্তের ব্যবসা বাণিজ্যে যোগদান করে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি করেছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর অঞ্চল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপশ্চিমে উড়িষ্যার সংলগ্ন উপকূল থেকে বরাবর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই বন্দর রাজ্যের রাজধানী যে কোথায় ছিল তার সঠিক অনুমান করা কষ্টসাধ্য। প্রাচিন গ্রীক ও রোমান লেখকগণ ফা-হিয়েন, ইয়েৎসিন ও য়ুয়ান চোয়াঙ সকলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবস্থিতি গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী সামুদ্রিক খাঁড়ির উপর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। য়ুয়ান চোযাঙ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন তাম্রলিপ্তের ভূমি সমতল, জলবায়ু উষ্ণ, ফুল ফল শস্য প্রচুর। লোকের আচার ব্যবহার রূঢ়, কিন্তু তারা খুব সাহসী, এই দো স্থল ও জল পথের সমন্বয় এবং এর রাজধানী তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রের একটি খাঁড়ির উপর অবস্থিত।

এরপর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। প্রাচীন তাম্রলিপ্তের গৌরব মহিমা অস্তমিত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল ও সেন যুগের অর্থনীতিতে মুদ্রাব্যস্থার অবমূল্যায়ন স্পষ্ট হয়েছে। মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ ও রৌপ্য)-র অপ্রতুলতার জন্য এ যুগের মুদ্রাব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে লালমাই-ময়নামতীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই সময়কার সুপ্রচুর একশ্রেণীর হাল্কা রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। প্রশ্ন আসতে পারে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও উপরোক্তস্থানে রৌপ্যের আমদানি কিভাবে হলো। এর উত্তরে বলা যায় এই রৌপ্য বিদেশাগত। বর্মা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াজাত রৌপ্য যা আরাকান দেশ থেকে লালমাই বা ময়নামতীতে আসত। আরাকানের সঙ্গে ময়নামতীর যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত নিবিড়। এই প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে উপযুক্তস্থানের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। বাংলার ভূমি ও নদনদীর প্রাচীনতম নকশা "জাও দ্যা ব্যারো কৃত মানচিত্র" পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে বর্তমান তমলুকের অবস্থিতি সমুদ্র থেকে ৮৫/৯০ কিলোমিটার দূরে ছিল। এমন একটি স্থানকে অন্তর্দেশীয় নদীর বন্দর বলা যেতে পারে। কিন্তু একে সমুদ্রের খাঁড়ির উপর অবস্থিত সমুদ্র বন্দর বলা যায় কি করে? পক্ষান্তরে উপরোক্ত মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সুবর্ণরেখার সঙ্গে গঙ্গা (হুগলী) নদীর যোগসূত্র ছিল এবং বিপুল পরিমাণ জলস্রোত এই পথ দিয়ে প্রবাহিত হত। এক্ষণে অতি বিনম্রভাবে জানাই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করতে গেলেই বর্তমান তমলুকের দক্ষিণ পশ্চিমের নূতন কোন প্রত্নক্ষেত্রের উপর বৈজ্ঞানিক খনন কার্য করা যেতে পারে যা গঙ্গা বা হুগলী নদীর তীরে মোহানার নিকটে অবস্থিত এবং নদী প্রবাহ থেকে মাত্র ছয়-সাত কিমি দূরে রসুলপুর নদীর প্রাচীন খাঁড়ি রসনালার তীরে অবস্থিত। স্থানটি প্রাচীন নৌযোগাযোগের চিহ্ন যুক্ত।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে উত্তর ভারতীয় মৌর্য শুঙ্গ সভ্যতার প্রভাব যেমন করে

উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ময়মনসিং ইত্যাদি স্থানে প্রভাব বিস্তার করেছিল ? অনুরূপভাবে পূর্বদক্ষিণ ও দক্ষিণ মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার কোন কোন স্থানে এই সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। দক্ষিণ মেদিনীপুরের কোন প্রত্নক্ষেত্র থেকে উপরোক্ত প্রভাবের প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী পাওয়া গেছে। যেমন এন. বি. পি, পাঞ্চমার্ক মুদ্রা, ঢালাই করা তাম্র মুদ্রা, কুষাণ মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির প্রাপ্তি থেকে বোঝা যায় যে উত্তর ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা থেকে এগুলি অভিন্ন ছিল না। স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার কথা এই মুদ্রাগুলি নীরব ভাষায় প্রকাশ করছে। এছাড়াও নানা প্রকার পোড়ামাটির মূর্তি (পাঞ্চচূড়া যক্ষিণী ও পশুমূর্তি)-র সন্ধান মিলেছে। ঝাঁঝরা ধূসর মৃৎপাত্র, স্পাউড় পটাবী এবং সুবৃহৎ রোমান অ্যাম্ফোরারের সন্ধান মিলেছে। যা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা জানায়।

উপসংহারে বলা যায় প্রাকৃতিক কারণে রাঢ় অঞ্চলের পলি এবং গাঙ্গেয় পলির অবক্ষেপণের ফলে খাঁড়ি ও নদীমুখগুলি বন্ধ হয়েছে। কালের গতিপথে ভূগঠনের পরিবর্তন ও নূতন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে উপকূলীয় সমভূমি সৃষ্টির সাবমার্জ পদ্ধতিতে এখানে বালুকা স্তুপের সৃষ্টি হয়েছে। যার সাক্ষ্যবহন করছে কাঁথি বালিয়াড়ি ও দীঘা বালুয়াড়ি অঞ্চল। কালক্রমে এই বালুস্তরের প্রভাবে এবং নদনদীর পলি অবক্ষেপণের ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের মৃত্যু ঘটেছে। তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমাগত উপরের দিকে এই বন্দর রাজ্যের রাজধানীকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজনের তাগিদে রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্তের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তাব উপরে এই বন্দর সপ্তগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হুগলী বন্দরের সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে মহাপ্রভু চৈতন্য নীলাচলে যাওয়ার পথে বর্তমান তমলুকে অবস্থান করেছিলেন, খুব সম্ভবত: (Rennel) রেনাল সাহেব উপরোক্ত কারণে রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন। সবশেষে যে কথাটি বলতে চাই রাঢ় সংলগ্ন সমগ্র তাম্রলিপ্ত রাজ্য ও চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাচিন বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠিত হত। সার্মগ্রিক ভাবে এইটাই সত্য বলে মনে হয়। কালক্রমে নদীপথের অবলুপ্তি ও পলি সঞ্চয়ের ফলে প্রাচীন বাংলার এই বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও বেঙ্গোলা (Bengala) বন্দরের উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সচেতনতা-একটি প্রতিবেদন

শুভেন্দু পাল

আমরা জানি যে পরিবেশ হল প্রকৃতি সম্পর্কিত। পরিবেশের বাস্তুরীতি বজায় থাকে তার 'ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স' এর জন্য। এখন প্রশ্ন হল, প্রাচীন ভারতের অধিবাসী তথা শাসকগোষ্ঠী কতটা সচেতন ছিলেন এ সম্পর্কে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার বিচারবিশ্লেষণই আমার আলোচ্য বিষয়।

এক. আমরা যদি ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার (সিন্ধু সভ্যতা) দিকে ফিবে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে হরপ্পা ও মহেঞ্জদারোর প্রাপ্ত বেশীরভাগ শীলমোহরের বিষয়বস্তু হল জীব-জন্তু সম্পর্কিত। বিশেষত: একটি সীল পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যাবে যে একটি পুরুষ দেবতা চাবিদিকে পশু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পুরুষ দেবতা আরো দুটি সীলে পাওয়া যায় এবং সেখানে তার মাথা থেকে ফুল অথবা লতাপাতা বেরিয়ে আসছে দেখা যায়। মার্শাল একে শিব-পশুনীতি রূপে চিহ্নিত কবেছেন এবং অধ্যাপক ব্যাসাম একে আদি শিব বলে বর্ণনা করছেন। হরপ্পা সংস্কৃতির এই দেবতাকে উর্বরতার দেবতা মনে করা হত। শীলগুলোতে বিভিন্ন প্রতিমূর্তি দেখে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পশুপূজাও তাদের ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। বৃক্ষ, অগ্নি ও জলপূজার প্রচলন ছিল যা সবই ছিল প্রকৃতি সম্পর্কিত।[1] আবাব ঐ সভ্যতাব উৎখননের ফলে ছাগল, ভেড়া, শূকর, বৃষ, মহিষ প্রভৃতি, গৃহপালিত পশুব অস্থি পাওয়া গেছে যা অধিকাংশ শীলমোহরে উৎকীর্ণ এবং এর মধ্যে বৃষ সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এর থেকে ঐতিহাসিকবা মনে কবেন যে এই সভ্যতায় পশুসম্পদ ও বিশেষত গো-সম্পদের উপব সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[2] কিন্তু পববর্তীকালে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়ে ফলে অনেকেই (বিশেষত: ব্যাসাম) এর ধ্বংসের পেছনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা হরপ্পানগরে পাকা ইমারত, প্রাকার ইত্যাদির জন্য ইটের প্রয়োজন ছিল, আর তা পোড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট জ্বালানীরও। এই জ্বালানীর জন্য ব্যাপকহারে অরণ্য ধ্বংস করা হয়, যার ফলে ব্যাহত হয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ধ্বংস হয় হরপ্পা সভ্যতা।[3]

দুই. বৈদিক সাহিত্যেও আমরা দেখি যে বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র, পাহাড় প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি ও দৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং তাদের বশে আনার

জন্য উপাসনাও হয়েছে। বিশেষত: বিভিন্ন বৈদিক দেব-দেবী সমূহ প্রায় সকলেই প্রকৃতি সম্পর্কিত। ঋকবেদে ও অথর্ববেদে কৃষি ও পশুর উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ঋকবেদের সুক্তগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত পার্থিব প্রার্থনায় মুখর। এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল পশুসম্পদ লাভের বাসনা। যার মধ্যে ছিল গবাদি পশু ও ঘোড়া। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে সমগ্র ঋগ্বেদে 'গো' শব্দটি কম করেও ২৭৬ বার উল্লেখিত। আবাব ঋগ্বেদে যুদ্ধের সমার্থক শব্দ 'গবিষ্টি' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গোসম্পদেব জন্য ইষ্টি বা প্রার্থনা। এখানে গো-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য একাধিক প্রার্থনা আছে।[৪] এর থেকে আমাদেব মনে প্রশ্ন জাগে না কি গো-সম্পদ প্রয়োজনেব তুলনায় কম ছিল বলেই এই প্রার্থনা ? আবার ঋকবেদে দেখি যে ক্ষেত্রপতিব (কৃষির অধিষ্ঠাতা দেবতা) উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়েছে।[৫] অথর্ববেদের সুক্ত গুলিতে আমরা নতুন নামের উদ্ভিদ ও নানা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও সেগুলোর ব্যবহার দেখতে পাই। এ পর্যায়ে 'গোধন' 'সম্পদে'র প্রতিশব্দ হয়ে পড়েছে এবং অনেক প্রার্থনায় তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যাধি প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের উদ্বেগ প্রতিফলিত।[৬] তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে অথর্ববেদের বিভিন্ন প্রার্থনা নবপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাবা সুনির্দিষ্ট গৃহে বাস করতো, কৃষির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে অবহিত ছিল, বৃক্ষলতা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করে তাদের প্রতি যত্নবান ছিল এবং যারা পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতো।[৭] এছাড়াও বেদের 'আরণ্যক' এর সঙ্গে চতুরাশ্রমের 'বানপ্রস্থ' সম্পর্কিত এবং উভয় ক্ষেত্রেই অরণ্য গুরুত্ব পেয়েছে। বিখ্যাত ভাবততত্ত্ববিদ গোল্ডস্টুকের আমাদের এই তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শুধু অরণ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি অর্থেই পার্ণিনি 'আরণ্যক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'অরণ্যে বচিত গ্রন্থ' অর্থে 'আরণ্যক' শব্দেব প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন কাত্যায়ন-আনুমানিক খ্রী: পূ: ৪র্থ শতাব্দীতে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সময়েব কাছাকাছি 'আরণ্যক' পৃথক প্রকাশ মাধ্যম রূপে স্বীকৃত হয়েছিল।[৮]

আবার গোত্রের ধ্যান ধারণাও পশুপাখি সম্পর্কিত এবং গোত্র নামগুলোর মূলে টোটেম বিশ্বাসেব পরিচয় মেলে। যেমন ভরদ্বাজ (ভরত পাখী থেকে) গৌতম (গরু থেকে), কাশ্যপ (কাছিম থেকে) শুণক (কুকুর থেকে), মৌদিগল্য (মাগুব মাছ থেকে), কৌশিক (পেঁচা থেকে), শাণ্ডিল্য (পাখি থেকে), মাণ্ডুকেয় (ব্যাঙ থেকে), তৈত্তিরীয় (তিতির পাখি থেকে) ইত্যাদি।[৯] রিজলী তার ভাবতবর্ষের মানুষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বইটিতে ফর্দ করে দিয়েছেন আমাদেব দেশেব পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষের মধ্যে কত গোত্র নামের উৎস জন্তু জানোয়ার বা গাছ-গাছড়ার নাম থেকে। বৌধায়ন প্রমুখের গ্রন্থেও সেকালের অজস্র গোত্র নামের পবিচয় পাওয়া যায়।

তিন. মহাকাব্যেব যুগেও আমরা যে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কবার রীতি দেখি তা প্রকৃতপক্ষে

অরণ্য সম্পর্কিত। রামায়ণে দেখি হনুমান কর্তৃক বিশল্যকরণীর খোঁজে গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসার চিত্র ইত্যাদি। এর থেকে প্রশ্ন জাগে না কি যে ঔষধি গাছ তথা অরণ্য স্পষ্ট নিবেশিত: তাই তা না পাওয়ার জন্য পুরো পর্বতটাই তুলে আনতে হয়েছিল। এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। আবার রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের দ্বিতীয় স্বর্গে হনুমান কর্তৃক দৃশ্যমান যে বন-উপবনের চিত্র অঙ্কিত আছে তা রাবণের অরণ্যপ্রেমের পরিচয় দেয়।[১০] এছাড়া রাবণের উদ্যান ও অশোকবনের সম্পর্কিত যে চিত্র রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে (৫।১৪।২২-২৩) তা প্রকৃতপক্ষে বন তথা পরিবেশ সচেতনতার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে।[১১] কেবলমাত্র এই অশোককাননই রাবণের সুরুচি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয়, অধিকন্তু তিনি যে একজন উদ্ভিদ বিশারদ ছিলেন তাও জানা যায়। আর তার প্রমাণ মেলে একালের সুপ্রসিদ্ধা খনার বচনে। খনা বলেছেন—

"ডেকে কয় রাবণ,
কলা-কচু না লাগাও শ্রাবণ।"

শত জাতের ফল-ফুল ও লতাগুল্মের বৃক্ষরাজির একস্থানে সমাবেশ ঘটিয়ে তা লালন পালন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখা সত্যিই কৃতিত্বের পরিচায়ক। একজন প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমী ছাড়া এ কাজ অসম্ভব।

চার. খ্রী: পূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের যুগে আমরা দেখি যে পূর্বের নির্বিচারে পশুহত্যার বদলে তার সংকলন ও পরিচর্যা গুরুত্ব পায়। তাই বৌদ্ধগ্রন্থ গুলিতে অগ্রগণ্য জীবিকার মধ্যে 'কসি' (কৃষি) ও 'গো-রকখা' (গোরক্ষা গবাদি পশুর লালন পালন) একসঙ্গে উল্লেখিত হয়। আবার শুধু 'রক্ষা' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে পালি সাহিত্যে। সম্ভবত. বলিদান থেকে গো-সম্পদ সংরক্ষণ করার চেতনা থেকেই 'গোরক্ষা' কথার প্রচলন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের অত্রঞ্জিখেড়ায় প্রচুর পরিমাণে মৃত পশুর (গবাদি পশু সহ) দেহাদি পাওয়া গেছে এবং তাতে আঘাতের চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। এগুলো সবই খ্রী: পূ: ৫০০র পূর্ববর্তী আমলের। ৫০০ খ্রী: পূ: পরবর্তী স্তর থেকে নিহত পশুর অস্থি অত্রঞ্জিখেড়ায় বিরল। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ সম্ভবত: নির্দেশ করে যে খ্রী: পূ: ৫০০র পর পশুহত্যার প্রবণতা কিছুটা কমেছিল।[১২] বৌদ্ধের যে সংঘারাজের কথা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংঘ+আরাম, আরাম অর্থে বাগান, যা পরিবেশ সম্পর্কিত।

পাঁচ. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সমাহর্তা যে সাতটি সূত্র থেকে কর সংগ্রহ করেন তার মধ্যে বনাঞ্চলও ছিল। মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন যে পশুপালক ও পেশাদারী শিকারীরা রাষ্ট্রকে কর দিত। এই জাতীয় কর সম্ভবত অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত 'ব্রজ' ও 'বন' খাতে সংগৃহীত হত। অরণ্য ও গোচারণ ভূমিকে রাজস্বের আওতায় আনার প্রথম প্রয়াস সম্ভবত: মৌর্য আমলে দেখা যায়।[১৩] 'অশোক' পরিবেশ তথা অরণ্য ও জীবকুল

সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তা তাঁর বৃক্ষরোপন, কূপ খনন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয় স্থাপন ও নানা ঔষধি গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দেয়। অষ্টম শিলালিপিতে অশোক বলেছেন যে তাঁর রাজত্বের দশম বৎসরে তিনি বিহারযাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রা আবম্ভ করেন। অশোক পশুহত্যার পরিমাণ সীমায়িত করার জন্য অকারণ পশুহত্যা নিষিদ্ধ কবেন। তাঁর তৃতীয় স্তম্ভলেখতে উল্লেখিত-'অনারম্ভ প্রানানাম' (প্রাণী হত্যা না করা) ও অভিহিল ভূতানাম (জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করা) এর প্রয়োজনীয়তা মানুষকে বোঝান। প্রথম শিলালেখতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন "এখানে (ইহ্ অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা পাটলিপুত্র অথবা রাজপ্রাসাদে) কোন প্রাণী দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হবে না..." রাজকীয় রন্ধনশালায় আহার্যের জন্য প্রতিদিন শতসহস্র প্রাণী হত্যা করা হত। প্রথম শিলালেখ থেকে জানা যায় এই সংখ্যাও তিনি নির্দয়ভাবে হ্রাস করেছিলেন। প্রতিদিন খাদ্যের জন্য দুটি ময়ূর ও একটি হরিণের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জীব হত্যা তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাতে বন্যপ্রাণী হত্যা কিছুটা কমেছিল। তার প্রতিফলন দেখতে পাই স্তম্ভলিপি ৫ ও ৭ এ, এতে তিনি বলেছিলেন কিছু নির্দিষ্ট প্রাণী (যেমন হাতী, ঘোড়া, মৎস, গর্দব ইত্যাদি) বধ করা যাবে না। তাতে আগের দুটো ছিল না। এর থেকে বোঝা যায় যে বন্যপ্রাণী হত্যা কিছুটা কমেছিল।[১৪] রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এরকম চিন্তা পরিবেশ সম্পর্কে বোধ হয় প্রথম অশোকের সময়ই দেখা যায়। মৌর্য শিল্পেও আমরা দেখতে পাই স্তম্ভের শীর্ষেব ভাস্কর্যে পাথরের বৃষ, সিংহ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর মূর্তি এবং এর মধ্যে সারনাথের সিংহশীর্ষস্তম্ভ বিখ্যাত। এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে না কি যে এই সমস্ত জীবগুলো সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্যই এই ব্যবস্থা? গুপ্তযুগের শিলালিপিতেও আরাম এর উল্লেখ আছে যা বাগানকেই বোঝায়।

ছয়. বিভিন্ন পুরাণেও অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বিশেষত: বিষ্ণুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে পশুদের বধের জন্য দণ্ডদানের কথা আছে। কালিদাসের শকুন্তলমে শকুন্তলার সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। বিশেষত: কর্ণমুনির আশ্রম তথা তপোবনের যে চিত্র আমরা পাই তা থেকে আমার উদ্দিষ্ট বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

সাত. গুপ্তযুগে বিশেষত: সমুদ্রগুপ্তের আটবিক রাজ্যজয় (অরণ্য সংকুল) এর যে পরিচয় আমরা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পাই তা একটি অনবদ্য উদাহরণ। এই রাজ্য সমূহ জয়ের মধ্য দিয়েই কি তিনি অরণ্য রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন? এছাড়া অজন্তার গুহাচিত্রগুলি বিশেষত: হাতি ও পশুপাখি সম্পর্কে সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে।

আট. ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনেও বনের কর্মচারীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বনকে রক্ষার জন্য বনের কর্মচারীর ব্যবহারের দিকটা এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

নয়. মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসেও পরিবেশ চেতনার ইঙ্গিত মেলে। বিশেষত: মূর্তপ্রতীকের পশুরূপের অনবদ্য উদাহরণ হল বৃষ, যা মহাদেবের পশুরূপ। আবার বরাহমুখ

মানবদেহী বিষ্ণুর বরাহদেবতার মূর্তিতে পশু ও মানুষের মিশ্ররূপ চিত্রায়িত। গণেশাদি কয়েকজন দেবতার ধ্যানে ও মূর্তিতে আদন্ত পশু ও মানুষের মিশ্ররূপের সাক্ষাৎ মেলে, আবার দেবতাকল্প গরুড়েব ক্ষেত্রে পাখি ও মানুষের রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে প্রথমে দেবতাগণ অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে পূজিত হতেন। তাদের মানবীয় মূর্তির উত্তর পরবর্তীকালের।[১৫] এছাড়া দেবদেবীর বাহনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীর উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন জাগতেই পারে যে উক্তপ্রাণীগুলো সংরক্ষণের তাগিদেই কি এই ব্যবস্থা ?

মার্শাল বলেছেন যে আর কোন দেশেই মাতৃদেবীর উপাসনা ভারতের মত বিগত অতীত থেকে এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও ব্যাপক নয়। তাকে মাতা বা মহামাতা বলা হয়। তিনিই হলেন প্রকৃতির প্রতিরূপ এবং ঐ প্রাকৃতিক ধারণা থেকেই শক্তির ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। তারই প্রতিনিধি বলতে আজকের গ্রাম্য দেবতা এই দেবীর অসংখ্য নাম এবং স্থানীয় লক্ষণের নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ওই প্রকৃতির মূর্ত মানবী-রূপ।[১৬] আমরা জানি যে ভারতীয় অধিবাসীরা পূর্বে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মতই বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহা ়, ফল, ফুল,পক্ষী বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করতো। এখনো খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাই করে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ সমাজের মেয়েদের মধ্যে বিশেষত: পাড়াগাঁয়ে গাছপূজা এখনো বহুল

প্রচলিত। অনেক পূজা ও ব্রতউৎসবে গাছের একটি ডাল এনে পুঁতে দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়।[১৭] আবার আমরা দেখি যে আদিম জনগোষ্ঠীর অরণ্যপ্রেম তথা বৃক্ষপূজা পরবর্তীকালে অভিব্যক্তিঘটে উদ্ভূত হল নানা ধরণেব মূর্তির। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পূজা উৎসব বৃক্ষের আরাধনায় কেন্দ্রীভূত। এমনকি বাঙালীদের দুর্গাপূজার প্রাথমিক বিষয় হল নবপত্রিকা যাকে বলে কলাবৌ। এতে থাকে নয় জাতীয় উদ্ভিদ যথা - কচু, হলুদ, কলা, বেল, ডালিম, যব, অশোক, মানকচু ও ধান। এই নয় জাতীয় উদ্ভিদের উপাসনাটি হল দুর্গাপূজা। উদ্ভিদ সমষ্টির ধীর ব্যক্তি আরোপের ধারায় দুর্গামূর্তি রূপলাভ করেছে। অর্থাৎ আদিম মানসিকতার বৃক্ষপূজা মানবীরূপী মূর্তিপূজায় রূপায়িত হয়েছে।[১৮]

দশ. মুদ্রার মাধ্যমেও আমরা পরিবেশ বিষয়ক কিছু তথ্য পাই। যেমন পাঞ্চ মার্ক মুদ্রায় গাছ, জম্বু, দাসী, সরীসৃপ, মানবপ্রতিকৃতি ও ফুল দেখা যায়। উত্তর পাঞ্চাল রাজার মুদ্রায় মাছ, বৃষ, আরোহীসহ বা আরোহী বিহীন হাতীর চিত্র পাওয়া যায়। সুরশ্রেণী মুদ্রায় বিড়াল ও সিংহজাতীয় প্রাণীর ছবি, বৃক্ষের চিত্র ও পাহাড়ের চিত্র পাওয়া যায়।[১৯] আবার মৌর্য পরবর্তী কিছু আঞ্চলিক রাজাদের মুদ্রায় আমরা প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয় পাই যথা, অগ্র-অর্জুনারায়ণ, শিবি-বেমক-যৌধেয়দের মুদ্রায় যে সমস্ত প্রতীক, পশু প্রতিকৃতি ও মানবমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে তা নানা সাংস্কৃতিক তথ্যের প্রত্যক্ষ

নিদর্শন। এখানে অঙ্কিত নানা সম্প্রীতি চিহ্ন, পাহাড় নদী বেষ্টনীবদ্ধ বৃক্ষ, বৃষ, হস্তী ও সিংহের প্রতিচ্ছবি পরিবেশ সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে।[২০] সংখ্যাবিচারে তাদের বেশীরভাগ মুদ্রাতে বৃক্ষ প্রতীক ও বৃক্ষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আবার ঐ সকল মুদ্রায় কিছু আজগুবি প্রাণীর ছবিও লক্ষিত হয়। জীবজন্তুর প্রতি তারা কতটা সংবেদনশীল ছিলেন তা আর্জুনাবাযণদের মুদ্রার যজ্ঞোৎবের বৃষের মুখে প্রতিফলিত মৃত্যুর পূর্বাভাষের বেদনা দেখলেই বোঝা যায়।[২১] আবার কণিষ্কের মুদ্রায় "পাওনামো শাও কনেষ্কি কোশানো" কথাগুলি লেখা থাকতো। এইসব মুদ্রাগুলির বিপরীতে ইরানীর নামের অনেক দেবদেবীব মূর্তি চিত্রিত আছে। এদের নাম মিহির বা মিথ্র (সূর্য), মাও (চন্দ্র), ওয়েদা (বায়ু), লুহ্রাস্প (ধ্রুভাঙ্গ -জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের অভিভাবক), নানা খাও বা নানিয়া (ইন্মানা, ইশত্তার-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী)[২২] যা সবই প্রকৃতি সম্পর্কিত।

উপরোক্তসকল তথ্য থেকে সহজেই অনুমিত হয যে প্রাচীন ভারতের মানুষেরা নিজেরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনা বোধ কিছুটা গড়ে তুলেছিল, হয়তো সর্বসময় তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে জীবজন্তু ও অরণ্যের গুরুত্ব উপলব্ধির কথা কিছুটা হলেও করেছিল তা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে কিছুটা পরিবেশনার চেষ্টা করলাম। এই বিষয়টি নিয়ে যদি কোন উৎসাহী গবেষক গবেষণার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন তাহলে পাঠককুল নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

সূত্র নির্দেশ

১. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড) - সুনীল চট্টোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, পৃ: ২২।

২. রণবীর চক্রবর্তী - প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ৩১।

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ৩৯।

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ৪৫, ও লোকায়ত দর্শন (২য় খণ্ড) কলকাতা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৪৭।

৫. র. চ. - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৬।

৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য - ইতিহাসের অলোকে বৈদিক সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯১. পৃ: ১৭৭।

৭. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ১৭৪।

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ২৭১।

৯. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় - লোকায়ত দর্শন (২য় খণ্ড) কলকাতা, পৃ: ২৮।

১০. মাখন পাল রায়চৌধুরী - বামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা, কলকাতা, ১৩৬৬ সন। পৃ: ৭৬।

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ৮৩।

১২. রণবীর চক্রবর্তী - প্রাচীন ভাবতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ৭৫।

১৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ১১৫-১১৬।
১৪. বি.এন. বড়ুয়া - ইনস্ক্রিপশনস্ অব অশোক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩, রাধাগোবিন্দ বসাক - অশোকান ইনস্ক্রিপসনস্ কলকাতা, ১৯৫৯।
১৫. কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত - ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৭৭৮।
১৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ৫৭।
১৭. নীহাররঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা, ১৪০২ সন।
১৮. রেবতীমোহন সরকারের প্রবন্ধ, পুতুল : সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, দেবপুতুল ও খেলার পুতুল বিশেষ সংখ্যা ৯ বর্ষ ২ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ: ১৭৬।
১৯. ভারতের মুদ্রা - পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত, অনুবাদ-অরুণ বিশ্বাস, নয়াদিল্লী ১৯৮৭,, পৃ: ১৩।
২০. কল্যাণ কুমার সামন্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ ,পৃ: ১৪১।
২১. পৃ: ১৪২-১৪৪।
২২. ভারতের মুদ্রা, পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত, পৃ: ৩৩।

প্রাচীন ভারতে প্রাণী সুরক্ষায় কিছু শাস্ত্রীয় বিধান

অনিতা বাগচী

বন ও বন্য প্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান মানব ইতিহাসের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। বনভূমির উপর মানব সমাজের নির্ভরতা মানুষের আপন অস্তিত্বের প্রয়োজনে। পৃথিবীর অন্যান্য নানা দেশের মত এই উপমহাদেশের আদিম মানুষরাও বেঁচে থাকার জন্য একান্ত ভাবে নির্ভর করত শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উপর। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যে সমস্ত পাথর দিয়ে শিকার করত তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে।[১] পাথর মসৃণ করার কৌশল যখন মানুষের আয়ত্বে এল তখন থেকেই বনাঞ্চলের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হল। বন্যপ্রাণীদের জীবনধারণের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত এল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত বিভিন্ন সীলমোহরের উপর অঙ্কিত পশুর প্রতিকৃতি এবং খেলনা (ছোট ছোট পশুর প্রতিমূর্তি) থেকে জীব জগৎ সম্পর্কে সে যুগের লোকেদের তীক্ষ্ণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও সীলমোহরের উপর অঙ্কিত বাঘ, হাতি, গন্ডার প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি প্রমাণ করে সিন্ধু সভ্যতার যুগে এই অঞ্চল বনসমন্বিত ছিল,[২] এবং আবহাওয়া এইসব জীবজন্তুর বাসোপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এইসব জীবজন্তুর বাসের অনুকূল নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তরই এই পরিবর্তনের কারণ কিনা তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তর আলোচনা চলছে। হুইলার লিখেছেন যে হরপ্পার বাসিন্দারা ইট ও মৃৎপাত্র পোড়ানো, ধাতু গলানো ও দৈনন্দিন জ্বালানীর জন্য ব্যাপক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস করেছিল।[৩]

একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ছাড়া বনাঞ্চল, প্রকৃতি ও পশুদের সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনার কোন লিখিত বিবরণ বা দলিল আমরা পাইনি। ফলে তাদের রেখে যাওয়া পুরা নিদর্শন আর আমাদের আধুনিক মনের বিচার বিশ্লেষণ থেকে জাত কিছু তত্ত্বের মধ্যেই আমাদের জ্ঞান সীমিত। বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে তাদের আগ্রহ কতটা ছিল তা আমাদের অজ্ঞাত। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা তিন শ্রেণীর পশুর চিহ্ন দেখতে পাই; যথা- গৃহপালিত, আংশিক গৃহপালিত এবং বন্যশ্রেণীর পশু।[৪]

ঋগ্‌বেদের যুগে পশুচারণের গুরুত্ব থাকলেও কৃষি ক্রমশঃই নিজের জায়গা করে নিতে থাকে। ঋগ্‌বেদে[৫] পশু ও পাখির প্রসঙ্গ অনেকবার এসেছে। অথর্ব বেদেও[৬] জীবজন্তু ও পাখির কথা রয়েছে। সভ্যতার যুগে যেমন নিয়মিত বৃক্ষচ্ছেদন শুরু হয়েছিল তেমনভাবে চলেছিল পশুনিধনের পালা। বনজাত সামগ্রীকে কেন্দ্র করে কিছু বৃত্তি বা পেশা তৈরী

হয়েছিল। যেমন গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি ছিল দারুশিল্প তেমনই ছিল চর্ম্মকার বৃত্তি। আবার বিভিন্ন বৈদিক রচনা ও পালিগ্রন্থে কিছু মানব গোষ্ঠীর প্রাণীবাচক নামকরণ দেখা যায়। যেমন অজ গোষ্ঠী, মৎস গোষ্ঠী, তরক্ষ, নাগ, লম্বকর্ণ ইত্যাদি নাম কৌতুহল উদ্রেককারী।

যাইহোক মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সাথে বনাঞ্চল হ্রাস পেতে থাকে ও বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষকে সচেতন করল যে মানুষের নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এই বনভূমি ও তার বাসিন্দাদের রক্ষা করতে হবে।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে (৫৪৫ খ্রীঃ পূঃ) মগধের সিংহাসনে বিম্বিসারের আরোহণের সময় থেকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। কিন্তু একটি সুসংগঠিত বনবিভাগের কথা আমরা প্রথম পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।[৭] কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মত প্রতিবাদী ধর্ম সমূহ। লোহার লাঙ্গল ও পশু সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল এ যুগের নূতন কৃষি ব্যবস্থার সহায়ক ছিল না যজ্ঞ প্রধান বৈদিক ধর্ম। গো সম্পদ রক্ষা করা ছিল তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান জরুরী বিষয়। তাই বৌদ্ধধর্মে পশুর প্রতি অহিংস আচরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূত্ত নিপাতে গোরক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে হস্তী সম্পদ যুদ্ধের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়েছে।[৮] হাতীর গুণমানএর ভিত্তিতে কৌটিল্য তৎকালীন ভারতের বনগুলিকে আটটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। কৌটিল্য হাতীর গুণমান ছাড়াও হাতী ধরা, তাদের পালন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সময় রাষ্ট্র বনসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। বনকে রাজকোষে ধনাগমের একটি প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে। কৌটিল্য বনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরকম 'পশুমৃগদ্রব্যহস্তী বনপরিগ্রহো বনং' (কৌ. অ. ১১.৬.৬)।

কূপ্যাধ্যক্ষের উপর বনরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। দ্রব্যবনের প্রধান ছাড়াও হস্তীবনের জন্য হস্তীবনাধ্যক্ষের পদ ছিল এবং তিনি একটি পূর্ণ বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। কামন্দক[৯] দুই শ্রেণীর বনের উল্লেখ করেছেন - কুঞ্জর বন ও কন্টক বন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে[১০] কুঞ্জর বনকে গজবন ও অশোকের পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে[১১] বলা হয়েছে নাগবন। হস্তীবনের অধ্যক্ষ নাগবন - পাল দ্বারা পর্বতে, নদীকূলে, সরোবর সমীপে ও অনূপ বা জলময় প্রদেশে অবস্থিত নাগবন রক্ষা করবেন। নাগবন পালেরা হস্তীঘাতী যে কোন পুরুষকে হত্যা করতে পারবেন (কৌ.অ. ২.২.৮.)। স্বাভাবিক ভাবে মৃত হাতীর দন্তযুগল আহরণকারী ব্যক্তিকে ৪ পণ পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি অগ্নিগুন ধরিয়ে দ্রব্যবন বা নাগবনের ক্ষতিসাধন করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে আছে (কৌ.অ. ৪.২.২০.)। এই নির্দেশ নামা অবশ্যই পশুদের জীবনরক্ষার সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে রাজপরিবারের লোকেরা মৃগয়া করতে যেতেন। এই মৃগয়া যাত্রার একটি পরিষ্কার চিত্র আমরা স্ট্রাবোর লেখা থেকে পাই।[১১] এই রাজকীয় মৃগয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট মৃগবন ছিল। এছাড়া আর এক শ্রেণীর পশুউদ্যানের প্রসঙ্গ অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে এইখানে পশুরা ছিল স্বাগত অতিথি ও তাদের জীবনের সুরক্ষা ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চিত (কৌ.অ.

১১.২.৩.৪)। এইগুলি স্বভাবতই ছিল অভয়ারণ্য। এছাড়া বেদ অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণদের বন দান করা হত। পরবর্তীকালে কালিদাস[১২] উল্লিখিত কণ্বমুনির আশ্রম ছিল এই শ্রেণীর একটি তপোবন।

এইসব অভয়ারণ্যে পশুবধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। শকুন্তলার একটি দৃশ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য - রাজা দুষ্মন্ত তপোবনের প্রান্তে এসে একটি মৃগকে লক্ষ্য করে শর যোজনা করেছেন - আর ঠিক সেই মুহূর্তে কতিপয় তপস্বী এসে রাজাকে নিবৃত্ত করেছেন এই বলে - 'হে রাজন এটি আশ্রমের মৃগ। একে হনন কবা উচিত নয়।' (অভি. শকু. এ্যাক্ট ১, ১৩)। আর এই সব বনের পশুরা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিল যে আমরা এরপরেই লক্ষ্য কবি বথের চাকার শব্দ শুনেও মৃগকুল নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বোমন্থনে লিপ্ত। তারা এই তপোবনে কোন রকম ত্রাসে বা ভযে অভ্যস্ত নয়। প্রাচীন ভারতে পশুদের প্রতি একটি স্বাভাবিক মমত্ব বোধ গড়ে উঠেছিল। এর পবিচয় পাই অর্থশাস্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে পশুনির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুশাসনের মধ্যে। অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ আছে - ক্ষুদ্র পশুকে কাষ্ঠ অথবা অন্যকিছু দিয়ে আঘাত করলে এক বা দু পণ জরিমানা দিতে হবে। রক্তপাত ঘটালে দিতে হবে দ্বিগুণ। বড় পশুব ক্ষেত্রে এই অপরাধের জন্য দিতে হবে এর দ্বিগুণ ও চিকিৎসা ও আরোগ্যের সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে। (কৌ.অ.৩, ১৯, ২৬.২৭.)।

মাছ ও পাখিদের অত্যাচার করলে অপরাধীকে ২৬ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব ছিল মাংস ক্রয় বিক্রয়ের উপর লক্ষ্য বাখা। কোন গোবৎস, ষন্ড এবং দুগ্ধবতী গাভী ছিল অবধ্য। এদের হত্যা করলে বা অত্যাচার করে হত্যা করলে জরিমানা নির্দিষ্ট ছিল ৫০ পণ। (কৌ.অ. ৩, ২৬.১০.১১.)। যেসব মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্য রাজার আদেশে অভয় লাভ করেছে এবং রাজকীয় বনে বাস করছে - সেগুলিকে যারা রন্ধন করবে, প্রহার করবে ও তাদের প্রতি মারণাদি হিংসা প্রদর্শন করবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে। যে যে প্রাণীকে রক্ষা করতে বলা হয়েছে সেগুলি হল হাতী, ঘোড়া, মানুষ, ষাঁড়, ও গর্ধভ সদৃশ সামুদ্রিক মাছ এবং সরোবরে নদীতে, তড়াগে ও খালে জাত মাছ, ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, দাত্যুহ (জলকাক) হংস, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক, ভৃঙ্গরাজ (মোরগের মত পক্ষী) চকর, মত্তকোকিল, ময়ূর, শুক, মদন শারিকা ইত্যাদি সব পাখি বা অন্যান্য প্রকারে মঙ্গল সূচক সব প্রাণীবর্গ। এর ব্যতিক্রম ঘটলে প্রথম সাহস দণ্ড হবে।

রাজর্ষি অশোক মৃগয়া আইনকে ধর্ম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেন। অশোক রাজত্বের দশম বর্ষে ৮নং শিলালেখ দ্বারা রাজকীয় মৃগয়া বন্ধ করেন। সেই স্থানে ধর্মযাত্রা চালু করেন। ১নং শিলালেখ ও ৫ নং স্তম্ভলেখতে রাজকীয় রন্ধনশালা ও তাঁর সাম্রাজ্যে পশুহত্যা হ্রাস করার নির্দেশ দেন। আফগানিস্তানে লাঘমান নদীর ধারে প্রাপ্ত দুটি অ্যারামিক লেখদুটি[১৩] এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অধ্যাপক বি. এন. মুখার্জীর অনুবাদ অনুসারে বলা যায় যে প্রিয়দর্শী তার রাজত্বের পূর্ণ ষোড়শ বর্ষে (অর্থাৎ সপ্তদশবর্ষ চলাকালীন) তাঁর প্রজাদের মধ্যে যারা পশু ও মৎস্য শিকারে এবং অসার বিষয়ে অত্যধিক আসক্ততাদের বিতাড়িত বা নির্বাসিত করেন। অধ্যাপক মুখার্জীর মতে এই নির্দেশগুলি খোদিত হয়েছিল মৎস্যশিকারীদের

উদ্দেশ্যে। লাঘমান নদীতে অত্যধিক মৎস্যশিকার যাতে না হয় সম্ভবতঃ সেই কারণে লেখগুলি নদীর তীরবর্তী স্থলে প্রোথিত হয়েছিল। এই সব নির্দেশ কার্যতঃ তাঁর সার্বজনীন অহিংস নীতির অঙ্গ হিসাবেই প্রচারিত হয়েছিল।

পঞ্চম স্তম্ভ লেখটি সম্পর্কে হোরার[১৪] প্রবন্ধটি কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। হুলৎসের ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায় - 'আমার রাজত্বের ২৬ তম বর্ষে এই পশুরা অবধ্য হিসেবে ঘোষিত হল - তোতা, ময়না, লালহংসী, বন্যহংসী, নন্দীমুখ (অপরিচিত), জেলাত, বাদুড়, রাণীপিঁপড়ে, নদীচরকচ্ছপ, শার্ক, ভেদভেয়কে, গঙ্গাপুপুতক, স্কেটফিস (এক ধরণের সামুদ্রিক মাছ), কচ্ছপ, শজারু, কাঠবিড়ালী, শ্রিমর (কুকুর বিশেষ), স্বেচ্ছাচর ষন্ড, কীট মুষিকাদি, গণ্ডার, বন কপোত (হোয়াইট ডাভ) এবং সমস্ত চতুস্পদ জীব যা সাধারণভাবে মানুষের প্রয়োজনে লাগে না অথবা মানুষেব ভক্ষণীয় নয়।

হোরা 'অনঠিকমচ্ছে' অর্থাৎ অস্থিবিহীন মৎস বলতে শার্ক মনে করেছেন। 'ভেদভেয়কের সঙ্গে তুলনা করেছেন 'ইল' এর। গঙ্গা পুপুতক বলতে মনে করেছেন গাঙ্গেয় ডলফিন (মাছের সদৃশ), আর 'সঙ্কুজ' বলেছেন 'স্কেটফিস' কে। গর্ভবতী ছাগী, ভেড়ী, শূকরী ও ছ - মাসের কমবয়সী ছানাকে অবধ্য ঘোষণা কবা হয়। মোরগদেব নিবীর্য করা নিষিদ্ধ করা হয়। ঘোষিত হয় যে জীবিত লোমশ প্রাণীকে (হাস্ক ফর্স্টেইনিং) দগ্ধ করা যাবে না। কোন বন পোড়ানো যাবে না। অন্য কোন জীবিত প্রাণীর প্রাণনাশ করে কোন প্রাণীকে খাদ্য সরবরাহ করা যাবে না। প্রতিটি পক্ষের চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও প্রতিপদ তিথিতে মৎস শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি উপবাস দিবসে মৎস্য শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই দিনগুলিতে হস্তীবন বা মৎস্যশিকারীদের নিজস্ব সংরক্ষিত জলাশয়ে শিকার নিষিদ্ধ হয়। এছাড়া ও ষন্ড, ছাগ, ভেড়া, শূকর এবং এই জাতীয় প্রাণী যাদের নিবীর্য করা হত তাদের নির্দিষ্ট কতগুলি দিনে নিবীর্যকরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অশোকের উদ্দেশ্য ছিল অপ্রয়োজনীয় প্রাণী নিধন সীমিত রাখা। ব্যাপকহারে প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে অশোকের চিন্তা ভাবনা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

অশোকের মৎস্য আইন সম্পর্কে হোরার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অবশ্য স্মর্তব্য। হোরা বলছেন ভারতবর্ষে প্রধান মাছগুলোর প্রজনন সময় মোটামুটি জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু অশোকের নিষেধাজ্ঞা নভেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। তাঁর মতে এই কালসীমাকে বৃদ্ধি করার মধ্যে অশোকের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ সদ্য প্রসবিনী মাছ দুর্বল থাকে এবং ডিম ছাড়ার পর তারা অগভীর জল থেকে আবার গভীর জলে তাদের স্বাভাবিক বাসযোগ্য এলাকায় ফিরে যায়। এ সময় বাড়তি নিরাপত্তা দিয়ে সম্রাট অশোক করুণাধর্মের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন।

২ নং শিলালেখতে সম্রাট পশু চিকিৎসা ও মনুষ্য চিকিৎসার কথা পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্যে পশু চিকিৎসার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ধৌলি লেখতে দেখি পশু ও মানুষের উভয়েব জন্যই চিকিৎসা, জলের ব্যবস্থা ও ছায়াসমৃদ্ধ বৃক্ষ বপনের কথা। কি অসাধারণ মানবিক প্রয়াস। মনু সংহিতায় পশু হত্যার বিরুদ্ধে শাস্তির

ব্যবস্থা আছে।[১৫] বলা হয়েছে মানুষ এবং পশু উভয়কেই আঘাত করার ক্ষেত্রে আঘাতের পরিমাণ অনুযায়ী জরিমানা ধার্য হবে। (মনু. সং ৮, ২৮৬) ছোট গবাদি পশুকে আঘাত করলে অপরাধীর দুইশ পণ জরিমানা হবে। সুন্দর চতুষ্পদ এবং পাখি নিধনের শাস্তি হল পঞ্চাশ পণ (মনু. সং ৮, ২৯৭)। আর গাধা, ভেড়া ও ছাগলের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্দিষ্ট হয়েছিল পাঁচ মশা। কুকুর ও শূকরের ক্ষেত্রে এই জরিমানা ছিল এক মশা (মনু. সং. ৮.২৯৮)। এ ছাড়া মনু এই ধরণেব নৃশংস অপরাধের জন্য জাতিচ্যুত করা বা মিশ্রবর্ণে পতিত হবার ভয়ও দেখিয়েছেন (মনু. সং. ১১,৬৯)।

বিষ্ণু সংহিতায় শাস্তির বিধান কঠোরতর।[১৬] হাতী, ঘোড়া বা উটের হত্যাকারীর শাস্তি ধার্য হয়েছে - একটা পা বা একটা হাত কেটে নেওয়া (বি.সং. ৫,৪৭)। গৃহপালিত পশু হত্যার শাস্তি ছিল একশ কর্ষপণ (বি.সং. ৫৪৯)। পাখি ও মৎস্য হত্যার জরিমানা ছিল দশ কর্ষপণ (বি.সং. ৫২)। এমনকি নগণ্য কীট হত্যার করার জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যে প্রাচীন ভারতের স্মৃতিকারেরা পশু পীড়নকে গভীর অপবাধ বলে মনে করতেন। ফলতঃ আমরা দেখি শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের পাশাপাশি পশুদের উল্লেখ।

অগ্নিপুরাণে[১৭] বলা হচ্ছে-"অজ, হরিণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুদের তাড়ন করে অতিরিক্ত ক্লেশ দিলে, তাদের অঙ্গ থেকে শোণিত স্রাব করলে অথবা শাখাঙ্গ ছেদন করলে যথাক্রমে দ্বিপণ, চতুঃপণ এবং ষট্পণ দণ্ড জারি হবে। আর ওই সব পশুদের লিঙ্গ ছেদন করলে কিংবা তাদের বধ করলে মধ্যম সাহস দন্ড হবে। গো, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি মহাপশুদের তাড়ন এবং শোণিতপাত করলে পূর্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হবে।" মৃগয়ার উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েও শুক্রাচার্য[১৮] নিষ্ঠুরতাব জন্য শিকার পরিত্যাগ করতে বলেছেন। কামণ্ডকও শিকার যাত্রাকে একটি ব্যসন বলেছেন। এই ব্যসনকে শুধুমাত্র ক্রীড়া হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। এই ব্যসনে আসক্ত না হতে উপদেশ দিয়েছেন এবং শিকারের সমস্ত আইনকে যথাযথ মানতে বলেছেন (কাম. ৪১ ও ৪২)।

সুতরাং উপরিউক্ত তথ্যাদি এটুকু প্রতিভাত করে যে সার্বজনীন অহিংসার যে পবিবেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তৈরী করেছিল তার প্রভাব ভারতীয় জনমানসে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান ছিল। আধুনিক কালে আমরা নির্বিচারে পশুহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। প্রাচীন ভারতেও অপ্রয়োজনীয় ও যথেচ্ছ পশুপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার ছিলেন। হিন্দু সমাজ চিন্তাবিদেরাও নানারকম শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে পরিবেশ সুরক্ষার তিনটি মূল উপাদান বৃক্ষ, বন ও বন্যপ্রাণী কুলকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন। প্রাণী সুরক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্তহলেও প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারণের পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান কালেব মত পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতন বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ছিল কিনা এ বিষয়ে আরো বেশী অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় সভ্যতা তার আদিকাল থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক অসাধারণ আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। প্রাণী সুরক্ষায় প্রাচীন ভারতীয়েব প্রয়াসেব শুধু বস্তুবদী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণই

যথেষ্ট নয়। এর মূল প্রোথিত আছে অনেক গভীরে - ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান গভীর মমত্ববোধের মধ্যে।

সূত্র নির্দেশ

১. সাহু, বি.পি, ফ্রম হান্টার্স টু ব্রিডারস (ফনাল ব্যাক গ্রাউন্ড অব আরলি ইন্ডিয়া), অনামিকা প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৮৭।
২. হুইলার, আর.ই.এম,আরলি ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, টেমস্ এ্যান্ড হাসন্, লন্ডন, ১৯৫৯।
৩. হুইলার, এম.দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন, দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া - সাপ্লিমেন্টারি ভল্, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬০।
৪. ভাদুড়ী, জে.এল.; তিওয়ারী, কে.কে. এবং বিশ্বাস, বি. জুলজি। এ কনসাইজ হিস্ট্রি অব সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স এ্যাকাডেমী, নিউদিল্লী, ১৯৭১।
৫. উইলসন, এইচ. এইচ., ঋগ্‌বেদ (ইং. অনু) লন্ডন ১৮৫০।
৬. ব্লুমফিল্ড, এম., হিম অব দি অথর্ব বেদ, অক্সফোর্ড, ১৮৯৭।
৭. কাংগ্লে, আর. পি., (ইং. অনু) দি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, পার্ট ২, ইউনিভার্সিটি অব বম্বে, ১৯৭২।
৮. গ্যাডগিল, মাধব ও গুহ, রামচন্দ্র, দিস্ ফিসার্ডল্যান্ডঃ অ্যান ইকোলজিক্যাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।
৯. মিত্র, আর. এল. (সম্পা. ই. অনু), দি নীতিসার অর দি এলিমেন্ট অব পলিটি বাই কামন্ডকি, বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা, ১৮৪৯।
১০. সরকার, ডি.সি. (সম্পা.), 'দি এলিফ্যান্ট ফরেস্টস্ অব এনসেন্ট ইন্ডিয়া', দি ভক্তিকাল্ট এ্যান্ড এনসেন্ট ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা, ১৯৭০।
১১. বড়ুয়া, বি. এম., অশোক এ্যান্ড হিজ ইনস্ক্রিপশনস্, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড কলকাতা, ১৯৪৬।
১২. বোস. আর. এম., অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ অব কালিদাস (ইং. অনু), মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ কলকাতা. ১৯৬৩।
১৩. মুখার্জী, বি. এন., স্টাডিজ ইন দি অ্যারামিক এডিক্টস্ অব অশোক, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম রিপ্রিন্ট সিরিজ ১, কলকাতা, ১৯৮৪।
১৪. হোরা এস. এল, নলেজ অব দি অ্যানসেন্ট, হিন্দুস কনসার্নিং ফিস অ্যান্ড ফিসারিজ অব ইন্ডিয়া, ফিসারি লেজিসলেশন ইন অশোকজ পিলার এডিক্ট ফাইভ (২৪৬ খ্রীঃ পৃঃ) জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৬ নং , পৃ ৪৩-৫৬, ১৯৫০।
১৫. বুহ্‌লার, জি. দি., লজ অব মনু (ইং. অনু) দি সেক্রেড বুক অব দি ইস্ট, ভল ২৫ (সম্পা. এফ. ম্যাক্সমূলার) মতিলাল বানারসী দাস, দিল্লী, ১৯৮৪।
১৬. দত্ত, এম. এন., বিষ্ণুপুরাণ (ইং. অনু) কলকাতা, ১৮৯৪।
১৭. দত্ত, এম. এন., অগ্নিপুরাণ (ইং. অনু) কলকাতা, ১৯০১।
১৮. সরকার, বি. কে., দি শুক্রনীতি (ইং. অনু.), ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন, নিউদিল্লী, ১৯৭৫।

প্রাচীন বঙ্গের জলবায়ুঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ করে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, মাটি, অগণিত নদী আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত নিঃসন্দেহে তার জনগণের প্রকৃতি ও স্বভাব চরিত্র গঠনে, মননশীলতায়, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি রূপায়ণে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেইরূপ বঙ্গের জলবায়ু, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত বাঙালীর সামগ্রিক ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার উর্বরা পলিমাটিযুক্ত সমতলভূমি, প্রচুর বৃষ্টিপাত বাংলাকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করেছে। এখানে বাঙলা বলতে সেই বাঙলাদেশ যার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, ডান হাতে যার কমলার ফুল, বামে মধুকমালা আর দক্ষিণে যার চরণবন্দনা করছে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

প্রাচীন বঙ্গের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের সমীক্ষা করতে গেলে আমাদের লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের উপাদান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাচীন ও বর্তমান জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তারতম্য বা পার্থক্যও খুব বেশী বলে মনে হয় না। তবে হাজার বৎসরেরও বেশী ব্যবধানে ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও অন্যান্য ঋতুর আমূল পরিবর্তন না হলেও কম বেশী অমিল তো থাকবেই।

প্রাচীন বঙ্গের জলবায়ু নিরীক্ষণে বর্তমান বঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) জলবায়ুর সারাংশে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমে বলা যেতে পারে বর্তমান বঙ্গের জলবায়ু ভৌগোলিক সংজ্ঞায় উপ-ক্রান্তীয় (Sub-tropical) মণ্ডলভুক্ত। গ্রীষ্মকালে ৩৮° সেলসিয়াস থেকে ৪৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা উঠানামা করে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের পশ্চিমাংশ কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর।

গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। আবার হিমালয় পর্বতের সানুদেশে, দার্জিলিং, কার্শিয়াং প্রভৃতি অঞ্চল খুবই শীতল।[১]

তাপমাত্রার তারতম্যের ন্যায় বৃষ্টিপাতের তারতম্যও লক্ষণীয়। যেমন উত্তর-বঙ্গে জলপাইগুড়ি, হিমালয়ের পাদদেশে, মেঘালয় মালভূমিতে, ত্রিপুরা-লুসাই পার্বত্য অঞ্চলে, মেঘনা নদীর মোহনায়, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, বরিশালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।[২] উত্তরে বৃষ্টিপাত সাধারণত: ১৪০০ থেকে ২৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়।[৩] আবার বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ থেকে

২২৫০ মিলিমিটারের মধ্যে।[৪]

অতএব বলা যেতে পারে বৎসরের ২ মাস গ্রীষ্মের দাবদাহ ও কিছুদিন ভ্যাপ্‌সা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ব্যতীত জলবায়ু বেশ ক্লান্তিনাশক, উৎসাহব্যঞ্জক। প্রাচীনকালের ন্যায় বর্তমানেও সঙ্গীতে, কবিতায়, গল্পে, নাটকে বঙ্গদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্ণনা পাওয়া যায়। আজকের ঋতুচক্রে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের রূপমাধুর্য পরিস্ফুটনে কেবলমাত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু-একটি কবিতা ও সঙ্গীতের ছত্র উদ্ধৃত করলাম।

যেমন 'দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে', কখনো 'ঐ বুঝি কালবৈশাখী সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি' কিংবা 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ ইত্যাদি।[৬]' এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো' 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো সকালবেলার মল্লিকা' ইত্যাদি।

এইভাবে ঋতুচক্রের অপূর্ব দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নিবন্ধের মূল বিষয় প্রাচীন বঙ্গেব জলবায়ু। উল্লেখ্য সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সন্ধ্যাকর নন্দীর (একাদশ শতাব্দী) রামচরিত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ (দ্বাদশ শতাব্দী), সদুক্তিকর্ণামৃত, চর্যাপদ (দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখছেন- পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের মৃত্তিকা নিম্নোক্ত (low) ভিজে ভিজে স্যাঁতসেঁতে (moist)। পুণ্ড্রবর্ধনের জলবায়ু অনুকূল (congenial), তাম্রলিপ্তি উত্তপ্ত (hot) বায়ু উষ্ণ, কর্ণসুবর্ণ সহনশীল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ।[৭] বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বারিপাত বাহুল্য বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব বাংলায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বরেন্দ্রীতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বর্ষার ঘন কালো মেঘের ঘনঘটার চিত্র পাওয়া যায়। যথা 'অতিকদাঃ যঃ বেগ বনন্তশ্চ ঘনা মেঘা প্রভূতং বর্ষিতামিত্যাশয়েঃ' ইত্যাদি।[৮] কোথাও বর্ণিত আছে প্রায়শই ও একটানা বর্ষণের কথা।[৯] এর থেকে অনুমিত হয় বরেন্দ্রীতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে প্রভূত বৃষ্টিপাত হতো। আবার জয়দেবের গীতগোবিন্দে অনুরণিত হয়েছে- 'মেঘৈর্মেদুবমম্বরম বনভূবশ্যামান্তমালদ্রুমৈঃ'[১০] কখনো 'বৃষ্টিব্যাকুল গোকুল' ও 'সজলজলদসমুদয়'[১১] প্রভৃতি শব্দচয়নে গীতগোবিন্দে ঘন বর্ষার অপূর্ব সৌন্দর্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সদুক্তিকর্ণামৃতে প্রবল বর্ষার পরিচয় মেলে কবি যোগেশ্বরের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে —

'প্রভূত পয়সঃ...

দেবে নিরমুদারমুল্পতি সুখং শেতে নিশাম্ গ্রামণীঃ'[১২]। চর্যাপদে বর্ণিত আছে বর্ষার নদী দুকূল প্লাবিত করেছে।[১৩] নৌকা, ডিঙ্গিতে জনগণ যাতায়াত করছে। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের বিরহ পর্যায়ে বর্ষার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়ের পদাবলীতে বর্ষার অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় —

'ঝাম্পি ঘনঘোর জান্তি সন্ততি
ভুবন বারি বারি খন্তিয়া
এ ঘোর রজনী মেঘেব ঘটা (চণ্ডীদাস)

কখনো বা 'গগনে অব ঘন মেহ

দারুণ সঘনে দামিনী চমকই' (রায় শেখর) কোথাও বর্ণিত 'ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত (রায় শেখর) কিংবা জ্ঞানদাসের লেখনীতে অনুরণিত —

'মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়া' 'বসন্ত ঋতে' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে উভয়কে দর্শন করেন।[১৪]

এইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের জলবায়ু বিশেষ করে বর্ষার চিত্র প্রতীয়মান।

ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজল আইন-ঈ-অকবরীতে প্রবল বর্ষণ ও বর্ষার উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল বলেছেন বর্ষার আগমন মে মাসে, স্থায়ী ছ' মাসেরও বেশী, সমতলভূমি জলমগ্ন। তারমাঝে উঁচু উঁচু ঢিপিগুলি দেখা যায়।[১৫] অবশ্য ছ' মাস একটানা বর্ষা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

এইভাবে লিখিত উপাদানে প্রাচীন বঙ্গের আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। লিখিত উপাদান ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে বর্ষার ও অবিরাম বর্ষণের উল্লেখ আছে। অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজা ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে অবিরাম বর্ষণের অপূর্ব বর্ণনা পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন 'নিরাতিশয় ঘন ঘনাঘনঘটা শ্যামায়মান বাসরলক্ষ্মী সমারব্ধ সন্তত জলদসময়'।[১৬] ঠিক তেমনি করে 'দেবপালের' মুঙ্গের তাম্রশাসনে বর্ষার 'নিরতিশয় ঘন ঘনঘনঘট্টা'র অপূর্ব বর্ণনা খোদিত আছে।[১৭] মহীপালের বানগড় তাম্রশাসনেও অবিরাম বর্ষার প্রতিবিম্ব লক্ষণীয়ঃ 'দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সিস্বচ্ছমাপিয়োতোয়ং' শ্লোকে।[১৮] পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের লেখতে[১৯] ও চোলরাজা রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলই লেখতেও বঙ্গে প্রবল ও অবিরাম বর্ষণের উল্লেখ আছে।[২০] তিরুমলই লেখতে বঙ্গালদেশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এই দেশে বারিপাতের কখনও বিরাম ছিল না (Vaṅgāladeśa where the rain water never stopped.)।[২১]

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যুগে যুগে বাংলার বর্ষা কবি, দার্শনিক, চিন্তাবিদ্, রাজামহারাজদের চিত্ত হরণ করেছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রাচীন বঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হ'তো। লিখিত ও লেখমালার তথ্যসমুদয় প্রমাণ করে বর্ষাকে কেন্দ্র করে মানুষের অনুভূতি, ভালবাসা, অনুরাগ, উচ্ছ্বাস ও আনন্দ।

বর্ষার ন্যায় বসন্তও প্রাচীন বঙ্গের লিখিত উপাদানে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জয়দেবের গীতগোবিন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। গীতগোবিন্দে বসন্তের ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ বর্ণনার রঙীন ছবি পাওয়া যায় নিম্নলিখিত শ্লোকে- 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমলমলয়সমীরে'।[২২] সুন্দর, স্নিগ্ধ ললিত লবঙ্গলতা মৃদুমন্দ, শীতল, মনোহরণকারী ক্লান্তিনাশক বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া সৌন্দর্য বিকিরণ করছে। 'বসন্তে বাসন্তি কুসুম সুক্ত'- বাসন্তি লতায় প্রস্ফুটিত ফুলের শোভা চতুর্দিক আলোকিত করে রয়েছে। থোকা থোকা বকুল ফুটেছে, তমাল গাছের পাতা সুগন্ধ বাতাসে দুলছে। মলয়সমীরে কোকিল আনন্দে কুহু কুহু রবে ডাকছে। 'বহুতিত মলয়সমীরে কোকিল কলরব কূজিত'।[২৩] ধোয়ীর পবনদূতে (দ্বাদশ শতাব্দীর) সুন্দর মনোমুগ্ধকর

মলয় পবনের উল্লেখ আছে।[২৪] রামচরিতেও শীতল সুগন্ধ বাতাসের কথা বাবংবার লক্ষ্য করা যায়।[২৫] শীতকাল ক্ষণস্থায়ী। আবুল ফজলও সেকথাই বলেছেন। শরৎকাল খুবই আবামপ্রদ ও উপভোগ্য। এইভাবে লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের তথ্যসমূহ প্রাচীন বঙ্গের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপর আলোকপাত কবেছে।

এখন আলোচ্য বিষয় জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত কিভাবে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে রূপায়িত করেছে। বঙ্গদেশে গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, মেঘনা, মহানন্দা, মাত্‌লা, দামোদর, রূপনাবায়ণ প্রভৃতি নদী প্রবহমান। বৈচিত্র ভূপ্রকৃতিতে, জলবায়ুতে, বৃষ্টিপাতে, মৃত্তিকায়। কোথাও জঙ্গলমহল, অজলা, অনুর্বর। কোথাও বৃক্ষশ্যামল, শস্যবহুল। যাইহোক্ নদীবহুল পলিমাটিতে গড়া বদ্বীপের উর্বর মৃত্তিকা বঙ্গদেশকে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। বদ্বীপ, উর্বর পলিমাটি, দুকূলভরা নদীর অবদান। বর্ষার সঙ্গে ভরা নদী ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। এই রকম জনপদ বহির্দেশ থেকে আগত জনগণের আকর্ষণীয় আশ্রয়স্থলে পরিগণিত হযেছে। সহনশীল আবহাওয়া, উর্বর মৃত্তিকা সব মিলিযে মনুষ্যবসতির উপযুক্ত স্থান বলে নির্ণীত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দিক থেকে উপজাতি সম্প্রদায় এই ভূখণ্ডে প্রবেশ কবতে শুরু করলো, জল ও চাষবাসের জমি দেখে বসবাস করতেও আরম্ভ করলো। জঙ্গলে জ্বালানি সংগ্রহ করা, বন্যজন্তু শিকার করা তাদের জীবিকা হলো। ক্রমশ কৃষিকার্য শুরু হ'লো। পরে বঙ্গের অধিবাসীদের কৃষিকার্যই প্রধান জীবিকা হ'লো। আব্হাওয়া ও বারিপাত বাহুল্যের দরুণ ধান উৎপাদনের প্রাচুর্য দেখা যায়। 'ব্রীহিঃ স্তম্ভকারিঃ প্রভূত পয়সঃ'।[২৬] নানারকমের ধান উৎপন্ন হ'তো। বামচরিতে 'বহুনামি' বহুবিধনং ধান্যরাজানাং ইত্যাদি শ্লোকে।[২৭] চর্যাপদে 'কাগনি' নামক ধান্যের ফলনের কথা পাওয়া যায়।[২৮] উৎকৃষ্ট শালিধান্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্নামৃতেব শ্লোকে- 'শালিচ্ছেদ সমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ' (২/১৩৬/৫)[২৯]। বঙ্গে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে প্রচুর ইক্ষু বা আখ চাষ হ'তো। আখ মাড়াই করে গুড় তৈরী হতো। ইক্ষুযন্ত্রের শব্দ ধ্বনিত হ'তো ঘরে ঘরে। গ্রামগুলি নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত হ'তো। 'ধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রাম্য গুড়ামোদিনঃ' (২/১৩৬/৫)।[৩০] লিখিত উপাদান ছাড়া মহাস্থান লেখ থেকে আবম্ভ করে পাল-সেন যুগের অগণিত লেখমালায় ধান উৎপাদনের উল্লেখ আছে।[৩১] লেখমালায় ও লিখিত উপাদানে আম্র, মধুক, খর্জুব, পনস (কাঁঠাল), ডুমুর, কলা, আখ (ইক্ষু), নারিকেল, সুপারি, পান, ডালিম ইত্যাদি ফলের প্রচুর ফলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। (সগুবাক-নারিকেল, আম্র, পনস, মধুক ইত্যাদি[৩২]) কৃষিকার্য ও কৃষিজাত শস্য আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতেব উপর নির্ভর করে। সব জায়গাব আবহাওয়া একই রকম উৎপন্ন ফসলের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এই আবহাওয়ায় সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও লতার প্রস্ফুটন হয়। যেমন কেশর, কদম্ব, কেতক, কনক, মল্লিকা, বকুল, নাগকেশর ইত্যাদি।[৩৩]

স্যাঁতসেঁতে জলবায়ু ও মাটি কার্পাস চাষের উপযুক্ত। চর্যাগীতিতে বর্ণিত আছে কাপাস ফুল ফোটায় শবব শবরীর কি আনন্দ। 'কপাস ফুটিলা, তৈলা বাড়ীর পাসেরে জোহ্না বাড়ী তা এলা'।[৩৪] এইভাবে দেখা যায় আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়ে কৃষিজাত ফসল ও ফুল ফলেব ফলনে। জলবায়ুর প্রভাব পড়ে শিল্পের ওপর। বয়নশিল্পে বঙ্গেব খ্যাতি দেশে বিদেশে

ছড়িয়ে পড়েছিল। বঙ্গের বিখ্যাত বস্ত্র কার্পাসিক, ক্ষৌম, কৌশেয়, পত্রোর্ণ, দুকূল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মসলিন সর্বত্র সমাদৃত।[৩৫] আজও দেশে বিদেশের বাজারে বাঙলার টাঙ্গাইল, শান্তিপুরী, ঢাকাই, জামদানি, অমর্শি, ধনেখালি বিষ্ণুপুরের বালুচরি, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, তসর গরদ ইত্যাদি শাড়ী আকর্ষণীয় ও শ্রেষ্ঠত্বের স্থান অধিকার করে। এ প্রসঙ্গে মার্কো পোলোর উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :"It is stated that Bengal was a great centre of manufacturing cotton fabrics which were exported to different parts of the world."[৩৬] পেবিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি পুস্তকে, প্লিনির ন্যাচাবাল হিষ্ট্রি ও অন্যান্য লেখকদের বর্ণনায় বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ আছে।[৩৭]

মৃৎশিল্পও জলবায়ু ও বিশেষ ধরণের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই কুমোর বা কুম্ভকার সম্প্রদায় কলসী, হাঁড়ি, গ্লাস ইত্যাদি গৃহস্থালির ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈয়ার করতো। লেখতে কুম্ভকারের, কুম্ভকারগর্ত্তা, কুমোরপাড়া ইত্যাদির উল্লেখ পাই।[৩৮] জলবায়ুর প্রভাবে আর একটি শিল্প উল্লেখনীয় যথা লবণশিল্প। সমুদ্রের লোনা জল শুকিয়ে নুন তৈরী করা হ'তো।[৩৯] মাছ ধরা অন্যতম জীবিকা। বৃষ্টিপাত ও মৎস্যের প্রাচুর্য জনগণের জীবিকা নির্ধারণ করে।[৪০] মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে বাঁশের ঝাড় দেখা যায়। রামচরিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪১] বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী সম্প্রদায় শবর, শবরী, নিষাদ, চণ্ডাল ইত্যাদি জনগণ বাঁশের চাঙাড়ি, ঝুড়ি এসব তৈরী করতো।[৪২]

বৈদেশিক ও অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য জল ও স্থলপথে চলতো। জলপথে নদীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৃষ্টিপাতের দরুণ নদীগুলির নাব্যতা থাকতো। নৌকা ও ডিঙ্গিতে পারাপাব করা হ'তো, ব্যবসা বাণিজ্যও চলতো। চর্যাপদের বহুবিধ শ্লোকে এর কতো উল্লেখ আছে।[৪৩] জাহাজও বন্দরে ভিড়তো।

এইভাবে দেখা যায় আবহাওয়া, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত বঙ্গের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বঙ্গ-সংস্কৃতি রূপায়ণেও বঙ্গের জলবায়ুর অবদান লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, লৌকিক আচার পদ্ধতি, শিল্পচেতনা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি উল্লেখ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উপ-ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিবাসীরা সূতি বস্ত্র পরিধান করতো। পুরুষেরা ধুতি ও উত্তরীয় অর্থাৎ চাদব ব্যবহার করতো। পরে পাঞ্জাবী, শার্ট, ফতুয়া পরিধান করতে আরম্ভ করে। আদিবাসী সম্প্রদায়কে আজও দেখা যায় ছোট ধুতি ও গামছা পরে থাকতে। খালি গায়ে থাকতেই তারা ভালবাসে।

পরিষ্কার বোঝা যায় জলবায়ুর প্রভাবেই এই ধরণের পোষাকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা শাড়ী, চৌলি, কাঁচুলি ব্যবহার করতো।[৪৪] যার নিদর্শন পাহাড়পুরে দেখা যায়। শীতকালে অল্প পশমের জামা কাপড় পরতো। প্রাচীনকালে তাও ছিল না। আগুন পোহাতো। এখনও আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাই দেখা যায়। অতএব একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে পোষাক পবিচ্ছদ আবহাওয়ার সংগে সম্পৃক্ত।

আবার খাদ্য তালিকায় ও খাদ্যাভ্যাসে দেখা যাচ্ছে বাঙালীরা ভাত, ডাল, মাছ, নালিতাশাক, দুধ, দই, ফলমূল, তরিতরকারি, নানারকমের মিষ্টান্ন, ঘি, পায়স বা পরমান্ন-ইত্যাদি গ্রহণ করে।[৪৫] দুবেলাই ভাতে অভ্যস্ত। রুটি খাওয়া পছন্দ করে না। বিশেষ করে গ্রীষ্মে নিম্নবর্গীয় জনগণ ভিজে বা পান্তাভাত, পোস্ত, পেঁয়াজ, লঙ্কা খেতে অভ্যস্ত। এও কিন্তু আবহাওয়ার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। চুন, খয়ের, সুপারি সহযোগে পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতিতে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।[৪৬]

বাঙালীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, ঋতুচক্রের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রীষ্মে চড়কপূজা, ঝাঁপান, গাজন, বৃক্ষপূজা, বর্ষায় মনসাপূজা, গঙ্গাপূজা, ভাদু, টুসু ইত্যাদি, শীতকালে মাঠে পাকা ধান, একে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রপূজা, লক্ষ্মীপূজা, পৌষ সংক্রান্তি, শরৎকালে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বসন্তে বাসন্তীপূজা, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা, দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মে গাছপালাকে বাঁচিযে রাখাব জন্য জল সিঞ্চন করে পূজা করার রীতি, বর্ষাকে আবাহন জানানো, বর্ষায সর্পেব প্রাদুর্ভাবের জন্য মনসাদেবীকে পূজা করে সন্তুষ্ট করাব বীতি, পৌষমাসে লক্ষ্মীপূজা, ক্ষেত্রপূজা সর্বই ঋতুব সংগে সম্পৃক্ত। ধান প্রধান খাদ্য। তাই ধান্য উৎপাদনে কৃষকেব আনন্দেব সীমা থাকে না। তাই এই পূজা — পৌষসংক্রান্তিতে নূতন কাপড় পরিধান করে মালক্ষ্মীকে বরণ করে নানাবিধ পিঠে পায়েস নিবেদন করে আনন্দ জ্ঞাপন কবে। জলবায়ু, প্রকৃতির সংগে সংযুক্তপূজা-পার্বণ, আচাব অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার বঙ্গদেশ/বাঙলা নামে জনপদেব আদিবাসী সম্প্রদায অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জন-গোষ্ঠীর। সমীক্ষায় দেখা যায় এই সকল পূজা-পদ্ধতিব অধিকাংশের উৎসই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী সম্প্রদায়ের। তারপরে আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের সংগে মিশ্রণে ধর্মানুষ্ঠানে সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বাঙালীর জীবন জুড়ে বিশেষ করে স্বভাব চরিত্রে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বহুল প্রভাব প্রতিভাত হয়েছে। এই রকম জলবায়ুর জন্যই বাঙালীরা পরিশ্রম বিমুখ। জলবায়ুই তাদের ক্লান্ত করে দেয়। ক্লান্তিতে নিদ্রায মগ্ন হয়ে যায়। 'দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি সুখং শেতে নিশা গ্রামণীঃ বাহিরে আকাশ হইতে প্রচুর জল ঝরিতেছে- গ্রাম্য (যুবক) সুখে শুইয়া আছে' (সদুক্তিকর্ণামৃত ২/৮৪/৩)। অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বঙ্গের জনগণ বেশী ভাবকু, কল্পনাপ্রবণ, চিন্তাশীল। স্নিগ্ধ, শীতল, প্রাকৃতিক পরিবেশ অধিবাসীদের কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। তাদের নিজ নিজ কর্মের ক্ষেত্র ও পরিসর অনুযায়ী তারা উদ্ভাবনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যান্য জনপদের ভৌগোলিক পরিবেশ সেই অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো বঙ্গের জনগণ পরিবেশের সংগে নিজেকে সামঞ্জস্য করে নিতে পারে। বহুবিধ চিন্তা ও সংস্কৃতির স্রোতকে তারা মিলন-মিশ্রণের দ্বারা সমন্বয় সাধন করে একটি নূতন স্রোতধারায় প্রবাহিত করতে পারে। নূতন চিন্তা, নূতন সংস্কৃতি গ্রহণ কবে নিজেদের মতন করে রূপায়িত করার ক্ষমতা ও মানসিকতা অর্জন করে। জলবায়ু বাঙালিকে শান্ত, স্থির, সহজ, সরল, উদার হতে সাহায্য করেছিল। বঙ্গ-সংস্কৃতির সমন্বিত

রূপ প্রতীয়মান হয়েছে অলক্ষ্যে জলবায়ুর অবদানে। এই সমন্বিত সংস্কৃতি গ্রহণ করতে শিখিয়েছে, বর্জন করতে শেখায়নি, আবাহন করতে শিখিয়েছে, বিসর্জন দিতে শেখায় নি।

বহুবিধ নরগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণে পুণ্ড্র, সূক্ষ্ম, বঙ্গ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ কালের বিবর্তনে, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে বঙ্গদেশ/বাঙলায় রূপান্তরিত হয়ে বাঙালী জনগোষ্ঠীর বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। তাই যথার্থই রবীন্দ্রনাথঠাকুর বলেছেন 'আমার (বাঙালীর) শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর'। বিবিধ নরগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিরও মিলন ঘটেছে এই ভূখণ্ডে। এই সমীকরণ ও সুসম্বন্ধ জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় রয়েছে এই দেশের ভূপ্রকৃতি, নরম পলিমাটি, স্নিগ্ধ, মনোরম জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত। এই জলবায়ুই শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতি ও অনন্তের সঙ্গে মিলনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাহিত্যে, কবিতায়, নাটকে, গল্পে এর প্রভাব প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত হয়েছে। তাই কবিকণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছে —

'বাংলার মাটি বাংলার বায়ু
বাংলার জল বাংলার ফল
..ধন্য হউক ধন্য হউক ...'

এই বিশ্লেষণী সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে ...'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'...এই সমন্বিত সংস্কৃতির উৎস বঙ্গের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত।

সূত্র নির্দেশ

১. স্পেট, ও এইচ.কে.এ্যাণ্ড লিয়ারমন্থ, এ.টি.এ, ইন্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান, এ জেনারেল এ্যাণ্ড রিজিওন্যাল জিওগ্রাফি, পৃ: ৫৭৫ (লন্ডন, ১৯৫৪, রিপ্রিন্ট ১৯৬৭); চ্যাটার্জী, এস.পি, বেঙ্গল ইন ম্যাপস্, পৃ: ১৮-২২ (ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ক্যালকাটা, ১৯৪৯); সম্পাদকমণ্ডলী, চ্যাটার্জী, এ.বি, গুপ্ত, এ. এ্যাণ্ড মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, পৃ: ৩৯ (ক্যালকাটা, ১৯৭০); ঘোষ, শচীন্দ্রলাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃ: ১১-১৩ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৬); রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ ১২৭-১২৯ (কলিকাতা, ১৯৮০)।

২. তদেব, পৃ ৫৭৫; চ্যাটার্জী, গুপ্ত, মুখোপাধ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃ: ৩৮; রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ:; ১৩৪।

৩. তদেব, পৃ: ৫৮২।

৪. সেন্টিনারি কমেমোরেসন ভল্যুম, গর্ভমেন্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ফরেষ্ট ডিরেকটোরেট, ১৯৬৬, পৃ: ১৪১, ১৪৯, ১৫১। (পদ্মা-মেঘনা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৫০-২২৫০ মি.মি. বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে ১২৫০-১৫০০ মি.মি., মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে ১১২৫ মি.মি., বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় ১৩০০ মি.মি. ইত্যাদি)।

৫. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর - সঞ্চয়িতা, পৃ: ৭৪৪ (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৬); গীতবিতান, ২য় খণ্ড পৃ: ৪৩২-৩৩, (বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৫)।

৭. ওয়াটারস্. টি. (অনুবাদক), অন হিউয়েন সাঙ্ ট্রাভ্লস ইন ইন্ডিয়া. ভল্যুম টু, পৃ: ১৯৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯১. (লন্ডন, ১৯০৫, দিল্লী, ১৯৬১); রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ:

১২৯-১৩২।
৮. সম্পাদকমণ্ডলী মজুমদার, আর.সি. বসাক, আর.জি.এ্যাণ্ড ব্যানার্জী এন.জি, দি রামচরিত অব সন্ধ্যাকরনন্দীন, অধ্যায় তৃতীয়, পৃ: ৯৫ (রাজসাহি, ১৯৩৯)।
৯. তদেব, ভার্স - ২৬, পৃ:: ৯৮, ভার্স, ১৩ পৃ: ৮৮।
১০. লক্ষ্মীনরসিংহ শাস্ত্রী, গীতগোবিন্দকাব্য অব জয়দেব, পৃ: ২৭ (মাদ্রাজ, ১৯৫৬);; সেন সুকুমার, শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্ কবি জয়দেব গোস্বামী বিরোচিত, পৃ: ১ (কলিকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ)।
১১. তদেব, পৃ: ৭২-১০৩, সেন, তদেব, পৃ: ৩২-৪৯।
১২. সম্পাদক, ব্যানার্জী সুরেশচন্দ্র, সদুক্তিকর্ণামৃত শ্রীধর দাস ২/৮৪/৩ (কলিকাতা, ১৯৬৫); রায় নীহার রঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৮০)।
১৩. দাশগুপ্ত, এস.বি., বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃ: ১২৪, ১২৩, ১২৫ (কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।
১৪. বিদ্যাপতির পদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, (সম্পাদিত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪)। পৃ: ৫৯, ৫৪, ৫৩, ৫৫, ৯৬ ইত্যাদি।
১৫. জ্যারেট, এইচ. এস. (অনুবাদ, জে.এন. সরকার কর্তৃক) আইন-ঈ-অকবরী, ভল্যুম টু, পৃ: ১৩২ (কলিকাতা, ১৯৪৮-৪৯)।
১৬. মাইতি, এস.কে. এ্যাণ্ড মুখার্জী আব.আর, করপাস অব বেঙ্গল ইন্সক্রিপসন্স বিয়ারিং অন হিষ্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেসন অব বেঙ্গল. পৃ: ৯৯-১০৬, (কলিকাতা, ১৯৬৭)।
১৭. তদেব, পৃ: ১১৮, ১২৩।
১৮. তদেব, পৃ: ২০০।
১৯. ময়নামতী প্লেট অব গোবিন্দচন্দ্র, প্রোসিডিংস অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেস, আলিগড়, ১৯৬০, পার্ট ওয়ান, পৃ: ৩৬ এফ, এফ, মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬-২৮।
২০. এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম নাইন (IX), পৃ ২২৯ এফ্, এফ্।
২১. Tirumala Inscription.
২২. লক্ষ্মীনরসিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯; সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮।
২৩. তদেব, পৃ: ৭৪, ৫৪; সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯, ৩৩।
২৪. সম্পাদক, চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, পবনদূতম্ অব ধোয়ী, পৃ: ১,২,৩,২১ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, নং ১৩, কলিকাতা, ১৯২৬, ১৯৩৮)।
২৫. সম্পাদক, মজুমদার, বসাক ও অন্যান্যরা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৫।
২৬. সম্পাদক ব্যানার্জী সুরেশচন্দ্র, সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৮৪/৩; রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫, চট্টোপাধ্যায় এ., ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রোসিডিংস, বোধগয়া, ১৯৮১, পৃ: ১০১।
২৭. সম্পাদক, মজুমদার এ্যাণ্ড আদার্স, রামচরিত, তৃতীয় অধ্যায়, ভার্স ১৭ বি, পৃ: ৯১,

চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০১।

২৮. দাশগুপ্ত শশীভূষণ, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃ: ১১৭, চর্যাগীতি শবরপাদ, নং ৫০, কঙ্গুচিন পাকেলা রে। কঙ্গুচিন = কাগনি। কাগনি অর্থ-ধান্য, কলিকাতা, ১৩৭৬।

২৯. সদুক্তিকর্ণামৃত, পূর্বোক্ত, ২/১৩৬/৫; রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৬।

৩০. তদেব। চট্টোপাধ্যায়, এ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০১।

৩১. মজুমদার এন.জি., ইন্সক্রিপসন্স অব বেঙ্গল, ভল্যুম থার্ড, পৃ: ১২৯ (রাজসাহি, ১৯২৯); মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯, ৪০, দাশ, এস.আর, রাজবাড়ীভাঙ্গা, পৃ: ৪২ (কলিকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬০)। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি লেখর উল্লেখ করা হ'ল- লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর তাম্রশাসন, কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন।

নয়পালদেবের ইরদা তাম্রশাসন ইত্যাদি। (এপিগ্রাফিক ইণ্ডিকা, XXII, পৃ: ১৫০ এফ.এফ, XXIV, পৃ: ৪০৩ এফ.এফ; মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০২-৩১২ (আনুলিয়া), পৃ: ২৯৫-৩০২ (তর্পণদীঘি); পৃ: ২৭১-২৭৭ (গোবিন্দপুর)।

৩২. শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন (সতলা, সাম্রপনমা। সগুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা... ভোজবর্মনের বেলব লেখ; দেবপালের মুঙ্গের শাসনে — সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৫, ১১৯; নারায়ণপালের ভাগলপুর লেখ, পৃ: ১৬৮ শুধু মৎস্যের উল্লেখ নেই। মহীপালদেবের বানগড় তাম্রশাসন. পৃ: ২০২ রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪-১৮৩; মাইতি ও মুখার্জী, পূর্বোক্ত; মজুমদার, এন.জি., ইন্সক্রিপসন্স অব বেঙ্গল, ইত্যাদি। চট্টোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা, অ্যান ইনসাইট ইন্টু অ্যাগ্রোনমিক প্রোডাক্টস্ অব অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল, (প্রোসিডিংস অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৮১, বোধগয়া) পৃ: ১০১, ১০৬।

৩৩. মজুমদার এ্যাণ্ড আদার্স, পূর্বোক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ৯০-৯৫, ৮৪, ৫৫ এফ্; এফ্; সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ১,৮,১২; মজুমদার, এন.জি. ইনস্ক্রিপসন্সস্ অব বেঙ্গল, পৃ: ৭৬, ১৬২ এফ. এফ. (রাজসাহি ১৯২৯)

৩৪. চর্যা ৫০, দে সতব্রত, চর্যাগীতি পরিচয়, পৃ: ২২০-২২১ (কলিকাতা, ১৯৬০)।

৩৫. শামশাস্ত্রী, আর (অনুবাদক), কৌটিল্যাম অর্থশাস্ত্র, চ্যাপটার ইলেভেন (XI), পৃ: ৮৩-৮৪ (মাইশোর, ১৯৬৭) চট্টোপাধ্যায়, এ সাম ক্রাপ্টস্ অব এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল (টেক্সটাইল), প্রোসিডিংস অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, পৃ: ১৩১-১৪১, (বম্বে ১৯৮০); ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, গোল্ডেন জুবিলি ভল্যুম, টু।

৩৬. য়িয়ুল. এইচ. (সম্পাদক এবং অনুবাদক), দি বুক অব সের মার্কো পোলো, পৃ: ১১৫ (লণ্ডন, ১৯০৩, থার্ড এডিশন, রিভাইসড বাই এইচ. করডিয়ার, টু ভল্যুমস্, লণ্ডন, ১৯২০-২১)।

৩৭. শফ উইলফ্রেড, এইচ. (এডিটেড), দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি, পৃ: ৪৭ (লণ্ডন, ১৯১২); মজুমদার আর সি, দি ক্লাসিক্যাল এ্যাকাউন্টস্ অব ইণ্ডিয়া, পৃ: ৩০৮, ৩৩৮ (ক্যালকাটা, ১৯৬০); প্লিনিজ ন্যাচারাল হিস্ট্রি, বুক টুয়েলভ (XII) ১৮-১৯।

৩৮. মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত,.পৃ: ৩৭৭ (বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন)- এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম, টু, পৃ: ৩৫০ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম (XII), পৃ: ৬৫, এফ.এফ.; নিধনপুর তাম্র শাসন, ভল্যুম উনিশ (XIX) পৃ: ১১৫ এফ.এফ., এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ভল্যুম চব্বিশ

(XXIV), পৃ: ৩২৯ এফ.এফ; মজুমদার, এন.জি, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩।

৩৯. রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭, (ইরদা লেখ)।

৪০. তদেব, পৃ: ১৭৭, (দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন — মোষিকা নামে একটি গ্রাম দান করা হচ্ছে...সজল স্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ; মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯)।

৪১. তদেব, পৃ: ১৭৮; সম্পাদক মজুমদার ও অন্যান্যরা, পূর্বোক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, ভার্স ১৭, পৃ: ৯১।

৪২. তদেব, পৃ: ১৭৮।

৪৩. দাশগুপ্ত, এস.বি, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০১; দে, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০ (গঙ্গা যৌনা মাঝেরে বহতি নাই)।

৪৪. সম্পাদক মজুমদার আর.সি., হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ৬১৩-১৪ (ইউনিভারসিটি অব ঢাকা, ১৯৪৩; ঘোষ, এস.এল, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃ: ৩০ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৬)।

৪৫. ঘোষ, এস.এল, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০-৩১; সম্পাদক মজুমদার, আর.সি, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃ: ৬১১-১২; রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, ভল্যুম টু, পৃ: ৫৬৪-৬৬।

৪৬. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, পূর্বোক্ত, শ্লোক ২৮, পৃ: ১১৩ (হিয়া তাঁম্বুল মহাসুখে কর্পূর খাই)।

প্রাচীন ভারতের রাজ্যবর্ষঃ সংশ্লিষ্ট সমস্যা

সত্যসৌরভ জানা

প্রাচীন ভারতীয় লেখমালার মধ্যে বেশকিছু সংখ্যক লেখ 'রাজ্যবর্ষ'(Regnal Year) সম্বলিত।[১] অর্থাৎ আলোচ্য লেখমালাতে তারিখ উল্লেখের ক্ষেত্রে 'রাজ্যবর্ষ' ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন-দ্বাদশ বসাভিসিতেন ময়া ইদং আঞপিতম্, গিরনার অনুশাসন, অশোকের তৃতীয় শিলা লেখ)।[২] রাজ্যবর্ষ সম্বলিত লেখমালাতে 'বর্ষ', 'দিন' বা 'রাত্রি'র উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] কখনো আবার চান্দ্রদিবসেরও উল্লেখ করা হয়েছে ('সবছরে ১৮ বাসপখ ২ দিবসে', গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাসিক লেখ)।[৪] আবার এই ধরণের এমন কিছু লেখ পাওয়া যায়, যাতে সংশ্লিষ্ট রাজার বৎসরানুক্রমিক কীর্তিকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় (কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখ)। এক্ষেত্রে রাজার কীর্তিকাহিনীকে যে পঞ্জীকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ভারতীয় লেখমালায় রাজ্যবর্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যাও বর্তমান, যেমন : এক।। রাজ্যবর্ষগুলির গণনা ঠিক কোন মাস থেকে শুরু হত। কার্তিক, চৈত্র, আষাঢ় না শ্রাবণ এবং সেই মাসটি অমাবস্যা দিয়ে শেষ হত অর্থাৎ 'অমান্ত' নাকি পূর্ণিমা দিয়ে শেষ হত অর্থাৎ 'পূর্ণিমান্ত' ? দুই।। এই রাজ্যবর্ষগুলি কি সংশ্লিষ্ট রাজার সিংহাসনারোহনের দিন থেকেই গণনা করা হত নাকি এই রাজ্যবর্ষ প্রচলিত বা গণিত বর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাকে বর্ষগণনার সঙ্গে যুক্তকরা হয়েছিল। তিন।। লেখমালায় উল্লিখিত রাজ্যবর্ষগুলি 'বর্তমান' বর্ষ না 'গত' বা 'পূর্ণঅব্দ''। চার।। এই রাজ্যবর্ষগুলি বাজার ষোলআনা রাজকীয়ত্বের পরিচায়ক কিনা।

উল্লিখিত প্রথম সমস্যা সম্পর্কে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত 'বিক্রমাব্দ',[৫] 'শকাব্দ'[৬] এবং 'গুপ্তাব্দ-র[৭] সূচনাকাল সম্পর্কেও পন্ডিতমহলে মতবিরোধ রয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শকাব্দ চৈত্রমাস থেকেই গণনা করা হত এবং এই মাসগুলি ছিল 'অমান্ত'।[৮] কিন্তু উত্তর ভারতে 'শকাব্দ' গণনা করা হত 'পূর্ণিমান্ত' মাস থেকে।[৯] আবার উত্তর ভারতে 'বিক্রমাব্দ'[১০] গণনা করা হত 'অমান্ত' কার্তিক মাস থেকে যদিও দক্ষিণ ভারতে তা গণনা করা হত চৈত্র মাস থেকে এবং মাসটি ছিল 'পূর্ণিমান্ত।'[১১] কোন কোন লেখমালাতে দেখা যায় যে রাজস্থান ও গুজরাট অঞ্চলে বর্ষগণনা করা হত আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাস থেকে। সুতরাং এ ব্যাপারে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। বরং রাজ্যবর্ষটি প্রচলিত কোন অব্দের সঙ্গে যুক্ততা বিচার করেই এ ক্ষেত্রে সমাধানে আসা সম্ভব।

দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে বলা যায় যে - প্রাচিন ভারতীয় লেখমালায় উল্লিখিত রাজ্যবর্ষগুলি কি সংশ্লিষ্ট রাজার সিংহাসনারোহনের দিন থেকেই গণনা করা হত নাকি গণিত বর্ষ প্রচলিত অব্দের সঙ্গে যুক্ত করা হত। কেননা আমরা বেশ কিছু সংখ্যক লেখমালায় দেখি যে উল্লেখিত রাজ্যবর্ষগুলি পরবর্তী কালে প্রচলিত অব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন অ্যাজেস নামাঙ্কিত অব্দ বা অ্যাজেস অব্দ।[১২] আবার কোন কোন অব্দ রাজা স্বয়ং প্রচলন করেছিলেন। যেমন কুষাণ সম্রাট (প্রথম) কণিষ্ক তাঁর সিংহাসনারোহণের দিন থেকে একটি অব্দ প্রচলন করেন যা প্রথমে 'কণিষ্ক অব্দ' এবং পরে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত 'শকাব্দ' রূপে পরিচিত হয়।[১৩]

এবার দেখা যে এই সকল রাজ্যবর্ষ 'বর্তমান' না 'অতীত' বর্ষ না 'গত বা পূর্ণ' অব্দ ছিল। অশোকের লেখমালায় উল্লেখিত রাজ্যবর্ষগুলি অতীত বর্ষ বলেই মনে হয়। কেননা তিনি যে সকল রাজ্যবর্ষের উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলি যেহেতু অতীতের ঘটনা, সেহেতু বলা যেতে পারে যে আলোচ্য বর্ষগুলিও 'অতীত বা গত'বর্ষ। অশোকের পঞ্চম শিলালেখতে[১৪] বলা হয়েছে "সে ত্রেডস-বস-অভিসিতেন ময় ধ্রম-মহমত্র কটে..." অর্থাৎ "সিংহাসনে আরোহণের ত্রয়োদশ বর্ষের পর আমার দ্বারা ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করা হয়েছে।" আবার রুম্মিনদেই স্তম্ভলেখ[১৫] অনুযাযী, "দেবনপিয়েন পিয়দসিন লাজিন' বিসতিবসাভিসিতেন অতন অগাছ মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে শক্য-মুনীতি' অর্থাৎ "বিংশতিবর্ষ অভিষিক্ত হবার পর দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক পূজা করা হল, এখানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" এছাড়া অশোকের প্রথম অপ্রধান শিলালেখ (MREI), গ্রীক ও আরামীয় (Aramaic) অনুশাসন[১৬] প্রভৃতির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে অশোকের লেখমালায় উল্লিখিত 'বর্ষ' গুলি ছিল 'অতীত' বা 'গত' রাজ্যবর্ষ, এগুলি বর্তমান রাজ্যবর্ষ (Current regnal year) নয়।

হেলিওডোরাসের বেসনগর স্তম্ভলেখতে[১৭] ভাগভদ্রের চতুর্দশতম বর্তমান রাজ্যবর্ষের উল্লেখ আছে। (রঞো কাসিপুত্রস ভাগভদ্রস ত্রাতারস বসেন চতুদসেন রাজেন বধ-মানস")।

আবার 'অ্যাজেস' অব্দ শুরু হয়েছিল রাজা অ্যাজেসের রাজ্যবর্ষ হিসেবেই। তবে তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজ্যবর্ষ প্রচলিত অব্দে রূপান্তরিত হয়। এটি যে বর্ষ থেকে গণনা করা হত তা "মহরয়স অয়স অতিদস"[১৮] "মহংতস অয়স কলগদস..."[১৯], "...অয়স বুর্তকলস"[২০] প্রভৃতি রূপে উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিক্রমাব্দ 'কৃত' বা অতীত অব্দ রূপেও উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু উদাকের পাভোসা লেখাটি[২১] তাঁর 'বর্তমান' দশম রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত (...উদাকস দশম-সবচ্ছরে) কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখটি[২২] রাজার বর্তমান বর্ষের ইঙ্গিত-বাহী। এতে রাজার সিংহাসনারোহনের প্রথমবর্ষ থেকে বৎসরানুক্রমিক কীর্তি চিত্রিত হয়েছে। সাতবাহন সম্রাট গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাসিক লেখটিও বর্তমান রাজ্যবর্ষের উল্লেখ করে।

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখ[২৩] (...শ্রী চন্দ্রগুপ্তস্য বিজয়-রাজ্য

সংবতসরে পংচমে (৫) কালানুবর্তমান সংবতসরে একষষ্ঠে....), প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসদ স্তম্ভলেখ[২৪] (...মহারাজাধিরাজ শ্রী কুমারগুপ্তস্য-অভিবর্ধমান-বিজয়-রাজ্য সংবতসরে...) অনুযায়ী 'কালানুবর্তমান' এবং 'অভিবর্ধমান' কথাগুলি বর্তমান রাজ্যবর্ষেরই দ্যোতক। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যবর্ষগুলি গণনা করাব ফলে তা একটি প্রচলিত অব্দে রূপান্তরিত হত। আবার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলেখতে প্রচলিত অব্দ (কালানুবর্তমান সংবতসরে) এবং রাজ্যবর্ষের (বিজয়রাজ্য-সংবত-সবে) মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

পৃথিবী বিগ্রহ ভট্টারকের সুমন্ডল লেখতে[২৫] বর্তমান গুপ্তরাজ্যবর্ষের (...বর্তমান গুপ্ত রাজ্যে...) উল্লেখ আছে। এহুবল শান্তমূলের নাগার্জুনীকোন্ডা[২৬] লেখতে দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের উল্লেখ আছে। বাঘেলরাজ বরসিংহের রাণী বুড়াব একটি লেখতে[২৭] "সংবত ১৫৫৫ বর্ষে শকে ১৪২০ প্রবর্তমানে উত্তরায়ন গতে..." অর্থাৎ ১৫৫৫ 'অতীতবর্ষ' এবং ১৪২০ শকাব্দেব উল্লেখ আছে। একটি পান্ডুলিপিতে অবশ্য "স্বস্তি সংবত পঞ্চদশ ১৫ অসীতন ৮০ প্রবর্তমান উত্তরায়ণে" অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'প্রবর্তমান' শব্দটি বর্তমান বর্ষেরই দ্যোতক।

পরবর্তীকালে দক্ষিণভারতে চোল এবং পান্ড্যদেব লেখতে,[২৮] বঙ্গদেশেব পাল ও সেন লেখমালাতে,[২৯] আসামের ব্রহ্মণপালের লেখতে[৩০] এবং অন্যান্য কিছু লেখতে রাজ্যবর্ষের উল্লেখ থাকলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচলিত অব্দের ব্যবহাব দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশেও গুপ্তাব্দের পরিবর্তে রাজ্যবর্ষ ব্যবহার কবা হয়েছিল।

কোন কোন সময় দুটি সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমেও রাজ্যবর্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৪+৯, ৬+৪ ইত্যাদি।[৩১] এক্ষেত্রে প্রথমে উল্লিখিত সংখ্যাটি পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ রাজার সঙ্গে পরবর্তী কনিষ্ঠ রাজার দ্বৈতরাজত্বকাল সূচিত করে এবং পরের সংখ্যাটি তাঁর একক স্বাধীন রাজত্বকালের দ্যোতক। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যবর্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'দিবস'-এর উল্লেখও করা হয়েছে।[৩২]

এইভাবে দেখা যায় যে ইতিহাসের অন্যান্য বিষয়ের মত প্রাচিন ভারতীয় লেখমালায় ব্যবহৃত রাজ্যবর্ষও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

সূত্র নির্দেশ

১. সরকার, ডি.সি., সিলেক্ট ইন্‌সক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন, প্রথমখন্ড, দিল্লি সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ: ১৮-১৯ (পরে সি.ই.)।

২. তদেব।

৩. তদেব, পৃ: ৪৭-৪৮।

৪. তদেব, পৃ: ১৯৭-৯৯৯।

৫. বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সরকার ডি.সি., ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি, দিল্লি, ১৯৬৫, পৃ: ২৫১ ও তৎপরবর্তী। দ্র:ইন্ডিয়ান ম্যুজিয়ম বুলেটিন, বিংশ খন্ড, ১৯৮৫, পৃ: ১-২৭।

৬. তদেব।

৭. সরকার ডি.সি., প্রাগুক্ত পৃ: ২৮৪ পরবর্তী; ফ্লীট, জে.এফ. (সম্পাদিত), কর্পাস ইন্সক্রিপশনাম ইন্ডিকারুম, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৬ ও পরবর্তী।

৮. সরকার, ডি.সি. প্রাগুক্ত পৃ: ২৩৫-২৪২ পিল্লাই, এল.ডি. স্বামীকান্নু, এন ইন্ডিয়ান এফিমেরিস, চতুর্থখণ্ড, ১৯২২, দিল্লি, পৃ: ১৩০ পরবর্তী।
৯. তদেব।
১০. তদেব।
১১. তদেব।
১২. দ্র: মুখার্জী বি.এন., (লিখিত প্রবন্ধ), ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ম বুলেটিন, ১৯৮৫, পৃ: ৭-২৭।
১৩. রায়চৌধুরী, এইচ.সি, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, (বি.এন. মুখার্জীকৃত কমেন্টারি সহ) নয়াদিল্লী, ১৯৯৬, পৃ ৮৪৮-৮৪৯।
১৪. সরকার ডি.সি., সি.ই, পৃ: ২২।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।
১৬. মুখার্জী বি.এন., স্টাডিস ইন দি অ্যারামাইক এডিক্টস্ অফ অশোক, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ: ৫৩।
১৭. সরকার ডি.সি., প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮-৮৯।
১৮. জার্নাল অব দি এ্যানসিয়েনট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ১৯৭৭-৭৮, একাদশ খণ্ড, পৃ: ১০২-১০৩।
১৯. বুলেটিন দে একল্ ফ্রাঙ্কেইস দ্য এক্সট্রিম ওরিয়েন্ট। (পরে বেফিও), খণ্ড-৭৪, ১৯৮৫, চিত্র নং-১১।
২০. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড-২৩, ১৯৮১, পৃ: ১৬১।
২১. সরকার, ডি.সি., প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫-৯৭।
২২. তদেব, পৃ: ২১৩-২২১।
২৩. তদেব, পৃ: ২৭৭-২৭৯।
২৪. তদেব, পৃ: ২৮৫-২৮৭।
২৫. তদেব, পৃ: ৪৯০-৪৯২।
২৬. তদেব, পৃ: ২৩৮-২৩৯।
২৭. ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি, খণ্ড১৮, পৃ: ২৫১ পরবর্তী।
২৮. দ্র: এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-৮, পৃ: ১১-১২ পরবর্তী; তদেব, খণ্ড-২৮, পৃ: ১৪৫ পরবর্তী।
২৯. তদেব।
৩০. তদেব।
৩১. সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্সক্রিপশনস, নং ১২, ১২ বি; এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-২১, পৃ: ১০৬, এবং সরকার ডি.সি., ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি, পৃ: ২৪১।
৩২. সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্সক্রিপশনস, খণ্ড-১৪, নং-১৫।

প্রাচীন মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের সামরিক সংগঠন ও সমাজঃ একটি ইতিহাসতত্ত্বীয় ব্যাখ্যা

শৌভিক মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারত বিভিন্ন কারণে ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কবে আছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমসাময়িক উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া এই সময়কালে কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকলেও এই সময় দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাম্রাজ্য তৈরীর প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় নি। বস্তুত: এই সময় এবং পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের নিরন্তরতা আমাদের চমৎকৃত করে। ইতিহাসের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মাঝের কিছুদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে প্রবল উৎসাহের পর ইদানিংকালে আবার বাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাপারে পুনরুজ্জীবিত উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে।[১] ৭০ এবং ৮০-র দশকে সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও নৃতত্ত্বের বিভিন্ন তথ্যের ব্যবহারে রাষ্ট্রনির্মাণ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।[২] এই পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক সংগঠন ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক পুনরায় পর্যালোচনার দাবী রাখে।

রাজনৈতিক সংগঠন ও সামরিক কার্যকলাপ পর্যালোচনার জন্য দক্ষিণ ভারত ঐতিহাসিকদের কাছে একটি অনন্য জায়গা, কারণ একদিকে তথ্যের প্রাচুর্য্য, অন্যদিকে সামরিক কার্যকলাপের নিরন্তর ধারাবাহিকতা।[৩] দক্ষিণ ভারতে শিলালেখ, তাম্রলেখ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সৌধের প্রাচুর্য্য ঐতিহাসিকদের বিশেষ আকর্ষণের কারণ। আবার অন্যদিকে দীর্ঘ ১৫০০ বছর ধরে মূলত: কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রার উর্বর ভূমি দখলের জন্য দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ/সংগঠনের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর কিছুকাল দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত সাতবাহন বংশের একক কর্তৃত্বে থাকার পর শকদের আক্রমণে সাতবাহনরা কিছুকালের জন্য হলেও দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নিলে গোটা এলাকা দুই যুযুধান সক্রিয় শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শক ও সাতবাহন শক্তির পতনের পর কিছুকালের ব্যবধানের পর দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও দক্ষিণ ভারতে পল্লবরা এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঐতিহ্য বজায় রাখে। অন্যান্য রাজবংশ যেমন বনবাসীর কদম্বকুল বা গঙ্গাবাড়ীর গঙ্গা বংশ কখনও এপক্ষ কখনও পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় বাখে। পরে একদিকে রাষ্ট্রকূট, অন্যদিকে পুনরুজ্জীবিত পান্ড্যদের চাপে পল্লবরা রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেলেও এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের নতুন কুশীলব হিসাবে পশ্চিম চালুক্য

ও চোলবংশ আত্মপ্রকাশ করে। পবে বিজয়নগব বাহমনীর সংগ্রাম এই ঐতিহ্যেরই নতুন রূপমাত্র।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে এই যুদ্ধের জন্য রাজশক্তিগুলি কিভাবে তৈরী হত কারণ যুদ্ধ মানেই এক বিরাট দক্ষযজ্ঞ। একদিকে যোদ্ধা সংগ্রহ করবার আয়োজন। আর যেহেতু তখন বর্তমানের পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈন্যসংগ্রহ করবার প্রক্রিয়া চালু ছিল না তাই রাজশক্তিগুলিকে নির্ভর কবতে হত সেই জনগোষ্ঠিগুলির উপর যারা যুদ্ধপ্রবণ। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের একত্র সহাবস্থান, যেদিকে ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে নদী উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও পার্শ্ববর্তী অবণ্য অঞ্চল বা পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি-পূর্ব সংগ্রাহক অর্থনীতির মানুষ বহাল তবিয়তে টিঁকে ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। সভ্যতাব এই দুই স্তরের মধ্যে মিঠে গরম সম্পর্কের কথা সঙ্গম সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মারাভাব, কাল্লার বা পল্লি জাতির মানুষরা যেমন কখনও কখনও সমতলের অরক্ষিত মানুষদেব উপর লুঠপাট করেছে তেমনি রাজশক্তি গুলির আগ্রাসী যুদ্ধে কামানের খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখন এই ধবণের মানুষ যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেই থাকে তবে একথা ভাবাটা অবান্তর যে একটি সফল অভিযানে অংশগ্রহণের পর সংগৃহীত ধন সম্পদ নিয়ে তারা আদিবাসস্থানে ফিরে যেত নতুন করে যুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত। বরং আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে তারা তাদের নবঅর্জিত সম্পদকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চাইবে। বস্তুত ঐতিহাসিক সুব্বারায়ালু দেখাচ্ছেন[৪] কিভাবে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পল্লি বা শ্রীগোপালের মত পশুপালক গোষ্ঠি জমিব মালিকে পরিণত হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরনো ভূম্যধিকারীদেব সাথে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই নয় নোবোরু কারাশিমা দেখাচ্ছেন কিভাবে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে উর নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলিতে সামূহিক ভূমিবিন্যাস (communal landholding) ব্যক্তি মালিকানায় বদলে যাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে তিনি কয়েকটি সম্ভাবনাব কথা উল্লেখ করেছেন যেমন প্রথম রাজরাজ ও তৎপরবর্তী সময়তে যুদ্ধে অর্জিত ধনসম্পদ দ্বারা ভূমিক্রয় বা সৈন্যবাহিনীর লোকেদের স্থায়ীভাবে জমিদান (জীবিতা পাড্ডু, পাড়াই পাড্ডু ইত্যাদি)। এই ভাবেই যুদ্ধ যেন সমাজজীবনেও সুদূর প্রসারী প্রভাব এনেছে। তাই সামরিক সংগঠন ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নতুনভাবে পর্যালোচনা করার দরকার আছে।

চোল সাম্রাজ্যের ব্যাপারে উনবিংশ শতকের শেষপাদে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হলেও অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মধ্যে চোল সাম্রাজ্যে যেন তার থুকিডিডিসকে খুঁজে পেল। তাঁর রচিত "The Colas" এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পায়। কিন্তু ইতিহাস রচনায় তাঁর কতগুলি ঝোঁক ইদানিংকালে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত: তিনি চোল সাম্রাজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিযে তাকে Bygantine Monarchy বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে চোল সাম্রাজ্য ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের একটি চূড়ান্ত রূপ। আবার একই সাথে তিনি 'সভা', 'উব' বা নগবমের মত প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, তাঁদের

স্বায়ত্তশাসনেব আদর্শেব প্রভূত প্রশংসা করেছেন। বস্তুত এই স্ববিরোধ, যে প্রেক্ষাপটে তিনি ইতিহাস বচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের ইতিহাসবিদ। ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভবনের আদর্শ এবং গণতান্ত্রিক বীতিনীতির প্রশংসা উভয়ই কবতে বাধ্য ছিলেন। বার্টন স্টাইন অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই বৈপরীত্বের যুক্তিকে প্রশংসা কবেছেন। এছাডাও তিনি বিশ শতকেব গোড়ার দিকে তামিল জাতিবাদের আদি যুগে বাস্তবিকই একলাবোধ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জাতি বিরোধকে যতটা কম দেখানো যায় এটাই ছিল তার কাম্য।[৫] স্বভাবত:ই তাঁকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে দান ফেলতে হয়েছিল।

যদিও তিনি মনে করতেন যে এই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনেব কারণ ছিল ক্ষত্রশক্তির উপর চোল সম্রাটদের একচ্ছত্র আধিপত্য তথাপি “The Colas” গ্রন্থটিতে পুবোপুরিভাবে সামরিক সংগঠনেব জন্য খরচ কবা হয়েছে মাত্র তিন পাতা। প্রথম রাজরাজের একটি শিলালেখে ৩০টি রেজিমেন্টের নাম উল্লেখিত আছে যাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হয় ভেলাঙ্গাই ভেলাইক্কারার (দক্ষিণ হস্ত বাহিনী-মূলত: অব্রাহ্মণ কৃষক গোষ্টির সংগঠন) বা ইডাস্টাই বেলাইক্কারার (বামহস্ত বাহিনী - মূলত কারুজীবী শ্রমিক ও বণিকদের সংগঠন)। শাস্ত্রী মনে করতেন এরা চোল সেনাবাহিনীর স্থায়ী অংশ যারা প্রয়োজনে (বেলাই-প্রয়োজন/বিপদ উৎপন্ন হলে) নিজেদের প্রাণেব বিনিময়ে রাজাকে রক্ষা করতেন। শাস্ত্রীর এই বর্ণনার সাথে এর কিছুকাল পরে কেরালার একধরণের যোদ্ধা তেন্নাভন আবত্তুউদাবিগাল এর মিল পাওয়া যায় যাদেরকে ঐতিহাসিক এম জি এস নারায়নন “Companion of Honour” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

সেনাদের নিশ্চয়ই অর্থ বা জমিদান করা হত ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলছেন যে service tenure অনেক রকমের ছিল। এর মধ্যে রাজকর্মচারীদের সাধারণত: কোন একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট খাজনাই দেওয়া হত, জমির মালিকানা নয়। আবাব সামরিক ব্যক্তিদের জমি ও খাজনা উভয়ই দান করা হত। তিরুভাডুত্তুরাই থেকে প্রাপ্ত দুটি অনুশাসন থেকে জানা যায় মেরকানাডুর ক্কাইকোলারদেরকে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষযোগ্যজমি ‘বীরভোগ’ হিসাবে দান করা হয়। আবার ১১২৫ খ্রী: রামনাদ অঞ্চলের সিরপুরী থেকে প্রাপ্ত অনুশাসনে দেখা যায় চোল সম্রাটের এক সামন্ত সুনন্দন গঙ্গাইকোন্ডন তাঁর যেসব সহচবরা (বাল্লিলার) যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তাদের নিকটাত্মীয়দের জমিদান করছেন।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর Bygantine Monarchy-র মূলে কুঠারাঘাত করে বার্টন স্টাইন ঐতিহাসিক মহলে হইচই ফেলে দেন। তিনি নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর যুক্তিকে খণ্ডন করে হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদ কবে দেখিয়েছেন যে ক্ষত্রশক্তিব (Cocrcir Power) উপব চোল সম্রাটদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না। চোল সম্রাট প্রথম রাজরাজের যে অনুশাসনের উল্লেখ আমরা করেছি সেই অনুশাসনে উল্লিখিত বেলাস্টাই/ইডাষ্টাই বেলাইক্কারারদের সম্পর্কে স্টাইনের অভিমত হল এদের প্রয়োজন (বেলাই) পড়লে ডাকা হত এবং এরা একেবারেই স্থায়ী সেনাদল নয়। বস্তুত স্টাইন মনে করেন দক্ষিণ ভারতে দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ‘ক্ষত্রিয়রাজ’ (যে অর্থে উত্তরভারতে সপ্তম শতক থেকে পাওয়া যায়) ছিলই না। ক্ষত্রশক্তি ছিল স্থানীয় নাডুব হাতে যেখানে কৃষক বা কারুজীবীবা বেলাষ্টাই/ইডাষ্টাই বেলাইক্কারার তৈরী করেছিল।

এরাই প্রয়োজন পড়লে রাজার পাশে এসে দাঁড়াতেন। সুতরাং যেখানে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী চোল সম্রাটের প্রভূত সামরিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে রাজশক্তির কেন্দ্রীভবনের কথা বলছেন সেখানে স্টাইন বলছেন রাজা বস্তুত ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার। চোল সম্রাট নিজ নাড়ু অঞ্চলে অবশ্যই সর্বেসর্বা কিন্তু অন্য নাড়ুর উপর তাঁর অধিকার যতটা না সামরিক কারণে তার থেকে অনেক বেশী আদর্শগত কারণে। সোজা করে বললে ভয়ে নয় ভক্তিতে সাম্রাজ্যের অন্য অংশের লোকেরা তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এই বিকেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন segmentary state এর কাঠামো উপস্থাপনার সাহায্যে।

স্টাইন তাঁর এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক মহলে একটা হইচই ফেলে দিলেন। বেশ কিছু আমেরিকান ঐতিহাসিক তাঁর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বা কখনো পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালালেন। কেনেম হল থেকে শুরু করে নিকোলাস ডার্কস পর্যন্ত অনেকে এখনো পর্যন্ত লিখে চলেছেন।

স্টাইনের অভিমতের বিরোধীদের বক্তব্য হল তিনি তত্ত্বে যতটা শক্তিশালী তথ্যে ততটাই কমজোরি। বস্তুত তিনি কিছু কিছু শব্দের মানে ইচ্ছেমত গ্রহণ করার জন্য কিছু মূলগত ভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। যেমন তিনি আরাইয়ান, উড়াইয়ানদের (মূলত: জমির মালিক) সাথে বংশগতভাবে সামন্ত শক্তিগুলি এক করে ফেলেছেন (সামন্ত শ্রেণী এখানে Feudatory/ Chiefs অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। আর একটি ক্ষেত্রে স্টাইনের দুর্বলতা প্রকট। ক্ষত্রশক্তির উপর চোল সম্রাটদের অধিকার যতই কাল্পনিক মনে হোক না কেন তাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত যুদ্ধগুলি ততটা কাল্পনিক নয়। এই যুদ্ধগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লোক বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করতেন। অনেকক্ষেত্রে (গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যেমন অক্কোলাম) যুদ্ধের মূল দুই কুশীলবের আশেপাশে বিভিন্ন সামন্তশক্তির সমাবেশ হত। যারা আবার তাদের অধস্তন শক্তিদের এককাট্টা করতেন যেমন অক্কোলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে চোলদের পক্ষ অবলম্বন করেন চেররাজারা, যাদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন বল্লুবানাড়ুর সামন্তরা। কাজেই চোলদের ক্ষত্রশক্তির আলোচনা এই সামন্তশক্তিগুলির আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোড়ুমবালুর, পলুভেট্টারায়ার, মিলাড়ুরায়ার, বান বা তেলেগু চোল ইত্যাদিরা। এরা প্রধান রাজশক্তির (যেমন চোল, রাষ্ট্রকূট বা পশ্চিম চালুক্য ইত্যাদি) সাথে বৈবাহিক বা রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ থাকতেন। কখনো কখনো এরা পক্ষ পরিবর্তন করলে বড়সড় রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হত। যেমন গঙ্গা বংশের দ্বিতীয় পৃথিবীপতি ছিলেন চোল সম্রাট প্রথম আদিত্য ও পরান্তকের বিশ্বস্ত সেনাপতি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন নতুন গঙ্গা রাজা দ্বিতীয় বুটুগ রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে সমর্থন করলেন তখন অক্কোলামের বিপর্যয় ঘটে গেল। কাজেই প্রধান রাজশক্তি গুলির স্থায়ীত্ব নির্ভর করত এক জটিল সাপ লুডোর ছক এর উপর।

চোলদের সাথে অধস্তন সামন্তশক্তিগুলির সম্পর্ককে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (১) বিজয়ালয় চোল থেকে প্রথম রাজরাজের শাসনের প্রথমদিক পর্যন্ত। (২) প্রথম রাজরাজের শাসনকালের অবশিষ্টাংশ থেকে প্রথম কুলোত্তুঙ্গ পর্যন্ত। (৩) প্রথম কুলোত্তুঙ্গ থেকে তৃতীয়

কুলোতুঙ্গ পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে চোলমণ্ডলের প্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত সামন্তরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রধান রাজশক্তির 'আদেশ' কাজে রূপান্তরিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আশ্চর্যজনকভাবে তথ্য সূত্রগুলি এই সামন্তশ্রেণী সম্পর্কে নীরব। এই সময়কালে কখনো কখনো চোল সম্রাটদের অনুশাসনে এদেরকে কর্মচারী হিসাবে দেখা যায়। যেমন ১০৪৫ খ্রী: আমরা চেপেনী চাত্তাম বীরা চোলা ওরফে বনরাজার কথা পাচ্ছি চেঙ্গেলপেট জেলা থেকে যে জায়গাটি বনরাজাদের আদি বাসস্থান থেকে অনেক দূরে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম কুলোতুঙ্গেব সময় থেকে আবার এই সামন্ত রাজাদের উল্লেখ অনেক বেশী বেশী কবে পাওয়া যাচ্ছে। এরা যে ক্রমেই আরো বেশী শক্তিশালী হযে উঠছে তাব বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। এরা নিজেদেব মধ্যে প্রধান রাজশক্তির অনুমতি ছাড়াই 'নিলাইমাডিট্টু' সন্ধি কবছেন যাবা প্রয়োজনে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন। তৃতীয় রাজরাজের সময বচিত গদ্যকর্ণামৃতম কাব্যে দেখা যায় কড়বাবাজ কোপ্পেরুনজিয়ার নেতৃত্বে একদল সামন্ত তৃতীয় রাজবাজকে চক্রব্যূহে বেঁধে ফেলেছেন এবং এই বিপদ থেকে চোল সম্রাটকে বাঁচাচ্ছেন হোয়েসল রাজা দ্বিতীয় নরসিংহ।

এখন ইতিহাসচর্চাব যে স্তরে আমরা আছি তাতে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এবং স্টাইন দুজনেবই বক্তব্যের পবিপন্থী কিছু তথ্য আমবা পাচ্ছি। একদিকে বিভিন্ন সামন্তশক্তিগুলিব অবস্থান যেমন বয়েছে তেমনি প্রথম রাজরাজ থেকে অধিরাজেন্দ্র পর্যন্ত সময়কালে সামন্তশক্তিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্টাইন চাইলেও Segmentary state এর তত্ত্বের সাথে মেলানো সম্ভব নয়, অন্যদিকে ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আমাদেরকে আরেকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৬] সোসেয়ুর অরণ্যের মালোসা থেকে কিভাবে পরবর্তীকালেব শক্তিশালী হোয়েসল বাজ্য তৈরী হল সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথনির্দেশ। অন্যদিকে আমরা দেখেছি কিভাবে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে পল্লি বা শ্রীগোপালের মত পশুপালন গোষ্ঠি জমির মালিকে পরিণত হচ্ছে। এই নতুন ভূম্যাধিকারীদের সাথে পুরনো জমির মালিকের দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। এই সামাজিক জটিলতাব মূলে পৌঁছতে গেলে দবকাব এই সামরিক গোষ্ঠিগুলি আলোচ্য সময়কালে যে বিভিন্ন দেবস্থানে জমিদান করছেন তার নিবিড় অনুসন্ধান যা থেকে আমরা সামবিক সংগঠন ও সামাজিক অবস্থার আন্ত:সম্পর্কের সম্বন্ধে এক নতুন দিকনির্দেশ করতে পারব।

সূত্র নির্দেশ

১. Brajadulal Chattopadhaya, Presidential Address, Ancient Indian Section, Proceedings of Indian History Congress, Burdwan 1983.

২. Hermann Kulke (ed.) The State in India1000-1700 (1994).

৩. Nilkantha Sastri A History of South India

৪. Y. Subbarayalu, Some Aspects of the Socio-Economic Organisation in Medieval Tamil Nadu (with reference to Cola Inscriptions).

৫. G. Subbiah, K A Nilkantha Sastri

৬. Brajadulal Chattopadhaya, n 1

বৈদিক ভারত নিয়োগ প্রথার অবস্থিতি

চিরকিশোর ভাদুড়ি

নিয়োগ-একটি বিচিত্র প্রথা-কিন্তু আপৎকালীন পবিস্থিতিতে বংশরক্ষাকারী এই ব্যবস্থাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভাবতীয় আর্যদের কাছে বিভিন্ন যুগে নিয়োগ উৎকর্ষ বজায় রাখতে ব্যর্থকাম হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমবা বৈদিক ভারতে নিয়োগের অবস্থিতি এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে দু চার কথা বলবার চেষ্টা কবব।

বংশরক্ষা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুচারুভাবে যাতে সম্পন্ন করা যায় সেইজন্যে বৈদিক আর্যরা পুত্র সন্তান বিশেষভাবে কামনা করতেন এবং তাঁদের এই ঐকান্তিক পুত্র সন্তান কামনাই নিয়োগ প্রথার উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণ বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করে থাকেন। একটি মত প্রচলিত আছে যে দেবর-এই সংজ্ঞাটি (স্বামীর ভাই) দ্বিতীয় বর, সংজ্ঞাকে প্রকৃত পক্ষে নির্দিষ্ট করে দেখায়। কেননা দেবর অথবা মৃত স্বামীর ছোট ভাই আপৎকালীন অবস্থায় বংশরক্ষার কারণে নিঃসন্তান বৌদির গর্ভে পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য কায়িকভাবে মিলিত হবার অধিকার ভোগ করত।

আলোচনার শুরুতে নিয়োগের রূপরেখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বৈদিক গ্রন্থে আমরা এই প্রথা সম্বন্ধে কোন নির্দেশিকা দেখতে পাই না। কিন্তু পরবর্তীযুগে অনুশাসন শাস্ত্রে আমরা এই প্রথার কার্যকারণে বিস্তৃত নির্দেশিকা দেখতে পাই। এবং এই ব্যাপারে[১] মনু বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মনু সুপারিশ করেছেন কোন ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, বংশরক্ষার কারণে তার বিধবা স্ত্রী তারই ছোট ভাই (দেবর) অথবা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তার কোন সগোত্র, বংশজ অথবা এমনকি কোন ব্রাহ্মণের সংগেও শারীরিক ভাবে মিলিত হতে পারবেন।[২] মনু আরও বিধান দিয়েছেন দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত এই প্রথা অনুসরণে কোন বাধা নেই। এই প্রসংগে একটি বিষয় আমাদের ভেবে দেখবার আছে। আমরা আগেই দেখেছি মূলত: বংশরক্ষার কারণেই নি:সন্তান বিধবা তাঁর দেবরের সংগে কায়িক ভাবে মিলিত হতেন। কিন্তু এই প্রথার অনুসরণে কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার অদৃষ্ট কি হোত কিংবা নিয়োগ অনুসরণ চালু থাকাকালীন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ ছিল কিনা সেই ব্যাপারে আমবা কোন কিছু জানতে পাবি না।[৩] কানের গবেষণা পত্র পড়ে আমরা জানতে পারছি গৌতম, বশিষ্ঠ, বৌধায়ন এবং নারদ প্রমুখ অনুশাসকেরাও মনুর মতই নিয়োগ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। বেদে আমবা হামেশাই এমন সব তথ্যের সম্মুখীন হচ্ছি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুত্র সন্তান প্রজনন বাস্তব সম্মত করবার

জন্য দেবতাদের কাছে আকুল আর্তি জানান হয়েছে। ঋগবেদে বিবাহ[৪] সূক্তে অন্তত: দশটি পুত্র সন্তান প্রজননের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ইন্দ্রের বর প্রার্থনা করা হয়েছে।

নিয়োগ সম্বন্ধে মনুর সুপারিশগুলি নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব। মনে রাখতে হবে মনু[৫] এই প্রথার প্রয়োগ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তিনি[৬] সুপারিশ করেছেন নিয়োগ অনুসাবী ব্যক্তি মঙ্গল চিহ্নে শোভিত হয়ে নির্দিষ্ট বিধবার সংগে রাত্রিকালে মিলিত হবেন।[৭] মনু আরও বিধান দিয়েছেন নিয়োগের উদ্দেশ্য সফল হবার পরেই বিধবাটি আবার আগের মতই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে থাকবেন।[৮] মনু বলেন রাজা বেনের আমলে এই প্রথা বাস্তবে আকার নিয়েছিল। আমরা মহাকাব্য এবং পুরাণ পড়ে জানতে পারি যে এই বেন রাজা পৃথুর জনক। পৃথুকে একজন উল্লেখ্য ভারতীয় নরপতি হিসেবে ঋগবেদে বার বার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অতএব আমরা নিয়োগ প্রথা যে বৈদিক যুগে রূপলাভ করেছিল সে বিষয়ে নি:সন্দেহ হতে পারি। অবশ্য আধুনিক শাস্ত্র অথবা বিশেষজ্ঞরা বেন এবং পৃথুর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেননি। মনু আরও বলেছেন যে বেন রাজা সবিশেষ উচ্ছৃংখল ছিলেন বলে প্রকটভাবে বর্ণ সংকর সমস্যা দেখা দেয় এবং তখন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মিলিত প্রয়াসে সামাজিক অসাম্য দূর করবার জন্যে এই প্রথার প্রচলন করেন।

পাশাপাশি এই কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে ড: বার্ণেটের[৯] ধারণা অনুসারে এই প্রথা পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা[১০] এবং স্মৃতিকারেরা অনুমোদন করতে চাননি কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁরা তাঁদের বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সব সময় নিয়োগকে নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে রেখেছিলেন।অবশ্য এই সমস্ত অনুশাসন বৈদিক যুগেও চালু ছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না।

এইবারে আমরা বৈদিক ভারতে নিয়োগ প্রথা চালু ছিল কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা কবব। বিশেষজ্ঞদের[১১] কেউ কেউ মনে করেন ঋগবেদের ১০.৪০.২নং অধ্যায়টি ঐ যুগে বিধবা বিবাহ চালু থাকার সপক্ষে ওকালতি করেছে।

এন.কে দত্ত[১২]ও মনে করেন বৈদিক যুগে সাধারণ ভাবে দেবর তাঁর বিধবা বৌদিকে পুনরায় বিবাহ করতেন এবং ঋগবেদে ১০.৪০.২নং অধ্যায়টিতে তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঋগবেদের উল্লিখিত ১০.৪০.২নং অধ্যায়টির যথাযথ অর্থ খুঁজে বার করতে গিয়ে উপরি উক্ত বিশেষজ্ঞরা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সংগে আমরা সহমত হতে পারছি না কেননা তাঁদের ঐ মতামত যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যাদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা শুরু করবার আগে ঋগবেদে উল্লিখিত ১০.৪০.২নং অধ্যায়টির অর্থ বুঝে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ঐ ঋগবেদীয় ১০.৪০.২নং অধ্যায়টি হলঃ-

"কুহ সিদ্দোষা কুহ বস্তারোশ্বিনা কুহ ভিপিত্বম্ করতঃ কুহসতুঃ।
কো বাম সয়ুত্রা বিধবেব দেবরম্ মর্যম্ ন যোষা কৃনুতে সধস্থ আ।।"

আলোচ্য শ্লোকটির বাংলা রূপান্তর এই রকম দাঁড়ায় :-

হে অশ্বিনগণ! সন্ধ্যাবেলা এবং প্রাত:কালে তোমরা কোথায় ছিলে? তোমাদের আবাসস্থল

কোথায় ? রাত্রেই বা তোমরা কোথায় বিশ্রাম কর ? শয্যাশ্রিত বিধবা যেমন তার দেবরকে আকর্ষণ করে অথবা নব পরিণীতা বধূ যেমন তার স্বামীকে আকর্ষণ করে, তেমনি কার আকর্ষণে তোমরা গৃহাভিমুখী হও ?

আলোচ্য শ্লোকটিকে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে উল্লেখিত বিধবাটি নিঃসন্তান এবং পুত্র সন্তান লাভের কামনায় তার দেবরের সংগে শয্যায কায়িকভাবে মিলিত হয়েছে (বি.এম আপ্তেও ঐ বিধবাটিকে সন্তানহীনা বলেই মনে করেছেন) এবং ঐ দেবর কোন অবস্থাতেই ঐ নিঃসন্তান বিধবাটির স্বামী হিসেবে বিবেচ্য নয়।[১৩] কানের বক্তব্য অনুসারে প্রাচীন ভারতীয় অনুশাসকেরা (মেধাতিথি, বিশ্বরূপ প্রমুখ) ঋগবেদের আলোচ্য ১০.৪০.২ অধ্যায়টি যে বিধবাবিবাহের বদলে নিয়োগ প্রথার অবস্থিতির সপক্ষে ইতিবাচক রায় দিয়েছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। বি.এম আপ্তে এবং The Vedic Age এর মাননীয় সম্পাদকও উল্লেখিত ভারতীয় অনুশাসকদের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। বি.এম. আপ্তের[১৪] মতে ঋগবেদের আলোচ্য ১০.৪০.২ নং অধ্যায়টিতে উল্লিখিত নিঃসন্তান বিধবাটির পুত্র সন্তান লাভের কামনায় নিজের দেবরের সংগে কায়িক সম্পর্ক বজায় রেখে চলবার পরিস্থিতিকে প্রত্যয়িত করা হয়েছে। সুতরাং বি.এম. আপ্তে এখানে নিয়োগ প্রথার অবস্থিতিকেই নিশ্চিত করে বুঝিয়েছেন।[১৫] The Vedic Age এর মাননীয় সম্পাদক মনে করেন ঋগবেদের আলোচ্য ১০.৪০.২নং অধ্যায়টি নিঃসন্তান বিধবা এবং তার দেবরের মধ্যে পুত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য কায়িক মিলনের নিয়োগ নামধেয় প্রথাটির অনুসরণকেই নির্দেশ করেছে।

উপরিউক্ত প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিকারদের যুক্তিকে মেনে নিয়ে এবং আধুনিক ঐতিহাসিকদের (যাঁদের উল্লেখ আমরা একটু আগে করেছি) সংগে সহমত হয়ে আমরা সবিনয়ে নিবেদন করছি যে ঋগবেদের উল্লেখিত বিতর্কিত ১০.৪০.২নং অধ্যায়টি বৈদিক যুগে নিয়োগ প্রথার অবস্থিতির সপক্ষে ওকালতি করে এবং কোন অবস্থাতেই ঐ অধ্যায়টি বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ সামাজিক নিয়ম হিসেবে চালু থাকার সপক্ষে ইতিবাচক সায় দেয় না। আর তাছাড়া নিয়োগ প্রথার প্রচলনকে সমর্থন করা হয়েছে বলেই ঐ ১০.৪০.২ নং অধ্যায়ে বিধবার নিজশয্যায় দেবরকে আকর্ষণ করে আনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে নব পরিণীতা বধূর নিজ স্বামীর সংগে আকর্ষিত হওয়ার প্রক্রিয়ার তুলনা করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে আসবার আগে আমরা যাস্ক বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে এন.কে. দত্ত যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলব। এই একই সংগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য ঋগবেদীয় ১০.৪০.২নং অধ্যায়টিতে দেবর সাময়িকভাবে বিধবাটির মৃত স্বামীর কর্তব্যই সম্পাদন করছেন এবং সেই জন্যেই (এন. কে. দত্তর অভিমত অনুসারে) যাস্ক দেবরকে দ্বিতীয় বর হিসেবে চিহ্নিত করলেও আমাদের বিবেচনায় তিনি আমাদের অন্ধকারে ঠেলে দেননি। কিন্তু দেবরকে যাস্ক যদি দ্বিতীয় বর হিসেবে চিহ্নিতও করেন, তাহলেও কিন্তু উক্ত দেবর আলোচ্য বিধবাটিকে বিবাহ করে তার দ্বিতীয় স্বামীতে পরিণত হয়েছেন এরকম কোন যুক্তি কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আসলে নিয়োগ সেই বৈদিক যুগ থেকেই বিধবা বিবাহের

বিকল্প হিসেবে আমাদের দেশে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

The Vedic Index of Names and Subjects এর মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীও মনে করেন যে নিয়োগ আর বিধবা বিবাহ এক অভিন্ন প্রথা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না কারণ ঋগবেদের আলোচ্য ১০.৪০.২নং শ্লোকটির উল্লেখিত দেবরটি একজন বিবাহিত ব্যক্তিও হতে পারে।[১৭]

The Vedic Age এব মাননীয় সম্পাদক আরও মনে করেন যে ঋগবেদের ১০.১৮.৭-৮ নং অধ্যায় দুটি বৈদিক ভাবতে নিয়োগ যে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেছে। আমবা অবশ্য The Vedic Age এর মাননীয় সম্পাদকের উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থন করতে পারি না। আমাদের এই প্রসঙ্গে বিনীত নিবেদন এই যে ঋগবেদের উল্লেখিত ১০.১৮.৭-৮ নং অধ্যায় দুটি আসলে বৈদিক ভারতে যে সহমরণ (বা বিধবাদের আত্মাহুতি) প্রথা প্রচলিত ছিল সেই যুক্তির সপক্ষেই সুস্পষ্ট রায় দিয়েছে।

বৈদিক ভারতে যে নিযোগ প্রথা প্রচলিত ছিল তার একটি সুস্পষ্ট তথ্য[১৮] মহাভারতে পাওয়া যায়। ঐ মহাকাব্য পড়ে আমরা জানতে পারি যে সৌদাস রাজার স্ত্রী দময়ন্তী সৌদাসের সম্মতিক্রমে ঋষি বশিষ্ঠর সঙ্গে নিয়োগ অনুসরণে মিলিত হয়েছিলেন এর পরিণামে অশ্মক জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সৌদাস যে সুখ্যাত বৈদিক যুগের রাজা সুদাসের পুত্র এই যুক্তিপন্ডিতেরা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। অতএব বংশরক্ষার কারণে ঋষি বশিষ্ঠর সঙ্গে রাণী দময়ন্তীর কায়িক মিলনকে বৈদিক যুগে সংঘটিত একটি নিয়োগ প্রথার উদাহরণ হিসেবে অনায়াসে মেনে নেওযায় আমরা কোন রকম দ্বিধা বোধ করি না।

উপসংহারে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে ঋগবেদের ১০.৪০.২ নং অধ্যায়টি বৈদিক ভারতে নিয়োগ প্রথা চালু যে ছিল এই যুক্তির সপক্ষে ইতিবাচক সায় দিয়েছে।

এইবার আমরা কানের[১৯] অনুসরন আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করব:-একথা বলা ভাল যে নিয়োগ সুদূর অতীতকাল থেকে জীবনীশক্তি পেয়ে প্রবহমান হয়ে থেকেছিল বটে, কিন্তু এই প্রথা ক্রমশঃই বিরল হয়ে আসতে থাকে এবং অবশেষে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একেবারে লোপ পেয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা নিয়োগ প্রথার বৈদিক যুগে অবস্থিতি এবং ক্রম পরম্পরা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। সুপ্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যরা এই বিচিত্র দেশে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করবার পথে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তারই পরিপূরক অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের নিজেদের জনবল বৃদ্ধির কথা বিশেষ ভাবেই ভাবতে হয়েছিল এবং তারই অন্যতম সমাধান সূত্র হিসেবেই সম্ভবত: এই বিচিত্র প্রথা আর্য সমাজে আসন পেতে বসেছিল। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আর্যরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হন, আর তার ফলে নিয়োগের উপযোগিতাও ক্রমশ: কমে আসতে থাকে। তাছাড়া সঙ্গত কারণেই এই প্রথার অনুসরণে সামাজিক অনীহা এবং বিশেষভাবে নারীজাতির উষ্মা যে বেড়ে উঠছিল তার সপক্ষেও নানা প্রমাণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রথা স্বাভাবিক নিয়মেই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এবং একান্ত সামাজিক উপযোগিতা থেকে এর জন্ম হলেও নিয়োগের মত একটি

বিচিত্র ব্যবস্থাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে ভারতীয় আর্যদের উদার সামাজিক বাতাবরণ বিশেষভাবে কাজ করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. Mānaba Dharma Sastra - ed. by J. Jolly - London - 1887-IX 53,60.
২. I bid-XI.61.
৩. Kane P.V-History of Dharmaśāstra-Vol.-2 Pt-I, Poona-1941. pp 599-606.
৪. ঋগবেদ - ১০.৮৫.৪২, ৪৫ ইত্যাদি।
৫. Mānava Dharma Sastra-IX.59 (* practice) - IX.65 (Condemnning the practice).
৬. Ibid IX.60.
৭. I bid IX.62
৮. Ibid IX.66.
৯. Barnett h.D (Dr.)-Antiquitum of India-Calcutta 1964-p. 146
১০. Manu-IX.67-68
১১. Mackdonell & Keith (ed.) - Vedic Index of Names and Subjects - London 1912-Vol.-I, p. 477.
১২. "No aversion expressed anywhere ih the Rgveda to the re-marriage of widowed woman. Probably the custom of a widow marrying the brother of her deceased husband was general and hence the word devara literally meaning second husband according to YasKas Nirukta coming to denote womans' borther-in-low. This customs is agian referred to in X 40.2 where a widow is said to draw her husbands brother in bed-"
Dutta N.K. - Origin and growth of Caste in India - Vol.-I-London, 1930, pp-72-73.
১৩. Kane P.V.-History of Dharmaśāstra- Vol.-2 Pt-1, p. 606.
১৪. "X.40.2 mentions the circumstances in which a widow (with all probablity childless) was to keep connection with her brother-in-law until the birth of a son."
Apte V.M.-Social and Religious Life in the Grhya Sutras - Bombay 1954, p-17.
১৫. "R.V. X-40.2 points to the practice of regurling a childless widow to co-habit with her brother-in-law until the birth of a son. This Niyoga is a short term **."
"Mayrinden R.C - The Vedic Age-Bombay 1969-p.392.
১৬. "This custom was hardly re-marriage in the strict sense since the brother might so far as it appears-be already a married man himself."
"The Vedice Index of Names and Subjects - Vol.-1 p 477.
১৭. Majumder R.C. - The Vedic Age, p-392.
১৮. Haridas Siddhanta Vagis (ed.), Mahabharata - Calcutta 133813, S-I.116. 22-23.
১৯. "It is latter to say that Niyoga was a revival from the remote past that it became rarer and rarer till to the first centuries of the christian era, it came to be totally prohibited."-
"Kane D.V-History of Dharmaśāstra-Vol-2. Pt-I, p 607.

আর্য ও দ্রাবিড় নামের উৎস সন্ধানে : ইতিহাস আশ্রয়ী ভূগোল

রাজকুমার জাজোদিয়া

আর্য শব্দটিব উৎস সন্ধানের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ও ভৌগোলিক দিক থেকে এই উৎস সন্ধান করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের অন্যতম মত যে উরাল নদীর পূর্বদিকে অবাস্থিত কিরঘিজ স্তেপভূমি বা তৃণভূমি ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। এই বাসভূমি থেকে আর্যরা ইউরোপ, পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ভাষায় পরিবর্তন হয়েছে এই ভাবে।

আরল-আর-আরঅ-আরয়্

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আর্য শব্দটি ইংরেজীতে এরিয়ান হিসাবে উচ্চারিত হয়। সুতরাং উচ্চারণ হিসাবে 'আরয়' ধনি হয় আর্য বা এরিয়ান। এই স্থানবাচক শব্দটি পরে গুণবাচক বা ভাষাবাচক হয়ে ওঠে।

প্রচলিত মত হিসাবে দ্রাবিড় নামের উৎপত্তি এশিয়া মাইনরের হেলেনিক-পূর্ব লিসিয়দের থেকে। লিসিয়রা নিজেদের ট্রামিলি নামে অভিহিত করেছেন। ট্রামিলি পরিবর্তিত হয়ে হয়ে দ্রামিজা। এই দ্রামিজা নামটি দুভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রথমভাবে দক্ষিণভারতে এর পরিবর্তন ঘটে দ্রামিজা-তামিজ বা তামিল। অন্যভাবে উত্তরভারতে আর্যদের মধ্যে দ্রাজি-দ্রাবিড়া বা দ্রাবিড় হিসাবে পরিবর্তিত হয়।

প্রাচীনকালে দ্রাবিড় অঞ্চল বলতে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের ভূখণ্ডই মনে করা হত। আবার বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরের ভূখণ্ড আর্যাবর্ত নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণভারতে বা দ্রাবিড়ের প্রকৃতি ভূগোল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ভূখণ্ড তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। 'সমুদ্রাব' শব্দের অনুকরণে সমুদ্রদ্রাবিড় বা সংক্ষেপে দ্রাবিড় হওয়াই সঙ্গত।

সমুদ্রাব সমুদ্রাবিড় দ্রাবিড়

নভ-নীড়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে আর্য এবং দ্রাবিড় নাম দুটি মূলত: ভূখণ্ডবাচক। সাধারণভাবে আমরা প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তু বলতে বুঝি রাজা রাজড়াদের নির্মিত প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, গির্জা, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি। অর্থাৎ মানুষ নির্মিত নির্মাণকার্য। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রকৃতিও অনেক নির্মাণ কাজ করে রেখেছে। এই প্রাকৃতিক নির্মাণেই লুকিয়ে অলিখিত ইতিহাস।

সূত্র নির্দেশ

১) আধুনিক পৃথিবীর মানচিত্র, সম্পাদক - শ্রী অমিত কুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক - চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোং প্রা: লি:, কলিকাতা।

২) ভূগোল চিন্তার বিকাশ, ৫, কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত, জি ওয়াড প্রেস, প্রা: লি:, কলিকাতা।

সিন্ধু সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার যুগে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

তপন কুমার মন্ডল

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাব ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধবে বহন করে চলেছে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ইতিহাসেব এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মানুষ সমৃদ্ধ হয়ে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনেব ক্ষেত্রে নানা রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে।

নগরকেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতার যুগে নগরেব অনতিদূরে গড়ে ওঠা গ্রামগুলির শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সম্ভবত: নগর প্রশাসন দ্বারা নিকটবর্তী গ্রামগুলি শাসিত হত। পৃথক কোন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন সিন্ধু সভ্যতার নগরের শাসনকর্তা অনুভব কবেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, পৃথক গ্রাম্য প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুললে নগরের প্রতি গ্রাম্য মানুষের আনুগত্য ও নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং পরিণামে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি ফসলের যোগান ব্যাহত হতে পারে। ফলে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা দ্রুত বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য সিন্ধু সভ্যতার যুগে কোন রকম গ্রাম্য প্রশাসন সংস্থার ন্যূনতম নিদর্শন বা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঋগ-বৈদিক যুগে আর্যবা যে গ্রামীণ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল এবং যা ক্রমশ: বিকশিত হয়ে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল, তার প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন-রূপ। গ্রামীণ আর্যদের প্রয়োজন ও চাহিদা পরিপূরণের জন্য গ্রাম্য সমাজজীবন বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করেছে এবং এই রূপান্তরের পথ ধরে গ্রামীণ স্তব থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরে উপনীত হয়েছে। আর্যদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও ধাবণা শুরু হয়েছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাব মধ্যে থেকে। জনবসতির ঘনত্ব ও পরিসীমা সম্প্রসারিত হতে থাকলে পৃথক পৃথক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পৃথক পৃথক গ্রামণীর অধীনে গড়ে ওঠে। এরপব অনেক গুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিশ বা জন গঠিত হত। কয়েকটি বিশ বা জন নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রেব 'আরোহ' পদ্ধতিতে গ্রাম থেকে রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো ধীরে ধীরে এবং আর্যজাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে।

গ্রামণীর শাসন সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক ছিল না। কারণ যাযাবর জীবন থেকে আর্যদের মধ্যে সাম্য ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে যখন তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে তখন তাদেব গণতন্ত্রের 'সাধারণ ও ব্যবহাবিক ধারণা' গ্রামীণ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. J. Filliozat, Political History of India, 1st. ed 1947, p.86
২. ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা, পৃ: ২৪.
৩. Romila Thapar, Ancient Indian Social History, 2nd ed. 1984, P. 214
৪. Rama Shankar Tripathi, History of Ancient India, P. 32
৫. Ibid, Page-33
৬. Ibid, Page-34
৭. Romila Thapar, Ancient Indian Social History, 2nd ed. 1984, P. 131.
৮. D.D. Kosambi, The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical outline, P. 26.
৯. Ibid, Page-86.
১০. Radhakumud Mukherjee, Local Government in Ancient India, 1958, P.26.

একটি প্রাচীন কাহিনীর অভিপ্রয়াণ

সুচন্দ্রা ঘোষ

ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত কাহিনী বা ফিকশন থেকে ইতিহাসের ঘটনা নির্ভর পরীক্ষিত তথ্য বা ফ্যাক্টকে আলাদা করে চিহ্নিত করা। তথ্যের চেয়ে কাহিনীর গুরুত্ব ঐতিহাসিকের কাছে সাধারণত কম। অথচ এইসব আপ্তবাক্য মনে রেখেও দুটি প্রাচীন কাহিনীকে ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু করতে চাইছি। কাহিনীর মধ্যে কল্পনা ও অবাস্তবতা যতই থাক না কেন, তাকে কোনমতেই তার সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

এই মুখবন্ধের সাহায্যে আমরা একটি বহুল প্রচলিত গ্রীক কল্পকথার সঙ্গে বর্তমানেও প্রচলিত চীনা তুর্কিস্তানের অন্তর্গত তাশকুরগান এলাকার একটি লোককাহিনীর প্রসঙ্গ আনব। চীনদেশীয় কয়েকজন পুরাতাত্ত্বিক তাশকুরগান অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কাহিনীটি শুনেছিলেন। মেলিন পেরিস তাঁর একটি প্রবন্ধে[১] এই গল্পটিকে এথ্নোহিস্টোরিক্যাল উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনার তৃতীয় উপাদান ঘটজাতকের কাহিনী। গ্রীক কল্পকথায় আমরা জানি যে আর্গসের রাজা অক্রিসিয়াসের কন্যার নাম ছিল Danae। অক্রিসিয়াস কন্যা Danae কে অবিবাহিত রাখার উদ্দেশ্যে একটি মিনারে বন্দি করে রেখেছিলেন কারণ একটি দৈববাণী অনুসারে Danae-র পুত্র অক্রিসিয়াসের মৃত্যুর কারণ হবে। বন্দি অবস্থাতেই Zeus এর দ্বারা Danae গর্ভবতী হন এবং গ্রীক কল্পকথার বিখ্যাত বীর Perseus এর জন্ম হয়। আমরা জানি Perseus এব চক্রের আঘাতে তাঁর মাতামহ অক্রিসিয়াসের প্রাণ হানি হয়।[২]

তাশকুরগানের প্রচলিত লোক কাহিনীটি এরকম। এক যোদ্ধা চীন দেশীয় এক রাজকন্যাকে পারস্যের রাজার সাথে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনা চক্রে সৈনিকটি একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে সে রাজকন্যাকে একটি মিনারে বন্দি করে রেখে যায়। ফিরে এসে সে দেখে যে রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা। প্রচলিত কাহিনী হল যে কোনও এক দেবতার দ্বারা রাজকন্যা গর্ভবতী হয়েছেন এবং এই রাজকন্যার সন্তানও কালে একজন প্রখ্যাত বীর হয়ে ওঠেন।

এই দুটি কাহিনীর পাশাপাশি ঘটজাতকের[৩] কাহিনীর দিকে এবারে দৃষ্টি দেওয়া যায়। ঘটজাতকে দেবগব্বা নামে এক রাজকন্যার উল্লেখ আছে। রাজকন্যাকে অবিবাহিত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর ভাইয়েরা তাকে একটি পাথরের প্রাসাদে বন্দি করে রাখে-অর্থাৎ যাতে করে

দেবগব্বা কোন পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে না পারে। প্রাসাদটি 'এক স্তম্ভ প্রাসাদ' বলে বর্ণিত। অর্থাৎ তার আকার ছিল স্তম্ভ বা মিনারের মতন। দেবগব্বার বন্দিদশার জন্য এখানেও দায়ী একটি দৈববাণী। দৈববাণীটিতে বলা হয়েছিল যে দেবগব্বার ঔরসজাত সন্তান তাঁর মাতুলদের হত্যার কারণ হবে। কিন্তু ভ্রাতারা তাঁকে বন্দি করে রাখলে ক্রমশ উপসাগর নামে এক যুবকের সঙ্গে দেবগব্বাব ঘনিষ্ঠ শারীরিক সান্নিধ্য ঘটে। তাঁদের মিলনজাত জ্যেষ্ঠ সন্তান একটি চক্রের দ্বারা তাঁর মামাদের মস্তক ছিন্ন করে। এইভাবে দৈববাণী ফলে যায়।

এই তিনটি ভিন্ন কাহিনীর এবং সম্ভবত তিন ভিন্ন সময়ের কাহিনীর মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে, যদিও তারা নিশ্চয়ই হুবহু এক নয়। এই সাদৃশ্যের সম্ভাব্য কারণ খোঁজায় ঐতিহাসিকের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

ভাবের জগতে আদান প্রদানের ফলে এই জাতীয় সাদৃশ্য আসতে পারে। এই আদান প্রদান ঘটে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে বণিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বণিকরা কেবলমাত্র পণ্য বিনিময় করেন না। সাংস্কৃতিক ও চিন্তার জগতের অন্যতম বাহকও তারাই। ফলে যোগাযোগের প্রাচীন পথের অনুসন্ধানও করা যেতে পারে।

গ্রীক এবং জাতকের কাহিনীর বিষয়বস্তু যেহেতু এখনও তাশকুরগান অঞ্চলে জীবন্ত, তখন আমাদের ধরে নিতে বাধা নেই যে এই অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন পথ দিয়েই গ্রীক এবং ভারতীয় কাহিনীর আদান প্রদান ঘটেছে। কাহিনীর বিষয়বস্তু কে কার থেকে নিয়েছে আমরা জানি না। তবে ভারতীয় ও গ্রীক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যোগসূত্রকে অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যএশিয়া, পশ্চিমএশিয়া যখন সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিনিময়ের দ্বারা নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল তখনই এই জাতীয় সাংস্কৃতিক আদান প্রদান তথা সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা।

আমরা জানি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই চীনের রেশম স্থলপথে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, মধ্যএশিয়ার তাকলামাকান মরুভূমির মধ্য দিয়ে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে পামির মালভূমি ও ইরান হয়ে পশ্চিম এশিয়া পৌছত।[৪] এই রেশম পথের একটি উল্লেখযোগ্য বিনিময় কেন্দ্র ছিল 'সুলে' বা কাশগড় বা গ্রীকদের সেরেস্। এটি তাশকুরগানের কাছেই অবস্থিত। কাশগড়ের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে এখানে নানা দেশের বাণিজ্যপথ এবং ভারতীয়, চীন দেশীয় এবং গ্রীক সহ পশ্চিমএশিয়ার বণিকেরা মিলিত হতেন। দক্ষিণ ইয়ারকান্দ এবং চিপিন (কাশ্মীর) এর সাথে কাশগড় অঞ্চল যুক্ত ছিল। টলেমীর[৫] লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে টিটিয়ানাস নামক একজন মেসিডোনিও বণিকের প্রতিনিধিরা বাণিজ্যের জন্য ব্যাক্ট্রিয়া থেকে stone tower পর্যন্ত আসতেন। এই stone tower কাশগড়ের খুব কাছেই অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে স্থল পথে আগত কোন বণিকের পক্ষে মহাদেশীয় বাণিজ্য পথে যাত্রার পূর্বতম সীমা ছিল এই stone tower। প্লিনিও[৬] তাঁর 'ন্যাচুরেলিস হিস্টোরিয়ায়' এই অঞ্চলের বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই কাশগড়কে আমরা আমাদের কাহিনীর transmission point ধরতে পারি। এখানেই ভাবতীয় ভাবনার সাথে গ্রীসীয় ভাবনার বিনিময়, সংযোগ এবং মিশ্রণ ঘটে।

ফলে এই ধরণের কাহিনী এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার মত বিশাল এলাকায় বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, তারই প্রকাশ, ভাবনা এবং কল্পনার ক্ষেত্রেও খুঁজে পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশ

১। মার্লিন পেরিস, 'টু তাশকুরগান অ্যাণ্ড পাণ্ডুওয়ামনুওয়ারা, ডি.পি. দুবে (সম্পা), রেজ অ্যাণ্ড ওয়েজ অব ইণ্ডিয়ান কালচার, নিউ দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ: ২২৯-২৩৯।

২। জে. পিনসেন্ট, গ্রীক মিথোলজি, লণ্ডন, ১৯৮২, পৃ: ৬৩।

৩। ডি. ফৌসবোল (সম্পা) দ্য জাতকস টুগেদার উইথ ইটস্ কমেন্টারী, ভল্যুম ৪, লণ্ডন, ১৮৮৭, জাতক, ৪৫৪।

৪। রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ: ১৩৭।

৫। ক্লডিয়াস টলেমী, জিওগ্রাফিকো হুফেগেসিস, অনু, ই.এল. স্টিভেনসন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩২:১২।

৬। প্লিনি, ন্যাচুরালিস হিস্টোরিয়া, অনু, এইচ. র‍্যাগহ্যাম, লোয়েব ক্লাসিক্যাল সিরিজ, ১৯৪২, ৬.২৪., ৮৮-৮৯।

প্রাচীন বাঙালী রমণী

শাহানারা হোসেন

প্রাচীন যুগের বাঙালী রমণী সম্পর্কে জানাব জন্য আমাদের নির্ভরশীল হতে হয় সমসাময়িক সাহিত্য, লিপিমালা, প্রতিমামূর্তি ও পোড়ামাটির ফলকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর। এ সকল উৎস হতে প্রাপ্ত অপ্রতুল উপাদান হতে প্রাচীন বাঙালী রমণীব জীবনের খণ্ড চিত্র সঙ্কলিত করে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়াস আমরা করতে পারি। তবে প্রথমেই আমাদেব মনে রাখতে হবে প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেই নারীর একক সত্তার অস্বীকৃতি ছিল একটি সার্বজনীন বাস্তবতা। আমাদের জ্ঞানের পরিধি এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা লগ্ন হতেই নারী ছিল পুরুষের অধীন এবং পিতা, স্বামী, পুত্র বা অন্য কোন পুরুষ অভিভাবকেব উপর নির্ভরশীল। বিবাহ প্রথা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনাবলী নারী পুরুষের সম্পর্ক এমনভাবে নির্ধারিত করেছিল যার ফলে নারী হয়ে পড়েছিল আধুনিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে অসমতা ও বৈষম্যেব শিকার।

প্রাচীন বাংলায় একটি মেয়েব জীবনে বিবাহ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিবাহিত জীবনই ছিল তার জীবনকালের সবচেয়ে সুদীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। কারণ বাঙালী ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিধান দিয়েছিলেন শৈশবোত্তীর্ণ না হতেই একটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। এ বিধান লঙ্ঘনকারী পিতা বা ভ্রাতা পরলোকে শাস্তি ভোগ করবেন এবং ইহকালে হবেন সমাজে নিন্দিত। বয়োঃপ্রাপ্ত অনূঢ়া নারীকে শূদ্রারূপে অধঃপতিত করার অনুশাসনও শাস্ত্রকার ভবদেব এবং জীমূতবাহন দিয়েছেন। বিবাহের বয়স সম্পর্কে কুল্লুকের অভিমত এই যে, অষ্টবর্ষীয় মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মনুকে অনুসরণ করে জীমূতবাহনও বলেছেন দ্বাদশবর্ষীয় কন্যার পাত্রের বয়স ত্রিশ বছব এবং অষ্টমবর্ষীয় কন্যার পাত্রেব বয়স চব্বিশ বছর হতে হবে। এ সকল তথ্যবলী থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট যে প্রাচীন যুগে বাঙালী মেয়ের জীবনে শৈশবকাল কোন অর্থবহ অধ্যায় ছিল না কারণ আট থেকে বার বছরের মধ্যে তার বিয়ে হতে হবে-এটাই ছিল ধর্মশাসিত সমাজের বিধান।

একটি বিবাহিত মেয়েকে সাধারণত বাস করতে হতো যৌথ পরিবারে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ ও অন্যান্য পরিজনদের সাথে। তার কর্তব্য কর্মের মধ্যে ছিল স্বামী, সন্তান ও গুরুজনদের সেবা-যত্ন, অতিথি আপ্যায়ন এবং সাংসারিক অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন। এ সকল দায়িত্ব তাকে পালন করতে হতো গুরুজনদের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী সাহিত্যমোদী শ্রীধর দাস কর্তৃক সঙ্কলিত প্রকীর্ণ শ্লোক গ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি

শ্লোকে কুল-স্ত্রীদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে,

শ্বশুরকে অতিশয় ভক্তি করবে, শশ্রুমাতার পদে
আনত থাকবে, ভৃত্যদের স্নেহ করবে, দ্বারে সমাগত
বান্ধব ও স্বজনদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে।

তবে স্বামী ছিলেন বাঙালী নারীর নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই উপরোক্ত শ্লোকে আরো বলা হয়েছে যে,

গৃহে অথবা কুঞ্জে সহচরীরূপে স্বামীকে নিত্য বন্দনা করবে।

নারীর জীবনে স্বামীর গুরুত্বের উপর ধর্মশাস্ত্রকারগণও সবিশেষ জোর দিয়েছেন। মনু এ বিষয়ে বিধান দিয়েছেন যে, স্ত্রী যদি বাক্য ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রভু পতির প্রতি কর্তব্যে অবহেলা না করেন তবে পরলোকে তিনি স্বামীর সাথে স্বর্গে বাস করবেন এবং ইহলোকে তিনি সাধ্বী রমণী রূপে নন্দিত হবেন। কূল্লুকের অভিমতে পতিসেবাই স্ত্রী লোকের মোক্ষ লাভের পথ এবং তার স্বর্গলোকে গমনের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে পতিসেবা। উমাপতিধর বলেছেন একজন সাধ্বী কুল-স্ত্রী তার গুণী ও ধনী পিতা এবং পুত্রের চেয়েও অধিক নিষ্ঠা ও যত্নশীল হবেন তার স্বামীর প্রতি। পতি নির্ভর অসহায়া বঙ্গ নারীর করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে গোবর্ধনাচার্যের বিরহিণী নায়িকার বর্ণনায়ঃ

প্রবাসী পথিকের আগমনে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায়,
মৃগনয়নার চূর্ণকুন্তল বিলসিত দৃষ্টি যেন শৈবালাচ্ছন্ন
করতোয়া নদীর মত সদানীরা।

স্ত্রী স্বামীকে অন্ন পরিবেশন করতেন এবং সাধারণ বাঙালী স্বামী-স্ত্রীর পরিবেশিত কলা পাতায় ঘৃত সহকারে গরম ভাত, নালিতা শাক ও মৌরলা মাছ গ্রহণ করে নিজেকে পুণ্যবান মনে করতেন। কিন্তু স্বামীর সাথে স্ত্রীর অন্ন গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল। সমবর্ণের স্ত্রীই স্বামীর দৈহিক যত্ন, খাদ্য রন্ধন ও পরিবেশন করতেন। সমবর্ণের স্ত্রী স্বামীর ধর্মীয় যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু একক ভাবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার স্ত্রীর ছিল না। তবে প্রাচিন বাঙালী নারী বহুব্রত পালন করত যেমনঃ সুখরাত্রি, কোজাগর, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অশোকাষ্টমী, ত্রয়োদশী। নারী কর্তৃক পালিত বহু ব্রতের উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া রাজপরিবার ও উচ্চ পরিবারের মহিলাগণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনতেন পুণ্য অর্জনের জন্য। ব্রাহ্মণেরা তাদের এই সব মহাকাব্য পাঠ করে শুনিয়ে দক্ষিণা হিসেবে পেতেন ভূমি ও ধনসম্পদ। লিপিমালার সাক্ষ্য হতে মনে হয় পৌরাণিক দেবীকুল ও সীতা ছিলেন বাঙলার রমণীকুলের আবহমান আদর্শ-যে আদর্শের মর্মবাণী হচ্ছে ত্যাগ, পবিত্রতা ও পতিভক্তি।

পুরুষের বহু বিবাহ সমাজে ও ধর্মে স্বীকৃত প্রথা ছিল এবং রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও অভিজাত স্তরের পুরুষ অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কনিষ্ঠা সপত্নীকে ভগ্নীর মত স্নেহ করবেন-এটাই ছিল পুরুষ প্রধান সমাজের অনুশাসন। কিন্তু মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার কারণেই জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ঈর্ষান্বিতা হতেন। নারীর সপত্নী দুঃখ ও পরিবারে সপত্নী দ্বন্দ্বের

অনেক চিত্র সমসাময়িক সাহিত্যে রয়েছে। বাল্যবধূব আর্বিভাবের পর জ্যেষ্ঠা আরও বেশী বৎসলা, সুশীলা, সেবাপরায়না, বিনীতা ও স্বামীর অনুকূলা হতে প্রয়াস করতেন। স্বামীকে বশীকরণের জন্য মন্ত্রৌষধিও তিনি প্রয়োগ করতেন। সপত্নীদের মধ্যে বিবাদ ও ঈর্ষা প্রায়শঃই পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করতো। পতি শয়নবার প্রথার উল্লেখ আমরা সমসাময়িক আর্যসপ্তশতী কাব্যে পাই অর্থাৎ কোন পত্নীর সাথে কোন বার পতি নিশি যাপন করবেন তা বহুপত্নীক পরিবারে নির্ধারিত থাকতো। আবার প্রিয় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামী অন্য স্ত্রীকে দৈহিক নির্যাতনও করতেন। দ্বাদশ শতকে সঙ্কলিত কোষকাব্য সুভাষিতরত্নকোষে উদ্ধৃত অজ্ঞাতনামা কবির একটি শ্লোকে বহু পত্নীক পরিবারে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পীড়নের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে.....

মুষ্টি দিয়ে তাকে আমি আঘাত করেছি এবং তাব বক্ষ আঁচড়ে দিয়েছি
আমি তার দেহের দুই পাশে আঘাত করেছি এবং কেশ টেনেছি
এবং তার অধর কামড়িয়েছি যতক্ষণ না পর্যন্ত সে
নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে।
তোমাকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে আমি এসব করেছি....
এখন আমাকে আদেশ কারো আমি আর কি করবো।

জ্যেষ্ঠা পত্নী তার দুঃখ, ভয় ও হতাশার কথা ব্যক্ত করতেন তার সখীর নিকট। নবীনা স্ত্রীও শঙ্কিত থাকতেন-যদিও তার তারুণ্য ও রূপ তাকে আত্মবিশ্বাসী রাখতো। এসব বহুপত্নীক পরিবারে যে পত্নী পুত্র সন্তানের মাতা তিনি আত্মগরিমায় ও কিছুটা নিঃশঙ্কচিত্তে থাকতেন, কারণ পুত্রবতী নারী হিসেবে পরিবারে ও সমাজে তার স্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ ও সুরক্ষিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলেছেন পুত্র সন্তান লাভের জন্য পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ করেন-কারণ এই পুত্র সন্তান তার এবং তার পূর্ব পুরুষদের মুক্তির মাধ্যম। পোড়ামাটির ফলকে আমরা মাতা ও শিশুর বহু চিত্র দেখতে পাই। মা শিশুকে নিয়ে খেলা করছে, কুয়া থেকে মা পানি তুলছে পাশে দাঁড়িয়ে শিশু, নৃত্যরতা রমণী ও পাশে দন্ডায়মান শিশু-এ ধবনেব দৃশ্য পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একাধিক ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রাচীন বাঙলার বহু বাজন্যবর্গ ও ধনশালী ব্যক্তি ধর্মীয় কাজে ভূমিদান করেছেন মাতা ও পিতা উভয়ের পুণ্য কামনা করে। আবার নৃপতিগণের অভিলেখ মালায় রয়েছে মাতার নাম ও বংশ পরিচয়।

প্রাচীন বাঙলায় বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। কোন কোন বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুণীরাও বাস করতেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং ও সেঙচি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের কথা তাদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন। কিংবদন্তীতে আজও খ্যাত রয়ে গেছেন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী 'মেখলা'। তিনি ছিলেন দেবীকোট বিহারের অধিবাসী। পূর্ব ভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কয়েকজন নারী খ্যাতি লাভ করেছেন। যেমনঃ ময়নামতী, লক্ষ্মীঙ্কার, সহজযোগিনী চিন্তা, লীলা বজ্র। তবে সাধারণভাবে নারীর সন্ন্যাস গ্রহণ সমাজে ছিল ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা...নারী গৃহী জীবন যাপন করবে এবং পতির প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আত্মীয় পরিজনদেব সেবা যত্ন করবে এটাই ছিল ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক নিয়ম।

সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত এই দুটি প্রকীর্ণ শ্লোক গ্রন্থেই রয়েছে একটি কবিতা- যা প্রাচীন বাঙালী রমণীর পরিবারে এবং সমাজে অবস্থান, মর্যাদা ও মূল্য অতি স্বল্প কথায় ফুটিয়ে তুলেছে। ক্রুদ্ধা স্ত্রী বিশ্বাসহন্তা স্বামীকে বলেছেন,

'আমার পদযুগলের সম্মুখে দয়া করে আনত হয়োনা,
কারণ এটা সত্যি যে স্বামীগণ তাদের নিজেদের প্রভু।
কিছু কালেব জন্য তুমি অন্যত্র আনন্দ আহবণ কবেছো,
এতে দোষ কোথায় ?
আমিই পাপী, যেহেতু তোমার অনুপস্থিতিতেও আমি
দেহত্যাগ করিনি,
কারণ তাবা বলেন স্ত্রীদের জীবন
স্বামীর জীবনের মধ্যেই নিহিত।
তাই এটা নিশ্চিত যে আমারই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
করা উচিত।'

প্রাচীন বাঙালী বমণীব জীবনের যে রূপরেখা এই প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন ঐতিহাসিক এ প্রশ্ন উত্থাপন কবতে পারেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুবই উঁচুতে ছিল। সেই সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক সত্যেব পবিপ্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করে মূলত চতুর্থ খ্রীষ্টিয় শতক হতে দ্বাদশ শতকে লিখিত অভিলেখ, ধর্মশাস্ত্র ও কবিতা গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত উপাদানেব উপর ভিত্তি করে এ উপসংহার কি সমীচীন যে বাঙালী রমণীর অবস্থান ও মর্যাদা সমগ্র প্রাচীন যুগেই এত অনুন্নত ছিল যে তাকে পুরুষ অভিভাবকের উপব নির্ভরশীল হয়ে পিতৃ প্রধান সমাজের অনুশাসনাবলী দ্বারা সাধারণতঃ সর্বদাই নিপীড়িত হতে হয়েছে ? এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল সাম্প্রতিক কালে এ অভিমত কোন কোন ঐতিহাসিক মিথ বা অতিকথন বলে মনে করছেন। এ ধবনের মন্তব্যও করা হয়েছে যে,

বৈদিক ভাবতবর্ষে নাবীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোন
স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না,.....

বৈদিক যুগে ভারতীয় নাবীর মর্যাদা নিয়ে যে বিতর্ক তা বাদ দিয়েও আরেকটি ঐতিহাসিক সত্যের নিরিখে প্রাচীন বাঙালী রমণীর সামাজিক মর্যাদা ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তার অধিকার সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। বাঙলা নামে ভূখন্ডটি বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বলয়ের বাইবে ছিল। প্রাগ-আর্য বাঙলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণ ও সমন্বয়ের প্রভাব অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতক হতেই। এই সময়কালে উত্তর ভারতের আর্য সমাজ ও সংস্কৃতিতেও নারীর স্থান বৈদিক যুগের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। লিখিত উপাদানের অভাবে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্বে বাঙালী নারীর জীবন সম্পর্কে আমবা প্রায় কিছুই জানিনা। বাঙলার সেই সময়কালের বিদ্যমান পুরাবস্তু যেমন, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম নারীকে সাধারণতঃ উৎকীর্ণ করেছে

বহু অলঙ্কার ও বৈচিত্রপূর্ণ কেশ বিন্যাসে সুসজ্জিতা রমণী রূপে। নারীর অলঙ্কার ও কেশ বিন্যাসের চিত্র তার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কোন তথ্যের তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হতে পারে না। তাই প্রাচীন বাঙালী রমণীর সমাজে ও সংস্কৃতিতে অবস্থান সম্পর্কে এবং তার অধিকারের বিষয়ে এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তকারে যা বলা হয়েছে সেই বক্তব্য স্বল্প তথ্য সমর্থিত হলেও সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদার বাস্তবতা এবং প্রচলিত চিন্তা ধারণা ও ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকৃত চিত্র বলেই গ্রহণীয়।

সূত্র নির্দেশ

১. An Anthology of Sanskrit Court Poetry, Vidyakara's "Subhasitaratnakosa" translated by D.H.H. Injalls, H.O.S , 44, 1965

২. Jimutavahana, Dyabhaga, Translated into English by H T Colebrooke in the Hindu, Law of Inheritance, Calcutta, 1810

৩. Manussamhita, (ed.) by Bharata Chandra Siromani with a Bengali translation, Calcutta, Samvat, 1923. translated into English by G.Buhler, The Laws of Manu, S.B.E. XIV, Oxford, 1886

৪. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩.

৫. শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৭৮।

৬. Sadukti-karnamrita of Sridharadasa, edited by Sures Chandra Banerji, Calcutta, 1965

৭. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদনা), ভারত-ইতিহাসে নারী. কলকাতা-নয়াদিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯।

সম্রাট অশোক ও তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি ঃ একটি পুনর্মূল্যায়ন

জিনবোধি ভিক্ষু

বিষয়সারঃ

সম্রাট অশোক (খ্রীঃ পূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) ছিলেন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর বিভিন্নমুখী মানব কল্যাণমূলক ভূমিকা পালনের জন্য তিনি নানা অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। মহামতি অশোক তাঁর ধর্ম বিজয়, অহিংস নীতি, রাষ্ট্রধর্ম এবং উদার ধর্মনীতিব জন্য প্রিয়দর্শী অশোক, ধর্মবিজয়ী অশোক, অহিংসনীতিক অশোক, ধর্মনীতিক অশোক, দেবনামপ্রিয়তিষ্য অশোক এবং ধর্মাশোক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত। শাসক হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন খ্যাতিমান তেমনি ধর্মানুরাগী সম্রাট হিসেবেও ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর বিভিন্ন অনুশাসন তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন কবছে। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ও অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্মের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জানা যায়, বৌদ্ধ সংঘের পবিত্রতা ও অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হযেছিল। তখন যেসব ভিক্ষু ঐ মহাসঙ্গীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না সেই বজ্জিপুত্র ভিক্ষুবা এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সমস্ত ঘটনা এটাই প্রমাণ কবে যে সে সময় থেকেই বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে বিশৃংখলা ও নানা মতবাদ দানা বেঁধে উঠে ও পববর্তীকালে বাজা অশোকের সময় বিনয়বাদী ও অবিনয়বাদী প্রধানতঃ এ দুটি ভাগ সর্বমোট আঠারটি সম্প্রদাযে বৌদ্ধ সংঘ বিভক্তহযে পড়ে। রাজকীয় আনুকূল্য লাভ কবে ধর্মের প্রতি আনুগত্যহীন, শ্রদ্ধাহীন অনেক লোক ছদ্মবেশে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্মের স্থায়ীত্বের পথে বাধার সৃষ্টি করেন। স্থবিববাদী ভিক্ষুবা তথা বিনয়বাদী ভিক্ষুগণ এ সময়কার ঘোরতর ধর্মীয় বিশৃংখলা থেকে বৌদ্ধধর্মের পরিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র রক্ষাকল্পে তাঁদেব স্ব স্ব মেধা ও মননশীলতা কাজে লাগান। এ সময় সম্রাট অশোকের রাজকীয় সহায়তায় ও স্থবির মোগ্গলীপুত্ত তিষ্যের সভাপতিত্বে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বৌদ্ধ শতাব্দীতে তৃতীয় অব্দে মহাসঙ্গীতি পাটলীপুত্র নগরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাবান রাজা অশোকের ঐকান্তিকতায় এ মহাসঙ্গীতি সার্বিক সাফল্য লাভ করে। এ সঙ্গীতির একটা বিশেষত্ব এই যে, সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্গলীপুত্ত তিষ্য স্থবিব তৎকালীন বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন করে বৌদ্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য 'কথাবত্থু' নামক একটা গ্রন্থ রচনা করেন এবং এটা অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলা বাহুল্য তৃতীয় সঙ্গীতিব পবেই ত্রিপিটক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় এবং সম্রাট

অশোকের অনুপ্রেরণায় ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এভাবে বৌদ্ধধর্মের বিশৃংখল অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকৃত থেববাদ বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোক ও থেরবাদী ভিক্ষুগণ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা পুনর্মূল্যায়ন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভগবান তথাগত বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে ইহাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল আদর্শের সম্যক অর্থ ও ব্যঞ্জনের ভারসাম্যহীন বিচার বিশ্লেষণে সংস্কার নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ সংস্কারমুক্তহতে পারবে না। তাই তারা তাদের সংস্কাবের বশবর্তী হয়ে বুদ্ধের ধর্মকে আপন সংস্কারেব অন্তর্ভুক্ত করে বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবে এবং নিজ মতবাদে স্থানুবৎ হয়ে থাকবে। বুদ্ধ আরও চিন্তা করেছিলেন যে, এ মতবাদগুলি মিথ্যাদৃষ্টি হতে উৎপত্তির প্রসঙ্গ তাঁর সময়ে উত্থাপণ করা হলে ভিক্ষুসংঘ এদের গুরুত্ব দেবেন না। তাই তিনি ঘটনার স্থান কাল পাত্র নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হলে এর স্থায়ীত্ব ও গুরুত্ব অধিকতর হবে চিন্তা কবে এই মতবাদের খণ্ডন করা স্থগিত রেখে-ছিলেন। তিনি তার সর্বজ্ঞতা দৃষ্টিতে এই সব মতবাদের খণ্ডন করতে এই শিষ্য মোগ্গলীপুত্ত তিষ্যের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। উপরোক্ত তথ্যসূত্রে আমরা বৌদ্ধ ধর্মের অভিধর্ম গ্রন্থের কথাবথু পুস্তকের ভূমিকায় সঙ্গীতিকারকদের উদ্ধৃতিতে পাই। এখন আমি কথাবত্থুর ইংরেজীতে প্রকাশিত পন্ডিত সুয়ে জান আং ও রীচ ডেভিডস্-এর বই হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি-"যখন ভগবান বুদ্ধ যমক প্রতিহার্য জ্ঞান সমাপ্ত করেছিলেন, তখন তিনি তাবতিংশ দেবলোকে বর্ষাবাসের জন্য গমন করেন এবং শিরীষবৃক্ষের নীচে পান্ডুকম্বল পর্বতে আসীন হয়ে তাঁর মাতৃদেবীকে প্রধান সাক্ষী করে তিনি দেব পরিষদের অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন। তিনি তাদের নিকট ধর্ম-সংগণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা এবং পুগ্গল প্রজ্ঞপ্তি দেশনার পর চিন্তা করেছিলেন-যখন ভবিষ্যতে "কথাবত্থু" প্রতিষ্ঠিত করার সময় আসবে। আমার শিষ্য বিশেষভাবে অভিজ্ঞ স্থবির মোগ্গলীপুত্ত তিষ্য ধর্মের মধ্যে উত্থাপিত মিথ্যা ধারণা খন্ডন করবে এবং তৃতীয় সংগীতি আহবান করে আমাদের ধর্মীয় মতবাদের পাঁচশত এবং অন্য ধর্মীয় মতবাদের পাঁচশত মতবাদ নিয়ে মোট একহাজর মতবাদ সংকলন করবে। কারণ এই সময়ে আত্মা বা পুগ্গল মতবাদের চারটি প্রশ্নের প্রত্যেকটির দ্বিপঞ্চভাগে অষ্টমুখ পরিচ্ছেদ জিজ্ঞাসার প্রারম্ভে বুদ্ধ সকল আলোচ্য বিষয়ে কর্মধারা অবলম্বন করে আবৃত্তির জন্য মাত্র একটা পরিচ্ছদে সমাপ্ত না করে বিষয়ের শিরোনাম প্রস্তুত করেছিলেন।[১]...."

সম্রাট অশোক ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য রাজসুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের জন্য তাঁর এই ত্যাগের পটভূমি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা গবেষণা হয়নি। এই নিবন্ধে আমরা সম্রাট অশোকের জনকল্যাণমুখী ক্রিয়াকান্ডের পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করব।

ভগবান বুদ্ধ অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় এই বিতর্কের উৎপন্ন হয়েছিল- "আমি গম্ভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পন্ডিত বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত করেছি। জনসাধারণ আলয়ারাম, আলয়রত, আলয়সম্মোদিত। তাদের পক্ষে

ইদ-প্রত্যয়তা প্রতীত্য-সমুৎপাদ, তত্ত্বদর্শন কবা দুষ্কর। তাদেব পক্ষে সর্ব সংস্কার শমথ, সর্ব উপাধিমুক্ত তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা তত্ত্ব দর্শন করা আরও দুষ্কর। যদি আমি ধর্ম উপদেশ করি এবং অপরে তা বুঝতে না পারে তাহলে আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তের কারণ হবে।"[২] এই বিতর্কেব বশবর্তী হযে ভগবান তাঁব অধীত ধর্ম প্রচারে অনুৎসাহী হয়েছিলেন। যদিও তিনি সহম্পতি ব্রহ্মাব অনুরোধে তাঁর অধীত ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই ধর্মের পটভূমি অন্য প্রকাব ছিল। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় যখন তুষিত দেবলোকে অবস্থান করছিলেন, দেবতাদের অনুবোধে তিনি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করবেন কিনা বিষযে পাঁচটা "মহাবিলোকন" অনুসন্ধান কবছিলেন। তিনি জগতে বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ কবলে এই পাঁচটা মহাবিলোকন প্রয়োজন। এ পাঁচটা বিলোকন হল- ১। সময়, ২। মহাদ্বীপ, ৩। জনপদ, ৪। পবিবার ও ৫। তাঁর মাতার জীবিতকাল।[৩] এই পঞ্চ বিলোকনের দ্বাবা বুদ্ধ তাঁব ধর্ম প্রচারের জন্য ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা চিন্তাই কর্বেছিলেন। কাবণ ধর্মকে ধারণ করাব জন্য স্থান, কাল ও পাত্র যথোপযোগী হতে হবে। তাই তাঁর অধীত ধর্ম প্রচারে অনুৎসাহী হলেও তাঁর ধর্ম প্রচাবের ক্ষেত্র পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়েছিল এবং তাঁর ধর্ম ধাবণ কবার মত উপযুক্ত সব কিছুই ছিল। উপবোক্ত আলোকে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচাবে ব্রতী হওয়ার পশ্চাতের কারণগুলি আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করতে পাবি। যথা- ১। সম্রাট অশোকের কাল, ২। সম্রাট অশোকেব সময়ে পরিবেশ, ৩। সম্রাট অশোকের সময বৌদ্ধ ধর্মেব বিতর্কিত বিষয়েব সমাধান ৪। এই সময়ে বৌদ্ধ সংগীতির প্রযোজনীয়তা ও ৫। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সম্রাট অশোকেব কার্যকবী ব্যবস্থা।[৪]

সম্রাট অশোকের কালঃ

আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখতে পাই ভগবান বুদ্ধ তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে লক্ষ্য কবেছিলেন, তিনি অভিধর্মেব অন্যান্য বিষয় দেশনা কবলেও 'কথাবত্থু' দেশনা করার সময় হচ্ছে সম্রাট অশোকের সময। তাই সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন। মহাকশ্যপ দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি সম্রাট অজাতশত্রুর সহায়তায় রাজগৃহে "বুদ্ধ ধাতু" নিধন করেছিলেন এবং স্বর্ণপাতে লিখিত দুটি নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন- ১। রাজগৃহে বুদ্ধাস্থি নিধন করে এক মহাস্তূপের লৌহ নির্মিত প্রবেশ দ্বাবে সুবর্ণ লিপি-"অনাগতে দরিদ্র বাজা মনিখন্ড নিয়ে বুদ্ধাস্থির সৎকার করুক"। ২। বুদ্ধাস্থি রক্ষিত গৃহের অভ্যন্তরে স্বর্ণ পাতে দ্বিতীয় নিদর্শন-"অনাগতে প্রিয়দর্শী কুমার রাজ্য অভিষিক্ত হয়ে অশোক নামে ধর্ম রাজা হবেন। তিনিই এই বুদ্ধাস্থিসমূহ বিস্তার করবেন।[৫] ভগবান বুদ্ধ ও মহাকশ্যপ সম্রাট অশোকেব সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উপযুক্ত সময় বা কাল বিবেচনার পটভূমি অনুসন্ধান করলে আমবা উপলব্ধি করতে পারি যে, সম্রাট অশোকের সময় ভারতের প্রাচীন রাজনৈতিক অস্থিরতা শমিত হবে এবং সম্রাট অশোক একটা স্থিতিশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন। বুদ্ধেব সমসাময়িককালে ভারতেব রাজনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিতের জীবন এবং মগধরাজ বিম্বিসারের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি তখন ভারতে হত্যাব বাজনীতি প্রবল ছিল। তথাগত বুদ্ধের প্রভাবে শান্তি-শৃংখলা ও

মানবপ্রেমের জাগরণ সূচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য- সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তিন পুরুষ ধরে মৌর্য সাম্রাজ্যের শান্তি শৃংখলা সুষ্ঠু ও সুন্দররূপ পেয়েছিলেন। তাই সম্রাট অশোকের সময় একটা অহিংস নীতি প্রবণ ধর্মপ্রচাবের উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হয়েছিল।

সম্রাট অশোকের সময়ের পরিবেশঃ

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে সম্রাট অশোক তাঁব রাজ্যে প্রজা মনোরঞ্জনে আত্মনিযোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে, তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ জ্ঞান করতেন। তিনি পিতা হয়ে পুত্রের সকল প্রকার সুখ শান্তির পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রজাকূলের মঙ্গলের জন্য রাস্তাঘাট তৈরী কবে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করেছিলেন। প্রয়োজনীয় স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। চিকিৎসার জন্য শুধু মানুষের জন্য নয় পশু পক্ষীদের জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এমনকি ভেষজ চিকিৎসার জন্য দরকারি গাছপালা রোপনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য তিনি চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য নির্মাণ করে জনসাধারণের জন্য বুদ্ধ পূজার পথ সুগম করেছিলেন। সম্রাট অশোক প্রজাকুলে সন্তুষ্টির জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে অন্যান্য ধর্মীয় লোকদের জন্য ধর্ম অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর রাজ্যে জীব হত্যা সম্বন্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করে-ছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তী জীবনে নিরামিষভোজী ছিলেন। এমনকি তিনি কিছু কিছু প্রাণী হত্যা একেবারে নিষেধ করেছিলেন।

সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্মীয় বিতর্কের সমাধানঃ

"কথাবত্থু" গ্রন্থের ভূমিকায় বৌদ্ধধর্মে আঠার প্রকার মতবাদের কথা আমরা জেনেছি। এই সময়ে মোগ্গলীপুত্ত তিষ্য এই বিতর্কের মীমাংসা করবেন বলে ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়ে বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব, চ্যুতি, দেবত্ব অরহতের রাগ ও চ্যুতি নিয়ে, আত্মার শ্বাশত- অশ্বাশত নিয়ে এবং বৌদ্ধধর্মে অনেক অস্বীকৃত বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে উল্লেখ আছে- কেহ অরহত্তপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বুঝতে পারেন "তাঁর জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত হয়েছে, করণীয় কার্যকৃত হযেছে, অতঃপর তাঁর আর পুনঃজন্ম হবে না।"[৬]

সম্রাট অশোকের সময় তৃতীয় সংগীতির প্রয়োজনীয়তাঃ

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনমাসের মধ্যে দূরদর্শী মহাকশ্যপ বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম সংগীতি সম্পন্ন করেছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধ প্রবর্জিত দুর্বিনীত সুভদ্র নামক ভিক্ষু বলেছিলেন- "বন্ধুগণ, ভালই হয়েছে, তোমরা শোক করবে না, বিলাপ করবে না, আমরা সে মহাশ্রমণ হতে মুক্ত হয়েছি, ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা তোমাদের অনুপযুক্ত ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আমরা উপদ্রুত হতাম, এখন আমরা যা ইচ্ছা করব, যা ইচ্ছা নয় তাই

করতে পারব, যা ইচ্ছা হবে না, তা করব না"।[৭] মহাকশ্যপ মহাস্থবির বৃদ্ধ প্রবর্জিত সুভদ্রের উক্তি শুনে বুদ্ধের মরদেহ বর্তমান থাকতে ধর্ম বিনয়ের প্রতি দুর্বিনীত ভিক্ষুদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে চিন্তা করেছিলেন-"ভগবানের দেশিত ধর্ম অসংগৃহীত পুষ্পরাশির ন্যায় রয়েছে, বাতাস অসংগৃহীত পুষ্প যেমন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে, সেই রূপ এবম্বিধ, পাপ ব্যক্তিদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিনয়ের দুএকটি শিক্ষাপদ বা সূত্রের দু একটি প্রশ্নোত্তর অভিধর্মের দুএকটি অংশ বিলোপ হতে পারে। এইভাবে মূ ল নষ্ট হলে আমরা মূলহারা পিশাচের ন্যায় দৃষ্ট হব। অতএব ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করব। তাহলে দৃঢ় সূতায় গ্রথিত পুষ্প রাশির ন্যায় এই ধর্ম-বিনয় নিশ্চল হবে।"

আমরা "কথাবত্থু" গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করছি যে সম্রাট অশোকের সময় দুর্বিনীত ভিক্ষুদের দ্বারা ভিক্ষুসংঘে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। স্থবির মোগ্গলীপুত্ত তিষ্য ভিক্ষুদের অনাচার দেখে অহোগঙ্গা পর্বতে গমন করেন। ভিক্ষুসংঘে সাত বছর ধরে তাঁদের অবশ্য পালনীয় পাক্ষিক উপোসথ বন্ধ ছিল। সম্রাট অশোক আদেশ প্রদানের মাধ্যামে ভিক্ষুসংঘের শৃংখলা আনয়ন করে উপোসথ উদযাপনের জন্য ব্যবস্থা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমনকি এই বিশৃংখলায় অনেক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্রাট অশোক অহোগঙ্গা পর্বত হতে মোগ্গলীপুত্ত তিষ্যকে আহ্বান করে নিজে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা নিলেন এবং ভিন্নমতাবলম্বী ভিক্ষুবেশধারী অভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়ে প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ হতে বহিষ্কার করে-ছিলেন। স্থবির মোগ্গলীপুত্ত তিষ্য বৌদ্ধ ধর্মে অন্য মতবাদীদের মতবাদ খন্ডন করে পুনরায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর তিনি ধর্ম বিনয় ও চার প্রতিসম্ভিতা প্রাপ্ত অরহতৎ ভিক্ষুদের নিয়ে তৃতীয় সংগীতি করে ভিক্ষু সংঘতে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি সম্রাট অশোক এই সংগীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন লিপিতে এর উল্লেখ করেননি। তাই অনেক পন্ডিত মহল এই সংগীতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে সম্রাট অশোক তৃতীয় সংগীতির কথা প্রচার করেননি। **যাই** ১। সংগীতি অনুষ্ঠান একান্তই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনুষ্ঠান। গৃহীরা এই অনুষ্ঠানের সহায়ক মাত্র। তাই সম্রাট অশোক ভিক্ষুদের অনুষ্ঠান নিজের ক্রিয়াকর্মের অংশ হিসাবে শিলালিপিতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। ২। বুদ্ধ বলেছিলেন তাঁর ধর্মে নবাঙ্গ বিশিষ্ট চুরাশি হাজার স্কন্ধ আছে। সম্রাট অশোকের সময় মোগ্গলী পুত্ত তিষ্যের "কথাবত্থু" সংকলনের পর চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতির মত এই সংগীতিব বিবরণ লিপির অন্তর্ভুক্তকরা প্রয়োজন ছিল না। ৩। যেহেতু ত্রিপিটকের বিষয় অতি ব্যাপক, জটিল এবং সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য তাই সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অতি সহজ এবং সাধারণের নিকট বোধগম্য করে ধর্ম বিনয়ের কথা পাষাণে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৮]

সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্মের জন্য কার্যকলাপঃ

সম্রাট অশোক চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য দৈনিক পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দান করে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যয়-দায়াদ হিসাবে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি ধর্ম- দায়াদ হবার জন্য ভিক্ষুসংঘে তাঁর পুত্র-কন্যাকে

দান করেছিলেন। একজন গৃহী উপাসক হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা এবং ধর্ম দায়াদ ছিলেন। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি জনসাধারণের মনোবৃত্তি এবং আকর্ষণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ধর্ম মহামাত্র নিযুক্ত করেছিলেন। সম্রাট অশোক ধর্ম বিজয়ের জন্য ক্ষুদ্র পাষাণ লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভারুশিলালিপিতে প্রচার করেছিলেন যে, "ভগবান বুদ্ধ যা বলেছেন, তা যথার্থই বলেছেন"। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকলে এই উক্তিকরতে পারে। তা এই লিপিতে বুঝা যায়। **ব্রহ্ম গিরি**-১। রূপনাথ মস্কিলিপিতে তিনি বুদ্ধের ধর্মের প্রতি এবং সংঘের প্রতি তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট অশোক ভারুলিপিতে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণকে বুদ্ধের নিম্নলিখিত সাতটি উপদেশ বার বার শ্রবণ ও পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশগুলি- যথাঃ ১। বিনয় সমুকসে, ২। অলিয়সানি, ৩। অনাগত ভয়ানি, ৪। মুনিগাথা, ৫। মোনেয় সুত্র, ৬। উপতিস পসিনে ও ৭। রাহুলোবাদ।

সম্রাট অশোক ভিক্ষুসংঘ পরিশুদ্ধ রাখার জন্য ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। তিনি সংঘ ভেদকদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। যথাঃ ১। সারনাথ ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি, ২। কোসাম্বী ক্ষুদ্র স্তম্ভ লিপি ও ৩। সাঁচী ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি। সম্রাট নিজে রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের জন্য শিলালিপি, অনুশাসন এবং ধর্ম মহামাত্র প্রেরণ প্রভৃতি কার্য করে তাঁর সীমান্ত প্রদেশে বুদ্ধের অনুশাসন ও ধর্ম বিজয়ের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শে সম্রাট অশোকের সীমান্ত রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্তহয়েছিলেন।

উপসংহারঃ

সম্রাট অশোক ও তৃতীয় মহাসঙ্গীতি একটি পুনর্মূল্যায়ন নিবন্ধে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুই শতাধিক বৎসর পর অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে সম্রাট অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্মকে গণজনমুখী করার প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্মের পক্ষে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক ভিত্তি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা ভারতবর্ষের অনাদিকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার বেড়াজাল ছিন্ন করে প্রাতিষ্ঠানিকরূপে গড়ে উঠতে কিছু সময়ের দরকার। বুদ্ধ তাঁর সর্বজ্ঞতা দৃষ্টিতে এই চিন্তা করে সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের পূর্ণবিস্তার হওয়ার ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন। এই ভবিষ্যৎবানীর মূল কারণ কয়েকটার বিভিন্ন দিক উত্থাপন করে আমরা সম্রাট অশোকের সময়ে তৃতীয় মহাসঙ্গীতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। সম্রাট অশোকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা বৌদ্ধধর্মের মত একটি গম্ভীর, দুরতিগম্য, পন্ডিতবেদনীয় ধর্ম মানব হৃদয়ে স্থায়ী থাকার সম্ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়েই ভারতের ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক পরিস্থিতি একটা স্থিতিশীল রূপ লাভ করেছিল। ইহাতে সম্রাট অশোকের অবদান বিভিন্নমুখী। এই দৃষ্টিতে সম্রাট অশোককে বিচার বিশ্লেষণ করতে অনেকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রচারের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে শুধু সম্রাট অশোককেই বিবেচ্য বলে উল্লেখ করেন। সম্রাট অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে বুদ্ধ যেমন ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন, সেইরূপ

মহাকশ্যপ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সম্রাট অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে দুইটি সুবর্ণফলকে তাঁর নাম উল্লেখ করে নিদর্শনও স্থাপন করেছিলেন। তাই আমরা এই প্রবন্ধে সম্রাট অশোকের আবির্ভাবের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট উত্থাপন করে এই কথাই বলতে চাই যে, বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য সম্রাট অশোক ও তৃতীয় সঙ্গীতি ছিল বৌদ্ধধর্মের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক গতিশীলতায় বুদ্ধের ধর্ম দর্শন আপন মহিমায় মহিমান্বিত রাখা।

সূত্র নির্দেশ

১. Points of Controversy or Subjects or Discourse : By-Shwe Zan, Aung and Mrs. Rhys Davids, (P.T.S), London . 1915. p.-1-7.
২. মহাবগগস্থবির, প্রজ্ঞানন্দ, কলিকাতা- ১৯৩৭, পৃ: ১৬।
৩. The Clarifier of the Sweet Meaning By : I.B. Horner (P.T.S), London. 1978 p:390-391.
৪. ভগবান বুদ্ধ-ধর্মানন্দ কোসাম্বী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ: ৭, ২০৯।
৫. মহাপরিনির্বাণ সূত্র-ধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃ: ১৭২, ১৫৮।
৬. মহাবগগস্থবির, প্রজ্ঞানন্দ, কলিকাতা, ১৯৩৭, পৃ: ১৬।
৭. মহাপরিনির্বাণ সূত্র-ধর্মরত্ন মহাস্থবির
৮. Buddhist Sects in India, By : Nalinaksha Dutta, Delhi, 1978 p: 72, 84, 184
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে), কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ১৪৮-১৬২।

কুষাণ রাজাদের ঐশ্বরিকতা : রবাতক লেখ'র সাক্ষ্য

দূর্ব্বা আইন

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কুষাণ বংশীয় শাসন (আ: ৩০-২৯ খ্রী: পূ: ২৪২ খ্রী:)। সমসাময়িককালে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিভিন্ন লেখ ও মুদ্রা থেকে জানা যায় যে কুষাণ শাসকরা একসময় সুদূর ব্যাকট্রা (ব্যাকট্রিয়া) থেকে চম্পা (ভাগলপুর) পর্যন্ত অধিকার করেন (১ম কণিষ্কের সময়)। এই অধিকার দীর্ঘকাল বজায় রাখতে না পারলেও মথুরা পর্যন্ত অবশ্যই কুষাণ অধিকারে ছিল। বলাবাহুল্য, এই বিস্তৃত অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ বাস করত। ফলে শুধুমাত্র সামরিক বা প্রশাসনিক বলের উপর নির্ভর না করে কুষাণ শাসকরা রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখার জন্য এক ভাবাদর্শের প্রচার করেন : তা হল শাসকদের ওপর ঐশ্বরিকতা আরোপ। এই ব্যাপারে রবাতক লেখ এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য।

১৯৯৩ সালে আফগানিস্থানের কাটাঘানের বাঘলান অঞ্চলের রবাতক নামক স্থানে একটি লেখ আবিষ্কৃত হয়। এটি ১ম কণিষ্কের এবং কুষাণ বংশের বৃহত্তম লেখ। এটি থেকে রাজা ১ম কণিষ্কের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা, শাসকীয় ঐশ্বরিকতার দাবী, প্রশাসন সংক্রান্ত, বংশতালিকাগত - ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

ব্যাকট্রিয়ান ভাষায় লিখিত সাদাটে চুনাপাথরে খোদিত এই লেখ'র প্রথম সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন Nicholas Sims-Williams ও Joe Cribb।[১] পরে কিছুটা নূতন পাঠ দেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[২] লেখটির তথ্যাবলীর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ও পূর্বোক্ত গবেষকদ্বয়ের মত ভিন্ন হলেও ঐশ্বরিকতার ক্ষেত্রে এঁরা সহমত।

লেখটির পাঠ অনুযায়ী সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে কণিষ্ক যিনি ঈশ্বর (The God), উপাসনাব যোগ্য (The Worthy of Worship), যিনি ননা (ব্যাবিলনীয় দেবী, যিনি খ্রী: পূ: ১ম শতক থেকে অম্বা বা দুর্গার সমার্থক হয়ে ওঠেন) এবং অন্য দেবতাদের কাছ থেকে শাসনাধিকার পেয়েছেন তিনি প্রথম বর্ষের গণনা শুরু করেন অর্থাৎ সাল গণনা শুরু করেন। কণিষ্ক তাঁর কর্মচারী (NOKONZOKO)[৩] কে নির্দেশ দেন ননার নামে উপাসনালয় তৈরী করতে যেমন শ্রী (Ziri - সৌভাগ্যলক্ষ্মী বা ভাগ্যদেবী)। ফারো (Pharo - রাজার গৌরব ও বৈধতার প্রতীক) এবং উমা (Omma - দুর্গা)-র মূর্তি স্থাপিত হবে। একই সঙ্গে তিনি আহুর মাজদা (জরথুষ্ট্রীয় মতানুযায়ী পৃথিবীর স্রষ্টা), মাজদুয়ানা (কুষাণ রাজত্বের প্রতীক), স্রোশরদা, (সাহসী বীর), নারাশাও (রাজতন্ত্রের মূল ভিত্তি স্বরূপ) এবং কুমার, মহাসেন,

বিশখ মিহির (এঁরা সকলেই কুমার কার্তিকেয়র বিভিন্ন রূপ) - প্রমুখ দেবতার মূর্তি নির্মাণের কথাও ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে বলা হয় তাঁর প্রপিতামহ কুজুলা কদফিসেস, পিতামহ সদ্দশকন (সদশকন)[৪], পিতা বিম কদফিসেস এবং তাঁর নিজের মূর্তি স্থাপিত হবে। এই লেখতে আরও বলা হয়েছে রাজার রাজা, দেবপুত্রের মতানুযায়ী এই উপাসনালয়টি স্থাপিত হয়। পরিশেষে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে উপরোক্ত দেবতাগণ কণিষ্ককে চিরন্তন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিজয়ের আশীর্বাদ করবেন।

সুতরাং এই লেখ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যাচ্ছে যে কুষাণ রাজগণ ঐশ্বরিক রাজাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই নয় Mat (মথুরার কাছে অবস্থিত) ও Surkh-Kotal (বাঘলান, উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান)-এও দেবকুলের পুরাতাত্ত্বিক চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ধরণের 'দেবকুল' কুষাণ সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যেখানে কুষাণ শাসকগণ দেবতারূপে পূজিত হতেন। প্রয়াত কুষাণ রাজা তো বটেই, এমনকি ক্ষমতাসীন কুষাণ শাসকও পূজিত হতেন। চৈনিক সূত্র থেকেও জানা যায় কুষাণ শাসকরা 'স্বর্গের পুত্র' নামে অভিহিত হতেন।

মুদ্রা থেকেও কুষাণ শাসকদের ঐশ্বরিক রাজতন্ত্রের বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। প্রথম কুষাণ শাসক মিয়াওসের মুদ্রায় ক্ষোদিত ছিল 'তুরান্নন্তস' যার অর্থ সেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল "সর্বোচ্চ শাসকের রাজত্বকালে" তিনি নিজেকে মনে করতেন "সর্বোচ্চ শাসক যার ক্ষমতা কোন আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়"। কুজুলা কদফিসেস কখনও নিজেকে 'দেবপুত্র' (এই উপাধিটি চিনা সূত্র থেকে কুষাণরা গ্রহণ করেন), কখনও 'ধর্মপুত্র' বলেছেন। বিম কদফিসেস-এর মুদ্রায় তাঁর যে আবক্ষ অবয়বটি অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি মেঘমালা সম্ভূত, ঐশ্বরিকতায় ভাস্বর। কয়েকটি মুদ্রায় দেখা যায় কুষাণ শাসকের মাথার পিছনে মেঘমালাপুঞ্জ। Mat-এ যে দেবকুলটি পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী এটি বিমের আমলের। সেখানে প্রধানতম পূজ্য ছিলেন তিনি নিজেই অর্থাৎ তাঁর মূর্তি। হুবিষ্কের আমলে এটি পুন:নির্মিত হয় এবং এ থেকে বোঝা যায় এই ধারা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। ১ম কণিষ্কের Kosam,Mat ও Surkh-Kotal-এ প্রাপ্ত লেখতে তাঁকে 'দেবপুত্র' (Bogopouro) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। Shaji-Ki-Dheri Relic Cascet-এ ১ম কণিষ্কের যে মূর্তি খোদিত আছে তাতে দেখা যায় চন্দ্র ও সূর্যের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হচ্ছেন। সূর্য তাঁকে আশীর্বাদ করছেন এবং চন্দ্রের হাতে পুষ্পহার। এ থেকে ড: মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন কুষাণ শাসকগণ চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দেবতাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত বলে মনে করতেন। Kamra (Punjab, Pakistan) লেখতে বাসিস্ককে বলা হয়েছে 'দেবপুত্র' এবং 'দেবমনুষ' (অর্থাৎ মানুষের রূপগ্রহণকারী দেবতা)।[৫] এরই সঙ্গে তুলনা করা যায় মনুসংহিতায় প্রাপ্ত একটি বিখ্যাত আপ্তবাক্যের-'রাজা বালক হলেও কখনও অবমাননাব পাত্র নন কারণ তিনি নররূপে বিরাজমান এক মহান দেবতা।' শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে রাজা নন, রাজ্য বা রাজত্বকেও দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় কণিষ্কেব ও হুবিষ্কের বিভিন্ন মুদ্রা থেকে।

রবাতক লেখ থেকে কুষাণ রাজাদের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাসের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ভাবে

প্রতীয়মান হয়। তবে এই ধারণাটি একেবারে নতুন ছিল না। কারণ সমসাময়িক ও প্রায় সমসাময়িক চৈনিক হান বংশ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রোমক সম্রাটগণ ও কুষাণদের প্রতিবেশী Arsacid শাসকগণ এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুষাণ সম্রাটদের রাজ্যে একতা ও বিশৃংখলা বজায় রাখার জন্য একটি ভাবাদর্শের প্রয়োজন ছিল। বহুধা বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন হত (মৌর্যদের মত, যদিও অশোককেও ভাবাদর্শের ওপর গুরুত্ব দিতে হয়) অথবা প্রয়োজন ছিল রাজাকে সকল শ্রেণীর মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে স্থাপন করা (অর্থাৎ ঐশ্বরিকতার অধিকারী করা) যাতে সকলেই তাঁর আদেশ ঈশ্বরের আদেশ বলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। এই ব্যাপারটি ছিল কুষাণ শাসনব্যবস্থার একটি দিক। কুষাণ রাজাদের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাসের প্রমাণ আরও নানাভাবে পাওয়া গেলেও রবাতক লেখ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

সূত্র নির্দেশ

১. Silk Road Art and Archaeology, Vol. 4; The Inscription of Silk Road Studies, Kamakura.
২. Indian Museum Bulletin, 1995, Vol. XXX.
৩. NOKONZOKO, ১ম কণিষ্কের এই প্রশাসকের নাম হুবিষ্কের সময়কালেও পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় তিনি দীর্ঘকাল ধরে কুষাণ শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
৪. সিমস উইলিয়মস্ ও ক্রিব এই নামটিকে 'বিমতকতু' পড়েছিলেন। কিন্তু ড: মুখোপাধ্যায়-এর মতে এটি 'সদস্কন'। সদস্কন নামে কুজুলার এক পুত্রের উল্লেখ একটি কুষাণ লেখতে পাওয়া যায় (হ্যারল্ড বেইলি, জার্নাল অফ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৩)। সুতরাং ড: মুখোপাধ্যায়ের মতই গ্রহণযোগ্য।
৫. ড: ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য কুষাণ এম্পায়ার', ফার্মা কে.এল.এম., কলকাতা, ১৯৮৮।

বঙ্গদেশে ব্রহ্মোপাসনা

শম্ভুনাথ কুণ্ডু

পৌরাণিক ত্রিমূর্তিবাদের অন্যতম দেবতা ব্রহ্মার উপাসনা বা পূজা আমাদের এই বঙ্গদেশে কেমন ছিল, বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে তাঁর প্রভাব কতখানি ছিল এবং কেনই বা তাঁর পূজা সাধারণ্যে আকর্ষণহীন হয়ে পড়লো সে-বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই এই নিবন্ধের সূত্রপাত। প্রাচীন বঙ্গদেশে এবং বৃহদ্বঙ্গে অদ্যাবধি প্রাপ্ত লেখসাহিত্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহৃদয় পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে ব্রহ্মাকে প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্তা, ধাতারূপে পুরাণগুলিতে কল্পনা করা হয়েছে তাঁকে বিষ্ণু, শিব কিংবা শক্তির মতো তেমন জনপ্রিয় ইষ্টদেবতারূপে অর্চিত হতে দেখি না। অথচ জনগণমনে তিনি যে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত তার পরিচয় লেখসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পূজার জন্য কোন ভক্তসম্প্রদায়ের যেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি তার পূজার্চনার জন্য মন্দিরাদি নির্মাণের সংবাদও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের চন্দ্রবংশীয় নরপতি শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনটি এদিক দিয়ে অনন্যতার দাবীদার। এই বংশের মহাপরাক্রমশালী রাজা শ্রীচন্দ্র (আ. ৯২৫-৭৫ খ্রী:) এই তাম্রশাসনে এক সুবিশাল ভূখণ্ডদানের কথা জানিয়েছেন। তিনপ্রস্থে তিনি ভূমিদান করেছেন শ্রীচন্দ্রপুর-ব্রহ্মপুর বিষয়ে। প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক (১৮০০ একর) ভূখণ্ড দান করেছেন ব্রহ্মা ও তাঁর মঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং চান্দ্রব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য কোন এক বৈয়াকরণ অধ্যাপককেঃ শ্রীশ্রী চন্দ্রপুরাভিধানং ব্রহ্মপুরং পরিকল্প্য/এতস্মিন্ শ্রীচন্দ্রপুরে/ব্রহ্মণে এতন্মধপ্রতিবদ্ধ-চান্দ্রব্যাকরণোপাধ্যায়স্য।[১] ব্রহ্মাপূজার উদ্দেশ্যে মঠনির্মাণের এই বাস্তব তথ্যটি আমাদের সচকিত করে।

শ্রীচন্দ্রের প্রায় একশো বছর পর তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলে (আ. ১০৪৩-৭৩ খ্রী:) নির্মিত গয়া অক্ষয়বট মন্দিরলেখে 'প্রপিতামহেশ্বর' ব্রহ্মার মন্দিরনির্মাণ ও পুননবীকরণের এবং 'গাথেশ', 'কনকেশ্বর', 'অম্বুজভব' প্রভৃতি নামধারী ব্রহ্মার মন্দির নির্মাণের ও উল্লেখ আছে।[২] তারও আগে নয়পালের (আ. ১০২৭-৪৩ খ্রী:) আমলে উৎকীর্ণ গয়া নরসিংহমন্দির লেখ থেকে জানা যায় যে 'বেধা' কর্তৃক গয়াধাম সৃষ্ট হয়েছিল-তাই গয়াধাম "ব্রহ্মপুরী" নামে প্রসিদ্ধ।[৩] এই আমলেরই কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরলেখের দ্বিতীয় শ্লোকে প্রজাপতি ব্রহ্মা গয়াধামের সর্বত্র বিরাজিত বলে উল্লিখিত- "প্রজানাম পতির্যো মধ্যাস্ত ইবাত্মনৈব পরিতো মূর্তিপ্রপঞ্চং দধৎ"।[৪] সুতরাং এটা নিছক অনুমান সাপেক্ষ নয় যে. বৃহদ্বঙ্গের গয়াধামেও ব্রহ্মা একাদশ

শতকে মন্দিরে পূজিত হতেন এবং এখানেও সাম্প্রদায়িক ব্রহ্মাপূজার প্রচলন হয়েছিল যদিও সূর্যোপাসনাই এতদঞ্চলে সমধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

এছাড়া বঙ্গদেশে বা বৃহত্তর বঙ্গে স্বতন্ত্র মন্দিরে ব্রহ্মার পূজার কোন তথ্য আমরা অভিলেখগুলি থেকে পাই না। মন্দির বা মঠনির্মাণের সংবাদ না পেলেও লেখমালার পংক্তিতে পংক্তিতে ব্রহ্মার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আমাদের বিস্মিত করে, যা ব্রহ্মার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি দ্যোতিত করে। উৎসাহী পাঠকদের অবগতির জন্য কালানুক্রমিকতার নিরিখে তা উপস্থাপিত করলাম।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার (আ ৬০০-৫০ খ্রী:) নিধনপুর তাম্রশাসনে 'কমলসম্ভব' ব্রহ্মা জগতের উদয় ও অস্তরূপে কল্পিত-"জগদুদয় কল্পনাস্তময়হেতুনা ভগবতা কমল সম্ভবেন" (পংক্তি৩৪)।[৫]

নারায়ণ পালের (আ. ৮৬০-৯১৭ খ্রী:) আমলে বাদাল গরুড়স্তম্ভ লেখে দর্ভপানি বেদচতুষ্টয়রূপ মুখপদ্মলক্ষণান্বিত কমলযোনি ব্রহ্মারূপে বর্ণিত।[৬] লড়হচন্দ্রের (আ. ১০০০-২০ খ্রী:) ময়নামতী শাসনে 'স্বভূ' ব্রহ্মা কর্তৃক বারাণসীতে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের পুরাকাহিনী লিপিবদ্ধ-"সাক্ষাদক্ষতধীর ষষ্ঠ দশভির্যত্রাশ্বমেধৈঃ স্বভূঃ" (পং২৯)।[৭] গোবিন্দচন্দ্রের (আ. ১০২০-৫৫ খ্রীঃ) ময়নামতী শাসনের চতুর্থশ্লোকে 'বাগীশ' ত্রিমূর্তিবাদের অন্যতম মূর্তি এবং ষোড়শ শ্লোকে তিনি 'স্বয়ম্ভু'- "স্বয়ম্ভুঃ সৃজতু প্রকামম্"।[৮] নয়পালের (আ. ১০২৭-৪৩ খ্রী:) রাজত্বকালীন মূর্তিশিবের বাণগড় প্রশস্তিতে তিনি 'ধাতা' রূপে উল্লিখিত।[৯]

বর্মনরাজ হরিবর্মার (আ. ১০৭৩-১১২৭ খ্রী:) মহামন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে তিনি ত্রিমূর্তির অন্যতম মূর্তি 'বিরিঞ্চি'-"স জজ্ঞে যজ্ঞপুরুষো বিরিঞ্চি হরয়োরিব"।[১০] ভোজবর্মার (আ. ১১৩৭-৪৫ খ্রী:) পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত বেলাব তাম্রশাসনে বাগব্রহ্মাময়রূপে কল্পিত হয়েছে - "শ্রীমজ্জয়ন্নিব বাগ্ ব্রহ্মময়ানন্দ-মহাদধৌ" (শ্লো. ২১)।[১১] বৈদ্যদেবের (আ. ১১২৮-৩৫ খ্রী:) উত্তরপ্রদেশের কমৌলিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, পদ্মজন্মা ব্রহ্মাব চতুর্মুখে বিরাজিতা সরস্বতী-"পয়োজজন্মাস্যচয়ভ্রমবশাৎ যদাস্য-পদ্মেষু সুখং গিরাস্থিতম্।"[১২]

সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের (আ. ১০৯৬-১১৫৯ খ্রী:) দেওপাড়া প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরলেখে সৃষ্টিকর্মের কর্তারূপে ব্রহ্মা পৌরাণিক ত্রিমূর্তির অন্যতমরূপে কীর্তিত - "ঐকৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে কশ্চিদ্বন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ" (শ্লোক. ১৮)।[১৩] তৎপুত্র বল্লালসেনের (আ. ১১৫৯-৭৯ খ্রী:) নৈহাটি তাম্রশাসনে ব্রহ্মার হংস শ্রেণীবিলাসোজ্জ্বলিত বাসভূমির উল্লেখ আছে।[১৪] বিশ্বরূপ সেনের (আ. ১২০৬-২৫ খ্রী:) সাহিত্যপরিষদ্, মদন পাড়া এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে ব্রহ্মা 'বাগীশ্বর' অভিধায় অভিহিত। ত্রিবেণী তীরে অর্থাৎ প্রয়াগে 'কমলভব' ব্রহ্মার যজ্ঞসম্পাদনের উল্লেখ উক্ত তিনটি শাসনে দৃষ্ট হয়।[১৫] রাজা গোবিন্দ কেশবদেবের (আ. ১২২০-৩০ খ্রী:) ভাটেরা তাম্রশাসনের প্রারম্ভিক শ্লোকে ত্রিমূর্তিকল্পনায় ব্রহ্মার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। যদিও এই শাসনে জগতের মঙ্গলের জন্য শিবই ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা, উপেন্দ্র এবং মহেশ্বর নাম গ্রহণ করেছেন।[১৬]

লেখ পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু। কমলভব, পদ্মযোনি; তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, প্রজাপতি; তিনি বাগীশ, বাগীশ্বর। তিনি চতুর্মুখ, তাঁর চতুর্মুখে চতুর্বেদ ও বাগেদবী সরস্বতী সমাসীনা। তিনি গয়াধামের স্রষ্টা এবং বারাণসীতে তিনি দশাশ্বমেধযাজ্ঞী। সর্বোপরি, তিনি ত্রিমূর্তিবাদ তত্ত্বে স্রষ্টারূপে বন্দিত। ব্রহ্মার এই অভিধাগুলি (Epithets) সর্বৈব পৌরাণিক ব্রহ্মার নাম, রূপ ও কীর্তির পরিচায়ক। বিষ্ণুপুরাণে (৪।১।৪) স্বয়ম্ভু বা স্বভূ ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির মানসে আবির্ভূত হন। কূর্মপুরাণের পূর্বভাগে (৬।২৭-২৮) উপাখ্যানের মাধ্যমে কথিত হয়েছে যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর উদরে প্রবেশ করে অনন্তদর্শন করতে থাকলে বিষ্ণু তাঁর সমস্ত দেহের দ্বার অবরোধ করেন। ব্রহ্মা যোগবলে পুষ্কর (পদ্ম) থেকে নিজরূপ উদ্ধার করেন বলেই তিনি পদ্মযোনি, কমলসম্ভব। বিভিন্ন পুরাণে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।[১৭] বামন, কূর্ম, পদ্ম, শিব, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা কিভাবে চতুর্মুখ হলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[১৮] বাগীশ্বররূপে ব্রহ্মা ভাগবত পুরাণে (৩।১২।২৩), পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪২।৮৪) উল্লিখিত। বাগীশ্বরীরূপিণী সরস্বতী ও ব্রহ্মার চতুর্মুখাম্ভোজবিহারিনী। আলংকারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মার এই পৌরাণিক রূপকল্পটি গ্রহণ করেছেন। বারাণসীতে ব্রহ্মার দশাশ্বমেধযজ্ঞের পুরাকাহিনী ও পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (১৬ অধ্যায়) দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মাকেন্দ্রিক পৌরাণিক কীর্তিকাহিনীগুলি জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখকবিরা সেগুলিরই অনুবর্তন করেছেন বলে অনুমিত হয়। কিন্তু বৈদিক দেবভাবনায় ব্রহ্মার যে রূপ, গুণ ও কীর্তির কথা জানা যায় তা পৌরাণিক ব্রহ্মার মধ্যে অস্পষ্টভাবে, পরিবর্তিতভাবে থাকলেও পৌরাণিক ব্রহ্মা বহুলাংশে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্-ঋত্বিক্ বিশেষ। ডঃ যোগীরাজ বসু ব্রহ্মন্ শব্দে 'সকল পুরোহিত' অর্থ করেছেন।[১৯] এই ব্রহ্মন্-ই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বকর্মা, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতি প্রভৃতি নামে অভিহিত। কেউ কেউ আবার মনে করেন, এই ব্রহ্মন্ পুরোহিতরাই ব্রাহ্মণাচ্ছংশিন্ নামে অভিহিত হতেন। ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে বলা না হলেও যজুর্বেদ বা অথর্ববেদে ব্রহ্মা বলতে যাজক শ্রেণীকেই বোঝাতো।[২০] একথা ঠিক যে, কোন বেদেই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তারূপে আমরা পাই না। তবে ঋগ্বেদে ব্রহ্মাকে প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে কল্পনা করা হয়েছে যা তাঁর স্রষ্টারূপেরই দ্যোতক। যাস্কাচার্য বৃহস্পতিকেই ব্রহ্মা বলেছেন- "বৃহস্পতির্ব্রহ্মাসীৎ"। তবে প্রজাপতি নামধারী ঋষি ব্রহ্মা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে চার দেবতার অন্যতম দেবতারূপে স্তুত হয়েছেন সন্ধ্যাহ্নিক মন্ত্রে-"প্রজাপতির্ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়বগ্নিসূর্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণাযামে বিনিয়োগঃ"। ঋগ্বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা অগ্নি যেমন একদিকে পুরোহিত, ঋত্বিক, অন্যদিকে তিনি দেবতাও। ঠিক তেমনি ব্রহ্মা ঋত্বিক্, পুরোহিত, ঋষিরূপে বন্দিত হলেও দেবতারূপেও অর্চিত হতেন। বৈদিক ব্রহ্মার ঋষিত্ব, ঋত্বিকত্ব ও দেবত্ব-এই ত্রিবিধ সত্ত্বাব রেশটুকু পৌরাণিক ব্রহ্মা মূর্তিকল্পনায় দৃষ্ট হয়।[২১]

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মা দেবতারূপে প্রাধান্য অর্জনে সমর্থ না হলেও পরবৈদিক ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্ সাহিত্যে তিনি অন্যতম প্রধান দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে তিনি মনুষ্যাদি জীবজন্তুর স্রষ্টা। শ্বেতাশ্বেতর (৪।১২) ও মহানারায়ণ উপনিষদে (১।১২) তিনি দেবতাদের মধ্যে অগ্রজন্মা - তিনি এখানে হিরণ্যগর্ভ। মৈত্রায়নী উপনিষদে

(৬।৮) তিনি হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বস্রষ্টা - "প্রজাপ্রতির্বিশ্বসৃক্ হিরণ্যগর্ভঃ"। কৌষিতকী উপনিষদে (২।৪) তাঁর পৌরাণিকরূপটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এখানে ব্রহ্মা পঞ্চমুখ - "পঞ্চমুখো সীতি প্রজাপতিঃ"। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ - আবণ্যক উপনিষদ পাড়ি দিয়ে পৌরাণিক ব্রহ্মার উত্তরণের ধারাটি এই আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

পৌরাণিক ব্রহ্মা শুধু বঙ্গদেশে কেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। প্রবাদ আছে যে রাজস্থানের আজমীর প্রদেশে অবস্থিত পুষ্করেব সাবিত্রী পাহাড়ের মন্দির ছাড়া আর কোথাও নাকি ব্রহ্মার মন্দির নেই। একথা ঠিক নয়। কানিংহাম বুন্দেলখণ্ডে দুভাহি গ্রামে একটি ব্রহ্মার মন্দির আবিষ্কার করেন।[২২] রাজস্থানের বসন্তগড়ে, ধারওয়ার জেলার উষ্কল গ্রামে ব্রহ্মার মন্দির আছে। ইন্দোরের ১৬ মাইল উত্তরে খেড়্-ব্রহ্ম নামক স্থানেও একটি বিশাল কারুকার্য শোভিত ব্রহ্মার মন্দির আছে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবরের পূর্ব পার্শ্বে ঘাটের দিকে একটি ব্রহ্মামন্দিরের সংবাদ পাওয়া যায়। তাছাড়া ময়ূরভঞ্জে শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণেরা সূর্যমন্দিরেই ব্রহ্মাপূজা করতেন বলে ভারততত্ত্ববিদ্ নগেন্দ্র বসু জানিয়েছেন।[২৩] একথা সহজেই অনুমেয় যে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ব্রহ্মামন্দির অত্যন্ত স্বল্প যা তাঁর জনপ্রিয়তার লাঘবত্বেরই পরিচয় বহন করে।

পৌরাণিক অন্যান্য দেবদেবীর তুলনায় ব্রহ্মা তাঁর মহিমা বজায় রাখতে পারেননি বিশেষ করে পরবর্তীকালে। অথচ পুষ্করেব ব্রহ্মামন্দিরের কথা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের নাসিক শিলালেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত। অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের সমসাময়িককালে ব্রহ্মা তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতাদের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তার জন্য ব্রহ্মাপূজা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। বঙ্গদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে দশম-একাদশ শতকে চন্দ্ররাজাদের আনুকূল্যে ব্রহ্মার মঠ নির্মাণ কিংবা গয়াধামের ব্রাহ্মণ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রহ্মাকেন্দ্রিক পূজার্চনার একটা আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মার পূজা কেন স্তিমিত হয়ে গেল তা নিয়ে নানা মত, নানা কাহিনী, নানা যুক্তি আছে। পুরাণগুলিতে ব্রহ্মার পূজালোপের কারণ হিসাবে নানা কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। সেগুলি হোল মোহিণী শাপ, শিবের শাপ ও সাবিত্রীর অভিশাপ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (৩৩ অধ্যায়) কথিত আছে যে মোহিনী নাম্নী স্বর্গবেশ্যা ব্রহ্মাকে কামনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মা শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেন। ক্রুদ্ধা প্রত্যাখ্যাতা মোহিনী তাঁর পূজালোপের অভিশাপ দেন।

মহাদেবের অপার্থিব জ্যোতির্লিঙ্গের আদি-অন্ত নিরূপণে মিথ্যাচার করায় শিব ব্রহ্মাকে তাঁর পূজা লোপের অভিশাপ দেন।[২৪] আবার, পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (১৬ অধ্যায়) কথিত আছে যে সাবিত্রী ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে আসতে বিলম্ব করলে বিরক্ত ব্রহ্মা সাবিত্রীর পরিবর্তে গোপকন্যা গায়ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ব্রহ্মার এই আচরণে ক্ষুব্ধা সাবিত্রী তাঁর পূজালোপের অভিশাপ দেন।

এই অভিশাপ বৃত্তান্তের আড়ালে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে তা হোল বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের প্রবল জনপ্রিয়তা জনগণকে তাঁর প্রতি বহুলাংশে উদাসীন করে তুলেছিল। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাপূজা মূলতঃ বেদবিহিত আচার-অনুষ্ঠাননির্ভর পূজা। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় তার কিছুটা

আভাস মেলে। এখানে নির্দেশ আছে যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মার মূর্তি প্রতিষ্ঠার অধিকারী এবং এই প্রতিষ্ঠাকার্যটি বিপ্রগণই স্ববিধি অনুসারে করবেন। ভাষ্যকার উৎপল এই স্ববিধি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বেদ-বিহিত কর্মই স্ববিধি। তাই ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক সময় ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ভক্তসম্প্রদায়ের মত সম্প্রদায় গঠনের প্রচেষ্টা শুদ্ধ বেদাচারী ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল যা ফলপ্রসূ হয়নি।[২৫] সঙ্গত কারণেই মনে হয় যে, সাধারণ মানুষ শুদ্ধাচারনিষ্ঠ বেদবিহিত উপাসনাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তিনি কেবল সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণীব দেবতারূপে পূজিত হতেন - সাধারণের দেবতা হয়ে উঠতে পাবলেন না। অধিকন্তু, ব্রহ্মাপূজায় যথেষ্ট সদাচার ও পবিত্রতা রক্ষার কঠোরতার জন্য, বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠানেব জন্য সাধারণ্যে এই পূজা জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত: শক্তিদেবতা ছাড়া কোন দেবতা নরনাবীর হৃদয়জয়ে সমর্থ হয়নি। লক্ষ্মী-নারাযণ, উমা-মহেশ্বর যেভাবে আপামর জনসাধারণের ধর্মীয় চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল সাবিত্রী ও সরস্বতা সহ ব্রহ্মা তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি। কারণ সরস্বতী নারায়ণের বক্ষোলগ্নারূপেই সমধিক পরিচিতা, ব্রহ্মাশক্তিরূপিনীরূপে নয়। প্রেমঘন রস সঞ্চারে এই আচাবনিষ্ঠ বৈদিক দেবতাটি একান্তভাবেই অসফল। তাই ক্রমশ: তাঁর পূজা সংকুচিত হতে হতে বিবাহের কুশণ্ডিকা মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দান কালে, সাবিত্রীমন্ত্রে, গৃহদাহকালে অভিষ্ঠুত হতে থাকল। কার্যত: ব্রহ্মা অগ্নির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সূত্র নির্দেশ

১. Sircar. D.C., Epigraphic Discoveries in East Pakistan, Calcutta, 1973, p. 67 (Appendix).
২. Epigraphic Indica. Vol. xxxvi, p. 89.
৩. OP. Cit., pp. 86 ff.
৪. মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, পৃ. ১১২।
৫. ভট্টাচার্য, পদ্মনাথ, কামরূপশাসনাবলী, বংপুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫।
৬. মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, তদেব, পৃ. ১২।
৭. Sircar. D.C , Op.cit. p. 72 (Appendix)
৮. Op Cit , p. 77 (Appendix).
৯. সরকার, দীনেশচন্দ্র, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৯১.
১০. Majumdar, N.G , Inscriptions of Bengal, Vol. III, Rajshahi, p 33.
১১. Op.Cit. p. 20
১২. মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, তদেব, পৃ. ১৩৩।
১৩. Majumdar, N.G., Op. Cit. p 48.
১৪. Op. Cit., p. 72.
১৫. Op. Cit., pp. 140 ff., 177 ff., 133 ff
১৬. যঃ সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভজতি ত্রৈগুণ্যভেদাশ্রিতো।

ব্রহ্মোপেন্দ্রমহেশ্বরেতি জগতামীশায় তস্মৈ নমঃ ।।

১৭. মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮১ অধ্যায়; বরাহ পুরাণ, ২য় অধ্যায়।

১৮. বামন পু. ২।৩৩-৩৫; কূর্ম পু. উপরিভাগ, ২০ অধ্যায়; পদ্ম পু. সৃষ্টিখণ্ড, ১৪ অধ্যায়।

১৯. বসু, যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৯।

২০. Macdonell, A.A., & Keith, A.B., Vedic Index, Varanasi, 1958, Vol II, p 77.

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন, 'ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা', সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৮, পৃ. ১০৯।

২২. Cunningham, A.S.R., Vol. X, p 109

২৩. গঙ্গোপাধ্যায়, মনোমোহন, তদেব, পৃ. ১১৮।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১০-১১।

২৫. তদেব, পৃ. ১০।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দুর্গাপ্রতিমা : কিছু প্রশ্ন

শুভজিৎ দাশগুপ্ত

সূচনা

ভারতীয় প্রত্নকথার (Mythology) অন্যতম আকর উৎস হল পুরাণ। দেবী দুর্গার মহিষাসুরবধ একটি অতি পরিচিত পৌরাণিক কাহিনী। দৈত্য বিপ্রচিত্তির কন্যা মাহিষ্মতীর গর্ভে প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন রম্ভ (মতান্তরে রুরু) দৈত্যের পুত্র। মায়াবী এই অসুর ছিলেন পারদর্শী কূটযোদ্ধা। ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করতে পারতেন। যৌবনে উপনীত হয়ে মহিষাসুর ইন্দ্রের অমরাবতী (দেবলোক) আক্রমণ করেন। বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হন। দেবতাদের যাবতীয় কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত হীনবল (অস্তংগমিত মহিমা) হয়ে তাঁরা ইতঃস্তত বিচরণ করতে থাকেন। অপ্রতিহত প্রতাপ মহিষাসুর ভোগসর্বস্ব স্বৈরাচারে লিপ্ত হন। ত্রিভুবন তাঁর ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিরুপায় সুরবৃন্দ কমলযোনি ব্রহ্মাকে পুরোগামী করে হরিহরের শরণে গমন করেন। তাঁদের দুর্গতি দেখে দেবত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। ক্রমে ক্ষুব্ধ দেবমণ্ডলীর দেহজাত অতুল তেজোরাশি অতুলনীয়া এক নারীমূর্তি পরিগ্রহণ করে। মহাশক্তিস্বরূপা সেই দেবীকে পেয়ে শোকে মুহ্যমান দেবতাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার ঘটে। তাঁরা উপযুক্ত বস্ত্রাভূষণে ও বিবিধ আয়ুধনিচয়ে দেবীকে সুসজ্জিত করেন। দিবাকর দেবীর দেহে নিজরশ্মি সন্নিবিষ্ট করেন। নগাধিরাজ হিমালয় উপহার দেন বাহন সিংহ। দেবতাদের আশ্বস্ত করে সিংহবাহিনী ভাস্বতী দেবী যুদ্ধে অবতীর্ণা হন। দীর্ঘ দ্বৈরথ সমরে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবতারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করলে ত্রিভুবনে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে।

তুলানামূলক বিশ্লেষণ

আবহমান কাল ধরে দেবাসুরযুদ্ধের এই অভিনব কাহিনী গভীর তাৎপর্য বহন করে চলেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য অংশে (অধ্যায় ৮১-৯৩) এই কাহিনীর অপূর্ব বর্ণনা আছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা দেবী ভাগবতে আরো সুবিস্তৃতভাবে কাহিনীটি বলা হয়েছে। মহাভারতের বিরাটপর্বে আকারে ইঙ্গিতে এই কাহিনীর উল্লেখ পাই (যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্গাস্তব)। এখানে দেবী 'খড়গ খেটকধারিণী, বিন্ধ্যপর্বতনিবাসিনী ও মহিষসৃক'[১] অর্থাৎ মহিষ শোণিত প্রিয়া। তাঁর বিপুল বাহু শত্রুবধে উদ্যত। এর থেকে তাঁর রণরঙ্গিনী রূপের

কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্তিতে দেখি, দেবী ঠিক সিংহবাহিনী নন, তিনি সিংহোপরি দণ্ডায়মানা। তাঁর দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে আরোপিত। বামপদের প্রান্তভাগ অসুরের স্কন্ধ ও গ্রীবাসন্ধিকে স্পর্শ করেছে। দেবীর শূল অসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করেছে। অসুরে-র কটিদেশ বাহন সিংহের দ্বারা আক্রান্ত। অসুরের পার্শ্বভাগ দেবীর নাগপাশে আবদ্ধ। অদূরে মহিষের ছিন্নমুণ্ড রক্তাপ্লুত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে সদ্যই। দেবীর দাঁড়িয়ে থাকাব ভঙ্গী একটি জয়সূচক মুহূর্তেব প্রতীক। দেবী মাহাত্ম্য অনুসারে, "এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্ / পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ"- দেবী এই কথা (অর্থাৎ প্রাগুক্ত সাবধানবাণী) বলে উল্লম্ফনপূর্ব্বক সেই মহাসুরের দেহে আরোহন করলেন এবং তাঁকে পদতলে পিষ্ট করে শূল দ্বারা তাঁর কন্ঠ (সংলগ্ন) অংশে আঘাত করলেন (২'চরিত্র, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক।) অল্পবিস্তর তফাৎ উপেক্ষা করলে এটাই দেবীর প্রচলিত রূপ।

প্রশ্ন হল, মূর্তিশিল্পের (Iconography) বিবর্তনের ধারায় কখন এই রূপটি আত্মপ্রকাশ করে ? এই রূপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী ? কেনই বা মহিষমর্দ্দিনীর অন্য সব রূপভঙ্গিমার চেয়ে এই রূপটিই ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে গৃহীত হয় ?

দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩.৭) মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির উল্লেখ আছে। মেধস মুনির মুখে দেবী মহামায়ার বৃত্তান্ত শুনে সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধির মনে দেবীকে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা জাগে। উভয়ে তখন নদীতীরে মাটি দিয়ে দেবীর মহীময়ী (মৃন্ময়ী) মূর্তি গড়ে তাঁর যথাবিহিত পূজা করেন :

"তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যা; কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণা চক্রতুতস্যাঃ পুষ্প ধূপাগ্নিতর্পনৈঃ ।।"

দেবীর এই মূর্তি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্তি ছিল কি না, তা অবশ্য জানা যায় না। তবে পুরাণ-সাহিত্যে মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পূজার এটি অন্যতম উল্লেখ। আধুনিক যুগের হিন্দুধর্ম যেহেতু মূলত: পুবাণ প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থনির্ভর, তাই দেবীপূজার এই পৌরাণিক প্রথা আজও অব্যাহত।

মহিষমর্দ্দিনী দেবী (দুর্গা)'র প্রাচিনতম মূর্তিগুলি রাজস্থানের টঙ্ক (Tonk)জেলার উনিয়ারা অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। মৃৎ ফলকে উৎকীর্ণ এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের। দেবী এখানে খালি হাতেই মহিষ (মহিষাকৃতি দানব) মর্দন (পিষ্ট, চূর্ণ) কবছেন। মথুরার পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় কুষাণ আমলের প্রায় অনুরূপ কিছু মূর্তি সংরক্ষিত আছে। দেবী এখানে এক হাতে মহিষের পৃষ্ঠদেশ মর্দন ও অন্য হাতে সজোরে তার জিভ টেনে বের করছেন। আকর্ষণের এই বিশেষ ভঙ্গীকে সংস্কৃতে 'উৎকীলন' বলা হয়। দেবী বগলামুখীর তন্ত্রোক্ত ধ্যান অনুযায়ী তিনি 'শত্রুজিহ্বা উৎকীলনকারিণী':-

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমন্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
. দেবীং ভজামি ধৃত মুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্।।

-'যিনি অমৃত সমুদ্রে রত্নময় পীঠিকায় উপবিষ্টা, সিংহাসন-আরুঢ়া, পীতবর্ণা, পীতাম্বরা

ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা, মুদ্গার ও শত্রুজিহ্বা ধারিণী সেই দেবীকে ভজনা করি।'

তন্ত্রমতে বগলামুখী বশীকরণক্রিয়া ও স্তম্ভনক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেব। দেবীমাহাত্ম্যে দেখি, ছিন্নমুন্ড মহিষের দেহ হতে নির্গমনশীল অসুর দেবীর তেজে স্তব্ধ (স্তম্ভিত) হল-"অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ।।"[১১] [২'য় চরিত্র, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোকার্দ্ধ ৪১]। সেক্ষেত্রে হয়ত মথুরার মহিষমর্দ্দিনী মূর্তির মধ্যে আমরা বগলামুখী সংক্রান্ত তান্ত্রিক ধারণার একটা ক্ষীণ পূর্বগামিনী ছায়া লক্ষ্য করছি। গুপ্ত যুগের অন্তিম লগ্নে অথবা গুপ্তোত্তর যুগে চামুন্ডার সঙ্গে কালীর অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। সমকালীন বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরানে চামুন্ডাকে 'সর্বসত্ত্ববশঙ্করী' (সর্বজীব-বশীকরণ শক্তির অধিকারিণী) বলা হয়েছে। এটি তাঁর তান্ত্রিক চরিত্রের পরিচায়ক। চামুন্ডাব সঙেগ যুক্তহয়ে কালীতন্ত্র সাধনার আবর্তে চলে আসেন। দুর্গার ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু ঘটে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই।

গুপ্ত যুগের মহিষমর্দ্দিনী মূর্তির মধ্যে ভীলসা (বিদিশা)'র নিকটবর্তী উদয়গিরি গুহা, ভিটা ও ভদ্রকালী থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত অঞ্চলটি রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার অন্তর্গত। এখানে মৃৎফলকে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে চর্তুভুজা দেবীকে শূলদ্বারা মহিষ বধ করতে দেখা যায়। গুপ্ত যুগের মূর্তিগুলিব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, দেবীর বাহন সিংহ ও দেবীব হাতে অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি। এসময় দুর্গা (অম্বা)'র সঙ্গে ক্ষাত্র রাজশক্তির দৃঢ় যোগাযোগ ঘটে। সিংহ এবং অস্ত্র হল রাজকীয় ক্ষমতার অভিজ্ঞান (insignia)। সম্প্রতি মাদাম বিয়ার্দ (Madeleine Biardeau) প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ দেবী ও রাজশক্তির সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। গুপ্তবংশীয নৃপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও মহিষী কুমারদেবীব নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার গৌণদিকে (Reverse) এক পাশ হস্তা সিংহবাহিনী দেবীকে দেখা যায়। এ্যালান, আল্‌টেকর্ (A. S. Altekar) প্রমুখ পন্ডিতগণ এঁকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী অম্বা (দুর্গা) রূপে চিহ্নিত করেছেন। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই দেবীকে গুপ্ত বংশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিভূ বলে মনে করেছেন। বোধহয় গুপ্তযুগ থেকেই সিংহবাহিনী কুষাণ মুদ্রার দেবী ননা (Nana) ও ভাগ্যদেবী শ্রী (the Goddess o Fortune) সমন্বিত এক মহাদেবীর সঙ্গে রাজশক্তির সম্পর্ক ঘটে যায়। বাজশক্তির যে দণ্ডদানের ক্ষমতা (Coercive Power) ও বিজয়গৌরব রয়েছে, দানব-দলনী দুর্গা তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনা। পশুরাজ সিংহ বহুযুগ ধরেই রাজচিহ্ন রূপে স্বীকৃত। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে আমরা 'হর্যঙ্ক' (হরি+অঙ্ক সিংহ চিহ্নিত) রাজবংশের উল্লেখ পাই। অশোক স্তম্ভের সিংহ চতুষ্টয় তো জগতবিশ্রুত। মহিষ মর্দ্দিনী মূর্তিতে দুর্গাপূজার যে প্রসার, তার পিছনেও ছিল রাজ অনুগ্রহ। প্রবাদ বলে, দুর্গাপূজা কলির অশ্বমেধ। অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি (রাজা অথবা ভূস্বামী) ব্যতিরেকে এই পূজার সম্বাৎসরিক খবচ যোগান দুঃসাধ্য ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে ষোড়শ শতকে অধুনা রাজসাহী জেলা (বাংলাদেশ) র অন্তর্গত তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা করেন। এই ঘটনা সত্য কি না জানি না, তবে পূজাটি যে ব্যয় সাপেক্ষ তা সকলেই জানেন।

পরিশিষ্ট

ইতিহাস ও পুরাণের প্রেক্ষাপটে দুর্গামূর্তির প্রত্নসাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূল দেবীকল্পনার মধ্যে উর্বরতা-সংক্রান্ত বিশ্বাস অথবা আচারের বীজ (Fertility Cult) — উপ্ত থাকলেও দেবীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ ক্রমশঃ ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রতিনিধিস্থানীয় এক কাহিনী হয়ে পড়ে। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে পড়েন গ্রীক আথেনা প্রমাকস্-এর মত (Athena Promachos) যুদ্ধের জয়দাত্রী অথবা বিজয়দায়িনী (Nike) দেবী। দেবীমূর্তির মধ্যে তন্ত্রোক্ত বগলামুখীর যে ছায়া পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, সেটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয়ে. অসুরের বিরুদ্ধে দেবী'র জয় অশুভ যাদুকরী শক্তি (Black Magic)'র বিরুদ্ধে মঙ্গলময় যাদুশক্তি (অথর্বন্)-এর জয়কে সূচিত করছে। এই জয়ের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসাবে প্রকৃতির সমস্ত উপদ্রব শান্ত হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী হয়ে উঠছে মধুময়। নানা বাধা ও বিপদের ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে জীবনের উত্তরণ ঘটছে আলোকে ও আনন্দে। প্রত্নকথার (Mythology) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নৈসর্গিক মহাবিশ্বে ইতিবাচক শক্তিগুলির অবধারিত বিজয় সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করা। দেবীর দানব-দলনের মধ্য দিয়ে প্রত্নকথার এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়েছে বলেই দেবীর মহিষ মর্দ্দিনীমূর্তি এত জনপ্রিয় হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১. ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শক্তির রূপ : ভারতে ও ম া এশিয়ায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪-৫৭।
২. শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূজা-পার্বণ. শা[illegible], বঙ্গাব্দ ১৩৫৮ আশ্বিন।
৩. পূর্ব্বা সেনগুপ্ত, দুর্গা : রূপে রূপান্তরে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৮।
৪. John Stratton Hawley and Donna Marie Wulff (eds.), Devi : Goddesses of India, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1998 (Ref. Dr. Thomas B. Coburn, Devi : The Great Goddess, p. 31-48).
৫. Dr. Thomas B. Coburn, Encountering the Goddess : A Translation of the Devi-Mahatmya and a study of its Interpretation, Albany : State University of New York Press, 1991.
৬. Bhagwant Sahai, Iconography of Minor Hindu and Buddhist Deities, Abhinav Publications, 1975.
৭. M C.P. Srivastava, Mother Goddess in Indian Art, Archaeology and Literature, Agam Kala Prakashan, Delhi, 1979.
৮. Larry D. Shin, "The Goddess : Theological Sign or Religious Symbol ?" Numen 31, no 2. (1984), p. 175-98.
৯. David R. Kinsley, Hindu Goddesses : Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkely : University of California Press, 1986.
১০. শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) শ্রীশ্রী চণ্ডী, ঋদ্ধি ইন্ডিয়া, ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৯০।
১১. স্বামী দিব্যানন্দ, তন্ত্ররহস্য, ক্যালকাটা গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮১।
১২. সুকুমার সেন. ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ইং ১৯৯২ সন।

দেবী কালী : তার উদ্ভব ও অস্তিত্ব

সুমিত বিশ্বাস

কালী বাঙালিদের অতি আপন দেবী। তিনি সমগ্র পূর্ব ভারতে সর্বাধিক পূজিতা বিগ্রহ। দেবী দুর্গা বছরে একবার আসেন কিন্তু কালী পূজোপাওয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠ দেবী। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে শশীভূষণ দাশগুপ্তের "ভারতেব শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃত করে বলাই ভাল যে "পার্বতী, উমা, সতী এবং চণ্ডীকা-দুর্গার দ্বারা মিলিয়া পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই তার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি নতুন ধারা তাহা হইল কালীকা বা কালী দেবীর রাধা। এই দেবী বাংলাদেশের শক্তির সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্যসব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন।"

ঋগ্বেদে রাত্রি সূক্তকে অবলম্বন করে পরে এক রাত্রি দেবীর রূপ কল্পনা করা হয়, সেই রাত্রি দেবীই পরবর্তীকালে কালী রূপ ধারণ করে। বেদের এই রাত্রি দেবীর সঙ্গে এক কৃষ্ণা ভয়ঙ্করীদেবীর উল্লেখ পরবর্তী বেদ গুলোতে পাওয়া যায় যার নাম নির্ঋতি। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে আমাদের বর্তমান কালীদেবী দেবী নির্ঋতির রূপান্তর মাত্র। সামবেদের কেনোপনিষদে পাওয়া যাচ্ছে যে দেবী উমা হৈমবতী অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী তার শক্তিতে দেবগণ শক্তিশালী এবং তিনি ব্রহ্মের চালিকা-শক্তি। সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে ভদ্রকালী নামক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হিরণ্যকেষী গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী দেবী ভবানী ধ্বংসের দেবী। যজুর্বেদের কাজসনিয়ী সংহীতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী, আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। সম্ভবত এই সময় থেকে দেবীর সঙ্গে রুদ্রের ধ্বংসের স্বভাব এক করে দেওয়া হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবীকে কৃষ্ণা এবং ঘোরা বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবীকে পাশহস্তা বলা হয়েছে আবাব মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীকেও বলা হয়েছে "বিনিষ্ক্রান্তসিপাশিনী" অর্থাৎ.যিনি দশ হাতে বেরিয়ে এসেছেন। মন্ডপ উপনিষদে দেবী কালীকে যজ্ঞের অগ্নীর সপ্তজিহ্বার একটি বলে মানা হয়-

> কালী করালী চমনোজবাচ।
> সুলোহিতা যা চসুধূম্রবর্ণা।।
> স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী।
> লোলায় মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।।

দেবীর উল্লেখ আমরা পুরাণ গুলিতে অধিকভাবে পাই, তার মধ্যে কালীকা পুরাণ, দেবী

ভাগবত, মার্কন্ডেয় পুরাণ, দেবী পুরাণ উল্লেখযোগ্য। মার্কন্ডেয় পুরাণে প্রথম অধ্যায় (৬০-৯০/৬০-৯০) পর্যন্ত যখন মধুকৈটভ বধ পর্ব চলে তখন আমরা ব্রহ্মাকে বিষ্ণুযোগনিদ্রাধিশ্বরী জগতের স্থিতিসংহারকারিণী যোগনিদ্রা কালরাত্রি দেবীর স্তব কবেন ও বলেন —

"ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা, ত্বংহি
বষট্ কারঃ স্বরাত্মিকা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিররূপাত্বং স্থিতিরূপা
চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।।"

অর্থাৎ তুমি স্বাহা, স্বধা ও বষট মন্ত্র, তুমি সৃষ্টি কর স্থিতিরূপ পালন কর আবার অন্তে তুমি কালকে গ্রাস কর।

প্রকৃতিঞ্চহি সর্বস্ব গুণত্রয় বিভারিণী।
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চদারুনা।।

অর্থাৎ তুমি ত্রিগুণময়ী, তুমি কালান্তকারিণী তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি ও মোহরাত্রি।

আবার মহানির্বাণ তন্ত্রে কালীর রূপ বর্ণনায় পাওয়া যায়।

তব রূপাং মহাকালে জগৎ সংহারকারক:।
মহাসংহার সময়ে কাল: সর্ব্বং গ্রাসিষ্যতি।।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকাল: প্রকৃত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাং ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।
কালসংপ্রসাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বানদাদি ভূতত্বাদাদ্যা কালিতি গীয়তে।।

অর্থাৎ - জগৎ সংহার কালের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা তোমারই রূপ। এই কালরূপ সময়কে গ্রাস করে ও পঞ্চভূতকে বিনাশ করে বলে ইহা মহাকাল, এই কালকে তুমি নিজদেহে আশ্রয় দাও বলে তুমি মহাকালী ও অন্তে তাহাকে গ্রাস করে তুমি অবিকৃত থাক বলে তুমি চিরস্থায়ী আদ্যাদেবী সবার আদিভূতে যে কাল ইহা মহাকাল, এই কালকে তুমি নিজদেহে আশ্রয় দাও বলে। তুমি মহাকালী ও অন্তে তাহাকে গ্রাস করে তুমি অবিকৃত থাক বলে তুমি চিরস্থায়ী আদ্যাদেবী। সবার আদিভূতে যে কাল তার কালত্বই কালী।

ত্বং কালী তরিণী দূর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্ন মস্তিকা।।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তি স্বরূপত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনু।।
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজষ্ট ভুজাত্বয়া।
তমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শাস্ত্র ধারিণী।।

কালীর উল্লেখ আমরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যেমন পাই তা হল কতকটা এই রকম প্রথমা পূজিতা সাজ কৃষ্ণেণ পরামত্মানা।

বৃন্দাবনে চ সৃষ্টৌদৌ গোলাব রাস মন্ডলে ।।
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মণা স দ্বিতীয়া
ত্রিপুরাপ্রেমীতে নৈব তৃতীয়োত্রিপুরারিনা ।।
দ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রন সাপাদ্দুর্বাসায় পরা।

এবপব থেকে বোঝা যায় যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে যখন ব্রহ্মা দেবীকে কালরাত্রি বলেন তখন তা দেবকালীকে মার্কণ্ডেয় পুবাণে শুম্ভনিশুম্ভ বধপর্বে আমরা দেখতে পাই যে দেবী অম্বিকা অসুর বধ করাব জন্য নিজেব দেহ থেকে দেবীর কৌলিনীর জন্মদেন। এই দেবী ঘোর কৃষ্ণাবর্ণা আবার শিবপুরাণ মতে দেবী পার্বতী ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা এবং শৈব কর্তৃক তাকে কালী বলে সম্বধন করায় তিনি কৃষ্ণকোষ ত্যাগ করে গৌরী হয়ে ওঠেন এবং সেই কৃষ্ণকোষ থেকে জন্ম নেন দেবী কৌশিকী। তিনি পুং স্পর্শ বহিতা ও তিনি অযোনি সম্ভবা অর্থাৎ তার কোন পুরুষের সঙ্গে সংগম হয়নি ও কোন মাতৃযোনি থেকে তিনি জন্ম নেননি। এই দেবীর সঙ্গে যুদ্ধকালে তার ললাট থেকে জন্ম হয় কালীব কিন্তু এই দেবী আমাদের প্রচলিত দেবীর থেকে অনেক ভিন্ন। ইনি দেবী চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ড হারিণী। মার্কেণ্ডয় পুরাণে আমরা পাই-

ভ্রকুটি কুটিলৎ তস্যা: ললাট ফলকাদ্রুতম।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাপিপাশিনী ।।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমাল্যবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপবীধানা শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা।
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বা ললন ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপুরিতদিঙ্মুখা ।।
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরা ক্রুরা গজচর্ম্মোতরীয়াকা।
মুন্ডমালা ধারা ঘোরা শুষ্কবাপী সমাদরা ।।
ঘড়পাল ধবাতীব ভীষণানভয়দায়িনী।
খট্টাঙ্গধারিণী বৌদ্রা কালবাত্রিবিরাপক ।।
বিস্তীতাবদনা জিহ্বং চলয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ।

মৎস্যপুরাণে এই দেবী চামুণ্ডা শববাহনা এবং ইনি রক্তবীজ মালিনী এবং অষ্টশক্তির অন্যতমা। এছাড়া আমরা মহাভারতে দেবীকালীর উল্লেখ পাই। অজ্ঞাতবাস পর্বে মা বগলা দেবী কালীর স্তব করেন। সেই স্তব অনুযায়ী দেবী রক্তনয়না পাশ হস্তা, সর্পংহাররূপীনী, শত্রুহারিণী ও মদমাংস বলিপ্রিয়া। এছাড়া দেবী ভাগবতে আমরা দেখতে পাই যে, যখন সতী তার পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য আবদার করেন তখন মহাদেব সেই অনামন্ত্রিত যজ্ঞে যাওয়ার অনুমতি দেন না। অনুমতি না পেয়ে দেবী ক্রোধে মহাদেবকে তার দশখানি ভয়ঙ্কর রূপ দেখালেন। সে যুগেই দশমহাবিদ্যারূপে জগতে খ্যাত।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা ।।

এই দশবিদ্যার চিন্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের সাধন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ব্রজযান মহাযান ও কালচক্রযানের দেবীদের সংমিশ্রণ দেখা যায়। নালন্দায় বৌদ্ধ লামাদের লেখা একটি সুপ্রাচীন চন্ডী পাওয়া যায়। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মেও উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, ভদ্রকালী, কামেশ্বরী, তারা মারীচি প্রভৃতি দশখানি অতি উল্লেখযোগ্য দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া, আমরা যে নবদুর্গাস্তুতি পাই তাতে আমরা কালরাত্রি ও চন্দ্রঘন্টা নামে দুই দেবীর উল্লেখ পাই। এবা দেবী কালী ও দেবী চামুণ্ডার সমার্থক। শ্রীশ্রী চন্ডীর দেবীববণেব (৩-৫) যে শ্লোক আমরা পাই তাতে দেবী কালরাত্রি যে দেবী কালীর অন্যতম রূপ তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘন্টেতি কুষ্মান্ডেতি চতুর্থকম্ ।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়ণী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গা প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তানেতানি নামানি ব্রহ্মণৈবমহাত্মনা ।।
এবং কালরাত্রির ধ্যান মন্ত্রে বলা আছে —
কালী কালী মহাকালী কালরাত্রিকে।
ধর্ম্মাথমোক্ষদে দেবী কালবাত্রি নমহস্তুতে ।।

দেবী কালের জননী, তিনি একই সঙ্গে কালকে গ্রাসও করেন ও প্রসবও করেন তাই তিনি কালী।

পুরাণের যুগে যে কালীর রূপ আমরা পাই তার সঙ্গে এখনকার দেখা কালীর অনেক অমিল, দেবী পাশ হস্তা নন, তিনি বরাভয়দায়িনী, বৃহৎপুরাণে দেবীকে আমরা কিছুটা আমাদের মহাদেব বক্ষবিনাশিনী বলে দেখতে পাই। দেবীর আধুনিক রূপকল্পনার সঙ্গে তিব্বতের তন্ত্র সাধনার সংমিশ্রণের মিল অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কালীপূজোর উল্লেখ, Hiuen Tsang তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন। কিন্তু কালীকে তান্ত্রিক মনে পূজা করা হোত কেবল মহামারী ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য, তাও শিলাখণ্ডে, ঘটে, যন্ত্রে বা গুপ্ত যোগে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দীর সূচনাকাল। শক্তি সাধনার নামে এই মহান শক্তিক্ষেত্র বঙ্গভূমিতে চলছে ভয়ঙ্কর কদাচার ও বামাচার। সেই সময় নবদ্বীপের পন্ডিতপ্রবর মহেশ্বর ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ অগম বাগিকা ধ্যানমন্ত্রের দেবীকে চিন্ময়ী থেকে মৃন্ময়ীতে সাকার মূর্তিরূপ দিলেন, তাই একদিন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যে উষাকালে দেখা প্রথম নারী মূর্তির ভঙ্গিমাই হবে তার মূর্তির ভঙ্গিমা।

পরদিন উষাকালে, দেখলেন এক অন্তজ মেয়ে, আলুলায়িত কেশ একহাতে খুঁটি ধরা, বাঁ হাতে গোবরের তাল, ডান পা দাওয়ায়, বাঁ পা খানি মাটিতে, ছোট একখানি কাপড় পরা, কপালে সিন্দুর। সেই মেয়ে কৃষ্ণানন্দকে দেখে জিভ কাটতেই, সাধক পেয়ে গেলেন তার মাতৃমূর্তি। উচ্চারিত হোল মন্ত্র-

"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং
মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যা, মুন্ডমালা-
বিভূষিতাং।"

★

"মহামেঘপ্রভাংশ্যামাং
তথাচৈব দিগম্বরীং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং
পীনোন্নতপয়োধরাং॥"

★

"সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গাবামাধোর্দ্ধ পাণিকাং
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ পাণিকাং॥"

★

এরপর সাধকেরা দেবীকে এককভাবে একক রূপে সাজাতে থাকেন এবং অধিকাংশই এই বাংলাদেশে। তিনি রামপ্রসাদের মেয়ে, বামাক্ষ্যাপার মা, আবার রামকৃষ্ণ তার স্ত্রীকে অর্থাৎ সারদাদেবীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন।

মা কালীর রূপ বর্ণনায় তার রূপকল্পনায় যে দার্শনিক দিক লুকিয়ে আছে এবার সেটাকে ধরার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমেই প্রশ্ন থাকে দেবী কালো কেন ? অনেকে মনে করেন দেবী কালকে গ্রাস করেন তাই তিনি কালী, তাঁর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রূপ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়ই কালো। মা আবার নীল রঙের ও হয়, কারণ তিনি অনন্তরূপিনী, আকাশ ও সাগরের মতো তাই তিনি নীল।

মা দাঁত দিয়ে জিভ কাটেন কেন ?

মঙ্গল কাব্য অনুযায়ী, দেবী যখন যুদ্ধকালে প্রলয় নাচনে লিপ্ত, তাঁর রণন্মোত্ততাকে শান্ত করতে মহাদেব তাঁর পদতলে পড়লেন ও শিবের বুকে পা দিয়েই শান্ত হোল দেবীর ক্রোধ, তিনি লজ্জায় কাটলেন তাঁর জীব। পন্ডিতগণের মতে এটা সত্তগুণ দিয়ে তমোগুণ ও রজোগুণকে দমনের প্রতীক। আবার এই বিশেষ মুদ্রাটি খেবরীমন্দ্রা নামেও পরিচিত ও এটি যোগ সাধনার উন্নতস্তরে লাভ হয়।

মার গলায় নরমুন্ডের মালা কেন ? ৫০টি নরমুন্ড ৫০টি বর্ণমালার প্রতীক ও এদের আমাদের মস্তিকের মগজে ধারণ কবতে হয়, তবেই আমাদের উন্নতি আসে ও দেবীর বাম হাতের নরমুন্ডটি দেবীর দ্বারা সাধকের আজ্ঞাচক্র নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

মা কেন দিগম্বরী ?

দেবীর দিগম্বরী রূপকে সামনে বেখে সাধকের কামজয়ের প্রচেষ্টা ও দেবীর অনন্ত রূপ

বলেই তিনি অনাচ্ছাদিতা।

দেবী কটিদেশে কর্মেব প্রতীক ৰূপ হাতীকে তাব অঙ্গবস্ত্র ৰূপে পবেছেন ও তাব চাব হাত সাধককে চতুবর্গদান কবে।

দেবী-খড়গ কেন বাম হাতে ?

দেবী ডান হাতে ভয প্রদান কবেন তিনি শাসনহেতু খড়গ ধাবণ কবেছেন ও তিনি তাই বিপবীত হাতে তা ধবেছেন।

দেবী কেন শ্মশানবাসিনী ? তিনি সকল জীবেব অন্তকাবিণী ও আমাদেব অন্তিম স্থল হল শ্মশান। নিগূঢ়ানন্দ তাঁব বই "দেব দেবীব উৎস সন্ধানে"-তে কোযাণ্টাম ফিজিক্সেব (Quantam Physics)-উপবে ভিত্তি কবে কালীব ৰূপ বর্ণনা কবেছেন। তিনি ব্রহ্মাকে বলেছেন Sigularity, এবং কালীকে বলেছেন Black Hole যা কাল বা Time কে গ্রাস কবে। ও Big Bang -এব মাধ্যমে Time বা কালেব জন্ম দেয। এই Big Bang হল কালেব একত্রে সমাবিষ্ট চাবটি শক্তি বা Energy যা চাবদিকে বিচ্ছিন্ন হযে যায়, যাকে বলে Symmentry breaking। এই Energy হোল - electo Magnatic force, strong এবং Weak nuclear force, এবং gravitat·onal force এবং এবা যথাক্রমে সৃষ্টিব সহায়ক, ধাবক, বাহক ও ঘাতক। যে হাতে নবমুণ্ড সেটা সৃষ্টিব প্রতীক, যে হাতে ববমুদ্রা তা হোল ধাবক, অভয়মুদ্রা বাহক ও যে হাতে খড়গ তা হোল ঘাতকেব প্রতীক। কালেব জীবন চক্রেব বিধাতা বলে একে কালী বলে ডাকা হয।

লোকে বলে "যেখানে দুজন থেকে পাঁচজন ইংবেজ একত্রিত হয সেখানে গডে ওঠে একটি ক্লাব, আইবিশবা একত্রিত হলে গড়ে ওঠে একটা সিক্রেট সোসাইটি (Secret Society) ও পাঁচজন বাঙালী এক হলে গডে ওঠে একটা কালীবাডী, কালী আমাদেব identity বা পবিচয। কালীব আধুনিক ৰূপ হিসেবে আমবা ঠাকুবকে পাই।

কালী যেমন সৎ এব মা অসৎ-এবও মা। দেবী যেমন সাধকেব কালী, তিনি চিতে ডাকাতেব চিত্রেশ্ববী, তিনি এন্টনী কবিযালেব ফিবিঙ্গীকালী, নিবেদিতাব 'দা মাদাব" এবং সুভাষ ও অববিন্দেব দেশ জননী।

সমগ্র পূর্ব ও উত্তবপূর্ব ভাবতেব যত শক্তিপীঠস্থান আছে তাতে দেবী দুর্গাব পবিবর্তে দেবী কালীব পুজো কবা হয়। বলে কালী কলকাত্তেওযালী আবাব বাঙালীদেব অতি পবিচিত এই কালী উত্তবভাবতে বজ্রযোগিনী নামে অতি ভয়ঙ্কব এক দেবী তিনি সাধাবণেব নাগালেব বাইবে। দেবী কালী নিয়ে কাজেব অন্ত নেই, এব পবিধিও বিবাট কিন্তু এই সীমিত স্থানে তা দেওযা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে আবো কিছু তথ্য দেওয়াব ইচ্ছা বইলো।

লক্ষ্মীর বাহন

সরিতা ক্ষেত্রী

হিন্দুধর্মেব এক অন্যতমা দেবী হলেন লক্ষ্মী। বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্মী সম্পর্কিত যে বর্ণনা রয়েছে তাব থেকে বোঝা যায় যে বৈদিক যুগেব মধ্যেই লক্ষ্মী সংক্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসেব জন্ম হয়ে ছিল। এই দেবী সংক্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে বা খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আরও জনপ্রিযতা লাভ করে। এব প্রমাণ হল এই সময়কার নামমুদ্রা, মুদ্রা ও ভাস্কর্য যেখানে লক্ষ্মীকে দেখান হযেছে পদ্মহাতে, পদ্মবনে দাঁড়িযে, সমৃদ্ধিব প্রতীক পূর্ণঘট থেকে উঠে আসা পদ্মেব উপবে ও পদ্মহাতে দাঁড়ানো ইত্যাদি নানা ভঙ্গিমায়। এই সময় থেকে ধনদেবী লক্ষ্মী বিভিন্নরূপে পূজিতা হয়েছেন। বিশেষ করে বাঙালীর ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীর আজও পূজা হয়, লক্ষ্মীব লৌকিক ব্রত পালন করা হয়, ব্রত সম্পর্কিত আলপনা দেওয়া হয়। কোজাগবী পূর্ণিমাতে দেবীব বিশেষ পূজা এখনও প্রচলিত।

বর্তমানে বাঙলায় (পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশ) লক্ষ্মীর যে মূর্তিগুলি প্রচলিত তা একক ভাবেই হোক কিংবা সপরিবারেই হোক, দেবীকে দেখা যায় তাঁর বাহন প্যাঁচা বা পেচকের সঙ্গে। লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে প্যাঁচার উপস্থিতি কত প্রাচীন এবং কেন তাঁকেই দেবীব বাহন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল এই দুটি বিষয়ে আলোকপাত করাই আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে[১] এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ[২], তৈত্তিরীয় সংহিতা[৩], ঐতরেয ব্রাহ্মণ[৪], মহাভারত[৫] ইত্যাদিতে লক্ষ্মীর সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে দেবীর বাহন হিসেবে প্যাঁচার উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালের কোনও মূর্তিতেও প্যাঁচার উপস্থিতিব কোন প্রমাণ মেলে না। এব থেকে বোঝা যায় যে লক্ষ্মীর সঙ্গে এই প্যাঁচার ধর্মীয় সংযোগ এবং পরিশেষে বাহন রূপে প্যাঁচার পরিগণ্য হওয়ার ইতিহাস তুলনায় অর্বাচীন। দেবীর বাহন হিসেবে প্যাঁচাব আগমনেব অনেক পূর্বেই আমরা লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে সিংহের উপস্থিতিব প্রমাণ পাই। এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশেব এটা জেলায় বিলসড়ে আবিষ্কৃত এক স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ গুপ্তযুগের একটি ভাস্কর্য[৬] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাস্কর্য 'অভিষেক লক্ষ্মী' বা 'গজলক্ষ্মী' নামে চিহ্নিত। এই প্রতিমূর্তিতে দেবী লক্ষ্মী সিংহের উপরে আসীনা। দেবীর এক হাতে পদ্মের মৃণাল এবং দেবীকে দু পাশ থেকে অভিষিক্ত কবছে দুটি হাতি।

বিলসড় ভাস্কর্য ছাড়াও উত্তর ভারতের অন্যত্র এই ধরণের আরও মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত ভাবতীয় উপমহাদেশেব উত্তব-পশ্চিমে অবস্থিত কাশ্মীর থেকে প্রাপ্ত তৃতীয়-চতুর্থ

শতাব্দীর এক লক্ষ্মীর মূর্তির[৭] উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তিটি বর্তমানে ব্রিটিশ মুজিয়ামে রক্ষিত। এখানে দেবীর এক হাতে পদ্মের নাল; তিনি সিংহ উপরে বসে আছেন। তাঁর মাথায় উপুড় করা দুটি ঘট দৃশ্যমান। মূর্তিটি বর্তমানে ভগ্ন। সম্ভবতঃ অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটিতে দুটি হাতি দুপাশ থেকে ওই ঘটের জল দিয়ে দেবীকে অভিসিঞ্চিত করছিল মনে করা অসঙ্গত হবে না।

তথ্য সাপেক্ষে[৮] মনে হয় সিংহের সঙ্গে লক্ষ্মীর সংযোগ ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ। এই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (গ্রীসীয় যবন), শক-পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি শক্তিবর্গের শাসনকালে) সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার বিশেষ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। এই অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মাতৃ-দেবীর সঙ্গে পশুরাজের সম্পর্কের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন সুমেরীয় 'নিনলিল' (নিনহুরস্যাগ) ফ্রিজীয় ও লিডীয় (সুতরাং পশ্চিম এশিয়) 'কুবিলি' (কুবেলি?) বা 'সিবিলি', আসুরীয় 'ইষতার', গ্রীসীয় 'রিয়া' ও 'অ্যাথিনা', ব্যাবিলোনীয় 'ননা' এবং পারসিক 'অনাহিত'।[৯] এই সব দেবীগণ নিজ-নিজ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা মাতৃ-দেবী রূপে পূজিতা হতেন। বিভিন্ন জাতিভুক্ত ঐ সব ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ফলে এই সব দেবীরা পরস্পর নিকটবর্তী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একে অন্য থেকে অভিন্নরূপে পরিচিত হন। এই একীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু পূর্বেই। এর ফলস্বরূপ কুবেলি, ইষতার ও ননার বাহন বা সহচর সিংহ, রিয়া ও পরে অ্যাথিনার সহচরে পরিণত হয়।[১০] ভারতের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের ফল স্বরূপ এই সব অভারতীয় মাতৃ-দেবীদের ধ্যান-ধারণা, লক্ষ্মী সম্পর্কিত ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল তৃতীয় কণিষ্কের এক শ্রেণীর মুদ্রা।[১১] এই মুদ্রায় সৌভাগ্যের ফিতা হাতে সিংহের উপর আসীনা দেবীর পদতল পদ্মের উপর স্থাপিত। পাশের উৎকীর্ণ লেখ দেবীকে 'ননা' বলে চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রে ননা রূপে নির্দেশিত হলেও এই দেবী ননা-লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি রূপেই গ্রহণযোগ্য। কুষাণ যুগের বিভিন্ন মুদ্রায় ননার প্রতিমূর্তি তার জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। অতএব উপরের আলোচনা থেকে মনে করা যেতে পারে যে লক্ষ্মীর বাহন রূপে সিংহের সংযুক্তির ধারণা এসেছিল ব্যাবিলোনীয় মাতৃ-দেবী ননার কাছ থেকে।

লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে সিংহের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় আবিষ্কৃত দ্বাদশ শতাব্দীর আরও একটি ভাস্কর্যে।[১২] বর্তমানে ভাস্কর্যটি রাজশাহী-বরেন্দ্র-রিসার্চ মুজিয়ামে রক্ষিত। এই ভাস্কর্যটির প্রতি সম্প্রতি অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মূর্তিটি হচ্ছে ললিতারূপী দুর্গা বা উমার। তিনি সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী নন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সকলেই যথা লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ এবং কার্তিক উপস্থাপিত। ভাস্কর্যটিতে এই সব দেব-দেবীর ক্ষেত্রে বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) তাঁদের প্রচলিত বাহনের উপস্থিতি লক্ষণীয় যেমন সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বাহন হাঁস, গণেশের সঙ্গে মুষিক এবং কার্তিকের সঙ্গে যথাযথ ঐতিহ্য অনুসারে ময়ূর। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ভাস্কর্যটিতে সিংহ কে দেখান হয়েছে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে, দুর্গার বাহন হিসেবে নয়।

অথচ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই ভাস্কর্যের চারশ বছর পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে পরিবারের অন্যান্যদের (অর্থাৎ শিব, লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিকেয়) সঙ্গে দশভূজা চণ্ডিকার (অর্থাৎ দুর্গার) সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী রূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৩] এই পারিবারিক বর্ণনায় লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে প্যাঁচা উপস্থিত এবং সিংহ দেবী দুর্গার বাহন। উপরে উল্লিখিত এই দুটি তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে প্যাঁচার উপস্থিতি ইঙ্গিত করে যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহের স্থানে প্যাঁচার আগমন হয়।

এখানে অবধারিত ভাবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে পড়ে যে কেন প্যাঁচা লক্ষ্মীর বাহন রূপে এই ধন-দেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ? এই বিষয়ে বিদ্বজ্জনেরা বিভিন্ন মত বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১৪] একটি মত অনুযায়ী, বিষ্ণুর বাহন কাল্পনিক গরুড় পাখীর এক পরিবর্তিত রূপ হিসাবেই প্যাঁচার আগমন।[১৫] এই মতের সপক্ষে কয়েকটি প্রাচীন নাম - মুদ্রার তথ্য প্রামাণ্য রূপে দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্য একটি সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছেন। যেহেতু প্যাঁচা শস্য-হানি-কারক (শস্য খেয়ে ফেলে যে সব প্রাণী) প্রাণীর খাদ্য রূপ (যেমন ইঁদুর) কৃষকের শস্যক্ষয়ের সম্ভাবনাকে কমিয়ে কৃষকের পক্ষে এক মহৎ উপকারীর ভূমিকা পালন করে সেহেতু লোকমানসের বিশ্বাসে প্যাঁচা কল্যাণরূপের একটি চিরন্তন স্থান অর্জন করেছিল। অন্য দিকে দিনের আলোয় প্যাঁচার ধানের গোলায় লুকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে সাধারণ কৃষিজীবী তাদের লোক-বিশ্বাসের দৃষ্টিতে ধানের তথা শস্যদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে প্যাঁচার একটি অন্বয় -সূত্রও উদ্ভাবন করে নেয়। সাধারণতঃ কৃষিজীবী বাঙালীর এই প্রধান শস্য ধানের সঙ্গে প্যাঁচার এই ওতপ্রোত সম্বন্ধ দিয়েই লোক-বিশ্বাসে তাকে লক্ষ্মীর বাহন রূপে কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।[১৬]

যদিও লক্ষ্মীর বাহন রূপে প্যাঁচার বাঙালীর আবহমানের প্রচলিত বিশ্বাস তথাপি দু একটি ঐতিহাসিক তথ্যসাপেক্ষে প্যাঁচার ও লক্ষ্মীর সহাবস্থানের অন্যএকটি তাত্ত্বিক দিকও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। লক্ষ্মীর বাহন রূপে প্যাঁচার ঐতিহাসিক উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রসঙ্গক্রমে সম্ভাবনার এই দ্বিতীয় তাত্ত্বিক দিকটিও আলোচনার যোগ্য। প্যাঁচা ও লক্ষ্মী এখানে অশুভ ও শুভের ধারণার বৈপরীত্য মূলক অবস্থানের এক প্রতীক। প্যাঁচার বীভৎসদর্শন আকৃতির জন্য তাকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে গণ্য করবার সাধারণ প্রবণতা অসঙ্গত ছিল না। এক্ষেত্রে প্যাঁচার লক্ষ্মীর পদতলে অবস্থান থেকে ভারতীয় ধর্মের সেই আদি ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে যে-প্রাথমিকভাবে না হলেও চূড়ান্তভাবে শুভশক্তিই জয়ী হয় এবং অশুভ শক্তির উপর তার ধ্রুব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এখানে লক্ষ্মীর বিপরীত অলক্ষ্মীর ধারণা উল্লেখ করা যেতে পারে। অলক্ষ্মী বা পাপীলক্ষ্মীর উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের শ্রী সূক্তে।[১৭] এ প্রসঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক সামাজিক আনুষ্ঠানিক রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এই ঐতিহ্যপূর্ণ রীতি অনুসারে অলক্ষ্মীকে ধর্মীয় নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিতাড়নের পরই লক্ষ্মীর আবাহন করা হয়ে থাকে। সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে এই কুৎসিত পেচকই কি অলক্ষ্মীর প্রতীক। বিভিন্ন প্রতিমূর্তিতে দেবীর পায়ের কাছে তার অবস্থান অলক্ষ্মীর অর্থাৎ অশুভ শক্তির উপরে লক্ষ্মীর বা শুভ শক্তির প্রাধান্যের দ্যোতক হতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১. ঋগ্বেদ, ১, ১৬৬, ১০; ২, ২৩,১৮; ৩,১,৫; ৪,৫.১৫; ৫,৬০,৪; ৭,১৫,৫; ৯,১০৪,১; ১০,৪৫,৮; ১০,৯১,২; ১০, ৯০, ৬; ১০, ১০৫, ১০ ইত্যাদি।

২. শতপথ ব্রাহ্মণ ৮, ৪, ৪, ১১।

৩. তৈত্তিরীয় সংহিতা ২, ১,৫, ২

৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২, ৪০. ৮।

৫. মহাভারত ৯, ১৫৮, ৩।

৬. বি, এন, মুখার্জী, ননা অন লায়ন - এ স্টাডি ইন কুষাণ নিউমিসম্যাটিক আর্ট (নীচে এন এল রূপে চিহ্নিত), কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ: ১৮-১৯ ও ১১৪; চিত্রপত্র ৭, নং ২৪।

৭. বি, এন, মুখার্জী, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (প্রকাশিতব্য) পৃ: ৭৪-৭৫।

৮. এন, এল, পৃ: ১৪-১৫।

৯. বি, এন, মুখার্জী, শক্তির রূপ-ভারত ও মধ্য এশিয়ায়, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ: ৩৭-৩৮।

১০. বি, এন, মুখার্জী, "ফরেন এলিমেন্টস ইন আইকনোগ্রাফি অফ মহিষাসুরমর্দিনী-দি ওয়ার গডেস অফ ইন্ডিয়া", জেড, ডি, এম, জি, ক্রোড় পত্র নং ৬, স্টুটগার্ট, ১৯৮৫, পৃ: ৪০৪; বি, এন, মুখার্জী. শক্তির-রূপ-ভাবতে ও মধ্য এশিয়ায়, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ: ৩৮।

১১. ঐ, পৃ: ৩৯।

১২. বি, এন, মুখার্জী, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (প্রকাশিতব্য)।

১৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চন্ডী (অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলিকাতা, পৃ: ৮৬।

১৪. অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বই 'বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত' এই প্রসঙ্গে আর একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। হেলেনীয় মাতৃদেবী ও যুদ্ধের দেবী এবং এ্যাথেন্সের নগরলক্ষ্মী এ্যাথিনার প্রতীক ছিল প্যাঁচা। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে এই দেবী সংক্রান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের পরিচিতি হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালের কোনও লক্ষ্মীর মূর্তিতে এর অনুপস্থিতির ফলে তিনি এ্যাথিনার কাছ থেকে তাঁর বাহনকে পেয়েছিলেন কিনা বলা মুশকিল। (বি, এন, মুখার্জী, বঙ্গ, বাঙ্গলা ও ভারত, প্রকাশিতব্য পৃ: ৭৫) অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে প্যাঁচার সঙ্গে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে যে দেবীব যোগসূত্র নির্দেশ করা হয়েছে - তিনি হলেন চামুণ্ডা। কিন্তু ভয়োদ্রেককারী ও অমঙ্গলসূচক চামুণ্ডার সঙ্গে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা লক্ষ্মীর রূপগত সাযুজ্য নেই (আনন্দ বাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা ১৯৯২, কলিকাতা, পৃ: ৪৩)

১৫. বি, এন, মুখার্জী, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (প্রকাশিতব্য), পৃ: ৭৫।

১৬. ঐ।

১৭. ঋগ্বেদ, শ্রীসূক্ত ৮।

আদি মধ্যকালীন ভারতে দুই শৈবাচার্য ত্রিপুরান্তক ও বিশ্বেশ্বর শম্ভু

কৃষ্ণেন্দু রায়

ভারতীয় ইতিহাসে আদি মধ্যযুগে (আ: খ্রী: ৬০০-১২০০ খ্রী:) ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জনপ্রিয় ভক্তি ধর্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার ও প্রসার। এই আদর্শকে অনুসরণ করেই দেবার্চনা পদ্ধতিতে দেখা দেয় পৃথক পৃথক ধর্ম সম্প্রদায়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায় ইত্যাদি। উক্ত সম্প্রদায়গুলি রাজকীয় সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা এবং মান্যতাও এই সময়ে পেয়েছিল। অর্থাৎ আলোচ্য যুগে রাজানুকূল্যে আবাসিক ধর্ম প্রতিষ্ঠান তথা মঠ স্থাপিত হয়েছিল। এ বিষয়ে লেখমালার সাক্ষ্য আছে-চন্দ্ররাজ শ্রীচন্দ্রের (খ্রী: ৯২৫-৭৫ খ্রী:) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন, চোলুক্যরাজবংশীয় বাঘেলা শাখার রাজা সারঙ্গদেবের (খ্রী: ১২৭৫-৯৬ খ্রী:) সিনত্রা প্রশস্তি ইত্যাদি। মঠ জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের খবর তথ্যসূত্রে থাকলেও মঠের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিতভাবে লেখমালায় স্থান পায় না। আলোচ্যযুগে এমন মঠাধ্যক্ষের বিষয়ে কিছু খবর আছে।

॥ ২ ॥

প্রথম জন শ্রী ত্রিপুরান্তক ও দ্বিতীয় জন শ্রী বিশ্বেশ্বর শম্ভু। দুজনেই ছিলেন শৈবাচার্য। দুজনেরই সময়কাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক। ত্রিপুরান্তকের কর্মস্থল ছিল গুজরাটের সোমনাথে এবং বিশ্বেশ্বর শম্ভুর ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়ুর (গুন্টুর) জেলায়। ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরান্তক ছিলেন একজন পুরোহিত-পরশ্রী ত্রিপুরান্তক (পুরোহিত শব্দটি সংস্কৃতে পর বলে সংক্ষেপিত) এবং একই সঙ্গে তিনি নবঘনেশ্বর মন্দিরের স্থানপতি বা মঠাধীশও ছিলেন।[১] তাঁর বংশ পরিচয় পাওয়া যাবে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দের সিনত্রা লেখমালায়। ত্রিপুরান্তক ছিলেন লকুলীশ-পাশুপতদের গার্গ্যশাখার শৈবাচার্য।[২] ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করে-হিমালয়, কেদারনাথ, প্রয়াগ শ্রীশৈল/শ্রীপর্বত (নর্মদার উত্তরে), গোদাবরী, ত্রিম্বক (নাসিকের নিকটে)-অবশেষে তিনি (সোমনাথে) দেবপট্টনে বা প্রভাসে এসে উপস্থিত হন।[৩] সোমনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত (গন্ড) বৃহস্পতি তাঁকে গ্রহণ এবং ষষ্ঠ মহত্তর হিসেবে নিয়োগ করেন (শ্রীমান্ গন্ড বৃহস্পতিঃ/বিনির্মায় ষষ্ঠ্যং চক্রে মহত্তরং॥[৪] স্থানীয় প্রশাসনেও তিনি মান্যতা পেয়েছিলেন (হৃদি চাতুর্জাতকেন[৫] গুণজাতবসেন)।[৬] দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ ত্রিপুরান্তক সোমনাথ দেবপট্টনের ধর্মীয় মহলে এবং স্থানীয় প্রশাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীবকুলেশ্বরদেবের মন্দিরের অধিকার ভুক্ত জমি (পল্লড়িকা) হর্মুজবাসী জনৈক নাখুদা নুরউদ্দীন ফিরজকে[৭] বিক্রি করেছিলেন।[৮] এই দুটি ঘটনা থেকে

অনুমান করা যেতে পারে যে, ত্রিপুরান্তক সোমনাথ দেবপট্টনের সমাজে উচ্চস্তরের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

অনুরূপ কথা বিশ্বেশ্বর শম্ভুর ক্ষেত্রেও বলা চলে। বিশ্বেশ্বর মূলতঃ ছিলেন দক্ষিণ রাঢ় দেশের[৯] পূর্বগ্রামের বাসিন্দা। তাঁর ধর্মীয় পরিচয় হল তিনি শৈব সম্প্রদায়ের মত্তময়ূর উপশাখার একজন শৈবাচার্য। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজের আমলে (খ্রীঃ ৯৪০) নির্মিত মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একাধিক মত্তময়ূর শৈবাচার্য। এঁদের-ই পরম্পরায় উত্তরসূরী ছিলেন বিশ্বেশ্বর।[১০] তাঁকে বলা হয়েছে ধর্মতনয়।[১১] বৌদ্ধগ্রন্থ সংযুত্ত নিকায় (সংস্কৃতে সংযুক্ত নিকায় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক)-এর অন্তর্ভুক্ত কল্যাণমিত্ত সুত্তের (সংস্কৃতে কল্যাণমিত্র সূত্র) আলোকে বলা যেতে পারে যে, ধর্মতনয় তাঁকেই বলা যেতে পারে যিনি ন্যায়-পরায়ণ ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে মানুষের হিতার্থে কাজ করেন।[১২] বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে এই কথাগুলি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, সেটা পরে দেখব। বরং তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গ বুঝে নেওয়া যাক। তাঁর উপকারী মনোবৃত্তি একদিকে যেমন তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, অন্যদিকে এই জনপ্রিয়তাই তাঁকে কলচুরি রাজদরবারে অত্যন্ত কাছের মানুষ করে তোলে। তিনি হয়ে ওঠেন রাজগুরু।[১৩] মালব ও চোল রাজারাও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] বস্তুত: এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবা যেতে পারে যে, বিশ্বেশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে উক্ত রাজারা নিজেদের রাজশক্তিকে প্রজাদের মধ্যে অধিকতর মান্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সম্ভবত একই পথ অনুসরণ করেছিলেন বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশ। কাকতীয়রাজ গণপতিদের (খ্রী: ১১৯৯-১২৬১) বিশ্বেশ্বরকে রাজদরবারে দীক্ষাগুরু হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।[১৫] এইভাবে বিশ্বেশ্বরকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে শুধুমাত্র রাজশক্তিকে দৃঢ়তর করাই নয়, কাকতীয়রা যে কলচুরিদের সমান রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী-এই বিষয়টিকে প্রমাণ করার প্রয়াসও ছিল। জমি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে বিশাল মঠ স্থাপনে সহায়তা দিয়েছিলেন গণপতির উত্তরাধিকারী কন্যা রুদ্রাম্বাদেবী (খ্রী: ১২৬১-৯৭)।[১৬] বস্তুত নারী শাসক হিসেবে কাকতীয় রাজসিংহাসনে রুদ্রাম্বাদেবীর কোন বৈধ অধিকার ছিল না। তাঁর সিংহাসন আরোহণ তাই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল। একমাত্র গ্রন্থ প্রতাপচরিত (আ: খ্রী: ১৩শ শতক) থেকে জানা যায় যে, তাঁর সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করা হয়েছিল। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা রুদ্রাম্বার নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক সিংহাসন আরোহণকে স্বাভাবিক ও প্রজাদের নিকট গ্রাহ্য করে তোলাই খুব সম্ভব রুদ্রাম্বার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরকে মঠ স্থাপনে সাহায্যের মূলে ছিল রুদ্রাম্বার রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায়।

তাহলে বোঝা গেল যে, ধর্মীয় ব্যক্তিহিসেবে রাজনৈতিক মহলে বিশ্বেশ্বর নিজের অবস্থান, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানকে বিশেষভাবে পাকা করে তোলেন। এখানেই বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে ত্রিপুরান্তককে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। রাজনৈতিক মহলে উভয়েরই ছিল অবাধ গতি। এব-ই মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস তাঁরা পেয়েছিলেন। এবার সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

॥ ৩ ॥

সোমেশ্বর মন্দিরের নিকটে ত্রিপুরান্তক পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করান। প্রথম মন্দিরটি ছিল তাঁর মাতা মালদেবীর নামে-মালনেশ্বর।[১৭] দ্বিতীয় মন্দিরটি উৎসর্গ করেন উমাপতির উদ্দেশ্যে (উমাপতেরায়তনম্)।[১৮] উমাপতি হলেন গন্ড বৃহস্পতি যিনি ত্রিপুরান্তককে সাদরে ও সসম্মানে সোমনাথে গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় মন্দিরটি ছিল বৃহস্পতির পত্নী উমার নামে উমেশ্বরম্।[১৯] বাকী দুটি মন্দিরের মধ্যে একটি ছিল নিজের নামে ত্রিপুরান্তকেশ্বর এবং অপরটি ছিল নিজ পত্নী রমা'র নামে- রমেশ্বর।[২০] পাঁচটি মন্দিরকেই ত্রিপুরান্তক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন এবং সেই মন্দির এলাকায় প্রবেশের জন্য উত্তর দিকে একটি তোরণের ব্যবস্থা করেন।[২১] গোটা মন্দির এলাকা বিখ্যাত সোমেশ্বর মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল।

মন্দিরগুলি এবং বিগ্রহদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজার্চনার জন্যও ত্রিপুরান্তক ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেকদিন বিগ্রহগুলিকে স্নান এবং মন্দিরগুলিকে পরিষ্কার করানো হত।[২২] বিগ্রহগুলির উদ্দেশে নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা একজন উপযুক্ত শিষ্যকে দিয়ে করানো হত (বটুকেন পটীয়সা...নৈবেদ্যান্ন...)।[২৩] চন্দনকাঠ কেনার জন্য ত্রিপুরান্তক প্রত্যেক মাসে ৮ দ্রম্ম দিতেন।[২৪] উদ্যান-সংঘের তরফ থেকে প্রত্যেকদিন ২০০ শ্বেত পদ্ম এবং ২০০ সংখ্যক সুগন্ধী করবী জাতীয় বিবিধ ফুল মন্দিরের উদ্দেশে দেওয়া হত।[২৫] মূল্যস্বরূপ চাতুর্জাতকের পক্ষ থেকে উদ্যান-সংঘকে একটি হট্ট বাজার/দোকান দেওয়া হয়েছিল (হট্টমেকং শ্রীমৎ চতুর্জাতকেন প্রদত্তং।[২৬] ২ মণ ধান ও ৪ কোর্ষ (প্রায় ৮ তোলা) পরিমাণ ঘি এবং প্রদীপ জ্বালাবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[২৭] সংশ্লিষ্ট ভান্ডার থেকে (কোষ্ঠাগারাৎ) প্রত্যেকদিন (নিত্যং) ১ মণ চাল (মাণকমেকং) ২ পল্লিকা (ছোট মাপ বিশেষ) বিন (পল্লিকাদ্বয়ং মুদ্গাঃ), ২ কোষ ঘি (ঘৃতকর্ষৌ) ইত্যাদি পশুপালকে দেওয়া হত (পশুপালায় দাতব্যং)।[২৮] খুব সম্ভবত পশুপতি শিবের পূজার্চনার কাজে যুক্ত থাকতেন এমন ব্যক্তিকেই পশুপাল বলা হত।[২৯] মন্দিরস্থ বিগ্রহগুলির পূজার্চনা সংক্রান্ত কাজের ভার থাকত একজন শিষ্যের ওপর (বিটক) এবং এর ভরণ-পোষণের জন্য ত্রিপুরান্তক মাসে ৯ দ্রম্মের ব্যবস্থা করেন। নব দ্রম্মান্ বটুকগ্রাসহেতবে পূজামগ্রাউমাং কর্তুং প্রতিমাসমুপেয়ুষঃ।[৩০] পূজারী পশুপালকে প্রতিমাসে ১৫ দ্রম্ম করে দেওয়ার ব্যবস্থাও ত্রিপুরান্তক করেছিলেন এবং এই মর্মে তিনি চতুর্জাতকের কোষাগারে ১৫ দ্রম্ম জমা রাখতেন। (দেয়াঃ পঞ্চদশ দ্রম্মাঃ পশুপালস্য ধর্মতঃ চাতুর্জাতিক পাদানং যঃ সংমিলিত পোত্তকে / ততঃ পঞ্চদশ দ্রম্মান্ প্রতিমাসং ব্যধত্ত যঃ)।[৩১] চৈত্র ও ভাদ্র মাসে পূর্ণিমার দিনগুলিতে উপনয়ন উপলক্ষে সম্ভবত উৎসব এবং এই জন্য স্থানীয় মহাজনেরা (ব্যবসায়ীরা ?) প্রত্যেকটি হাট থেকে খরচবাবদ ১ দ্রম্ম করে আদায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। (চৈত্রোমহে ভাদ্র পদোমহে চ পবিত্রকং..কর্তুং/ মহাজনপেপ্রতিহট্টমেকং দ্রম্মং বিশেষস্থিতকে চকার)।[৩২] চাতুর্জাতকের নিকট থেকে তিনটি বিশিষ্ট ও চমৎকার হট্ট কিনে নিয়ে (হট্টানি যো বিশিষ্টানি ত্রীণি প্রীনিতমানসঃ চাতুর্জাতকপাদেভ্যোঃ)[৩৩] সেগুলি মন্দিরগুলির উদ্দেশ্যে দান করেন।

এক কথায় দেবালয় নির্মাণ করিয়ে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের এবং বিগ্রহগুলির যথাবিধি

পূজার ব্যবস্থা করে ত্রিপুরান্তক নিজের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বকে সমকালীন সমাজে উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়।

অনুরূপ ভূমিকা বিশ্বেশ্বর শম্ভুও পালন করেছিলেন। দান স্বরূপ বিশ্বেশ্বর রুদ্রাম্বার নিকট থেকে পেয়ে ছিলেন মন্দারামগ্রাম ও কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরস্থ কিছু (পরিমাণ অজ্ঞাত) জমি।[৩৪] এই জমিব নাম ছিল লঙ্ক। লঙ্ক শব্দের অর্থ করা হযেছে একজন ছুতোর মিস্ত্রি।[৩৫] তাহলে মনে করা যেতে পারে যে উক্তজমিগুলি ছিল ছুতোর মিস্ত্রি অধ্যুষিত এলাকা। এই জমি ছিল বিশ্বেশ্বরের ভূসম্পদ। মন্দারাম গ্রামে তিনি একটি শিব মন্দির নিজের নামে স্থাপন করেন। এবং শুদ্ধশৈব মঠ নামে একটি মঠও প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬] এই মঠে ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর ব্যবস্থাও ছিল (বিপ্রসত্র)। এছাড়া ছিল আরোগ্যশালা, প্রসূতিশালা।[৩৭] বস্তুত শুদ্ধশৈব মঠটিকেই বিশ্বেশ্বর নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নামকবণ করেন বিশ্বেশ্বর গোলকিমঠ। এই মঠে পাশুপত দর্শনের কিছু ছাত্র বসতি করতেন। তাদেব খাওয়া-পবার ব্যবস্থাও উক্ত মঠেব মধ্যে করা হয়েছিল। (বিদ্যার্থীনাম্ পাশুপতব্রতানাম্ অপি অন্নবস্ত্রাদি)।[৩৮] কালিশ্বর (বর্তমান পরিচয় অজ্ঞাত) এবং এলিশ্বরপুরে বিশ্বেশ্বর আরও দুটি মঠ স্থাপন করেন। এই দুটি মঠ সম্ভবত উক্ত গোলকি মঠেব শাখামঠ ছিল। এলিশ্বরপুর বর্তমানে নালগোন্ডা জেলাস্থ এলিশ্ববম অঞ্চল। যাহোক কালিশ্বরে প্রতিষ্ঠিত মঠের নাম ছিল উপল মঠ এবং এই মঠের বক্ষণাবেক্ষণের জন্য পোন্নাগ্রাম অগ্রহাব স্বরূপ দান করেন।[৩৯] অগ্রহার ব্যবস্থার মূল কথাই হল কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অথবা কোন পুরোহিত সম্প্রদায়কে নিষ্কর ভূ-সম্পদ দান।[৪০] এলিশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বেশ্বর ১৬টি আবারক-অকে মঠের নিকটস্থ এলাকায় বসতি দেন (সমধ্যং চ ষোড়াশাবারকম্)।[৪১] এখন, আবার অ শব্দের অর্থ হল দোকান এবং এই অর্থে গ্রহণ করলে আবার-অ শব্দের সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে যে, আবাব-অ শব্দটি নিকটবর্তী বাজারস্থ দোকান থেকে সংগৃহীত অর্থ-ই বোঝাচ্ছে।[৪২] তাহলে ধরা যেতে পারে এলিশ্বরপুরে মঠের নিকটে ১৬টি দোকানসহ হাট জাতীয় ছোট-খাটো বাজার ছিল।

বিশ্বেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-মন্দ্রাকুট, চন্দ্রবল্লী, কম্মগ্রাম (বর্তমানে কম্মরুগ্রাম)। শিবশিঙ্গগুলির পূজার্চনার খরচ চালানোর জন্য পুনুরুগ্রাম এবং দুদ্যালগ্রামের কিছু বনজ সম্পদ দান করেন। তবে উল্লেখ্য যে, বিশ্বেশ্বর নিজের নামেও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন-লিঙ্গম্ বৈশ্বেশ্বরম্।[৪৩] স্পষ্টতই এটি ছিল নিজেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস। গ্রাম, মন্দির, মঠ প্রভৃতি সব কয়টির হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন বিশ্বেশ্বব শম্ভু নিজে (দেবস্য, সত্রস্য মঠস্য তস্যাগ্রামস্য সর্বস্য চ সোধিকারী)।[৪৪] যদিও আপাত দৃষ্টিতে ১০০ নিষ্কর (বাৎসরিক ?) বিনিময়ে একজন আচার্য সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে দেখাশোনা করতেন (নিষ্কানাম্ শতমাচার্য্য ভোগম্ ভুঞ্জিত দেশিকঃ)।[৪৫]

॥ ৪ ॥

দুই শৈবাচার্যেব ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করে একথা সঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে যে, একাধিক আবাসিক ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং সেগুলির বক্ষণাবেক্ষণেব উপযুক্ত ব্যবস্থা

করে উভয় আচার্যই সমসাময়িক সমাজে নিজেদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন। এমন খ্যাতনামা আচার্যদের রাজকীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়ে সমসাময়িক রাজশক্তিগুলি নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত এবং প্রজাদের নিকট মান্য ও গ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিল। কাজেই শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, আলোচ্য দুই শৈবাচার্যকে সামাজিক-রাজনৈতিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখলে তাঁদের ভিন্নতর ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ

১. সরকার ডি. সি. সিলেক্ট ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌স্‌ (সি.ই), খণ্ড ২, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃ: ৪০৫, লাইন নং ২৪।

২. বুহলার. জি. 'দি সিন্‌ত্রা প্রশস্তি অব দ্য রেন অব সারঙ্গদেব', এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা (এ.ই.), খণ্ড ১, নং ৩২, পৃ: ২৭৪।

৩. ঐ, তদেব, পৃ: ২৭৫, ছন্দ নং ২৩-৩০।

৪. ঐ, তদেব, পৃ: ২৭৫, ছন্দ নং ৩১।

৫. চাতুর্জাতক : ছন্দ ৬৪ এবং ৭০ থেকে বোঝা যায় যে, চাতুর্জাতক স্থানীয় কোন প্রশাসনিক দফ্‌তর ছিল। মন্ডপিকার মত বিপনন কেন্দ্রে আদায়ীকৃত শুল্ক থেকে অনুদান মঞ্জুর করে চাতুর্জাতকের দফ্‌তর থেকে আদেশনামা জারী করা হত (ছন্দ ৬০-৬১)। ছন্দ ৬৩ থেকে বোঝা যায় যে, চাতুর্জাতকের একটি কোষাগারও ছিল; স্পষ্টতই শস্যাদি মজুত রাখার জন্য- বুহলার. জি, এ.ই., পৃ: ২৮৫-৮৬ এবং পৃ: ২৭৫, পাদটিকা নং ১২।

৬. বুহলার. জি, এ.ই., পৃ: ২৮৩, ছন্দ ৩৫।

৭. নুরউদ্দীন ফিরুজ ছিলেন একজন নাখুদা। নাখুদা শব্দটি ফার্সী নাও (জলযান) ও খুদা (মালিক) থেকে তৈরী। অর্থাৎ জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিয়ে যিনি ব্যবসা করে তাকেই নাখুদা বলা যেতে পারে। বেরাবল লেখমালায় (খ্রী: ১২৬৪) নাখুদা নুরউদ্দীন ফিরুজকে নোরদীন পিরোজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত লেখমালায় নোরদীন-ই প্রধান চরিত্র। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখিয়েছেন নোরদীন কীভাবে সোমনাথদেব পট্টনে স্থানীয় প্রশাসন ও হিন্দু পুরোহিতদের সহায়তা নিয়ে মসজিদ (মিজিগিতি) নির্মাণ করান এবং সেখানে মুসলিম ধর্মোৎসব পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

৮. সরকার ডি.সি, সি.ই, পৃঃ ৪০৫, ছন্দ ২৫-২৬।

৯. ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, দি জিওগ্রাফিক্যাল ডিকশন্যারি এনশেন্ট অ্যান্ড মিডিয়াভাল ইন্ডিয়া (জি.ডি), দিল্লী, ১৯৯১, পৃ: ১১৩।

১০. পন্টুলু জে. আর, 'মলকাপুরম্‌ ষ্টোন পিলার ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌ অব রুদ্রদেব (রুদ্রাম্বা) শক সম্বৎ ১১৮৩', জার্নাল অব অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি (জ.এ.এইচ.আর.এস), খন্ড ৪, অংশ ৩-৪, ১৯২৯-৩০, প্রথমদিক পৃ: ১৫৬-৫৭, লাইন নং ৫৭-৬৩, দ্বিতীয় দিক, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ২-৩;
দ্বিতীয় দিক, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ৪-৫:

দ্বিতীয় দিক, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ৬।

১১. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ৬।

১২. মালালসেকের জি.পি, ডিকশন্যরি অব পালি প্রপাব নেমস্, খণ্ড ১, তৃতীয় সংস্করণ, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫, পৃ: ৫৩৮; তুলনীয় কাশ্যপ জে (সম্পা:), দ্য সংযুক্তনিকায়, বিহার, ১৯৫৯, পৃ: ৮৬-৮৮।

১৩. পন্টুলু জে.আর. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় দিক, লাইন নং ১৩-১৪।

১৪. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ১১-১২।

১৫. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ৭।

১৬. ঐ, তদেব, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ২১-২২।

১৭. বুহলার জি, এ.ই, পৃ: ২৮৪, ছন্দ ৪১।

১৮. ঐ, তদেব, পৃ: ২৮৪, ছন্দ ৪২।

১৯. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৩।

২০. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৪।

২১. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৬।

২২. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৭।

২৩. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৮।

২৪. ঐ, তদেব, ছন্দ ৪৯।

২৫. ঐ, তদেব, ছন্দ ৫০।

২৬. ঐ, তদেব, ছন্দ ৬৫।

২৭. ঐ, তদেব, ছন্দ ৫২।

২৮. ঐ, তদেব, ছন্দ ৫৭।

২৯. ঐ, তদেব, পৃ: ২৭৮, পাদটিকা নং ৩৪।

৩০. ঐ, তদেব, ছন্দ ৬১।

৩১. ঐ, তদেব, পৃ: ২৮৬, ছন্দ ৬৩।

৩২. ঐ, তদেব, পৃ: ২৮৬, ছন্দ ৬৬।

৩৩. ঐ, তদেব, ছন্দ ৬৪।

৩৪. পন্টুলু জে. আর, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৮, লাইন নং ২১-২২।

৩৫. সরকার ডি.সি, ইন্ডিয়ান এপিগ্র্যাফিক্যাল গ্লোসারি (সংক্ষেপে গ্লোসারি), দিল্লী, ১৯৬৬, পৃ: ১৭০।

৩৬. পন্টুলু জে. আর, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয়দিক, লাইন নং ৪৭।

৩৭. ঐ, তদেব, দ্বিতীয় দিক, লাইন নং ৪৮।

৩৮. ঐ, তদেব, পৃ: ১৬০, দ্বিতীয় দিক, লাইন নং ৭১।

৩৯. ঐ, তদেব, পৃ: ১৬১, তৃতীয় দিক, লাইন নং ১৩।

৪০. চক্রবর্তী রণবীর, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, বাংলা, কলকাতা, ১৩৯৮,

পৃ: ১৫৫।

৪১. পন্টুলু জে. আব, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬১, তৃতীয়দিক, লাইন নং ২১।

৪২. সরকার ডি.সি. গ্লোসারি, পৃ: ৩৯; তুলনীয় ঐ, ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি, নতুন দিল্লী, ১৯৬৫, পৃ: ৪০৬।

৪৩. পন্টুলু জে. আর, প্রাগুক্ত, তৃতীয়দিক, লাইন নং ২৫।

৪৪. ঐ, তদেব, দ্বিতীয়দিক, লাইন ৭৩-৭৪।

৪৫. ঐ, তদেব, তৃতীয়দিক, লাইন নং ৩।

পরমারকালীন মন্দিরশিল্পের অনুপম নিদর্শন: উনগ্রাম

স্বাতী দাস (মন্ডল অধিকারী)

যুগযুগান্তর ধরে ভারতবর্ষ শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান। প্রাচীন ভারতে শিল্প ও ধর্মের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটেছিলো, তা আজও ভারতীয়দের কাছে এক গৌরবজনক উত্তরাধিকার। দেবদেবীব সম্মানে যে দেবালয় নির্মিত হয়, তা শুধুমাত্র ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো না। মন্দিবগুলি স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্পের সুসমাহারের চিরন্তন নিদর্শন। প্রাচীন ভাবতের সর্বত্র গড়ে উঠেছিলো অসংখ্য মন্দির। আমাদের দুর্ভাগ্য, এদের বেশীবভাগই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেইটুকু সামান্য নিদর্শন আজও বর্তমান তা আমাদের কাছে অমূল্য রত্নের মতোই আদরণীয়। এদের মধ্যে কোনটি হয়ে উঠেছে বিখ্যাত, কিন্তু কোনটি হয়েছে অবহেলিত। এমনই একটি স্থান হোল 'উন'। যেখানে আজও দেখা যায় আটটি মন্দির-যেগুলির সৃষ্টি হয় পরমার রাজবংশের শাসনকালে (৮০০-১৩০৫ খ্রীঃ)।

উন মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম নিমাড়ের অর্ন্তগত খারগোন জেলা তহসিলের একটি ছোট গ্রাম।
গ্রামটি বোম্বাই-আগ্রা রাষ্ট্রীয় রাজপথের থেকে প্রায় ৩৫ কিমি: ভেতরে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, গ্রামটি সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর উত্তরে অবস্থিত। এই স্থান প্রাচীন মালয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে পরমার রাজাগণ সগৌরবে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন।

বর্তমানে উন অন্যান্য গ্রামের ন্যায় বিশেষত্বহীন। কিন্তু এখানে যে আটটি মন্দির ও আরও কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা প্রমাণ করে হাজার বছর আগে স্থানটি সমৃদ্ধ মন্দিরনগরী ছিল। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈনসাহিত্যে এই স্থানটির নাম পাবাগিরি। জৈন সাহিত্যে বলা হয়েছে-"সুবর্ণভদ্র ও অন্য তিন সপ্তকে নমস্কার, যাঁরা চলনা নদীতীরে স্থিত পাবাগিরিতে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন।"[১] উনগ্রামের একটি মন্দিরে (১নং চৌবারা ডেরা) পরমারকালীন শিলালেখ খোদিত আছে, যেখানে পরমাররাজ উদয়াদিত্যের (রাজত্বকাল ১০৭০-১০৮৬খ্রীঃ) নাম পাওয়া যায়।[২] এই মন্দিরের অন্তরাল অংশে রয়েছে একটি সর্পবন্ধ শিলালেখ, যেখানে দেবনাগরী বর্ণমালা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু সূত্র উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত লেখ থেকে জানা যায়, এই মন্দিরে গ্রামের বালকগণ সংস্কৃতশিক্ষার্থে আসতো। এই সমস্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, হাজার বছর আগে উনগ্রামটি ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কৃতির পীঠস্থান ছিলো।

জনশ্রুতি অনুসারে, এখানকার রাজা ১০০টি মন্দির নির্মাণের জন্যে মনঃস্থির করেন। কিন্তু ৯৯টি মন্দির তৈরী হওয়াব পর রাজা মারা যান, একটি মন্দির গড়া বাকী থেকে যায়। স্থানীয় ভাষায় ৯৯ হোল 'উন'-তাই এই গ্রামের নাম হয় উনগ্রাম। উন শব্দটি ন্যূন বা কম অর্থে ১০০টির কম, তাও বোঝাতে পারে। অবশ্য উপরোক্তগল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তা বলা যায় না। তাছানা ৯৯টি মন্দিরের অস্তিত্বও দেখা যায় না। কিন্তু একটি গ্রামে একসঙ্গে ৮টি মন্দিরের অবস্থান ইতিহাস, শিল্প ও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

উনগ্রামের প্রধান আকর্ষণ মন্দিরগুলি। কি গঠনসৌকর্যো, কি ভাস্কর্যসুষমায়, প্রতিটি মন্দিরই অনবদ্য। মহেশ্বরী দয়াল খারে যথার্থই বলেছেন, "The temples of un display a combination of architectural skill and sculptural maturity."[৩]

মন্দিরগুলি স্থানীয় বালিপাথরে নির্মিত। এর কোনটিরই গাঁথনীর জোড়ে কোন মশলা ব্যবহৃত হয়নি। ভারসাম্য বজায় বেখে পাথবের ওপর পাথর সাজিয়ে মন্দির নির্মাণের তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিই এখানে গৃহীত হযেছিল। এখানে হিন্দু ও জৈন উভয়ধর্মের মন্দিরই রয়েছে। মন্দির গুলি নাগরশৈলীতে গঠিত। প্রতিটি মন্দিবে গর্ভগৃহ, অন্তরাল, স্তম্ভযুক্তমন্ডপ, দ্বারমন্ডপ বা মুখমন্ডপ, কখনো কখনো মন্ডপেব দুইপার্শ্বে দুটি পার্শ্বমন্ডপ দেখা যায়। প্রতিটি মন্দিরে শিখব টাওয়ারসদৃশ্য। শিখরে অন্তর্মুখী ধনুকাকৃতি বক্রতা লক্ষণীয়। শিখরগুলি অঙ্গশিখর, পদক বা মেডালিয়ান এবং চৈত্যগবাক্ষের ক্ষুদ্র অনুকরণ (সূরসেনক) দ্বারা সজ্জিত লতার সমন্বয়ে গঠিত। মন্দিবগুলি উঁচু ভিতেব ওপর অবস্থিত। মালয়া অঞ্চলের একটি স্থানীয় মন্দির নির্মাণরীতি হোল ভূমিজ-রীতি। ভূমিজ অর্থে-ভূমি থেকে জাত। উনের মন্দিরগুলি ভূমিজ-রীতি অনুসারে নির্মিত।

পঞ্চায়তন ও সপ্তায়তন দেবস্থান উনগ্রামে বর্তমান। তবে এইসকল ক্ষেত্রে কোনটিই বর্তমানে অক্ষত অবস্থায নেই। অবশ্য ভিতগুলি বর্তমান।

উনগ্রামের সর্ববৃহৎ মন্দিরটি হোল ১নং চৌবারা ডেরা। এটি একটি শৈব মন্দির। মন্দিরেব সামনে নন্দীমূর্তি (শিবের বাহন) আজও বর্তমান। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের ওপর কেন্দ্রস্থানে (ললাটবিম্বস্থান) গণেশমূর্তি উৎকীর্ণ। মন্দিরটি বর্গাকার গর্ভগৃহ, অন্তরাল, আয়তাকার মন্ডপ, দুইপাশে দুটি পার্শ্বমন্ডপ ও সম্মুখে একটি মুখমন্ডপ নিয়ে গঠিত। বর্তমানে গর্ভগৃহটি ভগ্ন, শিখরের অস্তিত্ব নেই। এই মন্দিরটি একটি পঞ্চায়তন দেবস্থানের মুখ্যমন্দির। এই মন্দিরটি ঘিরে চারকোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির ছিলো। এখনশুধুমাত্র মুখ্যমন্দিরের পশ্চাৎদিকে দক্ষিণপশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। মুখ্যমন্দিবের সম্মুখে ডানদিকে আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান। বাকী দুটি ছোট মন্দির বর্তমানে লুপ্ত। এই গৌণ মন্দিরগুলি মুখ্যমন্দিরেরই ক্ষুদ্র সংস্কবণ। প্রতিটি মন্দির গর্ভগৃহ, মন্ডপ, মুখমন্ডপ ও টাওয়ারসদৃশ শিখরে সুগঠিত ছিলো।

স্তম্ভগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত। বিশেষ করে মন্ডপের চারকোণে চারটি স্তম্ভ অপূর্ব কারুকার্যে অলঙ্কৃত। প্রতিটি স্তম্ভেব নীচের দিকে রয়েছে উপবিষ্ট দেবদেবীমূর্তি; তাব ওপরে রয়েছে নৃত্যবাদ্য প্যানেল-নৃত্যভঙ্গিমা, হস্তমুদ্রা ও পদঅবস্থান যা ভারতীয় মার্গীয় নৃত্যের

পূর্ণবিকশিত রূপ প্রদর্শন করে। এর ওপরে রয়েছে অপ্সরা মূর্তি। নান্দনিকতায় ও বিষয়বৈশিষ্ট্যে এইগুলি খাজুরাহোর অপ্সরামূর্তির সমতুল্য। অপ্সরা মূর্তিগুলি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত। যেমন-নৃত্যরতা, প্রসাধনরতা, স্খলিতবসনা ইত্যাদি। অপ্সরামূর্তিগুলির ওপর পরপর ছ'টি প্যানেলে দেবদেবীমূর্তি দেখা যায়। তারও ওপরে রয়েছে নৃত্যবাদ্য প্যানেল। অন্যান্য স্তম্ভগুলি পুষ্পসজ্জা, অপ্সরামূর্তি ও জ্যামিতিক অলঙ্করণে সুসজ্জিত। মন্ডপের ভেতরের ছাদ বৃত্তাকারে সূক্ষ্ম কারুকার্যে পূর্ণ। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে চৌরি বা চামরধারিণী অপ্সরা প্রভৃতির মূর্তি ও দ্বারের নীচে চন্দ্রশিলা বর্তমান। তাছাড়া মন্ডপে প্রবেশের দ্বার ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে অলঙ্কৃত। অন্তরালের সদরে ব্রহ্মা, গণেশ, শিব, বিষ্ণু ও সরস্বতীর মূর্তি বর্তমান। মন্দিরের বাইরের দিকের দেওয়ালে, অধিষ্ঠানে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়।

যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি (দক্ষিণ পশ্চিমদিকে) আজও বর্তমান, তার শিখর অঙ্গশিখর, মেডালিয়ান বা পদক, চৈত্যগবাক্ষের ক্ষুদ্র অনুকরণযুক্তলতা দ্বারা সুসজ্জিত। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার, স্তম্ভ ও অধিষ্ঠান অলঙ্কৃত।

১নং চৌবারা ডেরার পাশের মন্দিরটি ১নং মহাকালেশ্বর মন্দির। এটি শৈবমন্দিব-মন্দিরের সম্মুখে নন্দীমূর্তি বর্তমান। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ নিয়মিত পূজিত হন। গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মন্ডপ, দুইপাশে দুটি পার্শ্বমন্ডপ ও সামনে মুখমন্ডপ নিয়ে গঠিত মন্দিরটির মুখমন্ডপ, একটি পার্শ্বমন্ডপ ও মন্ডপ সম্পূর্ণ ভগ্ন। শিখরটি অর্ধভগ্ন। মন্দিরটি উঁচু ভিতের ওপর অবস্থিত, এখানে ওঠার সিঁড়ি বর্তমানে অর্ধভগ্ন। এই মন্দিরের স্তম্ভগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যমন্ডিত। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে চামরধারিণী, সনালমৃণালধারিণী মূর্তি বর্তমান। প্রবেশপথে চন্দ্রশিলা ও ললাটবিম্বস্থানে গণেশমূর্তি বর্তমান। বাইরের দিকের দেওয়াল নটরাজ, ত্রিপুরান্তকমূর্তি ও চামুন্ডামূর্তিতে সুসজ্জিত।

গ্রামের প্রধান সড়ক ছেড়ে খানিকটা গ্রামের ভেতরদিকে এগিয়ে গেলে যে মন্দিরটি চোখে পড়ে, সেটি হোল নীলকন্ঠেশ্বর মন্দির। মন্দিরটির সামনে স্থাপিত নন্দীমূর্তি। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ নিয়মিত পূজিত হন। স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে এটি পূর্ববর্ণিত মন্দিরগুলির মতো বিভিন্ন অঙ্গগুলি হোল, গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মন্ডপ, মুখমন্ডপ। বর্তমানে শুধু গর্ভগৃহ ও অন্তরাল ব্যতীত ভেঙে পড়েছে মন্দিরের বাকি অংশ। শিখর সামনের দিকে ভগ্ন হলেও পশ্চাৎদিকে অনেকাংশে অটুট।

শিখরের অলঙ্করণে অঙ্গশিখর, পদক, চৈত্যগবাক্ষের ক্ষুদ্র অনুকরণযুক্ত লতার সমাবেশ দেখা যায়। মন্দিরের ভিত বেশ উঁচু। ওপর ওঠার সিঁড়ি ভগ্ন। সূক্ষ্ম অলঙ্করণে মন্দিরের বহির্গাত্র আবৃত। নটরাজ, ত্রিপুরান্ত, চামুন্ডার মূর্তি ছাড়াও উপবিষ্ট গণেশমূর্তি, অন্যান্য দেবদেবী, উপবিষ্ট বা দন্ডায়মান মিথুন যুগল ইত্যাদি চোখে পড়ে। গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের দুইপাশে চামরধারিণী, সনালমৃণালধারিণী মূর্তি রয়েছে।

পঞ্চায়তন মন্দির সমাবেশের মুখ্য মন্দিরটি মহাকালেশ্বর নং ২ নামে আখ্যাত। চারদিকের ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র দুটি মন্দিরের ভিতের চিহ্ন রয়েছে। এই মন্দিরটি স্থানীয় নারায়ণী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে শুধু গর্ভগৃহটি দাঁড়িয়ে

আছে। এই মন্দিরটির গর্ভগৃহের মেঝে ভূমিতল অপেক্ষা বেশ খানিকটা নীচে অবস্থিত। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পূজা আজও হয়।

সম্মুখদিকে মন্দিরের বহির্দেওয়াল ভগ্ন হলেও পশ্চাৎদিকের দেওয়াল ও শিখর উভয়ই আংশিকভাবে অটুট। শিখর অঙ্গশিখরও লতাসজ্জিত। বহির্দেওয়ালগাত্রে ত্রিপুরান্তকমূর্তি, গণেশ, মিথুনযুগল, বিভিন্ন দেবদেবীমূর্তি চোখকে মুগ্ধ করে।

গ্রামের মধ্যে দুটি ছোট মন্দির চোখে পড়ে। একটি মন্দিরের নাম গুপ্তেশ্বর বা হটকেশ্বর মন্দির। বর্তমানে মাটির তলায় অর্ধপ্রোথিত গর্ভগৃহটি ব্যতীত অন্য অংশগুলি লুপ্ত। প্রবেশদ্বারটি দুইপার্শ্বে ও ওপরদিকে সূক্ষ্ম কারুকার্যে অলঙ্কৃত। দ্বারপার্শ্বে অলঙ্করণের মধ্যে উপবিষ্ট দেবমূর্তি (আয়ুধ অস্পষ্ট) দেখা যায়। নন্দীমূর্তিটি আজও আছে। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ নিয়মিত পূজিত হন। অপর একটি ছোট মন্দির ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। এটির শুধুমাত্র গর্ভগৃহ বর্তমান-বাকী অংশ লুপ্ত। মন্দিরের একপার্শ্বে একটি অর্ধভগ্ন স্তম্ভের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখলে বোঝা যায় এই মন্দিরটিও অলঙ্করণে সমৃদ্ধ ছিলো। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের নিয়মিত পূজা হয়। নন্দীমূর্তিটি বর্তমানে ভগ্ন।

গ্রামের প্রধান সড়ক ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে বল্লালেশ্বর মন্দির। এটির শুধুমাত্র গর্ভগৃহ ও অন্তরাল বর্তমান। মন্দিরটির সম্মুখে একাধিক নন্দীমূর্তির সমারোহ দেখে মনে হয়, এর অধিকাংশই আশপাশ থেকে সংগৃহীত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটিকে মেরামত করা হয়। ফলে শিখরটি বর্তমানে গম্বুজে রূপান্তরিত। মন্দিরের চারদিকে আজও ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে স্তম্ভের ভগ্নাংশ, কুলুঙ্গী, ভগ্ন দেবদেবীমূর্তি। মন্দিরগাত্রে সপ্তমাতৃকা প্যানেল, ললিতাসনে উপবিষ্ট বীণাধর শিব ও গণেশমূর্তি লক্ষণীয়। এর চারদিকে অন্যান্য মন্দিরের ভিত থেকে অনুমান করা যায় এখানে সমষ্টিবদ্ধভাবে সাতটি মন্দিরের সমাবেশ ছিলো।

২নং চৌবারা ডেরা হোল একটি জৈন মন্দির। মন্দিরটি বর্তমানে অর্ধভগ্ন। গর্ভগৃহের চারদিকে দেওয়াল থাকলেও ছাদ ভাঙা। শিখর সম্পূর্ণ লুপ্ত। গর্ভগৃহ অন্তরাল দ্বারা মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত। মণ্ডপটি আটটি স্তম্ভ দ্বারা সুসজ্জিত-এগুলি বৃত্তাকারে স্থাপিত। স্তম্ভগুলিতে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক অলঙ্করণ ছাড়াও দণ্ডায়মান জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্তি দেখা যায়। মুখমণ্ডপটি ভগ্ন। তবে মুখমণ্ডপের স্তম্ভগুলি বর্তমান, যেগুলির সূক্ষ্ম অলঙ্করণ প্রশংসনীয়। মণ্ডপটির চারদিকে রয়েছে চারটি প্রবেশদ্বার। একটি সম্মুখে, দুটি দুইপার্শ্বে ও একটি গর্ভগৃহের দিকে।

বহির্গাত্রে অপরূপ মূর্তিসম্ভার চোখকে মুগ্ধ করে। একাধিক ভঙ্গিমায় অপ্সরামূর্তি এখানে দেখা যায়-খঞ্জরধারিণী, চামরধারিণী, নূপুরপাদিকা, বংশীবাদনরতা, নৃত্যরতা ইত্যাদি। নৃত্যবাদ্য প্যানেল রয়েছে একাধিক। হংস, হস্তীযুগের লড়াই এবং সারি দিয়ে বৃষমূর্তি চোখে পড়ে। এছাড়াও রয়েছে উপবিষ্ট দেবীমূর্তি এবং দন্ডায়মান জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি।

অপর একটি জৈন মন্দিরের নাম গোলেশ্বর মন্দির।তবে এই মন্দিরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুনরূপে সংস্কার করা হয়েছে। ফলতঃ এই মন্দিরটির প্রাচীন রূপ কেমন ছিলো, তা বোঝা সম্ভব নয়। গর্ভগৃহ, অন্তরাল ও মণ্ডপ নিয়ে গঠিত এই মন্দিরটি গ্রামস্থ একটি ছোট টিলার ওপর অবস্থিত। গর্ভগৃহের মেঝে মন্ডপের মেঝে অপেক্ষা দশ ফুট নীচু। গর্ভগৃহে তিনটি দণ্ডায়মান জৈন দিগম্বরমূর্তি অধিষ্ঠিত। মাঝখানের মূর্তিটি সবচেয়ে বড়। এটির উচ্চতা সাড়ে

বারো ফুট।

মন্দির ছাড়া উনগ্রামে আরও একটি কীর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এটি 'বাওলী' বা স্থায়ী জলাদার। উনগ্রামে গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যধিক। এইসময়ে নদীর জলও শুকিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোনও সময়ই বাওলীর জল শুকিযে যায় না। জলাধার, জলস্তর অবধি সিঁড়ি- মোটামুটি এই হোল বাওলীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, উনগ্রামে প্রায় ১২/১৩টি বাওলী ছিলো, প্রতিটিই খুব পুরোনো। বতর্মানে দু'তিনটি বাওলী দেখা যায। বাকীগুলি বুজিয়ে দেওযা হয়েছে। বাওলীগুলি কখন তৈরী, তার উত্তর সঠিক জানা নেই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাওলীর পাশে পুরোনো মূর্তি (অনন্তশায়ীন বিষ্ণু, অপ্সরা ইত্যাদি) পাওয়া গেছে। তাই হতে পারে, কোন কোন বাওলী খুবই প্রাচীন।

বর্তমানে উনগ্রাম কোন বিখ্যাত পর্যটনস্থল নয়, কিন্তু এখানে যে সম্পদ আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের জন্যে সঞ্চিত রেখে গেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। ইতিহাস, শিল্পসংস্কৃতি, ধর্ম-প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে উনগ্রামের মন্দিরগুলির মূল্য অপরিসীম।

সূত্র নির্দেশ

১. প্রেমী নাথুরাম; জৈন সাহিত্য অর ইতিহাস (হিন্দি)।

২. Archaeological Survey of India, Annual Report, 1918-1919, p-7.

৩. Khare, M.D; Un-An Important Centre of Paramara Art and Architechture [Art of the Paramaras of Malwa- Edited by R.K Sharma, p-49]
(Proceedings of the U.G.C sponsored All-India Seminar held at Prachya Niketan, Centre of Advanced Studies in Indology and Museology; Bhopal. Jan. 21-23, 1978., Agam Kala Prakashan, Delhi

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী

- Bhatia Pratipal - The Paramaras
(Munshiram Manohorlal Oriental Publishers, New Delhi)
- Srivastav Premnaravan - Madhva Pradesh Dist. Gazetter (West Nimar)

খিজিঙ্গকোট্টের শিল্প ইতিহাস ও রমাপ্রসাদ চন্দ

রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়

১৯২২ সালের কার্তিক মাসে হিমেল হাওয়াকে সঙ্গী করে, খিচিং-এ পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে গিয়েছিলেন উনপঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় রমাপ্রসাদ চন্দ। পুরাকীর্তি ও ভঞ্জরাজবংশের তাম্রশাসনসমূহের উপর ভিত্তি করে পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা বর্তমান খিচিংকে প্রাচীন খিজিঙ্গকোট্ট বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] খিচিং বা খিজিঙ্গকোট্ট উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজেশ্বর পশ্চিম অংশে অবস্থিত। ময়ূরভঞ্জের প্রধান শহর বারিপদা থেকে তার দূরত্ব ৯১ মাইল। ইতিহাসের বিচারে খিচিং সুপ্রাচীন অঞ্চল। খিচিংযের নিকটবর্তী বহালড়া থেকে মৌর্য আমলের আহত মুদ্রা (punch-marked coins) ও ভঞ্জকিয়া এবং খিচিং থেকে কুষাণ আমলের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[২]

খিচিংয়ের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হল ৮৫০-১০৫০ খ্রীঃ এবং খিচিং এই সময় খিজিঙ্গমণ্ডল নামে এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নিবন্ধটিতে পূর্বোক্ত সময়ে (৮ম-১১শ খ্রীঃ) ভঞ্জরাজাদের আমলে খিচিংয়ে যে শিলাচর্চার স্ফুরণ ঘটেছিল তার ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দের অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

১৯২২ সালে রমাপ্রসাদ যখন খিচিংএ যান, ততদিনে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বচর্চায় অতি সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি। ময়ূরভঞ্জের তৎকালীন মহরাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব যখন প্রত্নতত্ত্ব অবেক্ষক স্যার জন মার্শালের কাছে তাঁর রাজ্যে প্রত্নতাত্ত্বি ক অনুসন্ধান কার্য চালাবার জন্য অনুরোধ করেন।[৩] তখন স্যার মার্শাল নির্দ্বিধায় এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র রমাপ্রসাদের উপর।

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে, শ্রীধর খোলায় ১৮৭৩ সালে রমাপ্রসাদ চন্দের জন্ম।[৪] স্বদেশী যুগে হিন্দু স্কুল ও রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ইতিহাস শিক্ষকতা, অক্ষয়কুমাব মৈত্রের সাহচর্যে ও দীঘাপতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায়ের বদান্যতায় রাজশাহীতে বিশাল আঞ্চলিক সংগ্রহশালা নির্মাণ, নৃতত্ত্বের গবেষক হিসাবে বাঙালিজাতির দেহগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্যের পর ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্বে সর্বেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২১ সাল ভারতীয় মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্বশালার নিয়ামকেব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পদে থাকাকালীনই খিচিংএ- প্রথমে ক্ষেত্রানুসন্ধান ও পরে খনন কার্য পরিচালনা করেন রমাপ্রসাদ। ১৯২২-২৩, ২৩-২৪, ২৪-২৫ পরপর তিন বছর

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বার্ষিক রিপোর্টে খিচিংয়ে খননকার্যের বিবরণ ও মন্দির পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে চিত্রগ্রাহক মুন্সী শের মুহাম্মদ, কামাখ্যাপ্রসাদ বোস ও পন্ডিত তারকেশ্বর গাঙ্গুলির সাথে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা এবং হরিপুর, মান্ত্রি, বরসাই, খিচিং ঘুরে দেখেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম। রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীনভাবে রমাপ্রসাদ লেখেন, প্রাচীনত্বে ও গুরুত্বে খিচিং অনায়াসে, হরিপুর, মান্ত্রি ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যায়।[৫] এই অনুসন্ধানের সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে ঠাকুরাণীর মন্দিব বলে অভিহিত মূল আরাধ্যা দেবীর (চামুণ্ডামূর্তি) আরও কয়েকটি মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তাদের গায়ের অলংকরণ বা মূর্তি শিল্পের বিচারে যথেষ্ট উন্নত। ঠাকুরাণীর মন্দিরের সামনেই এক খণ্ডিয় দেউল বা অসম্পূর্ণ মন্দির আবিষ্কার করেন রমাপ্রসাদ। পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে আসেন যে শিখর তৈরি হওয়ার আগেই এই চৌকো গর্ভগৃহসম্পন্ন মন্দিরটির নির্মাণ কার্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সব থেকে বেশি আকর্ষণ করে খণ্ডিয় দেউলের প্রবেশদ্বারের দু ধারে গঙ্গা-যমুনার দুটি মূর্তি। সাথে লতানো নক্সা যার সূত্রপাত অপূর্ব খোদিত মূয়রপুচ্ছ থেকে। অভিজ্ঞ, সংবেদনশীল কলানুরাগী রমাপ্রসাদ সহজেই ধরতে পারেন মূর্তিদুটির প্রতীকি অর্থ। ভক্তের মন্দিরে প্রবেশ করার সময় মনে হবে সে যেন গঙ্গা যমুনা এই দুই পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করে পবিত্র হয়ে তার আরাধ্য দেব/দেবীর কাছে এসেছে। মুগ্ধ রমাপ্রসাদ লেখেন-"লতার অদ্ভুত নক্সা, (মূর্তিগুলির) অলঙ্করণহীন চালচিত্র এমন কি নিম্নভাগের নিপুন নির্মাণ ইঙ্গিত করে যে এখানে একটি স্থানীয় ভাস্কর্যের ঘরানা ছিল, যা স্বকীয় ধারায় গড়ে উঠেছিল।[৬]

ঠাকুরাণীর মন্দিরের পাঁচশোগজ দূরে নীলকন্ঠেশ্বর বা কুতাই তুণ্ডীর মন্দিরের গায়ের ছোট মাঝারি ভাস্কর্য ও নক্সা রমাপ্রসাদকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি রিপোর্টে পরিষ্কার জানান, কুতাই তুণ্ডী অক্ষত অবস্থায় ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরগুলির থেকে কোন অংশে কম ছিল না, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে এই মন্দিরকে তুলে দিতে গেলে তার আশু সংবক্ষণের প্রয়োজন।[৭]

১৯২৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের জানুয়ারী-টানা দু'মাস ঠাকুরাণী মন্দির চত্বরে খননকার্য পরিচালনা করেন রমাপ্রসাদ। পাশে সহকারী হিসাবে ছিলেন পরেশনাথ ভট্টাচার্য ও অনাথবন্ধু মৈত্র। এই খননের ফলে বহু প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায় (কিছু আবার লেখ সম্বলিত) এবং খণ্ডিয় দেউলের ভিতের নিচে প্রাচিনতর একটি মন্দিরের হদিশ পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ নির্ণয় করেন যে খন্ডিয় দেউলের নির্মাণকাল ১৫-১৬শ খ্রীষ্টাব্দ ও তার তলায় যে প্রাচীনতর ত্রিরথ মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা ১১শ খ্রীষ্টাব্দের। উৎখনিত শিল্পবস্তু সংরক্ষণের জন্য ঠাকুরাণী চত্বরেই একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়, বলাই বাহুল্য রমা প্রসাদেরই উদ্যোগে।[৮]

১৯২৪-২৫ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মহারাজা পূর্ণচন্দ্রদেব রমাপ্রসাদকে নির্দেশ দেন খন্ডিয় দেউল ভেঙে, তার জায়গার চামুণ্ডা বা খিচকেশ্বরী ব খিচিকেশ্বরীর (খিচিংয়ের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী) একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করতে। এই কাজ ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় ও পরে পরমানন্দ আচার্য শেষ করেন।

খিচিং বা ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্প সংক্রান্ত বর্তমানে যা বই বা গবেষণাপত্র আছে, তা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ১৯১১ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ "আর্কিওলজি অফ্ ময়ূরভঞ্জ"-এ খিচিংয়ের পুরাকীর্তির উল্লেখ করলেও সেখানকার পুরাকীর্তি ও শিল্পবস্তুকে বিদ্বজ্জনের ভাবনা-চিন্তার জগতে গুরুত্ব দিয়ে তুলাধরার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রমাপ্রসাদ চন্দের। সংগ্রহশালা স্থাপনের মাধ্যমে তিনি যে অসীম উপকার করে গেছেন, তার ঐতিহাসিক ও বাস্তবিক মূল্য বাদ দিলেও তিনি যেভাবে তার বিভিন্ন লেখায় খিচিংয়ের শিল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দাবি রাখে।

খিচিংয়ের মন্দিরশৈলী উড়িষ্যার অন্য অংশের থেকে বা সাধারণভাবে স্বীকৃত শৈলীর থেকে যে আলাদা তা নির্দেশ করেছেন রমাপ্রসাদ। ওড়িষ্যার অনুসৃত নাগর শৈলীটির নির্মাণ প্রকরণের প্রধান লক্ষণগুলি হল সুউচ্চ মূল শিখর সংলগ্ন জগমোহন, নাটমন্ডপ, ও ভোগ-মন্ডপ। এছাড়াও একাধিক উপমন্দির এবং প্রাকারবেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গনও দেখা যায়। কিন্তু খিচিং-এ যে মন্দিরস্থাপত্য পুষ্টিলাভ করেছিল, তাতে এই অনাবশ্যক আড়ম্বরের দিকটি বর্জিত। ১১শ ও ১২শ খ্রী: নির্মিত মন্দিরগুলির আকারে অন্যান্য জায়গার তুলনায় ছোট এবং কোনটিরই মুখমন্ডপ নেই। পার্সি ব্রাউনের মতে উড়িষ্যার সাবেক নাগরশৈলী আর রায়বাংলার মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে খিচিংয়ের এই দেবালয়গুলি। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলায় সরলীকৃত এই স্থাপত্য রীতির বিস্তীর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। রমাপ্রসাদ কাব্যিক ভাষায় লিখেছেন যে বাহুল্য বর্জনের এই প্রয়াস শুদ্ধব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করে। মুখমন্ডপের নির্ভয় আচ্ছাদন ছাড়াই, ঝড়, জল, রোদ, বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকে যে ভক্ত, তার অন্তরের ভক্তির দীপশিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে।[৯]

খিচিংয়ের মূর্তি ভাস্কর্যের কথা বলতে গিয়ে রমাপ্রসাদ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সব ধর্মের আরাধ্য মূর্তিই পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর ও সুনিশ্চিত মূর্তিগুলিকে তিনি ১১-১২ খ্রী· বলে চিহ্নিত করেছেন মন্দিরের গায়ে খোদিত যে মূর্তিগুলি, শৈলীর বিচারে, রমাপ্রসাদ তাদের ভুবনেশ্বরের পরের দিকের মন্দিরগুচ্ছ-যেমন মুক্তেশ্বর লিঙ্গরাজ ইত্যাদির সমসাময়িক বলে মনে করেছেন।[১০] উন্নত নাসিকা, সরু হয়ে আসা ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ চিবুক সম্পন্ন এই মূর্তিগুলি উড়িষ্যার মধ্যে তো বটেই, ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের মধ্যে স্থানগ্রহণ করতে পারে বলে রমাপ্রসাদের যে দাবী, পরবর্তী গবেষণাতে তার আরও সমর্থন মিলেছে।[১১] ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের প্যানেলের কাজের সঙ্গে তুলনা করে রমাপ্রসাদ দেখিয়েছেন মন্দিরগাত্রে যে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র অলংকরণ যেমন লতানো নক্সা ও বিভিন্ন পশুমূর্তির প্যানেল তার কাজে উড়িষ্যা শিল্পীর ছাপ স্পষ্ট এবং এই শৈলী সম্পূর্ণ উড়িষ্যার।[১২]

কিন্তু রমাপ্রসাদের মতে, বড়, প্রমাণ সাইজের মূর্তিগুলিতে রয়েছে অন্যধারার স্বাক্ষর। ভুবনেশ্বর বা খাজপুরের মন্দিরগুলির বড় মূর্তির তুলনায় খিচিংয়ের পূর্ণাকৃতি মুখের মণ্ডল অনেক সংযত, তাদের বর্তনায় রয়েছে নিয়ম ও অভ্যাসের ছোঁয়া। রমাপ্রসাদ ইঙ্গিত করেছেন যে এই মণ্ডন ও বর্তনা সমকালীন গৌড়ীয় (বাংলা-বিহার) রীতির ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য।[১৩] আবার একই সঙ্গে অমিলও খুঁজে পেয়েছেন কারণ তিনি দেখিয়েছেন বাংলা বিহার শৈলীর যে দণ্ডায়মান মূর্তি, তার নিম্নাঙ্গের সংস্থাপন, খিচিংয়ের তুলনায় অনেক আড়ষ্ট। চালচিত্র বা পৃষ্ঠপটের অলংকরণেও খিচিং ও বাংলা-বিহারের মূর্তির ভিন্নতা রয়েছে। তাই তিনি উপসংহার টেনেছেন যে ভঞ্জ রাজারা গৌড়ীয় ঘরানায় দক্ষ কোন শিল্পীকে নিয়োজিত করেছিলেন। যিনি খিচিং এসে স্থানীয় শিল্পীদের প্রভাবেও অনুপ্রেরণায়, এক অনন্য মিশ্র শৈলীর জন্ম দিয়েছিল। যা একেবারেই খিচিংয়েব নিজস্ব।[১৪] সমসাময়িক শিল্প ওড়িয়া শিল্পীদের হাতে কুক্ষিগত থাকলে, খিচিংয়ে ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যেত। আদি মধ্যযুগীয় নতুন, আঞ্চলিক এক ঘরানার জন্ম হত না।[১৫]

খিচিংয়ে যে মিশ্র শৈলী পাওয়া যায় তার উদ্ভব ও স্বাতন্ত্র্যের আলোচনায় না গিয়েও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে 'খিচিংয়ের শিল্প শৈলীর অনন্য দিকটি ইতিহাসবেত্তা, কলারসিক ও গবেষকমহলে তুলে ধরেছেন রমাপ্রসাদ। ক্ষেত্রানুসন্ধান, সর্বেক্ষণের উদ্যোগ, মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ছাড়াও সর্বোপরি একটি উন্নতমানের শিল্পধারাকে শনাক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন তিনি। ১৯৪২ সালের ২৮শে মে বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার এলাহাবাদের বাড়িতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।[১৬] কিন্তু তিনি রেখে যান তাঁর খিচিংয়ের পুরাকীর্তি ও শিল্পবস্তু সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যও বিশ্লেষণের অমূল্য ভাণ্ডার। যা পরবর্তীকালে গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করেছে (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খিচিংয়ের মূর্তির ক্ষেত্রে বহুমূল্য আলোচনা; অর্জুন যোশী, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বলরাম শ্রীবাস্তব, শিল্প ইতিহাস) ও ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই করবে।

সূত্র নির্দেশ

১. অর্জুন যোশী, হিস্টরি এ্যাণ্ড কালচার অফ খিজিঙ্গকোট্ট বিকাশ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, পৃ: ২।
২. ঐ, পৃ: ১৪ এবং ২৮। উড়িষ্যা হিস্টরিকাল রিসার্চ জার্নালে (১, নং ২, জুলাই, ১৯৫২, পৃ: ২৭) বহালদা বা বহালড়া অঞ্চলের আহত মুদ্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।
৩. ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২২-২৩ ডি.বি. স্পুনার (সম্পা.), পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০, স্বাতী প্রকাশনী, দিল্লী।
৪. অশোক উপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ-সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জী, 'ঐতিহাসিক', বর্ষ-৭, সংখ্যা ১ ও ২, বৈশাখ ও চৈত্র, ১৪০৪।
৫. পূর্বোক্ত রিপোর্ট, ১৯২২-২৩।
৬. ঐ।
৭. ঐ।
৮. ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২৩-২৪।
৯. পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২২-২৩; রমাপ্রসাদ চন্দ, নোট্স অন দি এনসিয়েন্ট

মনুমেন্টস্ অফ ময়ূরভঞ্জ, জার্নাল অফ বিহার অ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ত্রয়োদশ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ১৩২।

১০. ঐ, পৃ: ১৩৪-৩৫; বার্ষিক রিপোর্ট-১৯২৪-২৫।

১১. বলরাম শ্রীবাস্তব, দি আর্ট অফ খিচিং, রামানন্দ বিদ্যাভবন, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ: ২ এবং ১৩-১৬।

১২. পূর্বোক্ত গবেষণাপত্র, জার্নাল অফ দি বিহার অ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ত্রয়োদশখণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ১৩৫।

১৩. ঐ।

১৪. ঐ, পৃ: ১৩৫-৩৬, 'ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্তি নিদর্শন', মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩৪।

১৫. ঐ, পৃ: ১৩৬।

১৬. অশোক উপাধ্যায়, 'রমাপ্রসাদ চন্দ', ঐতিহাসিক, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১ ও ২, বৈশাখ ও চৈত্র, ১৪০৪।

বাসুদেব সার্বভৌম একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

সুলেখা রায়

মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির যে দুটি ক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ স্থান স্বীকৃত; তা হল নব্যন্যায় এবং ভক্তিবাদ। এই ধারণা স্বীকৃত যে - "নব্যন্যায় চর্চামূলক জীবন ধারায় নব্যস্মৃতির প্রতি আনুগত্য থাকলেও বৈষ্ণবীয় ভক্তির কোন স্থান ছিল না।"[১] এইসঙ্গে একথাও বলা হয়ে থাকে, "নব্যন্যায়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপকদের কোন সামাজিক মত ছিল না।"[২] সাধারণভাবে নব্যন্যায়ের অধ্যাপকগণ সম্পর্কে এই ধারণা যথার্থ, কিন্তু বঙ্গে নব্যন্যায় সম্পর্কিত আলোচনায় অপরিহার্য ব্যক্তি বাসুদেব সার্বভৌম এর ব্যতিক্রম।

এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ্য তাঁর চিন্তাধারায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিসংক্রান্ত তথ্য। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পূর্ববর্তী সময়ই প্রধান বিবেচ্য। সেই সঙ্গে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি স্মরণে রাখা প্রয়োজন, অন্যথায় তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আলোচ্য বিষয় সূত্রে উল্লেখ্য তথ্যগুলি হল:

ক) সার্বভৌম রচিত অনেকগুলি ভক্তিমূলক পদ রূপগোস্বামী সংকলিত পদাবলীতে আছে: অবশ্য এইগুলির রচনাকালে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার আগে অথবা পরে এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কিন্তু ***হেত্বাভাসপ্রকরণ*** মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে রচিত।[৩] এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি একটি ভক্তিমূলক পদ। শ্লোকটি হল:

"হৃদ্ব্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমদ্ভুতং।
অনাভাসং পরংধাম ঘনশ্যাম মহংভজে।।"[৪]

খ) চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণের উদ্দেশ্য রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে একটি গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেটি হল স্বরূপ দামোদরের ***কড়চার*** রামানন্দ সংবাদ।

এই গ্রন্থ মতে :

চৈতন্যপ্রভুর লীলা পরম-গম্ভীর।
সে বুঝে তাঁর পদে যার মন স্থির।।
বিশ্বরূপ উদ্দেশ্য ছলে কপট বিহার।
ভক্তগণে ছাপা নহে কিছু কার্য্য তাঁর।।
রস-আস্বাদন লাগি ছলে দেশে দেশে।

ভক্তির স্থাপন কৈলা অশেষ বিশেষে।।
ভক্তগণে অনুগ্রহ-এ নহে অন্তর।
নিজ কার্য সাধিবারে গৌরাঙ্গ তৎপর।।[৫]

সুতরাং একমাত্র উদ্দেশ্য যদি নাও হয়, 'রসাস্বাদন'-যে তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম মিলিত হন বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে। ***চৈতন্যভাগবত*** অনুসারে তাঁর পুরী যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাত—

"জগন্নাথ দেখিতে সে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আসার মূল হেথা আছো তুমি।।"[৬]

এই সাক্ষাতকালে তিনি স্পষ্টভাবে 'কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি'-র অধিকারী বলে সার্বভৌমকে স্বীকৃতি দেন,—

তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি।।[৭]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহলে এই বিষয়টি বিতর্কিত।[৮] কিন্তু বৃন্দাবন দাসের এই ধরনের বিবৃতি থেকে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে চৈতন্য-পূর্বকাল থেকেই কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী হিসাবে সার্বভৌমের খ্যাতি ছিল।

গ) চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব অনুধাবনের ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে সার্বভৌম এ বিষয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হবার জন্য রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পরামর্শ দেন;—

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন।।

রায় কহে সার্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোহ হিতে হয় সাবধান।।[৯]

সুতরাং চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বেই সার্বভৌম ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তিবাদীদের সম্পর্কও ছিল।

ঘ) নবদ্বীপে বসবাসকালীন সময়েই 'কৃষ্ণ' বাসুদেবের উপাস্য ছিলেন। নবদ্বীপে অদ্যাপি সার্বভৌম-সেবিত 'বৃন্দাবন চন্দ্র' নিত্য পূজিত হন। আলোচ্য বিষয়ের সূত্রে স্মরণযোগ্য যে ন্যায়শাস্ত্রের উপাস্য দেবতা কিন্তু শিব।[১০]

অতএব এই সকল তথ্যসূত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় চৈতন্যপূর্বকালেই বাসুদেব সার্বভৌমের জীবনধারায় বৈষ্ণবীয় ভক্তির নির্দিষ্ট স্থান ছিল।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারেও সার্বভৌমের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। রায় রামানন্দ সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও চৈতন্যকে উপদেশ এই প্রকার ঃ-

"রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে।।
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।।"[১১]

সুতরাং তাঁর কাছে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাই ছিল বিচার্য, এক্ষেত্রে জাতি বিচার অনুচিত বলে তিনি মনে করতেন এবং এধরনের ভ্রান্তি বিষয়ে তিনি চৈতন্যদেবকে সচেতন করেন।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও তাঁর উদার মনোভাবের পরোক্ষ সমর্থন নবদ্বীপ অঞ্চলের লোকশ্রুতিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী পোড়ামা। পোড়ামার উৎপত্তি রহস্যাবৃত। কিন্তু প্রচলিত জনশ্রুতিগুলিতে[১২] একটি বিষয় সাধারণ যে - এই লৌকিক দেবীর অবস্থান প্রথমে মূল শহরের বাইরে ছিল, পরে বাসুদেব সার্বভৌমের উদ্যোগে ইনি শহরের কেন্দ্র স্থলে অধিষ্ঠিত হন। লোকশ্রুতিতে লৌকিক প্রধান দেবীর সঙ্গে সার্বভৌমের নামের সংযুক্তি অবশ্যই তাঁর সর্বজনগ্রাহ্যতার ইঙ্গিতবাহী।

বাসুদেব সার্বভৌমের পাণ্ডিত্য নবদ্বীপের সারস্বত সাধনাকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর খ্যাতি, উদার ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গী এবং জনপ্রিয়তা সম্ভবত অন্যের ঈর্ষা ও সন্দেহের কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নবদ্বীপ ত্যাগ করতে হয়েছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে জয়ানন্দ রচিত **চৈতন্যমঙ্গল** গ্রন্থে। এই বর্ণনা অনুসারে - নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে এই মিথ্যা অভিযোগ জানায় যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ তাঁর বিপদ ঘটাবে। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা নবদ্বীপের উপর অত্যাচার শুরু করেন। এর ফলে বাসুদেব সার্বভৌম উৎকলে ও তাঁর পিতা বিশারদ কাশী চলে যান। কিন্তু সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বাস করতে থাকেন এবং বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য ও ভট্টাচার্য শিরোমণি নবদ্বীপেই থেকে যান। অত:পর রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবদ্বীপবাসীদের অভয় দান করেন ও কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেন। ফলে যে সব মহাজন নবদ্বীপ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা আবার প্রত্যাবর্তন করেন। নবদ্বীপে সুখ সমৃদ্ধি বিরাজ করতে থাকে।[১৩]

এই গৌড়েশ্বর হচ্ছেন জালালুদ্দিন ফতেহ্ শাহ্,[১৪] যাঁর রাজত্বকাল ১৪৮১-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।[১৫] লক্ষণীয় এই ঘটনার ফলে সার্বভৌম ও বিশারদ ছাড়া আর কেউ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নি, বরং এরপর গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা স্বীকার করে নেন। সুতরাং বাসুদেব সার্বভৌম বিরোধী স্থানীয় ষড়যন্ত্রই এই ঘটনার মূল কারণ - এই অনুমান অসংগত নয়।

ঘটনাটির অন্য একটি দিকও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ বাজা হবে হেন আছে' — এবং গৌড়েশ্বরের পক্ষে এই বিপদের কারণ 'নবদ্বীপ বিপ্র' (সার্বভৌম?)। স্মরণযোগ্য যে ঠিক এই ধরনের অভিযোগ নিমাই পন্ডিতের জনপ্রিয়তার কারণে উত্থাপিত হয়েছিল।[১৬] পার্থক্য এই যে পূর্ববর্তী ঘটনার সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ্ এবং পরবর্তীসময়ে গৌড়েশ্বর ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্। এই কারণে সার্বভৌমের জনপ্রিয়তা স্বীকৃত বিষয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। বলা বাহুল্য সাধারণের প্রতি মরমী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত জনসাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন সম্ভব নয়।

সুতরাং একাধারে অসাধারণ পান্ডিত্য, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও 'বৃন্দাবন চন্দ্রের' উপাসনা, ভক্তিবাদে বিশ্বাস এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সংগতভাবে বাসুদেব সার্বভৌমকে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নত করা যায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) রমাকান্ত চক্রবর্তী, ***বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম***, কলিকাতা ১৯৯৬ খৃ., পৃ: ২২।

২) রমাকান্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ "বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার প্রভাব", ***মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি***, কলিকাতা, ১৯৯২ খৃ:, পৃ· ১৪৮।

৩) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ***বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা***, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ৩৮।

৪) ঐ পৃ: ৩৮।

৫) নির্মলেন্দু খাসনবীশ (সম্পাদিত) ***পূজ্যপাদ স্বরূপ দামোদর বিরচিত রামানন্দ সংবাদ***, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫।

৬) সুকুমার সেন (সম্পাদিত), ***চৈতন্যভাগবত***, সাহিত্য আকাদামি, ১৯৯১, পৃ: ২৫৯।

৭) ঐ পৃ: ২৫৯।

৮) শ্রী রাধা গোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, (মধ্যলীলা: প্রথম খণ্ড), সাধনা প্রকাশনী, পৃ: ২০০-২০২।

৯) ঐ পৃ: ২৪১।

১০) ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায়দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১ম খণ্ড, পৃ: ৩।

১১) *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত* প্রাগুক্ত পৃ: ২২২।

১২) ক) কুমুদরঞ্জন মল্লিক; ***নদীয়া কাহিনী***, কলিকাতা পুনঃ প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃ: ১১৫।
খ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, ***নবদ্বীপ মহিমা***, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, নবদ্বীপ, পৃ: ৯৯-১০০।

১৩) বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ***জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল***, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ: ১৪-১৫।

১৪) সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল***, ১৯৮৮, পৃ: ২৪৬।

১৫) ঐ পৃ: ২২৭।

১৬) সুকুমার সেন (সম্পাদিত), ***গৌরাঙ্গবিজয়***, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৭, পৃ. ৫৩।

বাঙালীর পীর পূজা ঃ হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

১

বাংলাদেশে পীরদের পূজা যে বাঙালীর লোকধর্মের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তা বাঙালী মাত্রেরই কাছে সুবিদিত। পাড়াগাঁ বা শহরে সবজায়াগাতেই কোন না কোন পীরের আস্তানা বা দরগা (যেখানে পীরকে সমাধি দেওয়া হয়েছে) অথবা নজরগাহ (পীরের স্মৃতি বিজড়িত স্থান) রয়েছে সেখানে বিভিন্ন সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানত করে ও পূজা দেয়। পীরেরা তাদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য জীবদ্দশায় কেবল পূজিত হতেন না, তাঁদের দেহাবসানের পরও তাঁদের সমাধিক্ষেত্র (দরগা) বা নজরগাহ পবিত্র তীর্থস্থান রূপে বিবেচিত হয়ে চলেছে এবং নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় জনগণ এইসব দরগা বা নজরগাহে উপস্থিত হয়ে মনস্কামনা পূরণের জন্য পীরের কাছে পূজা নিবেদন করেন।

পীর বলতে সাধারণত দু-শ্রেণীর মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের আমরা বুঝে থাকি (১) আউলিয়া বা ফকির এবং (২) গাজী (মুসলমান ধর্মশাস্ত্র মতে, যিনিই বিধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে সধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী)। এককথায় বাংলাদেশে যে সকল মুসলমান সাধু ও গাজী জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করে পূজিত হয়ে চলেছেন তাঁদেরকেই আমরা সাধারণভাবে পীর বলে আখ্যাত করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে পূজিত সব পীর গাজীদেব ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কিছু কিছু পীরের পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিছু কিছু কাল্পনিক পীরের সন্ধানও পাওয়া যায় যেমন ঘোড়া পীর, কুম্ভীরা পীর, কাঁটা পীর, তেঁতুল পীর ইত্যাদি।[১]

পীর পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে জানা যায় মুসলমান জগতের অনেক দেশেই প্রথম অবস্থায় পীর পূজার প্রচলন হয়। অবশ্য মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরানে পীর পূজার পরিচয় পাওয়া যায় না।[২] ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মারা যাওয়ার কিছু কালের মধ্যেই পীর পূজার সূত্রপাত। পীরেরা মহম্মদের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে পূজিত হয়ে চলেছেন।[৩] অনুমান করা চলে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার কিছু কালের মধ্যেই পীরদের পূজার প্রচলন সুরু হয়। পঞ্চদশ

শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত এবং ষোড়শ শতাব্দীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরামের লেখায় পীর পূজার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।[৪]

বাংলা তথা ভারতবর্ষে পীর পূজা যে বহিরাগত একথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন আব্দুল করিম।[৫] অবশ্য তাঁর এই অভিমত অঞ্জলি চ্যাটার্জী মেনে নেন নি। লেখিকার মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পীর পূজার প্রচলন হিন্দু প্রভাবে গড়ে উঠেছিল।[৬] দু:খের বিষয় লেখিকা বাংলা সাহিত্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে পীর পূজার প্রচলন বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ বিজয়গুপ্ত ও মুকুন্দরাম রেখে গিয়েছেন। তাছাড়া ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংলাকাব্যে বহু জনপ্রিয় পীরের কথা 'দিগবন্দনা' অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে উল্লিখিত রয়েছে।[৭] এসব তথ্য বাংলাদেশে পীর গাজীদের পূজার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যেমন কাব্য রচিত হয়েছিল, তেমনি পীর গাজীদের মাহাত্ম্য সূচক পাঁচালীও রচিত হয়।[৮] লৌকিক দেবদেবীর ন্যায় বিভিন্ন পীর, গাজী ও পীরাণী মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের কাছে আদৃত হয়ে পূজা পেতে শুরু করেন এবং সেই ধারা আজও প্রবহমান। লক্ষনীয় এই যে বিভিন্ন পীর গাজীদের কাছে বছরের কোন নির্দিষ্ট দিন বা যে কোন দিন মানত পূজা দেওয়ার রীতি রয়েছে। এঁদের কারো কারো উরস (আবির্ভাব বা তিরোধান) উৎসবও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয এবং সেই উপলক্ষে অনেক স্থানে মেলা বসে।

২

এবারে আমরা সাধারণতঃ যেসব উদ্দেশ্যে পীরেরা পূজা পান তা আলোচনা করব। রোগমুক্তি ও সন্তান কামনায় পশ্চিমবঙ্গে বহু পীর পূজিত হচ্ছেন তা বিভিন্ন সূত্রে ও ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু উল্লেখ করা হল। রোগমুক্তি কামনায় আবালসিদ্ধ পীর (মন্ডলপাড়া, ২৪ পরগণা), আবদুল্লা আব্বাস ফকির (মল্লিকপুর, ২৪ পরগণা), আলীসন পীর (ভোঁপুর, হুগলী), বাবন পীর (শাঁকশহর, ২৪ পরগণা), বড় পীর (আটলিয়া, ২৪ পরগণা), বড় পীর (কুমারপুর, নদীয়া), চেল পীর (মহাটোর, পশ্চিম দিনাজপুর), চাঁদশাহ ফকির (দামোদরপুর, হুগলী), ধকর সৈয়দ পীর (বেড়াইল, পশ্চিম দিনাজপুর), দাতা পীর বা দাদা পীর (শেখপুরা, মুর্শিদাবাদ), একদিল শাহ পীর (বারামত শহর, ২৪ পরগণা), ফতিমা বিবি (শহরা, ২৪ পরগণা), গোরা সঈদ পীর (সোহাই, ২৪ পরগণা), গোরাচাঁদ পীর (এর ২৪টি নজরগাহ অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলায় এবং ১ টি হাওড়া জেলায় রয়েছে), হজরত জঙ্গলবিলাস পীর (বানীবন, হাওড়া), ইসমাইল গাজী (গড়মান্দারন, হুগলী), জঙ্গলী পীর (বাহাদুরপুর, বীরভূম), ঘোয়াজ পীর (টাঙ্গাইল-বীলপাড়া, পশ্চিম দিনাজপুর) কাটা পীর (নাংগলা, নদীয়া),

কুরমন সাহেব (বিষ্ণুপুর শহর, বাঁকুড়া), কাজীমন ফকির (মহানাদ, হুগলী), মানিক পীর (তমলুক শহর, মেদিনীপুর), মখদুম পীর (অমর্শি, মেদিনীপুর) মখদুমী পীর (কসবা - মহশো, পশ্চিম দিনাজপুর), মোবারক গাজী বা বড় খাঁন গাজী (ঘুটিয়ারী শরীফ, ২৪ পরগণা), মীর মহম্মদ পীর (হাবিবপুর), শাহচাঁদ পীর (আঁধারমাণিক, ঐ), শাহান্দী সাহেব (বাঁকুড়া, ঐ), নিরগিন শাহ পীর (বীরসিংহপুর, বাঁকুড়া), সাহাবন্দ পীর (বাসুদেবপুর, হুগলী), শাহ সুফী সুলতান (পান্ডুয়া, ঐ), তারাশাহ পীর (আগরপাড়া রেল স্টেশন, ২৪ পরগণা), প্রভৃতি পীর গাজীরা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজিত হয়ে চলেছেন।[৯]

এবারে সন্তান কামনায় যে সব পীর গ্রাম বাংলার উভয় সমাজের জনগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে চলেছেন তাঁদের কথায় আসছি। মেদিনীপুর জেলার মখদুম পীর (অমর্শি ও বাল্যগোবিন্দপুর), তাজখাঁ পীর (হিজলী), সত্যপীর (জাহানপুর) ও মানিকপীর (তমলুক শহর) সন্তান কামনায় পূজা পেয়ে থাকেন। মালদা জেলায় পান্ডুয়াতে শেখ জালালউদ্দিন মুখদুম পীরের একটি প্রসিদ্ধ দরগা রয়েছে যেটি 'বড় দরগা' বা 'বাইশ হাজারী' নামে প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুরের মখদুম পীর এবং মালদার মুখদুম পীর উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মেদিনীপুরের পীরের নাম হল মখদুম মিহাসউদ্দিন চিসতি। মালদায় অবস্থিত 'বড় দরগা'র বাইরে একটি চত্বর রয়েছে এবং তারই একধারে একটি ডালিম গাছ আছে। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় ডালিম গাছে ইঁট বেঁধে মানত করে। তাছাড়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তাজবাজ পীর (তাজপুর), জেবা পীর (শাসন) ও ধকর সৈয়দ পীর (বেড়াইল), হাওড়া জেলার হজরত জঙ্গল বিলাস পীর (বানিবন), ২৪ পরগণা জেলার পাগলা পীর (গাছা), গাজী সাহেব মোবারক আলী, চলতি নাম মেবরা গাজী (ঘুটিয়ারী শরীফ), আবাল সিদ্ধি পীর (মন্ডলপাড়া), রত্তশন বিবি (তারাগুনিয়া) নদীয়া জেলার গাজী সাহেব (শ্রীনগর) এবং হুগলী জেলার ইসমাইল গাজী (গড়মান্দারন) সন্তান কামনায় বিশেষভাবে পূজিত হন। ভক্তদের বিশ্বাস, এই সকল পীর-গাজীদের দরগায় মানত করলে স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যাত্বদোষ নষ্ট হয় এবং সন্তানলাভে সমর্থ হন। তাছাড়া মৃতবৎসা দোষ নিবারণের জন্যও মৃতবৎসা নারীরা মানত করে থাকেন। সাধারণতঃ মাটির ঘোড়া মানত করেন ও সিন্নি দেন। উপরোক্ত পীর-পীরানীর দরগা বা আস্তানাগুলিতে অন্যান্য উদ্দেশ্যেও লৌকিক দেবদেবীর ন্যায় পূজা দেওয়া ও মানত করার প্রথার প্রচলন রয়েছে। তবে সন্তান কামনায় এসব দরগায় অধিক জনসমাগম হয়।[১০]

রোগমুক্তি ও সন্তান কামনা ছাড়া আরও অন্যান্য ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্যও বহু পীর আঞ্চলিক ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় পূজিত হয়ে চলেছেন।

৩

যদিও পীর পূজা ভারতের বহু অঞ্চলে দেখা যায় তথাপিও বাংলাদেশের ন্যায় পীর পূজার ব্যাপকতা, গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না। এখানে পীর পূজার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নানাভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বর্তমানে এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু হিন্দু জমিদার ও রাজন্যবর্গ পীর পূজার পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। পীরের দরগা বা নজরগাহ নির্মাণ করে বা পীরের নামে জমিদান করে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রাউতাড়া গ্রামে অবস্থিত মানিক পীরের দরগাটি রামদয় রায় নামে জনৈক জমিদার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। পরে তাঁর বংশধররা এই দরগাটি সংস্কার করেন। বারাসত শহরের একদিল শাহ পীরের নজরগাহ, বামুন পুকুরিয়া (২৪ পরগণা) ও কামদেব পুরের (ঐ) পীর গোরাচাঁদের নজরগাহ, শাসন গ্রামের ২টি, ঘোলায় অবস্থিত মাদার পীরের দরগা, ঘুটিয়ারী শরিফের মোবারক গাজীর দরগা (ঐ), বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার বীরসিংহপুর গ্রামের নিরগিন শাহ পীরের মাজার শরীফ ও মালদহ জেলার গাজোল থানার ধাওয়াইল গ্রামের কুতুব শা পীরের দরগা ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

পীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বা পীরের আশীর্বাদে বিপদ মুক্ত হয়ে বহু হিন্দু পীরের সেবা কাজের জন্য জমিদান করেছেন। এঁরা হলেন নবদ্বীপের কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাল্যগোবিন্দপুর গ্রামের জগমোহন চৌধুরী, শ্যামবাজারের (কলিকাতা) কৃষ্ণচন্দ্র বসুর মা মাতঙ্গিনী দেবী, রাসবিহারী ধর, কোচবিহার রাজ।[১১]

৪

হিন্দুগণ কর্তৃক পীর পূজার কেবল পৃষ্ঠপোষকতা নয়, সেই সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পীর পূজার মাধ্যমে এক ধর্মীয় সমন্বয়ী ভাবধারারও প্রকাশ ঘটেছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন পীর পূজার বহুল প্রচলন ঘটেছে, তেমনি এই পীরদের মধ্যে হিন্দুদের দেবদেবীর পূজায় প্রচলিত বহু আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছে। বহু পীরের হিন্দু নাম লক্ষ্য করা যায় যেমন আদম, আবালসিদ্ধি, একদিল, গোরাচাঁদ, কালু, দাদা, বাবন, মানিক ইত্যাদি। পীরের দরগায় বা থানে হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি যেমন হত্যা দেওয়া, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তেল বা জলপড়া দেওয়া, পীরের নামে লুট দেওয়া (হরির লুটের অনুকরণে), ভর হওয়া ইত্যাদিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।[১২]

গাজনের সময় যেমন শিবের মাথায় ফুল দেওয়ার প্রথা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি শিব ভক্তগণের ন্যায় পীর ভক্তগণও ভক্তিভরে পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ফুল ধোয়া

জল পান করে থাকেন। মনস্কামনা পূরণের জন্য হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে ইটের টুকরো বা ঢেলা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়ার রীতি যেমন বহুল প্রচলিত, তেমনি বেশ কিছু পীরের দরগায় বা নজরগাহে এই রীতি যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কিছু কিছু পীরের দরগায় হিন্দুরা সেবায়েতের কাজ করে থাকেন। ২৪ পরগণা জেলার বারাসত শহরের একদিল শাহ্ পীরের সেবায়েত হলেন ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এই জেলার রঘুবীরপুর (বারাসত) গ্রামের একদিল শাহ্ পীরের সেবায়েত হলেন নরেন্দ্রনাথ কর্মকার।[১৩] ধর্ম সমন্বয়ের দিক থেকে আরও লক্ষণীয় এই যে প্রায় শতাধিক বছর ধরে এই পীরের বাৎসরিক উৎসবকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে এবং এই উপলক্ষে একটি বড় মেলাও বসে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে আরও চিত্তাকর্ষক দিকটি হ'ল পীরের উরস (জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস উপলক্ষে উদযাপিত অনুষ্ঠান) উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান একত্রে বসে পীরের সিন্নি হিসেবে অন্নভোগ গ্রহণ। পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় এই প্রথার প্রচলন চোখে পড়ে।[১৪]

৫

ভারত তথা বঙ্গ সংস্কৃতি সত্যই বিচিত্র। সমন্বয় সাধনই এই সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পীর পূজায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যপীরের উদ্ভব আর এক বিস্ময়কর নজীর। হিন্দুদের সত্যনারায়ণের ধ্যানধারণা এবং মুসলমানদের পীরবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এই সত্যপীর। সত্যপীরের কাহিনীতে তা স্পষ্টতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সমন্বয়ী ধারা বর্ণহিন্দু ও উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও প্রতিফলিত। বিভিন্ন পীরের উরস উৎসব এবং উপজাতিদের দেবদেবীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই সমন্বয়ের ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় অনুদারতার উর্দ্ধে এখন সবাই বিচরণ করে। এই সব বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে মেলা হয় তা ধর্মীয় বেড়াজাল উপেক্ষা করে এক মহামিলনের লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নটি বর্তমানে ভারতের অন্যতম জটিল সমস্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এরজন্য সাধারণ ভারতবাসী কতটা দায়ী তা আমাদের অজানা নয়। কতিপয় মৌলবাদী ও স্বার্থান্বেষী মানুষ মূলত: এই সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী এবং নব্বই ভাগ ভারতবাসী শান্তিকামী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে জীবনযাপনে আগ্রহী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের মাটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিশেষ করে নিম্নকোটি সমাজে যে প্রবহমান তা আমাদের অজানা নয়। তথাপিও বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে যে অশুভ শক্তির প্রভাব দেখা যাচ্ছে তাকে পরাস্ত করতে হবে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত পালিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোচ্য

দৃষ্টান্তগুলিকে স্মরণ করে। কারণ সমন্বয় সাধনই যে ভারত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য একথা আমাদের ভুললে চলবে না।[১৫]

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) বিশদ বিবরণের জন্য প্রদ্যোত মাইতির প্রবন্ধ "পীরিজম ইন বেঙ্গল — এ সোসিও কালচারাল স্টাডি" বিদ্যা (জার্নাল অব বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সংঘ), খন্ড ৬, নং-৮, নভেম্বর, ১৯৮০, পৃ: ৪১৭-৪১৯ দ্রষ্টব্য।

২) অশোক মিত্র (সম্পাদিত), ***দ্যা ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল***, গর্ভনমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ: ২৬৭।

৩) তদেব, পৃ: ২৬৭-২৬৮

৪) *বিজয়গুপ্তঃ পদ্মপুরাণ* (ভট্টাচার্য সম্পাদিত) বসন্তকুমার, বরিশাল, পৃ: ৫৭, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীঃ ***কবিকঙ্কন চণ্ডী***, বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা, পৃ. ৬৮

৫) আবদুল করিম, ***সোস্যাল হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল***, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ: ১৬৩

৬) অঞ্জলি চ্যাটার্জী, ***বেঙ্গল ইন দ্যা রেস অব ঔরঙ্গজীব***, কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ: ২৩৪

৭) দত্ত, বিজিত কুমার এবং দত্ত সুনন্দা মানিকরাম, *ধর্মমঙ্গল* (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ ১৬; রূপরামঃ *ধর্মমঙ্গল* (সম্পাদিত) সেন, সুকুমার, মন্ডল, পঞ্চানন এবং সেন, সুনন্দা, পৃ: ৯, ১০, ১১; ***কেতকীদাস ক্ষেমানন্দ: মনসামঙ্গল*** (সম্পাদিত) ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন, ২য় সং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ: ৭; ***পুঁথি পরিচয়*** (সম্পাদিত) মন্ডল, পঞ্চানন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, ১ম, পৃ: ৯৫, ২য় পৃ: ১২৯, ১৩০, ৩২০ এবং ৩য় পৃ: ১৯৪

৮) গিরীন্দ্র নাথ, দাস **বাংলা পীর সাহিত্যের কথা**, বারাসত, ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য।

৯) বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রদ্যোত মাইতির প্রবন্ধ "ডিজীজ কিয়োরিং পীরম্ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল" বিদ্যা খণ্ড ৮, নম্বর - ১, এপ্রিল, ১৯৮২, পৃ: ৪২৪-৪৩৪

১০) এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন প্রদ্যোত কুমার মাইতি, হিউম্যান ফার্টিলিটি কাল্টস্ অ্যান্ড রিচুয়্যালস অব বেঙ্গল, ১৯৮৯, পৃ: ১১৪-১৩৬ দ্রষ্টব্য।

১১) বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রদ্যোত কুমার মাইতির প্রবন্ধ "হিন্দু পেট্রনেজ অ্যান্ড দ্যা কাল্ট অব পীরিজম্", বিদ্যা, খণ্ড ৬, নম্বর - ১০, জানুয়ারী, ১৯৮১, পৃ: ৫৩০-৫৩২

১২) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে প্রদ্যোত কুমার মাইতির প্রবন্ধ "হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স অব দ্যা কাল্ট্রী অব পীরিজম্" বিদ্যা খণ্ড - ৭, নম্বর - ২, মে জুন, ১৯৮১, পৃ: ২৩-২৫

১৩) তদেব, পৃ: ২৫

১৪) প্রদ্যোত কুমার মাইতি, "হিন্দু-মুসলিম এমিটি অ্যান্ড দ্যা কাল্ট্রী অব পীরিজম্," বিদ্যা, খণ্ড - ৭, নম্বর - ১০, জানুয়ারী, ১৯৮২ দ্রষ্টব্য

১৫) প্রদ্যোত কুমার মাইতি, "পীরিজম্ ইন বেঙ্গল - অ্যান্ অ্যাসপেক্টস্ অব হিন্দু-মুসলিম রিলিজন্" অবলম্বনে রচিত।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের রাষ্ট্রভাবনা

খন্দকার মুজাম্মিল হক

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যধারার একজন বড় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন মুঘলআমলের মানসিংহের সুবাদারিকালের সময়ে, ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যবিবেচনায় রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই স্মরণীয়। তুর্কি-মুসলমানদের বঙ্গ-বিজয়ের (১২০৪ খ্রী:) মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম-সংস্কৃতির যে ধারা সূচিত হয়, পরবর্তী কয়েক শতাব্দে তার বিচিত্র বিকাশ লক্ষণীয়।

মুসলিম রাজশক্তির প্রবল আঘাতে হিন্দু-সমাজ আত্ম-সংহতি অর্জ্জনের প্রয়াস পায়। মেল-থাক প্রথার পুনর্বিন্যাস ও জাতিভেদ হ্রাসকরণের মধ্যে সে প্রয়াস স্বাক্ষরিত। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনও শতধা-বিভক্ত সমাজকে ঐক্য-সূত্রে বাঁধবার তৎপরতায় লিপ্ত; অপরদিকে অগ্রসর বুদ্ধিজীবিগণ রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ করে পৌরাণিক সাহিত্যে সাধারণ হিন্দুর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার কাজে ব্যস্ত। মঙ্গল কাব্যের কবিগণও একই উদ্দেশে কলম ধরলেন। পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যান সমন্বিত ক'রে দ্বিজ-চন্ডালকে এক পংক্তিতে বসাবার আয়োজনে তাঁরা উদ্‌গ্রীব। কল্পনার উপকরণ দিয়ে একটি অনুসবণযোগ্য দেশ বা রাষ্ট্রের আদর্শও তাঁরা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে এ-বিষয়টি স্পষ্টরূপে বিধৃত।

মুকুন্দরামের কাব্যের সবচেয়ে বড় ঘটনা কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন। এই অংশটি এজন্য তাৎপর্যপূর্ণ যে, এর মধ্য দিয়ে কবির সব উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়েছে। প্রথমত, কবি যে-চন্ডীদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন তা এই অংশেই প্রদর্শিত ও পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কবির যে-জীবনদর্শন, কবির যে-স্বপ্নরাষ্ট্র, তা কালকেতুর রাজত্বের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে। তৃতীয়ত, কাব্য-কাহিনীর অনিবার্য পরিণাম হিসাবেও এধরনের একটি অধ্যায় আবশ্যক ছিল। একজন সংগ্রামী ও পরিশ্রমী মানুষ তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই কালকেতু। ব্যাধ থেকে বাদশাহ্ হয়েছে কালকেতু। প্রতিষ্ঠিত কলিঙ্গ রাজ কালকেতুকে নব্যরাজা হিসাবে সসম্মানে প্রণাম জানিয়েছেন,[১] কাহিনীর ধারাবাহিকতায় এটাই স্বাভাবিক ছিল।

কালকেতুর গুজরাট নগরপত্তনকে অনেকেই সঙ্কীর্ণদৃষ্টিতে নিছক নগর-স্থাপনারূপেই বিবেচনা করেছেন।[২] কিন্তু কবি যে একে একটি স্বয়ম্ভর সার্বভৌম রাষ্ট্রের ছায়ারূপে চিত্রিত করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়: রাজা-কালকেতু সম্পর্কে কলিঙ্গরাজকে কোটাল বলে

ক) বার দেই দন্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কারতরে নাহী করে শঙ্কা
অযোধ্যা সমান পুরী আমি কি বলিতে পারি
সুবর্ণের জেনমত লঙ্কা।[৩]

খ) কালকেতুর শত্রু ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর কাছে অন্যায় কাজে সুবিধা লাভ করতে না পেরে পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজের নিকট নালিশ ক'রে বলে যে, 'কালকেতু নতুন রাজ্যস্থাপন করে রাজত্ব করছে।' খবর শুনে কলিঙ্গরাজ, খবর না রাখার জন্য, নিজের কোটালকে তীব্রভাবে অনুযোগ করলেন। এ-থেকেও কালকেতুর রাজত্বের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলিঙ্গরাজ কোটালকে বলে ঃ

বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভুমি
দেশের বারতা বেটা নাহী পাই আমি।
একরাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার
ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার।[৪]

গ) একজন সার্বভৌম রাজাই কেবল রাজ্যে স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ পতাকা উড়াতে পারে; স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিপুল সৈন্যবাহিনী পুষতে পারে। এরূপ বর্ণনা পাই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রেরিত 'নিশীশ্বর' (রাতে ভ্রমণকারী গুপ্তচর বিশেষ) এর মুখে ঃ

নিশাকালে নিশীশ্বর দেখিল নগর
পুরের নির্মাণ দেখি চিন্তেন অন্তর।
চারি দিগে রহে জত নফর চাকর
ভ্রমিয়া বুলিলা তারা সহরে সহর
সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলকা
হাতি ঘোড়া দেখে বীরের সৈন্যসেনাপতি...।[৫]

বস্তুত কালকেতু একটি স্বাধীন রাজ্যই গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া স্বীয় অর্থে নগর নির্মাণ ক'রে দিলে কলিঙ্গরাজের তো রুষ্ট হবার কথা নয়। তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন কালকেতুর সার্বভৌম ক্ষমতার বিস্তারে, স্বাধীন রাজ্য গড়ার কারণে।

ঘ) আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কালকেতু প্রজাদের করমকুবের যে আশ্বাস দিচ্ছেন এবং ডিহিদার, নিয়োগি প্রভৃতি অত্যাচারী কর-আদায়কারী কর্মচারী নিয়োগ না করার যে অঙ্গীকার করেছেন, তা থেকেও মনে হয়, তিনি নিজেকে নিছক নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মনে করেন না, বরং রাজা-ই মনে করেন। কারণ এরূপ মৌলিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত কেবল দেশের রাজাই গ্রহণ করতে পারেন। যেমন ঃ

আমার নগরে বৈস জত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।।[৬]

কালকেতুর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ কালকেতু যেভাবে তাঁর রাষ্ট্র বিন্যস্ত করেছেন, তাতে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং কান্ডজ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর রাষ্ট্রে মুসলিম-সম্প্রদায়কে শুধু আশ্রয়ই দেন নি, তাঁদের সৈনাপত্যেও নিয়োজিত করেছেন। কলিঙ্গ-নৃপতির সৈন্য যুদ্ধ করতে এসে কালকেতুর দুই সেনাপতি 'হবিবউল্লা' ও 'সৈদউল্লার' নিকট পরাজয় মেনে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।[৭] ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম শাসনাকালে হিন্দুগণ শুধু সৈন্য হিসেবে নয়, সেনাপতি হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ-সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন, "রাজ্যশাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি, সৈনাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।[৮] কবি নিজেও এসব তথ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৭৩ সালে) গুজরাট বিজয় সম্পন্ন হয়। ১৭৫৮ সালে মারাঠাদের অধিকারে আসার পূর্বপর্যন্ত গুজরাট মুঘল অধিকারেই থাকে। সুতরাং মুকুন্দরাম যে-ভাবে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে উপস্থাপন করেছেন, তাতে সম্রাট আকবরের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। গীতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই অংশটির (নগর-পত্তন) মধ্যে আকবরের ভূমি-বন্দোবস্ত এবং প্রজানুরঞ্জকতার আদর্শ যে প্রতিফলিত হয়নি একথাই বা বলি কি করে? কালকেতুকেও মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন আকবর বলে মনে হয় না কি"?

কালকেতুর রাষ্ট্র ছিল সকল জাতির নিরাপদ আশ্রয় স্থল। এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ পূরণ করেছে এদেশেরই সাধারণ মানুষ, যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাই ধর্মীয় বিধি-নিষেধে কিছু পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকলেও দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ও আচার-অনুষ্ঠানে এ-দেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান বরাবরই পরস্পর নির্ভরশীল। একারণে ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রপরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এই বাস্তবতার সানন্দ স্বীকৃতি ঘটেছে মুকুন্দরামের 'কালকেতুর নগর-পত্তনে'। মুসলমানদের মধ্যে বৃত্তিগত যত শ্রেণী রয়েছে, তাদের

কাউকেই কবি কালকেতুর রাষ্ট্র থেকে খারিজ করে দেন নি; কারণ রাষ্ট্রে সব রকম লোকেরই প্রয়োজন রয়েছে।

রাজা কালকেতু তাঁর রাষ্ট্রের সর্বপশ্চিমে ঠাঁই দিয়েছেন মুসলমানদের। যেহেতু পশ্চিমদিকে ফিরে এদের নামাজ পড়তে হয়, তাই হয়ত কবি তাদের সামনে আর কাউকে রাখেন নি। মুসলিম নাগরিকের বসবাসের জন্য রাজা কালকেতু শতশত গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। নামাজের জন্য গ'ড়ে দিয়েছেন বিরাট তোরণ-সংবলিত কারুকার্যময় মসজিদ। ক'রে দিয়েছেন পরিপাটি রন্ধনশালা। একটি রাষ্ট্র খোর-পোষ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধর্মকর্মের সুবিধা ও সহায়তা দেওয়ার পর মানুষের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। তার উপর দেশে নেই করের অত্যাচাব, নেই ডিহিদার। যে যুগে রাজনীতিক কারণে মুসলমান রাজাদের কিছু মন্দির ও মঠ ভাঙার ঘটনার কথা জানা যায়, সেই যুগে কবি মুকুন্দরাম মুসলমানদের মসজিদ গ'ড়ে দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করছেন, এটি কম সাহসের কথা নয়।

কবি রাজ্যের যে-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান বসতির কথা বর্ণনা করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'হাসন হাটি'। নামকরণে হিন্দুয়ানি চেতনা কাজ করেনি। কবি মুসলমানদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতেও কোনো অশ্রদ্ধার ভাব নেই। গভীর কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের জীবনযাত্রার চমৎকার চিত্র বিস্তৃত পরিসরে এঁকে গেছেন। ফজরে মুসলমানদের গাত্রোত্থান, লোহিত পার্টিতে পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়ন, সোলেমানি তছবিহ জপ করা, পীরনবী উদ্দেশে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো, মাজারে নিশান ওড়ানো, বাতি জ্বালানো, সিরনি পাক ক'রে সাধারণ লোকদের খাওয়ানো - এ সব বর্ণনা তো দিয়েছেন, উপরন্তু তাদের দাড়ি-টুপি ও বসন-ভূষণের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, রোজা রাখার কথা, বিবাহের কথা, মুরগি-বকরি জবাইয়ের কথা, শিশুদের মক্তবে কোরআন পড়ানোর কথা প্রভৃতিও কবি যথাযথ উল্লেখ করেছেন।

শ্রমজীবী মুসলমানদের তথ্যও কবি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মুসলমান সমাজে অশিক্ষিত বেনামাজিরা হচ্ছে 'গোলা', সুতোর মাজনন্দাররা, 'জোলা', গরুর গাড়িতে ধানবহনকারীরা 'মুগরি', পিঠাবিক্রয়কারীরা 'পিঠাহারি', মৎস্যবিক্রয়কারীরা 'কাবাড়ি', ধর্মান্তরিত মুসলমানরা 'গরসাল' 'সানা' বা তাঁতযন্ত্রের ব্যবসায়ীরা 'সানাকর', তীর নির্মাণকারীরা 'তীরকর', কাগজ প্রস্তুতকারীরা 'কাগতি', ভবঘুরে ফকিরেরা 'কলন্দরিয়া' আর ভিখ্ মেগে যারা খায় তারা হচ্ছে 'ফকির'। এই হচ্ছে কালকেতুর রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের পরিচয়। এই পরিচয় "একদিকে যেমন সত্যানুগ, অন্য দিকে তেমনি সহৃদয়।"[২০]

কালকেতুর রাষ্ট্রভুক্ত হিন্দুসমাজের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কাজকর্ম বৈদিকশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ ও আগাম-পুরাণের পঠন-পাঠনে নিহিত। অবশ্য

কেউ কেউ তিলক-চন্দন পরে পূজা-পরিচালন, বিবাহে পৌরহিত্যকরণ, যজ্ঞ-সাধন, পাঁজি ও জ্যোতিষবিচার প্রভৃতি কাজও করে থাকেন। সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবরাও এই শ্রেণীভুক্ত।

ক্ষত্রিয়রা পুরাণশ্রবণকারী, বিপ্রদের দান-দক্ষিণা প্রদানকারী। এঁদের মধ্যে রয়েছে রজ, মল্ল, যুদ্ধবিদ্যার্থী, পিঙ্গল পাঠক ভাট, কৃষ্ণসেবক মহাজন, কৃষক, গোপাল, গাড়োয়ান, প্রবালবিক্রেতা, শঙ্খ ব্যবসায়ী, সূচিকর্মকার প্রভৃতি। কবি বৈদ্যকদের পরিচয়ে বলেন: এদের উপাধি গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি। এরা উর্ধ্ব-ফোঁটা, পাগড়ি, ধুতি পরে, আর পাঁজি পুঁথি রাখে সঙ্গেই। এরা ডাক্তারি করে, তবে কঠিন রোগী এড়িয়ে চলে। রাজকর দেয় না, চিকিৎসার মজুরি হিসাবে অর্থের বদলে গরু, সোনা বা ফসল গ্রহণ করে।

কালকেতুর নগরে বসবাসকারী কায়স্থরা শিক্ষিত। এদের উপাধি ঘোষ, বসু মিত্র, পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, বিষ্ণু, রাহা, নন্দ, ভঞ্জ ইত্যাদি। দেখা যায়, কালকেতু এদের ঘরবাড়ি ক'রে দেন নি, তবে বিস্তর গৃহঋণ দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে গৃহ-ঋণের তথ্য সম্ভবত এই প্রথম।

বৈশ্যদের শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে তেলি, কামার, তাম্বুলি, কুম্ভকার, তাঁতি, মালি, বারুই, নাপিত, মোদক বা চিনি-উৎপাদক। কালকেতুর রাষ্ট্রে জৈনরাও মর্যাদাপ্রাপ্ত। জৈন বা 'সরাকগণ' অহিংস, নিরামিষাশী। দামিবস্ত্র বা নেত-পাটের শাড়ি-বস্ত্রের উৎপাদক এরা।

কালকেতুর রাষ্ট্রে আরো কিছু বৃত্তিধারী নিম্নশ্রেনীর মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ধূপধুনার কারবারি গন্ধবেনে, অনুরূপ স্বর্ণবেনে, মণিবেনে, কাঁসারি, সাপুড়ে, চুনারি, দধিয়াল, কৈবর্ত বা মৎস্যব্যবসায়ী, বাইতি বা বাদ্যকার. বাগদি বা অস্ত্রব্যবসায়ী, মাটিয়া, কোঁচ বা মৎস্য ব্যবসায়ী সঙ্করজাতি। ধোবা. দরজি. শিউলি বা গাছি, ছুতার, পাটনি, জগাভাট বা যোগি-ভিখারি, চৌদুলি, কোরঙ্গা বা বাজিকর, চন্ডাল বা লবণ-ব্যবসায়ী, কোয়ালি সম্ভবত ওজনকারী, কেওরা বা ঘাসের ব্যবসায়ী, চামার, বিঅনি বা ব্যজনি অর্থাৎ পাখার ব্যবসায়ী, ডোম অর্থাৎ বাঁশের জিনিসেব কারবারি। কালকেতুর রাজ্যে বারবণিতার ব্যবসায়ও চালু আছে, নইলে লম্পট পুরুষের উপায় কি? তবে এদের রাজ্যের এক প্রান্তে এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। আনন্দ-বিধানের জন্য গুজরাট রাজ্যে বিভিন্ন নর্তকি ও সংগীতজ্ঞরা বাস করছেন পরম রঙ্গে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন অংশে এমন একটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমান-জৈন বৌদ্ধসহ সকল সম্প্রদায়ের সকল বৃত্তিধারী মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বভাবত:ই এরাষ্ট্র

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। তাই এ-অংশের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, জনগণের সুবিধার্থে রাজা কালকেতু দেশের বিভিন্ন স্থানে জলকুপ-দিঘি খনন ক'রে দিয়েছেন, যথেষ্ট রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন, বৈষ্ণবদের হরি-সংকীর্তণের জন্য দেবস্থল গ'ড়ে দিয়েছেন; স্থাপন করে দিয়েছেন আশ্রম, বাজার গোলাঘর প্রভৃতি। দু:স্থলোকের জন্য ঋণদান ও কর মওকুফের ব্যবস্থাও রয়েছে কালকেতুর রাষ্ট্রে। সুতরাং কালকেতুর রাষ্ট্রের আদর্শ কবি মুকুন্দরামের রাষ্ট্রচিন্তার আন্তরিক বহি:প্রকাশ মাত্র। তাই কাহিনীর জন্য এই অংশের আত্যন্তিক দৈর্ঘ্য ক্লান্তিকর হলেও কবির রাষ্ট্র-চিন্তার বাহন হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) সুকুমার সেন সম্পাদিত, ***কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,*** নতুন দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ: ১০৩-১০৭, (দ্র: 'অঙ্গদ কঙ্কণহার কুসুমচন্দনে .আজি হইতে কালকেতু বাজা গুজরাটে', এবং ''গুজবাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা/কত ভূঞা রাজামেলি করে তার পূজা।''

২) ভীষ্মদেব চৌধুরী, কবির প্রত্যাশা ও কালকেতুর নগর নির্মাণ, ***সাহিত্য পত্রিকা,*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একত্রিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৯৫, এবং দ্র: 'কবি কঙ্কণচণ্ডী' ১ম খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এই গ্রন্থের সম্পাদক ক্ষুদিরাম দাস বলেন, ''গুজ্জ অর্থাৎ ছোট রাষ্ট্র হ'ল গুজুরাট বা গুজরাট। গুর্জর রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই (পৃ: ভূমিকা XXXi)।

৩) প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন সম্পাদিত *চণ্ডীমঙ্গল,* পৃ: ৮৬।

৪) ঐ, পৃ: ৮৬।

৫) ঐ, পৃ: ৮৭।

৬) ঐ, পৃ. ৭৬।

৭) ঐ, পৃ: ৯২। কালকেতুর যুদ্ধযাত্রায় দু'জন শক্তিশালী বীরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হচ্ছে সৈয়দ উমার গাজী ও রণাগল খান পাঠান্তরে বলাগল খান। দ্রষ্টব্য, সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদিত), ***কবি কঙ্কণচণ্ডী,*** কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ২৩১।

৮) সুকুমার সেন, ***বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।***

৯) গীতা মুখোপাধ্যায়, ***বাংলা সাহিত্য সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা,*** কলিকাতা ১৯৮১, পৃ: ১৬।

১০) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত), **কবিকঙ্কণ-চণ্ডী**, প্রথম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ: ৩৯ (ভূমিকা)।

পীর বাহরামের সমাধি ভবন — বর্ধমানে
(১৬৬২ - ১৬৬৩ ইং সন)

রাশেদা ওয়াজেদ

অবস্থান ঃ- বর্ধমানে যে স্থানে পীর বাহরামকে সমাধিস্থ করা হয় সে স্থানটি তাঁর নাম অনুসারে পীর বাহরাম বলা হয়। এ স্থানে ফারসী ও স্থানীয় ভাষায় তথ্য পাওয়া যায়। আবদুল ওয়ালী দরগাটি একাধিক বার দেখেছেন, একবার ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে। এইচ ব্লক ম্যান আবদুল ওয়ালী সাহেবের বহু পূর্বে এ দরগাহে অনেকগুলি উৎকীর্ণ লিপির কথা আলোচনা করেন এবং ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এই দরগাহের বিবরণ দেন।

পরিচিতি ঃ- পীর বাহরামকে নানাভাবে সম্বোধন করা হয় - যথা পীর, দরবেশ এবং হাজী। কিন্তু বর্ধমানে তিনি পীর বাহরাম অথবা বাহরাম স্যাবক নামে পরিচিত। তিনি বুখারার চাখতাই তুর্কী বংশীয় এবং বাদশাহ হুমায়ুনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন। **গুয়োফ-ই-ইব্রাহীম এবং নেদারাইল** পুস্তকগুলি থেকে এই দরবেশ সম্বন্ধে চমৎকার বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এ করীম আমাদেরকে বলেছেন যে পীর বাহরামের আসল নাম হচ্ছে শাহ্ বারদী বায়জিদ এবং তিনি বায়াজীদের জেষ্ঠ ভ্রাতা। বায়াজিদ **তারিখী-ই-হুমায়ুন** নামে সম্রাট আকবরের জন্য ১৫৯০-৯১ সনে পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি তাঁর ছোট ভাই পীর বাহরাম সম্বন্ধে লেখেন যিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ এবং পীর বাহরাম শাবকা নামে পরিচিতি লাভ করেন। পীর বাহরাম আগ্রাতে পানি বন্টনকারী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন, যিনি সেখানে **শাবকাখানা** অথবা পানিঘর নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক বাদাউনী এই পীর বাহরামকে তাঁর **মুনতাখাব-এট-তাওয়ারিখ** গ্রন্থে একজন শেখ হাজী মুহাম্মদ কাফু শামীর শিষ্য হিসাবে তাঁকে উল্লেখ করেন। বাহরাম শাবকা যিনি মক্কা, মদীনা এবং নাজফ শরীফে একজন তীর্থযাত্রী হিসাবে যান। বাদশাহ আকবর তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এই পীরের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর বিরোধী দল তাকে রাফদী অথবা শিয়া বলে অনুযোগ দেওয়ায় তিনি আগ্রা রাজদরবার ঘৃণা সহকারে ত্যাগ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হন। তিনি যেখানে বসবাস করেন ও সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। তার স্বঘোষিত সৎকর্মের জন্য তাকে সাক্কা বা পান-কর্ম্মচারী নামে অভিহিত করা হয়। তিনি চামড়া নির্ম্মিত মশক থেকে পথচারীদের মাঝে এবং

গরীবদেরকে পানী বন্টন করতেন। মৌলভী আবদুল ওয়ালী এই পীর সম্বন্ধে একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তার ভাষায় "তিনি ফকিরের পোষাকে (পীর বাহ্‌রাম) সজ্জিত হয়ে একটি চামড়ার মশক এবং চামড়ার জ্যাকেট (জামবিল) পরিধান করে পানি পান করার একটি কাপ ও কুঁজো সহ্ ৯৭৮ হিজীঃ সনে বর্ধমানে উপস্থিত হন। অতএব দরগাহের খাদেম আমাকে বলেন, খুব সম্ভব একজন মহান মুসলমান দরবেশকে এখানে সমাহিত করা হয়। তিনি মোঘল দরবারের একজন কর্মচারী ছিলেন। তার জন্য যোগী জয়পাল জমি দান করেন। পীর বাহ্‌রাম যোগী জয়পালকে তাঁর নিজের বসবাসের জন্য কিছু ভূমি প্রদান করার অনুরোধ জানান। যোগী পীরের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম্ম দেখাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে পীর বাহ্‌রাম তা প্রদর্শন করেন। যোগী এই কর্ম্মকান্ড দেখে চমৎকৃত হলে তিনি পীরকে জমি দান করেন। সম্ভবত এটাই যোগীর কাছে পীরের প্রথম এবং শেষ চাওয়া বা অনুরোধ ছিল। পরবর্ত্তীতে যোগী পীরের একজন অনুসারী হন এবং তিনি জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চান - কিন্তু পীর তাকে সেখানে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ জানান। এই ঘটনার ঠিক তিনদিন পর পীর বাহ্‌রাম শাবকা ইনতেকাল করেন এবং তাকে তাঁর নিজ জমিতেই সমাহিত করা হয়, যেটি সত্যি তাঁর নিজের জমি ছিল।"

স্থাপত্যিক অলংকরণ ঃ- শামসুদ্দিন আহ্‌মেদ যথার্থ বলেছেন যে পীর বাহ্‌রাম সাক্কার দরগাহ অথবা পবিত্র স্থান স্থাপত্যের কলাকৌশলের দিক দিয়ে একটি চমৎকার ইমারত যার নির্ম্মাণ শৈলীর জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক। পীরের শবদেহটি একটি সমাধি ভবনে শায়িত এবং তা একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহ। গম্বুজটি একটি চার বাহু বিশিষ্ট বর্গফুটের নকশাকৃত গৃহের উপর স্থাপিত। গম্বুজটি বৃহৎ এবং দেখতে দৃঢ় যাহার ফিনিয়াল কলস মটিফ দ্বারা আবৃত - যদিও আলাই দরজার মত, (কুতুব দিল্লী) দেখতে যাই - নির্ম্মাণ কাল ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ আকাঙ্খিত উচ্চতা অর্জনের জন্য গম্বুজের চূড়ায় একটির পর আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট কলস স্থাপন করা হয়েছে। ফিনিয়াল হিসাবে কলস মোতিফের ব্যবহার গম্বুজ শীর্ষে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। গম্বুজের উচ্চতা আসল বিল্ডিং এর সাথে কোন সমতা নেই। মুঘল পূর্ব যুগের স্থাপত্যের ন্যায় এর দেওয়ালগুলি বক্র বাংলার চির - ঐতিহ্যময় স্থাপত্যের ন্যায়, যেমন হজরত পান্ডুয়াতে অবস্থিত একলাখী সমাধি- নির্মাণ কাল ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু দেওয়ালগুলি মুঘল বিল্ডিং এর ন্যায় প্লাস্টার অলংকরণ। সমাধি বিল্ডিং এর চার কোনে একটি করে অষ্টগোলাকৃতি কোন টাওয়ার রয়েছে। দক্ষিণ দিকে গৃহে প্রবেশের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী একটি প্রবেশ পথ একটি পোর্টিকো সম্মুখে।

অলংকরণ ঃ- পীর বাহ্‌রামের দরগাটি অত্যন্ত সাদামাটাভাবে নির্মিত। দরগাটি দেখলে এমনিতে ভক্তিতে মন হয় আপ্লুত অথচ অত্যন্ত সাদাসিদে অলংকরণে তৈরী। মাজারটির পিছনের দেওয়ালটি সমান্তরাল মোলডিং এর সাহায্যে এমন ভাবে আচ্ছাদিত

যা দেখতে বাহির হতে দুই তলা ভবন মনে হয় এবং যার সঙ্গে মালদার একলাখী সমাধির অত্যধিক মিল দেখা যায়। মাজারের উত্তর অংশের দেওয়ালে নীচের অংশে দুটি ছোট কুলুঙ্গি দেখা যায়। এক এক অংশে ১টি করে সর্বমোট ২টি কুলুঙ্গি। কোনের অষ্টাভূজাকৃত টাওয়ার গুলি মাথার উপরিভাগে সলিড কিউপলা দ্বারা আবৃত ও ফিনিয়াল মটিফ দ্বারা অলংকৃত যেভাবে আসল বিল্ডিং এর গম্বুজটির মাথায় ফিনিয়াল অলংকরণ করা হয়েছে ঐ একই ভাবে। কর্ণার টাওয়ারগুলি তিনটি অংশে মোলডিং এর সাহায্যে বিভক্ত, কর্ণার টাওয়ারের উপরের অংশে, সমান্তরাল মৌলডিং এর সাহায্যে তিনটি অংশে বিভক্ত - উপরের অংশ, মধ্যভাগ ও নীচের অংশ টাওয়ারের প্রভৃতি। পূর্বের ইঁটের কার্ভওলি এখন লুক্কায়িত প্লাষ্টারের সহায়তায় ও লাইম দ্বারা আবৃত যাহা আবদুল ওয়ালী আমাদের বর্ণনা দিয়েছেন। দেওয়ালগুলি প্লাষ্টার করে আবৃত করা হয়েছে মোঘল নির্মাণে কৌশলীর ন্যায় কিছু সামান্য পরিবর্তন সহ যাহা ওয়ালী সাহেব আমাদেরকে বর্ণনা দিচ্ছেন। পিছনের দেওয়ালে ইমারতের মধ্যের অংশে আমরা একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখতে পাই, যেটি একটি আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অবস্থিত - একটি ঝুলন্ত বেল ও চেইন মটিফ খোদিত - যেটি দেখতে অতি সুন্দর। দরজার লিনটন থেকে টেমপেনাম অলংকরণ করা হয়েছে। টিমপেনামের উপরের অংশে প্রাসাদ শীর্ষে প্যানেল নকশা যথেষ্ট তাৎপর্য লাভ করেছে। ছোট ছোট প্যানেল নকশা দ্বারা দেয়াল চারিদিক বেষ্টন করে ফুল লতাপাতা নকশা দ্বাবা আচ্ছাদিত কিন্তু বর্তমানে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

একই ঝুলন্ত শৃঙ্খল ও বেল মটিফ অলংকরণ আমরা দেখতে পাই - বাংলার পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদে। ছোট সোনা মসজিদে এবং রাজশাহীর বাঘা মসজিদে দরজা বসাবার সময় পাথরের স্লাবের ব্যবহার ঢাকার অনেক সমাধিতে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে ঢাকার মোহাম্মদপুরের অজানা সমাধিতে ও নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের সমাধিতে। তারিখ বর্ধমানের পীর বাহরামের সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপি হতে যাহা প্রথম এইচ ব্লক ম্যান সাহেব বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে দুটি উৎকীর্ণ লিপি আছে। বর্ধমানের পীর বাহরাম মহল্লার পীর বাহরাম সাক্কার সমাধির ভিতরের দরজায় গাঁথা আছে একটি, আর একটি দরগাহের পোর্টিকোর দক্ষিণ অংশে আছে। দুটি লিপি ফারসী পঙক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পাথরের খন্ডে নিম্ন রিলিফে লেখা।

প্রথম উৎকীর্ণ লিপি স্মরণ করিয়ে দেয় য়ে, বাহরাম সাক্কার মৃত্যু দিনটি ৯৭০ হিজরী অর্থাৎ (১৫৬২-৬৩) খ্রীষ্টাব্দ। এ ওয়ালী সাহেব এর উদ্ধৃতিতে পঙ্‌তিটির মমার্থ নিম্নরূপ ঃ-

"একত্রিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ (মৃত্যুর) তারিখ ৯৭০ হিজরী ধর্মপথযাত্রী বাহরাম "সাক্কা" কে আল্লাহ যেন অর্থাৎ (তাঁর পবিত্র চিত্তকে) সন্তুষ্ট করেন, যিনি আল্লাহর সঙ্গে মৃত্যুর মাধ্যমে একত্রিত হয়েছেন, এভাবে তিনি আল্লাহর দীদার বিজয়ী।

দ্বিতীয় লিপিটিও পীর বাহরাম সাক্কার মৃত্যু সংক্রান্ত যা ৯৭০ হিঃ ১৫৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

তুলনামূলক আলোচনা ঃ- ১. চতুর্কোয় ভবনটির একটি মাত্র গম্বুজ দ্বারা আবৃত ও একটি করে চারকোনে সর্বমোট চারটি অষ্টভূজাকৃতি কোন টাওয়ার। ক্যাথারিন বি আশার এর উদ্ধৃতিতে "পীর বাহরামের সমাধিটি স্থানীয় প্রাদেশিক কায়দায় তৈরী একলাকী সমাধিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি চতুর্কোয় ইট দ্বারা প্রস্তুত ভবন, একটি করে চারটি সংলগ্ন টারেট, বক্রকার্ভ, একটি মাত্র গম্বুজ দ্বারা মুকুটের ন্যায় ইমারতটি সজ্জিত।

২. গম্বুজ গঠন - পীর বাহরামেব সমাধির গম্বুজটি খুব বেশী উঁচু নয় - এটি খাট সাইজের যা একলাখী সমাধিকে স্মরণ করিয়ে দেয় - অতএব এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। আমরা আরও এই স্থাপত্যে বক্রের উপস্থিতি কার্নিশের কোনগুলিতে ও প্রাচীরগুলিতে যাহা বিল্ডিং এর ছাদের উপরের অংশে দেখতে পাই। বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি পান করার জন্য এর কারতেচাব থাকা উত্তম যা খুব সহজে পানিকে নিক্ষেপ করতে পারে তাই বিল্ডিং এ কার্ভ থাকলে তা বিল্ডিং যত বড় কিম্বা ছোট হোক সহজে পানিকে নিক্ষেপ করা সহজ হয়, যাহা বক্র বাঁশ আচ্ছাদিত খড় পাতা ইত্যাদির ছাওয়া চাল দ্বারা।

দেওয়ালের প্যানেল ঃ- দেওয়াল প্যানেল (ক্ষোপ) নকশায় সুষ্ঠু সমন্বয় ও প্রকৃতি? ভারসাম্য সৃষ্টির ফলে দৃষ্টি নন্দন হয়ে উঠেছে - দেওয়াল প্যানেল তোঘলোকীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য যেটি বাংলায় মোঘলদের সময় আবার আবির্ভূত হয় যেমন - পীর বাহরামের সমাধি, মুর্শীদাবাদের কাটরা মসজিদ, ঢাকার সোনারগাঁয়ের মগড়াপাড়া মসজিদ - এই ইমারতগুলি সব কয়টি মোঘলদের সময় তৈরী হয়। বাংলাদেশ বাঁশ ও খড়ের বেড়ার কাঠামো তৈরী করতে উলম্ব ও আনুভূমিক পযায়ে বাঁশের ফালি স্থাপন করে শক্ত করে বাঁধার ফলে কতকগুলি প্যানেল বা খোপের সৃষ্টি হয়। কুঁড়ে ঘরের বেড়ার অসংখ্য ভাগে বিভক্ত খোল নকশা বাংলার ইমারত স্থাপত্যে প্যানেল নকশা আর্কষণীয় রূপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্য আবদানে খোপ নকশা যথেষ্ট তাৎপর্য লাভ করে থাকে।

পিছনের উদ্‌গত অংশ ঃ- সবচেয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ ও চমৎকার হচ্ছে পীর বাহ্‌রামের সমাধির পিছনের দেওয়ালের উদ্গাত অংশ - যেটি একটি চতুর্কোয় ফ্রেমের মধ্যে বসানো - এটি বিল্ডিং এর একঘেয়েমিকে ও অতিরিক্ত বেশী আকৃতিকে ভুলিয়ে দেয়।

পূর্বের সুলতানী রীতির সাথে ইঁটের কার্ভিং এর একই অবস্থা মোঘল প্লাষ্টারিং এর ব্যবহার ঃ- ক্যাথরিনের ভাষায় **"A plaster veneer has covered much of the brick work through some remains visible."**

একটি প্লাষ্টার প্রলেপ সমস্ত ইটের কাজকে ঢেকে ফেলেছে, যদিও কিছু অংশ এখনও দেখা যায়।

পর্যালোচনা ঃ- ষোড়শ শতাব্দীর পীর বাহরামের দরগাটি চতুর্কোয় এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সমাধি। এটি একটি ঐতিহ্যময় সমাধি ভবন বলা হয়ে থাকে - যেটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্ব মোঘল যুগ ও মোঘল যুগের ইমারত ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রিত করেছে যেমন একলাখী সমাধি হজরত পাণ্ডুয়ায় এবং চিকা ভবন গৌড়ের। মোঘল যুগের পীর বাহরামের সমাধিতে সুলতানী ও মোঘল বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে এবং পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) আবদুল ওয়ালী, - **"দি এমটিকিউটিজ অফ বারদওয়ান"**,
জার্নাল অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ডাবলু - এস, XIII ১৯১৭, পৃঃ ১৭৭।
২) ***প্রেসিডিংনস অফ জার্নাল অফ দি সোসাইটি ১৮৭১, পার্ট*** ॥ পৃ· ২৫০-২৫২।
৩) ***গ্যাজেটিয়ার অফ দি বারদওয়ান এডষ্ট্রিট,*** ১৯১০, উদ্ধৃতি এ ওয়ালী প্রাগুক্ত, পৃ· ১৭৮।
৪) ***আওয়ালী - জে এস, বি,*** প্রাগুক্ত খন্ড - XXI , নুতন সিবিজ, ১৯২৪ পৃঃ ৪৯০ এ করীম প্রাগুক্ত।
৫) এ রহিম দ্বারা বিবৃত প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।
৬) আবদুল ওয়ালী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬, ফিন ১।
৭) প্রাগুক্ত, শামসুদ্দীন আহমেদ, পৃঃ ১৭৮।
৮) ***ইনসক্রিপসন অফ বেঙ্গল, খন্ড*** - ২, পৃঃ পিপি - ২৫৬-২৫৭।
৯) পাসী ব্রাউন, ***ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার,*** ইসলামী পিরিয়ড, বম্বে, পৃঃ - ১৯৭৫, পৃঃ - ১৭-১১৬, ফিগার - এগার।
১০) এইচ দোনী - ***মুসলিম আরকিটেকচার, অফ বেঙ্গল এম.*** এ, বি, ঢাকা, ১৬৭১।
১১) এইচ দোনী, ***এম, এ বি,*** পৃঃ ২২০।
১২) আবদুল ওয়ালী - প্রভিক্ত, পৃঃ ১৭৭-১৮৯
১৩) ক্যাথাবিন বি, আনাব, *ইনভেনটেরি,*
দি ইসলামিক হেরীটেজ অফ বেঙ্গল, ইউনেসকো, ১৯৮৪. পৃঃ ৪৬।
১৪) এস. এম, হাসান ***মস্ক আরকিটেকচার অফ প্রি মোঘল বেঙ্গল,*** ঢাকা, ১৯৭৯, প্লেটস - IX, XI. আরও দেখতে হবে ***মোঘুল মনুমেনটস অফ বাংলাদেশ,*** ঢাকা, ১৯৮৭।
১৫) **জে-এ এস-বি, ভলুম্ভা** - XIII (নতুন সিরিজ) ১৯১৭, পৃঃ ১৭৭-১৮২, প্লেট ১১১৭, ১২৩
১৬) এইচ দানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১, আবদুল ওয়ালী, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ১৭৯, এ করীম, **করপাস অফ এরাবিক এবং পার্সীয়ান ইনসক্রীপসন অফ বেঙ্গল**, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৩৯৯-৪০২।
১৭) এ, ওয়ালী, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ১৮; এ করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০০।
১৮) ক্যাথরিন বি, আশার, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ - ৪৬।
১৯) ক্যাথরিন বি, আশার, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ - ৪৬।

মধ্যকালীন বাংলার নদী-বন্দর ইন্দ্রাণী

দীনেশ ঘোষ

মধ্যকালীন বাংলার নগর-বন্দর সপ্তগ্রাম[১] বাণিজ্য অর্থনীতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই বৃহৎ বন্দর-বাণিজ্য কেন্দ্রের সাথে জড়িত ছিল একাধিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী-বন্দর যেগুলি আঞ্চলিক বাণিজ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমান নিবন্ধে সপ্তগ্রাম বন্দরের সমসাময়িক নদী-বন্দর ইন্দ্রাণীর ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ইন্দ্রাণী নগরের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই তবে প্রত্নতত্ত্ব ও মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থে ইন্দ্রাণী নগরের ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রের সমৃদ্ধ অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ঐ সময়ে ঐ নগর মধ্যকালীন ধর্ম-সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবেও যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন

বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে মহকুমা শহর কাটোয়ার দক্ষিণে পরিত্যক্ত ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে মধ্যকালীন ইন্দ্রাণীর অবস্থান ছিল। মধ্যকালীন ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্রস্থল ছিল ইন্দ্রাণী[২] নগর, যা বর্তমানে দাঁইহাট নামে পরিচিত। ইন্দ্রাণী নগরের বিস্তার ছিল কাটোয়া থেকে দক্ষিণে ভাগীরথীর নিম্নপ্রবাহ পথে ছয় মাইল দূরে ...পুর পর্যন্ত।

'মঙ্গল কাব্য' গ্রন্থ গুলিতে বণিকের বাণিজ্য যাত্রাপথের বর্ণনায় ভাগীরথী তীরবর্তী ইন্দ্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত[৩] বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থে বলা হয়েছে —

"উজানি কাটোয়াবাহি রহে ইন্দ্রঘাটে।"[৪]

ভাগীরথী তীরে কাটোয়ার নিকটস্থ ইন্দ্রঘাট অর্থাৎ ইন্দ্রাণীতে বণিক অবস্থান করেছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থে ইন্দ্রাণীর অবস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী স্থাননাম গুলির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণীর বিশেষ বিশেষ অংশ এবং তার সংলগ্ন নদীর ঘাটগুলির কথাও মুকুন্দরাম লিখেছেন, যেমন বিকীহাট, মণ্ডলহাট, প্রভৃতি।[৫] বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন,

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম"[৬]

জয়ানন্দ - 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে ইন্দ্রাণীর ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দরভাবে।

"পূর্বে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট মনোহর
উত্তরে অজয় গঙ্গা।[৭]

ইন্দ্রাণীর পূর্বদিকে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, যেখানে মঙ্গলকাব্যের বণিকদের তরী বেঁধে অবস্থান করার কথা জানা যায়। উত্তরে অজয়-গঙ্গা অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর উত্তরে কাটোয়ার নিকটে অজয় গঙ্গার সংগম স্থল। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ার কেশবভারতীর আশ্রম পর্যন্ত যাত্রা পথের বর্ণনায় ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, বিকীহাট প্রভৃতির নামোল্লেখও করেছেন।[৮]

বাংলা 'মহাভারত' রচয়িতা কাশীরাম দাস এবং 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা গদাধর দাস উভয়েই ছিলেন ইন্দ্রাণীর অর্ন্তগত সিদ্ধির বাসিন্দা। সিদ্ধি স্থান নামটি সিঙ্গি হয়েছে। কাশীরাম দাস মহাভারতের আদিপর্বের শেষে আত্মপরিচয় অংশে লিখেছেন -

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধি (পাঠান্তর সিঙ্গি) গ্রাম।[১০]

কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস 'জগন্নাথমঙ্গল' - এ স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রায়ণী নাম তারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি (পাঠান্তর 'সিঙ্গি') গ্রাম।।[১১]

কাশীরাম দাসের অনেক পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে ইন্দ্রাণীর স্বতন্ত্র বর্ণনা পাওয়া যায়,

'"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবীভাগীরথী।।"[১২ক]

কাশীরাম দাস ও গদাধর দাস দুজনের বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁদের গ্রাম সিদ্ধি ছিল ইন্দ্রাণী নামক অধুনালুপ্ত বৃহৎ নগরের অংশ।[১২খ] কাশীরাম দাস ইন্দ্রাণীকে 'ইন্দ্রাণীনগর' বলেও উল্লেখ করেছেন। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত একটি ছড়ায় ইন্দ্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায় -

বারঘাট, তেরহাট, তিনচন্ডী, তিনেশ্বর।
ইহাই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।।[১৩]

বর্তমান দাঁইহাট কে ঘিরে এই ইন্দ্রাণী নগর ছিল। দাঁইহাট উদ্ধৃত ছড়ায় - উল্লিখিত তের হাটের অন্যতম হাট। ইন্দ্রাণী তখন এত বিশিষ্ট জনপদ ছিল যে বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' "ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম" বলে কাটোয়ার অবস্থিতি জানিয়েছেন। 'মঙ্গলকাব্য ' গুলিতেও একাধিক হাট ও ঘাট এর কথা জানা যায়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ক্যাডাস্ট্রাল সেটেলমেন্ট (সি. এস.) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্ভুক্ত মৌজা নামের তালিকায় বেশ কিছু 'হাট' - অন্ত স্থান নাম ও গ্রাম নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন - কাটোয়া, ঘোষহাট, পানুহাট, মন্ডলহাট,

আকাইহাট, বিকিহাট, বেড়া, পাতাইহাট, চরপাতাইহাট, দাঁইহাট, ভাওসিং, পাইকপাড়া, গাজীপুর, তনুনগ্রাম প্রভৃতি। ছড়া ও সাহিত্য গ্রন্থে উল্লিখিত হাটগুলির সব বর্তমানে নেই তবে সাধারণ মানুষের চিরাচরিত ধারণায় হাট গুলি হল ঘোষহাট, আতুহাট, পানুহাট, মন্ডলহাট, আকাইহাট, পাতাইহাট, বিকিহাট, বীরহাট, বামুনহাট, তাঁতিহাট, দেহাট, দন্ডীহাট বা দাঁইহাট। এই হাট বিশেষিত স্থাননাম গুলির কিছু অন্য নামে পরিচিতি হয়েছে। যাইহোক, ঐ স্থানগুলির অবস্থান কাটোয়া থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত ভাগীরথীর পরিত্যক্ত পশ্চিমতীর বরাবর। এই হাটগুলি মধ্যকালীন বাণিজ্যের এক একটি বিভাগ ছিল, যেগুলির সমন্বিত পরিচয় ছিল ইন্দ্রাণী নগর।

হাট সংলগ্ন ঘাটগুলির অস্তিত্ব মধ্যকালীন গৌরব হারিয়ে বর্তমানে জঙ্গলাবৃত হয়ে আছে। এই ঘাটগুলি হল - বারদুয়ারীঘাট, কালুর ঘাট, মনোহারীর ঘাট, কান্তবাবুর ঘাট, ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, স্বরূপপানের ঘাট, কদমতলার ঘাট, বক্সীর ঘাট, গণেশমাতার ঘাট, শিবের ঘাট, দেওয়ান ঘাট, শংখেশ্বরীর ঘাট, ভাওসিং ঘাট প্রভৃতি। বেশকিছু ঘাট পরবর্তী কালে সংস্কারকের নামে পরিচিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

ইন্দ্রাণী নগরের নামকরণ সম্ভবতঃ ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে মাতৃদেবী ইন্দ্রাণীর প্রভাবে হয়ে থাকবে। ইন্দ্রাণী দেবীর নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত ভুবনেশ্বরে পরশুরামের মন্দির ভাস্কর্যে।

স্বতন্ত্র মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় উদয়পুর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের নিদর্শনে।[১৪] এযাবৎ ইন্দ্রাণী দেবীর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কোন মূর্তি দাঁইহাট অঞ্চলে পাওয়া যায়নি তবে ইন্দ্রাণী দেবীর অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার মধ্যকালীন সাহিত্যে ইন্দ্রেশ্বর দেবমন্দির ও সংলগ্ন ঘাট এর কথা পাওয়া যায়। এই প্রাচীন দেবমন্দিরের বিভিন্ন অংশ দাঁইহাট অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালে নির্মিত ধর্মস্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন অংশগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরে দেবরাজ ইন্দ্র তৎসহ ইন্দ্রাণী দেবীর মূর্তিও যে পূজিত হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দ্রাণী নগরের নামকরণ ইন্দ্রাণী দেবীর নামানুসারে হয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য বিষয় ইন্দ্রেশ্বর হলেন জৈন দেবতা, ইন্দ্রাণী জৈন দেবী।

ইন্দ্রাণীর প্রাচীন স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় নেই তবে তার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্নবস্তু গুলির মধ্যে। বেশ কিছু দেবদেবীর মূর্তি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। পীর বদর শাহ্‌র দরগা, মসজিদ, নির্মাণের উপকরণ হিসাবে পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন অংশগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রাণীর শিবমন্দির (ইন্দ্রেশ্বর) থেকে একটি প্রস্তরলেখ এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এর ভিত্তিতে তারাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, লেখটির সময়কালানুযায়ী মন্দিরটি অষ্টম শতকের।[১৫] নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়, ইন্দ্রাণীর অংশ

কাটোয়া থেকে গুপ্তযুগের রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রাপ্তির কথা বলেছেন।[১৬] দাঁইহাট সংলগ্ন গোঁসাই ডাঙাতে (রাজার ডাঙা) শ্রমিকেরা মাটি খোঁড়ার সময় বেশ কিছু শংখ এবং একটি বিষ্ণুমূর্তির নীচের অংশ সংগ্রহ করে। শংখগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। উক্ত মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক মন্তব্য করেছেন, এগুলি দক্ষিণাবর্ত শংখ। বিষ্ণুমূর্তির অংশটি আকাই হাট গ্রামে সার্বজনীন পূজোমণ্ডপ সংলগ্ন গাছ তলায় একাধিক ভাঙা মূর্তির সাথে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। গ্রামের মানুষের সম্মতিক্রমে সেটি সংগ্রহ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ঘোষ মহাশযের নিকটে রাখা হয়েছিল ১৯৮৮ তে। বর্তমান নিবন্ধটি ঐ সময়ে লেখা শুরু হয়েছিল। মূর্তিটির পাদদেশে দেবনাগরী হরফে দু-লাইনের লেখাটি উৎকীর্ণ রয়েছে। এটি বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। লেখটির পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায়। লেখটির লিপিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বোঝা যায় মূর্তিটি দশম শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং এটিতে প্রতিষ্ঠাতার নাম হিসাবে বসন্ত সিংহ ও তার পুত্রের কথা জানা যায়। বসন্ত সিংহ ছিলেন বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত।[১৭]

প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, আদি-মধ্যকালীন ইন্দ্রাণী বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালে রচিত 'মঙ্গলকাব্য' সমূহে আদি মধ্যকালীন বাণিজ্যের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে।[১৮] কারণ 'মঙ্গলকাব্য' গ্রন্থগুলির রচনাকালে যে বাণিজ্যরীতি চালু ছিল তার সাথে বর্ণনার মিল নেই। যাইহোক, লেখটির ভিত্তিতে বলা যায় যে, দশম শতকে ইন্দ্রাণী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। এক্ষেত্রে এরকম অনুমানও স্বাভাবিক যে, প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তের সহায়ক অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে একসময় ইন্দ্রাণী সক্রিয় ছিল, অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে তাম্রলিপ্তের ক্রমাবনতির ফলে একাধিক অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। গৌরপদ সেন মহাশয় এরূপ একাধিক নদীবন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের প্রেক্ষাপটে।[১৯] উক্ত তালিকায় ইন্দ্রাণী নবতর সংযোজন, কারণ গৌর বাবু ইন্দ্রাণীর মূর্তিলেখটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাম্রলিপ্তের বিকল্প বন্দর হিসাবে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পর সপ্তগ্রাম বাণিজ্য অর্থনীতিতে গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে।[২০] সে সময়ও ইন্দ্রাণী অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মধ্যকালীন ইন্দ্রাণীর বাণিজ্য বিষয়ক পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' এ সদাগর উজানি (বর্তমান মঙ্গলকোট) থেকে সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যযাত্রা শুরু করে অজয় নদীর প্রবাহ পথ ধরে এসে ভাগীরথী তীরবর্তী ইন্দ্রাণীব ঘাটে বাণিজ্যতরী ভিড়িয়েছেন ও সেখানে অবস্থান করে ইন্দ্রদেবতার পূজো করেছেন।[২১] বিপ্রদাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থরচনা করেছেন, তাই সদাগরের

ইন্দ্রাণীতে অবস্থান করে ধর্মকর্মকেই প্রধানত উল্লেখ করেছেন, এখানে বাণিজ্য কর্ম প্রাধান্য পায়নি। উজানির প্রয়োজনেই যে তিনি সিংহল-র দিকে যাত্রা করেছেন তা মনে হয় না, পথে ইন্দ্রাণীতেও বাণিজ্যকর্ম সম্পূর্ণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গলে' দেখা যায় সদাগর ইন্দ্রাণীর ঘাটে তরী বেঁধে ধর্মকর্ম সম্পন্ন করে বিকীহাট[২২] সম্ভবতঃ বাণিজ্য উপলক্ষেই গিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, সমকালীন বণিকেরা ইন্দ্রাণী নদী-বন্দরে এসে ধর্মকর্ম ও বাণিজ্য কর্ম উভয়ই সম্পন্ন করতেন। বর্তমানের শহর কাটোয়ার নাম মঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে তবে বণিকেরা এসে অবস্থান করেছেন ইন্দ্রাণীতে, কারণ কাটোয়া সে সময় গ্রাম ছিল।[২৩] বৃন্দাবন দাসের 'কাটোয়া নামে গ্রাম' উক্তিটি যথাযথ বলেই মনে হয়।

ইন্দ্রাণী নগরে বসবাসকারী মধ্যকালীন বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার জৈন সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায় একটি জৈনমূর্তি লেখ থেকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দাঁইহাট সংলগ্ন বেড়া (বীরহাট) নামকস্থানে পিতল নির্মিত জৈনমূর্তিটি পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, মূর্তিটি জৈনদের নৌপজ্জী অর্থাৎ নবপদপূজাপ্রতিমা, এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। মূর্তি সংলগ্ন লেখতে উক্তস্থান জিনক্ষেত্র বা স্বর্গস্থান বলে চিহ্নিত হয়েছে। মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভুগু সিংহের নাম পাওয়া যায়।[২৪] সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ইন্দ্রাণী বাণিজ্যকেন্দ্র পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত কার্যকরী ছিল।

মধ্যকালীন বাণিজ্যে যে সমস্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল সেগুলির বসবাস ইন্দ্রাণীতে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দশম শতকের লেখটিতে সিংহ পদবীধারী বণিক বসন্ত সিংহ এবং তার পুত্রের কথা পাওয়া যায়। ঐ একই পদবীধারী বণিককে নবপদপূজা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে দেখা গিয়েছে চতুর্দশ শতকে। এছাড়া হাট ও ঘাটগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে একাধিক বণিক বৃত্তিধারী মানুষের বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনধর্মমতাবলম্বী বাংলার বর্ণ ব্যবস্থায় শরাক সম্প্রদায় ভুক্ত বণিক অন্য বণিকদের বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করত।[২৫] এই মূর্তিলেখ থেকে বোঝা যায়, ইন্দ্রাণীতে বর্ধিষ্ণু শরাক সম্প্রদায়ের বাস ছিল। মমতাজুর রহমান তরফদার মহাশয় শরাকদের বস্ত্রবয়ন শিল্পের সাথে জড়িত সম্প্রদায় বলে মন্তব্য করেছেন।[২৬] সুতরাং শরাক সম্প্রদায়ভুক্ত বণিক শুধুমাত্র ঋণ দান জনিত ব্যবসাই করত না বস্ত্র-শিল্পোৎপাদনের স্বার্থেও জড়িত ছিল। এছাড়া অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গন্ধবণিক, কংসবণিক, স্বর্ণবণিকদেরও বসবাস ইন্দ্রাণীতে ছিল। বর্তমান কাটোয়া শহরের পুরাতন ব্যবসায়ী বণিকদের আদি বাসস্থান ছিল ইন্দ্রাণীতে। কাঁসা পিতলের বাসনপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ তৈরীর অন্যতম কেন্দ্র ছিল ইন্দ্রাণী। এইভাবে দেখা যায় বস্ত্রশিল্প, কাঁসা-পিতল শিল্প কেন্দ্র হিসাবে ইন্দ্রাণী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

ধর্ম-সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে ইন্দ্রাণীর খ্যাতি ছিল সর্বাপেক্ষা। আদি-মধ্যকালীন ধর্মীয় পরিচয় হিসাবে বলা যায়, সে সময় বৈষ্ণব অবতার পূজন রীতি প্রচলিত ছিল।[২৭] দশম শতকের মূর্তিলেখটিতে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বণিকের নাম পাওয়া যায়। পাশাপাশি ইন্দ্রেশ্বর শিব মন্দির ইন্দ্রাণীতে শৈবধর্মের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। বাণিজ্য কেন্দ্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল একাধিক ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের উপস্থিতি থাকবে। এদিক থেকেও ইন্দ্রাণীকে মধ্যকালীন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভের ইতিহাসে ইন্দ্রাণী ছিল অন্যতম কেন্দ্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের জনক শ্রীচৈতন্য ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে কেশবভারতীর আশ্রমে এসে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।[২৮] দীক্ষান্তে তিনি নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বক্রেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাঢ় অঞ্চলে তিনদিন ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[২৯] অর্থাৎ ইন্দ্রাণী থেকেই শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন। সে কারণে ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে অন্যতম তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিত্যানন্দের অবদান ছিল যথেষ্ট। তিনিও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রাণীকে অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। নিত্যানন্দের ভাবশিষ্যগণ দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত ছিলেন। পানিহাটির রাঘব পন্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দের অভিষেকের সময় 'দ্বাদশগোপাল' দের শ্রীপাট নির্দিষ্ট হয়। 'দ্বাদশগোপাল'দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত আকাইহাট এর কালাকৃষ্ণ দাস। কাটোয়াতে নিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রভাবশালী বৈষ্ণব গদাধর দাসের শ্রীপাট ছিল। গদাধব দাস 'দ্বাদশগোপাল' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না।[৩০] কালাকৃষ্ণ দাস ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তিনি চৈতন্যের সঙ্গীরূপে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। এই সময় বামাচারী তান্ত্রিকদের খপ্পরে পড়ে চৈতন্যের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হন। পুরীতে ফিরে কালাকৃষ্ণকে বহিষ্কার করতে চাইলে নিত্যানন্দের হস্তক্ষেপে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। নিত্যানন্দের নির্দেশে তিনি আকাইহাট-এ এসে গোপাল হন। এখান থেকে কালাকৃষ্ণ পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে গিয়ে বিবাহ করেন, পরে বৃন্দাবনও গিয়েছিলেন।

১৯২১-এ বৈষ্ণব ঐতিহাসিক অমূল্যধন রায়ভট্ট আকাই হাট এসে আকাই হাট জঙ্গলাকীর্ণ দীনদরিদ্রভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব হরেরাম বাবাজী কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করছেন।[৩১] ১৯৮৮ - তে আমি শ্রীপাট-র কোন চিহ্ন পাই নি। শুধু নামটি টিকে আছে মানুষের মনে। এখানেই পূর্বোক্ত বিষ্ণু মূর্তি লেখটি সংগ্রহ করি। সুতরাং দেখা যায় যে, কালাকৃষ্ণ দাস এবং গদাধর দাসের শ্রীপাট দুটি ইন্দ্রাণীর গুরুত্ব কে বৃদ্ধি করেছিল? সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দ্রাণীকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেবার কারণ হিসাবে নিত্যানন্দের বণিক প্রীতিকে উল্লেখ করতেই হয়। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ

বণিকের অর্থানুকুল্য লাভ করেছিলেন। সপ্তগ্রামের বণিকের ঘরে ঘরে তিনি হরিনাম বিতরণ করেছেন।[৩২] সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে হুগলী জেলায় ধর্মপ্রচার যেমন করেছিলেন তেমনি ইন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের একাংশ ও বীরভূম-মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। 'চন্ডীমঙ্গল' - এ মুকুন্দরাম বলেছেন, বণিকেরা বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক ছিলেন।[৩৩]

ইসলাম মতাদর্শের প্রভাবে ইন্দ্রাণীর মানুষজন প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় এটাই ছিল স্বাভাবিক। পীর-বদর শাহ্-র মাজার ও মসজিদ ইসলাম ধর্ম প্রসারের পরিচায়ক। স্থানীয় কোন শ্রেণীর মানুষ ইসলাম মত গ্রহণ করেছিল এবং কেন? সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সাধারণ ঐতিহাসিক মতানুযায়ী বলা হয় - নিম্নবর্গের হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী মানুষ ইসলাম ধর্মমত গ্রহণ করেছিল প্রধানতঃ সুফী দরবেশদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। শাস্ত্রীয় ইসলাম অপেক্ষা সুফীবাদ নামে মরমীবাদ সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩৪]

ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলার সমাজ কাঠামোয় যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রাথমিক কারণ ছিল বৃত্তিগত পরিবর্তন। পশ্চিম এশিয়া থেকে চরকা ও তুলো ধুনার যন্ত্র ধুননী আমদানির ফলে বস্ত্র বয়নের কাজে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব আর্থনীতিক জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। বহির্দেশে বাংলার সুতীবস্ত্রের চাহিদার প্রেক্ষাপটে মনে করা যেতে পারে যে, বাংলায় তাঁত শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন পেশার লোকজন চিরাচরিত বৃত্তি ত্যাগ করে তাঁত শিল্পে আত্মনিয়োগ করে।[৩৫] এই পরিবর্তনের ছোঁয়াচ থেকে ইন্দ্রাণী ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষ মুক্ত ছিল না। মমতাজুর রহমান তরফদার মহাশয় বলেছেন, শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত মানুষদের বা কারিগর শিল্পী শ্রেণীকে হিন্দুসমাজের কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন উচ্চবর্ণের উৎপাদন বিমুখ উচ্চবর্ণের মানুষ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিধির বাইরে রেখে অন্ত্যজ বলে চিহ্নিত করেছিল। এরাই অর্থাৎ বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন পেশাভিত্তিক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৩৬]

সমাজ বিবর্তন ও শ্রেণী গঠনের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ইন্দ্রাণীর শরাক সম্প্রদায়। বাণিজ্যিক কারণে মুসলমান বণিকদের সাথে বস্ত্র শিল্পে যোগদানকারী শরাক সম্প্রদায় - এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল।[৩৭] সম্ভবত: সেই কারণেই শুধু ইন্দ্রাণী নয় একদা বর্ধমান অঞ্চলে বসবাসকারী জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ইসলাম ধর্মমতানুসারী হয়েছিল। 'ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত আর্থনীতিক দিকটি ছাড়াও সুফী প্রভাবেও ইসলামের প্রচার হয়েছিল কারণ ইন্দ্রাণীতে শেখ বদর সাহিব-এর মাজার ও মসজিদ এই সুফী প্রভাবের পরিচায়ক সন্দেহ

নেই। এই পীর বদর শাহ বা সাহিব ছিলেন পাঁচপীরের অন্যতম পীর।[৩৮] এইভাবে দেখা যায় যে, ইন্দ্রাণীতে একাধিক ধর্মের সহাবস্থান ছিল। বাণিজ্যকেন্দ্র গুলিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের যাতায়াত ঘটার কারণে বিভিন্ন ধর্মমতের সহাবস্থানই স্বাভাবিক। ইন্দ্রাণী নদী বন্দর এর ব্যতিক্রম ছিল না।

মধ্যকালীন ভূমিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় ইন্দ্রাণী ছিল অন্যতম। আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ইন্দ্রাণী মহাল এর পরিচয় পাওয়া যায়। সুলেমানাবাদ বা সেলিমাবাদ সরকারের একত্রিশটি মহালের মধ্যে ইন্দ্রাণী ছিল অন্যতম। সরকারের সামগ্রিক আয় ছিল ১৭, ৬২৯, ৯৬৪ দাম সেখানে ইন্দ্রাণীতে এককভাবে বাৎসরিক আয় ছিল ৫৯২, ১২০ দাম।[৩৯] নদী-বন্দর তথা ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর মহাল গুলি সাধারণ কৃষিভিত্তিক মহাল গুলি অপেক্ষা আলাদা ছিল। নগর বন্দরের বাজার নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র মহাল গুলি কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক জাগীর হিসাবে বরাত দেওয়া হত। বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র বন্দর হুগলী, গুজরাটের পোরবন্দর প্রভৃতি ছিল এরকম মহাল। খালিসার আওতায় এগুলি রাখা হত।[৪০] ইন্দ্রাণী নগর তথা নদীবন্দরটিও এরকম মহালের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

ইন্দ্রাণীর ব্যবসা বাণিজ্য ভিত্তিক দীর্ঘ ঐতিহ্যের অবসান ঘটেছিল প্রধানত: দুটি কারণে। প্রথমটি হল নদীপথের স্থান পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি মারাঠা বর্গীদের অত্যাচার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় প্রায় একই কারণে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ঘটেছিল। সরস্বতী নদীর অনাব্যতা এবং আফগান দস্যুদের দ্বারা সৃষ্ট রক্তক্ষয় জনিত অস্থির পরিস্থিতি।[৪১] ইন্দ্রাণীর ক্ষেত্রে ভাগীরথী নদী পূর্বদিকে সরে গিয়েছিল। কাটোয়া থেকে আটমাইল দূরে গাজীপুর পর্যন্ত প্রবাহ পথটি চিরাচরিত অশ্বক্ষুরাকৃতি গতিপথটি ত্যাগ করে সোজাসুজি প্রবাহিত হতে শুরু করে ফলে ইন্দ্রাণী থেকে নদীপথটি সরে যায় প্রায় দু-মাইল পূর্বে। এই পথ পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় ফান্ ডেন্ ব্রোক এর মানচিত্রে। এর ভিত্তিতে ব্লকম্যান বলেছেন এই স্থানে নদীপথটির স্থানান্তর ঘটেছিল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে।[৪২] জেমস্ রেনেলের মানচিত্রে পুরাতন এবং নূতন দুটি প্রবাহ পথেরই পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৩] দুটি প্রবাহ পথের মাঝে বিস্তীর্ণ দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বর্তমানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রাণীর বণিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে দক্ষিণে কাটোয়াতে ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছে। কারণ এখানে নদীপথ গতি পরিবর্তন করে নি। নবোদ্ভুত শহরটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়াতে দুর্গ নির্মাণ করেন ও নিজের নামানুসারে নামকরণ করেন মুর্শিদগঞ্জ।[৪৪] এই আলোচনায় বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রাক্কালে কাটোয়া রাজনৈতিক গুরুত্ব পেলেও ইন্দ্রাণী বাণিজ্যকেন্দ্রটি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েনি, অর্থাৎ দুটি বাণিজ্যকেন্দ্রই কাটোয়া ও ইন্দ্রাণী সমভাবে কার্যকরী ছিল।

শুধুমাত্র নদীপথের পরিবর্তন বাণিজ্য কেন্দ্রের পতনের একমাত্র কারণ নয়। কারণ, ১৭৬০-এ ভাগীরথী নতুন পথে প্রবাহিত হলেও পুরোন জলপথ কার্যকরী ছিল তাই পরবর্তী প্রায় একশো বছর ইন্দ্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। এই অস্তিত্বের অবসান ঘটতে সাহায্য করেছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত মারাঠা বর্গীদের বিধ্বংসী কার্যকলাপ। মারাঠা বাহিনীর ব্যাপক লুঠতরাজের ফলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ভাবে মারাঠাদের নির্যাতন পর্ব চলেছিল। এই ভয়ংকর মারাঠা বাহিনীর সেনাশিবির স্থাপন করেছিল ইন্দ্রাণীতে। নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার নিযুক্ত ব্যক্তি ভাস্কররাম কোলাহাতকার-এর পরিচালনায় এই লুঠতরাজ সম্পন্ন হত। মারাঠা অত্যাচারের এই বিবরণ পাওয়া যায় গঙ্গারাম-এর 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ।[৪৫] মানুষ প্রাণভয়ে ভাগীরথীর পূর্বদিকে চলে গিয়েছিল। ভাগীরথীর পূর্বদিকের গ্রামগুলিতে মারাঠা বাহিনীর অমানবিক অত্যাচারের যে বর্ণনা গঙ্গারাম দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ভাস্কররাম কোলহাতকার ইন্দ্রাণীতে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন, যেখানে স্থানীয় জমিদারদের উপহার পাঠাতে বাধ্য করেছিলেন। সমকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দী ভাস্কররাম সহ বাইশজন সেনাধ্যক্ষকে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা হত্যা করেন ১৭৪৪ - এর ৩০শে মার্চ। ভাস্কররাম নিহত হলেও ইন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নির্যাতনপর্ব চলেছিল।[৪৬]

ইন্দ্রাণীর অস্তিত্ব যেটুকু বজায় ছিল তাও সমাপ্ত হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেই। ইন্দ্রাণীর মানুষ ভাগীরথীর পূর্বদিকে চলে যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, ইন্দ্রাণী নগরের পতনের জন্য দায়ী ছিল নদীপথের স্থান পরিবর্তন ও মারাঠা বর্গীদের অত্যাচার জনিত পরিস্থিতি। বর্গী অত্যাচার পর্ব সমাপ্তির পর ইন্দ্রাণীনগর আর পূর্ব ঐতিহ্য ফিরে পায়নি, পেয়েছিল বর্তমান মহকুমা শহর কাটোয়া, যাকে বৃন্দাবন দাসের কথায় বলা যায় - ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। এই সময়ের নগরায়ণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় মন্তব্য করেছেন - সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলীর আবির্ভাব, কলকাতার উত্থানের কারণ বাংলার ছিন্নমূল সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসে নিহিত।[৪৭] এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রাণী কাটোয়ার ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

বাংলার নগরায়ণের ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রাণীর উদ্ভব ও পতনের পর অষ্টাদশ শতকে কাটোয়া শহরের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনার এই প্রয়াসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ সন্দর্ভের বিষয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১.) দীনেশ ঘোষ, নগর-বন্দর সপ্তগ্রাম: বিকাশের পটভূমি, ***ইতিহাস অনুসন্ধান*** - ৭, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলিকাতা - ১৯৯৩, পৃ: ১৭৪ - ১৮৪, 'নগরবন্দর সপ্তগ্রামের অভ্যুত্থান কাল', ***ইতিহাস অনুসন্ধান*** - ৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলিকাতা - ১৯৯৪, পৃ: ১৯৬ - ২১১।

২) আবুল ফজল '*আইন-ই-আকবরী*, এইচ. এস. জ্যারেট (সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি, ভল্যুম - ২, পৃ: ১২৯।

৩) সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম***, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ: - ৭।

৪) বিপ্রদাস পিপিলাই, ***মনসামঙ্গল***, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ: - ১৪৭।

৫) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ***চন্ডীমঙ্গল***, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ২১৬ - ২১৭, ৩১১ - ৩১৪।

৬) বৃন্দাবন দাস, ***চৈতন্যভাগবত***, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, (সম্পাদিত), অন্ত খন্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ৩৬০।

৭) জয়ানন্দ, *চৈতন্যভাগবত*, বিজন বিহারী মজুমদার এবং সুখময় মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত) কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ: - ১৩১।

৮) ঐ, পৃ: - ১৩২।

৯) সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃ: ১৭৮ - ১৭৯।

১০) কাশীরাম দাস, ***মহাভারত***, স্বামী পরমানন্দ, (সম্পাদিত), পৃ: - ৬০৬; সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃ: - ১৭৬।

১১) সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃ: ১৭৬।

১২ক) ঐ, (সংগৃহীত), পৃ: - ১৭৯।

১২খ) অভয় দাস মুখোপাধ্যায়, 'কাশীরাম দাসের জন্মস্থান', ***প্রবাসী***, দ্বিতীয় খন্ড, ৫৪শ ভাগ, ১৩৬১ সাল, পৃ: ৫৯৯ - ৬০০।

১৩) সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃ: ১৭৯।

১৪) কল্যাণ কুমার দাসগুপ্ত, ***ইতিহাস ও সংস্কৃতি***, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ: - ১২৩ - ১২৪।

১৫) তারাদাস চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী, ***মাসিক বসুমতী***, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চমবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল, পৃ: - ৮৭৭।

১৬) নীহাররঞ্জন রায়, ***বাঙালীর ইতিহাস***, (আদিপর্ব), কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ: - ১৯৫।

১৭) লেখটির "ছাপ-ছবি" সংগ্রহ করে অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-র সহায়তায় পাঠোদ্ধার করা হয়। এটি আমার গবেষণা গ্রন্থে (অপ্রকাশিত) সংযোজিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, আদি-মধ্যকালীন বাংলার বাণিজ্য ধ্বংস হয় নি। ইন্দ্রাণীর ন্যায় একাধিক বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র সমকালীন বাণিজ্য ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

১৮) রাধাকুমুদ মুখার্জী, ***এ হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়ান শিপিং***, ক্যালকাটা, ১৯৫৭, পৃ: ১১০;

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, এ্যান্ ইনট্রোডাকশন্ টু দি ম্যারিটাইম হিস্টরি অব্ ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ - ১০৮।

১৯. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), "*কালচার অব্ বেঙ্গল থ্রো দি এজেস*", বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃঃ - ১৪ - ৩৪।

২০. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, "*এ্যান্ ইনট্রোডাকশন*", ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৯৯ - ১০৭, দীনেশ ঘোষ, পূর্বোক্ত নিবন্ধ, ***ইতিহাস অনুসন্ধান*** - ৭ এবং ৯, পৃঃ ১৭৪ - ১৮৪, ১৯৬ - ২১১।

২১. বিপ্রদাস পিপিলাই, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ১৪৭।

২২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ২১৬ - ১৭, ৩১১।

২৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ১৭৯।

২৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিওল ফলক, ***বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা***, চতুর্থ সংখ্যা, চতুর্থ ভাগ, ১৩০৪ সাল, পৃঃ ৬০০।

২৫. এন. এন. ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), জৈনইজম্ এন্ড প্রাকৃত ইন এনসিয়েন্ট এন্ড মেডিভাল ইন্ডিয়া প্রকাশিত ভাস্কর চ্যাটার্জী, ***রেলিকস্ অব্ দি জৈন কমিউনিটি ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া***, ১৯৯৪, পৃঃ ২৩০ - ২৪০।

২৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, ***ইতিহাস ও ঐতিহাসিক***, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৮ - ৪৯।

২৭. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ***বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম***, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৯৬।

২৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ - ২৮।

২৯. ঐ, পৃঃ ২৮।

৩০. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৭৮ - ৭৯, ৯৭।

৩১. ঐ, পৃঃ - ৯৮।

৩২. ঐ, পৃঃ ১০১ - ১০২।

৩৩. কবিকংকন মুকুন্দ, চন্ডীমঙ্গল, নতুন দিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ৭৮ - ৭৯।

৩৪. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), ***মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি***, কলিকাতা - ১৯৯২, পৃঃ ১৮৭ - ৮৮।

৩৫. ইরফান হাবিব, প্রেসিডেন্সিয়াল এ্যাড্রেস : মেডিয়াভেল ইন্ডিয়া সেশেন, ***ইন্ডিয়ান হিষ্টরি কংগ্রেস প্রসীডিংস***, বারানসী, ১৯৬১ (পাটনা, ১৯৭০), পৃঃ ১৪০ - ১৪৯, ***ইকোনমিক হিস্টরি অব্ দিল্লী সুলটানেট, এ্যান্ এ্যাসে ইন্ ইনটারপ্রিটেশন, ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়্যু***, চতুর্থ ১৯৭৮, পৃ. ১৮৯ -২৯০।

৩৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৪৮ - ৪৯।

৩৭. ঐ, পৃঃ ৫০।

৩৮. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ১৯৩।

৩৯. আবুল ফজল, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ১৪০।

৪০. ইরফান হাবিব, ***দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব্ মুঘল ইন্ডিয়া***, (১৫৫৬ - ১৭০৭) বোম্বাই, ১৯৬৩, পৃঃ ২৫৯।

৪১. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, 'সপ্তগ্রাম অর সাতগাঁও' ***জার্ণাল অফ্ দ্য এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল***, ১৯০৯, পঞ্চম খন্ড, প্রথম পর্ব, নং - ৭, পৃঃ ২৪৫ - ২৫৮, অনিরুদ্ধ রায় ও

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬৮ -৭০।

৪২. *এইচ্ রকম্যান, কনট্রিবিউশন্ টু দি জিওগ্রাফি এন্ড হিস্টরি অব্ বেঙ্গল*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা - ১৯৬৮, পৃঃ ১৩ (পুণঃ প্রকাশিত)

৪৩. জেমস্ রেনেল, ***মেমোয়ার - অব্ এ ম্যাপ অব্ হিন্দুস্তান অফ্ দি মুঘল এম্প্যায়ার এন্ড হিজ বেঙ্গল এ্যাটলাস্***, (সম্পাদিত), ব্রহ্মদেব প্রসাদ অম্বষ্ঠ্য, পাটনা, ১৯৭৫, শিট্ নং - ৭।

৪৪. কালীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, ***বাংলার ইতিহাস***, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃঃ ৫৩।

৪৫. কবি গঙ্গারাম, 'মহারাষ্ট্র পুরান', বোমকেশ মুস্তাফী, (সম্পাদিত), ***বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা***, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৩ সাল, পৃঃ ২২৭।

৪৬. কালীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ১৫১, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ***বাংলাদেশের ইতিহাস***, **মধ্যযুগ**, কলিকাতা - ১৩৮০, পৃঃ ১৫৬, রাধামাধব সাহা, 'নদীয়ায় মারাঠা আক্রমণ', ***ইতিহাস***, প্রথমখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৩ সাল, পৃঃ ৯৩ - ১০১।

৪৭. অনিরুদ্ধ বায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, ***পূর্বোক্ত***, পৃঃ ৬৮।

মেদিনীপুরে বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলা

রবীন্দ্রনাথ মন্ডল

ভারতে বহু ধর্মের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে এবং অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের আলোচ্য বিষয় মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলা।

মেদিনীপুর জেলায় ৩৬০টিরও অধিক বৈষ্ণবীয় মঠ ও মন্দির আছে।[১] এই মঠ ও মন্দির গুলিতে প্রতিটি বৈষ্ণবীয় উৎসব এবং কোন কোন স্থানে সেই উপলক্ষ্যে মেলা আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবগুলের উপলক্ষ্য হল ঃ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি এবং শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে উৎসব; বৈষ্ণব সাধুসন্তদের আবির্ভাব ও তিরোভাব বা মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব ও মেলা; এবং ব্যক্তি ও গ্রামীণ সমষ্টিগত উৎসব।

এখন বৈষ্ণবীয় উৎসবগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল ঃ

রথযাত্রা উৎসব ঃ

রথযাত্রা উৎসব বৈষ্ণবদের একটি অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসব সাধারণত আষাঢ় মাসে হয়। অধিকাংশ কাঠের রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিগুলি স্থাপন করা হয়। তারপর হরিনাম সংকীর্তন ও জগন্নাথের নাম ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা রথের রশ্মি ধরে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিছু দূরে গিয়ে রথ থেমে যায়। সেখানে কোন মন্দিরে (যাকে বলা হয় রথের মাসীবাড়ী) বিগ্রহগুলিকে সাত দিন রাখা হয়। এই সময় এই স্থানে হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবৎ পাঠ, যাত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। অষ্টম দিনে আবার ভক্তেরা রথের রশ্মি ধরে মন্দিরে আনেন জগন্নাথ দেবকে। বাংলায় রথযাত্রা উৎসবের কাহিনী পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবির লেখনী হতে জানা যায়। লোচন দাসের "রাধার বারমাসী" কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে - "আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোকধন্য।" আবার, "আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ঠাকুর কাটেন ফোঁটা।" তবে ওড়িয়া সাহিত্যে পঞ্চদশ শতকে পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়

এবং সম্ভবত পুরীতে প্রথম রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আঠার বার পুরীতে রথযাত্রা উৎসব পরিদর্শন করেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৬০টির বেশি স্থানে মাঝারি থেকে বড় মাপের রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়।[৮] স্থায়ী মন্দিরের রথযাত্রা উৎসব ছাড়াও মন্দির নেই এরকম কিছু স্থানে অস্থায়ীভাবে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। কোন কোন স্থানে এই মেলা ১৫ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে মন্দিব প্রাঙ্গণে কীর্তন, ভাগবৎপাঠ, কৃষ্ণযাত্রা, যাত্রানুষ্ঠান, সিনেমা ও ভিডিয়ো শো এর ব্যবস্থা থাকে সমাগত জনতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রথ মাহেশের পরে স্থান পায়। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রঘুনাথবাড়ী গ্রামে বিজয়া দশমীতে রঘুনাথের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, এই জেলার অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের রথযাত্রা উৎসব ও মেলার একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

রথযাত্রা

স্থান/গ্রাম	*থানা*	*সময়কাল*	*প্রাচীনত্ব*	*স্থায়িত্ব*	*জনসমাগম*
জাগঞ্জ	মেদিনীপুব	আষাঢ	সাম্প্রতিক	১ দিন	৪,০০০
আনন্দপুব	কেশপুব	আষাঢ	২০০ বৎসব	১ দিন	২,০০০
গালগ্রাম	ডেববা	আষাঢ	প্রাচীন	৬ দিন	৩,০০০
লোযাদা	ডেববা	মাঘ	১০০ বৎসব	২ দিন	৫,০০০
তেঘবি বাড় কমল	সবং	আষাঢ	২০০ বৎসব	২ দিন	১,০০০
পিন্ডুবই	পিংলা	বৈশাখ	১৯৪৪ খৃঃ	২ দিন	২,০০০
কাঁটাপুকুর	পিংলা	মাঘ	—	১৫ দিন	২০,০০০
মালঞ্চ	খড়গপুর	আষাঢ	—	৮ দিন	৪,০০০
কাঁথড়া	খড়গপুব	আষাঢ়	৫০ বৎসব	৭ দিন	৪,০০০
কসবা নাবায়ণ গড়	নাবাযণগড়	আষাঢ়	প্রাচীন	৪ দিন	৪,০০০
বেলদা	নবাযণগড়	আষাঢ	—	১ দিন	২,০০০
রাউতারাপুর	দাঁতন	আষাঢ	সাম্প্রতিক	২ দিন	১,০০০
মোহনপুর	মোহনপুব	আষাঢ়	—	১ দিন	৫,০০০
তলকেশিয়াড়ী	কেশিয়াড়ী	আষাঢ	—	৭ দিন	৪,০০০
বাহিরী	কাঁথি	আষাঢ়	প্রাচীন	৯ দিন	৫,০০০-৬,০০০
দেখালি	খেজুরী	আষাঢ	সাম্প্রতিক	১ দিন	১,০০০-১,৫০০
নৈপুব	পটাশপুর	আষাঢ়	৩০০ বৎসয়	৭ দিন	৫,০০০

টেপরপাড়া	পটাশপুর	আষাঢ়	৫০০ বৎসর	৮ দিন	৮,০০০
বাসুদেবপুর	রামনগর	আষাঢ়	—	২ দিন	২,০০০
বাগপুরা	রামনগর	আষাঢ়	৩০০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
বাসুদেবপুর	এগরা	আষাঢ়	প্রাচীন	১০-১২ দিন	১৫,০০০-১৬,০০০
শ্রীনগর	চন্দ্রকোনা	মাঘ	৩০০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
বাসুদেবপুর	দাসপুর	বৈশাখ	৩০০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
রঘুনাথবাড়ী	পাঁশকুড়া	আশ্বিন	২৫০ বৎসর	৭ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
ইড়পালা	ঘাটাল	আষাঢ়	৪২ বৎসর	১ দিন	১,০০০
বল্লুক	তমলুক	আষাঢ়	প্রাচীন	৭ দিন	৩,০০০
কুলটিকরি	সাঁকরাইল	আষাঢ়	—	১ দিন	১,০০০
রামগড়	বিনপুর	আষাঢ়	—	২ দিন	১,০০০

ঝুলনযাত্রা ঃ

শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই জেলার বহুমন্দিরের সন্নিকটে ঝুলনমঞ্চ নির্মিত আছে। ঐদিন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে মন্দির হতে ঝুলনমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দোলনায় দোল দেওয়া হয়। এই সময় মন্দিরে বিশেষভাবে পূজার্চনা করা হয়। তবে ঝুলনযাত্রা উৎসব মেদিনীপুরবাসীদের খুব জোরাল ভাবে আলোড়িত করে না।

জন্মাষ্টমী ঃ

সাধারণতঃ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে বৈষ্ণবরা খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে জন্মাষ্টমী পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] লোচন দাসের "রাধার বারমাসী" কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় - "ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরির জন্মমাস", তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর একটি ভাস্কর্য মথুরা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে যার রিলিফ নং ১৩৪৪।[৪] এর থেকে প্রমাণিত হয় জন্মাষ্টমী উৎসব কত প্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি বৈষ্ণবীয় মন্দিরে জন্মাষ্টমী পূজা হয়। ভক্তেরা মন্দিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন খুবই ভক্তিপূর্ণ ভাবে। এই সময় মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন হয়। বৈষ্ণবরা এই দিনটিকে বৎসরের পবিত্রতম দিন হিসেবে মনে করেন। এমনকি হাজার হাজার অবৈষ্ণব হিন্দু ঐ দিন আমিষ খাবার ত্যাগ করেন এবং জন্মাষ্টমীর পরের দিন মন্দিরে নন্দউৎসব পালিত হয়।

রাসযাত্রা ঃ

কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উৎসব পালিত হয়। এটি বৈষ্ণবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই জেলার প্রতিটি বৈষ্ণবীয় মন্দিরে এই উৎসব যথাযথ

মর্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে আবার অস্থায়ী প্যান্ডেল করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উৎসব পালন করা হয়। এই অস্থায়ী রাসমঞ্চে একটি কৃত্রিম বড় কদম্ব বৃক্ষের তলে অষ্টসখী পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপন করে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এক কথায় রাস বলতে বোঝায় "রসো বৈসঃ"। রাধাবানী সহ গোপীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেমরসের খেলা হল রাস। কিন্তু রাসলীলার এই চিরন্তন চিত্রটি একটি অধ্যাত্মিক ও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পুরুষ এবং শ্রীরাধা হলেন প্রকৃতি এবং তাঁদের দু'জনের মিলিত শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্ট। গোপীরা তাদের পার্থিবসুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। শ্রীচৈতন্য রাসলীলার এই দার্শনিক তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছিলেন।

বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের রাস বর্ণিত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবি "গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাহার যুগ" গ্রন্থে রাস উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] মেদিনীপুর জেলায় পটাশপুর থানার অধীনে পঁচেতগড়ের রাসউৎসব খুবই প্রাচীন। এর পরের স্থান তমলুক মহকুমায় ময়না থানার অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাসউৎসব। অধুনা কাঁথি মহকুমায় পটাশপুর থানার অন্তর্গত জব্দাগ্রামে রাস উৎসব ও মেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এছাড়া, এই জেলার অন্যান্য স্থানে রাসউৎসব ও মেলার প্রাচীনত্ব, জনসমাগম ইত্যাদি সম্পর্কে একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ[৬]

রাসযাত্রা

স্থান/গ্রাম	*থানা*	*সময়কাল*	*প্রাচীনত্ব*	*স্থায়িত্ব*	*জনসমাগম*
নেড়াদেউল	কেশপুর	কার্তিক	১০০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
চলন্তাপাড়া	সবং	কার্তিক	—	৫ দিন	২,০০০
দেউলি	নারায়ণগড়	কার্তিক	—	১ দিন	৩,০০০
আসাদা	নারায়ণগড়	কার্তিক	১০০ বৎসরের অধিক	৫/৬ দিন	৫,০০০
পলাশিয়া	দাঁতন	ভাদ্র	—	১ দিন	২,০০০
খন্ডরুই	দাঁতন	কার্তিক	৬৫ বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
সানপিরা	মোহনপুর	কার্তিক	—	৭ দিন	২,০০০
মারিশদা	কাঁথি	কার্তিক	৪৫ বৎসব	১ দিন	২,০০০
বাহিরী	কাঁথি	কার্তিক	প্রাচীন	১২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
কুঞ্জপুর	খেজুরী	কার্তিক	—	৫ দিন	২,০০০
গুড়গ্রাম	ভগবানপুর	কার্তিক	৩৫ বৎসর	৫ দিন	৫,০০০
টেপরপাড়া	পটাশপুর	কার্তিক	৫০০ বৎসর	৬ দিন	১০,০০০
পাঞ্চেলগড়	পটাশপুর	কার্তিক	—	৮ দিন	৬,০০০

দুবদা	এগরা	কার্তিক	১০০ বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
যোগীখোপ	তমলুক	কার্তিক	৫০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
ঘোষপুর	পাঁশকুড়া	কার্তিক	১০০ বৎ. অধিক	৪ দিন	৫,০০০
যশাড়	পাঁশকুড়া	কার্তিক	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
গোপালচক	পাঁশকুড়া	কার্তিক	২৫ বৎসর	৫ দিন	৫,০০০
গড়সাফৎ	ময়না	কার্তিক	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
কিয়ারানা	ময়না	কার্তিক	প্রাচীন	১৫ দিন	৫,০০০
গোজিনা	ময়না	মাঘ	২০০ বৎসর	৭ দিন	৩,০০০
খোদামবাড়ি	নন্দীগ্রাম	মাঘ	১৫ বৎসর	২ দিন	২,০০০
কাঁথরা	খড়গপুর	কার্তিক	সাম্প্রতিক	২ দিন	১,০০০
বেলাবেড়্যা	গোপী-বল্লভপুর	কার্তিক		৩ দিন	৩,০০০

দোলউৎসব ঃ

হিন্দু শাস্ত্রমতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন মন্দির হতে বিষ্ণুর প্রতিরূপ শালগ্রাম শিলাকে মন্দিরের অনতিদূরে নির্মিত এক নবমন্ডপে আনা হয়। সেখানে বিগ্রহকে পূজা করা হয় এবং ইহার পর বিগ্রহকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনবার উত্তর দক্ষিণে দোল দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রহের গাত্রে ফাগু ও চন্দন স্পর্শ করিয়ে উপস্থিত সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ স্বরূপ কপালে গ্রহণ করে।[৭] দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন বহ্ন্যুৎসব, যার চলিত নাম চাঁচর। মন্দিরের অনতিদূরে কিংবা ফাঁকা জায়গায় বাঁশ, খড়, তালপাতা, বকুলপাতা ইত্যাদি দিয়ে গৃহ নির্মাণ করা হয়। কোথাও পশু, নরমূর্তি বা পিঠালীর ভেড়া তৈরী করে উক্তগৃহে স্থাপন করা হয়। এই ভেড়ার নাম মেণ্ঢাসুর। সন্ধ্যার সময় বিপুল হর্ষধ্বনিসহ এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কি যেন আপদ দগ্ধ হল, তাতেই আনন্দ। শাস্ত্রমতে বিষ্ণু মেণ্ঢাসুরকে আগুনে পুড়িয়ে বধ করেছিলেন।[৮] এই চাঁচর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে দূর করে শুভকে স্বাগত জানানো হয়।[৯]

কিন্তু প্রচলিত ও জনপ্রিয় দোল উৎসবের ব্যাখ্যা হল বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে আনন্দোৎসবে যখন মেতেছিলেন, তখন গোপীরা আবীর ও লাল রঙ দিয়ে তাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। বৃন্দাবনের দোললীলার এই দিব্য দৃশ্য শ্রীচৈতন্যদেব উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এই দোল উৎসব আরও বেশী আনন্দমুখর ও প্রাণবন্ত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং গোপীজন বল্লভদাসের রসিকমঙ্গল গ্রন্থে দোলউৎসবের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।[১০]

"ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী দুলিবে কোন ছলে।।"

লোচন দাস।

আবার, "ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে।
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।।"

শ্যাম দাস

দোল উৎসব একটি সর্বভারতীয় উৎসব। একে আবার বসন্ত উৎসবও বলা হয়। ভারতীয়রা হোলি বা রঙ খেলার মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে উপভোগ করে। দোল উৎসবের প্রতিফলন তাই স্বাভাবিকভাবে মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামেও পড়েছে। এই জেলার প্রতিটি রাধাকৃষ্ণ বা মহাপ্রভু মন্দিরে দোলপূর্ণিমার দিন বিশেষভাবে পূজা হয় এবং দেবতাদের আবীর, কুমকুম এবং চন্দনে রঞ্জিত করা হয় হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে। এই উপলক্ষ্যে কোন কোন মন্দির প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে এই জেলার বগড়ি কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায় জীউর দোল উৎসব ও মেলার কথা সর্বাগ্রে এসে পড়ে। আঠারো শতকের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'বন্দনা' অংশে বগড়ি কৃষ্ণরায় জীউর নাম উল্লেখ করেছেন।

"সরস হৃদয়ে বন্দি বগড়ির কৃষ্ণরায়
নিরবধি ঘর্ম তার শ্রীঅঙ্গে চুআয়।"

এছাড়া, এই জেলার আরও কয়েকটি স্থানের দোল উৎসব ও মেলার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ[১১]

দোলযাত্রা

স্থান/গ্রাম	থানা	সময়কাল	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
গড়বেতা	গড়বেতা	ফাল্গুন	—	৩ দিন	২,০০০
ত্রিলোচনপুর	ডেবরা	ফাল্গুন	—	৩ দিন	৫,০০
শ্রীরামপুর	খড়গপুর	ফাল্গুন	—	৩ দিন	১,৫০০
বাড়বাঁশি	খড়গপুর	ফাল্গুন	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
পলাশিয়া	দাঁতন	ফাল্গুন	সাম্প্রতিক	৭ দিন	২,০০০
বাহিরী	কাঁথি	ফাল্গুন	প্রাচীন	১২ দিন	৫,০০০
কুঞ্জপুর	খেজুরী	ফাল্গুন	—	১ দিন	৫০০-১,০০০
ঠাকুরনগর	খেজুরী	ফাল্গুন	—	৩ দিন	২,০০০
এক্তারপুর	ভগবানপুর	ফাল্গুন	৮০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০

অনন্তবেড়ে	ভগবানপুর	ফাল্গুন	১০০ বৎসব	৪ দিন	৭,০০০
বাগমারী	পটাশপুর	ফাল্গুন	১৫০ বৎসর	৮ দিন	১,৫০০-২,০০০
শালিকা ধনিয়াচক	তমলুক	ফাল্গুন	৫০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
হলদিচক	তমলুক	ফাল্গুন	সাম্প্রতিক	২ দিন	২,০০০
নীলহানপুব	তমলুক	ফাল্গুন	সাম্প্রতিক	৩ দিন	১,৬০০
খশোড়া	পাঁশকুড়া	ফাল্গুন	৩৫ বৎসর	৮ দিন	৫,০০০
জিযাখালি	পাঁশকুড়া	ফাল্গুন	—	১ দিন	৪,০০০
গড়ময়না	ময়না	ফাল্গুন	—	১ দিন	২,০০০
আনন্দপুর	ময়না	ফাল্গুন	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০-১,৫০০
নাইকুন্তি	মহিষাদল	ফাল্গুন	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
বড়বাসুদেবপুর	সুতাহাটা	ফাল্গুন	সাম্প্রতিক	২ দিন	১,০০০
ফতেপুর	দাসপুর	ফাল্গুন	১০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
বহড়া	চন্দ্রকোনা	ফাল্গুন	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
গোপীবল্লভপুর	গোপীবল্লভপুর	ফাল্গুন	—	১ দিন	৩,০০০

উৎসব ও মেলা ঃ

উপরিউক্ত বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান উৎসব ও মেলাগুলি ছাড়াও বৈষ্ণবদের আরও কতগুলি উৎসব আছে যেগুলি মেদিনীপুরবাসীদের অনুপ্রেরণা দেয় এবং উজ্জীবিত করে। অবশ্য এগুলির মধ্যে বিচিত্রতা যেমন দেখা যায়, তেমনি সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব গুলির কিছুটা রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রামনগর থানার পানিপারুল মোড়ে সরস্বতী পূজার সময় হয় বালিসাই উৎসব। এই উৎসবটি চোদ্দমাদল অর্থাৎ মূলত বৈষ্ণবদের হলেও একই সঙ্গে সরস্বতী, চন্ডী, শীতলা, বগলামাতা, সত্যনারায়ণ ও গোষ্ঠদেবতার পূজা করা হয়। সেইসঙ্গে অখন্ড হরিনাম সংকীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মহোৎসব হয়। এখানে একটি বড় আকারের মেলারও আয়োজন করা হয়। সুতরাং এই উৎসবের মূল সুর বৈষ্ণবীয় তারে বাঁধা থাকলেও আঙ্গিকের কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই থানার অধীনে বোধোড়া গ্রামে রাখালদাস বাবাজী নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধকের সমাধি আছে এবং এখানে প্রতি বৎসর মাঘমাসের দ্বাদশী তিথিতে তাঁর তিরোভাব উৎসব পালন করা হয়, তমলুক শহরে মহাপ্রভু মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ও বৈষ্ণবপদ কর্তা এবং মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব ঘোষের তিরোধান উৎসব চৈত্রমাসে পালন করা হয়। কীর্তন, ভাগবৎপাঠ, শাস্ত্র আলোচনা ও মহোৎসবের মাধ্যমে। গোপীবল্লভপুরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে জ্যৈষ্ঠমাসে শ্যামানন্দের তিরোভাব তিথিতে

বারদিন ব্যাপী দন্ডমহোৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়। এই মন্দিরে রসিকানন্দের আবির্ভাব উৎসব কার্তিকী শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে পালন করা হয়। উভয় অনুষ্ঠানে কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ও মহোৎসব হয়। সবং থানার অধীনে কোলন্দা গ্রামে, কেলেঘাই নদীর তীরে পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় বৈষ্ণব সাধক গোকুলানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব, এখানে একটি মেলাও বসে, মেলাটি খুবই প্রাচীন। ডেবরা থানার অন্তর্গত তালবন্দী গ্রামে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার পরে তিনদিন ব্যাপী সাধক কিশোরীবল্লভ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে হরিনাম সংকীর্তন ও চিড়াভোগ হয়। উৎসবটি প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন। চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে নিতাই গৌরাঙ্গ আশ্রমে ১০৮ রামদাস বাবাজীর অবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব ৪ঠা চৈত্র খুবই জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। এই উৎসব দু'তিন দিন ধরে চলে। এই সময় কীর্তন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও মহোৎসব হয়। কাঁথি থানার অন্তর্গত নাচিন্দাগ্রামে বৈশাখমাসে রাধাকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে চন্দন লিপ্ত করে স্থানীয় একটি বড় পুষ্করিণীতে সারাদিন নৌকাবিহার ও সন্ধ্যাকালে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলাটি ৭৫ বৎসরের প্রাচীন। এই থানার অধীনে বাহিরী গ্রামে চন্দন যাত্রা উৎসব ও মেলা হয়। গভীর অনুসন্ধানে মেদিনীপুর জেলায় আরও এই রকম বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে।

ব্যক্তিগত ও গ্রাম্যকমিটিগত ভাবে উৎসব ও মেলা ঃ

বৈষ্ণবীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলি মেদিনীপুর জেলার হিন্দু পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েগেছে। সাধারণতঃ রোগমুক্তি, সন্তানকামনায়, মামলা মোকদ্দমা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠাদিবস পালন প্রভৃতি উপলক্ষে অবৈষ্ণব হিন্দুরা মহোৎসব ও হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে থাকেন। এগুলি প্রায় প্রতিটি গ্রামে প্রতিবৎসর অন্ততঃ একটি দুটি পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়। আবার, এই জেলার বহু গ্রামে সম্মিলিত ভাবে কমিটি গঠন করে মহোৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন আয়োজিত হয়।

এইভাবে বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলাগুলি মেদিনীপুর বাসীর জনজীবনে এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এই উৎসবগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হলেও শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এই উৎসবের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে যায়। তাই তো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার নর-নারী দল বেঁধে মন্দির প্রাঙ্গণে আসে। উৎসবগুলিতে অংশ নেয় এবং সবাই এক ভক্তির মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়। তাই তো মেলা বা মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে উঠে এক মহামিলন ক্ষেত্র এবং

এখানেই উৎসবগুলির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। মেলাগুলি আবার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সহায়তা - প্রণব রায়, মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প: ব: সরকার, কলিকাতা, ১৯৮৬; তারাপদ সাঁতরা, পুরাকীর্তি সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর, প: ব: সরকার, কলিকাতা ১৯৮৭, জি. সাঁতরা, টেম্পলস্ অফ্ মিডনাপুর, কলিকাতা, ১৯৮০ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ (১৩৫১-১৪০১), কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৯৫।

২) অশোক মিত্র সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, তৃতীয় খন্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৭১ তে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান।

৩) এস. পি: ভট্টাচার্য্য, ভারতীয় সাহিত্য বারমাস্যা, পৃ: ১১৫, ১২৬

ক) ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরির জন্মমাস, - রাধার বারমাসী: লোচন দাস

খ) ভাদ্রমাসে হরিজন্ম ভূভার তাড়নে - শ্যামদাস।

৪) ডি. সি. সরকার, বি. সি. এ. জি. আই, পৃ: ৩১।

৫) বি. বি. মজুমদার, গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, পৃ: ২৭১-২৮২ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস, শ্রী রসিকমঙ্গল, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশক মহান্ত গোপাল গোবিন্দানন্দ দেবগোস্বামী, গোপীবল্লভপুর, ১৩৪২ সাল।

৬) পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, তৃতীয় খন্ড।

৭) যোগেশ চন্দ্র রায়, পূজা-পার্বন, বিশ্বভাবতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯০ সাল।

৮) প্রাগুক্ত।

৯) নীহার পত্রিকা, কাঁথি, মেদিনীপুর, ২০শে জুন, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।

১০) ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, পৃ: ১১৫, ১১৬, ১২০, ১৬৭, ১৭৩ ও শ্রী রসিকমঙ্গল, পৃ: ৭০-৭৬।

১১) ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, তৃতীয় খন্ড।

মেদিনীপুর জেলার গড় ও দুর্গ

রাজর্ষি মহাপাত্র

মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত দুইয়েরই সীমান্তে। প্রাচীনকাল থেকে জেলায় কয়েকটি বাজপথ থাকায় বহুদূরবর্তী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করে দিয়েছিল।

খ্রীঃ তেরো থেকে আঠারো শতকের মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতে বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল।[১] এঁদের মধ্যে স্বাধীন, অর্ধস্বাধীন রাজা ও জমিদারের সংখ্যা ছিল অনেক। স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য গড় বা দুর্গ নির্মাণ করা তাঁদের প্রয়োজন ছিল। এক সময়ে এই জেলায় গড়ের সংখ্যা ছিল এক হাজারের উপর। আজ তা ক্রমেই ভগ্ন হতে হতে এসে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ ষাটটিতে। সেগুলিও বর্তমানে প্রায় ভাঙনের শেষ পর্যায়ে।[২]

মেদিনীপুর জেলায় যে সব ছোট ছোট রাজ্য ছিল তার রাজারা বা জমিদারেরা গড় বা দুর্গ তৈরী করেছিলেন। এসব রাজা বা জমিদারদের উপর সুলতান বা মুঘল রাজশক্তির বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল না। নামে মাত্র অধীনতা বা বশ্যতাস্বরূপ এসব রাজারা নজরানা পাঠিয়ে নিজেদের বসতবাটি ঘিরে গড়, কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।[৩]

মধ্যযুগে গড়গুলি যে খুবই গুরুত্ব পেত তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল, এখানে বহুপ্রসিদ্ধ স্থানের নামকরণও হয় গড়কে কেন্দ্র করে যথা, গড়বেতা, নারায়ণগড়, আড়রাগড়, ময়নাগড়, কর্ণগড়, রামগড়, লালগড়, কাজলাগড় ইত্যাদি।[৪]

ময়নাগড়

কিংবদন্তী পুরুষ ধর্মমঙ্গলখ্যাত লাউসেন রাজত্ব করতেন বলে বলা হয় বর্তমান তমলুক মহকুমার ময়নাতে। এখানে তিনি এক গড় প্রস্তুত করান এবং নাম দেন ময়নাগড়। এইগড় ছিল দুইভাগে বিভক্ত। ভিতরগড় ও বাহিরগড়। দুই পরিখার মাঝে সাধারণ প্রজারা বাস করতেন, তাঁদের ব্যবহারের প্রয়োজনে দোকান ও বাজার বসত। ভিতরগড় বা দ্বিতীয় পরিখা অতিক্রম করে তবেই পৌঁছানো যেতো রাজপ্রাসাদে। এছাড়া এখানে ছিল ধনাগার, সৈন্যাগার ও শস্যাগার। ভিতর গড়ের

এলাকা ছিল ৬২,৫০০ বর্গফুট। ভিতরগড়ের চারিদিকের পরিখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ ফুট, প্রস্থ দুই পরিখারই ১৫০ ফুট ও গভীরতা প্রায় ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট। তখন কাঁটাগাছ আর বাঁশের জঙ্গল ভেদ করে গড়ে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বর্গীর আক্রমণের সময় স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিতেন বলে জানা যায়।[৫]

ব্রিটিশ রাজপুরুষ বেইলী, হান্টার ও ওম্যালী ময়নাগড়ের সৌন্দর্য ও সুপরিকল্পনায় অভিভূত হয়েছেন। আবার বালিসীতাগড়ের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাই মুঘল যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ **আইন-ই-আকবরীতে**।[৬] তাছাড়া ময়না রাসমেলা ১৯৯৬ তে প্রকাশিত স্মরণিকাতে গড় সম্বন্ধে বাহু বলীন্দ্র রাজবংশের পারিবারিক বিবৃতি ও অনুসন্ধান থেকে লেখা হয়েছে, "The structure of the 'Garh' (Killa or fort) is unique and seems to be unparalleled. It was a marvel of mediaeval planning and engineering. The fort proper is surrounded by two very wide moats with hillock-like huge mounds. There had been crocodiles in the ditches, wild animals in the dense forest and ever-ready cannons in different lofty corners."[৭]

কাশীজোড়া গড় ঃ

সতেরোশ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কাশীজোড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ একটি গড় বা দুর্গ নির্মাণ করে নাম দেন গড়কেল্লা। গোটা গড়কেল্লা মাটির উঁচু পরিখা আর জলঘেরি দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। **আইন-ই-আকবরীতেও** সেই সময় বাংলার বিভিন্ন বড় বড় কেল্লা বা দুর্গের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে গড়কেল্লার উল্লেখ আছে। এখানে দুশো অশ্বারোহী, আড়াই হাজার গোলন্দাজ এবং তীরন্দাজ সৈন্য ছিল। **আইন-ই-আকবরী** গ্রন্থের সূত্র ধরে বলা চলে আকবরের রাজত্বের সময়ই অজ্ঞাতনামা কোন রাজা বা ভূস্বামী এই গড় তৈরী করেন। প্রতাপনারায়ণ সেই গড় অধিকার করেছিলেন মাত্র। বর্গী ও বর্গী সর্দার শ্যামদেবের অত্যাচারে এবং নিষ্ঠুরতায় গড়কেল্লা ধ্বংস হয়ে যায়।[৮] সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ১০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক লোহার কামান পাওয়া গেছে। কামানটি 'কালে খাঁ' কামান বলে অভিহিত। কামানের গায়ে ফারসী ভাষায় লিপি আছে।[৯] উল্লেখ্য যে মহিষাদল রাজাদেরও একটি গড় ছিল। যদিও এটা মধ্যযুগে তৈরী হয় নি। ব্রিটিশ আমলে তৈরী হয়েছিল। মহিষাদলের রাজ-পরিবার রাজকুমারী বিভাবতীর সঙ্গে প্রভাতচন্দ্রের বিবাহ দিয়ে রামবাগে একটি গড় নির্মাণ করে রাজকুমারীর নামে দানপত্র করেন। এই গড়ের পরিমাণ একাশি বিঘা। ইংরেজ আমলে এই গড়ের মধ্যে বোমা তৈরী হত বলে শোনা যায়।[১০] অবশ্য উদয়রামের অর্ধ সমাপ্ত 'উদয়রামের গড়' এখানে লক্ষণীয়। এছাড়া **আইন-**

ই-আকবরী থেকে জানা যায় তমলুকের রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্ব কালে (১৫৬৪-১৬১৬) সম্রাট আকবর কর্তৃক তাঁর ভুঁইয়া উপাধি লোপ পায়, যেহেতু আকবর তখন বাংলা থেকে পাঠান শক্তির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় তমলুকে ঐ সময় পাথরের তৈরী একটি দুর্গও ছিল।[১১]

আলীশাগড় ঃ

বালীচক থেকে এই গড়ে যাওয়া যায়। ডেবরা থানার মধ্যে আলীশার গড়টি আলিশাহ নামে এক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার প্রায় সাড়ে চারশত বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমান। তাঁরই নাম অনুসারে গ্রামটির নাম আলিশা গ্রাম হয়। গড়টি প্রায় নষ্ট হয়ে গেলেও গড়টির চারিদিকে যে পরিখা বা মৃত্তিকা স্তুপের প্রাচীর ছিল আজও বিভিন্ন জায়গায় তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া উঁচু বিরাট এক মাটির প্রাচীর ঘেরা বিস্তৃত গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিছু কাল আগে এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খনন কালে একটি কূপ পাওয়া যায়, সেখান থেকে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ব্যবহৃত কয়েকটি মূল্যবান তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছিল।[১২]

গড়কিল্লা ঃ

ডেবরা থানার মধ্যে 'গড়কিল্লা' নামে আরও একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জনশ্রুতি, গড়কিল্লায় কেদারকুন্ড পরগনার জমিদার রাজা রাজনারায়ণের হাতে রাজা মুকুটনারায়ণের পরাজয় ঘটলে ঐ গড়সমেত সমস্ত কেদারকুন্ড পরগণা কাশীমোড়া রাজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। **আইন-ই-আকবরীতে** কেদারকুন্ড পরগণার মধ্যে যে তিনটি দুর্গের উল্লেখ আছে তার মধ্যে গড়কিল্লাটি অন্যতম বলে মনে করা যেতে পারে। গড়টি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং স্মৃতিমাত্রে পরিণত হয়েছে।[১৩]

বরদাগড় ঃ

ইতিহাসের ক্ষেত্রে উত্তর মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘাটাল মহকুমার বরদাগ্রামে যেতে হলে এক সময় অনেকখানি জলপথ পেরিয়ে আসতে হত। বরদার চারপাশটা ছিল চওড়া গভীর পরিখায় ঘেরা। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে এখানকার এক রাজার নাম পাচ্ছি, তার নাম দলপৎ। সেটা ছিল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গোড়ার দিক। মির্জা নাথন নামে এক ঐতিহাসিক **বাহরিস্তান-ই-ঘায়েরী** নামে এক ফারসী গ্রন্থে রাজা দলপতের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ১৬৬০ খ্রী: আঁকা ফান ডেন ব্রুকের ম্যাপে এটা যে এক দুর্গস্থান ছিল তা দেখানো হয়েছে। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সিংহবংশের রাজারা এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই বংশেরই স্বনামখ্যাত রাজা বা জমিদার

ছিলেন শোভা সিংহ। এই শোভা সিংহ গড়ের তিনটি অংশ রয়েছে (১) প্রথম বা ভিতরগড় (অজবনগর মৌজার অন্তর্ভুক্ত) (২) দ্বিতীয় বা মধ্যগড় (অজবনগর মৌজা) (৩) তৃতীয় বা বাহিরগড় (রথীপুর, অজবনগর, রাণীবাজার ও শিবপুর মৌজা)। এতগুলি মৌজা জুড়ে শোভাসিংহের গড়ের বিস্তৃতি ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় এ গড়টির পরিধি কতো বিশাল ছিল।[১৪]

কর্ণগড় ঃ

মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়কে উপলক্ষ্য করে একসময় একটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। কর্ণগড়টির নির্মাতা ছিলেন কেশরী বংশীয় রাজা কর্ণসিংহ বা কর্ণকেশরী। একদা এই কর্ণগড় উড়িষ্যা রাজ্যের দুর্গ রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। এর অবস্থান হল মেদিনীপুর শহর থেকে তিন ক্রোশ উত্তরে। প্রায় এক ক্রোশব্যাপী এই দুর্গ, এই গড়ের তিন দিকে জল। পারাং নদীর জলস্রোত গড়ের দুদিকে প্রবাহিত হওয়ায় নদী পরিখার কাজ করত। দুর্গদ্বারে অবস্থিত সৈন্যগণ সর্বদাই যুদ্ধ সাজে সজ্জিত থাকতেন। এঁদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, কঠার, বর্শা প্রভৃতি। পরে কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হত। দুর্গদ্বারে সর্বদাই দুটি কামান সাজানো থাকত। দুর্গের বাইরে যে সব সৈন্য থাকতেন দুর্গদ্বারে রণ দামামা বাজলেই তাঁদেরকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে দুর্গে আগমন করতে হত। কর্ণগড় রাজ্যের অধীন সৈন্যগণ মাসিক বেতনের পরিবর্তে জায়গীর পেতেন। সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি ছিল বক্সি।[১৫]

গড়ের মধ্যেই ছিল রাজপ্রাসাদ, সৈন্যশালা, অনাদিলিঙ্গ ভগবান দন্তেশ্বরের ও ভগবতী মহামায়ার দুটি মন্দির। সেগুলি অবশ্য আজ ধ্বংসাবশেষ।[১৬]

মেদিনীপুর শহরের দুর্গ ঃ

আবুল ফজলের লেখা **আইন-ই-আকবরীতে** মেদিনীপুরে অবস্থিত দুর্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দুটি দুর্গ সহ এক বৃহৎ নগরী এবং সে দুটি দুর্গের মধ্যে একটি প্রাচীন অন্যটি নবীন। সেখানকার দুর্গাধিপতিরা হলেন জাতিতে খণ্ডাইত এবং সৈন্যবলের মধ্যে অশ্বারোহী ৬০ ও পদাতিক ৫০০ জন; রাজস্বের পরিমাণ ১,০১৯,৯৩০ দাম।

এখনও আমরা কর্ণেলগোলার কাছে পুরোনো কেল্লা বা পুরোনো জেলখানা নামে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঝামাপাথরের কুঠরিবিশিষ্ট যে সৌধটি দেখতে পাই, সেটি সম্ভবত **আইন-ই-আকবরী** গ্রন্থে উল্লিখিত দুটি দুর্গের মধ্যে একটি। ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্তী ১৯১৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (খণ্ড ১২) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, উল্লিখিত দুটি দুর্গের মধ্যে নতুন দুর্গটি অবস্থিত ছিল শহরের কোর্ট-কাছারির কাছে, যা একসময়ে জেলখানা হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং তাঁর মতে

পুরানো দুর্গটি ছিল সম্ভবত শহর থেকে দুই মাইল পশ্চিমে গোপগিরিতে। জেলখানা হিসেবে যেটি ব্যবহৃত হত কে কবে এটি তৈরী করেন তা সঠিক জানা যায়না। তবে এটি যে কোন এক খন্ডাইত হিন্দু নৃপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মনে হয়। মুসলমান যুগে এটি সেনানিবাস ছিল বলে জানা যায়। কিছুদিন এটি মারাঠাদের অধিকারে থাকে। 'মেদিনীপুর ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু তার ঐ গ্রন্থে লিখেছেন, "জনশ্রুতি এই দুর্গটির অভ্যন্তর থেকে শহরের উপকণ্ঠস্থিত গোপগিরি পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। শত্রু কর্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হলে ভেতর থেকে বাইরে যাবার জন্য বা বাইরে থেকে ভেতরে আসার জন্য এই গুপ্তপথটি রাখা হয়েছিল।"

শ্রী চক্রবর্তীর উল্লিখিত অন্য দুর্গটির অবস্থান হল গোপগিরিতে। এই দুর্গটি মেদিনীপুর শহর থেকে পশ্চিমে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে কাঁসাই নদীর তীরে এক উচুঁ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বৃহৎ আকারের দেওয়াল ও পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল দুর্গটি। অনুমান করা হয় দুর্গপ্রাচীরের ধার বরাবর সেসময় হয়ত কাঁসাইএর জল স্রোত প্রবহমান থাকায় কোন নৌযান ভেড়ানোর ব্যবস্থা ছিল।[১৭]

রায়কোটা দুর্গ ঃ

গড়বেতায় 'রায়কোটা' নামে দুর্গের (রাজা তেজচন্দ্র নির্মিত) ধ্বংসাবশেষ আছে। গড়বেতা স্কুলের কিছু পূবে ও সিংহপ ়ায় দুর্গে প্রবেশপথের তোরণের চিহ্ন দেখা যায়। দুর্গের চারদিকে চারটি দেবতা হিন্দু ও মুসলমান দেবতা প্রহরী হিসেবে রয়েছেন। দুর্গের চারপাশে পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। পরিখার সেই চিহ্ন গড়বেতা স্কুলের দিক দিয়ে ক্রমশ পশ্চিমমুখী হয়েছে বোঝা যায়। দেখা যায় বর্তমানে শহরের পত্তন এই গড়ের মধ্যে হয়েছে।[১৮]

কুরুমবেড়া দুর্গ ঃ

বর্তমান কেশিয়াড়ি অঞ্চল একসময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এই কেশিয়াড়ির প্রায় দু-মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কুরুমবেড়া দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটি গগনেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। গজপতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কপিলেশ্বর দেবের রাজত্বকালে (১৪৩৫-১৪৭০) এই দুর্গটি নির্মিত হয়ে থাকবে এবং দুর্গের ভিতরে বর্তমানে নিশ্চিহ্ন প্রায় গগনেশ্বর শিবের দেউলটিও সে সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। মুঘল আমলে কেশিয়াড়ি ও এই দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে এবং কেশিয়াড়িতে একটি প্রধান তহশীল কাছারি তৈরী হয়।[১৯]

পাঠান রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজারা এই দুর্গ থেকেই প্রতিরোধ চালান। পরে পাঠান ও মুঘলরা এই দুর্গ তাঁদের অধিকারে আনেন ও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। মারাঠারাও সামরিক প্রয়োজনে এটি কাজে লাগান।

দুর্গটি ঝামা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের মধ্যে প্রশস্ত সমতল চত্বর। উচ্চতায় ও চওড়ায় প্রাচীরটি যথাক্রমে বারোফুট ও তিনফুট। দুর্গটি আয়তাকার উত্তরমুখী - পূর্ব পশ্চিমে আয়ত। উত্তরদিকে প্রবেশপথ। পাশেই যজ্ঞেশ্বর কুন্ড নামে এক পুকুর। ভিতরে চারদিকে আট ফুট প্রশস্ত খোলা বারান্দা। প্রাচীরের গায়ে তেষট্টিটি কক্ষ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অনেকগুলি ভগ্ন। দুর্গের আয়তন দৈর্ঘ্যে তিনশ ফুট প্রস্থে দু'শো পঁচিশ ফুট। বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে বাদশাহী সড়কের পাশে দুর্গের অবস্থিতি হওয়ায় এটির সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী ছিল।[২০]

চন্দ্ররেখাগড় ঃ

নয়াগ্রাম থানায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। মেদিনীপুর জেলায় যতগুলি গড়ের চিহ্ন আছে তারমধ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত ছিল বলে বোধ হয়।

মাকড়া পাথরের তৈরী এ দুর্গ আয়তাকার - পূর্ব পশ্চিমে এক কিলোমিটার পরিখা ছিল যার চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। গড়টির দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভূমি পরিমাণ ১০৫০ X ৭৮০ গজ। কুড়ি পঁচিশ ফিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট গভীর পরিখাটি খনন করতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়ে থাকবে। পরিখাটির ভেতর পাশ থেকেই গড়ের চারদিকে পনেরো ফুট উঁচু একটি পাথরের প্রাচীর ছিল। তারপরে আর একটি ছোট পরিখা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ (কেউ কেউ বলেন চন্দ্রশেখর সিংহ) এই গড়টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২১] বর্তমানে দুর্গটি বিধ্বস্ত।

লালগড় ঃ

চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোনার পশ্চিম প্রান্তে এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। লালগড় দুর্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পরিখা ও পরিখার চারপাশের মাটির প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। বর্তমানে দুর্গের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। লালগড়ের উত্তর ও পূর্বদিক পরিখা বেষ্টিত ছিল। দক্ষিণে নদী থাকায় দুর্গটি প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত ছিল। গড়ের দুটি অংশ ছিল - ভিতর গড় ও বাহিরগড়। ভিতরগড় ছিল পশ্চিমে এবং পরিখা বেষ্টিত ছিল। বাহির গডে বাইরে যাবার পথের চিহ্ন দেখা যায়। এখান থেকে প্রায় সাড়ে ছ-ফুট একটি কামান পাওয়া যায়, তা চন্দ্রকোনা থানায় রাখা আছে।[২২] ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশদ্বারী দুর্গ থেকে গিরিধারী জীউকে এনে লালগড় দুর্গে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[২৩]

দ্বাদশদ্বারী দুর্গ ঃ

চন্দ্রকোনা শহরের দক্ষিণে দ্বাদশদ্বারী বা বারদুয়ারী নামে দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি ঐ স্থানেই চন্দ্রকোনার প্রাচীন রাজা চন্দ্রকেতুর রাজবাড়ী ছিল। এই দুর্গটির চারপাশ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর পরিখার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ঐ দুর্গের মধ্যে একটি স্থানকে লোকে কর্পূরতলা বা রাজাদের কোষাগার বলে নির্দেশ করে থাকে।[২৪] কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে চন্দ্রকোনা শহরের মধ্যবর্তী যে মূল 'বারদুয়ারীগড়' ছিল তার প্রায় চারদিকে আয়ত কয়েকটি গড় পরিখা বেষ্টন করে থাকত। সেগুলির নাম রঘুনাথ গড়, রামগড় ও লালগড় এবং কারও কারও মতে কিরাতগড়। পূর্বোক্ত তিনটি গড় চন্দ্রকোনার উত্তর পশ্চিম অংশকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল।[২৫]

কাঞ্চনপুর গড় ঃ

কাঁথি থানায় একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি যে এটি শাহ আলমের রাজত্বকালে তৈরী। এখানে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তৈরী এক মসজিদ রয়েছে।[২৬]

কাজলাগড় ঃ

ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় নামক স্থানে সুজামুঠার প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। দীর্ঘকায় পরিখা ওখানে দেখতে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য পটাশপুর থানার পঁচেট গ্রামে পটাশপুর পরগণার চৌধুরীবংশে বাস করছে। একসময় বিরাট গড়খাই তাঁরা তৈরী করেছিলেন (পঁচেটগড়) যা আজও বিদ্যমান।[২৭]

খণ্ডরুইগড় ঃ

দাঁতন থানার অন্তর্গত মনোহরপুর ও খণ্ডরুই গ্রামে যথাক্রমে দাঁতনের ও খণ্ডরুই গড়ের বর্তমান গড়বাড়ী বিদ্যমান।[২৮]

নারায়ণগড় ঃ

নারায়ণগড় থানার মধ্যে নারায়ণগড় গ্রামে রাজবংশের গড়বাড়ী অবস্থিত। এটা 'হান্দোলগড়' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্লভপাল এই স্থানে প্রায় তিন শত বিঘা ভূমি সুগভীর পরিখা বেষ্টিত করে তার মধ্যে একটি রাজভবন তৈরী করে ছিলেন। সেই ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। রাজবাটির চারদিকে ৪ টি দ্বার ছিল। এর মধ্যে উৎকল গমনের দিকে রাস্তাটির উপর 'যমদুয়ার' দ্বারটিই প্রধান ছিল। দ্বিতীয় সিদ্ধেশ্বর, তৃতীয় মৃন্ময় বা মেটে দরজা ছিল। ৪র্থ দরজা পার্শ্ববর্তী

কেলেঘাই নদীগর্ভে ছিল। ৪র্থ দ্বার বন্ধ করলে বাইরের সমস্ত জলমগ্ন হত। শত্রুপক্ষ নারায়ণগড়ে প্রবেশ করতে পারতো না।[২৯]

নাড়াজোল গড় ঃ

উহা বাহিরগড় ও ভিতরগড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে দুটি সুপ্রশস্ত পরিখা ঐ দুই গড়ের চারদিকে বেষ্টন করে আছে। নাড়াজোল রাজভবনের কাছে 'লঙ্কাগড়' নামে বিরাট সরোবর দেখার মত। সরোবরের মধ্যস্থলে কৃত্রিম দ্বীপে একখানি গৃহ আছে। নাড়াজোল পরগণার মধ্যে ফতেগড় ও গড়গোপীনাথপুর নামে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত আরও দুটি পুরোনো গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্গী প্রভৃতি উপদ্রবের সময় রাজ পরিবার ধনরত্ন নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতেন।[৩০]

খেলালগড় ঃ

নয়াগ্রামের খেলালগড়টি নয়াগ্রাম রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন। যদিও দুর্গটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর পুত্র বলভদ্র সিংহ দুর্গের কাজ সম্পূর্ণ করেন। প্রাচীব ও পরিখা দ্বারা গোটা গড়টি ঘেরা ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত রাজবাড়ী ছিল যা এখন একেবারে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এর অভ্যন্তরে নীল পাথরে নির্মিত একটি ঘোড়ার পীঠে একসঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুমান করছেন কেউ কেউ যে এটি পারসীক বা শক প্রতিমূর্তি হতে পারে।[৩১]

ঝালদার দুর্গ ঃ

গড়বেতা থানার অন্তর্গত ঝালদা গ্রামের অদূরস্থ নয়াবসাতের ভগ্ন দুর্গটি বগড়ীর রাজবংশের অন্যতম কীর্তি। রাজা গণপতি সিংহের সময়ে উহা নির্মিত হয়েছিল।[৩২]

ঝাড়গ্রাম ও জামবনীগড় ঃ

ঝাড়গ্রাম থানার ঝাড়গ্রাম ও জামবনী থানার জামবনী গড় দুটি প্রসিদ্ধ। ঝাড়গ্রাম গড়ের চারদিকে সুদৃঢ় পাথরের তৈরী প্রাচীর ও পরিখা ছিল। গড়ের মধ্যে রাজবংশের কুলদেবতা এবং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গায়ত্রী ও সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে। জামবনী রাজবংশের গড়বাড়ী, চিল্কীগড় নামে সুপরিচিত, এখানেও পুষ্করিণী দেবালয় আছে।[৩৩]

মাঝিরাজার গড় ও আড়ড়াগড় ঃ

কেশপুর থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তঃপাতি তাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে একটি পাথরের তৈরী গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ওখানে

মাঝি রাজারা রাজত্ব করতেন। ঐ গড়টিও 'বাহিরগড়' ও 'ভিতরগড়' নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ভিতরগড়ে রাজাদের বাসভবন ছিল এবং তিনচারটি বড় সরোবর ছিল। এই মাঝি রাজাদের রাজত্ব লোপ পেলে ব্রাহ্মণ রাজার অভ্যুদয় হয়। মাঝি রাজাদের গড়ের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রসিদ্ধ 'আড়ঢ়াগড়' বিদ্যমান। ঐগড়ে থেকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর **চণ্ডীমঙ্গল** কাব্য রচনা করেছিলেন অনেকের ধারণা। কারণ কাব্যে ঐ গড়েরও উল্লেখ আছে।[৩৪]

বীরসিংহের গড় ঃ

খড়্গপুর স্টেশনের পূর্বদিকে প্রায় পাঁচমাইল ভেতরে চাঙ্গুয়াল গ্রামে ও দেউলী গ্রামে ষোলাদীঘি, ক্ষীর সরোবর, বীর সরোবর, নজর নামে দীঘি, পাথরের তৈরী মন্দির, ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চাঙ্গুয়ালের চারদিকে একটি পরিখা আছে যার পরিধি চার মাইল। উত্তরদিকে সিংহদ্বার ও সেনা-নিবাসের চিহ্নও দেখা যায়। এই গ্রামের মধ্যে 'ধনপোতা' নামে একটি স্থান আছে। শোনা যায় ঐ জায়গায় রাজবংশের ধনাগার ছিল। এগুলি সব রাজা বীরসিংহ ও তাঁর বংশের কীর্তি।[৩৫]

এছাড়াও খড়্গপুর থানার মধ্যে বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর মধ্যে 'আড়াসিনীগড়' ও 'অযোধ্যাগড়' বিশেষ প্রসিদ্ধ। খড়্গপুর থানার অন্তর্গত কলাইকুন্ডা গ্রামে ধারেন্দার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ছিল। তাছাড়া চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোনার পশ্চিম প্রান্তে 'রামগড় দুর্গ' নির্মিত হয়েছিল।[৩৬]

এই সমস্ত গড় ও দুর্গগুলি মেদিনীপুব জেলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন সময় গড়ে উঠেছিল। হয়তো এগুলি ছাড়াও আরও কিছু তৈরী হয়েছিল যেগুলি সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে সে সময়ের বিভিন্ন 'সরকার' বিভাগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় অসংখ্য গড়, দুর্গ গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় এসব গড়, দুর্গে কত পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি থাকতো তারও উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া পরগণার বা সরকারের রাজস্বের বিবরণেরও উল্লেখ রয়েছে।[৩৭]

যাইহোক দুর্গের বিবর্তনের ইতিহাসে কোনটির স্থান প্রথমে তা নির্দ্ধারণ করা মুস্কিল। তাছাড়া আলোচনা বিষয়ের ভৌগোলিক এলাকাতেও এসেছে পরিবর্তন। রচনার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, *পশ্চিমবাংলার গড়কেল্লা দুর্গ,* কলকাতা ১৯৯৬, পৃঃ ৩৬।
২. রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ***মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গড়*** (জেলায় জেলায় আলোচনা), পৃঃ ১২২, **প্রসাদ পত্রিকা**।
৩. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৪২।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ***তদেব*** ।
৫. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৩৮।
৬. ডিষ্ট্রিক্ট ষ্ট্যাটিটিকাল হ্যান্ডবুক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিরিজ ১৯৯৩-৯৫, এবং *ময়না রাসমেলা স্মরণিকা* ১৯৯৫।
৭. ময়নাগড় এ পেনস্কেচ, স্মরণিকা, মুখ্য সম্পাদনাঃ বাহুবলীন্দ্র, প্রণব, ১৯৯৬।
৮. অভিজিৎ গোস্বামী, গড়কেল্লার কথা (প্রবন্ধ) পৃঃ ৮৮-৮৯, ***দর্পণ*** (বাৎসরিক পত্রিকা) শারদ সং, খড়গপুর ১৯৯৭, এবং মহাপাত্র রাজর্ষি, মুঘলযুগে মেদিনীপুরের জমিদার (প্রবন্ধ) পৃঃ ২২২, **ইতিহাস অনুসন্ধান-১৪**, কলিকাতা, ২০০০।
৯. চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ৩৯।
১০. বঙ্কিম ব্রহ্মচারী, ***মহিষাদল ও রাজকাহিণী***, কুমারপুর, মেদিনীপুর, ১৯৯১, পৃঃ ৮৮-৮৯।
১১. যুধিষ্ঠির জানা, ***বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস***, কলকাতা ১৩৭১ (বাং সন) পৃঃ ১৬১-১৬২।
১২. যোগেশচন্দ্র বসু, ***মেদিনীপুরের ইতিহাস***, কলকাতা ১৯৩৬, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।
১৩. তদেব, পৃঃ ৩৪৫।
১৪. প্রণব রায়, বরদাগড়, ঘাটাল মহকুমার ঐতিহাসিক গুরুত্ব (প্রবন্ধ) পৃঃ ৩-৭ এবং আরও কিছু পত্রিকা।
১৫. রাধারমন চক্রবর্তী, ***শাক্ততীর্থ কর্ণগড়***, বল্লভপুর-মেদিনীপুর, ১৯৭৬, পৃঃ ৫।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ***তদেব***।
১৭. তারাপদ সাঁতরা, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন দুর্গ (প্রবন্ধ), পৃঃ ৩৩-৩৪, **ডুলুং** পত্রিকা।
১৮. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৩৯।
১৯. প্রণব রায়, ঐতিহাসিক কেশিয়াড়ি, ও সর্বমঙ্গলা মন্দির (প্রবন্ধ), শারদীয়া **অন্যযুগ পত্রিকা** (দ্বিতীয়বর্ষ) পৃঃ ৩৩-৩৪।
২০. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৪০।
২১. বসু, ***তদেব***, পৃঃ ৩৬০।
২২. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৪১-৪২।
২৩. বসু, ***তদেব***, পৃঃ ৩১৮।
২৪. ***তদেব***, পৃঃ ৩১৭-৩১৮।
২৫. চট্টোপাধ্যায়, ***তদেব***, পৃঃ ৪২।
২৬. ***তদেব***, পৃঃ ৩৭।
২৭. বসু, ***তদেব***, পৃঃ ৩৮২।

২৮. *তদেব*, পৃ: ৩৭৯।

২৯. *তদেব*, পৃ: ৩৭১-৩৭২।

৩০. *তদেব*, পৃ: ৩২৪।

৩১. *তদেব*, পৃ: ৩৫৯।

৩২. *তদেব*, পৃ: ৩৫২।

৩৩. হরিসাধন দাস, *মেদিনীপুর দর্পণ*, পৃ: ৪৯, মেদিনীপুর ১৪০১ (বাং) দ্বিতীয় প্রকাশ।

৩৪. বসু, *তদেব*, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭ (দ্বিতীয় খন্ড)।

৩৫. *তদেব*, পৃ: ৩৩৯-৩৪০।

৩৬. *তদেব*, পৃ: ৩১৮, ৩৪২।

৩৭. চট্টোপাধ্যায়, *তদেব*. পৃ. ৪২।

মধ্যযুগের রাজগীরে একটি জৈন মন্দির

কাকলী রায়

বিহার প্রদেশের রাজগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে রাজগীর সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পাওয়া যায়। রাজগীরে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি এই স্থানের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি ধর্মসম্প্রদায়ই রাজগীরকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করেছে।

রাজগীর জৈনদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান, মুনী সুব্রতর স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। রাজগীরের প্রাচীনতম জৈন নিদর্শনের তারিখ সম্ভবতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতক। সোনভাণ্ডার গুহার গায়ে খোদিত একটি লেখে বলা হয়েছে মুনী বৈরদেব নির্বাণলাভের উদ্দেশ্যে জৈন সাধুদের জন্য দুটি গুহা নির্মাণ করেন এবং অর্হৎ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় একই সময়ে রাজগীরে একটি নেমিনাথের প্রতিমা স্থাপিত হয়। মূর্তিটির পাদপীঠে একটি লেখ আছে। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে লেখটির পাঠ হলঃ মহারাজ - তিরাজ শ্রী চন্দ্র। তাঁর মতে এটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৩) এর সময়ে। এছাড়া সোনভাণ্ডার গুহার পূর্বদিকের একটি কক্ষের একসারিতে ৬টি জিনমূর্তি উৎকীর্ণ আছে।

এই মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকের। এছাড়া নেমীনাথসহ বিভিন্ন তীর্থঙ্করের বেশ কয়েকটি প্রতিমা রাজগীরে পাওয়া গেছে যেগুলিকে শিল্পশৈলী ও মূর্তিতত্ত্বের বিচারে আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বলে মনে করা হয়। পালযুগের বেশ কয়েকটি জিনমূর্তি পাওয়া গেছে রাজগীরের বিভিন্ন স্থানে। অনুমান করা যেতে পারে এইসব মূর্তিগুলি বিভিন্ন দেবায়তনে পূজিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমকালীন কোন জৈন দেবালয়ের অস্তিত্ব নেই। রাজগীরে যে সব জৈন মন্দিরগুলি রয়েছে সেগুলি মোটামুটিভাবে বিগত এক শতকের মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু রাজগীরে জৈন তীর্থযাত্রীদের আসাযাওয়া বহুদিন ধরেই চলে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে এক জন জৈনসাধুর কথা উল্লেখ করা যায়। কর্ণেল কলিন ম্যাকেঞ্জি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন দক্ষিণভারত থেকে বদলী হয়ে পূর্বভারতে সার্ভেয়র জেনারেলের পদে যোগদান করেন, তখন তিনি এই পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এই জৈন সাধু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বভারতের বিশিষ্ট জৈন তীর্থগুলিতে তীর্থযাত্রায় যান। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত ম্যাকেঞ্জী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং ১৮২৩-এ Oriental Magazine and Calcutta

Review পত্রে সেই বিবরণ ছাপা হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই লেখাটি Indian Antiquary (Vol XXXI) তে পুনরায় মুদ্রিত হয়।

মধ্যযুগে রাজগীরের জৈন প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা কি ছিল এ বিষয়ে তথ্যাদির অভাব আছে এবং এই প্রসঙ্গেই পূরণচাঁদ নাহার আলোচিত পঞ্চদশ শতকের একটি শিলালেখ বিশেষ গুরুত্ব সহযোগে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই শিলালেখে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মধ্যযুগের রাজগীরে জৈন সম্প্রদায়ের মন্দির নির্মাণের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই শিলালেখটি রাজগীরের বিপুল পর্বতের উপর সম্ভবতঃ ছ'শো বছর আগে নির্মিত একটি মন্দিরে পাওয়া গেছে। মন্দিরটি পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এতে তারিখটি (আষাঢ়ের ষষ্ঠ দিন, বিক্রম সংবৎ ১৪১২) দেওয়া আছে সাংকেতিক সংখ্যা এবং শব্দে এবং এটি জৈন দেবনাগরী লিপিতে লেখা।

এই লেখাটিতে আমরা ফিরোজ শাহ তুঘলকের উল্লেখ পাই, ইনি ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। তাঁর সময়ে রাজগীরে জৈনমন্দির নির্মাণের একটি পরম্পরা তৈরী হয়। দুটি পরম্পরার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি দাতা-পরম্পরা এবং অপরটি গুরু পরম্পরা। দাতারা হলেন বিহারপুর অঞ্চলের অধিবাসী এবং আচার্য্য বা গুরুরা হলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের খরতরগচ্ছ শাখা। একাদশ বিক্রমশতকে এই শাখাটির উদ্ভব হয় এবং এই শাখার জিনেশ্বর, জৈনসাধুদের জীবনচর্চায় আরও কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন। দেবালয়গুলিতে সন্ন্যাসীদের বসবাসের বিরোধী ছিলেন তিনি এবং জৈনসাধুদের সততই সঞ্চরমান থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই এই শাখার প্রভাব রাজগীর এবং সন্নিহিত অঞ্চলে পড়েছিল। এই শাখার অনুসারীরা বাজগীর অঞ্চলে বাস করতেন।

অন্যদিকে বিহারপুর নামটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্থানটি নালন্দার নিকটবর্তী বিহার শরীফের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে এটি একটি নগর ছিল। মনে করা যেতে পারে যে গুপ্তযুগ থেকে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য দেবালয় ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে পালযুগের অনেক ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতকে নিশ্চয়ই এখানে একটি বড় মুসলমান বসতি গড়ে উঠেছিল যার ফলে নগরটি বিহারশরীফ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সময়েও বিহারপুরে জৈনধর্মাবলম্বীদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। দাতারা নিজেদের ঠক্কুর বলে বর্ণনা করেছেন, যেটি তাঁদের সামাজিক গুরুত্বের নির্দেশক। মনে রাখা প্রয়োজন ঠক্কুর বা ঠাকুর — এই পরিচিতি সাধারণত ক্ষত্রিয়/রাজপুত মর্যাদার অধিকারীরাই ব্যবহার করেন বিহার এবং বিশেষত উত্তর ভারতে। অনুমান করা যেতে পারে এই জৈনদাতারা

তাঁদের ক্ষত্রিয়/রাজপুত পরিচিতিকে ত্যাগ করতে চাননি, জৈন ধর্মের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও।

সর্বোপরি এই শিলালেখটির গুরুত্ব একটি ভিন্ন কারণে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইতিহাস চর্চায় মধ্যযুগে মুসলমান এবং অমুসলমানদের বিরোধ এবং মুসলমান শাসকদের উদ্যোগে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মায়তনগুলি ধ্বংস করার কথা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব পায়। এই শিলালেখটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তুঘলকদের শাসনকালেও একটি প্রধান তীর্থস্থান হিসাবে রাজগীরের অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে নতুন নতুন দেবালয় নির্মাণ করা হত এবং প্রতিষ্ঠালিপিতে তৎকালীন মুসলমান শাসকদের বর্ণনা করা হত একান্তভাবে প্রথাগত রীতিতে। তাই এই বর্ণনায় সুলতান হয়ে দাঁড়িয়েছেন সুরত্রাণ।

মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে এই শিলালেখটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. কম্প্রিহেন্সিভ, ***হিস্ট্রী অফ বিহার*** : দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম ভাগ; সৈয়দ হাসান আসকারি ও কেয়ামুদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), পাটনা, ১৯৮৩, পৃ: ১৫৭-১৮৩।

২. "***এক্সট্র্যাক্টস্*** ফ্রম দ্য জার্নাল অফ কর্ণেল কলিন ম্যাকেঞ্জি'স পন্ডিত অফ হিস রুট ফ্রম ক্যালকাটা টু গয়া ইন্ ১৮২০". ***ইন্ডিয়ান এ্যান্টিক্যোয়ারী***, ত্রিংশ খন্ড, মুম্বাই, ১৯০২, পৃ: ৬৫ - ৭৫।

৩. পূরণচাঁদ নাহার, রাজগীর জৈন ইন্‌স্‌ক্রিপসন্, ***জার্ণাল অফ বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি***, পঞ্চমখন্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ: ৩৩১ - ৩৪৩।

আলঙ্গিরী ঃ একটি আর্থ সামাজিক গ্রাম সমীক্ষা

দেবমাল্য খুঁটিয়া

'আলঙ্গিরী' গ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখা দরকার, এর উপাদান খুবই সীমিত। কারণ এই গ্রাম সম্বন্ধে কোন লিখিত ইতিহাস ও দলিল (সমসাময়িক) পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের কিছু দলিল (যদিও সম্পূর্ণ নয়), স্থাপত্য নিদর্শন এবং গ্রামবাসীদের কিছু কথা থেকেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গ্রামটির একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামবাসীদের মুখ থেকে শোনা যে সমস্ত কথা বা তথ্য আমার কাছে অসত্য বা কাল্পনিক বলে মনে হয়েছে, তা এই আলোচনায় বাদ রেখেছি। তাই এক্ষেত্রে আমার আলোচনাটা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ২৫০-২০০ বছর আগে, অর্থাৎ যে দিন থেকে গ্রামটি উৎকর্ষতা লাভ করতে শুরু করেছে এবং উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে।

অবস্থান — বর্তমানে আলঙ্গিরী গ্রাম (জে. এল নং ৪৮), মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার এগরা থানায় উড়িষ্যার সন্নিকটে অবস্থিত। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, বহুপূর্বে এই অঞ্চলটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। মুঘল আমলে কোন এক সময়ে এই অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনের ফলে পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের জনসমাগম ঘটে এবং বেশ কয়েকদিন যাবৎ এখানে মেলা বসে। এথেকেই এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু হয় এবং গ্রাম গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রাম গড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে বহুকাহিনী প্রচলিত, যা অনেকক্ষেত্রেই কাল্পনিক ও অসত্য বলে মনে হয়। তবে অনেকের মুখেই একই কথা শোনা যায় যে, এই গ্রাম গড়ে ওঠার সঙ্গে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কোন না কোনভাবে একটা যোগাযোগ ছিল এবং 'আলমগীর' থেকেই নাকি 'আলঙ্গিরী' নামের উৎপত্তি। যাইহোক, এ সত্যতা বিচার সময়সাপেক্ষ ও গভীর গবেষণার বিষয়।

পরিধি — বর্তমান গ্রামের পরিধি ও অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, 'আলঙ্গিরী' গ্রামটি পূর্বেও ছিল বিশালাকার। গ্রামটি যবে থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা পেতে শুরু করেছে (আজ থেকে প্রায় ২৫০-২০০ বছর আগে), সেই সময় থেকে বর্তমানেও এর আকৃতি যে একই আছে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে গ্রামটির দৈর্ঘ্য প্রায় চার মাইল ও প্রস্থ প্রায় তিন মাইল। বর্তমানে গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, যা

প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২৫০-২০০ বছর আগেও গ্রামটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বর্তমানের মত না হলেও এর আকৃতি যে বিশালাকার ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে রচিত নারায়ণ প্রসাদ দাসের কাব্য 'মোদের গ্রাম'। ২৫০-২০০ বছর আগের বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত এই কাব্যে স্পষ্ট যে, মুসলমান রাজার অধীন (রাজার নাম উল্লেখ নেই) এই গ্রামের জমিদার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে গ্রামটিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করেন। বিভক্ত অঞ্চলগুলি 'বাড়' নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি 'বাড়' বা অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক কয়েকটি দলিলেও পাওয়া যায়।

প্রশাসন — ২৫০-২০০ আগে আলঙ্গিরী গ্রামটি ছিল এক মুসলমান রাজার অধীন। রাজা প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্থানে থাকলেও গ্রামটির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হতো জমিদারের অধীনে, যিনি ছিলেন হিন্দু। সমসাময়িক একটি দলিলে জানা যায় যে, ঐ সময় গ্রামের জমিদার ছিলেন চৌধুরী দিব্যসিংহ করমহাপাত্র। প্রশাসনে খুবই দক্ষ এই জমিদার গ্রামটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে চারটি অঞ্চল বা 'বাড়ে' ভাগ করেন। প্রত্যেকটি অঞ্চল বা 'বাড়' পরিচালনার জন্য একজন করে 'প্রধান' নিযুক্ত হতেন। জমিদার দিব্য সিংহের এই বাড় বিভাজনে দক্ষ পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়, যা বাড়গুলোর নামের বিশ্লেষণে স্পষ্ট। বাড়গুলি হল যথাক্রমে- 'বাড়উর্দ্ধব', 'বাড়বুধাই', 'বাড়কোট' ও 'বাড়আনন্দ'। 'বাড়উর্দ্ধব' এলাকা ছিল প্রাধানতঃ জমিদার ও তার অনুগামীদের বাসস্থান। গ্রামের সমস্ত প্রশাসনিক নির্দেশ ও কার্যক্রম এই অঞ্চল হতে সম্পাদিত হত। এই বাড় বা অঞ্চল অন্যান্য বাড়গুলির তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার একটা বড় প্রমাণ কেবলমাত্র এই বাড়টি একটি জলের পরিখা দ্বারা ঘেরা ছিল। ঐ পরিখার কিছু অংশ এখনও বর্তমান। গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী এই বাড়ের অধিবাসীদের কাছে বহু মূল্যবান সামগ্রী থাকার দরুণ অঞ্চলটি জলের পরিখা দ্বারা ঘেরা ছিল - বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। এছাড়া এই অঞ্চলের অধিবাসীরা গ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আলাদা ছিলেন। এটি চিহ্নিত করার জন্য অঞ্চলটিকে জলের পরিখা দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গ্রামের জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যে অঞ্চলে বসবাস করতেন, সেই অঞ্চলটিকে 'বাড়বুধাই' বলা হয়। জমিদার গ্রামের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন 'বাড়বুধাই'র প্রধানের পরামর্শে। 'বাড়কোট' অঞ্চলে গ্রামের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা বাস করতেন। এই অঞ্চলের পন্ডিতেরা 'ভট্টাচার্য্য' নামে পরিচিত ছিলেন। এই পন্ডিতেরা যেমন শাস্ত্রালোচনা ও পূজার্চনা করতেন, তেমনি গ্রামের বিচার-আচারও সম্পাদিত হতো এঁদের দ্বারাই। গ্রামের একপাশে নিম্নবর্ণ ও বিত্তসম্পন্ন কৃষিজীবির বাসস্থান ও চাষযোগ্য জমি নিয়ে যে অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল, তা 'বাড়পরমানন্দ' নামে পরিচিত। এই বাড়ের যিনি প্রধান ছিলেন তাঁর দ্বারাই সমস্ত

কৃষিকার্য সম্পাদিত হত। জমির হিসাব, জমিথেকে উৎপাদিত সমস্ত ফসল ও খাজনার হিসাব এবং আদায় এই প্রধানের দ্বারাই পরিচালিত হত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধানকে সাহায্য করার জন্য কিছু কর্মচারী (সংখ্যা জানা যায় নি) ছিল বলে জানা যায়। আয়ের প্রধান উৎস শস্য এবং শস্য থেকে আদায়কৃত খাজনা হওয়ায় গ্রামের সুখ-দুঃখ নির্ভরশীল ছিল এই অঞ্চলটির উপর। এই কারণে সমসাময়িক কালে অঞ্চলটি ভালো কৃষিকার্যের উপযোগী হওয়ায় তা 'বাড়আনন্দ' নামে পরিচিত ছিল।

সমাজ-জীবন — আলোচ্য সময়ে সমাজ-জীবন কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেমন কিছু প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করেছি, তেমনি এর সঙ্গে যুক্ত করেছি নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গিও, যেটা এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন তথ্যের বাহ্যিক দিকটি দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজজীবন ছিল খুবই উন্নতমানের। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, আমরা যদি উপরের বাড়বিভাজনটা একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করি তাহলে সমাজের আসল চিত্রটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে সমাজের শ্রেণীবৈষম্য। বাড়বিভাজনে স্পষ্ট, বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মানুষ শ্রেণী ও জাতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করতেন। জমিদার ও তার অনুগামীরা যে সমাজের অন্যান্যদের থেকে আলাদা তা যেমন বাসস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনই জলের পরিখা দ্বারা অঞ্চলটিকে বেষ্টন করে রাখার ক্ষেত্রেও বিষয়টা স্পষ্ট। গ্রামের নিম্ন জাতি ও বর্ণের মানুষদের যে খুব নিচু চোখে দেখা হতো, তার বড় প্রমাণ গ্রামের একপাশে কেবলমাত্র তাদেরই বাসস্থান। এই শ্রেনীর মানুষেরা মজুর খেটে ন্যায্যমজুরী পেত কিনা সন্দেহ? কারণ এরা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন নির্বাহ যে করত তার প্রমাণ আছে। গ্রামবাসীদের মুখ থেকে শোনা বিভিন্ন কাহিনী থেকে স্পষ্ট, সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল - যে কাহিনী বর্তমান বিজ্ঞান প্রসারতার যুগে যুক্তিসম্পন্ন তথ্যও নয়, আবার গ্রহণযোগ্যও নয়।

অর্থনৈতিক জীবন -– সমসাময়িককালে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ছিল মোটামুটি ভালো। কেবলমাত্র গ্রামের নিম্নশ্রেনীর হাতে তেমন অর্থ না থাকলেও অন্যান্যদের হাতে বেশ ভালোই অর্থ ছিল। গ্রামের অধিবাসীদের পোশাক পরিচ্ছদ, আচার-অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে আলঙ্গিরী যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহুল অর্থব্যয়ে নির্মিত গ্রামের চারটি মন্দির গ্রামের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বড় উদাহরণ। তাছাড়া ঐ সময়ে কৃষিকার্য যে ভালোভাবে সম্পাদিত হত তা নারায়ণ প্রসাদ দাসের কাব্য 'মোদের গ্রাম' এ স্পষ্ট। আর এই কৃষিজাত শস্য আয়ের প্রধান উৎস হওয়ায় এই গ্রাম অর্থনৈতিক দিকে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাছাড়া গ্রামে বছরে বেশ কয়েকবার বড় বড় মেলা বসত। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে যে বহুব্যক্তির সমাগম ঘটত, তেমন ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালোভাবে সম্পাদিত হত।

স্থাপত্য-নিদর্শন — গ্রামটির যে কারণে এত উৎকর্ষতা বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব, তা হল স্থাপত্যের নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামটিতে যে সমস্ত স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা কেবলমাত্র 'বাড়উর্দ্ধব' ও 'বাড়বুধাই' এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে মিলে এই অঞ্চলে মোট চারটি মন্দির আছে। এর মধ্যে একটি মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে - ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। পরবর্তীকালের মন্দিরে যে পরিকল্পনা ও শৈল্পিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা আলোচ্য সময়কালে নির্মিত মন্দিরগুলিতে তেমন দেখা যায় না।

ক) রাধাগোকুলানন্দ জীউ মন্দির - আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'বাড়উর্দ্ধব' এলাকায় নির্মিত রাধাগোকুলানন্দ জীউ মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি কাহিনী কথিত আছে। গ্রামের জমিদার চৌধুরী দিব্য সিংহ করমহাপাত্রের সময়ে বৃন্দাবন ধাম থেকে বৈরাগী প্রসাদ দাস অধিকারী ও তাঁর চার সহোদর জমিদার গৃহে আসেন। সেই সময়ে জমিদার চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই অবস্থায় সন্ন্যাসীগণ জমিদার পুত্রকে মহাপ্রভুর চরণোদক সেবন করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। সন্ন্যাসীগণের এই অবদানে জমিদার আনন্দিত হন এবং তাঁদের প্রতি প্রগাঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মায়। সেই সময়ে সন্ন্যাসীগণ গ্রামে মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জমিদার দিব্য সিংহ মঠের জন্য জমিদান করে সেই স্থানে রাধাগোকুলানন্দ জীউর মন্দির নির্মাণ করেন। এই পাঁচজন সন্ন্যাসীর দায়িত্বে মঠপরিচালনা শুরু হয়। পাঁচজন সন্ন্যাসী (যাঁরা 'মহন্ত' নামে পরিচিত) হলেন - প্রসাদ দাস অধিকারী, পরমানন্দ দাস অধিকারী, বিমলানন্দ দাস অধিকারী, শ্যামানন্দ দাস অধিকারী ও রসিকানন্দ দাস অধিকারী। মন্দিরের পাশে এই ৫ জন মহন্তের সমাধি বর্তমান। রাধাগোকুলানন্দ জীউর পূর্বমুখী একরত্ন মন্দিরটি এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি একরত্ন রীতির হলেও এটির সংলগ্ন আটচালা রীতির জগমোহনটি একান্তই অভিনব। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭"৬' (৫.৩ মি.) ও প্রস্থে ১৫"৬' (৪.৭মি.), জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ২১' (৬.৪ মি.), প্রস্থে ১৩'১০" (৪.২ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৬' (৮ মি.)। মন্দিরটি পোড়া ইটের তৈরী একতলা বিশিষ্ট। মন্দিরটিতে তেমন কারুকার্য বা শৈল্পিক বিকাশ তেমন দেখা যায় না। মন্দিরটির মাথায় একটি চূড়া আছে এবং মূল গর্ভগৃহের সামনে একটি খিলান আছে, যার উপর ইঁট কেটে কেটে লতা-পাতা অঙ্কিত করা হয়েছে। মন্দিরটির সামনে একটা বড় জলাশয় আছে, যাতে দুটি পাকা ঘাট আছে। একটি মহন্ত ও ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য এবং অপর ঘাটটি মঠে আগত ভক্তদের ব্যবহারের জন্য। মূল গর্ভগৃহের ভিতরে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাধা কৃষ্ণের মূর্তি ছাড়াও পাশে শালগ্রাম শিলা আছে। নিয়মিত এদের পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পাশে রাসমঞ্চে রাসউৎসবে ঠাকুরকে আনা হয়। কথিত আছে, এই রাসউৎসবকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের সমাগম ঘটত এবং মেলা বসত - যা আজও বর্তমান।

খ) ভৈরবনাথের মন্দির - উনিশ শতকের প্রথমভাগে 'বাড়উর্দ্ধব' অঞ্চলে একটি বড় শিবের মন্দির নির্মিত হয় - ভৈরবনাথের মন্দির। অল্প জায়গার উপর নির্মিত দক্ষিণমুখী লম্বা এই মন্দিরটির মাথায় একটিমাত্র ত্রিশূলাকৃতি চূড়া আছে। মন্দিরটিতে কারুকার্য বা শিল্পের নমুনা নেই বললেই চলে। মন্দিরটির সামনে কেবলমাত্র দু দিকে দুটি স্তম্ভ আছে। গর্ভগৃহের ভিতর মাটির নিচে পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রত্যেক-শিবরাত্রিতে বহু নারী পুরুষ ব্রত করে জল ঢালেন। এই প্রথা সমসাময়িক কালে যেমন ছিল তেমনি বর্তমানেও আছে। কিন্তু পূর্বে এই উপলক্ষ্যে মেলা বসলেও বর্তমানে তা দেখা যায় না। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে, যা আনুমানিক বারো - তেরো শতকের এক প্রাচীন পুরাবস্তুর নিদর্শন।

গ) জগন্নাথদেবের মন্দির - সমসাময়িক কালে 'বাড়উর্দ্ধব' এলাকায় নির্মিত জগন্নাথদেবের মন্দিরটি বর্তমানে আর নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ঐ স্থানে আর একটি মন্দির নির্মিত হয়। তবে পূর্বের মন্দিরটি আকারে যেমন বড় ছিল, তেমনি মন্দিরটির গায়ের কারুকার্যেও উন্নত নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের ধ্বংসস্তুপই এই ধারণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মন্দিরটি জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোন উন্নত পরিকল্পনা মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পূর্বের মন্দিরের দেবতা আজও বর্তমান - কাঠের নির্মিত তিনটি মূর্তি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। পূর্বে এখানে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বড় মেলা বসত বলে কথিত আছে।

ঘ) নবরত্ন মন্দির - 'বাড়বুধাই' এলাকায় নির্মিত এই নবরত্নমন্দির (বৈষ্ণব ধর্মের নবভক্তির অনুকরণে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট মন্দির) গ্রামটির স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ এটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এখন যেখানে নবরত্নমন্দির অবস্থিত ঐখানে প্রথমে একটি ছোটমন্দিব ছিল। বাজপুত ক্ষত্রিয় বংশীয় কুঞ্জারী চরণ দাস উড়িষ্যা থেকে এসে বাড়বুধাই এলাকায় বসবাস শুরু করেন। কুঞ্জারী চরণ দাস ও তাঁর পুত্র ভিখারী চরণ দাস মুর্শিদাবাদে ওকালতি করতেন। পিতা-পুত্র দুজনে মিলে বাংলার ১১৯০ সাল নাগাদ ঐ ছোটমন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং ঠাকুরসেবার জন্য একশত বাহাত্তর বিঘা জমি নির্দিষ্ট করেন। পরবর্তীকালে ভিখারী চরণ দাসের প্রপৌত্র তুলসীরাম দাস এই ছোটমন্দিরের পরিবর্তে বড়মন্দির নির্মাণের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং শিল্পীদের আহ্বান জানান। বহু শিল্পীদের মধ্যে একজন শিল্পী (নাম জানা যায় নি) চালের গুঁড়ো দিয়ে তিনটি মন্দিরের ছক তৈরী করেন। তার মধ্যে তুলসীরাম বাবু নবরত্ন মন্দিরের ছকটি পছন্দ করেন এবং শিল্পীকে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেন। বাংলার ১২১৯ সাল নাগাদ মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। পুরো মন্দিরটি পোড়া ইঁট ও চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত। মন্দিরটিতে টেরাকোটার কাজ পরিলক্ষিত হয়। এই নবরত্ন মন্দিরটি পাঁচতলা বিশিষ্ট, যাতে মোট নয়টি চূড়া আছে। তিনতলার চারকোনে চারটি,

চারতলার চারকোনে চারটি এবং সবার উপরে একটি বড়চূড়া বর্তমান। মন্দিরের সামনের দিকে তিনতলায় এবং চারতলার চারটি কোণে দুটি করে কেশর তোলা সিংহের মূর্তি আছে। এর কারণ অন্য কিছু হলেও সিংহের মূর্তিগুলি মন্দিরের সৌন্দর্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে আলাদা মাত্রা দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্দিরের সামনের দিকে দুটি বড় স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগুলির সঙ্গে তিনটি অর্ধগোলাকৃতি খিলান যুক্ত। খিলানগুলির ওপরে মন্দিরের একেবারে সামনে বাইরের দিকে টেরাকোটার কাজে পোড়া ইঁট কেটে কেটে ছোট ছোট মূর্তি বসানো আছে, যা তিন ভাগে বিভক্ত। তাহল, রামায়ণের যুদ্ধের সমস্ত কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের সংকটভঙ্গ হতে সমস্ত প্রকার লীলা কাহিনী এবং কমলেকামিনী চন্ডীমাহাত্ম্য। শুধু মূর্তি নয়, মন্দিরের গায়ে ইঁট কেটে তৈরী সূক্ষ্ম কারুকার্য শৈল্পিক বিকাশের চূড়ান্ত নিদর্শন। মূল গর্ভগৃহের সামনে প্রবেশদ্বারের দুদিকে জয়-বিজয়ের অনুকরণে দুটি তলোয়ার ধারী দারোয়ানের মুর্তি মন্দিরটিকে একটি আলাদা মাত্রা দিয়েছে। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে বিশালাকার একটি সিংহাসনে গোকুলানন্দ জীউ মন্দিরের অনুরূপ দেবতাদের মূর্তি (রাধাকৃষ্ণ) ও শালগ্রাম শিলা উপবিষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্দিরের এই দেবতারা পূর্বের ছোটমন্দিরে পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে দেবতাদের এখানে স্থাপন করা হয়। মন্দিরের পূজার্চনা পুরোহিতদের ('ননা' নামে পরিচিত) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মন্দিরের দেবতারা 'রঘুনাথ জীউ' ও 'বালমুকুন্দ জীউ' নামে পরিচিত।

বিশালাকার এই নবরত্ন মন্দিরটিকে [দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৯' (৮.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২.২ মি.)] ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল মন্দিরটির সামনের দিকে যেমন কারুকার্য তেমনই অন্য তিনদিকে নেই বললেই চলে। কথিত আছে, মন্দিরটি নির্মাণ করতে গিয়ে তুলসীরাম বাবু সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মন্দির নির্মাণের শেষান্তে তাই অন্যদিকগুলিতে কারুকার্য করা যায় নি। এই কাহিনী কল্পনা করা হয় যা দেখে তাহল-মন্দিরে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর দুটি মূর্তি (তুলসীরাম বাবু খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র অবস্থায় মালা জপ করছেন এবং তার স্ত্রীর হাতে কেবলমাত্র একটি সরুবালা, যা লালসুতো বলে পরিচিত) দেখে। তালপাতায় বর্ণিত একটি বংশতালিকা থেকে দেখা যায় তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। নিঃসন্তান তুলসীরামবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর ধর্মার্চনা করেই জীবন নির্বাহের পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় - তাই সর্বস্ব দিয়ে মন্দির নির্মাণ ও পুজার্চনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। তবে তিনি যে ধর্মপ্রাণ ও সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্দিরটি নির্মাণে যথেষ্ট উন্নত পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট। বাইরে দূর থেকেও যেমন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট দেবতার মূর্তিকে স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন সময়ে মন্দিরের সংস্কারের সুবিধার্থে পূর্ব ব্যবস্থা (পেছনের দিকে সিঁড়ি দিয়ে উপর পর্যন্ত যেমন ওঠা যায়, তেমনি নীচের মত উপরে গর্ভগৃহে যেখানে প্রয়োজনে ঠাকুর এনে পূজার্চনা করা

সম্ভব হয়) গ্রহণ উন্নত পরিকল্পনার উদাহরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্দিরটি অনেকটা দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অনুরূপ।

নবরত্ন মন্দিরের সামনে একটি বড় 'নাটমন্দির' আছে, যেখানে বছরে দুবার ঠাকুর এনে ঝুলনযাত্রা ও দোল উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও মন্দিরের কাছাকাছি রঘুনাথের আটকোনা রাসমঞ্চটিও একান্ত চিত্তাকর্ষক এবং এটির প্রতি কোনের থামে পোড়ামাটির ভাস্কর্যসজ্জা বিদ্যমান। এখানে বছরে একবার ঠাকুর এনে রাসউৎসব পালিত হয়। মন্দিরের সংশ্লিষ্ট একটি ছোট চারকোন বিশিষ্ট মন্দির আছে, যেখানে কালিকা মায়ের পূজার্চনা হয়।

সৃষ্টিকাল থেকে শুরু করে আলোচিত সময়কাল পর্যন্ত 'আলঙ্গিরী' গ্রামের বিভিন্ন নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য - স্পষ্ট করে অন্য গ্রামগুলির থেকে এই গ্রাম ছিল স্বতন্ত্র। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বহুমানুষের সমাগম হত, যা গ্রামের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য দিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বহু স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে 'আলঙ্গিরী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সবশেষে যেটা বলার, স্বল্পচিন্তাভাবনা ও স্বল্পপরিসরে 'আলঙ্গিরী' গ্রামের উপর আমার সমীক্ষাকে পুরোপুরি বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে আরো বিস্তারিত ভাবে জানা এবং জানানোর ইচ্ছা তো থাকলো বটেই, উপরন্তু অন্যকোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বা গবেষকের কাছেও আহ্বান হয়ে রইল আমার এই অসম্পূর্ণ সমীক্ষা।

সূত্র নির্দেশ ঃ

ক) নারায়ণ প্রসাদ দাসের কাব্য - 'মোদের গ্রাম'।
খ) সমসাময়িক দলিল।
গ) নারায়ণ প্রসাদ দাসের পুরোনো ফাইল থেকে সংগৃহীত কিছু কাগজপত্র।
ঘ) সমসাময়িক কালে তালপাতার বর্ণিত কিছু তথ্য।
ঙ) গ্রামবাসীদের মুখের কিছু কথা।
চ) তারাপদ সাঁতরা পুরাকীর্তি সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর - (নারায়ণ প্রসাদ দাস, কুঞ্জারী চরণ দাসের বংশধর ও রাধাগোকুলনন্দ জীউ মন্দিরের (বাং ১৩৬০ - ১৩৯৬) ট্রাস্ট কমিটির এবং নবরত্ন মন্দিরের পরিচালন কমিটির আজীবন সম্পাদক ছিলেন)।

মধ্যযুগের পারসীক বিবরণে কোচবিহারের কোচেরা

পরিমল ব্যাপারী

হিমালয়ের পাদদেশে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যাঁহাদের শাসন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত ভারতে যাঁহারা বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন কোচ উপজাতির লোক। যদুনাথ সরকার তাঁহার **"History of Bengal"**[১] গ্রন্থে কোচদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন **"Half-a-century before Sulaiman's accession, a new power had been born in the extreme North of Bengal"**। এখানে **"New Power"** শব্দদ্বয় দ্বারা যে কোচদের বোঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কোচ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ, (খ্রীঃ ১৫১৫-১৫৪০) তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নরনারায়ণ (আঃ খ্রীঃ ১৫৪০-১৫৮৭) কোচদের সম্পর্কে সামগ্রিক উৎসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে পারসীক লেখকদের বিক্ষিপ্ত বিবরণ সমূহে।[২]

পারসীক লেখকদের রচনায় কোচদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক মিন্‌হাজ-উদ্দিন-সিরাজের রচিত **"তাবাকৎ-ই-নাসীরি"** গ্রন্থে।[৩] কোচ উপজাতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের বিবরণে পাওয়া যায় যে ১২০৬ খ্রীঃ বখতিয়ার উদ্দিন যখন লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর তিব্বত অভিযান করিয়াছিলেন, তখন হিমালয়ের পাদদেশে, বাংলার উত্তরে 'কোচ', 'মেচ' এবং 'থারু'[৪] নামের তিনটি উপজাতি বাস করত। এই উপজাতি তিনটির মধ্যে কোচ এবং মেচদের এই অঞ্চলে এখনও লক্ষ্য করা যায়; যাহাদের মধ্যে কোচরা পরবর্তী কালে রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে শুরু করিয়াছেন।[৫]

'তাবাকৎ-ই-নাসীরির' লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে বকতিয়ারের তিব্বত অভিযানে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত এক মেচ (যাহার নতুন নাম করণ হইয়াছিল *আলীমেচ*) পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়াছিল। এই অভিযান কালে বকতিয়ার গঙ্গা নদীর থেকেও প্রায় চারগুণ বেশী প্রস্থের একটি নদী; ২২ টি প্রস্তর স্তম্ভযুক্ত সেতুর উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি প্রহরার জন্য দুই জন সৈন্যকে সেখানে রাখিয়া তিব্বত অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিবার সময় একটি বিশালাকার মন্দিরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে স্থানীয় উপজাতীয় লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় কোনপ্রকারে পলায়ন করিয়া সেতুটির নিকট আসিয়া

দেখিলেন তাঁহার প্রহরারত সৈন্য কেহই নাই এবং সেতুটির দুইটি স্তম্ভ ভগ্ন। তাই খরস্রোতা নদীটি কোন প্রকারে সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন। তাঁহার বেশির ভাগ সৈন্যই খরস্রোতে ভাসিয়া যায়, তিনি শুধু মাত্র সাত জন সৈন্য সহ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেখানে কোচ রাজ্যে আলীমেচের আত্মীয় স্বজনরা তাঁহাকে আপ্যায়ন করিয়াছিল এবং তাঁহার দুঃখ লাঘবের প্রয়াস চালাইয়াছিল। লেখক এখানে নদীটির নাম উল্লেখ না করিলেও পরবর্তীকালে মুলুক উজবেগ ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কামরুপ আক্রমণ কালে যে নদীটি অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহার নাম বাগমতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] ইহা হইতে বলা যায় যে এই সময়ে বাগমতি নদীটির দক্ষিণ অথবা পশ্চিম তীরে ছিল কোচ এবং মেচদের বাসস্থান। নদীটির উত্তর অথবা পূর্ব তীরে ছিল কামরুপ রাজ্য। বাগমতি নদীটি অনেকের মতে ব্রহ্মপুত্র হইলেও খুব সম্ভবত এইটি ব্রহ্মপুত্র নহে। কারণ টাংসু (Tang-Shu) গ্রন্থের মতে এই নদীটির নাম ক-লো-তু (Ka-Lo-Tu)। Ka-Lo-Tu স্পষ্টতই করতোয়া' ইহাই ছিল পুন্ড্রবর্ধন ও কামরুপের সীমানা। প্রাচীন তথা মধ্য যুগে করতোয়া নদীটি যে বিশালাকার ছিল তাহার ইঙ্গিত বিভিন্ন উৎস হইতে জানা যায়।[৮]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে *আকবর নামায়*[৯ক] যে বিশু বা বিশ্বসিংহের সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে এই কোচ উপজাতীয় লোক ছিলেন তাহার বিবরণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পারসীক লেখকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক মহাম্মদ কাশেম ফেরিস্তা তাঁহার **তারিখ-ই-ফেরিস্তা** গ্রন্থে[৯খ] কোচবিহারের রাজবংশের প্রাচীনত্ব বোঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, এই রাজবংশ ইসলাম ধর্ম-প্রচারের (সপ্তম শতাব্দী) পূর্ব হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। কোচ দেশের রাজা সঙ্কলের সময় হইতে পুরুষাণুক্রমে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে চারবার পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। নবাব মীরজুমুলার কোচ বিহার আক্রমণের সহযাত্রী '*'তারিখ-ই-আসাম'*' গ্রন্থের লেখক হিসাবুদ্দিন মহাম্মদ তালিশও[১০] এই রাজবংশের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বলা যাইতে পারে যে ***তাবাকৎ-ই-নাসীরির*** লেখক মিনহাজ উদ্দিন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোচ উপজাতির কথা প্রথম উল্লেখ করিলেও ষোড়শ শতাব্দীর ***তারিখ-ই-ফেরিস্থার*** লেখক মহাম্মদ কাশেম খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কোচ বিহারের রাজবংশকে পিছাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে আমাদের দেশীয় কিছু উপাদানের সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়"।[১১]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কামরু কামতার[১২] শাসক নীলাম্বরকে পরাজিত করিয়া হোসেন শাহের কামরু কামতা বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার (হুসেনশাহ) ৯০৭ হিজরীতে (১৫০২ খ্রী:) গৌড়ের (মালদা) একটি মসজিদের দ্বার লিপিতে এবং বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে নির্মিত অপর একটি মসজিদের

দ্বারলিপিতে। এ ছাড়াও ১৪৯৩-১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে হোসেনশাহের নামে অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রায় হোসেনশাহকে কামরু কামতা যাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়কারী হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৩]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রভাবশালী কোচ শাসকদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের লেখা *আকবর-নামার* পরবর্তী খন্ড *আইন-ই-আকবরীতে*।[১৪] বিশাঁ বা বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচ রাজবংশের উৎপত্তি বিষয়ে *আকবর নামায়* লিখিত আছে যে প্রায় ১০০ বৎসর আগে (১৫৯৬-১০০ = ১৪৯৬ খ্রী:) কোচদেশের এক ভক্তিমতী নারী, রাজা হইবে এইরূপ একটি পুত্রের প্রার্থনায় জলপেশের[১৫] শিবমন্দিরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শিবের বরে সেইরূপ একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছিল বিশাঁ বা বিশু বা বিশ্বসিংহ এবং পরবর্তীতে কোচদেশের রাজা হইয়াছিলেন।

আকবর-নামার পরবর্তীতে বিশ্বসিংহের পৌত্র উল্লেখ করিয়া যে বর্ণনা আছে তাহা রাজা নরনারায়ণের ইঙ্গিত দেয়। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে বিশ্বসিংহের পৌত্র বলিয়া লিখিত আছে "He lived in a disengaged manner and refrained from marriage, at fifty years of age, he nominated his brother's son, the Pat Kumar as his successor"। বিভিন্ন বুরুঞ্জি এবং দেশীয় লৌকিক উপাদানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া যায় যে *আকবর নামায়* যাহাকে বিশ্বসিংহের পৌত্র হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি অবশ্যই বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ, পৌত্র লক্ষীনারায়ণ বা রঘুদেব নহে।

আকবর নামায় শুক্কগোঁসাই এবং মালগোঁসাই নামদ্বয়[১৬] দ্বারা যে শুক্কধ্বজ এবং মহারাজ নরনারায়ণকে বোঝানো হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ এবং কে কনিষ্ঠ তাহার আলোচনায় অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বেভারিজ কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদে বলা হইয়াছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শুক্কগোঁসাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় উপাদানে এবং বর্তমানে ঐতিহাসিকরা সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে নরনারায়ণ জ্যেষ্ঠ এবং শুক্লধ্বজ কনিষ্ঠ। আকবর নামায় বলা হইয়াছে যে মালগোঁসাই ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন এবং পরে শুক্লধ্বজের অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলেন, একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল, যাহার নামকরণ হইয়াছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে পটকুমার রঘুদেব বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ঈশা খানের সহযোগিতায় প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ তৎকালীন বাংলার সুবাদার অম্বর রাজ[১৭] মানসিংহের সহযোগিতায় তাঁহার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে রাজবংশাবলী বুরুঞ্জি প্রভৃতি উপাদান

গুলি কিন্তু অন্য তথ্য পরিবেশন করিয়া থাকে। এগুলিতে বলা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকরাও মানিয়া লইয়াছেন যে নরনারায়ণ জীবিত অবস্থায় তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশ চিলা রায়ের পুত্র রঘুদেবকে শাসন করিতে দিয়াছিলেন ।[১৮] পরবর্তী সময়ে যে বিদ্রোহের কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহ নহে, ইহা ছিল সীমানা সংঘাত।[১৯] তবে সংঘাতের সূচনা নরনারায়ণের সময়ই সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ রঘুদেবের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়াই বাদশাহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া *আকবর নামায়* উল্লেখ আছে।[২০]

মহারাজ নরনারায়ণ যে প্রজ্ঞাবান ও বহুগুণ সম্পন্ন শাসক ছিলেন তাহার বিবরণও *আকবর নামায়* পাওয়া যায়। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বাদশাহ্ আকবরের মহত্বের বিষয় কিছু অনুধাবন করিতে পারিয়া তাহার প্রশংসা পূর্বক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বহু উপহার সহ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আকবর নামায় লক্ষ্মীনারায়ণের সময় কোচ রাজ্যের সীমা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইহা ছিল একটি জনবহুল দেশ, যাহার দৈর্ঘ্য ছিল ২০০ ক্রোস (১ ক্রোস = দুই ইংলিস মাইল) এবং প্রস্থ ছিল ৮০ থেকে ১০০ ক্রোস। পূর্বদিকে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী, উত্তরে নিম্ন-তিব্বত ও আসাম, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমদিকে তিরহুট।

রিয়াজ-উস-সালাদ্দিন এর ইংরাজী অনুবাদক আবদুস সালিম কোচবিহারের সীমা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "Between the North and the West of Bengal pointing more towards the North is the province of Koch Bihar"।[২১] পূর্বে পরগণা ভিতরবন্দ হইতে পশ্চিমে পাট গাঁও ময়মনসিংহের সীমা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫৫ ক্রোস। দক্ষিণে পরগণা নীজবন্দ হইতে বিজিত দেশ পুসকরাপুর, যাহার সহিত খোনটাঘাট যুক্ত - পর্যন্ত উত্তরে এর প্রস্থ হইল ৫০ ক্রোস।[২২] *আকবর নামা* এবং *রিয়াজ-উস-সালাদ্দিন* এর সীমা বর্ণনায় পার্থক্য মনে হয় সময়ের জন্য কারণ কোচবিহারের সীমা সকল সময় এক থাকে নাই। *বাহারিস্তান ঘাইবী*[২৩] পুস্তকে সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের সীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত কোচ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। *তারিখ-ই-আসাম* পুস্তকে[২৪] রংপুরের দক্ষিণে বাগদুয়ারের নিকটবর্তী গড় পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মোরাঙ্গ দেশের সীমান্তে ভাটগড় পর্যন্ত কোচবিহারের সীমা নির্দেশ আছে।

পারসীক লেখকদের বিবরণে কোচদেশের আবহাওয়া, মানুষের দৈহিক গঠন এবং উৎপন্ন ফসল প্রভৃতির বিষয়েও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *রিয়াজ-উস-সালাদ্দিনে* বলা হইয়াছে "....the sweetness of its water, and mildness of salubrity of its air and the comfort of its inhabitants, is superior to all the

eastern tracts of Hindustan"।[২৫] এখানে উৎপাদিত ফসল হিসাবে বলা হইয়াছে "Large oranges thrive here and other fruits also grow in abundance. The tree of pepper grows there, its root is thin, and its branches creeps over ponds. Its ear like the ear of grape hangs down from the branches"।

এখানকার বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তাহারা ছিলেন দুইটি উপজাতি — Makh এবং Kuj সম্প্রদায় ভুক্ত।[২৬] এখানকার রাজা ছিলেন প্রথম সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁহারা "নারায়ণী" নামে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য রাজার এক লক্ষ একহাজার পদাতিক সৈন্য সব সময় থাকিত।

পারসীক ঐতিহাসিকদের বিবরণে কোচদের এবং কোচবিহার সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের সহযোগিতায় কোচদের বা কোচবিহারের তৎকালীন সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা সম্ভব না হইলেও এবং বিপুল পরিমাণ অতিরঞ্জিত অথবা হেয় করিবার ধারণা ভিত্তিক তথ্য, অথবা এই দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত ভুল থাকিলেও ইহাদের সহযোগী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিয়া কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। কোচ বা কোচবিহারের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সকল উপাদানেব উপযোগিতা ঐতিহাসিকরা মানিয়া লইয়াছেন।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১২০০-১৭৫৭, দ্বিতীয় খন্ড, পাটনা, ১৯৭৩, পুনঃপ্রকাশিত, পৃঃ ১৮৪।

২. পারসীক লেখকদের বিবরণগুলি পার্সী প্রভৃতি ভাষাতে লিখিত। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুবাদক দ্বারা অনুবাদ গ্রন্থ ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩. মিনহাজ-উদ্দিন-সিরাজ, তাবাকৎ-ই-নাসীরি, ইংরাজী অনুবাদ, মেজর এইচ. জি. র‍্যার্ভাটি, প্রথম খন্ড, নতুন দিল্লী, ১৯৭০, পৃঃ ৫৬০, পুণঃমুদ্রণ।

৪. শিবশংকর মুখার্জী, "হিষ্ট্রি অফ দ্য কোচেস অফ নর্থ বেঙ্গল", প্রকাশিত এসেস অন নর্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া, মিল্টন এস. সাঙমা (সম্পাদক), নিউ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ১১০।
এই উপজাতি তিনটির নাম উল্লেখ করিতে গিয়া অনুবাদকেরা, পরবর্তী পারসীক লেখকরা, এমন কি ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বানানে পার্থক্য করিয়াছেন। তবুও বুঝিতে কাহারওই অসুবিধা হয় না যে -

Kwnc→Kōc→Koch
Myj→Mec→Mech
Th'rw→Tharu

৫. চারুচন্দ্র সান্যাল, দ্য রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৫, পৃঃ

১৩।

৬. মিনহাজ-উদ্দিন সিরাজ, তদেব, পৃঃ ৫৬২।

৭. নীহাররঞ্জন রায়, ***বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*** দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৪০২ শকাব্দ, পৃঃ ৮৮।

৮. লঘুভারতে "বৃহৎ পরিসরা পূণ্যা করতোয়া" লিখিত আছে বলিয়া নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকে লিখিয়াছেন (পৃঃ ৮৮)। ডঃ হান্টার শুনিয়াছিলেন যে করতোয়া বাসীরা করতোয়াকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া জানিতেন (হান্টার স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, পৃঃ ৩৩৫)

৯ক. আবুল ফজল, ***আকবর নামা*** (তৃতীয় খন্ড) ইংরাজী অনুবাদ এইচ. বেভারিজ, নিউ দিল্লী, ১৯৭২, পৃঃ ৩৪৯।

৯খ. মোহাম্মদ কাশেম ফেরিস্তা, ***তারিখ-ই-ফেরিস্তা*** (উর্দু অনুবাদ) দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪১৯-৪২০।

১০. খাঁন চৌধুরী আমানুতুল্লা আহম্মদ, ***কোচবিহারে ইতিহাস***, কলিকাতা, পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃঃ ৭৯।
উক্ত পুস্তকে ***"তারিখ-ই-আসাম"*** হিসাব উদ্দিন মোহাম্মদ তালিশের পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি।

১১. দেশীয় ঐতিহ্যগত উপাদানে কোচ উপজাতির প্রাচীনত্বের অপ্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কম্বোজদের যদি কোচদের পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে কোচদের প্রাচীনত্ব দশম শতাব্দী পর্যন্ত পিছাইয়া নিতে হয়। **ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে** (ব্রহ্মখন্ড, দশম অধ্যায়) কোচদের উল্লেখ আছে।

১২. খাঁন চৌধুরী আমানুতুল্লা আহম্মেদ **প্রাগুক্ত** পৃঃ ৩, সেকেন্দর শাহের মুদ্রায় 'কামরু' ওরফে 'চাউলিস্থান', হোসেন শাহের মুদ্রায় 'কামরু' 'কামতা' এক সঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবাকৎ-ই-নাসীরিতে কোচ উপজাতির কথা উল্লেখ থাকিলেও 'কামতা' বা কোচ বিহারের উল্লেখ নেই কিন্তু 'কামরূপের' উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীতে আলবেরুণী নেপাল, কামরু ও ভোটেশ্বর দেশের নাম লিখিয়াছেন।

১৩. খাঁন চৌধুরী আমানুতুল্লা আহমেদ **প্রাগুক্ত** পৃঃ ৪৬। আমাদের দেশীয় উপাদানে হোসেন শাহের 'কামতা' বিজয় প্রসঙ্গে জানা যায় যে শেষ খেন রাজা নীলাম্বরের মন্ত্রী শশিপাত্র এর প্ররোচনায় হুসেন শাহ কামতা দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামতা দুর্গ অনেকদিন অবরোধ রাখিবার পরেও অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বন্ধুত্বের ছলে দুর্গে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।

১৪. আবুল ফজল, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ৩৪৯, ৬২২, ৬২৫, ৬৫০, ১০৬৬-৬৪, ১০৬৪-৮২, ১০৯৩
আইন-ই-আকবরী (অনুবাদক ব্রখমান দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫ পৃঃ ১৪০-৫৫২।

১৫. বর্তমানে জলপেশের শিবমন্দির ঝড়দা নামী ক্ষুদ্রনদীর তীরে অবস্থিত, ***জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার***, পৃঃ ১৪২।

১৬. আবুল ফজল, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ৩৪৯

১৭. আবুল ফজল, ঐ পৃঃ ৩৬২।

১৮. ডি. নাথ, ***হিষ্ট্রি অফ কোচ কিংডম,*** দিল্লী ১৯৭৯, পৃঃ ৮৪।

১৯. ***দারাংরাজবংশাবলী*** (পৃষ্ঠা ৬২২-২৩) তে উল্লেখ আছে যে মহারাজ নরনারায়ণ জ্ঞাতি সংঘাত এড়াইবার জন্য রাজ্যের পূর্ব অংশ রঘুদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমঅংশ দিয়াছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণকে। রঘুদেব কর প্রদানেও রাজী হয়। এর পরবর্তীতে বিরোধের কারণ দুইটি হইতে পারে - কর প্রদানে গররাজী অথবা সীমান্ত সংঘর্ষ। ডি. নাথ পূর্ব উল্লিখিত গ্রন্থে কর প্রদানের গররাজীকেই বিরোধের কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

২০. আবুল ফজল, **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ৭১৬।

২১. গোলাম হোসেন সলীম, ***রিয়াজ-উস-সালাতিন,*** আবদুস সালাম (ইংরাজী অনুবাদ), ১৯৭৫, (পুণঃর্মুদ্রণ) পৃ· ১০।

২২. উল্লিখিত স্থান সমূহের পরিচয়, ***জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি,*** ১৮৭২, পৃঃ ৪৯।

২৩. খাঁন চৌধুরী আমানুতুল্লা আহম্মেদ **প্রাগুক্ত**, পৃঃ ১২৪।

২৪. খাঁন চৌধুরী আমানুতুল্লা আহম্মেদ ঐ, পৃঃ ১২৪।

২৫. গোলাম হোসেন সলীম, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১০।

২৬. তদেব, এখানে 'কোচ' ও 'মেচ' দুই উপজাতির উল্লেখ আছে। এখানে 'থারুর' উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগে বাংলার মহিলা মন্দির নির্মাতা

প্রভাত কুমার সাহা

সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের যে অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯৯৯) হয়ে গেল সেখানে যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তা থেকে দুটি বিষয় সুপরিস্ফুট তা হল নতুন সহস্রাব্দে ভারতবর্ষে ইতিহাস গবেষণার ধারা নতুন দুটি খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে — ১) ভারতবর্ষে নারী ইতিহাস বা Women History এবং ২) পরিবেশ ও ভারত ইতিহাস। সদ্য সমাপ্ত ইতিহাস কংগ্রেসে নারী ইতিহাস নিয়ে মোট চল্লিশটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে।[১] প্রবন্ধ গুলির সুর বাঁধা ছিল যতটা না মহিলাদের কৃতিত্ব বর্ণনে তদপেক্ষা বেশী মহিলা নির্যাতনের উপর। বর্তমান প্রবন্ধটি নারী ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র সংযোজন মাত্র। এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু মধ্যযুগে বাংলাদেশে মহিলা মন্দির নির্মাতা।

মধ্যযুগে বাঙালী নারীর জীবন ছিল নিষ্করুণ ভাবে বিবর্ণ। সাংসারিক জীবনবৃত্তের বাইরে তার অন্যজীবন ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শাস্ত্রীয় বিধানের আড়ালে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে করে তুলেছিল পরনির্ভরশীল। তার স্বাধীন মতামতের কোন গুরুত্ব ছিল না। সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত হয়েছিল নারী, পরিণত হয়েছিল পুরুষের ভোগাকাঙ্খার সামগ্রীতে। সাংসারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্তঃপুরবাসীদের মতামত পুরুষসমাজ কখনো গ্রহণ করেনি। মহিলাগণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ভ্রান্তমতি, পাপীয়সী, নরকের দ্বার ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়েছে। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ আলাওয়াল তার 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন[২] —

> "স্ত্রিয়া জাতি হীন মতি কি বুদ্ধি তোমার।
> প্রাণের বিপক্ষ কর্ম কি ফল তোমার।।
> স্ত্রিয়া বুদ্ধি শুনে যার করগত প্রাণ।
> উচ্চতর উপদেশ কহয় অজ্ঞান।।"

মধ্যযুগে বাংলাদেশে নারীর সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল সম্প্রতি সত্যবতী গিরি তাঁর এক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "একটি পরিবারে নারী সর্বহারা সব দিক দিয়েই। কারণ তার শ্রমের কোন মর্যাদা ছিল না, প্রজনন অর্থাৎ পুত্র জন্মের সে ছিল যন্ত্রমাত্র। পুরুষের একাধিক নারীবিবাহ সমাজে বিধিসম্মত, এমনকি বারঙ্গনাগমনও আইনত দন্ডনীয় ছিল না। কেবলমাত্র পরস্ত্রীগমন ছিল

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং সেটাও পুরুষদেরই স্বার্থে। ..বিপত্নীক পুরুষের বিবাহ কোনদিন বাধা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত বালিকা বয়সে বিধবা নারীরও পুনর্বিবাহ ছিল কঠোর নিষেধ। ..অন্যদিকে সমাজে পুরুষের ব্যভিচারের কোন বাধা না থাকায় এই সমস্ত নারীরা লম্পট পুরুষের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট" হত।[৩] মধ্য যুগের নারী জগতের এক চালচিত্র।

মুদ্রার অপরপিঠও ছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে দুটি প্রথায় - শ্রুতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক - শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে। প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালী মহিলাগণ ঠাকুমা-ঠাকুরদা, দাদু-দিদিমা প্রভৃতির কাছে মুখে মুখে শিক্ষালাভ করত। তারপর পাঁচালীকার, কথকঠাকুর প্রমুখের, কাহিনীকাব প্রমুখের মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান লাভ করত। কচি বয়সে বালকের সঙ্গে একই গুরুগৃহে বা পাঠশালায় যেত। তবে উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারত না দুটি কারণে - ১) বাল্যবিবাহ এবং ২) সংস্কার - কন্যার অধিক বিদ্যা নাকি তার অকাল বৈধব্যের কারণ। এই অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য দেবের সাম্যবাদী আন্দোলনেব ফলে। বাংলার সমাজে নব-চেতনাব সৃষ্টি হল। বৈষ্ণব কুলে শিক্ষার অনুপ্রবেশ এবং বিস্তার ঘটল। সৃষ্টি হল বৈষ্ণবী শিক্ষিকা মা গোঁসাই শ্রেণীর। বঙ্গীয় সমাজে উচ্চ শিক্ষিতা গোস্বামীনীগণ নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে এলেন[৪] - নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাস দেবী, শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুবানী প্রমুখ। তাঁরা তদানীন্তন সমাজে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। জাহ্নবাদেবী শিষ্যদের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করতেন, বীরভদ্র পত্নী সুভদ্রা জাহ্নবাদেবীর প্রশস্তিমূলক সংস্কৃত কাব্য 'অনঙ্গকদম্বাবলী', হেমলতা ঠাকুরানী 'মানবীবিলাস' রচনা করলেন। হরিলীলা কাব্যের কবি জয়নারায়ণ সেনের আত্মীয়া আনন্দময়ী, দয়াময়ী, গঙ্গামণি প্রভৃতি ছিলেন বিদুষী। মল্লরাজ গোপাল সিংহদেবের পটরানী ধ্বজামনি দেবী প্রেম বিলাস কাব্যের পুঁথি নকল করলেন।[৫] এছাড়াও ছিলেন শ্যামাপ্রিয়া, মাধবীলতা, অন্নপূর্ণাদাসী, তারিণীদেবী, বিপ্রদাস কন্যা চন্দ্রাবতী* প্রমুখ। চৈতন্যদেবের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালী নারী সমাজের বুদ্ধি-বিভাষার জগতে নতুন আলোড়ন-সৃষ্টি হ'ল। বুদ্ধি-বিভাষার প্রভাবে বাঙালী নারী সমাজের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের ছড়িয়ে দিলেন। বাংলাদেশে দেখা দিল মহিলাদের নির্মিত মন্দির।

মন্দির নির্মাণকে তাঁরা সামাজিক প্রগতির নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই মহিলা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দেখা পাই। মন্দিরগুলি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পুণ্য লাভ। অন্ততপক্ষে মন্দির লিপি থেকে তাই মনে হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মন্দির স্থাপনের পশ্চাতে ভিন্নতর উদ্দেশের উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন যশঃলাভ, কেউ মনে করেন লোকহিত, কেউ বা মনে করেন প্রায়শ্চিত্ত।

আবার হিতেশরঞ্জন সান্যাল প্রমুখ মনে করেন সামাজিক উত্তরণ ছিল মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য।[৬]

উদ্দেশ্য যাই হোকনা কেন প্রাচীন কাল থেকে মন্দির নির্মাণে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের সাম্যবাদী আন্দোলনের ফলে মহিলাগণও মন্দির নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার মাত্র কয়েকটি মন্দিরের আলোচনা করা হ'ল।

মধ্যযুগে মহিলাদের মধ্যে মন্দির নির্মাণে পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নবদ্বীপে। মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন নিম্নবর্গের জনৈক মহিলা।[৭] বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নাই।

প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে বাংলাদেশে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার লালগড়ের লালজীর নবরত্ন মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ভান বংশীয় রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রানী লক্ষ্মণাবতী। মন্দির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ-

> " শুভমস্তু শকাব্দা/১৫৭৭/ শাকেদৃশ্ব মুনিবাণেন্দৌ
> বৈশাখে শুক্লপক্ষেকে/তৃতীয়ায়াং শুভদিনে/আরোম্ভোস্য বভুব হ।।

হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী/শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ/প্রীত্যৈ নবরত্নমিদংদদৌ/ রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানের্বধূ খ্যাত/শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরাযাত্মজা/ মাতা/শ্রীযুক্তমিত্রসেন নৃপতের্বিখ্যাত কীর্তে ক্ষিতৌ/শ্রীনারায়ণমল্ল ভূপভগিনী বম্যং দদৌ/মন্দিরং।। গিরিধাবি পদাম্ভোজে নববত্নমি/দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা।। পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস।"

মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তবে শিলালেখটি ঠাকুরবাড়ীর একটি সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

মহিলাদের নির্মিত যে সমস্ত মন্দির এখনও অক্ষত আছে এবং মধ্যকালীন বাংলার মহিলাদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে সেগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মুরলীমোহনের মন্দির অন্যতম। প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায়, ১৬৬৫ খ্রীঃ মুরলীমোহন মন্দিরটি নির্মাণ করেন মল্লরাজ দুর্জন সিংহের মাতা অর্থাৎ মল্লরাজ বীরসিংহের মহিষী শ্রী শ্রীলচূড়ামণি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি এইরূপ ঃ- "শ্রীশ্রীদুর্জনসিংহ ভূপ জননী মল্লাবনী বল্লভ/শ্রীল শ্রীযুত বীরসিংহ মহিষী শ্রী শ্রীল

চূড়ামণিঃ/মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োঃ/প্রীতৌ সৌধগৃহং ন্যবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোহপ্যুজ্জলম্। ৯৭১।"

বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া জেলা) গোয়াল পাড়ায় মল্লরাজ বীরসিংহের দ্বিতীয় রাণী শিরোমনি ১৬৬৫ খ্রীঃ (১৬৬৫ A.D.) মদন গোপালের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির লিপিটি এইরূপ ঃ- "রাধাকৃষ্ণ পদপ্রান্তে সোমসপ্তাঙ্গগে শকে/রঘুনাথ মহীনাথঃ তনয়স্যোন্নতাশয়া। বীরসিংহ নরেশস্য ভীরবমান সংশয়া। মহিষ্যতি প্রমোদে নবরত্নং সমর্পিতং।"৯৭১।।

আধুনিক বর্ধমান জেলায় বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদের মহিষী ব্রজকিশোরীদেবী কালনায় লালজীর পঁচিশরত্ন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আবার ১৭৮৯ খ্রীঃ মহারানী বিষণকুমারীদেবী নবাবহাটে ১০৯টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিষণকুমারী ছিলেন মহারাজা তেজচন্দ্রের জননী। মন্দিরের লিপিটি নিম্নরূপ ঃ-

"শাকে শূন্য-শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্ম্মায় রাধাহরি
প্রীত্যৈ পুণ্যবতী নবাধিক শতং শ্রীমন্দিরানী স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী ধৌরেয় চূড়ামণে-
র্মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়ত্ন।"

কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারী। মন্দিরলিপিতে অভিনবত্ব আছে। একটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত অপরটি বাংলা ভাষায়। দ্বিভাষায় মন্দির লিপি বাংলাদেশে বিরল। সংস্কৃত ভাষার লিপিটি এইরূপ ঃ-

"সংসারার্নবতারনৈক তটিনী, তীরে মুরারযের্মুদে।
শাকে ভেশানগাগভেশবিমিতে.তারে শকায়াদদৎ।।
শ্রীরাধেশ সুবেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী।
মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্।"

বাংলা লিপি ঃ-

"শাকে সপ্তদশ শত একাত্ত প্রমাণে অম্বিকায় অমর বাহিনী সন্নিধানে।
শ্রীরাধাবল্লভ রাসরসিক সুন্দর শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বিশ্বমনোহর।।
তাঁহার কিঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা।
মহাস্থানে করি মহামন্দির নির্মাণ হরিপ্রিতে হরসিতে হরেদিলাদান।।"
শকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার মহিলাগণও মন্দির নির্মাণে পিছিয়ে ছিলেন না। মহিষাদলের রানী জানকী ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন গড়বাড়ীর অভ্যন্তরে গোপাল

জীউএর নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের লিপিটি হ'ল - "শুভমস্তু ১৭০০ শকে শ্রীনৃপানন্দলালস্য/পত্নী শ্রীজানকীর্তিয়া দ্বন্দ্ব ত্রয়োবিংশ/শনো দিশেষু নবরত্নকং দদে স/প্ত দশসংশকে গোপাল রায় তৎ/গঠান্ত শ্রীপাঁচুলাল মিস্ত্রীরে।" মহিষাদলের ভূস্বামী গর্গপরিবারের জগন্নাথ গর্গের সহধর্মিনী ইন্দ্রাণীদেবী ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান নতুন বাজার এলাকায় আর্যকোনা সতেরো চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাসমঞ্চে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি তার ধ্রুপদী সাক্ষ্য। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাড়াগ্রামের কালীমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন সরকার পাড়ার রায় পরিবারের জনৈকগিন্নী মা। জাড়াগ্রামের কাশীনাথ ও পার্বতীনাথ শিব মন্দিরটি মধ্যযুগে বাঙালীর গভীর যুগল প্রেমের নিদর্শন। মন্দির লিপি থেকে জানা যায় শ্রীশিবনারায়ণ দেবশর্মা সস্ত্রীক এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এগুলি ছাড়াও মাধবী দাসীও তাঁর পুত্র নবীনচন্দ্র বেরা ১৮৮৩ খ্রীঃ ডিহি চেতুয়ার শীতলার চাঁদনী, শ্রীমন্ত ভুরিষ্টাল ও অন্নপূর্ণাদেবী গোপালনগরের ঝাকড়েশ্বর শিবের আটচালা (১৮৮৪ খ্রীঃ) রামপুরের দয়াময়ীদেবী শীতলার দেউল (১৮৯৩ খ্রীঃ), উজ্জ্বলাবালা দাসী পঞ্চরত্ন তুলসী মঞ্চ (১৮১২ খ্রীঃ) গোলাপ সুন্দরীদেবী গড়বেতার সুকুল পাড়ার মদন মোহনের একরত্ন মন্দির (১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ) নির্মাণ করেন। মেদিনীপুর জেলায় আরো যাঁরা মন্দির বা চাঁদনি বা আটচালা নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন খেতুয়ার চঞ্চলাদাসী, জাড়ার জগৎমোহিনী দেবী, ময়না হাটের রানী সারদাময়ী, জুখিয়ার রানী হরিপ্রিয়াদেবী প্রমুখ।

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নাটোরের রানীভবানী। রানীভবানী বড়নগরে শিব এবং কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেছিলেন*। মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারের মহারাজা মনিন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মহিষীও উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে কুচবিহার শহরে মহিলাদের নির্মিত তিনটি মন্দির আছে। শহরে সুভাষপল্লী অঞ্চলে অনাথ নাথ শিবের মন্দিরটি লোকশ্রুতি অনুসারে মহারাজ নীরেন্দ্র নারায়ণের রানী নিশিময়ী উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে নির্মাণ করান। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের বড় রানী ১৮৮৩ খ্রীঃ কামেশ্বরী দেবী বা ডাঙ্গর আয়ী (ডাঙ্গর = বড়, আয়ী = রানী, স্থানীয় ভাষা) মন্দিরটি নির্মাণ করান। শহরের রাজমাতা ঠাকুর বাড়ীটিও ডাঙ্গর আয়ী কামেশ্বরী দেবী ১৮০৩ খ্রীঃ পুর্বে নির্মাণ করেন।

সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে মহিলাদের মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ মহিলাদের দ্বারা নির্মিত অধিকাংশ মন্দিরই হয় বৈষ্ণব দেবতা অথবা শিবের। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও কুচবিহারে শিব মন্দির নির্মাণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণবঙ্গে বৈষ্ণব মন্দিরের সংখ্যা

অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণবঙ্গে মহিলাদের দ্বারা নির্মিত মন্দিরের মধ্যে রত্নমন্দিরের সংখ্যা বেশী। উত্তরবঙ্গে চালা মন্দিরের সংখ্যা বেশী। মুর্শিদাবাদে অষ্টকোন এবং উল্টানোপদ্ম রীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তৃতীয়তঃ বিষ্ণুপুরের মল্লমহিষী এবং নাটোরের রানী ভবানীর নির্মিত মন্দিরের অলঙ্করণ এবং বৈভব সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চতুর্থতঃ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতক অপেক্ষা উনিশ শতকে মহিলাদের মন্দির নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে বৃহৎ জমিদারী গুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে নতুন নতুন অসংখ্য ছোট ছোট জমিদারীর পত্তন হয়েছিল। ফলে ছোট ছোট জমিদার বা ভূস্বামীদের সহধর্মিনীগণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ফল হিসাবে মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মন্দিরের অবয়ব তাদের আর্থিক সঙ্গতি নির্দেশ করছে। উনিশ শতকের মন্দির আকার প্রকারে ছোট এবং প্রায় নিরাভরণ। কয়েকটিতে টেরাকোটার কাজ আছে কিন্তু মান স্থুল। পঙ্কের ব্যবহার তুলনায় বেশী। এই পরিবর্তন আর্থিক নিম্নমুখীনতার পরিচায়ক। পঞ্চমতঃ মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন মহিলা রাজমিস্ত্রীর ভূমিকা ছিলনা। তখন মহিলারা এ কাজ করত কিনা এ প্রশ্নও মনে জাগে। তারা যুদ্ধে অংশ নিত (অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজনে) যেমন লক্ষ্যা ডোমনী।[৮] কিন্তু সমাজের অন্যান্য পেশার মত অর্থকরী[৯] রাজমিস্ত্রীর কাজে মহিলারা আকৃষ্ট হয়নি কেন তা অনুসন্ধানের বিষয়। কেননা নিম্ন হিন্দুসমাজের মহিলাগণ চিরকালই কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত। ষষ্ঠত: মন্দির নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ হত জমিদারীতে মন্দির নির্মাতা মহিলার যে অংশ নির্দ্ধারিত থাকত তার আয় থেকে। তৎকালে প্রত্যেক জমিদারীতে ভাতের জোত নামে নির্দিষ্ট থাকত বিস্তৃত জমি।[১০] এই জমির আয় ছিল মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কাজের খরচের সংস্থান। সব শেষে বলা যেতে পারে যে আধুনিক কালের মত মধ্যকালীন বাংলায় গঠনমূলক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মা-গোঁসাই ব্যতীত সমাজের উচ্চ অভিজাত ঘরের মহিলাগণ। মন্দির নির্মাণও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধ, "ইতিহাস চর্চায় নারী", *কালান্তর*, ১৫-১-২০০০।

২) দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদিত, *আলাওল* : পদ্মাবতী, ১৯৮৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ: ৯০।

৩) সত্যবতী গিরি, "মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য : অবরোধে নতজানু বিদ্রোহিনী," *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ১৯৮৮-৮৯, পৃ: ১০।

৪) প্রভাত কুমার সাহা, বৈষ্ণবধর্ম ও মধ্যযুগে বাংলায় নারী আন্দোলন, প্রকাশিত *মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ: ২৭-২৯ কলিকাতা।

৫) *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*, পুঁথি নং ২০০।

* চন্দ্রাবতী রামায়ণ বচনা করেছিলেন

৬) হিতেশরঞ্জন সান্যাল, ***সোস্যাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল,*** কলিকাতা, ১৯৮১।

৭) কলকাতা দূরদর্শনের মহাপ্রভু সিরিয়াল।

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন : প্রভাত কুমার সাহা, মুর্শিদাবাদ জেলার মন্দির ও সমাজ, প্রবন্ধ : আজও অন্বেষণ, ২য় বর্ষ, ১৯৯৯।

৮) শ্রী বিজিত কুমার দত্ত ও শ্রী সুনন্দা দত্ত, সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলী, *ধর্মমঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃঃ ৫০৮।

"ডাকে বলে ডুমনি ডরাই নাঞি তাকে।
ধনুঃশর আনিতে ধাইল ঘর মুখে।।

- - - - - - - - - - - - - - -

হেদে গো ডোমের বেটি হেটে ধর হুল।
সহিতে না পারি তেজ শরীর আকুল।।"

৯) এম. এ. রহিম, **বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস** দুই খন্ড, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮২, ঢাকা, পৃঃ ৫১৪।

শ্রমজীবীর পরিচয়	দৈনিক বেতন	মাসিক বেতন
ভাস্কর	৫ দাম	৩১/৪ টাকা
রাজমিস্ত্রী	২১/২ দাম	২ টাকা
ছুতোর	৪ দাম	৩ টাকা
ঘরামী	৩ দাম	২১/২ টাকা
দিন মজুর	২ দাম	১১/২ টাকা

৪০ দাম (40 Dam) = ১ টাকা (Re 1/-)

আরো দেখুন ঃ- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ***প্রাক পলাশী বাংলা,*** কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ· ৮৭

শ্রমজীবি	দৈনিক মজুরী
কুলি	১ পন ১২ গন্ডা কড়ি
কারিগর	১০ পয়সা
রাজমিস্ত্রী	২ পন ১ গন্ডা কড়ি

(১৭৪৩ খ্রীঃ দৈনিক মজুরী)

আরো দেখুন ঃ প্রভাত কুমার সাহা, ***মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধানে,*** প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

১০) প্রভাত কুমার সাহা, ***সাম আসপেক্টস অফ মল্ল রুল ইন বিষ্ণুপর*** *(১৫৯০-১৮০৬ এ.ডি.)*, কলিকাতা, ১৯৯৫, পরিশিষ্ট - ২।

মুর্শিদকুলী খানের বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি আলোচনা

অনিরুদ্ধ রায়

১

যদুনাথ সরকার, আবদুল করীম ও নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ[১] প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ইংরাজী ও ফার্সী লেখার উপর ভিত্তি করে মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনা করেছেন। এর সঙ্গে তাঁরা কয়েকটি আনুষঙ্গিক বক্তব্যও রেখেছেন। যেগুলিকে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১৭০০ সালে মুর্শিদকুলী সুবে বাংলার দেওয়ান ও মখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৭০১ সালে তিনি বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদার এবং উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭০৩ সালে তাঁকে উড়িষ্যার উপসুবাদার করা হয়। ১৭০৪ সালে উনি বিহারের দেওয়ান ও বাংলার উপ-সুবাদার হন। আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকেই তিনি পদগুলি হারাতে থাকেন। ১৭০৭ সালে বাংলার দেওয়ানের পদ। মখসুদাবাদের ফৌজদারের পদ হারান ও ১৭০৮ সালে ওঁকে দাক্ষিণাত্যে বদলী করা হয়। ১৭১০ সাল থেকে ওঁর দ্বিতীয় উত্থান শুরু হয় বাংলার দেওয়ানের পদ পাবার পর। উল্লেখযোগ্য যে তিনি ঐ সময়ে যুবরাজ আজিমুদ্দীনেরও দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭১১ সালে মেদিনীপুর ও হুগলীর ফৌজদার, ১৭১৩ সালে বাংলার উপ-সুবাদার। ১৭১৪ সালে উড়িষ্যার সুবাদার ও ১৭১৭ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলার সুবাদার ছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই নাটকীয় উত্থানের সময়ে যুবরাজ আজিমুদ্দীনের ছেলে ফারুখসিয়ার সম্রাট ছিলেন। এটা অবশ্য ঠিক যে আজিমুদ্দীনের বাবা বাহাদুর শাহ প্রথম যখন সম্রাট ছিলেন তখন মুর্শিদকুলীর পতন শুরু হয়। ফারুখসিয়ার ৯ই জানুয়ারী ১৭১৩ সালে সম্রাট হলেও মুর্শিদকুলির উত্থান চলতে থাকে। গৃহযুদ্ধের সময় মুর্শিদকুলী ফারুখসিয়ারকে সাহায্য পাঠাতে অস্বীকার করেন কারণ তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। ১৭১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফারুখসিয়ার সম্রাট হলে তিনি নিয়মিত খাজনা পাঠাতে থাকেন। এর পরও মুর্শিদকুলীর উত্থান চলতে থাকে। সুতরাং কতটা মুর্শিদকুলী ও আজিমুদ্দীনের পরিবারের মধ্যে বিরূপতা ছিল, যা নিয়ে যদুনাথ সরকার লিখেছেন,[২] এটা আবার খতিয়ে দেখা উচিত।

২

আজিমুদ্দীন (সুবাদার) ও দেওয়ান মুর্শিদকুলী প্রথম থেকেই টাকা সংগ্রহ করার উপর জোর দেন। ১৭০৩ সালে সম্রাট ইউরোপীয়ানদের উপর থেকে বাণিজ্য বন্ধ

করার আদেশ তুলে নিলে, এঁরা কোম্পানীগুলির কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা চান বাণিজ্য খুলে দেবার জন্য। কাশিম বাজারের শুল্ক মুর্শিদকুলী ইজারা দেন ও কোম্পানীগুলিকে এখানে শুল্ক দেবার কথা বলা হয়। কিছু টাকার বিনিময়ে এটির নিষ্পত্তি হয়। মথুরাদাস (বণিক) ইজারা নিয়েছিলেন। কিস্তিবন্দী টাকা দিতে না পারায় বন্দী হন ও পরে টাকার বিনিময়ে মুক্তি পান।[৩] আওরংজেব ইজারার বিরুদ্ধে মুর্শিদকুলীকে লিখলে, তিনি জানান যে পুরাণো মুঘল প্রথা অনুযায়ী তিনি ইজারা দিচ্ছেন।[৪]

প্রথম পাঁচ বছরের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে মুর্শিদকুলী নগদ টাকা পাবার চেষ্টা করছেন। ইউরোপীয় চিঠিতে দেখা যায় যে এই সময় নগদ টাকার ঘাটতি দেখা গিয়েছিল ও সাধারণ জিনিষপত্রর দাম খুব বেড়েছিল, যার জন্য ইউরোপীয়ানরা মুর্শিদকুলীর বণিকদের উপর জুলুম ও আজিমুদ্দীনের টাকা জমানো প্রধান কারণ বলে ধরেছেন।[৫] আমাদের মনে রাখতে হবে যে শোভাসিংহ ও রহিমখান এর বিদ্রোহের[৬] ফলে উত্তর বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় এসেছিল যার ফলে মুদ্রা ঘাটতি অস্বাভাবিক নয়। বণিকরা অধিকাংশই পালিয়েছিল ও টাকা বের করতে চাইছিল না। এর উপর ছিল দাক্ষিণাত্যে লড়াই যার জন্য সম্রাটের নগদ টাকার প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় ইউরোপীয় বাণিজ্য চালু হলে পর, ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলী মখসুদাবাদে টাঁকশাল চালু করেন। ১৭০৫ সালের পর থেকে দেখা যায় যে মুদ্রা ঘাটতি অনেকটা কমে গিয়েছে যার জন্য ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে রূপার আমদানী অনেকাংশে দায়ী।[৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা দেখব।

৩

টোডরমল্লর বন্দোবস্তে আমরা দেখি যে রাজস্ব ছিল ১, ০৬, ৯৩, ১৫২ কোটি টাকা।[৮] ১৭২১ সালে ইংরাজী দলিল থেকে পাওয়া যায় যে এই রাজস্ব বেড়ে হয়েছে আনুমানিক ১, ৪১, ০৯, ১৯৪ কোটি টাকা।[৯] অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ বছরে রাজস্ব ধীরে ধীরে বেড়েছে, যা ৩৫ লক্ষ টাকার নীচে। রাজস্ব বাড়ার গতির ব্যতিক্রম রয়েছে দুটি বছরে যখন রাজস্ব দ্রুত গতিতে বাড়ে। ১৭০২ সালে রাজস্ব বাড়ার পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার মতন এবং ১৭১১ সালে এটি বাড়ে সাতলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার মতন। উল্লেখযোগ্য যে প্রথমবার (১৭০২) মুর্শিদকুলী দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার (১৭১১) যখন মুর্শিদকুলী দেওয়ান পদে পুনঃর্নিযুক্ত হন। বলা যেতে পারে দেওয়ান এর পদ পাবার পর সম্ভবতঃ সম্রাটের নেকনজরে পড়ার জন্য তিনি এতটা বাড়িয়েছিলেন যা গড়পড়তা বার্ষিক বৃদ্ধির অনেক উপরে। উল্লেখযোগ্য যে ১৭০৫ সালে আজিমুদ্দীন চলে যাবার পর রাজস্ব সংগ্রহ কয়েক হাজার টাকা কমে গিয়েছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সুবাদার ও দেওয়ান

একযোগে কাজ করেছিলেন। আরো বোঝা যায় যে ইউরোপীয় বণিকরা যে ধরনের অত্যাচারের কথা বলছেন রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে, ঐ ধরনের অত্যাচার অন্ততঃ ইংরাজী দলিল এর হিসাব থেকে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুবাদার শাহসুজার রাজত্বের সময়ের রাজস্ব যদি ১, ৩১, ১৫, ৯০৭ কোটি টাকা বলে ধরা যায়,[১০] তাহলে বলা যাবে যে শোভাসিংহ-এর বিদ্রোহের ফলে যে আর্থিক বিপর্যয় এসেছিল, মুর্শিদকুলী তার থেকে সুবা বাংলাকে বের করার চেষ্টা করেছেন অত্যধিক চাপ না দিয়ে।

১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী ***কামিল জমা তুমারী*** বা নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। নূতন নূতন আর্থিক একক তৈরী করা হয়। যার সংখ্যা শাহসুজার সময়ের থেকে ২৫০ একক বেশী। একটা কারণ ছিল অবশ্য যে মেদিনীপুরকে বাংলার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। নূতন একক ***চাকলা*** শুরু করা হয় যা অন্যান্য প্রদেশে আগেই চালু করা হয়েছিল।[১১] নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মনে করেছেন যে ***সরকার*** কে বাতিল করে ***চাকলা*** করা হল, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এই বর্দ্ধিত নূতন একক করা থেকে মনে করা যেতে পারে যে উন্নত সংগ্রহের জন্য মুর্শিদকুলী বড় একক ভেঙে ছোট একক করেছিলেন। জমিদারী ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবার এটা দেখব।

সাধারণতঃ মুর্শিদকুলীকে দোষারোপ করা হয় যে তিনি জমিদারদের উপর নূতন কর চাপিয়েছিলেন - ***আবওয়াবি খাসনবিসী***। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেছেন যে এটাই ***নজরানার*** পরিবর্তে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ***নজরানা*** কোন কর নয়, এটা প্রথাগত উপঢৌকন। যার সঙ্গে নূতন করের কোন মিল নেই। ***নজরানার*** বন্ধ হয়ে যাবার কোন উল্লেখ নেই। প্রথম দিকে নূতন করের পরিমাণ ছিল ২, ৫৮, ৪৫৭ লক্ষ টাকা। মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দীন এটিকে ১৯ লক্ষ টাকাতে নিয়ে চলে যান। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী পাবার পর ইংরাজরা রাজস্বকে আড়াই কোটি টাকা করে, যদিও ইংরাজ ঐতিহাসিকরা সে সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকে মুর্শিদকুলীকে দোষারোপ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ ১৭২২ সালের পর খাজনা বাড়ে প্রায় এক কোটি তের লক্ষ টাকার মতন। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে মুর্শিদকুলীর রাজস্ব কত কম খাতে ধরা হয়েছিল। ওঁর জোর ছিল কড়া হাতে রাজস্ব সংগ্রহ করার দিকে, যার ফলে অত্যাচারের কাহিনী শুরু হতে থাকে।[১৪]

মুর্শিদকুলী প্রথম থেকে ***নগদ*** টাকা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ***নগদী*** সৈন্যদের মাহিনা দেওয়া হত নগদ টাকায় যার ফলে নগদ টাকার প্রয়োজন বেশী দেখা যায়। আর একটি কারণে নগদী সৈন্যদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্যা জটিল হয়ে যায়। মুর্শিদকুলী বাংলায় আসার আগে থেকেই বাংলার মনসবদারদের অন্য

প্রদেশে বদলী করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুর্শিদকুলী এই ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করেন যার ফলে মনসবদারদের সৈন্য (জায়গীরের খাজনা থেকে যাদের মাহিনা দেওয়া হত) বাংলায় কমে যায়। ঐ জমিগুলি সরকারী জমিতে রূপান্তরিত করা হয় (*খালিসা*)। জায়গীর জমি কমিয়ে ওগুলিকে খালিসাতে রূপান্তরিত করা অন্য প্রদেশেও হচ্ছিল আওরংজেবের নীতি অনুযায়ী।[১৫] বলা বাহুল্য বাংলাতে এই কাজ একবছরে হয়নি - মুর্শিদকুলী ১৭১১ সালে ফিরে এসে কাজটি সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু সমস্যা শুরু হয়ে যায় এদের মাহিনা দেবার ব্যাপার নিয়ে, যেখানে নগদ টাকার প্রয়োজন। এর ফলে নগদী সৈন্যরা মাহিনা না পেয়ে মুর্শিদকুলীকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণকে গোলাম হোসেন তাবাতাবাই'র[১৬] রচনা অনুযায়ী বর্তমান ঐতিহাসিকরা ধরেছেন যে আসল পরিকল্পনা ছিল যুবরাজ আজিমুদ্দীনের।[১৭] বলা হয়েছে যে এর পরে মুর্শিদকুলী মখসুদাবাদে দেওয়ানী দপ্তর নিয়ে যান এবং পরবর্তী কালে এর নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

দুটি ধারণাই অমূলক ও ইতিহাস সম্মত নয়। আগেই বলা হয়েছে যে সুবাদার ও দেওয়ান হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন। সমকালীন ইউরোপীয় চিঠিপত্রে এদের মধ্যে বিরোধের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যার ইঙ্গিত সপ্তদশ শতকের শেষ দিকের সুবাদার ইব্রাহিম খান ও তাঁর দেওয়ানের মধ্যেকার বিরোধ নিয়ে পাওয়া যায়। এমন কি ১৭০৪ সালে সুবাদার আজিমুদ্দীন সম্রাটের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন মুর্শিদকুলীকে সম্মানিত করার জন্য এবং সম্রাট সেই সুপারিশ মেনেও ছিলেন।[১৮]

বলা প্রয়োজন যে মুর্শিদকুলী বাংলায় আসার আগেই একটা দেওয়ানী দপ্তর মখসুদাবাদে ছিল। স্থানাভাবে বিশদ আলোচনা না করে বলা যায় যে দেওয়ান কাফায়েৎ খান ১৬৯৬ সালে ফরাসীদের যে পরোয়ানা দেন, সেটি মখসুদাবাদ থেকেই দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ দেওয়ান তখন ঐখানে ছিলেন।[১৯] মুর্শিদাবাদ নাম পরিবর্তন করা হয় সম্ভবতঃ ১৭১৭ সালের পর যখন মুর্শিদকুলী সুবাদার নিযুক্ত হন। ঐ সময়ই রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আরো মনে রাখা দরকার যে নগদী সৈন্যদের মাহিনা দেবার সমস্যা শুধু মুর্শিদকুলীর সময়ে ছিল তা নয়। ১৭১০ সালে দেওয়ান জিয়াউল্লাখান নগদী সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারান।[২০] সুতরাং এটি শুধু দুটি ব্যক্তির বিরোধ নয়। যদুনাথ সরকার বলেছেন যে সব জায়গীরই বাংলা থেকে সরে গিয়েছিল। এটিও ঠিক নয় নিজামত ও দেওয়ানী জায়গীরগুলি রয়ে যায়। নবাবের ও তাঁর পরিবার বর্গের জায়গীর ছাড়াও ***দেবোত্তর*** ও ***মাদাদ-ই মাস*** জায়গীর ছিল।[২১]

৪

সপ্তদশ শতকের শেষ বিদ্রোহের পর কর সংগ্রহ কমে যায় ও সংগ্রহ কারক আমিনরা খাজনা আত্মসাৎ করতে থাকে। যেটি মুর্শিদকুলী - আওরংজেবের পত্রালাপের

মধ্যে পাওয়া যায়। ফলে কর সংগ্রহকারকদের সম্পর্কে মুর্শিদকুলী কঠোর হয়েছিলেন যার কথা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলে গিয়েছেন। কঠিন শাস্তি দেওয়া হত তার কথাও বলেছেন।[২২]

আর একটি কর সংগ্রহকারক গোষ্ঠী ছিল জমিদাররা। মনে হয় এরা তিনজন ছাড়া প্রায় সকলেই ছিল *মালগুজারী, খিদমৎকারী* নয়। বিষ্ণুপুর, পাচেৎ ও বীরভুম এর জমিদাররা ছিলেন *পেশকাশি*[২৩] *মালগুজারী* জমিদাররা নিয়ম অনুযায়ী খাজনা দিতেন। মনে হয় মুর্শিদকুলী এদের সঙ্গে চুক্তিপত্র করেন, যেটির মূল ছিল পয়লা বৈশাখের দিন সম্পূর্ণ খাজনা জমা দেবার অঙ্গীকার। মনে হয় এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না এবং কর না দিলে নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তবে জমিদার জমিদারী হারিয়েছেন এর কোন দৃষ্টান্ত নেই কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া।[২৪] যে কারণে এটি জমিদারদের অপছন্দ হয়েছিল, সেটি মনে হয় মুর্শিদকুলীর জোর করা যে নিয়ম বেঁধে জমিদাররা কর আদায় করবেন। অর্থাৎ জমিদারদের খাজনার অংশ রাখবেন সেটা ঠিক করা হয়েছিল, যদিও নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় যেখানে জাবতি প্রথা চালু ছিল, সেখানেই এই ধরনের নিয়ম বলবৎ ছিল। মুর্শিদকুলী ঐ সাবেকী প্রথা মেনে চলার উপর জোর দিয়েছেন। ততদিনে সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় জমিদারদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বাংলায় এই সময়ে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

এখানে সংক্ষেপে দুটি মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। যদুনাথ সরকার ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ দুজনেই বলেছেন যে মুর্শিদকুলী বাংলায় কয়েকটি বড় জমিদারী তৈরী করেছিলেন কর সংগ্রহ সহজ করার জন্য।[২৫] এ মতটি সম্পূর্ণভাবে মানা যায় না। রাজশাহী ছাড়া, বাকী বড় জমিদারীগুলি আগেই ছিল। যদুনাথ সরকার আরো বলেছেন যে মুর্শিদকুলী বেশীমাত্রায় *ইজারা* চালু করেন যার ফলে পুরানো হিন্দু জমিদার ও অভিজাত বংশগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।[২৬] আওরংজেব-মুর্শিদকুলী *ইজারা* দেবার ব্যাপারে রায়তরা অত্যাচারের মুখে পড়বে। এ কথা সম্রাট বললে মুর্শিদকুলী জানান যে তিনি পুরানো মুঘল প্রথা অনুযায়ী *ইজারা* দিচ্ছেন।[২৭] যদিও বিশদ তথ্য নেই, তাহলেও বলা যায় যে জমিদারকে সরিয়ে ইজারাদারের হাতে খাজনা তোলার ভার দিলে, সাবেকী মুঘল প্রথা অনুযায়ী জমিদাররা তাঁদের যে প্রাপ্য অর্থাৎ *হক* সেটি পেতেন। এককথায় এটিকে বলা হত *সির*। জমিদারের আয় কিছুটা কমে গেলেও, তার সামাজিক মর্যাদার হানি হত না। সুতরাং এই কারণে জমিদার বংশগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এটা মানা যায় না। তাদের ধ্বংস হবার পিছনে আভ্যন্তরীণ কলহ বেশি ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নদীয়ার দুই ভাই এর লড়াই থেকে। মুর্শিদকুলী সৈন্য নিয়ে এক ভাইকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারী বিভাজনের বিপক্ষে ছিলেন।[২৮]

আরেকটি সাম্প্রতিক মত আছে যে মুর্শিদকুলী হিন্দু জমিদারদের বিপক্ষে ছিলেন। যদুনাথ সরকার এই মতের স্বপক্ষে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। গোলাম হোসেন বলেছেন যে বীরভূম এর জমিদার আসাদুল্লা খানকে মুর্শিদকুলী নানারকম সুবিধা দিয়েছিলেন। কারণ আসাদুল্লা অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। এছাড়া, মুর্শিদকুলী সীতারাম রায়কে হত্যা করেন। নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণরাম রায়কে কারারুদ্ধ করেন ও দর্পনারায়ণ কানুনগো সই দিতে অস্বীকার করায় না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেন।[২৯] এগুলি সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়।

আগেই আমরা দেখেছি যে তিনটি প্রান্তিক জমিদারী ছিল **পেশকাশি** অর্থাৎ তারা শুধু উপঢৌকন দিত। এদের মধ্যে ছিল দুটি হিন্দু জমিদারী, যাদের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। আসাদউল্লা এই ধরনের **পেশকাশি** জমিদার ছিলেন। সীতারাম রায়ের বিদ্রোহ, ফৌজদারকে হত্যা ইত্যাদি এখন জানা। তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল বিদ্রোহী হিসাবে সাবেকী মুঘল প্রথা অনুযায়ী। তবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল কিনা এরকম কোন প্রমাণ নেই। বরঞ্চ দেখা যায় যে তার ছেলেরা পুরাণো জমিদারীর মূল অংশ ফিরে পেয়েছেন।[৩০] দর্পনারায়ণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন মুর্শিদকুলী এবং সমকালীন ইংরাজদের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মুর্শিদকুলীর উপর তাঁর বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। ওঁর মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিল।[৩১] নদীয়ার জমিদার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন কর না দেবার কারণে। আসলে মুর্শিদকুলীর আমলে নদীয়ার জমিদারী বৃদ্ধি পায়, যে কথা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে বাংলার রাজস্ব বিভাগে বাঙালী হিন্দুরা উচ্চপদ পেতে শুরু করেন মুর্শিদকুলীর সময় থেকেই।[৩৩] সুতরাং তিনি হিন্দুদের বিপক্ষে ছিলেন, এটা ভাবাটা অমূলক।

আবদুল করীম অভিযোগ করেছেন যে মুর্শিদকুলী জগৎশেঠকে স্বাধীনতা ও প্রশয় দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন।[৩৪] মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর ফরাসী কোম্পানীর আধিকারিক দুপ্লেকসের চিঠি থেকে জগৎশেঠের প্রচন্ড প্রভাবের কথা জানা যায়।[৩৫] আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুর্শিদকুলী মুঘল সাবেকী প্রথা অনুযায়ী বাণিজ্য ও ব্যবসার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন নি। উনি বণিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রথমদিকে নগদ টাকা সংগ্রহ করলেও, পরবর্তীকালে তাদের কাজকর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে কোন বিশেষ অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি সম্রাটের *ফারমাণ* (১৭১৭) সত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানী বাড়তি জমি বা টাঁকশালের সুবিধা পায় নি।[৩৬] কিন্তু ফরাসী কোম্পানীকে কাজকর্ম নিয়মিতভাবে চালানোর জন্য *পরওয়ানা* দিয়েছিলেন।[৩৭] অর্থাৎ সম্রাট আওরংজেবের সময়ে যে নীতি ছিল, বিদেশী কোম্পানী, দেশী বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি সেই নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এই সময়ে সারা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে জমিদারী বিস্তারের যুগ। *রিসালা-ই জিরাত* (১৭৫০) থেকে জানা যায় যে নূতন করে জরীপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় নি।[৩৮] এর ফলে এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমিদাররা অনেক বেশী কর সংগ্রহ করেছিল। মুর্শিদকুলী এই বেনিয়মী আয় বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু অধিকাংশ জমিদারই ছিল হিন্দু, সুতরাং মুর্শিদকুলী হিন্দুবিরোধী ছিলেন, এই ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাঁর সামগ্রিক রাজস্ব নীতি বিচার করলে বোঝা যায় যে এই ধারণা অমূলক। মনে রাখতে হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরাজ আমলারা অধিকাংশ জমিদারদের সমর্থন পাবার জন্য এই ধারণা ছড়িয়েছিলেন, যার থেকে বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরাও বাদ যান নি।

এই ধরনের মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়। গোলাম হোসেন বলেছেন যে মুর্শিদকুলী পুরানো প্রথার বদল করতে চেষ্টা করেছিলেন।[৩৯] আমরা দেখেছি যে মুর্শিদকুলী বরঞ্চ আওরংজেবী প্রথার মধ্যে ফিরে যেতে চাইছিলেন। ধর্মান্ধ উলেমাদের হিন্দু বিদ্বেষ, ইংরাজদের সুপরিকল্পিত প্রচার ও প্রাক-স্বাধীনতার কালে ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস লেখার ঝোঁকের ফলে এই রকম ধারণা গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার আগে যদুনাথ সরকারের লেখা থেকে মুর্শিদকুলীর সময়ে বাংলার যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা হয়েছিল, সেটা বলা হতে থাকে। আবদুল করীম এর বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এখানে সাম্প্রতিক বিতর্কের আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু নূতন করে মুর্শিদকুলীর সামগ্রিক নীতি ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। এটি তার মুখবন্ধ মাত্র।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত), ***হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল***, ১৯৭২, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮) পৃঃ ৩৯৭-৪২১ (অধ্যায়টি যদুনাথ সরকারের লেখা) (এখানে শুধু *সরকার*), আবদুল করীম, ***মুর্শিদকুলী খান এ্যান্ড হিস টাইমস***, ঢাকা, ১৯৬৩ (এখানে শুধু *করীম*), নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ***ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল***, কলিকাতা, ১৯৬৮, তিন খন্ড, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬২), খন্ড ৩, পৃঃ ১-২২ (এখানে শুধু *সিংহ*)।

২) জীবনীপঞ্জিকার জন্য, *সরকার*, পৃঃ ৩৯৮-৯৯, আজিমুদ্দীনের সঙ্গে বিরোধ, *ঐ*, পৃঃ ৪০২-৪০৫। *করীমও* এটি মেনে নিয়েছেন যে দুজনের মধ্যে গোলমালের ফলে মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদে চলে যান (পৃঃ ১৯-২২)।

৩) অনিরুদ্ধ রায়ের প্রবন্ধ, "ফরাসীদের চোখে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলা", ***ইতিহাস অনুসন্ধান***, খন্ড ১০, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬১-২৬৬।

৪) এ বিষয়ে ***করীমের*** আলোচনা দেখুন (পৃ: ৯১-৯৩)। ***করীমের*** বক্তব্য মুর্শিদকুলী রাজস্ব নিয়মের মধ্য থেকেই ***ইজারা*** প্রথা চালু করেছিলেন।

৫) অনিরুদ্ধ রায়, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ: ২৬২-২৬৫।

৬) পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দেখুন, অনিরুদ্ধ রায়, ***এ্যাডভেঞ্চারার্স, ল্যান্ডওনার্স এ্যান্ড রেবেলস,*** নিউ দিল্লী, ১৯৯৮, পৃ: ১১৪-১৭৪।

৭) অনিরুদ্ধ রায়, প্রবন্ধ, ***প্রাগুক্ত,*** পৃ: ২৬৪-২৬৫।

৮) আবুল ফজল, ***আইন-ই আকবরী,*** (অনুবাদ জ্যারেট, পরিমার্জিত যদুনাথ সরকার), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, তিন খন্ড একত্রে, ১৯৯৩ পুনঃমুদ্রণ। দ্বিতীয় খন্ড, পৃ· ১৪১। আবুল ফজল ধরেছেন ১, ৪৯, ০৬১, ৪৮২-১৫-৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে উড়িষ্যার খাজনাও রয়েছে।

৯) বিস্তারিত আলোচনার জন্য, দেখুন ***করীম,*** পৃ: ৮০-৮২। বিভিন্ন দলিলে মোট খাজনার (*জমা*) কিছু হেবফের আছে। জেমস গ্রান্ট এর বক্তব্য ড. কে. ফারমিঙ্গার এর ***ফিফথ রিপোর্টে,*** দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, ১৯১৭ তে পাওয়া যাবে, ***সিংহ,*** পৃ: ৩।

১০) এটি গ্রান্টের হিসাব, যা ***করীম*** মেনে নিয়েছেন (পৃ· ৮১)।

১১) ঐ, পৃ: ৮৪-৮৫।

১২) ***সিংহ,*** পৃ: ১৬-১৭।

১৩) সিংহ, পৃ: ৫।

১৪) বিস্তৃত আলোচনার জন্য, ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৫) ১৭০০ সালের ১৫ই ফেব্রয়ারী. ফরাসী বণিক ফ্রাসোয়া মার্তা একটি বড় প্রতিবেদনে জায়গীর বদলানোর কথা বলেছেন (***আর্চিভ ন্যাসিওনাল ও কলোনিয়াল,*** প্যারিস, কলোনী সি (২), ৬৫, ফোলিও ৪৯-৬৫। গোলাম হোসেন বলছেন যে খালসা জমি বাংলাতে কম থাকার জন্য সুবার রাজস্ব থেকে নগদী সৈন্যদের বেতন দেওয়া সম্ভব হত না (***রিয়াজ-উস-সালাতিন*** এর বঙ্গানুবাদ ***বাংলার ইতিহাস,*** ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৯২)।

১৬) *গোলাম হোসেন.* পৃ: ১৯৩-৯৪।

১৭) *সরকার,* ৪০২-৮০৫, ***করীম,*** ১৯-২০।

১৮) ***করীম,*** ২৩।

১৯) ***বিবলিওথেক ন্যাসিওনাল*** (প্যারিস), নং ন. আ. ৯৩৬৭। ফোলিও ২৩।

২০) ***সরকার,*** ৪০৫।

২১) গোলাম হোসেন, ***প্রাগুক্ত,*** ১৯৩।

২২) ঐ, ১৯৭-২০০।

২৩) ***করীম,*** ৭৬-৭৮।

২৪) ঐ, ৯২। করীম বলেছেন যে কয়েকটি ছোট জমিদার জমিদারী হারিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রান্ট যে বড় জমিদারগুলির পারিবারিক ইতিহাস দিয়েছেন, সেটি উনি মেনে নেন নি। সরকার সলীমুল্লার (***তারিখ-ই বাংলা,*** ১৭৬৩-তে লেখা) উপর নির্ভর করে পুণ্যাহ বা খাজনা দেবার শেষ দিনের বর্ণনা দিয়েছেন (পৃ: ৪১০-৪১১)।

২৫) ***সরকার,*** ৪১০-১১; ***সিংহ*** ১৩-১৪।

২৬) *সরকার*, ৪০৯-১০।

২৭) *ঐ*, ৪১১।

২৮) কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী* (মোহিত রায় সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৮৬, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭) পৃ: ২০-২২। রামকৃষ্ণ ও রামজীবনের মধ্যে সংঘর্ষের ও মুর্শিদকুলীর যোগদানের কথা সমকালীন ফরাসী চিঠিতে দেখা যায়। এর পরই রামজীবনের জমিদারীর প্রসার হয়।

২৯) *সরকার*, ৪০৯-১২।

৩০) অনিরুদ্ধ রায়, এ্যাডভেনচার, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৭৫-১৮৬।

৩১) এটি প্রথম বলেন সলীমুল্লা ও জেমস স্টুয়ার্ট এটি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন, এটা যে কতদূর অসত্য, সেটি সমকালীন ইংরাজী দলিল থেকে *করীম* দেখিয়েছেন (পৃ: ৬৭-৬৮)।

৩২) *করীম*, পৃ: ২১৮। রামজীবনের সাহায্যে তার ভাই রঘুনন্দন রাজশাহী, ভুষণা ও মুর্শিদাবাদ সরকারে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারী পান।

৩৩) *সরকার*, ৪১০।

৩৪) *করীম*, পৃ: ৯৮-১০১।

৩৫) এ. মার্তিনো, *দুপ্লেক্স এ ল্যান্ড ফ্রাঁসেজ*, প্যারিস, ১৯২৯ (ফরাসী)।

৩৬) *করীম*, পৃ: ১৪৩ ও পর।

৩৭) ফরুখসিয়ার ১৭১৯ সালে *ফর্মান* দেন ফরাসীদের। এর পরে জাফর খান সম্রাট মুহম্মদ শাহর তৃতীয় বছরে (১১২৭ হেজিরা) একটা *পরওয়ানা* দেন (*আর্চিভ ন্যাশিওনাল ও কলোনিয়াল*, ফ্রান্স, কলোনি সি (২), ১১৫, ফোলিও ২৫-২৮)।

৩৮) সলীমুল্লার উপর ভিত্তি করে *করীম* বলছেন যে জরীপ করা হয়েছিল। যার উপর ভিত্তি করে *ইজারা* দেওয়া হত; যাকে বলা হত *মাল-জমিনী* (পৃ: ৮০ ওপর)। এটা মেনে নিলে রায়তয়ারী ব্যবস্থা চালু ছিল বলা যায়।

৩৯) গোলাম হোসেন এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলেন নি কিন্তু প্রধানত: সলীমুল্লার উপর নির্ভর করে মুর্শিদকুলীর রাজস্ব'র যা বর্ণনা দিয়েছেন (পৃ: ১৯৬ ও পর) যার মানে এই দাঁড়ায়।

শোভা সিংহ ও সমকালীন নথিপত্র

প্রণব রায়

শোভা সিংহ ও তার বিদ্রোহ নিয়ে সমকালীন ইংরেজ ও ফরাসীদের সুতানুটি ও চন্দননগর কুঠির যে সব চিঠিপত্র লন্ডন ও প্যারিসের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, তা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য শোভা সিংহ, তাঁর বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারা গেছে। সৌভাগ্যক্রমে, সে সব নথি প্যারিসের 'বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল' ও লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি'তে সযত্নে রক্ষিত আছে।[১] লক্ষণীয়, বিদেশী বাণিজ্যকুঠির বণিকরা শোভা সিংহের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তাদের বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট স্বার্থের বিষয় নিয়ে এসব চিঠি লিখেছিলেন তাদের ওপরওয়ালাকে।[২] মূলতঃ এগুলি বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও সেসময় শোভা সিংহের বিদ্রোহ তাদের সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সতেরো শতকের শেষদিকে হুগলী ও সুতানুটিতে যে তিনটি বিদেশী কোম্পানি তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল, তারা হ'ল, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ (ডাচ)। ভাগীরথীর তীরে যথাক্রমে হুগলী, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ইংরেজরা পরে হুগলী থেকে সুতানুটিতে তাদের কুঠি পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত করে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের তরঙ্গ এদের সকলকেই কমবেশী স্পর্শ করেছিল। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক কারণে ঐসব বিদেশী কোম্পানি তাদের বাণিজ্যস্বার্থ যাতে কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেকারণে কতকটা নবাব ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিরপেক্ষতার ভাণ করে চলেছিল। অবাধে ব্যবসা চালাবার জন্য তারা এমন ভাব দেখাত যে, নবাবপক্ষ যেন মনে করে তারা নবাবেরই সমর্থক, আবার বিদ্রোহীরাও যাতে ভাবে যে তারা তাদেরই সমর্থক।[৩] ১৬৯৫ সালের মাঝামাঝি সময় সম্ভবতঃ জুন মাস নাগাদ শোভা সিংহ ঘাটালের বরদা থেকে যুদ্ধযাত্রা ক'রে প্রথমে বর্ধমানের জমিদার চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের পঁচিশজন সদস্যকে নিহত করেন।[৪] ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী একটা বিশাল অঞ্চল শোভা সিংহের করতলগত হয়। মুকসুদাবাদে অভিযান চালিয়ে সেখানেও তিনি জয়লাভ করেন। এর ফলে শোভা সিংহ ও তাঁর বিদ্রোহী বাহিনী প্রায় অর্ধেক বাংলার অধিকারী হয়ে ওঠেন। প্রচুর অর্থ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ, তাঁর ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ এবং মুঘল বাহিনীর কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ না থাকায় বিদ্রোহী বাহিনী খুবই পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। একসময় নবাবের তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় অভিযানের জন্যেও তারা উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আনুমানিক ১৬৯৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ শোভা সিংহের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায়[৫] বিদ্রোহ কিছুটা ভাটা পড়লেও শোভা সিংহের কাকা মহা সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরও বিশাল আকার ধারণ করে।[৬] পাঠান দলপতি রহিম খাঁ ও বহু পাঠান সেনা বিদ্রোহীবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাকে পুষ্ট করে তোলে। ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ ও হত্যা চলতে থাকায় সর্বত্র একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। একসময় এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয় যে বিদেশীদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হ'তে থাকে যে, শোভা সিংহ বা তার উত্তরাধিকারী মহাসিংহ ও বিদ্রোহী সেনার হাতে নবাবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং তারা যে কোন সময় বাংলার সিংহাসন অধিকার করতে পারে।[৭] সেকারণে অনেক সময় তারা বিদ্রোহীদের সহায়তা করেই চলেছিল যাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহীরা ক্ষমতায় এলে তাদের অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের কোনরকম ক্ষতি না হয়।

এদিকে বিদ্রোহীরা সুতানুটি থেকে মুকসুদাবাদ পর্যন্ত একটা মুক্তাঞ্চলের অধিকারী হয়ে হুগলী নদীর ওপর কড়া নজরদারীর ব্যবস্থা করে এবং বিদেশীদের বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের ওপর 'লেভি' ধার্য ক'রে অর্থসংগ্রহ ক'রতে থাকে।[৮] ভাগীরথীর পশ্চিমের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিবাসীদের ওপর কর ধার্য করে তারা ষাট লক্ষ টাকা[৯] ও আরও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। স্থানীয় অনেক ছোটখাটো জমিদার, যোদ্ধা, সেনা, জনসাধারণ তাদের সমর্থন করতে থাকে এবং দলে যোগ দেয়। এই ভাবে পরাক্রান্ত বিদ্রোহী বাহিনীকে প্রতিহত করার মতো কোন শক্তি আপাততঃ সেসময় না থাকায় বিদ্রোহীরা তাদের অভিযান ও আক্রমণ আরও কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়।

শোভা সিংহ ও তাঁর অনুগামীদের এই বিদ্রোহ ও আধিপত্য ১৬৯৫ সালের জুন থেকে ১৬৯৮ বা তার কিছুকাল পরেও চলেছিল। এই সময়টা ছিল ভারতের ইতিহাসের এক ক্রান্তি কাল। বৃদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে ব্যতিব্যস্ত থাকার সুবাদে বাংলা রাজ্যে স্বাধীনচেতা জমিদারদের অভ্যুদয়ের চেষ্টা, শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁয়ের নিশ্চেষ্টতা (যা অনেকটা নবাব দেওয়ানের অন্তঃকলহ বলে কেউ কেউ মনে করেন যা অনেকটা গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়), ফৌজদারের যুদ্ধদ্যোগের বদলে অর্থসংগ্রহের জন্য অতিমাত্র লিপ্সা, মুঘল সেনাদের যুদ্ধবিদ্যায় অসারদর্শিতা প্রভৃতি কারণরূপে উপস্থিত করা যেতে পারে, যদিও এ বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ আছে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে কামান গোলাগুলি থাকলেও তারা সেগুলি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নি,

একমাত্র ওলন্দাজরা ছাড়া। তারা একবার নবাবের আদেশে হুগলী থেকে বিদ্রোহীদের সরিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ নিরুপায় নবাব বিদেশীদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগসুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন যাতে তাবা প্রয়োজনে নবাবকে সাহায্য করে। সেই সুযোগে ইংরেজরা সুতানুটীতে দুর্গ তৈরী করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় এই ভাবে তাদের দুর্গ সুরক্ষিত করে।[১০] বিদেশী শক্তির ভিত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজুহাতটা ছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

আনুমানিক ১৬৯৬ সালের জুন মাস নাগাদ শোভা সিংহের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর কাকা মহাসিংহ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। মহা সিংহ প্রচন্ড লুঠপাট ও অত্যাচার শুরু করেন। সমকালীন কবি সীতরাম দাস তাঁর 'ধর্মমঙ্গলে' (আঃ রচনাকাল ১৬৯৮-৯৯) একথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা আছে তিনি কবির স্বগ্রাম সাহাপুর লুঠ করেন।[১১] রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'য় মহাসিংহের উল্লেখ আছে।[১২] আনুমানিক ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত যাদবরামনাথের 'ধর্মমঙ্গলে' বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম ও সম্ভবতঃ তাঁর ভাই বলরাম রায়ের মৃত্যু ও রাজপুরীর সর্বত্র অরাজকতার উল্লেখ থাকলেও শোভা সিংহ বা মহা সিংহকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, তার কোন উল্লেখ নেই।[১৩] শোভা সিংহ সম্ভবতঃ তখনও জীবিত ছিলেন।

শোভা সিংহের ভাই ছিলেন হিম্মৎ সিংহ। কিন্তু শোভা সিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব মহা সিংহের হাতে পড়ে। শোভা সিংহ তাঁর বাহিনীতে পাঠানদেব অন্তর্ভুক্ত করেন। পাঠান সেনাদের সংখ্যা বিদ্রোহীবাহিনীতে ক্রমশ বাড়তে থাকে।[১৪] মহা সিংহের নেতৃত্বে পাঠানরা আরও বেশি সংখ্যায় যোগ দেয়। নানা স্থানে লুঠপাট চলতে থাকে। বিদ্রোহী বাহিনীর একের পর এক জয়লাভের ফলে বিব্রত ঔরঙ্গজেব নবাবের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে পাঠালেন। জবরদস্ত খাঁয়ের সামরিক নৈপুণ্যে ও বীরত্বে বিদ্রোহীরা অনেকটা পিছু হটেছিল। জবরদস্ত বিদ্রোহীদের নির্মূল করার জন্যে যখন উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, সেসময় বাদশাহের পৌত্র আজিমুশ্বান বর্ধমানে পৌঁছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠান। ১৬৯৭ এর নভেম্বরে আজিমুশ্বান বর্ধমানে আসেন।[১৫] তাঁকে বিহার ও বাংলার নবাব ক'রে পাঠানো হয়। নবাবের প্রস্তাবে জবরদস্ত কিছুটা বিস্মিত হলেও তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হয়। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি খুবই অপমানিত বোধ করেন[১৬] এবং সামরিক তৎপরতা পরিত্যাগ ক'বে অন্যত্র গমন করেন। এই সুযোগে বিদ্রোহীরা আবার পরাক্রান্ত হয়ে উঠলে তিনি তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি ক'রে বিদ্রোহকে কতকটা শান্ত করেন। কিন্তু পরে পাঠান দলপতি রহিম খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি প্রতিশোধগ্রহণের জন্যে যে যুদ্ধ করেন, তার

ফলে চন্দ্রকোণায় এক তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে রহিম খাঁ এবং সম্ভবতঃ মহা সিংহ নিহত হন।[১৭] সময় ১৬৯৮ সাল। ঐসময়ে চন্দননগরের ফরাসীকুঠি থেকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে একথা জানা যায়।

বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেলেও চন্দ্রকোণা এবং চেতুয়াবরদা অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতার সৃষ্টি হয়। হিম্মৎ সিংহ তখনও জীবিত ছিলেন। আজিমুশ্বান তদানীন্তন মুঘলপ্রথা অনুযায়ী তাঁর জায়গীর ফেরৎ দেন। হিম্মৎ তারপর বেশ কিছুকাল ঐ অঞ্চল শাসন করেন।

শোভা সিংহ ও তাঁর বিদ্রোহ নিয়ে সমকালীন যেসব নথিপত্র পূর্বোক্ত ইংরেজ ও ফরাসীদের কুঠি থেকে লন্ডন ও প্যারিসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, সেগুলি পর্যালোচনা ক'রে অনিরুদ্ধ রায় শোভা সিংহের বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নতুন ও মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন।[১৮] ইংরেজদের চিঠিপত্র 'সুতানুটির চিঠি' যা মাদ্রাজের 'ফোর্ট সেন্ট জর্জে' পাঠানো হয়েছিল। ১৬৯৬ এর জুন থেকে এইসব চিঠিতে শোভা সিংহ ও তাঁর বিদ্রোহের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আরও আকর্ষণীয় নথিপত্র চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়াল (ফ্যাক্টর) ফ্রাঁসোয়া মার্তোঁর চিঠি ও প্রতিবেদন (মেমোয়ার্স)। এগুলি বিদ্রোহের সমকালীন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিরুদ্ধ রায় ঐ দু'রকমের চিঠি বা নথি থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি উপস্থিত করেছেন সেগুলি হ'ল ঃ

১) বিদ্রোহের সময় শোভা সিংহের বয়স ছিল ত্রিশ। তাহলে ১৬৬৫ নাগাদ তাঁর জন্মসাল ধরা যেতে পারে।[১৯]

২) বিদ্রোহ চলাকালীন অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। আনুমানিক ১৬৯৬ সালের জুন মাস।

৩) শোভা সিংহের মৃত্যু হয়েছিল উঁচু কোন বারান্দা বা ছাদ থেকে পড়ে যখন তিনি আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন।[২০]

৪) সলীমুল্লার উল্লিখিত বর্ধমান রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয় নি, এটা নিশ্চিত। কারণ, শোভা সিংহের বর্ধমান আক্রমণে একমাত্র কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ছাড়া তাঁর সমগ্র পরিবারই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সলীমুল্লার 'তারিখ-ই বাংলা' ঘটনার প্রায় আটষট্টি বছর পরে লিখিত। অতএব সমকালীন ফ্রাঁসোয়া মার্তোঁর স্মৃতিকথাই বেশি প্রমাণযোগ্য।

৫) অধ্যাপক রায় ঐসব নথিপত্র পর্যালোচনা ক'রে ইঙ্গিত দিয়েছেন, শোভা সিংহ ও তাঁর পূর্বপুরুষ বাইরে থেকে চেতুয়া-বরদা অঞ্চলে আসেন এবং একেবারে উচ্চবংশসম্ভূত না হলেও (যদিও বিদেশী কুঠিয়ালদের চিঠিতে

তাঁকে উচ্চবংশসম্ভূত বলা হয়েছে) তিনি বর্ধমানের চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায়ের মতো ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত ছিলেন। সম্ভবতঃ ফরাসী ও ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর পূর্বে বাণিজ্যিক সম্পর্কও থাকতে পারে।[২১]

৬) শোভা সিংহের এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক রায় ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর মত অনুসরণ করে বলেন, শুধুমাত্র শোভা সিংহ তাঁর ওপরওয়ালা জমিদার কৃষ্ণরামের কাছে জমির খাজনা বাকী পড়া বা খাজনা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ করেন নি, এর কারণ ছিল আরও অনেক গভীরে বা গোপনে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এর অন্যতম কারণ হ'তে পারে। এই ধরণের অভ্যুত্থান ছিল সুপরিকল্পিত।[২২]

৭) রায় মার্তাঁর চিঠি থেকে নিশ্চিত হয়েছেন যে, শোভা সিংহের পতনের পর তাঁর খুল্লতাত মহা সিংহই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং সেসময় বিদ্রোহ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। রহিম খাঁ ও পাঠানেরা এই বিদ্রোহে আরও বেশি ক'রে যোগ দেয়। স্বভাবতই শোভা সিংহের স্বল্পকাল স্থায়ী বিদ্রোহ অপেক্ষা মহা সিংহের বিদ্রোহ ছিল আরও ব্যাপক ও বিশাল।[২৩]

৮) রায় ১৬৯৭ সালের ১৯ মার্চ ও ২৫ মার্চের ইংরেজদের চিঠি থেকে দেখিয়েছেন যে শোভা সিং ১৬৯৬ এর কোন সময় মারা যান। কাজেই যুবরাজ আজিমুদ্দিনের (আজিমুশ্বান) 'আখবরাতে' (চিঠিপত্র) চন্দ্রকোণায় ১৬৯৮ এর শেষযুদ্ধে শোভাসিংকে তিনিই নিহত করেন বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। এ-সম্পর্কে এম. আত্হার আলির বক্তব্য যথার্থ বলে রায় মনে করেন।[২৪]

৯) রায়ের অনুমান, চন্দ্রকোণার যুদ্ধে যুবরাজের হাতে যিনি নিহত হন, তিনি ছিলেন মহাসিংহ। আত্হার আলির মতে শোভা সিংহের মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রায়ও তাই মনে করেন।

উপরি উক্ত দুটি বিদেশী কোম্পানির চিঠি ও নথিপত্র থেকে অনিরুদ্ধ রায় যে সিদ্ধান্তগুলি করেছেন, তা অধিক যুক্তিসঙ্গত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, ইউরোপীয় এই দুটি কোম্পানির চিঠিপত্রগুলি সমকালীন ও গ্রহণযোগ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যে পূর্ণ। এগুলি কোন ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক ছিল না, বরং কোম্পানি দুটি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব এবং তদানীন্তন মুঘল শাসনের অন্তঃসারশূন্যতার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে কথারই ইঙ্গিত তাদের চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেকারণে, এগুলি শোভা সিংহ সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই নথিপত্র থেকে শুধুমাত্র শোভা সিংহ ও তার কাকা মহা সিংহের বিদ্রোহের কথা কিছুটা জানা গেলেও এদের সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানতে পারা যায় না। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের যিনি প্রধান হোতা, তাঁর বংশপরিচয়, অভ্যুদয়, ব্যক্তিগত জীবন, আয়ুষ্কাল প্রভৃতি সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। সম্ভবতঃ স্বল্প আয়ুই এর জন্যে দায়ী। (বিদ্রোহকালীন শোভা সিংহের যে বয়স ও দৈহিক বিবরণ মার্তাঁ ১৬৯৬ এর ১৫ জানুয়ারি তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন, তাতে জানা যায়, শোভা সিংহের বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বছরের মতো ছিল। তিনি ছিলেন সুদর্শন, গম্ভীর এবং সদ্‌বংশজাত। এই বর্ণনায় সন্দেহ করা চলে না। কারণ, শোভা সিংহের সঙ্গে ফরাসীদের সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো।[২৫] বরদার কাছাকাছি রাধানগরে ফরাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে এসেছিল এবং রেশম ও সুতিবস্ত্রের ব্যবসার জন্য কুঠি তৈরীও করেছিল) হুগলি ও বর্ধমান জয় করার পরও চন্দননগরে ফরাসীদের সঙ্গে শোভা সিংহের ভালো বোঝাপড়া ছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে বিদ্রোহী বাহিনী কোনরকম হস্তক্ষেপ করে নি।

ইংরেজ ও ফরাসীদের চিঠি ও নথিপত্রে শোভা ও মহাসিংহের নাম বার বার উল্লিখিত হলেও শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহের নাম কোথাও পাওয়া যায় না।[২৬] তাছাড়া চন্দ্রকোণার যুদ্ধে মহা সিংহের সঙ্গে রঘুনাথ সিংহও নিহত হন। সম্ভবতঃ তিনি 'ভান' বংশীয় চন্দ্রকোণার শেষ রাজা ছিলেন। এদের মৃত্যুর পর চেতুয়া-বরদার জমিদারী হিম্মৎ সিংহের যে দখলে চলে যায়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় চেতুয়া - বরদা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি ভূমিদান সনন্দ থেকে।[২৭] হিম্মৎ সিংহ প্রদত্ত সর্বপ্রথম সনন্দটি হোল ১৭০২ এবং সর্বশেষটি ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের। এর থেকে প্রমাণিত হয়, দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁনের দ্বারা এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও (যে কথা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর ১৭০৩-০৪ এর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন) চেতুয়া-বরদা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে মুঘলদের হস্তগত হয় নি। অন্ততঃ হিম্মৎ সিংহ যে ১৭৩০ পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিম্মৎ সিংহের ঐ সনন্দগুলির প্রসঙ্গে আসার আগে চেতুয়া-বরদায় শোভা সিংহের শাসন সম্পর্কে সামান্য যে কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি সে বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাধাকান্তপুরের (দাসপুর) গোপীনাথের 'একরত্ন' মন্দিরের সংস্কার কালীন এক দীর্ঘ লিপিতে[২৮] (১৮৪৪ খ্রীঃ/১২৫১ বঙ্গাব্দ) শোভা সিংহকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামদাসের সামান্য অপরাধে শোভা সিংহ তাঁর মুন্ডচ্ছেদ করেন। আবার দেববিগ্রহের সেবাপূজার জন্যে তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তিও দান করেছিলেন। বরদার বিশালাক্ষীর সেবায়েৎ পরিচালক ক্ষমানন্দ বড়ালকে তিনি ২১৫ বিঘা ৭ কাঠা জমি দান করেন। ১৬৮৫

খ্রীষ্টাব্দের একটি পিতলের পাট্টায় এই দান লিপিবদ্ধ হয়। বাংলা ১২০৯ সালের (ইং ১৮০২) ১২ ফাল্গুনের তায়দাদে (তায়দাদ নং ৩১৬৮, রেজিষ্টার নং ৮১৬) এর উল্লেখ আছে। এছাড়া ঘাটালের কাছাকাছি নিমতলার পরশুরাম গোস্বামী ব্রজবাসীকে শোভা সিংহ চোদ্দটি মৌজায় উনচল্লিশ বিঘা বারো কাঠা জমি দান করেন। তারও উল্লেখ পাওয়া যায় ১২০৯ সালের ৪৪২৬৭ নং তায়দাদে।

শোভা সিংহ বরদাগড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করার আগে থেকেই এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। সবকার মন্দারণের অন্তর্ভুক্ত এই স্থান সতের শতকের গোড়া থেকেই পরিচিত ছিল। সেসময় দলপৎ বা দলপতি নামে এক জমিদার এখানে রাজত্ব করতেন। দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'অভয়ামঙ্গল' পুঁথিতে এঁর উল্লেখ আছে।[২৯] সেখানে তাঁকে 'মহাতেজা' বলা হয়েছে। এছাড়া 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী ও বাহাকিস্তান-ই-ঘয়েবী' গ্রন্থে ঐ দলপৎকে নাবালক বলা হয়েছে।[৩০] তিনি এবং চন্দ্রকোণার চন্দ্রভান মুঘলদের বিরোধিতা করতেন। পরে বশ্যতা স্বীকার করেন। শোভা সিংহের আরও উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিজ হরিরামের 'অদ্রিজামঙ্গল' কাব্যের পুঁথিতে।[৩১]

শোভা সিংহের অভ্যুদয়ের আগে থেকেই বরদায় একটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ ছিল। ফান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) এই গড়ের অস্তিত্ব সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে। ঘাটাল শহর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ঐতিহাসিক গড়টি 'শোভা সিংহের গড়' নামে পরিচিত। গড়ের সীমা চিহ্নিত হয়েছে এইভাবে- ভিতরগড় ও বাহিরগড়। বাহিরগড় দুটি - দ্বিতীয় ও তৃতীয়গড়। ভিতরগড়ে শোভা সিংহের প্রাসাদ, অন্তঃপুর, 'জলহরি' দেবালয় প্রভৃতি ছিল। বর্তমানে তার আর কোন চিহ্নই নেই। দ্বিতীয়গড়ে একসময় লোকালয়, সেনানিবাস প্রভৃতি ছিল। ভিতর ও দ্বিতীয় গড় বর্তমান অজবনগর মৌজার অন্তর্গত। দ্বিতীয়গড়ে বিশাল দীঘিটি হ'ল, 'রাধাসাগর' (এখানে পাথরে বাঁধানো শোভা সিংহের আমলের ঘাট এখনও বর্তমান)। ভিতর ও বাহিরগড় চওড়া পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত।[৩২] তৃতীয়গড়ের এলাকা আরও বিশাল - রথিপুর, অজবনগর, শিবপুর ও রানীরবাজার গ্রামগুলির মধ্যে এর ব্যাপ্তি। বর্তমান পাকা রাস্তার ডান পাশ দিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থিতি ছিল। এখানে আছে বিরাট কয়েকটি দীঘি - রণসায়র, পালদীঘি, সিংসায়র, চন্দ্রার দীঘি, নারায়ণদীঘি, কাত্রজকাটা দীঘি। ভিতর ও বাহির গড়ের পরিখার চারপাশে উঁচু মাটির বাঁধ একসময় দুর্ভেদ্য লতাগুল্ম ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং প্রতি কোণে ছিল উঁচু টিলা। সেখান থেকে সেনারা দূরে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করত। শোভা সিংহের কুলদেবী বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল আগে ভিতরগড়ে। পরে তা বাইরে স্থানান্তরিত হয়। (বর্তমানে দ্বিতীয় ও তৃতীয়গড়ের সংযোগস্থলে পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত)।[৩৩] শোভা সিংহ এই গড় থেকে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন এবং 'দারির জাঙ্গাল' নামে এক সুপ্রাচীন সড়ক দিয়ে গড় মান্দারণ হয়ে বর্ধমান অভিযান করেন। ঐ উচ্চ পথটির কিছু অংশ এখনও খড়ারের কাছাকাছি সুলতানপুরে (ঘাটাল থানা), 'দলকার জলা'য় লক্ষ্য করা গেছে।[৩৪]

শোভা সিংহ ও তাঁর পূর্বপুরুষ বরদার কাছাকাছি চেতুয়ার রাজনগরে রাজধানী স্থাপন ক'রে কিছুকাল বসতি করেন।[৩৫] কিন্তু সেখানে কোন চিহ্নই এখন আর অবশিষ্ট নেই। এককালে এই স্থানও সমৃদ্ধশালী ছিল। পার্শ্ববর্তী কাঁকিনদীর ওপর দিয়ে তখন বরদায় আসা সহজসাধ্য ছিল শিলাইয়ের মধ্য দিয়ে। আবার কাঁকিনদী যুক্ত হয়েছিল দক্ষিণে কাঁসাই নদীর সঙ্গে। বরদাগড়ের দু'দিকের বিস্তীর্ণ স্থান জলবেষ্টিত থাকায় ঐ গড় খুবই দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। সেসময় ঘাটালে চেতুয়া ও বগড়ির মধ্যবর্তী একটি সৈন্যঘাঁটি ছিল। এখানে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রকোণা ও বরদার মুঘল বিরোধী সম্মিলিত বিদ্রোহী-বাহিনীর তুমুল লড়াই হয় ১৭০২ সাল নাগাদ এবং তাতে ঐ দুই স্থানের রাজা পরাজিত হন।[৩৬] ঐ দুই রাজার মধ্যে হিম্মৎ সিংহ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু পরাজিত হলেও তাঁদের আধিপত্য খর্ব হয় নি। হিম্মৎ সিংহ শিলাইতীরবর্তী নিমতলায় (ঘাটালের নিকটবর্তী) রাজধানী স্থাপন ক'রে দীর্ঘকাল বাস করেন।

পূর্ব উল্লিখিত হিম্মৎ সিংহ প্রদত্ত সনন্দগুলি থেকে এটা নিশ্চিত যে, হিম্মৎ অন্ততঃ ১৭৩০ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৭৩৪ সালে বাদশাহ মহম্মদ শাহ কর্তৃক কীর্তিচন্দ্রকে চেতুয়া-বরদা ও অন্যান্য আরও জমিদারী অর্পণের যে সনন্দ প্রদত্ত হয় তাতে জানা যায়, কীর্তিচাঁদ বাদশাহী সৈন্যের সহায়তায় হিম্মতের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রলে 'উক্ত দুরাত্মা অরণ্য মধ্যে পলায়ন করে।' আবার অপর একটি সনন্দে (১৫ রমজান ১৭ জুলুষ) শোভা ও হিম্মতের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দুটি সনন্দে বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। অতএব ১৭৩৪-এর আগেই হিম্মৎ সিংহের মৃত্যু হয়েছিল, এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

১৬৯৮ সালে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর চেতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও হিম্মৎ সিং প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ক'রতে থাকেন। তিনি বেশ অত্যাচারী হয়ে ওঠেন, অবশ্য মঠ-মন্দিরের সেবার জন্যে কিছুকিছু ভূমিও যে তিনি দান করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হ'ল, যদুপুর-নিবাসী (ঘাটাল) কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীকে তিনি পৈতৃক বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করেন। কবি অগত্যা তাঁর স্বগ্রাম ছেড়ে স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে কর্ণগড়ের (শালবনী) রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩৭] বাসুদেবপুর গ্রামের (দাসপুর), দামোদর রায় চৌধুরীর ক্রীত চেতুয়া পরগণার ছয় আনা অংশের জমিদারী তিনি কেড়ে নেন এবং তার বদলে তাঁকে একশ বিঘা দেবোত্তর জমি দান করেন।[৩৮] এই

মর্মে যে দলিলে তিনি নাগরী অক্ষরে স্বাক্ষর করেন, তার তারিখ ১১১৬ সাল (ইং ১৭০৯)। দামোদরের প্রপৌত্র গুলাব রায়কে (দত্ত) বর্ধমানরাজ তিলোকচাঁদ ১১৬৩ সালের ১১ চৈত্র (ইং ১৭৫৬) ঐ জমিগুলির ফসলছাড়ের নির্দেশ দেন। হিম্মৎ সিংহ দামোদরের জমিদারী কেড়ে নেওয়ার পর দুটি ফসলছাড় তাঁকে দেন, একটি ১১২৩ সালের ৩১ চৈত্র (১৭১৬ খ্রীঃ) এবং অপরটি ১১২৮ সালের ২ মাঘ (১৭২১ খ্রী)। ফসলছাড়দুটি ফারসী মোহরাঙ্কিত। শেষোক্ত ছাড়পত্রটিতে ৮৮ বিঘা ১ কাঠা জমির উল্লেখ আছে।

হিম্মৎ সিং বাংলা ১১০৯ সালে (ইং ১৭০২) মহারাজপুর নিবাসী (ঘাটাল) হুসেনকে মাত্র এক টাকা চার আনা খাজনার বিনিময়ে বাইশটি গ্রামের 'পরামাণিক' পদসহ বিবাহ ও মৃত্যুর অনুষ্ঠান গুলিতে মালাচন্দন ও বরণ লাভের অধিকার দান করেন। এই মর্মে একটি ফারসী দলিলও সম্পাদন করেন। দলিলে তাঁর নাম 'মহারাজাধিরাজ হিম্মৎ সিংহ' এইভাবে উল্লেখ আছে।[৩৯] পাট্টাটি চৈত্রমাসে লেখা হয়। মহারাজপুর বরদা পরগণার অন্তর্গত।

হিম্মতের একমাত্র ভূমিদান-দলিলটি বর্তমান লেখক আজ থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগে (১৯৭৬) একটি বৈষ্ণব মঠের পুরানো মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করেন। এতে ঐ মঠের আদি মোহন্ত শুকদেবকে সেবাপূজার জন্য বিভিন্ন মৌজায় নিষ্কর ছেচল্লিশ বিঘা জমিদানের উল্লেখ আছে। দলিলটি ১১৩৭ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ (ইং ১৭৩০) সম্পাদিত হয়। লক্ষণীয়, ঐ দলিলে নাগরী হরফে 'হীমত সিংহ' স্বাক্ষর আছে।[৪০] হিম্মতের এর পরবর্তী আর কোন দলিল এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। পূর্বোক্ত দুটি দলিলেই হিম্মৎ সিংহের স্বাক্ষর দেবনাগরীতে থাকায় সহজেই অনুমেয়, তাঁরা নিশ্চয়ই বাঙালি ছিলেন না। এমন কি, বেশ কিছুকাল এদেশে বাস করার পরও তাঁরা দলিলপত্রাদিতে দেবনাগরী হরফেই স্বাক্ষর করতেন। বর্তমান লেখকের কাছে বর্ধমান মহারাজাদের মধ্যে তিলোকচাঁদ ও তেজচাঁদের স্বাক্ষরিত যে কয়েকটি দলিল ও ফসলছাড়পত্র আছে, তাতেও তাঁদের দেবনাগরী হরফে স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমানরাজাদের পূর্বপুরুষরা যেমন উত্তর-পশ্চিম দেশ থেকে এদেশে ব্যবসা উপলক্ষে এসে সম্রাটের কৃপায় 'রাজা-মহারাজা'য় রূপান্তরিত হন, তেমনি শোভা সিংহের পূর্বপুরুষও ঐ একই অঞ্চল থেকে এসে চেতুয়া বরদায় বসতি করেন। জানা যায়, শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ রঘুনাথ সিংহ চেতুয়ায় ব্যবসার জন্য আসেন। তাঁর পুত্র কানাই সিংহ পরে সমগ্র চেতুয়া ক্রয় করেন। তার পুত্র দুর্জয় সিংহ চেতুয়া-বরদার আধিপত্য লাভ করেন। এই দুর্জয় সিংহের দুই পুত্র - শোভা ও হিম্মৎ সিংহ। এঁদের প্রায় সকলের নামেই চেতুয়া-বরদা অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রাম আছে, যেমন, রঘুনাথপুর, পাইকান-দুর্জয়ধাম, শোভাগঞ্জ, হেমৎপুর,

সিংহডাঙ্গা প্রভৃতি।[৪১] যেমন চন্দ্রকোণা ও ঘাটালের নানা গ্রাম 'ভান'-বংশীয় রাজাদের নামের সঙ্গে জড়িত - চন্দ্রভানপুর, বীরভানপুর, মিত্রসেনপুর ইত্যাদি, তেমনি পূর্বোক্ত নামগুলিও শোভা সিংহের পূর্বপুরুষদের বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। হিম্মৎ সিংহ নিজে তাঁর নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম হয় 'হেমন্তনগর' (বর্তমান নাম নিমতলা)। এখানে তিনি নিজের নামে হেমন্তনাথ শিবলিঙ্গ ও কারুকার্যমন্ডিত শিবের একটি 'আটচালা'-রীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[৪২]

শোভা ও হিম্মৎ সিংহ সম্পর্কে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে এঁদের বংশপরিচয় আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে বরদার রাজা দলপতের সঙ্গে বা চন্দ্রকোণার 'ভান' রাজাদের সঙ্গে এঁদের কোন আত্মীয়তাসূত্র ছিল কিনা, তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু হরিভানের মহিষী লক্ষণাবতী মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশীয়া ছিলেন, তা জানা যায় একটি শিলালিপি থেকে। কেউ কেউ শোভা সিংহকেও ঐ দুই বংশের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান ক'রে আজ পর্যন্ত যা নথিপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে এবিষয়ে এক অস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। শোভা সিংহের বরদাগড় মুঘল আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা গত শতকের গোড়ার দিকেও তাঁর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁরা গড় থেকে পাওয়া পেতলের পাট্টা, মুদ্রা প্রভৃতির কথাও বলেছেন। কিন্তু সেসব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বা দুষ্পাপ্য হওয়ায় শোভা সিংহ সম্পর্কে অনেক তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে। তবে শোভা সিংহের যুদ্ধাভিযানের কথা 'টেরাকোটা'-শিল্পীদের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে এই অঞ্চলে আঠারো শতকের কোন কোন মন্দিরে যেন সেই যুদ্ধাভিযানের দৃশ্যগুলি নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) *ক্যালকাটা ফ্যাক্টরি রেকর্ড্‌স* (ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি) এবং *লেটার্স অ্যান্ড মেমোয়ার্স অব্ ফ্রাঁসোয়া মার্তোঁ* (বিবলিও থেক ন্যাশিওনেল)।

২) ১৬৯৬, ২২ জুনের ফোর্ট সেন্ট জর্জে পাঠানো *সুতানুটির চিঠি* (আই. ও. এলে. সংরক্ষিত)

৩) রায়, অনিরুদ্ধ, *অ্যাড্‌ভেনচারার্স, ল্যাণ্ডওনার্স অ্যাণ্ড রেকভস্*, নিউ দিল্লী, ১৯৯৮, ১৩১ ও ১৪০ (এখানে সংক্ষেপে রায়)।

৪) রায়, তদেব, ১১৯ ও ১২০, ১৭৩৪ সালে বাদশাহ মহম্মদশাহের সনন্দ, 'মেদিনীবাণী', ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃঃ ৪১৭-৪১৮, মৃগাঙ্কনাথ রায় এর প্রবন্ধ, 'চন্দ্রকোণার ইতিবৃত্ত - শোভা সিংহের বিদ্রোহ'।

৫) রায়, ১২৫।

৬) রায়, ১২৬ ও ১২৯, টিপ্পনি ৫৩।
৭) বায, ১৪৩।
৮) বায, ১২৪।
৯) '*মেদিনীবাণী*', পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৪।
১০) বায, ১৩১, বায, পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, ***চেতুয়া ও বাসুদেবপুর কাহিনী***, দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ, 'মেদিনীবাণী', ১ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৬, পৃ ৫১৯, বায, ১৩৮, সুতানুটিব চিঠি ৯ ডিসে ১৬৯৬।
১১) সেন, সুকুমাব, ***বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*** (১৯৬৫ সং), কলিকাতা, তিনখন্ড, ১ম খন্ড, অপবাধ, পৃ ১৬৭।
১২) তদেব, ১৬৭।
১৩) তদেব, ১৭৫।
১৪) বায, ১২২।
১৫) বায, ১৪৮।
১৬) বায, ১৬০, টীকা ৯৭।
১৭) বায, ১৫৪।
১৮) বায, অধ্যায ১২ ও ১৩,
১৯) মার্তোব ব্যক্তিগত চিঠি, ১৫ জানুযাবি, ১৬৯৭, বায ১২৭ টীকা ১২।
২০) বায, ১২৫, মার্তোব চিঠি পূর্বোক্ত।
২১) বায, ১১৮।
২২) বায, ১১৯।
২৩) দ্রষ্টব্য, বায, ১৩ অধ্যায।
২৪) বায, ১২৬ ও ১২৯ টীকা ৫৩।
২৫) মার্তোব মঁসিযে দ্য ভিলার্মকে চিঠি, ১৫ জানুয়াবি, ১৬৯৭, রায় ১২৭ টীকা ১২।
২৬) বায, ১৫৪।
২৭) বায, প্রণব, 'শোভা সিংহেব বিদ্রোহ ও সমসাময়িক কযেকটি প্রাচীন সনদ' ***ইতিহাস***, ৮ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০।
২৮) বায, প্রণব, ***মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ***, প্রত্নতত্ত্ব অধিকাব, পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, ১৯৮৬, পৃ ২০১ (এখানে লিপিটির অবিকল বানান সহ যথাযথ পাঠোদ্ধার দেওযা হযেছে)। অনিরুদ্ধ বায়েব গ্রন্থে এটি রাধানগর মৌজায় বলা হয়েছে, তা ঠিক নয। (দ্রষ্টব্য, অনিরুদ্ধ রায় ১২৮ টীকা ৩১)। প্রকৃতপক্ষে এটি রাধাকান্তপুর। রায় বলেছেন, লিপির তাবিখ লুপ্ত। কিন্তু সংস্কারকালীন লিপিটি ১২৫১ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪৪ খ্রীঃ। তাতে উক্ত তাবিখ থেকে দু'শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়, যদিও মন্দিরটি অত প্রাচীন বলে মনে হয না।
২৯) দ্বিজ গঙ্গাদাস বা গঙ্গেশের পুঁথিটি লেখক কর্তৃক দৃষ্ট। পুঁথির লিপিকাল ১১৪৩ বঙ্গাব্দ (ইং ১৭৩৬ খ্রীঃ)। অক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহে পুঁথিটি আছে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি যথাযথভাবে এখানে দেওয়া হ'ল ঃ

'ধন্য দলপতি রাজা রণকালে মোহাতেজা হীলা রাজা বড়দা নগরে।

হয়্যা রাজা যুখাসীত প্রতীষ্ঠা করিলা গীত গায়ণ গজেশ কবিবরে'।। (পুঁথি পৃষ্ঠা ১৪(১))। দ্রষ্টব্য, বিদেশংকর দাশ ও প্রণব রায় (সম্পাদিত), '*মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*, ২য় খন্ড (১৯৯৮), পৃঃ ১২১, টীকা ৮ ঐ, পৃঃ ১০০।

৩০) সম্ভবতঃ এই দলপৎ বা দলপতির নামে দলপতিপুর গ্রামটির নামকরণ হয়েছিল। এটি খড়ারের পার্শ্ববর্তী গ্রাম। গ্রামটি সম্পূর্ণ পরিক্রমা ক'রে লেখকের মনে হয়েছে, এটি অতি প্রাচীন গ্রাম।

৩১) দাশ ও রায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, ১০০ (প্রবন্ধটি বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত)।

৩২) রায়, পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও রায়, প্রণব, '*ঘাটালের কথা*', বানীসংসদ, কলি. ১৯৭৭, ৩২ পৃষ্ঠার পর মানচিত্র দ্রষ্টব্য। এতে গড়টির বিভিন্নস্থান চিহ্নিত হয়েছে। এই সীমা চিহ্নিতকরণ পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য, অনিরুদ্ধ রায়, ১১৬ টীকা ১৩।

৩৩) মন্দিরটি বিশালাক্ষীর, রায়ের উল্লিখিত 'বিজয়লক্ষ্মীর' নয়। দ্রষ্টব্য রায় ১১৫।

৩৪) রায়, মৃগাঙ্কনাথ, 'জালন্দার গড়' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩৩১, ৩য় সংখ্যা, চন্দ্রকোণার ইতিবৃত্ত, শোভা সিংহের বিদ্রোহ, মেদিনীবাসী, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃঃ ৪১৫-৪১৬।

৩৫) রায়, পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, *দাসপুরের ইতিহাস*, ১৩৬৫, পৃঃ ৪।

৩৬) ও'ম্যালি, এল. এস. এস., *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিড্নাপোর*, প্রথম পুনঃপ্রকাশিত ডিসে. ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ২২০।

৩৭) চক্রবর্তী, রামেশ্বর, *শিবায়ণ* (রচনাকাল ১৭১১ খ্রীঃ) উদ্ধৃতি, 'পূর্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে, রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।'

৩৮) রায়, প্রণব, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ '*ইতিহাস*', পৃঃ ২৫। অনিরুদ্ধ রায়ের মতে দামোদরের কাছ থেকে হিম্মৎ জমিদারীর কিছু অংশ ক্রয় করেন। দ্রষ্টব্য, রায়, ১৫৪। কিন্তু তা ঠিক নয়। ভূমিদানপত্রের মর্ম অনুসারে হিম্মৎ দামোদরের অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন।

৩৯) রায়, প্রণব, '*ইতিহাস*' ২৩-২৪। এখানে ফারসী বয়ান ও তার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪০) রায় কাব্যতীর্থ ও রায়, '*ঘাটালের কথা*' (১৯৭৭), পরিশিষ্ট (১) দ্রষ্টব্য।

৪১) রায় পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৫।

৪২) রায় পঞ্চানন, ৫।

হীম্মৎ সিংহের স্বাক্ষরিত সন ১১৩৭ বঙ্গাব্দের একটি ভূমিদান-সনন্দ ঃ

শ্রীশ্রী কৃষ্ণঃ

ইয়াদিকীর্দ শ্রীজুত যুকদেব মোহন্ত যুচরিতেষু সন ১১৩৭ এগার সর্ত্ত সাইতিব সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে মৌজে দাউদপুরদিগার পরগণে চেতুয়া গ্রাম হাএ বঞ্জয় পতিত ৪৬/০ ছচল্লীষ বিঘা জমি তোমার শ্রীশ্রী শেবার খরচ কারন দেবোত্তর দিলাঙ জমি জায় মাফিক চিহ্নিত করিয়া লইয়া সেবা ও সাধু সেবা করিয়া শীস্যানুশীস্যক্রমে ভোগ করহ রাজস্বয় সহিত দায় নাই ইতি সন সদর।

তারিখ—২২ অগ্রহান।

জায় জমি
পং চেতুয়া

দাউদপুর—	৯ ⁄৷ ৩
ঝুমঝুমি—	২১৷৷০
উকুব পুর—	৪/২
মণ্ডুমালা—	১০৷৷০
	৪৬/০

ছচল্লীব বিঘা ইতি

শ্রীহীমল সিংহ
(দেবনাগরি স্বাক্ষর)

* শোভা সিংহ ও সমকালীন নথিপত্র/প্রণব রায়

শোভাসিংহ ও সমকালীন নথিপত্র / প্রণব রায়
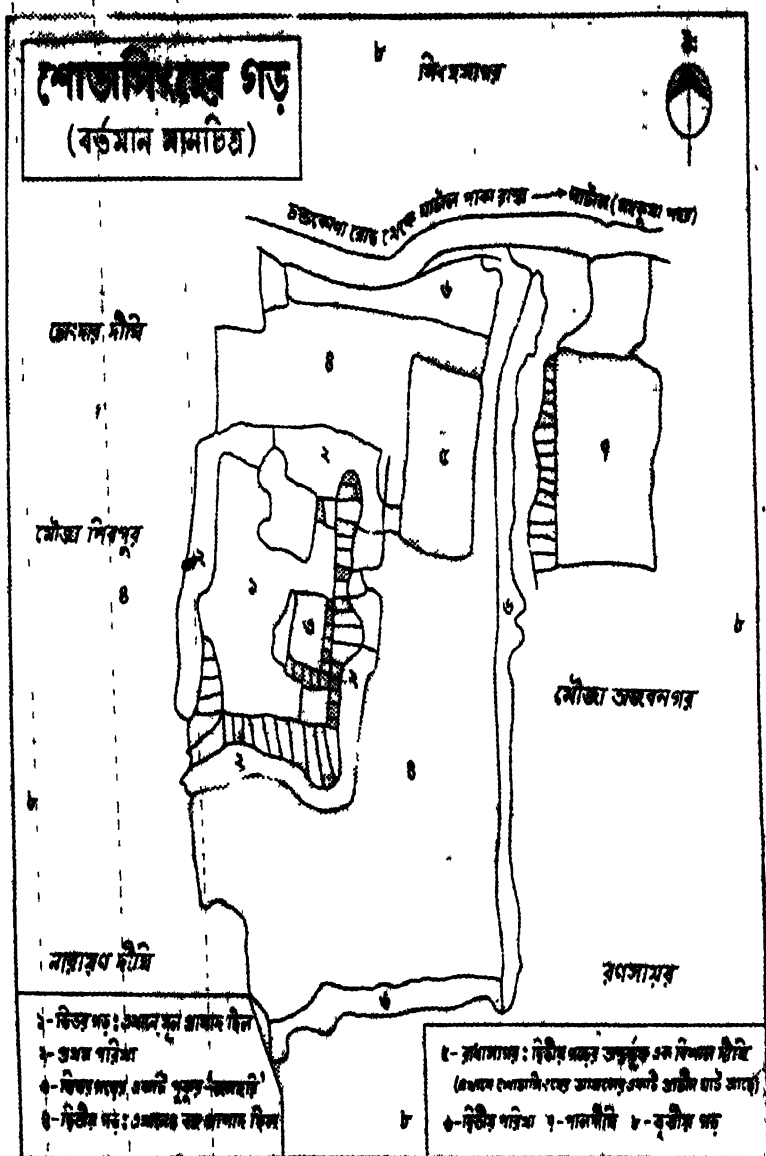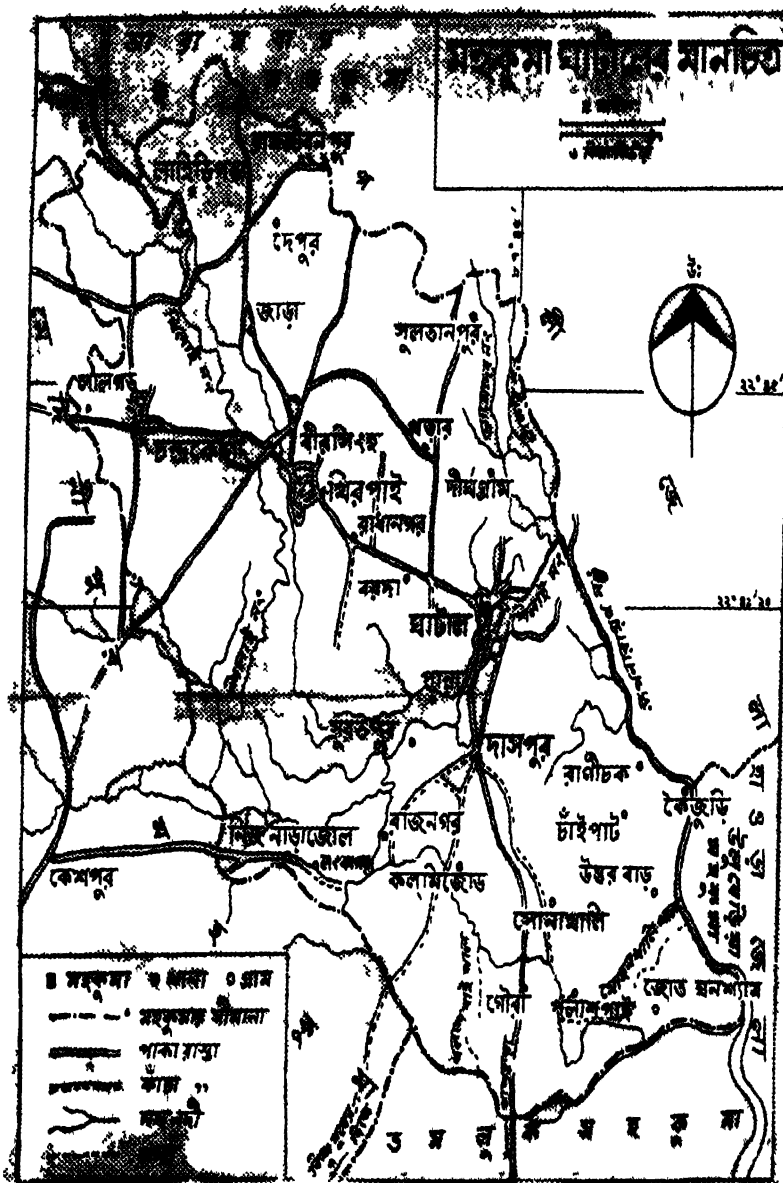
শিমলাবাজার, লান ও মিত্র পরিবার ঃ একটি এলাকার পরিবর্তনের ইতিহাস

উত্তরা চক্রবর্তী

উত্তর কলকাতার হেদুয়া, বেথুন কলেজ, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট এলাকা অতি প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন সুতানুটি গ্রামের অংশ বিশেষ এই অঞ্চল এককালে শিমুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫১ সালে শিমুলিয়ার হেদুয়া পুকুরের পশ্চিম পারে তৈরী হ'ল জন ড্রিংকওয়াটার বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম বদলে হয় বেথুন স্কুল। বেথুন স্কুল তৈরী হওয়ার আগে, এখানে রাস্তা ঘেরা, প্রায় চতুষ্কোণ একটি বড় খোলা জমি ছিল। জমির দক্ষিণ দিকে ছিল মানিকতলা স্ট্রিট, এখন যা রামদুলাল সরকার স্ট্রিট নামে পরিচিত। পূর্বদিকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, যার এখনকার নাম বিধান সরণী; আরও আগে এই রাস্তার নাম ছিল ঠনঠনিয়ার রাস্তা।[১] উত্তরে কোন রাস্তা ছিলনা। বিডন স্ট্রিট, তখনও তৈরী হয়নি। পশ্চিমে কৃষ্ণমোহন সিংগি নামে একটি সরু পায়ে চলার পথ। বর্তমানের বেথুন রোর, আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিলনা। চতুষ্কোণ এই খালি জমি জুড়ে ছিল একটি বড় দৈনিক বাজার - শিমলাবাজার নামে যার উল্লেখ সেকালের নথিপত্রে ও প্রাচীন কলকাতার মানচিত্রে পাওয়া যায়।

বেথুন স্কুলের জমিতেই যে বাজার ছিল, এই তথ্য জানা যায় বেথুনসাহেবের লেখা একটি চিঠি থেকে। ৩০শে মে ১৮৫১, তৎকালীন বাংলার ডেপুটি গভর্ণর মেজর জেনারেল জে. লিটলারকে বেথুন লিখলেন, স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট মির্জাপুর এলাকার জমির বদলে হেদুয়ার পশ্চিমে, 'নেটিভ বাজারের' দখলিকৃত জমি তাকে স্কুল করার জন্য দেওয়া হ'ক।[২] সেই সময় বাজারের ইজারাদার ছিলেন মতিলাল শীল। এ তথ্যও বেথুনের চিঠি থেকে জানা যায়।"It is well known that the Charitable Society of Calcutta have applied to the Government of Bengal, for a grant of the lands of the western side of Cornwallis Square belonging to the Government, now leased as a bazar to Babu Motilal Seal. The purpose for which the charitable society require this land is building on it an almshouse.....for Hindoos and Mahomedans". বাজারের পূর্ব অংশ নিয়ে ভিখারি ভবঘুরেদের বাসস্থান করার প্রস্তাব ওঠে। বেথুন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন - "I beg leave to

point out a very valuable purpose to which I attach so much importance if the government is inclined to allow me to exchange my lands for the lands in cornwallis square for the purpose of the Female School".

বেথুনের এই চিঠির ভিত্তিতে শেষপর্যন্ত কোম্পানির সরকার বেথুনকে বাজারের এই অংশের জমি কেনার অনুমতি দিলেন। বাজারের কোণ ঘেঁষে ছিল ১৮২৯ সালে স্থাপিত ক্রাইস্টচার্চ গীর্জা। বেথুন স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিখ্যাত লিথোগ্রাফ ছবিটির এককোণায় গীর্জাটিকেও দেখা যায়।[৮] বাজারের পূর্বদিকের অংশে স্কুলবাড়ী উঠলেও দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে শিমলা বাজার বজায় রইল। এই সময়, ১৮৫১ সালে শিমলা বাজার একশো বছরের পুরোনো বাজার।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতার একাধিক প্রাচীন মানচিত্রে শিমলাবাজারের উল্লেখ আছে। ১৭৮৪র বেইলির প্রকাশিত, ও লেঃ কর্ণেল মার্কউডের আঁকা "প্ল্যান অফ্ ক্যালকাটা"য় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর "ওল্ড শিমলি বাজার" এবং মানিকতলা স্ট্রিটের ওপর শিমলাবাজার দেখানো হয়েছে। এছাড়া ১৭৯২-র আপজনের ম্যাপে, ১৮২৫-৩২, ১৮৫২-৫৬র লটারী কমিটির তৈরী প্ল্যানে, হেদুয়া পুকুর, শিমলাবাজার, কৃষ্ণমোহন সিংগি লেন ও বেথুন ফিমেল স্কুল সময়ানুক্রমে দেখতে পাওয়া যায়।[৮]

শিমলাবাজার অঞ্চলের আদিমতম নাম সুতানুটি। সুতানুটি গ্রামের পত্তন, জোব চার্ণকের আগমনের অনেক আগে থেকেই। গ্রাম তৈরী করেছিল হুগলি, সপ্তগ্রাম থেকে আসা তাঁতীরা। ষোড়শ শতকের পর্তুগীজরা তাদের 'বড় বন্দর' (Porto Grande) চট্টগ্রাম ছেড়ে, 'ছোট বন্দর' (Porto Pequino) সপ্তগ্রামেই নজর দিয়েছিল। এখনকার গার্ডেনরিচের উল্টোদিকে হাওড়ার দক্ষিণে বেতড়ে তাদের বড় জাহাজগুলি নোঙ্গর করত। বেতড়ে একটি অস্থায়ী হাট গড়ে ওঠে। ক্রমে কিছুটা উত্তরে, গঙ্গার পূবপারে আরেকটি স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে লাগল ষোড়শ শতকেই। সপ্তগ্রামের ক্রমশঃ অবনতির কারণেই বসাক ও শেঠ নামের পাঁচ ঘর তাঁতী, গঙ্গার পূব পারের গোবিন্দপুরে জঙ্গল কেটে বসতি তৈরী করল। গোবিন্দপুরের উত্তরে তাদের একটি হাটও তৈরী হল। সুতোর কারবারের জন্য এই হাটের নাম হল সুতানুটি হাট। হাট ঘিরে সুতানুটি গ্রাম ও তৈরী হল। সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা এই তিন গ্রামের মধ্যে কলকাতার পরিচয় আরও প্রাচীন। ১৪৯৫-৯৬ সালে বিপ্রদাস পিললাইএর 'মনসা বিজয়' কাব্যে কলকাতার উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরিতেও কলকাতার নাম পাওয়া যায়। মোগল আমলের মানচিত্রেও কলকাতা দেখানো আছে। সি. আর উইলসন তাঁর "আর্লি এ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল" বইটিতে কলকাতা

শহরের গড়ে ওঠার তিনটি পর্বের কথা বলেছেন। প্রথম পুর্তগীজদের বেতড়ে নোঙ্গর করা। দ্বিতীয় পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে শেঠ, বসাক তাঁতীদের জঙ্গল কেটে সুতানুটি হাট ও গ্রামবসতি তৈরী করা এবং সবশেষে ১৬৮৬-১৬৯০ সালে, চার্ণকের এই অঞ্চলে যাতায়াত এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই কুঠি বাড়ী তৈরী করা। সুতানুটি হাটের তাঁতীদের বসতি ও কারবার জোব চার্ণককে উৎসাহিত করেছিল। "Whether the Bengali merchants ever invited the English to come and settle near them, we cannot say, but the advantages of doing so must have been manifest"।[৫]

হুগলির দক্ষিণে এই অঞ্চল যে কখনই জনবিরল ছিল না একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য। ষোড়শ শতকে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করার জন্য এই সম্পূর্ণ এলাকা, নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদারকে জায়গির হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।[৬] ষোড়শ শতকে এই অঞ্চলে তাঁতীদের আসা যাওয়া শুরু হয়। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষের দশকে সুতানুটি অঞ্চলে তাঁতীদের গ্রাম হিসেবে শিমলা বা শিমুলিয়া গড়ে ওঠে।[৭] এই একই সময়ে কোম্পানি ও ইংরেজদের বসতি বিস্তৃতি পাচ্ছিল গোবিন্দপুর গ্রামাঞ্চলের দিকে। ফলে ঐ অঞ্চলের বহুমানুষ বাসচ্যুত হয়। তাদের পুনর্বাসন হ'ল শিমলাগ্রামে। ১৭৪৬ সালের জুন মাসে কোম্পানি, পাগলাডাঙ্গা, বেনিয়াপুকুর ইত্যাদি অঞ্চল 'জননগর' নাম দিয়ে কিনে নেয়। উপরন্তু ১৫ টি ডিহির সন্নিকটে শিমলা গ্রামও ভাড়া নিয়েছিল। পরে শিমলা ইংরেজরা কিনে নেয়।[৭] শিমলাপাড়ার আদিতম বাসিন্দা নানপরিবার। সুতানুটি হাটে ব্যবসাই নানদের এখানে টেনে আনে। বর্তমানের ১৮নং বেথুন রোতে বাস করেন সচ্চিদানন্দ নান আশি অতিক্রান্ত এই ইতিহাস সচেতন মানুষটি প্রতিবেশীদের কাছে বাদলবাবু নামে পরিচিত। পেশায় তন্তুবায় বাদলবাবুর পূর্বপুরুষ সুতানুটি হাটে চলে আসেন আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর আগে। বাদলবাবুর কথায় "প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ২০ বছরে একবছরের ব্যবধান ধার্য হলে ১২ পুরুষের ব্যবধান হওয়া উচিত ২৫X১২ অর্থাৎ ৩০০ বছর। ঠাকুর্দার (কার্তিক চন্দ্র) মুখে যখন এই প্রতিবেদন শুনি, তখন থেকে ৩০০ বছর পিছিয়ে গেলে দাঁড়ায় ১৬৩০। ঐ সময়ে অদূরবর্তী আঁটপুর বা রাজবোলহাট থেকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কলকাতায় এসেছিলেন.....ঐ দুটি জায়গাতেই তন্তুবায় গোষ্ঠীর বহুদিনের বাসভূমি। কলকাতার এই শিমলেপাড়া ছাড়া আমাদের এই নান বংশের অস্তিত্ব সাত বা আট দশক আগেও অন্যত্র আছে বলে আমাদের জানা ছিল না"।[৮] নানদের আদি বসতবাড়ী ছিল শিমলা বাজারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায়।

অষ্টাদশ শতকে শিমলাগ্রাম মূলত তাঁতীদের গ্রাম হলেও, আরও অন্য ধরনের বৃত্তিজীবী ব্যাপারী, কারবারী মানুষের বসবাস শুরু হয়ে গিয়েছিল এখানে।

১৭৫৮-র শিমলার জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কোম্পানিও এই অঞ্চলের উন্নয়নের কথা চিন্তাভাবনা করে; ১৭৬৯ সালের (২২.১৭৬৯) কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্‌কে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়।[৯] তাঁতীরা তখনও সুতানুটি গঞ্জ বা হাট উপলক্ষ করে আসা যাওয়া করছে। ১১ই ডিসেম্বর ১৭৭৫ সালের একটি আবেদন পত্রের উত্তরে কোম্পানি ১০০০ জন তাঁতীকে এই অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিল।[১০] নানপরিবাবও অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তাদের জাতব্যবসাই চালিয়ে গেছে।

শিমলা গ্রামের উন্নতির জন্য এবং তাঁতী ও অন্যান্য বাসিন্দাদের প্রয়োজনের জন্য এখানে ক্রমশঃ দৈনন্দিন বাজার গড়ে উঠতে থাকে। শিমলা বাজার এমনই একটি বাজার।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানির প্রসার যখন বাড়ছে, কৃষ্ণনগরের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে, এই অঞ্চলের দখলদারি নিয়ে ইংরেজরা নবকৃষ্ণদেবকে সুতানুটির তালুকদার নিযুক্ত করে। সুতানুটি হাটও তাঁর তালুকদারির অন্তর্গত ছিল।[১১]

১৭৭৩-১৭৯২ ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউর তৈরী কলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বাজারের তালিকার মধ্যে শিমলাবাজার অন্যতম। রীতিমত বড় এবং স্থায়ী বাজার।[১২] কমিটির নথি বলছে সুতানুটি হাট সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার বসলেও, শিমলা বাজার দৈনন্দিন বাজার।[১৩] তখন একটি ব্যস্ত বাজার কবে শুরু হ'ল,তার সঠিক হদিশ পাওয়া যায়না। একটি বাজার নানা কারণে গড়ে উঠতে পারে। বাজারের উপস্থিতি আশে পাশের গ্রাম থেকে মানুষ টেনে আনতে পারে, বেচাকেনার জন্য অথবা সৈন্য বাহিনীর ছাউনি বা বণিক সওদাগরদের আনাগোনা থেকেও বাজার গড়ে ওঠে।[১৪] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে বহু আগে থেকেই, গঙ্গার নাব্যতা ও সমুদ্রের মোহনা কাছে হওয়ার দরুণ এই অঞ্চলে নদীর দুপাশে হাট ও বাজার গড়ে উঠেছিল। চর্তুদশ শতকে ইবনবতুতা হুগলি নদী দিয়ে নৌকো করে যাওয়ার সময় দু'পাশে ব্যস্ত হাটগ্রামের উল্লেখ করেছেন। "As if we are going through a market"। একই কথা শোনা যায় ইটালিয়ান পর্যটক সিজার ফ্রেডেরিক বা র‍্যালফ্ ফিচের লেখায়।[১৫]

শিমলা বাজার এক না একাধিক, কোম্পানির নথিপত্র বা বেইলির প্ল্যান থেকে এমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে শিমুলিয়ায় একাধিক বাজারের উল্লেখ পাই। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাজার গুলি তৈরী করত বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী মানুষ। এদের সঙ্গে সুতানুটি অঞ্চলের এবং সিমুলিয়ার তালুকদার নবকৃষ্ণের বিবাদ লেগেই থাকত। মদন দত্ত বা জগমোহন সাহার সঙ্গে নতুন বাজার বসানো

নিয়ে নবকৃষ্ণদেবের নানা বিচিত্র বিবাদের বিস্তারিত বিবরণ ক্যালকাটা কমিটি অফ রেভিনিউর নথিপত্রে পাওয়া যায়।[১৬] নবকৃষ্ণের দাবী ছিল বাজার গুলি তার তালুকদারি অধিকার অগ্রাহ্য করে তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে বিবাদী পক্ষের দাবী ব্যাপারীরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী খোলা জায়গায় বসছে, তাদের তোলা সম্ভব নয়। জগমোহন সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তার বাজারের জায়গায় একটি ইদগা এবং একটি কবরস্থানও রয়েছে। মুসলমানদের পবিত্র স্থানে বাজার বসানো, এখন ঠিক নয়। কমিটির কাছে নবকৃষ্ণের আরজি - বাজার গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হ'ক।[১৭]

কমিটির নথি থেকে বাজার সংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, বাজারের অস্থায়ী ছাউনি গুলি তৈরী হত বাঁশ ও খড় দিয়ে। পণ্য সামগ্রীর লম্বা তালিকা বা খোলা বাজার ছাউনির দোকান ঘরের সংখ্যার তালিকাও তৈরী হ'ত নিয়মিত। শিমলা বাজারের পণ্যের তালিকায় আরক, তেল, হুকাঁ, চাল, মিষ্টি, ফল, ছোলা, চূণ, কলি, গাঁজা, পান, মাছ, কাপড়, বেতের ডালা, ফুল, ডাব, নারকেল, কলাপাতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। পান মহল শিমলা বাজারেব একটি বড় অংশ ছিল।[১৮]

ইজারাদারের গোমস্তারা প্রায়ই সাধারণ ব্যাপারী বিক্রেতাদের ওপর অত্যাচার করত। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৭৯ জনৈক আত্মারাম অভিযোগ করছে গোমস্তা তার পানসুপারি বাজারের পথে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে জোর করে তুলে দিয়েছে। তার অভিযোগ যুগল নামে শুধু একই ব্যক্তিকে পানমহলের একচেটিয়া ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কমিটির সুরাহা হ'ল যুগল বজায় থাকুক, কিন্তু নিয়মিত খাজনা দেয়কারী ব্যাপারীদের যেন উচ্ছেদ না করা হয়। অনেক সময় বাজারের ইজারাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকত তারা সরকারী রাস্তায় ব্যাপারীদের বসতে দিচ্ছে। ১৭৯১র জুলাই মাসে কমিশনারস অফ পুলিশের তালিকায়, শিমলা বাজারের বিরুদ্ধেও এমন অভিযোগ রয়েছে।[১৯]

কমিটির নথি থেকে শিমলাবাজারের বার্ষিক আয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধির একটা হিসেব পাওয়া যায়।

	১৭৭৩	১৭৭৬	১৭৭৭
শিমলা	টাকা ৭০৯-৮-০	টাকা ৯৫৫-০-০	টাকা ১০৩০-০-০[২০]

১৭৭৩ সালে শিমলাবাজারের ইজারাদার ছিলেন কানাই মিত্র, ১৭৭৮ সালে নীলমণি মিত্র, ১৭৯১ তে নিমু মিত্র।[২১] এরা একই পরিবার ভুক্ত। মিত্র পরিবার কোন্নগর থেকে কলকাতায় আসে জোব চার্ণকের আমলেই। শিমুলিয়ায় তাদের বসতবাড়ী তৈরী হয়। বাজারের ইজারাদার ও অন্যান্য ব্যবসায় তারা শিমুলিয়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হিসেবে পরিচিত হ'ন।[২২]

উনবিংশ শতকে সুতানুটি হাটের অস্তিত্ব ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে, কিন্তু মূল শিমলাবাজারের সরগরম ব্যস্ততা বজায় আছেই। এই সময়েও বাজারের মালিক ইজারাদার মিত্র পরিবার। পরিবারের প্রধান পুরুষ নীলকমল মিত্র, ডেভিড হেয়ারের স্কুলের ছাত্র, কিছুকাল মেডিকেল কলেজে পড়াশুনাও করেছিলেন। বাজারের উত্তর অংশে, এখনকার ৬১ নং এবং ৬২ নং বিডন স্ট্রিট নিয়ে ছিল মিত্রদের ছড়ানো বিশাল বসত বাড়ী।[২২] অন্যদিকে বাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে তৈরী হয়েছে 'নেটিভ জমিদার' কৃষ্ণমোহন সিংহের বাগান বাড়ী। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নানদের আদি বসতবাড়ী আগেই ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নান পরিবারের কৃতীপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র নান পারিবারিক ব্যবসা - সুতোর কারবার ছেড়ে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির স্টিভেডর হ'ন ও প্রচুর সম্পত্তি করেন। এলাকার প্রায় সব জমি তিনি কিনে নেন।[২৩] বাজারের মুখোমুখি বৈঠকখানা হিসেবে একটি নতুন বাড়ী কেনেন। দোতলা কোঠা বাড়ীটির আদি মালিক নীলমণি পাত্র, কোনকারণে বাড়ী বন্ধক রেখেছিলেন, কৃষ্ণমোহন সিংহ এবং জনৈক হেনরি উইলিয়ম ডাফের কাছে।[২৪] এই ডাফ সাহেবের সঙ্গে আলেকজান্ডার ডাফের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানা যায় না। যদিও ডাফ সাহেবের স্কুল হেদুয়ার অপরপারে তখন তৈরী হয়ে গিয়েছে। বন্ধকি দলিল সুদ্ধুই ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীটি কিনে নিয়েছিলেন, এদের কাছে থেকে।

উনিশ শতকে বাজার ঘিরে বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবারের বসতবাড়ী তৈরী হয়েছিল। নান পরিবারের পুরোনো দলিল থেকে বাজার এবং শিমুলিয়ার লোকবসতির চেহারাটা বোঝা যায়। আগে বাজার ঘিরে ছিল ব্যবসায়ী, কারবারী, বসাক, তাম্বুলি, ধোপা ইত্যাদি বৃত্তিজীবী মানুষের বাস। এখন ক্রমশ শিক্ষিত, ধনী, বিদ্যোৎসাহীদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণমোহন সিংহ, ল্যান্ডহোর্ল্ডাস সোসাইটির সক্রিয় সদস্য ও পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।[২৫] সম্ভবত এদেরই সমসাময়িক কালে (১৮২৮) বিখ্যাত কবি মির্জা আসাদৌল্লা গালিব দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন এবং শিমলা বাজারের পশ্চিমে, গোলতালাও অর্থাৎ হেদুয়ার কাছে জনৈক মির্জা সওদাগর নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ী মাসিক ৬ টাকায় ভাড়া নেন। এখানে তিনি প্রায় দু'বছর ছিলেন।[২৬] মির্জাগালিব যে বাড়ীতে ছিলেন সে বাড়ী সম্ভবত তখনকার ১৩৩ নং বেথুন রো।[২৭] পরে এই বাড়ীটিও নানপরিবার কিনে নিয়েছিল। উনিশ শতকে শিমলা বাজার পাড়া একটি কসমোপলিটান পাড়া। হিন্দু, মুসলমান, ইওরোপীয়, বাঙালী, অবাঙালীর মিশ্র আবাসন এখানে ১৮২৯ সালে ক্রাইস্ট চার্চ গীর্জা তৈরী হয়েছে। এপাড়ায় যে পুরোনো মুসলমান বসতি ছিল বোঝা যায়। মির্জা সওদাগরের নাম উল্লেখ ত আছেই। না থাকলে মির্জা গালিব দিল্লী থেকে সটান এই অঞ্চলে আসতেন না। কমিটি অফ রেভিনিউর রেকর্ডস-এ ইদ্‌গা, কবরস্তান ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৫১ সালে বাজারের পূর্ব অংশের জমিতে বেথুন স্কুল তৈরী হ'ল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; কোম্পানির সরকার বাজারের ইজারাদার মতিলাল শীলের কাছ থেকে এই অঞ্চলের জমি দখল করেছিল। শিমলা বাজারের আদি ইজারাদার মালিক মিত্ররা মতিলাল শীলকে বাজারের এক অংশ ছেড়ে দিয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায়না। পঞ্চাশের দশকে মিত্র পরিবারের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি হ'লেন চারুচন্দ্র মিত্র। চারুচন্দ্র মিত্র আইনজীবী এবং গর্ভনর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হ'ন।[২৭] অন্যদিকে নান পরিবারের বর্ধিষ্ণুতা আরও বেড়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নানদের আদি বসতবাড়ী জরাজীর্ণ, ভগ্নপ্রায়। ঈশ্বরচন্দ্রের বৈঠক খানা বাড়ীতে তার পরিবারের একাংশ পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করে।[২৮]

বেথুন স্কুলের পশ্চিমদিকে, দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত টানা জমিতে শিমলাবাজার বজায় ছিল। ১৮৫২-র কলকাতার প্ল্যানেও বাজার চিহ্নিত করা আছে। ষাটের দশকে স্কুলের উত্তর অংশের ৮ কাঠা জমি নিয়ে সরু পায়ে চলার পথকে বাড়িয়ে তৈরী হ'ল বিডন স্ট্রিট।[২৯] ইতিমধ্যে স্কুলের সেক্রেটারি মনমোহন ঘোষ তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তাকে বারবার অনুরোধ করছেন বাজার তুলে দেবার জন্য। ১৮৭৯ সালের ২২শে এপ্রিলে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তাকে লেখা চিঠিতে মনমোহন ঘোষ বলছেন, স্কুলের পশ্চিমে, প্রায় জানালার নীচেই তরিতরকারী ও মাছের বাজারের গন্ডগোলে ছাত্রীদের পড়াশুনোর বিঘ্ন ঘটছে। তার মতে বাজার ও পারিপার্শ্বিক বিদ্যালয়ের উপযোগী নয়। বাজার অবশ্য তখনও ওঠেনি।[৩০]

উনিশ শতকের শেষের দিকে মিত্র পরিবারের আর্থিক অবনতির সঙ্গে বাজারের ভাগ্য জড়িত হয়ে গেল। শিমুলিয়ার উত্তর পশ্চিমে ছিল আঠেরো, উনিশ শতকের বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দে সরকারের বসত বাড়ী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তার পুত্র ছাতুবাবু নতুন একটি বাজার তৈরী করলেন বাড়ীর উল্টোদিকে। ছাতুবাবুর বাজারের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা, শিমলা বাজারের পড়ন্ত অবস্থার একটি কারণ। তাছাড়া এর আগেও যেমন হ'ত, তখনও তেমনি বাজারের মালিকদের মধ্যে, ব্যাপারীদের বসানো নিয়ে টানাটানি, রেষারেষি হ'ত। অষ্টাদশ শতকে নবকৃষ্ণদেবের এরকম অভিযোগই ছিল শিমলাবাজার সম্বন্ধে। এখন শিমলা বাজারের মালিকরা ছাতুবাবুর বাজারের সঙ্গে রেষারেষিতে পিছিয়ে যেতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বাজার বজায় ছিল। ১৯০১ সালের সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তৈরী কলকাতার একটি মানচিত্রে শিমলাবাজার চিহ্নিত করা আছে।

শিমলাবাজার শেষ পর্যন্ত উঠল ১৯০৫ সালে। স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপ, ছাতুবাবুর বাজারের সঙ্গে রেষারেষি ইত্যাদি নানা কারণে ইজরাদার মালিক মিত্র পরিবার বাজার ছেড়ে দিয়েছিল। চারুচন্দ্র এবং তার স্ত্রী শিবসুন্দরী মিত্রর মৃত্যুর পর

মিত্রদের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। বাজারের জমি শেষ পর্যন্ত তারা গর্ভনমেন্টকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মিত্র পরিবারের এক আত্মীয়, বেথুন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রীর মতে চারুচন্দ্র মিত্র মৃত্যুর আগে ঐ জমি বেথুন স্কুলকে প্রদান করেছিলেন। বেথুন কলেজের হেডমাস্টার শ্যামাচরণ গুপ্তর অক্লান্ত চেষ্টায় বাজার শেষপর্যন্ত উঠে গেল।' বাজারের পরিত্যক্ত জমি বহুদিন অব্যবহৃত পড়ে ছিল। ১৯১৬-র ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতার সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এস. জে. গুড শিক্ষা অধিকর্তা হরনেল কে লিখছেন, জঙ্গলাকীর্ণ ঐ জমিতে তারা একটি লেডিস পার্ক কবতে চান। "It is covered with jungle and old ruins but it is a fine large plot which I would think make an ideal park for Ladies"।' গুড সাহেবের চিঠিতে 'ওল্ড রুইনস্' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। বাজার তো খোলা বাজার ছিল, প্রাচীন ভগ্নাবশেষ তাহলে কিসের?

১৭৫৮ থেকে ১৯০৫ শিমলাবাজারের এই সুদীর্ঘ ১৪৭ বছরের নথিবদ্ধ ইতিহাস জানা যায। ১৭৫৮-র আগে শিমলাবাজারের অস্তিত্ব ছিল কিনা বোঝার উপায় নেই। থাকাটা কিন্তু অসম্ভব নয়। ষোড়শ শতকের সুতানুটি হাটের সঙ্গে শিমলাবাজার জড়িত ছিল, কমিটি অফ রেভিনিউর রেকর্ডস্ থেকে এই তথ্য জানা যায়। সুতানুটি হাট বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। সুতানুটি গ্রামের উল্লেখও সরকারী নথিপত্রে বা সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

শিমলা বাজারকে মাঝখানে রেখে চারপাশের বসতবাড়ী ও বাসিন্দাদের পরিচয়ের বদল ঘটেছে। সুপ্রাচীন নান বা মিত্র পরিবারের মধ্যে এই পরিবর্তন খুব বেশী করে চোখে পড়ে। নারী শিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুল ও কলেজ, শিক্ষার্থী বালিকারা বা উচ্চশিক্ষার্থী কলেজের ছাত্রীদের উপস্থিতি উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই এই পরিবর্তনের জন্য অনেকটা দায়ী। অথবা পাড়ার বদলে যাওয়া পরিবেশেই হয়তো এই অঞ্চলেই বালিকা বিদ্যালয় তৈরী করাতে বেথুন সাহেবকে উদ্যোগী করেছিল। কারবারী ব্যবসায়ী, বাজার পাড়া ক্রমশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পাড়ায় পবিণত হচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সংবাদ প্রভাকর, হেদুয়ার দক্ষিণদিকের রাস্তায় ৪৬ নং বাড়ী থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই স্বামী বিবেকানন্দর পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলে বাড়ী তৈরী করলেন। নান পরিবারেও চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটল। ঈশ্বর নানের পৌত্র কার্তিক চন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ঈশ্বর নানের বিলাস বহুল বৈঠকখানা বাড়ীর হলঘরে বিপ্লবী উপাধ্যায় মশাই বহুদিন বাস করেছিলেন। এখান থেকেই 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কার্তিকচন্দ্রের পুত্র সুধীর চন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবের উৎসাহেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হ'ন। প্রথম ১০ জন ছাত্রদের একজন হলেন সুধীরচন্দ্র। সুধীরচন্দ্রর স্ত্রীর সঙ্গে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা

তটিনী দাসের বন্ধুত্ব ছিল। চারুচন্দ্র মিত্রর কন্যা সরোজিনী দে বেথুন কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যা হ'ন।[৩৩]

সময় বদলিয়েছে এভাবে; শিমলা পাড়ারও পরিবর্তন হয়েছে। ষোড়শ শতকের সুতানুটি হাট, বসাক ও নান তন্তুবায় পরিবারদের আগমন ও বসতি, রাজা নবকৃষ্ণদেবের তালুকদারি, বাজারের ইজারাদার কানাই মিত্রর পরিবারের ইতিহাস এই বিবিধ বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে শিমলাবাজারের কাহিনী জড়িত। এরই সূত্র ধরে শহর কলকাতার আদি উৎস এবং প্রাচীনতর ইতিহাস রচনার কথা নতুন করে ভাবা যেতে পারে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১) A History of Calcutta Streets - P. T. Nair, Firm KLM, p. 214.

২) Letter no 16 from the Hon'ble J. E. D. Bethune to Major General the Hon'ble Sir J. Littler, Deputy Governor of Bengal. General Education 1850 consultation no 16/20.

৩) Bethune College and School Centenary Volume 1849-1949 Edtd. by Dr. Kalidas Nag and Lotika Ghosh.

৪) Atlas of the City of Calcutta and the Environs . National Atlas and Thematic mapping Organization pp. 22, 23, 24, 50.

৫) Early Annals of the English in Bengal : C. R. Wilson Asiatic Society Edition, Vol - 1, p. 137.

৬) Gazetteer of India . West Bengal : 24 Parganas Edtd. by Barun De, p. 78.

৭) Anatomy of a Colonial Town : Calcutta 1756-1794 : Soumitra Sreemani p. 41, Reb Honutages 26.8.1768.

৮) 'আমাদের বংশের কথা' - শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ নাথ।

৯) Anatomy....Soumitra Sreemani, p. 41.

১০) List of Documents on Calcutta : Vol - 1, 1764-1800 Edtep - Adhir Chakraborty p. 66 Progs No. 14, 11, 12, 1775.

১১) COR 1778, 22nd Dec. 1778 Original Consultation.

১২) তদেব

১৩) তদেব

১৪) Anatomy : S. Sreemani, p. 68.

১৫) Changing Economic Structure in the 16-18 centuries Alexander I. Tchitcherov, p. 104.

১৬) 2nd Sep. 1777, Revenue Dept. G. General of Bengal in Council.

১৭) 22nd Dec 1778, Revenue Dept G General of Bengal in Council
১৮) Fort William 30th Aug 1779 Progs & Calcutta Committee of Revenue 2nd Aug, 8th Sep No 32
১৯) Anatomy S Sreemani, p 97
২০) তদেব, পৃ ৭১।
২১) List of Documents Vol - I, 1764 - 1800 Adhir Chakraborty, pp 130, 132, 133
২২) মিত্র পরিবারের বর্তমান বংশধর শ্রী আর্যকমল মিত্র থেকে পাওয়া তথ্য।
২৩) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ নান।
২৪) নান বাড়ীর সংরক্ষিত দলিল, ১৮২৬।
২৫) সংবাদ প্রভাকর, জুন ১৮৪৯।
২৬) Ghalib 1797-1869, Vol - Life and letters, Translated and edited by Ralph Russell & Khurshid Islam, Published - Genge Allen & Unwin Ltd Parsian Letters of Ghalib S A L Tirmizi - pp xxiii-xv
২৭) A History of Calcutta's Streets - P T Nair, p - 586
২৮) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ নান - আমাদের বংশের কথা।
২৯) Education General Record May 1868, p 309-310, Regarding purchase of Card Letter from the Secretary Bethune School Committee to Lt Governor of Bengal
৩০) Education General Record June, 1879 Letter dtd April 1879 from Manmohan Ghosh, Sect Bethune School Committee do D P I
৩১) Bethune School and College Centenary Volume History - J C Bagal, p-61 Reminiscences - Tatini Das, p - 172
৩২) Letter No S-3535 From S J Goode Central Municipal Office to Hon'ble Mr W W Hornell, D P I dated 7th Dec 1917
৩৩) শ্রী আর্যকমল মিত্রর তথ্য।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস ঃ বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতক
সন ১৩০১ - ১৩২৫

বাসব সরকার

সন ১৩০১-১৩২৫, বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটা বড়ো মাপের পরিবর্তনের সূচনা পর্ব বলে গণ্য করা যেতে পারে। সামাজিক ইতিহাস দুনিয়ার সব দেশেই সমাজ বাস্তবতায় এক ধরনের মিথস্ক্রিয়ার ফল। সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে মানুষের জীবনচর্যায়, অনুকরণে অনুসরণে একটা পরিবর্তনের হাওয়া না লাগলে, একটা তাগিদ অনুভূত না হলে, মানুষ অভ্যস্ত জীবনযাপন পদ্ধতি বদলায় না। তাকেই বলে পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব। তার পাশাপাশি সামাজিক অর্থনীতি, শাসননীতি, শিক্ষা স্বাস্থ্যনীতি সেগুলিও বদলায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক নিবিড়। এদের বলে পরিবর্তনের সমাজতত্ত্ব। পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব আর পরিবর্তনের সমাজতত্ত্ব. এই দুইয়ের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে সামাজিক ইতিহাস। এই আলোচনার স্বল্প পরিসরে বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে এই মিথস্ক্রিয়া কোথায় কিভাবে ঘটেছে, কিম্বা তাদের লক্ষ্য করা গেছে, তারই একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা হবে।

এই কাল পর্বেই দেখা যায় বাংলা দেশে কলকাতা নগরকেন্দ্রিক একটা শিষ্ট সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বাঙালির সমাজ জীবনে গ্রাম্যতা প্রায় অচলায়তনের মতোই বিরাজ করতো। আর গ্রাম্যতার পরিমণ্ডলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, চিন্তা ও চেতনার বৃত্তে সীমাবদ্ধতা এমনই অনড় ছিল যে নতুন কিছু করা বা ভাবা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মফস্বলে ব্যাপকভাবে, এমন কি কলকাতা শহরেও একটা ছড়া শোনা যেত ঃ

'বাংলাকে উচ্ছন্নে দিল তিন সেন,
উইল সেন, ইস্টি সেন আর কেশব সেন।'

উইল সেনের ছিল কলকাতার একটা নামকরা হোটেল যেখানে পঞ্জিকা মতে নিষিদ্ধ রসনাতৃপ্তির উপকরণ আস্বাদ করা থেকে বঙ্গীয় যুবকদের গ্রামে বাস করা, গুরুজন আর সমাজপতিরা আটকাতে পারছিলেন না। শহরমুখী টান তখন জোরালো হয়ে উঠছে ইস্টিসেনের কল্যাণে। রেলপথ যতো বিস্তৃত হয়েছে ততো যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার

ঘটেছে, ততোই কলকাতায় নতুন সব সদাগরী আপিসে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার যুব সমাজকে, গতানুগতিক চিন্তাধারার অনেক কিছু পরিত্যাগ করে, আকর্ষণ করতে শুরু করেছে এক অজানা জীবনের দিকে।

এই উচ্ছন্নে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল বাংলার বর্ণহিন্দু সমাজে। নিম্নবর্ণ কিম্বা নিম্নবর্গ, আর বাংলার মুসলমান কিম্বা ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের কথা এই ছড়ায় বলা হয়নি। তারা সম্মিলিতভাবে ছিল বাঙালির সমাজ জীবনে ব্রাত্যজন। এরা মুখ্যতঃ গ্রাম সমাজের মানুষ। গ্রামের ভদ্র পঞ্চজনের জীবনে এদের ভূমিকা নিছক শ্রমজীবীর। সেটা নগদ পয়সার বিনিময়ে হতে পারে, যদিও শ্রম ও মজুরীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক বাংলাব গ্রাম সমাজে উনিশ শতকে কোথাও স্বীকৃতি পেয়েছিল বলে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। আর নয়তো নিম্নবর্ণ কিম্বা নিম্নবর্গ উচ্চবর্ণের আশ্রিত, অনুগৃহীত ছিল বলে তারা বেশির ভাগ সময়েই বেগার দিতে বাধ্য হতো। তাই গ্রাম বাংলার উচ্চবর্ণের যুবকবৃন্দ, শিক্ষা কিম্বা রোজগার যে টানেই হোক না কেন, কলকাতা অথবা মফঃস্বল শহরবাসী হওয়ার সুবাদে চাকরির সূত্রে টাকা পয়সা যা পেয়েছে তা গ্রামে বসবাসকারী পরিবার বর্গের ভরণপোষণে কিছুটা খরচ হতে থাকলেও percolation তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক নিম্নবর্গের জীবনে তার চুঁইয়ে পড়া সুযোগ তেমনভাবে কোন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের দুঃখ দুর্দশাময় জীবনের কথা বলতে রামা কৈবর্ত কিম্বা পরান শেখদের উল্লেখ করেছেন ঠিকই, বাংলার ভদ্র পঞ্চজনকে নিম্নবর্ন ও নিম্নবগ সম্পর্কে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। এই ব্যবধান কতোটা ব্যাপক ছিল একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে।

উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ববঙ্গে গ্রাম জীবনে নমঃশূদ্ররা ছিল সংখ্যায় বিপুল এক জনগোষ্ঠী। সরকারি সুমারিতে তাদের 'চণ্ডাল' বলে উল্লেখ করা হতো। চণ্ডাল শব্দটির হীন সামাজিক তাৎপর্য ভদ্রজনের জানা ছিল না, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু সুমারিতে নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে এই ধরনের হীন ধারণা তুলে দেওয়ার জন্যে ভদ্রজনেরা আদৌ কিছু করেছেন বলেও জানা যায় না। ছোটলোকদের সামাজিক মর্যাদা কিছু থাকতে পারে, চণ্ডাল অভিধায় তারা আহত বোধ করতে পারে, সেই চেতনাও বাঙালি সমাজে জন্মায়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মধ্য ও পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজ সাড়া দেয়নি। নিজের বাঙালি পরিচয়, বাংলার দেশ পরিচয়ের মধ্যে তাদের গর্ববোধ করার মতো কিছুই ছিল না। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনে তাদের সামিল হওয়ার মতো প্রেক্ষিত ছিল না। বরং বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলায় যে নতুন প্রদেশ গড়ে ওঠে, সেখানে শাসক ইংরাজ ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর যে মুখিয়া অংশ বঙ্গভঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আশা করেছিল, তাদের কাছে নমঃশূদ্ররা হিন্দু বলেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই নমঃশূদ্র সমাজের চণ্ডাল অভিধা তুলে দেওয়ার দাবি সরকার সহজেই মেনে নেয়। ১৯১১ সালের সুমারিতে

নমঃশূদ্ররা স্বনামে নথিভুক্ত হয়, চণ্ডাল শব্দটি বাদ পড়ে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর এই সাফল্য নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, কংগ্রেসের মডারেট পর্বের নেতারা যে 'আবেদন নিবেদন' আর সাংবিধানিক প্রতিবাদ ও প্রতিকারের রাজনীতি চালু করে ছিলেন, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতারা সেই কৌশলই নিয়েছিলেন, যাকে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দর কষাকষির রাজনীতি বলে গণ্য করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষ বাংলার রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানের গুরুত্ব ও সমর্থনের মূল্য সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারে, যা তাদের সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বাড়াতে সাহায্য করে। গুরুচরণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'মতুয়া' সম্প্রদায় নামে তারা নিজেদের যে পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে চায় সামাজিক ইতিহাসে তার বিশ্লেষণও খুব দরকার।

শিষ্ট সমাজ গড়ে ওঠা একটা মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপার। সেটা বহুমাত্রিক পরিবর্তন। সেখানে ভাষার সঙ্গে রুচি, দৃষ্টিকোণ ও সাংস্কৃতিক মানের পরিবর্তনও ঘটে। উনিশ শতকের বাংলায় শহর কলকাতা থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও মানুষের আলাপচারিতায় যে শব্দের অনায়াস ব্যবহার হতো, তার মধ্যে দুটি বহুল প্রচলিত শব্দ এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। তার একটি হলো ' মাগী' এবং অনাটি 'রাঁড়'। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মন্সি রামরাম বসু তাঁর মনিব পাদ্রী কেরী সাহেবকে ধর্মপ্রচারের সময় সমবেত নারী ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে যিশুর বানী শোনানোর জন্যে যেভাবে সম্বোধন করতে শিখিয়ে ছিলেন, সেখানে ইংরাজি 'লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টলম্যান এ্যাণ্ড আদারস্ ' এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়। সেটা হল ' হে মাগী , হে মিন্‌সে ও অন্যান্য ফলানাগণ'। আট দশক পরে বিদ্যাসাগরের মুখেও শোনা যায় পড়শি কোন মহিলার কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার সময় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করতে 'মাগী কি বললে?' শিকাগো বক্তৃতার প্রায় তিন বছর পরে লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথের কাছে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে ইংরাজরা কর্ণপাত করছে না শুনে ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'ঘরে বসে মাগীদের মতো নাকে কান্নায় কেউ পাত্তা দেবে না'।

রামরাম বসু থেকে বিবেকানন্দ, উনিশ শতকের বাংলায় এঁরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু মহিলাদের সম্পর্কে বলার সময় অথবা পুরুষোচিত কাজের ঘাটতি দেখে তাকে ধিক্কার জানাতে নারী সুলভ আচরণ বলে চিহ্নিত করার সময় নির্বিকার ভাবে 'মাগী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিশ শতকের বাঙালির ব্যবহারিক জীবনে 'মাগী' শব্দটি অশালীন বলে চিহ্নিত হওয়ার যে পরিবর্তন আভাষিত, সেটাই হলো শিষ্ট সমাজ গড়ে ওঠার কাহিনী। উনিশ শতকে 'রাঁড়' শব্দটি বিধবা, বেশ্যা, রক্ষিতা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। কলকাতা সম্পর্কে গ্রাম বাংলার সেই বিখ্যাত ছড়া 'রাঁড়ী, বাড়ী, জুড়িগাড়ী, মিছে কথার কি কেতা/ আজব শহর কলকেতা' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। চতুর্দশ শতকের কলকাতায় এবং মফঃস্বলের বড়ো শহরগুলিকে রাঁড় শব্দ যারা ব্যবহার

কবতো, তাদেব ভদ্র সমাজের বাইরে গ্রাম্যরুচির মানুষ বলেই মনে করো হতো। মানসিকতাব এই পবিবর্তন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই শতকেই প্রথম ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য কবা যায়।

বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসের ছাত্ররা বলেন বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতকেব শেষ বছরে এবং শেষ মানস বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই রবীন্দ্রযুগেব সূচনা হয়েছে। তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত হওয়ার পরের দিন থেকেই রবীন্দ্রযুগের শুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুব দুই দশক পরেও চিত্তরঞ্জন ও সুরেশ সমাজপতি বঙ্কিমী ঠাট বাট বজায় বেখেই সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাংলায় সাহিত্য চর্চায় যে ধারা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠে, সেটাই শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির চেতনায় একটা আধুনিকতার মাত্রা যোগ করে। উনিশ শতক শেষ হওয়ার অনেক আগেই ব্রাহ্ম আন্দোলন ধর্ম সংস্কার আন্দোলোন হিসেবে তার জোর হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু নাগরিক চেতনার উন্নয়নে ব্রাহ্মসমাজ তখন ভিন্ন ধরনের একটা সংস্কার শুরু করেছিল। সেটা ব্যাপক সোরগোল তুলে অনেককে নিয়ে গড়ে তোলা আন্দোলন নয়, সেটা ছিল রুচি, মানসিকতা, জীবন দৃষ্টি ও বোধের মানোন্নয়নের আন্দোলন। ব্রাহ্মরা একালের বিচারে অনেকেই রক্ষণশীল ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকালে সামাজিক অচলায়তনে তাঁদের চাল চলন, দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশেই র‍্যাডিকাল মনে হয়েছিল। চিরায়ত রক্ষণশীলতা আর র‍্যাডিকাল আধুনিকতা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে শহরবাসী বাঙালি শতকরা একশ ভাগ আধুনিক হয়ে না উঠলেও একথা অনস্বীকার্য যে সমাজ জীবনে এই পরিবর্তনের হাওয়া তাদের অনেককেই বহু বিষয়ে সব কিছু জেনে নেওয়ার বদলে প্রশ্ন করতে শেখায়। এই জিজ্ঞাসাই হলো সামাজিক ইতিহাসে চলিষ্ণুতার ভিত্তি, তার পরিবর্তনের চাবিকাঠি।

এই সূত্রেই বাঙালি চেতনার আরেকটি বিশেষ পরিবর্তনের কথা বলা দরকার। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে বিনোদনের তেমন কোন ব্যাপক ব্যবস্থা কিম্বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ইতিহাস নেই। গড়পরতা মানুষ ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যেই দিন গুজরান করতো। বিনোদনের সুযোগ আসতো কোন পার্বণকে উপলক্ষ্য করে, মেলায় স্থূল বাঁধাধরা কয়েকটি বিষযে যাত্রা কিম্বা পালাগানকে কেন্দ্র করে, যেমন বেহুলা লখীন্দরের কাহিনী কিম্বা ফুল্লরা কালকেতুর কথা। স্বদেশী যুগেই দেখা যায় গ্রাম বাংলায় শৌখীন থিয়েটার, নাটক অভিনয় শুরু হয়েছে। সেই সময়ে বিশেষত চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলিতে দুর্গা পূজা বা এই ধরনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহর থেকে গ্রামে ছুটিতে আসা যুবকবৃন্দের উদ্যোগে সখের থিয়েটারের ব্যাপক প্রসার। তখন দ্বিজেন্দ্রলালেব দেশাত্মবোধক নাটক ব্যাপকভাবে অভিনীত হতে থাকে। বাঙালির আট পৌরে জীবনে বীরবসের যে ঘাটতি ছিল, যে ক্ষাত্র শৌর্যবীর্য উত্তর ভারতের একচেটিয়া অধিকার ছিল, বাঙালি টিনের তলোয়ার হাতে সেই সব বীর চবিত্রে অভিনয় করে অন্ততঃ মনের দিক থেকে পবাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে একটা লড়াকু চেতনা সাময়িক

ভাবে হলেও অনুভব করতো। আর তাদের আপামর দর্শক ও শ্রোতারা সেই চেতনার শরিক হতে শুরু করে, বলাবাহুল্য ধীরে, না জেনে না বুঝে, কিন্তু উত্তেজনার আগুন নিজেদের বুকের পাঁজরে ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে নিয়ে। বাঙালি 'প্যাট্রিয়টিজ্‌মের' গণভিত্তি এইভাবেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শিক্ষিত শহরবাসীরা তাতে আপ্লুত হয়েছে যতো সহজে, যতো তাড়াতাড়ি, গ্রামের মানুষ ততো সহজে কিম্বা তাড়াতাড়ি তা হয়নি ঠিকই, কিন্তু সেই প্রভাবের বাইরে থেকে যেতেও পারে নি।

তার ফল যে সব সময়ে সদর্থক হয়েছে, তা অবশ্যই বলা যাবে না। কারণ সেই সব নাটকে অনেক সময়েই মাত্র শৌর্যবীর্য প্রকাশ করা হয়েছে মুসলমান অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে। সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক মাত্রা অবশ্যই এসে যাওয়ার বিপদ ছিল। সেটা ঘটেও ছিল। স্বদেশীয়ানার আতিশয্যে সেই বিপদ, বিকাশমান রাজনৈতিক চেতনার নঙর্থক দিক বাঙালির প্যাট্রিয়টিজ্‌ম খণ্ডিত করে। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসে তার সদর্থক দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাচার, অনাচার যারাই সংগঠিত করুক না কেন, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব অত্যাচারী যে দুশমন্, এই চেতনা, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও ধীরে ধীরে মানুষের ভাবনার একটা ঠাঁই করে নেয়। তখন ক্রমেই রাজনৈতিক বিষয়, ঘটনা সামাজিক বিষয় ও ঘটনার সঙ্গে একাকার হয়ে একটা অখণ্ড দ্রোহী চেতনার জন্ম দেয়। দুনিয়ার সব দেশেই সামাজিক অচলায়তন ভেঙ্গে মানুষের ইতিহাস সৃষ্টির প্রস্তুতি পর্ব এইভাবেই শুরু হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাতে বাঙালির মননে ও চেতনায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে বাঙালির ন্যাশনালিজ্‌ম না বলে বাঙালির প্যাট্রিয়টইজ্‌ম বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙালি ভারত-মনস্ক হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা চিত্রটি নিঃসন্দেহে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু সেটা ছিল শিক্ষিত বাঙালির মননের ফসল। লক্ষ লক্ষ সাধারণ বাঙালি যাদের গোষ্ঠী চেতনা আর গ্রাম চেতনার বাইরে আর প্রায় কিছুই ছিল না, চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে তারা ক্রমেই বাঙালি হয়ে উঠতে থাকে। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি, যা কার্জনী বাংলায় তার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের বাইরে এসে বাঙালিকে দেশ ও সমাজ মনস্ক করে তুলতে উদ্যোগী হয়, সেখানে সেই সময়কার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বাঙালি কোন না কোন ভাবে এই শিক্ষাব্রতে অংশ নিয়ে ছিলেন, তাঁরা বাঙালির সমাজ চেতনাকে - দু'চার কদম এগিয়ে দিতে সাহায্য করেন। ডন সোসাইটির সেই সব শিক্ষার্থীরা সবাই রাজনৈতিক কর্মী হন নি, বরং নানা পেশায়, সরকারী ও বেসরকারী নানা কাজকর্মে যুক্ত হয়ে তাঁরা যে ধারায় প্রশিক্ষিত হয়ে ছিলেন, সেটাই বাংলা ও সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান, এই জাতপাতের সংকীর্ণতা ভেঙ্গে 'অজ্ঞ, মুচি, মেথরগুলিকে' ভাই বলে সম্বোধন করার ডাক, ঠিক তখনই কার্যকর হয়নি। বাঙালির সমাজ ইতিহাসে জাত পাতের বিভাজন যে কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি সেই ধারাকে এই শিক্ষার্থীর দল

আরো কিছুটা সঞ্জীবিত করে ছিল। এই রাজ্যে রাজনীতির যে র‍্যাডিকাল ধারার কথা বলা হয়, তা উপর থেকে আরোপিত কিম্বা ভুঁইফোঁড় নয়, তার একটা সামাজিক ভিত্তি, সাংস্কৃতিক আধার সবাব অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম পাঁচিশ বছরে। আর সেটা শুধু শিক্ষিত শহববাসী বাঙালির মানসিকতায় আবদ্ধ থাকে নি, ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি সমাজের পরতে পরতে।

বাংলার মুসলিম আমজনতার দিকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করলেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। বাঙালি হিন্দুর তুলনায় বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে দেরীতে। এই বহুশ্রুত কথাটি কেবল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত বাঙালির ক্ষেত্রে সত্য। এই আপেক্ষিক তারতম্যের মাপকাঠিতে বাংলার সামাজিক ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করা যায় না। কারণ হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গ আর মুসলিম সমাজে আত্রফ্ বা নিম্নবর্গের রাজনীতি ও সমাজ চেতনার কোন বিশেষ তারতম্য তখনও ছিল না, এখনও নেই। আলোচ্য কালপর্বে উভয়েই ছিল রাজনীতি ও সমাজে অন্তেবাসী, প্রান্তিক জন। গ্রাম বাংলার নিস্তরঙ্গ জীবনে যখনই শোষণ কিম্বা অপশাসন জনিত কোন আলোড়ন এসেছে তখন আশর্ফ্ নেতৃত্বের শত সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আত্রফ দের সামাজিক আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করা যাযনি। তারাও সোচ্চার হয়েছে আশর্ফ্ শোষকদের বিরুদ্ধে। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য সময়ের শেষ পর্বে, গান্ধী যুগে, যখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ তাতে অংশ গ্রহণ করেছে। অবশ্যই খিলাফতের ডাক সেখানে ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র অজানা কোন তুরস্কে খলিফার আসন বিপন্ন, তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার তাগিদ একটা আবেগগত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল মাটির কাছাকাছি বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতায় হিন্দু ও মুসলমান নিম্নবর্গের চেতনায় বিশেষ তারতম্য ছিল না।

চতুর্দশ শতকের প্রথম পাঁচিশ বছরে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিকাশ ধারা অবিরাম একরৈখিক ভাবে চলেনি। সেখানে ওঠানামার নানা টানাপোড়েন ছিল। দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বের সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, সাময়িক কর্মসংস্থান ও তারপর বেকারত্ব, নগরায়নের প্রসার, কলকাতা থেকে আশেপাশে লাইট রেলওয়ে চালু করে গ্রাম ও শহর জীবনে দৈনন্দিন অভিঘাতে সৃষ্টিব আয়োজন, মাঝে মাঝে শিশুপালবধ হলেও শিক্ষার বিস্তার, বাঙালি জীবন ও সমাজের যে অংশকে স্পর্শ করে সেখানেই একটা আলোড়ন নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় অনুভূত হচ্ছিল। বড়লাট রিপনের সংস্কারকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার বিস্তার, তার নিতান্ত সীমিত নির্বাচকমণ্ডলী সত্ত্বেও ভোট ও ভোটের রাজনীতি নিয়ে বাঙালির নানা রঙ্গব্যঙ্গ লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে, বাঙালির সমাজ জীবনের সীমিত বৃত্ত আর আগেকার মতো থাকছে না, থাকতে পারছে না। তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার জটিল যোগফল বাঙালির এই পর্বের সামাজিক ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

উত্তরবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক বৈচিত্র্য এবং নস্যশেখ সম্প্রদায়—একটি আলোচনা।।

বিষ্ণু প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। এর ভৌগলিক সীমারেখা দক্ষিণে গঙ্গা থেকে উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে বিহার থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমারেখায় বসবাসকারী অন্যতম আদি বাসিন্দারা হলেন স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী। উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগই হলেন তারা। সেই বিচারে আলোকিত অঞ্চলে মুসলমানরাই হলেন প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সামাজিক নৃতাত্বিক পরিচয়ে উত্তরবঙ্গের মুসলমানগণ মূলত দেশজ মুসলিম। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার বহু আগে থেকেই তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন কারণের জন্য স্থানীয় হিন্দুজনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা স্থানীয় হিন্দুজনগোষ্ঠীর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা রয়েছেন। শুধু ধর্মমতের ভিন্নতা ছাড়া উত্তরবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে স্থানীয় হিন্দুজনগোষ্ঠীর পেশা, কৃষ্টি, লোকাচার, চেহারা ইত্যাদিতে প্রভূত মিল রয়েছে। আঞ্চলিক বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতিতেও তাঁদের যোগসূত্রে কোন ছেদ পড়েনি।

আবার ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের মুসলমানগণ পারস্পরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ হলেও ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার, বৃত্তি, বসবাসের স্থান অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। এগুলির ভিত্তিতেই উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজ বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গের মুসলমানগণ মূলত অষ্ট্রিক মঙ্গোলিয়ড জাতির বিশেষত্ব বহন করে। প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে বসবাসকারী পুণ্ড্রজাতি সম্ভবত অষ্ট্রিকদের প্রাধান্যে এবং মঙ্গোলিয়ডদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। তারা আলোচিত অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল কৃষিভিত্তিক জনপদ আর গ্রামীণ সংস্কৃতি। মিনহাজউদ্দিন তাঁর 'তবকাৎ-ই-নাসিরিতে এবং বুকানন হ্যামিল্টন ও এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের কোচ মেচ বলে চিহ্নিত করেছেন। পনেরো শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বৈষ্ণব, শৈব ভাবধারার প্রচারে এবং মিথিলা কনৌজ

থেকে আসা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে স্থানীয় অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। আর ইতিহাসের এই সময়কালেই পীরদরবেশদের প্রচারে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় রাজবংশী, পালিয়া, মেচ প্রভৃতি জনজাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন।

উত্তরবঙ্গের জনসমাজ নির্দিষ্টভাবে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযান কালে। মিনহাজউদ্দিনের 'তবকাৎ ই নাসিরি' তে উল্লেখ আছে যে বখতিয়ার খিলজির এই অভিযানে পথ প্রদর্শক ছিলেন আদিবাসী দলপতি আলি মেচ। সম্ভবত আলি মেচই প্রথম ব্যক্তি যিনি উত্তরবঙ্গে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ শতকে গৌড়ে তুর্কিশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সুফী সাধকেরা সেখানে আসেন এবং গৌড় পাণ্ডুয়াকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ইসলাম ধর্মপ্রচারের স্বর্ণযুগ বলা যায়। উনিশ শতকেও বিশেষ করে ডুয়ার্স এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচার অব্যাহত ছিল। প্রাথমিকভাবে গৌড়ের সুলতানী শাসকদের সহায়তায় এবং সুফী সাধকদের উদার মানবতাবাদী প্রচারে উত্তরবঙ্গে ইসলামধর্মের যে বিস্তৃতি ঘটে তা হয়েছে মূলত স্থানীয় নিম্নবর্গীয় হিন্দুসমাজের ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে। ফলে ধর্ম পরিবর্তন হলেও তাঁদের ভাষা, কৃষ্টি, লোকাচার, খাদ্যাভাস ইত্যাদিতে মিল রয়ে গেছে স্থানীয় হিন্দুজন গোষ্ঠীর সঙ্গে। এ বিষয়ে শ্রীদুর্গাপদ সান্যাল তাঁর 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ''মীরজুমলা প্রথম রাজবংশীদিগকে মুসলমান করিয়াছিলেন।'' (১)

উত্তরবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর উৎসের দিকে লক্ষ্য রেখে হান্টার, বুকানন হ্যামিল্টনও মন্তব্য করেছেন যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানেরা মূলত ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান। সুফী পীর দরবেশরা তাঁদের উপর হাদিস শরিয়তের কঠোর বাধা নিষেধ আরোপ না করাতে পূর্বের ব্যবহারিক আচার আচরণে কোন প্রতিবন্ধকতা আসেনি। স্থানীয় মুসলমান সমাজ পুরাতন লোকাচারগুলিই মেনে চলেছেন। ফলত এতদঅঞ্চলে ইসলামের লোকায়তকরণ ঘটেছে। একই সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুসমাজ জীবনের অভিশপ্ত বর্ণব্যবস্থাও তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেনি। ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অষ্পৃশ্যতার কোন স্থান না থাকলেও এখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। মূলত নিম্নবর্গীয় হিন্দুসমাজের যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন হলেও পেশা বা সামাজিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বহুক্ষেত্রেই সামাজিক ভেদাভেদ রয়ে গেছে। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা। উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা ইত্যাদি দিক থেকে বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠী চোখে পড়ে। যাদের মধ্যে অন্যতম হল নস্যাশেখ গোষ্ঠী।

উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজের বৃহত্তম অংশই হল নস্যশেখ গণ যারা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহের গাজোল, চাঁচোলে বসবাস করেন। তাঁরা মূলতঃ রাজবংশী, পলিযা, কোচ, মেচ প্রভৃতি হিন্দুজনগোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত

হয়েছেন। এ বিষয়ে শ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্ধন লিখেছেন " বস্তুত রাজবংশী অঞ্চলবাসী মুসলমানেরা সকলেই হিন্দুসমাজ হইতে ধর্মান্তরিত, এদের উপাধি ছিল নস্য।"(২) বিখ্যাত লেখক ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন "এই উত্তরবাংলার প্রান্তে অনেকবছর আগে ছিলেন পঞ্চানন বর্মন উকিল। স্কুল কলেজের ভাল ছাত্র। ওকালতি করতে এসে দেখতে পেলেন বহু রাজবংশী 'নস্য' হয়ে যাচ্ছে।"(৩) নস্য কথাটি এসেছে নষ্ট শব্দ থেকে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে হিন্দুরক্ষণশীল সমাজপতিদের বিধানে তাঁরা পতিত বা নষ্ট বলে ঘোষিত হয়। সরকারী কাগজপত্রে , গেজেটে, দলিলেও তাঁদেরকে নস্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় হিন্দুরাজবংশী জনগোষ্ঠীর মতনই নস্যশেখ গণ রাজবংশী ভাষাতেই কথা বলেন। শুধু ভাষা নয়, খাদ্য, পোষাক, লোকাচার, সংস্কৃতি, পেশা ইত্যাদিতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। ব্যাবহারিক দিক থেকে নস্যশেখরা সরল, শান্ত এবং সুপ্রতিবেশী। ধর্মীয় দিক থেকে উদার এবং সহনশীল । হিন্দুরাজবংশী কৃষকের সঙ্গে নস্যশেখ কৃষকের পাশাপাশি বাস সুদীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে। তাঁদের মধ্যে পর্দাপ্রথা কম। কিন্তু শিক্ষাগত দিক থেকে নস্যশেখরা প্রধানত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবন নির্ভব। খুবই সামান্য সংখ্যক অংশ চাকুরীজীবি। মূলত কৃষিজীবি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যায় না। কুটির শিল্পেও তাঁরা খুব দক্ষ নন। কৃষিজীবিদের মধ্যেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বেশী। সেজন্য এই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ অভাবী রেখার নীচেই রয়ে গেছে।

মালদহ, দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান মুসলিম জনগোষ্ঠী হলেন শেরশাবাদিয়া বা বাদিয়ারা। এদের জীবনযাত্রা, ভাষা সংস্কৃতি এক অনবদ্য স্বকীয়তার পরিপূর্ণ। পেশা, চালচলনের ভিত্তিতে শেরশাবাদিয়ারা আবার তিনটি উপশাখায় বিভক্ত- যথা পেচি বাদিয়া, চাকাইয়া বাদিয়া এবং যোগিয়া বাদিয়া। শেরশা বাদিয়ারা মূলত কৃষিজীবি, তাঁদের মধ্যে চাকুরী জীবির সংখ্যা নেই বললেই চলে। সাধারণত নদী তীরবর্তী অনুর্বর জমিতে এরা বসবাস করেন। শেরশা বাদিয়ারা নিজেদের পাঠানবীর শেরশাহের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এর ইতিহাসিক সূত্র হিসাবে বলা যায় যে হুমায়ুনের শাসনকালে শেরশাহ গৌড় দখল করলে হুমায়ুন গৌড় পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হন। কৌশলগত কারণে তখন শেরশাহ গৌড় ত্যাগ করেন। সে সময় তাঁর বেশ কিছু সৈন্য এতদ অঞ্চলে থেকে যায়। সেই পাঠান সৈন্যদের জন্য মালদহ ও মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী তীরে নির্দিষ্ট হয় শেরশাবাদ পরগণা। শেরশাবাদ পরগণার পাঠান বংশধরবাই পরবর্তীতে শেরশাবাদিয়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ইতিহাসগত ভাবে তাদের সঙ্গে পাঠান সেনাবাহিনীর উৎস সূত্র থাকলেও বহুদিন ধরে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশ্রণ হওয়াতে বর্তমানে মালদহের চাঁইমণ্ডল, নাগরধানুক এবং রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চেহারাগত মিল বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এখন শেরশাবাদিয়ারা অধিকাংশ কৃষিজীবি। এরা কঠোর পরিশ্রমী, রক্ষণশীল, ক্রোধী একান্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। শিক্ষা এবং অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই

তাঁরা পিছিয়ে আছেন। ভাষাগত দিক থেকে এদের মধ্যে নিজস্ব উচ্চারণগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন রয়েছে। শেরশাবাদিয়ারা সাধারণত অন্যকোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন না। যদিও বিবাহে স্থানীয় লোকাচার মেনে চলেন।

মালদহের রতুয়া, কালিয়াচক, হরিশচন্দ্রপুর, পূর্ণিয়া কাটিহারের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী হল খোট্টা মুসলিমগণ। তাঁরা হিন্দি, উর্দু এবং বাংলা মিশ্রিত ভাষায় কথা বলেন। তবে কথাবার্তায় হিন্দির ছাপই বেশী। এদের মধ্যে শহরে বাস করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই ছোট বড় ব্যবসায়ে নিয়োজিত। নস্যশেখ এবং শেরশা বাদিয়াদের সঙ্গে এদের একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, এরা কৃষির চাইতে ব্যবসাতেই বেশী আগ্রহী। তাদের মধ্যে যেমন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কম তেমনি ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবির সংখ্যার আনুপাতিক হার বেশী। এছাড়া তাঁর যে স্থানীয় অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর তুলনায় আর্থিক দিক থেকে ভাল অবস্থায় আছে সেটা তাঁরা সচেতনভাবে কথাবার্তায়, আচার আচরণে বুঝিয়ে দেন। এঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী উদার। এঁরা শিক্ষায় আগ্রহী। তাঁদের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার কম। তাঁরা উত্তরবঙ্গের অন্য কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। ঘরের মেয়েদের মাঠের কাজে অংশ নেওয়াকে অমর্যাদাকর বলে বিবেচনা করেন। খোট্টা মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে চন্দনের ব্যবহার যা অন্য স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় অপ্রচলিত। মালদহে ও দিনাজপুরের আরেকটি পরিচিত জনগোষ্ঠী হল মোমিনগণ। মালদহের সুজাপুর, কালিয়াচক, উত্তর দিনাজপুরের কবদ দিঘি, ভাটোলে মূলত এঁদের বাস। সম্ভবত বখতিয়ার খিলজির গৌড় অভিযান কালে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোমিনদের আদি পেশা হল তাঁতের কাজ, সেজন্য অনেক জায়গাতেই তাঁবা জোলা নামে পরিচিত। অনেকেই এখন কৃষিকাজে নিযুক্ত। কিন্তু তাঁদের ভিতর সত্তর শতাংশই ভূমিহীন কৃষক। শিক্ষার হারও এঁদের মধ্যে কম। এই জনগোষ্ঠীর মহিলারা খুবই পর্দানশীল। হাটে বাজারে যাওয়া তাঁরা পছন্দ করেন না। এঁদের ভাষায় মৈথিলী এবং রাজবংশী ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়।

আনসারীরা মূলত বিহারের লোক। তবে বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প সংখ্যায় দুতিন পুরুষ ধরে বসবাস করছেন। তাঁতের কাজ তাঁদের মূল পেশা হলেও, দিনাজপুর জেলায় এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি শহবে বসবাসকারী আনসারীদের মূল পেশা হল লেপতোষক বানানো, জুতা তৈরী করা, কসাইবৃত্তি ইত্যাদি। আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষাগত পরিস্থিতি উভয় দিক থেকেই তাঁরা পিছিয়ে আছেন। আনসারী জনগোষ্ঠীর মহিলারা মোমিন গোষ্ঠীব মহিলাদের মতই পর্দানশীল। বাল্যবিবাহের হারও এদের মধ্যে বেশী। আনসারীরা হিন্দি মিশ্রিত বাংলায় কথা বলেন।

ত্রিশ, চল্লিশের দশকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার কালজানি সংকোশ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। স্থানীয় মানুষের কাছে ভাটির দেশ থেকে আসা এই মানুষেরা সাধারণভাবে ভাটিয়া নামে পরিচিত। ভাটিয়া মুসলমানগণ পূর্ববঙ্গীয় বাংলা উচ্চারণে কথা বলেন। শুধু ভাষা নয় চালচলন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এমনকি খাদ্যাভাসেও তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় রাজবংশী নস্যশেখ মুসলিমদের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়া মুসলিমগণ খুবই পরিশ্রমী এবং কৃষিকাজে দক্ষ। কিন্তু তাঁদের মহিলারা খুবই পর্দানশীল, পুরুষদের সাথে মাঠের কাজে তাঁরা অংশ নেন না। কৃষিকাজ ছাড়াও এঁদের অনেকেই মাছ বিক্রি, সবজি বিক্রি, রিক্সা চালানো ইত্যাদি সাধারণ পেশাও বেছে নিয়েছেন। তবে ব্যবসাতে এঁদের আগ্রহ কম। ভাটিয়া মুসলিমাদের বিয়েতে গানের প্রাধান্য চোখে পড়ে। শহর থেকে দুরে নদীর ধারে বসবাসকারী ভাটিয়া মানুষদেব মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম। এঁবা বাইরে থেকে এসেছেন বলে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীর কাছেই তাঁরা খুব পছন্দের লোক নন। তবে অনেক দিন ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে অপছন্দের ধার কমে এসেছে।

মালদহতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী হল হোসেনী গোয়ালারা। তাঁরা প্রধানত দুধ এবং দুধের তৈরী জিনিষ সরবরাহ করে থাকেন। বহুকাল আগে তাঁরা গৌড়ের রাজদববারে দুধ সরবরাহ করতেন। সম্ভবত সুলতান হোসেন শাহের সময়ে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হোসেনী গোয়ালা নামে পরিচিত লাভ করেন।

মালদহ এবং উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে মুসলিম সম্প্রদাযের বিশেষ কৌলিন্য উপাধিধারী সৈয়দ জনগোষ্ঠীর বাস। এঁরা নিজেদের সুফী পীরদের বংশধর বলে পরিচয় দেন। নিজেরাও খুবই পীরভক্ত। পীরের উরসে তাঁরা গজল কাওযালী গেয়ে থাকেন। তাছাড়াও অন্য মুসলিম ধর্মীয় আধ্যাত্মিক গানও তাঁরা করেন। সৈয়দ বলে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামিক ধর্মীয় নিয়ম কানুন মেনে চলেন। এঁদের মধ্যে উর্দুভাষার চল বেশী হলেও কথ্যভাষা হল সূর্যপুরী। এখন এঁদের মূল জীবিকা হল কৃষিকাজ। সামান্য অংশই চাকুরী করেন। সামাজিক ক্ষেত্রে উঁচুবংশজাত বলে নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলেন। স্থানীয় অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সৈয়দদের যথেষ্ট সমীহ করে চলেন। প্রতিবেশী অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এঁদের বিবাহ হতে দেখা যায় না। সৈয়দ পবিবারের মহিলারা খুবই পর্দানশীল। এঁদের মধ্যে বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত এবং একই সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উপেক্ষিত।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ও সংলগ্ন এলাকায় দাই নামে ছোট একটি জনগোষ্ঠীর বাস। এরা নিজেদের সামাজিক কৌলিন্য প্রমাণের জন্য আরবের বিখ্যাত হালিমা দাইয়ের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, যদিও তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বরঞ্চ স্থানীয় নিম্নবর্গীয় হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁদের ভাষা, পেশা ও চেহারাগত মিলই বেশী

চোখে পড়ে। অনুমান করা কঠিন নয় যে স্থানীয় হিন্দুসমাজ থেকেই কোন কারণে তাঁরা স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে দাইরা অর্থের বিনিময়ে অন্যের সন্তান দেখাশোনা করেন এবং সন্তান সম্ভবা নারীকে প্রসবে সাহায্য করে থাকেন। তবে দাইয়ের কাজ সবসময় পাওয়া যায় না বলে অন্য সময় এই গোষ্ঠীর মহিলারা অন্যের বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করে নিজেদের সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। পুরুষেরা সাধারণত জনমজুরের কাজ করেন। আবার এদেরই একটি অংশ মাটির হাড়ি কলসী গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করে থাকেন। পেশাগত কারণেই মহিলারা পর্দানশীন নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এঁদের গোঁড়ামী কম। এঁদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

চুল দাড়ি কাটা বা ত্বকচ্ছেদন কাজে যে জনগোষ্ঠীর লোকেরা ব্যস্ত সাধারণভাবে তারা হাজ্জাম বা নাউয়া নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। এরা মূলত বিহারের অধিবাসী। বৃত্তিগত প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গে বাস করছেন। হাজ্জামরা জনমজুর বা কৃষিকাজ করেন না। পড়াশুনোর চল তাঁদের মধ্যে কম। বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত। কিন্তু বিবাহ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার বিহার সীমান্তে বসবাসকারী কথাবার্তায় অত্যন্ত দড় এক জনগোষ্ঠী ভাট নামে পরিচিত। কোথাও নতুন সন্তান হলে সেখানে তাঁরা যায়, নাচগান করে, নবজাতকের মঙ্গল কামনা করে পয়সা নেয়। জনশ্রুতি আছে যে ভাটদের কোলে নতুন শিশুকে দিলে সে তাড়াতাড়ি কথা বলা শিখবে। অধুনা এদের অনেকেই অন্যান্য পেশায় অর্থাৎ ছাতা মেরামত, দর্জির কাজ করেন। তাঁরা হিন্দি প্রভাবিত বাংলায় কথা বলেন। ভাটদের একটি বৈশিষ্ট্য হল এদের অনেকেই নামের শেষে 'রায়' উপাধি ব্যবহার করেন।

উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই গাইন নামে এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস যারা সত্যপীর, মাদারপীর অর্থাৎ পীরের গান গেয়ে রুজি রোজগার করে থাকেন। মালদহ জেলার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় নাড়েগুস্তি নামে পরিচিত এক জন গোষ্ঠীর বাস। এঁদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে হিন্দুয়ানীর ছাপ রয়েছে। যেমন কোন অনুষ্ঠানে তাঁরা আলপনা দেন, বৈশাখ মাসে বুড়ীমার পূজা করেন। এ থেকে মনে হয় যে এরা কোন স্থানীয় নিম্নবর্গীয় হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। মাছধরা, মাছ বিক্রি অর্থাৎ মাছের ব্যবসায়ে লিপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা পাঁঝরা নামে পরিচিত। পেশাগত কারণে এদের সঙ্গে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের তেমন মেলামেশা গড়ে ওঠেনি এবং ইসলামিক রীতি নীতিও দৃঢ়ভাবে স্থান নেয়নি। তার একটি বহিঃ প্রকাশ হল এই গোষ্ঠীর বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে সিঁদুর পরার চল। মালদহের কালিয়াচক এবং উত্তর দিনাজপুরের বিহার সীমান্তে কুঁঝড়া নামে পরিচিত এক জনগোষ্ঠীর বাস। এদের অন্যতম জীবিকা হল মাছ ও শাকসবজি বিক্রি করা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেলদার, চুনারী, কাঠিগোড়া, শেখ প্রভৃতি অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজের বড় অংশই বৃত্তিগতভাবে কৃষিজীবি। সহজ সরল সুপ্রতিবেশী এই গ্রামীন মানুষেরা রাজনীতিতে কখনও তেমন উৎসাহ দেখাননি। ওয়াহাবী ফরাজী বা আলিগড়, পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের আন্দোলন থেকে তাঁরা দূরে থেকেছে। মাটি আর ফসলকে ছেড়ে, শুধু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে পুরাতন প্রতিবেশীকে ত্যাগ করে ভাগ্যপরীক্ষা করতে অপরিচিত পার্শ্ববর্তী দেশে তাঁরা যাননি। হাজার বছর ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজ। কিন্তু আজকের অর্থনৈতিক কঠিন অবস্থায় বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট ঘনিয়ে আসাতে মূলত কৃষিজীবি এই মানুষেরা একান্ত ভাবেই বিপর্যস্ত। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার জন্য তাঁদের চাকরী পাওয়ার সমস্যা রয়েছে। আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়াতে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিপাটাও নেই। ইসলাম তাঁদের পুরাতন উচ্চবর্গীয় হিন্দুসমাজের অবহেলা থেকে সামাজিক মুক্তি দিলেও আর্থিক মুক্তি ঘটেনি। তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তরবঙ্গে বিষময় পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। জনবিন্যাসের সংখ্যালঘু দারিদ্র সীমার প্রান্তবাসী এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি শুধু উত্তরবঙ্গ নয় দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থেই আজ একান্ত প্রয়োজন।

সূত্র-নির্দেশ

১) মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা (১৩৯৪) ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ লিখিত জলপাইগুড়ি জেলার মুসলমান সমাজ প্রবন্ধে উল্লিখিত। পৃঃ ১২৩

২) ঐ পৃঃ ১২৩

৩) ধনঞ্জয় রায় লিখিত উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন গ্রন্থে (নর্থ হাট পাবলিকেশন, অতুলমার্কেট, মালদহ - ১৯৮৯) উল্লিখিত। পৃঃ ৭৫

এছাড়া প্রবন্ধটি লেখার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত বইপত্রের সাহায্য নিয়েছি

১) মধুপর্ণী ঃ বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা (১৩৮৪), মালদহ জেলা সংখ্যা (১৩৯২), কোচবিহার জেলা সংখ্যা (১৩৯৬), পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা (১৩৯৯)

২) মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজ ঃ বজলে রহমান-সানামা এণ্ড কোং, আর এন রোড, কুচবিহার (১৯৯৬)।

৩) বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস ডঃ আব্দুল করিম - বাংলা একাডেমি, ঢাকা (জুন ১৯৯৩)

৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী ঃ মীনহাজ ই-সিরাজ-বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (১৯৮৩)

৫) A Statistical Account of Bengal-(Vol-X) W W Hunter-First re-printed in 1974- DK Publisling House, Ananda Nagar, Delhi - 38.

৬) Moslems of Rural Bengal (A study in social stratification and Socio cultural maintenace) · Ranjit Kumar Bhattacherjee, Subarnarekha, Calcutta - 9 (1991)

কলকাতার ইতিহাসে ইহুদিরা

ডালিয়া রায়

কলকাতার ইতিহাসে আগষ্ট মাস হলো অনেকগুলো শুভ তারিখযুক্ত। যেমন জব চার্ণকের কলকাতায় আগমনের তারিখ ২৪শে আগষ্ট তেমনি ১৭৯৮ সালের ১ লা আগষ্ট অর্থাৎ জব চার্ণকের কলকাতায় আগমনের ঠিক ১০৮ বছর পরে কলকাতার ইহুদিদের জনক শালোম বেন্ আরোন্ বেন্ ওবাদিয়া হা-কোহেন কলকাতার সর্বপ্রথম ইহুদি বসতি স্থাপন করেন ক্যানিং স্ট্রীটে।

যদিও শালোম কোহেন ছিলেন সুরাটের একজন সচ্ছল ও প্রতিষ্ঠিত মণিকার ও মাণ ব্যবসায়ী, পরে কলকাতার আর্মেনিয়ানদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কথা জেনে তিনি কলকাতায় ইহুদি বসতি গড়ায় মনস্থির করেন। অন্তঃপর সুরাট ত্যাগ করে বোম্বে, মাদ্রাজ ও কোচিন হয়ে কলকাতায় পৌছলেন এবং ক্যানিং স্ট্রীটে এক বড় বাগানবাড়ীতে এসে উঠলেন মাসিক ৭২.৮০ টাকা ভাড়ায়। কলকাতায় শালোমের রুফতানি ব্যবসা বেশ রমরমা হয়ে ওঠে। ফলে নিজের আত্মীয় স্বজন ছাড়াও তিনি কোচিনের ইহুদিদের তাঁর ব্যবসায় নিয়োগ করতে লাগলেন। তাঁর হীরে জহরতের ব্যবসা চলতো প্রধানতঃ পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রদেশগুলোর রাজসভায়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, তৎকালীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, ১৮৩০ সালে কলকাতার রাজভবনে শালোমকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃ পর শালোম কোহেন কলকাতার প্রথম সিনাগগ্ বা প্রার্থনা গৃহ স্থাপনের জমি দান করেন। এই সিনাগগের নাম হলো নেভে শালোম সিনাগগ্। ১৮৩৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে শালোম কোহেনের মৃত্যু হয় কলকাতাতেই এবং কলকাতার অন্তর্ভুক্ত নারকেলডাঙ্গায় অবস্থিত ইহুদি সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি জীবিতকালীন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছে জমি দান করে যান এই সমাধি ক্ষেত্র নির্মাণের জন্য।

কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের মুখ্য অংশ হলো বাগদাদী ইহুদি অর্থাৎ বাগদাদ, ইরাক এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বহিরাগত ইহুদিরা। কলকাতার প্রতি ইহুদিদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ ছিল আবাসনের সুযোগ সুবিধা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা কারণ কলকাতা তখন সমগ্র পূর্ব ভারতের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিলাভ ও

চীনা বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রবেশ পথ হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলো।

কলকাতায় ইহুদিদের সংখ্যা কখনই খুব বেশী ছিল না। বিগত ১৮১৫ সাল পর্যন্ত এদের সংখ্যা ৫০ জনের বেশী ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এদের সংখ্যা ছিলো সবচেয়ে বেশী প্রায় ৫ (পাঁচ) হাজার জনের মত। এর প্রধান কারণ ছিল রেঙ্গুন থেকে আগত ইহুদি শরণার্থীদের সংখ্যা। ১৯১১ সনের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মোট ১৯২০ জন। বর্তমানে কলকাতার ইহুদিদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয়। এখন তাদের সংখ্যা মাত্র ৫৩। ৫৪ জন। এই ক্ষীয়মান সংখ্যার অন্যতম কারণ হলো দ্বিমুখী ... যথা ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের ফলে কলকাতাবাসী ইহুদিদের একটা বড় অংশ ইজরায়েলে পাড়ি দিল এবং অন্যদিকে ১৯৫০ সালের পর থেকে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর বিত্তশালী ইহুদিরা বেশীরভাগ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় কলকাতা ছেড়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলে গেলো।

ইহুদিদের সিনাগগ্ বা প্রার্থনা ভবন হলো ইহুদি জীবনধারার প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় ইহুদিদের তিনটি সিনাগগ্ আছে। ১৮২৫ সনে ইজেকেল জুডা জ্যাকব ৫, শুক্তিহাটায় সর্বপ্রথম নেভে শালোম সিনাগগ্টি স্থাপন করেন। বিগত ১৮৫৫ সালে ডেভিড্ জোসেফ এজরা ও ইজেকেল জুডা মিলে ২৬/১ নম্বর, পোলক্ স্ট্রিটে বেথ্ এল্ সিনাগগ্ স্থাপন করেন। এরপর ১৮৮৩ - ৮৪ সালে এলিয়া এজরা তাঁর স্বর্গীয় পিতা ডেভিড জোসেফ এজরার স্মৃতি রক্ষার্থে ক্যানিং স্ট্রীটে মাঘেন ডেভিড সিনাগগ্টি স্থাপন করেন।

এই সিনাগগ্গুলি নির্মাণ হওযার পূর্বে ইহুদিরা শালোম কোহেনের বাড়ীতে প্রার্থনা সভার আয়োজন করতেন। দ্বিতীয় প্রার্থনা হলটি ছিলো আমড়াতলায় ৪৯, এজরা স্ট্রীটে খান হাজী মাসু দার বাড়ীতে। এছাড়া অন্যান্য প্রার্থনা হলগুলো ছিলো যত্রাক্রমে ২৫ ব্ল্যাকবার্ন লেনে মাঘেন এবথ্ এবং ৬, সদর স্ট্রীটে শারে রাসোন্।

কলকাতার ইহুদিদের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোসেস্ সাইমন্ দোয়েক্ কোহেন ১৭৮৬ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত। ইনি ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের হাজান্ বা প্রার্থনা সভার পরিচালক এবং সুন্নত অনুষ্ঠানের বা সারকামসিশানের মোহেল্ বা পরিচালকও ছিলেন। মোসেসের পৌত্র এলিয়াস্ মোসেস্ ডোয়েক্ কোহেন ১৮৭৩ সাল থেকে নেভে শালোম সিনাগগের হাজান ছিলেন এবং ১৮৮৩ - ৮৪ সাল থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত মাঘেন ডেভিড সিনাগগের হাজান ছিলেন।

কলকাতার এই সিনাগগ্গুলোতে ইউরোপীয় প্রথার পরিবর্তে প্রাচ্য দেশীয় ইহুদি ধর্মাচার ও প্রথা মান্য করা হয়। সিনাগগের ভেতরে পূর্বমুখী কক্ষে কাঠের , রুপো বা সোনার তৈরী কেসের মধ্যে তোরাহ্ বা মোজেসের পাঁচটি গ্রন্থের সমন্বয় হয়। এই তোরাহ্ লেখা হয়েছে পার্চমেন্ট বা ভেড়ার চামড়ার ওপর হাতে লেখা হিব্রু ভাষায়। ধর্মসভায় উপস্থিত ইহুদিরা আর্ক্ অর্থাৎ যেখানে তোরাহগুলো রাখা হয় সেদিক মুখো হয়ে ঈশ্বরের

আরাধনা করেন। এই সিনাগগ্গুলোতে ইহুদি পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক বসার জায়গার ব্যবস্থা করা আছে। মহিলারা বসেন সিনাগগের উপরের ব্যালকনিতে এবং পুরুষেরা বসেন একতলায়। মাঘেন ডেভিড সিনাগগ্টি প্রাচ্যে সর্ববৃহৎ সিনাগগ এবং এখানে একসাথে ৬০০ জনের বসার জায়গা আছে। তাছাড়া অতিরিক্ত আবো ৪০০ জনের বসার জায়গা আছে। বর্তমানে মাঘেন্ ডেভিড ও বেথ্ এল্ সিনগগে পালা করে প্রতি শনিবার ও রবিবারে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেভে শালোম্ সিনাগগ্টি বর্তমানে ভগ্নদশা এবং এখানে এখন কোন প্রার্থনা সভা হয় না।

কলকাতার ৪৫ নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রটি ইহুদিদের সর্বপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এলিয়া এজরা সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অতিরিক্ত ১৪,৪০০ বর্গ ফুট জমি কিনে সম্প্রসারণ করেন। বিগত ১৯৮৮ সালে সমাধি ক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে আরো ৪ বিঘা ৮ কাঠা ১৪ ছটাক জমি ক্রয় করা হয়। সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে আলাদা ভাবে জায়গা সংরক্ষিত আছে বেনে ইজরায়েল, কোচিন, বাগদাদী ও আশকেনাজি ইহুদি ও শিশুদের সমাধিব জন্য। এখানে প্রায় ২০০ জন বেনে ইজরাইলির, ১০০ জন কোচিনির ও ৩০০ জন আশকেনাজী ইহুদির সমাধি আছে। তাছাড়া কোহেন বা ইহুদি পুরোহিত শ্রেণীর সমাধির জন্য সমাধি ক্ষেত্রের প্রবেশপথের মুখে একটি বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট করা আছে।

বর্তমানে সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে প্রার্থনা হলটি ভবঘুরেদের স্থায়ী আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের বর্তমান জনসংখ্যা এবং আর্থিক সংগতি হ্রাস পাওয়ার ফলে বাইরের লোকজনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা বা জরাজীর্ণ সমাধিগুলি মেরামত করা অসম্ভব হয়ে দাঁরিয়েছে।

১৮৬৬ সালের পূর্বে কলকাতার ইহুদিরা বড়বাজার কলুটোলা এলাকায় বসবাস করতো। ১৯৮১ সালের পর থেকে তারা ক্রমে দক্ষিণ কলকাতায় বসতি স্থানান্তর করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বহু দরিদ্র ইহুদি ইরাক ও বাগদাদ থেকে কলকাতায় আসে এবং তারা বসতি স্থাপন করে ক্যানিং স্ট্রীট ও এজরা স্ট্রীটের সংলগ্ন এলাকায় হরিনাভি লেন ও চীনাপাড়ায়।

ইহুদিরা কলকাতার বাঙালী বা অবাঙালীদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা কবতো না। ফলে কলকাতাব বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি তাদের কোন একাত্মবোধ গড়ে ওঠেনি। যদিও বাগদাদী ইহুদিদের মাতৃভাষা আরবী কিন্তু তারা ক্রমে ইংবাজী ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। হিব্রু ভাষা সংরক্ষিত রইলো কেবলমাত্র তোরাহ্ অধ্যায়ন ও চর্চার জন্য।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা ইহুদি ছেলেমেয়েদের ধর্মান্তর করার প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য ইহুদিরা কলকাতায় দুটো স্কুল স্থাপন করে। মোজেস্ ডি জেকব্ আবিয়াসিস্ ১৮৮১ সালে ইহুদি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন গরীব ইহুদি সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের

উদ্দেশ্যে। এই বিদ্যালয়ে হিব্রু ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয় ইংরাজী মতে শিক্ষা দেওয়া হত।

১৮৯৪ সালে এই বিদ্যালয়টি ইয়োরোপীয়ান বিদ্যালয় হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়। এই স্কুলে পাঠরতা ইহুদি বালিকাদের জন্য ১৯৩৭ সালে স্থাপিত হয় একটি হোস্টেল। এই হোস্টেলটি নির্মাণ করে ইহুদি মহিলা লীগ। গত ১৯৫৫ সালে এই বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবন স্থাপিত হয় ৬৫, নম্বর পার্ক স্ট্রীটে। মিস্ ডাফ্রিন ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষায়িত্রী এবং মিস্ রামা লুডি এই বিদ্যালয়ের শেষ ইহুদি অধ্যক্ষা ছিলেন ১৯৬৬ সন পর্যন্ত। এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতী ছাত্রী হলেন মাটিল্ডা কোহেন যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী ইহুদি মহিলা ও রাশেল কোহেন যিনি একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও কলকাতার ডাফ্রিন হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন।

বিগত ১৮৮২ সনের নভেম্বর মাসে কলকাতায় স্থাপিত হয় ইহুদি বালিকাদের বিদ্যালয়টি। এলিয়া ডি, জে, এজরা এই অবৈতনিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন গরীব ইহুদি সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য। পরবর্তী কালে এই বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এলিয়াস্ মেয়ারের অকৃপণ বদান্যতায় বিদ্যালয়টির নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ সম্ভব হয় ১৯২৫ সালে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি 'এলিয়াস মেয়ার ফ্রি স্কুল এন্ড তামুস তেরাহ্' নামে পরিচিত।

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের পর প্রচুর সংখ্যায় ইহুদিরা স্থায়ী ভাবে কলকাতা ত্যাগ করার ফলে এই দুটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের এই স্কুল গুলিতে ভর্ত্তি করা হবে বেতনের ভিত্তিতে। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় এই বিদ্যালয় দুটিতে এবং বর্তমানে কোন ইহুদি ছাত্র, ছাত্রী, কর্মচারী বা শিক্ষক ও শিক্ষিকা এই স্কুল দুটিতে নেই। এক মাত্র ব্যতিক্রম, যে বালকদের বিদ্যালয়টিতে কেবল মাত্র একজন ইহুদি শিক্ষিকা আছেন। এই দুটি বিদ্যালয়ে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড ও সেন্ট্রাল বোর্ড) স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়।

কলকাতাবাসী ইহুদিদের বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তৎকালীন ইহুদিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী এবং কলকাতার ভৌগলিক ও সুবিধাজনক অবস্থা ইহুদি ব্যবসায়ীদের কাছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। কোহেন্ মরডিকাই, এয়িয়াস্ ও অন্যান্যদের নাম কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটা শীর্ষস্থানীয় স্থানের অধিকারী হয়ে আছে। কলকাতায় ইহুদি ব্যবসায়ীরা পাট, তুলো, মশলাপাতি, নীল, সিল্ক ও মস্লিন ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষপত্রের কারবার ছিল। এছাড়া ইহুদিরা ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী রফতানী বাজারে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করেছিল ইউরোপে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। তারা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলি যথা ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং, শাংহাই এবং পেনাং ইত্যাদি দেশের সাথেও ব্যবসায় লিপ্ত ছিলো। চীন দেশে আফিং রফতানির কারবারে পারসিদের তুলনায় খুব বেশী পিছিয়ে ছিলো না

ইহুদিরা।

ইহুদিবা ব্যবসায়ীরা মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ। স্যার ডেভিড্ এজরা একাধিক শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার পরিচালক ছিলেন যথা - কয়েকটি পাটকল, কয়লা কোম্পানী, পটারী কোম্পানী, শিপিং কোম্পানী, ময়দাকল, স্টীল কর্পোরেশন, গ্যাস কোম্পানী, বেঙ্গল -আসাম স্টীমশিল্প কোম্পানী, হাওড়া তেলের মিল ও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। এজরাব চৌরঙ্গী ম্যানসন, এসপ্ল্যানেড্ ম্যানসন, এজরা ম্যানসন, এজবা টেরেস ইত্যাদির মালিক ছিলেন। পাটের ব্যবসায় বি এন এলিয়াস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সাগরপাড়া জুট কোম্পানী লিমিটেড, ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া , এম্পায়ার বোন মিলস্ লিঃ, মেফেয়ার এস্টেটস্ লিঃ, মেদিনীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই, কৃষ্ণনগর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং আরো অনেক কোম্পানীর অধিকর্তা ছিলেন। মরডিকেই ফ্যামিলি ডঃ সেন এন্ড কোম্পানীর মালিক ছিলেন - এরা চাট্নী ও আচারের ব্যবসায়ী ছিলেন। এছাড়া নাহুম্ পরিবার কলকাতার নিউ মার্কেটে (হগ্ মার্কেট) নাহুমস্ এন্ড সন্স্ নামে কেকের দোকানটি সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন গত ১৯১৫-১৬ সন থেকে।

১৮৮৮ সালের ১লা মার্চ স্বর্গীয় এলীয়া এজরার স্ত্রী মোজেল এজরা কলকাতা মেডিকেল কলেজের চত্বরের মধ্যেই এজরা হসপিটাল স্থাপন করেন। দুঃস্থ ইহুদি রোগীদের চিকিৎসার জন্য। এই হাসপাতালটি এখনও চালু আছে, তবে সব রোগীই এখন বাঙালী ও অবাঙালী।

কলকাতায় ইহুদিরা অনেকগুলি ক্লাব ও সমিতি স্থাপন করে ছিল তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য। ১৯১৩ সনে গঠিত হয় জুইশ ওমানস্ লীগ ইহুদি মহিলাদের ও দরিদ্র ইহুদিদের কল্যাণের জন্য। এই লীগটি এখনও বজায় আছে এবং তার দায়িত্বে আছেন মিস রামা মাস্লিয়া যিনি এই লীগের সেক্রেটারী।

১৯২১ সালের ৩১ শে জুলাই গঠিত হয় জুইশ এসোসিয়েশান অফ্ ক্যালকাটা। এই এসোসিয়েশানটি বর্তমানে কেবলমাত্র নামে বেঁচে আছে এবং ডেভিড, ই, নাহুম হলেন এই সংস্থার বর্তমান রেজিষ্ট্রার। এছাড়া ছিল হাবোনিম ক্লাব, মাকাবি ক্লাব, জুডিয়ান ক্লাব, জুইশ এথ্লেটিক ক্লাব ও জুইশ স্কুল বয়েস ক্লাব।

১৮৪১ সালে রাবাই ইলাজার বি, মারী আরোন বি, সাওভিয়া ইরাকি হা - কোহেন কলকাতার প্রথম হিব্রু প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪১ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে তিনি ২৮ টি হিব্রু পুস্তক ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এরপর ১৮৭১ সনেও এজেকেল বেন্ সিলিম্যান হানিন্ আর একটি হিব্রুপ্রেস স্থাপন করেন কলকাতায়। তিনি 'মাবাসার' নামে একটি হিব্রু-আরাবিক ভাষায় সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে জুন মাসে প্রথম হিব্রু ভাষায় সাপ্তাহিক গেজেট প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে হাককাম্ শেলেমা আবিদ্ টুইনা তৃতীয় হিব্রু প্রেস চালু করেন কলকাতায়। ইনি শেলেমা আবিদ্ টুইনা তৃতীয় হিব্রু প্রেস

চালু করেন কলকাতায়। ইনি মাগিদ্ মেশারিম নামে একটি হিব্রু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালের পর থেকে কলকাতার ইহুদিদের মধ্যে হিব্রু-আরাবিক ভাষার চলন হ্রাস পায় কারণ ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রবণতা ও ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করাই ইহুদি যুবক যুবতীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ফলে উনিশ শতকে ইহুদিরা কিছু পত্রিকা বের করে ইংরাজি ভাষায় যেমন - দি ইষ্টার্ন হিব্রু এন্ড এনুয়াল্, শেমা, ইত্যাদি।

ইহুদিরা কলকাতার উন্নয়ন ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলো। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের অবদান পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কলকাতার ছেলে মেয়েদের জন্য ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ব্যতীত, ইহুদিদের বিদ্যালয়গুলি বহু মানুষের কর্মসংস্থান করে চলেছে। কলকাতার অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ও সফলতা এবং তাদের জনহিতমূলক কার্যের মাধ্যমে ইহুদিরা এক সমৃদ্ধ গৌরবগাথা রেখে গেছে যা কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তথা সমগ্র জাতির ইতিহাসে গৌরবপূর্ণ বিষয় বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য।

সূত্র-নির্দেশ

১) আইজ্যাক, এস, এব্রাহাম, 'ওবিজিন এন্ড হিসট্রি অফ্ দি ক্যালকাটা জুস', ক্যালকাটা, ১৯৬৯।

২) মাভিস হাইম্যান, 'জুস অফ্ দি রাজ', লন্ডন, ১৯৯৫

৩। রাজ কৃষ্ণ (এডিটেড) 'ফ্লম থেমস্ টু হুগলী', ক্যালকাটা হেরিটেজ; নিউ দিল্লী, ১৯৯১।

৪) কাট্জ নাথান (এডিটেড), 'স্টাডিস অফ ইন্ডিয়ান জুইস আইডেনটিটি', নিউ দিল্লী, ১৯৯৫

৫) রাবাই, এজেকেল, এন, মাসলিয়া, 'অন দি ব্যাঙ্কিসস্ অফ গঙ্গা', ম্যাসাচুসেটস, ১৯৭৫

৬) টমাস, এ, টিমবার্গ, (এডিটেড) 'জুস ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬।

৭) রেকর্ড অফ ডেথস অফ দি জুস।

৮) ফ্লাওয়ার ইলিয়াস ও জুডিথ কুপার, 'দি জুস অফ ক্যালকাটা', ক্যালকাটা, ১৯৭৪।

৯) আইস্যাক ল্যান্ডম্যান এডিটেড), 'জুইশ এনসাইক্লোপেডিয়া' ভলুম ৪, লন্ডন, ১৯০৩

১০) সিসিল রথ (এডিটেড) 'স্ট্যান্ডার্ড জুইশ এনসাইক্লোপোডিয়া' লন্ডন, ১৯৫৯

১১) 'শেমা ম্যাগাজিন, ১৯৭৪-১৯৫৩, ক্যালকাটা।

১২) মিনিটস্ অফ 'দি জুইশ এসোসিয়েশন অফ ক্যালকাটা'।

১৩) নিউস ফ্রম ইজরাইল ম্যাগাজিন।

১৪) ইন্টারভিউ অফ দি জুস অফ ক্যালকাটা।

খিলাফততন্ত্রের অবসান ঃ যুক্তি তর্কে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ

কাজী সুফিউর রহমান

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর দিন থেকেই ইসলামের ইতিহাসে খলিফাতন্ত্রের সূচনা হয়। প্রথম চার খলিফার অর্থাৎ হজরত আবু বকর, হজরত উমর, হজরত উসমাণ ও হজরত আলীর শাসনকালকে একত্রে 'খলিফায়ে রাশেদুন'[১] বলা হয়। এই চারজন খলিফা হজরত মহম্মদের আদর্শ ও নীতিকে এমনভাবে আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় জীবনে বাস্তবায়িত করেছিলেন যে এরা ইসলামের ইতিহাসে স্তম্ভ স্বরূপ বা আদর্শের প্রতীকে পরিণত হন। যাইহোক, ইসলামের প্রাণপুরুষ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর দিনে হজরত আবু বকর মদিনাতে যে খলিফাতন্ত্রের সূচনা করেন সেই খলিফাশাহী নানা ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে তা তুরস্কে আসীন হয়।[২] ১৯২৪ সালে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল পাশার নির্দেশে 'গ্রাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী অব আঙ্কোরা' বা তুরস্কের পার্লামেন্ট খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটায়। এই সুদীর্ঘ তেরশ বছর ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসে খলিফাতন্ত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল।

এদেশের মুসলমান শাসকেরা খলিফার কাছ থেকে ঐতিহ্য ও প্রথামত নিজেদের শাসনপ্রাপ্তিকে অনুমোদন করে নিতেন। ইলতুৎমিস ছিলেন তার প্রথম পথ প্রর্দশক। উল্লেখ করা যেতে পারে আলাউদ্দিন বা আকবরের মত বেশ কিছু সুলতান খলিফার কাজ থেকে অনুমোদন লাভ করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন না করলেও এদেশের অধিকাংশ শাসকই খলিফাকে উপঢৌকন পাঠাতেন, বিচিত্রতর পদবিসহ মনোনয়ন লাভ করতেন এবং পবিত্রতা ও ধর্মীয়গুরু হিসাবে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে স্বীকার করে নিতেন। সুলতানী, মুঘল বা আঞ্চলিক নবাবীযুগে খলিফার সঙ্গে এদেশের শাসককুলের প্রয়োজনমত যোগযোগ থাকলেও, জনসাধারণের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খলিফার ছিল না। কিন্তু এই জনসাধারণই প্রতি জুম্মার খুদবার সময় পবিত্র খলিফার নাম উচ্চারণ করে তাঁকে পার্থিব-ধর্মীয় প্রতীক বলে স্বীকার করে নিতেন। এইটুকুই দীর্ঘদিনের প্রথা ও ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে খলিফা আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত

হলেন। বাংলা তথা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর ঐতিহ্য ও গুরুত্বের কথা স্মরণ করেই খলিফার সার্বভৌমত্বের সংকোচনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিভিন্ন ধরণের খিলাফত কমিটি, সমিতি, রাজনৈতিক পন্থা অনুসরণ করে দেশজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। বলাবাহুল্য, খলিফা প্রশ্নে খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় রাজনৈতিক মেরুকরণে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে ছিল। এর কারণ হল বল্কান সমস্যা নিয়ে গ্রীক-রাশিয়া-ইংলন্ডের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বিরোধ। যাইহোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির কাছে জার্মানীর জোট পরাজিত হয়। পরাজিত তুরস্ক বিজয়ী ইংলন্ডের সঙ্গে সেভরেস্ এর চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ঐ চুক্তির ফলে ইসলামের পবিত্রভূমি 'জজিরাতুল আরবের' উপর যেমন খলিফার প্রভাব সঙ্কুচিত হয়, তেমনি ব্রিটিশদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এতে খলিফার স্বাধিকার ও মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুন্ন হয়। এর প্রতিবাদে ভারতসহ সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান জনমত ক্ষিপ্ত ও জেহাদি হয়ে ওঠে। কারণ জজিরাতুল আরব ইসলাম-বিশ্বের কাছে অত্যন্ত পবিত্রভূমি বলে গ্রাহ্য।

ভারতের খিলাফত আন্দোলন ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্যান-ইসলামিজম্ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন। রাজনৈতিক - ধর্মীয় কারণের উপর আবেগ-যুক্ত হয়ে ভারতে খিলাফত আন্দোলন যে চরিত্র লাভ করেছিল বিশ্বের অন্য কোন দেশে সেই চরিত্র লক্ষ্য করা গেছে কিনা সন্দেহ আছে। এই আন্দোলনের ফলে স্বল্পকালের জন্য হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক মিলন সম্ভব হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে একটা অধ্যায় সূচিত করে। এই আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদদের আত্মপ্রকাশ - যারা পরবর্তী সময়ে ভারতের রাজনীতিতে নিজেদের সুস্পষ্ট চরিত্র প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন। যাইহোক, ভারতের তথা বাংলাদেশের খিলাফত আন্দোলনের মূল পটভূমি হল সেভরেস চুক্তির ফলে পবিত্র আরব ভূখন্ডে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ এবং খলিফার মর্যাদাহানি। এই দুই ঘটনায় মুসলমান সমাজ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে পবিত্রভূমি উদ্ধারের সংকল্পে ভারতসহ নানা দেশে খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে।

খিলাফতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে ধর্মাশ্রিত আবেগের উপর ভর করে মুসলমান ধর্মালম্বীদের মধ্যে এক গণচেতনার সঞ্চার করে। বাংলাদেশে ১ আগস্ট বা ১৬ শ্রাবণ খিলাফত দিবস হিসাবে পালন করা হত। ১৯১৯ সালে তৃতীয় খিলাফত দিবসে এক লিফলেট জারি করে 'খিলাফত কমিটির নির্দ্ধারণ ও মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ' এই শিরোনামে ঘোষণা করা হয় যে 'ঐ দিন ভারতের প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান জৈন-বৌদ্ধ আপনাদের সমস্ত কাজ কারবার বন্ধ রাখিবেন এবং প্রত্যেক জনপদে খিলাফতের সভা করিয়া সত্যের জয় এবং অসত্যের পতন প্রার্থনা করিবেন।'[৩] ঐ দিন ভারতব্যাপী হরতালের ডাক দিয়ে মুসলমানদের অটুট প্রতিজ্ঞা ছিল "স্বদেশীগ্রহণ, বিদেশী বর্জন, সরকারকে

কোনপ্রকার ঋণ দেবার বা নেবার, সৈন্যদলে যোগদান না করার এবং কোনরূপ সহযোগিতা না করার অঙ্গীকার।"[৪] ঐ দিন মুসলমানরা সমবেত ভাবে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হিন্দুদের উপবাস করার অনুরোধ করা হয়। ১৯১৯ সালের ৭-১৫ নভেম্বর, কলকাতায় খিলাফত সপ্তাহ পালন করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে এক লিফলেট বিতরণ করে বলা হয় 'কলিকাতাবাসী প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য তিনি নিজে স্বয়ং এবং নিজ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ১ টাকা করে খিলাফত ভান্ডারে দান করেন।'[৫] এমন অজস্র নজির আছে যে খিলাফত আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের অনেক রাজকর্মচারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন; সম্পন্ন মহিলারা নিজেদের অলংকারাদি খিলাফৎ ভান্ডারে দান করেছেন; ধর্মপ্রাণরা অত্যন্ত চড়া দামে খিলাফত কমিটির কাছ থেকে তস্‌বীহ্‌, জায়নামাজ কিনে খিলাফত ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন; এমনকি সাধারণ মহিলারা মুষ্ঠিচাল বিক্রি করে খিলাফত কমিটিকে অর্থ যোগান দিয়েছেন: খেতাব-পদবি ধারীরা তা ক্ষোভে ত্যাগ করেছেন ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হবার ফলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন আনন্দমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঁচদিনব্যাপী অর্থাৎ ১৩-১৭ নভেম্বর, ১৯১৯ বিজয় উৎসবের বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ মেনে নিতে পারেনি কারণ এটাকে তারা খলিফার পরাজয় পালনের উৎসব বলেই ধারণা করেছিল। এক্ষেত্রে মুসলমানরা নিজেদের উপহাসের পাত্র বলে ধারণা করল। তাঁরা ঠিক করল যে উৎসবে তারা সামিল তো হবেই না বরং অ্যান্টি পিস সেলিব্রেশন কমিটি' গঠন করে এর বিরোধিতা করবে। এ বিষয়ে তারা অনেক রকমের পুস্তিকা ছাপিয়ে মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য তুলে ধরল। বাংলাদেশের নানা স্থানে পোষ্টার মারা হল যাতে লেখা ছিল 'মাওলানা আবদুর বারির ফৎওয়া/বিজয় উৎসবে যোগদান হারাম/ মহাত্মা গান্ধীর আদেশ/ বিজয় উৎসবে যোগদান মহাপাপ।[৬] হিন্দুদের সমর্থন পাবার আশায় একটি আবেদন পত্রে বলা হল, 'খলিফাকে রক্ষা করা, যেমন মোসলেমের কর্তব্য. তেমনি হিন্দুরও স্বার্থ। উভয়ের স্বার্থ উভয় ধর্মাবলম্বীকে সম্মিলিত রাখবে।'[৭] ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ হিন্দু নেতা -যৌথভাবে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে বিজয় উৎসবে যোগ না দেবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন।[৮] কিন্তু তা খুব কার্যকরী হয়নি। যাই হোক, বাংলার মুসলমানরা এই উৎসবকে কিভাবে উপেক্ষা বা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা ছোট দু-একটি ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। নোয়াখালি জেলার হরিশচর রোশনপুর গ্রামের জনৈক অশিক্ষিত আবদুস্‌ সামাদ। 'জয় সম্রাটের জয়' ধ্বনিরত মিছিলকারী বালকদের হাত থেকে ফ্লাগ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং উপহাস করে বলে, 'জয় পাছা মারার জয়।' বিচারে সামাদকে পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হয় বালকদের।[৯] একই জেলার সমদমপুরের স্কুলের মুসলিম ছাত্ররা বিজয় উৎসবের হিন্দু ছাত্রদের হাত থেকে ফ্লাগ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।[১০] ঐ জেলার চটখিল স্কুলের ছাত্র মহম্মদ আলম সহপাঠী মুসলমান ছাত্রদের হাত থেকে উৎসবে দেওয়া মিষ্টান্ন ফেলে

দিতে বাধ্য করলে তাকে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয়।[১১] এইভাবে বাংলার মুসলমানরা বিজয় উৎসব বা শান্তি উৎসবের বিরোধিতা করেছিল উপেক্ষা-অভিমান আর ভ্রূকুটির মধ্য দিয়ে।

যে ঐতিহাসিক কারণে ভারতে খিলাফত আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল তদনুরূপ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে খিলাফত আন্দোলন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল পাশার নেতৃত্বে 'গ্রান্ড ন্যাশানাল এসেম্বলী অব্ আঙ্কোরা' বা আঙ্কোরার পার্লামেন্ট পরপব দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯২২ সালে প্রথম সিদ্ধান্ত নেয় যে খলিফা যেহেতু জজিরাতুল আরব বা ইসলামের পবিত্র ভূখন্ড রক্ষনাবেক্ষণে অপারগ সেইহেতু খলিফার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হল। অর্থাৎ তুরস্কের রাজ্যের ও রাজনীতির অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হল গ্রান্ড ন্যাশানাল এসেম্বলী। খলিফা ক্ষমতার আড়ালে ছায়াতে পরিণত হলেন। ১৯২৪ সালে অন্য একটি সিদ্ধান্তে এসেম্বলী খলিফাদের বিলুপ্তি সাধন করে তুরস্ককে একটি রিপাবলিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। ঐতিহাসিক এই দুই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুসলিম জনমানস সিদ্ধান্তের পক্ষে বিপক্ষে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে জোরালো যুক্তিতর্কে আবর্তিত হয়।

প্রথম সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বতন খলিফা আব্দুল হামিদকে অপসারিত করে। ৮ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ ওয়াহিদউদ্দিনকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়।[১২] অপসারিত খলিফা মাল্টাদ্বীপে পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশদের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় নিলেন।[১৩] খিলাফত ইতিহাসে এর থেকে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে?

খলিফার পালাবদলের জন্য একদল বাঙালী মুসলমান কামাল পাশাকে দুষলেন এবং অভিযোগ এনে বললেন এই রকম একটি মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় পদলুপ্তির সিদ্ধান্ত কামালের বা পার্লামেন্টের একা নেওয়া উচিত হয়নি; যেহেতু খলিফা পদটি হল ইসলাম জগতের মর্যাদার ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এরজন্য তিনি বিশ্বব্যাপী জনমত চাইতে পারতেন। তারা আরও অভিযোগ তুলল যে কামাল বলশেভিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এই কাজ করেছেন।[১৪] সুতরাং কামাল পাশার আরব্ধ কাজকে তারা অনৈতিক, অনৈস্লামিক এবং ইসলাম জগতের প্রতি ক্ষতিকারক পদক্ষেপ বলেই ব্যক্ত করলেন।

উপরোক্ত মতের বিপক্ষে যুক্তির সমর্থক সংখ্যাই ছিল বেশী। তাদের মতে কামাল ইসলামের শত্রু নয় বরং রক্ষক। তারা সুনিশ্চিত যে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও বিভিন্ন মাধ্যমে কামালকে ইসলামের শত্রু বলে চিহ্নিত করতে চাইছে।[১৫] এক সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি খলিফার জন্য বিভিন্ন উপায়ে জনজাগরণ ঘটাতে চেয়েছিল এখন তারাই সানন্দচিত্তে কামাল পাশার খলিফা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। ১৯২২ সালের ৮ ডিসেম্বর নতুন খলিফার মনোনয়নে স্বাগত জানাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি বাড়িতে-বাড়িতে, মসজিদে, প্রভৃতি স্থানে আলোকসজ্জার বিধান দেয়।[১৬] উল্লেখ করা যেতে পারে সেই সময় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'কামাল পাশা' কবিতায় কামালকে

পাশাকে ইসলামের নবজীবনের দ্যোতক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বলাবাহুল্য পরবর্তী সময়ে 'কামাল' শব্দটিই বিশেষ সাফল্যসূচক শব্দে পরিণত হয়।

ফলতঃ দেখা যাচ্ছে যে খলিফাকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম সমাজে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রশ্ন জেগে ওঠে। ঠিক এই সময়ে গুজব রটে যায় যে ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে অপসারিত খলিফা ভারতে আসছেন কামাল পাশার বিপক্ষে এবং নিজের স্বপক্ষে জনমত গঠন করার জন্য। গুজবটা অবশ্য গুজবই থেকে যায়। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজে সবচেয়ে সমস্যা দেখা দিল তারা এখন জুম্মার খুদবার সময়ে কার নাম উচ্চারণ করবে। পাশা কর্তৃক জোরপূর্বক অপসাবিত খলিফা আব্দুল হামিদের, না পার্লামেন্টের অনুমোদন পুষ্ট নব নির্বাচিত খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদের? আর একটি বৈধতা সংক্রান্ত সমস্যা হল আসল খলিফা অপসারিত এবং শত্রু ব্রিটিশের কাছে আশ্রয়প্রার্থী, অন্যদিকে নবনিযুক্ত খলিফা হলেন এসেম্বলী কর্তৃক নির্বাচিত — যার ঐশ্বরিক অনুমোদন নাই বললেই চলে। এই সংকটের সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হল যে জুম্মার খুদবার সময়ে খলিফার প্রাসঙ্গিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। তবে সেখানে খলিফার ব্যক্তিগত নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই; কেবল 'খলিফা' শব্দটি উচ্চারিত হলেই হবে।[১৭]

এই বির্তকিত সময়ে মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র ও খিলাফত নেতৃত্বের ভূমিকা কি ছিল তা অনুধাবন যোগ্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সভাপতি The Mussalman এ পত্রিকার Editor মৌলভী মুজিবর রহমাণ New phase of the Khilafat question শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লেখেন, " ... Let us see what the position of the deposed sultan was He had no jurisdiction over any part of the Jazirat-ul-Arab, his territories in Arabia having been snatched away from him, and it was the British govt that was mainly responsible for it He was not at all an independent monarch, was a puppet in the hands of the Allies and practically a captive in his own Capital and became so weak as to be incapable of making any defence against foreign aggressors. So truly speaking, he had no title to the Khilafat and, according to Islamic law as we understand it, Ceased to be the Khalifa. The fact that Indian Mussalmans had so long regarded him as such was due to the hope that sooner or later there might or would come a time when he would have jurisdiction over the Holv places, would be powerful enough to protect them and would thus become Khalifa in the true sense of the term But the policy of the British govt stood against their realisation of that fond hope. Now the sword of Mustafa Kamal pasha has succeeded in recovering some of the lost terrotories of turkvey and establishing a strong

and efficient government at Angora. The government is going to be the proper and support of the Khalifa whom the National Assambly will be better, stronger and more in conformity with the Islamic law than that of the one just deposed and, if the reply be in the affirmative as it must be, we find no reason why we Mussalamns should fail to acknowledge him as such when the deposed sultan who had ceased of have any title to the Khilafat was so long regarded as the Khalifa.১৮

১৯২৪ সালে তুরস্কের পার্লামেন্ট এক সিদ্ধান্তে সে দেশ থেকে খলিফাপদের চিরঅবসান ঘটায়। এরপর থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের খলিফাকেন্দ্রিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, আবেগ অনুরাগ, যুক্তি-তর্ক সময়ের সাথে সাথে থিতিয়ে পড়ে। এখন থেকে কামাল পাশা ও তাঁর দেশ তুরস্ক বাংলাদেশের মুসলমানদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের মুসলমানদের এক মানসিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তন সেইসমাজের গতিশীলতা যে কিয়দংশে এনে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্র-নির্দেশ

১। 'খলিফায়ে রাশেদুন' কথাটির সাধারণ অর্থ হল শ্রেষ্ঠ খলিফাদের যুগ।

২। প্রথম চারজন খলিফার রাজধানী ছিল মদিনাতে। পঞ্চম খলিফা মুয়াবিয়া রাজধানী দামাস্কাস-এ পরিবর্তন করেন। আরও পরবর্তী সময়ে খলিফার রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এখানে দীর্ঘদিন খলিফাতন্ত্র কায়েম ছিল। এরপর খলিফাতন্ত্র দুটি ভাবে ভাগ হয়ে একটি মিশরে, অপরটি তুরস্কে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তুরস্কের খলিফাশাহী বলবৎ ছিল।

৩। আকরম খাঁ কর্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির' প্রচারিত লিফলেট।

৪। তদেব।

৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট।

৬। IB File, 472/19 (Postar)

৭। Ibid. রেফাজউদ্দিন আহমদ ও মোহম্মদ কাজেম আলি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট।

৮। Ibid (leaflet)

৯। Ibid. extract from S.P. Noakhali, confidential report dt. 17.01.1922.

১০। Ibid dt 03.01.1922

১১। Ibid.

১২। IB File, 362/22, attitude of the Bengal Moslems in regard to the depostition of the Sultan of turky.

১৩। Ibid.

১৪। Ibid.

১৫। Ibid.

১৬। Ibid.

১৭। Ibid.

১৮। The Mussalman, Editor Mouli Mujibar Rahaman. dt. 10.11.1912.

ব্রিটিশ আমলে নগরায়ণ ও পৌর প্রশাসন

কুমকুম চট্টোপাধ্যায

আজকের অভিধানে নগরায়ণ একটি অতি সুপরিচিত শব্দ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাকালে দেখা যায় যে শহরে পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে বেশী থাকায় গ্রাম থেকে ক্রমশঃই মানুষ শহরাভিমুখী হচ্ছেন। বিশ্ব জুড়ে নগরায়ণ ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৯১-এর আদমসুমারিতে দেখা যায় যে ভারতে ৮৪.৫ কোটি লোকের মধ্যে ২২ কোটির সামান্য কম লোক নগরে বাস করেন। পরিসংখ্যান বলে যে উন্নতশীল দেশগুলিতে নগরায়ণের গতি বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে নগরায়ণের গতি বর্তমানে উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত। এই নগরায়ণ শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোতেই পরিবর্তন আনে না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসেও আমূল রূপান্তর আনে।

ভারতেব ক্ষেত্রে আধুনিক নগরায়ণ ব্রিটিশ শাসনেবই ফলশ্রুতি। সাম্প্রতিককালে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ব্রিটিশ প্রভাবের বাইরেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের নগরব্যবস্থায় খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। তবুও এখনও পর্যন্ত ইতিহাস আমাদের বলে যে ভারতের নগরায়ণ ও তার হাত ধরে পৌব প্রশাসন ব্যবস্থা মূলতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই দান।

ব্রিটিশরা এদেশে আসবার আগে ভারতের কৃষিভিত্তিক সমাজে পুণা, দিল্লী, কানপুর, নাগপুর, আহমেদাবাদ ইত্যাদি নগর গড়ে উঠেছিল। আবার অন্যভাবে দেখলে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে তিন ধরনের শহর দেখা যায় — রাজধানী শহর, তীর্থকেন্দ্রিক শহর ও বন্দর শহর। এর বিপরীতে কোলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই ব্রিটিশ নগরায়ণের ফলশ্রুতি। বলা বাহুল্য এই তিনটি শহরই ছিল বন্দর নগর। এই দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই আমরা দেখতে পাই হায়দ্রাবাদ ও বাঙ্গালোরের ক্ষেত্রে যাদের সূচনা প্রাক্-ব্রিটিশ আর্থসামাজিক কাঠামোয় আবার ব্রিটিশ আমলে ক্যান্টনমেন্ট হিসেবেও এদের পরিচিত উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশদের প্রভাবে গড়ে ওঠা কোলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই ইউরোপীয় ধাঁচের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই তিনটি শহরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গড়ে উঠেছে বলে এখানে শহরের সংগঠন ও রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রে খুবই অনিয়মিত বৃদ্ধি দেখা

যায়। চেন্নাইতে ফোর্ট সেন্ট জর্জেস এবং কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। কিন্তু এই ফোর্টগুলির বাইরে ঘিঞ্জি বসতি ও পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে নগরায়ণ —

ব্রিটিশপূর্ব ভারতের নগরগুলিতে অনেক বেশী ভারসাম্য বজায় ছিল। সেই নগরগুলিতেও ফোর্ট বা দুর্গ তৈরী করা হ'ত যাদের আয়তন ব্রিটিশ নির্মিত বন্দরগুলির ফোর্টের থেকে অনেক বড় ছিল। কারণ ব্রিটিশ নির্মিত দুর্গগুলিতে শুধু ব্রিটিশদের রক্ষা করার কথা চিন্তা করা হ'ত। কিন্তু ব্রিটিশপূর্ব ভারতে নিজস্ব শহরের দুর্গগুলিতে পুরো নগরের জনগণকে রক্ষা করার মত স্থান ও রসদের ব্যবস্থা রাখা হ'ত। দুর্গের বাইরে দেশীয় শহর এমনভাবে গড়ে তোলা হ'ত যে প্রশাসনের সঙ্গে যাঁরা কোনভাবে যুক্ত নন এমন সাধারণ মানুষরা শান্তির সময় দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে শহরে বাস করতেন। এই দুর্গগুলিতে মূল ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হ'ত এবং কৃষকদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করত। নাগরিক অর্থনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হ'ত। উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরকেন্দ্রিক বসবাস স্থাপন করে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেদের নগরের বাইরের দিকে ঠেলে দিতেন। পদব্রজে চলাই যেহেতু রেওয়াজ ছিল সেহেতু নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই নগরের নাগালের মধ্যে পাওয়া যেত, যে কারণে নগরগুলি ঘনবিন্যস্ত হ'ত। তবে এই ব্যবস্থায় নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব কমই থাকত।

ব্রিটিশ আমলে নগরায়ণ

ব্রিটিশ আমলে নগরব্যবস্থায় খুব দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। শহরের উপকণ্ঠে গ্রামগুলিতে এই পরিবর্তনের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। ফলে নগরায়িত গ্রাম বা urban village এর জন্ম হয়। নগরায়ণের প্রথম প্রকাশ আমরা দেখি রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির মধ্যে দিয়ে। শহরের ঘিঞ্জি বসতি ভেদ করে রেললাইন পাতার বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয় বলে অপেক্ষাকৃত কম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা দিয়ে রেললাইন তৈরী হয়। এর ফলে নগরায়ণ পদ্ধতির মধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মত ভারতেও ব্রিটিশ শাসনকালে দ্রুত নগরায়ণের পিছনে অনেকগুলি কারণ কাজ করেছে। কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতি ও কৃষিতে অত্যধিক চাপের ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা গ্রাম থেকে শহরের দিকে আসতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শহরগুলিতে শিল্পায়ন-এর সূচনা হয় যা গ্রামের মানুষকে শহরের দিকে টেনে নিয়ে আসতে থাকে। ফলে নগরায়ণের গতি ত্বরান্বিত হয়।

ব্রিটিশরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থপ্রসারের জন্য তৎপর হ'ন। ফলে ভারতে নগরায়ণ অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নগর গড়ে তোলার পদ্ধতিটি ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয়। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারিতে

দেখা যায় যে তখন ৬০টি নগর ছিল, ১,০০,০০০ বা তার বেশী লোকসমন্বিত এবং অন্ততঃ ২৭টি শহর ছিল ৫০,০০০ বা তার বেশী লোক সমন্বিত।

বিংশ শতকের শুরুতে ভারতে ১০.৮৪ শতাংশ মানুষ নগরাঞ্চলে বসবাস করতেন। ১৮৮১ সালেই আদমসুমারি কমিশন দেখেন যে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির গতিপ্রকৃতি মূলতঃ নগরায়ণ বিরোধী কারণ এইসময় শিল্পের যথাযথ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোই এর জন্য দায়ী।

ব্রিটিশ শাসনকালে নগরাঞ্চলে যে পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে সে পরিবর্তন ব্রিটিশদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। তার সঙ্গে খুব পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতের প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এর ফলে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত নগরব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কিছু নগর ও শহর ব্রিটিশ ব্যবস্থায় গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করে। বিশেষতঃ উল্লেখ করা যায় যে ব্রিটিশদের আবাসিক কেন্দ্রগুলি খুবই উন্নতমানের হয়। সেখানে রাস্তাঘাট, সবুজের সমারোহ, খোলা প্রকৃতি, অপূর্ব স্থাপত্যসম্পন্ন সুদৃশ্য বৃহৎ অট্টালিকা এবং অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন পৌর সুবিধা সমন্বিত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি দেশীয় জনবসতি যেখানে, সেখানে অপরিকল্পিত ঘিঞ্জি ব্যবস্থা এদেশে নগরায়ণ পদ্ধতিতে এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সূচনা করে, নগরায়ণ ও পৌর প্রশাসন

ব্রিটিশ আমলে অপরিকল্পিত নগরায়ণের সাথে সাথে নানাবিধ পৌর সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। সেইসব সমস্যা সমাধানের জন্য পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস আমাদের দেশে সুপ্রাচীন হ'লেও আধুনিক অর্থে এর সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনকালে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী তাঁদের নিজেদের স্বার্থে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন আমাদের দেশে। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনকে সংহত করা, সংরক্ষণ করা এবং এই ব্যবস্থা-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রশমিত করা। বস্তুতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্য ছিল পৌর প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থনকারী শক্তি (Suport base) হিসেবে তৈরী করা। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন শহরে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল — যদিও তা খুব সংকীর্ণ অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল — মূলতঃ ভূস্বামী ও উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। এই শেষোক্ত শ্রেণীটির জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ উচ্চশিক্ষানীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ব্রিটিশরা ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যার সদস্যরা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে অংশ নিতে আগ্রহী হ'ন। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে স্থানীয় সমস্যা মেটাবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এই

পশ্চদাপটের মধ্যেই আমাদের দেশে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ইতিহাস লুকিয়ে আছে, ভারতে পৌরপ্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন

ভারতে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থায় ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমী আঞ্চলিক সরকারের মডেল ব্রিটিশরা ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে আঞ্চলিক সরকারের বিবর্তনকে আমরা মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

(১) প্রথম পর্যায় ১৬৬৭-১৮৮১

এদেশে আধুনিক পৌর ব্যবস্থার ইতিহাস শুরু হয় ১৬৮৭ সালে যখন তৎকালীন মাদ্রাজে চেন্নাইতে একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে চার্টার এ্যাক্ট পাশ হয় যার মাধ্যমে তিনটি প্রেসিডেন্সী শহর কোলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাইতে পৌর প্রশাসন শুরু হয়।

হুগলী জেলার প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর George Joynbee রচিত ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত "A Sketch of the administration of the Hooghly District - From 1795-1845 বইতে বলা হয়েছে যে পৌর শাসনের বীজ নিহিত আছে ত্রয়োদশ রেগুলেশনে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের নাগরিকদের দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা করা।

১৮৪২ সালে দশম আইন (Act X of 1842) প্রবর্তিত হয়। এই আইনই তৎকালীন অখন্ড বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আসল পৌর আইন। এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পরীক্ষামূলকভাবে প্রর্বতন করা হয়। ১৮৫০ সালে Act XXV পাশ হয় যা ১৮৪২ সালের দশম আইনকে বাতিল করে দেয়। এই নতুন আইনটি রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নতিতে কোলকাতা সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৮৬৩ সালে কোলকাতা কর্পোরেশন গঠনের জন্য একটি আইন পাস করা হয়। সেই আইন ১৮৭৬ সালের আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

১৮৬৩ সালে Royal Army Sanitary Commission সারা ভারতের অপরিচ্ছন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ করে। তার ফলে পর পর কতকগুলি আইন পাস হয় এবং ক্রমশঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌর প্রশাসন গড়ে ওঠে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যাপারটি আর ঐচ্ছিক থাকে না। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে মিউনিসিপ্যাল কমিটি তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয় মূলতঃ নিকাশী ব্যবস্থা, আলো ও জল সরবরাহের জন্য। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো এই বিবর্তনের পথে আরও ও এক ধাপ অগ্রসর হ'ন তাঁর আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে তিনি মনে করেছিলেন যে মিউনিসিপ্যাল সরকার তৈরী করলে ইউরোপীয়দের মত ভারতীয়রাও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হবেন।

এই পর্যায়টি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ব্রিটিশরা এদেশে চালু করেছিলেন তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে,

ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আনার জন্য নয়। মূলতঃ এই ব্যবস্থা নির্বাচনের পরিবর্তে নিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রশাসকরা ছিলেন প্রধাণতঃ ব্রিটিশ।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় - ১৮৮২ — ১৯১৯

১৮৮২ সালে লর্ড রিপন তাঁব বিখ্যাত প্রস্তাব প্রকাশ করেন যা ভারতের পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কার্টা নামে খ্যাত।

উপযোগিতা তত্ত্বের সঙ্গে উদারনীতিবাদের সমন্বয়ে যে মানসিকতা তখন কোন কোন ব্রিটিশ প্রশাসকের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, লর্ড রিপন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেন। ফলে পৌর প্রশাসন দায়িত্বশীল সরকার গঠনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিররূপে গৃহীত হয়। ১৮৮২ সালে রিপন প্রস্তাবে বলা হয় যে আঞ্চলিক সরকার রাজনৈতিক শিক্ষা ও জনশিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

লর্ড রিপনেব প্রস্তাব বিরাট পরিবর্তনের প্রেরণা দিয়েছিল যদিও শক্তিশালী আমলাতন্ত্র তাকে বাস্তবায়িত হ'তে দেয় নি। লর্ড রিপন তাঁর প্রস্তাবে নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রকাশ করেছিলেন ঃ

প্রথমতঃ, স্থানীয় স্বাযত্বশাসনে নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষর বদলে পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করা হয়।

তৃতীযতঃ, স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা চালাতে গেলে স্থানীয় পৌর প্রশাসনের হাতে পর্যাপ্ত পুঁজি থাকা প্রয়োজন সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

চতুর্থতঃ লর্ড রিপনের এই প্রস্তাবকে প্রাদেশিক সরকারগুলি আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করবে এই আশা করা হয়।

এই পর্যায়ের আব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল Royal Commission upon Decentraligation (1906) এর রিপোর্টে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়।

প্রথমতঃ গ্রামগুলিকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার একক ধরে সেখানে পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়। শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের কথা বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকারগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য রাখার কথা ভাবা হয়।

তৃতীয়তঃ মিউনিসিপ্যালিটি তার নিজের সভাপতি নির্বাচন করবে, কিন্তু ডিস্ট্রিকট লোকাল বোর্ডে ডিস্ট্রিকট কালেকটরই সভাপতি থাকবেন।

চতুর্থতঃ মিউনিসিপ্যালিটির কর নির্ধারণ করার ক্ষমতা থাকবে। তদুপরি ন্যূনতম রিজার্ভ ফান্ড রেখে বাজেট তৈরী করার ক্ষমতাও থাকবে। সরকার জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যদির জন্য অনুদান দেবে।

পঞ্চমতঃ বৃহৎ শহরগুলিতে পুরো সময়ের মনোনীত অফিসার থাকবেন।

ষষ্ঠতঃ স্থানীয় ব্যাপারে শুধুমাত্র পরামর্শদান, প্রস্তাব দেওয়া ও অডিটের ব্যাপারে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে।

সপ্তমতঃ প্রাথমিক, শিক্ষার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটি নেবে এবং সম্ভব হ'লে কিছুটা পরিমাণে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বও নেবে।

এই প্রস্তাব খুব সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছিল। ফলে ১৯১৮ সালে সরকার প্রস্তাবটিকে পুনরায় ঘোষণা করে। সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের স্বাধীনতা, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়।

(৩) তৃতীয় পর্যায় - ১৯২০ -১৯৩৭

১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থাটিকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এবং আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে পাঠাবার কথা বলা হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলা হয় এবং ১৯২০ সালে তা কার্যকর হয়। এইভাবে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এইসময় ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রতিটি প্রদেশে নানাবিধ সংশোধন আইন পাস হয়। যেমন ভোটাধিকারকে আরও গণতন্ত্রসম্মত করা হয়; বাজেট তৈরীর ব্যাপারে স্থানীয় সরকারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়, সর্বোপরি প্রশাসনিক নির্দেশদানের দায়িত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে চলে যায়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, পুরুষোত্তম দাস ট্যানডন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে ঢুকে গণতান্ত্রিক সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৩২ সালে Bengal Municipal Act পাশ হয় যা পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ।

(৪) চতুর্থ পর্যায় - ১৯৩৭ - ১৯৪৭

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। দ্বৈত ব্যবস্থার জায়গায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় ১৯৩৭ -এ। এইসময় জাতীয় আন্দোলনও গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর থেকে উঠে এসে এবার তা সংগঠিত রূপ নিতে শুরু করে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। আজ আমরা বলতে পারি যে নগরায়ণ ও পৌর প্রশাসন এর অগ্রগতিতে আমরা বর্তমানে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার মূল নিহিত আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের গভীরে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১। পৌর দিগন্ত ঃ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান স্টাডিজ — পৌর বিষয়ক বিভাগ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৌরব্যবস্থার ক্রমবিকাশ - মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। The Foundations of Local Self-government in India, Pakistan and Burma : Jugh Tenker : University of London, The Athlone press, 1954.

৪। Local government in India : Shruiram Maheswari Lakshmi Narain Agarwal, Agra - 3

৫। Social Background of Indian Nationalism A.R Desai : Popular Prakashan, Bombay.

৬। The spirit of Municipal Government with special reference to West Bengal : Mohit Bhattacharya, Pouradarpan, Vol VI & VII, October 1984-July 1985, No, 2,3,4, and 1 : Alak Pereuliters

৭। Development from Below - Local government and Finance in Developing Countries of the Commonwealth - Ursula K. Hicks

Clarendon Press, Oxford.

৮। Rulers, Townsmen and Bazars : North Indian Society in the age of British expansion - 1770 - 1870 - C.A. Bayly

৯। Cambridge University Press

১০। Urban Development : B. Bhattacharya

১১। Cities of India - R. P. Misra

১২। The Municipal Administration in India - R. K. Bharadwaj.

হ্যামিলটনের গোসাবা সমবায় সমিতি ঃ একটি ভাবনা

সুতপা চট্টোপাধ্যায় সরকার

সুন্দরবন। বাদা ও আবাদ মেশানো এক বিস্তীর্ণ এলাকা। পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে হুগলী এবং উত্তরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত এলাকা সমূহে সীমাবদ্ধ এই সুবিস্তৃত অরণ্যাঞ্চলে ঠিক কবে বসতির পত্তন হয়, বলা শক্ত।[১] তবে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের নানা তথ্যে এবং বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত আদি গঙ্গানদীর গতিধারার চারিপাশে বহু পুরাতন জনপদের চিহ্ন ও ঐতিহাসিক কীর্তির অবস্থান থেকে বোঝা যায় যে কিছু অঞ্চল বরাবরই শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গল ছিল না।[২] সম্ভবত প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে অরণ্য আবার বসতি অঞ্চলকে গ্রাস করে।[৩] এই আঞ্চলিক ভাঙা গড়ার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে উঠে আসে একটি নাম গোসাবা। এবং তারই সঙ্গে জড়িত আর এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হ্যামিলটন ও তার সমবায় ভাবনা। আলোচ্য এই বিষয়ের মূল স্রোতে যাবার আগে কিছু প্রাক্ কথন থেকে যায়, যার উল্লেখ এ ক্ষেত্রে আবশ্যিক।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের যে চুক্তি হয়, তাতে কোম্পানীকে কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত কুল্পী পর্যন্ত সমস্ত এলাকার ওপর জমিদারী স্বত্ব দেওয়া হয়।[৪] শুরুতে কোম্পানীর জমিদারীর গোড়াপত্তনের সময় সুন্দরবন অঞ্চল তার আওতার বাইরে ছিল। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, এই বিস্তীর্ণ শ্বাপদ সঙ্কুল বনভূমিকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে বাংলা দেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম ফল।[৫] এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা পর্বে ইংরেজরা সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে একধরনের বিশেষ নজরদারী (পেনপটিকন প্রীজন) চিন্তাধারার প্রবর্তন করে, যেটা পূর্বে বেনথামের মত ছিল ও পরে- ফুকো বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি থেকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের শিথিল হয়ে যায়, প্রবর্তিত হয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন। পরিবর্তিত এই প্রেক্ষিতেই হ্যামিলটন ও সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে ১৭৭০ সালে ক্লড রাসেলের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে আবাদের কাজ শুরু হয়।[৬] এরপর যশোর জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল

আপন হাতে অঞ্চল আবাদের দাযিত্ব তুলে নেন। তার সমর্থক ছিলেন স্বযং ওয়ারেন হেস্টিংস।[৮] হেঙ্কেল গোটা অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলি তালুকের পত্তন কবেন।[৯] আবাদেব সার্মগ্রিক প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিজেরই হাতে বাখেন। অঞ্চলের জোলা ও মালাঙ্গি, মাহিন্দারদের (নুনের কারবাবি) সমস্যাব সমাধানও করেন তিনি।[১০] তার শাসনের বিশেষত্ব ছিল, উদাবনৈতিক কাঠামোর আড়ালে সমগ্র অঞ্চলের ওপব একাধিপত্য বজায রাখা। অর্থাৎ প্রথর্মদিকে স্বৈরতান্ত্রিক ঔপনিবেশিকতার এক দরদী চেহারা (Kind face of Colonialism) আপাতভাবে ধরা পড়ত। হেঙ্কেলেব প্রভাব চিরস্থায়ী হয নি। তার মৃত্যুর পর কিছুদিন এই অঞ্চলের উন্নয়নের গতিতে ভাটির টান এসেছিল। আব এখন শুধুমাত্র হিঙ্গলগঞ্জ তার নাম বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে, এই অঞ্চলে বার বারই এইরকম একক নেতৃত্ব এসেছে। স্বৈরতন্ত্র ঢাকা পড়ে গেছে পিতৃতন্ত্রের আড়ালে। এই সব একক পরিচালক বা নেতৃত্বের মধ্যে, অষ্টাদশ থেকে বিংশ, এই দুই শতাব্দী জুড়ে দুজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হেঙ্কেল আর হ্যামিলটন। হেঙ্কেলের পর হ্যামিলটন। হ্যামিলটনই এই অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য 'সমবায়' প্রথার কথা ভাবলেন। সমবায়ের কথা ভাবলেন এমন এক শ্বাপদ সঙ্কুল অঞ্চল ভূমির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে পিছিয়ে থাকা বর্গের মানুষজনের জন্য। হেঙ্কেল না হয় ছিলেন যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু কে এই হ্যামিলটন? কেনই বা তিনি এখানে এলেন সমবায় করতে?

পুরো নাম ড্যানিয়াল ম্যাকিনন হ্যামিলটন। জন্ম স্কটল্যান্ডে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতবর্ষে আসেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি র (Mackinon Mackenizie) সদস্য হিসাবে।[১১] এই কোম্পানির তখন জাহাজের ব্যবসা। পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টীম নেভিগেশন লাইন (Peninsular and Oriental Steam Navigation Line) তখন সমুদ্র পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের অন্যতম সেরা সংস্থা। অনেক পরে খুব সম্ভব ১৯৫৪ সালে আমাব শিক্ষক অধ্যাপক বরুণ দে যখন এই সংস্থার জাহাজে উচ্চতর শিক্ষাব জন্য অকসফোর্ডে যাচ্ছিলেন তখন জাহাজে একুশ রকমের পদ বিশিষ্ট খাদ্য পরিবেশন করা হত। শোনা যায় সবজি সব আসত সুন্দরবনের ক্যানিং থেকে। হয়ত এমন এক ব্যবসার তাগিদেই হ্যামিলটনের সুন্দরবন অঞ্চলে জমিদারি পত্তন। বিপদসঙ্কুল অনগ্রসর গোসাবার উন্নয়নে ঝুঁকি কম ছিল না। অথচ সেই ঝুঁকি নেবার ক্ষেত্রে হেঙ্কেল ও হ্যামিলটনের এক আশ্চর্য রকমের মিল লক্ষ্য করা যায়। হ্যামিলটনের ইচ্ছে, হেঙ্কেলের পথ ধরেই স্বৈবতন্ত্রকে পিতৃতন্ত্রের আড়ালে রেখে নিজস্ব আধিপত্যে এক শস্যভান্ডার গড়ে তোলা।

এই অঞ্চলে যখন সমবায় শুরু হচ্ছে তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকেরা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের (local self government) ওপব জোব দিচ্ছে। গ্রাম উন্নয়নের কথা ভাবা হচ্ছে। হ্যামিলটনের সমবায় ভাবনাও খুব সম্ভব সেই সূত্র ধরেই। হ্যামিলটন মনে করতেন, যেহেতু ভারতবর্ষ মূলত গ্রাম ভিত্তিক, তার উন্নতির উপায়ও তাই স্বয়ং সম্পূর্ণ

গ্রাম গড়ে তোলা।[১] তার ভাবনায় ছিল, উদারনৈতিক জমিদার, সৎ ও পরিশ্রমী কর্মচারি।[১৩] ফল স্বরূপ এক একটি গ্রাম সুখ-শান্তির নীড়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০০ একর জমি রাঙাবেলিয়া আর সাতজেলিয়ায় তার যাত্রা শুরু করেন।[১৪] সমস্ত অঞ্চল তখন ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এবং নদীর জল নোনা অর্থাৎ অপেয়। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ ছিল জঙ্গল হাসিল করা ও পানীয় জল সরবরাহ করা। কূপ খনন শুরু হোল, এল জল শুদ্ধ করার যন্ত্র।[১৫] প্রথম পাঁচ বছর গেল জমিতে বাঁধ বাঁধতে ও জায়গা বসবাসযোগ্য করতে।

ধীরে ধীরে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এল বসবাস করতে। ১৯০৮ সালে নলিনচন্দ্র মিত্র মহাশয় ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। এই সময় হ্যামিলটন সাহেব ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিনের জন্য নিজের দেশে ফিরে যান। ১৯০১ সালে সুধাংশু ভূষণ মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হলেন। ততদিনে এখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় শুরু হয়েছে।[১৬]

এ সবই শুরুর কথা, গোড়ার কথা। হ্যামিলটন দেশে ফেরেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এব তখনই তার সমবায় প্রচেষ্টার সূত্রপাত। এই বছরই তৈরী হোল সমবায় ব্যাঙ্ক। প্রথম ম্যানেজার এ.কে. মিত্র মহাশয়, ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল গোসাবা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। খোলা হল গ্রামীণ শাখা।[১৭] বস্তুত হ্যামিলটনের সমবায় আলোড়নের দুঃসাহসিক পরীক্ষার মূল ভিত্তি ছিল এই ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের কাজ ছিল কম সুদে চাষেব মরশুমে ঋণ মঞ্জুর করা। কোন কৃষক কত ঋণ পেতে পারে ঠিক করা হত পঞ্চায়েতের সভায়।[১৮]

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের আরও কিছু স্রোত এসে গেল। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল গোসাবা কোঅপারেটিভ স্টোর্স। ১৯২১-এ উইভিং স্কুল, ১৯২৫ এ সেন্ট্রাল রাইস ক্রপ সেলিং সেন্টার, ১৯২৭ এ যামিনী রাইস মিল এবং ১৯৩৪ সালে রুরাল রিকন্সট্রাকশন ইনস্‌টিটিউশন।

এ যেন উন্নয়নের এক অশ্রুত জোয়ার। অন্যান্য বাদা অঞ্চল থেকে একেবারেই ভিন্ন। ১৯৪৪, ১৯৪৫-এ প্রায় সমস্ত খবরের কাগজে স্টেটসম্যান, বেঙ্গল উইকলিতে ভূয়সী প্রশংসা।[১৯] প্রতিটি গ্রামে ব্যাঙ্ক ও বিদ্যালয় আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। লেখা হচ্ছে 'Where the jungale law reigned thrity years ago, now reigned small village societies.'[২০] অঞ্চল জুড়ে মদের দোকান নেই, অরাজকতা নেই। বার্তা ছড়িয়ে যায় দূর দূরান্তে।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'I have my trust in individuals like yourself who are simple lovers of humanity'?[২১] রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের ভাবনায় গোসাবার প্রভাব রয়ে গেছে। হ্যামিলটন বহু ব্যাপারে গান্ধীর সাথেও সহমত পোষণ করতেন।

নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় হ্যামিলটনের এই সমবায় উদ্যোগ। উন্নয়নের যে সমাজচিত্র এই অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল তা বাস্তবে কৃষকের সমাজমানসিকতাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে অবশ্য পরবর্তীকালে যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় এবং প্রত্যক্ষ হয় হ্যামিলটনের মৃত্যুর পরে। সমবায়ের মূল মানসিকতা অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা দ্রুত অন্তর্হিত হয়।

সমবায় মানসিকতায় কৃষকের মন কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তার বেশ কিছুটা হদিশ পাওয়া যায় পঞ্চায়েতের কার্যবিবরণী এবং ইনস্পেকশন নোট বুক থেকে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬, এই গোটা সময় জুড়েই কার্য বিবরণীতে স্পষ্ট ধরা পড়ে কয়েকটি মূল বিষয়, যেমন - ঋণ নেওয়া ও শোধ দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট গন্ডগোল ছিল, [২] একবার সংস্থার সম্পাদক নিজে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেননি, তার উল্লেখ রয়েছে।[৩] মিটিঙে কৃষক সাধারণের অংশ গ্রহণে অনীহা, গ্রামীণ ঝগড়া বিবাদে পারস্পরিক হৃদ্যতার যথেষ্ট অভাব (যা সমবায় মানসিকতার সম্পূর্ণত বিরোধী), এমনকি পরবর্তীকালে ম্যানেজার সুধাংশুবাবুর বিরুদ্ধে নালিশও কার্যবিবরণীগুলিতে স্পষ্টতই উল্লেখিত।[৪]

হ্যামিলটনের জীবদ্দশায় গোসাবায় তার উপস্থিতি পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলায় সমস্যা, ফাঁকিবাজ ইত্যাদি তুলনামূলক ভাবে কম ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এটাই কি তাহলে সত্য যে, হ্যামিলটনের ব্যক্তিত্ব কিংবা মহানুভব অথচ কঠোর জমিদারের প্রতি কৃষক সাধারণের সম্ভ্রমবোধ ও সমীহই সাদারণ মানুষদের শান্ত সভ্য বা সমবায় প্রচেষ্টার অন্তর্গত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল? অথবা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ নেওয়াটাই কৃষকদের উদ্দেশ্য ছিল? সমবায় মানসিকতা তাদের মধ্যে প্রভাবই ফেলেনি, এ ছিল নিছকই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এক প্রয়াস?

গোসাবায় সমবায় প্রচেষ্টা শেষাবধি হারিয়েই গেল। হারিয়েই গেলেন ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন গোসাবা থেকে। সমবায় হ্যামিলটনের মানসলোকের কল্পনাই থেকে গিয়েছিল সাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি, এ এক প্রত্যক্ষ সত্য। হয়ত এর জন্য প্রয়োজন ছিল অন্য কোন পথ অন্য কোন পদ্ধতি। সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পদ্ধতি হ্যামিলটনের জানা ছিল না।

এর পরও একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। সমবায় উদ্যোগের জন্য এমনই, একটা পিছিয়ে থাকা অরণ্য অঞ্চল নির্বাচন করলেন কেন? এবং করলেন এমনই এক সময়ে যখন বাংলার মধ্যবিত্ত বিপ্লব চেতনা ক্রমান্বয়ে আশা ও হতাশায় দোদুল্যমান। জানা যায় কিছু আন্দামানের বন্দীদের এই অঞ্চলের নিয়ে এসে উনি বসবাস করিয়েছিলেন।[১১] তবে কি তার কাছে মধ্যবিত্ত যুবকদের এই বিপ্লব প্রয়াস বিপথগামী এক ক্রিয়াকান্ড বলে বোধ হয়েছিল? এবং এই বিপথগামী যুবকদের এমন এক সমবায় প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করে বড় কোন বিদ্রোহে সামিল হওয়া থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন? এবং করেছিলেন সচেতনভাবে? সেক্ষেত্রে অ্যালান অকটাভিয়ান হিউমের

সেফটি ভালভ থিয়োরির কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যাবে। প্রশ্ন উঠে আসে সমবায় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের আন্তরিকতা নিয়ে। যাই হোক, হ্যামিলটনের গোসাবা ভাবনা শেষ পর্যন্ত কিন্তু এক স্থায়িত্বহীন পরিকল্পনায় পর্যবসিত হয়। জনজীবনের তৃণমূলী সত্ত্বায় মূল আদর্শকে, তার দর্শনকে প্রোথিত না করে ওপর থেকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার ফল অন্তঃসারশূণ্য হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মহাপ্রাণের সমবায় ভাবনা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয় গোসাবাব মাটিতে। আজ শুধুই হ্যামিলটন একটি নাম এবং তার সমবায় ভাবনা একটি তত্ত্বমাত্র, বাস্তবের গোসাবায় আজ যার কোন চিহ্নই নেই।

সূত্র নির্দেশ

১. কালিদাস দত্ত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অতীত, প্রথম খন্ড, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ১৯৮৯, পৃ. ২৭.

২. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত), দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ ১১২৩-১১৩০.

৩. J West Land, A Report on the District of Jessore, Its Antiquities, Its History, and Its Commerce, Calcutta, 1871, pp 20-21.

৪. Radha Kumud Mookherjee, Indian Land System, Ancient, Mediaval and Modern with special reference to Bengal, Alipore, West Bengal, 1958, P. 37.

৫. নীতীশ সেনগুপ্ত, 'সুন্দরবনের ভূমিব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভূমিকা', রমেশচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ', সম্পাদিত, ইতিহাস, ১৯৬০, পৃ ৬৪-৬৫.

৬. F.E. Pargiter, A Revenue History of Sundarbans, 1765-1870, Calcutta, P.I.

৭. West Bengal State Archives, Board of Revenue, 10th May 1786, Letter written by collector of Jessore to President, Members of the Calcutta Committee of Revenue, L.S S.O. Malley, Bengal District Gazetteer Twenty Four Pargenas, Calcutta, 1914, pp 46-47.

৮. Pargiter, পূর্বোল্লেখিত, P.I.

৯. L S.S.O' Malley, Bengal District Gazetteer, Khulna, Calcutta, 1908, P 41.

১০. J. Westland, pp 79-89, West Bengal State Archives, Calcutta Committee of Revenue, 27th June 1775, Letter issued to Governor General in council, Fort Willium from Prit Chand.

১১. কালীপদ ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়ল ম্যাকিনন হ্যামিলটন, গোসাবা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ১৯৫৫, পৃ ২.

১২. D M. Hamilton, New India and How to get there Calcutta, 1931, ppvi-vii.

১৩. গোসাবা, হ্যামিলটনের বক্তৃতা, 'To the Zamindars of Bengal', Januray, 1936, হ্যামিলটনের নথিপত্র - দ্রষ্টব্য (অপ্রকাশিত)

১৪. West Bengal State Archives, Revenue Department Land Revenue Branch, File No 3 – L/15 (1-2) Proceedings No., 25-26, February 1909, Letters From F.W. Duke. (Chief Secretary to the government of Bengal) to the Commissioner of the Presidency Division.

১৫. কালীপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লেখিত, পৃ ১৮, S. B. Majumder, 'Estate Farming in India, Indian Farming, Vol III, No. II, November, 1942, pp. 573-574.

১৬. S. B. Majumder, 'Estate Farming in India, পূর্বোল্লেখিত, pp 574-577

১৭. A. P. Blair, 'Practical Co-operation Sir Daniel Hamilton's Farm in the Sunderbans', Modern Review, Apirl 1937, p - 395.

১৮. 'Clive Street Gossip', reprinted from Indian Finance, Friday, 18th Feb, 1938, pp 1-2

১৯. 'Praise for Gosaba Scheme', The Bengal Weekly, 7th March 1945,

গোপীনাথ বর্মন, 'মহান স্যার ড্যানিয়ল হ্যামিলটন ও মানস কন্যা গোসাবা', রমানাথ মাইতি, সম্পাদিত, সুন্দরবন সমাচার, অষ্টম সংখ্যা, গোসাবা, ১ লা ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ, ১-৪.

২০. S B. Majumder, 'Estate Farming in India', পূর্বোল্লেখিত, pp 573-577

২১. Santiniketan, Rabindra Bhavan, 20th June, 1930; Letter from Tagore to Hamilton.

২২. গোসাবা, পঞ্চায়েত কার্যবিবরণী, অধিবেশন, ২৮ শে' ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, ৮ই জুন ১৯৪৬, ২০ শে জানুয়ারী ১৯৪৫, ইনস্পেকসন্ বুক, ১৮ই জানুয়ারী ১৯২০, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৬, ১৬ই জুলাই ১৯৪৮ এর রিপোর্ট।

২৩. গোসাবা, ইনস্পেকস্ন বুক ১৬ জুলাই ১৯৪৭, এর রিপোর্ট।

২৪. গোসাবা, ইনস্পেকস্ন বুক, ২৮ শে মার্চ ১৯৩৪, কো -অপারেটিভ মেম্বারদের চিঠি লেডি হ্যামিলটনকে।

২৫. গোপীনাথ বর্মন, 'মহান স্যার ড্যানিয়ল হ্যামিলটন ও মানস কন্যা গোসাবা' পূর্বোল্লেখিত, পৃ, ৩-৪

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে চব্বিশ পরগনার লবণ শ্রমিক (১৭৬৫-১৮০০)

পুষ্পরঞ্জন সরকার

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও উৎপাদন উপকরণগুলি কুক্ষিগত করতে শুরু করে। লর্ড হেস্টিংস লবণ শিল্পকে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়-এ পরিণত করেন।

সূতি বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, সোরা, গন্ধক প্রভৃতির নবাবী আমলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল মুর্শিদাবাদের কাশিম বাজার। এর সঙ্গে লবণ শিল্পের প্রাসঙ্গিকতায় বলা যায়, লবণ নিত্য আহার্য বস্তু হওয়ায় এবং ভারতে লবণ প্রাপ্তির সুযোগ থাকায় প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে লবণ উৎপাদন ছিল একান্ত পরিচিত। ভারতের তিনদিকে সমুদ্র থাকায় সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হত। মুঘল আমলেও লবণ ছিল ভারতের অন্যতম বৈদেশিক বাণিজ্য।

বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক, হিজলী এবং চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূল ছাড়াও চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্র উপকূল ছিল লবণ উৎপাদনের আদর্শ কেন্দ্র। জনশূণ্য খাড়ির মুখে নোনা জল তুলে এবং রোদে শুকিয়ে পরিশ্রম সাধ্য উপায়ে এখানে লবণ প্রস্তুত করা হত। স্বাভাবিক ভাবেই এই লবণ উৎপাদনের জন্য প্রচুর লবণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই লবণ শ্রমিকরাই বাংলায় মলুঙ্গী নামে পরিচিত ছিল।[১] কষ্টসাধ্য লবণ উৎপাদনের জন্য নিকটবর্তী গ্রামীণ শ্রমিক ও কৃষকদের পাওয়া যেত না। আরও দূরবর্তী স্থান থেকে আরও অভাবক্লিষ্ট কর্মহীনদের এখানে লবণ তৈরির কাজে নিয়ে আসা হত।

মেদিনীপুর জেলার লবণ শ্রমিক সংগ্রহ করা হত জেলার পরিশ্রমী, নিরক্ষর সাঁওতাল ও লোধা উপজাতিদের মধ্য থেকে। এঁরা 'বুনো' নামেও পরিচিত ছিল। এভাবে এদের সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর ও মেদিনীপুর জেলা থেকে হুগলী নদীর অপরদিকে চব্বিশ পরগণার সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে লবণ তৈরির কাজে নিয়ে যাওয়া হত। এই মলুঙ্গীরা (লবণ শ্রমিকরা) অনেকেই আবার অনেক সময় নিজেরা স্বাধীনভাবে লবণ তৈরি করত। তবে একচেটিয়া কারবারী হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের কাছে

লবণ বিক্রয় করতে বাধ্য থাকত। মলুঙ্গীদের এই দুই শ্রেণী 'আজুরা (প্রকৃত শ্রমিক) ও 'ঠিকা' নামে পরিচিত ছিল। মেদিনীপুব সংলগ্ন উড়িষ্যা থেকেও ওড়িয়া ভাষী লবণ শ্রমিক সংগ্রহ করা হত। মোটামুটি বলা যায় যে কোম্পানির রাজত্বের শুরুতে তাঁরা লবণ শ্রমিক রূপে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় আসেন। মলুঙ্গীদের আবার স্থানীয় ভাষায় 'নুনমারা'ও বলা হত।

মলুঙ্গীদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। অত্যধিক পরিশ্রম, ন্যূনতম মজুরী, নিরাপত্তাহীন চাকুরীতে তাদের জীবন ছিল অনিশ্চিত। নির্জনতা, স্যাঁতসেতে আবহাওযা, ভাঁটাব টান, জোয়ারের প্রাবল্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অসুবিধা তাদের সইতে হত। প্রতি বছর ডিসেম্বব থেকে জুন ছিল লবণ তৈরির মরসুম। মলুঙ্গীরা ছিলেন একান্তই অস্থায়ী মরসুমী শ্রমিক। মরসুমে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের খাটতে হত।

কম বেতন ও অমানুষিক পরিশ্রমের পরে মরসুম শেষে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তারা বাড়ী ফিরতেন। তাদের উপার্জন কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেত। সাংসারিক অভাব ছিল তাদের নিত্যসাথী। অন্য উপার্জনের পন্থা না থাকায়, পববর্তী মরসুমে আবার তাঁরা লবণ তৈরির কেন্দ্র 'চার'-এ ফিরে আসতেন।

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মুরাগাছা (চব্বিশ পরগণা) লবণ কেন্দ্রের মলুঙ্গীরা ঐ কেন্দ্রের কর্তপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বোর্ড অব ডাইরেকটরে নালিশ করেন।

এছাড়া ঐ কেন্দ্রের জনৈক সল্টএজেন্ট এদেশীয় রামতনু দত্তের অত্যাচারেও তাঁবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। কলিকাতার ঐ কেন্দ্রের (হুইলার কোম্পানী) প্রধান কার্যালয়ে তারা নালিশ করতে যান। পথিমধ্যে তাদের প্রতিরোধ করা হয় এবং লবণ তৈবির কেন্দ্রে ফেরত পাঠান হয়। ফেরার পথে অনেকে জঙ্গলে পালিয়ে যান। জঙ্গলে হিংস্রপ্রাণীর আক্রমণে অনেকের মৃত্যু হয়।[৪]

চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন ছাড়াও লবণ তৈরির অন্যান্য কেন্দ্রগুলি ছিল যথাক্রমে ১) কুলবেড়িয়া ২) হাতিয়াগড় ৩) সাহাপুর ৪) ময়দানমল ৫) মগরা ৬) মুরাগাছা ৭) পেঁচাকুলি ৮) আজিমাবাদ ৯) মইদা ১০) হাসিমাবাদ ১১) বালিয়া ১২) দক্ষিণ সাগর ১৩) বোদে ১৪) কাশীপুর (বর্তমানে বারুইপুর ?) প্রভৃতি[২] লবণ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কুলবেড়িয়া ছিল কলিকাতা পরগণার মধ্যে।

তৈরি লবণ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানীর জন্য জলপথ ব্যবহার করা হত। ঘুঘুডাঙ্গা, সুখতাল, ময়দানমল, মুরাগাছা প্রভৃতি ছিল লবণ রপ্তানীর প্রধান বন্দর, কোম্পানীর রাজত্বকালে হাওড়া, হুগলী ও কলিকাতায় হুগলী নদীর উপকূলে অনেক লবণের গুদাম ছিল। বরানগর, শোভাবাজার পেঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে লবণ গুদামের অবস্থান ছিল। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'খালারি' (লবণ উৎপাদন কেন্দ্র)-র সংখ্যা ছিল ২৬০০ এবং জেলার মলুঙ্গীর সংখ্যা ছিল, ১৮,৬৫৫ জন। ঐ বছরে চব্বিশ পরগণায় মোট ৪,৬৫,০০০ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুব সংলগ্ন উড়িষ্যার বালেশ্বর ছিল পূর্ব ভারতের লবণ রপ্তানীর

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

দেশীয় লবণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ্য। খ্যাতনামা ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকীর মোহন সেনাপতির আত্মজীবনীতে 'বালেশ্বরী পঙ্গানুন (সামুদ্রিক লবণ)' ও তৎকালীন লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি নিজেও লবণ ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মলুঙ্গী প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। অভাবক্লিষ্ট মলুঙ্গীরা যোগ্য পারিশ্রমিক না পাওয়ায় অনেক সময় অসদুপায়ের আশ্রয় নিতেন। নিমক দারোগার চোখ এড়িয়ে, ওজন কম দেখিয়ে অতিরিক্ত লবণ নাম মাত্র মূল্যে লবণ রপ্তানীকারকের নৌকায় পাচার করতেন। অন্যভাবে বলা যায় যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাদের মধ্যে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার করত। কিন্তু তা ছিল বিক্ষিপ্ত মাত্র। সংঘবদ্ধতা ও নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পরবর্তীকালের নীল বিদ্রোহ বা দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামার (Decan Riot) ন্যায় আলোড়নকারী ঘটনায় পরিণত হয় নি।

বর্ণগতভাবে বলা যায় যে জঙ্গল ঘেরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নিম্নবর্গের স্থানীয় মানুষদের অনেকেই প্রকারান্তরে মলুঙ্গীদের বংশধর। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে লবণ শ্রমিক থেকে কৃষি মজুরে পরিণত হন। তাঁরা সুন্দরবনের স্থানীয় জমিদারদের জঙ্গল পরিষ্কার করে তাকে আবাদযোগ্য করে তোলেন। খাল-বিল-নদী-নালা ঘেরা সুন্দরবনে তাঁরা মৎস্যজীবীরূপেও পরিণত হন। এখানেই তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন।

একচেটিয়া বাণিজ্য ও এজেন্সী প্রথার অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ সরকার (কোম্পানি) এক সময়ে আইন করে ভারতে লবণ উৎপাদন বন্ধ করেন। অধিকতর মুনাফা লাভের আশায় ইংরেজ বণিককূল ইংল্যান্ডের উৎপাদিত লবণ চড়া দামে ভারতে রপ্তানী করতে থাকেন। ভারতে লবণ উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় চব্বিশ পরগণার মলুঙ্গীরা লবণ শ্রমিক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে (এপ্রিল) গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য অন্দোলনের অঙ্গরূপে লবণ আইন ভঙ্গ শুরু হলে চব্বিশ পরগণার মহিষবাথান (বর্তমান সল্টলেকের নিকটবর্তী), কালিকাপুর (ক্যানিং) ও নীল (ডায়মন্ড হারবার) লবণ আইন ভঙ্গের কেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করে। কলিকাতার কংগ্রেস নেতাদের সংস্পর্শে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীরা এই স্থানগুলিতে বে-আইনী লবণ তৈরি করে (এখানকার নোনা জলে লবণ তৈরি করার সুযোগ থাকায়) লবণআইন ভঙ্গ করতে এগিয়ে আসেন। স্থানীয় প্রভাবশালী মানুষের একাংশও এই লবণ আইনভঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী মহিষ বাথানের তৎকালীন জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭] ঐ সময়ে বাংলায় সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের কংগ্রেসী নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থাকায় এই অঞ্চলে লবণ আইন ভঙ্গের দায়িত্বভার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের ওপর অর্পিত হয়েছিল।[৮]

স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহচর্যে এবং স্বদেশ প্রেমের অনুভূতি নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই লবণ আইনভঙ্গে অকুতোভয়ে যোগ দেন।" এই গ্রামবাসীদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই ছিলেন মলুঙ্গী বা লবণ শ্রমিক। এ কথা মনে করা অসমীচীন হবে না যে পূর্ব পুরুষদের (লবণ শ্রমিকদের) ওপর অত্যাচার পরপুরুষদের (বর্তমান গ্রামবাসীদেব) ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. S C. Agarwal, The Salt Industry in India, Delhi, Ministry of Production, 1956, P-32

২. A M Serajuddin, The Condition of the Salt Manufacturer of Bengal under the Rule of the East India Company (Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol XVIII no.1) Dacca, April, 1973, P.5

৩. Balai Barui, The Salt Industry of Bengal Calcutta, 1985 P-8

৪. A M Serajuddin, The Condition of the Salt-Manufacturer of Bengal under the Rule of the East India Company (Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XVIII no 1) P-8

৫. Balai Barui, The Salt Industry of Bengal P-9

৬. Liberty, April 9, 1930, 9-10

৭. ভূপেশ চন্দ্র প্রামাণিক, লবণ ক্ষুদের উপকথা

৮. The Mussalman April 13, 1930

৯. কৃষ্ণকালী মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৯৯ পৃঃ ১২৭

প্রবর্তক জুট মিল্‌স (লি)
একটি 'স্বদেশী' শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা
(১৯৩৫-১৯৪১)

অমিয় ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণোজ্বল অধ্যায় ছিল স্বদেশী আন্দোলন, জন্ম যার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জঠরে। সন্দেহ নেই, আট কোটি (প্রায়) লোকের বাসস্থান বাংলাপ্রদেশকে শাসন করতে হলে প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাগের, কিন্তু পিছনে ছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি। বাংলাদেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা চেয়েছিল ভাবতীয় জাতীয়তাবাদের স্নায়ুকেন্দ্র বাংলাকে দুর্বল করে দিতে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতীয়, রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ঘটেছিল এই সময়েই। বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ চরমপন্থার দিকে ঝুকে পড়লেও এই মতের অন্যতম প্রবক্তা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ উপলব্ধি করেন পন্থার ক্রটিগুলি। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর কাছে প্রথম যোগমন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীমতিলাল রায় প্রচার করতে লাগলেন দেশ ও জাতিগড়ার নবমন্ত্র। কিছু যুবক চরমপন্থা ত্যাগ করে এঁদের 'Man Making'- এর আহ্বানে সাড়া দিলেন। এদেবই যৌথ প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গডে উঠলো প্রবর্তক সংঘ, 'Nation Making' -এর প্রতিষ্ঠান। শুরু হলো এগিয়ে চলার তৃতীয় পথ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় নয় তৃতীয় দলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'বিশ্বচৈতন্যকে আশ্রয় করে ভারতের নবজন্মের কথা'। অরবিন্দের আশীর্বাদ ধন্য প্রবর্তক সংঘ ধর্ম, অর্থ, শিক্ষা, শিল্প ও সেবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে তার উদাহরণ গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। এই সঙ্ঘের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হলো 'প্রবর্তক জুট মিলস্' নামে একটি বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা। স্বদেশীদের চটকল গড়ার এই একমাত্র প্রচেষ্টাকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

।। ২ ।।

ভারতবর্ষের ডান্ডিতে পাটশিল্পের সূচনা হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাংলা পাটশিল্পজাত উৎপাদনে ডান্ডিকে ছাড়িয়ে যায়।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি

ভারতের পাটশিল্পে স্কটিশদের আধিপত্য ছিল। কেবলমাত্র একজন ভারতীয় পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শিল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অধিকাংশ মূলধন এসেছিল ভারতে অবস্থানরত অথবা ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও পদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে।[১] কাঁচা পাট উৎপাদনে ভারতের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়রা কেন এই শিল্পে আগ্রহী ছিল না তার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী। অধ্যাপক বাগচী মনে করেন বাঙালীদের উদ্যোগের অভাব, ভূমিকা না থাকা ছিল কারণ।[৩] ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার শিল্পের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। কারণ এই বছরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ঠাঁই করে নেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় চটকলের সংখ্যা ৪৩ থাকলেও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০০ তে।[৪] কিন্তু বাংলার ১০০টি চটকলের মধ্যে বাঙালী পরিচালিত মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি।[৫] চটকলগুলি মূলত গঙ্গার দুই তীরে হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠে। এক সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চটগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিল ২৯৩,৪৬৯ জন কর্মী।[৬] ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মীর সংখ্যা ৬৩ হাজার কমে গেছে।[৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চটকলগুলিরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ১/৮ অংশ দখল করে নেয় পাটজাত দ্রব্য।[৮] সে সময় এই চটকলগুলি প্রায় ৩ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল।

।। ৩ ।।

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে যেসব স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাপড়ের কল, তাছাড়াও বেঙ্গল কেমিকেল্‌স্, ন্যাশনাল সাইকেল ও মোটর কোম্পানী, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কোম্পানী এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কারখানার কথা উল্লেখযোগ্য। এমনকি ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয়রা নেমে পড়লেও ইউরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ন করতে চটকল স্থাপনে স্বদেশীদের উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় স্তিমিত হয়ে এলে, বক্তে রাঙা বিনিদ্র রজনীর শেষে গান্ধীজীর অহিংসের ঢেউ উঠলেও বাংলার বুকে গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বজা নিয়ে তখনও সবার আগে চলেছিল প্রবর্তক সংঘের কর্মীরা। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বুকে গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়া অব্যাহত রেখেছিল মতিলাল রায়ের নেতৃত্বে প্রবর্তক সংঘ। প্রবর্তক সংঘ চটকল স্থাপন করতে আসে কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমত, বৈপ্লবিক আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বন্দীদের মুক্তির পর শিক্ষিত এইসব বেকারের কর্মসংস্থান করা। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলা প্রদেশের অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকারকে একপত্রে মতিলাল রায় লেখেন : "Our Jute Mill

project has been conceived with this very object inview to create a field, where unemployed educated youths on a vast scale may find a way of maintenance through dignified labour" " দ্বিতীয়ত, বাংলার, চাষীর উৎপাদিত পাটের অর্ধেক ইউরোপে রপ্তানী করা হত। এই রপ্তানী পাটের জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা শুল্ক দেশ থেকে বহির্নির্গমন হয়ে যাচ্ছিল। সেটি বন্ধ করার চিন্তা ধরা পড়ে চটকল পরিচালকের ভাষণে।[১০] তৃতীয়ত, প্রবর্তক সংঘ Commercial Corporation প্রতিষ্ঠা করে রপ্তানী বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংঘের কর্মীরা একটি রপ্তানী নির্ভর বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহসী হয়।

॥ ৪ ॥

প্রবর্তক সংঘ এই বৃহৎ শিল্পটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সর্বপ্রথম ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবর্তক জুট মিলস্ লিমিটেড' নামে একটি ২৫ লক্ষ টাকার মূলধনের যৌথ কোম্পানী রেজিষ্টারীকরণ সম্পন্ন হয়।[১১] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কাছে কামারহাটি পৌরসভার অন্তর্গত এলাকার জমি কিনে প্রস্তুতির কাজ শুরু করে। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জুট মিল তৈরীর কাজে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বিপ্লবী মতিলাল রায় চাইছিলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ উৎপাদন শুরু করতে।[১২] কিন্তু নানা বাধা উপস্থিত হয়ে এই বৃহৎ শিল্পটি গড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রথম বাধাটি ছিল অর্থের। অবশ্য সংঘকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শেয়ার বিক্রির মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহে সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হয়।[১৩] দ্বিতীয় বাধাটি আসে কারখানার যন্ত্রপাতি সরবরাহকে কেন্দ্র করে। জুটমিল এসোসিয়েশনের অনুমতি ছাড়া কোন সংস্থাই যন্ত্রপাতি সরবরাহে রাজী ছিল না। এই এসোসিয়েশনে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য থাকায় নানা অজুহাতে প্রাক্তন বিপ্লবীদের এই গঠনমূলক কাজকে বাধা দিতে থাকে। এই মর্মে নিখিলবঙ্গ প্রবর্তক সংঘ সম্মেলনের চতুর্থ কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছিল ঃ "গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রবর্তক সংঘের নবীন অভিযান প্রবর্তক জুট মিলস্ লিমিটেডের অগ্রগতির পথে বৈদেশিক পাট ব্যবসায়ী সংঘের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে গুরুতর বাধা এসেছে। সংঘের কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জুট এসোসিয়েশনের অসহযোগিতায় যদি যন্ত্রপাতি কেনার পথ দীর্ঘদিন রুদ্ধ হয় তা'হলে সংঘের এই মহতী চেষ্টাই সমূলে বিনাশ হবে না, পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালীর কারবার হয়তো ভবিষ্যতে বন্ধ করে দিতে হবে"।[১৪] ইতিমধ্যে তৃতীয় বাধাটি আসে বাংলা সরকারের কাছ থেকে। ১৯৩৮ খ্রীঃ জুট অর্ডিনান্স পাশ করে বলা হয়, চটকলগুলি যন্ত্রপাতি কিনতে চাইলে সরকারের অনুমতি লাগবে।[১৫] এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে অর্থাৎ সরকারের লালফিতের বাঁধন থেকে বেড়িয়ে আসতে সংঘসভাপতি মতিলাল রায় দ্বারস্থ হন মন্ত্রীদের কাছে। বাংলার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী হুসেন সৈয়দ সুরাবর্দীকে চিঠি লেখা হয় কারখানা স্থাপনের বাধাগুলি জানিয়ে (দেখুন -পরিশিষ্ট 'ক')। সংঘ কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা, সংঘ

প্রতিষ্ঠা বিপ্লবী মতিলাল রায়ের গঠনমূলক কাজের সুখ্যাতি, সংঘের আদর্শের প্রতি বাংলার জনগণের আস্থা এবং তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে প্রবর্তক জুট মিলস্ তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে সক্ষম হয়। এই মর্মে সংঘ সম্পাদক তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন ঃ " আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করার পর সংঘের জুটমিল কার্যাদি শেষ। অধিকাংশ বহুমূল্য মেশিনারী প্রাক্‌যুদ্ধের দরে পাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই মিল সম্পূর্ণ বাঙালীর পরিচালনাধীন বাংলার অর্থশিল্পের যৌথ কারবার বলিয়া, ইহা বাংলার ধনী ও মধ্যবিত্ত সর্বসাধারণের একান্ত সহানুভূতি ও সহযোগিতার যোগ্যক্ষেত্র"।[১৬]

প্রবর্তক জুট মিলস্ -এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ বড় বাধা ছিল বিশ্বযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব চটশিল্পের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সরকারী অনুমতি পাওয়া গেলেও, অর্থ সমস্যা মিটলেও যন্ত্রপাতি পৌঁছাতে দেরী হওয়ায় (ইংল্যান্ড থেকে) মিলের উৎপাদন শুরু আরো পরে, ১৯৪১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে। জুট মিলের পরিচালক মন্ডলীব ষান্মাসিক প্রতিবেদন এবং অডিট রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ড থেকে কিছু যন্ত্রপাতি ঝুঁকি নিয়ে কেনা হয় এবং বাকী স্থানীয়ভাবে বরাত দেওয়া হয়েছিল।[১৭] অবশেষে মাসিক ২০০ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন মাত্রা স্থির করে ১৯৪১ খ্রীঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী প্রবর্তক জুট মিলস্-এ উৎপাদন শুরু হয়।[১৮]

॥ ৫ ॥

স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যেব প্রচেষ্টার পথে প্রবর্তক জুট মিলস্ (লিঃ) প্রতিষ্ঠান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। অন্যদিকে স্বদেশীদের শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রথম চটকল ও বাঙালী পরিচালিত চটকলের তালিকায় চতুর্থ সংযোজন। ভারতের পাট শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী নানা আলোচনা করলেও স্বদেশীদের এই গঠনমূলক প্রচেষ্টা সম্পর্কে নীরব থেকে গেছেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা থাকায় এই জুটমিল প্রথম থেকেই লাভের মুখ দেখতে থাকে এবং ১৯৫৯ খ্রীঃ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছিল শতকরা ৬ শতাংশ।[১৯] ১৯৬০ খ্রীঃ মিলটির আধুনিকীকরণের জন্য ৯.৬৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে।[২০] কিন্তু নূতন আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতিতে শেয়ার হাত বদল হয়ে যাওয়ায় জুট মিলের ম্যানেজিং এজেন্সী চলে যায় অন্যোর হাতে। আসলে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হাত বদলের পর থেকে ধীরে ধীরে স্বদেশিকতার রঙ ফিকে হতে থাকে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের উচ্চমূল্যের ডিভিডেন্ডের ধাক্কায় প্রবর্তক সংঘের শেয়ার বাজার নষ্ট হয়। দ্রুত মূলধন হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে সংঘের জুট মিলের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। তাছাড়াও দেশ বিভাগের পর পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গে সংঘের পাটের গুদাম গুলিও পাকিস্থান 'শত্রুসম্পত্তি আইন' দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়। পরিণতিতে প্রবর্তক সংঘ চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

প্রবর্তক জুট মিলের পর তাই আর্থিক আঘাতটি ছিল চরম। যদিও এই মিলটির মালিকানা অন্য ব্যক্তিদেব হাতে চলে গেছে, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, গঠনমূলক জাতীযতাবাদের এই উজ্জ্বল উদাহরণকে আমরা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই দিতে বাধ্য।

সূত্র নির্দেশ

১ অমিয় কুমাব বাগচী - ভারতের আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগও উৎপাদন ১৯০০-১৯৩৯, কলিকাতা, ১৯৯৭, প ২৮৮

২. তদেব, পৃ ২৮৯

৩ তদেব, পৃ ২৮৯-২৯০

৪ ১৯৪১ খ্রী. ১৬ ফেব্রুয়াবী প্রবর্তক জুট মিলস্ (লি.)-এর উদ্বোধনী- অনুষ্ঠানে ডিরেক্টব দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রদত্ত ভাষণ, পৃ ১ সূত্র ঃ প্রবর্তক ট্রাস্ট অফিস, কলিকাতা, ফাইল সংখ্যা Jute Mill/II/38

১৯৪০ খ্রীঃ ভাবতেব চটকলের সংখ্যা

ক)	বাংলা প্রদেশ	১০০টি
খ)	বিহাব প্রদেশ	৪টি
গ)	মাদ্রাজ প্রদেশ	৪টি
ঘ)	সেন্ট্রাল প্রদেশ	- ৪টি
	মোট	১১২টি

৫. তদেব, পৃ. ১ ৪

৬. Census of India (Bengal and Sikim) - 1931, Vol-V, Calcutta, 1937, p 275

৭ তদেব পৃ ২৭৫

৮ ডিরেকটর দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভাষণ (১৬ ২.১৯৪১), পৃ-২

৯ অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারকে লেখা সংঘ সভাপতি মতিলাল রায়ের চিঠি, তাং ১০ ১২ ১৯৩৭

সূত্র ঃ সভাপতির ব্যক্তিগত ফাইল, চন্দননগর

১০ প্রবর্তক জুট মিলসের পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভাষণ, পৃ. ২

১১ তৃতীয় নিখিলবঙ্গ প্রবর্তক সংঘ সম্মেলনে সম্পাদক পঠিত বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৯৩৬, পৃ ৫

১২ শ্রী মতিলাল রায় কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা - 'প্রবর্তক জুট মিলের জন্য আমার আকুতি', চন্দননগব, ৩০ জুন, ১৯৩৭

১৩ শ্রী মতিলাল রায়ের ব্যক্তিগত দিনলিপি, তাং - ৯.৮ ১৯৩৭ (বর্তমানে চন্দননগর সংঘের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত)

১৪. পঞ্চম নিখিলবঙ্গ প্রবর্তক সংঘের সম্মেলনে সম্পাদক পঠিত বার্ষিক কার্যবিবরণী, চট্টগ্রাম, ১৯৩৮, পৃ. ৬

১৫. তৎকালীন বাংলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী সুরাবর্দীকে লেখা মতিলাল রায়ের চিঠি, তাং - ২৭. ১০. ১৯৩৮

সূত্র ঃ সভাপতির ব্যক্তিগত ফাইল, চন্দননগর

১৬. ষষ্ঠ নিখিলবঙ্গ প্রবর্তক সংঘ সম্মেলনে পঠিত সম্পাদকের কার্যবিবরণী, রায়না, বর্ধমান, ১৯৩৯, পৃ. ৫

১৭. Audited Accounts for the Half-year ending 31.12 1939 for Prabartak Jute Mills Ltd., Auditors : P. C. Nandı and Co., Calcutta, dt 23.2.1940

১৮. প্রবর্তক জুট মিলের ডিরেকটরের ফাইল, সংখ্যা - Con./II/1938, প্রবর্তক ট্রাস্ট অফিস, কলিকাতা

১৯. 27th Annual Report of the Director's, Prabartak Trust, Calcutta, 13 4 1960

২০. তদেব।

পরিশিষ্ট 'ক'

MOTILAL ROY **PRABARTAK SAMGHA**

CHANDERNAGORE

Dated the 27th. October ' 38.

Hon'ble Mr. Suhrawardy,
Minister-in-charge,
Commerce & Labour Department.

Dear SIr,

It is years ago you once graced the Prabartak Samgha, with your visit when the latter received a touch of your heart, which we do still remember.

Two members of this Samgha who to-day approach you with this letter, require your favour in connection with the Prabartak Jute Mill. Two and a half years ago, this Company was flotated by the Samgha as a continuation of its effort to solve the unemployment problem of Bengal. A lakh and half of rupees have already been spent in laying the foundation of the Mill.Now, in view of the recent Jute Ordinance, it is impossible for us to order for

Machinery without official sanction from you. Several months have already elapsed due to this difficulty. The work has been brought almost to a standstill, which is a cause of great economic loss and disavantage to us - as you may easily understand.

The Parbartak Samgha is a missionary body, whose workers have long been suffering and toiling to serve the country and humanity. Their aim is to spread education and uplift the economic condition of the country, for which they have started various institutions along both lines.

It is my fervent appeal to you to-day, to help us by giving us the necessary sanction, so that we may place our order for Machinery without delay. You have sincere sympathy for the Samgha and the noble cause it represents. I am sure, you will lend a sympathetic hearing to my friends and lay us all in a deep bond of gratitude by finally ordering the sanction.

Praying to God for your long life and prosperity,

Yours sincerely,

সূত্র ঃ সংঘসভাপতির ব্যক্তিগত ফাইল, চন্দননগর (মূলকেন্দ্র)।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতি (১৯৪৭-৭০)
একটি পর্যালোচনা

চন্দন বসু

যে কোন দেশের আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিল্প অর্থনীতির ভূমিকা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। একথা আরো গভীর ভাবে প্রযোজ্য উত্তর-ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের আর্থিক উন্নয়ন, বিশেষত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কল্যাণ মুলক অর্থনীতির সক্রিয় ভূমিকা প্রসঙ্গে। দরিদ্র দেশের শিল্প বিকাশের অপেক্ষাকৃত শ্লথ হার ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।[১] উত্তর-ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের শিল্প অর্থনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনার বৃহত্তর প্রেক্ষিত মনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতিকে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের রেশ স্বরূপ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কাঠামো পশ্চিম ভারতের তুলনায় বহুলাংশে সুষম ছিল। পশ্চিম ভারতের শিল্পায়নের ভিত্তি ছিল বস্ত্র ছিল; পূর্ব ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে শিল্প অর্থনীতির বিকাশে পাট শিল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তারপরেও একথা মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন শিল্প যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতু, রাসায়নিক, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ ঘটে। ১৯৪৭-৪৮ সাল পশ্চিমবঙ্গ ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য স্থান দখল করেছিল।[২] এই প্রসঙ্গে শিল্পায়নের আঞ্চলিক বৈষম্যর কথাও মনে রাখা দরকার। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে যে অগ্রগতি দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ জেলায় যেমন কলকাতা, হাওড়া, ২৪-পরগনা এবং হুগলী। পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অঞ্চল বিশেষত উত্তরবঙ্গ (চা বাদ দিলে) ছিল মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক। স্বাধীনতা -উত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করার সময় এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা মাথায় রাখা দরকার। বর্তমানে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা-উত্তর দশকে পরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগও বেসরকারী পুঁজির বিনিয়োগ সত্ত্বেও এই আন্তঃ জেলা বৈষম্য কমেছিল কিনা তা বোঝা। বর্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনা করা হবে ১৯৪৭ উত্তর দীর্ঘমেয়াদী শ্লথ উৎপাদন হার ও শিল্প সঙ্কটের কথা মনে রেখে। বলা বাহুল্য এই আলোচনা করা হবে যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে।

স্বাধীনতা - উত্তব প্রথম দশকে পশ্চিমবঙ্গেব শিল্প অর্থনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ অবদান দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জন্ম। পরিকল্পিত সবকাবী উদ্যোগের ফলে এখানে দুর্গাপুব স্টিল প্ল্যান্ট, মাইনিং এন্ড এ্যালায়েড মেশিনারী কর্পোরেশন, অপথ্যালমিক গ্লাস প্রজেকট, দুর্গাপুর প্রজেকট (কোক ওভেন), দুর্গাপুর কেমিক্যালস প্রভৃতি। এছাড়া দুর্গাপুরে একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করা হয়। বস্তুত দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে একটি শিল্প নগরীর জন্ম হয় ও কল্যাণীকে কেন্দ্র কবে একই ভাবে শিল্পায়নের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। কল্যাণী স্পিনিং মিলস-এর মতন বড় শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি ছোট শিল্প বিকাশের কথাও ভাবা হয়। একটি হিসেব থেকে দেখা যায় ১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করেছে মাথা পিছু ২৪৩ টাকা। এর মধ্যে ১৪১ টাকা কেন্দ্রীয় সহায়তা।[৪] ১৯৬৮ সালের ৩১মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন সংস্থায় মোট ৪০৩.৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এই হিসেবের মধ্যে ফারাক্কা ও হলদিয়ার হিসেব ধরা হয়নি। কিন্তু এই বিপুল সরকারী বিনিয়োগ সত্ত্বেও ১৯৬৬-৬৭ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে যে সার্বিক সঙ্কটের সূচনা হয় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেও তার ছায়া পড়ে। শ্রমদিবস নষ্ট, ধর্মঘট, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, শ্রমিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্পে, বিশেষত দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে উৎপাদন কমে যায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দুর্গাপুরের শিল্প অর্থনীতি আক্ষরিক অর্থে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্কট[৫] রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থার একটি সূচক মাত্র।

পরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী শিল্প কাঠামোর ক্ষেত্রে এই একই ধবনের ছবি পাওয়া যায়। বেসরকারী ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিকাশ লাভ করে পাটকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের মোট শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৩৪.৩ শতাংশ যোগান দিত পাট শিল্প। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানীকৃত পাটের মূল্য ছিল ১৩৫.১ কোটি টাকা যা দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ২১ শতাংশ।[৬] সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শ্রমিকও নিযুক্ত ছিল এই শিল্পে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্প কিন্তু ১৯৪৭ এর পর থেকেই বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশ-ভাগের ফলে পূর্ব বাংলার উৎকৃষ্ট পাটের আমদানী কমে যায়। এর ফলে পশ্চিমবাংলার পাটকলগুলিতে কাঁচামালের সঙ্কট শুরু হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের দাম কমে যাওয়া। পাট শিল্পের এই সঙ্কটের অর্থ ছিল পশ্চিমবাংলার শ্রমিক শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের অস্তিত্বের সংকট। যে সংকটের অর্থ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কর্মহীনতা বৃদ্ধি। এই সংকটের প্রত্যহ ফল স্বরূপ ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের পাট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পায়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও '৬০ এর দশকের শেষে পাট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা পুনরায় হ্রাস পায়।[৭] এই তথ্যগুলি থেকে প্রাথমিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৯৪৭ সাল থেকে পশ্চিমবাংলার পাট শিল্পে একটি দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের সূচনা হয়,

'৬০ এব দশকের শেষে এই সঙ্কট চরমে ওঠে এবং এই সঙ্কটে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রমিক শ্রেণীব স্বার্থ।

পাট শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে। সার্মগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গেব শিল্প অর্থনীতির অবস্থা ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত মোটের উপব ভালো ছিল। ১৯৬৬ ৬৭ থেকে ১৯৬৯ ৭০ পর্যন্ত এই অর্থনীতি সঙ্কটের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সঙ্কটকে চিহ্নিত কবা যায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন শিল্প সম্পর্কের অবনতি এবং জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশের মধ্য দিয়ে।

এই সময় পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কাঠামোর আঞ্চলিক ঝোঁক বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চা বাদ দিলে যাবতীয় ভারী শিল্প ছিল ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলী জেলায় অবস্থিত। ১৯৬৬ সালের একটি হিসেব থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কারখানার শতকরা ৮১ শতাংশই কলকাতা, ২৪-পগরণা এবং হাওড়ায় অবস্থিত। পরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগ সত্ত্বেও এই চিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পরে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট শিল্প শ্রমিকের শতকবা ৯৭ শতাংশ পাঁচটি শিল্প ভিত্তিক এবং দুটি চা-শিল্প ভিত্তিক জেলায় নিযুক্ত ছিল।[৮] এর থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কাঠামোর অসম বিকাশ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারো নিম্ন প্রদত্ত হিসেব থেকে এই ধারণা আরো স্পষ্ট হয়।[৯] এই একটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শিল্প কাঠামোর কোন বিধিবদ্ধ কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা (শতাংশের হিসেব) পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়না।

জেলা	বছর	মোট	বছর	মোট	বছর	মোট
	১৯৫১		১৯৬১		১৯৬৫	
উন্নত জেলা কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনা	৮৬.৩৭	৯২.৬৮	৮২.৭৮	৯১.১০	৮৩.৯৫	৯২.৬২
বর্দ্ধমান	৬.৩১		৮.৩২		৮.৬৭	
অনুন্নত জেলা						
উত্তরবঙ্গ	৪.২৯	৭.৩২	৪.৪১	৮.৯০	৩.৪২	৭.৩৮
দক্ষিণবঙ্গ	৩.০৩		৪.৪৯		৩.৯৬	

আঞ্চলিক বৈষম্যের ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার ভূমিকা ছিল মুলতঃ কাঁচা মাল রপ্তানীকারকের। শেষ বিচারে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কলকাতা

এবং উন্নত জেলাগুলির অবস্থান প্রভুত্বকারীর। সম্পদ ও শিল্পায়নের এই অসম বিন্যাসের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতি কিন্তু পিছিয়ে পড়ে। ১৯৬৬-৬৭ এর সঙ্কট কলকাতা ও তৎসন্নিহিত তিন চারটি জেলাকে তীব্রভাবে আঘাত করে এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এখানে জঙ্গী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। উপসংহারে বলা যায় কলকাতা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরতার নবীকরণ (এই সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে) ও অবশিষ্ট অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গের শিল্প অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য।

সূত্র নির্দেশ

১. ভারতের মতন তৃতীয় বিশ্বের দেশের শিল্প অর্থনীতি নিয়ে নানান গবেষণা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অমিয় বাগচী, সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন, প্রভাত পট্টনায়েক, পরেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গবেষণা দ্রষ্টব্য।

২. West Bengal - An Analytical Study. Sponsored by BCCI, Calcutta. 1971 P – 12.

৩. Ibid. P · 30-37

৪. Ibid

৫. India In Industries (Vol - 10, No – 3) suppplement on Industries in West Bengal, March, 1972. Calcutta. P - 117.

৬. Techno - Economic Survey of West Bengal – National Council of Applied Economic Research. 1962. P – 109-111

৭. Statistical Hand Book (1960, 1970) – State Statistical Bureau, Govt. of West Bengal.

৮. Techno-Economic Survey of West Bengal. op-cit. P – 26

৯. 'India In Industries', op-cit. P – 34

কলকাতা শেয়ার বাজারে মারওয়াড়ীদের আগমন ঃ বিশৃঙ্খলা না শৃঙ্খলার সূচনা

প্রবাল বাগচী

এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার শেয়ার বাজারে মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীদের আগমন ও প্রাধান্য বিস্তার জনিত বাজারের চারিত্রিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন। সমকালীন ভারতীয় ও অ-ভারতীয় সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, ডাইরেক্টরী প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় মূলধন গঠন ও যোগানের প্রয়োজনে শেয়ার বাজারের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজী ও দেশীয় ভাষাসমূহে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের দৈনিক মূল্য-তালিকা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হত। এই সাধারণ দৃষ্টান্তই একটি সরল সত্যকে মূর্ত করে তোলে যে নাগরিক পরিমণ্ডলে, বিশেষতঃ ইংরেজ জনগোষ্ঠী ও ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে শেয়ার-বাজার কোন অজানা অচ্ছুৎ বিষয় ছিল না। যদিও ঔপনিবেশিক সরকারের কর্তৃত্বের বাইরে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ব্যতিরেকে যেভাবে বল্গাহীন অবস্থায় ফাটকার দৌরাত্মে শেয়ার বাজারে মাঝে মধ্যেই বিশেষ বিশেষ শেয়ারের দাম ওঠানামা করত, তা সাধারণের কাছে ভীতিপ্রদ ও রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। সরকারী আইনকানুন অনেক পরে তৈরী হলেও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাথে বাজারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভালই যোগাযোগ ছিল, পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের সুযোগ থাকার জন্য অনেকক্ষেত্রে লাভকে লাগামছাড়া করার প্রয়োজনে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার না করাটাই প্রশাসনবিদ্‌দের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল।

সপ্তদশ শতক থেকে ব্রিটেনে ষ্টক মার্কেট ও পরবর্তীকালে লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জের ইতিবৃত্ত জানতে পারলেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে স্বাভাবিক কারণেই শেয়ার কেনা-বেচার সংবাদ পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার ও প্রমিসরী নোটের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এই বাজারটির আদিরূপ গড়ে ওঠে। মূলতঃ ইংরেজ ও ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ, বাঙালী জমিদারদের গোষ্ঠী ও বেনিয়ানরা সুরক্ষিত আয়ের জন্য সরকারী ঋণপত্র কিনে রাখত। ত্রিশের দশক থেকেই শুরু হয় ব্যাঙ্ক ও পাট কোম্পানিগুলির শেয়ারের লেনদেন।[১] ১৮৫০-এর পূর্বে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের

বিপর্যয়, সর্বোপরি ব্যাঙ্ক ও এজেন্সীহাউসগুলির পতন মূলধন গঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার ১৮৫৭ সালের এক আইন মোতাবেক ব্যাঙ্কিং ও ইনসুরেন্স ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌথ বা অংশীদারী মালিকানার সীমিত দায়বদ্ধ কোম্পানী গঠনের অনুমতি দেয়। ১৮৬০ এবং ১৮৬৬ সালে দুটি নতুন আইনবলে এই সুবিধা ব্যাঙ্ক ও ইনসুরেন্স - উভয় ক্ষেত্রেই প্রসারিত করা হয়েছিল। অধ্যাপক রাধেশ্যাম রুংটার মতে ১৮৭০-এর দশকের মধ্যেই পূর্বভারতের অধিকাংশ চা, পাট, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'লিমিটেড লায়াবিলিটির' আদলে কোম্পানিগুলি নবসজ্জায় সজ্জিত হয়েছিল।'

সুতরাং মূলধন গঠনের জন্য অর্থের যে অভাব কোম্পানীর শাসনকালে লক্ষ্য করা যায়। জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী প্রবর্তনের ফলে বৈদেশিক মূলধনের মুখাপেক্ষী না হয়ে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রী মারফত মূলধন তহবিল গঠনের অনুভব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬০ পরবর্তী সময়ে শিল্পায়নের শ্লথবিন্যাস থাকলেও বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কলকাতায় শেয়ার বাজারের প্রাণচাঞ্চল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিম উপকূলে ভারতীয় পুঁজির প্রাধান্য থাকায় সেখানকার শেয়ার বাজারে ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল আশাব্যঞ্জক। অথচ কলকাতার ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল বিপরীত। এখানে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা, ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ইংরেজ দালালদের অপরিসীম কর্তৃত্বের ফলে গুটিকয়েক বাঙালী ও আর্মেনীয় শেয়ার দালালদের উপস্থিতি কোনরকমে টিঁকে ছিল। ১৮৮০ দশকে স্বর্ণ সংক্রান্ত শেয়ার বিপর্যয়ে বেশ কিছু বাঙালী লগ্নীকারীর সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা ভীতির মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলির দাপটে শেয়ারের দাম ওঠা-নামার চিত্রটি এজেন্সীগুলির অঙ্গুলিহেলনে চালিত হত। এই হাউসগুলির সাথে শেয়ার ব্রোকারদের ভালই যোগাযোগ ছিল। ইংরেজ প্রশাসনবিদ্‌দের মধ্যে অনেকেরই প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জ্ঞান বিশেষ বিশেষ শিল্পক্ষেত্রের পরিচালন - বোর্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করেছিল। এটি লৌহ ও কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও সরকারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সেই শিল্পক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল। ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের জাল বিছিয়ে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই এজেন্সীগুলি আবার তাদের অপরিসীম পুঁজির ভান্ডারকে ব্যবহার করে ফাট্‌কাজাত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে পণ্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ চাইত। বিভিন্ন কোম্পানিগুলির বাৎসরিক ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য প্রেফারেন্স ও অর্ডিনারী শেয়ারের পরিবর্তনের উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। তবে এও স্বীকার্য যে বর্নাঢ্য ও সম্পন্ন বাঙালী অ-বাঙালী জমিদার ও বেনিয়ানরা সরকারী বন্ড ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ে যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তারা সুরক্ষার অভাবের জন্যই শেয়ার সম্পর্কে ততটাই নিরুৎসাহ ছিলেন।[৪]

যে পর্বের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কূট-কচালি, সেই সময়ে ভারতবর্ষের কোন শেয়ার-

বাজারই রেজেষ্ট্রিভুক্ত ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে সরকারী হস্তক্ষেপেব বাইবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই আদান-প্রদানের কাঠামোটি তৈরী হয়েছিল। কলকাতার চীনাবাজার ও ক্যানিংষ্ট্রীটে যততত্র, বিশেষতঃ নিম গাছের তলায় শেয়ার দালালবা জমায়েত হত, সেখানেই বিশ্বাস এবং ফিউচার অপশন-এর প্রয়োজনে প্রচুর টাকার হস্তান্তর ঘটত। এই কেনা-বেচার জগতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের যে কোন অভাব ছিল তা নয়, বরং লন্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন নিয়মাবলীর অনুসরণে বেশ কিছু প্রথা ও রীতি ব্রোকার ও লগ্নীকাররা মান্য করত।[৫] কিন্তু বিপর্যয় ও সংকটের সময় সুরক্ষা প্রদান এবং কোম্পানীর হিসাব ও ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষেত্রে প্রতিপদে পদে যে সমস্যার সম্মুখীন সাধারণ মানুষদের হতে হত, তার জন্য অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলিতে অভিযোগ-পত্রে সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিহিত করার আবেদন প্রকাশিত হত। বলা যায়, আশির দশকে স্বর্ণসংক্রান্ত শেয়ার কেলেঙ্কারীর পর ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন আইনকানুনের জালে শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।[৬] সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার-বাজারের চারিত্রিক পরিবর্তনও যে হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৮৬০ পরবর্তী সময় থেকে শেয়ার ও বিলব্রোকারদের নাম জানা যাচ্ছে। এদের অধিকাংশই হচ্ছেন ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং কেহই শুধুমাত্র শেয়ার দালাল হিসাবে জীবন নির্বাহ করতেন না। কতিপয় বাঙালী ও আর্মেনীয়দের নামও পাওয়া যায়। মূলধন গঠনেব সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করার জন্য শেয়ারের কেস-ভ্যালু ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। কোম্পানী সংক্রান্ত আইনের পূর্বে শেয়ারের নগদ মূল্যমান নির্ধাবিত হত পাঁচ, দুই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক হাজার টাকায়। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে মধ্যশ্রেনী ও মফস্বলের বিত্তবানদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে শেয়ারের ফেসভ্যালু পাঁচশো ও মূলতঃ একশো টাকায় নির্ধারিত হচ্ছে।[৮] স্বর্ণকোম্পানী গঠনের কেলেঙ্কারী পর্বে এক টাকা মূল্যমানের শেয়ারের হদিস পাওয়া যায় যা অসংখ্য নিম্নবিত্তদের গৃহে জমে উঠেছিল। এই সময় 'নিউ ইস্যু ব্রোকার'দের ন্যায় ক্যানভাসার নিয়োগ করে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত।[৯] শেয়ারের হস্তান্তর ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও চলন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই ব্রোকার বা দালালদের কার্যক্ষমতাও শেয়ারের দাম ওঠা-নামার ক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারক হয়ে উঠত।

১৮৮০ দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির বেনিয়ানরূপে বাঙালী ও ক্ষত্রিদের পরিবর্তে মারওয়াড়ীরা ধীরে ধীরে নিযুক্ত হচ্ছে।[১০] প্রায় একই সময়ে শেয়ারের জগতে তাদের প্রবেশ ও ধীরে ধীরে আধিপত্য স্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিনিয়োগকারী থেকে বাজারের গতি-সঞ্চালকে পরিবর্তনের প্রবেশ পথটি অবশ্য মসৃণ ছিল না। আট ও নয়ের দশকে বেশ প্রবল ও সোচ্চার ভাবে তাদের আগমন তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত শেয়ার দালালদের কাছে অস্বস্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই সম্পর্কে তিক্ততার রেশ ছাড়া কিছুই

রইল না। উদার অর্থনীতির সমর্থক লিব্যারেলপন্থী ইংরেজী অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা ক্যাপিটাল-ও এই আগন্তুকদের বিশেষ বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি। ম্যানেজিং এজেন্সী বা ব্রিটিশ শেয়ার ও বিলব্রোকারদের মধ্যে 'গেল গেল' রব উঠেছিল। সর্বোপরি এদের মূল অভিযোগ ছিল যে অলিখিত ব্যবস্থার মধ্যেও যে নিটোল শৃঙ্খলার বাতাবরণ ব্রিটিশ নীতিবোধ ও উদার অর্থনীতির ভাবধারায় বিকশিত হয়েছিল "ফাটকার জন্য লালসায় পরিপূর্ণ দুর্নীতি পরায়ণ মারওয়াড়ীরা" সেই জগতটিকে তছনছ করে বিশৃঙ্খলার সূচনা করেছে।[১] কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা নেই, উপরন্তু যে ব্রিটিশ মূল্যবোধ সুরক্ষার হাল ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছিল, নীতিহীনতা ও অর্থগৃধ্রতা সামগ্রিক সংহতিকে করেছিল বিপন্ন। মজার কথা যে অবশিষ্ট বাঙালী দালালদের অধিকাংশই এই মতের সাথে সহমত পোষণ করতেন। এমন কি এই আগ্রাসনকে ঠেকাবার জন্য সবকারী হস্তক্ষেপও দাবী করেছিল। কিন্তু কেন এই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

প্রথম কারণটি খুঁজে পাওয়া যায় তৎকালীন ব্রিটিশ মালিকানাধীন পত্র-পত্রিকাগুলিকে পর্যালোচনা করলে। তারা শুধু মারওয়াড়ী বেনিয়ানদেরই ভৎর্সনা করেনি, স্বজাতীয়দেরও গালমন্দ করতে বাধ্য হয়েছিল। 'বিশ্বাসঘাতক' 'হতবুদ্ধিকর' ইউরোপীয় ও অ্যাংলোইন্ডিয়ানরা কম দালালির কমিশনের জন্য বিজাতীয়দেব শিবিরে ভিড়েছিল।[১] সেখানে ব্রিটিশ দালালরা দেড় বা দুই শতাংশ কমিশনে দালালি করত, নয়ের দশকে মারওয়াড়ী এবং ক্ষত্রি-চৌবেরা এক শতাংশের কমে সেই কাজ করে দিতে রাজী ছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে আসে যে এটা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে, ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির উপর যে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। তার দরুণ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পগুলির উপর তদারকি ও টাকার যোগানের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে অভীষ্ট বা হিসাব-নিরীক্ষা ঠিকমত পেশ না করে বা রিজার্ভ ফান্ডে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট না রেখে কয়েক বছর অন্তর নতুন ইস্যু বাজারে ছেড়ে পুনরায় মূলধন গঠনের চেষ্টা করত। এই নতুন ইস্যুগুলিকে বাজারজাত করবার এবং ডিভিডেন্ড ও কোম্পানী ফলাফল প্রকাশের পূর্বে শেয়ারের দামকে ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে বা বাড়িয়ে রাখবার প্রবণতায় শেয়ার দালালরাই একমাত্র সহায়ক ছিল। এক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য এবং তথ্যের উপর সরাসরি যোগাযোগ থাকার জন্য এই গোষ্ঠীটি সবসময়ই বাজারে নিজেদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারত। এই কোনঠাসার খেলায় বাজারী চালিকাশক্তির মন্ত্র কখনই কার্যকরী ছিল না। আট ও নয়ের দশকে শেয়ার বাজারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আবির্ভাব হয় স্বর্ণসংক্রান্ত অসংখ্য কোম্পানীর শেয়ার বেচা-কেনার সূত্রে। এই ঘটনাই শেয়ার বাজারের সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। স্বর্ণ কেলেঙ্কারীর সমাপনে বাঙালীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও মাবওয়ারীরা যে স্বাদ পেল, তার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না। প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাবান খেলোয়াড়রা অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করল,

নতুন আগন্তুকদের ফাটকার প্রতি আকর্ষণ, দক্ষতা ও বড়বাজারের গদির ঋণ পাওয়া ও দেওয়ার জোর, পাল্টা চাপ তৈরী কববার ইচ্ছা এবং এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সেখানে নতুন ব্যবসায়িক নীতিবোধ যা সহজেই অবস্থা বিশেষে নমনীয় ও ভঙ্গুর হতে পার — এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাজারের চারিত্রিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন পর্বে ভারতীয় শিল্পে মারওয়াড়ীদের যে প্রবেশ বিশেষতঃ পাটশিল্পে, তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও মূলধন তৈরীর চেষ্টা কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই শুরু হয়। শেয়ার বাজারে নিজেদের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পর পরিচালন কর্তৃত্ব নেবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। নয়ের দশক থেকে বেশ কিছু কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার লিষ্টে তাদের উপস্থিতি লক্ষনীয়।[১৩] এমনকি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মতামতকে অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। মারওয়াড়ীরা শুধুমাত্র দালালিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দ্বারে দ্বারে উৎপাদন-পরিকল্পনার সাথে নিজেদের যুক্ত করতে চেয়েছিল। মনে রাখা দরকার, ম্যানেজিং এজেন্সীগুলির টাকার যোগানের সহজলভ্যতা থাকার দরুন যে সুযোগ পেত, গদীগুলির সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ভালভাবেই ছিল। তদুপরি, অধিকাংশ মারওয়াড়ী ও উত্তর-ভারতীয় দালালরা শুধুমাত্র শেয়ারের উপব নির্ভরশীল ছিল না, খাদ্যশস্য, অর্থ, রী শস্য, বুলিয়ন প্রভৃতি পাইকারী ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করত। এখানকার অনেক নিয়ম যা বাজার ব্যবস্থায় চালু ছিল, তা তারা শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল। দীর্ঘদিন ধরেই শস্য, বিশেষতঃ পাট ও আফিমের পাইকারী ব্যবসায়ে ফাটকা মারফত অতিরিক্ত ঝুঁকির সাহায্যে মুনাফা তোলবার দক্ষতা এদের সহজাত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন মারওয়াড়ীরা শেয়ার বাজারের মূল চালিকা-শক্তি হয়ে দাঁড়াল, তখন থেকেই মন্দীওয়ালাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ দু একটি উচ্চাঙ্গ অবস্থা ব্যতীত তেজীওয়ালারাই এতদিন বাজারের গতিকে শাসন করতে পেরেছিল।[১৪] দ্বিতীয়তঃ 'ফিউচার অপশন' কে উন্মুক্ত রাখার জনাই 'ক্যারি-ফরোয়ার্ড' ব্যবস্থাকে তারা চাঙ্গা করে তুলেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে 'বদলা'র (কনস্ট্যাংগো) জন্ম হল। যদিও স্বল্পমেযাদী লাভের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মারওয়াড়ী লগ্নীকারীরা শেয়ার বাজারে প্রবেশ করেছিল। সেখানে নতুন এই সুবিধাগুলি পাওযা অনেকেই দীর্ঘদিনের জন্য বিনিয়োগ করে, প্রয়োজনমত বদলা মিটিয়ে টাকা তুলে নিতে পারতেন। বিশেষতঃ নতুন শস্য পাইকারী বাজারে আসার সময়ে শেয়ার বাজারে টাকার মজুতের টান পড়ত। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, প্রায় সমসময়ে ক্ষত্রী বা চৌবেদের ন্যায় অন্যান্য উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শেয়ার-বাজারে প্রবেশ করেছিল, তবু তারাও মারোয়াড়ীদের মতন এত সংঘবদ্ধভাবে টিকে থাকতে পারেনি। অন্তবর্তী ভূভাগে ব্যবসায়িক যোগযোগ, শৃন্ডি ও নিজস্ব শ্রফদের মাধ্যমে ঋণ আদান-প্রদানের সহজলভ্যতা, সমস্যার নিস্পত্তিকরণে মধ্যস্থতার জন্য আভ্যন্তরীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, বড়বাজারের গদীগুলির কম উপরিব্যয় এবং ব্রিটিশ ব্যাঙ্কব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল না থাকার জন্য তারা শেয়ার বাজারের সিংহভাগ দখল

করতে পেরেছিল। ফাটকার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনস্বীকার্য, কিন্তু টাকার বাজারে নিজেদের অবস্থানকে প্রোথিত করবার পরই অতিরিক্ত ঝুঁকির পথ নিতে সাহস দেখায়। সর্বোপরি গুজবের ব্যবহারকে তারা দৈনন্দিন বেচা-কেনার ক্ষেত্রে একটি অবশ্যসম্ভাবী উপাদানে পরিণত করতে পেরেছিল। যুদ্ধ বা শান্তি - যে কোন সময়েই আগাম মতামত শেয়াবের মূল্য-নির্ধারণে নীতি নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেকক্ষেত্রে জনরবের পশ্চাতে প্রাথমিক বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল, একথা নিসংশয়ে বলা যায়।

সুতরাং তৎকালীন ঔপনিবেশিক বাস্তবতা 'দুনীর্তিপরায়ণ মারওয়াড়ীদের স্বাগত না জানালেও তাবা ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনমত একটি সুসংহত বাজারের সূচনা ঘটিয়েছিল, যেখানে তারাই ছিল মূল চালক।'[১৫] বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সর্বসময় বিপ্রতীপ ছিল, তা সত্য নয়। বরং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের ছাঁচকে পাল্টা চাপে নিজেদের মতন করে নতুন বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছিল। নতুন মাত্রা সংযোজনের ক্ষেত্রে তারা দেশীয় আভ্যন্তরীণ টাকার বাজারের প্রচলিত নিয়মগুলিকে এখানেও প্রোথিত করতে চেয়েছে। প্রয়োজনে তারা বিরোধিতার পথ গ্রহণ কবেছেন, কখনো সহাবস্থানের। তাদের কৃতকর্মে সাধারণ লগ্নীকারীদের সুবিধা হয়েছিল, একথা অবশ্য খুব জোর দিয়ে বলা যাবে না। আবার, গদী ও সেন্টার বিভিন্ন স্তরে অবস্থানরত মালিক থেকে হিসাব-রক্ষক প্রায় সকলেই গদীর সাংগঠনিক সুবিধা ব্যবহার করে যৌথভাবে মূলধনের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। সাংগঠনিক শক্তির এই নমনীয়তা বৃহৎ আমদানী ও রপ্তানী নির্ভব অর্থনীতির পরিমন্ডলে এমন এক প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল যে সেখানে উপরিস্তরের ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব অনেক সময় এই দেশীয় বাজারের কাঠামোকে ভাঙতে পারেনি, দুটি ব্যবস্থা সমান্তরাল পথে এগিয়ে চলেছিল। সেকারণেই আধুনিক স্টক একসচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেটের মধ্যে পাশ্চাত্যের রীতিনীতি সক্রিয় থাকে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা শেয়ার বাজারের কাছে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ছিল।

সূত্র নির্দেশ

(প্রবন্ধটির অনেক অংশই বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যার দাবী রাখে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য বেশ কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেল।)

১. অতুল সুর (সম্পাঃ): দ্য ষ্টক একসচেঞ্জ - অ্যা সিম্পোসিযাম; ১৯৮৫, কলকাতা। পৃ: ১-২

২. তিনটি কোম্পানী এ্যাকট: LXIII of 1650, XIX of 1857 এবং VII of 1860

৩ রাধেশ্যাম রাংটা : দ্য রাইজ অফ বিজনেস কর্পোরেশন ইন ইন্ডিয়া; ১৯৭০, কেম্বিজ। পৃ: ১১৯

৪. মিনিট বাই জর্জ ডিকসন অন দ্য পার্লাস অফ গ্রান্টিং দ্য ইম্পিরিয়াল গ্যারান্টি টু দ্য পাবলিক ডেট. .... ; ১৮৭২, কলকাতা। পৃ: ৯-১১

৫. ভি. আর. সারভাম্তে : দ্য ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট; ১৯৬২, বোম্বাই। এ ম্যাঞ্চেষ্টার ম্যান: আ গাইড টু ইন্ডিয়ান ইনভেষ্টমেন্ট, ১৮৬১, লন্ডন। পৃ : ২০-২২ হার্টলে উইদার্ণ: ষ্টকস এন্ড শেয়ারস; ১৯১০, লন্ডন

এস. পি. ভান ডেন বার্গ : ক্রনিক ডিসিজ অফ ইন্ডিয়ান মানি মার্কেট, ১৮৮৮/পৃ: ৭৩

৬. আর. এস. রাংটা : 'দ্য বেঙ্গল গোল্ড ক্রেজ'; ইন্ডিয়ান ইকনমিক এন্ড সোশ্যাল হিষ্টরী রিভিউ, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ: ৫৪-৬৬

৭. থাকার্স বা রাসাকের ডাইরেকটরীগুলিতে বিভিন্ন শেয়ার ও বিল ব্রোকাবদের নাম পাওয়া যায়। অতুল সুর মহাশয় অবশ্য ১৮৭০ পর্যন্ত বাঙালী তথা ভারতীয়দের রমরমা ছিল মনে করতেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য- উৎসগুলিতে ভারতীয়দের তুলনায় অ-ভারতীয়দের নাম বেশী পাওয়া যায়।

৮. ইংলিশম্যান : উইকলি মানি মার্কেট রিপোর্ট, আগষ্ট ৫, ১৮৯০, ক্যাপিটাল, নভেম্বর ১৩, ১৮৮৮

৯. অমল বসু : "শেয়ার কিনতে বাঙালী বড় দেরী করে ফেলে।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ মে ১৯৯২

১০. টমাস এ টিমবার্গ : দ্য মারওয়াড়িস; ১৯৭৮, নয়া দিল্লী। পৃ: ৫৬

১১. বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত চিঠিপত্র, ১৮৯০ এর দশকে ক্যাপিটাল 'রেক্স' শীর্ষাঙ্কিত প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয়তে এই অভিযোগ বারংবার উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মহলে সংহতি ও নিয়মনীতির অভাবের তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। দ্রষ্টব্য: ভি. আর. সারভাম্তে : দ্য ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট ; ১৯৬২, বোম্বাই।

১২. ক্যাপিটাল, ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৮৯০

১৩. কোম্পানীর নীতি নির্ধারণে মারওয়াড়ী শেয়ার হোল্ডারদের সোচ্চার উপস্থিতি লক্ষণীয়। কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৮৯৩ সালে সোনাপেট গোল্ড এন্ড মাইনিং কোম্পানীর লিক্যুইডেশনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকাই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। আবার, ১৮৯৪ তে গুসারী কটন মিলে বোর্ড অফ ডিরেকটরস্ - এ মারওয়াড়ী শেয়ারহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে বার্ষিক সভায় তীব্র বাদ প্রতিবাদ হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত তা মানতে বাধ্য হয়েছিল।

১৪. গ্রিন্ডলে'জ মান্থলি ইন্ডিয়ান ইনভেষ্টরি গাইড, জুন, ১৯০৩।

১৫. এ প্রসঙ্গে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ মারওয়াড়ী শেয়ার ব্রোকারদের নাম উল্লেখ করা দরকার। তবে এদের মধ্যে অধিকাংশের বিভিন্ন ব্যবসার সাথে শেয়ার দালালিও যুক্ত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুধুমাত্র শেয়ারের দালালির উপর জীবন নির্বাহ করছে, এ রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উল্লেখিত পর্বে যাদের নাম বারংবার

পাওয়া যায় - বাবুলাল গঙ্গাপ্রসাদ সোনি, লক্ষ্মীনারায়ণ সোনি, মুঙ্গিরাম বাঙ্গুর, বলদেওদাস বসন্তলাল, জয়নারায়ণ পোদ্দার, শিউপ্রসাদ পোদ্দার, হরমুখ রায় রামচন্দ্র, যমুনাদাস রামদয়াল প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেকেই বড়বাজারের গদীর সামান্য কর্মচারী থেকে অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। গদীগুলি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয় ও স্বজাতিয়দের জন্য সীমায়িত রাখা হত; অনেকেই সেই চাকুরী গ্রহণ করে গদী থেকে ঋণ পেয়ে ব্যবসায় অংশীদার হবার সুযোগ পেয়েছিল।

শেরপা ও সাহেব : পর্বতারোহণের আদিপর্বের সামাজিক বিভাজন

দীপাঞ্জন দত্ত

সভ্যতার উষাকাল থেকেই পর্বতের অধিবাসীরা তাদের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদেই এক পর্বত থেকে অন্য পর্বতে যাওয়ার মাধ্যমে তৈরী করেছেন আরোহণের ঐতিহ্য। এই অধিবাসীদের জীবনে পর্বত এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পর্বত ও পর্বতের অধিবাসীরা যেন একে অপরের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। শেরপাদের পাহাড় চেনা, সমুদ্র অঞ্চলে জেলেদের সমুদ্র চেনার মতো। এটি শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রশিক্ষণেই সম্ভব নয়, যুগ যুগ ধরে - সহাবস্থানের ফলেই এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে শেরপারা পাহাড়কে তাদের হাতের তালুর মতই জানতে পারে। এ ঘটনাকে হয়ত অনেকেই পর্বতারোহণ বলতে চাইবেন না। আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে বার বার অবহেলিত হয়েছে এই জীবনধারা, পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এই জীবনধারার বিশেষ মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেই মর্যাদা সে পায়নি। সেই জায়গায় এই পাহাড়ী মানুষগুলি পেয়েছে চরম বঞ্চনা। তাদের কৃতিত্বগুলিকে খাটো করার চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

নবজাগরণ ইউরোপে অজানাকে জানার তথা অভিযানের এক নবমানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি এ প্রসঙ্গে সহায়ক হয়েছিল, ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও। পক্ষান্তরে এই সময় থেকেই ইউরোপীয়রা নানা ভৌগলিক আবিস্কারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সময় পবর্তারোহণও যেন এক নতুন আঙ্গিকে ধরা দেয়, এক বিশেষ ক্রীড়া হিসাবে তা ক্রমশঃ ধরা দিতে লাগল। তার সঙ্গে ছিল অবশ্যই প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন।

ইউরোপীয়দের প্রাচ্য পাশ্চাত্য ধারণার সাথেও এর যোগ ছিল। বরাবরই প্রাচ্যের সম্পর্কে এক পৃথক ধারণা পোষণ করে এসেছে ইউরোপীয়রা - প্রাচ্য মানেই এক অদ্ভুত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগৎ। যার প্রতিটি প্রকোষ্ঠই এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার জন্যও উপনিবেশের নাগরিকদের প্রতি সুআচরণ তারা করতে পারে নি। উপনিবেশের মানুষদের কৃতিত্বকেও তারা বেশীর ভাগ সময়ই মেনে নিতে পারত না।

অপরদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের হিমালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা থাকে হিমালয়ের অধিবাসী মানুষদের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রভাবকে তুলে ধরা। এক সহজ কথা সহজে স্বীকৃত হয় না, যে হিমালয়ে বসবাসকারী মানুষেরা পৃথিবীতে অন্যতম সৎ জনগোষ্ঠী, তা কোন অলৌকিক কারণে নয় স্বভাবগত কারণে।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কোনটি এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। অনেকগুলি পর্বতই ছিল যাদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেন। সমস্ত বিতর্কের এক নতুন মোড় নেয় ১৮৪১ সালে রাধানাথ শিকদারের ''পিক্ ফিফটিন'' এর উচ্চতা নির্ধারণে। তিনি থিওডোলাইট' যন্ত্রের মাধ্যমে এই শৃঙ্গকে সর্বোচ্চ আখ্যা দেন। উচ্চতা বলেন ২৯,০০০ ফুটের বেশী। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই বেশীরভাগ ব্যক্তি উচ্চতম শৃঙ্গ মনে করতেন। ১৮৫২ সালে রাধানাথ শিকদার সরকারী ভাবে ঘোষণা করেন — "The peak designated XV had been found to be higher than any hitherto measured peak in the world" পিক্ ফিফটিন পরবর্তী সময় পরিচিত হল 'এভারেস্ট' নামে। এভারেস্ট সাহেব ছিলেন রাধানাথ শিকদারের উর্দ্ধতন অফিসার। এই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণের প্রকৃত কৃতিত্ব কার ছিল? আর আবিষ্কারকের কৃতিত্বকে অপমানিত করা হল না কি? উপনিবেশের শৃঙ্গ পেল সাহেবী নাম। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামও কিন্তু সাহেবী 'গডউইন অষ্টিন'।

পর্বত অভিযানের প্রথম ঘটনাটি জানা যায় ১৩৩৮ সালে আল্পসের একটি শৃঙ্গ আরোহণের। তবে ভারতবর্ষে তার অনেক পরে পর্বত অভিযান শুরু হয়। ১৮১৮ তে লিওপারগিল অঞ্চলে ৫৭৩৫ মিটারের একটি অনামী শৃঙ্গ আরোহিত হয়েছিল।[৩] ১৮৭৯ সালে হাঙ্গেরীর ভন ডিকে একটি অভিযান করেন। তবে প্রথম সুসংবদ্ধ অভিযান সংঘটিত করেন ব্রিটিশ পর্বতারোহী মি: গ্রাহাম ১৮৮৩ সালে কাব্রুতে - উচ্চতা ৭৭০২ মিটার।[৪]

এভারেস্ট অভিযান শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে এবং ১৯৫৩ সালে তা সফল হয়। এর মধ্যে মোট ১৪টি এভারেস্ট অভিযান হয় যার মধ্যে ব্রিটিশ পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ১১টি।[৫] সুইস, কানাডীয় ও রুশ পরিচালত অভিযানের সংখ্যা একটি করে। মূলতঃ এ সময় ব্রিটিশরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে শীর্ষে উঠবার জন্য। ১৯৫৩ সালের অভিযান ছিল ব্রিটিশ পরিচালিত। এই অভিযান সফল, কিন্তু কোন ব্রিটিশ সর্বোচ্চ শৃঙ্গে প্রথম আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। একজন ভারতীয় মালবাহক ও একজন নিউজিল্যান্ডবাসী শীর্ষে উঠেছিলেন।

ম্যালোরীর নাম পর্বতারোহণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। ১৯২৪ সালের এভারেস্ট অভিযানে ম্যালোরী ও অরভীন নিরুদ্দেশ হন। তারা ৬ নং শিবিরে যখন পৌঁছোন তখন তাদের সাথে শেরপারা ছিল। প্রসঙ্গত এই শিবির থেকেই পরের দিন শীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেরপাদের ৬ নং শিবিরের উপরে উঠতে না

দিয়ে তাদের নিচের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৬] শেরপা মালবাহকরা যখন ৬ নং শিবির তথা অভিযানের শেষ শিবিরে গিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই মালবহন করেই গিয়েছিলেন। আর তারা সুস্থ ছিলেন বলেই ঐ উচ্চতায় মালবহন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এখানে তাই একটি প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই শেরপা মালবাহকদের কেন আর উপরে যেতে দেওয়া হল না? আসলে এখানেও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছিল, যদি এই শেরপাদের শীর্ষে যাবার সুযোগ দেওয়া হত আর তারা যদি সফল হতেন, তবে আজ আর ম্যালোরী অরভিন 'myth' থাকত না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে তেনজিংই প্রথম শেরপা যিনি অভিযানের শেষ পর্যন্ত থাকতে সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই অভিযানও সফল হয়েছিল।

এছাড়া এও বলা যায় - শেরপাদের জীবন পর্বতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তারা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই ভাল বোঝেন। আবহাওয়াগত কারণে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে কি করা উচিত তাও তারা ভালভাবেই জানেন। যদি এই শেরপাদের ম্যালোরী অরভীনের সাথে উপরে যেতে দেওয়া হত তাহলে হয়ত ম্যালোরী ও অরভীনকে হিমালয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে হত না।

অবশ্য কেউ কেউ এখানে এই শেরপাদের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। যারা অভিযানের শেষ শিবির পর্যন্ত মালবহন করতে সক্ষম, তাদের দক্ষতা সম্পর্কে সত্যিই কি প্রশ্ন তোলা যায়? আর শেষ শিবিরের উর্দ্ধেতো তাদের যাবার সুযোগ দেওয়াই হয়নি। তাই পরবর্তী পর্যায়ে তাদের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাও সমীচিন নয়।

অভিযান পরিচালনা করতে বেশী প্রয়োজন হয় শেরপাদের। কিন্তু এই শেরপারা উপনিবেশের বাসিন্দা হওয়ায় কোন দিনই পর্বতারোহীর মর্যাদা পায় নি। অথচ এই শেরপারাই বেশীর ভাগ অভিযান কে সফল করে তুলতে সাহায্য করে। সামাজিক ভাবেই শেরপারা সব সময় শোষিত হয়েছে। তাদের কৃতিত্বকে কোন ভাবেই সহজে স্বীকার করা হয় নি। ১৯৫৩ সালের এভারেস্ট অভিযানে তেনজিং এর শর্তই ছিল যদি শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকেন তবে তাকে শেষ পর্যন্ত অভিযানে রাখতেই হবে।[৭] অভিযানটি সফল হয়েছিল। যুগ্ম ভাবে প্রথম সফল এভারেস্ট আরোহণকারী হিসাবে এডমন্ড হিলারী 'স্যার' উপাধি পান। অপর বিজয়ী তেনজিং সম্বন্ধে এই পাশ্চাত্য পুরস্কার দেওয়ার অধিকারীরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

এই শেরপাদেরই একজন প্রথমে এভারেস্ট উঠেছিলেন। অক্সিজেন ছাড়া প্রথম উঠেছিলেন আর একজন শেরপা ফু-দোরজী, নওয়ং গাম্বু ছিলেন প্রথম আরোহী যিনি দুবার এভারেস্টে উঠেছিলেন।[৮] সন্তোষ যাদব হচ্ছেন প্রথম মহিলা যিনি দুবার এভারেস্টে উঠেছেন। বর্তমানের আর এক শেরপা আংরিটা[৯] সর্বাধিকবার এভারেস্টে উঠেছেন — তিনিও পাদ প্রদীপের আলোয় আসতে পারেন নি, প্রথম দশ জন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীর মধ্যে এরা পড়েন না। রোনাল্ড মেসনার, লোরেটন, জেরী কুকুটজা, নরবু ওয়ামাদা, ক্রিস বানিংটনরা যথেষ্ট খ্যাতিমান পর্বতারোহী, একটা Status difference এর জন্য

অবশ্য দায়ী, শেরপা যত ভালই আরোহী হোক না কেন, সে শেরপাই, পর্বতকূল হিমালয়ের উপরের সাবির যে কোন শৃঙ্গ অভিযানের ইতিহাস সৎভাবে খুঁজলে অন্যতম নায়ক হিসাবে একজন না একজন শেরপাকে পাওয়া যাবেই। ভারতবর্ষে চারটি পর্বতারোহণ শিক্ষণ সংস্থা আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শ্রেণী হিমালয়েই এই সংস্থা গুলি অবস্থিত, এখানে পৃথিবীর অনেকদেশ থেকেই অনেকে পর্বতারোহণের শিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন। পরবর্তী সময় অনেকেই তাদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু ভারতীয়রা কোথায়? যারা এই সংস্থাগুলির শিক্ষক তারাও কি উচ্চমানের পর্বতারোহী নয়?

শেরপারা অভিযানে গেলেও তাদের পোষাক, খাবার, শোবার জায়গা এবং পর্বতারোহণের উপযুক্ত সরঞ্জামেও একটা পার্থক্য থাকেই। উপযুক্ত সামগ্রী কখনই তারা পায় না। যেখানে উপায় থাকে সেখানে থাকার জায়গাও পৃথক হয়। শেরপারা সাহেব পর্বতারোহীর সমতুল্য খাবারও বেশীরভাগ সময় পায় না।

হিমালয়ের শেরপাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আছে যথেষ্ট। তবে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন হিমালয়ের শেরপাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য আছে। এরা যথেষ্ট ধীর, স্থির ও শান্তিকামী। এদের জীবনযাত্রাও অনাড়ম্বর, সহজ সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। শেরপাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। এদের অনেকের কিছু জমি আছে - তাতে তারা চাষ আবাদ করেন। তবে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই যথেষ্ট কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়। আর তারা পাহাড়ের বুকে মালবহন করে কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের আশাতেই। অনেকে পশুপালনও করে থাকে। কিছু বাড়তি উপার্জন ও পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণই তাদের মালবাহকে পরিণত করে।

কোন একটি বিশেষ শৃঙ্গ বা বিশেষ অঞ্চলে দেখা যায় এক বা একাধিক শেরপা সুপরিচিত কিন্তু অন্য অঞ্চলে নয়। এই অবস্থার পেছনে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অক্ষমতা একটি বড় কাবণ। অন্যান্য অঞ্চলে তাদের নিজেদের উদ্যোগে অভিযান সংগঠিত করতে হলে যে অর্থ দরকার তা তাদের নেই, তাছাড়া তাদের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত উপার্জনও সম্ভব নয়। স্বাভাবিক দক্ষতা থাকলেও তাই তারা তাদের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কারণেও তাদেব দক্ষতার প্রতি সুবিচার করতে পারছে না।

রাধানাথ শিকদারকে তাঁর কর্মের স্বীকৃতিব জন্য পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝে তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করার চেষ্টা করে সাহেবরা। একটা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ছায়া কিছুতেই সরতে চায় না। তারা শ্রেষ্ঠই হতে চায় - প্রয়োজনে অপবের কর্মকাণ্ডকে ছোট করে দেখাতেও পিছপা হয় না।

পর্বতাবোহণ কৃতিত্বের, কিন্তু সেই কৃতিত্বের আলোকচ্ছটা শুধু সাহেবদেব উপরই পড়েছে। তেনজিং এক্ষেত্রে বিরল ভাবেই কিছুটা সম্মান পেয়েছেন কারণ সর্বোচ্চ শৃঙ্গে প্রথম আরোহণ করাকে অস্বীকার করা যায় নি। বর্তমানে ম্যালোরীর দেহ আবিস্কার হয়েছে। পূর্বে তাঁর ব্যবহৃত বরফ কুঠারও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মালোরী কে প্রথম এভারেস্ট

জয়ী হিসাবে চিহ্নিত করার সাহেবী প্রচেষ্টা অব্যাহত। যার জন্য ম্যালোরীর ব্যবহৃত ক্যামেরা খুঁজে বার করার চেষ্টাও অব্যাহত। তেনজিং মালবাহক হয়েও কিছুটা সম্মান পেয়েছেন কিন্তু অন্য মালবাহকেরা ? যাঁরা হাজার হাজার ফুট আরোহণ করেছেন, অভিযান সফল করার জন্য নিজেদের ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছেন তারা মালবাহকই থেকে গিয়েছেন, পর্বতরোহী আর হন নি। এই বৈষম্য ভারতীয় উপমহাদেশের পর্বতারোহণের ইতিহাসে একটি বিরাট দিক, যে জাতি বৈষম্যকে অন্যভাবে ভাবলে পর্বতারোহণের ইতিহাসও অন্যরকম হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. হামদি বে - "বে অফ বেঙ্গল"
২. "দিগন্ত" - ষষ্ঠ সংখ্যা
৩. NIM UTTARKASHI - HISTORY OF INDIAN MOUNTAINEERING.
৪.NIM UTTARKASHI - HISTORY OF INDIAN MOUNTAINEERING.
৫. "দিগন্ত" সপ্তম সংখ্যা
৬. 1924, 5th July- 'The times'
৭. "এভারেস্ট মানুষ তেনজিং" - সুকুমার চক্রবর্তী।
৮ তথ্য Indian Mountaineering Foundation
৯. তথ্য Indian Mountaineering Foundation

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ (১৮৫৭-১৮৭৭)

অনিরুদ্ধ দাস

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার উন্মেষের যুগে নব্য বাংলার রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বসূরী যেমন ছিল বেঙ্গলবৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, বৃটিশ এসোসিয়েশন, ভূম্যধিকারী সমাজ তেমনি এই ধারায় আরেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ। বলা বাহুল্য এই সংগঠনগুলির প্রত্যেকটিই গড়ে উঠেছিল কলকাতা মহানগরীর অভ্যন্তরে। স্বভাবতই রাষ্ট্রের কল্যাণকামী সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক এই সংগঠনগুলির সংগঠক ও সদস্যরা ছিলেন প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত। যদিও প্রতিটি সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল ভিন্নরূপ। তবু যেহেতু সংগঠনগুলির চরিত্র রাজনৈতিক ছিল না সেহেতু উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাংলার বাবু সম্প্রদায়রা সংগঠনে আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না। বলা যায় পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক সংগঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগের উদাহরণ পেয়ে থাকি স্বেচ্ছাশ্রয়ী রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বসূরী ঐ সংগঠনগুলির চরিত্রের মধ্যেও তার বীজ যে সুপ্ত ছিল বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের সংগঠন, কার্যাবলী ও তার সদস্যদের চরিত্র ইত্যাদি আলোচনা করলে তা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই খ্রীষ্টান মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রসার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য মিশনারী স্কুলের প্রবর্তন করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বাবু সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের জন্য ১৮১৭ সালে তৈরী করেন স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজ। তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্টের তার সহকর্মী হ্যারিংটন সাহেবকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল দেশীয় এক ব্রাহ্মণের মধ্যে, তাঁরই ইচ্ছায় ইষ্ট ১৮১৬ সালের ১৪ মে কলকাতায় একটি সভা আহ্বান করে ইউরোপীয় ধাঁচের উদার প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।[১]

হিন্দু কলেজেই ডিরোজিওর নেতৃত্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আকাদেমিক

এসোসিয়েশন' রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ে চুলচেরা যুক্তিবাদের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। এরই পাশাপাশি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী গৌড়ীয় সাধুভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন সাহিত্য , বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন যে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও প্রয়োজন, সেই উপলব্ধিতে ১৮৩৮ এর ১৬ মে অধিবেশন বসে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ সালে স্থাপিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রথম অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করে বৈজ্ঞানিব পরিভাষা সংকলন করেছিলেন। বাংলাকে মাধ্যম হিসাব ব্যবহার করার প্রবণতায় ইংরাজী উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য ১৮৫০ সালে স্থাপিত হয় 'বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ'। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিধিধার্থসংগ্রহ নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করতেন ঐ সমাজের পক্ষে। এ যুগে প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতম চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল ১৮৫১ সাল বাংলাদশে শ্রী শিক্ষা উন্নতি বিধায়ক ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর পর তাঁরই নামানুসারে গঠিত বেথুন সোসাইটির মাধ্যমে। এই সোসাইটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করত সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, ভাস্কর্য, ভারতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষক ও ভূমিজীবীদের উন্নতি ও স্বার্থ রক্ষার্থে ১৮৩৭ সাল স্থাপিত হয়েছিল ভূম্যধিকারী সমাজ। রাধাকান্তদেব, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ ছিলেন এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৪২ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুব বিলেত থেকে ফেরার সময় এদেশে শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন জর্জ টমসনকে যার সভাপতিত্বে ১৮৪৩-এর ২০ এপ্রিল স্থাপিত হয় বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। সরকারী কাজে ভারতীয়দের নিয়োগ ও আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে এরাই দাবী তোলেন প্রথম। ১৮৫১ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কালা আইনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ও বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ দুটিরই সম্পাদক। দুটি প্রতিষ্ঠানই ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরী।

১৮২৮-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যতগুলি সভা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করেছে সেগুলির অধিকাংশই প্রস্ফুটিত হয়েছিল বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ বা ফার্মিলি লিটারারী ক্লাবের মাধ্যমে। ১৮৭৫-এ 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা' লিখেছে, ''এই কলিকাতা শহরে যতগুলি দেশহিতকর সভা স্থাপিত আছে তা মধ্যে বেথুন সমাজ ও ফ্যার্মিলি লিটারারী ক্লাবই সর্বাগ্রগণ্য, কেননা এই দুটি সমাজের সহিত স্বদেশের জ্ঞান উন্নতির বিলক্ষণ সংশ্রব আছে।''

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের কার্যাবলী আলোচনা করলে পাওয়া যায় এর অনন্য আলোচিত বিষয়গুলি, যার অপরিসীম গুরুত্ব আজও বর্তমান। রুচি, সংস্কৃতি ও

চিন্তায় সমৃদ্ধ প্রসাদদাস মল্লিক ছিলেন ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নিরবচ্ছিন্ন সম্পাদক। সমাজের প্রতিষ্ঠা যেমন হয়েছিল তাঁর উদ্যোগে, তেমনি এর সমস্ত ব্যয়ভারও বহন করতেন তিনি।[৩]

প্রসাদদাস মল্লিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার সেই বিখ্যাত সুবর্ণবণিক পরিবারে যে পরিবারের পূর্বপুরুষ রাজারাম মল্লিক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে শুধু দৌত্যই[৪] করেন নি জব চার্ণককে পরামর্শ দিয়েছিলেন সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করতে।[৫] তাঁর পুত্র নয়ানচাঁদ মল্লিক '৭৬-এর মন্বন্তরে উজাড় করে দিয়েছিলেন কলকাতার বড়বাজারে তাঁর ভান্ডার। নয়ান মল্লিকের পুত্র নিমাই মল্লিক ছিলেন সেকালের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার। মহীশূর যুদ্ধের জন্য কোম্পানীকে কয়েক কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলেন তিনি। নিমাই মল্লিকের তোড়া সেকালে চলত বেসরকারী হুন্ডি হিসাবে। এই নিমাই মল্লিকের প্রপৌত্র ছিলেন প্রসাদদাস মল্লিক।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার - ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ জানাচ্ছে প্রসাদদাস মল্লিক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করছিলেন তাঁর বাড়ীর সন্নিকটে রতন সরকার গার্ডেন লেনের অধিবাসী স্বজাতি ও বন্ধু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের সহযোগিতায়। ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি' গ্রন্থে জানিয়েছেন ১৮৫৭ সাল থেকে প্রায় ২০ বছর অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ সাহিত্য সমাজ টিঁকে ছিল। কিন্তু গ্রন্থে লিখেছেন ঐ সমাজ ২২ বছর টিঁকে ছিল। শ্রী ঘোষ ১৮৮১ খ্রী. প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের প্রচ্ছদে নিজেকে ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাবের সদস্য বলে অভিহিত করেছেন। সেকালের কম বেশী প্রায় সব পত্রিকা ও বহু প্রবন্ধেই বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

প্রসাদদাস মল্লিক যেমন ছিলেন ঐ সমাজের দীর্ঘ দিনের সম্পাদক তেমনি রেভারেন্ড জেমস লঙ ছিলেন ১৮৫৯-১৮৬৭ পর্যন্ত ঐ সমাজের সভাপতি। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাংলার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে ঐ সমাজের সদস্য সংখ্যা ছিল গড়ে প্রায় শতাধিক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেভারেন্ড জেমস লঙ, মিসেস জে লঙ, রেভারেন্ড ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চন্দ্র আঢ্য, সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর, সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, লোকনাথ ঘোষ প্রমুখ। আরোও ছিলেন মৌলভী আব্দুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, মৌলভী আব্দুর রউফ, মিঃ পোস্তমজী নাসের ভানজী, পোস্তমজী নৌরজী প্রমুখ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজে যোগ দিতেন।

গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের মাসে হত একটি করে সভা। প্রথম দিকে ঐ সভায় শুধুমাত্র ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠের রীতি থাকলেও সমাজ সভাপতি রেভারেন্ড জেমস লঙের প্রচেষ্টায় বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের রীতি প্রচলিত হয়। দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ১৯টি নিয়মেব মধ্যে অষ্টমটিতে বলা হয়েছিল অক্টোবর থেক মার্চ মাস পর্যন্ত সন্ধ্যে ৭টা থেকে রাত

১০টা ও এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭.৩০ ১০.৩০ সমাজের সভা হবে। ঐ সময়ের মধ্যে বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ সভাগৃহ ত্যাগ করতে পারবেন না। দশম থেকে উনবিংশ নম্বর নিয়ম প্রবন্ধ পাঠের রীতি বিষয়ে। পূর্ব স্থির করা বিষয় অনুযায়ী প্রবন্ধ পাঠ করার পর ঐ বিষয়ে হবে আলোচনা। পাঠের সময় কেউ বক্তাকে বিবক্ত কবতে পারবেন না। বক্তব্য সমাজের অপছন্দ হলে চেয়ারম্যান বক্তাকে থামিয়ে দিতে পারেন। বহিরাগতভাবে, লিখিতভাবে, সম্পাদক ও সভাপতির অনুমতি ক্রমে প্রবন্ধ পাঠ করতে পারবেন। বহিরাগতদের অন্য প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার অধিকারও ছিল।

বছরে হত বেশ কয়েকটি অধিবেশন। বাৎসরিক ঐ অধিবেশনে যোগদান করতেন শতাধিক সুধীবর্গ। সারা বছর ধরে প্রাবন্ধিকগণ যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতেন তার মধ্যে থেকে বাছাই করে বৎসান্তে প্রকাশিত হত বার্ষিক সংকলন।

সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ পঠিত হত। প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল আয়ুর্বেদ সম্মত স্বাস্থ্যরক্ষা, ডিভাইন লাভ, হিন্দু নাটক, শিল্প ও তার সুবিধা, লাইকারগাসের আইন খ্রীষ্টানদের পক্ষে উপকারী ছিল কি না, ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন ও সময়, রোম ইংল্যান্ড ও ভারতীয় অভিজাতদের তুলনা, আর্যদের উৎস ও বিস্তৃতি হিন্দু মহিলাদের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে।

কয়েকটি প্রবন্ধ স্বল্প পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে জেমস লঙ বাংলায় শিল্প শিক্ষালয় না থাকার জন্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি রসায়নের অধ্যাপক না থাকায় বাংলা যে ইউরোপের থেকে পিছিয়ে পড়ছে তা নিয়ে আক্ষেপ করেন। অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে রেভারেন্ড জে মুলেনস ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে আলোচনার সময় প্রাচীন হিন্দু মন্দির নির্মানের প্রণালী সুন্দর চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করেন। ১৮৬৬-তে নবম বার্ষিক অধিবেশনে লঙ সাহেব বলেন এ দেশের অধিবাসীদের বর্তমান অবস্থা বিদেশীদের নিকট অজ্ঞাত। তিনি ভারতীয়দের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করে সাধারণের কাছে প্রকাশ করার আহ্বান জানান। চতুর্দশ বর্ষে ভারতীয় কৃষির বর্তমান অবস্থা ও তা উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে প্রবন্ধে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেক পরগণায় সমাজ ও তার অধীনে এক পাঠশালা স্থাপন করে সরকারী আইন 'কৃষিকুলদিগকে' বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। যেখানে ইংরাজী বা নৈতিক শিক্ষা থাকবে না, কারণ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ইংরাজী শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না এবং চাষারা মধ্যবিত্ত অপেক্ষা অধিক ধার্মিক। ১৮৯০-এর ১৪ আগষ্ট চতুর্দশ বর্ষ দ্বিতীয় অধিবেশন সংস্কারক সেন্টপলের জীবন ও কর্ম প্রবন্ধ গোষ্টবিহারী মল্লিক আশা প্রকাশ করেছিলেন সমসাময়িক 'খ্রীষ্টানগণ পলের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন। এই ভ্রাতৃভাব থেকে ইংল্যান্ড কোনদিন ভারতবর্ষকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাহার দাসত্ব পাশ মোচন করিবে।' ঐ অধিবেশনেই পিয়ারী মোহন বাগচী নৈতিক সামাজিক ও মানসিক উন্নতি প্রবন্ধে বুদ্ধির বিকাশ ও নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকার কথা

তুলে ধরেন। তাঁর মতে বাঙালীদের শক্তি ও তেজ নেই বলেই 'আমরা স্বাধীনতা প্রসূত বিমল সুখের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই না।' ঐ প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনায় অবৈতনিক সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক দেশের ধনী ব্যক্তিরা বিলাস আমোদে ডুবে থাকায় ও মদ্যপান করায় যে সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সে নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৮৭২-এ পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ছোট আদালতের জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারের শাসন বক্তৃতায় প্রচলিত আইন কানুন দ্বারা অবিচার তুলে ধরেন। ফৌজদারী বিভাগে ইউরোপীয়দের ভারতীয়দের দ্বারা বিচার করার অপারগতাকে গলদ বলে চিহ্নিত করেন। মোকদ্দমা চালানোর জন্য অধিক খরচের সমালোচনাও করেন। জুরী প্রথাকে তিনি প্রহসন মনে করতেন, কারণ তারা গজের দ্বারা চালিত হন। ষোড়শ বর্ষের প্রথম এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেতিয়ার মহারাজকুমার। সপ্তদশ বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও ছিলেন উমেশচন্দ্র। ঐ বছর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে প্রসাদ দাস বাবু বলেন ভাবতে অধিকাংশ ইউরোপীয়ানের স্বার্থ হল সর্বাপেক্ষা কম সময়ে সর্বাধিক অর্থোপার্জন, যেখানে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা ভারতীয়রা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না, সেখানে কেবল সাহিত্য সমর্থিত সভা পরিচালনা করা কঠিন। সপ্তদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজকৃষ্ণ মিত্র 'রাসায়নিক আসক্তি ও দহন' সেই সঙ্গে বাস্তব পরীক্ষা সহ প্রবন্ধ পাঠ করলে আশুতোষ ধর আলোচনায় বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা সহ ভারতীয় ছাত্রদের অন্যান্য বাধা তুলে ধরেন। উত্তরে মিঃ গাস্তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতাকে নস্যাৎ করে মানুষের করায়ত্ত বিষয়ের ওপর জোর দেন। নিউটন একবার নির্দিষ্ট সময়ে ঝড়ের পক্ষে অন্যবার বিরুদ্ধে দৌড়ে দুই সময়ের মধ্যে স্থানের ব্যবধান থেকে ঝড়ের গতি নির্ণয় করেন। আশুতোষ ধর এরপর পুনরায় উঠে বলেন এতদসত্ত্বেও ফ্যারাডে বা হামফ্রে ডেভির মত বিজ্ঞানীরা প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সাহায্য না পেলে পৃথিবীকে উপকৃত করতে পারতেন না। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের সেক্ষেত্রে অসুবিধার কথাই জানাতে চেয়েছেন। অবশেষে সভাপতি বিচারপতি জে বি ফিয়ার বলেন লোকের মনে বিজ্ঞান লোকের জন বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে ঝোঁক থাকলে সরকারী সাহায্য ও উৎসাহের অভাব হবে না।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপীয় অভিঘাতে জাতীয়তাবাদ স্ফুরণের অন্যতম মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম তখনো হয় নি। ইউরোপীয়রা এই সমাজের সদস্য হলেও ভারতীয়দের প্রবন্ধ ও আলোচনায় উঠে আসত বৃটিশ সরকারের সমালোচনার দিকগুলি। ইংরেজ রাজপুরুষগণ সরকারের সমালোচনা শুনলেও বিরূপ মন্তব্য করতেন না। প্রতিক্রিয়া যা হত সরকারী নীতিতে তার ছায়া পড়ত। অনেক সময় তাঁরা ভারতীয়দের সামাজিক উন্নতির পথ নির্দেশও

করতেন। সাহিত্য সমাজের ভাবতীস সদস্যবা নবজাগরণের উদ্গাতাদের নিয়েও চিন্তা করতেন। তাঁদের বিভিন্ন মানসিকতার ছাপ এতে ধরা পড়ত। মদনমোহন তর্কলঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার উন্নতি করলে তাঁরা প্রশংসা করেন। আবার সনাতন হিন্দু ধর্মের সমর্থনে তাঁরা কেশব চন্দ্র সেনের অনুগামী দলের নিন্দা করেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত প্রণালীর বদলে বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দেন। নানা সংরক্ষণপন্থী মনোভাব সমাজের মধ্যে প্রকট হলেও বুদ্ধির বিকাশ ও সামাজিক উন্নতিকেই গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিল। এসব কাজের প্রভাব পড়েছিল সার্বিক সামাজিক মননেও। অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলেছিল। প্রচলিত সমাজের একেবারে নীচু তলার ব্যক্তি এই সাহিত্য সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার প্রমাণ না থাকলেও চিন্তক শ্রেনীর বিষয়ের আওতা থেকে কেউই বাদ যেত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাহিত্য সমাজে পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাবু মতিলাল শীলের জীবন ও চরিত্র সাম্প্রতিককালে শ্যামল দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরী চাঁদ মিত্রের পঠিত প্রবন্ধ স্মরণীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১) বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আধুনিক যুগ) তৃতীয় খণ্ড

২) সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি ঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা (তৃতীয় খন্ড)

৩) সুবর্ণবণিক সমাচার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পত্রিকা ১৯৯০
প্রবন্ধ কলকাতার তিনশো বছরে সুবর্ণবণিকদের অবদান - শ্যামল দাস

৪) প্রথম সর্ব্বভারতীয় সুবর্ণবণিক সম্মেলন, পত্রিকা, ১৯৯০
প্রবন্ধ - ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় শ্যামল দাস

৫) The Modern History of India's Chiefs, Rajas and Zamindars Lokenath Ghosh

৬) Voluntary Associations Rajat Sanyal

৭) Murshid Kuli and his times Abdul Karim

৮) Sir Evan cotton Some Glimpses into forgotton India An essay published in Bengal past and present Vol 24

৯) Moti Lall Seal Kissory chaund Mitter. editer by Syamal Das

১০) The 15th Annual Report of the Family Libtrary Club.

উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একটি অনধীত চরিত্র ঃ ইতিহাস গঠনের সীমাবদ্ধতা

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম, হয়ত বা প্রধান উপজীব্য বিষয় হল তৎকালীন সমাজ চেতনা এবং আনুষঙ্গিক সংস্কার আন্দোলন। সে যুগে প্রচলিত কয়েকটি কুপ্রথার অবসান ঘটিয়ে নতুন আদর্শ ও উদার ভাবধারাব পথে সমাজের উত্তরণ ঘটাবার উদ্দেশ্যে বর্হুবিধ বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, আইনের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। এ সব কিছুরই মূল প্রবক্তা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী শাসনের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য অর্জিত কৌলীন্যের অধিকারী উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিগণ। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, এঁদের সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দুটি উপলক্ষ — নারীমুক্তি ও বর্ণপ্রথা দূরীকরণ। একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে প্রথমটিই আন্দোলনের সিংহভাগ দখল করে রেখেছিল এবং দ্বিতীয়টি নীতি হিসাবে গৃহীত হলেও তার বাস্তবায়নে সংস্কারব্রতীরা ততটা আগ্রহী ছিলেন না। যাইহোক, তাঁদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সেকালে এবং একালেও ঢক্কানিনাদ যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু লেখনী বা বক্তৃতা কোনোটারই সাহায্য না নিয়ে, শুধুমাত্র নিজের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের কুসংস্কারগুলি দূরীকরণের বাস্তব পথ যাঁরা দেখিয়েছেন তাঁদের অনেকেরই নাম ইতিহাস চর্চ্চায় স্থান পায়না — আমার আজকের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এমনই একটি নারীচরিত্র ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 'শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরাণী", শ্রীমতী সারদা দেবী।

শ্রীমতী সারদা দেবীর চরিত্রটিকে "অনধীত" বলা যায় কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিণীগণ ছাড়াও অনুরাগী ভক্তবৃন্দের মধ্যে বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর প্রগতিবাদী চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি অধ্যাত্ম জগতের অধিবাসী বলেই বিবেচিত হয়েছেন, তাই তাঁর সমাজ চেতনা ও তৎসম্পর্কিত নীতি নির্দেশ উনিশ শতকেব সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পায়নি। ব্যক্তি-নিবপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সারদা দেবীর জীবন-ইতিহাস পাঠ কবলে দেখা যাবে যে অধ্যাত্মমার্গের অত্যুচ্চ উচ্চস্তরে বিরাজমানা হয়েও সাংসারিক

ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে তিনি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই সমাজদেহের ক্ষতস্বরূপ কুপ্রথাগুলি দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সারদা দেবীর কাজের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে সংস্কার আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন এসে পড়ে, যেগুলির আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করছি। প্রথমতঃ, সংস্কারের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? — শুধুমাত্র কুপ্রথাগুলির অবসান ঘটানো, অথবা যা কিছু পরম্পরায় প্রাপ্ত প্রাচীন বলে তা বিসর্জন দেওয়া? ঊনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারের ধারা দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল এবং সেই কারণেই সে যুগের চিন্তাবিদ মনীষীদের মধ্যে অনেকেই ঐ আন্দোলন থেকে দূরে সরেছিলেন। প্রত্যেক দেশের খাদ্য, পরিধেয়, আচার-বিচার প্রভৃতি গড়ে ওঠে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সুতরাং দেশজ রীতিনীতির সবকিছুকে অস্বীকার করার অর্থ কতগুলি শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করা। তাছাড়া, আমাদের দেশের প্রথাগুলি বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী, তাদের দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণটিও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এই সত্যগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়ায়, সংস্কারকদের প্রচেষ্টা এক প্রবল প্রতিবাদী ও শক্তির জন্ম দিয়েছিল, সে যুগের অগ্রনী চিন্তাবিদ্ শিক্ষাব্রতী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "স্বজাতীয়দের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন জাতীয়দের আগমন হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিলে যেমন স্বাধীনতা ভিন্ন জাতীয় শাস্ত্রকে যুক্তিমুখে নিজের পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিলেই মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়।"[১] তাঁর কাছে এই ছিল সুস্থ সামাজিক জীবনের মূলমন্ত্র। সমকালীন অন্য দুই মনীষী --- বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ — ঐ সময়ের সমাজ সংস্কারমূলক কাজগুলিকে জাতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অবান্তর না হোক, নেহাতই প্রান্তিক বলে মনে করতেন।[২] এ বিষয়ে বিদেশী শাসকশ্রেনীর সাহায্য প্রার্থনা করা বিবেকানন্দ একেবারেই মেনে নিতে পারেননি।[৩] এইসব প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না যে ঊনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন অনেকটাই বিভ্রান্তির পথে অগ্রসর হয়েছিল। অথচ আজও, একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে, স্বাধীনতা উত্তর অর্দ্ধশতাব্দীতে দেশ ও জাতির সর্বাত্মক অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেও, আমরা সেই আন্দোলনের ইতিহাসই চর্চা করে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তারই উত্তরাধিকার দিয়ে যাচ্ছি। ভূদেব মনে করতেন দেশের চিরাচরিত রীতিনীতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ দেশের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই প্রবল যুক্তিবাদী দর্শন এবং ব্যবহারিক জীবনে যাঁরা এই দর্শনকে রূপায়িত করেছিলেন তাঁদের নাম আমাদের ইতিহাসচর্চ্চায় স্থান পায়না। এই প্রেক্ষিতেই এই প্রবন্ধের অবতারনা।

আগেই উল্লেখ করেছি যে নারীমুক্তিই ছিল সংস্কারকদের প্রধানতম ভাবনা। নারীশিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রথার অবলুপ্তি, বিধবা-বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি অত্যন্ত জরুরী ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে বাঙালী ভদ্রলোকদের সংস্কারের উদ্দীপনায় প্রধানতঃ তাঁদের নিজ নিজ পত্নীরা উদ্ধার পাবার ।।[৪] উদ্ধার এবং আলোকপ্রাপ্তা মহিলাগণ এরপর অন্যান্যদের ত্রাণকার্যে

বর্তী হয়েছিলেন। নারীমুক্তি, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, স্বগৃহে নারীর স্থান এ সব বিষয়ে অগ্রনী মহিলাদের ভাবনা-চিন্তা তাঁদের প্রকাশিত রচনা-বলীর সাহায্যে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক গোলাম মুর্শেদ। তাঁরই সমীক্ষা অনুসারে পাশ্চাত্যপন্থী সংস্কারকদের পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও তাদের কর্মকাণ্ডের ফলভোগী হয়েছিলেন শতকরা এক জনেরও কম। আশ্চর্যের বিষয়, সমাজের কতকগুলি গুরুতর সমস্যা — যেমন বিধবা বিবাহ বা সহবাস সম্মতি আইন — ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত আলোকপ্রাপ্তা নারীগণ একেবারেই নীরব। বোধহয় স্বামীর সঙ্গে সমাজ অধিকার, শাশুড়ির কর্তৃত্ব-মুক্তি এইসব ব্যক্তিগত সমস্যাকে তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সমাজের বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা বিবেচনা করার অবকাশ পাননি, অথবা সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। ফলতঃ তাঁরা মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নারীর স্বাধীন উপার্জনক্ষমতা, বিধবা বিবাহ, আব্রুবিহীন চলাফেরা এসব নিম্নবর্ণ তথা নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। অসূর্যাম্পশ্যা, অকাল-বৈধব্য-ক্লিষ্ট নারী উচ্চবর্গীয় পরিবারেরই বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সংস্কারের ব্যাপ্তি যদি অতি ক্ষুদ্র উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তার কার্যকারিতা কতটুকু?

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তৃতীয় যে প্রশ্নটি আমার মনে এসেছে, তা হল, সমাজদেহের গ্রহণক্ষমতা সংস্কারকদের বিবেচ্য হওয়া উচিত কি না? একটু বেমানান মনে হলেও এ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্য সমীক্ষক রাজশেখর (১০ম শতাব্দী) তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে প্রতিভার দুটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেছেন — কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। কারয়িত্রী প্রতিভা হল সৃজনী শক্তি, আর সেই সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করার শক্তি হল ভারয়িত্রী প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে, গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আর একজন গাবে মনে।"[৮] শুধু সাহিত্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনও সৃজনধর্মী কাজের ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য। সংস্কার আন্দোলনের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য জীবনধারার আলোকছটায় দিশেহারা হয়ে তাঁরা সমাজের গ্রহণ-ক্ষমতার বিষয়টি চিন্তা করেননি। নারীমুক্তি আন্দোলনের যৌক্তিকতা যেমন অস্বীকার করা যায়না, তেমনি সুদীর্ঘকাল অন্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় নারীকে হঠাৎ পাশ্চাত্য রমনীর মত উন্মুক্ত পরিমণ্ডলে এনে ফেলার প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি যুক্তিসম্মত বলা যায়না। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর খোলা ফিটনে স্বামীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়ার ঘটনা ঠাকুরবাড়ীর মত প্রগতিশীল পরিবারেও গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল : মেয়েদের অতিরিক্ত "সাহেবীয়ানা" যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এমনকি অনেকাংশ নারীশিক্ষার অগ্রগতির পথরুদ্ধ হওয়ার উপলক্ষ হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই সংস্কারকদের অভিপ্রেত ছিল না। ভূদেব তাঁর স্ত্রীর উক্তি বলে একটি মন্তব্য রেখেছেন, তা প্রনিধানযোগ্য ঃ "অন্ধকার কোথায়? ঘরের দোর জানালা সব খোলা আছে। বাহিরেও বড় একটা বেশী আলো নাই, তবে যথেষ্ট রৌদ্র আর ধূলা আছে বটে।"[৯]

অর্থাৎ তার মতে, বিদেশী রীতির যতটুকু গ্রহণযোগ্য তার চেয়ে বেশী তার চাকচিক্য আর আবর্জনা। গোলাম মুর্শেদ লিখেছেন যে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অত্যন্ত প্রগতিসম্পন্না এবং বেশ কয়েকবছর ইংল্যাণ্ডে বসবাস করেছেন এমনই এক মহিলা, কৃষ্ণভামিনী দাসও রক্ষণশীল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। "আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে কেবলমাত্র কয়েকটি টাকা রোজগার করবার জন্য শিক্ষিতা মহিলারা সবাই অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবেন এবং প্রতিদিন সেখানে বেশ কিছু সময় ব্যয় করবেন?" স্পষ্টতঃই তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। অবশ্য দরিদ্র এবং যার কোন পুরুষ সহায় নেই, সে রকম মহিলাদের চাকরী করা উচিত বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন, কারণ তাতে তারা অনেক অপমান ও অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত ধারার শিকড়টি সমাজদেহে দৃঢ়বদ্ধ ছিল, তাকে আচমকা উৎপাটন করা সহজও নয়, উচিতও নয়।

সামাজিক পরিস্থিতি তথা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমার প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু যিনি, তাঁর অবদানের মূল্যায়ণ করব। সারদা শিক্ষিতা, লেখিকা, বক্তা কোনটাই ছিলেন না। তাঁর পিতৃকুল শ্বশুরকুল দুইই ছিল পাশ্চাত্যশিক্ষার জৌলুষমুক্ত। তিনি যেখানে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন, মেট্রোপলিটান সংস্কৃতির হাওয়া তার ধারকাছেও পৌঁছয়নি। তিনি কোন বর্গীয়, অর্থাৎ সমাজের কোন স্তরের মানুষ ছিলেন তা এককথায় বলে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ বিদেশী সংস্কৃতির ধার করা কৌলীন্য বা আর্থিক আভিজাত্য — যা ছিল সে যুগে 'এলিট' বা উচ্চবর্গের মাপকাঠি, তা তাঁর পরিবারে ছিল না। বরং নিতান্ত দরিদ্র, গ্রাম্য পরিবারে তাঁর জন্ম এবং বিবাহ। দেশজ আদর্শে বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের যে আভিজাত্য তা দুই পরিবারেই ছিল। আধুনিক পরিভাষায় যারা নিম্নবর্গ, অর্থাৎ কামার, কুমোর, নাপিত জাতীয় অশিক্ষিত, দরিদ্র, শ্রমোপজীবীরা ছিল তাঁরা পারিপার্শ্বিক। বালিকা বয়স থেকেই সারদা দৃঢ়চিত্ততা ও সংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে বসবাসের সময় কলকাতার বিশিষ্ট প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনা, সেই সঙ্গে স্বামীর অনন্য ঔদার্য্যের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের উন্মুক্ততা যেন ঠিক উপযুক্ত পরিবেশটি পেয়েছিল। ধীর, স্থির, অসামান্য ধীশক্তি এবং প্রখর সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্না সারদা ভারতীয় নারীত্বের সুমহান আদর্শগুলির সঙ্গে যুগের প্রয়োজনীয় নব্য আদর্শগুলির মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী, অবগুণ্ঠনবতী হয়েও সমাজদেহের দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ কুসংস্কারগুলি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন। তাঁকে ঘিরে থাকা সংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাদের কটূক্তি ও বিরুদ্ধাচারণ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, বরং তাঁর দৃঢ়তা ও ন্যায়নিষ্ঠা অন্যদের কাছে উদাহরণস্বরূপ হয়েছিল।

দরিদ্র পিতামাতার সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যাসন্তান সারদাকে মায়ের গৃহকর্মে সাহায্য করা ছাড়াও ছোট ভাইগুলির দেখাশোনা করতে হত, তাই নিয়মিত পাঠশালায় যাবার সুযোগ তাঁর হয়নি। ভাইরা পাঠশালায় পড়ে এলে তাদের কাছে অক্ষরপরিচয় করে তিনি পড়তে

শেখেন। কৈশোরে শ্বশুরবাড়ী কামারপুকুরে থাকার সময় একইভাবে ভাসুরঝি লক্ষ্মীর কাছ থেকে তার পাঠশালায় পড়ে আসা বিদ্যার ভাগ নিতেন। জানতে পেরে রামকৃষ্ণদেবের ভাগনে হৃদয় তাঁর বর্ণপরিচয় বই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। সারদা আবার লুকিয়ে আর একখানি বই কিনে বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় রামকৃষ্ণদেবের কাছে অনেক শিক্ষিকা মেয়ের আনাগোনা ছিল। তাদেরই একজন রোজ গঙ্গায় স্নান করতে আসার সময় সারদার পড়া নিতেন ও দিতেন। দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অদম্য আগ্রহ ছাড়াও তৎকালে প্রচলিত কুসংস্কার যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় অথবা কুলে কালি পড়ে, তা তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। নিয়মিত রামায়ণ পড়ার অভ্যাস তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন, অনেক দুরূহ শব্দের অর্থ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হবার কথা বারবার বলেছেন এবং নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। জনৈক স্ত্রীভক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করতে তিনি বলেন ঃ "বে দিতে না পার এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও, লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[৯] বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার পরিপন্থী বলেই তিনি এই রীতির বিরোধী ছিলেন। নিবেদিতার স্কুলে দুটি বয়স্কা, অবিবাহিতা, দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখছে। আর এখানে .... আট বছরের হতে না হতেই বলে পরগোত্র করে দাও।"[১০] নিজের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, একজন বিয়ের পরও মিশনারী স্কুলে পড়তে ও হাতে কাজ শিখতে যেতেন। গোলাপ-মা নামে পরিচিতা তাঁর এক সঙ্গিনী এতে আপত্তি জানালে সারদা তাঁকে বলেন যে এতে দোষের কিছুই নেই, বরং তার কাছ থেকে তার শ্বশুরবাড়ীর ও প্রতিবেশিনী মহিলাদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখার সুযোগ হবে।" জয়রামবাটী যাওয়ার পথে কোয়েলপাড়া গ্রামে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। অনুমান করা যেতে পারে যে দূরান্তের গ্রামে প্রচারবিহীন শিক্ষাবিস্তারের কাজে শহরের আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা উৎসাহী ছিলেন না। লিখতে-পড়তে শেখার সঙ্গে সূচীশিল্প, ধাত্রীবিস্তার প্রভৃতি শিখে মেয়েরা স্বাবলম্বী হবে তাই সারদার অভিপ্রেত ছিল।

সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে — যে ক্ষেত্রে সংস্কারব্রতীদের প্রচেষ্টাকে নেতিবাচক বলা যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দু, মুসলমান — কাউকেই তিনি অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি। আবার বলছি, তাঁর প্রতিবাদ মৌখিক বা আলংকারিক ছিল না, ছিল তাঁর কাজে। জয়রামবাটীতে তাঁর বাড়ীতে আমজাদ নামে এক মুসলমান জেলখাটা ডাকাতকে তিনি একদিন খাবার নিমন্ত্রণ জানান। ভাইজি নলিনীর ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে অশ্রদ্ধাভরে দূর থেকে পরিবেশন করা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজে হাতে পরিবেশন করে যত্ন করে তাকে খাওয়ালেন। এমনকি খাওয়ার

পর নিজ হাতে তার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবহারিক প্রতিবাদ, বিশেষতঃ একজন হিন্দু আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিধবার দ্বারা, সেই যুগে এর নজির মেলা ভার। উল্লেখ্য, আমজাদের মত আরও অনেক মুসলমান তুঁতচাষী নীলকুঠি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে নিরন্ন হয়ে চুরি-ডাকাতির পথ অবলম্বন করে, ঐ অঞ্চলের সকলেই তা জানত এবং এরা 'তুঁতে ডাকাত' নামেই পরিচিত ছিল, কিন্তু ভালবাসা দিয়ে তাদের অন্যায়ের পথ থেকে নিরস্ত করার কথা কজন সমাজ-সংস্কারক ভেবেছিলেন? এদেরই একজনের ঠাকুরের জন্য আনা কলার ছড়া সারদা অন্যদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "ভক্তের কোনো জাত নেই", সারদা তা কাজে দেখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যেসব ভক্ত আসতেন তাদের খাওয়ার পর তনি নিজহাতে সেই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন। "ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে" বলে ভাইঝি নলিনী বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি স্বচ্ছন্দে বলেন, "ছত্রিশ কোতা, সবই যে আমার!" গীতোক্ত সাম্যবাদ ঃ "বিদ্যাবিজয়সম্পন্নে ব্রাহ্মনে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব, শ্বপাকে চ পণ্ডিতা ঃ সমদর্শিনঃ।" — যা ঊনিশ শতকের ভারত বিস্মরণ হয়েছিল, সারদা যেন তারই জীবন্ত উদাহরণ। ভাইঝি রাধুকে তিনি শ্যামাদাস কবিরাজ এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রনাম করতে বলেন, কারণ তাঁরা "কত বড় শিষ্ঠ, ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য।"[১২] তাঁর আর একটি অসমসাহসিক কাজ হল ইউরোপীয় ও মার্কিন মহিলাদের সঙ্গে পংক্তিভোজন। স্বয়ং বিবকানন্দ তা দেখে বলেছিলেন 'ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?" বাস্তবিকই অদ্ভুত। কুসংস্কাবের বেড়াজাল ছিন্ন করে উদার ভেদাভেদহীন সমাজে উত্তরনের পথে তিনি এক উজ্বল আলোকবর্তিকা। কোনো সভাসমিতি, সাময়িক পত্রের প্রয়োজন হয়নি তাঁর, শক্তিমান রাজপুরুষের দ্বারস্থও হতে হয়নি। আমাদের ছোটোবেলায় পড়া এক বৈজ্ঞানিক মহামূল্যবান একটি উক্তি যেন সারদার যথার্থ মূল্যায়ণ ঃ "আলো সম্বন্ধে শতশত বক্তৃতা অপেক্ষা একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া ধরিলে আলোর ধারণা স্পষ্ট ও সহজ হয়।" তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার প্রভাবে সংকীর্ণনতা জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ প্রবলভাবে প্রভাবে সংকীর্ণমনা জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ প্রবলভাবে রক্ষণশীল নারীসমাজের মধ্যে। তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ রক্ষণশীলতার ভিত্তি জড়িয়ে দিয়েছিল, কোনো যুক্তিসমৃদ্ধ প্রবন্ধ বা বক্তৃতা তা করতে পারত বলে মনে হয়না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে সমাজ সংস্কার অন্দোলনের দুটি প্রধান ধারাতেই সারদা তাঁর চেতনা সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু কালজয়ী প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকে তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁর ব্যবহারে তাঁর সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামীর মর্যাদা যাত কোনোভাবে ক্ষুন্ন না হয় সে বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক ছিলেন, অথচ যে সব বিষয় স্বামীর সঙ্গে তাঁর মত মেলেনি সেখানে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছেন। তাঁর পাতিব্রত্য দাসত্বে পরিণত হয়নি। কখনোই তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জোসেফাইন ম্যাকশাউড লিখেছিলেন ঃ "সেই শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল — আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার

বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই আদর্শ।" The Master as I saw Him গ্রন্থে নিবেদিতা একটি গভীর দ্যোতনাময় প্রশ্ন রেখেছেন ঃ " তিনি (সারদা) কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ?"

প্রবন্ধের উপসংহারে আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই — উনিশ শতকের বাঙালীর সমাজ-চেতনা ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস কি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার প্রচেষ্টার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? আচার্য্য অমলেশ ত্রিপাঠি দেখিয়েছেন উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে ইতিহাস চেতনার কতটা পরিবর্তন ঘটেছে। থুকিদিদেশের তৈরী করে দেওয়া ইতিহাস-দর্শনের বেড়াজাল ছিন্ন করতে না পারলে, মুখের কথাকে ইতিহাসের উপাদানরূপে স্বীকৃতি না দিলে History from below নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস সৃষ্টি হত কি? তাই বলতে চাই, সারদা দেবীর মত আরও অনেক পুরুষ ও মহিলা, যারা শহুরে সভ্যতার পরপার থেকে সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার ভিত নড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের নামও লেখা হোক বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে।

সূত্র নির্দেশ

১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, উদ্ধৃতি ঃ ইউরোপ পুণর্দর্শন, অনুবাদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১২৯।

২) তদেব, পৃঃ ১৭৬।

৩) তদেব।

৪) সুমিত সরকার, An Exploration of the Ramakrishna Vivekananda Tradition, Occasional Paper I, I.I.A.S., Simla, 1993, P.59

৫) গোলাম মুর্শেদ, Reluctant Debutante, Rajsahi University, Introduction, P.17

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯, পৃঃ ১২৯

৭) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্দ, উদ্ধৃতি গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।

৮) গোলাম মুর্শেদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯

৯) স্বামী গম্ভীরানন্দ, শ্রী শ্রী মায়ের জীবনকথা, উদ্বোধন, পৃঃ ১৭

১০) তদেব, পৃঃ ৫০৭

১১) তদেব

১২) তদেব, পৃঃ ১১৮

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী কেরাণী চরিত্র চিত্রণ

অনামিকা নন্দী

ঔপনিবেশিক যুগ সে সকল নতুন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে কেরাণীদের স্থান অন্যতম। শিল্পায়ণ, দেশীয় শিল্পের ক্রমঃক্ষয়, সম্পদের বহির্গমন ও একতরফা বাণিজ্যের ফলে জীবিকা নির্ধারণের পূর্বতর পথগুলি ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই নতুন শহরে এসে নতুন পেশার সন্ধান করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকায় অনেক সংখ্যক শিক্ষিত বাঙালী কেরাণীগিরি পেশায় নিযুক্ত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার সরকারী ও বেসরকারী সওদাগরী অফিসগুলিতে বাঙালী কেরাণীর প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নতুন পরিবেশে কেরাণীরা যে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তথা সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বঙ্কিম পূর্ব যুগে যদিও এ সমস্যা তেমন প্রকটভাবে দেখা দেয়নি তবুও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন কালী প্রসন্ন সিংহ তাতে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও নতুন শহুরে সমাজের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের পার্থক্যের সচিত্র চিত্রণ করেছেন।[১] এই গ্রন্থে বঙ্কুবিহারী বাবুর বর্ণনা থেকে সে যুগের কেরানীদের সম্পর্কে বোঝা যায়। হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর হেড কেরানী হলেন বঙ্কুবিহারী বাবু। আপনার বুদ্ধি কৌশলের বলে বাড়ি ঘর-দোর ও বিষয়-আশয় বানিয়ে নিয়েছেন। আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের মামলা, কমন ল-এর প্যাঁচ এ সবেতেই বঙ্কুবিহারী বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন। তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন। ভদ্রলোক মাত্রই তার নামে ভয় পেতেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় প্রথম দিকে উচ্চপদস্থ কেরাণীবা নানা উপায়ে বেশ ভালই উপার্জন করেছিলেন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছিলেন।

উচ্চপদস্থ কেরাণীরা যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার আর এক উদাহরণ প্যারী চাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে পাওয়া যায়।[২] চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্যারীচাঁদ লিখেছেন সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর আইন আদালতের ধাক্কায়

ইংরেজী চর্চা বেড়েছিল। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরাণীগিরি করতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখে দিতেন। এরপর তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যে স্কুলে মতিলাল দু একদিন পড়েছিল। ইংরাজী ভাষায় দরখাস্ত লেখার জন্য যে পরিমাণ ইংরেজী অক্ষর জ্ঞান থাকা দরকার তা রামনারায়ণ মিশ্রীর ছিল বলে সাধারণ মানুষের কাছে সে প্রায় উকিলেরই সমান।

পাশাপাশি এর বিপরীত চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্ব্ববর্তী লেখক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় এর 'কলিকাতা কমলালয়' প্রবন্ধে পাওয়া যায়।[৩] এই প্রবন্ধে বিষয়ী ভদ্রলোক শ্রেণীর ব্যাখ্যা কালে 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকের' সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ভবানীচরণ। দু'বেলা দুমুঠো অন্নের জন্য এবং বাইরের ভদ্রতার সামান্য আবরণটুকু রক্ষা করার জন্য তাদের যে কতখানি দাসত্বের অপমান সহ্য করতে হয় সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বিস্তর পথ পায়ে হেঁটে এই কেরাণীদের প্রতিদিন কাজে যেতে হত। কাজের শেষেও তাদের নিস্তার নেই। প্রতিদিন রাত্রে গিয়ে মনিবের কাছে 'আজ্ঞে যে আজ্ঞো মশায় মশায়' ইত্যাদি চাটুকারিতা করতে হয়। এই সবকটি লেখার থেকে দুটি বিপরীত ছবি ফুটে ওঠে। একদিকে যেমন সেযুগের বাস্তব পরিস্থিতির সমালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে একটি Nostalgia-র মনোভাব থেকে অতীতের সঙ্গে তুলনাও রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে গ্রাম্য পরিবেশে জমিদারের সঙ্গে তার প্রজাদের সে ব্যক্তিস্তরের সম্পর্ক ছিল শহুরে সমাজে সে সম্পর্ক ভেঙে যায়। এখন পাশ্চাত্যের ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী অফিসে পৌছতে কিছুমাত্র দেরী হলে নানা রকম ভৎর্সনা সহ্য করতে হত।[৪] চিরাচরিতের সঙ্গে আধুনিকের হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটায় অনেকের মনে আত্মসংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর 'কেরাণী চরিত' নাটকটি এই একই বিষয়কে ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল[৫] এবং দুর্গাচরণ রায় -এর প্রহসন 'দেবীগণের মর্তে আগমন' এই একই সমস্যার বিবরণ দেয়।[৬] সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্ত অবস্থায় গৃহে ফিরেও শান্তি নেই। স্বামীর সামান্য বেতনে সংসার প্রায় অচল তাই স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বাহিরের দাসত্বের গ্লানি ও অন্দরে নিত্য কলহ নিম্নশ্রেণীর চাকুরিজীবিদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

কিন্তু একথা ভাবলে চলবে না যে দেশীয় কর্মচারীদের সকলেরই এই এক অবস্থা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত মুচিরাম গুড় এর জীবন চরিত প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন অযোগ্য ব্যক্তিও ব্রিটিশের প্রভুত্ব স্বীকার করলে পদোন্নতি লাভ করতে পারেন কিন্তু তাঁর মতন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন।[১] এর ফলে শুধু শাসনব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, ক্ষমতাশীল শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য যে ভয়াবহ ইঁদুর দৌড় শুরু হয় সে দুর্নীতি আজও উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' প্রবন্ধটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলস্বরূপ সামাজিক পরিবর্তনগুলির তীক্ষ্ন সমালোচনা এখানে করা হয়েছে।[৭] বিদেশী আচার ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণের মধ্যে দিয়ে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের চিহ্নিত করার, প্রবণতা যেমন একদিকে ছিল অন্যদিকে দেশীয় সভ্যতাও

সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করাও ছিল সে যুগের নতুন বাবু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিচরিতা দিয়েই বাবু মানস সৃষ্ট হয়েছিল।

এরপর একটি কবিতার কথা মনে আসে। সমসাময়িক অবস্থান জটিলতা ও সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের বোধ হয় এর থেকে বাস্তবচিত্রণ আর দ্বিতীয়টি নেই। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাঁশি'।[১] হরিপদ এর মতন মানুষদের সব স্বপ্ন ও আকাঙ্খাগুলি বাস্তবের ধাক্কায় কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শুধু খাওয়া আর পরার জন্য বাঁচা, জীবনের সব আনন্দ থেকে যারা বঞ্চিত রবীন্দ্রনাথ তাদের কথাই এই কবিতায় লিখেছেন। অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হরিপদ, মাত্র পঁচিশ টাকা বেতন, ঘরে আলো জ্বালবার সামর্থ নেই তাই সন্ধেটা শিয়ালদহ স্টেশনে কাটিয়ে দেয়। বর্ষার সময় তার স্বল্প আয় এর মধ্যে খরচ বাড়ে কারণ ট্রামে করে সময় মতন অফিসে পৌঁছতে হবে। তারই মধ্যে দেরী হলে মাইনেও কাটা যায় জরিমানা স্বরূপ। এই হতাশার পরিস্থিতিতেও কিন্তু হরিপদ-এর মনে আশার ছোট্ট প্রদীপ জ্বলে। তাই হরিপদ কেরাণী কল্পনায় আকবর বাদশার সঙ্গে কোনো তফাত খুঁজে পায় না। বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে এক বৈকুণ্ঠের দিকে - কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে কবি সে কেরানী চরিত্র চিত্রণ করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই।

অবশেষে একটি সংবাদ পত্রের Report- এর কথা বলা আবশ্যক। ১৮৯১ খ্রীঃ সংবাদ প্রভাকর 'বেঙ্গল সিবিল সেক্রেটারীয়েট কেরাণীগণের ভাগ্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে।[১৮] সেই লেখা অনুযায়ী বঙ্গেশ্বর স্যার চার্লস এলিয়েট সেক্রেটারী বিজলী সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী বেঙ্গল সিবিল সেক্রেটারীয়েট বিভাগের কেরাণীদের বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার পদ্ধতির পরিবর্তে তাদের বেতন এককালীন করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চপদের বেতন হ্রাস করে দেবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ শাস্তি শুধু সেক্রেটারীয়েট বিভাগের কেরানীদের জন্যই ছিল কারণ রেভনিউ এবং অন্যান্য বিভাগের কেরাণীরা এই নতুন নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। তাই সেক্রেটারীএট বিভাগের নিরীহ ও নিরাশ্রয়ী কর্মচারীরা লেফ্টেন্যান্ট গবর্ণর চার্লস এলিএট -এর কাছে, এই দুর্মূল্যের সময় বিজলী সাহেবের প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত না করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। কারণ এই দুর্দিনের সময় বেতন হ্রাস করা হলে তারা সপরিবারে অনাহারে প্রাণে মারা যাবে।

সেই একই বছর অর্থাৎ ১৮৯১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় কেরাণী বৃত্তির বিভিন্ন স্তর মিলিয়ে মোট ১৮২৮৪৩ জন ব্যক্তি কেরাণী পেশায় নিযুক্ত ছিলেন যেখানে অন্যান্য পেশা যেমন গান বাজনার ক্ষেত্রে ১৬৯৫৬৬ জন। দেশীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন ১৩৮৯৮৭ জন ব্যক্তি এবং স্কুল শিক্ষক ছিলেন ১৩৪৭৯৪ জন ব্যক্তি। এই গণনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে কেরাণীকূল অন্য পেশায় নিযুক্ত মানুষদের তুলনায়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল।

অবশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ক্রমশঃ জটিল হওয়ার সাথে সাথে সময়ের সঙ্গে কাজ এবং নিয়ম অর্থাৎ Time, work and discipline এই সকলের সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাগল।[১১] এবং এই নতুন ব্যবস্থা নিম্নবর্গীয় কেরাণীদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পরিণামে ১৯০৫ সালে হাওড়ার Burn Iron work এর কেরাণীরা প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় যার সমর্থন অনেকেই করে ছিল তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই কঠোর Time discipline এর বিরুদ্ধে।[১২] এই প্রথম প্রতিবাদের সূত্র ধরে বিংশ শতাব্দীতে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন কেরাণী ও অন্য নিম্নবর্গীয় কর্মচারীরা, যার নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সরকারী নথিপত্র ও সমকালীন সাহিত্য থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ যুগে সৃষ্ট কেরাণীরা কোন একমাত্রিক স্তরবিশিষ্ট শ্রেণী ছিল না। কেউ ঔপনিবেশিক নৈতিকতা, সময় ও কাগুজে সংস্কৃতির সঙ্গে নানাভাবে আপস করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এক গৃহের অভ্যন্তরে পিতৃতান্ত্রিকতা ও বহিরাঙ্গে রাজনীতিকেও গ্রহণ করেছিল। অবার এক বিশাল গোষ্ঠী নামে ভদ্রলোক ও কেরাণী বলে চিহ্নিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আয়ের নির্ধারণে ছিল হতদরিদ্র শ্রমিকেরই কাছাকাছি। সারা মাসের ব্যয় নির্বাহ করে সুস্থ পরিবেশে জীবন কাটানোই ছিল তাদের কাছে অলীক কল্পনা। এই হরিপদ কেরাণীদের জগতে পিতৃতান্ত্রিকতা বা রাজনীতির প্রশ্নটি ছিল ভিন্নস্বাদের। কেরাণীবৃত্তির মাধ্যমে জীবনধারণ করাই ছিল সেখানে জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

সূত্র নির্দেশ

১. কালী প্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ; ১৮৬২ কলকাতা

২. প্যারীচাঁদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল; ১৮৫৮ কলকাতা

৩ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা কমলালয়, ১৮২৬ কলকাতা

৪. Sumit Sarkar · Writing Social History, Oxford University Press, New Delhi 1997

৫. প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কেরানী চরিত, কলকাতা ১৮৮৫

৬, দুর্গাচরণ বায় : দেবগণের মর্ত্তে আগমন, কলকাতা ১৮৮৯

৭. লোকরহস্য, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত বঙ্কিম রচনাবলি, কলকাতা

৮. Ibid

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাঁশি', সঞ্চয়িতা

১০. বিনয় ঘোষ : সংবাদ পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড, জানুয়ারি ১৯৬২, কলকাতা

১১. C. P. Thompson · Time, work discipline and Industrial Capitalism, Past and present, No 38 December 1967.

১২. Sumit Sarkar : Ibid

বার্দ্ধক্যে বাস্তুচ্যুতি ঃ বাংলায় দেশভাগজনিত দুর্ভোগের একটি দিক

ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু

দেশভাগের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস চর্চায় একটি উপেক্ষিত বিষয় হয়ে আছে। আমাদের ইতিহাস চর্চায় দেশভাগকে সচরাচর দেখা হয়ে থাকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের নিরিখে একটি বিচ্ছিন্ন ও গৌণ বিষয় হিসাবে। দেশভাগের প্রথাগত ইতিহাস কেবলমাত্র তার কারণ উদঘাটনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।[১] কিন্তু উপমহাদেশে জাতিরাষ্ট্র গঠনের যজ্ঞে যারা বলি হল নির্বিচারে তাদের কণ্ঠস্বরকে খুঁজে পাওয়া যায় না দেশভাগের এই প্রথাগত ইতিহাস চর্চায়, সম্প্রতি সেই হারিয়ে যেতে বসা কণ্ঠস্বরকে তুলে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। যদিও এই প্রচেষ্টা নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় আছে।[২] যাইহোক, দেশভাগের এই অন্য ইতিহাসকে পুনর্গঠন করার কাজে পশ্চিমবঙ্গ কিছুটা পিছিয়ে আছে। অপর বিভক্ত প্রদেশ পাঞ্জাবে সম্প্রতি কালে বেশ কিছু ভালো গবেষণা হয়েছে।[৩] এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সেই প্রায় অনালোকিত ক্ষেত্রে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। যে কোন বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগের শিকার হয় নারী, শিশু ও বয়স্করা, দেশভাগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নারী ও শিশুদের দুর্ভোগ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।[৪] তাই এই প্রবন্ধের সার্চলাইট ফেলা হয়েছে বয়স্কদের উপর।

বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হওয়া যে কোন বয়সের মানুষের কাছেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই বেদনা বোধহয় সর্বাধিক। বাস্তুভিটের সঙ্গে তাদের যোগ এতটাই দীর্ঘ ও গভীব ছিল যে সেখান থেকে বিচ্ছেদ ছিল তাদের কাছে কল্পনার অতীত। বাস্তুভিটে তো কেবল একখণ্ড জমি বা তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঘর-বাড়ি নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং গভীর আবেগ। অনেকের দৃঢ়মূল বিশ্বাস "......ঐ অকিঞ্চিৎকর মালমশলায় তৈরী সামান্য বাসস্থানটি ঘিরে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ রয়েছে, আপদে বিপদে সেই আশীর্বাদ আমাদের রক্ষা করে"। বাস্তুভিটে থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। এইকারণে কর্মসূত্রে

অনেকে শহরে বসবাস করলেও সেখানে স্থায়ী ভাবে বাস করার কথা ভাবেনি। এই মনোভাব সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তপন রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণে, "........... আমরা বছরের বেশীরভাগ সময়টা কাটাতাম জেলা শহরে। পূজোর মাসটা এবং কখনও কখনও অন্য প্রয়োজনে কয়েকটা সপ্তাহ গ্রামে থাকা হত।.... কিন্তু অধিকাংশ সময় শহরের যে বাড়িটায় কাটত, কথ্য ভাষায় তার নাম ছিল বাসা। অর্থাৎ সেই বাসস্থল পাখির নীড়ের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর পিতৃপুরুষের তৈরী গ্রামের বাড়িটাই বাড়ি, যেখানে উত্তরপুরুষ অনন্ত কাল বাস করবে।"[৬] নীরোদ চন্দ্র চৌধুরীর Autobiography তেও একই মনোভাবের প্রতিফলন দেখি।[৭] নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণাতেও বাস্তুভিটের প্রতি মানুষের অদম্য টান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাঁর পিতামহ ও পিতা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকলেও সেখানে নিজস্ব কোন বাড়ি কেনেননি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও। কেননা এক্ষেত্রে একটা ভয় কাজ করেছিল। "কিসের ভয়? না তিনি (পিতা) ধরেই নিয়েছিলেন যে, একবার যদি কলকাতায় একটা বাড়ি হয়ে যায় তো গ্রামের বাড়ির সঙ্গে তাঁর উত্তর পুরুষের আর কোনও সম্পর্কই থাকবে না"।[৮] বাস্তুভিটের প্রতি এই অদম্য টান এবং শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও বাঙালী জনমানসে এতটাই প্রবল ছিল যে বাস্তুভিটে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছিল চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

এই কারণেই আমরা দেখি দেশভাগের পরে বয়স্ক অনেকেই শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে সীমান্তে এপারে চলে আসতে পারেনি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেও তারা সেই সিদ্ধান্তে সামিল হতে পারেনি। শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে নীলুর বৃদ্ধ মাতামহর মানসিক টানাপোড়েন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, "অদ্ভুত কথা। নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায় নাকি? হতে পারে কখনো?

...... ভাব একবার, ওই কাছারি ঘরটার পিছনে সুপবিগাছের সারি একটা একটা করে ওর সবটা আমার নিজেব হাতে লাগানো. সেই কোন আদ্যিকালে, তোদের তখন জন্মও হয়নি। একটু একটু করে ওরা বড় হলো আমার চোখের সামনে। খালের ধার থেকে দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত গোটা পথটার প্রত্যেকটা দাগ খুঁটে খুঁটে পরিস্কার করি রোজ ভোরবেলা, দেখিস তো সব। ওই আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছগুলি, দিনান্তে একবার ওদের গায়ে হাত না রাখলে ভালো লাগে না আমার। আর ওই যে মণ্ডপের পাশ দিয়ে পুকুরের পিছন দিকটা - তোরা তো ওদিকে যাস্ও না বেশি — ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুরদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এই সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে, বলতো আমি যাই কোথায়, যাই কেমন করে —"।[৯] পুত্ররা দেশত্যাগ করলেও বৃদ্ধ বাবা-মা ভিটে আগলে থেকে যান। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "পালঙ্ক" গল্পেও অনুরূপ ঘটনা দেখি।[১০] অভিজিৎ সেন তাঁর স্মৃতিকথায় প্রায় একই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[১১] এই যে বাস্তুভিটে আঁকড়ে বয়স্কদের পড়ে থাকার প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি - তার

পিছনে ঐতিহ্যের টান যেমন ছিল সেই সঙ্গে একটি ক্ষীণ আশাও জড়িয়ে ছিল। অনেকেই আশা করেছিল যে দেশভাগের উন্মাদনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি আবার আগের মত হয়ে যাবে। ভিটে মাটি ছেড়ে সবাই একসঙ্গে চলে গেলে ফেরার আর পথ থাকবে না। এই হিসাব মাথায় রেখে অনেকেই শতকষ্ট সহ্য করেও থেকে যায়। সেদিক থেকে অনেকের কাছেই এটা ছিল একটা কৌশল গত সিদ্ধান্ত। যেহেতু বয়স্কদের উপর আক্রমণের সম্ভবনা সবচেয়ে কম সেই কারণে পরিবারের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের, বিশেষ করে মেয়েদের, নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বয়স্করা থেকে যায়। পরিবার পরিজন বিচ্ছিন্ন সেই সমস্ত বয়স্ক মানুষদের জীবন কাটে সীমাহীন নিঃসঙ্গতায়। চিঠি পত্রের আদান প্রদান এবং মাঝে মধ্যে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক টিকে থাকে কোনক্রমে। কিন্তু পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়ার পর যাতায়াত অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যেও অনেকেই আমৃত্যু সেখানেই থেকে যায়। আবার অনেকে সিদ্ধান্ত বদল করে এপারে আত্মীয় স্বজনদের কাছে চলে আসে।

পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে অনেককেই বৃদ্ধ বয়সে দেশত্যাগের কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত তাদের মনে এমন এক গভীর এবং স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যা তারা বাকী জীবনকালে সামলে উঠতে পারেনি। প্রবোধ সান্যালের হাসুবানু[১১] উপন্যাসের জীবেন্দ্রনারায়ণ, শক্তিপদ রাজগুরুর দেশ কাল পাত্র-র বিষ্টু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সান্যালের বল্মীক[১৪] উপন্যাসের হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি চরিত্রগুলি বৃদ্ধ বয়সে বাস্তুত্যাগের মানসিক আঘাত বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত ছেড়ে আসা গ্রাম[১৫] -এর বিবরণ গুলিতেও বাস্তুভিটে হারানোর হাহাকার মূর্ত হয়ে ওঠে। এই অনুভূতি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়িয়ে এক সার্বজনীন মাত্রা পায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশভাগের পর যে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারাও সমান ভাবেই এই অনুভূতির শরিক। এরকমই একজন মানুষ ছিলেন আবুল হাসিম, তৎকালীন মুসলীম লীগের একজন প্রথম সারি নেতা, যদিও বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সমর্থক ছিলেন না। ১৯৫০ সালে তাঁরা সপরিবারে বর্ধমান থেকে ঢাকায় চলে যান। তাঁর পুত্র বদরুদ্দীন উমর এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পিতার মনঃকষ্টের কথা স্বীকার করেছেন অকপটে।[১৬] এই মানুষগুলো আর কখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। দেশত্যাগ বাস্তুভিটের গভীরে প্রোথিত তাদের শিকড়কে কেটে দিয়েছিল। নতুন জায়গায় আর তারা নতুন করে শিকড় মেলতে পারেনি;— সেই বয়স, বা উদ্যম কোনোটাই তাদের ছিল না। ফলে সেই ভিটে ছাড়া মানুষগুলো তাদের বয়সের তুলনায় যেন আরও বেশী অথর্ব হয়ে পড়েছিল। আরও বেশী করে তারা অতীতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। এই মানুষগুলো কখনও একত্রিত হলে কেবল সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতেরই স্মৃতি রোমন্থন করে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' উপন্যাসের ললিতের মা বা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় তার ঠাকুর্মা ও তাঁর বন্ধুস্থানীয়রা সেই গোত্রের মানুষ —" তাঁরা একত্রিত হলে এমন

এক নদীর গল্প করতেন, যা আমি দেখিনি। এমন সব গ্রামের গল্প করতেন, যেখানে কোন দিনও যেতে পাবব না আমি। এমন সব মানুষ জনেব কথা বলতেন, নদী-সাঁকো নারকেল গাছ জড়িয়ে, সেই সব মানুষরা থাকতেন দমদম-বেকবাগান-সোদপুরের রিফিউজি কলোনীতে এই সব গল্প করতে করতে ঠাকুর্মাব সমবয়সিনীরা মাঝে মাঝেই তাঁদের কাপড়ের পাড় চোখে ঠেকাতেন, কাপড়ের পাড়ের কলকা কিম্বা সরপুঁটিমাছ ভিজে যেত। আমি বুঝতে পারতাম — ওঁরা সব হারিয়ে যাবার দুঃখকথা বলছে"।[১৭]

দেশত্যাগের পথে বয়স্কদের শারীরিক হয়রানির অন্ত ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর না হলেও সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে এই যাত্রাপথ ছিল অস্বাভাবিক রকমের সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। স্টীমারে, ট্রেনে এমনকি দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে অনেককে সীমান্তের এপারে আসতে হয়। পথের এই ধকল বয়স্কদের অনেকের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হয়নি। শারীবিক দুর্বলতা, অনাহার, সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পথেই অনেকে প্রাণ হারায়। সহযাত্রীদের কাছে এমনকি নিকট আত্মীয়দের কাছেও তারা হয়ে ওঠে বোঝা স্বরূপ। সমসাময়িক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এবং বাংলাসাহিত্যে সেই কষ্টকর যাত্রাপথের বর্ণনা পাওয়া যায়। শান্তা সেনেব পিতামহী উপন্যাসে এক বৃদ্ধার দেশত্যাগের নিখুঁত ও মর্মস্পর্শী বিবরণ মেলে। কলকাতা দূরদর্শনে অস্তিত্বের সংকট শীর্ষক সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানেও শান্তা সেন তাঁর পিতামহীর দেশত্যাগের বর্ণনা দিয়েছেন। বরিশাল শহর থেকে কুড়িমাইল দূরের এক গ্রাম থেকে কলকাতায় আসতে তাঁর এক মাসেরও বেশী সময় লেগে যায়। গ্রাম থেকে নৌকায় বরিশাল। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা খুলনা যাবার স্টীমারের টিকিটের জন্য। খুলনা থেকে ট্রেনে শিয়ালদা যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায়ই ছিল অত্যন্ত কষ্টকব। ভীড়ে ঠাসা স্টীমারে বা ট্রেনে ওঠাই ছিল বয়স্কদের পক্ষে দুঃসাধ্য। সেই বৃদ্ধাকে তাঁর সহযাত্রীরা কোনক্রমে কোলে করে ভীড়ে ঠাসা স্টীমারে তুলে দেয়। খুলনা স্টেশনে ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেখানে তাঁকে তাঁর সহযাত্রীরা জানালা গলিয়ে ট্রেনের কামরার মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেয় মালের মতো। বৃদ্ধা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। সহযাত্রীদের প্রশ্ন — "এই বুড়া মানুষ আবার এই হানে, এ আর এক ফ্যাসাদ, এহনি খুল্লা দিয়া পড়লে যাইবেন, ক্যামনে এত হানি পথ!"[১৮] দীর্ঘ একমাসের পথযাত্রার অমানুষিক ধকল সহ্য হয়নি সেই বৃদ্ধার। কলকাতায় ছেলের বাড়ি পৌঁছেই মারা যান তিনি।

পুনর্বাসন পর্বেও বয়স্কদের দুর্ভোগের শেষ ছিল না। জীবনেব শেষ-পর্যায়ে এসে স্বাভাবিক ভাবেই তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। এই ব্যর্থতা তাদের মধ্যে এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরী করে। কর্মহীন, উপার্জনহীন এই ছিন্নমূল প্রবীণরা স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারায়, যা তাদের পৌরুষে মোক্ষম ঘা দেয়। ফলে ক্রমশঃ তারা পরিবারে নিজেদের অপ্রয়োজনীয় বোঝা মনে করতে থাকে। এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট

বাংলা সাহিত্যে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শক্তিপদ রাজগুরুর দেশ কাল পাত্র উপন্যাসে "বিষ্টু পণ্ডিত দেখছে স্ত্রীকে। আগেকার সেই শান্ত কমলা আর নাই। গ্রামের জীবনে ছিল প্রাচুর্য, স্বচ্ছলতা। বিষ্টু পণ্ডিত তখন সম্মানিত ব্যক্তি। আজ সেই পরিচয় নেই, স্বচ্ছলতাও নেই। কমলাকেই এখন সংসারের জন্য খাটতে হয়। যতীন সাহার দেবসেবায় ভোগ রেঁধেও কিছু রোজগার করতে হয়। স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আর নেই; তাই কমলাও যেন স্বাধীন হয়ে উঠেছে। মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আজ কমলাকেই তার নিজের সাধ্যমত ভাবতে হয়।.... আজ বেশ বুঝেছে যে এই সংসারে সে এখন এদের দয়াতেই পড়ে আছে, ফালতু বাতিলই সে।"[১৯]

নারায়ণ সান্যালের বল্মীক উপন্যাসের বৃদ্ধ হরিপদ চক্রবর্তীও সেই একই মনস্তাত্ত্বিক সংকটের শিকার। একই পরিণতি ঘটে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "অবতরণিকা" (যে গল্পের উপর ভিত্তি করে সত্যজিৎ রায়ের মহানগর) গল্পে আরতির বৃদ্ধ শ্বশুর প্রিয়গোপালের ক্ষেত্রে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বয়স্ক মহিলারা পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই-এ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরে নিজেদের মূল্যহীন ভাবার অবকাশ হয়ত অতটা পায়নি। অশোক মিত্রের Calcutta Diary র The Song of Mother courage"[২০] রচনাটিতে আমরা এমন এক বৃদ্ধার উজ্জ্বল ছবি পাই।

বয়স্ক উদ্বাস্তুদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রসারিত হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "হেডমাস্টার"[২১] গল্পে দেখি গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার ভিটে মাটি চাকরী ছেড়ে কলকাতায় এসে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার জন্য চেষ্টায় ত্রুটি করেনি। নতুন চাকরী খুঁজতে গিয়ে ভাগ্যের পরিহাসে তার চাকরী জোটে তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্রের অফিসে। সেই বৃদ্ধ শত চেষ্টা করেও নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে বাদ সাধে তাঁর ২৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অর্জিত মূলবোধ। একই লেখকের অপর একটি গল্প "অকিঞ্চন"[২২]ও দেখি অন্য এক চিত্র; যেখানে বাস্তুচ্যুত বৃদ্ধ স্কুল শিক্ষক বেঁচে থাকার তাগিদে শহরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে ভিক্ষা করতে শুরু করেন। ছেলেকেও তিনি একই কাজে নিয়ে আসেন। অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন যে তাঁর পিতা পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন স্টেশনমাস্টার ছিলেন। চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে তাঁকে বাধ্য হয়ে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি ছোট পানের দোকান খুলতে হয়। ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাবে সেই দোকানও পরে উঠে যায়। একজন আমুদে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ পরিস্থিতির চাপে কেমন বদলে যায়, সাবিত্রী তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন।[২৩] দেশভাগ লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষের বাস্তুভিটে এবং সহায়সম্বলই কেবল ছিনিয়ে নিয়েছিল তাই নয়, একই সঙ্গে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তাদের আত্মসম্মানবোধকেও। সবক্ষেত্রে সেই চেষ্টা যে সফল হয়নি তা বলাইবাহুল্য। এর ফলে হয় আরও মারাত্মক। এর থেকে উদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার যন্ত্রনা সেই সব হতভাগ্য মানুষের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত

দুর্বিষহ করে তোলে। দেশভাগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বোধহয় এখানেই। অশোক মিত্রের -Calcutta Diary র সেই বৃদ্ধা জীবনের বহু ওঠাপড়াতে অবিচলিত থেকেছেন এবং সংসারের হাল ধরে রেখেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ-পর্যায়ে এসে তার সবচেয়ে বড় আক্ষেপ হল, — দারিদ্র নয়, — পরবর্তী প্রজন্মে মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়। তিনি বরং খুশী হতেন যদি তাঁর নাতিরা মধ্যবিত্তের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে এসে শ্রমিকের জীবন বেছে নিত। কিন্তু তারা তো করেনি। বদলে তারা বেছে নিয়েছে অন্ধকার জগতে সহজ উপায়ের রাস্তা। এই পরিবর্তন, অবক্ষয়কে মেনে নেওয়া একদা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেই বৃদ্ধার পক্ষে যে কতবড় যন্ত্রণার তা সহজেই অনুমেয়।

সূত্র নির্দেশ

১. Pandey, Gynendra, "The Prose of othrsseuss", in Arnold, D and Hardiman, D (ed), Subaltern studies, Vol VII, Delhi, OUP, 1994, P. 204-5.

২. জাভেদ আলম ও সুরেশ শর্মার কথোপকথন দ্রষ্টব্য, Seminar, Vol 461, January 1999, P 98-103 । এইসঙ্গে উর্বশী বুতালিয়ার বক্তব্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য Seminar, Vol 463, March 1998, P 71-74

৩. এইসঙ্গে ঋতু মেনন, কমলা ভাসিন, উর্বশী বুতালিয়া প্রমুখের গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

৪. কুণ্ডু, ত্রিদিব সন্তপা, (ক) "বাঙালী নারী জীবনে দেশভাগের প্রভাব", চট্টোপাধ্যায়, গৌতম(সম্পাদিত), ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৩, কলকাতা, ফার্মা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮৯-৫৯৯। (খ) "ছিন্নমূলছেলেবেলা ঃ বাংলায় দেশভাগ জনিত পরিস্থিতির একটি দিক", ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৪, পৃ. ২৯৩-৯৬.

৫. রায়চৌধুরী, তপন, "রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিত-চর্চা", শারদীয়া দেশ, ১৩৯৯ (বা.স) পৃ. - ৫৩০

৬. ঐ, পৃ. ৫৩০

৭. Chaudhuri, Nirad c, The autobiography of an Unknown Indian, Bombay, Jaico Publishing House, 1997, P. 57-58.

৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, "ভিটেছাড়া" রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৭।

৯. ঘোষ, শঙ্খ, সুপুরিবনের সারি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯০ পৃ. ৬৪-৬৫।

১০. মিত্র, অভিজিৎ (সম্পাদিত), গল্পমালা-১, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৮ পৃ. ২৪১-২৫৭

১১. সেন, অভিজিৎ, "কি লিখি- কেন লিখি", কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৯৭ (বা.স), পৃ. ৫৫।

১২. সান্যাল, প্রবোধ, হাসুবানু, কলকাতা, সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৯

১৩. রাজগুরু, শক্তিপদ, দেশ কাল পাত্র, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০০ (বা.স)

১৪. সান্যাল, নারায়ণ, বল্মীক, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, ১৯৮৩

১৫. বসু, দক্ষিণারঞ্জন (সম্পাদিত), ছেড়ে আসা গ্রাম, কলকাতা, জিজ্ঞাসা ১৯৭৫

১৬. কুণ্ডু, ত্রিদিব সন্তপা, ''এপার বাংলা ওপার বাংলা। বদরুদ্দীন উমর-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার'', নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৫-৯৯।

১৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ''স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ঃ ব্যক্তিগত কথা'', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া ১৪০৪, পৃ ২৫২।

১৮. সেন, শান্তা, পিতামহী, কলকাতা, প্রতিক্ষণ. ১৯৯৪, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৯. প্রাগুক্ত, (১৩), পৃ; ৬১-৬২। Calcutta,

২০. Mitra, Ashok, Calcutta Diary Calcutta, Rupa & Co.,

২১. মিত্র, অভিজিৎ (সম্পাদিত), গল্পমালা-১, কলকাতা, ১৯৮৬, আনন্দ, পৃ. ১৪৩-১৫৭

২২. ঐ, গল্পমালা ২, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৯, পৃ ২০৮-১৭।

২৩. চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী ''স্মৃতি বিস্মৃতির মালা,'' বর্তমান, শারদসংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ ৪৫৪ ৬৮।

পান্থশালার কথা ঃ নৈহাটীর পান্থশালা ও পুরসভা

মৃণালকুমার বসু

আতিথ্য বিষয়ে ভারতীয়দের উদারতা প্রবাদপ্রতিম প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে অবশ্য অপরিচিতের অনাহুত আবির্ভাব যা স্বাভাবিক পরিচিত ছকের বাইরের জীবনকে জানার সুযোগ দেয়। তবু একই সঙ্গে যুগ যুগ ধরে এদেশে মানুষ নানাকারণে নিজেদের এলাকার বাইরে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এদের জন্যই প্রয়োজন হত পান্থশালার। মূলত বাণিজ্যপথ ও ধর্মীয় পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে অগণিত ধরণের যাত্রীনিবাস গড়ে উঠত। আয়তন ও চরিত্র অনুযায়ী বাংলায় এদের চটি, যাত্রীনিবাস, পান্থশালা, সরাই ইত্যাদি বলা হত। সাময়িক এই আবাসস্থলগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজের গতিশীলতার একটা ছবি ফুটে ওঠে যার সঙ্গে অনড়, পরিবর্তনহীন প্রাচ্য জীবনের ছক মেলে না। এ সব যাত্রীনিবাসের সঙ্গে আধুনিক হোটেলের মিল নেই, কেননা যাত্রী নিবাসে রান্নাকরা খাবার বিক্রি হত না। ফলে যাত্রীনিবাসের চারপাশে মুদী, পসারি দোকানদারদের ওপব যাত্রীরা খাদ্যের জন্য নির্ভর করত। যাত্রীরা নিজেরা অথবা রাঁধুনীদের সহায়তায় খাবার তৈরী করত বলে যাত্রীনিবাসকে কেন্দ্র করে খাদ্যসংক্রান্ত ব্যবসা চলত। অন্যধরণের ব্যবসাও চলত। মন্দির ও পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে বাংলায় পুরী, গয়া বা দেওঘরের মত বিশাল বন্দোবস্ত গড়ে ওঠেনি। কালীঘাট বা তারকেশ্বরের মত জাগ্রত দেবস্থানকে কেন্দ্র করে মন্দির গড়ে ওঠেনি যে সব জায়গায় সেখানে গঙ্গার মাহাত্ম্যের ফলে ব্যাপক হিন্দুসমাজের কাছে গঙ্গাস্নানের ও গঙ্গাজলের যে আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল তারই ফলে যাত্রীনিবাসের খণ্ডচিত্র তুলে ধরার জন্য নৈহাটী শহরের পান্থশালার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

মন্দিরের আকর্ষণ নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গঙ্গাস্নান তুলনায় নিশ্চিত সস্তা ও ব্যাপক হিন্দুসমাজের কাছে অনেক আকর্ষণীয় বলে উনিশ শতকের শেষে নৈহাটীর খ্যাতি বেড়েছিল। অবশ্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম রেলপথ খোলার ফলে নৈহাটী শুধু সেখানের একটি স্টেশন নয় জংশন স্টেশন হওয়ায় যাত্রীদের বিশেষত স্নানযাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে বেড়েছিল। আধুনিক পরিবহণব্যবস্থা ঐতিহ্যময়ী ধর্মীয় চিন্তাধারা পরিবর্তনের বদলে সবল করেছিল। যাত্রীরা শুধু গঙ্গাস্নানেব পুণ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে

নানা পারলৌকিক কাজে নৈহাটী ও অন্য গঙ্গা তীরবর্তী এলাকা বা শহরে আসত। যাত্রীসংখ্যা নানা পর্বোপলক্ষ্যে অগণিত জনসমাবেশের ফলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে লাভজনক বলে বিবেচিত হত তেমনি সাধারণ মানুষ ও পুরকর্তৃপক্ষ এর ফলে দুর্ভোগের ভাগীদার হত। নানা ধরণের মানুষের যাতায়াত জনিত কারণে নানা রোগের ব্যাপক সংক্রমণ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করত যার মোকাবিলা করা নাগরিক বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষস্থানীয় পুরকর্তাদের কাছে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। সমস্যাটা আরো জটিল রূপ নেয় নৈহাটীর মত শহরে কেননা শহরের পুরসভা নিয়ন্ত্রণ করতেন গঙ্গাতীরবর্তী পাটকল কর্তৃপক্ষ - যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকদের সগোত্র। অন্যদিকে বাসিন্দারা ও আনুসঙ্গিক যাত্রীরা গঙ্গামহিমায় বিশ্বাসী হিন্দু যাঁদের কাছে নানা পালাপার্বণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব পালাপার্বণের মধ্যে সে যুগে বারুণি, মহাবারুণি, দশহরা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে হাজার হাজার যাত্রী বিশেষ বিশেষ দিনে নৈহাটীতে হাজির হলে সেখানের জনজীবন বিপর্যস্ত হত। যাত্রীরা শুধু দূরাগত জীবনের উজ্জ্বল ছবিই নয় মারাত্মক সংক্রামক রোগের বাহক এই বোধ প্রশাসনিক ও সামাজিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ায় সমস্যা জটিল রূপ নেয়।

স্থানীয় পুরসভা সামাজিক দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত। একদিকে বিদেশী কারখানা মালিক ও পদস্থ কর্মচারীদের জগৎ ও অন্যদিকে দেশী মানুষদের আলাদা জগৎ। সেটাও আবার দুভাগে বিচ্ছিন্ন। একদিকে স্থানীয় মানুষ ও অনাদিকে কারখানার সঙ্গে যুক্ত অবাঙালী কর্মচারীর দল। গঙ্গা দুদলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও গঙ্গানদীর প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা জোরালো ছিল বলা চলে না। নিয়মিত যাত্রী আসার ফলে নৈহাটীতে যাত্রীদের সাময়িক আবাসের প্রয়োজন দ্রুত বেড়েছিল। স্থানীয় বিচক্ষণ মানুষেরা এর সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছিলেন, কিন্তু এর সমস্যা একদিকে স্থানীয় অনাদিকে সর্বভারতীয়। একদিকে স্বাস্থ্যবিধি পালনে বিদেশী পুরকর্তার আগ্রহের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্পদে সচেতন শঙ্কা যেমন সত্য তেমনি মহামারীজনিত বিপুল ক্ষতি দমনে সামান্য প্রচেষ্টাও সত্য। শুধু শহরেই নয় সরকার এ যুগে তখনকার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার যে বিধি বলবৎ হয়েছিল সে ধরণের বিধিব মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আগ্রহ দেখান। প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ বা হাতিয়ার যথা সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী বিশেষত ইংরেজ কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

স্থানীয় পুরসভার সামনে যাত্রী আগমনের চেহারাটা বোঝার জন্য একটি বিশেষ প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে নানাধরণের যাত্রীনিবাস গড়ে উঠেছে। সে ব্যাপারে বারাসাতের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অমৃতলাল মুখার্জী ১৯ শে মে, ১৯০৩ তারিখে ২৪ পরগণা জেলা শাসককে জানান যে বিভিন্ন যোগকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা খুব বাড়ে। তখন যাত্রীনিবাসগুলো ভীড়ে উপচে পড়ে। অমৃতলাল অবশ্য সরাই শব্দ ব্যবহার করছেন। কিন্তু সরাই শব্দের অনুষঙ্গ হিসেব যে সব সুবিধা বা ব্যবস্থা মনে পড়ে

তার সঙ্গে নৈহাটার যাত্রীনিবাসের কোনও মিল নেই। আসলে নৈহাটীর মত অর্বাচীন এলাকায় সবাই থাকার কথা নয়। পর্বোপলক্ষ্যে নৈহাটীর যাত্রীনিবাসগুলোও স্বাভাবিকের চেয়ে তিনচারগুণ যাত্রী বাস করতে বাধ্য হয়। তাই যাত্রীরা শূওরের মত থাকতে বাধ্য হয় ও যাত্রীনিবাসের শৌচাগারগুলোর অবস্থা নারকীয় হয়ে ওঠে। অবস্থার উন্নতি করতে হলে, অমৃতলালের মতে পুরী যাত্রীনিবাস আইনের ধাঁচে নৈহাটীতে যাত্রীনিবাস নিয়ম চালু করা হোক। অন্যথায় বাংলার পুরসভা আইনের ২৬১ নম্বর ধারা বলবৎ করে যে কোনও যাত্রীনিবাসকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হোক। আশা করা হল যে এর ফলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

১৯০৩ সালের মার্চ মাসে নৈহাটীতে বিপুল সংখ্যক যাত্রী হাজির হয়। ফলে যাত্রীনিবাসগুলোর মালিকেরা প্রচুর লাভ করে। এঁরা বেশীরভাগই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিন্তু যাত্রী নিবাস চালিয়ে আয় করতে তৎপর। এমনকি বাড়তি যাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে সাধারণ গৃহস্থেরাও দুপয়সা রোজগার করে। হঠাৎ কলেরার আক্রমণ শুরু হয়। পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত হয় ও কলেরা রুগীদের ফেলে সহযাত্রীরা পালিয়ে যায়। পুরসভা কর্তৃপক্ষ তখন শহর পরিস্কার রাখতে ও মৃতদেহ ফেলার জন্য মুর্দাফরাস নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। পুরকর্তৃপক্ষ ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে এর ফলে পুরসভার ২৮০্ টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে যদিও যাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে যাত্রীনিবাসের মালিকেরা যথেষ্ট রোজগার করেছে। অন্যদিকে যাত্রীদের থেকে পুরসভা প্রত্যক্ষভাবে আয় না করলেও শহর বাঁচাতে যথেষ্ট খরচ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক সি.জে. স্টিভেনসন মুর বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে নৈহাটীতে পুরী যাত্রীনিবাস আইনের আওতায় নিয়ম চালু করার পরামর্শ দেন।

এ সময়ে প্রকাশ পায় যে যাত্রীনিবাসগুলো বেশীর ভাগ অস্থায়ীভাবে তৈরী। ফলে স্বাস্থ্যবিধি পালন করার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। ইংরেজ পুরকর্তারা বিশেষ ক্ষুব্ধ কেননা যাত্রীরা রোগাক্রান্ত সহযাত্রীদের ফেলে পালিয়ে গেছে। এ থেকে তাঁরা দেশীয় চরিত্রের দুর্বলতা ও নীচতার পরিচয় পান। অন্যদিকে শহরে কারাখানা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধে পান সেটা এড়িয়ে যান। তাই পুরসভা কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে নতুন আইনে যাত্রীনিবাসের মালিকদের কাছ থেকে ট্যাকস আদায় করে পুরসভার আয় বাড়িয়ে শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো হবে।

নৈহাটী শহরের যাত্রীনিবাস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাক্তন পুরপিতা শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য নৈহাটীর পুরপ্রধানের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করেন। জানা যায় যে শহরে পান্থশালার সংখ্যা ৩৫টি ও ৩৩ জন এর মালিক। গড়ে ৯৫০ থেকে ১০০০ জন এগুলোতে থাকে বলে মালিকেরা যথেষ্ট রোজগার করে। বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে

১ মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট। প্রসিডিংস এ নম্বর ১ ঃ মে, ১৯০৪

২ ঐ

যেমন চূড়ামণি, অর্ধোদয়যোগ ও মহাবারুণীতে নৈহাটীতে প্রায় চার হাজার যাত্রী আসে। মার্চ মাসের বারুণী উপলক্ষ্যে ও দশহরা উপলক্ষ্যে জুন মাসে বহু যাত্রী আসে। মোটামুটি কিছু খরচ করে শহরে এ ব্যাপারে বন্দোবস্ত করলে পুবসভার কিছু আয় হতে পারে। অবশ্য কিছু আমলা নিয়োগ করতে হবে। তিনি মোটামুটি খবচ ধবেন ঃ-

স্বাস্থ্য পরিদর্শক ১৫, হারে	১৮০
ওভারসিয়ার ১২, হারে	১৪৪
বীজাণু নাশক	২৫
লাশ ফেলার খরচ	২৫
মুর্দাফেলা গাড়ি ১৫ হারে	১৮০
অন্যান্য খরচ	২৬
মোট খরচ	৬১০

হিসেব থেকে বিপুল আমলা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত খরচের পাশে যৎসামান্য বীজাণু নাশক খরচের হিসেবটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। আসলে পুরসভা যাত্রীনিবাসের মালিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা আদায় করে পুরসভার আয় বাড়াতে খুবই তৎপর সেটা বোঝা যায়।

এ ধারণা প্রস্তাব পুরসভাকর্তৃপক্ষের কাছে বেশ পছন্দসই ছিল। নৈহাটীর মত শহরে শ্বেতাঙ্গ পুরপ্রধান কার্যত নিরঙ্কুশ আধিপত্য করতেন। ১৯০৪ সালে পুরপ্রধান জর্জ রবার্টসন চব্বিশপরগণায় জেলাশাসককে জানালেন যে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি খুবই দরকারী কেননা তীর্থযাত্রীরা যত নষ্টের মূল। ফলে শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের ঘাড়ে কর চাপানো ঠিক হবে না। বরং যাত্রীনিবাসের মালিকরা যেহেতু লাভ করেন সেহেতু তাদের ঘাড়ে বাড়তি বোঝা চাপানো হবে ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য পুরসভার যাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাসিক ১০ টাকা মাইনের একজন পবিদর্শক নিয়োগ করা উচিত বলেন। দশটাকা মাইনেয় বাইরের কেউ চাকরী করবেন না বলে স্থানীয় হাসপাতালের এক কর্মচারী এই টাকায় বাড়তি কাজ করবেন। এটা করা জরুরী কেননা কলেরার মোকাবিলা করতে গিয়ে পুরসভার বাড়তি ২৮০ টাকা খরচ হয়েছে অথচ তীর্থযাত্রীদের থেকে পুরসভার কোনও লাভ হয়না। পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীদের জন্য বন্দোবস্ত থেকে পুরসভার কিছু আয়ের ব্যবস্থা দরকার।

যাত্রীনিবাস আইন-চালু হলে পুরসভার আয়েব রাস্তা হবে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছে মজুরী বাবদ পুবসভা পাবে প্রতি যাত্রী নিবাস কিছু ১ হারে ৩৫ টাকা।৪

লাইসেন্স বাবদ পাবে	৪৭৫
ফাইন	১০০
মোট	৬১০

অবশ্য সামান্য কিছু টাকা পুরসভাকে খরচ করতে হবে। পুরসভা প্রথমেই ফাইন বাবদ ১০০টাকা আয় হবে ঠিক করে নেয়। ফলে পুরকর্মীদের এই ফাইনের মাধ্যমে

আরো কিছু ব্যক্তিগত আয় হবে বোঝা যায়। পুরসভা আশা করেছিল যে নৈহাটীতে যাত্রীনিবাস আইন চালু হলে যাত্রীনিবাসের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

যাত্রীনিবাস গুলোর প্রকৃত অবস্থা শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। নৈহাটী শহরে পাটকল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ওপর ও নীচের তলায় শুধু ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তাই নয় রেল পরিবহণ ব্যবস্থা সেই পরিবর্তনকে জোরালো করেছে। পাশাপাশি পুণ্যকামী যাত্রীদের নিয়মিত আসাযাওয়ায় ফলে শহরে যাত্রীনিবাস গড়ে ওঠার ফলে আয়ের রাস্তা খুলে গেছে। মন্দিরের তুলনায় গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন সমাজের সব স্তরের মানুষকে রেল পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই যাত্রীনিবাস গড়ে অনেকেই আয়ের রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্যই ব্রাহ্মণরা মালিকদের দলে প্রধান। আয়ের এই নতুন উৎসেব ব্যবহারে গঙ্গাতীরবর্তী এলাকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল না. এটা সহজেই বলা যায়। যজমানী ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া বেশ স্পষ্ট। শহরে ৩৫ টি পান্থশালা আছে ও সেগুলোতে মোট ১৫০ টি ঘর আছে। মোটামুটি ৯৫০ জন যাত্রী থাকা সম্ভব। অবশ্য বাড়তি যাত্রী রেখে যাত্রীনিবাস মালিক লাভ নিজের কাছে রাখবেন। যাত্রী নিবাস গুলো শহরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ২৩টি পান্থশালা আছে গঙ্গায় ধারে স্টেশন রোডে, ৩টি বাজার এলাকায়, কাঁঠালপাড়ায় ৩টি পান্থশালা আছে। এ ছাড়া ৬টি আছে বাঙালপাড়ায়। শহরে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দারা স্থায়ী বসতি করেছেন কিন্তু তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বাঙালপাড়া নামের মধ্যে স্পষ্ট চোখে পড়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা যাত্রীরা এখানের যাত্রীনিবাস পছন্দ করবেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। ফলে এলাকা ও বর্ণভিত্তিক সমাজের ছবি যাত্রীনিবাসের মালিকানার মধ্যেও সহজেই ধরা যায়। আধুনিক হোটেল গড়ার ব্যবস্থার এভাবেই গোড়াপত্তন হচ্ছিল ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজেব ভেতরে। নৈহাটীতে ব্রাহ্মণ থেকে সর্বনিম্ন জাতের মানুষ যাত্রীনিবাস গড়ে তুলেছেন। বাড়তি আয়েয় ব্যবস্থা করতে সকলে কতটা আগ্রহী তা নীচের তালিকা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে মালিকেরা আদপে আগ্রহী ছিল বলা যায় না। বেশীর ভাগ যাত্রীনিবাস মাটির ও মেঝে স্যাতসেঁতে। মোটামুটি চারটি এলাকায় যাত্রীনিবাস আছে ষ্টেশন রোড, বাঙালপাড়া ও কাঁঠালপাড়ায় যার খ্যাতি প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হিসেবে। যাত্রীনিবাসের এই ব্যবসায়ে যেমন আছেন ন্যায়রত্ন উপাধিধারী, কুলীন ব্রাহ্মণ তেমনি আছেন বিপিন চঙ্গ বা চাঁড়াল অথবা বঙ্কু মুচী। মালিক মহিলার মধ্যে যেমন অপর্ণাসুন্দরী দেবী এতে যুক্ত আছেন চন্দ্রমুখী বেওয়া, খুদী বেওয়া, আন্না বেওয়া অথবা সখি গয়লানীর অভাব নেই। অবশ্য বড় যাত্রীনিবাসগুলোর মালিকানা বামুনদের। শশী চক্রবর্ত্তী কালীকিশোর মজুমদারের একটি মাত্র ঘরে মাত্র ৮ জন থাকতে পারে।

চারটি এলাকার যাত্রীনিবাস সম্পর্কে অর্থাৎ মালিকানা, স্তরের সংখ্যা ও কত জন থাকতে পারে তার বিস্তৃত তথ্য নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যায় ঃ-

মালিক	ঘরের সংখ্যা	কতজন থাকতে পারে ঃ-	
চন্দ্রমুখী বেওয়া	৪	২৪	কাঁঠাল পাড়া
নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪	২৪	
দীননাথ ভট্টাচার্য্য	৬	৩৬	
বিধু ময়রানী	৪	২৪	বাজার রোড
চূণী বেওয়া	২	১২	
বেণী ঘোষ	২	১৬	
কালীকিশোর মজুমদার	৯	৫৪	বাঙালপাড়া
নব নাপিত	৪	৩২	
রজনী ভট্টাচার্য্য	৭	৪২	
কৃপাময়ী দেবী	৪	২৪	
রামসুন্দর বর্মা	৩	২৪	
সখি গয়লানী	২	১৬	
কাঁঠালপাড়া এলাকায় ঃ-	৯		
বেণী ঘোষ	২	১৬	
বেণী ঘোষ	৩	১৮	
বঙ্কু মুচী	৪	২৪	
মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৩	১৮	
বিপিন চঙ্গ	৩	২৪	
নদেরচাঁদ পাল	৫	৩০	
বঙ্কু দে	২	১৬	
নব পাল	৫	৪০	
অন্ন বেওয়া	৪	২৪	
সদী চূণারণী	৭	৪২	
খুদী বেওয়া	২	১২	
শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	৯	৫৪	
কৃষ্ণধন ন্যায়রত্ন	৫	৩০	
পূর্ণ ঘোষ	১	৮	
সারদা পাল	৪	২৪	
গুরুনাথ ভট্টাচার্য্য	৯	৫৪	
বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী	৭	৪২	
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী	৭	৪২	

অপর্ণাসুন্দরী দেবী	৫	৩০
পঞ্চি বেওয়া বা বেহারী ভজা	২	১২
জন্মেঞ্জয় ভট্টচার্য্য	৫	৩০
হরি চক্রবর্ত্তী	১	৮
প্যাবী চক্রবর্ত্তী	৪	২৪
	১৫০	৯৫০ জন

মোটামুটি ১৫০টি ঘরে ৯৫০ জন যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা যদিও আসলে পর্বের দিন অনেক বেশী সংখ্যক যাত্রীরা সেখানে আসত। পুরসভার ওপর চাপ ছিল বিশেষত শহরে পাটকল ও রেলের সঙ্গে যুক্ত সাহেবসুবো থাকার জন্য নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার ব্যবস্থায় জোরালো করার ইচ্ছা পুরসভার থাকা স্বাভাবিক। সবদিক বিবেচনা করে পুবসভা প্রশমনকে পুরী যাত্রীনিবাস আইন নৈহাটীতে যাত্রীনিবাস আইন বলবৎ করেন। ফলে প্রতি যাত্রীনিবাস কর্ত্তৃপক্ষরা লাইসেন্স নিতে বাধ্য হল। অন্যদিকে প্রতি যাত্রীকে যাত্রীনিবাসের খরচ ছাড়া প্রতিদিন আট আনা হিসেবে দিতে বাধ্য হল ৫ পুণ্যকর্মী যাত্রীরা গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জনেও পুরসভাকে পয়সা দিতে বাধ্য হলেন। শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধে কিছু বেড়েছিল নিশ্চয় কিন্তু সে সব সুযোগ বিশেষ গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ব্যাপক নাগরিক জীবনকে খুব উন্নত করেছিল বলা চলে না। তবু, ধর্মপ্রাণ ঐতিহ্যসচেতন যাত্রীদের দুঃখের মধ্যে দিয়ে পুরসভার সহযোগিতায় আমলাতন্ত্র নাগরিক বন্দোবস্তের বিপর্যয় ঠেকাতে এগিয়ে আসে।

ছাত্র সমাজে আড্ডার চরিত্র বদল ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর এক সমীক্ষা (ষাট এর দশক থেকে নব্বইয়ের দশক)

মহুয়া পাত্র

সমাজের পরিবর্তনশীলতার দ্বারা কীভাবে ছাত্র সমাজ অর্থাৎ সমাজের যে ভিত তার কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় তার সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এই সমাজের আড্ডাকে বিশ্লেষণ করলে। আড্ডা হল প্রথাবহির্ভূত আলোচনা, আড্ডার মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেই মানুষের চরিত্রের এবং চিন্তাভাবনার আসল প্রতিফলন ঘটে। আর এই আড্ডার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আড্ডার স্থান, আড্ডার বিষয়, আড্ডার চরিত্র সবই পরিবর্তনশীল। আড্ডার এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এক সামঞ্জস্য আছে।

আড্ডা সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই হয়। এখানে আমি ছাত্র সমাজের আড্ডা নিয়ে আলোচনা করছি। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। এই ছাত্রসমাজের চিন্তাভাবনা ও চরিত্রকে বিচার করলে জানা যাবে আমাদের দেশ, সমাজ কী অবস্থায় রয়েছে, এবং কী পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত স্তরের জন্য এদের আড্ডার চরিত্র অনেকটাই স্পষ্ট ও সুদৃঢ়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাটের দশক থেকে নব্বই-এর দশকের ছাত্রদের উপর এক সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে ছাত্রদের আড্ডার স্থানগুলিও আলোচনার বিষয়বস্তুগুলির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আজ আমাদের ছাত্র সমাজের ভূমিকা কি? ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আমাদের কোন দিকে নিয়ে চলে এসেছে?

স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটনের গোসাবা একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।

দীপক মণ্ডল

প্রাচীন কাল থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের গভীর বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বহু পর্যটক এখানে এসেছে। এখানকার চওড়া, অতল নদী গুলি বিভিন্ন দ্বীপ গুলিকে শহরাঞ্চল থেকে আলাদা করে রেখেছে। নদীমাতৃক এই সুন্দর বনাঞ্চলে বন্দর তৈরীর উপযুক্ত পরিবেশ থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি।

দুই ২৪ পরগণার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা বিস্তীর্ন অরণ্যময় ভূখণ্ডে জঙ্গল হাসিলের ঘটনা এই সেদিনের কথা। ইংরেজ আমলে নতুন করে এখানে শুরু হয় জঙ্গল হাসিল।

ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন স্কটল্যাণ্ড থেকে এই সুন্দরবনে এসে শুরু করেছিলেন এক বিচিত্র কর্মকাণ্ড। তিনি স্কটল্যাণ্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে। চাকরী থেকে অবসর গ্রহনের পর সুন্দরবনের দিকে তাঁর নজর পড়ে। বাদা অঞ্চলের এই দ্বীপটিই তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিলেন গোসাবা, রাভাবেলিয়া ও খগতজেলিয়া এই তিনটি দ্বীপকে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর জমিদারী লাভের পর সুন্দরবন অঞ্চলেও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এখানকার জমি লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় ও জমিদারদের মধ্যে বিতরন শুরু হয়। এসব অষ্টাদশ শতকের কথা। তারপর ১৯০০ শতকের শুরু থেকে সুন্দরবনে রায়তদারী ব্যবস্থার সুপারিশ হয়। এ সময়েও জঙ্গল হাসিলের কাজ চলে। এইভাবেই হাজির হলেন হ্যামিলটন সাহেব। বাদার এই তিনটি দ্বীপে জঙ্গল হাসিলের কাজ শুরু করে তিনি ভারত সরকারকে বছরে কিছু খাজনা দেবার শর্তে এই দ্বীপ তিনটি ইজারা নিয়ে বিশ শতকের ১ এর দশক থেকে শুরু করলেন কাজকর্ম। চলল ৩০ এর দশক পর্যন্ত। অঞ্চলটির নাম হয়ে গেল হ্যামিলটনের আবাদ। মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি থেকে কিছু মানুষ জনকে দিয়ে রীতিমত জঙ্গল হাসিল করে হ্যামিলটন সাহেব এখানে গড়ে তুললেন পাকাপোক্ত নদী বাঁধ। গড়ে উঠল ঘরবাড়ি. রাস্তাঘাট। হ্যামিলটন আবাদে স্পন্দিত হয়ে উঠল জনজীবন; শুরু হল রীতিমতো ঘরগৃহস্থলী। হ্যামিলটনের উদ্দেশ্য হল আদর্শ একটি কৃষি উপনিবেশ

গড়ে তোলা এবং তা হবে সমবায়ের আদর্শে গড়ে তোলা কৃষি উপনিবেশ। দারিদ্র, শোষণ অশিক্ষার হাত থেকে কিছু লোককে রক্ষা। ভারতবর্ষে এসে তিনি দেখেছিলেন ভারতবাসী কত গরীব, শিক্ষার আলো থেকে কত দূরে, কত তারা শোষিত। ইতিপূর্বে ইউরোপের কিছু কিছু জায়গায় তিনি দেখেছিলেন সমবায় আন্দোলনের প্রভাব। এই দেখাগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা যায় এবং হ্যামিলটন সেই পরিকল্পনাই করে ফেললেন। তিনি চেয়েছিলেন গোসাবায় একটি বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায় একমাত্র হাতিয়ার সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। তিনি বিশ্বাস করতেন সমবায় যদি ব্যর্থ হয়, ভারতবর্ষ ব্যর্থ হবে। গ্রামীন স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তনের দিকেও তাঁর ছিল সর্বশেষ নজর। একটি ভাষণে তিনি এই মনোভাব ব্যক্ত করেন - "The village people will relearn the art of self government and resusciate the old village repubilc as they are doing in Gosaba" আর একটি জিনিস তিনি চেয়েছিলেন - তাহল দেশের যুবশক্তি চাকরীর বদলে সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। যুবকদের তিনি স্বাবলম্বী করার কথাও বলতেন। তারা স্বাবলম্বী না হলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি গ্রামে মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন। দেখেছিলেন গ্রামের মানুষ মহজনী ঋণে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। চাষী যা কিছু আয় করে তার মোটা অংশই চলে যায় মহাজনের ঘরে।

এইসব অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়েই হ্যামিলটন এসেছিলেন গোসাবায়। তিনি এখানে গড়ে তোলেন এক এক করে বিশাল কৃষি ক্ষেত্র, সমবায় ভাণ্ডার, সমবায় চালকল, সমবায় পুকুর, রাস্তা ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে জেটিঘাট, গোপালন ব্যবস্থা, তাঁত শিল্প প্রভৃতি ভিন্ন ধরনের শিল্প। আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি করেছিলেন এই অঞ্চলে এক টাকার কাগজে নোটের প্রচলন করে। গোসাবার সমবায় গুলিতে এই নোটের প্রচলন ছিল। এই নোট দিয়ে গোসাবার মধ্যে যে কোন জিনিস কেনা-বেচা করা যেত।

দরিদ্র ও মেহনতী সাধারণ মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে তাঁর এই কর্মসূচী, শিক্ষার অভাব দূরীকরণে তিনি প্রাথমিক, উচ্চ ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কারণ তিনি জানতেন - "The only way to get honest man is to train them to be honest from their childhood" আর সেই জন্যই এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন - .and Gosaba should be given a lead in manufacture of good men rather than in making money" ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারও তিনি নির্মান করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল হ্যামিলটন গোসাবাতে বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমালার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এবং এ ব্যাপারে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ ক্রমে রোমান বর্ণমালা প্রচলনের চিন্তা থেকে দূরে সরে আসেন।

গোসাবার মানুষের স্বাস্থ্যোন্নয়নের স্বার্থে তিনি একাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল কৃষি, সমবায়, ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে। ধানচাষ, মাছ চাষ, গোপালনের দিকে তাঁর নজর ছিল বেশী। তিনি Cross Breading এর মাধ্যমে দেশী বিদেশী গোপালনের ব্যবস্থা করেন। স্থাপন করেছিলেন গরু প্রজনন কেন্দ্র থেকে গরু বাইরে চালান দেওয়া হতো। গ্রামে, লবণ, গুড়, ধুতি শাড়ী গামছা তৈরীর তাঁতকল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল। গড়ে উঠেছিল চর্মশিল্প, মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা, মোমশিল্প, পোলট্রি এককথায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস এই সব কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। হ্যামিলটন চেয়েছিলেন এক ফসলী সুন্দরবন কে দোফসলী করতে, নোনা মাটিকে কৃষির উপযোগী করে গড়ে তুলতে, কৃষিতে সবুজ সারের ব্যবস্থা করতে এবং দেশীবিদেশী শাকসজ্জীর চাষ করতে, কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে। তিনি দেখেছিলেন সুন্দরবনের মানুষ শুধু ধান, মাছ, শাকসজ্জীর চাষ দিয়েই থাকে না। তারা পা বাড়ায় এখানকার গভীর জঙ্গলের দিকেও। মধু মোম কাঠের জন্য তাদের সুন্দরবন অভিযান যাতে নিরাপদ করা যায় তারও ব্যবস্থা ছিল এই হ্যামিলটনের আবাদে।

এখানে গরীব মানুষেরা মহাজনের কাছে না গিয়ে যেত সমবায় ব্যাঙ্কে। এখান থেকে তারা লোন পেত। ১৯০৯ সালে গড়ে উঠেছিল "Bengal young men's Zamindary Co-Operative Society." চাষীদের অর্থনৈতিক জীবনে অনেকখানি ভূমিকা নিয়েছিল এগুলি। হ্যামিলটনের আমলের এই সংস্থা সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং গোসাবার সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে নিঃসন্দেহে এমন একজন মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। গোসাবার মহাজনী প্রথার অবসানের জন্য এখানকাব আপদকালীন ধর্মগোলার কথা তুলে ধরা প্রয়োজন। এই ধর্মগোলা থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষ সাহায্য পেত, ফলে তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হত না।

গোসাবায় এমন একটি কৃষি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল যার স্বাক্ষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় এসেছিলেন এবং দেখে গিয়েছিলেন হ্যামিলটনের কর্মকাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে তিনিও তাঁর জমিদারীতে হাত লাগিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমবায় আন্দোলনের নীতি একমাত্র সুসভ্যনীতি। ১৯২২ সালে তিনি গড়ে তোলেন শান্তি নিকেতন তাঁর গ্রাম পুনঃগঠন তথা গ্রাম সেবার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সৃষ্টি। এখানে চিকিৎসালয় কৃষিখামার, গোপালন কেন্দ্র, তাঁত শিল্প, স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি, সমবায় ভাণ্ডার, ইত্যাদি। এই আন্দোলনের আগেই হ্যামিলটনের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই হ্যামিলটন সাহেবকে তিনি ১৯২৯ সালে শান্তিনিকেতনে যে বাৎসরিক উৎসবের শেষে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। এই সময়ে হ্যামলিটন সাহেব রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গোসাবায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথ

সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা না করে ১৯৩২ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর হ্যামিলটন আবাসে যান এবং দেখে আসেন সাহেবের মানস কন্যাকে। হ্যামিলটনের গোসাবায় জনহিতকর কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। গোসবার তাঁত শালার তৈরী একটি শাল তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী কবি চলে যান গোসাবা ছেড়ে। সঙ্গে নিয়ে যান গোসাবার অভিজ্ঞতা।

মৃত্যুর পূর্বে হ্যামিলটন তাঁর সম্পত্তির একটি মোটা অংশ উইল করে গেছেন গোসাবার কল্যাণে। রবীন্দ্রনাথের বছর দুই আগে মারা যান হ্যামিলটন। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়েছিলেন।

গোসাবায় তাঁর আমলে পাকা রাস্তা হয়নি ঠিকই শহর জীবনের কিছু অসুবিধা সেখানে উপস্থিত ছিল ঠিকই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু সুবিধা সৃষ্টিতে এই মানুষটির প্রয়াস প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। জঙ্গল তিনি হাসিল করেছিলেন ঠিকই। গাছে তিনি কোপ লাগিয়ে ছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেটা জনগণের স্বার্থে। বনের গাছ কেটে সেখানে তিনি কৃত্রিম ভাবে বন সৃষ্টি করতে চেযেছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও হ্যামিলটন আপ্রাণ উন্নতির চেষ্টা করেন। গোসবার ঝাউবন, নারকেল বীথিই তার প্রমাণ। হ্যামিলটনের উদ্যোগে ব্যক্তিগত ভাবে একক আগ্রহ ও জন-কল্যাণের প্রয়াস অনুসারী। সরকারী উপনিবেশবাদে অরণ্য সম্পদ কে শোষণ করে ইংল্যান্ডের স্বার্থে তা কাজে লাগানোর যে নীতি হ্যামিলটনের নীতির সঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে উপনিবেশবাদ ও শোষণ, আরেকদিকে জনকল্যাণ - হ্যামিলটনের কার্যকলাপ এই সংকটের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮৬০ সালের ৬ই ডিসেম্বর সুদূর স্কটল্যান্ডে জন্ম হয়েছিল এই মানুষটির। কেউ ভাবেনি ভারতবর্ষের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের কাজে সেই স্কটল্যান্ড থেকে একজন মানুষ ছুটে আসবেন গোসাবায়। অবশ্য জনসাধারণের কাজে নামলে এককভাবে ত্রুটিহীন কাজ করা যায় না। কিছু না কিছু ভ্রান্তি, পদস্খলন এসে যায়। হ্যামিলটনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবু বলা যায় এমন প্রত্যন্ত বাঘ ও কুমিরের দেশে এসে কিছু দুঃখী দরিদ্র মানুষের জন্য একটুখানি হলেও তিনি না হয় সেই একটুখানিই করে গেছেন। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে সেই গোসাবা আজ হেঁটে চলেছে। অবশ্য গোটা দেশের একটা পরিবর্তন না হলে গোসবারও বা পরিবর্তন আসবে কি ভাবে? ব্রিটিশ শাসকেরা যেখানে শোষণে অভ্যস্ত সেখানে এই মানুষটি রাজবংশের রক্ত গায়ে থাকা সত্বেও ছিলেন একটু ব্যতিক্রম। গোসাবা এখন অনেকটা নগরায়িত। সেখানে গেলে দেখা যাবে — কিছুটা ইট বিছানো পথ, কিছুটা পীচ গড়া রাস্তা, স্কুল বাজার, হাসপাতাল, সৌরশক্তির দৌলতে সেখানকার কিছু অন্ধকার ও ঘুচে গেছে। কিন্তু সেখানকার জনজীবন থেকে এখনও মুছে যাননি এই সাহেবটি। ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন গোসাবার প্রাণপ্রদীপ এই সাহেব।

মনন থেকে বিযুক্ত নয়, মননের উৎস থেকে নিঃসৃত কর্মের ধারা। কদাচিৎ যখন এই দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটে, যখন চিন্তা কর্মের প্রতি ধাবিত হয়ে কর্মের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, তখনই তা সার্থক রূপ ধারণ করে। গোসাবার রূপকার হ্যামিলটনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

ঔপনিবেশিক যুগে অরণ্য বিষয়ক গবেষণার আদিপর্ব— সাম্রাবাদীর বিশুদ্ধ জ্ঞানতৃষ্ণা না সাম্রাজ্যের চাহিদা?

শুভাশিস বিশ্বাস

ভারতবর্ষের অরণ্যবিষয়ক গবেষণার একযুগ অতিক্রান্ত। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম অরণ্যআইনের পূর্বেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসককুল ভারতবর্ষের অরণ্যের জগত নিয়ে বিভিন্নপ্রকার 'মিথ' সৃষ্টি করেছিল ও সেই অরণ্যের সংরক্ষণের তাগিদে বিভিন্নপ্রকার আইন প্রণয়ন করে। তাদের এই সংরক্ষণ প্রয়াস বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহুপ্রশংসিত— এমনকি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে রিচার্ড গ্রোভ এই প্রয়াসকে 'Green Imperialism' রূপে অভিহিত করেছেন।[১] কিন্তু এই সংরক্ষণ প্রয়াসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অন্যরকম। সংরক্ষণ প্রয়াসের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক যুগের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রথমপর্বের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে এই গবেষণাগুলির মধ্যে কোন সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা। ভারতবর্ষের অরণ্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা এই গবেষণাকেন্দ্রের গবেষণা গুলির প্রকৃত প্রয়াস ছিল, না সাম্রাজ্যবাদের কোন গুঢ় উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে কাজ করেছিল, তা অনুসন্ধানও এই প্রবন্ধের প্রয়াস।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুনে এই গবেষণাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অরণ্য বিষয়ক গবেষণার একটি মূল দিক পর্যবেক্ষণ, ১৯০৪ সালে গবেষণাকেন্দ্রের একটি সংকলনে সুস্পষ্ট লেখা আছে - "It is note-worethy that officers interested in shikar has furnished us some of the best observations"[২] প্রবন্ধটিতে গবেষণাকেন্দ্রের গবেষকরা কত বড় শিকারী ছিলেন ও শিকারের ক্ষেত্রে তারা পর্যবেক্ষণকে কতভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তার বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে এই যুগপর্বে এই অঞ্চলে শিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে অরণ্যবিষয়ে গবেষণার বিষয়বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ে যে আগ্রহ ব্যাপক ছিল তা এই উদ্ধৃতিটি থেকে সুস্পষ্ট।

গবেষণাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার প্রথম তিরিশ বছরে গবেষকদের ব্যক্তিগত গবেষণা প্রয়াসের মধ্যেই এর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। উদ্ভিদবিদ্যা, অরণ্যসম্পদের যথাযথ ব্যবহার প্রভৃতিগুলিই এই পর্বে মূল গবেষণার বিষয় ছিল।[৩] ব্রান্ডিস ১৮৭৪ সালে "Forest, Flora of North West and Central India' ও গ্যামবেল ১৮৮১ সালে "Manual of Indian timber" গ্রন্থদুটি লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এসময়টি ছিল উত্তরভারতে রেলপথ বিস্তারের যুগপর্ব। রেলপথের নির্মাণকার্যে শালকাঠের প্রয়োজন ছিল এবং ব্র্যান্ডিস ও গ্যামবেলের গবেষণায় কিভাবে শালকাঠের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে গবেষণার প্রয়াস ছিল। ব্রান্ডিস লিখেছেন যে হিমালয় অঞ্চলে দেওদার ছাড়া শাল ও সেগুনকেই সর্বাপেক্ষা বেশী রেলপথ নির্মানের কাজে ব্যবহার করা যায়।[৪] তিনি এমনকি বলেছেন যে কয়লার পরিবর্তে রেলইঞ্জিনে কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।[৫] সুতরাং দেখা যায় যে রেলপথবিস্তারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে তাদের গবেষণার সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

সি. ওয়ার্থ ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা কেন্দ্রটির পরিচালক ছিলেন। 'Indian Forester' এর সপ্তম খণ্ডে দেখা যায় যে ওয়ার্থ কিভাবে সরাসরি অরণ্যসম্পদ ধ্বংসের কথা ভেবেছিলেন। অর্থনৈতিক অরণ্যচিন্তা বা 'Economic Foresty' এই সময়ের গবেষণাগুলিতে গুরুত্ব পায়। George Watt এসময়ে 'Dictionary of Economic products' গ্রন্থটি লেখেন।[৭] কিন্তু এইপর্বে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল যে বিষয়গুলি সমকালের ইউরোপে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় গবেষণার বিষয়। ১৯০১ সালে, অর্থাৎ গবেষণাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার ৩৫ বছর পরে প্রথম উদ্ভিদবিদ E.P. Stebbing কে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু Stebbing বিভিন্ন বিরোধীদের চাপে সফলভাবে কোন কাজ করতে পারেন নি। শেষে ১৯০৩ সালে উদ্ভিদবিদের পদটি তুলে দেওয়া হয়।[৮] এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সত্যিকারের গবেষণার থেকেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই গবেষণাকেন্দ্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার Sainthill Eardley Wilmot গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণাকেন্দ্রে ছয়টি পদের সৃষ্টি হয়, পদগুলি হল Imperial Silviculturist, Imperial Superintendant of working plans, Imperial Forest Zoologist, Imperial Forest Botanist, Imperial Forest Economist এবং Imperial Forest Chemist.[৯] এই পদগুলির মধ্যে রসায়নবিদের পদটিতে একজন ভারতীয় পুরন সিংকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলেও ১৯০৬-১৯০৯ এর মধ্যে সম্পূর্ণ ১০৪,০০০ বর্গমাইল অরণ্যের জন্য একজনমাত্র উদ্ভিদবিদ R.S. Troup কে নিয়োগ করা হয়েছিল। একজন উদ্ভিদবিদের পক্ষে এই বিশাল অঞ্চলটি নিয়ে গবেষণা সম্ভবপর ছিল না।[১০] R. S. Troup এর পক্ষে সরকারের অরণ্যবিভাগকে সহায়তা করবে এরূপ কয়েকটি বিষয় নিয়ে গবেষণা ছাড়া অন্য গবেষণা সম্ভবপর ছিল না। তথ্য থেকে

পাওয়া যায় - "In the province the close connection between working plan and research has always been recognized The realisation helped the appointment of Senior administrative officers"[১০] সুতরাং দেখা যায় যে এক্ষেত্রেও গবেষণার থেকে প্রশাসনিক স্বার্থের বিষয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই গবেষণাকেন্দ্রটির গবেষণাপত্রিকা 'Indian Foresty' প্রকাশিত হতে শুরু করে ও William Schlich ছিলেন এর সম্পাদক। কিন্তু প্রথমপর্বের পত্রিকাগুলিতে শিকার ও ভ্রমনের গল্প প্রভূতভাবে স্থান পেয়েছিল।[১১] পত্রিকাটি পড়লে কখনো কখনো সেগুলি ভ্রমন ও শিকার পত্রিকা কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ হয়। পত্রিকার একই সংখ্যাতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর প্রবন্ধ ও শিকারের কাহিনী মুদ্রিত হয়েছে, যে ধারণাগুলি বিপরীতধর্মী।

সামগ্রিকভাবে অরণ্য বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিষয়টিই অধিক পরিঃস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখানে প্রথমপর্বে হয়নি, সরকারের অরণ্যনীতির রূপায়নের তাগিদে কিছু স্বার্থদুষ্ট অনুসন্ধান হয়েছিল মাত্র। তাই কোনভাবেই এই প্রয়াস 'Green Imperialism এর অংশ নয়, বরঞ্চ এর মধ্যে একধরণের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদই প্রকাশ পায়। এই প্রেক্ষিতেই অরণ্য বিষয়ক গবেষণাগুলিকে বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের বদলে সাম্রাজ্যের চাহিদার পরিপূরক গবেষণাপ্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

তথ্যসূত্র

১। রিচার্ড গ্রোভ - ''গ্রীণ ইমপিরিয়ালিজম'', অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩

২। 'Indian Foresty', vol XIV পৃঃ ১৩৬

৩। "Hundred years of Indian Foresty", vol II, ১৯৬১ পৃঃ ১৬০.

৪। D. Brandis - "Memorendum on the supply of Railway Sleepers of the Himalayan Pines Impregnated in India," Indian Foresty, vol IV, পৃঃ ১৩৬

৫। Anon, "Railway Fuel in the Punjab", Calcutta Review, vol XLVI, (১৮৬৭)

৬। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট্রি, সপ্তম খণ্ড, পৃ ১৭৩,

৭। পূর্বোল্লেখিত, 'Hundred Years' পৃঃ ১৬৩

৮। ঐ, পৃঃ ১৬৪

৯। ঐ, পৃঃ ১৭৩

১০। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট্রি, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ১৮৬

১১। ঐ, পৃঃ১৭৭

১২। ঐ, পৃঃ ১৬৩

ইতিহাসের আলোকে খেজুরী

প্রতীক মাইতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দর শহর খেজুরীর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নৌ বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং পরবর্তী পর্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খেজুরী থানার অংশগ্রহণ ও অবদান আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগের তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হওয়ার পর খেজুরী বন্দর সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খেজুবী মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত। এর ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৫২২২´´ অক্ষাংশ এবং ৮৮°১৭´´ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২½ ফুটের কিছু বেশী। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কোম্পানী লাভের পর খেজুরী ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনে আসে। বতর্মানের যে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মধ্যে খেজুরী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মেদিনীপুর এবং হিজলী দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল। খেজুরী হিজলী জেলার অংশ ছিল। ১৮৩৬ সালে হিজলী এবং খেজুরী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

খেজুরীর ইতিহাস প্রায় সাড়ে চারশ বছরের পুরনো। ১৫৫৩ সালে অঙ্কিত ডি ব্যারোর, ১৬৬০ সালে ব্লেভের, ১৬৬০ সালে ভান্ডেন ব্রুক, ১৬৮২ সালে জর্জ হিরোন এবং ১৬৮৭ সালে বৌরীর মার্নচিত্রে দেখা গেল হিজলী ও খেজুরী পাশাপাশি দুটি দ্বীপ জেগে উঠেছে ভাগীরথীর মোহনায়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী ছিল নৌ বাণিজ্য ও নৌ যুদ্ধের প্রাধান্যের যুগ। একদিকে সাগর দ্বীপ, অপর দিকে খেজুরী এবং হিজলী যে শক্তির অধীন থাকবে তারা শুধু বাংলা নয় - দিল্লী থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে, তাই বঙ্গোপসাগর থেকে গঙ্গার প্রবেশ দ্বারের এই দুটি দ্বীপের অবস্থান সার্মরিক এবং বার্ণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউরোপ থেকে ভারতের সমুদ্রযাত্রার পথ খুলে যেতেই এই দুই দ্বীপের অধিকার নিয়ে ক্ষমতায় আসীন মোগল এবং ক্ষমতালোভী পর্তুগীজ ও ইংবাজদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল।

১৬৮৭-৮৮ সালে জব চার্ণক ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে হিজলীতে আশ্রয় নিলে মোগল সেনাপতি আবদুল সামাদের দ্বাবা এই দ্বীপেতেই

অবরুদ্ধ হন এবং দুপক্ষের সংঘর্ষ হয় হিজলী দ্বীপে। ১৭০৩ সালের নাবিকদের, ১৭৬৯ সালের হুইট চার্চের, ১৭৭০ সালের বোল্টের এবং ১৭৮০ সালের রেনেলের মানচিত্রে খেজুরী দ্বীপ দেখা যায়। পরবর্তীকালে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়ের বিভাজক কাউখালি নদীটি ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে দুটি দ্বীপ একই ভূখণ্ডে পরিণত হয়। হিজল গাছ আর গেঁয়োর জঙ্গলে খেজুরী আর হিজলী ছিল সমাচ্ছন্ন।

''খেজুরী নাম সম্ভবতঃ খেজুর গাছের সংস্রবে সৃষ্ট হয়েছিল, তবে স্থানটি ''খেজুরী'' অপেক্ষা ''খাজুরী'' নামেই অধিক পরিচিত ছিল। বৌরী 'খেজুরী'কে 'ক্যাজুরী' (CASUREE) করেছিলেন, ১৭৫১ সালে নাবিকদেব চার্টে 'গ্যাজুরী' (GAJOURI) আছে, ১৭৬৩ সালে ভি. এন্‌ভিল্ 'ক্যাজোরী' (CAJORI) লিখেছিলেন। সেয়ারের মানচিত্রে (১৭৭৮) 'ক্যাজোরী' (CAJORI) দেখা যায়। রেনেলের ম্যাপে (১৭৮০) 'কাদ্‌জেরী' (CUDJEREE) পাওয়া যায়। এই নামগুলো 'খাজুরী'রই বৈদেশিক রূপান্তর হতে পারে। হিরোণ KEDGERYE , হেজেস্ KEGERIA, হ্যামিলটন KEDGERIE। ১৬৭৯ সালের হুগলী কুঠীর কাগজপত্রে KEDGAREE প্রভৃতি নানা রকম বানান দেখা যায়। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে KHIJURI ও KIJURI, মেদিনীপুর গেজেটিয়ারে KHEJRI এবং বেলীর সেটেলমেন্ট্ রিপোর্টে KAJOOREAR আছে। বর্তমান পোর্ট ট্রাস্ট সারভে KHAJURI করেছে। নামটি পরবর্তীকালে KHAJRI এবং পোষ্ট অফিসের নাম KEDGEREE ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটি KHEJURI এইভাবে লিখিত হয়।

ইংরেজ কুঠীসমূহের প্রথম অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেজেস খেজুরীর উপকূলে অবতরণ করে ১৬৮৩ সালের ১১ই মার্চ একটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন (দক্ষিণ থানাবেড়িয়া গ্রামে), একটি ফারসী লিপি থেকে জানা যায় ইখতিয়ার খাঁ মাটি দিয়ে এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। নবাবের সেনাপতি আবদুল সামাদের সঙ্গে জব চার্ণকের ঐ দুর্গেই যুদ্ধ হয়েছিল, ১৫৮৩ সালে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে র‍্যালফফীড লিখেছেন - 'হিজলীতে প্রচুর চাউল, কার্পাসের ন্যায় তুলাজাত বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এছাড়া চিনি, লঙ্কা, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপে রপ্তানি হইত।' ১৬২৯ সালে ফ্যানরিকের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বহু সংখ্যক বৈদেশিক বণিক এখানে বসবাস করতেন। হিজলী শহরে ও বান্‌জাতে দুটি গীর্জা ছিল। ম্যানরিকের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আরও জানা যায় যে, ১৬২৯-৩৫ সালের মধ্যে পর্তুগীজ ও মগ দাসব্যবসায়ীরা এই অঞ্চল থেকে প্রায় ১৮ হাজার মানুষকে ক্রীতদাস রূপে আরাকানে পাঠিয়েছিল। পর্তুগীজরা হিজলীকে বলতেন 'আঞ্চলিম', প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টান বাস করত খেজুরী ও হিজলী অঞ্চলে, ১৬৩৬ সালে মুঘল সম্রাট শাজাহান মগ দস্যুদের খেজুরী অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। কাজু বাদামের চাষ খেজুরী-হিজলী অঞ্চলে পর্তুগীজরাই প্রথম করেছিলেন, তাছাড়া আতা, সপেদা, কামরাঙ্গা, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি ফলফুল পর্তুগীজরাই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম এনেছিলেন। ১৫১৪ সালে প্রথমে

পর্তুগীজরা খেজুরী-হিজলী অঞ্চলে আসেন, তারপর ওলন্দাজ, ইংরাজ এবং ফরাসীরা আসেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মগ ও পর্তুগীজদের লীলাভূমি ছিল এই অঞ্চল, খেজুরী হিজলীর নিকটবর্তী ভাগীরথী মোহনার নামকরণই হয়েছিল 'Rogue's River', বা দস্যুনদী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আগত বড় বড় জাহাজগুলো বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বালেশ্বর বন্দর পর্যন্ত আসত এবং সেখান থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির জাহাজ 'স্লুপ' (Sloop) এ মালপত্র খালাস করে হুগলীর মোহনা দিয়ে সেগুলোকে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়ে সপ্তগ্রাম, বেতোড়, হুগলী, কলকাতা প্রভৃতি বন্দরে পাঠানো হত। বিশেষ করে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে বালেশ্বরের থেকে আরো নিকটবর্তী ও সুবিধাজনক স্থান হিসাবে খেজুরী নির্বাচিত হল, সম্ভবতঃ ১৭৮০ সালে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তেইশ বছর পরে খেজুরীতে একটি পোতাশ্রয় (Anchor-age) ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হল। বহু জাহাজ খেজুরী বন্দরে কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত নোঙ্গর করে থাকতে বাধ্য হত। সেজন্য এখানে ইউরোপীয় নাবিকদের, যাত্রী এবং বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিদের জন্যে আবাসগৃহ (Agent's house), বিশ্রাম গৃহ (Waiting room), টেভান, কফিহাউস, হোটেল, নাচঘর, গণিকালয়, গীর্জা, হাটবাজার, পোষ্ট অফিস গড়ে উঠল। অল্প কালের মধ্যে খেজুরী একটি জনাকীর্ণ জনপদে তথা বন্দর নগরীতে পরিণত হল। এই সময় খেজুরীতে ইউরোপীযগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এসে বসবাস করতেন, তাই খেজুরীর একটি স্থানের নাম 'সাহেব নগর' বলে পরিচিত ছিল। সাহেব নগর গ্রাম এখনও আছে, সেকালে সাহেবনগর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও উদ্যানে শোভিত হয়েছিল।

১৮১০ সালে খেজুরীর চার মাইল দক্ষিণে কাউখালিতে একটি আলোকস্তম্ভ (Light house) নির্মিত হয়। এটি ছিল পঞ্চতল-বিশিষ্ট ও এর উচ্চতা ছিল আশি ফুট, মেঘ ও কুয়াশাবর্জিত রাতে ১৫ মাইল দূর পর্যন্ত এর আলো দেখা যেত, প্রায় একশ বছর ধরে এটি থেকে আলো প্রদর্শিত হওয়ার পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে জার্মানীর 'এমডেনের' আশঙ্কায় অস্থায়ীভাবে এর আলো নির্বাপিত ছিল। কলকাতার পোর্ট কমিশনারগণের এলাকাভুক্ত আলোকস্তম্ভগুলোর মধ্যে কাউখালির আলোকস্তম্ভটি প্রাচীনতম, বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তৎকালীন ইংরাজ সরকার ঐ ঐতিহ্যবাহী আলোকস্তম্ভটিকে ডিনামাইট দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আলোকস্তম্ভের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

১৭৮৬ সালের গ্যান্ট্ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খেজুরী হিজলী অঞ্চলে প্রতি বছর আট লক্ষ মন লবণ উৎপন্ন হত, এই অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি বিরাট লবণের গোডাউন ছিল। খেজুরীতে তাঁর নিজস্ব কুঠিতে এসে তিনি মাঝেমধ্যে এই ব্যবসা দেখাশুনো করতেন, ১৮৩০ সালের ১০ই নভেম্বর রাজা রামমোহন রায় তাঁর পালিত পুত্র রাজারাম, রামহরিদাস ও ভৃত্য শেখ

বক্সকে সঙ্গে নিয়ে এই খেজুরী বন্দর থেকে 'আলবিয়ান' নামক জাহাজ করে বিলেত যাত্রা করেছিলেন।

খেজুরী বন্দর থেকে সমগ্র পূর্ব ভারতে বিদেশী ডাক প্রেরনের ব্যবস্থা ছিল. প্রকৃতপক্ষে খেজুরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল ইউরোপ থেকে আগত সংবাদ বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে, তখনো পর্যন্ত টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হয়নি. ইউরোপ থেকে বিভিন্ন সংবাদ ও চিঠিপত্র জাহাজে খেজুরীতে আসত এবং তা খেজুরী থেকে কলকাতাতে এবং পূর্ব ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হত, কলকাতার ইংরাজ অধিবাসীরা দেশের খবর জানবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত। এই সব সংবাদের মধ্যে থাকত ইউরোপ থেকে আগত মালের অর্ডারপত্র, এর ফলে প্রতিটি জাহাজ আসা মাত্র কলকাতার বাজারে জিনিসপত্রের দাম উঠানামা করত। এইসব সংবাদ প্রেরনের জন্য প্রত্যহ খেজুরী থেকে নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থানে ডাক যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল, আর এই সংবাদ আগেভাগে ছাপার জন্যে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এই সব সংবাদের শুধু ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক নয়, রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ছিল খুব বেশী। এইসব চিঠিপত্র এবং সংবাদ পাঠানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যই খেজুরীতে ইতিহাস বিখ্যাত পোষ্টঅফিসটি স্থাপিত হয়েছিল। কোম্পানীর আমলে খেজুরীর নদীপথে নৌদস্যুর উৎপাত প্রায়ই ঘটত, তাই কোম্পানী ভাগীরতী মোহনার পথে স্থানে স্থানে গার্ড-বোট বা চৌকি নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সংবাদ নিরাপদে অথচ দ্রুতগতিতে কলকাতাতে পাঠাবার জন্য অধুনালুপ্ত এক অভিনব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল - তা হল সেমাফোর (Semaphorc) বা সাঙ্কেতিক অক্ষর দিয়ে সংবাদ পাঠানো, সংবাদ প্রেরনের জন্য কিছু দুব অন্তর মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল - তার উপর একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে হাত কিম্বা পতাকা বিভিন্ন ভঙ্গিতে সঞ্চালিত করে সাঙ্কেতিক চিহ্নের মারফৎ সংবাদ দূরত্বে অবস্থিত অন্য এক মঞ্চের উপর মানুষের কাছে পাঠাতো। টেলিস্কোপের সাহায্যে একে অন্যের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলো লক্ষ্য করত। পতাকা এবং হাতের ভঙ্গির দ্বারা ইংরাজী বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হত। এখনো কলকাতা থেকে খেজুরীর পথে বড়ুলধ্বজা এবং হুগলী পয়েন্টের নিকট এইসব মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বি.টি. রোডের মুখচর, চিঁড়িয়ামোড়, শিয়ালদা, হাওড়া, হুগলী এবং বাঁকুড়াতে এই ধরনের মঞ্চগুলো এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতে বর্তমান। এইভাবে সেকালে সংবাদ পাঠানো হত, আর এই সংবাদ প্রেরণের প্রধান কেন্দ্র ছিল খেজুরী। ১৮৫১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ও'শাগনেশী(Dr. W.B. O'shaelghnessey)Galvanoscope যন্ত্রের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তিনি কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার, সেখান থেকে কুঁকড়াহাটী হয়ে খেজুরী পর্যন্ত ৮২ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের অনুমতি পান, এইভাবে ১৮৫২ সালে খেজুরীতে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ কেন্দ্র স্থাপিত হল। এই সম্পর্কে তৎকালীন

পত্রিকা "সমাচার দর্পনে" ১৮৫১ সালের ১৮ই অক্টোবর শনিবার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা হল "খেজুরী হইতে চাঁদ পাল ঘাট পর্যন্ত অর্থাৎ চৌত্রিশ ক্রোশ বিদ্যুতীয় টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত হইয়াছে, আগামী মাসে ১৩ তারিখ অবধি তাহার কার্য্য চলিবেক। ঐ তার নদীর স্রোতের নীচে বসানো গিয়েছে তাদ্দারা খেজুরীর সম্বাদ এক মিনিটের মধ্যে ঐ কলিকাতার পৌছাইবেক। যদি উক্ত পথের দ্বিগুনও হইত তবু উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ সম্বাদ পাওয়া যাইত, যেহেতু বিদ্যুৎ যেমন বেগে চলে তেমন ঐ তারের দ্বারাও সম্বাদ চলিবেক"।

খেজুরীর এই সমৃদ্ধি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি এর প্রথম কারণ গঙ্গার নাব্য পশ্চিম তীর থেকে পূর্বতীরে অপসারণ এবং দ্বিতীয় কারণ ড্রেজিং এর ফলে গঙ্গার নাব্যতার উন্নতির জন্য সমুদ্রগামী জাহাজের কলকাতা পর্যন্ত বরাবর পৌছবার ব্যবস্থা। এর ফলে এখানে যাত্রী ও মালের জাহাজ পবিবর্তনের প্রয়োজন দূর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই বন্দর শহরের ধ্বংসেব প্রধান কারণ সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা, খেজুরী বন্দর এবং তার সন্নিকটে গড়ে ওঠা বিদেশীদের আবাসনগুলো উপর্যুপরি ১৮০৭, ১৮২৩, ১৮৩১, ১৮৩৩ সালের সামুদ্রিক ঝড়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৪ সালের ঝড় ও জলপ্লাবনে এই বন্দর শহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছিল, এই বন্দরের অধিকাংশই হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর গ্রাস করে নিয়েছিল। ১৮২৩ সালের ২৭ মে তারিখের ঝড়ে জলোচ্ছ্বাস হয়ে বহু ঘরবাড়ি ও মানুষ ভেসে যায়। ঝড়ের তীব্র বেগে জাহাজের যাতায়াতের পথে সমস্ত 'বয়া' (Buoy), মরিশাসগামী 'লিভারপুল', দক্ষিন আমেরিকাগামী 'হেলেন', 'ওরক্যাবেসা', কটকগামী 'কটক' প্রভৃতি বৃহৎ জাহাজগুলো খেজুরীর নিকটবর্তী চরে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসে এই অঞ্চলের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ মারা যায়। ঐ ঝড়ে খেজুরীর ইউরোপীয় পোষ্টমাস্টার মিঃ পাটেল্‌হো প্রাণ হারান।

এখন খেজুরীর সাবেক অট্টালিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাকবাংলো যা বর্তমানে সেচবিভাগের ডাকবাংলো রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে; আর অপরটি হল খেজুরীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ পোষ্ট অফিস, এবং একটি সমাধিক্ষেত্র। পোষ্ট অফিসটি বহুকাল খেজুরীর পোষ্ট অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর সংস্কারের অভাবে বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। পোষ্ট-অফিসের দোতলাতে যে উঁচু গৃহটি আছে তাতেই তৎকালিন টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি স্থাপিত ছিল, ঐ গৃহে একটা দূরবীনও ছিল। পোষ্টমাষ্টার ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংকেত পাঠাতেন। এখানে একটি সেমাফোর মঞ্চের ধ্বংসাবশেষও আছে, সমাধিক্ষেত্রটি পোষ্টঅফিসের পেছনে এবং ডাকবাংলোর সম্মুখে, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হলেও সুরক্ষিত নয়, অধিকাংশ কবরের মার্বেল ফলকই অপহৃত হয়েছে, এখানে মোট ৩৩টি সমাধি আছে। এর প্রথম সমাধিটি ছিল ১৮০০ সালে মৃত এক নাবিকের। সর্বশেষ সমাধিটির তারিখ ১৮৬৫ সাল। তারপর ঐ

সমাধি ক্ষেত্রে আর কোন দেহ সমাহিত করা হয়নি, এই সমাধি ক্ষেত্রে ভাগলপুরের তৎকালীন ম্যজিষ্ট্রেট চামার সাহেবের, সিভিলিয়ান বার্লো সাহেবের এবং ডাক্তার ফরবেস সাহেবের সমাধি, তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার কাটেলহো, পত্নী মেরী এবং পুত্র ইউজিনকে একত্রে সমাহিত করা হয়। এছাড়া রয়েছে দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ড ম্যাকসওয়েলের স্ত্রী এমিলিয়ার, কুমারী সারলটী অ্যানি-মিডলসেকসবাসী রেভারেন্ড টমাস ব্রাকেনের কন্যার সমাধি, সর্বশেষ সমাধিটি খেজুরীর পূর্ত বিভাগের তৎকালীন সুপারভাইজার এমোস ও য়েষ্ট সাহেবের (১০ অক্টোবর ১৮৬৫), কতকগুলি সমাধিলিপি এতই মর্মস্পর্শী যে, পাঠ করলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না।

খেজুরীর যে স্থানটিতে তৎকালীন বাজার বসত, তার উপরেই বর্তমানে অনুকূলের আশ্রম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমানে খেজুরীর পূর্বপ্রান্তে নদীতে যে চর দেখা যায়, তার মধ্যেই বন্দর শহর খেজুরীর বিরাট সব অট্টালিকা, হাটবাজার, হোটেল, টেভার্ণ, কফিখানা, নাচঘর, গণিকালয় প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। খেজুরীর গৌরব আজ বিলুপ্ত - মুক ইতিহাস তার একমাত্র স্বাক্ষী।

খেজুরীতে 'হালাম শাহের দীঘি'' নামক একটি প্রকাণ্ড আয়তনের সরোবর বর্তমান। এর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই দীঘি ''হালাম শাহ'' নামে কোন ব্যক্তির খনিত, নাকি এর নাম 'আলম সায়র'' (সাগর) দীঘি না জানা যায় না। তবে খেজুরীর জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে লেফটনান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক গ্রীষ্মে খেজুরী ভ্রমন করতে গিয়ে বলেন যে, খেজুরীর জলবায়ু ওয়ালটেয়ারের চেয়েও স্বাস্থ্যকর।

খেজুরী থানার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে আছে কলাগেছিয়া গ্রামে অবস্থিত অষ্টাদশ শতকে তৈরী ভীমেশ্বরের মন্দির, সমতল ছাদযুক্ত এবং ২২ ফুট উঁচু। দামোদর চকের নীলকুমারীর মন্দির যা উনবিংশ শতকের শেষভাগে তৈরী, চৌদ্দতুলির লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির এবং জনকার কালীমন্দির।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলা যখন উত্তাল তখন মেদিনীপুর জেলা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল, আর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খেজুরী থানা এক অগ্রণী ভূমিকাতে আসীন ছিল, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী বয়কট আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারতছাড়ো, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে খেজুরী থানার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। বিখ্যাত 'লবণ সত্যাগ্রহ' খেজুরী হিজলীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এক সময়ে ''স্বাধীন খেজুরী সাধারণতন্ত্র'' গড়ে উঠেছিল। এর সভাপতি ছিলেন পূর্ণেন্দু শেখর ভৌমিক, বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের নেতৃত্বে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী খেজুরী থানাতে সংগঠিত হয়েছিলেন। খেজুরী থানার অন্তর্গত কলাগেছিয়া গ্রামে ১৯২১ সালে এক জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তী পর্বে কলাগেছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত হয় এবং

মেদিনীপুর জেলার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মধ্যে যা উল্লেখযোগ্য, উক্ত জাতীয় বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলন ঐ অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছিল, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং চারণকবি মুকুন্দ দাস উক্ত জাতীয় বিদ্যালয়ে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, হাজার হাজার মানুষ খেজুরী থানাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন - নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, জগদীশ চন্দ্র মাইতি, গিরিশচন্দ্র মাইতি, অহল্যা মাইতি, আভা মাইতি, বসন্ত কুমার দাস, মহেন্দ্র করণ, সত্যভামা দাস, শশীভূষণ ভৌমিক, পঞ্চানন প্রধান, হিমাংশু কুমার সামন্ত, রমেশ সেন, অতুলচন্দ্র মেইকাফ, হরিহর মাইতি, চিরঞ্জীব মাইতি, সৃষ্টিধর দাস, নগেন্দ্রনাথ বেরা প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ।

ভারতবর্ষে বহু বিদ্রোহের তথা গণ আন্দোলনের কথা ইতিহাসে বহু চর্চিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার খেজুরী হিজলী অঞ্চলের 'মলঙ্গী বিদ্রোহ' এক ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনের রূপ নিলেও ঐতিহাসিকরা এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন নি। মলঙ্গীরা মূলত দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষ, যাদের পেশা ছিল লবণ প্রস্তুত করা, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল সল্ট কমিটির বিরুদ্ধে বহু প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রায় ৫০০ মলঙ্গী সংঘবদ্ধ হয়ে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ খেজুরী হিজলী ছাড়িয়ে বীরকুল, বালিসাই, মীরগোদা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরা একটি 'সঙ্কট' কমিটি গঠন করেছিলেন, রামু দীন্ডা, ভগবান মাইতি, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু, ও বৈষ্ণব ভূএ্যা এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বীরকুলের মলঙ্গীরা বলাই কুণ্ডুর নেতৃত্বে একটি আবেদন পত্র কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। মলঙ্গীদের লবণের মূল্য উপযুক্ত পরিমানে বৃদ্ধি, বেগার ও ভেট্ প্রথা রহিত প্রভৃতি দাবী উত্থাপন করা হলে ও এর কোন প্রতিকার হয় নি। দীর্ঘ আন্দোলন চলতে থাকলেও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সমানভাবে শোষণ ও শাসন চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮০৪ সালে পরমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে মলঙ্গীরা সংঘবদ্ধ হন এবং ব্যাপক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, কাঁথির মহকুমা শাসক ফারকুহারসন্ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি. টমাস কেইন্সের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, মলঙ্গীরা দলবদ্ধ ভাবে কাঁথির ইংরেজে লবণ এজেন্টের কাছারী ঘেরাও করেন। এজেন্ট সাহেবের পাইকরা পরমানন্দ সরকারকে গ্রেপ্তার করে এবং এর ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, এজেন্টগণ সাহেব মলঙ্গীদের দাবীগুলি মেনে নেওযার প্রতিশ্রুতি দিযে এই বিদ্রোহকে শান্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে দরিদ্র মলঙ্গীদের কয়েক বছরব্যাপী এই আন্দোলনে কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার সত্বেও সংঘবদ্ধতা ও সাহসিকতা উপেক্ষণীয় ছিল না।

যে খেজুরীর এককালে এত বৈভব ছিল দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকে মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে উপেক্ষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে খেজুরী অন্যতম। যেখানে ভারতের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আজ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুত পৌঁছোয়নি, রাস্তাঘাট

অনুন্নত, ভালো হাসপাতাল নেই, দীর্ঘদিন পরে সবেমাত্র একটা কলেজ গড়ে উঠেছে, খেজুরী একটা সুন্দর ভ্রমণ কেন্দ্র হতে পারত, হতে পারত ওয়ালটেয়ারের মতই স্বাস্থ্যকর স্থান, কিন্তু আজও সেখানে দূরপাল্লার সরকারী বাস পর্যন্ত চলে না. সম্প্রতি খেজুরীর নিকটবর্তী স্থান শীলাবেড়িয়াতে একটা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার সরকারী পরিকল্পনা চলছে; কিন্তু সেটা কেন খেজুরীতে নয় তা বোধগম্য হয় না! পোষ্টমাস্টার জেনারেল খেজুরী ঘুরে এলেও যেখানে দেড়শ বছর আগে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যোগযোগ মন্ত্রক আজও সেখানে কিছু করার কথা ভাবছেন কিনা জানা নেই। তাই ইতিহাস বিখ্যাত খেজুরী আজ অবহেলিত, নির্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল মূক ইতিহাসের স্বাক্ষী মাত্র।।

সূত্রনির্দেশ

১. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য- স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর।

২. প্রবোধ কুমার ভৌমিক- মেদিনীপুর কাহিনী।

৩. প্রবোধ চন্দ্র বসু - এই আমাদের কাঁথি।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত - সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড)

৫. বসন্ত কুমার দাস - স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর।

৬. বসন্ত কুমার দাস - মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম খেজুরী থানা।

৭. বিনয় ঘোষ - পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

৮. ভারতের আদি টেলিগ্রাফ কেন্দ্র ঃ ভুপেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১.০২.৭১.

৯. মহাদেব ঘোষ - সুক্ষভূমির বন্দরমালা ও আধুনিকতা,

১০. মহেন্দ্র নাথ করণ - খেজুরী বন্দর,

১১ মহেন্দ্র নাথ করণ - হিজলীর মসনদ-ই- আলা।

১২. যোগেশ চন্দ্র বসু - মেদিনী পুরের ইতিহাস।

১৩. সুশীল কুমার ঘোষ - কাঁথির পুরাবৃত্ত।

১৪. Bengal District Gazetters (Midnapore) - 1911, L S.S. O' Malley, P. 134.

১৫. Bengal : Past and Present, vol. II, XII.

১৬. Blochman's contributions to the Geography and History of Bengal.

১৭. Bowrey - Countries Round the Bay of Bengal P. 209

১৮. Hamilton - East India Gazetter. 1815.

১৯. Hedge's Diary, vol. III, P 208

২০. H. Sanderson's Selections from Calcutta Gazette. vol. IV, P. 7 1.

২১. Human source : (i). Kalikrishna Ghosh & (ii) Kusudwaj Patra of Khejure.

২২. Hunter's S.A.B. vol. III, P. 117-118, 120-133.

২৩. Hunter, W.W. - History of British India, vol. II, P. 258.

২৪. India Gazette, Aug, 13. 1807.

২৫. Midnapore District Gazetter. P-9.

রায়বাঘিনী ভবশঙ্করীদেবী - ইতিহাসে উপেক্ষিতা একনারী

শুভ্রাংশু রায়

ভারতে নির্মিত ইতিহাস রচনার কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই। পার্শ্ববর্তী দেশ চীনে কয়েকশো বছরের নিরবচ্ছিন্ন নির্মিত ইতিহাসের ধারা থাকলেও ভারতবর্ষে আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। প্রাচীন ভারতে অতি সামান্য কয়েকটি ঐতিহাসিক রচনা আমরা পাই যার অধিকাংশই রাজন্যবর্গ ও তার পারিবারবৃন্দের কীর্তি, গৌরবগাথা প্রচার করে সাধারণ মানুষের সেই ইতিহাসে কোন স্থান ছিল না। পরবর্তী সময়ে, মধ্যযুগে নির্মিত ইতিহাসের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেও হাতে গোনা কয়েকটি রচনা ছাড়া এই ইতিহাস রচনার চরিত্রের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। উপনিবেশিক আমলে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই ইতিহাস রচনার ধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে এবং আংশিক অর্থে হলেও ইতিহাসের পাতায় ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের চিত্র স্থান পায়। কিন্তু তাসত্বেও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা সেইভাবে গুরুত্ব পায়নি। স্বাধীনোত্তর কালের প্রথম কয়েক দশকে এই ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমানে অবশ্য আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা গুরুত্ব পাচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভদিক। আর এই আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ঘটনা বা চরিত্র উঠে আসছে যেগুলি বা যাদের ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইতিহাস তাদের সম্পর্কে নীরব। এই প্রবন্ধের যিনি মধ্যমণি 'রায়বাঘিনী' ভবশঙ্করী দেবী ইতিহাসে উপেক্ষিতা এরকমই এক নারী চরিত্র। ষোড়শ শতকে দামোদরের দুইপাড়ে হাওড়া-হুগলী তথা বর্ধমানের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ভুরশুট রাজ্যের রায় রাজবংশের এই রাণীর উপস্থিতি স্থানীয় এলাকার কাহিনী কিংবদন্তী, জনশ্রুতি গল্পে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ করা গেলেও কোনও ইতিহাসের পাতায় সম্পূর্ন উপেক্ষিতা রয়ে গেছেন। ঐতিহাসিক বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের 'হাওড়া-হুগলীর ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে দামোদরকে কেন্দ্র করে তার উভয় তীরে হাওড়া-হুগলী তথা বর্ধমান জেলার কিছু অংশকে নিয়ে এক রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল যার নাম ভুরশুট। বিধুবাবুর মতানুসারে ভুরি-শ্রেষ্ঠ থেকে কালক্রমে অপভ্রংশে রাজ্যের নাম ভুরশুট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে। প্রথমদিকে এই রাজ্যের রাজারা ধীবর বা কৈবর্ত জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ব্রাহ্মণ রায়বংশ এই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে। প্রখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই রাজবংশেরই সন্তান ছিলেন। তিনি "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের এক জায়গায় লিখছেন

"ভুর্শুট মহাকায় নৃপতিচন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।।"

এই রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়ে বিধুবাবুর "রায়বাঘিনী" গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের রচনাতেও এই রাজত্বের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীর মসনদে তখন মুঘল সম্রাট আকবর আসীন; দিল্লীর মসনদ দখলের লড়াইয়ে ক্রমশ কোণঠাসা আফগানদের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বঙ্গদেশ। এখান থেকেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পুনরায় ভারতে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন তারা দেখছিল, অন্যদিকে মুঘলরা তাদের সেই সুযোগ দিতে একদম নারাজ ছিলো। ফলে তৎকালীন সময়ে বঙ্গদেশ হয়ে উঠেছিল ক্ষমতা দখলের কেন্দ্রবিন্দু। ভুর্শুট রাজ্যের মধ্যদিয়ে যে রাস্তাটি ছিল বর্তমানে যার নাম অহল্যা বাঈ রোড, সেটিই ছিল বহির্বাংলার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। ফলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভুর্শুটের ভৌগোলিক অবস্থান তৎকালীন উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভুর্শুটের রাজা ছিলেন 'মহারাজা' রুদ্রনারায়ণ রায়। এই রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী ছিলেন রাণী ভবশঙ্করী দেবী; এই প্রবন্ধের মূল চরিত্র। হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রামের রাজবল্লভী মন্দিরে রুদ্রনারায়ণ ও ভবশঙ্করী দেবী পরস্পরের সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আজও অস্তিত্বমান ঐ মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নির্মিত 'রাজবল্লভী মন্দিরের ইতিবৃত্ত'-এ এই বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ রচনায় ভবশঙ্করীকে এক সামন্ত কন্যা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর প্রথম জীবনের কিছু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। ঐ বিবরণ অনুযায়ী ভবশঙ্করী দেবী ছিলেন ভুর্শুট রাজের এক সামন্ত সর্দার দীননাথের কন্যা। দীননাথের স্ত্রী দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে কার্যত মাতৃহারা শিশুপুত্রকে ধাইমার তত্ত্বাবধানে রেখে দীননাথ তার বালিকা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেন। দীননাথের সাহচর্য ভবশঙ্করীকে অশ্বারোহণ, তরবারী চালনা ইত্যাদিতে পারদর্শী করে তোলে। বিধুভূষণ ভট্টাচার্যও ভবশঙ্করীদেবীকে "সামন্ত সর্দার দীননাথের কন্যা" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া স্থানীয় এলাকায় মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত নানা ব্রতকথায় রাণী ভবশঙ্করীকে 'দীননাথ কন্যা' হিসেবে উল্লেখ করার নজীর রয়েছে। যাইহোক সামন্ত কন্যা ভবশঙ্করী কিভাবে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হলেন সেই সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদিন রাজা রুদ্রনারায়ণ যখন নৌকা সহযোগে দামোদর নদী দিয়ে তাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি হঠাৎ দেখেন যে এক তরুণী তরবারী হাতে একাই দুটি বুনো মহিষের সঙ্গে লড়াই করছে। এই দৃশ্য রাজাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে এবং তিনি দ্রুত মাঝিকে নৌকা পাড়ে ভেড়াতে নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখেন দু'টি মহিষই তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে। বিস্মিত রাজা তরুণীর

কাছে তার পরিচয় জানতে চান এবং তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকেই বিবাহ করার মনস্থির করেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। মন্ত্রীকে দিয়ে পিতা দীননাথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং দীননাথের সম্মতিতে এক পূর্ণিমার রাতে রাজবল্লভী মন্দিরে ভবশঙ্করীর সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হন। সামন্ত সর্দার কন্যা ভবশঙ্করী 'রাণী ভবশঙ্করী দেবী' হিসেবে পরিচিত হলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাণী ভবশঙ্করী দেবীর প্রাক-বৈবাহিক জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর স্বপক্ষে সেই অর্থে এখনও পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে স্থানীয় এলাকার নানা জনশ্রুতি কাহিনী কিংবদন্তীতে এই কাহিনীর স্বপক্ষে নানা তথ্য মেলে। সর্বোপরি যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাণী ভবশঙ্করীর উপর নির্মিত গ্রন্থের একমাত্র গ্রন্থকার বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় মোটামুটিভাবে ভবশঙ্করী দেবীর কুমারী জীবনের প্রায়ই একই বিবরণ দিয়েছেন। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে এই দম্পতি এক পুত্রসন্তান লাভ করেন যার নাম রাখা হয় প্রতাপনারায়ণ। পুত্রের জন্ম উপলক্ষে কয়েক হাজার মানুষকে রাজা তিনদিন ধরে ভোজন করান এবং নানা সামগ্রি দান করেন। কিন্তু এই খুশির দিন বেশিদিন রইলো না কেননা এর অল্প কিছুদিন পরেই রাজা দেহত্যাগ করেন।

বিধুবাবুর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে স্বামীর মৃত্যু ভবশঙ্করী দেবীকে মানসিকভাবে দারুণ আঘাত করে এবং তিনি কার্যত রুদ্রনারায়ণের ভাই উদয়নারায়ণ, যার নামে বর্তমানে হাওড়া জেলায় উদয়নারায়ণপুর নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম রয়েছে, মন্ত্রী তথা প্রবীণ সেনাপতিদের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে নিজে পূজা অর্চ্চনা নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তারই নির্দেশে বর্তমান হরিপাল থানার অন্তর্গত বাসুরি গ্রামে ভবানী মায়ের মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানেও এই মন্দিরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়।

এদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসে অন্যদিক থেকে। বঙ্গদেশের পাশ্ববর্তী উড়িষ্যায় তখনও আফগান সামন্ত সেনাপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত কালে বাংলার অধিপতিদের উৎকোচ অথবা ভয় দেখিয়ে আফগানরা নিজপক্ষে আনার চেষ্টা চালাতো। বাংলার সঙ্গে বহির্বাংলায় সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ভুর্শুটের প্রতি আফগান সেনাপতিদের অনেকদিন ধরে নজর ছিলো। আফগান সর্দার ওসমান খাঁ একাধিকবার অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে মিত্রতার প্রস্তাব দিলেও রুদ্রনারায়ণ তাকে খুব একটা পাত্তা দেননি। এখন রাজার মৃত্যুর সংবাদ ওসমান খাঁর সামনে ভুর্শুট দমনের সুযোগ এনে দেয় এবং তিনি সেইমত পরিকল্পনা শুরু করেন। এরজন্য ওসমান খাঁ একাধিক গুপ্তচর নিয়োগ করেন এবং তাদের থেকে তিনি খবর পান যে প্রতি অমাবস্যার রাতে রাণী ভবশঙ্করী দেবী বাসুরির ভবানী মন্দিরে কয়েকজন সহচরী তথা গুটি কয়েক দেহরক্ষীকে নিয়ে পূজো করতে আসেন। ওসমান কৌশলে রাণীকে অপহরণ করে ভুর্শুট দখলের পরিকল্পনা করেন। সেইমত উড়িষ্যা থেকে কয়েকশো দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভুর্শুটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দিনের বেলায় জঙ্গলে আত্মগোপন করে, রাতে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধীরে তারা বাসুরির পাশ্ববর্তী গোপিনাথপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হন।

অবশেষে আসে সেই প্রতীক্ষিত দিন। বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের 'রায়-বাঘিনী' গ্রন্থেব বিবরণ অনুযায়ী অমাবস্যাব গভীব অন্ধকাব ভেদ করে কয়েকশো অশ্বারোহী বাহিনী মন্দির ঘিরে ফেলে। বিপদ দেখে রাণীর দেহরক্ষীবা শিঙা ফুকে দেন। ওসমান খান সম্ভবত জানতেন না যে নিকটস্থ ছাওনাপুর গ্রামে বাণীর একটি ভূগর্ভস্থ দুর্গ ছিল যেখানে সবসময়ে কিছু সৈনিক উপস্থিত থাকতো। বিপদের সঙ্কেত পেয়ে বাণীর সৈন্যদল মন্দিব প্রাঙ্গণে হাজির হয় এবং আফগান সেনাদেব সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। বিধুবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে আফগান সর্দার ওসমান খাঁ উদ্ধত তরবাবী হাতে মন্দিবেব অভ্যন্তবে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে মবীয়া ভবশঙ্করী দেবী ভবানী মূর্তির হাত থেকে খাঁড়া খুলে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ওসমানকে বাধা দেন। বেশ কিছুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধ চলার পর ওসমান খাঁ পিছু হটতে বাধ্য হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁর লেখায় এই দ্বৈতযুদ্ধেব কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী রাণী একাই ওসমান খাঁর নেতৃত্বাধীন সমগ্র বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। খুব সম্ভবত এই জনশ্রুতির সঙ্গে অতিরঞ্জনেব মিশ্রণ ঘটেছে কেননা মন্দিরের প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত হওয়ায় একই সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির মন্দিরে প্রবেশ অসম্ভব ছিল। তাই এক্ষেত্রে বিধুভূষণবাবুর লেখাকেই অনেক বেশি বাস্তবিক বলে মনে হয়।

আর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাসুরি গ্রামের পার্শ্ববর্তী এক বিদ্যালয়ের জনৈক উৎসাহী ইতিহাস শিক্ষক নিজ উদ্যোগে ছাওনাপুরের যে জায়াগায় দুর্গ আছে বলে কথিত ছিল সেই স্থানে খননকার্য চালান এবং সেই স্থান থেকে বেশকিছু পুরানো অস্ত্রশস্ত্র, কামানের ভগ্নাংশ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। ঐ এলাকার বহুমানুষ এব সাক্ষী আছেন এবং ঐ খননকার্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল, কমা-মাণ্ডি নামে জনৈক সত্তর অতিক্রান্ত সাঁওতাল দীনমজুরের স্মৃতি চারণা অনুযায়ী খননকার্যের ফলে উদ্ধারপ্রাপ্ত জিনিসগুলি গ্রামবাসীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্দিরের পুরোহিত 'বামুন ঠাকুর'এর বাড়ীতে রাখা হয়। অবিবাহিত ব্রাহ্মণ বেশ কয়েক বছর আগে দেহত্যাগ করায় খননকার্যেব ফলে প্রাপ্ত জিনিসগুলির সন্ধান এই প্রবন্ধকার এখনও পাননি।

যাইহোক ভবশঙ্করী দেবীর এই বীরত্বের কাহিনী ক্রমশ দেশ থেকে দেশান্তরে লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট আকববের কানে গিয়ে তা পৌঁছায় এবং তিনি রাজা মানসিংহের মাধ্যমে রাণী ভবশঙ্করীদেবীকে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কাব ও স্বীকৃতি স্বরূপ একটি স্বর্ণ তরবারী, একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং দুটি হাতি প্রদান করেন এবং তাঁকে 'রায়বাঘিনী' খেতাবে ভূষিত করেন। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা ছাড়া স্থানীয় রায়চৌধুরী বাড়ীর প্রায় দুশো বছর পুরানো দলিলে যাদের ভবানী মন্দিরে সম্পত্তি দান রয়েছে আকবর কর্তৃক ভবশঙ্করী দেবীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এহেন মহীয়সী নারীব ইতিহাসের পাতায় কোন স্থান নেই। অথচ স্থানীয় সাহিত্য, কাহিনী, কিংবদন্তী, জনশ্রুতিতে তাঁর উপস্থিতি প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ কবা যায়। দীর্ঘদিনের অবহেলা, উপেক্ষা তাঁর জীবনকাহিনীর উপর কল্পনা আর অতিরঞ্জনেব এক গভীব আস্তরণ ফেলে দিয়েছে। এমত অবস্থায় আমাদেব কর্তব্য 'কাহিনী কিংবদন্তীর বেড়াজাল' থেকে মুক্ত করে ভবশঙ্করী দেবীর প্রকৃত জীবনবৃত্তান্তকে পুনরুদ্ধার করা এবং ইতিহাসে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া।

(এই প্রবন্ধটি রচনার জন্য বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের লিখিত 'হাওড়া-হুগলীর ইতিহাস' 'রায়বাঘিনী'. গ্রন্থ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত রায়বাঘিনী গ্রন্থের মুখবন্ধ, ছাড়াও স্থানীয় অঞ্চলের এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, নানা সাহিত্যকর্ম, প্রচলিত জনশ্রুতি এবং সর্বোপরি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।)

ফ্লরেন্স নাইটিংগেল ও ভারতবর্ষ

ঝরনা গোরলে

প্রদীপ হাতে মুমূর্ষু সৈনিকেব শয্যাপাশে দাঁড়ানো ফ্লবেন্স নাইটিংগেলের ছবির সাথে পরিচয় নেই এমন লোক কমই। ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রাইমিযার যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষাব ক্ষেত্রে ফ্লবেন্সের অবদানের কথা সবাই জানেন। কিন্তু ভাবত ও ভারতীযদের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ইংবেজ মহিলার যে অসাধাবণ উৎসাহ ও সমবেদনা ছিল, ভারতেব রায়তদের জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ভাবতেব বাযতী আইনের সংস্কার, পূর্ত ও সেচব্যবস্থার পরিবর্তন, গ্রামীণ জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যেব উন্নতি, তাদেব পবিবেশ দূষণমুক্ত করাব জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন অনেকেই সেকথা জানেন না। ১৮৫৭ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ ৩৭ বছর ফ্লরেন্স ভাবতের হিতার্থে কাজ করেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদী অনুদারতার কথা স্মরণ করলে ভারত সম্পর্কে ফ্লরেন্সের এই সংবেদনশীল আচবণ বিস্ময়েব সৃষ্টি করে। লন্ডনে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে অসংখ্য চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত কাগজপত্র, রিপোর্ট, বই ও লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে ফ্লবেন্সের কাজের হদিশ ও তথ্য।[১]

ভারতের প্রতি ফ্লরেন্সেব দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়। এই বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে ভাবতে ব্রিটিশ সৈন্যের ভয়াবহ মৃত্যুহাব ও সেনা ব্যারাকগুলির অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তাঁব নজরে আসে। তিনি উপলব্ধি করেন যে বিদ্রোহে যত না সৈন্যের মৃত্যু ঘটে, তার চাইতে অনেক বেশী মৃত্যু ঘটে কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস আর আন্ত্রিক রোগে। বিশুদ্ধ পানীয় জলেব অভাব, পবিবেশের অপরিচ্ছন্নতা, হাসপাতালগুলিব অব্যবস্থা, নার্সের অভাব এই সব নানা কারণে ভাবতে ব্রিটিশ সৈন্যের মৃত্যুহাব দাঁড়িয়ে ছিল বছরে প্রায় হাজাবে ঊনসত্তোর জন। এই পবিস্থিতিব অনুসন্ধানেব জন্য ফ্লরেন্সেব উদ্যোগে ১৮৫৯ সালে এক বয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়।[২] এই কমিশনের সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট লেখার দায়িত্ব পড়ে ফ্লরেন্সের ওপর। এই কাজটি করতে গিযেই ফ্লরেন্স সর্বপ্রথম ভারতীয়দেব দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থা, তাদের দাবিদ্র, মহামারীতে তাদের মৃত্যু, জমিদার ও মহাজনদের হাতে তাদের নিগ্রহ এই সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন। যদিও বযাল কমিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ছিল ব্রিটিশসৈন্যদেব স্বাস্থ্যেব উন্নতি, ফ্লরেন্সের চাপে পড়ে বেসামরিক ভাবতীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ দূষণ দূর কবাব সিদ্ধান্তও নেওযা হয়। ফ্লরেন্সেব নজরও ক্রমশঃ ব্রিটিশ সৈন্যদেব থেকে ভারতের সাধাবণ লোকদেব দিকে সবে যায়।

১৮২০-এ ভিক্টোরীয় ব্রিটেনের এক উচ্চবিত্ত পরিবারে ফ্লরেন্সের জন্ম। পারিবারিক সূত্রেই বহু ক্ষমতাশালী নামকরা ব্যক্তির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ক্রাইমিয়ায় যে সুনাম তিনি অর্জন করেছিলেন তাও তাকে প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিল। তার ওপর তিনি ছিলেন সুনিপুণ লেখিকা, তার কলমের ধার ছিল তরবারীর থেকেও তীক্ষ্ণ। ভারতের হিতার্থে যুদ্ধ দপ্তর এবং ভারত দপ্তরে অথবা ভারতসচিব এবং বড়লাটদের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও ক্ষমতা দুই তার ছিল। তিনি সে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারও করেছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ শুচিকরণে ফ্লরেন্স ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তার জ্ঞানের পরিধি, কর্মক্ষমতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক, তৎকালীন ব্রিটেনে কেউ-ই ছিলেন না। বড়লাট এবং ভারত সচিবরা বার বার ফ্লরেন্সের পরামর্শ চেয়েছেন, বার বার তাকে রিপোর্ট লেখার অনুরোধ করেছেন। ১৮৬৪ সালে বড়লাট জন লরেন্সের শাসনকালে ভারতে যে স্যানিটারি কমিশন গঠিত হয়েছিল ফ্লরেন্স ছিলেন তার জন্মদাত্রী। রয়াল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে সেনাব্যারাকগুলির উন্নতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আবর্জনা নিষ্কাশন, পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলির উন্নতির জন্য এই স্যানিটারী কমিশন কাজে নামেন। কিভাবে কাজ হবে তার নির্দেশ দেন ফ্লরেন্স। লরেন্স এবং ফ্লরেন্সের মাঝে এই নিয়ে অসংখ্য চিঠির বিনিময় হয়েছে, মতান্তরও হয়েছে।[৩] কাজে নেমে ফ্লরেন্স অবশ্য অচিরেই বুঝতে পারেন যে ব্রিটিশ সৈন্যদের হিতার্থে যত সহজে কাজ করা সম্ভব, ভারতীয়দের জন্য তত সহজে সম্ভব না। ব্রিটিশ প্রশাসকরা নিজ অক্ষমতা ও ঔদাসীন্য ঢাকার জন্য ভারতীয় নির্লিপ্তিকে দোষারোপ করেন। রাজ তহবিলে ঘাটতি দেখান। তিনি বুঝতে পারেন যে ভারতের সমস্যা শুধু দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা বা দূষিত পরিবেশ নয়, ভারতের সমস্যা আরো বিরাট এবং জটিল। ফ্লরেন্স বলেন, এ হচ্ছে হাইড্রার শত মাথা। দুর্ভিক্ষে যে লোক মরতে বসেছে তার কাছে পরিচ্ছন্নতার কথা বলা অশোভনীয়।[৪]

এরপর ফ্লরেন্স যে কাজে এগোন তা সহজসাধ্য তো নয়ই, পরন্তু রাজরোষের কোপে পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তার চরিত্রের নির্ভীকতা, তার শাণিত বুদ্ধি, তার যুক্তিবাদী চেতনা তাকে ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশাকে সত্যের আলোতে বিচার করতে শেখায়। ফ্লরেন্স নিজেকে 'রায়তদের বিশ্বস্ত বন্ধু' বলে পরিচয় দেন।[৫]

উনবিংশ শতাব্দী, ভারতের ইতিহাসে দুর্ভিক্ষের শতাব্দী নামে পরিচিত। উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, বাংলা, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম ভারত, সর্বত্রই ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যাতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার জন্য ফ্লরেন্স বার বার চিঠি লিখে বড়লাট ও ভারত সচিবদের উত্যক্ত করেছেন। পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে জনমত গড়ে তুলেছেন। জন লরেন্স থেকে শুরু করে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যন্ত এমন বড়লাট খুব কমই ছিলেন যিনি ফ্লরেন্সের বাক্যবাণের ও রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হননি। তেমনি এই সময়ের সব ভারতসচিবই লর্ড স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট, লর্ড সলসবেরী, লর্ড কিম্বারলি, লর্ড ক্রস-সবাইকেই 'মিস নাইটিংগেলের মেমোর' উত্তর দিতে হয়েছে। ফ্লরেন্স ছিলেন বড়লাট ও ভারত সচিবদের বিবেক। প্রয়োজন হলে তিনি রাণী ভিক্টোরিয়া অথবা প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে ভারতের মঙ্গলের জন্য চিঠি লিখতেও ইতস্ততঃ

করেননি।[৬]

১৮৭০ নাগাদ ফ্লরেন্স সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ভারতের কৃষিজীবি রায়তদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া দরকার, যাতে তারা দুর্ভিক্ষ মহামারীর মোকাবিলা করতে পারে। জমির ফলন বাড়লেই হয়তো এটা সম্ভব। অনাবৃষ্টির প্রকোপ এড়াতে আর ফলন বাড়াতে প্রয়োজন ব্যাপক সেচ পরিকল্পনার। এই সময় থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ফ্লরেন্স ক্রমাগত ভারতে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করেছেন, খালকাটা ও নাব্যতার কথা বলেছেন, এই নিয়ে ব্রিটেনে জনমত গড়ে তুলেছেন। এই কাজে ফ্লরেন্সের জুটি ছিলেন স্যার হেনরি কটন, যিনি নিজে ভারত সরকারের রাজকীয় এনজিনিয়ার হিসেবে কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরী পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সর্বতোভাবে ভারতে পূর্ত ও সেচ পরিকল্পনার কতখানি প্রয়োজন তা নিয়ে কমন্সসভায় সিলেক্ট কমিটিতে লড়াই করেছেন। ভারতে তখন রেল চালু হবে না খাল কাটা হবে, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন ছিল। বিনিয়োগকারীদের ধারণা ছিল রেল থেকে মুনাফা বেশী হবে, যদিও কার্যতঃ অনেকক্ষেত্রেই সেটা ঘটেনি। খালকাটা ও সেচ পরিকল্পনায় টাকা ঢালতে এদের দ্বিধা ছিল। রক্ষণশীল ভারত সচিব লর্ড সলসবেরীর (লর্ড ক্র্যানবোর্ন ছিলেন এদের পক্ষে সত্তরের দশকে সলসবেরীর) সাথে ফ্লরেন্সের এই নিয়ে বাদানুবাদ তৎকালীন ব্রিটেনের রক্ষণশীল বনাম উদারপন্থী রাজনীতির একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।[৭] ভারত সম্পর্কে ফ্লরেন্সের জ্ঞান এত গভীর ছিল, ভারতের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, নদী নালা সম্পর্কে তিনি এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে তার নানা প্রবন্ধ ও চিঠিতে পরিষ্কারভাবে নক্সা কেটে, লিখে দেখিয়েছেন যে কোথায় খালকাটা সহজ হবে, কোথায় খাল কাটলে নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে, ঢাকা থেকে কলকাতায় নৌকাচলাচল সহজ হবে, সিন্ধু প্রদেশের ভেতর দিয়ে করাচী বন্দর পর্যন্ত মাল নেওয়া সহজ হবে, আর পাঞ্জাবে খাল কাটলে, হয়তো লোকে হাতিয়ার রেখে কাস্তে হাতে নেবে। বলা দরকার, স্বাধীনতার পর ভারতে যে সব সেচ পরিকল্পনা হয়েছে, ফ্লরেন্স প্রায় দেড়শো বছর আগেই তাদের কথা বলেছিলেন, যেমন দামোদর নদীর সেচ প্রকল্প।

ফ্লরেন্স অবশ্যই জানতেন যে শুধুমাত্র সেচ পরিকল্পনা ও জমির ফলন বৃদ্ধিতে ভারতীয় রায়তদের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। দাক্ষিণাত্যে সোত্তকার বা মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়তদের যে দাঙ্গা হয়েছিল, পাবনায়, উত্তরবংগে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে সংঘর্ষে নেমেছিল, অথবা তার আগে নীলবিদ্রোহের ঘটনা, সব তথ্যই ফ্লরেন্সের নখদর্পণে ছিল। এই দাঙ্গা, বিদ্রোহ ও সংঘর্ষে ফ্লরেন্সের সমর্থন ছিল রায়তের স্বপক্ষে। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় উদ্যোগের তৃতীয় পর্যায়ে ফ্লরেন্স বাংলার ভূমিসংস্কার বা রায়তী আইনের সংস্কার নিয়ে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় একদিকে যেমন কৃষ্টদাস পাল, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় সম্মুখ সমর ঘোষণা করেছিলেন এবং তাদের মদত দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের মত প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের মত পত্রিকা; অন্যদিকে তেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর মতন ব্যক্তিরা নেমেছিলেন রায়তদের স্বার্থ রক্ষায়, আর এদের পেছনে ছিল ইন্ডিয়ান

এসোসিয়েশনের সমর্থন। এই সময় প্রসন্ন কুমার সেন নামে কলকাতার এক তরুণ আইনজীবির সাথে ফ্লরেন্সের পত্র বিনিময় হয়। প্রসন্ন কুমারের কাজ ছিল কলকাতা থেকে ফ্লরেন্সকে রায়তী আইন ও আন্দোলন সম্পর্কে খবর পাঠানো আর ফ্লরেন্স সেই খবরের প্রেক্ষিতে লন্ডনের পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন, রায়তদের প্রকৃত অবস্থা ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।[৮]

ভারতে সংস্কারের কাজে ফ্লরেন্স সব চাইতে বেশী সাহায্য পেয়েছেন লর্ড রিপনের কাছ থেকে। রিপন ফ্লরেন্সের পুরোনো বন্ধু এবং দুজনেই উদারপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রিপনের প্রশাসনকালে, কভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিসএ বয়সমাত্রা বাড়ানো, ভারতীয়দের স্থানীয় প্রশাসনে ক্ষমতাদান, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি আইন, কৃষি ব্যাংক - প্রতিটি সংস্কারের সাথে ফ্লরেন্স জড়িত ছিলেন। এই নিয়ে রিপনের সাথে তার বহু পত্র বিনিময় হয়েছে। রিপন ফ্লরেন্সের মতামতের জন্য ভারত থেকে সরকারী কাগজপত্র পাঠিয়েছেন। ইলবার্ট বিল নিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে রিপন কার্যমেয়াদ শেষ না হবার আগেই ভারত ছাড়েন। কিন্তু রিপনের সংস্কার নীতি যাতে কার্যকরী হয়, ডাফরিন বা ল্যান্সডাউনের আমলে তা যাতে বানচাল না হয়ে যায়, তার জন্য ফ্লরেন্স ভারত সচিবের বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদ্বির করতে দ্বিধা করেন নি।

ফ্লরেন্স শুধু বড়লাট ও ভারত সচিবদের কাছে তদ্বির করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। ১৮৭০ সাল থেকেই তিনি ভারতীয় ও বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শুচিকরণের প্রতি ভারতীয়দের উৎসাহিত করা, তাদের সাথে নিজের ধ্যান ধারণা ভাগ করে নেওয়া এই ছিল তার লক্ষ্য। ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে তার যোগাযোগ হয়।[৯] ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের উদ্যোক্তরা, এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, মনোমোহন ঘোষ, লাল বিহারী ঘোষ, এন. জি. চন্দ্রাভারকার, এস. আর. মুদালিয়র, দাদাভাই নাওরোজি, বি. এম. মালাবারি, এবং পরবর্তীকালে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রত্যেকেই ছিলেন ফ্লরেন্সের পরিচিত। লন্ডনে এরা ফ্লরেন্সের সাথে যোগাযোগ করেছেন, বাকিংহামশায়ারে তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণও করেছেন। ভারত সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এদের সাথে ফ্লরেন্সের চিঠিপত্রের আদান প্রদানও হয়েছে। হিউম, ওয়েডার বার্ণ প্রমুখ ভারত হিতৈষীরা কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে 'ইন্ডিয়া' নামে যে পত্রিকাটি বার করেছিলেন, ফ্লরেন্স তাতে ভারতের গ্রামীণ শিক্ষার জন্য প্রবন্ধও লিখেছেন।[১০]

ফ্লরেন্সের জীবনের শেষভাগে, ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ শুচিকরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামের মেয়েরা যাতে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সজাগ হন, তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। ১৮৮৭ সালে বোম্বাই ভিলেজ স্যানিটেশন বিল নিয়ে কথাবার্তা চলাকালে ফ্লরেন্স পুনা সার্বজনিক সভা ও বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করেন।[১১] এই সময় একদিকে যেমন ডাফরিন ও পরে ল্যান্সডাউন দুই বড়লাটই ফ্লরেন্সকে বার বার কাগজপত্র

বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন, ভারত সচিব ফ্লরেন্সকে রিপোর্ট লিখতে বলেছেন, অন্যদিকে তেমনি ফ্লরেন্স পুনা সার্বজনিক সভা ও বম্বে প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের কাছে চিঠি লিখে তাদের মতামত জানতে চেয়েছেন। ভারতের [বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, বম্বে ক্রনিকল্, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর-এ এই খবর ছাপা হয়েছে ও সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। ১৮৯১ সালে লন্ডনে হাইজিন ও ডেমোগ্রাফী নিয়ে যে আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়েছিল, ফ্লরেন্সের উদ্যোগে তাতে একটি ইন্ডিয়া কমিটি হয় এবং ভারতীয় প্রতিনিধিরা -দাদাভাই নাওরোজি, বদ্রুদিন তেয়াবজি, উইলিয়াম ওয়েডবরার্ণ এতে যোগ দেন।[১২]

ফ্লরেন্স কখনো ভারতে আসেননি। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর অসুস্থ হয়ে জীবনের বাদবাকি বছরগুলি তিনি নিজের শোবার ঘরেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তার কাজের খ্যাতি এতদূর ছড়িয়েছিল যে ১৮৯২ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় খবর বার হয়েছিল যে ফ্লরেন্স নাইটিংগেল ভারত সফরে এসেছেন।

ভারতে না গিয়েও ভারতের জন্য তিনি অবিশ্রান্ত কাজ করে গেছেন। তার কাজের ধরণ ছিল প্রথমে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে বিশদ খবর সংগ্রহ করা। তারপর বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে একটা সমাধান স্থির করা। তারপর একটা রিপোর্ট লেখা। সেই রিপোর্ট ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়ে রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করা। তাতে কাজ না হলে, সংবাদপত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশ করে, প্রবন্ধ ছাপিয়ে জনমত গড়ে তোলা। সংবাদপত্রে খবর ফাঁস করার আধুনিক অস্ত্রটি তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে ডেইলী মেইল পত্রিকার হ্যারিয়েট মার্টিন্যু ছিলেন তার জুটি।

ফ্লরেন্স ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক রাজনীতি ও দর্শনের অনুগামী। ১৮৫৭ সালে, ভারতের বিদ্রোহের সময়, তিনি খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করলেও, অচিরেই এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী ছিল মানবতার, যৌক্তিক ও বাস্তবধর্মী। এতে তিনি দেশ, ধর্ম ও রাজনীতিকে স্থান দিতে নারাজ ছিলেন।

ভারতীয়দের জন্য ফ্লরেন্স নাইটিংগেলের জীবনের এই ৩৫-৩৭ বছরের কাজের কথা অনেকেই জানেন না। আজ তার পূর্ণ-মূল্যায়ন প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১. Florence Nightingale's Private Paper British Library London.

২. **The Royal Commission on the sanitary state of the Army in India, 1859-1862.** (Publication details)

৩. Nightingale to Lawrence 26 Sep 1864 British Library (BL) Add Mss 45777 FF 49-53
Lawrence to Nightingale 7 April 1865 BL Add MSS 45777, FF 64-102.

৪. Florence Nightingale Life or Death in India, P7, 1874. London

৫. Florence Nightingale's **Indian letters** ed P.R. Sen Calcutta 1937.PP 1-4

৬. Nightingale to Gladstone, 4 Dec 1884 BL Add Mss 44488 F 213

৭. Nightingale to Salisbury, 5 Oct 1875 BL Add Mss 45779 F 38
Salisbury to Nightingale 1 Nov 1875 BL Add Mss 45779, FF 50-54

৮. Florence Nightingale **The Dumb shall speak and the Deaf shall hear or The Ryot, the Zamindar and the Government 1883** London

৯ **Transuctions Bengal Social Science Association** Vol IV 1870

১০. Florence Nightingale **Helath lectures for Indian Villages : India**, October 1893 P 305

১১. **Quarterly Journal,** Poona Sarwajanik Sabha July 1892 P1
Letters to the Joint Secretaries Bombay Presidency Association 1887, 1889, Nightingale Private Paper British Library

১২. **Proceedings, International Congress of Hygiene and Demography, London** 1891

নাবীবাদী আঙ্গিকে সরোজিনী নাইডু

হাসি ব্যানার্জী

বিগত বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক ধরেই নারীবাদের চর্চা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় ভারতে নারীবাদের উত্থান এবং ক্রমবিকাশের প্রকৃতি কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সরোজিনী নাইডুকে প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করার কারণ প্রথমতঃ সরোজিনী (১৮৭৯ ১৯৪৯) পাঁচ দশকের অধিক সময় ভারতীয় জন জীবনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একাধিক বার ইংলন্ড ও আমেরিকা ভ্রমণকালে পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন এবং নারী বিষয়ক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং শুরু থেকেই স্বদেশে এ্যানি বেশান্ত এবং মার্গারেট কাসিনস্ প্রভৃতি বিদেশিনী মহিলাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতে নারী আন্দোলনের সূচনা করেন। এছাড়া সরোজিনীর পারিবারিক পট ভূমিকা, শিক্ষা দীক্ষা তাঁকে এক উদার, মানবতাবাদী, বিশ্বনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করেছিল।[১] এই সব মিলেই সরোজিনী হয়ে উঠেছিলেন যেন ভারতীয় নারীবাদের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের এক আদর্শ প্রতিভূ।

তাহলে সরোজিনী কি ধরনের নারীবাদের প্রবক্তা ছিলেন ? নারীবাদ বলতে তিনি কি বুঝতেন ?

সরোজিনীর অসংখ্য বক্তৃতায় স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর নারী সম্পর্কিত ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবিষয়ে তাঁর লিখিত চিঠি পত্রের বিরাট সংকলনটিও উল্লেখ্য।[২] এর থেকে আমরা দেখি যে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি নারীর প্রচলিত মাতৃমূর্তির (Mother image) জয়গান গেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ভাষণ লক্ষ্ণীয় যেখানে 'Mother emblem of Indian Woman বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। অথবা ১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসে তার সভানেত্রীর ভাষণ ও উল্লেখ করা যায়। এখানে তিনি বলছেন : 'I represent the other sex i e The mothers of men' এবং ভারত মাতাকে "perfect mother and perfect lady of the house বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলছেন Mine as become a Woman is most modest domestic programme merely to restore India to her true position '[৩] এখানে তিনি পরিবারে মায়ের প্রচলিত ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরোজিনী মহাকাব্য এবং পুরাণে বর্ণিত নারীদের

Socialist নারীবাদীরা নারী পুরুষের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য এবং শোষণের কথা বলে থাকেন। সরোজিনী এদের সঙ্গে সহমত হতেন না। তবে Socialist নারীবাদীদের ন্যায় তিনি [illegible] ন্যায় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।

আধুনিক কালের নারীবাদী দৃষ্টিকোণে তিনি যথার্থ নারীবাদী বলে বিবেচিত নাও হতে পারেন। সরোজিনীর নারী পুরুষ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনায় কোন শ্রেণীভিত্তিক বা লিঙ্গভিত্তিক শোষণের স্থান ছিল না। হয়ত তৎকালীন আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোয় এগুলি বহুল এবং প্রকাশ্য আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি।

সরোজিনী বিশ্বাস করতেন যে নারীদের সম্বন্ধে যুক্তিহীন কতকগুলি প্রচলিত ধ্যানধারণার বিসর্জন দিতে হবে। এবং নারী ও পুরুষের সমান ও স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকবে এবং নারী পুরুষ সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় থাকবে।[৮]

এই চিন্তাধারা ছিল পাশ্চাত্য নারীবাদের বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ এবং তার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী নারীবাদের সমাবেশেরই ফলশ্রুতি। এই ভাবেই সরোজিনী হয়ে উঠেছেন পুরাতন চেতনা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার (অবশ্যই উগ্র আধুনিকতা নয়) এক ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতীক।

নারী পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে সরোজিনীর চিন্তাধারা আবার অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ — এই দুই যুগন্ধর পুরুষের সংস্পর্শে এসে। গান্ধী নারীর এক উচ্চ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভূমিকার আদর্শ রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নারীপুরুষ সম্পর্কে এক সুসঙ্গতিময় সহযোগিতার কথা বলতেন। সরোজিনীর চিন্তায় উপরোক্ত ধ্যান ধারণার প্রতিফলন দেখি। তিনি বলেন 'Let us show as women the embodiment the symbols and relations of love that conquers, knowledge that serves and power that recreates weakness into courage death into life disunion into harmony and slavery into freedom of life' এবং সরোজিনী বিশ্বাস করতেন যে এই আদর্শই হওয়া উচিত নারীবাদী দর্শনের ভিত্তি।

সূত্র নির্দেশ

১. Padmini Sengupta **Sarojini Naidu,** New Delhi 1574 a

২. **Speeches and writings of Sarojini Naidu,** GA Natesan Madras 1919

৩. **Report and Progress of the I N C ,** 1925

৪. **Devotion Feast,** ইত্যাদি।

৫. A W Symons **An Introduction to the Golden Threshold**

Olive Banns **Faces of Feminism,** New York 1990

৭. Neera Desai and M Krishnaraj **Women and Society in India,** Delhi 1990

৮. Letters in Sarojini Naidu Papers and **Padmaja Naidu Papers,** Nehru Memorial Museum and Library New Delhi

৯. **Second All India Womans Conference** 1928

মিসেস এম. রহমানঃ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

তাহ্‌মিনা আলম

মিসেস এম. রহমান বিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমান সমাজের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলিম বাংলায় 'অগ্নি কন্যা' রূপে পরিচিত।[১] উনবিংশ শতাব্দীর অধিকার বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারীর ন্যায্য অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সহচর, ধূমকেতু, বিজলী, আত্মশক্তি প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় নানা বিষয়ক তাঁর তেজোদীপ্ত, বলিষ্ঠ ও বিদ্রোহাত্মক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। নারীজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর রচনা সমূহ তৎকালীন গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম সমাজকে বিপুল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

আমরা জানি যে, প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলিম সমাজ অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের এই অবক্ষয়ের যুগে সামাজিক ও আইনগত অধিকার বঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারীর অবস্থা ছিল স্বধর্মীয় পুরুষ সমাজের চেয়ে অধিকতর শোচনীয়, করুণ ও বেদনাদায়ক।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সম্মুখে যাওয়াও ছিল বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য নিষিদ্ধ, আর এ অযৌক্তিক পর্দাপ্রথার কঠোরতা মাত্র পাঁচ বছরের শিশুর উপরও বলবৎ ছিল।[২] এক কথায় তৎকালে এদেশের প্রথা অনুসারে নারীকে অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের বেষ্টনে আবদ্ধ করে অবরোধবাসিনী করে রাখা হতো। যে যত বেশী অবরোধ জীবন-যাপন করতো সমাজে সে তত বেশী প্রশংসিত হতো। এটাই আভিজাত্যের প্রতীক বলে মনে করা হতো।[৩] সেকালে অবরোধ বন্দিনী মুসলিম নারী ছিল শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। অল্প পরিমাণে আরবী ও উর্দু চর্চা করা ছাড়া অপর কোন গ্রন্থ পড়ার অধিকার মেয়েদের ছিল না।[৪] সে সময় মেয়েদের হাতের লেখা পর্যন্ত পুরুষদের দেখা জায়েজ মনে করা হতো না। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো।[৫]

মিসেস এম. রহমান নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি উনবিংশ শতাব্দীর এমনি এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে জন্মগ্রহণ করেও নিজ মেধা, অদম্য স্পৃহা, উদ্যম, ত্যাগ, কঠোর কর্মনিষ্ঠার বলে তিনি তাঁর জীবন ও সময়কালে পারিপার্শ্বিকতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন যা তাঁকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।

মিসেস এম রহমানের প্রকৃত নাম মসম্মত মসুদা খাতুন। হুগলী জেলার আরামবাগের অন্তর্গত শেখপুরা গ্রামে এই মহীয়সী নারী ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মসুদা খাতুন হুগলী জর্জকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী খান বাহাদুর মৌলবী মজহারুল আনোয়ার চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। মসুদা খাতুনের পিতা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ তিনি পাননি।[৬]

সামাজিক ও পারিবারিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি অতীব বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে বাড়ীর হিন্দু সরকার ও চাকরদের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার বইগুলি পড়া শেষ করেন।[৭]

মাত্র এগার বৎসর বয়সে হুগলী জেলার খানপুরা নিবাসী কাজী রসিবর রহমানের পুত্র শ্রীরামপুরের সাব রেজিস্ট্রার কাজী মহম্মদর রহমানের সাথে মসুদা খাতুনের বিয়ে হয়।[৮] তখন থেকে তিনি মিসেস এম রহমান নামে পরিচিত।[৯] মিসেস এম রহমানের শ্বশুর ছিলেন একজন উচ্চর শায় আয়মাদার ও দানশীল সরকার। মিসেস এম রহমান শ্বশুরালয়ে এসে শ্বশুরের ত্যাগ ও পরদুঃখকাতরতার সম্যক অধিকারী হয়েছিলেন।[১০] বিয়ের পর স্বামীর কাছে তিনি নতুন উৎসাহের সাথে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। এখানেও নানা প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক থাকায় আশানুরূপভাবে সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু বাংলা শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ থাকায় তিনি এ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[১১] এসময়ে নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙালি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের[১২] প্রবন্ধাদি পাঠ করে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেন। বেগম রোকেয়ার ঠিকানা সংগ্রহ করে তিনি তাঁকে নিজ মনোভাব জানান। বেগম রোকেয়া মিসেস এম রহমনের উচ্চ আশা আকাঙ্খার পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রবন্ধাদি লিখতে উৎসাহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদূষী লেখিকা মিসেস আর এস হোসেন মসুদা খাতুনের গুরুস্থানীয়া ছিলেন।[১৩]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সামাজিক কুসংস্কার, নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর তেজদীপ্ত, বিদ্রোহমূলক ও আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও নারীনিপীড়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন,

অবরোধে নারী হেথা চির গতিহীনা,
দাঁড়াবার নাই ঠাঁই এতটুকু নাব।
কুমারীর বলিদান দেখিবে কি, হায়।
এস তব আজি ওগো এই বাঙ্গালায়,
নির্মম সমাজ রূপ অত্যাচারী হাতে
নারীর এখানে হয় জীবন্ত সমাধি।[১৪]

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষের সম অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যার

দ্বারা সমাজপতি তথা আলেমগণ নারীকে যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত করে রেখেছে। সমাজপতিদের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে এবং ইসলাম প্রদত্ত অধিকার দাবি করে মিসেস এম. রহমান 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা' প্রবন্ধে বিদ্রোহাত্মক শ্লোগান উচ্চারণ করে বলেন,

আমরা চাই আমাদের ইসলামদত্ত সম্মান স্বাধীনতা, চাই ইসলামদত্ত অধিকার, চাই আমাদের মধ্যে বিরাট মাতৃত্ব জাগাতে, চাই মঙ্গলাসাধিক রূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফত সেবা করতে।

কে আমাদের পথ রোধ করবে, সমাজরূপী শয়তান ? কখনই পারবে না। যুগ-ভেরীনিনাদে আমার ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠেছে, আমার সত্ত্বা সাড়া দিয়েছে, কোথায় সমাজ ? কোন দোজখের অগ্নিগহ্বরে ঘুমাইয়া আছে ? নির্যাতিত বালিকার অভিভাবিকা রূপে, উপেক্ষিতা নারীর বন্ধুরূপে সমাজের দরবারে আমি বিচার প্রার্থনা কচ্ছি, এসো সমাজপতিগণ ! শাসন দণ্ড ধারণ ক'রে এসো, মোসলমান আলেমগণ ! মোহাম্মদী আইন নিয়ে ধর্ম্মাধিকার অলঙ্কৃত কর।[১৫]

পুরুষ সমাজ স্বেচ্ছায় নারীকে তার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করবে না। কাজেই তাদের নিকট অনুনয় বিনয় না করে নারীকে সোচ্চার হয়ে নিজ অধিকার আদায় করার আহ্বান জানিয়ে মিসেস এম রহমান বলেন,

আমরাও যতদিন ভিক্ষায় শিক্ষা স্বাধিকার পাবার আশা করবো ততদিন আমাদের দুর্দশারও অবসান হবে না। আমাদের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে পুরুষেরা একযোগে আমাদের স্বাধীনতার সনন্দ দেবে না। চোখের জলের মর্যাদা করা যারা বোঝে না তাদের কাছে চোখের জল ফেলা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। ভাল জিনিস কেউ কখনও হাতে তুলে দেয় ? নিতে হবে জোর করে হাত থেকে ছিনিয়ে।[১৬]

নারীজাগরণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে মিসেস এম.রহমান আবেগময়ী ভাষায় লিখেছেন,

"আমাদের অধিকার বঞ্চিতা ভগ্নিদিগকে করজোড়ে অনুরোধ করছি, তোমরা জাগো গো জাগো। জাগিয়ে তোল তোমাদের সুপ্ত শক্তিকে, আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, জাগরণী সঙ্গীতের সুর লহরী জাতির মৃত্যুদেহে প্রাণ সঞ্চার করছে, এ সুখাদ সময়ে সুদিনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে না জাগা মহাপাপ। নাগপাশ খুলে, লৌহ নিগড় ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াও সুপ্তা সিংহীগণ, একবার চেয়ে দেখ - কোথায় তোমাদের আসন আর এসে পড়েছ কোথায় ? মঙ্গলাসাধিকা রূপে জাগো, অভয় দাত্রী দেবী রূপে জাগো, মূর্তিমতী কর্মীরূপে জাগো। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা কর আমরা ছোট নই, দাসী নই, তুচ্ছ নই পশু নই, আমরা মানুষ, মানুষের প্রাপ্য অধিকার আমাদিগকে পেতেই হবে"।[১৭]

সামাজিক কুসংস্কার ও নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার মিসেস এম. রহমানের অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু ছিল। মিসেস এম. রহমান 'মা ও মেয়ে' নামক উপন্যাস রচনা করেন। এটি সহচর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে তিনি স্বসমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহের কুফল প্রভৃতির চিত্র জনসম্মুখে উপস্থাপন করে সমাজকে বিদ্রূপ কশাঘাত করেছেন - যা বাঙালি মুসলিম নারীজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয়

হয়ে থাকবে। উক্ত উপন্যাসের এক স্থানে তিনি লিখেছেন,

'ডেপুটী সাহেব দুইটি মেয়েকে, দুইটি দুগ্ধপোষ্য বালকের হাতে সমর্পণ করিয়া প্রতিবেশী ও পত্নীর আবদার রক্ষা করিলেন। অনেকগুলি গহনায় কন্যাদ্বয়কে সাজাইয়া আইনজ্ঞ ডেপুটি, কন্যা-বাৎসল্যের পরিচয় দিলেন'।

'হায় স্নেহান্ধ পিতা! শিক্ষাভিমানী মূর্খ! স্নেহের কন্যাদিগকে সে ভূষণে সাজালে না, যাহাতে আত্মার বিকাশ হইত, হাত, পা ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করিতে তাহারা শিখিত'।[১৮]

নারীস্বাধীনতা মিসেস এম. রহমানের মুখ্য উদ্দেশ্যে হলেও স্বদেশের স্বাধীনতাও তিনি চেয়েছিলেন মনে প্রাণে। পুরুষের ন্যায় নারীকে দেশের আজাদী সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

"পিতা ভ্রাতারা যেমন দেশ ও দশের হিতে কাজে নেমেছেন, আমরাও তেমনি নামি এস। যার যতটুকু শক্তি, সে তাই নিয়ে অগ্রসর হও, যার যেমন চরিত্র, সে তাকে সেই ভাবেই কাজে লাগাও। দেশ ও দশের হিতের জন্য পরিশ্রম করলে, নিজের হিতও যথেষ্ট হয়, একথা সকলেই বোঝেন"।[১৯]

স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে তিনি খদ্দরের কাপড় পরিধান করতেন। এমন কি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কাফনও খদ্দরের কাপড়ে তৈরী হয়েছিল।[২০]

মিসেস এম. রহমান কেবল সাহিত্যসেবিকা ছিলেন না, কবি সাহিত্যিকদের জননী স্বরূপও ছিলেন। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিক এবং দেশপ্রেমিক তরুণদের তিনি ছিলেন মাতা সদৃশ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। নজরুল ইসলাম সহ সমসাময়িক বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ সকলেই এই মহিয়সী রমনীকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন মিসেস এম. রহমান। প্রমিলা দেবীকে বিয়ে করার ঘটনা নিয়ে কবি নজরুল যখন বিপদের সম্মুখীন তখন মিসেস এম. রহমান তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২১] বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও এই অনন্যসাধারণ মহিলাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম তাঁকে বাংলার 'অগ্নি-নাগিনী' বলে আখ্যায়িত করে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ **বিষের বাঁশী** তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

মিসেস এম. রহমান ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটে দুরন্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অধিকার-বঞ্চিতা নারীজাতির ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে পাবার জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং এই সংগ্রামে তাঁর প্রধান ও একমাত্র অস্ত্র ছিল লেখনী। তিনি অবরোধ উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সত্যিকার ইসলামী পর্দাকে অগ্রাহ্য করেননি!

মিসেস এম. রহমানের ন্যায় আদর্শ মহিলার সংখ্যা অতি নগন্য। তিনি ছিলেন বাংলার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।[২২] সুদীর্ঘ জীবন লাভ না করলেও তিনি সফল জীবন লাভ করেছিলেন। বাংলার মুসলমান সমাজের এক প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তা-ধারা ছিল যুগের

তুলনায় অনেক অগ্রগামী ও সুদূরপ্রসারী। তিনি সর্বার্থে সংস্কারমুক্ত ছিলেন। মিসেস এম রহমান যথার্থই এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজে পুরুষদের অনুরূপ নারীসম্প্রদায়কেও জাগ্রত করে তুলতে না পারলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। আর এ লক্ষ্যে তিনি সমগ্র জীবন এক অঘোষিত সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, **বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ**, ঢাকা নবজাহান/বেগম রহুল প্রকাশিত, ১৯৮৫, পৃ ৫৭৮।

২ মিসেস আর এস হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', **মাসিক মোহাম্মদী**, সচিত্র মাসিক ১ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ৭১১

৩ W W Hornell **Progress of Education in Bengal**, ১৯০২ ০৩ to ১৯০৬ ০৭ **Third Quinquennial Review**, ১৯০৭, p ১১৬

৪ কাজী ইমদাদুল হক, **আব্দুল্লাহ**, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা ইসলাম প্রকাশনী, ১৯৫৮ পৃ ২৮।

৫. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, **প্রাগুক্ত**, পৃ ৪৭৮, ৪৭৯।

৬ এম. আব্দুল রহমান, 'মহিয়সী মিসেস এম রহমান', **সওগাত**, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৫১৬।

৭. ঐ।

৮. **চানাচুর**, হুগলীঃ কাজী মহমুদর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৪, দ্রষ্টব্য, ভূমিকা। এখানে উল্লেখ্য যে, মিসেস এম রহমান কর্তৃক রচিত একটি পত্রিকার সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে **চানাচুর**, এটি লেখিকার মৃত্যুর এক বছর পর তার স্বামী কাজী মহমুদর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৯ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, **প্রাগুক্ত**, পৃ ৫১।

১০ চানাচুর, দ্রষ্টব্য, ভূমিকা।

১১. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮।

১২ বাঙালী মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (মিসেস আর এস. হোসেন)। তিনি নির্ভীক সৃজনশীল ও বৈপ্লবিক লেখনীর মাধ্যমে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত নারীর কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াস করেছেন অন্যদিকে বাস্তবে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা ও বাংলার প্রথম মুসলিম মহিলা সমিতি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে'র মধ্যদিয়ে আজীবন নারীর সার্বিক কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, শামসুন নাহার আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' **চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম**, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

১৩. **চানাচুর**, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য, ভূমিকা। আরও দ্রষ্টব্য, এম আব্দুর রহমান, **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা**, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতাঃ প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৭, পৃ ৮১।

১৪. মিসেস এম. রহমান, 'মতিচুর', **সহচর** আষাঢ় ১৩২৯। দ্রষ্টব্য, আব্দুল কাদির সম্পাদিত **রোকেয়া রচনাবলী**, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৬০৩।

১৫. মিসেস এম. রহমান. 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা' **সহচর**, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৯, পৃ

১৩৯।

১৬ মিসেস এম রহমান, 'নারীর কথা', **সহচর**, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০, পৃ ২২৩। আরও দ্রষ্টব্য **চানাচুর**, পৃ ৩০।

১৭ ঐ।

১৮ মিসেস এম রহমান রচিত 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসটি **সহচর** পত্রিকায় আষাঢ় ১৩২৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯ 'শান্তি ও শক্তি', **চানাচুর**, পৃ ১৪।

২০ **জানানা মহফিল: বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা** ১৯০৪-১৯৩৮, শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক সম্পাদিত, কলিকাতাঃ 'স্ত্রী', ১৬ সর্দান অ্যাভেনিউ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮, পৃ ৫০।

২১ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, **যুগ স্রষ্টা নজরুল**, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ৫৬-৬১।

২২ ঐ, পৃ ৬০।

সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবক্ষায় লালবাগেব শিয়া এবং জিযাগঞ্জ ও আজিমগঞ্জেব জৈন মহিলাদেব ভূমিকা

দেবশ্রী দাশ

মুখবন্ধঃ

মুর্শিদকুলী থেকে আলিবর্দী পর্যন্ত নবাববা মুর্শিদাবাদ নগবীব সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নজব দেন। বহিবাগত অভিজাতদেব আমন্ত্রণ জানান এই নগবীতে বসবাস কবাব জন্য, ফলে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তদেব মত শিযা মতাবলম্বী শাসকগোষ্ঠীব আত্মীয স্বজন বসবাস শুরু কবেন মুর্শিদাবাদ নগবীতে।[১] আসে মাডোযাবী (হিন্দু ও জৈন) ও বৈষ্ণব সম্প্রদায। জৈনবা বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন কবে লালবাগ মহকুমাস্থিত জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ অঞ্চলে। পশ্চিমাগত বৈষ্ণব সম্প্রদায আখড়া তৈবী কবেছিল নশীপুব, দেবীপুব ও সাধকবাগ অঞ্চলে। তাছাড়া ছিল হিন্দু সম্প্রদাযভুক্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয মুসলমান জনগোষ্ঠী।

লালবাগেব শিযা পবিবাব ঃ

মুর্শিদাবাদেব শিয়াপন্থী নবাবদেব অধিকাংশই ছিল বহিবাগত। মুর্শিদকুলি ও সুজাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যেব, আলিবর্দী তুবস্কেব। মিবজাফব ও মিবকাশিম গুজবাটেব অধিবাসী। দেওয়ান বেজা খাঁ ছিলেন পাবস্যেব। তাঁবা ছিলেন নিজ নিজ ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতিব প্রতি অনুবক্ত।[২] শাসনকার্যেব সঙ্গে যুক্ত এই শিযাগোষ্ঠী সামাজিক কাঠামোব উচ্চস্তবে অবস্থান কবতেন। শাসনকাঠামো সচল বাখতেন ঘনিষ্ঠজনদেব সহাযতায। এঁবা অধিকাংশ সামবিক বিভাগেব সঙ্গে যুক্ত থাকতেন মনসবদাব, জাযগীবদাব, বক্সী, কিল্লাদাব, লস্কব, দাবোগা, ফৌজদাব ও কোতোযাল পদে নিযুক্ত থাকে।[৩] তাঁবা নবাব ও বাংলা সুবাব নিবাপত্তা বিধানে নিবত থাকতেন।

জিযাগঞ্জ-আজিমগঞ্জেব জৈন পবিবাবঃ

বাজস্থান থেকে আগত জৈন সম্প্রদায আজিমগঞ্জে শহব ওযালা এবং জিযাগঞ্জে 'বালুচব' নামে পবিচিত হয।[৪] ভাগীবথীব পশ্চিমতীবে অবস্থিত আজিমগঞ্জ ও পূর্বতীবে অবস্থিত জিয়াগঞ্জ আঠাবো শতকে আভ্যন্তবীণ বাণিজ্য বন্দব হিসাবে গডে ওঠে। ভাগীবথীব মধ্য দিযে পূর্বভাবতেব ব্যবসা বাণিজ্য চলত। বাণিজ্য সমৃদ্ধ এই অঞ্চলেব নদী বাঁধেব উঁচু জাযগাকে তাবা বাসস্থান হিসাবে পছন্দ কবে। তাছাড়া নবাবদেব কাছাকাছি থাকাব জন্য তাদেব খাদ্যাভাস ও অহিংসা

নীতির অনুসারী বৈষ্ণবদের কাছাকাছি বাসস্থান নির্বাচন করে।[৬]

এই জৈন সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই এসেছিল রাজস্থান থেকে। দুধোরিয়া পরিবারের হুকুমচাঁদ কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসাবে বিকানীর থেকে এসেছিলেন। জগৎশেঠের আদি নিবাস ছিল রাজস্থান। তিনি ছিলেন আগরওয়াল সম্প্রদায়ভুক্ত। এসেছিল নওলাক্ষা, সিংঘী, দগড়, কোঠারী, নাহার, দুধোরিয়া, গোলেচ্ছা পরিবার।[৭] জগৎশেঠের পরিবার বাংলাসুবার অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সুবাদে কোম্পানীর ব্যবসা চালু রাখার জন্য তারা মুর্শিদাবাদের নবাবদের ঋণ প্রদান করতেন। অন্যান্য জৈন পরিবার মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এই ব্যবস্থা বাণিজ্যের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।[৮]

স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ :

এই দুই গোষ্ঠী বিদেশাগত। ধীরে ধীরে তারা এই অঞ্চলের বাসিন্দা। এখানকার বাঙালী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের আদান প্রদান ঘটেছে। যেমন জৈনরা বাঙালী হিন্দুদের কাছ থেকে দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রার মত অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে। যদিও তা নিজেদের মত করে তারা পালন করে। জৈনদের নিমকি (নোনতা খাবার), সলোনা, মেবার খিচুড়ি প্রভৃতি খাবারগুলোর মধ্যে নবাব পরিবারের খাদ্যাভ্যাস রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। জৈনরা সরস্বতী, লক্ষ্মীর পূজা করে। অতি সম্প্রতি তারা মাটির তলার শাকসব্জি কিছু কিছু গ্রহণ করে।[১১]

অপরদিকে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নবাব পরিবারের লোকজন বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। তারা হিন্দুদের হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। তেমনি হিন্দুরাও তাদের মহরমে অংশ নেন।[১২] এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুই গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সংক্রান্ত আচার, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, শিক্ষা ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে তারা অনড়।

প্রবন্ধের উপাদান :

আমি আমার এই নিবন্ধের রচনার জন্য মূলত ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করেছি। এই দুই গোষ্ঠীর শিক্ষা, সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভাষা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন রেখেছিলাম। জৈন (দিগম্বর, শ্বেতাম্বর) ও নবাব পরিবারের সদস্যরা আমাকে তথ্যদানে কৃতজ্ঞ করেছেন। এছাড়া সাহায্য নিয়েছি মুর্শিদাবাদের উপর কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধের। এই নিবন্ধে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা না করে আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে আলোচনা করেছি।

শিয়াদের স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র :

লালবাগের শিয়া পরিবার তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াগুলো চালু রাখতে সাহায্য করেন এই পরিবারের মহিলারা।

ভাষাঃ ভাষার বন্ধন ও এই গোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। শিয়া পরিবারের উর্দু ভাষা আজও বর্তমান। বাংলাতে আজও তাঁরা তেমন অভ্যস্ত নন।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানঃ ধর্মীয় রীতিনীতি রক্ষায় এই সম্প্রদায় অত্যন্ত সজাগ। তাঁরা মহরম, সবেবরাৎ, রমজান, ঈদ, নওরোজ, বখরী ঈদ, নমাজ প্রভৃতি উৎসব পালন করেন। এক্ষেত্রে মৌলবীর ভূমিকা অগ্রাহ্য নয়। ত্যাগ ও তিতিক্ষার দিক পায় প্রাধান্য। একেশ্বর উপাসনা পদ্ধতি হয় অনুসৃত। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ, উপবাস, দান এঁদের ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৮]

জৈনদের স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রঃ

জৈন সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের সমাজ পঞ্চায়েত দ্বারা তা পালন করে নিজস্ব ধারা অনুসারে। অন্য সম্প্রদায় থেকে তাদের গ্রহণ খুব কম।

ক) শিক্ষাঃ- ধর্ম পুস্তক পাঠ করার জন্য প্রত্যেক জৈন মন্দিরে নিজস্ব পাঠশালা আছে। সেখানে জৈন ছেলেমেয়েরা পাঠ ও ছাপা ধর্মপুস্তক পাঠ করে। চার বছর চারমাস ও চারদিনে হয় হাতে খড়ি। গুরু হন আচার্য। দেবতা দর্শন করিয়ে করা হয় হাতে খড়ি অনুষ্ঠান। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে হিন্দি, প্রাকৃত, সংস্কৃত শেখে পাঠশালাতে। এরা সকলেই স্বাক্ষর। বিশ শতকে ষাটের দশকের আগে খুব কম জৈন মেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। তাদের শিক্ষা পাঠশালাতেই ছিল সীমাবদ্ধ।[১৯]

খ) জন্ম, মৃত্যু, বিয়েঃ- শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় কয়েকটি অনুষ্ঠান পালন করে। গদা ভরাই (গর্ভবতী মহিলার সাতমাসে অনুষ্ঠান), ছটি (জন্মের ছ'দিন পর অনুষ্ঠান), ক্ষীর চাটাই (অন্নপ্রাশন), মুণ্ডন (মাথার কেশ ছেদন) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিয়েতে মুণ্ড (পাকা কথা কবা), তিলক (পাত্রকে আশীর্বাদ) কোলভরাই (পাত্রীকে আশীর্বাদ), বিন্দোরা (আত্মীয় স্বজনের কাছে মিষ্টি খাওয়া), গীত (গান), মেহেন্দি লাগাই (অঙ্গ সজ্জা), চির বিদাই (মামা মেয়েকে বিভিন্ন উপহার দেয়), রোদা বাঁধনা (মেয়েকে বালা পরানো), নিকাশা (বর সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে বের হয়), তোরনা (মালা বদল, কাজল পরানো), হাত লেওয়া জোড়াই (হস্ত বন্ধন), ফিরা (সাতপাকে ঘোরা) প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালিত হয়। পাত্র নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হয় নির্বাচিত। কিন্তু এখন এই জেলাতেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে বিয়ে। পাত্র নির্বাচনে চরিত্র, অর্থ ও ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার উপর গুরুত্ব কম। বিয়েতে পণ দেবার রেওয়াজ নেই। তত্ত্ব হিসাবে দেয় পোষাক বা অর্থ।

মৃত্যুতে উঠাল (মৃত্যুর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান) নাহাওন (পঞ্চম বা সপ্তম দিনের অনুষ্ঠান), পাগড়ী বদলাই বা কেশ বদলাই (দ্বাদশ দিনের অনুষ্ঠান) প্রভৃতি পালনীয়। জন্ম ও বিয়ের অনুষ্ঠানে মামার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজে বহুবিবাহ বা উপপত্নী রাখার রেওয়াজ নেই। জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য। সমাজ বহির্ভূত বিয়েতে উৎসাহ একেবারেই নেই।[১৯]

খাদ্যঃ- জৈন সম্প্রদায়ের কাছে মাটির তলায় সব্জি নিষিদ্ধ, পায়না বাড়ির বাইরে কোন

করা খাদ্য। নিজেদের প্রক্রিয়ায় রান্না করা খাদ্য খায়। খাদ্যের ক্ষেত্রে দিগম্বর সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলতা অনেক বেশী।

ভাষাঃ- জৈন পরিবারগুলি বাড়ীতে হিন্দি ও রাজস্থানী ভাষায় কথা বলে। নিজেদের হিসাবপত্র রাখার জন্য কুঠিয়ালী ভাষাও ব্যবহার করে। বাড়ীর বাইরে বাংলা ভাষাতে কথা বলে।[১৬]

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানঃ- জৈনরা মহাবীর জয়ন্তী (মহাবীরের জন্মদিন), পর্যুসন (কৃচ্ছসাধন ও উপাসনা), দেওয়ালী (দীপাবলী, গণেশ ও লক্ষ্মীপূজা), জ্ঞানপঞ্চম (জ্ঞানের জন্য উপাসনা), হোলি (আবীর খেলা), রক্ষা বন্ধন (রাখী বন্ধন), মোক্ষ সপ্তমী (উপবাস ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ), বীরাসনা ও রুটতীজ (দিগম্বর সম্প্রদায়ের), অক্ষয়নিধি ও ওলিজি (শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর উৎসব), কার্তিক মহোৎসব ও ধানতেড়া উৎসব পালন করে। অক্ষয় তৃতীয়া, সরস্বতী পূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তারা পালন করে। অংশ নেয় শিব চতুর্দশী, কালীপূজা ও দুর্গাপূজাতে। কিন্তু অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। চাঁদা দেয়। সংগঠকের ভূমিকাতে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ খায় না।

প্রাত্যহিক জীবনে পন্ডিত বা পুরোহিতের প্রাধান্য নেই। অন্য সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও নিষ্ঠাভরে পালন করে নিজেদের অনুশাসন। সম্প্রদায়ের বাইরে যারা বিয়ে করে তারা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে না। অন্য সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।[১৭]

স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকাঃ

এই দুই গোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। বংশগত কৌলিন্য ও আভিজাত্য তাদেরকে খুব কম উৎসাহ দেয়নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অবসিত হয়েছে। তবুও এই স্বাতন্ত্র্যের ধারা বহমান অনেকক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা কম নয়।

ক) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন-ভিন্ন নিয়ে এলেও পরিবারের কর্ত্রীর প্রাধান্য বজায় থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকতে হয়। যদিও কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শিয়া পরিবারের মহিলাদের কঠোরতা অনেক কম।

খ) উভয় গোষ্ঠীর মহিলারা ছোট থেকেই নিজেদের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে খুব সম্পৃক্ত। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মানার জন্য খুব যত্নশীলা। সন্তান সন্ততির মধ্যেও এই চেতনা গভীরভাবে প্রবিষ্ট।

গ) উভয় গোষ্ঠীর মহিলারা বাইরের জগতের জন্য নিজেদের তৈরী করেন না। তার ফলে সঙ্কীর্ণ পরিমন্ডলে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা জিইয়ে রাখার বিশেষ পক্ষপাতি তারা। অন্যের সঙ্গে ভাব আদান প্রদানে তত আগ্রহী নয়। এই দুই গোষ্ঠী পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। আগ্রহী পরম্পরা রক্ষায়। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেশী নয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া।

সূত্র নির্দেশ

১ Goutam Bhadra Social Groups and Relations in the town of Mursnidabad 1765 1793
The Indian Historical Review January 1976 Vol 2 No 2 P 313
২ ·স্যাদ·া আহমদ বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবি। ঢাকা ১৯৮১, পৃ ৩।
৩ তদেব, পৃষ্ঠা ১২
৪ বাঁধী সুদিপ্ত রহমান মুর্শিদাবাদের ওসোয়াল সম্প্রদায়, ইতিহাস অনুসন্ধান। ত্রয়োদশ সংখ্যা।
৫ Abhijit Bhatta In Migrant Community in culture contact A study of the Marawari Community of Jiaganj Azimganj Municipal area Unpublished M Phil Dissertation C U 1986 P 78
৬ Goutam Bhadra Ibid P 316
৭ বিমলচাঁদ বোথরা বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি সাক্ষাৎকার ২৫/১২/৯৮।
৮ গৌতম ভদ্র প্রাগুক্ত পৃ ৩১৬।
৯ অভিজিৎ ভট্ট প্রাগুক্ত পৃ ১২০।
১০ বিমলচাঁদ বোথরা সাক্ষাৎকার ২৫/১২/৯৮।
১১ বেগ আলি খান নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক ও নবাব পরিবারের সদস্য, সাক্ষাৎকার ২২ ৩ ৯১।
১২ আনার আলি মির্জা নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক ও নবাব পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাক্ষাৎকার ২৩ ১২ ৯৮।
১৩ প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রদত্ত।
১৪ প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা।
১৫ অভিজিৎ ভট্ট প্রাগুক্ত পৃ ৯৭ ১৪১।
১৬ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত
১৭ অভিজিৎ ভট্ট প্রাগুক্ত পৃ ১৫৫ ১৭৫।

উত্তরবঙ্গের মহিলা জমিদার

ধনঞ্জয় রায়

একুশ শতকের দোর গোড়ায় যখন দেশজুড়ে নারী সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা মুখরিত তখন স্বাভাবিক ভাবেই বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের মহিলা জমিদারদের কথা আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। রেনেসাঁস মুখর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে প্রাক স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের রাণী-মহারাণীদের জনহিতকর ইতিবৃত্ত অত্যন্ত গৌরবজনক। যে সময় নারীদের সমাজে কোনও বিশেষ স্থান ছিল না। সাধারণত পুরুষদের তুলনায় যে নারীরা ক্ষুদ্র বলে পরিচিত ছিল. ওই সময় উত্তরবঙ্গের রাজ্ঞী রাজ-নন্দিনীরা একদিকে যেমন জমিদারি শাসনের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করেছেন. অপরদিকে শিক্ষা বিস্তারে, শিল্প সৃষ্টিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সমাজ-সংস্কারে. বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও গবেষণায় উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং উত্তরবঙ্গের জীবন ধারা কে সুষমামন্ডিত করে তুলেছিলেন।

অতীত ইতিহাসের রেখে যাওয়া স্মৃতি চিহ্নের খাত ধরে এগোলে দেখা যায়। মোগল শাসনের ভাঙ্গনের যুগে বাংলায় নবাব আলিবর্দী খাঁ এবং সিরাজদৌল্লার রাজত্বকালে নানারকম কূট ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি কুটিল প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক দাবা খেলার ভেতর দিয়ে ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল এ দেশে। দেওয়ানি লাভ, দুর্বল নবাবের অসহায়তার সুযোগ ইংরেজ গভর্নরদের প্রশাসনের বিবরণ, এসবই আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ইতিহাস। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ। মানুষের জীবনে ওইসব ঘটনার ভয়াবহতা, লোকবিষাদ, মৃত্যু ও অনিশ্চিত উদ্বেগই ছিল সেই সময়কার সামাজিক চিত্র। এ সবের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের তেজস্বিনী মহিলা জমিদারগণ সততায়, সহিষ্ণুতায়, উদারতায়, সেবাব্রতে ও দেশপ্রেমে অত্যুজ্জ্বল অবদান ও অনুপ্রেরণা রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানী, দিনাজপুরের রাণী সরস্বতী, রংপুরের রাণী জয়দুর্গা ও রাণী জয়মণি ছিলেন অন্যতম।

উত্তরবঙ্গে জাতীয়তাবোধের স্বর্ণদ্বার বস্তুতঃ ওইসব মহিলা জমিদারই প্রথম উন্মোচিত করেছিলেন। সাহস ও নীতিবোধের জন্য আঠারো শতকের ওইসব রাণী মহারাণীরা শুধুমাত্র আমাদের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের বহিরঙ্গেই নয়, আমাদের অন্তর জীবনেও সেই মুহূর্তে সম্মুখীন করেছিলেন এক বুদ্ধিবাদী নবজাগরণের। তারই সূত্র ধরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রাক স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন চর্চা, বিদ্যাচর্চা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে মহিলা জমিদারদের দান ও ভূমিকা এক অন্বেষার ইতিহাস। এঁরা

বাস্তব ও মঙ্গলময় চিন্তায় আর্ত, পীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের সেবায় বিরাম বিরতিহীনভাবে পর হিতৈষণায় এগিয়ে এসেছিলেন। ব্রাহ্মণদের যেমন অকাতরে জমিদান করেছিলেন তেমনি মুসলমান ফকিরাও তাঁদের দান কার্য থেকে বঞ্চিত হন নি।

১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', নারীকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা' (১৮৫০), 'সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' (১৮৫৩), 'উত্তরপাড়া হিতকরীসভা' (১৮৬৪), 'বামাবোধিনী সভা' প্রভৃতি ওই সময়কার বাঙালি মহিলা সমাজ মানসে মূল্যবোধ গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, নারী পরিচালিত ও নারী মুক্তির বিভিন্ন কর্মকান্ডেব মধ্যে যেমন, সরলা দেবী চৌধুরাণীর 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল', লেডি অবলা বসুর 'নাবী শিক্ষা সমিতি' এবং 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন', সরোজ নলিনী দত্তের 'নারীমঙ্গল সমিতি', বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন', ওইসব মহতী প্রতিষ্ঠান সমাজ সেবা, লোকশিক্ষা ও মানুষ গড়ার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের* মহিলা জমিদারদের অনেকেই ওই প্রাণময় স্রোতধারাকে মনে প্রাণে অনুভব করে প্রজার কল্যাণে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা চিন্তা করেছিলেন মেয়েদের উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি হবে না এবং যে উন্নতির সোপান তাদের শিক্ষাদান। ওই সময় কিছু কিছু নারী-হিতৈষী পুরুষের কাছেই নারী পেয়েছিল তার বিকাশের সুযোগ আব উন্মীলনের সম্ভাবনা। তাছাড়া, রামমোহন-বিদ্যাসাগর এবং তাদের উত্তরসূরীদের কাছে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ছিল যা নারীকে সমাজের স্মার্তকাঠিন্য ভেদ করে উন্মুক্ত আলোকে এসে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। নারীর ওই নতুন আঙ্গিকে সমাজের প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত ছিল পুরুষের উৎসাহ, প্রয়াস ও প্রেরণা। উত্তরবঙ্গ নির্মাণের সমাচারে নানা সামাজিক বাধাবিঘ্নের প্রেক্ষাপটে মহিলা জমিদারদের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সব চেষ্টা সফল না হলেও নারীকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা এবং নারীর মানসপটে আত্মসচেতনতা ও পরিবর্তন স্পৃহা তাঁদের চেষ্টাতেই প্রথম শুরু হয়ে গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ নির্মাণ চর্চায় নিবেদিত প্রাণ কিছু মহিলা জমিদারের জীবন ও কর্মধারার পরিচয় একবাব নেওয়া যেতে পারে।

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী

রাজশাহীর অন্তর্গত পুটিয়া রাজবংশের রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের বিধবা শরৎসুন্দরী দেবী। হিন্দু বিধবাদের দূরবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের মত 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বালিকাদের লেখাপড়ার জন্য নাটোর, পুটিয়া ও রাজশাহীতে পাঠশালা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ৩৮টি পাঠশালা ও ২০টি চতুষ্পাঠী নির্মিত হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি যশস্বিনী হয়ে আছেন।

* উত্তরবঙ্গ বলতে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ ও পাবনা জেলার কথা বলা হয়েছে। রচনাকার।

মহারাণী হেমন্ত কুমারী দেবী

রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর বিধবা পুত্রবধূ মহারাণী হেমন্ত কুমারী দেবী পুটিয়া জমিদার শাসনের ভার পররর্তীতে গ্রহণ করেছিলেন। রাজশাহী কলেজ গঠনে তিনি প্রচুর টাকা দান করে-ছিলেন। রাজশাহীতে মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবী সংস্কৃত কলেজ (১৯০৪-১৯৪৭) উত্তরবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

রাণী মহামায়া দেবী

রংপুরের কুন্ডি জমিদার বংশের মধুসূদন রায়চৌধুরীর বিধবা রাণী মহামায়া দেবী। পুরোহিত, মালাকার, নাপিত, বাদ্যকার প্রত্যেকের নামে জমি বরাদ্দ ছাড়াও তাদের মাসিক নির্দিষ্ট বৃত্তি দিতেন। বহু উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে যেমন, রংপুরের যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও মুসলমান ফকিরকে নিষ্কর ভূমিদান করে ও বসতি গড়ে দিয়ে অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। রংপুরে কারমাইকেল কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরীর দরাজ হাত দিয়ে চারশো বিঘা জমিদান করেছিলেন।* বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকিকে রাণী মহামায়া দেবী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রাজকুমারী জগৎমোহিনী

কুন্ডি জমিদার বংশের কালিচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা জগৎমোহিনী দেবী। তিনি নারী শিক্ষার জন্য নিজ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে এক অতুলনীয় কীর্তি রেখে গেছেন। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলার দ্বিতীয় সাময়িকী 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' জগৎ মোহিনীর পিতা কালিচন্দ্র রায়চৌধুরীর আনুকুল্যেই বের হয়েছিল।

রাণী ভগবতীদেবী

রংপুর তুষভান্ডারের জমিদার কালি প্রসাদ রায় চৌধুরীর বিধবা পত্নী। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে তুষভান্ডারে শিক্ষার জন্য উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই বিদ্যালয়ের জন্য মাসে মাসে একশো চুয়াল্লিশ টাকা করে তিনি দান করতেন। প্রজার জলকষ্ট নিবারণে দুটি বড় দীঘি এবং রমণীগঞ্জ ও অনঙ্গগঞ্জ দুই নাবালক পুত্রের নামে দুটি বড় হাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রাণকুমারী বর্ম্মণী

রংপুরের মুশাপোয়ালী ঘাটের জমিদার প্রাণকুমারী বর্ম্মণী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যে রাস্তার নানাস্থানে সাঁকো নির্মাণের জন্য দশহাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলা জজ ম্যাজিস্ট্রেট নাথানি এল স্মিথের উদ্যোগে রংপুরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাণকুমারী বর্ম্মণী তিনশো টাকা দান করে জনসেবামূলক কাজে সুকৃতি রেখে

* বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী : রংপুরের বিপ্লবী অবনী বাগচীর কাছে গত ৮.৪.১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে এই তথ্য পেয়েছি। রচনাকার।

গেছেন।

রাণী গঙ্গাসুন্দরী

টেপাব জমিদাব তারিণী মোহন রায়চৌধুরীর বিধবা গঙ্গাসুন্দরীদেবী। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পানীয় জলের জন্য চাকির দীঘি ও সান্যালের দীঘিসহ প্রচুর ইঁদারা খনন করেছিলেন। কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে চাঁদা আদায়কৃত মোট ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে তিনি নিজে ১ লক্ষ টাকা দান কবেছিলেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী-চৌধুরানী

রংপুরের ডিমলার জমিদার জয়রাম সেনের বিধবাপত্নী। রংপুর শহরের মানুষ মশার অত্যাচার থেকে যাতে রেহাই পান এবং বর্ষাকালে শহরে যেন জল জমতে না পারে তারজন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে রংপুরেব ঘাঘট নদী থেকে একটি খাল কেটে শহরের ভেতর দিয়ে মহিগঞ্জের মধ্যে দিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। রংপুর কৃষি কলেজ স্থাপনে তিনি আট হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

রাণী শরৎসুন্দরী

রংপুরের তাজহাটের জমিদার গোবিন্দলাল রায়ের বিধবা পত্নী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী। ফার্সী ভাষায় তাঁর বিশেষ পান্ডিত্য ছিল। ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁর গভীরতা লক্ষ্য কবে পন্ডিতগণ বিস্মিত হতেন। রংপুরের তাজহাট উচ্চবিদ্যালয়টি তাঁর দানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রংপুরের মহিগঞ্জে দাতব্য চিকিৎসালয়টি তাঁর উদ্যোগেই সংস্কার করা হয়েছিল। অর্থ ও যশ তিনি অর্জন করেছিলেন নিজ সাধনায়। কিভাবে মানুষ যশের শীর্ষে উঠতে পারে তিনি তাঁর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে রেখে গেছেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

মজিদাতুন্নেসা চৌধুরানী ও জহিরাখান চৌধুরানী

রংপুর মহীপুরের খানবাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত জমিদাব আবদুল মজিদ চৌধুরীর কন্যা মজিদা তুন্নেসা চৌধুবানী এবং খানবাহাদুর আজিজ চৌধুরানীর কন্যা জহিরা খান চৌধুরীরাণী। এই দুইজন মুসলিম মহিলা পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীব মালিকানা পেয়েছিলেন। এই দুই জমিদার নন্দিনী মুসলিম সমাজেব পর্দাপ্রথা ভেঙ্গে কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ওই সময় মুসলিম মহিলাদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করার কাজে অনন্য নজীর রেখে গেছেন*। 'বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে মহিলা সমিতির আদলে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মুসলিম মহিলা মিলন সমিতি'।

* রংপুরের মুলাটোলে বসবাসরত প্রাক্তন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আবদুল লতিফ সাহেবের কাছ থেকে এই তথ্য পেয়েছি। বয়স ৮১। সাক্ষাৎকার তারিখ: ১২.১১.১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। রচনাকার।

মহারাণী শ্যামামোহিনী

দিনাজপুর রাজবংশের তারকনাথ রায়ের বিধবা। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরে এলোপাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় শ্যামামোহিনীর উদ্যোগেই প্রথম গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর শহরে প্রথম জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁরই প্রদত্ত ভবনে। দিনাজপুর পৌরসভা উচ্চবিদ্যালয় এবং জুবেলী ইস্কুল তাঁর দানেই গড়ে ওঠে। প্রচুর অতিথিকে অন্নদান করছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত প্রার্থীকে সাহায্য করতেন, দূর দূরান্ত থেকে শত সহস্র নরনারী তাব অতিথিশালায় যতদিন ইচ্ছে তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হত। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে তিনি একশো-দেড়শো বিঘা পর্যন্ত জমি নিষ্কর দান করেছিলেন। মহারাণীর জ্ঞাতিরা তাঁর ওই উড়নচন্ডী মনোভাবের নিন্দা করতেন। জমিদারির উৎকৃষ্ট সব জমি নিষ্কর হিসেবে বিলি হলে জমিদারির ভাবী রাজাদের প্রভূত ক্ষতি হবে এই ভেবে জ্ঞাতিদের গাত্রদাহ হত। দানের বিষয়ে মহারাণী বলতেন, "শাস্ত্রে দান করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আমি মহাপাতকী হতে পারি না।' ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে 'মহারাণী' উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন।

রাণী হেমপ্রভা

দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের পত্নী রাণী হেমপ্রভাদেবী। নারীদেব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'সখি সমিতির (১৮৮৬ খ্রি:) আদলে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন "সরস্বতী সমিতি'। সেই সময় ওই সমিতি যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

রাণী স্নেহলতা দেবী

*দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশ নাথ রায়ের পত্নী রাণী স্নেহলতা দেবী। বিদ্যাচর্চার প্রসারে মহৎ অবদান রেখে গেছেন। দিনাজপুর আর্য লাইব্রেরীর উন্নয়ন সাধনে তিনি মূল্যবান বইপত্র কেনার জন্য বছর বছর দশ হাজার টাকা দান করতেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর মোট দানের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন উর্মিলা দেবীর সঙ্গে রাণী স্নেহলতার যোগাযোগ ছিল। উর্মিলা দেবীর উদ্যোগে রাণী স্নেহলতা দিনাজপুরে 'নারীকর্ম মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে নারীর সামাজিক অধিকার বোধকে জাগ্রত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১. বিশশতকের দ্বিতীয় দশকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গে এই দৃষ্টান্ত নারীর দেশপ্রেম জনিত মহতী চিন্তাও চেতনা আন্দোলনের এক আশ্চর্য দীপশিখা।
২. উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে রানী স্নেহলতা পার্ক, পাঠাগার ও পাবলিক হল।
৩. তাঁরই সৃষ্টি আজও বহন করে চলেছে।

* দিনাজপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য- এর কাছ থেকে এই তথ্য পেয়েছি। বয়স ৭৯। সাক্ষাৎকার তারিখ : ১৯.৫.১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মহারাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী

মালদহের চাঁচলরাজ শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর মা মহারাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী। বহুমুখী প্রতিভা ও জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য জীবৎকালেই তিনি 'দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা' নামে পরিচিত হন। কলিগ্রামের ন্যায়রত্ন চতুষ্পাঠী তাঁরই দানে গড়ে উঠেছিল।

রাণী দাক্ষায়িণী দেবী

মালদহের চাঁচল রাজ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী। ১৯১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে মালদহের বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র কেনার জন্য তিনি ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ত্রিশের দশকে চাঁচলরাজ শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলালের হাতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুষ্ঠুভবে পরিচালনার জন্য আরো ১ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন।

রাণী সুধারাণী

মালদহের শেরশাহীর (কালিয়াচক) হরেন্দ্রনাথ অগস্থী চৌধুরীর পত্নী রাণী সুধারাণী চৌধুরাণী। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অনুপম কীর্তি রেখে গেছেন। কলকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে নিজের হাতে তৈরী খদ্দরের কাপড় গান্ধীজিকে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহীতে 'নিখিল ভারত চরকা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকার ওই সংঘকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন।

রাজকুমারী সুরেন্দ্রবালা

হরিশচন্দ্রপুরের জমিদার মোহিনী মোহন মিশ্রের কন্যা রাজকুমারী সুরেন্দ্র বালা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি পুষ্পিত নাম। তিনি মালদা ও দিনাজপুর জেলার আদিবাসী, সাঁওতাল ও পোলিয়া সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন করে জেলে গিয়েছিলেন। বহরমপুর জেলে থাকার সময় সত্যভামাদেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা, চারুপ্রভা দাসগুপ্ত, লাবণ্যপ্রভা চন্দ, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সায়েদা খাতুন, চারুশীলা ধর (সম্পর্কে ক্ষুদিরামের দিদি) প্রমুখ তাঁর জেলসঙ্গী ছিলেন।

জমিদারপত্নী উমা রায়

হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার রামহরি রায়ের স্ত্রী উমা রায় রাজনীতি ও সমাজ কল্যাণমুখী কাজে সুকৃতি রেখে গেছেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মালদায় নারী শিক্ষা বিস্তারে 'কন্যা শিক্ষালয়' তাঁর বাড়িতেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উমা দেবী বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ নিজেই পরিচালনা করতেন। মালদায় ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের মূল কেন্দ্রটি হয়েছিল তাঁর মকদুমপুরের বাড়িতে।

রাণী অশ্রুমতী

জলপাইগুড়ির রাজা জগদিন্দ্র দেব রায়কত-এর পত্নী রাণী অশ্রুমতীদেবী নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়িতে করলা নদীর ধারে বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে রাণী অশ্রুমতীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। নারীদের স্বদেশ প্রেমেও তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

এই নিবন্ধের সূচীমুখ

এক. তথাকথিত অনগ্রসর উত্তর বঙ্গের জমিদার পত্নী বা জমিদার তনয়ারা শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ছিলেন।

দুই. প্রজার জাগতিক ও চারিত্রিক জাগরণের জন্য তাঁরাও আন্তরিকভাবে তৎপর ছিলেন। গঠনমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এঁদের কেউ কেউ ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'মহারাণী' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

তিন. এইসব মহিলা জমিদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উদারতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশের কোনও অভাব ছিল না এবং হিন্দু মহিলা জমিদাররা ও মুসলিম মহিলা জমিদাররা প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

চার. এই সব মহিলা জমিদারদের মধ্যে কেউ যেমন উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে, কায়স্থ বংশের ছিলেন, তেমনি মাহিষ্য, তিলি, মুসলিম বংশজাতও ছিলেন। আবার, তপশিলীভুক্ত মহিলা জমিদারেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। জাতি, বর্ণ এবং ধর্মে এঁরা পৃথক হলেও এঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রজা অনুরঞ্জন করা।

পাঁচ. এই সব মহিলা জমিদারগণ দেশীয় প্রজাদের সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে স্বদেশীয়ানা, স্বদেশীভাবনা, স্বাজাত্যবোধ ও সর্বোপরি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৃঢ় প্রতিরোধের দূর্গ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা পরিশেষে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের মহারাণী স্বর্ণময়ীর কথা না বললে অতৃপ্তি থেকে যায়। তেজস্বিনী মহিলা হিসেবে তখনকার সামাজিক রঙ্গমঞ্চের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেপথ্য নায়িকা। তাঁর কীর্তি শুধু ইতিহাস নয়, সাধারণ মানুষেরও বিশেষ সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর এস্টেটের সবচেয়ে বড় মহাল ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুরে। স্বর্ণময়ী বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকতেন। উত্তরবঙ্গকে গড়ে তোলার জন্য ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী মাদ্রাসাকে পাঁচ হাজার টাকা, ১৮৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর হাইস্কুলকে চারহাজার টাকা, ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া ইন্সটিটিউশনকে পাঁচশো টাকা তিনি দরাজ হাতে দান করেছিলেন। রচনাকার।

সূত্র নির্দেশ

১. রংপুরের প্রাচীন ইতিহাস (প্রথম খণ্ড): মুহম্মদ মণিরুজ্জামান, আশরতপুর, আলমনগর, রংপুর থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ১ মে ১৯৮৮।
২. ইতিহাস অনুসন্ধান-২, সম্পাদক, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭; গৌতম নিয়োগী, বাঙালি মহিলা সমাজের সমাজ চিন্তা ও সামাজিক সংগঠন (১৮৫৭ - ১৯০৫); পৃষ্ঠা ২৬০; ধূর্জটি প্রসাদ দে, বাংলার মুসলমান সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতা (১৯০০-১৯৩০); পৃষ্ঠা ২৮৭।
৩. বৃহৎবঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) : দীনেশ চন্দ্র সেন, দে'জ সংস্করণ।
৪. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান: সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯।
৫. রাণীভবানী: অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিশীথরঞ্জন রায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯০, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬।
৬. স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান : সম্পাদক রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮, মালদহ।
৭. দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সম্পাদক শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, বাংলাদেশ ইতিহাস সংসদ।
৮. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal Vol. VII, Report New Delhi, 1974.
৯. Dinajpur District Gazetteer 1912, F.W. Strong.

সহবাস সম্মতি আইন : উনিশ শতকে বাঙালী নারীর প্রতিক্রিয়া

জয়শ্রী সরকার

"ঘোর বিভীষিকা ! জন্মভূমি মহাশ্মশান অপেক্ষাও অধমা হইতে চলিল।"[১]

সহবাস সম্মতি বিল যা ৯ই জানুয়ারী ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়েছিল।[২] সেই বিলটিকে কেন্দ্র করে জন্মভূমি পত্রিকার তথা গোঁড়া হিন্দু সমাজের এই আর্তরব।[৩] মারাঠী সংবাদপত্র "ইন্দু প্রকাশ"-এর কথায় "The Bengal presidency exhibited the most violent reaction. Calcutta was swept by a mad fury and almost convulsed by an unseemingly agitation."[৪] ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় সহবাস সম্মতি বয়ঃসীমা "দশ" এর পরিবর্তে "বারো" প্রতিস্থাপিত করাই ছিল আইনসভায় এ্যানড্রু স্কোল দ্বারা এই বিল উপস্থাপনার উদ্দেশ্য।[৫] সরকারের কাছে এই বিল ছিল একটি তুচ্ছ সংশোধন।[৬]

এই বিল আইন আকারে পাশ হলে, হিন্দু সমাজের দশটি প্রধান সংস্কারের অন্যতম 'গর্ভাধান' সংস্কারটি আর অনুষ্ঠিত করা যাবে না। এই অবশ্য পালনীয় সংস্কারটি হোল একটি মেয়ের প্রথম রজোদর্শনের সাথে সাথে তাকে স্বামীর সাথে সহবাস করতে হবে।[৭] সেই কারণে বিল বিরোধীদের বক্তব্য হোল যে যেহেতু ভারতের মত একটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বারো বছর বয়সের পূর্বেই একটি মেয়ে রজঃস্বলা হয়। আইনানুসারে তার 'গর্ভাধান' সংস্কার এবং সহবাস তার স্বামীকে আইনের চোখে অপরাধী করবে।[৮] এর ফলে ভবিষ্যতে যে সব সন্তানেরা সেই গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করবে তারা পিন্ডদানের অধিকারী হবে না।[৯]

সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্ধারণের বিষয়টি, ১৬ই জুন ১৮৯০-তে সাড়ে দশ বছরের বালিকাবধূ ফুলমণির মৃত্যু, প্রগতিশীল সমাজ নেতাদের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী দশ বছর অতিক্রান্ত ফুলমণির স্বামী, পঁয়ত্রিশ বছরের হরিমোহন মাইতির মাত্র একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।[১০]

সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য বিল বিরোধী সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি যেমন **বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, সহচর, বর্দ্ধমান সঞ্জবনী**, সারস্বত **পত্র, ঢাকা প্রকাশ, সমাজ ও সাহিত্য, পরিদর্শক উলুবেড়িয়া দর্পণ, সুরভি ও পাতক** ইত্যাদি শুধু যে ধর্মের জিগির তুলেছিল তা নয়, এই বিলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের উপর জোর দিয়েছিল।

এই বিলের উপর নারীর বক্তব্য শোনার আগে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে এই বিলের সামাজিক প্রতিক্রিয়া খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। এই মর্মে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে যা উচ্চারিত হয়েছিল, এই বিল সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। তবে যদি একান্তই ভারতবাসীর ধর্মীয় সামাজিক প্রথায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, ভারতবাসীরা নিজেরাই তা সম্ভব করে তুলবে, বিদেশী সরকারের সাহায্য ছাড়াই "Hindu customs and Hindu practice should be seen through with a Hindu's eyes"[১১] উপরন্তু এই আইন ভদ্রঘরের গৃহবধূদের সম্মানহানির কারণ হবে।[১২] প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, স্যার রমেশ মিত্র তাঁর আশংকার কথা বলে জোর দিয়েছেন এই বিল কখনোই কার্যকরী হবে না "If she spoke the truth...her position would be worse than that of a widow."[১৩] তাছাড়া একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জীবনের মূল্য এতখানি নয় যে তার জন্য একটি প্রধান ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেইজন্যই কি "a Phulmoni" শব্দ দুটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।[১৪] এই প্রথা নিষিদ্ধ করতে যে সব ভারতবাসী তৎপর তাঁরা "beef-eaters" এবং বিরোধীদের মতানুসারে, হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।[১৫] তবে যদি সংস্কারের একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে বালিকার প্রথম রজোদর্শনই সম্মতির বয়ঃসীমা হিসাবে নির্দ্ধারণ করা হবে।[১৬] স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই মর্মে তাঁর সহবাস সম্মতি বিলের উপর মতামত দিয়েছিলেন।[১৭] এই বিলকে কেন্দ্র করে অনেকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।[১৮]

যা ভারতবাসীর কাছে "the last unconquered space"[১৯], সহবাস সম্মতি আইনের ফলে সেইটুকুও হারাতে হবে। "আজি আমরা সেই সনাতন পবিত্রতম স্থানের রক্ষার ভার বৈদেশিক রাজপুরুষের হস্তে দিলাম !!! আমাদের অধঃপাতের আর বাকী কি আছে ?"[২০]

সমস্ত ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে বিলের সমর্থনকারীরা, সহবাস সম্মতি আইন পাশের আশু প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। অকাল সহবাসের ফলে কিভাবে বহু বালিকা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।[২১] তাই এই প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতার কাছে সম্মতিব বয়স অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দ বছর করা হোক।[২২]

ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও বিদগ্ধ ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সম্মতির বয়স চৌদ্দ বছরে নির্দ্ধারণ করার পক্ষে সরকারের হস্তক্ষেপ আহ্বান করেছেন কারণ তাঁর কাছে মেয়েদের এই "forcible wifehood and motherhood" হচ্ছে একটি "pernicious custom."[২৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে যে সব বাঙ্গালী মহিলারা বাল্যবিবাহ এবং আরো কিছু সামাজিক কুপ্রথাকে তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের লেখনী ধারণ করেছিলেন, সহবাস সম্মতি বিলের উপর তাঁদের প্রত্যাশিত কন্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না কেন ? ঐতিহাসিক গোলাম মুরশিদ ও তাঁর রচনায় এই প্রশ্ন রাখছেন।[২৪] বেশ কিছু পশ্চিমী মহিলা ডাক্তারদের সহবাস

সম্মতি বিলকে সমর্থন করে লেখা আমরা পাচ্ছি, যেমন ডাক্তার পিচী-ফিপসন তাঁর রচনা "the psychological effects of early Marriage"-এ ভারতবর্ষের বালিকাদের অপরিণত বয়সে সহবাস এবং অকাল মাতৃত্বে বিষময় ফলাফলের বিষয়টির উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।[২৫]

অকাল সহবাসের তেরোটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে, ভারতে চিকিৎসারতা পঞ্চান্নজন বিদেশী মহিলা ডাক্তার সরকারেব কাছে এই আইন শীঘ্র পাশ হওয়াব জন্য আপীল করেছেন।[২৬] ক্যাথেরিন মেয়োর "মাদার ইন্ডিয়া" উপবোক্ত তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে।[২৭] আহমেদাবাদের সম্ভ্রান্ত গৃহের কিছু মহিলা সহবাস-সম্মতি বিলের সমর্থনে একটি জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। সঞ্জীবনী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এই মর্মে যে বাঙালী মেয়েদের দ্বারা এইরকম একটি জনসমাবেশ সম্ভব হোত যদি বাঙালী পুরুষেবা তাঁদের নিজেদের মতামত দেওয়ার অধিকার দিতেন।[২৮]

তা যদি হয় তাহলে কয়েকজন বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মহিলাদের প্রেরিত স্মারকলিপিটির "Our sex is solely dependent on the government for the protection of our rights."[২৯] উল্লেখ পাওয়া যায় কেন ?

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার একটি প্রতিবেদনে আছে যে প্রায় কুড়ি হাজার মহিলা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে বিলের সমর্থনে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তবে দৈনিক কিন্তু এই কাজের জন্য মহিলাদের তীব্র নিন্দা করে বলেছে যে তাঁরা প্রকৃত হিন্দু মহিলা নন।[৩০] এমনও জানা যায় যে কিছু বাঙালী মহিলা লেডী ল্যান্সডাউন ও লেডী ইলিয়টের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন।[৩১] বিলের প্রতি সমর্থন আরো দৃঢ় হয় যখন প্রথম বাঙালী মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রায় দেড়শোজন হিন্দু, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ এবং মুসলমান মহিলাদের নিয়ে এই আইন পাশ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন।[৩২] বিলের সমর্থনে কোলকাতায় মহিলাদের একটি সমাবেশ হয়।[৩৩] সহবাস সম্মতি বিলের সমর্থনে কোলকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। বহু মহিলারা সেখানে তাঁদের স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাছাড়া ময়মনসিংহে বসবাসকারী পঁয়তাল্লিশ মহিলার স্বাক্ষরও কোলকাতা কমিটির কাছে পৌঁচেছে।[৩৪] মহিলাদের রচনা বিলের প্রতি তাঁদের মনোভাবকে পরিস্ফুট করেছে। গরীব ভগিনীর ছদ্মনামে লেখিকা বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁর সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে যেখানে সমাজ সংস্কারকেরা ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাকযুদ্ধে মত্ত না হয়ে দেশের নেতাদের উচিত ছিল সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর, সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা।[৩৫]

ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং আইনসভার সদস্য স্যার এ্যানড্রু স্কোবলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে শ্রীমতী "চা...." তাঁর পদ্যে লিখেছেন যে এই আইন হচ্ছে ভারতকে সুসভ্য ইংরেজ জাতির উপহার যার মূল্য কোহিনূর রত্নের চেয়েও বেশী।[৩৬]

এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতকের খ্যাতনামা লেখিকা মানকুমারী বসুর নাম উল্লেখ করা

যায়। তাঁর বহু রচনায় আমরা তৎকালীন সামাজিক প্রথার বিবরণ পাই বিশেষত বাল্যবিবাহ প্রথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই আইন শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্মানে আঘাত করেছে তবে এটি ভারতীয় মহিলাদের প্রতি রাজানুগ্রহের নিদর্শন।[৩৭]

সহবাস সম্মতি বিলটিকে কেন্দ্র করে যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, আরো দুই দশক পরে কুলদা দেবীর রচনা থেকে জানা যায় "এর থেকে বোঝা যায় যে এই দেশ কত পিছিয়ে আছে।"[৩৮]

এই বিলের প্রতি মহিলাদের সমর্থনকেই কি ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে যেহেতু ইংরেজ জাতি নারীদের প্রতি অনুরক্ত, সেই কারণে ইংরেজ সবকারের পক্ষে নারীদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবা সম্ভব হবে না।[৩৯]

এই বিলের প্রতি বিপরীত মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। মেরিডিথ বার্থউইক একটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন যার লেখিকা হচ্ছে "আ উত্তম্যান"। তবে আলোচিত বিষয়ের উপর যেভাবে রাজনীতির প্রভাব পড়েছে, তিনি মনে করেছেন যে এটি কোনো পুরুষের রচনা বলে ধরা যেতে পারে।[৪০] বিল বিরোধীরা কমলকামিনী এবং সুরেশভামিনী নামের দুটি নারী চরিত্রের কথোপকথনকে হাতিয়ার কবে দেখাতে চেয়েছেন যে নারীরাও এই বিলের বিরোধী। উপরোক্ত নামের নারীরা বলছেন, যে এই দেশে স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা রজস্বলা হয় এবং বারো বছরের পূর্বে সহবাসের জন্য তারা শারীরিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকে।[৪১] এই পুস্তিকায় ইন্দুনিভূষণ দেবী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীকেই জাগ্রত হয়ে সরকারের কাছে আপীল করতে বলেছেন যাতে এই বিল আইন আকারে পাশ না হয়। নতুবা ধর্ম, জাতি, পরিবার সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪২]

বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর কিছু মহিলা এই বিলের বিরোধীতা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল দীঘাপাতিয়ার রাণী ভবসুন্দরী,[৪৩] কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, সিয়ার সোলের রাণী হরসুন্দরী এবং মুর্শিদাবাদের রাণী আন্নাকালীদেবী। তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন যে এটি হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী এবং আচার বিরোধী।[৪৪]

এই বিল পাশ হওয়ার কিছুদিন আগে অর্থাৎ ১৬ই মার্চ, গোঁড়া হিন্দু সমাজ শেষ চেষ্টা হিসাবে কালীঘাটে একটি মহাপূজার আয়োজন করে। মিছিল শুরু হয় কাঁসারি পাড়া ও রসা রোডের সংযোগস্থল থেকে। বেশ কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তি নেতৃত্ব দেন যেমন ক্ষেত্রগোপাল স্মৃতিরত্ন, বামকুমার ন্যায়রত্ন, নীলকৃষ্ণদেব, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ইত্যাদি[৪৫] কালীঘাট মন্দিরের চত্বরে বহু গৃহবধূরা উপস্থিত থেকে বিল বিরোধীদের প্রতি তাঁদের নীরব সহমর্মিতা দেখান।[৪৬]

১৯শে মার্চ, ১৮৯১ তে প্রবল বিরোধীতার মুখে সহবাস সম্মতি আইন পাশ হোল।[৪৭]

এই বৃহৎ সংখ্যক মহিলাদের নীরবতা সরব হয়েছিল আরো চার দশক পরে। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের হরবিলাস সারদার "চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেন্ট অ্যাক্ট"-কে কেন্দ্র করে মহিলাদের কন্ঠস্বর ও উপস্থিতি ছিল জোরালো। তাহলে কি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান নারীকে দিয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা ? তাঁর এই দৃঢ়তা মডার্ণ রিভিয়্যুর পাতায় দেখা যায় "...almost astonishing women all over the country have

demanded the Bill (Sarda) be passed and passed without delay."[৪৮] এর কারণটা সরলাবালা নিজেই বলেছেন "এই কুপ্রথা যদি আমরা নিজেদের চেষ্টায় নিবারণ করিতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন হই, তবে আইনের বিধানের কঠোরতার দ্বারা ইহার নিবারণ স্বতই প্রয়োজন হয়।[৪৯]

সূত্র নির্দেশ

১. **জন্মভূমি**, ফাল্গুন, ১২৯৭, সংখ্যা ৩

২. Home Department Proceedings, January 1891, No 39 (location of sources to be specified)

৩. **জন্মভূমি** পূর্বোল্লিখিত।

৪. **Indu-Prakash**, January 19, 1891 · 4

৫. Government of India, Legislative Department, Gagette of India, 1891, Part V, p. 5

৬. তদেব

৭. পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, **জন্মভূমি**, মাঘ ১২৯৭, সংখ্যা ২।

৮. Tanika Sarkar, Rhetoric Again ! Age of Consent : Resisting Colonial Reason and Death of a Child Wife, Economic and Political Weekly, Sept. 4, 1993, P 1870 Ó

৯. **Dainik O Samachar Chandrika**, January, 11, 1891, R N.P (B).

১০. Empress Vs. Hari Mohan Maitee, Charge, Judicial P.V. Proceedings, June 1893, Nos. 101-102.

১১. **Dainik O Samachar Chandrika**, Op. Cit.

১২. Correspondence · Babu Nobin Chunder Sen, Deputy Magistrate to The Commissioner of the Chittagong Division, dated Feni., Sept 20, 1890, Judicial P.V. June 1893, No. 4411, **Bangavasi** January 30, 1891 R.N.P (B), Srihatta Mihir January 26, 1891 (B) R.N.P.

১৩. **Hindu Patriot**, March 9, 1891.

১৪. **Dainik O Samachar Chandrika**, January 11, 1891.

১৫. **Bangavasi** September 6, 1890 R.N.P.(B) March, 27, 1891, R.N.P.(B).

১৬. **Dainik O Samachar Chandrika**, August 17, 1890 R.N.P.(B); **Saraswat Patra** May 9 1891, R.N.P. (B).

১৭. Santosh Kumar Adhikari, **Vidyasagar and the New National Consciousness**, Appendix E, Calcutta, 1990, pp. xx-xxii.

১৮. **Dainik O Samachar Chandrika** March 16, 1891, R.N.P. (B), **Bengal Exchange Gagette**, March 29, 1891 R N P. (B); **Bangavasi** February 13, 1891 R.N.P(B); **Dainik O Samachar Chandrika** April 28, 1891 R.N.P. (B) Bangavasi April 3, 1891.

১৯. Tanika Sarkar, Hindu Conjugality and Nationalism in the Late Nineteenth Century

Bengal, Jasodhara Bagchi (ed.) **Indian Women : Myth and Reality**, Hyderabad, 1995, p. 98.

২০. **পরিচারিকা**, বৈশাখ, ১২৯৮।

২১. **Sanjivani**, February 10, 1891 R.N.P (B); February 21, 1891 R.N.P (B).

২৩. Dwarkanath Ganguli to the Chief Secretary to Govt. of Bengal, dated February 6, 1891, Judicial Department, P.V. Proceedings, June 1893.

২৪. গোলাম মুরশিদ ও সংকোচের বিহ্বলতা : **আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া**, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ: ১৫৫, ১৬৫।

২৫. **Indu-Prakash** October 27, 1890:3.

২৬. **Sudharak**, November 17, 1890.2; **Indu. Prakash** April 13, 1891:4.

২৭. Katherine Mayo, **Mother India**, London 1919, pp. 52-53.

২৮. **Sanjivani**, February 28, 1891 RNP(B).

২৯. Andrew Scoble's speech, Abstract of the proceedings of the council of the Governor-General of India assembled for the purpose of Making Laws and Regulations 1891, Vol. 30, pp 79-80.

৩০. **Dainik O Samachar Chandrika**, February 4, 1891, RNP(B).

৩১. **Surabhi O Patak** January 30, 1891 RNP(B).

৩২. **Journal of Indian History**, Vol. 49. April/August/December, 1971. p. 296.

৩৩. Mrinalini Sinha, **Colonial Masculinity**, Manchester, 1995, p. 145.

৩৪. Reis & Rayyet, March 21, 1891.

৩৫. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, বৈশাখ, ১২৯৮।

৩৬. তদেব।

৩৭. মানকুমারী বসু, বিগত শতবর্ষে ভারত রমনীদিগের অবস্থা, **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ়, ১৩০২।

৩৮. ঢাকা মহিলা কলেজ, ভারত মহিলা, ফাল্গুন, ১৩১৯।

৩৯. **Srihatta Mihir**, January 26, 1891, RNP(B).

৪০. Meredith Barthwick, **The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905**, New Jersey, 1984, p. 127.

৪১. মেয়ে কর্তৃক লিখিত, আইন ! আইন !! আইন !!! ঢাকা. ১৮৯০, পৃ. ৫।

৪২. তদেব, পৃ ১০।

৪৩. **Indian Mirror**, January 7, 1891.

৪৪. **ঢাকা প্রকাশ**, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৮৯১; Paramananda Datta, **Memoirs of Motilal Ghosh**, Calcutta, 1935, pp. 72-77; **Indian Nation** March 23, 1891 R.N.P. (B)

৪৫. **Hindu Parriot**, March 23, 1891 R.N.P. (B)

৪৬. **সোমপ্রকাশ**, মার্চ ১৬, ১৮৯১।

৪৭. **A collection of the Acts Passed by the Governor General of India in Council in the year 1891**, Calcutta, 1892, pp. 1-2

৪৮. **Modern Review**, March 1929.

৪৯. সরলাবালা সরকার, সারদা আইনের অকার্যকারিতা, **সরলা বালা রচনা সংগ্রহ**, খণ্ড ২, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ: ৬২৩-৬২৪।

উত্তরবঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : স্বদেশী থেকে তেভাগা

রত্নারায় সান্যাল

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের নিয়ে খুব বেশী গবেষণা হয়নি। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দেশের নারীমুক্তির প্রসঙ্গটিও ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নারীজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার পূর্ণতর বিকাশ ঘটেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতীয় পর্যায়ে এই ব্যাপারে কিছু কিছু গবেষণা হলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে গবেষণার সংখ্যা খুবই সীমিত।

উত্তরবাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যা নানা বইতে এবং নানা জনের স্মৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে তা একসঙ্গে আজও গ্রথিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্তমান উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার (উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কুচবিহার, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি) মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে।

ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উত্তরবঙ্গ অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। মূলতঃ এই অঞ্চল কৃষি নির্ভর, জনসংখ্যা ও নানা ভাষাভাষী। জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উত্তরবঙ্গ অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা আলাদা। যদিও এই অঞ্চলে রাজবংশী ক্ষত্রিয় শ্রেণী সংখ্যায় বেশী ছিল, কিন্তু বহিরাগত জনসংখ্যাও একেবারে কম নয়। এই বহুজাতীয় সংমিশ্রণের ফলে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ এই অঞ্চলে অনেক দেরীতে এসে পৌঁছেছিল। স্বভাবতঃ কারণেই মেয়েদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ আরও একটু পরে দেখা দেয়।

স্বদেশী আন্দোলন যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বাঙ্গালি নারীজাগরণের ইতিহাসেও তেমনি এক যুগসন্ধিক্ষণের সূচনা। এই প্রথম আমরা মেয়েদের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখি দেশের কাজে অংশ গ্রহণে। যদিও এ ব্যাপারে পুরুষেরাই সাহায্যের হাত প্রথমে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসংখ্যার অর্দ্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে কোন আন্দোলন সামগ্রিক রূপ পেতে পারে না। মেয়েরা পুরুষদের এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন নানাভাবে এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ যদিও দেরীতে পৌঁছেছিল কিন্তু আন্দোলনের একটা

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমাতা নিবেদিতার নাম স্মরণযোগ্য।

বাতাবরণ অনেকদিন আগে থেকেই তৈরী হতে শুরু করেছিল। তার কারণ জাতীয় পর্যায়ের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই নানা কার্যোপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গে এসেছেন, থেকেছেন, নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। এঁদের উৎসাহ, কর্মপন্থা উত্তরবঙ্গবাসীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। মেয়েরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অনেকবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন।

আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি:

(১) স্বদেশী আন্দোলন - ১৯০৫,
(২) অসহযোগ আন্দোলন - ১৯২০-২২,
(৩) আইন অমান্য আন্দোলন - ১৯৩০-৩৪
(৪) ভারতছাড় আন্দোলন - ১৯৪২ এবং
(৫) তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন :-

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রতিবাদ স্বরূপ সারা বাংলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হলে উত্তরবাংলাতেও এর ঢেউ এসে লেগেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়েছিল। এই সময় মালদাতে বলদেবানন্দ গিরী মেয়েদের শিক্ষার জন্যে "মহাকালী পাঠশালা" নামে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কালিয়াচক জমিদার পরিবারের সুধারাণী চৌধুরাণী প্রথম স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর গৃহে অনেক বিপ্লবী এবং কংগ্রেস কর্মীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। উমা রায় তাঁর কলেজ জীবন থেকেই অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন।[১]

কোচবিহারে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজ্যে আধুনিকী করণের ছোঁয়া লেগেছিল। মহারাণী সুনীতি দেবী ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম আলোকপ্রাপ্তা মহিলা। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা। পিতা কেশব সেনের সুযোগ্যা কন্যা হিসাবে কোচবিহারে মহারাণী সুনীতি দেবী স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন।[২] শুধু তাই নয় তিনি স্বদেশী আন্দোলনে মেলা এবং 'সখী সমিতির' কাজ চালানোর জন্যে অর্থদান করেছেন।[৩] মহারাণী গায়ত্রীদেবী তাঁর "A Princess Remembers" গ্রন্থে লিখেছেন যে রাজবাড়ীতে তাঁরা সূতো কাটতেন স্বদেশী বস্ত্র তৈরী করার জন্যে।[৪]

জলপাইগুড়িতে সুভাষিণী ঘোষ গোপনে রাজনৈতিক সংস্থা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি জলপাইগুড়িতে কংগ্রেস মহিলা সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন।[৫] বর্জননীতির সমর্থনে জলপাইগুড়িতে অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তার নেতৃত্বে সভা হয়।[৬] মুসলমান মহিলাদের মধ্যে লুতফার রহমান স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অসহযোগ পর্যায় :-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দিনাজপুরে বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন আন্দোলন শুরু হয়, জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রতিবাদের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। বালুরঘাটে একটি 'মহিলা সমিতি' এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৭] অসহযোগ পর্যায়ে এই অঞ্চলের মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কালিম্পং-এ দলবাহাদুর গিরীর চেষ্টাতেই দার্জিলিং জেলার মেয়েরা জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেয়। এঁদের মধ্যে হেলেন লেপ্‌চার নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিছিল নেপালী ও গোর্খা সৈন্য। এদের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে ইংরেজ সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সম্প্রদায় থেকেই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এক অগ্নি স্ফুলিংগ - হেলেন লেপ্‌চা। তিনি মজঃফরপুর ও আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। আমেদাবাদে থাকাকালীন শ্রীমতী লেপ্‌চার সাথে মহাত্মা গান্ধীর যোগাযোগ হয়। গান্ধীজি হেলেন লেপ্‌চার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাবিত্রী দেবী। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তিনি শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার হন। ছয় মাস তিনি জেলে ছিলেন। এরপর তাঁকে কার্শিয়াং-এ নজরবন্দী করে রাখা হয়।[৮]

মালদা জেলায় অসহযোগের ঢেউ এসে লাগলে সুধারাণী চৌধুরাণীর সাথে আমরা বাচাসাবির কৃষ্ণগোপাল সেন এর সহধর্মিণী তরুবালা সেন এর নাম পাই। এঁরা বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলাও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তীদেবীর জলপাইগুড়ি শহরে আগমন। জলপাই-গুড়ি জেলার অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবারের মেয়েরা বাসন্তীদেবীকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। তাঁরা স্বরাজ তহবিলে মুক্তহস্তে অর্থদান করেছিলেন। 'আর্য সমাজ' সভাঘরে মেয়েদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে শুধুমাত্র উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই নয়, সাধারণ পরিবার এমনকি পতিতারাও বহু সংখ্যায় এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।[৯] কমলা পাকড়াশি, শশিমুখি গাঙ্গুলী, সুনীতি নিয়োগী প্রমুখরা চরকা কাটার জন্যে মেয়েদের আহ্বান জানান এবং এঁরা বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

আলিপুরদুয়ার মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুমার গ্রাম এবং অন্যান্য গ্রামে মেয়েরা মঘা দেওয়ানীর নেতৃত্বে রাজস্ব না দেবার (non payment of Revenue) আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার জন্যে দুর দুরান্ত গ্রাম থেকে অনেক রাজবংশী মহিলারা এসেছিলেন। তাঁরা গান্ধীকে গান শুনিয়েছিলেন :

"মহাত্মা গান্ধীজি আমরা খদ্দর ধৈরাছি
বিলাইতি নুন আর খাস্ না, দেশী ধৈরাছি।"

এই সময়ে জলপাইগুড়িতে উকিল পাড়ার মোড়ে মেয়েদের জন্যে স্কুল এবং 'মাতৃমন্দির' নামে মেয়েদের একটি সংঘ তৈরী হয়েছিল। বিমলা রায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।[১০] ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দার্জিলিং-এ হিন্দু পাবলিক হলে একটি মহিলা সভায় চরকা এবং খাদির ওপব ভাষণ দেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু জলপাইগুড়িতে একটি মহিলা সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধরনের আয়োজিত এবং সংগঠিত বিভিন্ন মহিলা সভা, সংঘ ইত্যাদি মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তাঁদের এতে অংশগ্রহণে উৎসাহ উদ্দীপনাই সূচিত করে।

আইন অমান্য পর্যায় :-

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ শে যখন স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় শপথ নেওয়া হয়, তখন সারাদেশ এক অভূতপূর্ব আবেগে উদবেলিত হয়ে উঠেছিল। বাংলার উত্তরাঞ্চল এর ব্যতিক্রম ছিল না। মফস্বলে ও শহরে তীব্র আন্দোলনের ফলে বহুলোক কারাবরণ করেন এবং নানাভাবে সরকারী নির্যাতন ভোগ করেন। দিনাজপুরের বালুরঘাটে রাজলক্ষ্মী গুহ কয়েকজন যুবক, এবং প্রভা চ্যাটার্জী পদযাত্রা করে মফস্বলে প্রচার করেন। এখানেও মেয়েরা একটি 'মহিলা সমিতি' গঠন করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন গোপাল চ্যাটার্জীর পত্নী। প্রভা চ্যাটার্জী, বেলা চ্যাটার্জী, জ্ঞানদাদেবী, রাজলক্ষ্মী গুহ, বিমলা সুন্দরী দাসী প্রমুখ ছিলেন সমিতির অন্যতম সদস্যা। এঁরা ১৯৩০ এর মার্চ মাসের শেষে দিনাজপুর জেলা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হাটের দিনে মদের দোকান এবং কাপড়ের দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন।[১১] সরকারেব নিষেধ না মেনেও তাঁরা বিক্ষোভ চালাতে থাকলে প্রভা চ্যাটার্জী ও বেলা চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার কবে বহরমপুর জেলে বন্দী রাখা হয়। এই সময়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল দিনাজপুরের সিতাবগঞ্জে মুসলিম মহিলাদের সম্মেলন। তাঁরা পর্দাপ্রথা তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন করেন। দিনাজপুরের উকিল মৌলবী কাদের বক্স এর কন্যা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠ করেন। কাদের বক্স-এর পত্নী মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন এবং আলোচনা করেন।[১২]

মালদায় ভালুকার জমিদার কন্যা সুরেন্দ্রবালার নাম অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মালদায় মহিলাকর্মী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। প্রায় দু হাজার মহিলা কর্মী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। মালদহের অন্যতম নেতা সুবোধ কুমার মিশ্রের নেতৃত্বে নৈশ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। তাঁকে এই কাজে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মৃণালিনী দেবী, শৈলবালা রায়, গিরিজা সুন্দরী দেব্যা প্রমুখ। এই সব মহিলারা সেদিন সামাজিক এবং পাবিবারিক বাধাকে উপেক্ষা করে মিছিলে যোগ দিতেন, পর্দা প্রথা তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন করতেন, হাটে হাটে পিকেটিং কবতেন বিলিতি মদের, বিলিতি কাপড়ের দোকানে। ১৯৪০ সালে গান্ধীজির অনুমোদিত

সত্যাগ্রহী আন্দোলনে মালদহ জেলায় অন্যান্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রবালা রায়ের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য। প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে অংশ না নিলেও ডুবাই মন্ডলের পত্নী আলো দাসী ছিলেন মহীয়সী মহিলা।[১৩]

আরউইন চুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠক থেকে শূন্যহাতে গান্ধীজি ফিরে এলে আবার যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় তখন জলপাইগুড়ি জেলার ওপর দিয়ে অত্যাচারের ঝড় বয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলে তখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, মেদিনীপুরে পেডি হত্যার আসামী ফণীন্দ্রনাথ কুন্ডু ও পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথে সচেতন যুবকরা এক হতে শুরু করেছে। মেয়েরাও একেবারে পিছিয়ে নেই। কংগ্রেস ও সন্ত্রাসবাদে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো মহেন্দ্র বালা দেবী, বীণা চৌধুরী, সরযু সরকার, বাণী ভৌমিক প্রমুখ। এঁদের নেত্রী ছিলেন সুভাষিণী ঘোষ।

অরুণা দাশগুপ্ত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। শৈলবালা গুরুং প্রথম নেপালী মহিলা যিনি আইনভঙ্গ করেছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী জলপাইগুড়িতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল। শহরের শোভাযাত্রায় রাজলক্ষ্মীদেবী, কুসুমকামিনী ভাদুড়ী, মাতঙ্গিনী দাশগুপ্ত, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, বিমলাবালা সেনগুপ্ত সহ আরও অনেক মহিলা অংশ নিয়েছিলেন।[১৪] জলপাইগুড়ি বোনাপাড়া গ্রামে স্বর্ণময়ী রায়ের নেতৃত্বে রাজবংশী মহিলারা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৫] ১৯৩৯-এ জলপাইগুড়িতে স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর পরিচালিকা ছিলেন সুনীতি নিয়োগী।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়ি শহরে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির একটি শাখা গঠিত হয়েছিল। বিভা দত্ত, কল্যাণী চন্দ, কল্পনা নিয়োগী, লীলা সেন, আশা রায়চৌধুরী, অমিয়া নন্দী প্রমুখ মহিলারা শহর এবং গ্রামাঞ্চলে কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রচার করেন। ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে মাইলি ছেত্রী নামে একজন নেপালী মহিলা কুলি শ্রমিক কমিউনিষ্ট কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৬]

দার্জিলিং এর সাবিত্রীদেবী লবণ আইন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ এ পার্বত্য অঞ্চলের বিপ্লবীগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ কার্শিয়াং-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাবিত্রীদেবীর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সাবিত্রীদেবীর মাধ্যমেই নেতাজী সব নির্দেশনামা পাঠাতেন। খরকা বাহাদুর নামে এক স্থানীয় রুটি বিক্রেতা রুটির সঙ্গে চিঠিপত্র ইত্যাদি গিরদা পাহাড়ে নেতাজীর কাছে পৌঁছে দিতেন। সাবিত্রী দেবী নির্ভীকভাবে দেশের জাতীয় আন্দোলনে কাজ করে গিয়েছেন।[১৭]

ভারতছাড়ো আন্দোলন :-

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র বসু উত্তরবঙ্গে আসেন এবং 'মহিলা সংগঠন' গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪২-এ ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ কমবেশী উত্তরবঙ্গের সবজায়গাতে এসে লাগলেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়

বালুরঘাট, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার কুমারগ্রাম থানার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি জায়গাতে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা ছিল অনেক বেশী।

শিলিগুড়িতে আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ সিউমঙ্গল সিং ও ডাঃ ব্রজেন্দনাথ বসু রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিল।[১৮] মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যু শোককে কেন্দ্র করে একটি মৌন মিছিল বেরিয়েছিল এবং এই মিছিলের জন্যেই এইসব কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন পুলিশ। ১লা সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে হরতাল পালিত হয়েছিল। এই হরতালে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা।[১৯]

৯ই সেপ্টেম্বর ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বসুরায় চৌধুরীর কন্যা সীতা বসুরায়চৌধুরী ও শ্রীমতী কালিদাসী সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একহাজার লোকের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে থানার দিকে এগুচ্ছিল। পুলিশ শোভাযাত্রার উপর গুলি চালায়। এরফলে ৭/৮ জন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পাঁচ জন মারা গিয়েছিলেন। একজন নেপালী মহিলা সহ চারজন মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।[২০]

তারা ব্যানার্জী এবং উমা দাশগুপ্তার নেতৃত্বে ১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট জলপাইগুড়িতে এক বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল। শহর মফস্বলের সব স্কুল বন্ধ ছিল। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ভারতছাড় আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরবালা গাঙ্গুলী, গিরিবালা ব্যানার্জী প্রমুখ।[২১] এই আন্দোলনে অনেক রাজবংশী মহিলাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতছাড় আন্দোলনে কুমারগ্রাম দুয়ার থানা কয়েক ঘন্টার জন্যে আন্দোলনকারীদের হাতে চলে গিয়েছিল।[২২]

বৈভব ও ব্যাপ্তিতে ১৯৪২-এ বালুরঘাটের গণবিপ্লব সর্বভারতীয় মর্যাদার অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে ১৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শহর সারাদিনের জন্যে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।[২৩] মেয়েদের মধ্যে প্রভা চ্যাটার্জী এবং অহল্যা সোরেন নামে বালুরঘাটের একজন আদিবাসী মহিলার নাম ভারতছাড় আন্দোলনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মালদহে অন্যান্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রবালা রায় ও তরুবালা সেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উমা রায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও কর্মীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কোচবিহার দেশীয় রাজপরিবার দ্বারাই শাসিত হ'ত। স্বভাবতকারণেই ভারতছাড় আন্দোলন এ রাজ্যে দানা বাঁধেনি। এরাজ্যে মহিলা ছাত্রীরা এই সময়ে ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়ে-ছিলেন। অপরাজিতা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সুনীতি একাডেমীর ছাত্রীরা নেতাজীর জন্মদিন পালনের অনুমতি না পেয়ে আন্দোলন শুরু করেন। সরকারের তরফ থেকে ছাত্রীদের এই ব্যবহারের জন্যে তাদের বৃত্তি বন্ধ করে দেন। এর প্রতিবাদ স্বরূপ ছাত্রীরা ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিলেন।[২৪]

এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রেখেছিলেন, কালক্রমে দেশের প্রতিবাদী আন্দোলনেও তাঁরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

১৯৪৮-এ জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রংপুর-এ তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। জলপাইগুড়িতে এই আন্দোলনে রাজবংশী মহিলারা বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সাগবী, বর্মনী, পূণ্যেশ্বরী, বর্মণী (বুড়িমা) এঁদের নাম এ অঞ্চলে সর্বজন-বিদিত।[২৫] তেভাগা আন্দোলনের সময়ে পুলিসি অত্যাচার যখন চরমে, বুড়িমার নেতৃত্বে মাকড়ি, উজানি, বিদ্যা কমরেডরা আরো মেয়েদের নিয়ে ছাম গাইন হাতে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েছেন। যেখানে যেখানে তেভাগা হয়েছে সেখানে উপস্থিত থেকে ধান ভাগ করা থেকে গোলায় তোলা পর্যন্ত কাজ করেছেন। পঁচাগড়ের বুড়ি ও বুড়িমা (শিখা নন্দী, তিলক তারিণীদেবী) দিনের পর দিন মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন - মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অথবা কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। শুধু এই নয়, আন্দোলন চলাকালীন নানা রকম গোপনীয়তা রক্ষা করে পুলিশের মুখোমুখি হতে তাঁরা এতটুকুও ভয় পাননি। 'জান দিমু তবু ধান দিমুনা'-এটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও স্থান, কাল, পরিবেশে তাঁদের অবদান অপরিসীম।[২৬]

দিনাজপুরে জয়মণি এবং পশ্চিম ঠাকুরগঞ্জে দীপশোরী নামে একজন মহিলা তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সময়েব সবচাইতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল রংপুর জেলায়। এখানে একজন বৃদ্ধা রাজবংশী রমণী একজন মাড়োয়ারী জোতদারকে হত্যা করেছিলেন।

অতএব, বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নারী সমাজও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। আলোচ্য অঞ্চলগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট জাতীয় স্তরের তুলনায় পশ্চাদপদ হলেও এঅঞ্চলের নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে পরিবর্তন নাবীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ক্রমে তা তাঁদের আত্মনির্ভর এবং আত্মসচেতন করে তুলেছিল। এই সময় থেকেই নারী জাগরণের ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে - যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে পরবর্তী রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে এবং আজও যার সম্পূর্ণ বিকাশ পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রথম দিকের আন্দোলনে প্রধানতঃ উচ্চ, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে সাধারণ এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও এই সচেতনতা লক্ষ্য করি। তাই তেভাগা আন্দোলনে নিরক্ষর, দরিদ্র, গ্রাম্য 'বুড়িমা'দের এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাই - যাঁদের সাহস, ত্যাগ ও শ্রেনীশত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণা আন্দোলনে এক নতুনমাত্রা যোগ করেছে।

এঁদের সম্পর্কে ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু গবেষকেরা এখনও সেরকমভাবে গবেষণা শুরু করেননি। ইতস্ততঃ ছড়ানো কিছু লেখা এবং বইপত্র থেকে এই সামান্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। তন্নিষ্ঠ ইতিহাস গবেষকদের এঁদের প্রকৃত ভূমিকা অন্বেষণে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সূত্র নির্দেশ

১. ডা: রাধাগোবিন্দ ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান পৃ: ১৪, ৩৫।
২. শুক্লা ঘোষ, নারীশিক্ষা ও কোচবিহার, সুনীতি একাডেমী, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা ১৯৮১।
৩. আনন্দ গোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার, মধুপর্ণী কোচবিহার জেলা সংখ্যা পৃ: ৪০১।
৪. গায়ত্রীদেবী ও শান্তা রামা রাউ, দি প্রিন্সেস রিমেমবারস্, পৃ: ২০৪।
৫. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ন্যাশানালিষ্ট মুভমেন্ট এ্যাণ্ড ফ্রিডম ষ্ট্রাগল্ ইন সাম সিলেক্টেড এরিয়াস অফ নর্দান বেঙ্গল (১৮৫৭-১৯৪৭) অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ।
৬. সমরেন্দ্র দত্ত রায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃ: ২০ উত্তরবঙ্গ (১) স্মারক গ্রন্থ, উত্তরবঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন, ১৯৭৩।
ভারতী রায় অনু:, ফ্রম দা সিম্‌স অফ হিষ্ট্রি - পৃ: ১৮৬ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট এ্যাণ্ড ফেমিনিষ্ট কন্‌সাসনেস।
৭. জে.সি সেনগুপ্ত, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ওয়েষ্টদিনাজপুর।
৮. মলয়শঙ্কর ভট্টাচায, পূর্বোল্লেখিত।
সমরেন্দ্র দত্তরায়, পূর্বোল্লোখিত, পৃ: ৩৫।
৯. রণজিৎ দাশগুপ্ত, ইকনমি, সোসাইটি এ্যাণ্ড পলিটিক্‌স ইন বেঙ্গল : জলপাইগুড়ি ১৮৬৯-১৯৪৭ পৃ: ১১০।
১০. নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়, পৃ: ১৪।
১১. সমরেন্দ্র দত্তরায় পূর্বোল্লেখিত - পৃ: ৫৪।
১২. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পূর্বোল্লেখিত।
১৩. সমরেন্দ্র দত্তরায়, পূর্বোল্লেখিত - পৃ: ৪৯-৫১।
১৪. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ: ২৯২।
১৫. নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ২১।
১৬. জনমত ১৯৮১, পৃ: ৫।
১৭. সমরেন্দ্র দত্তরায়, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ২০-২১।
১৮. অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।
১৯. আনন্দগোপাল ঘোষ, ভারতছাড় আন্দোলন:প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ-ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
২০. কুইট্ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-১৯৪২, এ কালেকশন অফ ডকুমেন্টস্ ভল্যুম-১, গর্ভণমেন্ট অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, পৃ: ৩৯।
২১. জনমত, ৮.৩.১৯৮১, পৃ: ৫,৭।
২২. আনন্দগোপাল ঘোষ, পূর্বোল্লেখিত; পৃ: ১৭।

২৩. তদেব।

২৪. আনন্দ গোপাল ঘোষ এবং শেখর সরকার, মধুপর্ণী কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পৃ: ৪০৭।

২৫. রণজিৎ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ২২৭

২৬. কল্যাণী দাশগুপ্ত, তেভাগা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ পৃ: ৪০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- অধ্যাপক আনন্দ গোপাল ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ, বিশ্ববিদ্যালয়।
শ্রীমতী রত্না পাল, প্রাক্তন, এম্ ফিল ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভোটাধিকার থেকে আসন সংরক্ষণ : ভারতীয় মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

রাজশ্রী দেবনাথ

মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বিশেষত ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় মহিলাদের একাংশ পুরুষদের মতই ভোটাধিকার অর্জনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন আর শতাব্দীব শেষ পর্বে তাঁদেরই উত্তরসূরীরা সংসদীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভা ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলিতে নিজেদের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। দুটি ভিন্ন দাবি কিন্তু দাবি দুটির উদ্দেশ্য অভিন্ন। এই উদ্দেশ্য হ'ল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করা।

১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভারত সচিব এডুইন মন্টেগু ভারত সফরে আসেন এবং তিনি ও তৎকালীন ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড ভারতীয়দের সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভারত সচিবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা হয় এবং ঐ বছরেই ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এক সর্বভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ঐ স্মারকলিপিটিই ছিল মহিলাদের দাবি - দাওয়া সংক্রান্ত প্রথম স্মারকলিপি যা মহিলারা নিজেরাই পেশ করেছিলেন। এরপর আরো সংগঠিত পথে ভাবতীয় মহিলারা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে তৎপর হন, বিশেষ করে ভোটাধিকার অর্জনের দাবিতে। মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের দাবিতে যে সব নেত্রী সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সরলা দেবী চৌধুরাণী, মার্গারেট কাজিনস্‌, অ্যানি বেসান্ত, ডরোথি জিনারাজাদাসা, হীরাবাঈ টাটা, রমাবাঈ রাণাডে, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে মহিলা সংগঠন যেমন- অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স, উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। স্বভাবতই মনে হতে পারে সর্বস্তরের সমর্থন লাভ করে মহিলারা সহজেই ভোটাধিকার লাভ করেছিলেন। ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৫ - এই দীর্ঘ আঠারো

বছরের অবিরাম আন্দোলনের ফল হিসাবেই ভারতীয় মহিলারা ভোটাধিকাব লাভ করেছিলেন। ধাপে ধাপে, একটু একটু করে। ভারতীয় মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানে বিদেশী শাসক বর্গের ঔদাসীন্য (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য) যেমন ছিল তেমনি ছিল এদেশীয় রক্ষণশীল নেতৃবর্গের বিরোধিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কর্নেলিয়া সোরাবজির মত কিছু শিক্ষিত মহিলা নেত্রীও মহিলাদের ভোটাধিকারের বিরোধী ছিলেন। এই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ভারতীয় মহিলারা ভোটাধিকাব অর্জন করেছিলেন।

ভারত সচিব এডুইন মন্টেগুর ভারত সফরেব সময় থেকেই শ্রীমতী সবোজিনী নাইডু, সরলাদেবী চৌধুরাণী সহ অন্যান্য নেত্রীবর্গ কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন সভায়, অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভোটাধিকারের পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলন, হোমরুল লীগ এবং মুসলিম লীগ ভোটাধিকারের প্রশ্নে লিঙ্গগত বৈষম্যের অবসানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অথচ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদনে মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধানের জন্য সাউথবরো ফ্রাঞ্চাইস্ কমিটিকে ভারতে পাঠানো হয়। ভারতের মহিলা সংগঠনগুলির একটি প্রতিনিধিদল ঐ কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের কাছে ভোটাধিকাব প্রদানেব জন্য পুনবায় আবেদন করে। সাউথবরো কমিটি বিভিন্ন আবেদন পত্র গ্রহণ করলেও শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও বাংলায় কিছু মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মহিলাদের ভোটাধিকারের আবেদনকে খারিজ করে দেয়। কমিটির যুক্তি ছিল ভারতীয় মহিলাদের মানসিকতা এবং সামাজিক প্রথা মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে অনুপযোগী এবং এ অবস্থায় মহিলাদের ঐ অধিকার প্রদান করা হলে তা সময় ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে না।[১]

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড এবং সাউথবরো কমিটির এই নেতিবাচক ভূমিকা ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রীবর্গকে হতাশ করলেও হতোদ্যম করতে পারেনি। ১৯১৯ সালে উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অ্যানি বেসান্ত এবং দি বম্বে কমিটি অন উইমেন সাফরেজ-এর প্রতিনিধি শ্রীমতী হীরাবাঈ টাটা ও মিথান টাটা লন্ডনে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মহিলাদেব ভোটাধিকারের সপক্ষে তথ্য ও যুক্তি পেশ করেন।[২] ভারতীয় সমাজে মহিলাদের একাংশের মধ্যে প্রচলিত পর্দাপ্রথা এবং ধর্ম যে মহিলাদেব ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না একথা মহিলা প্রতিনিধিরা জোর দিয়ে বলেন। ভাবতেব মহিলা সংগঠনগুলি, জাতীয় কংগ্রেস, হোমরুল লীগ, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটেনের মহিলা সংগঠনগুলিও ভারতীয় মহিলাদের ভোটাধিকারের পক্ষে কমন্স সভায় স্মাবকলিপি পেশ করেন।[৩] কিন্তু জয়েন্ট কমিটি নিজে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে ভাবতের প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর ওপর ন্যস্ত করে।[৪] অতঃপর ১৯২১ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই, ১৯২৩ সালে যুক্তপ্রদেশ, ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব ও বাংলা এবং ১৯৩০ সালে আসাম, বিহাব, ওড়িষা ও কেন্দ্রীয় প্রদেশে মহিলাদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়।

এরপরও ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কারণ ইতিমধ্যে মহিলারা যে ভোটাধিকার লাভ করেছিলেন তা ছিল সীমিত অংশের ভোটাধিকার। আরো বেশী সংখ্যক মহিলা যাতে ভোটাধিকার লাভ করেন এবং আইনসভাগুলোতে নির্বাচিত হবার অধিকার লাভ করতে পারেন তার জন্য দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম গোলটেবিল বৈঠক কংগ্রেস ও ভারতের অগ্রণী মহিলা সংগঠনগুলি বয়কট করলেও সরকার মনোনীত দু'জন মহিলা প্রতিনিধি বেগম জাহানআরা শাহনওয়াজ এবং শ্রীমতী রাধাবাঈ সুব্বারায়ন ঐ বৈঠকে যোগদান করেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারকে কাঙ্খিত মনে করলেও তাঁরা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে মহিলাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ভারতের মহিলা সংগঠনগুলি যেমন অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া এই সংরক্ষণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং সাম্য ও সমানাধিকারের দাবিতে অটল থাকে। ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করে এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহিলা সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠক শেষে মহিলাদের ভোটাধিকার বিস্তৃত করাব জন্য সুপারিশ পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে পেশ করা হয় এবং বিষয়টি স্থির করার জন্য লোথিয়ান কমিটি গঠন করা হয়। লোথিয়ান কমিটি তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ভারতের বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা এবং বয়স্কদের মধ্যে ব্যাপক নিরক্ষরতার জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি অগ্রাহ্য করলেও সমাজ সংস্কারের স্বার্থে আরো বেশী মহিলাদের ভোটাধিকার দেবার পক্ষে মতপ্রকাশ করে এবং কুড়িজন পুরুষ পিছু একজন মহিলাব ভোটাধিকারের পরিবর্তে পাঁচজন পুরুষ পিছু একজন মহিলাকে ভোটাধিকার প্রদানের সুপারিশ করে।[৫] এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং এর ফলে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১৯১৯ সালের আইনে ঘোষিত ৩,১৫,০০০ থেকে প্রায় ছয় লক্ষ বৃদ্ধি পায়।[৬] এই অধিকার পর্যাপ্ত না হলেও দীর্ঘ সতেরো বছরের একটানা আন্দোলনের ফলেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

পরাধীন ভারতে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের শিকার মহিলারা হয়েছিলেন তার অবসান ঘটে স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সাম্যের আদর্শকে স্বীকৃতি জানানো হয় এবং সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গগত বৈষম্য করা হয়নি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছরের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বাস্তবে এই সাম্য প্রতিফলিত হয়নি। সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা সত্য কিন্তু জাতীয় ও রাজ্যস্তরের আইনসভাগুলোতে মহিলা জনপ্রতিনিধির সংখ্যা নামমাত্র। এপর্যন্ত গঠিত তেরটি লোকসভার প্রতিটিতেই মহিলা সাংসদদের সংখ্যা মোট প্রতিনিধি সংখ্যার দশ শতাংশের নীচে ছিল।[৭] রাজ্য বিধান-সভাগুলোতেও একই চিত্র। জাতীয় ও রাজ্যস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান মন্ত্রিসভাগুলোতে

মহিলা প্রতিনিধিত্বের হার আরও কম।[৮] লোকসভা, রাজ্যসভা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের মন্ত্রিসভাগুলোতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা থেকে স্পষ্টত:ই প্রমাণ হয় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের যে রাজনৈতিক সমানাধিকার ও সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত হয়েছে তা তত্ত্বগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, বাস্তবায়িত হয়নি। এই তত্ত্বগত সাম্য ও বাস্তব বৈষম্যমূলক অবস্থার বিরুদ্ধে সমতা ও সামাজিক মর্যাদার দাবিতে ভারতীয় মহিলারা সত্তরের দশক থেকেই সোচ্চার হন। বিশেষ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষিত হবার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের মহিলাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৭০ এর দশকে ভারত সরকার মহিলাদের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য 'কমিটি অন দি সোস্যাল ষ্টেটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রতিবেদন থেকে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। কমিটির মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অপর্যাপ্ত এবং এর কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মহিলাদের প্রার্থী করার ও তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্যোগের অভাব, মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ভার বহনের প্রশ্নে পারিবারিক ও দলীয় অসহযোগিতা, রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কারণে মহিলাদের চরিত্র হননের চেষ্টা প্রভৃতি। সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের পথে এই সব প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিভিন্ন মহিলা গোষ্ঠী কমিটির কাছে একাধিক যুক্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের আইন সভাগুলোতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষরের দাবি জানায়।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পরাধীন ভারতে মহিলারা যখন ভোটাধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন তখন তারা সংরক্ষণের এবং মনোনয়নের বিপক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন।[১০] অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির অর্ধশতক পরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের পশ্চাদপদতা, তাদেব বিরুদ্ধে সংঘটিত হিংসা, অন্যায়, অসাম্য প্রভৃতি কারণেই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সাময়িক বা বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করার দাবি উঠেছে। কমিটি লোকসভা বা বিধানসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিকে সমর্থন না করলেও পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলোতে অর্থাৎ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করেন।[১১]

মহিলা সংগঠনগুলোর নিরন্তর দাবি এবং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে সংরক্ষণ সমগ্র দেশে কার্যকর হলে দেশের মোট পঞ্চায়েত সদস্য ২২,৫০,০০০ জনের মধ্যে ৭,৫০,০০০ হবেন মহিলা আর মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান হবেন ৭৫,০০০ জন। সমগ্র দেশের ৫১,০০০ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে মহিলা সদস্যের সংখ্যা হবে ১৭,০০০ জন। পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতির সংখ্যা হবে ১৭০০ জন। সেই হিসাবে সমগ্র দেশে

জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৭৫০ জনের মধ্যে ১৫৮৩ জন মহিলা হবার কথা। এবং জেলা পরিষদের মহিলা সভাপতির সংখ্যা হওয়া উচিত ১৫৮ জন।[১২] ইতিমধ্যে যে সমস্ত রাজ্যে স্বায়ত্ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানে এই সংরক্ষণ কার্যকর হয়েছে যেমন কর্ণাটক, ওড়িষা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশে এক ব্যাপক সংখ্যক মহিলাব প্রত্যক্ষ ও সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে এই সব প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে তাদেব ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের দশটি[১৩] এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি (কুলটিকরী)[১৪] পঞ্চায়েতের উল্লেখ করা যায় যেগুলো সম্পূর্ণভাবেই মহিলা সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এইসব শতকরা একশভাগ মহিলা সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েতগুলো দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ প্রশাসন গঠন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছে। এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের নিরক্ষর পঞ্চায়েত প্রধান ফতেমা বাঈ, যিনি ১৯৯৯ সালের জাতিপুঞ্জের উন্নয়ণ প্রকল্পের অন্তর্গত "Race Against Poverty" পুরস্কার লাভ করেছেন, প্রধানতঃ স্বনিযুক্তপ্রকল্পে মহিলাদের ব্যাপকহারে শামিল করার জন্য[১৫] এবং মহারাষ্ট্রের একজন পঞ্চায়েত প্রধান, সুমনটাই, যিনি শুধু পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ারটিতে বসার জন্যই একবছর ধরে লড়াই করেছিলেন[১৬], এদের ঘটনা থেকে বোঝা যায় কিভাবে পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে উন্নয়ণ মূলক কাজের সাথে সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণ গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন কবেছে এবং মহিলারা নিজেরাই তাদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বিভিন্ন প্রথা, সংস্কার ও অভ্যাস দূর করতে উদ্যোগী হয়েছেন। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন, বধূ নির্যাতন ও পণ প্রথা বিরোধী আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন প্রভৃতিতে মহিলা নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলাদের উন্নতির জন্য গৃহীত বহুবিধ সরকারী প্রকল্প তৃণমূল স্তর থেকে বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনেব পবিপূরক হিসাবে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে আইনসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯৬ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর সংসদে ৮১ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হয়। ঐ বিলে ৩৩০(ক) এবং ৩৩২(ক) - এই নতুন দুটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়।[১৭] এই ৮১ তম সংবিধান সংশোধনী বিল বা মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটিকে সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, জনতা দল (ইউনাইটেড), মুসলিম লীগ সমর্থন করেনি। এইসব দলগুলো মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিরোধী না হলেও তারা প্রস্তাবিত এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনের মধ্যে তফশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে চান। উক্ত বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। দীর্ঘ চার বছর অতিক্রান্ত হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা ও তাদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবের দরুণ বিলটি এখনও পর্যন্ত আইনে

পরিণত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মহিলা সাংসদগণ দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ বিলেব পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং সংসদেব ভিতরে ও বাইরে বিলটি পাশ কবানোব জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

মহিলাদেব জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষে বিপক্ষে বহু যুক্তি বয়েছে। এই বিতর্কে না গিয়েও একথা বলা যায় যে ভারতে মহিলারা যে বহুবিধ অন্যায়, অসাম্য ও শোষণের শিকাব তার অবসান শুধুমাত্র লোকসভা, বিধানসভায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে ঘটানো সম্ভব নয়। তবে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটি আইনে পবিণত হলে সংসদীয় বাজনীতিতে মহিলাবা যে অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং সুযোগ পাবেন তার যথাযথ ব্যবহাবের মাধ্যমে আগামী দিনে সমাজে অনেক বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে এমন আশা কবা বোধ হয অন্যায় হবে না।

সূত্র নির্দেশ

১. Geraldine Forbes, **Women in Modern India**, Cambridge University Press, P-95.

২. Geraldine Forbes, ibid, P-95, এবং ভারতী রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)', রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত) **ভারত ইতিহাসে নারী**, পৃষ্ঠা-৫০.

৩. Geraldine Forbes, ibid, P-99.

৪. ভারতী রায়, পূর্বোক্ত, পৃ:-৫০

৫. Geraldine Forbes, ibid, P-109.

৬. Govt. of India, Report of the Committee on the Status of women in India, Towards Equality, P-285.

৭. এই বিষয়ে পরিসংখ্যানেব জন্য, বাজশ্রী দেবনাথ, 'ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', **সমাজ সমীক্ষা**, জুলাই, ১৯৯৮ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-১০৮।

৮. Govt. of India, "**Names and Portfolios of the Members of the Council of Ministers**

৯. **Towards Equality**, ibid,PP 302-305

১০. ছবি বায়, **বাংলার নারী আন্দোলন**, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ: ১১৭, Geraldine Forbes, ibid, P-107.

১১. **Towards Equality**, ibid, PP 304-305.

১২. রাজশ্রী দেবনাথ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১১২।

১৩. Gail Omvedt, "The Women's Bill', **The Hindu**, 4th September, 1998.

১৪. Usha Mehta and Usha Thakkar, "Seat Reservation in Decision Making bodies', **Nation and the World**, PP-51 (publication on details)

১৫. **Indian Express** 4th October, 1998.

১৬: Usha Mehta and Usha Thakkar, ibid-P 50.

১৭. **The India Gazette, Extraordinary**, Part-2, Sec-2. November 21, 1996, New Delhi

প্রসঙ্গ: নারীমুক্তি- 'ভারতী'তে স্বর্ণকুমারী

মধুময় রায়

পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে ছিল 'ভারতী'। এই পাঁচ দশকের জীবৎকালে ভারতী যোগ করেছিল উনিশ শতকের শেষ দুটি দশক আর বিংশ শতকের প্রথম দুটি দশককে। ঠাকুর বাড়ির সাহিত্যচর্চাকে উপলক্ষ্য করে ভারতীর জন্ম হলেও ভারতী নিজের অজান্তেই হযে উঠেছিল এক চলমান ইতিহাস-সাক্ষী ছিল বাঙালী জাতির রাজনৈতিক-সামাজিক সচেতনতার। উনিশ শতকের অপরার্দ্ধ যেমন একট পরাধীন জাতির আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার সময় তেমনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সমাজ সংস্কারেও ক্রান্তিকাল-উনিশ শতকের প্রত্যাশার ধারক বাহক যেমন 'ভারতী', তেমনি বিংশশতকের অর্জিত মর্যাদায় প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার সাক্ষী 'ভারতী'। দুটি শতকের মেলবন্ধনে ভারতী এক যুগান্তরের ধারাবিবরণী-ক্রান্তিকালেব রাখাল।

স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদিকা হিসাবে উনিশ ও বিংশ শতককে ধরে রেখেছেন। প্রথমবার সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেছেন ১২৯১ থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ খ্রীঃ, দ্বিতীয়বাব এই একই দায়িত্ব পালন করেছেন ১৩১৫ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভারতীর পঞ্চাশ বৎসরের জীবৎকালে তেত্রিশ বৎসব ভারতীর 'পালনভার বঙ্গ মহিলার হস্তে ন্যস্ত ছিল।' বোধহয় মহিলার সম্পাদনায় 'ভারতী' তিনদশকেরও বেশী সময় ছিল বলেই 'ভারতী' পত্রিকায় বার বার স্ত্রী শিক্ষা সচেতনতা, অন্ত.পুরের অবরোধের বিরোধিতা, শরীর আত্মস্বাতন্ত্র্য ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। উনিশ শতকের সামাজিক সচলতার মধ্যে 'আধুনিকতা'র ছোঁয়ায় যা বাঙালী সমাজকে সর্বাপেক্ষা নাড়া দিয়েছিল তার মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছিল প্রধান। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে যখন সভাসমিতির রাজনীতি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার দিকে চলেছে; ঔপনিবেশিক শোষণ পীড়ন দমননীতি কখনও অস্ত্র আইন, কখনও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, কখনও নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারীর মধ্যে বার বার প্রকাশিত হয়েছে-তখন সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বোধ, কুলীনপ্রথারোধ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজ এক পালাবদলের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সচলতা প্রকাশিত হয়েছে "লড়াই-সন্ধি-লড়াই" (struggle - Truce - struggle) মধ্যদিয়ে, তারই সামাজিক প্রতিফলন দেখা গেছে প্রথাবদ্ধ ঐতিহ্যময়তার সঙ্গে পরিবর্তন, পরিমার্জন আর সম্মিলন (Reformation - Reorientatioh-Assimilation)-এব মধ্যে। উনিশ শতকের ভাবসংঘাত ও ভাবসম্মিলনের সূচীমুখটি ছিল অবশ্যই নারীমুক্তি ও

স্ত্রী শক্ত্যায়ণ [woman empowerment] - স্বর্ণকুমারী এই পরিবর্তন, পরিমার্জন আর সম্মিলনকেই তুলে ধরেছেন 'ভারতী' সম্পাদনায়।

উনিশ শতকের শেষপর্বে পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে মহিলাদের প্রয়োজনভিত্তিক মূল্যায়ণ ঘটতে থাকে। তথাকথিত 'প্রয়োজন'-এব সঙ্গে একদিকে নৈতিকতা অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদিতার সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই যেমন প্রচলিত সামাজিক প্রথা প্রকরণের পুনর্বিন্যাস ঘটলো তেমনি তারই প্রতিফলন দেখা গেলো সমসাময়িক সাহিত্য ও পত্র পত্রিকায়। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে যে টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল তারই মধ্যে 'আধুনিক' পরিবারের চাহিদাতেই স্ত্রীশিক্ষা গুরুত্ব পেতে থাকে। অক্ষর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সামান্য শুভঙ্করী গণিত সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ও সেইসঙ্গে স্বামীপুত্র পরিবারের প্রতি দায়িত্বপালন ছিল প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজ থেকে বামাবোধিনী পত্রিকা ১৮৬৩-১৯২২ খ্রীঃ পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষা সচেতনতার বিষয়ে দোলাচলতা ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ আধুনিক পরিবারের উপযোগী মহিলা তৈরীর প্রয়োজন অনুভব করত কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা পারিবারিক স্তরবিন্যাসকে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিল না বরং গতানুগতিকতার সঙ্গে আধুনিকতাব নিরাপদ মিশ্রণে বিশ্বাস করতো। বামাবোধিনী চাইতো স্ত্রী শিক্ষা হবে নীতিশাস্ত্রনির্ভর যেখানে পতিভক্তি, পারিবারিক নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণ সমানভাবে প্রাধান্য পাবে- 'ভদ্রলোক'দেব জন্য ভদ্রমহিলা সৃষ্টি নতুনভাবে প্রাধান্য পেতে থাকে।

স্বর্ণকুমারী যে এই চলমানতার ক্ষেত্রে বেশ ব্যতিক্রমী সেটা ভারতীর সম্পাদনার প্রথমযুগে বোঝা না গেলেও স্বর্ণকুমারীর পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনের বিরোধিতার মধ্যে ক্রমশ: প্রকাশিত হতে থাকে। প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারণা যে 'পুরুষ মনন সর্বস্ব ও স্ত্রীজাতি আবেগসর্বস্ব'-এর বিরোধিতা স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' সম্পাদকীয়তে তুলে ধরেন। নামহীন প্রবন্ধ 'বর্তমান শিক্ষা' [বোধহয় স্বর্ণকুমারীর রচনা]-তে তিনি স্ত্রী শিক্ষা সচেতনতা ও তার প্রয়োগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরের শিক্ষায় স্বর্ণকুমারী এব উপযোগগত সংকীর্ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও স্বামী জানকী ঘোষালের অনুপ্রেরণায় স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষাকে স্ত্রীস্বাধীনতায রূপান্তরিত করেন। এমনকি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতাব প্রশ্নে তিনি শুধু ব্রাহ্ম সমাজের স্বীকৃতবিধি নয় রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধিতা করেছেন। বোধহয় উভয়েব মধ্যে এই বিরোধিতাই "চিড়" ধরিয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষা বলতে কখনই অক্ষর পুঁথি পরিচয় বোঝেন নি, তাঁর কাছে একটি ছিল সার্বিক ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা। একটি প্রস্তাব (১২৯২ বঙ্গাব্দ)-এ তিনি বলেন পুরুষসমাজ 'মেয়েলি গুণ' বলে কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য চিহ্নিত করে যে বিভাজন রেখা টানেন সেটি শুধু ভ্রান্ত নয়, মর্যাদা হানিকর। মেয়েলিগুণ যেমন দয়া মায়া মমতা সবই মানবিকগুণ যা মনুষ্যত্বকে পরিপুষ্ট করে। সুতরাং এই গুণগুলির মানুষমাত্রেই প্রয়োজন-তাই প্রয়োজন সার্বিক শিক্ষার। অবশ্যই স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাইলেও স্ত্রীস্বাধীনতা ও মুক্তির দাবীতে নারীস্বাতন্ত্র্য চাননি-উনিশ শতকের শেষপর্বে পরিবারের ঐক্য ও সমৃদ্ধি বিভিন্ন আলোচনায় প্রাধান্য পেতে থাকে, স্বর্ণকুমারী সেখানে চেয়েছিলেন স্ত্রীজাতির স্বীকৃতি ও অধিকার। 'শিক্ষা হবে সংসারের উপযোগী' - স্বর্ণকুমারী অবশ্যই বিশ্বাস করতেন। 'স্ত্রীশিক্ষা

ও বেথুন স্কুল' [ভারতী ও বালক শ্রাবণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ] - প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষার ক্রমপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও একটি সময়োচিত প্রশ্ন তুলেছেন "কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কার্যতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কতদূর হইয়াছে ? কতকটা উন্নতি যে হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। দিনদিন স্ত্রীশিক্ষাব ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু শিক্ষার এই ছড়াছড়িতে শিক্ষা কতটুকু হইতেছে ইহাই মাত্র আমাদের জিজ্ঞাস্য ? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়াছে তেমন গভীরতা কই ? ইহাব আড়ম্বর যতটা দেখিতেছি অন্তঃসারতা ততটা কই ?" আলোচ্য প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত দুটি প্রশ্ন তুলেছেন - একটি 'গভীরতার' অন্যটি 'অন্তঃসারশূন্যতার'। স্বর্ণকুমারী বাল্যবিবাহ কে স্ত্রীশিক্ষা প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন; তাঁব মতে 'বিবাহ হইয়া গেলে তখন বাঙ্গালী ঘরে রীতিমত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব।' আসলে বাঙালী সমাজে সাহসের অভাব আর রয়েছে লোকনিন্দা সমাজভয়। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ষষ্ঠ শ্রেণী। [চতুর্থ শ্রেণী] তেই মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষার ইতি ঘটে। অভিভাবকরা মনে করেন ইংরাজী অক্ষরের সঙ্গে এই পরিচয় যথেষ্ট। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর প্রশ্ন 'ইংরাজী দু চারখানা বই পড়িয়া তাহাদের কি লাভ ? লাভ ত কিছুই দেখিনা, সম্পূর্ণই লোকসান।' এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর পরামর্শ - 'যে সময়টা স্কুলের ইংরাজী পড়া তৈয়ার করিতে যায় - সেই সময়টাও বাঙ্গলাতে দিলে ভাল করিয়া শেখা যাইতে পারে।' বেথুন স্কুলে উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে অবশ্যই স্বর্ণকুমারী যে কি পবিমাণে খুশী হয়েছিলেন তাব প্রমাণ তার 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল' প্রবন্ধটি।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীমুক্তির প্রশ্নে স্বর্ণকুমারী কি পুরুষবিরোধী ? অন্তত তার রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের সপ্রশংস উল্লেখ সেটি প্রমাণ করে না। একথা সত্যি পুরুষশাসিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বর্ণকুমারী নারীর আত্মমর্যাদাকেই বাব বার উচ্চকিত করেছেন, হয়তো উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোগে নারী পুরুষের সমান অধিকার, সম্পত্তিব উত্তরাধিকারে নারী পুরুষের সমান অধিকাব কিংবা পরিবারে স্ত্রী পুরুষের সম ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ প্রশ্ন তোলেননি, কিন্তু আধুনিক সমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীন কর্মক্ষেত্র ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নে স্বর্ণকুমারী অনেক বেশী বলিষ্ঠ ও সোচ্চার। লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক বাতাবরণে স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধ 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' ছিল জে. বোমানিসের প্রকাশিত রচনার প্রতিক্রিয়া। পুরুষের সামর্থ্য ও সাফল্য সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী কোন প্রশ্ন তোলেননি সমাজতাত্ত্বিক ডিলনের বক্তব্যের বিরোধিতা রোমানিস করেছিলেন, স্বর্ণকুমারী রোমানিসের সঙ্গে সহমত হয়েই এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে স্ত্রীজাতির বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও পুরুষপ্রাধান্য। যুগযুগ ধরে শিক্ষার অধিকারে বঞ্চিত পুরুষদের দ্বারা নিপীড়িত অবহেলিত স্ত্রীজাতির উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটেনি - পুরুষের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার সমান অধিকারই পারে স্ত্রীজাতিব উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক উন্নতি ঘটাতে।

স্ত্রী মুক্তির প্রশ্নে স্বর্ণকুমাবী এককথায় "Traditional Moderniser" একদিকে তিনি যেমন পরিবারের কেন্দ্রে মহিলাদের সর্বংসহ ভূমিকাকে সমর্থন করে পাঠ্যসূচী ও দৈনন্দিন চর্চায় বামায়ণ মহাভারত ও নীতিশাস্ত্রচর্চাব প্রয়োজনকে সমর্থন করেছেন, তেমনি অবরোধপ্রথার

বাইরে এসে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা, যথোপযুক্ত বেশভূষা নির্বাচন ও উপস্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'একটি প্রস্তাব'-এ তিনি লিখেছিলেন 'বর্তমান সমাজের যেরূপ বিপ্লবের অবস্থা, কালের স্রোতে যেরূপ সকল দিকে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছেন তাহাতে দেশের উপযোগী করিয়া, দেশীয় ভাবের সহিত সাম্য রাখিয়া সমাজের পুরাতন আচার ব্যবহার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া পিটিয়া না লইলে চলিতে পারে না।' স্বর্ণকুমারী পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিসর্জন দিয়ে নারীমুক্তি চাননি-পুরুষশাসিত লিঙ্গ বিভেদাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভাবতীতে 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব', মস্তিষ্কভাব ও রমাবাই, রমাবাইযের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীজাতি সম্পর্কে ধারণা 'স্ত্রীলোকের একরকম গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তি নাই'-এর তীব্র বিরোধিতা স্বর্ণকুমারীর রচনায় রয়েছে এমনকি স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও স্বর্ণকুমারীর মতটি প্রণিধানযোগ্য 'কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের [স্ত্রীলোকের] জীবনের গুরুত্বর উদ্দেশ্য আছে-নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বেব পথে অগ্রসব করিতে তাহারও অধিকার আছে।' [রমাবাই, ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬] স্বর্ণকুমারীর বলিষ্ঠ মত হলো 'স্ত্রীলোকেও পুরুষের মত জ্ঞান ধর্ম্মে সমান অধিকারী [তদেব]। স্ত্রীলোকেব অসহায়তাও নিরাশ্রয় অবস্থার প্রচারক মহিলারাই স্বর্ণকুমাবী 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে পত্র' প্রবন্ধে এ বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন যে এরদ্বারা 'স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বন্ধনহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে।' অথচ স্বর্ণকুমারী সংসারের পতিভক্তিকে আদৌ অস্বীকার করেননি, তিনি চেয়েছেন স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের যথার্থ সামাজিক মূল্যায়ণ। তাই তিনি উপরিউক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন 'কর্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীনস্থ, সে কর্তব্যের অধীন।' উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে এ বক্তব্য অবশ্যই ঐতিহাসিক - ভারতী এখানেই ইতিহাস। স্ত্রীমুক্তি ও বিধবা বিবাহকে নিয়ে স্বর্ণকুমারীর রচনা "বিধবা বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা'তে যেন বিদ্যাসাগরের লড়াইযে সুর নতুন করে শোনা যায়। এখানে স্বর্ণকুমারী দেখিয়েছেন সমাজ স্থির নিশ্চল নয়, প্রয়োজনে সে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। শাস্ত্র তাই বিধিনিষেধের অচলায়তন নয় বরং সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত সামাজিক স্বাস্থ্যও শৃঙ্খলার পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন। 'কাহাকে' উপন্যাসের নায়িকা মনির বক্তব্যে শরীর চিরন্তন অধিকারবোধ ফুটে উঠেছে 'আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত, শিষ্টতা চাহেন, আমি তেমন আমার স্বামীব সমস্ত জীবনই আমাব বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।' [কাহাকে, স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড] বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, অন্তঃপুর অবরোধের কঠোরতার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর এই মানসিকতা অবশ্যই প্রথাবিরোধিতা - এক অর্থে বৈপ্লবিক।

সমাজে নারীজাতিব আর্থিক ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উনিশ শতকের অন্তিমলগ্নেই শুরু হয়েছিল যা বিংশ শতকে একটি নির্দিষ্ট গতি পায়। স্বর্ণকুমারীর শৈশব স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় উচ্চবর্ণের অভিজাত পবিবারের স্ত্রীলোকমাত্রেই ছিলেন অন্তঃপুরচারিকা ও অবরোধের শিকার। অথচ তুলনামূলকভাবে অনভিজাত নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা ছিলেন পুরুষ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রবৃত্তিধারিণী-বৈষ্ণবী বা অশিক্ষিতা নাপতানীরা নিজেরাই নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতো। মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে কখনোই মূল সামাজিক উৎপাদক শক্তির অঙ্গ

হিসাবে দেখা হয়নি। পরিবারের প্রতিপালক পুরুষের সাহায্যের জন্য সহায়ক উপার্জনকারী হিসাবে তাদের দেখা হয়েছে। স্বর্ণকুমারী কখনই তার পরিবেশ ও প্রথাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেননি - উনিশ শতকের দোলাচলতা স্বর্ণকুমারীর মধ্যেও ছিল। কিন্তু স্ত্রীজাতির আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন স্বর্ণকুমারী। 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা তারই ফলশ্রুতি। 'সখিসমিতি' [ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮] প্রবন্ধের তিন দফা উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ১। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন ২। যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী- সখী সমিতির উদ্দেশানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রতপালনে ইচ্ছুক, তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান; অন্য অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা। ৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার।' এক্ষেত্রে কোন মহিলা এ কাজ করতে না চাইলে তার ভরণপোষণে ও শিক্ষায় যা ব্যয় হয়েছে সেটি সে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে - এই অর্থে অন্য কোন বালিকার ব্যয়নির্বাহ হবে। স্বর্ণকুমারী এখানে রমাবাইয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। ঐ প্রবন্ধে সখিসমিতিতে যাঁরা অর্থ দিয়েছেন তাদের একটি তালিকাও আছে। উদ্যোগটি যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ এই মর্মে স্বর্ণকুমারীর আরেকটি প্রবন্ধ 'সাত বৎসরে সখিসমিতি' [ভারতী, আষাঢ় ১৩০০] সখিসমিতির উদ্দেশ্যগুলির মূল্যায়ণ ঘটেছে আলোচ্য প্রবন্ধে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনাথা বালিকাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান যে সফল হয়েছিল সে বিষয়ে স্বর্ণকুমারী সন্তোষ প্রকাশ করলেও অন্তঃপুর শিক্ষাকার্যে ও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগে সীমাবদ্ধ সাফল্য সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী অকপটে উল্লেখ করেছেন।' নানা দৈবদুর্বিপাকে ও ত্রাণপুনর্বাসনে সখিসমিতির ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন। বিধবা বিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচার ছাড়াও বিধবাদের পুর্নবাসন ও স্বতন্ত্র জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব সখিসমিতি নিয়েছে। নারীজাতির অধিকার ও উপার্জনশীল ভূমিকার উল্লেখ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ বন্ধনমুক্তি ও মর্যাদালাভ বোধ হয় তখন ও ঘটেনি।

আধুনিক অর্থে স্বর্ণকুমারীকে নারীবাদী বলা চলে না। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক সাম্য ও স্বীকৃতি। চেতনার স্তরে যা ছিল নারীমুক্তি, অধিকারের ক্ষেত্রে তাই স্ত্রী-স্বাধীনতা। নারী প্রগতির অপর অংশ নারী মুক্তি- স্বর্ণকুমারী উনিশ শতক ও বিংশ শতকের সংযোজক হিসাবে এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তিনী ছিলেন। অন্তত স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র সম্পাদনায় একটি সত্যকে বারবার তুলে ধরেছেন - নারীমুক্তি বা নারীশক্তির বিষয়টি কখনই আরোপিত হতে পারে না, বিষয়টি নারীর নিজস্ব, কারোর দয়া বা অনুকম্পার বিষয় নয়, বরং আত্মসচেতনতার জাগ্রত অংশ। সচেতনসত্ত্বার উপলব্ধি, মানুষ হিসাবে নিজের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অনুভব এবং প্রতিকূল অন্তরায়গুলিকে স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তিতে অপনোদন স্বর্ণকুমারীর সারাজীবনের সাধনা। 'ভারতী'-পত্রিকাতেই তাই নারীর নিজ ভাগ্য জয় করার সাধনার কথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন। শুধু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার নয় সামাজিক সংস্কারের মধ্যদিয়ে নারীকে সামাজিক মর্যাদায় স্থাপন ও স্বাবলম্বী করে তোলার বিষয়টিকে 'ভারতী'তে এক নতুন মাত্রায় স্বর্ণকুমারী স্থাপন করলেন। ভারতী স্বর্ণকুমারীর হাতে এইভাবে উনিশ ও বিংশ শতকে নারীমুক্তি ও সচেতনতার কন্ঠস্বরে পরিণত হলো।

অন্তঃপুরের নারীভাবনা

চিত্তব্রত পালিত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁব 'সাময়িক পত্র সম্পাদনায় বঙ্গনারী' বইটিতে লিখেছেন, ''অন্তঃপুর'' এই নামের একটি মাসিক পত্রিকা ১৩৭৪ সালের মাঘ মাসে (জানুয়ারী ১৮৯৮) প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত'' সেই অর্থে বোধহয় প্রথম এজাতীয় মহিলাদের পত্রিকা। বনলতাদেবী সম্পর্কে জানা যায় যে তাঁর জন্ম ২০শে ডিসেম্বর ১৮৮০, কলকাতার বরাহনগরে। পিতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা সমাজ সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বামী জীবনীকোষ সম্পাদক শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার। তিনি বাড়িতেই ইংরেজী সংস্কৃত ও বাংলা শেখেন। সুমতি সমিতি নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন কবেন এবং পিতাব প্রতিষ্ঠিত বিধবা আশ্রম এবং বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। বিবাহেব পর স্বামীর সঙ্গে সমাজসংস্কার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্ত:পুর' নামে মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন এবং মৃত্যুকাল ৩-১১-১৯০০ পর্যন্ত সেই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যায় তাঁব লেখা চাব লাইন কবিতা থাকত। রচিত কবিতা গ্রন্থের নাম বনজ।

১৯০০ সালে বনলতা দেবীর অকালমৃত্যু হলে পত্রিকাটিব সম্পাদনার দায়িত্ব নেন হেমন্ত কুমারী চৌধুরী। তিনি ১৯০৪ পর্যন্ত চাব বছর এই পত্রিকার সম্পাদনা কবেছিলেন। হেমন্ত কুমারীর জন্ম লাহোরে ১৮৬৮ সালে। তিনি ব্রাহ্ম, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা। বনলতাব মত তিনিও হিন্দী, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভৃতি শিক্ষা করেন কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবাব আগেই তাঁর সতের বছর বয়সে বিবাহ হয়। স্বামী ছিলেন শিলংএর একজন গেজেটেড অফিসার। তিনি (হেমন্তকুমারী) সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে সুগৃহিণী নামে হিন্দীতে একটি মহিলাদের পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ১৮৮৮ থেকে ছবছর যাবৎ তিনি এর সম্পাদনা করেছিলেন। এরপর তিনি অন্তঃপুরের দায়িত্ব পান এবং ১৯০১-১৯০৪ এর সম্পাদনা করেছিলেন। স্বামীর অবসর গ্রহণের পব তিনি পাঞ্জাবে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হন। পনের বছব সেই পদে বৃত থাকেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীবাদী হন এবং কংগ্রেসেব একজন জাতীয়তাবাদী সমর্থক হন। শেষ জীবনে দেরাদুনের পৌবসংস্থায় অন্যতম কমিশনার হন।

অন্তঃপুরের প্রথম সাত বছর এঁরা দুজনেই সম্পাদনা করেন। সেই সংখ্যাগুলি আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেচ্য। তবু উল্লেখ করতে হয় যে হেমন্ত কুমারীর পরে কয়েক মাস কুমুদিনী মিত্র, এবং ঠিক তার পরে তাঁর জননী লীলাবতী মিত্রও কয়েক মাস অন্তঃপুরের সম্পাদনা করেন। লীলাবতী প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা বাজ নারায়ণ বসুর কন্যা এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্রের সহধর্মিণী। তিনি নারী সংগঠন পরিচালনা কবেন এবং স্বদেশী ও জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে অন্ত:পুরের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয। কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধের বিবেচ্য নয়।

সম্পাদিকাদের পরিচয় থেকে জানা যায় যে এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের আলোকপ্রাপ্ত মহিলা এবং পত্রিকাগুলিও প্রধানত অভিজাত সমাজেই প্রচলিত ছিল। তবুও নারী স্বাধীনতার ইতিহাসে এর গুরুত্ব কম নয়। তাঁরা যে মুক্তচিন্তার সূচনা করেন সেই চিন্তাধারা ক্রমশঃ অগ্রসব হয়ে 'ভারতী', 'নারী' এবং শেষে 'চলার পথে' পর্যন্ত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় সম্পাদিকা বনলতাদেবী পত্রিকা প্রচাবের উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত করেন।

কেবল বঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আমাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশায অন্তঃপুর সেই চরিত্রই রক্ষা করেছে। পত্রিকাটি মুখ্যত ছিল নারীদের আত্মসমীক্ষার দর্পণ। তাদের স্বনির্ভরতা এবং উন্নতির পন্থা নির্ধারণের উপদেষ্টা। আজকের মত পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা এর উদ্দেশ্য ছিল না, আবার পিতৃতন্ত্রের অনুগামিনী হবার দাসীসুলভ মনোভাবও এর চরিত্র নয়। সেই গঠনমূলক পরিচয় দেবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমবর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদিকা বনলতা দেবী লিখেছেন,

গৃহের যে অংশে রমণী বাস করেন সেই অংশকে অন্তঃপুর কহে। অন্তঃপুর কোলাহল বিক্ষিপ্ত বহির্জগত হইতে একটি স্বতন্ত্র স্থান। কিন্তু ইহা সামান্য স্থান নহে। সমাজের শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্যে, সমাজের মধ্যে নীতি ও ধর্ম প্রবর্তিত করিবার জন্যে এবং সমাজের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অংশ দৃঢ় এবং সুন্দর করিবার জন্য ইহা একটি কারখানা।

ইহা রমণীর সাধনার স্থান। সমাজ অন্তঃপুরেব প্রতিবিম্ব মাত্র। অন্তঃপুর মনুষ্য জাতির চরিত্র গঠনের স্থান। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া শিশুর জীবন গঠিত হয় এবং হৃদয়ের বিকাশ সাধন হয়। এই শিশুই ভবিষ্যৎ সমাজের এক একটি উপাদান। অন্তঃপুরের যেভাব প্রবল থাকিবে সমাজও সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। এই অন্তঃপুরকে সুন্দর করাই রমণী জীবনের প্রধান ব্রত।

সম্পাদিকা এইভাবে অন্তঃপুরকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং সমাজ গঠনে তার মূল্যবান ভূমিকার কথা উল্লেখ কবেছেন। নারীদের আত্মমর্যাদা বোধের কথাই এতে ব্যক্ত হয়েছে, হীনমন্যতা নয়।

রমণীর জীবনব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখিকা সরলাবালা বলেছেন, গৃহই রমণীর প্রকৃত কর্মভূমি। শুনিতে পাই অনেকে এই অন্তঃপুরকে কারাগার আখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের বাদানুবাদের প্রবৃত্তি নাই কিন্তু বাস্তবিক অন্তঃপুর ছাড়া রমণীর বাস করিবার স্থান কোথায় আছে ?....কেহ বলেন বমণীর কার্যাবলী যদি অন্তঃপুর সীমাতেই বদ্ধ থাকিবে

তবে তাহারা জগতের কি করিলেন ? পতি পুত্রকে কে না ভালবাসে ? একথা যথার্থ বটে। এইস্থানে কবির একটি সুন্দর উক্তি মনে পড়ে,

প্রথমে পতিকে পরে তনয়েরে
পরে পরিজনে সহস্র মুখে।।
শেষে সীমা ছাড়ি -- ঢালে প্রেমবারি।
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে।।

আমাদের মন এই দেহপিঞ্জর নিবাসী অথচ তিনি সর্বত্রগামী। ভালবাসা কি কখনো অন্ত:পুর প্রাচীরে আবদ্ধ থাকিতে পারে ? ভালবাসা চিরবর্ধনশীল....অবশেষে সেই ভালবাসা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অনন্ত প্রাণীকে সুশীতল করে.....পৃথিবী দুঃখ দারিদ্র পূর্ণ। ভগবান আমাদের হৃদয়ে দয়া স্নেহ প্রভৃতি কোমলভাব দিতে কৃপণতা করেন নাই।

আবার এ সকল 'যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে' ভাণ্ডার অনন্ত, কিছুতেই ক্ষণ হইবে না। এমন ভাণ্ডার হাতে পাইয়া আমাদের কেন অন্নপূর্ণা হইয়া বসিবার সাধন হয় না ? নিজের গর্ভজাত একটি সন্তানে কেন আমরা সন্তুষ্ট হই ? ইচ্ছা করিলেই কত কোটি সন্তান পাইতে পারি। আমাদের অভাব কি ? আমরা তো রাজরাজেশ্বরী। (প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুণ - ১৩০৪)।

এইভাবে লেখিকা ঘরও বাহিরকে একসূত্রে গেঁথেছেন। রমণীকে শুধু অন্তঃপুরের সেবায় সীমিত রাখেননি, তাঁকে বিশ্বলোকের অন্নপূর্ণা হিসেবে দেখেছেন এবং তাঁকে রাজরাজেশ্বরী আখ্যা দিয়েছেন, অন্তপুরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোন বিরোধ স্বীকার করেননি দুদিকেই নারীর কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে করেছেন। তাই অন্তঃপুরকে কারাগার হিসেবে দেখেননি এবং সেখানকার ভূমিকাকেও হীনবলে মনে করেননি বা এরজন্য পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করেননি।

এইসূত্র ধরে আর এক লেখিকা নবশশী দেবী তাঁর 'রমণীর হৃদয়ের বল' প্রবন্ধে লিখেছেন,

"দৈহিক বলে ও বিদ্যাবলে বঙ্গরমণী পুরুষাপেক্ষা অনেকাংশে হীন কিন্তু হৃদয়ের বলে বলীয়ান হইলে রমণীর সকল অভাবপূর্ণ হইতে পারে। আমাদের দেশের রমণীগণ সামাজিক শাসনে হীনাবস্থায় থাকিলেও হৃদয়ের বলে উন্নত ছিলেন সেই জন্যে তাঁহারা পরিবারের কর্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অলক্ষিতভাবে সমাজের পরিচালনা করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন বাহিরে দেখিতে গেলে, অন্তঃপুরাবদ্ধা বঙ্গরমণীর সহিত সমাজের কোনই সংস্রব নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। রমণীই সকল কাজের উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারন"। (প্রথমবর্ষ ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৪)।

লেখিকা এখানে পিতৃ তন্ত্রের মধ্যে কর্মরত মাতৃতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সমাজের উন্নতিতে নারীর ভূমিকার কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। সুতবাং বর্তমান নারী ভাবনায় অন্তঃপুরের নারীকে যেভাবে পিতৃতন্ত্রের শাসনে নিষ্পিষ্ট দেখানো হয়, লেখিকা তা স্বীকার করেননি। দুর্বলা নারী তাঁর বিচারে হৃদয়ের বলে সবলা হয়ে উঠেছেন।

সম্পাদিকা বনলতা 'তরুলতাদেবী' এই ছদ্মনামে বঙ্গরমণীদের গৃহ কর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন।

ভারত যে উন্নতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, যে তরঙ্গের আন্দোলনে ভারত টলমল করিতেছে, সে তরঙ্গ সে স্রোত বুঝি ভারতীয় মহিলাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই ভারত রমণী এই আন্দোলনের মধ্যেও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। বর্তমান সময়ে ভারতরমণীর এইরূপ উদাসীনতা বড়ই শোচনীয়।

এই বাহিরের আন্দোলনের সময় রমণীদিগের কি করিবাব আছে, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।...রমণীর প্রধান কার্য গৃহধর্ম পালন ও প্রধান কার্যক্ষেত্র গৃহ। এই মহৎ বাক্য সকলেরই মুখে শোনা যায়। বাস্তবিক জগতে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় যদি রমণী গৃহ ধর্ম পালনে উদাসীন হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হন। কিন্তু গৃহধর্ম কি ? আমাদের দেশে বর্তমান অশিক্ষিতা রমণীগণ যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তাহাই কি আদর্শ গৃহ ধর্ম পালন ? যন্ত্রের ন্যায় সংসারের কার্য সম্পন্ন করা, অবসর পাইলে বাজে গল্প ও পরনিন্দায় আমোদ উপভোগ করা এই কি গৃহধর্ম ? আমাদের গৃহিণীগণ মাতাগণ যদি আলস্য বর্জন করিয়া সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকেন তাহা হইলে সংসার কতই সুখের হয়। (২য় বর্ষ, ১৭-১৮ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৬)।

সম্পাদিকা বনলতা এখানে মহিলাদের গৃহকর্মের সঙ্গে সামাজিক কর্মের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। গৃহকর্মকেও ছোট করে দেখেননি, আবার তার উত্তরণও চেয়েছেন সমাজ সেবার মধ্যে। পুরুষদের মত নারীদেরও কর্তব্যের এই উভয়দিকের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

অন্তঃপুরের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে অতঃপর নারীদের নানান সমস্যা আলোচিত হয়েছে। তারমধ্যে নারীস্বাস্থ্য নিয়ে হেমন্তকুমারী আলোচনা করেছেন (৪র্থ বর্ষ - ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ - ১৩০৮) বৈধব্যজীবন নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৯ ও ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা-ভাদ্র ১৩১০) নারীশিক্ষা নিয়ে একাধিক লেখা (৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র-১৩০৮, ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩১১) নারীদের অর্থকরী শিল্প শিক্ষা নিয়ে লীলাবতী মিত্রের একাধিক প্রবন্ধ (৭ম বর্ষ - আষাঢ় ১৩১১) চিন্তাশীল নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসবই স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধনের উপায় এবং গঠনমূলক উপদেশে সমৃদ্ধ। অন্তঃপুরের নারী ভাবনা আজকের নারীভাবনা যে লিঙ্গযুদ্ধে পরিণত হয়েছে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। লিঙ্গযুদ্ধ নারীদের হীনমন্যতার পরিচয়। অন্তঃপুরের কালে যদি সে বাধা বিক্ষুব্ধভাবে উচ্চারিত না হয়ে থাকে তবে সেটা প্রধান নারী সমস্যা নয় বলে মনে হয়। তাই অন্তঃপুরসমাজে নারীদের ভূমিকা নির্ণয় করে, তাদের বড় হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাকে উসকে দিয়েছে।

ইতিহাসের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা

পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

একবিংশ শতাব্দীতে নারীর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরী মনে করি। সেটি হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষণ পবিকল্পনার ক্ষেত্রে স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন আছে কি না ? আমার মতে তা নেই। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষা আমার আলোচনার বিষয় - নারী শিক্ষা বলে স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা পরিকল্পনা নয়। কারণ বিগত কয়েক বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তকারী পরীক্ষাগুলির ফলাফল যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে ছাত্রীরা ছাত্রদের থেকে পরীক্ষার ভালো ফলাফলের তালিকায় সংখ্যাগত ও মানগতভাবে মোটেই খুব একটা পেছিয়ে নেই। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে যে ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায় আসছে ও আসবে তারা কোন অংশেই ছাত্রদের থেকে পশ্চাদপদ নয়। শিক্ষান্তে চাকুরীগত দিকটি বিচার করলেও এখন মেয়েদের জন্য সকল প্রকার কাজেই অবারিত দ্বার। কোন পেশাগত বা চাকুরীগত ক্ষেত্রেই নিতান্ত মহিলা বলেই কারো আবেদন পত্র নাকচ করা হয় না। যে ঘটনা বিগত শতাব্দীতে বহু ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ম্যাটিলডা কোহেন নামে এক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে অ্যাটর্ণী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে চাইলে উচ্চ ন্যায়ালয় কেবলমাত্র মহিলা বলেই তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করে। এবং ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি সরকারী নথিতে - Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal - B-Proceedings for the month of Sept. 1897-এ স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয় - "Recently one miss Cohan applied to the High Court for enrolment as an Attorney but her application was refused by Court. So what so ever high University degrees the native ladies may possess, they have no chance of becoming pleaders or holding responsible Judicial and Executive offices under Government. The utmost they can get is some educational appointments under this Government for which they can still qualify themselves with the education they receive

পরবর্তী সময়ে এ বক্তব্যের যথাযথতা প্রমাণিত হয় যখন দেখা গেল একবিংশ শতাব্দীর শুরুর বছর ২০০০ সালের সদ্য প্রকাশিত আই.এস.সি. ও সি.বি.এস.সি র মত সর্বভারতীয় বিদ্যালয় সমাপ্তকারী পরীক্ষার ফলাফলে বরং মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে সংখ্যাগত ও মানগতভাবে ভালো ফল করেছে।

in the Bethune College." কিন্তু একবিংশ শতাব্দী কেন, বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে অন্তত এই ধরনের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন সরকারী নথিতে মেলে না। অবশ্যই এরজন্য শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস আছে। আমরা জানি বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে, কলকাতা মেডিকেল কলেজে মেয়েদের পড়ানো, সহ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন - সব কিছু নিয়েই প্রবল প্রতিবন্ধকতার কাহিনী। কিন্তু 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার' ? - এই প্রশ্ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য জেদ নিয়ে নারীরা নিজ কৃতিত্বের জোরেই তাদের পথ উন্মুক্ত করে নিয়েছিলেন বিগত শতাব্দীতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে নিজ কৃতিত্ব প্রমাণ করে উচ্চ শিক্ষার সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীরা। সে কাজে হয়তো কোথাও সাহায্য পেয়েছেন কোন কোন নারী হিতৈষী পুরুষের কোথাও বা সরকারের কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির। কিন্তু নিজেরা নিজেদের অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করেছিলেন সর্বক্ষেত্রেই। একবিংশ শতাব্দীতেও বৃহত্তম সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অগ্রসরতার হিসাব পুরুষের তুলনায় পশ্চাদপদতারই খতিয়ান কিন্তু বিশেষভাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নারীরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করছেন তারা বেশীরভাগই সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসছে এবং শিক্ষার গুণগত ও সংখ্যাগত ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চ অংশের ছেলেদের থেকে তারা পশ্চাদপদ নয় বলেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর উচ্চশিক্ষা বলে স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা পদ্ধতি বা পরিকল্পনার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে যে ধারণাটা বহুল প্রচলিত তা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দী যেহেতু তথ্য প্রযুক্তির যুগ সুতরাং তার শিক্ষা পরিকল্পনাও হবে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। অর্থাৎ শিক্ষার জোরটা পড়বে প্রয়োগগত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক শিক্ষার উপর। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও আমি কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি। তথ্য প্রযুক্তি কারিগরী শিক্ষা এবং প্রয়োগভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিলেও সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান এবং তত্ত্বগত বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পেশাগত ও প্রয়োগগত বিজ্ঞান যেমন কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন তত্ত্বগত মূল বিজ্ঞান শাখার উপর শিক্ষার্থীর প্রতিপত্তি। অন্যথায় যে যন্ত্রের সুইচ টিপতে টিপতে নিজেই নিজের অজ্ঞাতে যন্ত্রে পরিণত হয়ে যাবে, যন্ত্রকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, যন্ত্রই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যন্ত্রের উপর বা ব্যাপকতরভাবে প্রযুক্তির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই তার সার্থক প্রয়োগ এবং তার কাছ থেকে সর্বাধিক পরিষেবা গ্রহণ সম্ভব হবে। সেটা কখনোই সম্ভব নয় বিজ্ঞানের মূলগত জ্ঞানের উপর তার আধিপত্য স্থাপন ব্যতীত। অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত - এই গুলির পঠন পাঠন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী সাতটি সুরের উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই সে যেমন সুরস্রষ্টা হতে পারে না তেমনি বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলির উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত প্রয়োগগত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না। আবার সাহিত্যে সম্যক জ্ঞান না থাকলে যে কোন বিষয়ে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে, নিজের বিষয়টি অন্যকে বোঝানোর ক্ষেত্রে, নিজস্ব গবেষণা বা চিন্তা ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে দৈন্য প্রকাশ পেতে বাধ্য। তেমনি সমাজবিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল নয় এমন শিক্ষার্থী প্রয়োগগত জ্ঞানকে

যেখানে, যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইছে সেই ক্ষেত্রটাকেই সে যথার্থভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার তথ্য প্রযুক্তির বিশেষীকৃত জ্ঞান না সমাজের উপকারে প্রযুক্ত হবে, না তার নিজের সাফল্য এনে দেবে। কারণ যত গভীর বা বিশেষীকৃত বা আধুনিক জ্ঞানই হোক না কেন - সবই তো শেষ পর্যন্ত মানুষ, সমাজ ও দেশের তথা বিশ্বের হিতের জন্য। সুতরাং যার হিতাকাংখায় জ্ঞান লাভ যদি সেই জ্ঞান যথার্থভাবে প্রয়োগ করা না যায় বা তার দ্বারা হিতসাধন না হয় তাহলে সেই জ্ঞান অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। সেই নিরর্থক জ্ঞান ভান্ডার ব্যক্তিকে করে তুলবে সমাজ বিচ্ছিন্ন, একাকীত্বে জর্জরিত নিরানন্দময় প্রায় এক যন্ত্রমানব। আর সমাজ বা দেশের পক্ষে সেই শিক্ষা হয়ে যাবে যথার্থই অনুৎপাদিত, অর্থহীন, ডিগ্রি সর্বস্য, অর্থবিনষ্টকারী একটা বিষয় মাত্র।

সুতরাং নিজস্ব একটা বিশেষীকৃত ক্ষেত্র নিশ্চয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর থাকবে কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনা হওয়া উচিত এক সমগ্রতার শিক্ষা। আধুনিকতা, তথ্য প্রযুক্তি, প্রয়োগগত শিক্ষা তখনই তো যথার্থ শিক্ষা হবে যখন তাকে নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জ্ঞানও শিক্ষার্থীর থাকবে। সেই প্রয়োগগত জ্ঞান আইনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন এক সামগ্রিক শিক্ষা বা 'কম্পোজিট এডুকেশন'। একবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পনায় তাই গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই তার নিজস্ব বিশেষীকৃত বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান এবং তত্ত্বগত বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীরই পাঠক্রম নির্ধারণ করা জরুরী বলে মনে করি।

উনিশ ও বিশ শতকের ইতিহাসের দর্পণে রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি নারী চরিত্র

তপতী দাশগুপ্ত

ভূমিকা

উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল ভারতবর্ষের তথা বাংলার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, বিদেশী শোষণ ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ রচিত হয় ইতিহাসের এই পর্যায়ে। নারীচেতনার আলোড়নকারী কিছু নজির পাওয়া যায় উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্যচিন্তায়। প্রাচীন বৈদিকযুগের নারীদীপ্তি, যা প্রতিভাত হয়েছিল গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, লোপামুদ্রার মেধায় তা সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছিল অন্ধ সংস্কারের আবর্তনে এবং জাতিভেদ প্রথার বেড়াজালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই নারীকে তার অন্ধ সুষুপ্তি থেকে সমাজ চেতনার মঞ্চে সম্মানিত করার দায়িত্ব নেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তি বিশেষ। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীর নবজাগরণ সূচিত হয়। এই যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার মিলনসেতু অনেকাংশে এই নবজাগরণকে সফল করে।

১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবশিক্ষার যে জোয়ার এসেছিল, তাতে ধর্মের উন্মাদনাও কম ছিল না। সনাতন হিন্দুধর্মকে অগ্রাহ্য করে সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল প্রগতি ও যুক্তির অলঙ্করণ, অন্যদিকে ছিল হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর এক সুচিন্তিত প্রয়াস। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবও কিছু কম ছিল না সমাজ ও সমাজনীতির উপর। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে এই সময়ে উচ্চশিক্ষার এক প্রবণতা দেখা যায় এবং এই উচ্চশিক্ষার সমৃদ্ধি নারীমানসেও প্রভাব আনে। বাঙালী সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ যখন দেখা যায় শিক্ষার সুযোগলাভে বঞ্চিত সেই সময় মধ্যবিত্ত বাঙালী মহলের অন্তঃপুরবাসিনীরা, কেউ কেউ শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, ইংরেজী সাহিত্যেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন এবং প্রগতির ধারার সঙ্গে সমতা রেখে তথাকথিত সংস্কারকে বর্জন করে প্রাঞ্জল যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের তিনটি নারীচরিত্র সমসাময়িক যুগভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারীসত্ত্বার বলিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে। এই তিনটি চরিত্র হোল, এক) গোঁড়া হিন্দু পরিবারের গৃহস্বামী কৃষ্ণদয়ালের পত্নী এবং এই উপন্যাসের নায়ক 'গোরার' মা আনন্দময়ী, অন্যদিকে এক ব্রাহ্মপরিবারের গৃহকর্তা পরেশবাবুর দুই মেয়ে-সুচরিতা ও ললিতা। প্রথম চরিত্রটি একদিকে যেমন মায়া, মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি ধৈর্য, যুক্তি ও প্রগতির অলংকারে অলংকৃত। গোরা, যে ছিল বেনামী খ্রীষ্টান সন্তান, তাকে পুত্র জ্ঞানে আজীবন প্রতিপালন করাটাই সে যুগের দৃষ্টিকোণে এক বিদ্রোহী নজির। তারপর, ব্রাহ্মবাড়ীর মেয়েদের সাথে স্বচ্ছ মেলামেশার পথেও তিনি গোরাকে এবং পুত্রসম গোরার বন্ধু বিনয়কে অগাধ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন। বিনয় এবং ললিতা, অন্যদিকে গোরা ও সুচরিতার মিলনপথে বাধার পরিবর্তে তিনি আগাগোড়া উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। ব্যবহারের মাধুর্যে, যুক্তি-তর্কের প্রখরতায়, হৃদয়বত্ত্বার সৌন্দর্যে, আনন্দময়ীর চরিত্র মন্ডিত। 'গোরা' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৯০৯ সালে এই সমাজ ছিল জাতি-ধর্মের বিচ্ছিন্নতাবাদে বিবর্ণ এক পঙ্কিল সমাজ তারই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী চরিত্র প্রগতিবাদের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

সুচরিতা ও ললিতা দুজনেই ছিলেন সুশিক্ষিতা এবং ব্রাহ্মধর্মের আবহাওয়ায় বড় হওয়ায় তারা দুজনেই এক সুন্দর সংস্কৃতিকে লালন করেছিলেন। এদের মধ্যে ললিতা ছিলেন বেশী প্রখরা ও দীপ্তিময়ী, তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, এম, এ পাস, স্নিগ্ধ স্বভাবের, গোরার শৈশবের বন্ধু বিনয়ের প্রণয়মুগ্ধা। অপরদিকে সুচরিতা ছিলেন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বভাবের, যুক্তিবাদী, উচিতবক্তা, কিন্তু গোরার প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে অবনমিতা, সম্পূর্ণভাবে সমর্পিতা। বিনয় ও ললিতার ষ্টীমার পার্টি থেকে এক সাথে প্রত্যাবর্তনে এবং পরে হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহের পরিকল্পনায় তারা আনন্দময়ী এবং পরেশবাবু ছাড়া কারুর সমর্থন পায়নি। সে যুগের তুলনায় এ ধরনের কার্যকলাপ রীতিমত বৈপ্লবিক নজির বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রটি এক অদ্ভুত মহিমায় ভূষিত-তার মধ্যে দেশপ্রেম, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। গোরা এই উপন্যাসের প্রধান নায়িকা সুচরিতার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন এক মহীয়সী রমণী সত্ত্বা - এই ভাষা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে গোরার মনোভাবটি প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

"সুচরিতাকে সে তখন একটি ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া দেখিতেছিল না, তাহাকে একটি ভাব বলিয়া দেখিতেছিল। ভারতের নারী প্রকৃতি সুচরিতা মূর্তিতে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। ভারতের গৃহকে পুণ্যে, সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইঁহার আবির্ভাব। যে লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, রোগীকে সেবা করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যিনি দুঃখে-দুর্গতিতে ও আমাদের পূজার্ঘ্য হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত দুইখানি আমাদের কাজে উৎসর্গ করা এবং যাঁহার চিরসহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম অক্ষয় দানরূপে আমরা ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি, সেই লক্ষ্মীরই একটি প্রকাশকে গোরা তাহার মাতার পার্শ্বে প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই লক্ষ্মীর দিকে

আমরা তাকাই নাই, ইহাকেই আমরা সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়া ছিলাম- আমাদের এমন দুর্গতির লক্ষ্মণ আর কিছুই নাই। গোরার তখন মনে হইল, "দেশ বলিতেই ইনি, সমস্ত ভারতের মর্মস্থানে প্রাণের নিকেতনে শতদল পদ্মের উপর ইনি বসিয়া আছেন, আমরাই ইঁহার সেবক। দেশের দুর্গতিতে ইঁহার অবমাননা, সেই অবমাননায় উদাসীন আছি বলিয়াই আমাদের পৌরুষ আজ লজ্জিত।" গোরার এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নারীর মহিমাকে তার স্বকীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোরা যেন সুচরিতাকে তার প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছে দেশমাতৃকার মধ্য দিয়ে, তাকে সে প্রাণেমনে চেয়েছে সহধর্মিণী রূপে, সহকর্মিনী রূপে, সহমর্মিনী রূপে। সুচরিতাকে সে বলছে, "তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখা এই একটি আকাঙ্খা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি - কিন্তু তুমি না হলে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করবে কে ? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।" প্রাচীন ভারতের নারীর লুকানো সৌন্দর্য ও মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত লেখনীতে। সেই যুগের সমাজচেতনাকে জাগ্রত করার জন্য দরকার ছিল শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা, নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া, শ্রদ্ধার আসনে সম্মানিত করা। 'গোরা' উপন্যাসের তিনটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রতিভাত হয় যে দীর্ঘ সুপ্ত নারী চেতনার, নারী মুক্তির পথ প্রশস্ত হচ্ছিল এই শতকে।

২

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-র নায়িকা বিমলা সুশিক্ষিতা, সুরুচি সম্পন্না এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের জমিদার নিখিলেশ চৌধুরীর - সহধর্মিণী। নিখিলেশেরই বিশেষ ইচ্ছায় বিমলা তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস পায় সাজসজ্জা, সঙ্গীত, সূচীশিল্প, পঠন-পাঠন, রন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে। নিখিলেশেরই ইচ্ছায় বিমলা অন্দরমহলের চৌকাঠ পেরিয়ে বাহিরমহলে নিখিলেশরই বিশেষ বন্ধু সন্দীপের সাথে পরিচিত হয়, যে ছিল স্বদেশীভাবনায় এবং স্বদেশীকার্যে প্রজ্বলিত। এই স্বদেশী আগুন বিমলার বহিরঙ্গকে যে শুধু দগ্ধ করে তাই নয়, অন্তরের অন্তঃস্থলে বিমলা হয় সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ। বিমলা নিজেই যথেষ্ট সচেতন এই উপন্যাসে তার এই অন্তর বাহিরের জ্বালা সম্পর্কে। সন্দীপ যে ভাষায় বিমলাকে তার অন্তরের পূজা জানিয়েছিলেন, তার মর্মবোধ আর সুচরিতার উদ্দেশ্যে গোরার অর্ঘ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবনের। "আমি যে পূজার জন্যই এসেছি, তা জানেন ? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকে হয় প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে কথা কি আপনাকে বলিনি ? .....যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই, তখনই তো বুঝতে পারি দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে-তেজে কত পরিপূর্ণ ! আপনি নিজে হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব, আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি। তবেই তো, সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবরণ চেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি, তবে বুঝব সে কেবলমাত্র ভূগোল বিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল - কেমন আঁচল জানেন ? আপনি সেদিন একখানা শাড়ি

লাল মাটির মত তার রঙ, সেই শাড়ির আঁচল ! সে কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব ! এই সব জিনিষ হয় তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।" বিমলা যেন শিউরে ওঠে - কারণ সে নিজেই বলছে- "সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার, সে আমি বুঝতে পারলুম না। এরপরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না....। তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এসে পড়ছিল।"

'ঘরে-বাইরের' এই অংশটি পড়ে পূর্বে উল্লেখিত 'গোরার' অংশটির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে গোরার সুচরিতার প্রতি মুগ্ধতা ছিল খাঁটি, নান্দনিক স্পর্শে তা মধুর। সন্দীপের বিমলার প্রতি মুগ্ধতা ছিল স্বদেশীয়ানার ছলে, কামনার রঙে রাঙা।

সন্দীপের প্রণয়মুগ্ধা বিমলার প্রকৃত আত্মচেতনা ফিরে আসে উপন্যাসের একেবারে শেষে, যখন নিখিলেশ সন্দীপেরই স্বদেশীয়ানার প্ররোচনায় তাঁর অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা থামাতে নিজেকে বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। বিমলা তার অনুশোচনা এবং আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়েও কিন্তু তাঁর দাম্পত্য প্রণয়কে, যা ছিল পুষ্পের মত কোমল, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারল না, করতে পারল না অধিষ্ঠিত কোনমতেই তার পূর্ব প্রণয়ের সোপানকে। সন্দীপ স্বদেশ প্রেমের আগুনে ও বিমলার প্রেমের আগুনে জ্বলেও নির্বিকার। তার মক্ষিরাণীর হৃদয় দখল করার আনন্দে সে উদ্বেলিত। আর নিখিলেশ তিলে তিলে চেয়ে দেখল তার অগাধ প্রেমের পরিণতি, অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতার পরিণাম।

এই ট্র্যাজেডি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন দুটি দিকই ক) স্ত্রী স্বাধীনতা অবশ্যই দরকার খ) স্ত্রী-স্বাধীনতার সুরক্ষা দরকার। এই স্বাধীনতা কেবল অবাধ প্রাপ্তি নয়, এই স্বাধীনতাকে আপন সুশিক্ষায়, সুমর্যাদায় রক্ষা করতে হবে। বিমলা যে সেই চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু বোধকরি রোমান্টিক ভাবালুতার কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শিক্ষার স্তব, রূপের স্তুতি, গুণের প্রশস্তি শুনতে সব মানুষই ভালবাসে। সামান্য অন্তঃপুরের নারী বিমলা বাহির মহলের এই জৌলুস ভরা দ্যুতির কাছে, এক দৃঢ়তর ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল; যখন সম্বিৎ ফিরল, তখন তার চিরদিনের মনের পূজারী, প্রেমের পূজারী স্বামী নিখিলেশ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে শেষ অবধি সে এক রক্তের উজানে হারিয়ে গেল চিরদিনের তরে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মার্জিত নারীচরিত্রের জটিল চিন্তা-ভাবনা, তার আত্ম সমালোচনা, তাব স্বাধীনতা-কামী, অথচ চির নির্ভরশীলা মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন নিপুণ হাতে। তিনি বলতে চেয়েছেন স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতাকে যেন কোনমতেই শোষণ বা exploit না করা হয় — নারী সহজেই তার শিকার হতে পারে, যেহেতু বাহির জগতের সঙ্গে তার পরিচিতি কম, মেলামেশা কম। বিমলা চরিত্রের দ্বন্দ্ব, এই জাতীয় স্ত্রী মানসিকতার এক বিশেষ প্রতিফলন। প্রথম বিশ শতকের নারী, যে সবে শিক্ষার পরিশীলিত সোপানে পা রেখেছে তার বহুকালের দ্বিধা কাটিয়ে তার পক্ষে নিজেকে স্বদেশ মাতা রূপে কল্পনা করা বা স্বামী ব্যতীত অন্য এক পুরুষের মনোহরণকারী রূপে কল্পনা করার

নির্দোষ প্রলোভনকে সে জয় করতে পারেনি, তার ফলে তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে জীবনের নিষ্ঠুরতম ট্রাজেডি।

৩

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'যোগাযোগের' নায়িকা কুমুদিনীর চরিত্রচিত্রণও রবীন্দ্রনাথের আরেক অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যেন তিল তিল করে এই তিলোত্তমা নারীকে গড়েছেন তাঁর মনের সমস্ত সুধা মিশিয়ে। কুমুদিনী অপূর্ব সুন্দরী, কুমুদিনী বিনম্রা, ব্যক্তিত্বময়ী, সুশিক্ষিতা, সুমার্জিতা, সুবাদিকা, সুসেবিকা। কিন্তু এহেন কুমুদিনীর যখন তাদের পরিবারের বহুকালের প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের মধুসূদন ঘোষালের সাথে বিবাহ সূত্র হোল, তখনই ট্র্যাজেডির ভূমিকা তৈরী হোল। কুমুদিনী মনে-প্রাণে এক সুনিপুণা সুগৃহিনী হতে চেয়েছিল এবং ভ্রাতা বিপ্রদাসের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিল এক রুচিপূর্ণ আবেষ্টনীতে। সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে, এস্রাজের সুললিতবাদনে, কাব্য-সাহিত্য পঠনে সে ছিল সুদক্ষা এবং সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিল যে সে অবশ্যই তার স্বামীকে সুখী করবে এবং নিজেও হবে স্বামী সোহাগিনী — সে জানত সে যে কোন অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে স্বামীর সংসারে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মধুসূদন ছিলেন কুমুদিনীর একেবারেই বিপরীতধর্মী প্রকৃতির মানুষ। তিনি এত বেশী বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে তাঁর কাছে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির, হৃদয়ের নান্দনিক বোধগুলির কোনই দাম ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্থূল, কঠোর, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তিনি কুমুদিনীর বহিঃসৌন্দর্যের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, মনোজগতের সুখ, দুঃখ, অনুভূতির কোন খবর রাখেননি। উপরন্তু তিনি কুমুদিনীর দেবতুল্য ভ্রাতা বিপ্রদাস এবং তাঁর পিতৃকূলকে বারংবার অপমান করেছেন তাঁর বৈভবের অহংকারে — সে অপমান যে কুমুদিনীর কোমল হৃদয়কে দলিত-মথিত করেছে, সে খবর তিনি রাখেননি। শুধুমাত্র হীরা-মণি-মুক্তা-খচিত গহনা দিয়ে যে কুমুদিনীর মত সত্যিকারের মার্জিতা রমণীর হৃদয় স্পর্শ করা যায় না, তা তিনি বোঝেননি। কুমুদিনীর কাছে তার দাদার দেওয়া একটি ছোট্ট নীলার আংটি, জায়ের ছেলে হাবলুর দেওয়া রুমালে বাঁধা কয়েকটি ছোট এলাচদানাকে অনেক বেশী দামী মনে হয়। মধুসূদন ঘোষালের রূঢ়, বাস্তবের সঙ্গে কুমদিনীর কোমল, সুরুচিপূর্ণ সত্ত্বার প্রতিদিন সংঘাত হতে লাগল - সংঘাতে সংঘাতে কুমু হোল জর্জরিত। তার এস্রাজের সুর হোল স্তব্ধ। প্রথমে সে ছিল অভিমানিনী, তারপর হোল বৈরাগিনী, তারপর আবার হতে চেষ্টা করল সুগৃহিনী। সবশেষে বিদ্রোহিনী হয়ে পিতৃগৃহে গিয়ে অবস্থান করল। তাতে মধুসূদন প্রথমে হোল ক্ষুব্ধ, পরে বিমর্ষ, কিন্তু তারপরে কুমুর মন পাবেন না জেনেই বিধবা ভ্রাতৃবধূ লালসাময়ী শ্যামার সঙ্গে শারীরিক ভাবে অন্তরঙ্গ হলেন। এই অন্তরঙ্গতার খবর পেয়েও কুমুদিনী রইল অটল, অনড়, তার আপন সংসার সামলাতে সে ফিরে এল না। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণতি এমন হয় যে কুমুদিনী উপলব্ধি করল সে সন্তান-সম্ভবা। শুধুমাত্র, তার আগামী দিনের সন্তানকে পিতৃপরিচয়ে ভূষিত করার জন্য, দাদার সকাতর অনুরোধে সে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হোল তার স্বামীর গৃহে। এই খানেই উপন্যাসের যবনিকাপতন।

এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখনকার তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজের চিত্রটি

তুলে ধরেছেন, সেখানে নাবী শিক্ষা-দীক্ষার জোয়ারে নিজেকে প্রগতিবাদী করেছে, অথচ পুরুষের শাসন, লোভ, লালসা, অর্থ লিপ্সাব কাছে বার বাব সে হার মেনেছে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে নারীর [illegible] ভাবে পবাস্ত কবেছে পুরুষের পৌরুষ, যাকে বলা হয় "male chauvinism" পুরুষের কাছে যে নারীব শারীরিক সৌন্দর্যেরই শেষ অবধি দাম আছে, অন্য সব গুণাগুণ ম্লান হয়ে যায়, তাবই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'যোগাযোগ' উপন্যাস। শিক্ষিতা নারীকেও যে শেষ পর্যন্ত পুরুষেব ইচ্ছাশক্তি বা পৌরুষের কাছে পদানত হতে হয়, তারই নজির সৃষ্টি করেছেন ববীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাসে।

৪

উনিশ শতক ও বিশ শতকেব ভাবতীয় চিন্তামানসে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজচেতনায়। ববীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা এক সামাজিক চেতনাবোধকে, বিশেষ করে নাবীমুক্তির বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে তোলেন তাঁদের দৃপ্ত লেখনীব সাহায্যে। বহুকাল ধবে অবহেলিতা নারী তাব সামাজিক সম্মানে পুনরায় ভূষিত হয। হিন্দুধর্মে আসে সংস্কাব আন্দোলন, আর ব্রাহ্মধর্ম দেখায় মুক্তির নতুন পন্থা, যেখানে চিরাচবিত কুসংস্কারকে, জাতিভেদ প্রথাকে চ্যালেঞ্জ কবার মানসিকতা গড়ে তোলেন একদল বুদ্ধিজীবী মানুষ এবং সমাজেব উচ্চবিত্ত শ্রেণীব কিছু মানুষ, বিশেষ কবে নারী এই নবশিক্ষাব জোযাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন যা ছিল তাঁদের জীবনেব অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদেব অধিকারিণী কিছু নারীচবিত্রেব বিশ্লেষণ কবা হযেছে রবীন্দ্রকাব্যে। ললিতা, সুচবিতা, বিমলা বা কুমুদিনী সবাই ছিলেন শিক্ষিতা, মার্জিতা, সুরুচিসম্পন্না। বঙ্গসমাজে সেই সময় যে অনল দীপায়িত হয়েছিল, তা শুধু বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সে অনল অন্তঃপুরবাসিনী কিছু সুশিক্ষিতা মহিলার মনেও এনেছিল প্রগতিব জোয়াব। 'গোরা'র ললিতার মুখে (অষ্টাদশী) যে যুক্তি, যে প্রগতির, সে নির্ভীকতার কথা শুনি, তা সে যুগে বিবল। সুচবিতার মাসি, কুসংস্কার সম্পন্না হরিমোহিনীর পাশাপাশি গোরার মা আনন্দময়ীব চবিত্র কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার স্বকীয়তায়। রবীন্দ্রনাথেব আরও কিছু উপন্যাসে বা ছোট গল্পে এই ধবনেব বুদ্ধিদীপ্তা, প্রগতিশীলা, নারীব পবিচয পাওয়া যায় যারা পাঠকমনকে আকর্ষণ করে - যেমন 'শেষেব কবিতাব' লাবণ্য বা 'নষ্টনীড়' গল্পেব চারুলতা। এই সৌন্দর্যময়ী, তেজস্বিনী মহিলারা- আনন্দময়ী, সুচরিতা, ললিতা, বিমলা, কুমুদিনী, লাবণ্য, চারুলতা অবশ্যই বর্তমান নারী- মুক্তি আন্দোলনের পূর্বসূবী, চিন্তায, যুক্তিতে, আচবণে, সংস্কৃতিতে তাঁরা ভাঙনধরা সমাজে এক বৈপ্লবিক মানসিকতা আনযন কবেছিলেন। তাঁরা যে শুধু পুরুষের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন তা নয, তাঁরা সমাজভাবনায আমূল পবিবর্তন এনেছিলেন, এব জন্য হয়তো তাঁদের অনেক সমালোচনা ও অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপেবও সম্মুখীন হতে হয়েছিল 'গোবা'-তে ও 'ঘরে- বাইরে'-তে এই ধরনের প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে নারী মুক্তির ভিত্তি তাঁরা প্রস্তুত কবে গিয়েছিলেন, আজকের প্রজন্মের নারী তাঁদেবই পথ অনুসবণ কবেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বিশ শতকের শেষেব নাবী সর্বদা তাব স্বাধীনতার পূর্ণ মর্যাদা রাখতে পারছে না; স্বাধীনতার আতিশয্যে রবীন্দ্রসাহিত্যেব নারীকে তারা কোনকালে বিস্মৃতিব গহনে প্রেবণ কবেছে, বেশীর

ভাগেরই তাছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্য বা শরৎসাহিত্য বা বঙ্কিমসাহিত্য পড়ার রুচি নেই, ধৈর্য নেই, সময়ও নেই। তবুও এই বিজ্ঞান সভ্যতার অপরাহ্ণে, নারী স্বাধীনতার পূর্ণ জোয়ারের দিনে, সেই দিকসূরী কিছু নারীর কথা মনে রেখে আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া-মূল্যবোধকে আবার নতুন করে আমরা শেষের বিশ শতকের ইতিহাসের দর্পণে আরও রমণীয় আরও কমনীয়, করে তুলতে পারি।

সূত্র নির্দেশ

১. **রবীন্দ্ররচনাবলী** ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩৯৩ (১৯৮৭)।
২. **রবীন্দ্ররচনাবলী** ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩৯৩ (১৯৮৭)।
৩. **রবীন্দ্ররচনাবলী** ৫ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩৯৩ (১৯৮৭)।

বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী

জাহানারা রায়চৌধুরী

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরাজ শাসকের নতুন রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙলার নাগরিক জীবনের যে মডেল গড়ে ওঠে, তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন যে মেয়েরা, অন্যান্যদের মতই ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত তাঁদের ওপরেও এসে পড়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁরা নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত, ভিক্টোরিয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত বাঙালি ভদ্রলোক যখন সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে বাঙালি নারীর উন্নতিতে উদ্যোগী হলেন তখন আশ্চর্যজনকভাবে পেশা হিসাবে নাচ-গান-অভিনয়ের সাথে যুক্ত মেয়েরা তাতে অনুপস্থিত রইলেন। তাঁদের স্বতন্ত্র করে রাখা হল 'অন্যজগতে'র মেয়ে বলে ভদ্রলোক পরিবার বৃত্তে যাঁদের জায়গা নেই। গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি মেয়ের আপন কথার তালিকা খুব কম না হলেও, সত্যি বলতে কি, সাদা কাগজে কালির ছোঁয়ায় নিজেদের মনের কথাকে অক্ষরে রূপ দিতে পেরেছিলেন কজন ? বিশেষ করে ভদ্রলোক সমাজ যে মেয়েদের সরিয়ে রেখেছিল নিজেদের বৃত্ত থেকে, লিখিত ভাষ্যের অভাবে তাঁদের মনের কথা জানা যথেষ্ট কঠিন। একটি মাত্র ব্যতিক্রম নটী বিনোদিনীর আত্মকথা যাতে ধরা পড়েছে সমাজের বৈপরীত্যে ভরা আচরণে, বঞ্চনায় ক্ষোভ আর শিল্পী সত্তার সম্মান না পাওয়ার বেদনা। বিংশশতকে তার কতটা পরিবর্তন হল ? বিনোদিনী থেকে কাননবালা, সরযু, গহরজান, রাজমণি, যাদুমণি থেকে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়ার কাহিনী তারই ইতিহাস।

ঔপনিবেশিক বাংলার নতুন নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল নানা অঞ্চলের নানা স্তরের মানুষদের নিয়ে। সংস্কৃতিতে তারই প্রতিফলন। যে মেয়েরা জীবিকার তাগিদে নতুন রাজধানীতে জড়ো হয়েছিল তাদের মধ্যে যেমন ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় জাঁকজমক ফুরোনো দরবার চ্যুত কলাবন্ত বাঈরা, তেমনই নাগরিক পরিবেশে নতুন চেহারা নেওয়া খেমটা, ঝুমুর, যাত্রা, ঢপকীর্তন ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সাথে যুক্তমেয়েরাও। ইংরাজের সহায়ক বেনিয়ান রূপে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক, সমাজের মাথা হয়ে ওঠা নব্য ধনীরা এই দুই ধারাকেই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই জন্য অভিজাত গৃহে বাঈজীদের নাচ গানের পাশাপাশি ঝুমুর, খেমটা, কবিগান, ঢপকীর্তনও সাগ্রহে স্থান করে নিয়েছিল। তবে শ্রোতার পার্থক্য ছিল। ধনী বাড়িতে বাঈ নাচগানের আসরগুলির 'দরজা বন্ধ' থাকত সাধারণের কাছে। কিন্তু যখন যাত্রা, কবিগান, ঝুমুর, কীর্তনের আসর বসত তখন সর্বসাধারণের জন্য দরজা খুলে দেওয়াই ছিল

রেওয়াজ। এইভাবে অভিজাত শিল্পচর্চা ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে একধরনের যে সহাবস্থান কলকাতার নগর সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছিল, তাতে ফাটল ধরে উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকেই। তার কারণ বাঙালি ভদ্রলোক মননে ইংরাজী শিক্ষার হাত ধরে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার ছায়াপাত।[২] শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। বাঙালি ভদ্রলোকের শ্লীলতার মাপকাঠিতে খারিজ হয়ে যায় খেমটা, ঝুমুর, কবিগান তারসঙ্গে ব্রাত্য হলেন খেমটাওয়ালি, ঢপকীর্তন গায়িকারা। অথচ একসময় জগন্মোহিনীর মত ঢপ কীর্তনিয়া; হরিদাসী, কামিনীর মত খেমটাওয়ালিরা নাগরিক বাঙালিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বাঈনাচ-গানের সাথে অভিজাত সংস্কৃতির রেশ থাকায় উঁচু তলার বাঙালির আঙিনা থেকে তা ব্রাত্য হল না। এর একটা কারণ সম্ভবত বিদেশী শাসকদের চোখে এরা গ্রহণীয় বিবেচিত হয়েছিল।[৩] সমসাময়িক বহু ইংরাজই ধনী দেশীয় বাড়িতে আমন্ত্রিত হওয়ার সুবাদে বাঈজীদের নৃত্যগীতের অনুরক্ত ছিলেন। গায়িকা হিসাবে নিঁকি ও তারপরে গহবজান, যাদুমণির, মত অনেকে ইংরাজ রাজপুরুষ ও পর্যটকের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন। মনমোহন বসুর পত্রিকা 'মধ্যস্থ'তে এঁদের প্রশংসা করে লেখা হয়-'এদের নৃত্যকৌশল, গীতির ভাবানুযায়ী হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী, ভ্রূকুটি প্রভৃতি যথার্থ ভাবুক লোক দেখিলে বিস্ময়োৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন না।'[৪] এই প্রশংসা থেকে ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এই গায়িকা, নৃত্যাঙ্গনারা নারী হিসাবে, মানুষ হিসাবে সমাজের চোখে সম্মানীয় ছিলেন! এঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এঁরা 'তবায়েফ', ঘরের মেয়ে নন। একারণেই যখন বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৩-এ মহিলাচরিত্র প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য এলোকেশী, জগত্তারিণী, গোলাপ ও শ্যামা নাম্নী চার অভিনেত্রীকে নিয়ে এল তখন 'ভদ্রলোক'দের শঙ্কার শেষ ছিল না। মনমোহন বসুর 'মধ্যস্থ', 'সুলভ সমাচার', 'ভারত-সংস্কারক', 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় বইল। 'সুলভ সমাচার' লিখল- 'সিমলার কতগুলি ভদ্রসন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া আর এক থিয়েটার খুলিতেছে।....যে যে স্থানে পুরুষদিগকে মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করিতে হয় সেই সেই স্থানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়েমানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হইবে এই লোভে পড়িয়া তাঁহারা কতগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন।....মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোকই আনিতে হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্তই অনিষ্টের হেতু হইবে।'[৫] আর 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকা মন্তব্য করে- 'এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা, আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।'[৬] আবার কেউ কেউ ব্যাপারটি দেখেছিলেন অন্য-ভাবে। সাধারণী পত্রিকায় লেখা হয়-'বঙ্গভাষায় নাটক অভিনয়ের আর কোন উদ্দেশ্য থাকুক নীচ ভাবোদ্দীপক খেমটা নাচ সমাজ হইতে বহিষ্কার করা একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাঈনাচ থাকিলে ক্ষতি নাই।'[৭]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 'ভদ্রজনোচিত ভাবনা'-র যে জোয়ার বাঙালি সমাজে দেখা দিতে শুরু করে, তার প্রতিক্রিয়ায় শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্নে প্রথম কোপটি পড়েছিল একেবারে

নিচু তলার শিল্পীদের উপরেই। তবে তা বাঈজীদের সঙ্গীত নৃত্যকেও বাদ দেয় নি। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সংস্কারকদের চোখে এই বাঈজীরাও তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। এর চমৎকার প্রমাণ মিলবে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র মহিলাদের জন্য পত্রিকা 'বামাবোধিনী' ঘাঁটলে। সেখানে বাঈজীদেব সঙ্গীত সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল 'দুশ্চরিত্রা নারীগণের কণ্ঠবমিত অপবিত্র গান'' বলে।[৮] সুতরাং খেমটাওয়ালি, কীর্তনিয়া মহিলারা যেমন পরিত্যজ্য হয়েছেন, বাঈরাও কিন্তু সম্মানের আসন পান নি।

শিল্পী হিসাবে মহিলাদের আত্ম প্রকাশের এক বিরাট সুযোগ এনেছিল থিয়েটার। প্রথম প্রয়াস কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের বহু আগে ১৭৯৫-এ গেরাসেন লেবেদেফের উদ্যোগে বেঙ্গলি থিয়েটার-এ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয়ে নারীচরিত্রে মহিলা শিল্পীদের প্রয়োগের মাধ্যমে। এই অভিনেত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুমান সমর্থন করে ডঃ বিষ্ণু বসুর সিদ্ধান্ত - "আমাদের জনজীবনে প্রচলিত ঝুমুর, যাত্রা প্রভৃতির প্রদর্শন শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন যে মহিলারা, গোলকনাথ অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে।'[৯] তবে অন্য মতে, ঝুমুব বা যাত্রা নয়, লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারে গোলকনাথ দাস কলকাতার ঢপকীর্তনদলের মহিলা শিল্পীদের থেকেই অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন।[১০]

এরপর বেশ কয়েকবছর থিয়েটারে অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া যায় নি। ১৮৩৫-এ শ্যামবাজাবের নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে আর চার অভিনেত্রীর নাম পাওয়া যায় - রাধারাণী, জয়দুর্গা, রাজকুমারী ও বৌহবো ম্যাথরাণী। এই নাট্যাভিনয়ের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল কৈলাসচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত হিন্দু পায়োনিয়ার পত্রিকায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে তার অনুবাদ তুলে দিয়েছেন-'...এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্তি হইত না ? ...এই অভিনয়েব দ্বারা কি হিন্দু দর্শকের নিকট প্রমাণ হইবে না যে যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্তমান বলিলেই চলে ? আমাদের সমাজের স্ত্রী লোকদের মানসিক শক্তির এই মহান ও নতুন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাহাদেব হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।...এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। ...আমরা যেন বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই-যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতিলাভ ঘটিবে।'[১১]

কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ সত্যিই কি এই মেয়েদের 'আমাদের সমাজের স্ত্রীলোক' বলে ভাবতে পেরেছিলেন ? যে নৈতিক বিপ্লবের আশা লেখক করেছিলেন তা যে কতটা অলীক ছিল, তা বোঝা যায দীর্ঘদিন বাদে ১৮৭৩-এ বেঙ্গল থিয়েটারে পুনরায় মহিলা অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে সমাজের শিক্ষিত, প্রগতিশীল ব্যক্তিদের আশঙ্কা আর বিরোধিতায়। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দেব এই আচরণ কি ঐ মহিলা শিল্পীদের মনে কোন প্রশ্ন, ক্ষোভ সঞ্চার

করে নি ? তাঁদের নিজেদের ভাষ্য না থাকায় তাঁদের মনের কথা জানবার অবকাশ সত্যিই কম। তবে সে অভাব কিছুটা মেটে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকাহিনী 'আমার কথা'-র মধ্য দিয়ে। অনেক দিক থেকেই ব্যতিক্রমী তিনি। তথাকথিত বারাঙ্গনা ঘরে জন্ম নিয়েও নিজের চেষ্টায় গিরিশ ঘোষের শিক্ষায় নিজেকে অভিনেত্রী হিসাবে গড়ে তুলেছেন, অভিনয় দক্ষতার শীর্ষে উঠেছেন, প্রতিদানে পেয়েছেন একদিকে অকুণ্ঠ প্রশংসা আবার নাট্যজগতের বিশ্বস্ত নিকটজনের কাছ থেকে প্রতারণাও। তাৎপর্যপূর্ণ হল তিনি সেই ক্ষোভ, নারী হিসাবে অসম্মানের জ্বালা কোন কিছুই সমাজের ভয়ে অব্যক্তরাখেন নি। বরং নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন সেই সমাজপতিদের যাঁরা তাঁদের ব্যবহার করেন কিন্তু মর্যাদা দেন না। '...যে সকল ভাগ্যহীনা রমণীরা এই রূপে প্রতারিতা হইয়া আপনার জীবনকে চিরশ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে যে বারাঙ্গনা জীবন কতটা যন্ত্রণাদায়ক। এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য এই অবলা প্রতারকেবাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন।'[১২] - একথা তিনি নির্ভয়ে বলতে পেরেছিলেন। ব্যতিক্রমী গোলাপসুন্দরীও যিনি ১৮৭৫-এ 'শরৎসরোজিনী' নাটকে অভিনয় করে প্রচণ্ড খ্যাতি লাভ করেন, পরিচিত হন নাটকের চরিত্র 'সুকুমারী' নামে। তাৎপর্যপূর্ণ হল তাকে সামাজিক সম্মান দেওয়ার একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর দলের তরুণ অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সাথে ১৮৭২ এর তিন আইন অনুসারে সুকুমারী বিবাহ দেন। কিন্তু সমাজের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শেষ পর্যন্ত বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সুকুমারী রচনা করেন নাটক 'অপূর্ব সতী'। তাঁর প্রযোজনায় ১৮৭৫-এ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮৩-তে এক ধাপ এগিয়ে তিনি গঠন করেন হিন্দুফিমেল থিয়েটার। পরিচিত হন 'ষ্টার অব নেটিভ ষ্টেজ' আখ্যায়।

ইতিমধ্যে এর সমান্তরাল ধারায় তৎকালীন সমাজের শিক্ষা, আভিজাত্যের প্রতিভূ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা ১৮৭৭-এ অভিনয় করেন 'অলীক বাবু' নাটকে। ১৮৮১ তে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁরা অংশ নিলেন বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে। এই উদ্যোগ রক্ষণশীল সমাজ ভাল চোখে দেখেনি। তাঁদের বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তবুও সামগ্রিকভাবে ঠাকুরবাড়ীর এই মেয়েরা এবং সুকুমারী-বিনোদিনী তিনকড়ির মত অভিনেত্রীদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এদের উভয় সমাজ এক চোখে কখনই দেখেনি। ভদ্রলোক সমাজ সুকুমারী, বিনোদিনী, তিনকড়ি কি তারাসুন্দরীর মত মেয়েদের অভিনয়ে আপত্তি করে নি। এঁরা নৃত্য, গীত, অভিনয়ে মনোরঞ্জন করলে ঠিক কিন্তু আপত্তি তাঁদের সামাজিক উত্তরণের চেষ্টায়। এজন্যই সুকুমারীর বিবাহ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, একমাত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষিত করার ইচ্ছা বিনোদিনীকে সমাজের প্রবল প্রতিরোধে ত্যাগ করতে হয়।

১৯০১-এ গ্রামাফোন অ্যাণ্ড টাইরাইটার লিমিটেড এদেশে প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ড প্রকাশ করল। ওয়াক্স এসেস ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে প্রকাশিত এই রেকর্ডের প্রথম শিল্পী কিন্তু একজন মহিলাই-মিস্ শশীমুখী। এই তালিকায় যুক্ত হয় আরও নাম - ফণীবালা, শীলাবাঈ, মিস কিরণ, মিস বিনোদিনী, আশ্চর্যময়ী দাসী, আরও পরে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা

ঝরিয়া। এই রেকর্ডের গায়িকাদের গান শোনার ব্যাপারে বহু রক্ষণশীল গৃহস্থ বাড়িতেই বিশেষ আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও গ্রামাফোন এসে নিঃসন্দেহে অন্দরে মেয়েদের সামনে নতুন গানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিল। ১৯২৬-এ কলকাতা রেডিও চালু হওয়ায় ঐ সব মহিলা-শিল্পীদের সামনেও নতুন পথ খুলে যায়। জানা যায় উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় দিনেই ইন্দুবালা গান গেয়েছিলেন সেখানে। এই সময় গ্রামাফোন কোম্পানী বাঙালি গায়িকাদের রেকর্ডে হিন্দি গান গাইতে দিত না। কিন্তু ইন্দুবালার জোর অনশনের ফলে কোম্পানি তাঁকে অনুমতি দেয়। ফল সারাদেশে তার বিপুল খ্যাতির প্রসার।[১৩] অভিনয়ের জগতেও সংযোজিত হয় আরও নাম-সুবাসিনী, সুশীলাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, নীহারবালা, সরযূ দেবী, প্রভাদেবী, রাণীবালা, সিনেমায় জনপ্রিয়তমা অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন কানন দেবী।

চল্লিশের দশকে উত্তাল জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গণনাট্য সংঘের মঞ্চে নাচ-গান-অভিনয়ের সাথে যুক্ত হলেন আরও বহু মহিলা। এঁরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে। বেরা রায়চৌধুরী, ঊষা দত্ত, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, অনু দাশগুপ্ত, গীতা সোম, গীতা মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি ভাদুড়ী, প্রীতি ব্যানার্জীরা অনেকেই নানা পারিবারিক সামাজিক বাধা অতিক্রম করে গণনাট্য আন্দোলনে যোগ দেন।[১৪] অবশ্য কেউ কেউ ব্যতিক্রমীভাবে পরিবারের সমর্থনও পেয়েছিলেন। তবে প্রত্যেককেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হত। বেরা রায়চৌধুরীর কথায়- "আমাদের সময়ে মেয়েদের প্রতিপদে লড়তে হত। সামাজিক রাজনৈতিক বিরোধিতাই শুধু নয়, কুৎসা মাড়িয়েও লড়তে হত। মেয়েদের নামে কুৎসা করে পোষ্টার পর্যন্ত পড়ত।[১৫] শিলচরে গণনাট্য আন্দোলনের মেয়েরা যখন রাস্তায় বেরোতেন, তখন অনেক এলাকাতেই তাঁদের উদ্দেশ্যে "রাধে" "রাধে" আওয়াজ তোলা হত। সমাজে নারীপুরুষের একত্র অভিনয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে যথেষ্ট স্পর্শকাতরতা ছিল। এইজন্যই গণনাট্য আন্দোলনের সলতে পাকানোর পর্বে, ১৯৪০ এও ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউটের 'ইন দি হার্ট অব চায়না' নাটকে ছাত্র ও ছাত্রীরা একসঙ্গে অভিনয় করবে না এই নিয়ম বাঁচানোর জন্য মেয়েদের দৃশ্যগুলিতে পুরুষদের রাখা হয় নি।[১৭] তবে এর পাশাপাশি গণনাট্য সংঘে বহু পুরুষ মহিলাশিল্পীদের সহকর্মী হিসাবে সাদবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু অন্যদিকে পাবলিক থিয়েটার, সঙ্গীত, সিনেমার জগতের মহিলা শিল্পীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিকোণ কি সম্পূর্ণ বদলালো ? কাননদেবীর স্মৃতিকথা অন্যকথা বলে। যারা তথাকথিত অন্ধকার জগত থেকে এই শিল্পমাধ্যমগুলি এসে নিজেদের স্থান খুঁজে নিয়েছিলেন। তাঁদের এগিয়ে চলার প্রতিপদে তথাকথিত 'হীন জন্ম' এর ছাপ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজে সমালোচিত হয়েছে। শিল্পী হিসাবে তাঁদের যোগ্যতা মান্য পেলেও সেখানেও থেকে গেছে পুরুষতান্ত্রিক উচ্চমন্যতার ছাপ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গায়িকা ঋতা গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণ উল্লেখযোগ্য। ঋতার সম্ভাবনায় মুগ্ধ প্রখ্যাত গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী শম্ভু মহারাজের উপস্থিতিতে তাঁর শিষ্যা হিসাবে ঋতাকে নাড়া বাঁধেন। তখন শম্ভু মহারাজের মন্তব্য-'তোমরাও [অর্থাৎ তোমরা বাঈজীরাও] আজকাল গান বাঁধতে শুরু করেছ' ?[১৮] তবে বিংশ শতকের চল্লিশের

দশকে এসে মহিলাশিল্পীদের অবস্থান নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা অনেকটাই প্রাঞ্জল হতে পেরেছিল। বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় সমাজের অনাচার, অন্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তারসঙ্গে শেষ পর্যন্ত নিজের সমস্ত বিপর্যয়কে ভাগ্যের পরিহাস নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাননদেবী, ইন্দুবালা নিয়তির হাতে ভাগ্যকে সমর্পণ করেন নি। ইন্দুবালা উচ্চকণ্ঠে দাবি করেছেন ন্যায্য অধিকার, দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছেন তাঁদের তিনপুরুষের আশ্রয়স্থল ঐ বেশ্যাপল্লী রাম বাগান (রূপোগাছি) ছেড়ে তথাকথিত ভদ্রপাড়ায় যাওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। পাড়া বদলে নামের শেষে বালা বাদ দিয়ে দেবী হওয়াতেও ঘোর আপত্তি ছিল তাঁর।[১৯] শিল্পী জীবনে অনেক অন্যায়, মহিলা হিসাবে অনেক অবদমনের শিকার হলেও কাননদেবী বলতে পেরেছেন - 'জীবনে সম্মান, মর্যাদা কেউ হাতে তুলে দেয় না। পৃথিবীটা কঠিন পর্বতের মত এবড়ো খেবড়ো। গাঁইতি দিয়ে কেটে কেটে তাকে সমতল করে নিজের চলার পথ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।'[২০]...'বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে জন্মানোর অর্থ কি ? সুন্দর জীবন এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছেই এবং যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে যে কোন মূল্যে।'[২১] বিনোদিনী থেকে কাননদেবী, গহরজান, যাদুমণি থেকে আঙুরবালা, ইন্দুবালার উত্তরণ এখানেই।

সূত্র নির্দেশ

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, **পুরাতন প্রসঙ্গ**, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, **উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য**, ১৯৯৯।

২. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঈনাচ বনাম খেমটা ঃ উনিশশতকের বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রেণী বৈষম্য", **শারদীয়া বারোমাস**, ১৯৮৬, পৃ: - ১৯।

৩. ঐ, পৃ: - ২০।

৪. **মধ্যস্থ**, অগ্রহায়ণ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ: - ১৬।

৫. **সুলভ সমাচার**, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩; বিষ্ণু বসু, "নারী প্রগতি ও অভিনেত্রী", **গ্রুপ থিয়েটার**, দশম বর্ষ প্রথমসংখ্যা (আগষ্ট - অক্টোবর), ১৯৮৭, পৃ: - ২৯।

৬. বিষ্ণু বসু, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ: - ২৮।

৭. **সাধারণী**, অগ্রহায়ণ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে, পৃ: -

৮. "এদেশীয় নারীগণের সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যিকতা", **বামাবোধিনী পত্রিকা**, জৈষ্ঠ, ১২৭৯, ভারতী রায় সম্পাদিত, সেকালের নারী শিক্ষা ঃ **বামাবোধিনী পত্রিকা** (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২৮।

৯. বিষ্ণু বসু, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: - ২৭।

১০. নৃপেন্দ্র সাহা, "বঙ্গীয় নাট্য সংস্কৃতিতে নারী", **আকাডেমি পত্রিকা**, অষ্টম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, পৃ: - ২২২।

১১. **হিন্দু পায়োনিয়ার পত্রিকা**, ২২ অক্টোবর ১৮৩৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** গ্রন্থে, পৃ: - ২৩-২৪।

১২. বিনোদিনী দাসী, **আমার কথা** (সম্পাদনা - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য্য),

কলিকাতা, ১৩৭১।
১৩. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, "দশটি টাকা আর একবাটি মাংস" **ইন্দুবালা** (বিশেষ শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ), সানন্দা পার্বনী, বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ: - ২৫৪।
১৪. উষা দত্ত (ভার্মা), **দিনগুলি মোর**, ১৯৯৩ দ্রষ্টব্য।
১৫. পত্রাঙ্গ বসু, "রেবা রায় চৌধুরীঃ গণনাট্যের শক্তিময়ী অভিনেত্রী", **গ্রুপ থিয়েটার**, ৩৭ সংখ্যা, ১৯৮৮; নৃপেন্দ্র সাহা প্রাগুক্ত প্রবন্ধে, পৃ: - ২৩২।
১৬. সুরথ পালচৌধুরীর মৌখিক সাক্ষাৎকার, মালিনী ভট্টাচার্য, "**নতুন ভূমিকার খোঁজে ঃ গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নারী শিল্পী**", ১৯৯৯, পৃ: - ৩২১।
১৭. মালিনী ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: - ৩২৭।
১৮. কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, **মজলিস**, ১৯৯৭, পৃ: - ৫২।
১৯. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: - ২৫৫।
২০. কানন দেবী, **সবারে আমি নমি**, বৈশাখ, ১৩৮০, পৃ: - ১।
২১. ঐ, পৃ: - ১১.

উনবিংশ শতকের আধুনিকতা ও বাংলা নাটকে নারী প্রসঙ্গ

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবীচর্চা বলতে আজকের দিনে যা বুঝি, তা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঘরে বাইরে জীবনের সর্বত্র ক্ষমতার যে সূক্ষ্ম বৈষম্য মেয়েদের অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তার সচেতন ও বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনাও মানবীচর্চার অঙ্গ। এই চর্চার একটি বহু আলোচিত বিষয় হল সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক সম্পর্কের প্রকরণ ও বিবর্তন।

উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে মেয়েদের নিয়ে চিন্তাভাবনা এক নতুন মাত্রা পায়। সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে কীভাবে গড়ে উঠবে দেশজ সংস্কৃতির অবয়ব এবং সেই সংস্কৃতিতে ভারতীয় নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা কী হবে-জাতীয়তাবাদী চিন্তা আবর্তিত হত এসব প্রশ্নকে ঘিরে। নারীকে অন্দরমহলে রেখে তাকে জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে 'নারী সমস্যার জাতীয়তাবাদী সমাধান' বলে উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় 'নব্য ভদ্রমহিলা'র এক আদর্শায়িত প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগই এই চিন্তাধারার সাক্ষ্য দেয়। পুরুষ নির্মিত এই প্রতিমাকে মেয়েরা যে সবসময় নিঃশব্দে অনুসরণ করে গেছেন, এমন নয়। এক দিকে পরিশুদ্ধ শাস্ত্র সম্মত নারীত্বের আদর্শ আর অন্যদিকে পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রাণিত শিক্ষিত নারীর আদর্শ - এই দ্বিবিধ চাপ মাথায় নিয়েও তাঁরা বিবিধ পত্র পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে নিজেদের সত্ত্বা ও সামাজিক অবস্থানকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'আত্মজীবনী' বা 'আত্মকথা' লেখা সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ। একটি হিসেবে দেখা গেছে ১৮৫৯ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে লিখতে শুরু করেছেন ১৯৪ জন মহিলা। কিন্তু এই 'ভিড়'-এর মধ্যে আলাদা করে নেওয়া যায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের, তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু এবং বিশিষ্ট সামাজিক অবস্থানের কারণে।

আমরা এখানে দুজন অভিনেত্রীকে বেছে নিয়েছি - বিনোদিনী দাসি এবং গোলাপ-সুন্দরী।

১

মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিনোদিনীর সমসাময়িক অধিকাংশ মহিলা লেখকই 'আদর্শনারী'-র পুরুষ সৃষ্ট ছকটির সঙ্গেই সহমত হতেন। বিনোদিনীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী নারীভাবনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আদর্শ মাতা, কন্যা বা বধূর কোনটিই

তিনি ছিলেন না। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি 'সমাজপতিতা ঘৃণিতা বারনারী', উনিশ শতকে 'আদর্শ নারী'-র প্রতিমা নির্মাণের প্রকল্পে যে নারীর কোনও স্থান নেই। তাই তথাকথিত 'ভদ্র সংস্কৃতির' প্রতি তাঁর কোনও দায় ছিল না। সাহিত্যের জগতে তাঁর এই ব্রাত্য অস্তিত্ব সম্পর্কে বিনোদিনী নিজেও ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। কলম ধরার সিদ্ধান্ত তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল এইভাবে-'জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেন লোকশিক্ষার জন্য, পরোপকারের জন্য, আমি লিখিলাম, আমার নিজের সান্ত্বনার জন্য, হয়তো প্রতারণা বিমুগ্ধ নরক পথে পদবিক্ষেপোদ্যতা, কোন অভাগিনীর জন্য। কেননা আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজ বর্জিতা, বারবণিতা, আমার মনেব কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই।'[১]

এইখানেই একদিকে চূড়ান্ত মঞ্চসফল-পেশাদার অভিনেত্রী, অন্যদিকে ভদ্রসমাজে ব্রাত্য 'বার নারী' - এই দ্বৈতসত্ত্বা তাঁর লেখক সত্ত্বার অবস্থানের প্রশ্নটিকে আমাদের সামনে হাজির করে। এই অবস্থানটি যে জটিল এবং বহুমাত্রিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরল 'নারীবাদী' করে তাকে ফেলা যাবে না। যেখানে কেবল 'প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর' খোঁজা হয়। সমস্যা হল বিনোদিনী নিজে সে প্রতিবাদ সচেতনভাবে করতে বলেনি। গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরামর্শে 'অপ্রিয় প্রসঙ্গ' বাদ দিয়ে আত্মজীবনী লেখার কারণ কৌশল অনুযায়ী-ই শুরু করেছিলেন লেখা। সেই সীমারেখা শেষ পর্যন্ত ভেসে গেছে অনুভূতি আর আবেগের স্রোতে। তাঁর জীবনের প্রেমিক ও পুরুষ সহকর্মীদের কথা তিনি লিখেছেন অকপটে। থিয়েটারের প্রতি অসীম ভালবাসার তাগিদে একটি নতুন সাধারণ রঙ্গালয় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কীভাবে তিনি এক বিত্তবান অবাঙালি (গুর্মুখ রায়)-র উপপত্নী হয়ে থাকতে বাধ্য হন, সে বৃত্তান্ত [২] লিখেছেন সাহস করে। তিনি আরও লিখেছেন কীভাবে 'বন্ধু' ও সহকর্মীদের ঈর্ষা ও চক্রান্তে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠা সেই রঙ্গালয় তাঁর নামে নামাঙ্কিত হওয়ার সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হন। ফলে তাঁর 'আত্মকথায়' 'বেদনা গাথা'-র বহিরঙ্গের অন্তরালে সমসাময়িক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নৈতিকতার প্রতি ধিক্কারও খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বিনোদিনীর রচনা থেকে আমরা এক বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনা পাই। যে সমাজে বিনোদিনীর পেশাদার জীবন, যেহেতু সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত, সেই বিচারে তাঁকে 'ভদ্রমহিলা' আখ্যা দেওয়া যায় না। অথচ দৈনন্দিন নগরজীবনে সাধারণ রঙ্গালয়ই একমাত্র পরিসর যেখানে ভদ্রমহিলার আদর্শায়িত প্রতিমা নির্মাণে 'জাতীয়তাবাদী প্রকল্প'-এর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে আবার সেই প্রকল্প থেকেই বাদ পড়ে যায় তথাকথিত 'পতিতা' মেয়েদের বৃত্তিজীবিকাব প্রশ্ন। বিনোদিনী ও তাঁর সহকর্মী তারাসুন্দরী, হরিদাসী, যাদুমণিদের মতো অভিনেত্রীদের 'অলৌকিক' জীবিকার মধ্যে দিয়েই রঙ্গমঞ্চে পরতে পরতে উন্মোচিত হতে থাকে জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, শিক্ষা, আধুনিকতা সম্বন্ধীয় অসংখ্য বিতর্ক। যে বিতর্ক আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা-আন্দোলনের বিতর্ক, সর্বোপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিতর্ক যারাই আবার 'নব্য নারী'কে মুক্তি ও স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই বিষয়টি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে কতটা বিতর্ক তুলেছিল তার উদাহরণ একটি দীর্ঘ

উদ্ধৃতির দ্বারা দেওয়া যেতে পারে। জনৈক বসন্তকুমার ঘোষ[৩] লিখেছেন - 'সংস্কার প্রয়াসী উন্নতিশীল নব্যগণ সাধারণ নাট্যশালাকে সমাজের আবর্জনাস্বরূপ মনে করেন। সাধারণ নাট্যশালা বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট বলিয়াই যে তাঁহাদিগের এইরূপ বিরাগ, কেবল তাহা নহে - নাট্যশালার প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণার বোধ হয় অন্য কোন হেতুও আছে। ইংরাজী থিয়েটারে অভিনয় হয়নি, ছদ্মবেশে মত এলেনের নৃত্যসভায় যোগদান প্রভৃতিতে তাহাদিগের কোন প্রকার বিতৃষ্ণা দেখা যায় না - কিন্তু বঙ্গযুবক-পরিচালিত অবৈতনিক নাট্যশালার অভিনয় দর্শনও যেন তাঁহারা আত্মিক পাপ বলিয়া মনে করেন। ইহার প্রকৃত কারণ তাঁহারাই নির্দেশ করিতে পারেন।

আধুনিক সভ্যজগতের সর্বত্র সাধারণ নাট্যশালায় এবং বহু স্থানে অবৈতনিক নাট্যশালায়ও রমণীই রমনীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া থাকেন। রমণী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ, স্বাভাবিকতা, সম্পূর্ণ রূপে রমনীর কলানৈপুণ্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা সর্ববাদী সম্মত। অভিনয়ে নারীচরিত্রের পরিস্ফুটনের জন্য পুরুষের চেষ্টা কেবল অসম্ভব নহে অস্বাভাবিকও বটে। অভিনেতা যখন সর্ববিষয়ে অভিনয়ের চরিত্রের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন, তখনই এ অভিনয় সার্থক হয়। সুতরাং অভিনয়ের স্বার্থ হিসাবে পুরুষ কর্তৃক নারীচরিত্রের অভিনয় সকল স্থানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে না। অতএব নারী চরিত্রের অভিনয় যে রমণী কর্তৃকই হওয়া উচিৎ, ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। ...নাট্যশালার অভিনেত্রীগণ বারাঙ্গনা কি না, তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নাট্যশালার রুচি কলুষিত হইয়া যায় কি না, নাট্যশালার নামেই যাঁহাদিগের মনের তুলাদণ্ড এই সকল কল্পনার তৌল হইতে থাকে, তাঁহাদিগেরই রুচি পবিত্র কে বলিবে ? অভিনেত্রীগণকে কি কেবল অভিনেত্রী রূপেই গ্রহণ করা যায় না ? তাঁহাদিগের পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার অবশ্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ...বারাঙ্গণারও অবশ্য হৃদয় আছে, তাঁহারাও মানবী ব্যতীত আর কিছু নহে। বারাঙ্গনা হইলেও রঙ্গালয়ে তাঁহারা কোন মন্দ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন না। জীবিকার অনুরোধে অভিনেত্রী বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং অভিনয় সাফল্যের নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্তপারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। কেহ কেহ জীবিকা-নির্বাহের নিমিত্ত কেবল রঙ্গালয়কেই একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই নিমিত্তই রঙ্গালয়ে কুরুচির প্রস্রবণ বলিয়া সমাজ-নেতৃবর্গের উপেক্ষার বিষয়ীভূত তাঁহারাই হইয়া আসিতেছেন।'

১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। এতদিন পর্যন্ত নাটকে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করতেন। এতে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা নষ্ট হত। মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রনাথ দাস স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। মধুসূদন অভিনেত্রী গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর অসম্মতি জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের অসম্মতি সত্ত্বেও উদ্যোক্তরা অভিনেত্রীর সন্ধানে তৎপর হলেন। বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করা হল। চারজন অভিনেত্রী নির্বাচিত হলেন। গোলাপ, জগত্তারিণী, এলোকেশী এবং শ্যামা। এঁদের মধ্যে গোলাপই আমাদের আলোচ্য। গোলাপ অনেক নামে পরিচিত-

গোলাপকামিনী, গোলাপমোহিনী, গোলাপসুন্দরী, গোলাপী প্রভৃতি। গোলাপ পরে সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিত হন। অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা' গ্রন্থে 'রঙ্গালয়ে স্ত্রী-অভিনেত্রী' প্রবন্ধে গোলাপের জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁকে থিয়েটারে নিয়ে আসেন। তিনিও বারাঙ্গণা ছিলেন। তাঁর আখ্যানও অনেকটা 'বিনোদিনীর' মত। তিনি 'বিনোদিনী'-র মত আত্মকথা লেখেননি, কিন্তু 'অপূর্বমতী' (১৮৭৫) নামে নাটক লিখেছেন, যাকে আমরা এক অর্থে তাঁর আত্মকথা বলে মেনে নিতে পারি। সেই আত্মকথা একটি নারীর জ্বালা যন্ত্রণা শোক তাপে ভরা। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম মহিলা নাট্যকার। এই নাটকে তিনি পতিতাদের জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার সঙ্গে তাদের সতীত্বের প্রশ্নটিও এনেছেন। অভিনয়কলায় দীক্ষা নয়, নারীজীবনের সুস্থতার প্রত্যাশী সুকুমারী। সতীত্ব সুকুমারীর কাম্য। সমাজ দীক্ষা দিক এই অভাগিনীদের পুনর্বাসনে। এই নাটকের ভাষ্য এই রকম - 'ভাই-অনাথ অনেক সতীর কথা শুনেছি কিন্তু নলিনীর মত এমন অপূর্ব মতীর নাম কখনও শুনি নাই। বিমল তরঙ্গিণী সলিলে পঙ্কজোৎপত্তি যেমন অসম্ভব, অবিদ্যা তনয়ার সতীত্বও সেই রূপ। যে নারীর সর্বদা নীচ সংসর্গে বাস, যাহার উৎপত্তি অতীব ঘৃণিত, পবিত্র বিমল সতীত্বের উপর তাহার কখনই গাঢ় ভক্তি হইতে পারে না। আলোক সম্ভবা অপূর্বমতী প্রদর্শিত পবিত্র পথ যে নলিনীর ন্যায় অবস্থাগত রমণীদের একপ্রকার আদর্শ হইবে তাহার সন্দেহ নাই।'[৫]

এইভাবে আমরা দেখতে পাই বিনোদিনী, গোলাপসুন্দরীরা প্রচলিত আদলের 'নটী' নন। তাঁরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন। শিক্ষিত হয়েছেন, আধুনিকতার আলো পেয়েছেন, তা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলার 'অপর' (other) জীবনই তাঁদের কাটাতে হয়েছে। এই প্রত্যাখানের উপলব্ধি যে তিক্ততা আর অবিশ্বাসের জন্ম দেয়, তা এঁদের রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কাউকে দায়ী করতে এঁদের যতই আপত্তি থাকুক, ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদের দিনের। তাই এই বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী।

এখানে একটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করা যেতে পারে - যে বিনোদিনী, গোলাপসুন্দরীরা কখনও মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি তাঁরা 'কলঙ্কিনী পতিতা', তা সত্ত্বেও কেন তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তথাকথিত 'ভদ্রজনোচিত' জীবিকা লেখালিখির জগৎকে ? বোধ হয় ভিক্টোরীয় মহিলাদের মত বিনোদিনীদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও হয়তো কোনও নৈতিকতার দায় অথবা লেখার মাধ্যমে 'ভদ্রমহিলার' সামাজিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা ছিল। এখানেই বোধহয় আমাদের নাগরিক জীবনের ট্রাজেডি যার ফাঁদে কিন্তু বিনোদিনীদের পড়তেই হয়।

সূত্র নির্দেশ

১. বিনোদিনী দাসী 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত); পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৭।

২. সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক থিয়েটারের ইতিহাসের সূচনা পর্বেই ১৮৭৪ সালে, মাত্র এগারো বছর বয়সে বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন শুরু। ১৮৮৬ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে

অভিনয় থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন বিনোদিনী। জীবনের বাকি পঞ্চান্ন বছরে একবারের জন্যও আর রঙ্গ মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিনি, যদিও নাটকের প্রতি তাঁর ভালবাসা আমৃত্যু বজায় ছিল, যার উদাহরণ তাঁর লেখালেখি। বিভিন্ন বয়সে তিনি তিনবার আত্মকাহিনী লেখেন প্রথমবার ১৯১০-এ অমরেন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'; দ্বিতীয়বার ১৯১২-এ পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে প্রকাশিত হয় 'আমার-কথা', তৃতীয়বার ১৯৩১-৩২-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'আমার অভিনেত্রী জীবন'। এই সব রচনা একত্রিত করে 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় [সূত্র (১) দ্রষ্টব্য]

৩. বসন্তকুমার ঘোষ (পরিচয় অসংগৃহীত)-'রঙ্গনারী রঙ্গভূমি', নাট্যমন্দির, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২০, রচনাটি দেবাশিস মজুমদার ও শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত 'শতাব্দীর নাট্যচিন্তা', এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০ থেকে গৃহীত।

৪. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় - 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা', কলকাতা, ১৩৩০।

৫. বিজিত কুমার দত্ত (সম্পাদিত) - 'সুকুমারী দত্ত এবং অপূর্বসতী নাটক', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত, জানুয়ারি, ১৯৯২ - এটি নাট্য আকাডেমী পত্রিকা -২, ১৯৯২-তে ক্রোড়পত্র হিসেবে সংযোজিত।

উনবিংশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া

রণবীর নাথ

নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস থেকে দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নাটকের উদ্ভব ঘটেছে ধর্মের পথ ধরে। কোন না কোন ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীতমূলক লোকাভিনয়ের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাটকের জন্ম। ভারত, গ্রীস, রোম, চীন, ইংল্যাণ্ড - কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঠিক সেরকম প্রত্যেক দেশেই অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে মেয়েদের সরিয়ে রাখা হয়েছে সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির আশঙ্কায়। অথচ সমাজের প্রতিরূপ নাটক থেকে স্ত্রীচরিত্র যেহেতু বাদ দেওয়া যায় নি, তাই মঞ্চে অভিনেত্রীর অভাব পূরণ করা হয়েছে সুদর্শন বালক ও নবযুবকের সাহায্যে।

গ্রীক নাটকেব ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন। ডায়োনিসাম দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করেই গ্রীক ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উদ্ভব ও বিকাশ কিন্তু নাটকের ব্যাপক চর্চা সত্ত্বেও কোন মহিলাকে আমরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে দেখি না, পুরুষেরাই নারীরূপ ধারণের জন্য নানা প্রকার মুখোশ ব্যবহাব করত। রোমে অভিনেতারা বিশেষ অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। প্রথমদিকে থিয়েটারের দলগুলি গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাসদের নিয়ে। পরবর্তীকালে মাইম ও প্যান্টোমাইম বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। প্যাণ্টোমাইমের কিছুদল মহিলা কেন্দ্রিক ছিল। অভিনেত্রীদের উদ্দাম অর্ধনগ্ননৃত্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল কিন্তু রোমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পর অভিনয়েব ক্ষেত্র থেকে মেয়েদের অপসাবণ ঘটে। দীর্ঘকাল তা বজায় ছিল।[১] ইংল্যাণ্ডে নাটকের উদ্ভব পুরোপুবি খ্রীষ্টধর্মের আশ্রযে। খ্রীষ্টের জীবন কেন্দ্রিক মিষ্ট্রি ও মিরাক্‌ল্‌ প্লে অভিনীত হত গীর্জাপ্রাঙ্গণে, অভিনেতাবা ছিলেন পাদ্রী সম্প্রদায়ের। পরবর্তীকালে এলিজাবেথের রাজত্বকালে নাটকের বিস্তৃতি ঘটে বটে কিন্তু অভিনেত্রীদের আনা সম্ভব হয় নি। শেক্সপীয়রকে ডেসডিমোনা, লেডি ম্যাকবেথ, পোর্সিয়া ইত্যাদি অমর নারীচরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে হয়েছে একজন পুরুষ-অভিনেত্রীব কথা মাথায় রেখে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে (১৬৬০ খ্রী. ৮ই ডিসেম্বর) অভিনেত্রীসহ প্রথম অভিনয়টি সম্পাদিত হয। তার পূর্বেই অবশ্য চার্লস পুরুষ অভিনেত্রীপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর থেকে অভিনেত্রী প্রথা ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে পুরোপুরি প্রচলিত হয়ে যায়।

ভারতের সংস্কৃত নাটকে কিন্তু অভিনেত্রী প্রথা চালু হয়েছিল অতিপ্রাচীন যুগে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় অভিনয়েব জন্য ব্রহ্মা চব্বিশ জন অপ্সরা রমণীর সৃষ্টি করেছিলেন। এরাই আদি অভিনেত্রী। এটা গল্প হলেও, নিহিতার্থটি অনুমান করা সহজ। নাটকে স্ত্রী চরিত্র

থাকবে, আর তা অভিনয়ের জন্য নেওয়া হবে গণিকাদের, এটাই ছিল প্রাচীন নাট্যাচার্য্যদের সিদ্ধান্ত। উনিশ শতকের মত ন্যায়-অন্যায়ের টানা পোড়েনে তারা ভোগেন নি। সমাজে অভিনেত্রীদের (অভিনেতাদেরও) খুব সম্মানজনক আসন দেওয়া না হলেও, ইংল্যাণ্ডের মত তারা ঘৃণিত ছিলেন না।[২] ভর্তৃহরি ইত্যাদিদের লেখা থেকে দেখা যায় রাজারাও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতেন। মালবিকা, বসন্তসেনা ইত্যাদি চরিত্রই প্রমাণ করে এদের অবস্থানের পরিচয়।

তবে মেয়েদের অভিনয়ের এই ধারা মধ্যযুগের সুদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্নতা পেরিয়ে বাংলা নাটকে সঞ্চারিত হতে পারে নি। নাট্যাভিনয় ব্যাপারটি কেবল বাংলায় নয় মুসলিম শাসনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সর্বত্র স্তব্ধ হয়ে গেছিল।[৩] বাংলার শাসনদণ্ড ইংরেজদের হস্তগত হবার পর কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে, ধীরে ধীরে কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় গড়ে উঠতে থাকে। এই রঙ্গালয়গুলি বাঙালীর নাট্যচর্চা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বাবু ঘরানার সখের থিয়েটারের পথ বেয়েই একদিন গড়ে ওঠে ন্যাশান্যাল থিয়েটার। কেবল ব্যতিক্রম দু'টি: লেবেদফের বেঙ্গলি থিয়েটার ও শ্যামবাজারে নবীন বসুর রঙ্গালয়।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের জনক ভারত প্রেমিক রাশিয়ান লেবেদফ। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তাঁর 'কাল্পনিক সংবদল' (The Disguise এর বঙ্গানুবাদ) নাটকটিতে অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনেত্রীদের আগমন ঘটেছিল। তবে তারফলে সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি ঘটেছিল বা আদৌ ঘটেছিল কি না তৎকালীন সংবাদপত্রের অভাবেই তা জানার আর উপায় নেই। এর পর অভিনেত্রী গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায় শ্যামবাজারের নবীন চন্দ্র বসুর বাড়ির থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে (প্রথম অভিনয় ৬/১০/১৮৩৫) এখানের তিন অভিনেত্রী হলেন রাধামণি বা মণি, জয়দুর্গা ও রাজকুমারী বা রাজু। তৎকালীন সংবাদপত্র 'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' ও 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' এই মহিলাদের অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছিল। হিন্দু পাইয়োনীয়ার অন্যান্য কথার সাথে লিখেছিল, "....ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার সত্ত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। (৬.১০.১৮৩৫)[৪]

কিন্তু এই মানসিকতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখা যায় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনেত্রী যোগদানের ফলে। সুপ্রসিদ্ধ ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ (৯ নং বিডন স্ট্রীটে) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাইকেলের পরামর্শে এখানে প্রথমে চারজন অভিনেত্রী নেওয়া হয়। এই চারজন হলেন গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা-সুন্দরী। বলা বাহুল্য এরা সবাই বারাঙ্গনাপল্লী থেকে আগত। এদের সাহায্যে প্রথম অভিনীত নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৬.৮.১৮৭৩)। বেঙ্গলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারেও প্রথমে পাঁচজন অভিনেত্রী নেওয়া হয় (ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, কাদম্বিনী, রাজকুমারী, হরিদাসী) এবং এদের দ্বারা প্রথম অভিনীত নাটক 'সতী কি কলঙ্কিনী') (১৯.৯.১৮৭৪) অভিনেত্রী যুক্ত থিয়েটারে দর্শক সমাগম স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি হতে থাকে। ফলে ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য এরপর একে একে সব থিয়েটারেই অভিনেত্রী

নেওয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুই ছিল নারী। পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ছিল অন্যতম ভোগ্যবস্তু। এই ব্যক্তিত্বহীন লাঞ্ছিতা নারীকে বৃহত্তর পৃথিবীর সূর্যালোকে দাঁড় করানোর জন্যই রামমোহন-বিদ্যাসাগর ইত্যাদির সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা। সতীদাহ রদ, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহরদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি নানামুখী কল্যাণ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন সমাজ সংস্কারকরা। সাহিত্যে নারীব্যক্তিত্বের প্রকাশ আরো স্পষ্ট। মধুসূদনের কাব্যে নাটকে তারা কেবল বীরাঙ্গনাই নয়, পুরুষের সহকর্মিনীও। বঙ্কিমের উপন্যাসে নাবীর স্বাধিকার আরও স্পষ্ট উচ্চারিত। তবে এই জাগরণ অনেকটাই ভাবের জগতে। ব্রাহ্মসমাজ নারীজাগরণের ক্ষেত্রে ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। কেবল তাই নয় বাংলার নাট্যান্দোলনেও এদের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য।

অথচ রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নেবার কথা উঠতেই এই উদারপন্থীরা ভয়ে কেঁপে উঠেছেন। অভিনেত্রীর কারণেই বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকবর্গ থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর।[৫] তৎকালীন পত্রপত্রিকাগুলি সরবে গর্জে উঠেছে অভিনেত্রী প্রথার বিরুদ্ধে। অভিনেত্রীরা যেহেতু ভদ্রঘরেব মেয়ে নয়, বারাঙ্গনা কূল থেকে আগত, তাই তাদের সংস্পর্শে রঙ্গালয়ের পবিত্রতা নষ্ট হবে, সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হবে, স্কুল-কলেজের ছেলেরা বিপথগামী হবে, সমাজ পরিবার ভেঙে যাবে - ইত্যাদি যুক্তিতে তারা মঞ্চ থেকে অভিনেত্রীদের বিদায় দিতে চেয়েছে। একাজে অগ্রণী ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। কলকাতার অনেকগুলি পত্রিকাই ছিল এদের পরিচালিত। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে অবিশ্রাম বিষোদ্গার করা হয়েছে মঞ্চ সম্পর্কে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি লেখার সামান্য কিছু অংশ উদ্ধার করলাম:

(ক)...We wish this Dramatic corps had done without actress. It is true that professional women join the Jattras and natches, but we had hoped managers of Bengali theatres would not bring themselves down to the level of the Jattrawallas.[৬]

(খ) কুক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের বঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অধঃপতিত বঙ্গসমাজে অতিসন্তপর্ণে ইজ্জত রাখিতে হয় - এ সমাজে দুঃশীলা মহিলাদিগের সহিত একত্র হইয়া অভিনয়কার্য সম্পাদন করা অসাধ্য। এই বিড়ম্বনায় গিরিশ, কেদার, অর্ধেন্দু, মতি, নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র সকলে মাটি হইয়া গেলেন।[৭]

(গ) থিয়েটারেব লোকেরা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এবং উপার্জনের লোভে বাজার হইতে স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। এতদ্বাবা কি অল্প বয়স্ক কি অধিক বয়স্ক সকলের পক্ষেই কতদূর অনিষ্টের ভয় তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক....পাঠকদের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাঁহারা যেন যে সমস্ত থিয়েটারে স্ত্রী অভিনেতা আছে সেখানে গমন না করেন।[৮]

(ঘ) That this theatre has by the introduction of the harlots on the stage became the hot bed of immorality and corruption.[৯]

উদ্ধৃতির সংখ্যা আর না বাড়িয়েও বলা যায় এযুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখনোই অভিনেত্রীদের বারাঙ্গনার অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারেন নি। বারাঙ্গনা গমনে যদিও অনেকেরই অনীহা ছিল না, বরং অনেকক্ষেত্রে তা সামাজিক আভিজাত্যের পরিচায়ক ছিল, তা সত্ত্বেও প্রকাশ্য মঞ্চে বারাঙ্গনা অভিনেত্রীদের আবির্ভাব তারা মেনে নিতে পারেন নি। মধ্যভিক্টোরীয় নীতিবোধে বিশ্বাসী ব্রাহ্মরা এই কারণেই ছিলেন রঙ্গালয়ের ঘোরতর বিদ্বেষী। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "This opposition came almost exclusively from Brahma Samaj which represented a powerful puritan movement in those days."[১০] ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ছোটবেলা থেকেই নাটকের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু 'যখন হইতে বারাঙ্গনাগণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী হইল তখন হইতে শিবনাথ আর রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন নাই।"[১১] শিবনাথ স্বয়ং লিখেছেন, "বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যে দিন হইতে আসিল, সেইদিন হইতে আমার অন্তর্ধান।"[১২] তাঁর এই ছুৎমার্গিতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শ ত্যাগ। কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, 'যাব কি ? থিয়েটারের হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ওখানে আর আমাদের যাওয়া চলে না।"[১৩]

কেশবচন্দ্র সেন অভিনয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন, স্বয়ং অভিনয়ও করতেন। সেই কেশবচন্দ্র তাঁর 'সুলভ সমাচারে'র মাধ্যমে অভিনেত্রীযুক্ত থিয়েটার বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে। বঙ্কিমচন্দ্রও থিয়েটারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তার মতে, "থিয়েটার এখন ভদ্রলোকের যোগ্যস্থান নয়। কতকগুলো অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হ্যা হ্যা করে হাসে। বড় ত্যক্ত হয়ে এসেছি।"[১৪] এজন্যই বোধ হয় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ লিখেছেন, "যাঁহার তীর্থ ন্যাশন্যাল থিয়েটার তিনিই বাবু...।" অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের এই বিরূপতার জন্যই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাদের উন্নতির চেষ্টা করলে প্রবল বাধা এসেছিল। অভিনেত্রী বিনোদিনী বহুচেষ্টা করেও তার মেয়েকে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'স্যার' উপাধি দেবার জন্য স্ক্রাইন সাহেবের প্রস্তাব বাতিল হয়েছিল, কারণ তিনি বেশ্যা নিয়ে থিয়েটার চালান। নাগরিকদের প্রকাশ্য সভায় অভিনেত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তৎকালীন অধিকাংশ অভিনেত্রীর গুরু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর টাউন হলে তার স্মৃতি সভায় কোন অভিনেত্রীকে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। শোক প্রকাশ তো দূরের কথা। ১৮৭৬ খ্রীঃ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হলে বাঙালি সমাজের একাংশ তাকে সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। তারা আশা করেছিলেন এই আইনের দ্বারা অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত হবেন।

অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের একাংশের বিরূপ মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে, নীতির মুখ চেয়ে নট-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আগের অভিনয়গুলির মতই স্ত্রী চরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করে। নীতিবাদী পত্রিকাগুলি রাজকৃষ্ণ রায়ের এই প্রচেষ্টাকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানায়। যেমন, 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় (২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪) লেখা হয়ঃ "বীণা রঙ্গভূমি - কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা বঙ্গভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে কুরুচি আছে তাহাই দূরকরা তাহার উদ্দেশ্যে; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই, পুরুষ দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনীত হয়।...এখন এ দেশের সদাশয়

ব্যক্তিগণ রাজকৃষ্ণবাবুকে উৎসাহ দেন ও তাহার আশা পূর্ণ হয়, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

এই প্রার্থনা সাধারণ থিয়েটারের দর্শক কিন্তু পূর্ণ করে নি। দর্শক সমাজ অভিনেত্রী শূন্যতার কারণেই 'বীণা' থেকে মুখ ফিরিয়েছে। সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলির আবেদন, অভিনন্দন নিষ্ফল হয়েছে। প্রায় নিঃস্ব হয়ে রাজকৃষ্ণ তার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে লিখিত 'হরিদাসঠাকুর' নাটকের ভূমিকা 'দুঃখের কথা'য় নিজের তিক্তঅভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন।

নীতিবাগীশরা যাই বলুন না কেন, থিয়েটারপ্রিয় সাধারণ দর্শক, বারাঙ্গনা গমনে অসমর্থ (পারিবারিক ও আর্থিক কারণে) মানুষদের কাছে মঞ্চের অভিনেত্রীরাই ছিল বিরাট আকর্ষণ। সুন্দরী অভিনেত্রীদের আকর্ষণে মঞ্চে তারা ভিড করত। আবার অভিনেত্রীরাও অনেকে থিয়েটারকে 'বাবু' ধরার বারান্দা হিসাবে নিয়েছিল। তবে বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী যে নাটককে আন্তরিকভাবেই ভাল বেসেছিলেন, নাটকের জন্য সমস্তরকম প্রলোভন ত্যাগ করেছিলেন সে কথাও বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে রয়েছে। অমৃতলাল বসু লিখেছেন, অভিনেত্রীদের আগমনের পূর্বে তাদের সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল, তাদের আগমনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে গেছিল অল্পদিনের মধ্যেই। "তাদের সকল বিষয়েই নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্মস্থলে শ্লীলতারক্ষা, সহজভাব দেখে আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকেও নিজ নিজ চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়েছে। স্পষ্টই তারা আমাদের কাছে বলেছে যে উৎপীড়িতাদের জন্য এই নতুন পথ খুলে আমাদের আশ্রয় দিয়ে যে কষ্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন, তা বলতে পারি না।"[১৫] একথার সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের প্রস্তাবনাতেও গিরিশচন্দ্র জানিয়েছিলেন,

বিমল কবিত্ব আশে কেহ রঙ্গালয়ে আসে
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জন।।

অভিনেত্রীদের কারণে সে যুগে বহু অভিনেতা সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত ছিলেন। গিরিশের আক্ষেপ ছিল, সমালোচকরা অভিনয়ের প্রশংসায় মুখর হলেও, 'নিন্দা ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।' এযুগের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত অভিনেত্রীকে তিনি নিজের হাতে অভিনয় শিখিয়েছেন। তাদের আকৃতি, ক্ষমতা, অভিনয় যোগ্যতার দিকে তাকিয়ে তাঁকে নাটক লিখতে হয়েছে। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেন তিনকড়ি দাসী। প্রধানতঃ তিনকড়ির দিকে তাকিয়েই গিরিশের পরবর্তী She-tragedy জাতীয় পৌরাণিক নাটকে 'জনা'। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে গৈরিশছন্দ সৃষ্টির পেছনেও অশিক্ষিতা অভিনেত্রীদের ভূমিকা অনেকখানি। তাছাড়া গানের আধিক্য, নাচের বাড়াবাড়ি, লঘু-চপল গীতিনাট্য যা এযুগের মঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তার অনেকটাই অভিনেত্রীদের জন্য।

পিতৃ পরিচয়হীন সমাজ পরিত্যক্ত অভিনেত্রীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রীদের অন্যতম সুকুমারীকে (পূর্ব

নাম গোলাপসুন্দরী। শরৎ সরোজিনী নামক সুকুমারী চরিত্রে অভিনয়ের কারণে এই নামে বিখ্যাত হন)। উপেন্দ্রনাথ দাস তাব অনুচর ও অভিনেতা গোষ্ঠ বিহারী দত্তের সঙ্গে 'তিন আইনে' বিবাহ দেন (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) তবে তার উদ্দেশ্য পুরো সফল হয় নি। 'আর্য দর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতাদেব সঙ্গে অভিনেত্রীদেরও পুরস্কার দিয়েছিলেন। তবে এই অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের বিরূপ মনোভাব দূরীকরণে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তার শিষ্যসম্প্রদায় এবং আরো কয়েকজন ধর্মীয় নেতা। ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের মত এরা অভিনেত্রীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি, আশীর্বাদ ও করুণার বারিসিঞ্চনে এদের যেমন আশ্রয় দিয়েছেন তেমনি রঙ্গালয়ের প্রতি জনসাধারনের হেয় মনোভাব দূব করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'ষ্টার' থিয়েটারে গিরিশের লেখা 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শকরূপে আসেন (৩১.৮.১৮৮৪) এবং চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে 'চৈতন্যহোক' বলে আশীর্বাদ করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ফাদার ল্যাঁফো বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিনোদিনী লিখেছেন, "চৈতন্যলীলা অভিনয়ের জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায়গণের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"...[১৬] গিবিশচন্দ্র গুরুর মত স্পর্শে এসে অভিনয় ত্যাগ করতে চাইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিষেধ করেছিলেন, কারণ ওতে লোকশিক্ষা হয়। শ্রীবামকৃষ্ণের শিষ্যরাও গুরুর মতই রঙ্গালয়ের অনুরাগী ছিলেন। বিলাত প্রত্যাগত উচ্চশিক্ষিত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠের পর রঙ্গমঞ্চকে নতুনভাবে দেখেন। তাঁর 'পরপারে' নাটকের শান্তা চরিত্রে অভিনেত্রী সুশীলাবালার ছাপ পড়েছে। এই সময়কার বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রীদের প্রয়োজনীয়তা ও এর ফলে অভিনেত্রীদের সামাজিক অবস্থা উন্নতির বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তারাসুন্দরীর উপর কবিতা রচনায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবি নরেন্দ্রদেব, কবি গিরিজা কুমার বসু কয়েকজন অভিনেত্রীর উপর কবিতা রচনা করেন। সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায় ও আরো কয়েক জন অভিনেত্রীদের নিয়ে প্রবন্ধ এমনকি জীবনী গ্রন্থও লেখেন। বিনোদিনীর মতো নীহারবালা, প্রভা ইত্যাদিদের কবিতা, গান বিশিষ্ট সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে, তাদের প্রতিভা সম্পর্কে জনগণ সজাগ হন।

অভিনেত্রীদেব প্রতি সমাজ মানসিকতার পরিবর্তনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজনৈতিক ইতিহাসের পটপরিবর্তন, অধ্যাপকজীবন ত্যাগ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ, শিশিরকুমারের নাট্যশালায় যোগদান, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি স্মরণীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে নাট্যশালাব সংযোগ প্রভৃতি কারণ কাজ কবেছে। প্রবল বিরোধিতার মধ্যেই অভিনেত্রীরা মঞ্চে এসেছিলেন। নাটকের প্রয়োজন, দর্শকের চাহিদা তাদের স্থায়িত্ব দিয়েছে। কোন বিরুদ্ধতাই তাদেব মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনেত্রী প্রথাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলে সমাজের প্রতিবন্ধকতা ক্রমে দূর হয়।

ক্রীড়া জগতে বাংলার মেয়েরা
(১৯০৫ - ১৯৪৭)

সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

বর্তমান যুগের প্রগতিশীল, সচেতন নারী সমাজ আর অতীতযুগের মত অবহেলিত নির্যাতিত নয়, বরঞ্চ তারা আধুনিক যুগে অনেক বিষয়ই পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদা লাভ করেছে। খেলার জগতেও আজ এই চেতনাশীল নারী সমাজ আর পিছিয়ে নেই।

বর্তমানে বাংলায় দেখা যায় যে শারীরিক দিক অপেক্ষা সামাজিক প্রতিবন্ধকতাই নারীকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করার বিষয়ে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এই বাংলার নারী সমাজের মধ্যে খেলাধূলা সম্পর্কিত সচেতনতা এসেছে অপেক্ষাকৃত দেরীতে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় আমরা বাংলার নারীকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি বিংশ শতাব্দীর ছয় এবং সাতের দশকে। যদিও এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই। উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ অর্থাৎ ব্রিটেন অথবা আমেরিকার মত উন্নয়নশীল বাংলাতেও নারীরা শরীর চর্চা ও অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্যই খেলাধূলার পথে অগ্রসর হয়েছে।

নারীদের এই সমস্যাকে উপলব্ধি করতে হলে কিভাবে বাঙালী মহিলারা খেলাধূলার জগতে প্রবেশ করেছে সেই তথ্য আমাদের জানতে হবে। এ বিষয়ে সম্যকভাবে জানার জন্য আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ ঊনবিংশ শতকের আগে বাংলায় সামাজিক তুলাদন্ডের বিচারে নারী এবং পুরুষের মর্যাদা সমান ছিল না। অসহায়, অশিক্ষিত নারীজাতিকে তৎকালীন সমাজ অন্তঃপুরে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। তৎকালীন যুগের নারীর জীবনে আমরা তিনটি মূর্তিই দেখতে পাই, প্রথমত: রন্ধন প্রস্তুত কারিণীর মূর্তি; দ্বিতীয়ত: বিশ্বাসী গৃহরক্ষিণীর রূপ; তৃতীয়ত: স্বামীর সহবাসিনীর রূপ। এই চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণাগুলোই তার সত্ত্বাটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

সমাজের কড়া অনুশাসনে মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হত এবং তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ নারীকে অল্প বয়সেই বহন করতে হত মাতৃত্বের বোঝা। এরই ফলে নারীর শরীর হয়ে যেত দুর্বল এবং মন হয়ে উঠত অসুস্থ। তৎকালীন যুগের নারীদের মধ্যে নিজেদের শরীর সম্বন্ধে কোনরকম সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষর আগমনের ফলে বাংলার ভদ্রলোক সমাজ আধুনিকতার উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের বুকে গড়ে উঠেছিল নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে সমাজের

উচ্চশ্রেণীর মহিলারা শিক্ষালাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। সমসাময়িক বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনও নারী প্রগতির পথে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সমসাময়িক আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার ভদ্রলোক একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে মেয়েদের শরীরকে সুস্থ না রাখতে পারলে পরবর্তী প্রজন্মকেও সুস্থ, স্বাভাবিক এবং সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না। এরই ফলে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। শরীর এবং মনের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত contraceptive ব্যবহার, সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এই বোধ এসেছিল অতি ধীরে এবং বহু পরে।

স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে বাংলার নারী সমাজের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার মেয়েরা তখন অন্তঃপুরের গন্ডী অতিক্রম করে নিজেদের যুক্ত করেছিল স্বদেশী আন্দোলনের মত বৈপ্লবিক আন্দোলনে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বরিশালের মনোরমা বসু গড়ে তুলেছিলেন এক নারী বাহিনী। যুবসমাজের মধ্যে স্বদেশী চেতনা জাগ্রত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এই দলে তিনি যুবক যুবতীদের বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত করে উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। সরলাদেবী অনুভব করলেন যে বাংলার মেয়েদের শারীরিক দুর্বলতা এবং এই দৌর্বল্য জনিত সাহসের অভাবে তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতেও অক্ষম ছিল। তাই তিনি অন্তরঙ্গ দল নামে এমন একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন যেখানে বঙ্গদেশের মেয়েরা শুধুমাত্র শরীর চর্চা করারই সুযোগ পেয়েছিল তা নয়, উপরন্তু এমন কিছু কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত যার দ্বারা তারা যে কোন রকম বিপদের মুখ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। ১৮৯৫ সালে সরলাদেবী ভারতী নামে একটি পত্রিকার সম্পাদিকা থাকাকালীন এই পত্রিকার মাধ্যমে জানাতে চেষ্টা করেছিলেন সুস্থ ও সুগঠিত স্বাস্থ্য দেহে ও মনে জাগায় স্ফূর্তি ও আনন্দের অনুভূতি। এই পত্রিকাতে তাঁর মেয়েদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কিত বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০০ সালে তিনি বাঙালী যুবক যুবতীদের লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সংস্থার শিক্ষার্থীদের জিমনাষ্টিক দেখাবার জন্য তিনি গোয়ার প্রফেসার মর্‌তাজকে নিয়োগ করেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর রচনাগুলি এত উদ্দীপনামূলক হওয়া সত্ত্বেও, বাস্তবে দেখা গেল যে বঙ্গদেশের ললনারা নিজেদেরকে ঘর সংসারের সীমায়িত পরিবেশের মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছিল।

১৯২০-র দশক থেকে এই অবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে বহির্জগতের পরিচয় পেল। এই সময়ে মন্টফোর্ডের রিফর্মসের ফলে আইন পরিষদে (Legislative Council) তাদের প্রবেশের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সর্বোপরি গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রভাবে বাংলার নারী সমাজের মধ্যে এসেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলনের বহির্জগতে সুস্থ সবল মেয়েদের এগিয়ে আসতে ডাক দেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল আত্মশুদ্ধি এবং অনুশীলনের দ্বারা বঙ্গদেশের নারী ও

পুরুষের মধ্যে বিকাশ সাধনের কাজে আগ্রহী হয়েছিলেন। কানাইলাল দত্তের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশের নারীদের শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য একটি আখড়া তৈরী করা হয়েছিল। এই আখড়ায় শিক্ষার্থীরা লাঠিখেলা, ছোরা চালান এবং শারীরিক ব্যায়ামের মত কষ্টসাধ্য কাজে নিজেদের নিয়োগ করতো। এছাড়াও তিনি প্রবর্তক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যেখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের এক মহিলাছাত্রী 'নারীমন্দির' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সংঘমাতা রাধারাণী দেবীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারীদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য চার বছরের নির্ধারিত সময়ে কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রবর্তক সংঘ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য ভাবধারায় নারীজাগরণ আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করেছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন পাড়ায় মেয়েদের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট আখড়া তৈরী করা হয়েছিল। এই সমস্ত আখড়াগুলিতে শুধুমাত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদেরকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নানাধরনের ব্যায়ামের চর্চা করানো হত। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ পরবর্তীকালের মহিলাবা নিজেরাই অনেকগুলি শরীরচর্চা বিষয়ক ক্লাব গড়ে তুলেছিল।

যেমন:- শান্তিসুধা ঘোষ কর্তৃক নির্মিত বরিশালের অলকানন্দা ক্লাব, পারুল মুখার্জী এবং প্রতিভা ভদ্রের যুগ্ম উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল কুমিল্লা ছাত্রী সমিতি। ১৯২৩ সালে লীনা নাগের তত্ত্বাবধানে নির্মিত দীপালী সংঘে শরীর চর্চার সঙ্গে নিরক্ষর মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কমলা দাশগুপ্ত, সুরমা মিত্র এবং অন্যান্য মহিলাদের সম্মিলিত সহায়তায় কল্যাণী দাস ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বুকে ছাত্রীসংঘ নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই সংঘে বাংলার মেয়েরা শরীরচর্চা করতো। যুগান্তর সংস্থার জনৈক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার বাংলাদেশের এই মহিলাদের লাঠি খেলার প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই ধরনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্তথাকার ফলে তৎকালীন যুগের মেয়েদের মধ্যে এক শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। বাংলার মেয়েরা এর মধ্য দিয়ে এক প্রকার বিনোদনের সুযোগও পেয়েছিল যার থেকে এতদিন সম্পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চিত ছিল।

ব্রতচারী আন্দোলনের গুরুসদয় দত্ত বঙ্গদেশের নারীসমাজের মধ্যে এক নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছিলেন। শরীরচর্চার প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার সুপ্রাচিন সংগীত ও নৃত্যকে আশ্রয় করে এক ছন্দময় রীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শারীরিক ক্লান্তি দূর করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রেরনা জাগ্রত করার এবং সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয় সাধিত হলেই নারীদের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব, যা এই পদ্ধতির মাধ্যমেই একমাত্র ঘটানো যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে তাঁর সৃষ্ট এই ব্রতচারী সংগীত এবং নৃত্য মেয়েদের মধ্যে একটা দলীয় চেতনা জাগ্রত করেছিল। এরই ফলে বাংলার মেয়েরা ক্রমশ ক্রীড়া জগতের দিকে অগ্রসব হতে লাগলো।

মার্কসের সাম্যবাদের নীতি এবং গণতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Communist Party of India-ব মহিলা শাখাটি। এই শাখার ছত্রছায়ায় ১৯৪৪ সালে

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব জন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু সমাজের নিম্ন শ্রেণীব মহিলাদের মধ্যেও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

খেলাধূলার চর্চা অথবা ক্রীড়া অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাধারণ মহিলা অপেক্ষা ইংরেজ ও Anglo-Indian গোষ্ঠীভুক্ত মেয়েরাই অধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০-এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্লাব যেমন মোহনবাগান, Y.M.C.A., মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, রেঞ্জার্স ক্লাব, কাস্টমস এ্যাথেলিটিক ক্লাব এবং ডালহৌসি ক্লাবে খেলার সূত্রপাত হয়েছিল। তথাকথিত ইংরেজদের অনুকরণ করে বাঙ্গালী মহিলারাও এই সমস্ত ক্লাবগুলিতে যোগদান করে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য Anglo Indian মহিলা খেলোয়াড়ের নাম মারা মারে, জয় ম্যাকলয়েড, পামেলা ওয়াতরো।

সাধারণ ভাবে বলা যেতে পাবে যে মহিলারা ক্রীড়াজগতে প্রবেশ করবার পরে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেব নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বাঙ্গালী কৃতি মহিলার নাম যেমন :- সাঁতারে - আরতি সাহা, ব্যাডমিনটনে - ক্ষিরা দাস, দীপা চ্যাটার্জ্জী, টেবিল টেনিসে ইন্দ্রপুরী, রূপা মুখার্জী প্রমুখরা। এছাড়া ৮০০ মিটার এবং ১০০ মিটারের মত কঠোর পরিশ্রম সাধ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও বাঙালী মহিলাবা অংশগ্রহণ করেছিল। বাস্কেট বলে কয়েকজন ক্রীড়া প্রতিযোগির নাম:- পুষ্পা ব্যানার্জী, মীরা গাঙ্গুলী, ধীরা গাঙ্গুলী প্রমুখ।

প্রথমদিকে নারীদের শরীর চর্চার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার অন্তরালে যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা হল সুস্থ সবল করে নারীকে গড়ে তোলা। এই নারীর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব সুস্থ সুন্দর সন্তানের জন্ম দেওয়া। আর এই স্বাস্থ্যবান সন্তানই ভবিষ্যতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাবুরা চারিত্রিক, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে এতই দুর্বল ছিল যে তাদেরকে মেয়েলী বাবু বলেই আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু এই বাবুর মধ্যে শক্তির পুনর্জাগরণের প্রয়োজন ছিল। সরলাদেবীও ইহা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাইজন্যেই তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরাষ্টমী ব্রত, প্রতাপাদিত্য এবং উদয়াদিত্য উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই নারীকে হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে দেবীমাতার আসনে বসানো হয়েছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে নারী এই রূপেই প্রকাশিত হয়েছিলেন। ফলে অনেক সময়েই নারীর নারীত্বকে এবং দেবীত্বকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এই সময় এমন এক প্রকার চিন্তা করা হয়েছিল যে দেবী দুর্গা বা দেবী কালিকার শক্তি যদি কোন পুরুষের উপর আরোপ করা যায় তবে হয়তো সেই দুর্বল পুরুষেরা পুনরায় শক্তিবান হয়ে উঠতে পারবে। সুতরাং আমরা ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আসতে পারি যে নারীর শিক্ষালাভ বা নারীর শরীর চর্চার আসল উদ্দেশ্য নারী জাগরণ নয়, ভারতের স্বাধীনতা লাভ। বঙ্গদেশের নারীদের শরীরচর্চার বাতাবরণে আনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নারীর ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ নয়, উপবন্তু তাদের মধ্যে

মাতৃত্বের এমন এক সুন্দর, অমলিন, পবিত্ররূপ আছে যার সাহায্যে দুর্বলকে সবল করে তোলা যায় অথবা প্রতিকূলকে অনুকূলে আনা সম্ভব হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীর মাতৃত্বের মূর্তির সঙ্গে নারীত্বের মূর্তি এমন ওতোপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে ক্রীড়াজগতে অনেকসময় এই বিশ্বাস করা হত ভাল ক্রীড়াবিদ হবার জন্য মহিলাদের ব্রহ্মচারিণী হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।

বর্তমান গবেষণার উপর ভিত্তি করে আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এই যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমাজের দ্বৈত মনোভাবই কি বাঙ্গালী মেয়েদের ক্রীড়া জগতে দেরী করে অনুপ্রবেশের অন্তরালে প্রধান কারণ ?

সূত্র নির্দেশ :

১. সরলা দেবী চৌধুরাণী - জীবনের ঝরা পাতা।
২. রাসসুন্দরী দেবী - আমার জীবন।
৩. মেরেডির্থ বার্থউইক - দা চেঞ্জিং রোল অফ উইমেন ইন বেঙ্গল।
৪. যোগেশ চন্দ্র বাগল - জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ নারী।
৫. গুরুসদয় দত্ত - দা ব্রতচারী সিনথেসিস।
৬. সরোজ মুখার্জী - ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি ও আমরা (খণ্ড : ১-২)
৭. মৃণালিনী সিনহা-কোলোনিয়ল মাসকুলীনিটী।
৮. স্বামী বিবেকানন্দ - ভারতীয় নারী।
৯. ই. বাউআরস্ - রিক্রিয়েশন ফর গার্লস এণ্ড উইমেন।
১০. জে. রিঅরডান - দা সোশ্যাল ইম্যানসিপেশ্ন অফ উইমেন থ্রু স্পোর্ট।

শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ : নারীবাদ ও মানবতাবাদ

কল্যাণী মণ্ডল

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে চলতি শতকের এই শেষভাগে এসে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হলেও নারীর অবস্থার মূলগত অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত অগষ্ট বেবেল তাঁর "Woman in the Past, Present and Future" গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন, 'মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে দাস প্রথারও পূর্বে।' ইতিহাসে দাস প্রথারও পূর্বে নারী যে সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, তা আজও তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

আদিম যুগে নারীর দাসত্ব। তার শারীরিক শক্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যই তার শারীরিক অক্ষমতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার দাস পরিচয়কে সামাজিকভাবে বৈধ করে তুলেছে।

আদিমযুগে যখন বনচারী, গুহাবাসী, যাযাবর পুরুষ এবার গৃহবাসী হল, তখনই শুরু হল শ্রমবিভাজন। প্রচলন হল পশুপালনের, ক্রমে উৎপত্তি হল চাষবাসের, পিতৃপ্রধান পরিবার পাকাপাকিভাবে অতিগভীরে তার শিকড় বিস্তার করল। প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল পুরুষ। পাশাপাশি নারীর উপর চাপানো হল দাসত্ব[৩] সূচনা হল বিবাহ প্রথার। শুধুমাত্র শারীরিক পরিশ্রম করতে করতে একধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হল নারী। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন-"আজকের দিনে বিবাহই হল একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে আইনত দাস প্রথা বজায় আছে।" সমস্ত রকম শোষণের মূলে হল পুরুষের উপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা।

সার্বিকভাবেই নারীর মুক্তির জন্য বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, আজও তা অব্যাহত। শুরুর সময় থেকেই এই আন্দোলনের দুটি ধারা লক্ষণীয়, বুর্জোয়া নারীবাদ আর সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। বুর্জোয়া নারীবাদ প্রচলিত শ্রেণী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই নারীর জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায় করতে উৎসুক। আর সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ মনে করে, কেবলমাত্র শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় সত্যিকারের নারীমুক্তি সম্ভব। বুর্জোয়া নারীবাদে নারী তার পরিবারের পুরুষের সমকক্ষতা দাবি করে, কিন্তু ধনী ঘরের মেয়েদের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক ঘরের মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য ঘোচার কোন সম্ভাবনা এই আন্দোলনে নেই। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ নারীর শ্রেণীগত ও অর্থনীতিগত অবস্থান ও বিভাজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। সমাজতন্ত্র মেয়েদের সামাজিক উৎপাদন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যা নারীমুক্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ।

প্রথম বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে তা হয়নি। পুরুষের উপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা কমেনি। আশির দশকের গোড়ায় মার্কিন অর্থনীতির অনুজ্জ্বল অংশ ছিল নারীর বিচরণস্থল। সরকার নির্ধাবিত দারিদ্র সীমার নীচে যাদেব বসবাস, তার ৬৭% ছিল নারী। প্রতি দু'জন নারীর একজন পঁয়ষট্টি বছর হওয়ার আগে বিধবা হয়, আর এই বিধবাদের এক তৃতীয়াংশ দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে। নারী পরিচালিত পবিবারের বড়ো অংশ দাবিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং তাদের দুই তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল-এমন অবস্থায় নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হয় তা সহজেই অনুমেয়। রেগান আমলে মার্কিন সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তাদের দুর্দশার জন্য মেয়েদেরই দায়ী করা হয়েছিল। জর্জ গিল্ডার, জেরি ফাওয়েল, বিচার্ড ভিগারী প্রমুখ রেগানের পরামর্শদাতা নব্যদক্ষিণপন্থীরা হিটলারি ঢঙে চাকুরে তথা অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভর মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে। এদের বক্তব্য হল - মেয়েরা চাকরীর বাজারে নেমেছে বলেই পুরুষেরা বেকার। তাছাড়া মায়ের অখণ্ড মনোযোগ ও যত্নের অভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম গোল্লায় যাচ্ছে, অপরাধের হার হু হু করে বাড়ছে, সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে ফেরত পাঠালেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

রেগান সরকার এই পরামর্শ কিছুটা গ্রহণ করে প্রথমেই সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাই করার পথ ধরেছিলেন, যা বিশেষ করে নারীদেরই ক্ষতিগ্রস্থ করল। ১৯৭৬ সালে আমেরিকায় সমস্ত কর্মরতা মহিলার সংখ্যা ২১%, ১৯৮০-তে কৃষ্ণাঙ্গিনীদের ২৮% এবং সমস্ত পেশাজীবী (professional) নারীদের প্রায় অর্ধেক ছিল সরকারী কর্মচারী। ছাঁটাইয়ের খাঁড়া প্রথমেই তাদের উপর নেমে এসেছিল। তাছাড়া মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলে রাষ্ট্রীয় বদান্যতার ঘাটতি তাদের পক্ষে ছিল সর্বাপেক্ষা অসহনীয়। মেয়েদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অত্যাচারিত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু ও কৃষ্ণাঙ্গিণী নারীরা। তাদের পথে তিনটি কাঁটা - শ্রেণী, লিঙ্গ ও জাতি। রক্ষণশীল নেতা ও তাত্ত্বিক ময়নিহান দাবি করেছেন - কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের সব সমস্যা বা দারিদ্রের মূল হল নারী প্রাধান্য।

Fordhan University Institute for Innovation in social policy ১৯৭৪-৮৮-র মধ্যে মার্কিন 'সামাজিক স্বাস্থ্যের' নানা দিক নিয়ে গবেষণা করেছে। এই সংস্থার গবেষণায় যে ছবি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সর্বব্যাপী অবনতির মধ্যে মহিলাদের অবস্থা আরও খারাপ। সমীক্ষার সূচী '৮৮তে সাতজন নারীর মধ্যে একজন গরিব ছিল, দু'জনের মধ্যে একজনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বীমা বা অন্য ব্যবস্থা ছিল না, প্রতি তিনটি নারী প্রধান পরিবারের মধ্যে একটি ছিল দারিদ্র সীমাব নীচে।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশের মানুষের পায়ের তলায় মাটি দিতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গৃহহীনা সন্তান সম্ভবা মেয়েদের ৩০% এর কোন চিকিৎসা হয় না। অনেক গৃহহীনা নারী শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। নব্যদক্ষিণপন্থী ও মিডিয়া বর্ণিত জনপ্রিয় ছবি - স্বামী, সন্তান ও সমস্ত আধুনিক গ্যাজেটে পরিবৃতা এক সুন্দব গৃহের সুখী সমৃদ্ধ গৃহিণী - বাস্তবের তুলনায় পর্দায় বেশী সুলভ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটেনে সাফ্রাজেট আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল, তখন নিজেদের ভোটের দাবিতে হাজার হাজার নারী পথে নেমেছিল। তখন ও লিঙ্গ বিভাজনের পাশাপাশি শ্রেণী বিভাজনও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যে ব্যাংক হার্স্ট পরিবার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই পরিবারের মধ্যে এই মর্মে বিভেদ ও বিবাদ এড়ানো যায়নি। নেত্রী এমেলিনা ও তার বড় মেয়ে খ্রিষ্টাবেল ছিলেন শ্রেণী নিরপেক্ষ বুর্জোয়া নারীবাদের পক্ষে, কিন্তু মেজো মেয়ে সিলভিয়া নারী ও শ্রমিক আন্দোলন, নারীবাদ ও সমাজতন্ত্রকে মেলাতে চেয়েছিলেন। সে দেশের বামপন্থী লেবার দল মুখে নারীবাদের কথা বললেও এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট বা ঐক্যবদ্ধ ধ্যান ধারণার পরিচয় দেয়নি। লেবার দল বা ট্রেড ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্তবে কোন নারী ছিল না। লেবার নেতারা রক্ষণশীলদের মতোই উঠতে বসতে পরিবারের গুরুত্ব ও পবিত্রতার কথা বলেন। অবশ্যই তাদের মাথায় থাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। সেই লেবার দলেব প্রথম এবং দেশেরও প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নারীবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। তার সামান্য পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

থ্যাচার সরকার শ্রেণী বিভাজনের উপর বেশী জোর দিয়েছিল। উচ্চবিত্ত মেয়েদের হাতে পারিবারিক সূত্রে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি তুলে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য থ্যাচার সবকার নারীশ্রমিকদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য করেছিল। মেয়েরা পেনশানও পেত পুরুষদের তুলনায় কম। ইংল্যাণ্ডে বৈধব্য বা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীরা বাড়ির মালিকানার অধিকার হারাত।

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। উন্নত ধনতান্ত্রিক প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে কম-বেশী রেগান-থ্যাচারের নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে এবং সর্বোপরি মেয়েরা তার ফল ভোগ করেছে ও করছে।

সমাজতন্ত্র প্রথম থেকেই নারীবাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবু সম্পূর্ণ সাম্য সম্ভবতঃ আসেনি। যে সাংসারিক কাজকর্মের যৌথকরণের স্বপ্ন ফুরিয়ার বা কলন্তাই ক্রুপস্কায়া দেখেছিলেন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। মেয়েদের বাইরের ও ঘবের কাজের 'দ্বৈত বোঝা'র হাত থেকে রেহাই মেলেনি। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখযোগ্য - এমা গোল্ডম্যান, ক্লারা জেটকিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, লুই মিশেল, কলন্তাই ক্রুপস্কায়া। তবু সমাজতান্ত্রিক দেশে দল বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে নারীরা স্থান পায়নি। অনেকটা ইতিবাচক ও কিছুটা নেতিবাচক দিক মিলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীর ভূমিকা গড়ে উঠেছিল।

সমাজতন্ত্রের পতনের পর প্রায় সর্বত্র দেখা দিয়েছে অভূতপূর্ব মন্দা, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি সামাজিক সংকট। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব এসে পড়েছে মেয়েদের উপর। এক প্রাক্তন সোভিয়েত, আজকের ইউক্রেনিয়ান মহিলার বক্তব্য 'দারিদ্র এসেছে নারীর রূপ ধরে'। পোলাণ্ডে ৯০ সালের শেষ অবধি যারা ছাঁটাই হয়েছিল,

তার ৮০% নারী, পূর্ব জার্মানীতে বেকার হয়ে যাওয়ার মধ্যে ৫০% নারী। মেয়েরা নিজের প্রজনন ক্ষমতার উপর অধিকার হারিয়ে ফেলছে। পোলান্ডে মেয়েরা গর্ভপাতের অধিকার হারিয়েছে। জার্মান মালিকেরা মেয়ে কর্মীদের বন্ধ্যাকরণের জন্য চাপ দিচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মেয়েরা তার মাতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার হারাতে বাধ্য হচ্ছে।

চীনে ভূমি সংস্কারের প্রথম পর্বে বৃহৎ মালিকদের জমি চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কেবল পুরুষেরা নয়, কৃষক পরিবারের মেয়েরাও আলাদা করে জমির ভাগ পেয়েছিল। গড়ে উঠেছিল যৌথ কৃষিভূমি, পারস্পরিক সাহায্য টিম, প্রাথমিক সমবায়, কমিউন। মেয়েরাও পুরুষদের মতই ছিল কমিউনের সদস্য। ওয়ার্ক পয়েন্ট অনুযায়ী তাদের আয় হত পুরুষদের মতই। এই ব্যবস্থায় পূর্ণ সাম্য না এলেও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এসেছিল। মাও উত্তর চীনে কমিউন ভেঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা অনুসারে প্রত্যেক পরিবারকে জমি দেওয়া হল। এবার আর মেয়েরা স্বতন্ত্র অংশ পেল না, জমির অধিকার এল পরিবারের কর্তার হাতে, ফলে মেয়েদের স্বনির্ভরশীলতা বিসর্জিত হল। প্রাকবিপ্লব যুগে চীনে শিশুকন্যা হত্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আটের দশকে আবার সেই বীভৎস প্রথা ফিরে এসেছে। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে অবহেলা জনিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অধিকাংশ দম্পতি পুত্রের জন্য অপেক্ষা করে। বর্তমানে বস্তুতঃ বিদেশী পুঁজির পক্ষে চীনের বড়ো আকর্ষণ সস্তা, বাধ্য, অসংগঠিত নারীশ্রম।

ভিয়েতনামেও পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যয় কমানোর জন্য মেয়েদের শিক্ষা সঙ্কুচিত করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

প্রায় সর্বত্র একই ছবি। মেয়েদের উপর অর্থনৈতিক আক্রমণকে একটা মতাদর্শগত বাতাবরণ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এই সুরে গলা মিলিয়েছে মহাশক্তিধর ক্যাথলিক গির্জা। পোপ জন পল 'গির্জা, রান্নাঘর ও ছেলেমেয়েদের' নিয়ে সময় কাটাবার নির্দেশ দিয়েছেন। পোলিশ গির্জার কিছু কর্তাব্যক্তি আর এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন - মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষা বা ভোটের অধিকারের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এখানেও এই বিদ্বেষ সুস্পষ্ট।

গত দুই দশকে ভাঙ্গা গড়া অনেক হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক স্বাধীন হয়েছে (পর্তুগীজ শাসন থেকে)। এদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্ক ছেদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগীজ মালিকদের প্ররোচনায় সদ্য স্বাধীন দেশদুটিতে প্রতিবিপ্লব ও দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির প্রেক্ষিতে নারীদের অবস্থা কী রকম ? উৎপাদনে অংশগ্রহণ ও সমস্ত সংসার চালাবার ফলে তারা একধরনের স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিল, তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দারিদ্র, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন।

আফ্রিকান কৃষিজীবী মহিলাদের কর্মক্ষমতাই তাদের সামাজিক কু-প্রথার ও বঞ্চনার শিকার করেছে। মেয়েদের সাহায্য অথবা মূল ভূমিকা ছাড়া জমি চাষ অসম্ভব। তাই অনেক কৃষক বহুবিবাহ করতে চায়, কারণ বেশী স্ত্রী মানেই বেশী জমি।

পশ্চিম এশিয়ার মত আরব আফ্রিকার অনেকাংশে মৌলবাদ ও তীব্র নারী বিদ্বেষ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। মিশর ও আলজিরিয়া তার মধ্যে অগ্রগণ্য। ৯৩-৯৪ সালে আলজিরিয়ায় অন্ততঃ ৫০ জন নারী মৌলবাদীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। নারীর কোন রকম স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য সেখানে অপরাধ বলে গণ্য হয়। অথচ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামের পথে আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল। মেয়েরা ছিল পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের শরিক। বিপ্লবী চিন্তাবিদ ফ্যাননের মতে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা নির্যাতনের চিহ্নকে মুক্তির প্রতীকে পরিণত করেছিল, সেই পথেই জন্ম নেবে নতুন আলজিরিয়া কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

যে সব দেশ আজ অর্থনৈতিক সংস্কারের মডেল রূপে সাবা বিশ্বের কাছে বরণীয়, সেই দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া - সমস্ত স্থানেই নারীর অবস্থা খারাপ। এসব দেশের বড়ো আকর্ষণ নামমাত্র মজুরি, দক্ষ অথচ সংগঠিত বাধ্য শ্রম পরিবেশ বা শ্রমিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের শিথিলতা। কিন্তু তাতে নারীদের ক্ষতিই হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের তরুণী শ্রমিকরা দু'ভাবে শোষিত ও ব্যবহৃত হয়। তাদের শ্রমক্ষমতা ও যৌন আকর্ষণ - দুই-ই মালিকদের হাতে পণ্য। বাতান শিল্পাঞ্চলের এক ম্যানেজার খোলাখুলিভাবে বলেছেন - 'আমাদের কারখানা মোটেলও বটে, মেয়ে মজুরদের হুকুমমত শুয়ে পড়তে হয় অথবা ছাঁটাই হতে হয়।' পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র নারীদেহ ব্যবসা যথেষ্ট প্রসারিত। থাইল্যান্ড এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য। মার্কিন পত্রিকা 'টাইম' ব্যাংককে বেশ্যাবৃত্তির রাজধানীরূপে অভিহিত করেছে। থাই সরকার অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করতে পারেনি। পর্যটন সংস্থাগুলি কোন রাখ ঢাক না করেই 'সেক্স ট্যুরিজম' এর বিজ্ঞাপণ দেয়। সারাদেশে ভয়াবহ রূপে এডস্ ছড়িয়ে পড়েছে। মক্কেলরা নিরাপত্তার জন্য 'কুমারী গণিকা' অনুসন্ধান করছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে তাকানো যাক, ইতিহাসের গতি এখানে শ্লথ। কখনও কখনও মনে হয় ইতিহাসের কোন গতিই এখানে নেই। গ্রাম প্রধান এই উপমহাদেশে নতুন শতাব্দী তথা সহস্রাব্দের দোর গোড়ায় পৌঁছেও সামন্ততন্ত্র বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। অর্থনীতির রূপরেখাও সুস্পষ্ট নয়। ইউরোপ বা আমেরিকার মত সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র পর্যন্ত পর্যায়গুলি ধারাবাহিকভাবে এখানে আসেনি। ব্যাপক শিল্পায়ণ ঘটেনি। কিন্তু শহরে কল-কারখানা স্থাপিত হলেও (জনসংখ্যার তুলনায় তা নগণ্য) সেখানে ব্যাপক হারে মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত হয়নি। সরকারী বা বেসরকারী কিছু কিছু সংখ্যক নারী কর্মীর স্থান হয়েছে, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মেয়ে পড়ুয়া বা মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়েছে। তবুও বহির্বিশ্বের অঙ্গন এই উপমহাদেশের অধিকাংশ নারীর পদচারণা থেকে বহু যোজন দূরে। সামন্ত প্রথায় বিধৃত পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে 'অধিকার', 'স্বনির্ভরতা' সম্পর্কে সচেতন সুযোগ এখানকার মেয়েদের কম। শ্রমিক জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে একই মঞ্চে সমবেত হওয়ার সুযোগ পাশ্চাত্যের নারী পেয়েছে। জীবন যাপনের ভিন্নতর ক্ষেত্রের জন্য এই উপমহাদেশ

সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। 'স্বাধিকার', 'স্বাধীনতা', 'স্বনির্ভরতা' পাওয়া সম্পর্কে তার আন্তরিক তাগিদও কম। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ভোগবাদের মাদকতা ছড়াতে এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মডেল, সুপার মডেল, বিশ্বসুন্দরী, সৌরজগৎ সুন্দরী ইত্যাদি খোলসের মধ্যে এই দেশগুলির মেয়েদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একধরনের নারীমূর্তি বিশ্বের সামনে হাজির করা হচ্ছে।

এই উপমহাদেশের নাবীর বর্তমান অবস্থানের জন্য তথাকথিত ধর্মও কম দায়ী নয়। ধর্মের নিগড়ে বাধা সামন্ততন্ত্র নারীর জন্য একটি ছাঁচ তৈরী করে দিয়েছে। মনু তার বিধানে বলেছেন - নারী বাল্যে পিতাব, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে। যে নারী পূর্ণাঙ্গভাবে এই 'ছাঁচের মত' সে পেয়েছে আদর্শনারীর সম্মান। মানবিক চাহিদা বা মূল্যবোধ সেখানে যতই পদদলিত, অপমানিত হোক না কেন ? বৃহত্তর সমাজ তথাকথিত এই আদর্শনারীর খোলসটাকে মাথায় নিয়ে নাচে, যাতে সকল নারীই ঐ ছাঁচে গড়ে ওঠার প্রেরণা পায়। ব্যতিক্রমীরা 'নিজের অধীনে' থেকে সচেতনতার পরিচয় দিলে ধিক্কারের পর ধিক্কার দিয়ে তাকে দাবিয়ে দেওয়াব চেষ্টা করা হয়. এ অবস্থায় বৃহত্তর সংখ্যক নারীর পক্ষে সম্ভব হয় না গতানুগতিক জীবনের বাইবে বেরিয়ে মানুষের অধিকার ও মূল্যবোধ দিয়ে জীবনটাকে সাজানোর মত দুঃসাহস দেখাতে। হিন্দু ধর্মের স্ব-বিরোধিতার ফিরিস্তি না দিয়েও একটি মাত্র উদাহরণ দিলে ধর্মের ভন্ডামীটা বোঝা যাবে, এই ধর্ম একদিকে পছন্দমত নারীকে দেবীর আসনে বসিয়েছে, অপরদিকে এই ধর্মই নাবালিকা কন্যাকে দেবদাসী প্রথাব মত ন্যক্কারজনক প্রথার মাধ্যমে গণিকাবৃত্তির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করেছে। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ দেখা যায় না। বরং বোরখার আড়ালে শরীর ঢেকে রাখার সঙ্গে পারলে নারীর সমস্ত মানবিক গুণাবলী ও চাহিদাকে ঢেকে রাখাতেই ধর্মগুরুর তথা সমাজের উৎসাহ বেশী।

এর পরেও চলে রাষ্ট্রগতভাবে নাবীব উপব বৈষম্য, শোষণ ও লাঞ্ছনা। আজও গ্রামে-গঞ্জে বিড়িশ্রমিকদের মধ্যে মহিলারা সমপরিমাণ বিড়ি বেঁধে পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান, এমন নয় মহিলাদের তৈরী বিড়ির চাহিদা কম কিংবা তা পুরুষদের মুখটানে কিছু কম রসসঞ্চার করে। এ নিয়ে কোন প্রতিবাদও হয় না। অথচ নারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল সমকাজে সম মজুরি। উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার পাথর কুঁচি তৈরীর কারখানাগুলোতে মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত হয় পুরুষশ্রমিক চোখে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের ইটভাঁটাগুলিতেও মহিলা শ্রমিকদের আধিক্য। এই মহিলাদের উপার্জনেই সংসার চলে, পুরুষের রোজগার ব্যয় হয় তাদের নেশা ও ফূর্তিতে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও মেয়েদের রেহাই নেই, সন্ধ্যার পর তাদেব মুনসি ম্যানেজারদের সন্তুষ্টি বিধান করতে, উপরন্তু রোজগারের একটা অংশ কমিশন হিসেবে এই মুনসি ম্যানেজারদের দিতে হয়। কমবেশী এই একই চিত্র এই উপমহাদেশের সব জায়গায়। এছাড়া পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, গণধর্ষণ, ডাইনি প্রথার কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা-রাখে না। অফিসে 'পুরুষ বস' এর অধীনে নারী কর্মীদের অনেক সময়ই নানাভাবে অপদস্থ হওয়া বা যৌনপীড়নেব শিকার হওয়ার ঘটনা বিরল নয়।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিংবা গণতন্ত্রের বকলমে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় নারী-পুরুষ সম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। অন্ততঃ অভিজ্ঞতা তাই বলে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। যেখানে রাষ্ট্র নিজেই হস্তক্ষেপ করে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ণে অংশগ্রহণ করাতে পারে, যার মাধ্যমে যাবতীয় ধর্মীয় অনুশাসন, কুসংস্কার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নিষ্ক্রিয় করে নারী 'মানুষ' হয়ে ওঠার স্বাদ পায়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই নাবী পুরুষের পিছনে নয়, পাশাপাশি থাকার সুযোগ পাবে। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পাভেলের মা তথা বিশ্বজননী, স্বামীর কাছ থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যাবতীয় নিপীড়ন পেয়েও শেষ বয়সে 'মুক্তির স্বাদ' পেয়েছিলেন শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করে। একাজে তাকে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সহায়তা করেছিল তারই পুত্র এবং পুত্রের সতীর্থরা। বিশ্বের নারীরা খুববেশী পাভেলের জন্ম দিতে পারেনি। মানুষ স্বাধীনতা হারায় অনেকভাবে, সেক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতির তান্ডবকে প্রায় জয় করা গেছে, দুরারোগ্য ব্যাধিও আজ নির্বাসিত প্রায়, বন্যপশুরাও মানুষের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে। তবুও দুনিয়ার অধিকসংখ্যক মানুষ আজও স্বাধীনতার স্বাদ পেল না কেন ? সে কথা ভাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে এক শ্রেণীর মানুষই। যাবতীয় মানবিক ধর্মকে কবর দিয়ে অমানবিক বর্বরতায় মানুষই ক্ষেপে উঠে মানুষ নিধন যজ্ঞ পালন করে। চারিদিকে এক অপশক্তিআবারও জিগির তুলেছে মানুষকে মধ্যযুগের কৃষ্ণপক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, যেখানে যাবতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, মানুষের অধিকার তথা মানবিকতার সলিল সমাধি ঘটবে নব্যদক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীলদের কূট চক্রান্তের অথৈ জলে। নারীবাদ নয়, পুরুষবাদ নয়, 'মানবতাবাদ'-ই পারে সকল মানুষের মনুষ্যত্বেব বিকাশ ঘটিয়ে সহানুভূতিশীল মানুষ গড়ে সকলের স্বার্থ নিয়ে সকলের সহ-মর্মিতার পরিবেশ তৈরী করতে, সেখানে নারী এবং পুরুষ যে মর্যাদা পাবে তা হল 'মানুষের মর্যাদা'।

সূত্র নির্দেশ

১. সরিনা জাহান - একেবারেই মেয়েলি কথা।

২. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী - বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা ও নারী।

৩. অ্যাকাডেমি পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০২।

৪. অগষ্ট বেবেল - নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে — অনুবাদ কনক মুখোপাধ্যায়।

৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য - প্রাচীন ভাবত : সমাজ ও সাহিত্য।

৬. Alice W Clook, (ed.) - Gender and Political Economy

৭. J.M. Sutherland ed. sally. Bridging Worlds . Studies on women in South Asia, Asia.

৮. Nico Nelson. ed. African Woman in The Development Process.

৯. James Petras and Techchai Wongchairuwan - Thailand : "Free Markets, Aids and Child Prostitution."

১০. Peter Custers - A book on Women's Labour

আধুনিক মধ্যবিত্ত মননে নারী স্বাধীনতা

ইন্দ্রাণী লাহিড়ী

মানব সমাজে যখন থেকে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হয়েছে, তবে থেকেই মধ্যবিত্ত মনন ও চিন্তা চেতনা বাকি দুটি গোষ্ঠীর থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে মধ্যবিত্তরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামাজিক অচলায়তনের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাকেও খুব গুরুত্ব দিয়েছে। এই শ্রেণী নিরাপদ গৃহকোণে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে চায়। তারা খোলা মনে যে কোন সামাজিক পরিবর্তনকে চট করে গ্রহণ করতে পারে না। তারা বৈপ্লবিক নয়, ধীরে পরিবর্তনের পক্ষপাতী, সুখী গৃহকোণে সন্তানদের স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখে।

তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী মেয়েদের স্বাধীনতার বিষয়ে সদাসন্দিগ্ধ। মধ্যবিত্ত মানসিকতা মেয়েদের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলে মনে করে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, রাস্তাঘাটে মেয়েদের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেও এই বিষয়টাকে মধ্যবিত্ত কখনও ভালো মনে নেয় নি। মধ্যবিত্ত পুরুষের মতে এতে সমাজ ছারখার হয়ে যাচ্ছে, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে সমাজের মহান ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বহু যুগ আগে থেকে মেয়েদের যেভাবে দেখা হয়েছে, তাতে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে নারী মাত্রেই দুর্বল। অনেক শিক্ষিত মানুষও যখন বলেন, মেয়েরা ঘরকন্না ছাড়া অন্য কোন কাজে কোন প্রতিভার পরিচয় দেয় না, তখনই ইহা মধ্যবিত্ত মানুষের একদেশদর্শিতারই পরিচায়ক।

পিতৃতন্ত্রের রূপকার মধ্যবিত্তের মননে পরিবর্তন ঘটলে, তবেই নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। দেবী হিসাবে স্তুতিও নয়, নারী হিসাবে অবহেলা নয়। নারী পুরুষের উভয়ের সম্মতিতে গড়ে উঠবে নতুন যুগের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ।

মেদিনীপুরের ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা

শ্যামল বেরা

রাষ্ট্র ও সমাজের ইতিহাস চর্চায় পুঁথি থেকে নানাভাবে নানাসময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমরা সংগ্রহ করেছি। একথা আমাদের জানা যে, একটি দেশের ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় তো বটেই। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা বিস্ময়কর। তবে এ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, তথা পলিমৃত্তিকা সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকেই সর্বাধিক পুঁথি পাওয়া গেছে। এইসব পুঁথির মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত। আলোচ্য নিবন্ধে এ সম্পর্কে একটি রূপরেখা আমরা তৈরী করতে পারি।

এ অঞ্চল থেকে আমরা মূলত পাচ্ছি - বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের পুঁথি, প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের পুঁথি, কবিরাজী পুঁথি, রামায়ণ ও মহাভারতের পুঁথি এবং মন্ত্র-তন্ত্রের পুঁথি। পুঁথির রচয়িতারা তাঁদের পুঁথির মধ্যে আত্ম-পরিচয় উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক লোকজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে, পুঁথিগুলি কোন সময়ে লেখা হয়েছে, কোথায় লেখা হয়েছে, পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন, লিপিকর কে ছিলেন এবং কোন সামাজিক পটভূমিকায় লেখা হয়েছে তার বিবরণ পাচ্ছি এ সব পুঁথি থেকে। ফলে, অঞ্চল বিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ বিন্যাস, সাংস্কৃতিক জীবন প্রভৃতি নানা দিক-দিগন্তের পাথুরে প্রমাণ চিহ্ন এইসব পুঁথির সম্ভার। ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ ও দিক-বন্দনা অংশ থেকে আমরা জানতে পারি -কবি বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম পরিত্যাগ করে কেন মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সন্নিহিত আড়ড়া গ্রামে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে অবস্থান করেছেন। এ সময়ের সমাজ ইতিহাসের বহুসূত্র নিহিত রয়েছে চন্ডীমঙ্গলে। পরবর্তী সময়ে রাজা শোভা সিংহ, হেমৎ সিংহ কিংবা কর্ণগড় রাজবংশের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করতে হলে আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ণ'-এ। রামেশ্বরের জন্ম ঘাটাল মহকুমার যদুপুর গ্রামে। হেমৎ সিংহের অত্যাচারে যদুপুর গ্রাম ছেড়ে কবি চলে আসেন কর্ণগড়ে। তখন কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ। এ সম্পর্কে কবি উল্লেখ করেছেন-

পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিং ভাঙ্গে যারে
রাজা রাম সিংহ কৈল প্রীত
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।

রূপনারায়ণ, শিলাই, কাঁসাই, হলদি প্রভৃতি নদ-নদীর জলপথ এবং পলিমৃত্তির উর্বরতাকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরে বহু জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। ভিন দেশী মানুষ জন রাজ্য স্থাপনও করেছেন। এ বকম এক রাজবংশ কালীজোড়ার রাজবংশ। কোলাঘাট, পাঁশকুড়া ও ডেবরা থানা এলাকার বিস্তৃত অংশ জুড়ে ছিল কালীজোড়ার অবস্থান। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ থেকে আগত ক্ষত্রিয় বংশীয় গঙ্গানারায়ণ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালীজোড়ার রাজারা কেবল শাসকই ছিলেন না, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিব উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্যও নানা অবদান রেখে গেছেন। এই বাজসভার দু'জন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন-দয়ারাম দাস ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তী।

দয়ারাম দাসের ভদ্রাসন কোলাঘাট থানা এলাকার ভোগপুর রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী কিশোরচক গ্রামে। এ পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্মীচবিত, সারদামঙ্গলএবং জগন্নাথগীতির কথাই জানা ছিল। সম্প্রতি বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক ক্ষেত্রানুসন্ধান থেকে শীতলামঙ্গল, বায়মঙ্গল, পঞ্চানন্দ মঙ্গলের পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। এসব পুঁথি থেকে অঞ্চলের লোকধর্ম ও লৌকিক দেবদেবীর স্বরূপটি বোঝা যায়। শীতলা, মনসা, চন্ডী, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণ রায়, কানু রায়, ষষ্ঠী, প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস। বিশেষ করে বসন্ত রোগ কিংবা সর্পদংশনের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শীতলা বা মনসার পূজা প্রচলিত। এইসব দেবীর প্রাধান্য ঘটেছে শীতলা মঙ্গল, মনসা মঙ্গলে। যাইহোক, দযাবামের লক্ষ্মী চরিত্র বা বিনন্দ রাখালের পালা আপাতভাবে লক্ষ্মীদেবীর বন্দনাগীত হলেও এটি লেখা হয়েছে ১১৭৬ সালের (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে) মন্বন্তরের পটভূমিকায়। কাশীজোড়া রাজপরিবারের অবস্থান তত দিনে দু'শ বছব অতিক্রান্ত হয়েছে। মন্বন্তরের পটভূমিকায়, রাজা সুন্দর নারায়ণের রাজত্বকালে দয়ারাম মেদিনীপুরের কৃষিজীবী মানুষজনের দুরবস্থাব কথা ব্যক্ত করেছেন বিনন্দ রাখালের পালায়। পালাটি রূপকথা ধর্মী হলেও এখানে হতদবিদ্র রাখাল বিনন্দের লক্ষ্মী লাভ তথা বহু শস্য-সম্পদের মালিক হওয়াব দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি, দেখানো হয়েছে স্বেচ্ছাচারী রাজা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। কাব্যটির নিবিড় পাঠেব মধ্য দিয়ে কৃষি নির্ভর মানুষের অস্তিত্বের; তথা সংগ্রামের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। কেমন ছিলেন কালীজোড়ার রাজারা, কিংবা সেই সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, তার কিছু কিছু সূত্র দয়ারামের এই পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রাপ্ত 'লক্ষ্মীচরিত্র' পুঁথিব থেকে প্রাসঙ্গিক একটি ভণিতা এই রকম-

কালীজোড়া মহাস্থান মহারাজা শুন্দর নারান
ধন্য হে ধার্মিক নরপতি
হইয়া তাহার পৃত দআরাম রচে গীত
কিশরচকে জাহার বশতি।।"

পুঁথিটির পুষ্পিকায় রয়েছে-"ইতি বিনন্দ রাখালের পালা সমাপ্ত। যথাতি দৃষ্ট তথাতি লিখিতং শ্রী বনমালি দেবশর্মা। সং পশড়া প. মন্ডলঘাট। সাল ১২৭৩ সাল তাং ১৯ কার্তিক বুধবাব বেলা দুই দন্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল। এই পুঁথি জে লইবেক শে তাহার বংশ লক্ষ্মী ছাড়া হইবেক।"

পুষ্পিকা থেকে জানা যায় - পুঁথিটির লিপিকর ছিলেন 'পশড়া' গ্রাম নিবাসী শ্রী বনমালি দেবশর্মা এবং পুঁথিটি লেখা হয়েছিল 'পোনান' গ্রাম নিবাসী শ্রী ভজহরি মাইতির জন্য। 'পশড়া' ও 'পোনান' গ্রাম দুটি মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানা এলাকার খারুই অঞ্চলে। প্রাপ্ত পুঁথি থেকে এ অঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির সংবাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মন্বন্তর ক্লিষ্ট জনজীবনের দুঃসহ জীবনযাত্রার সংবাদও পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীও ছিলেন কালীজোড়ার সভাকবি। কোলাঘাট থানা এলাকার কানাইচক গ্রামে ছিল তাঁর ভদ্রাসন। শীতলা মঙ্গল ছাড়া - মনসা মঙ্গল, রায় মঙ্গল, সারদা মঙ্গল, পঞ্চানন্দেব গীত প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্যের রচয়িতা তিনি। এসব পুঁথির মধ্যেও অঞ্চল বিশেষের সামাজিক রীতি নীতির পরিচয় বিদ্যমান। 'শীতলা মঙ্গলে' আজ থেকে প্রায় দু'শ ছাপান্ন বছর আগে বিবাহেব যে রীতি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন, তা আজও এ অঞ্চলে অনুসৃত হচ্ছে। পালাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে মেয়ের অধিবাস, নান্দীমুখ, রমণীদের বর বরণ, বরকে সভাস্থ করা, কনের সিঁথিতে সিঁন্দুর দান, যৌতুক দান এমন কি চুন-হলুদের খেলাও বর্ণিত হয়েছে। 'শীতলা মঙ্গল'-এর বিবাহ পালার অংশ বিশেষ এই রকম-

"গোধূলি সময়ে রাজা শুভলগ্ন পেয়ে।
সভা করে বেদিতে সুশীল বর লয়ে।।
বেদ বিধি মতে বন্দে বরণের পরে।
জয় দিয়ে বর নিয়ে গেল স্ত্রীয়াচারে।।
সখিগনে সঙ্গে লয়ে শুভক্ষণ বেলা।
বরের নিকটে রাখে বরণের ডালা।।"

বিবাহের রীতি-পদ্ধতি ছাড়া বহু কিংবদন্তী, কবির আত্মপরিচয়, কালীজোড়ার রাজ পরিবারের প্রশস্তি বা প্রসঙ্গ কথা নিত্যানন্দের পুঁথিতে পাওয়া যায়। আত্মপরিচয়টি হল-

"পিতামহ পিতাম্বর তস্য সুত মনোহর
তাহার তনয় চিরঞ্জিব।
তস্য সুত হরিহর সখা যার দামুদর
চরাচর খেতি খিতি শব।।
রাধাকান্ত তস্য সুত অশেষ গুণের যুত
শ্রী চৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভাই শীতলা আদেশ পাই
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষান।।"

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী থেকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য, তারপর দয়ারাম, নিত্যানন্দ, শঙ্কর, দ্বিজদুর্গারাম, কবি বল্লভ প্রমুখ কবিদের রচনায় মেদিনীপুব জেলার নানাবিধ সংবাদ বিদ্যমান। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব-এর রচনায় আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু উপাদান রয়েছে। আঠারো শতকের শেষেব দিকে শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করেব 'শীতলা মঙ্গল'-এ মন্ডলঘাট পরগণার ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁর রচনার অংশ বিশেষ এইরকম -

"ক্ষেপুত ভাটড়া তড়া গপালনগর শ্রীবরা
পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য।
দেব অনুগ্রহ করি এ পঞ্চ পন্ডিতে সেবি
তবে কৈল কবিতায় ধার্য্য।

গণেশ ভট্টাচার্য্য ঋষি গপালনগর বাসী
শুক্রাচার্য্য মুনির সমান।
বুঝিয়া কবিত্ব হিত কৃপা করি যথচিত
তিনি মোর চিন্তিল কল্যাণ।"

মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি ঐতিহ্যময় গ্রাম - ক্ষেপুত, ভাটড়া, তড়া, গোপালনগর ও শ্রীবরা। গোপালনগরে বাস করতেন গঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য। এই সব গ্রামে বহু পন্ডিতের বসবাস ছিল, টোল ছিল অনেক। শ্রীকৃষ্ণ কিংকরের কাব্য রচনার কাল ১১৮০-১১৯৫ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ দিক। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের পুঁথি থেকে জানা যায় যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন মন্ডলঘাট পরগণার জমিদার ঠাকুবদাস চৌধুরীর পুত বাঞ্ছারাম চৌধুরী।

প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতের পুঁথি থেকেও জানা যায় লিপিকর ও পুঁথি মালিকদের নানা পরিচয়। কবিরাজী পুঁথি থেকে এলাকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা খবর জানতে পারি। সর্বোপরি, আলোচ্য নিবন্ধে এটাই আমার বলার - এত সব পুঁথি অনাদরে, অবহেলায় আজও আত্মগোপন করে রয়েছে। এসব পুঁথিব সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ একান্ত জরুরী, তা না হলে মেদিনীপুব জেলার আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু উপাদান অন্ধকাবেই থেকে যাবে। মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ - তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আপাতত নিবন্ধের ইতি টানা হলো।

সূত্র - নির্দেশ

১. রামেশ্বর রচনাবলী- সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী
২. বিস্মৃত কবি ও কাব্য ড: ত্রিপুরা বসু
৩. কৌশিকী (১৯৯৬) সম্পাদক দেবাশিস বসু
৪. নিবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি বর্তমান প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পুঁথির বানান ব্যবহৃত হয়েছে।

দুশো বছর পরেও অমলিন আলোকবর্তিকা
চুয়াড় বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণি

রাজীব কুণ্ডু

ইংরেজ ভারতে আসাব আগে কোন কোন বাঙালী কবিব রচনায় এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে যে - বাটি ভরা দুধ ও গোলা ভরা ধানই শুধু নয়, হাসি-ভরা মুখেরও স্বর্গরাজ্য ছিল এই বাঙলা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নামে শুধু যে, নিজেদের আসন পাকা করতে তৎপর হল তাই নয়, ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এরফলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার যে সংস্কার-আদতে, তা ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের (কৃষক ও বহু জমিদার) কাছে ছিল চরম দুর্দিনেরই (কোম্পানীর সুদিন) নামান্তর। এই ঘটনারই সুদূর প্রসারী ফল বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ। কোম্পানীর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তারের যুগে এদেশে বহু প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিল কৃষক ও নানা আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়। ১৭৯৯ সালে সংগঠিত এ রূপই একটি বিদ্রোহ - ইতিহাস খ্যাত 'চুয়াড' বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

১৭৬৭ সালে মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চলে আদিবাসী চুয়াড়দের নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহ (লেঃ ফারগুন সাহেব এর কর্তৃত্বাধীন সময়) হয়। তবুও, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে (১৭৯৯ সালে) উত্তর মেদিনীপুর ও পাশ্ববর্তী জঙ্গল মহলে'র সুবিস্তৃত অঞ্চলে পুনরায় চুয়াড়দের নেতৃত্বেই একটি ব্যাপক বিদ্রোহ হয়। এরূপ একটি 'খন্ড বিদ্রোহ' (মন্তজাতির বিদ্রোহ বা স্থানীয় হাঙ্গামা)[১] কেই বিদেশী ঐতিহাসিক ও কর্মকর্তাগণ চুয়াড় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষ করে ও'ম্যালির রিপোর্টে "১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়িয়া একটা বিরাট বিদ্রোহ....এই বিদ্রোহ সাধারণ চোয়াড় বিদ্রোহ নামে খ্যাত।"[২] কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অধ্যায়টি- আজ ২০০ বছর পরেও বিস্মৃত উপেক্ষিত। দীর্ঘকালের অন্ধকার অতীতে বাঙলার বিদ্রোহী মানসিকতার যে বীজ লুকিয়ে আছে - তার স্ফুরণ ঘটানোই আজ প্রয়োজন, প্রয়োজন চুয়াড় বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণির (এই বিদ্রোহের প্রধান নেত্রী) সঠিক মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণ।

পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলা - মেদিনীপুর। তরুণদেব ভট্টাচার্যের লেখায় পাই এখানকার মানুষ বেশিরভাগই আদিবাসী ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়।[৩] বিনয় ঘোষ এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে নাম দিয়েছেন 'নিষাদ সংস্কৃতি'।[৪] ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো এই সংস্কৃতিকে 'কৈবর্ত্ত -

পৌন্ড্র' সংস্কৃতি বলেছেন।[৫] ১৭৬০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মেদিনীপুর ও জলেশ্বর চাকলার মালিক হয়। মেজর জনষ্টন সাহেব কর্তৃক কোম্পানী এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার পায় এবং ক্রমশ ক্ষমতা কায়েমের মাধ্যমে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল সহ সমগ্র দেশে নিদারুণ অর্থনৈতিক শোষণ চালানো হতে থাকে। আর এরই চরম ফলশ্রুতিরূপে ঘড়ুই, পাইক প্রভৃতি বিদ্রোহের সঙ্গে ইন্ধন যোগায় ১৭৯৯ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ। সমসাময়িক কালে এই সব উপজাতি বা আদিবাসী অধ্যুষিত বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি - তার আভাস পাই - বর্ধন (A. B. Bardhan)[৬] সহ অন্যান্য অনেকের লেখায়। পরবর্তী কালে অবশ্য বিভিন্ন লেখায় এসবের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার প্রমাণ 'মেদিনী মঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যেই লেখা "চুযাড় বিদ্রোহে হল সম্মিলিত, দেখা দিল ধূম-বহ্নির আকারে।"[৭]

'চোযাড়'- শব্দটির আভিধানিক অর্থ - 'দুর্বৃত্ত ও নীচ জাতি'। মিঃ স্ট্রাচি'র মতে চুয়াড়রা মূলত ভূমিজ উপজাতি শ্রেণীভুক্ত এবং মুন্ডা উপজাতির সমগোত্রীয়[৮] - যাদের কর্নেল ডাল্টন কোলিরিয়ান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।[৯] কোম্পানীব কর্মচারী ও সেনানায়কদের অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে এই সব মানুষ 'অসভ্য আদিম' বলে (যেমন - ওসব চাষা চুয়াড়দের ব্যাপারে)[১০] পরিচিতি লাভ করেছে। তৎকালীন সমাজ অর্থাৎ তথাকথিত সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে তারা এতই অস্পৃশ্য বা ব্রাত্য ছিল যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য "অতি নীচ কুলে জন্ম জাতে গো চুয়াড়। কেহ না পরশে জল, লোকে বলে রাঢ়"[১১] - এই পরিচিতিই প্রমাণ করে দেয়। তৎকালীন এই সামাজিক চিত্রের হিসাব না কষলে চুয়াড়-এর বিশ্লেষণ যে অসম্ভব সে বিষয়ে অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ও মত প্রকাশ করেন।[১২] যতই এই শ্রেণীর মানুষকে অপরাধ প্রবণ জাতি বলে প্রচার করুক কোম্পানী লোক বা শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্র নাথ মিত্র - 'চুয়াড়ের ছেলে'[১৩] সাহিত্যের শিরোনাম ব্যবহার করেন, অথবা বাস্তবিক কোন শ্রেণীগত পরিচয় না থাকুক, তবুও এদের নিঃসীম নির্ভীকতা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যে প্রেরণা যুগিয়েছিল ও কোম্পানীর কাছে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল - তা মিঃ হ্যামিলটন এর "বগড়িতে চুয়াড় বিদ্রোহীরা এমন সব কাজ করতেন, যেন তাঁরা কারও অধীন নন"[১৪]- লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়।

১৭৯৮ 'এর কিছু আগে থেকেই চুয়াড় বিদ্রোহীরা ইংরেজ 'এর উৎপীড়নের জবাব দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনো বা জোট বাঁধেন ব্রিটিশের কোপে ক্ষমতাচ্যুত ভূস্বামী - জমিদারদের সঙ্গে। সুপ্রকাশ রায় 'এর লেখাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসে থাকে Common Enemy বলে, এক্ষেত্রে তেমনি ক্ষমতাচ্যুত ভূস্বামী জমিদার ও চুয়াড় বিদ্রোহীদের মধ্যে Common Enemy -ব্রিটিশ শক্তি। একথার সমর্থন পাই। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখাতেও।[১৪/ক] কোন প্রকারে ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য এবং চুয়াড়দেব এই ধূমায়িত বিক্ষোভের সঙ্গে সমস্বার্থে পাইকদের অংশগ্রহণ - আগুনে ঘৃতাহুতির সঞ্চার করে।

কোম্পানীর সর্বনাশা ভূমিবাজস্ব আইন ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'অনুসারে) দ্বাবা ১৭৯৮ সালে পাইকান জায়গার জমিগুলি বাজেয়াপ্ত হতে থাকলে, পুরুষানুক্রমিক জমির অধিকার হারায় পাইক চুযাড়রা এমনকি বহু জমিদাবেব অধিকারও সঙ্কুচিত হয়। দোর্দন্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকার শুধু রাজস্ব সংগ্রহেব নামে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করেই থামেনি, 'উক্ত রাজস্ব সম্পদ নির্গমন প্রক্রিয়াতেও অঙ্গীভূত হযেছিল। এরফলে ভূমিহীন বায়ত ও সাধারণ কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট দুরাবস্থাকে অবকৃষকায়ন (Depeasantisation) বা 'দারিদ্র্যায়ণ' (Panperization) - বলেছেন বিশেষজ্ঞ মহল। আর এই উপনিবেশিক শাসনেব অভিঘাত যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ - তা বিনয় চৌধুরীর বক্তব্যে স্পষ্ট।[১৫]

সুনীল সেন মহাশয় শশীভূষণ চৌধুবীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে "সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে চোযাড় বিদ্রোহ......ফাবাজি বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষক উপনিবেশিক শাসন এবং ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।"[১৬] ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে চুয়াড় বিদ্রোহের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে বলে গবেষক অতীশ দাসগুপ্ত মনে করেন।[১৭] সুনীল সেন 'এর লেখাতে তার সমর্থন থাকলেও তিনি অর্থনৈতিক শোষণকেই প্রধান মনে করে ।[১৮] তবে ঘড়ুই, পাইক, সাঁওতাল বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র বোধেই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল চোয়াড় বিদ্রোহ।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখায় পাই চুয়াড বিদ্রোহের প্রধান কারণ দ্বিবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।[১৯] বিনোদশঙ্কর দাস অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও, মনস্তাত্ত্বিক কারণকেও এই বিদ্রোহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।[২০] যে প্রচীনকাল থেকে যারা জমি ভোগ দখল করছিল, তারা যখন দেখল যে, বিনা অপরাধে বা বিনা কারণে তাদের অধিকার জেনে শুনেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা অথবা "সেই জমির উপর এরূপ একটা নতুন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই,....আবেদন নিবেদনেও কোন কাজ হয় না, তখন তাহারা যে প্রথম সুযোগেই অস্ত্রধারণ করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ফিরিয়া পাইবার...চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।...."[২১] (সুপ্রকাশ রায় এর বই) এই জন্যই চুয়াড় বিদ্রোহের মত গণ অভুত্থান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ইংরেজ সরকার এই সব বিদ্রোহীদের গতিপথ রুদ্ধ করতে পারেইনি, বরং 'চুয়াড়'-'লায়েক'-ইত্যাদিতে তাচ্ছিল্য করেছে। যদিও জে.সি. প্রাইস (মেদিনীপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার) বহু অনুসন্ধানের পব এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "অনেকের মতে, অন্য সকল আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন প্রায়ই জঙ্গল ও পাহাড় হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে লুন্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি করে চোয়াড় বিদ্রোহও সেইরূপ একটি ঘটনা।[২২] তবুও মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বাস করেন রাণীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত পাইকদের জমিদখলের ফলেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লেখেন - "১৭৯৮-৯৯ খ্রীঃ মেদিনীপুরের ইতিহাসকে ভয়ঙ্কর চোয়াড় বিদ্রোহের বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।"[২৩] সুতরাং এই সময় সাধারণ মানুষ

জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত হওয়ায় এক গণ অসন্তোষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিদ্রোহীরা প্রথমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে শিলদা পরগণার অন্তর্গত দুটি গ্রাম জ্বালিয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর আগেও অবশ্য ১৭৯৮ 'এর ফেব্রুয়ারী মাসে বলরামপুর, আনন্দপুর, নাড়াজোল, কুলামপুর - প্রভৃতি স্থানে সেনা পাঠানোর খবর মেদিনীপুর কোর্টের কমান্ডার গ্রেগরী'র ২৬ ও ২৮ তারিখের চিঠি থেকে পাওয়া যায়।[২৪] ঐ বছর মে মাসে রাইপুর'এর প্রাক্তন জমিদার দুর্জন সিং'এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা রাইপুরে বিদ্রোহের পাশাপাশি গুনাদোর দারোগার কাছারি অবরোধ করে এবং "একদিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ করে।"[২৫] এছাড়াও মেদিনীপুর'এর বগড়ী পরগণার গোবর্ধন দিবাপতি (দাগপতি বা দলপতি) যিনি সরকারী রিপোর্টে বাগদী বা দস্যু সর্দার হলেও, জমিদার তালুকদার শ্রেণীর মানুষ ছিলেন (শ্যামচাঁদপুরে'র দেবোত্তর সনদে)[২৬] বলেই জানা যায়। তাঁরই নেতৃত্বে চন্দ্রকোনা এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ সাহসী চুয়াড়েরা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় সাতখানি বৃহৎ অংশ সম্পূর্ণ হস্তগত করতে সমর্থ হয়। এই সকল স্থান ছাড়াও, মেদিনীপুরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও কর্ণগড় ছিল চুয়াড়দের দুটি প্রধান আড্ডা।

ইতিমধ্যে চুয়াড় বিদ্রোহীরা যে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলো - সেই প্রয়াসকে প্রেরণা দিয়ে, এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই সামনে চলে আসেন রাণী শিরোমণি। একটি সরকারী চিঠি থেকে জানা যায় যে, "১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা অজিতের মহিষী খ্যাতনামা রাণী শিরোমণি প্রায় ২১ খানি জঙ্গল পরগণার অধিশ্বরী ছিলেন।"[২৭] কিন্তু তিনি কোন জমিদার কন্যা ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ চাষির ঘরের বা চোয়াড় পরিবারের কন্যা। অধ্যাপক জে. সি. ঝা কোন সূত্র নির্দেশ না করেই তাঁকে আধা-উপজাতি বলেছেন।[২৭/ক] তা কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অজিত সিংহ 'এর মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়েই চুয়াড় বিদ্রোহের ব্যাপকতা বাড়তে থাকে এবং রাণী শিরোমণির সময়ে তা প্রকৃত আকার ধারণ করে।

চুয়াড় বিদ্রোহের লেলিহান শিখা রায়পুর পরগণাতে সেখানকার পূর্বতন জমিদার দুর্জন সিং প্রজ্বলন করলেও প্রাইস সাহেবের রিপোর্টে তাঁর মত (দুর্জন সিং) অন্যান্য অনেক জমিদারের সঙ্গে রাণী শিরোমণিরও (রিপোর্টে রাণী শ্রমতী) উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি একাধারে 'খাস জমিদার' ও অন্যদিকে নাড়াজোলের জমিদারের আত্মীয় চুনিলাল'এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছেন-এ ধারণা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে নেহাতই অমূলক ছিল না। আর তাই কালেক্টর সাহেব রাণীকে 'সংরক্ষিত' করার জন্য একদল সিপাহীকে পাঠানোর সুপারিশ করেন।[২৮] গুপ্তচর মারফৎ তিনি এ তথ্যও সংগ্রহ করেন যে চোয়াড়'দের একটি বিরাট দল রাণীর আশ্রিত ছিল এবং কেল্লায় তাঁরা নানা পরামর্শের জন্যই শুধু আসতো তাই নয়, নাড়াজোল থেকে রাণীর কেল্লায় চারটি বলদে টানা গাড়িতে করে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে আসা হত।[২৯] সুতরাং বিদ্রোহে রাণীর ভূমিকা যথার্থ 'উল্লেখযোগ্য' রূপে বিবেচ্যও বটে।

সাধারণ চাষির ঘরের কন্যা হওয়ায়, জীবন সংগ্রামে চরম দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার এ সবই তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। আর তাই-ই তাঁকে বিদ্রোহে প্রেরণা

যোগাতে প্রলুব্ধ করেছে। নিজে জমিদার কন্যা হলে, বিদ্রোহের সময় পিত্রালয়ের সাহায্য পেতেন। যাইহোক, ১৭৯৪ সালের জুলাই সে গণবিদ্রোহের চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ও সেই সংগঠনের অন্যতম নেতা কোম্পানীর হাতে ধৃত বংশীরাম (বাঞ্চারাম বা বনসুরাম) বক্সী ও সীতারাম খাঁন এর পক্ষ অবলম্বন করেন শিরোমণি। কিন্তু তাদের ফৌজদারী কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি একটি নির্দেশনামায় বলা হয় যে, ভবিষ্যতে চোয়াড় বিদ্রোহে সাহায্য করলে রাণীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। তবে এ সবকিছুই রাণীকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি।

প্রজাদের 'পাইকান' জমি কেড়ে নেওয়া হলে, প্রজাদেরই সন্তানবৎসল লালন-পালনে মাতৃরূপিনী রাণী ইংরেজ বিদ্বেষে গর্জে ওঠেন। এছাড়াও তাঁর জমিদারীতে রতনসিং, রাম সিং, রঞ্জিত মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন সর্দার তহশীলদারকে ইংরেজ সরকার বরখাস্ত করলে, ইংরেজ প্রেরিত নিষ্ঠুর খাজনা আদায়কারী রামমোহন রায়কে তিনি হত্যার নির্দেশ দেন।[৩০] সুতরাং চুয়াড় বা সাধারণ দীনদুঃখীর জীবন ধারণের উৎসমুখ ইংরেজ কোম্পানী রুদ্ধ করে দেওয়ায়, ইংরেজ আশ্রিত বা সমর্থন পুষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি-লুটপাট শুরু হয়। "অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ইংরেজ ঐতিহাসিক বর্ণিত ডাকাতের দল (!) নতুন শাসকদের বিপর্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ফলে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজ শাসন, বানচাল হবার উপক্রম হয়। পিন্ডারী, ঠগী, বর্গী প্রভৃতিরা নিছক দস্যু ছিল কিনা সন্দেহ..."।[৩১] কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও রাণী ইংরেজ বিদ্বেষী কাজের নির্দেশদানে অটুট থাকেন।

রাণীর পূর্ণ সমর্থনে চাঙ্গা হয়ে ওঠে চোয়াড় পাইকরা। সাম্প্রতিক কালে সাংবাদিক কুনাল ঘোষ শিরোমণির চুয়াড়দের সমর্থনের পিছনে যে যে কারণগুলির উল্লেখ করেছেন তা হলঃ জমিদারী রক্ষার স্বার্থ, ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম, নিজের অতীতের প্রভাবে অনগ্রসর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো।[৩২] এই একই মতের প্রতিধ্বনি পাই শ্যামাপদ ভৌমিকের লেখায়।[৩৩]

শুধুমাত্র চুয়াড়রাই নয়। ইংরেজ বিরোধী বহু জমিদারদেরও রাণী সাহায্য করেন। ১৭৬৭ সালে নাড়াজোল এর জমিদার অযোধ্যারাম ইংরেজদের খাজনা দিতে অস্বীকার করায় রানী তাঁকে আশ্রয় দেন। এভাবে রাণী বহু জমিদার, প্রজার (বহু মহাজনের) কাছে এতই আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন যে, তাঁর নিষ্কর জমির নিলামে কেঁউই অংশগ্রহণ করেনি। ইংরেজ শত্রুকে বিতাড়নে রাণীর সঙ্গে রামগড়, ঝাড়গ্রাম, শিলদা'র প্রভৃতির রাজরাও সামিল হন। উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজে'র বিরুদ্ধে সংঘর্ষে পাল্লা-দেওয়া কঠিন বুঝে রাণী গেরিলা যুদ্ধ রীতিকে গ্রহণ করেন।

১৭৯৩-এ গড়বেতা সহ লালবনি থানা ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহের নায়িকারূপে শিরোমণি অবতীর্ণ হন। প্রখর বাস্তববোধ ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়ে বিদ্রোহীরা জেলার সকল জমিদার, জোতদার এবং বিশেষত বানিয়াদের পত্রদ্বারা সতর্ক করে দেয় যে, ওদের কেউ ইংরেজ সৈন্যদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করলে তাকে হত্যা করা হবে। এধরনের

প্রস্তাবকে তারা কৌশলে রাণীর নির্দেশ বলে প্রচার করে।[৩৪] এভাবে নিজ জমিদারীর সমস্ত প্রজা ও উপজাতি সর্দারদের সমর্থন পেয়ে, তাদের দুঃখকষ্টের অংশীদার হয়ে রাণী এত বড় অভ্যুত্থানে প্রেরণা যোগান। বিদ্রোহের ভয়াবহতায় শঙ্কিত তৎকালীন কালেক্টর মিঃ ইম্হফ ও জাজেস ম্যাজিসস্ট্রেট ববার্ট গ্রেগরী সরকারী কোষাগারের সকল অর্থ ও মূল্যবান দলিলপত্র সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রাগারে প্রেরণ করেন[৩৫]।

শিরোমণির উৎসাহে বিদ্রোহ ব্যাপকরূপে রূপ নিলে তা দমনের জন্য ইংরেজ কর্ণগড় ও আবাসগড়ে সেনাবাহিনী পাঠায়। 'রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন'এর বিবরণে জানা যায় যে, সৈনরা কর্ণগড় দুর্গ আক্রমণ করে এবং "Plundered the Jewels and other valuables of the Rani, but she without offering the lightest resistance, surrendered herself with Chunilal to the commander"[৩৬] চুনিলাল ও নরনারায়ণ বক্সীকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। আবাসগড়ে বন্দিনী রাণী শিরোমণি হন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। তবে বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতকও (যেমন যুগলচরণ) যে বিদ্রোহীদেরও রাণীর খবরাখবর দিয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করেছিল-তার উল্লেখ পাই তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখায়।[৩৭] এমনকি এ নিয়ে অনেক গল্পকাহিনীরও যে প্রচলন আছে তার আভাস পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষ[৩৮] (রাণী শিরোমণি প্রবন্ধ) ও সত্য ঘোষালের 'পাপড়ি ছড়ানো পথ' গ্রন্থে। প্রাইস সাহেব লিখেছিলেন ১৭৯৯ সালের শেষের দিকে রাণী গ্রেপ্তার হওয়ায় কিছুটা শান্তি ফিরেছিল।

শিরোমণির মৃত্যু হয় ১৮১৩ খ্রীঃ। একটি কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা হয় "ঝাঁসী রাণী লক্ষ্মী সমা/করনি ক্ষমা/অধীনতা মান নাই শঠ শেতাঙ্গের।"[৩৯] রাণী শ্বেতাঙ্গের অধীনতা তুচ্ছ করে, ধূর্ত বণিকের শাসক প্রাণ কাঁপিয়ে, লক্ষ্মীবাঈ'এর মত অমিত বলের পরিচয় দেন। কুনাল ঘোষ অবশ্য তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়ে দেন যে, লক্ষ্মীবাঈ আদর্শের মূর্ত প্রতীক হলেও সে ঘটনার ৬০ বছর আগে, জটিল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন পুরুষ-শাসিত রাজকীয় জমিদারীর সম্ভ্রান্ত বধূ বা একজন বিধবা নারী রূপে শিরোমণি যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[৪০] শুধু তাই নয়, সেই অঞ্চলের অন্যান্য জমিদারদেরও নির্দেশ দেন বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে, কোম্পানীকে নয়। যদিও চুয়াড় বিদ্রোহকে প্রকৃত কৃষক বিদ্রোহ বলতে নারাজ[৪১] অনিরুদ্ধ রায় সহ অনেকে। তবুও অষ্টাদশ শতাব্দীর জঙ্গলমহলের বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণি-এই দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়কে আরও ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে হাজির করার দায় বোধ হয় অস্বীকার করতে পারেন না আধুনিক কালের গবেষকরা।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহে'র মত বিদ্রোহগুলির প্রভাব সুনীল সেনও যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন,[৪২] তেমনি কালীচরণ ঘোষও তাঁর লেখায়[৪৩] আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে চুয়াড় বিদ্রোহের অগ্রগণ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্যাথলীন গাফত ১৭৬৫-১৮৫৭ পর্যন্ত ২৯টি বিদ্রোহের মধ্যে এই বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন।[৪৪] ঐতিহাসিক

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন-"ব্রিটিশাধিকারের আদিপর্ব থেকে কোথাও রাজা তালুকদার পলিগাবেব মত অভিজাত, কোথায় পাইক-চুয়াড়ের মত আশ্রিতবর্গ ....সাঁওতাল, কোল....আদিবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছে" এবং "তা যে কিষাণ আন্দোলনের অগ্রদূত - জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণার উৎসভূমি"[৪৫] -তাও স্বীকাব করেছেন। সুতরাং বলতে পারি উপেক্ষা অবহেলা নয়, অন্যান্য সকল বিদ্রোহের মতই, এ ধরনের আঞ্চলিক বিদ্রোহও মুক্তিসংগ্রামের দোতাক। তাই আজও আমরা বলতে বাধ্য-

"বিপ্লবের শিরমণি নেত্রী - শিরোমণি
বিদ্রোহিণী, বিজয়ণী তোমা নমি ভনি "।[৪৬]

সূত্র নির্দেশ

১। 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস'-ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে গ্রন্থের প্রারম্ভিক পর্বে বিভিন্ন উপজাতি বিদ্রোহেব অবহেলা করার প্রসঙ্গে কথাটি ব্যবহার কবেছেন।

২। O'Malley-এর রিপোর্ট। আমি পেয়েছি সুপ্রকাশ রায়-এর 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (১ম খণ্ড) ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে। পৃ:-১৩৯।

৩। 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন - মেদিনীপুর'-তরুণ দে। ভট্টাচার্য (কলিকাতা - ১৯৭৯)।

৪। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

৫। 'সংবাদ প্রতিদিন' (সংবাদপত্র) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ (পৃ:-১১)

৬। "The Unsolved Tribal Problem" - A. Bardhan গ্রন্থটিব উদ্ধৃতি (পৃ:- ৫) পাই ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে'র 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে

৭। 'মেদিনীমঙ্গল'-কাব্য-গোরাচাঁদ গিরি রচিত। উদ্ধৃতিটি ঐ গ্রন্থের। আমি পাই তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যর 'ইতিহাসখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের দু'শো বছর'-প্রবন্ধে ('নন্দন' পত্রিকা/এপ্রিল ১৯৯৯) (পৃ:-১৩)

৮। 'বিদ্রোহিনী রাণী শিরোমণি ও মেদিনীপুরের প্রথম কৃষক গণবিদ্রোহ'- নগেন্দ্রনাথ রায় (মেদিনীপুর, ১৯৯৯) (পৃ:-৪১)

৯। পূর্ব্বোলিখিত গ্রন্থ (পৃ:-৪১)

১০। 'ইতিহাসখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের দু'শো বছর' - তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য (নন্দন পত্রিকা /এপ্রিল ১৯৯৯) (পৃ:-১০)

১১। উল্লেখ পাই তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা 'চুয়াড় বিদ্রোহ ও বীরাঙ্গণা রাণী শিরোমণি'-প্রবন্ধে, ('গণশক্তি', ২১ নভে: ১৯৯৯)।

১২। 'নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস' (২৪ জুলাই, ৯৯)-এর আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণে।

১৩। তারাঙ্কর ভট্টাচার্য-'ইতিহাসখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের দু'শো বছর' প্রবন্ধ (নন্দন, এপ্রিল, ৯১)

১৪। মিঃ হ্যামিলটন-'হিন্দুস্থান' গ্রন্থের উদ্ধৃতি। আমি পেয়েছি তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা প্রবন্ধ ১৪/ক-পূর্ব্বোল্লিখিত উৎস থেকে। (নন্দন/এপ্রিল-৯৯)।

১৫। নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস (২৪.৭.৯৯)-এ সেমিনার প্রদত্ত ভাষণে।
১৬। 'ভারতের কৃষক আন্দোলন' (১৮৫৫-১৯৭৫) - সুনীল সেন (১৯৯০) (পৃ:-৯)
১৭। ২৪ জুলাই, ৯৯ নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস-, সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ।
১৮। সুনীল সেন, গ্রন্থ-পূর্বোল্লিখিত (পৃ:-৯)*
১৯। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ ('নন্দন' এপ্রিল/৯৯)
২০। Civil Rebellion In the Frontier Bengal (1760-1805) _ Binod. S. Das (1973) (P-95)
২১। "Chuar Rebellion'- J.C. Price। উদ্ধৃতিটি ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, হলেও আমি পেয়েছি সুপ্রকাশ রায়-এর- 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'- গ্রন্থে। (পৃ: ১৪২)
২২। J.C. Price পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ। উদ্ধৃতিটি সুপ্রকাশ রায় এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (পৃ:-১৪২)
২৩। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ (পৃ:-১৪২)
২৪। 'বিদ্রোহিণী রাণী শিরোমণি ও মেদিনীপুরের প্রথম কৃষক গণবিদ্রোহ'-নগেন্দ্র নাথ রায় (মেদিনীপুর, ১৯৯৯) (পৃ:-৪৫)।
২৫। J.C. Price-পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ। উদ্ধৃতিটি সুপ্রকাশ রায়-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (পৃ:-১৪৫)
২৬। নগেন্দ্র নাথ রায়। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ (পৃ:-১৪৫)
২৭। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-ত্রৈলোক্যনাথ পাল (তৃতীয় খণ্ড) (পৃ:-৮৪)
২৭/ক বৈচিত্রময় মেদিনীপুরের ইতিহাস - শ্যামাপদ ভৌমিক।
২৮। ইতিহাস সংসদ 'স্মরণিকা'-১৯৯৯। নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত'র প্রবন্ধ।
২৯। পূর্বোলিখিত প্রবন্ধ (স্মরণিকা, ৯৯)
৩০। ইতিহাস অনুসন্ধান-১০, শ্যামাপদ ভৌমিক-এর 'মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি ও কৃষক বিদ্রোহ'-প্রবন্ধ। (১৯৯৫)
৩১। উদ্ধৃতিটি 'ইন্ডিয়া স্ট্রাগলস্ ফর ফ্রিডাম'-হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আহৃত। আমি পেয়েছি তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে (নন্দন, এপ্রিল,৯৯) (পৃ:-১১)
৩২। 'রাণী শিরোমণি' কুনাল ঘোষ (বিশ্বকোষ পরিষদ) (১৯৯৯) (পৃ:-৯)
৩৩। ইতিহাস অনুসন্ধান ১০-এ শ্যামাপদ ভৌমিকের প্রবন্ধ।
৩৪। সুপ্রকাশ রায়। পূর্বোলিখিত গ্রন্থ (পৃ:-১৫১)
৩৫। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ - সুপ্রকাশ রায় (পৃ:-১৪৯)
৩৬। History of Midnapore Raj - Raja Mohendralal Khan (1889) Ó
আমি পেয়েছি নগেন্দ্রনাথ রায় -এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের পৃ:-১০৫
৩৭। 'চুয়াড়বিদ্রোহ ও বীরাঙ্গনা রাণী শিরোমণি' - (প্রবন্ধ)-তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য (গণশক্তি, ২১শে নভে: ১৯৯৯)
৩৮। 'কিংবদন্তীর দেশে' (গ্রন্থ)-সুবোধ ঘোষ-'রাণী শিরোমণি (গল্প)
৩৯। 'পারাংপাড়ের ক্ষুধিত পাষাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ - কুনাল ঘোষ, (সংবাদ প্রতিদিন ১৩ ডিসে: ১৯৯৮-এ প্রকাশিত)। উদ্ধৃতিটি বিপ্লবী সুরেন্দ্র মোহন দে'র 'বিপ্লবী মেদিনীপুর' গ্রন্থের

পাতায় আছে।

৪০। কুনাল ঘোষ-'রাণী শিরোমণি'

৪১। ২৪.৭.৯৯-এশিয়ান স্টাডিস-এ সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণে।

৪২। সুনীল সেন, পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

৪৩। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'-'পশ্চিমবঙ্গ' সংখ্যা।

৪৪। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (আনন্দ) - অমলেশ ত্রিপাঠী।

৪৫। পূর্ব্বোল্লিখিত উৎস।

৪৬। বিপ্লবী সুরেন্দ্র মোহন দে'র 'বিপ্লবী মেদিনীপুর' গ্রন্থে। উদ্ধৃতিটি পাই কুনাল ঘোষ-এর 'পারাং পাড়ের ক্ষুধিত পাষাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে। (সংবাদ প্রতিদিন, ডিসে:, ১৩, ১৯৯৮)।

সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান - ত্রিবেণী এবং বাঁশবেড়িয়া

শমিতা সিংহ

পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চারটি স্থান নদীয়া রাজ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই চারটিকে 'চাবি সমাজ' বলা হত। এই চারটি স্থান নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী। এক সময়ে ত্রিবেণীতে তিরিশটি টোল ছিল।[১]

ত্রিবেণী মূলত: জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য গুণে বিখ্যাত। তবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মের প্রায় দুশ বছব আগে হুসেন শাহব রাজত্বকাল থেকে জগন্নাথ বংশের পাণ্ডিত্যেব খ্যাতি ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয়।[২]

'ত্রিবেণ্যাং বঘু - রাঘবৌ'। এই রঘু হলেন জগন্নাথের ন্যায়শাস্ত্রের গুরু রঘুদেব বাচস্পতি। তখনকাব দিনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈযাযিক ছিলেন। ত্রিবেণীতে তাঁর টোল ছিল। জগন্নাথ তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র পডতেন। পিতা রুদ্রদেবের কাছে তিনি পড়তেন ব্যাকবণ। জ্যাঠামহাশয় ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের টোল ছিল বাঁশবেডিয়ায। তাঁর কাছে জগন্নাথ স্মৃতিশাস্ত্র পড়তেন। রঘুদেবের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ কবাব এক বছর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত করেন।[৩]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী পন্ডিত বাংলাদেশে গত তিন শতকে জন্মগ্রহণ করেন নি বলে মনে হয়। জগন্নাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা গুণে আকৃষ্ট হয়ে দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এক সময়ে তাঁর টোলে পডতে আসত। সন ১৭১৮-১৮০৭ এই দীর্ঘ সময় ধবে জগন্নাথ অধ্যাপনা করে গেছেন। অর্থাৎ ৯০ বছর তিনি অবিরাম অধ্যাপনা কবে গেছেন। অধ্যাপনাব ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য কীর্তি।[৪]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোলে ন্যায়, স্মৃতি, পুবাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলংকার ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রাদি পঠন পাঠন হত। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এই পন্ডিতের বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জলেও অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি এই সমস্ত শাস্ত্রগুলিও টোলে পড়াতেন। তবে তাঁর ছাত্রদেব মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই বেশী ছিল। জগন্নাথের টোল ছিল তখন বাংলাব অন্যতম সংস্কৃত মহা-বিদ্যালয়।

বর্ধমান রাজ, শোভাবাজাবের বাজা নবকৃষ্ণ এবং নদীয়ার বাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জগন্নাথের পাণ্ডিত্যগুণে সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে বাঁশবেড়িয়া এমনকি নদীয়াব খ্যাতিও ম্লান হয়ে যায়। বাঁশবেড়িয়া এবং কুমাবহট্টের পন্ডিত সমাজ এক সময় বহু চেষ্টা

করেও নদীয়ার খ্যাতি ছাড়িয়ে যেতে পারেনি কিন্তু তর্কপঞ্চানন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং পান্ডিত্য দিয়ে একাই সে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫]

জগন্নাথের এক ছাত্র রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বার্ত্তিকমালা' গ্রন্থে গুরুস্তুতি করেছেন :-

বিদ্যাবিত্তবয়ঃ কুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতোহ দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং
শশ্বদ্‌গেয়গুণো গুণাকর নৃণমাসীৎ ত্রিবেণীপুরে।
শ্রেয়ঃ শ্রেণি বিধান সাধন - জগন্নাথেন নাম্নাপি চ
শ্রীপঞ্চাননসোদরো দ্বিজবরো যস্তর্কপঞ্চাননঃ।[৬]

অর্থাৎ জগন্নাথ বিদ্যায় বিত্তার্জনে, বয়সে এবং কুলমর্যাদিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি গুণের আকর ছিলেন এবং ত্রিবেণী পুরীতে বাস করতেন, ব্রাহ্মণদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেমন শিব এবং সূর্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন জগন্নাথও সেই রকম ছিলেন।

শোনা যায় একবার পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও একজন সমাজচ্যুতকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এতে অসন্তুষ্ট হয়ে জগন্নাথকে তাঁর সভায় বাজপেয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেননি। জগন্নাথকে অপমান করার জন্যই কৃষ্ণচন্দ্র এই কাজ করেন। নিমন্ত্রিত না' হয়েও পন্ডিত কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রেব সভায় উপস্থিত হন অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথেয়তা তিনি গ্রহণ করেননি। জগন্নাথের সঙ্গে ছিল তাঁর ১০০ জন ছাত্র। জগন্নাথ নিজ ব্যয়ে সেখানে থেকে যান। যজ্ঞ শেষে কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেইসভা সম্পর্কে জগন্নাথের মতামত চান পন্ডিত বিদ্রুপ করে বলেন যে সভায় জগন্নাথ নিমন্ত্রিত নন সে পন্ডিত সভা নিঃসন্দেহে মহৎ সভা যাতে জগন্নাথ রবাহূত সে যজ্ঞের মহিমাব সীমা কি ?[৭]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'রামচরিত' একটি নাটক। 'রামচরিত' ছাড়া তিনি অন্য যে সমস্ত নাটক রচনা করেছেন তাঁর কিছু অংশ মাত্র পাওয়া গেছে। নাটক ভিন্ন তাঁর অনেক রচনা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। জগন্নাথ রচিত টীকা সমস্ত ভারতবর্ষেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মাদ্রাজে তাঁর রচিত 'সামান্য নিরুক্তি পত্রম্' পাওয়া গেছে। বরোদাতে 'কবীন্দ্রাচার্য সূচীপত্র' নামে যে নির্ঘন্ট আছে তাতে 'জগন্নাথীয়' পাওয়া যায়। জগন্নাথের এক বংশধরের কাছে তাঁর রচিত দুটি মাত্র টীকা পাওয়া গেছে। এর একটি ব্যাভিচারের কয়েকটি ছত্রের ওপর এবং আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থস্যর কয়েকটি পঙক্তির ওপর রচিত। "সিদ্ধান্ত লক্ষণ জমদিমীর" টীকায় তিনি লিখেছেন, 'ইত্যস্মদ্ গুরুচরণাঃ' এবং তাঁর ন্যায়শাস্ত্রের গুরু পন্ডিত রঘুনাথ বাচস্পতির টীকা দিয়েছেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবাদ ভঙ্গার্নব' আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে। এই গ্রন্থে জগন্নাথ সংস্কৃতে হিন্দু আইন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ যখন ইংরেজরা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তাদের কাছে কোন লিখিত আইন ছিল না। ইংরেজ শাসকরা, ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য চালাত। সময়ে সময়ে হিন্দু পন্ডিতেরা স্মৃতিশাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যাও দিতেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচাবক উইলিয়াম

জোন্সের হাতে হিন্দু আইনের একজন সংকলক খুঁজে বার করার ভার পড়ে। জোন্স পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই বই ছাপাবার খরচ ইংল্যান্ডের রাজ কোষাগার থেকে দিতে রাজি হন। এই প্রসঙ্গে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্পর্কে গর্ভনব জেনারেল মন্তব্য করেন যে পন্ডিতের পান্ডিত্য এবং যোগ্যতা সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। আটশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ শেষ হতে জগন্নাথের তিন বছর লেগে যায়। জোন্স যদিও চেয়েছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের এক সংকলন গ্রন্থ কিন্তু পন্ডিত হিন্দু আইনের ওপর সম্পূর্ণ এক নতুন গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র মতামতের ভেদাভেদে কন্টকিত কি পরিমাণ পান্ডিত্য ও প্রতিভা থাকলে এই মতামত কন্টকিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিবাদ ভঙ্গার্নবের মত গ্রন্থ শেষ জীবনে মাত্র তিন বছরের মধ্যে, সঙ্কলন করা যেতে পারে, তা আজ আমাদের কল্পনা কবাও সম্ভব নয়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পান্ডিত্যে বহু ইংরেজ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস হার্ডিঞ্জ, কোলব্রক জোন্স আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে জগন্নাথের সাহায্য নিতেন।

রাজা, মহারাজা এবং জমিদার তাঁর পান্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা তাঁকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ এবং নিষ্কর জমি দান কবেছিলেন। এইভাবেই তিনি বর্ধমান রাজ ত্রিলোকচন্দ্র, কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ এবং নদীয়ার বাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। নবকৃষ্ণের সভায় নবরত্নের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেব নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপন্ডিত বামচন্দ্র তর্কালঙ্কার তাঁর 'মাধবমালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের এই নবরত্নসভার বর্ণনা করেছেন :-

> সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নাম জগন্নাথ।
> তর্কপঞ্চানন রূপে ভুবন বিখ্যাত ॥
> মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
> বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥

ত্রিলোকচন্দ্র তাঁকে হেদুয়াপাতা গ্রাম এবং একটি বড় পুষ্করিণী দান করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দেওযান নন্দকুমার তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে নবাবের সাথে জগন্নাথের পরিচয় করিয়ে দেন। নবাব তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

জগন্নাথ সম্বন্ধে বেশ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত হল - জনৈক ডাকাতের সর্দার শ্যামসুন্দর একদিন রীতিমত দক্ষিণা দিয়ে জগন্নাথের কাছে জানতে চান - 'লুটের মালে চোব ডাকাতেব কোন স্বত্ব আছে কি না ?' জগন্নাথ শাস্ত্রাদির প্রমাণসহ লিখিত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এই মর্মে যে লুটের মালে চোর-ডাকাতের স্বত্ব আছে। যেদিন তিনি ব্যবস্থাপত্র দেন সেইদিন রাতেই তাঁর নিজেব বাড়িতে ডাকাতি হয়।' এ ঘটনা সত্য বলেই মনে হয়। কারণ ১২০২ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করেছেন - "আমাদিগের বাটীতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পড়িয়া কাগজপত্রাদিও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।"[৮]

উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে ত্রিবেণীর টোলের উল্লেখ করেছেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পান্ডিত্যের প্রশংসা করে গেছেন। পরে তিনি আরেকটি গ্রন্থে বলেছেন যে ত্রিবেণীতে সাতটি কি আটটি টোল ছিল যার একটিতে পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পড়াতেন।

১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুকালে ত্রিবেণীর ঘাটে তিনি যখন শায়িত তাঁর এক ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেন "গুরুদেব, নানাশাস্ত্র পড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু এক কথায় তো বুঝিয়ে দেননি, ঈশ্বর কি বকম ?" মৃত্যুপথযাত্রী জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক মনে মনে রচনা করে বলেন-

নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ নীরাকারাম্ উপাস্মহে।৮

অন্তর্জলী অবস্থায়ও তাঁর স্মৃতিশক্তিএবং চিন্তা করার ক্ষমতা একটুও ম্লান হয়নি।

শোনা যায় পিতৃশ্রাদ্ধের পর সম্বলহীন অবস্থায় সংসারযাত্রা শুরু করে মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বহু সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে যান। জগন্নাথ পন্ডিতের জীবনে এও এক বিস্ময়কর কীর্তি।

জগন্নাথের সঙ্গে নদীয়ার বুনো রামনাথের মত পন্ডিতের বিরাট পার্থক্য ছিল এই যে বুনো রামনাথ কখনও কারো কাছে আর্থিক সাহায্য নেননি বা কোন রকম দানই গ্রহণ করেননি কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কখনও কোন দান গ্রহণে অস্বীকৃত হতেন না। যার ফলে তাঁর অবস্থা ছিল সচ্ছল কিন্তু বুনো রামনাথেব অসম্ভব দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। বিত্তকে রামনাথ এবং আরও কোন কোন পন্ডিত বিদ্যার শত্রু বলে মনে করতেন। জগন্নাথ এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতির মত কোন কোন পন্ডিত আবার বিত্তকে বিদ্যার শত্রু বলে কখনও মনে করেননি।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে আরও যারা পান্ডিত্যগুণে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথের পূর্বপুরুষ গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ ছিলেন ষডদর্শনবিৎ এবং তাঁর পুত্র শিবকৃষ্ণ ন্যায় পঞ্চানন ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রবিদ। জগন্নাথের পিতামহ, হরিহর তর্কালঙ্কার এবং জ্যেষ্ঠ পিতামহ চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ত্রিবেণীর বিখ্যাত পন্ডিত। জগন্নাথের উত্তরপুরুষের মধ্যে তাঁর তিন পুত্র কালিদাস, কৃষ্ণচন্দ্র, তর্কসিদ্ধান্ত ও রামনিধির পান্ডিত্য খ্যাতি ছিল। মহারাজা রাজবল্লভের সভায় চারজন নিমন্ত্রিত পন্ডিতের মধ্যে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং তাঁর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের সন্তান সন্ততির নব্যন্যায় চর্চা করতেন এবং রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতির বংশধরগণ স্মৃতিশাস্ত্র চর্চা করতেন। জগন্নাথের পৌত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌম সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি একজন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 'বিবাদ ভঙ্গার্নব'ও রচনা করার সময় তাঁর এই পৌত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে রাধাকান্ত তর্কবাগীশের মৃত্যুর পর ঘনশ্যাম সার্বভৌম সদর দেওয়ানি আদালতের বেতনভোগী পন্ডিত হন। ব্যবহারশাস্ত্র পারদর্শী এই পন্ডিত সতীদাহ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে হল এই যে যারা

পতানুগমনেব জন্য প্রস্তুত হন, তাঁদের অত্যন্ত শিশুসন্তান থাকলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা হলে, ঋতুকাল হলে কিম্বা নাবালিকা অবস্থা হলে, তাঁরা সহমরণ হবার যোগ্য নন, উপরিউক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকলে সহমৃত্যু হতে কোন দোষ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র চতুরবর্ণের প্রতি এই নিয়ম।[৯] কিন্তু জন্মভূমি পত্রিকায় ঘনশ্যাম সার্বভৌম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যে সতীদাহ শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। জগন্নাথের বংশধরদের মধ্যে আরও যারা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মহামহোপাধ্যায় রামদাস তর্কবাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মিস্টার ওয়ার্ড তাঁব গ্রন্থে বলেছেন যে হুগলী থেকে দূরে নয় বাঁশবেড়িয়া নামক একটি গ্রামে বারো কি চোদ্দটি সংস্কৃত টোল ছিল যাদের প্রত্যেকটিতেই নব্যন্যায় পঠন পাঠন হত।

বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী নব্যন্যায়েব পীঠস্থান হিসাব প্রথম বিখ্যাত হয় যখন পাটুলি থেকে বাজা বামেশ্বর বায় বাঁশবেড়িয়া চলে আসেন (১০৮১-৯৯ সন) এবং তার উৎসাহে বড়বাড়ীতে এক বিদ্যাসমাজ গড়ে ওঠে। রাজা রামেশ্বর নানা স্থান থেকে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পন্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে এবং শতাধিক সমবকুশল পাঠানকে আনিয়ে বাঁশবেড়িয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। কাশী থেকে পন্ডিত রামশবণ তর্কবাগীশকে আনিয়ে রাজা রামেশ্বর আপন সভাপন্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ঐ গ্রামের মধ্যে ৪১টি টোল স্থাপন করেন এবং কাশী ও মিথিলা থেকে অধ্যাপক আনিয়ে ছাত্রদের স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্যও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখবাব উপায় করে দেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার থেকে দেওয়া হত।

নবদ্বীপের বাইরে গঙ্গাব উভয় তীরবর্তী কুমারহট্ট (হালিশহর) ও বংশবাটীর পন্ডিতদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এককালে বেশ স্মরণীয় ঘটনা ছিল। রামেশ্বর রায়ের পুত্র ও পৌত্র রঘুদেব এবং গোবিন্দ দেবের সময়ে তাঁদের বিদ্যোৎসাহিতার ফলে সংস্কৃত চর্চাব কেন্দ্র হিসেবে বাঁশবেড়িয়াব গৌবব আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের বাইরে থেকে অনেক পন্ডিতবংশই বাঁশবেড়িয়াতে চলে আসে। রাজবল্লভের সভায় তিনজন পন্ডিত রামভদ্র সিদ্ধান্ত, রামচন্দ্র বাচস্পতি ও আত্মাবাম ন্যায়লঙ্কার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনজনেই 'বাঁশবেড়িয়া নির্বাসিন'।

বংশবাটীতে আরও যারা সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহী ছিলেন তাদের মধ্যে রাজা নৃসিংহ দেবের নাম করা যায়। বাজা নৃসিংহ দেব সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনী শঙ্করী দেবী পূজাপার্বন প্রভৃতিতে বিশেষ দোল যাত্রার সময়ে বাংলাদেশের পন্ডিতমন্ডলীকে নিমন্ত্রণ কবে এক শরা আবীব ও এক শরা টাকা দিয়ে প্রত্যেককে প্রণাম জানাতেন।[১০]

বংশবাটীর বাইরে থেকে যে সমস্ত পন্ডিত বংশ এখানে চলে আসে তাদের মধ্যে ন্যাযশাস্ত্র চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল তিন ভট্টাচার্য্য বংশ। রামভদ্র সিদ্ধান্ত এই ভট্টচার্য্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত। বাঁশবেড়িয়ায় আর যাবা ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদেব মধ্যে বিগত শতাব্দীব মধ্যভাগে হরদেব বিদ্যাবাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাঁশবেড়িয়ার দুই পন্ডিত

তারকনাথ তর্করত্ন ও অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি প্রথমে নবন্যায় চর্চা করতেন কিন্তু পরে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁরা দুজনেই বর্ধমান রাজসভা অলঙ্কৃত করে-ছিলেন। পন্ডিত দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে নানা দেশ থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসত তাদের মধ্যে অনেক দ্রাবিড়ী ছাত্রও ছিল। বান্দাপাড়া পল্লীতে ঐ পন্ডিতের টোল ছিল। ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বর্গত হন। পন্ডিত শ্রীনাথতর্কালঙ্কার ১৩১৬ খ্রিঃ পরলোক গমন করলে বংশবাটী বিদ্যাসমাজের দীর্ঘ দিনের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস শেষ হয়ে যায়।

অনুমান ১১৯৬ খ্রিঃ বাঁশবেড়িয়ার ব্রাহ্মণ বিদায়ের এক কৌতুকজনক ফর্দ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে মোট ১৪৪ জনের মধ্যে ২৬ জন ছিলেন ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং ২৪ জন উপাধিধারী কিন্তু ভট্টাচার্য্য নন। বিদায়ের পরিমাণ ২ টাকা থেকে দুই আনা। একশ বছর আগেও বাঁশবেড়িয়ার বহু চতুষ্পাঠী ছিল। ১৩১৬ সনে শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর বাঁশবেড়িয়ার এই বিদ্যাসমাজ একরকম লোপ পেয়ে যায়। এই বিদ্যাসমাজের উদ্দেশ্যেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' লিখেছিলেন :-

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর
যেদিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর।
বিদ্যাবিশারদ কত পন্ডিতের বাস
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।[১১]

এই সমস্ত পন্ডিত ছাড়া বাঁশবেড়িয়ার জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চানন নামে ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের এক পন্ডিত সম্বন্ধেও জানতে পারা যায়। তিনি উনিশ শতকেরই পন্ডিত ছিলেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এই পন্ডিত একদিন স্থানীয় গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন সেখানে দুজন ইংরেজ সাহেবের বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাকবিতন্ডা চলে। জগন্নাথ ইংরেজি জানতেন না, শুধু তাঁদের বাক্যালাপ শোনেন। তারপর অনিবার্য কারণে ঐ দুইজন ইংরেজ সাহেবকে আদালতে উপস্থিত হতে হয়। তাদের সেদিনকার বক্তব্যের সাক্ষী হিসাবে জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ও উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ন্যায়পঞ্চানন ইংরেজি না জেনেও তাদের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জজের সামনে বলতে পেরেছিলেন এতে তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয় যায়। সেই থেকে বাঁশবেড়িয়ার যে ঘাটে এই ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘাটের নাম হয় জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন ঘাট।

সূত্র নির্দেশ

১। নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, বিংশভাগ, কলকাতা, ১৩১৬।

২। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৭, পৃ:-৪৮৫।

৩। ঐ, পৃ:-৪৮৬।

৪। ঐ।

৫। দিনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য - বাঙালীর সারস্বত অবদান, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ:-২২৬।

৬। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, বার্ত্তিক মালা, সোসাইটির পুঁথি বিবরণী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ:-২১৭-১৮।

৭। দিনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য - বাঙালীব সারস্বত অবদান, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ:-২২৬।

৮। ঐ, পৃ:-২৩২।

৯। বিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সংকৃতি, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৭, পৃ:-৪৮৯।

১০। দীনবন্ধু মিত্র, সুরধনী কাব্য, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পৌষ, ১৩৫৯, কলকাতা, পৃ:-১০৬।

১১। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৭।

দার্জিলিং-এ নেপালী ভাষার প্রসার ও পরশমণি প্রধান

প্রবাল সেনগুপ্ত

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজার সঙ্গে সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় লেপচা জাতি অধ্যুষিত এই জনবিরল অঞ্চলটিতে ঔপনিবেশিক উদ্যোগ জাত 'চা' এবং অন্যান্য শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হিসাবে নেপাল আগত গোর্খাদের অভিপ্রয়াণ ঘটতে থাকে, ১৮৪০ সাল থেকেই। যার ফলে ১৯০১ সালের জনগণনাতেই দেখা যায় যে এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ৭০%-ই নেপালী জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই বিপুল জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির কেন্দ্রীক ধর্মীয় শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেলেও, আধুনি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে গড়ে ওঠেনি। এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বৃটিশ সরকারের চরম উদাসীনতা ও অবহেলা। যাইহোক, পরবর্তীকালে স্কটিশ মিশন চার্চ ও রেভারেন্ড ম্যাকফারলেনের মত সমাজ সংস্কারক মানুষদের চেষ্টায় পাহাড়ী অঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিস্তৃত পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালের 'উড্স ডেসপ্যাচের' সুপারিশ অনুযায়ী, ঔপনিবেশিক সরকারও দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয় সহ কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সীমিত হলেও কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করে।

এইভাবে দার্জিলিং-এ কাজ চালানো গোছের একটি পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে উঠলেও, প্রথম থেকেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরাজী ও হিন্দি। এছাড়া পুরোপুরি সরকারী শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে বাংলা ভাষাও পড়ানো হত। আশ্চর্যের বিষয়, বৃহত্তর পাহাড়ী জনতার মাতৃভাষা নেপালীর কোন স্থান ছিলনা এই শিক্ষা ব্যবস্থায়। ম্যাকফারলেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাদ্রী গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে সচেষ্ট হলেও, উপযুক্তপাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং সরকারী অনীহার জন্য, তাঁর সেই প্রচেষ্টা খুব একটা সাফল্য অর্জন করেনি। পরবর্তীকালে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালী ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় এককভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ডঃ পরশমনি প্রধান। এ'দিক থেকে তাঁকে আমরা 'পাহাড়ের বিদ্যাসাগর' বলে অভিহিত করতে পারি।

পরশমনি প্রধানের এই অবিস্মরণীয় অবদানের বীজ তাঁর শৈশব শিক্ষার অভিজ্ঞতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল। ১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী কালিম্পংএ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

পিতা ভাগ্যমণি প্রধান। ভানুভক্ত রামায়ণ সহ ধ্রুপদী নেপালী সাহিত্যের একজন পন্ডিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পিতার সাহচর্যে ছোটবেলা থেকেই নেপালী সাহিত্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জেগে ওঠে পরশমণির মনে। (পরবর্তীকালে যখন তিনি পুডুং প্রাথমিক পাঠশালায় ভর্তি হন, তখন সেখানে নেপালীর বদলে হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা দেখেই, বাইরের জগতে নেপালী ভাষার দুরাবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন পরশমনি। এরপরে স্কট মিশনের নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ও হিন্দি এবং ইংরাজী পড়বার সুযোগ পেলেও তিনি নেপালী ভাষা চর্চার কোন সুযোগ পাননি। ১৯১৩ সালে পরশমনি দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানেও হিন্দি মাধ্যমে পডাশোনা করেই তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।)

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা পড়বাব সুযোগ না পেলেও, মাতৃভাষা প্রেমিক পরশমণি বেনারস থেকে প্রকাশিত 'চন্দ্র', 'গোর্খালী' ইত্যাদি নেপালী সাহিত্য পত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ১৯১৫ সাল থেকেই তিনি এই সমস্ত পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'যুগলাঙ্গুরীয়' নেপালী ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজ ভাষার প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা এই সময় লেখা একটি কবিতায় তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'গোর্খা ভাষোন্নতি গরনো হুঙ্কু সঁদৈব তৎপর/ জসমা হাম্রা অতিশুদ্ধ ভাষা বড়োস্ সরাসর।'

এই সময়ই দার্জিলিং থেকে পাদ্রী গঙ্গাপ্রসাদের চেষ্টায় 'গোর্খে খবর কাগত' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকাটিতেও পরশমনি প্রধান নেপালী ভাষার প্রসার ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালীর স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, মিত্রবাহিনী তথা ইংরাজ সরকরের সমর্থনে দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে ১৯১৫ সালে একটি জমায়েতের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের ইংরাজীর পাশাপাশি বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুভাষা কেন্দ্রীক বিনোদনের ব্যবস্থা হলেও, পাহাড়ের মানুষের মুখের ভাষা নেপালীর মাধ্যমে কোন অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পরশমণির নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের প্রধান শিক্ষকের কছে নেপালী ভাষা কেন্দ্রীক অনুষ্ঠান করার দাবী জানায়। নিমরাজী প্রধান শিক্ষক শেষ পর্যন্ত এই দাবী মেনে নিলে সেই প্রথম একটি সরকারী মঞ্চে নেপালী ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রীক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে এই সময় যে পুস্তকালয় ছিল, তাতে নেপালী ভাষায় রচিত একটি পুস্তকও ছিল না। এই অবস্থার প্রতিবিধান কল্পে ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে তিনি 'গোর্খাসাহিত্য সমাজ' নামে একটি পুস্তকালয় গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় ছাত্রদের নিজ ভাষা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট হন।

১৯১৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করতে গেলে দশম শ্রেণীর ছাত্র পরশমণির নেতৃত্বে নেপালী ভাষী ছাত্রদল হিন্দি ও বাংলার পাশাপাশি ছাত্র যাতে নেপালী ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা ও পরীক্ষা দিতে পারে, তাব জন্য উপাচার্যের কাছে আবেদন জানান। এরপর ২৪শে জুলাই কোলকাতা গেজেট প্রকাশিত আদেশনামা অনুযায়ী নীতিগতভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদিত

ভাষা হিসাবে নেপালী ভাষা স্বীকৃতি পায়।

তরুণ পরশমণি সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন, অন্যান্য অগ্রসর ভারতীয় ভাষার সমতুল্য হিসাবে নেপালী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকি অনুমোদনই যথেষ্ট নয়। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য তিনি ১৯১৭ সালেই কার্সিয়াং-এ 'গোর্খা লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া শুদ্ধভাবে নেপালী ভাষা ব্যবহার ও প্রচারের জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'গোর্খা অ্যামেচার ক্লাব' ও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কাজে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীমণিনারায়ণ প্রধান। এর পাশাপাশি নেপালী ভাষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাদি প্রণযণ করবার জন্য পরশমণিব উৎসাহে হরিসিং থাপা, টেকবীর রাই, কীর্তিমান প্রধান, বলবাহাদুর ছেত্রী প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সমবেতভাবে কার্শিয়াংএ 'হরি প্রিন্টিং প্রেস' নামে একটি মুদ্রণালয়ও স্থাপন করেন এই সময়েই। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বব মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে পরশমণি এই প্রেসেব ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। এই মুদ্রণালয় থেকেই ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাস হতে পরশমণির সম্পাদনায় নেপালী সাহিত্য পত্রিকা 'চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নেপালী ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতার হ্রাস ঘটিয়ে, একরূপতা আনয়নের জন্য সচেষ্ট হন।

ইতিমধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা শ্রেণীতে নেপালীকে অন্যতম পাঠ্যভাষার স্বীকৃতি দিলে, পরশমণি কালিম্পং-এব বিখ্যাত স্কটিশ ইউনিভার্সিটি মিশন হাইস্কুলে নেপালী ভাষার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তহন। তবে এব পাশাপাশি তিনি 'চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদনাও করতে থাকেন। শিক্ষকতার কাজ করতে করতেই তিনি ছাত্রদের শুদ্ধ নেপালী ভাষা শিখাবার জন্য একটি ছাত্র পাঠ্য নেপালী ব্যকরণ বই লিখে ফেলেন। ১৯২০ সালে তৎকালীন বাংলা সরকারের শিক্ষা দপ্তর এই বইটিকে অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকের স্বীকৃতি দেয়। এর পরবর্তীকালে নেপালী মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরশমণি 'নেপালী পহিলো কিতাব', 'সও অক্ষর', 'নেপালী সজিলো সাহিত্য' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক লেখেন।

১৯১৮ সালের ২৪শে জুলাই একটি বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয় নেপালী ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে স্বীকৃতি দিলেও, দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক অচ্যুতনাথ অধিকারী নিজ বিদ্যালয়ে এই ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে টালবাহানা করছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে পরশমণি তার 'চন্দ্রিকা' পত্রিকার মাধ্যমে সরকারী বিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়ে, তীব্র জনমত গড়ে তোলেন, সেই সময় তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ডব্ল্যু. ডব্ল্যু. হর্ণেল দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনে এলে, তাব সঙ্গে পরশমণির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। একজন ভাষা প্রেমিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে পরশমণির কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে শিক্ষা অধিকর্তা ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে দার্জিলিং জেলার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে নিযুক্তকরেন।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে যোগদান করেই পরশমণি প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে নেপালী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করতে সচেষ্ট হন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৯২০ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে পার্বত্য দার্জিলিংএর প্রাথমিক

স্তরের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক-এর তালিকা প্রণয়ণ করতে সচেষ্ট হয়। প্যারিচরন সরকারের 'ফারষ্ট বুক' এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' এর আদর্শে পরশমনি নিজে এইসময় নেপালী ভাষায় 'পহিলো কিতাব' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু দার্জিলিং জেলার সেইসময়কার বিদ্যালয় পরিদর্শক-প্রিয়নাথ হোড় উক্ত বইটি সহ পরশমণি রচিত সমস্ত পাঠ্য পুস্তক গুলিকেই নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করলে, প্রাথমিক ভাবে বাংলা সরকারের অনুমোদন লাভে পুস্তকগুলি ব্যর্থ হয়। স্বীকৃতি লাভে আপাতভাবে ব্যর্থ হয়েও, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক পরশমণি, শিক্ষাবিভাগ নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তোলেন। ইতিমধ্যে দার্জিলিং অঞ্চলের স্কটিশ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয় গুলিতে পরশমণির বইগুলি পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহিত হয়। পরিশেষে ১৯২৬ সালে শিক্ষা অধিকর্তা ই. এফ. ওটেনের আদেশ অনুযায়ী দার্জিলিংএর সমস্ত বিদ্যালয়েই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয় পরশমণির পুস্তকগুলি। এইভাবে নেপালী ভাষা প্রসারের প্রাথমিক লড়াইএ জয়ী হন পরশমণি।

ইতিমধ্যে পরশমণি প্রধানসহ দার্জিলিং-এর অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের চাপে, ১৯২৩ সালেই পন্ডিত ধরণীধর শর্মা এবং সূর্যবিক্রম জাবালী, দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দুইজন ভাষাপ্রেমী পরশমণির সহযোগী হিসাবে কাজ শুরু করলে, নেপালী ভাষা প্রসার আন্দোলনে নতুন জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই তিন বুদ্ধিজীবি অনুভব করেন যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নেপালী ভাষাকে স্থান করে নেওয়ার জন্য, অন্যান্য অগ্রসর ভাষাগুলোর মত নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের অতি দ্রুত সমৃদ্ধি সাধন করতে হবেই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এঁদের পরিচালনায় ১৯২৪ সালের ২৫শে মে, দার্জিলিং শহরের হিন্দু পাবলিক হলে প্রায় আড়াইশো বুদ্ধিজীবির উপস্থিতিতে 'নেপালী সাহিত্য সম্মেলন' নামক সাহিত্য সংগঠনের জন্ম হয়। সমাবেশে পরশমণি নেপালী সাহিত্যের উন্নয়ণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নেপালী ভাষা চর্চার সোপান-হিসাবে এই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম সচিব নির্বাচিত হন তিনি। ১৯২৪ সাল থেকেই তাঁর নেতৃত্বের নেপালী সাহিত্য সম্মেলন বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি কাব্য, গদ্য, সমালোচনা, সাহিত্য ইত্যাদি নেপালী ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করে। এই সমস্ত নব রচিত সাহিত্য কর্মের মধ্যে, 'নেপালী সাহিত্য কথামালা', 'নৈবদ্য কাব্য সংকলন', 'মন-লহরী', 'কবি ভানুভক্তকা জীবন চরিত' আধুনিক ভারতীয় নেপালী সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাফল্যের পাশাপাশি পরশমণির জীবনে আবার দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসে এই সময়ে। সরকারে শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও, বেসরকারী সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার হাস্যকর অভিযোগে জেলার শিক্ষা পরিদর্শক তার বেতন কমিয়ে দেন। অদম্য পরশমণি নেপালী ভাষাকে সমৃদ্ধতর করবার লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯২৬ সালেই সরকার বাংলা, উর্দু এবং হিন্দির পাশাপাশি নেপালী ভাষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষণীয় ভাষার স্বীকৃতি দেয়। তা দার্জিলিং জেলার শিক্ষা অধিকর্তা

প্রিয়নাথ হোড়ের বিরোধীতার কারণে পাহাড়ের বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ মাত্রায় নেপালী ভাষা তখনই চালু করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই পরশমণি প্রিয়নাথ বাবুর এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। ফলস্বরূপ প্রিয়নাথ বাবু তাঁকে দার্জিলিং এর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ থেকে সরিয়ে দেন এবং পরশমণি এর পর জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষকের পদে বদলী নিতে বাধ্য হন। ১৯৩১ সালে অবশ্য তিনি জলপাইগুড়ি থেকে পুনরায় বদলী হয়ে দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক পদে যোগ দেন।

দার্জিলিং-এ ফিরে আসার পরে পরশমণি নেপালী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে সাহিত্যের অনত্যতম ধারা নাট্য আন্দোলন শুরু করেন, এবং 'সুন্দর কুমার' 'হরিশচন্দ্র' প্রভৃতি নাটক রচনা এবং সফল ভাবে মঞ্চস্থ করে পাহাড়ের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে পুষ্ট করে তোলেন। তাঁর এই নাট্য আন্দোলন আসলে তাঁর জীবনব্যাপী মাতৃভাষা সাধনারই অংশ ছিল।' এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী ও ভাষা প্রেমী হিসাবে তাঁর নাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং এরই ফলস্বরূপ ১৯২৮ সালে তিনি প্রথমে লন্ডনের 'রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি' এবং কিছু পরে গ্রেটব্রিটেনেব 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য নির্বাচিত হন।

পরশমণি নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রথম জীবন থেকেই নেপালী মুদ্রণালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। প্রথম জীবনে 'হরি প্রিন্টিং প্রেসের' অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ১৯২৮ সালে 'মণি প্রেস' নামে একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেন এবং উক্ত মুদ্রণালয়ে নেপালী ভাষার পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ছাপতে শুরু করেন। এই সময়ই তিনি তাঁর ভাই শেষমণি প্রধানের সহায়তায় 'আদর্শ' নামে একটি নেপালী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মণি প্রেস থেকেই ইন্দ্রমণি রাইয়ের 'জীবন লীলা', তারানাথ শর্মার 'রাঘব বিলাপ' এবং রুদ্ররাজ পান্ডের 'রূপায়িত' শীর্ষক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

কতিপয় শিক্ষা অধিকারীর চক্রান্তে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ থেকে অবসৃত করে পরশমণিকে সরকারী বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষকের পদে বদলী করা হয়। কিছুদিন জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয়ে কাজ করাবার পর, তিনি দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ে বদলী হন। শিক্ষক পরশমণি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্ব-ভাষা ও সাহিত্য বোধের বিকাশের পাশাপাশি আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরশমণির প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইন্দ্র সুন্দাসের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাতীয় পোষাক 'দাওরাসুরুবাল' পরিহিত পরশমণি নির্দিষ্ট ঘন্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করতেন এবং পাঠশুরুর আগে ছাত্রদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধির জন্য তাদের নিয়ে সমবেতভাবে ধ্যান করতেন। ছাত্রদের কোন অবস্থাতেই কোনরকম শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর অন্যতম ছাত্র বাবুলাল প্রধানের কথানুযায়ী বিদ্যালয়ের সময়ের বাইরেও ছাত্রদের পড়াশোনা সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান করতেন তিনি। তাঁর চেষ্টা এবং উৎসাহেই ১৯৩১ সাল থেকে দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয়ের নিজস্ব ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকায় নেপালীর পাশাপাশি ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু এবং তিব্বতীয় ভাষার রচনাদি প্রকাশিত হত। ছাত্রদের উপযোগী করে

এবং তাঁদের নেপালী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহিত করার জন্য পরশমণি বিদ্যালয় পত্রিকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এইসব লেখাগুলির মধ্যে 'সাহিত্য কে হো ?', 'কবির' কবিতা' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয়ের কাজের পাশাপাশি নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের কাজেও এই সময় পরশমণি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালে ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে, নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে পরশমণি দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাষার প্রসার সংক্রান্ত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশের দায়িত্বও তিনি পুরোপুরি নেন এই সময়ই। এছাড়া, তিনি দার্জিলিং পাহাড়ে প্রচলিত অন্যান্য ভাষা, যেমন লেপচা, ভুটিয়া, মগর, লিম্বু ইত্যাদির উন্নয়ণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ১৯৩৩ সালে নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে এই বিষয়ে তিনি জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালেই গোর্খাজাতিব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ণের লক্ষ্যে দার্জিলিং-এ 'গোর্খা দুখ নিবারক সম্মেলন' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালে এই সংগঠনের অধিবেশনে পরশমণি ভারতীয় নেপালী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিল্প-সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এপ্রসঙ্গে তিনি কোলকাতায় তঁর সঙ্গে জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও সি.ভি. রামণের মত বৈজ্ঞানিকদের আলোচনা ও কথাবার্তার কথা তুলে ধরে, নেপালী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের কথাও তুলে ধরেন।

১৯৩৪ সালে নেপালী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে পরশমণি নেপালী ভাষা উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে ঔপনিবেশিক সরকারের নিস্পৃহতাকে দায়ী করলে, জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর রুষ্ট হন। সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখার অভিযোগে দার্জিলিংএর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ ল্যাডেন-লা তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে, পরশমণি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, শিক্ষার সর্বস্তরে নেপালী ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য সরকারের আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। ল্যাডেন-লা সাহেব তাঁর এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন এবং ব্যাপারটির এখানেই নিষ্পত্তি ঘটে।

এর পরে পরশমণির চেষ্টায় পাহাড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাসমূহ একজোট হয়ে সরকারের কাছে শিক্ষার সর্বস্তরে নেপালী ভাষাকে মাধ্যম করার দাবী জানিয়ে স্মারক পত্র প্রেরণ কবে। উক্ত স্মারক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকাবের সচিব মিঃ মার্টিন ১৯৩৮ সালের মধ্যে পার্বত্য দার্জিলিং-এ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে নেপালী মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে নীতিগতভাবে রাজী হন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযোগী নেপালী পাঠ্য-পুস্তকের অপ্রতুলতার প্রতি এখানকার বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরশমণির নেতৃত্বে মাধ্যমিক পর্যায়ের পুস্তক প্রকাশিত হতে শুরু করে। তাঁর একক চেষ্টাতেই প্রায়, নেপালী সাহিত্য পুস্তক ছাড়াও, বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেমেন্দ্র কুমার সেনের বিজ্ঞান পুস্তক, অনাথনাথ বসুব ভূগোল পুস্তক, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর ইতিহাস বই এবং যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর গণিত বই নেপালী ভাষায় অনুদিত হয়। দার্জিলিংএর

তৎকালীন বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক কৃষ্ণবাহাদুর গুরুং এর চেষ্টায় শিক্ষাবিভাগ থেকে এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন পাওয়া যায়। এরপরে ১৯৩৯ সাল থেকেই দার্জিলিং পাহাড়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নেপালী মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়ে যায়। মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে নেপালী মাধ্যম স্বীকৃতি পেলেও আইনগত জটিলতার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্রবেশিকা-পরীক্ষায় নেপালী মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ১৯৩৯ সালেই পরশমণি বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। বাংলা আইনসভার অন্যতম সদস্য বর্ধমান মহারাজা উদয়চন্দ্র মহাতাব এই দাবী তোলেন আইনসভার মধ্যে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দার্জিলিং জেলার বিধায়ক ভম্বর সিং গুরুং-ও এই অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। শ্রীগুরুং এবং পরশমণি তাঁদের দাবী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী 'সিনেট' সদস্য অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেন। সুনীতি কুমারের পরামর্শ অনুযায়ী তারা নেপালী ভাষার বিভিন্ন পুস্তক ও অভিধান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। সুনীতিকুমার নেপালী ভাষার ন্যায্য দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে, উক্ত ভাষায় আরো পুস্তকাদি রচনার জন্য বাংলার নেপালী বুদ্ধিজীবিদের আহ্বান জানান।

১৯৩৯ বিশিষ্ট নেপালী ভাষী-বুদ্ধিজীবি এইচ্.পি. প্রধান, মাণিকচন্দ্র প্রধান, ধনবীর মুখিয়া সহ্ পাহাড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দার্জিলিং-এ শিক্ষার সর্বস্তরে নেপালী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এই্ সমস্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালী ভাষার দাবী পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে সমস্ত বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। ভারত স্বাধীন হবার পরে ১৯৪৮ সালে, সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষা সচিব ডঃ ডি.এম সেনের একটি আদেশনামা অনুযায়ী, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নির্দেশনামা প্রকাশের পর, ১৯৫০ সালে পরশমণির নেতৃত্বে পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নেপালী ভাষার স্বীকৃতির দাবী জানানো হয়।

ইতোমধ্যেই নেপালী বুদ্ধিজীবিরা আচার্য সুনীতি কুমারের পরামর্শ অনুযায়ী, সৃজনশীল সাহিত্য এবং শব্দকোষ প্রণয়নে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। একই সময়ে পরশমণি সম্পাদিত 'ভারতী' সহ অন্যান্য নেপালী সাহিত্য সাময়িকীগুলোরও মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৫৩ সালের ২০শে এপ্রিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়। সেই বছরেরই মে মাসে, দার্জিলিংএর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ একটি যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেপালী ভাষায় আরো সৃজনশীল সাহিত্য রচনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীকভাবে অলাভজনক হওয়ার আশংকায় কোলকাতা ও বেনারসের

পুস্তক প্রকাশকেরা নেপালী পুস্তক ছাপতে খুব একটা আগ্রহী না হওয়ায়, প্রচেষ্টাটি খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্যই পরশমণি একক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিং-এ মণি প্রিন্টিং প্রেস নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। ভারতীয় নেপালী উপন্যাস, জীবনী গ্রন্থ, গল্পসংগ্রহ ছাড়াও এই প্রকাশনা থেকেই রবীন্দ্র রচনাবলীর নেপালী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া পরশমণি সম্পাদিত বিখ্যাত নেপালী পত্রিকা 'ভারতী' ও প্রকাশিত হত এখান থেকেই। 'ভারতী' প্রকাশের উদ্দেশ্য জানিয়ে পরশমণি লিখেছিলেন, 'নেপালী কা ঘর ঘর/মহাজ্ঞান কো/হোস্ প্রচার/নেপালী হুন পৃথিবী তলমা/বিদ্যতা কি ভাণ্ডার।" এই সময় ভারতী পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি 'নেপালী ভাষাকে উৎপত্তির বিকাশ', 'নেপালী চলতো উত্থান', 'নেপালী পারিভাষিক শব্দ কোষ' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

এদিকে রাজ্য পুর্ণগঠন আয়োগের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাংলা ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল আনা হয়। এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে দার্জিলিং-এর তৎকালীন বিধায়ক ভদ্র বাহাদুর হামাল, বাংলার পাশাপাশি দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে নেপালীকেও অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানান। প্রবাদ প্রতীম কমিউনিষ্ট নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং কংগ্রেস নেত্রী মায়াদেবী ছেত্রীর নেতৃত্বে এই দাবী পাহাড়ে ভাষা আন্দোলনের রূপ নেয়। এই সময় পরশমণি রাজনীতির মানুষ না হয়েও, এই আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানান। নেপালী ভাষাকে যাতে সহজেই সরকারী কাজে ব্যবহার করা যায়, সেইজন্য তিনি সরকারী কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রশাসনিক শব্দের নেপালী সমার্থক শব্দ এবং বাক্যবন্ধ সমন্বিত 'হ্যান্ডবুক অব্ অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স, ড্রাফটিং, নোটিং ইন নেপালী' নামে একটি বই রচনা করেন। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ভাষা আইন অনুযায়ী বাংলার পাশাপাশি, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে নেপালীও অন্যতম সরকারী ভাষার মর্যাদা পাওয়ার পর, এই বইটি দার্জিলিং এর সরকারী কার্যালয়গুলিতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হত।

১৯৫৬ সালে দেরাদুনের মিলিটারী কলেজের অধ্যাপক আনন্দ সিং থাপা নেপালী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশীলভুক্ত করাব জন্য সর্বপ্রথম ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানান। তার জন্য ও প্রয়োজনীয় সাহিত্য একাডেমির স্বীকৃতি পাবার জন্য ১৯৬৩ সালেই তাই পরশমণি দার্জিলিং-এ ভ্রমণরত সাহিত্য একাডেমীর তৎকালীন সভাপতি ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এ সংক্রান্ত আবেদন জানান। এই দাবী বিবেচনার জন্য ডঃ চট্টোপাধ্যায় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে পরশমণি দেখান যে, ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১২ লক্ষ, ৮৬ হাজার, ৮২৪ জন ভারতবাসীর মাতৃভাষা নেপালী একটি ঐতিহ্যমন্ডিত এবং সৃজনশীল ভাষা। তাই এই ভাষা অবশ্যই সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক স্বীকৃতিযোগ্য। এই কমিটির সদর্থক সুপারিশে সাড়া দিয়ে সাহিত্যএকাডেমীর পরিচালন পর্ষদে নেপালী ভাষার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন পরশমণি। ইতিমধ্যেই নেপালী ভাষা

প্রচারের অক্লান্ত সৈনিক হিসাবে তিনি দার্জিলিং-নেপালী-একাডেমীরও অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে সিকিমের ভারত ভুক্তির পর, সেখানকার প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্যের আহ্বানে তিনি সিকিমে যান। এবং কিভাবে সরকারী কাজে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেপালী ভাষী অধ্যুষিত সিকিমে ওই ভাষার প্রচার ও প্রসার ঘটান সম্ভব সে সম্বন্ধে সিকিম প্রশাসনকে অবহিত করেন।

ওই সময়েই অনেপালী ভারতীয়দের, নেপালীভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজী ভাষায় চারজন বিখ্যাত নেপালী ভাষী সাহিত্যিকের জীবনী রচনা করেন। এই চারটি পুস্তকের অন্যতম 'আদিকবি ভানুভক্তআচার্য' পুস্তকের ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতিবসু এই প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নেপালী এবং অনেপালীদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো দৃঢ় হবে বলে মত প্রকাশ করেন। ১৯৭৭ সালেই কোলকাতায় ভাষাগত এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় পরশমণি বক্তব্য রাখেন এবং নিজ ভাষণে বিভিন্ন ভাষায় মূলগতঃ ঐক্যর বিষয়টি তুলে ধরেন। আসলে আজীবন নেপালী ভাষার সাধক হলেও, পরশমণি সারাজীবনই প্রকৃত অর্থে একজন ভারতীয় ছিলেন। তাই সমস্তরকম আঞ্চলিক ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি লিখতে পেরেছিলেন-"ভারত হাম্রো, দেশ ছ' রামরো/ মুকুট হিমালয় যস্কো/ ত্রস্তো রামরো ভারতমথি/ ভক্তি, ন' হোলা কস্কো/"

ভারতবর্ষের নেপালী সাহিত্য এবং নেপালী ভাষা প্রচার ও প্রসারের লড়াইএ পরশমণি একাই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে ছিলেন। সৃজনশীল সাহিত্যের উপরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি শিশুপাঠ্য কিতাব সমূহ রচনা করে, তিনি নেপালী ভাষার ভিত্তিকেও সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয় বা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিত পাষাণ' নেপালীতে অনুবাদ করে। তিনি যেমন একদিকে প্রতিবেশী সাহিত্যধারার সঙ্গে নেপালী সাহিত্য প্রেমীদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। তেমনি ভাবেই মোঁপাসার 'দ্য নেকলেশ' বা চেকভের 'ডারলিং' ইত্যাদি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করে নেপালী সাহিত্যের অঙ্গনে, বিশ্ব সাহিত্যিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

নেপালী মাধ্যমের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাতো প্রায় একক ভাবেই পরশমণির সৃষ্টি। বাংলাভাষী মানুষদের কাছে 'বিদ্যাসাগর' এর বর্ণ পরিচয় যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী, ভারতীয় নেপালী ভাষী মানুষদের কাছে পরশমণির 'পহিলো কিতাব' সেই রকম মর্যাদারই অধিকারী। পাহাড়ের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজ মাতৃভাষা নেপালীর মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে, তাঁর জন্য ছাত্রজীবন থেকে পরশমণি যে লড়াই শুরু করেছিলেন, ১৯৮৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই লড়াই ছিল অব্যাহত। দার্জিলিং এর প্রথম ইংরাজ প্রশাসক হুক্কারের মত অনুযায়ী, 'আধা বর্বর (!)' ভারতীয় নেপালীদের ভাষা ও সংস্কৃতি পরশমণির হাত ধরে আজ বিশ্বসভায় অন্যান্য ভাষার সমমর্যাদা লাভ করেছে। সংবিধানের অষ্টম তফশীল ভুক্ত হয়ে, অন্যতম জাতীয় ভাষার মর্যাদাও আজ পেয়েছে ভাষাটি। পশ্চিমবঙ্গের মাতৃভাষা আন্দোলনের এই প্রায় অনালোচিত অধ্যায়ের নায়ক ছিলেন পাহাড়ের বিদ্যাসাগর পরশমণি প্রধান।

সূত্র নির্দেশ

১। বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার দার্জিলিং -ও'ম্যালি, নু. দিল্লী, ১৯৮৯।
২। বেঙ্গল ডিসট্রিকট গেজেটিয়ার - দার্জিলিং - এ.জে. দাস, কল, ১৯৪৭।
৩। এ' কনসাইস হিষ্ট্রি অব দার্জিলিং সিন্স ১৮৩৫ - ই.সি. দোজে, কল, ১৯৮৯
৪। এ' ষ্টুডেন্টস্ হিষ্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়ার - নকল্লাও নায়েক, দিল্লী, ১৯৭৪।
৫। দার্জিলিং এ ফেবারড্ ব্রিটিশ - জহর সেন, দিল্লী, ১৯৮৯।
৬। এ' সর্ট হিষ্ট্রি অব নেপালী ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচর - পি. এম প্রধান, কালিম্পং, ১৯৭০।
৭। ডাঃ পবশমণিকো জীবনযাত্রা - নগেন্দ্রমণি প্রধান, দার্জিলিং, ১৯৯১।
৮। পহিলা প্রহর - কুমার প্রধান, দার্জিলিং, ১৯৮২।
৯। দার্জিলিং - নরবাহাদুর গুরুং, কালিম্পং, ১৯৭১।
১০। খরসাং : হিজো-র আজো - শান্তিরাজ শর্মা, কার্শিয়াং, ১৯৭০।
১১। পরশমণি প্রধান অভিনন্দন গ্রন্থ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সং-শিবপ্রধান, গ্যাংটক, ১৯৮৪, ১৯৮৫।
১২। পবশমণি প্রধান জন্মশতবার্ষিক মহোৎসব সংকলন - নেপালী সাহিত্য অধ্যয়ণ সমিতি, কালিম্পং, ১৯৯৮।
১৩। 'চন্দ্রিকা' - ডাঃ পরশমণি প্রধান বিশেষাংক, দার্জিলিং, ১৯৯৮।
১৪। 'দিয়ালো'-পরশমণি প্রধান বিশেষাংক, দার্জিলিং, ১৯৮৭।
১৫। নেপালী সাহিত্য সম্মেলন কো স্বর্ণজয়ন্তী, সং আর পি লামা দার্জিলিং, ১৯৮৪।
১৬। ভারতেলী নেপালী পত্র-পত্রিকাকো শতাব্দী (১৮৮৭-১৯৮৬) - হিরা ছেত্রী, রমফু (সিক্কিম), ১৯৯৩।
১৭। আফনো বারে - পরশমণি প্রধান, ললিতপুর, ১৯৭২।

এছাড়াও চন্দ্রিকা, দিয়ালো, হিমালুচুলি, হাম্রোধ্বনি, গোর্খা, অব্দিয়ো, হাম্রো অস্তিত্ব এবং পাইনস এণ্ড ক্যামেলিয়াজ ইত্যাদি নেপালী পত্র পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) ও বাঙ্গালীর ইতিহাস-চিন্তা

করবী মিত্র

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ, ঘটনাবলী ও ফলাফল সকলেরই জ্ঞাত। এই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর ইতিহাসচিন্তায় সেই যুদ্ধের প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছিল, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস চেতনায় মহারাষ্ট্রের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আঠার শতকের দ্বিতীয়ভাগে রচিত কবি গঙ্গারামেব 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'[১] প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও এডোয়ার্ড, সি, ডিমক সম্পাঃ 'দ্য মহারাষ্ট্র পুরাণঃ এ্যান এইট্টিন্থ্ সেনচুরি বেঙ্গলী হিস্টরিক্যাল টেক্সট', হনলুলু, দ্য এসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ, ইষ্ট ও ওয়েষ্ট প্রেস, ১৯৬৫ থেকে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ঐতিহাসিক ডঃ প্রাঞ্জলকুমাব ভট্টাচার্য্যের মারাঠা ইতিহাস ভিত্তিক গবেষণা[২] ডঃ প্রাঞ্জল কুমার ভট্টাচার্য্য, 'ব্রিটিশ রেসিডেন্টস এ্যাট পুণা, ১৭৮৬-১৮১৮', কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর সময়কালে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস বাঙ্গালীর মননে বিভিন্নভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন।

মাবাঠা ইতিহাসের বিদগ্ধ সমাজে এই ঘটনার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে[৩] [(ক) আচার্য্য যদুনাথ সরকার, 'ফল অব দ্য মুঘল এম্পায়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৬৬,) (খ) জি, এস, সরদেশাই,'নিউ হিস্ট্রী অব দ্য মারাঠাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, (নিউ দিল্লী, মুনশীরাম মনোহরলাল প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬)] কিন্তু বাঙালী সাহিত্যিকেব কলমে এই যুদ্ধ একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে জটিলতা মনস্বী সমাজকে বিব্রত কবে তুলেছিল, এই যুদ্ধেব ঘটনাকে অবলম্বন করে সেই সমস্যার রূপরেখা তাঁরা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি, জাতীয়তাবাদের প্রসার ও সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনের মত কঠিন বিষয়টি ও যথোচিত গুরুত্ব লাভ করেছে।

কালানুক্রমিকভাবে পানিপথ কেন্দ্রীয় সাহিত্য কীর্তিগুলির আলোচনার প্রথমে আসে কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' (১৩১১ বঙ্গাব্দ/১৯০৪ খ্রি:) মহাকাব্যের প্রসঙ্গ। কাশীরাজ

পণ্ডিতের পানিপথের বিবরণ থেকে তিনি এটি রচনা করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন[৪] [কায়কোবাদ , 'মহাশ্মশান', (ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৭৪), ভূমিকা]। এই মহাকাব্য রচনার পটভূমি ছিল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও নব্যহিন্দুবাদের বিপরীতে বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ। কবি 'পূর্ব্ব পুরুষদের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'[৫] [তদেব, ভূমিকা] হিসাবে পাণিপথের ঘটনাকে বেছে নিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক তুলে ধরার পাশাপাশি দৈনন্দিন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের জটীলতা ও অবশ্যম্ভাবী বঙ্গবিভাগের সমস্যা তাঁকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, উপলব্ধি এবং স্বচ্ছ চিন্তাধারার, সার্থক রূপায়ণ মহাকাব্যটিতে ঘটেছে। 'ভারতীয় হিন্দু' বনাম 'বিদেশীয় মুসলমান' শীর্ষক সমস্যাকে তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন -

"মুসলমান ম্লেচ্ছ নহে, নহে নীচ জাতি,
অনর্থক গালি কেন দেও তাহাদেরে ?
একই পিতাব পুত্র হিন্দু-মুসলমান
ভারতের প্রিয়পুত্র - সবি এক জাতি [৬]।" [তদেব, পৃ:-২৬৮]

বিশ্ব-ইসলামবাদের জয়জয়কারের যুগেও তাঁর জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রখর। তিনি আফগান জাতির আহমদ শাহ আবদালীর 'বিদেশী' অস্তিত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাকাব্যে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা কর্তৃক আবদালীকে সমর্থনের ঘটনায় তাঁর প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি শিকড়কে নাড়া দিয়েছে :-

"বিদেশী আব্দালী সনে সমর প্রাঙ্গণে
ভারতের বীরপুত্র কেন সংমিলিত
বিদারিতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বক্ষ ভারতের
...স্মরণে ও শিহরে হৃদয়
পুত্র হয়ে জননীর জীবন সংহাব ? [৭] [তদেব, পৃ:- ২৫৭-২৫৮]

কিন্তু সমকালীন মুসলিম বিদগ্ধ সমাজে মহাকাব্যটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল[৮]। আনিসুজ্জামান ক) 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৭৫৭-১৯১৮', (ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ), পৃ:-২২৬); খ) 'মুসলিম বাংলার সামাজিক পত্র ১৮৩১-১৯৩০', (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ,) পৃ:-৫২]। এঁরা মূলত: কায়কোবাদেব বচনার 'অনৈস্লামিকতা', 'অশ্লীলতা' প্রভৃতি ত্রুটি নির্দেশ করেছিলেন।

আধুনিক বিশ্লেষণে কায়কোবাদ হিন্দু মুসলিম বিভেদের উর্ধ্বে এক rational দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিহাসের সত্যকে কাব্যের খাতিরেও অতিক্রম করেননি। তাঁর বর্ণনায় "একপক্ষে পাণিপথ যেমন হিন্দু গৌববের সমাধিক্ষেত্র অপর পক্ষে সেইরূপ মুসলমান গৌরবেরও মহাশ্মশান"[৯] [তদেব, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা]। উভয় সৈন্যদলের ত্রুটিবিচ্যুতি

সম্বন্ধে তিনি মুখর আবার বীরত্বপ্রদর্শনেও কেউ ন্যূন নয়। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য "একজাতি দেশের জন্য, হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়াছেন, অন্যজাতিও দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য স্বজাতির কল্যানের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, কম কে ? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার্হ"[১০] [তদেব] ভারতের ইতিহাসে হিন্দুমুসলমানের ভূমিকা ও গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে 'বিদেশীয়' চিহ্নিত মুসলমানের আত্ম পরিচয় প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এটি ছিল এক শক্তিশালী যুক্তি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করার জন্য তার সহজ সমাধান

"ত্যজিয়া কলহ স্বার্থ ঝগড়া-বিবাদ
হিংসা-দ্বেষ, পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে
হও বদ্ধ, অচিরেই ফলিবে অমৃত,
ভারত দ্বিতীয় স্বর্গে হবে পরিণত"[১১] [তদেব, পৃ:-২৬৮]

বঙ্গবিভাগের ঠিক পূর্বে যখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা অত্যন্ত জটিল তখন এই সমাধান হয়তো utopian চরিত্রের, কিন্তু এর আশাবাদী দিকটিকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

একই বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত মতিয়র রহমানের 'যমুনা'১২ (১৯০৮) [মতিয়র রহমান খান, 'যমুনা', (ঢাকা, এম রহমান খান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬০)] [১৩] এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'ফিরোজা বেগম১৩ (১৯১৮) [সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'ফিরোজা বেগম', (কলকাতা, মোহাম্মদ বুক এজেন্সী, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ)] নামে উপন্যাস দুটিতে বিশ্ব ইসলামবাদের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উভয় উপন্যাসে কিছু বর্ণনাগত আতিশয্য উপস্থিত যেগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পরিপন্থী বলে মনে হয়।

সুপরিচিত রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কলমে আবদালীর প্রতিনিধি নাজীবউদ্দৌলার চরিত্র মহিমান্বিত। মারাঠাদের লুণ্ঠনপ্রিয়তা, নির্ম্মমতা ও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় জনমানসে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তিনি বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের নাজিমা ফিরোজা বেগম এক দেশপ্রেমিক নারী যিনি পাণিপথের যুদ্ধে নারীবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন, তৎসত্ত্বেও আবদালীকে ভারতীয় মুসলিমের ত্রাণকর্তা হিসাবে কল্পনা বিদেশীয়/ভারতীয় প্রশ্নকেই আবার তুলে ধরেছে। বিষয়টি উপন্যাসের জাতীয়তাবাদী আবেদনকেও ম্লান করেছে।

বাঙালী হিন্দু লেখকের কলমে পাণিপথের যুদ্ধ ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। তাঁরা প্রধানত জাতীয়তাবাদের প্রচার ঘটানোর চেষ্টা করেছেন এবং কিছুটা অতিকল্পনা হিসাবে মারাঠাদের কাউকে কাউকে হিন্দুমুসলিমের মিলনের প্রবক্তাতে রূপান্তরিত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে যথাক্রমে সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'মহারাষ্ট্র' (১৯২৪ খ্রি:) এবং দীনবন্ধুদের 'বালজীরাও' (১৯২৭ খ্রি:) নাটক দুটির উল্লেখ করতে পারি। প্রথম নাট্যকারের যথেষ্ট ইতিহাস সচেতনতা ছিল।

তিনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনুসৃত মারাঠা লুন্ঠননীতির প্রতিক্রিয়াকে এই যুদ্ধের প্রধান কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর কল্পনায় পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এক সর্বভারতীয় "অখণ্ড মহাসাম্রাজ্য"[১৪] [সুধীন্দ্রনাথ রাহা, 'মহারাষ্ট্র', খুলনা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫৯] গঠনে ব্রতী। তিনি সমকালীন জাতীয়তাবাদী আদর্শকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন 'যদি ভারতসাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে হয়-যদি ভারতের রাজনৈতিক একতা স্বপ্ন হতে কার্যো পরিণত করতে হয়-তবে এই লুন্ঠনপ্রিয় নির্ম্মম বৈদেশিকদের চিরতরে ভারতে প্রবেশ রুদ্ধ করতে হবে'[১৫] [তদেব, পৃ:-৮৪] এই বিদেশীদের চিনতে আমাদের ভুল হয় না। তিনি প্রাদেশিক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ওঠার এবং ভারতবর্ষকে 'হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি'[১৬] [তদেব, পৃ: ৮৪-৮৫] হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। পাণিপথের যুদ্ধ পেশোয়ার কাছে জাতীয় বিপর্যয় যার থেকে মুক্তির উপায় "হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর সহায়তা"[১৭] [তদেব, পৃ:-৮৬]।

সমালোচক সুধীন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টিতে মারাঠা নীতি বিশ্লেষিত হয়েছে[১৮] [তদেব]। কিছু মুসলিমের বিদেশী image-কেও তিনি কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে নাটকে তাঁর মুখপাত্র সেনাপতি ইব্রাহিম গার্দী। মলহর রাও হোলকারের স্বার্থান্বেষী নীতির প্রত্যুত্তরে গার্দী এক ভেদ নিরপেক্ষ উন্নত জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তুলে ধরেছেন-'ভারতবাসী হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক - সে ইব্রাহিমের ভাই। আর বিদেশী -হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক যে ইব্রাহিমের শত্রু'[১৯] [তদেব, পৃ:-১৭৮-১৭৯]। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দীনবন্ধু দে-র নাটকেও পাওয়া যায়[২০] [দীনবন্ধু দে, 'বালাজী রাও', কলকাতা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ/১৯২৭ খ্রি:]।

আলোচ্য লেখকদের মধ্যে মোটামুটি ইতিহাস সচেতনতা ছিল। যেটুকু আতিশয্য চোখে পড়ে তা সাহিত্য সৃষ্টির কারণে ঘটেছিল। এঁরা মারাঠা নীতির ক্রটিগুলিব উপর আলোকপাত করার পাশাপাশি সর্বভারতীয় ঐক্যবিধানের কাজে তাদের নীতিকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। হিন্দু লেখকদের উপর নব্য হিন্দুবাদের প্রভাব থাকলেও কায়কোবাদের উপর তার প্রভাব স্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, মারাঠা নীতির ক্রটি থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র চর্চাকারের কাছে তার উপযোগিতা ছিল ভিন্ন কারণে। ব্রিটিশদের আগে তারা একটি ভারত বিস্তারী সাম্রাজ্য গড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ঠিক আগেকার অপরূপ কোন উদাহরণ বাঙালী লেখকের সামনে ছিল না। কাজেই কিছুটা উপায়ন্তর না থাকাতে তাঁবা অষ্টাদশ শতকের মারাঠাদের মুখে বিশ শতকের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের বাণী আরোপ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বান ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি আকাঙ্খা।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর পর্বেব মত academic ভাবে মারাঠা ইতিহাসচর্চা শুরুর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাদেশিক ইতিহাস চর্চার সূচনা, ১৯১৭ খ্রি:) বেশ আগে থেকেই বাঙালী সাহিত্যিক মননে-ভারত-ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে

কেন্দ্র করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল। তাঁদের রচনাগুলিকে আমরা ইতিহাসচর্চার পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি না তবে ইতিহাস শিক্ষার সীমাবদ্ধ অবস্থানের বাইরে শহর, গ্রাম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মাতৃভাষাভাষী মানুষের কাছে ইতিহাসের বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই 'খালিপদ ঐতিহাসিকের' প্রশংসনীয় অবদান ছিল। ইতিহাসকে এঁরা রক্তমাংসের আধারে জীবন্ত করে তুলতেন এবং কিছুটা কল্পনার সংমিশ্রণে ঘটনার গতিকে জনগণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করতেন। জাতীয়তাবোধের গণমুখী প্রসারের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য্য।

সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা

অমল দাশ

ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাস একেবারেই পুরোনো নয়, বরং আধুনিককালের ঘটনামাত্র। আমাদের দেশে মূলধন-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলনও হয়েছিল ইউরোপের তুলনায় বেশ পরে। তাই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। অবশ্য এই ইতিহসচর্চার গতি ইউরোপের তুলনায় ছিল অত্যন্ত মন্থর।

বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে চটকল ও বস্ত্র শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল - একটি ধনী মালিক শ্রেণী এবং অন্যটি খেটে-খাওয়া সাধারণ শ্রমিক। ভারতে শিল্পায়ণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, মালিক-শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠল। নতুন সামাজিক শ্রেণী, হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে তাদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক মানচিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিককালে ভারতের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার আলোচনায় আমি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সত্তরেব দশক থেকে অধ্যাবধি শ্রমিক ইতিহাসচর্চাব রূপরেখা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে চাই। অবশ্য এ সম্পর্কে ধাবণা লাভ করতে হলে ঔপনিবেশিক যুগে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। নচেৎ সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার ধারার অগ্রগতি নজবে পড়বে না। দ্বিতীয়তঃ আমি এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র কায়িক শ্রমে নিযুক্ত 'নিম্নবর্গের' শ্রমিকদের ইতিহাসচর্চার ধারাটিই কেবলমাত্র তুলে ধরতে চাই।

শুরুতেই বলি, আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও ভারতের সামাজিক ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' ও কর্তৃত্ববাদী ইতিহাস। 'তলা থেকে ইতিহাস' বচনাব সম্ভাবনাগুলি একেবারেই খতিয়ে দেখা হত না।[১] এ ধরনের 'এলিটিস্ট' ইতিহাসে সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত চিত্র ভদ্রলোক শ্রেণীর 'বাবু' মানসিকতায় ধবা পড়েনি। এমনকি ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, বাংলায় শ্রমিক ইতিহাস সবেমাত্র 'সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক এটেনশন' পেতে শুরু করেছে এবং মাত্র ১৯৭৬ সাল থেকে এই বিষয়ে প্রথম চর্চা শুরু হয়।[২] একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা' বা 'নিপীড়িতদের ইতিহাসচর্চা' বা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ধারা ভারতবর্ষ ও তৃতীয় বিশ্বের দরজায় প্রবেশ

করার ফলেই এদেশে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আমরা একদল ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর এবং 'অ্যানাল' ক্লাবের সদস্যদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। হিলটন, হিল, এ.এল. মর্টন, ই.পি. টমসন, হবস্‌বম্‌, স্যামুয়েল প্রভৃতি ইতিহাসবাদিগণ শুধু সামাজিক ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিতই করেননি, উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। এইসঙ্গে সমাজের 'অচ্ছুৎদের' যথাস্থানে স্থাপন করে তাদের ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছেন।[৩]

এরই সূত্র ধরে বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। তবে এই সময়ে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পে নিযুক্তশ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কাহিনী ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির কার্যকলাপ ও দাবী-দাওয়ার কথাই কেবলমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ নজর করলে দেখা যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল এই সব প্রকাশিত গ্রন্থের মূল বিষয়। এই সব গ্রন্থগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি সীমাবদ্ধতা নজরে পড়ে। গ্রন্থগুলি অধিকাংশই মূলতঃ কিছু প্রকাশিত উপাদান, সংবাদপত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। সরকারী লেখ্যাগারে রক্ষিত প্রভূত উপাদান সম্পদ, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী নেতৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত কাগজপত্র, মিলমালিক ও বণিক চেম্বারগুলির কাগজপত্র, আইন-আদালতে রক্ষিত দলিল, শ্রমিক জার্নাল ইত্যাদি শ্রমিক ইতিহাসের গবেষকদের কাছে অব্যবহৃত থেকে গেছে।[৪]

এই ইতিহাসচর্চার ধারার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ইতিহাস একত্রিত করে পরিবেশন করা। ফলে বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের আন্দোলনের তৃণমূল বৈশিষ্ট্যগুলি এইসব আলোচনায় ধরা পড়েনি। এছাড়া এইসব ইতিহাসে বর্ণনা বা কাহিনীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে; কোনও রকম বিচার-বিশ্লেষণের আভাস খুব কমই পাওয়া যায়। এমন কি প্রাক্‌ স্বাধীনতাযুগে গোটা বিশ শতক ধরে ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, শ্রমিক আন্দোলনকে সেই প্রেক্ষাপটে বিচার করা, বা এই আন্দোলনকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া, বা মূল স্রোতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে তা লিপিবদ্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেননি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ সবসময়ে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের নিষ্ক্রিয় সমর্থক হিসেবে দেখেছে। যদিও তারা এই শ্রেণীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসাবে স্বীকার করেছে তথাপি, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই শ্রেণী যে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তাদের রচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। জাতীয়তাবাদী ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ উভয়েই শ্রমিক শ্রেণীকে বহিরাগত নেতৃবৃন্দের 'হাতের পুতুল' বা যন্ত্র হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। তাদের মতে, সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনই ভারতে বহিরাগত নেতৃবৃন্দ শুরু ও পরিচালিত করেছে। তাঁদের বিশ্লেষণ শ্রমিকশ্রেণীর জমায়েতের বৈশিষ্ট্য ও ঐক্য এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা অবহেলিত হয়েছে বা আলোচিত হয়নি। অবশ্য বামপন্থী

ঐতিহসিকগণ, বিশেষতঃ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের রচনায় শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকাটি এবং জাতীয় আন্দোলনে তাদের গুরুত্বের ও ভূমিকার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[৫]

তবে ১৯৭০ ও ৮০ এর দশকের পর থেকে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন ধারার আবির্ভাব হতে থাকল। শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চার আগ্রহও গবেষকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০০০ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রকাশিত হয়েছিল।[৬] ই.পি টমসনের 'দ্য মেকিং অফ দ্য ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস' শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে শুধু একটি নতুন দিকচিহ্ন হিসাবেই গণ্য হল না; একই সঙ্গে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকারীদের কাছেও নতুন প্রেরণা সঞ্চার করল এবং তারা এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করল।

সত্তরের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি শ্রমিক ইতিহাসচর্চায় যে সব নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধারাটি হলো প্রদেশ ভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস রচনা। অর্থাৎ সারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সব শিল্প ও তার শ্রমিকদের কথা একত্রে না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে চর্চা করা। বাংলার চটকল, কয়লাখনি, বোম্বে, কানপুর, আমেদাবাদ বা কোয়েম্বাটুরের সূতাকল বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা, আসাম, দার্জিলিং, ডুয়ার্সের চা-বাগিচা শিল্প প্রভৃতি গবেষকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত হল সময়ের পর্ব-ভিত্তিক গবেষণা। গবেষণার ক্ষেত্রে আরও বিশেষীকরণ এগিয়ে চলল। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়েই ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি হল না, তৃণমূল স্তরের অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা ভিত্তিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ঐতিহাসিকের রচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল। রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী বাংলার চটশিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে এই আলোচনার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। এই পথ অনুসরণ করে চটকলের উপর গবেষণাকে আবও এগিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁকার গোস্বামী, নির্বাণ বসু, পরিমল ঘোষ, অমল দাস, অর্জন দি হান্, শুভ বসু এবং আরও অনেকে তাদের গবেষণা লব্ধ নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মাধ্যমে। আসাম ও বাংলার চা-বাগিচা শিল্পের শ্রমিকদের নানা ধরনের সমস্যা ও তাদের আন্দোলন, আইনজনিত নানা সমস্যা ও প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রণজিৎ দাশগুপ্ত, সনৎ বসু, রানা প্রতাপ বাহ্ল, সরিৎ ভৌমিক, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কিছু গবেষক বহুবিধ মূল্যবান প্রবন্ধ, এমনকি গ্রন্থও প্রকাশ করলেন। চট ও চা এই দুটি সংগঠিত শিল্প ছাড়াও ট্রাম শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক, জাহাজ শিল্পের শ্রমিক, কয়লাখনি ইত্যাদি সংগঠিত শিল্প নিয়েও ইতিহাসচর্চা বেশ প্রসারলাভ করল।[৭] তুলনায় সংগঠিত শিল্পের মধ্যে রেল শ্রমিকদের নিয়ে কাজ সর্বভারতীয়স্তরে এবং বাংলায় অবহেলিত থেকে গেছে। ভাল মাল কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অভাব থেকে গেছে। অবশ্য অতি সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে (১৯০৬-১৯৪৭) একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,[৮] যা বলা যেতে পারে, রেল শ্রমিকদের নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে

সহায়তা করতে পারবে।

বোম্বে, আমেদাবাদ, কানপুরের সূতাকল নিয়ে সময়ের পর্বভিত্তিক গবেষনা ছাড়াও প্রদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে চার্লস মায়ার্স, আর. কে. নিউম্যান, মরিস্ ডি. মরিস্, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ চন্দভারকর, চিত্রা যোশী, রবীন্দর কুমার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জামশেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়েও সময়ের পর্বভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষীকরণ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে। সুনীল সেন, ব্লেয়ার ক্লিং, দিলীপ সিমিয়ন্, প্রভু মহাপাত্রের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে। পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুর, কুলটির শ্রমিকদের নিয়ে নির্বাণ বসু সম্প্রতি কাজ শুরু করেছেন।

বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ৭০ ও ৮০ এর দশক থেকে অভিনবত্ব ও বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যায়। বোম্বে, কানপুর ও আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকদের উৎস, গঠনবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং শুরু হল এই নিয়ে ইতিহাসচর্চা। শুধু প্রবন্ধই প্রকাশিত হল না, এই সঙ্গে প্রকাশিত হল উৎকৃষ্ট গ্রন্থও। এ ক্ষেত্রে চার্লস এ মায়ার্স, আর. কে নিউম্যান, মরিস্. ডি. মরিস্, চিত্রা যোশী, রবীন্দর কুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য[৯]। বাংলার চটকল নিয়েও গবেষণা উপরোক্ত বিষয়গুলিতে অত্যন্ত প্রসারলাভ করল। এক্ষেত্রে রণজিৎ দাশগুপ্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রণজিৎ দাশগুপ্তের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য গবেষকগণ বাংলার চটকলের শ্রমিকদের উৎস, আগমণের ধারা, তাদের সামাজিক অবস্থান, গঠনবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়কে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

চটকল, সূতাকল ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা, তাদের বাসস্থান-জনিত সমস্যা, পানীয় জল, খাদ্য ও স্বাস্থ্যের সমস্যা, দুর্ঘটনাজনিত সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ইতিহাসচর্চার প্রসার হল। শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কিত প্রশ্নটিও এই আলোচনার মধ্যে স্থান লাভ করল। মজুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং তার কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলেন গবেষকগণ। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শ্রমিকদের একদিকে নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে অধিকার প্রদান ও কল্যাণের জন্য অনেক আইনকানুন হয়েছে। এই আইনকানুনের প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন চিন্তাধারা গবেষকদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হল। বোম্বের সূতাকল শ্রমিকদের কারখানা চত্বর বহির্ভূত জীবনের রাজনীতি ও নানা সমস্যা নিয়ে এবং তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে উৎকৃষ্ট গবেষণা করে গ্রন্থ প্রকাশ করলেন রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকর। বাংলার চটকল শ্রমিকদের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেন সাবলটার্ণ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী। শ্রমিকদের সম্প্রদায় চেতনা ও শ্রেণীচেতনা নিয়ে তার আলোচনা উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকর ও দীপেশ চক্রবর্তী তাদের গবেষরার মাধ্যমে শ্রমিক ইতিহাসকে এক নতুন মোড় দিয়েছেন বলা যেতে পারে।[১০] শ্রমিকদের 'Mentalitics' নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যে একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল দীর্ঘকাল ধরে তাদের গবেষণাকার্য ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সেই অভাব খানিকটা পূরণ করতে পেরেছে। তবে এই বিষয়ে এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি তাদের জগৎ নিয়ে

তাদের কথায় এবং তাদের ভাষায় তাদের ইতিহাস রচনার আজ প্রয়োজন সবথেকে বেশী বলে মনে হয়। কারণ 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন শ্রমিক ইতিহাস বর্জন করে শ্রমিক জার্নাল শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনার উপর ভিত্তি করে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা আমাদের দেশে আজও শুরু হয়নি।

নারী শ্রমিকদের নানা বিষয় ও সমস্যা নিয়ে ইতিহাসচর্চা ঔপনিবেশিক আমলে না হলেও তাদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা ও গবেষণা সত্তরের দশকের শেষে শুরু হয়েছে এবং ৮০ ও ৯০এর দশকে তা প্রসারলাভ করেছে। নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন ভূমিকা, সাধারণ নারী শ্রমিকের জীবন ও দাবী দাওয়া ইত্যাদি। কয়লাখনি, চটকল, চা বাগান ও অন্যান্য নানা শিল্পের নারী শ্রমিক নিয়ে প্রবন্ধও যেমন প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।[১১] তবে রেল শিল্প ও সূতাকল শিল্পের নারী শ্রমিকদের নিয়ে তুলনামূলকভাবে ইতিহাসচর্চা খুব একটা হয়নি বললেই চলে।

শ্রমিক চর্চার ইতিহসে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনী বা অভিজ্ঞতার কাহিনী অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের জীবনীমূলক আলোচনা ও তাঁদের মূল্যায়ণের মাধ্যমে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার কাজকে প্রসারিত করা হয়েছে।[১২]

গত মার্চ মাসে (২০০০ খ্রী:) এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান লেবার হিস্টোরিয়ানস্ এবং 'ভি. ভি. গিরি ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ভারতীয় শ্রমিক ইতিহাস বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন তিনদিন চলেছিল। এই সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে আমার উপস্থিত থাকার এবং প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ হয়েছিল। এই সম্মেলনের কথা উল্লেখ করার বড় কারণ হল, এখানে তিনদিনে শ্রমিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় ৩০ জন ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রমিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পেশ করেছিলেন। এই সব প্রবন্ধ প্রমাণ করে যে শ্রমিক ইতিহাসের বিশেষীকরণ ও আলোচনার স্তর কতখানি প্রসারলাভ করেছে। তৃণমূল ও আঞ্চলিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় স্তর এবং আন্তর্জাতিক স্তরের নানা বিষয়সূচী আলোচনার অন্তর্ভুক্তছিল। নানা বিষয়ের উপর প্রবন্ধ থাকায় বিষয় অনুযায়ী বক্তাদের প্রবন্ধগুলিকে সাজানো হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছিল। চটকল, সূতাকল, চা-বাগিচা, রবার শিল্পের নানা দিক যেমন আলোচিত হয়েছিল, তেমনি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের বাসস্থান ও বাস্তব অবস্থা, শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলন, তাদের রাজনীতি, সাহিত্যে দলিতদের অবস্থান, নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও নানা দিক এবং শ্রমিকদের জবানীতে তাদের ধর্মঘট সম্পর্কে বক্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় যেমন যেমন সংগঠিত শিল্পের হরেক রকম সমস্যা ও নানা দিক আলোচিত হয়েছে, তেমনি অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের বিষয়েও অত্যন্ত জোর দেওয়াহয়েছে।সম্মেলনে "Memories and Resources" এবং অবহেলিত ও অচ্ছুৎদের ইতিহাস নিয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সম্মেলনের বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী এবং আলোচনার ধারা শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগতিরই নির্দেশ

করে।[১৩]

তবে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের উপর বা বৃহদায়তন শিল্পগুলি সম্পর্কে কাজের এবং ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিক এবং অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাস চর্চা ও ভাবনা-চিন্তা আমাদের দেশে খুবই কম হচ্ছে। সুখের বিষয়, এই অভাববোধ শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে জাগ্রত হওয়ায়.এই নিয়ে ইতিহাসচর্চার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্তর ও জাতীয় স্তরের সেমিনারে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। এর ফলে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বেশ কিছু আলোচনা ও সেই সঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১৪] সাম্প্রতিককালের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আরও একটি সীমাবদ্ধতা নজরে পড়ে। প্রাক স্বাধীনতা যুগের নানা শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে সময়ের পর্ব-ভিত্তিক যতটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে, তুলনায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ও আঞ্চলিক ও তৃণমূল স্তরে ইতিহাসচর্চা বা গবেষণা খুব একটা প্রসারলাভ করেনি। অবশ্য স্বাধীনতা উত্তরকাল নিয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। সাম্প্রতিককালের সমস্যা যেমন নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ রিট্রেঞ্চমেন্ট ও নয়া প্রযুক্তিসংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা, কানোবিয়া শ্রমিকদের আন্দোলন ও তার সূক্ষ্ম বিচার - বিশ্লেষণ; ভারতের নানা প্রদেশে বিশেষ করে মুম্বাই এ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বামপন্থীদের প্রভাব হ্রাস ও দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি, বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নানা পরিবর্তনে শ্রমিকদের মানসিকতা ও চিন্তাধারা; বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির ভূমিকা ও দুর্বলতা, শ্রমিকদের সঙ্গে 'ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের' যোগসূত্রের প্রকৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে বলে আমার ধারণা। সবশেষে বলি, ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আজও বহিরাগতদের বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভূমিকাকে যতটা গুরুত্বসহকারে দেখানো হয়েছে তুলনামূলকভাবে সাধারণ শ্রমিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভূমিকাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন সময় এসেছে তাদের যথাযথ ভূমিকাকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করবার। তাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে জমায়েতের বৈশিষ্ট্য, তাদের সংহতি, প্রাথমিক স্তরে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা, তাদের চৈতন্যের নানাবিধ রূপটি অনুসন্ধানের। তবেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চা ইতিহাসের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারবে।

সূত্র নির্দেশ

১. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে.পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ: ৪-১১।

২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, টুয়ার্ডস এ নিউ সোশ্যাল হিস্ট্রি পর কলোনিয়াল রিসার্চ: এ রিভিউ অফ রিসেন্ট রিসার্চ ইন এশিয়ান রিসার্চ ট্রেন্ডস্ নং ৩ (১৯৯৩); সি সেন্টার ফর ইস্ট এশিয়ান কালচারাল স্টাডিজ ফর ইউনেসকো।

৩. সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, মডার্ণ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, প্রেসিডেন্টের ভাষণ, ১৯৮২ পৃ: ৪-৫।
৪. তদেব, পৃ: ১০।
৫. অমল দাশ, আরবান পলিটিকস্ ইন এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া - হাওড়া ১৮৫০ - ১৯২৮ কলকাতা, ১৯৯৪ সপ্তম অধ্যায়।
৬. হ্যারল্ড স্মিথ, দ্য ব্রিটিশ লেবার মুভমেন্ট টু ১৯৭০, লন্ডন, ১৯৮০।
৭. নির্বাণ বসু (সম্পাদিত) বাংলার শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত রচনাপঞ্জী (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯৪)।
৮. শ্যামাপদ ভৌমিক, হিস্ট্রি অফ দ্য বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস্ ১৯০৬-১৯৪৭, ক্রান্তিক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮।
৯. সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, তদেব, পৃ: ১১-১২।
১০. দীপেশ চক্রবর্তী, রিসিঙ্কিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি: বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৪০, প্রিন্সটন, ১৯৮৯। রাজনারায়ণ চন্দভারকর, লেবার এ্যাণ্ড সোসাইটি ইন বোম্বে, কেম্ব্রিজ, ১৯৮৭।
১১. নির্বাণ বসু, তদেব, পৃ: ৯-১০।
১২. তদেব, পৃ: ১২-১৩।
১৩. দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভারতীয় শ্রমিক ইতিহাস সম্মেলনের প্রবন্ধাবলী, এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান লেবার হিস্টোরিয়ানস্ এবং ভি. ভি. গিরি ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত, ১৬-১৮ মার্চ, ২০০০, নয়েডা, গৌতম বুদ্ধ নগর, উত্তরপ্রদেশ।
১৪. নির্বাণ বসু, তদেব, পৃ: ৮-৯, ১২-১৩। সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, তদেব, পৃ: ১৩-১৯।

ডিরোজিওর অ-গ্রন্থিত কবিতার সন্ধানে

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

তরুণ বঙ্গের প্রথম কবি ডিরোজিও ছিলেন খুবই স্বল্পায়ু। বেঁচেছিলেন মাত্র ২২ বচর ৮ মাস ৮ দিন। জন্ম ১৮০৯, ১৮ এপ্রিল; মৃত্যু ১৮৩১, ২৬ ডিসেম্বর। এই স্বল্প জীবনকালের মধ্যে শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, সংবাদপত্রসেবী এবং কবি হিসাবে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অকল্পনীয় ও অবিস্মরণীয়। শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক ডিরোজিওর জীবন্তরূপ বিনয় ঘোষ তাঁর নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু '*বিদ্রোহী ডিরোজিও*' (১৯৬১) গ্রন্থে তুলে ধরেন। পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর '*ঝড়ের পাখি: কবি ডিরোজিও*' (১৯৭৯) গ্রন্থে প্রগতিশীলতার কবি ডিরোজিওর প্রাণবন্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। এতে আছে ডিরোজিওর ২০টি কবিতা বা কবিতাংশের সঙ্গে তাদের বঙ্গানুবাদ।

ডিরোজিও কতগুলি কবিতা লিখেছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। তিনি জীবৎকলে দুটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছিলেন '*Poems*' (১৮২৭) ও '*The Fakeer of Jungheera: A Metrical Tale and other Poems*' (১৮২৮)। '*Poems*'-এ ছিল ৪৭টি কবিতা আর Fakeer of jungheera -তে আখ্যানকাব্য সহ মোট ২৩টি কবিতা। অর্থাৎ মোট ৭০টি কবিতা তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ দুটি থেকে পাওয়া যায়।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডিরোজিওর যে কাব্য সঙ্কলনগুলি প্রকাশিত হয় তা মোটামুটি এই রকম: ১৮৭১ সালে আওয়েন আরাতনু '*The Poetical Works of H.L.V. Derozio*' নামে একটি কাব্য সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এতে নতুন ৩টি কবিতা পাওয়া যায়। ১৯০৭ সালে বিপিনবিহারী শাহ্ ডিরোজিওর একটি কাব্য সঙ্কলন প্রকাশ করেন সে গ্রন্থের নামও '*The Poetical Works of H.L.V. Derozio*'। এতে (গৌরচন্দ্রিকামূলক কবিতা সহ The Fakeer of Jungheera আখ্যানকাব্য বাদ দিয়ে) পূর্বে গ্রন্থকারে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা নতুন ১৭টি কবিতা তিনি ছাপেন। Volume-one কথাটি আখ্যাপত্রে থাকায় অনুমান করা যায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু তা কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। বি.বি. শাহ্র গ্রন্থে আমরা পাই ৮৮টি কবিতা। পূর্বে প্রকাশিত ২টি কবিতা বা আখ্যানকাব্য তিনি বাদ দিয়েছিলেন। সেগুলি ধরলে গ্রন্থাকারে সংকলিত কবিতার সংখ্যা দাঁড়াল ৯০। এরপর ডিরোজিও কাব্য সংকলন প্রকাশ করেছিলেন এফ.বি. ব্রাটলি বার্ট ১৯২৩ সালে। সঙ্কলনের নাম "*Poems of H.L.V. Derozio : A Forgotten Anglo-Indian*

Name of the poem with first line & number of lines	Place & Date	Name or Pseudonym	Journal
ELIGIACS TANZAS Her eyes were bright (30)	Bh-g-poor 7th May, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
"LOVE ME LEAVE ME NOT" Love thee and leave thee (8)	Bh-g-poor 7th May, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
THE MIDNIGHT HOUR Night, power benighnant gracious still to man (37)	Bh-g-poor 16th May, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
STANZAS Forget not, forget not the moment we parted (8)	Bh-g-poor 30th May, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
THE BARDS LAST SONG Once more my harp another strain (32)	Bh-g-poor 13th June, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
LINES WRITEN AT THE REQUEST OF A YOUNG LADY Like roses blooming over the grave a fair and fragrant wreath (12)	Bh-g-poor October, 1825	JUVENIS	INDIA GAZETTE
BALLAD STANZAS ADDRESSED TO HER WHO WILL BEST UNDERSTAND THEM The lock of your hair, which at parting you gave (18)	Calcutta May, 1826	HENRY	INDIA GAZETTE
TO HOPE ADDRESSED TO HER WHO WILL BEST UNDERSTAND THEM Ah love is me from my day to day (12)	Calcutta May, 1826 May, 1826	HENRY	INDIA GAZETTE
ADDRESSED TO HER WHO WILL BEST UNDERSTAND THEM Oh sad and watchful waits of love (29)	Calcutta May, 1826	HENRY	INDIA GAZETTE
COME SOFTLY LOVE A DUETT PORTUGUESE AIR Juan Come softly, Love I like an angel of night (16)	Calcutta Aug. 1826	EAST INDIAN	INDIAN MAGAZINE
THE STARS Hast thou e'er held communion with the stars (12)		H.L.V. Derozio	The Bengal Annual a Literary Keepsake
ODE TO THE SETTING MOON (Part) Flow sweet to gaze, how sweet to think (10)		EAST INDIAN	INDIAN MAGAZINE No. 3

Name of the poem with first line & numbers of lines	Plae & Date	Name or Pseudonym	Journal
TO—	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
I will break thee chain (20)	8th Jan. 1825		GAZETTE
TO—	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
Come ! Whither ? ah it can be (64)	8th Jan, 1825		GAZETTE
WOMEN'S SMILE	Bg-g-poor	JUVENIS	INDIA
Of all the gifts the *	Jan. 1825		GZSETTE
WOMEN'S TEAR	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
To move the sorry soul to	10th Jan. 1825		GAZETTE
THE POET'S GRAVE	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
How softly rests the poets' head (36)	28th Feb. 1825		GAZETTE
THE DAYS GONEBY	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
O where's the hart let it wither alone (42)	28th Feb. 1825		GAZETTE
HAPPY MEETINGS	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
How keen the pang, how sad the thought (28)	15th Mar. 1825		GAZETTE
THE DEATH OF RIGHTEOUS	Bh-g-poor	JUVENIS	INDIA
O ! How serene's the death of righteous die (38)	29th Mar, 1825		GAZETTE

Poet'। বি.বি. শাহ পর্যন্ত ডিরোজিওর কাব্য সংকলনের কাজটি যেভাবে এগিয়েছিল ব্রাটলি বার্টে এসে তা পেছিয়ে যায়। প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা সংকলনের নামে তিনি মাত্র ৬৬টি কবিতা সঙ্কলিত করেন। এতে কোন নতুন কবিতা সংযোজিত হয়নি। উপরন্তু ডিরোজিওর বিভিন্ন কবিতার সঙ্গে ললাটে যেসব উদ্ধৃতি ও পাদটীকা ছিল সেগুলি তিনি ঝেড়ে বাদ দিয়ে দেন। ব্রাটলি-বার্টের সেই ত্রুটিপূর্ণ সংকলনটিই ১৯৮০ সালে অকস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্তের মূল্যবান মুখবন্ধ সহ পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। ডিরোজিওর কাব্য সংকলন বলতে একালের পাঠকদের কাছে এই ত্রুটিপূর্ণ, সংকুচিত ব্রাটলি বার্টের কাব্য-সংকলনটিই প্রায় একমাত্র সম্বল। ১৯৭২ সালে পি. লাল ডিরোজিওর ২৬টি কবিতা সম্বলিত একটি ছোট্ট কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেন। এতেও কোন নতুন কবিতা নেই।

এছাড়া অন্যান্য যাঁদের গ্রন্থ থেকে দু'একটি করে নতুন কবিতা পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ডিরোজওর প্রথম জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডসের নাম করতে হয়। তিনি '*Henry Derozio The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*' (১৮৮৪) নামের বইটিতে 'Independence' নামক একটি অগ্রন্থিত কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। ডিরোজিওর দ্বিতীয় জীবনীকার ই. ডাবল্যু. ম্যাজ (E.W. Madge) তাঁর '*Henry Derozio The Eurasian Poet and Reformer*' (১৯০৫) গ্রন্থে একটি নতুন অনামা কবিতা উদ্ধৃত করেন। পরে

পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে 'Lines on a Grave-stone' নামে এটিকে মুদ্রিত করেছেন। বিনয় ঘোষ তাঁর '*বিদ্রোহী ডিরোজিও*' গ্রন্থে "Prologne" নামে ডিরোজিওর একটি রচনা উদ্ধৃত করেন। ডিরোজিও ড্রামন্ডের স্কুলে যখন ছাত্র তখন "Doglus" নামে একটি নাট্যাভিনয়ের অবতরণিকা হিসাবে এটি রচনা করেছিলেন। এটি প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্য অমল মিত্র মহাশয়ের। পরে সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর *অশান্তকাল ঃ জিজ্ঞাসু যুবক* (১৯৮৮) গ্রন্থে এর শুদ্ধ পাঠ ছাপেন। মূল উৎস সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি তাতেও অনেক ভুল থেকে গেছে। সে কথা যাক। পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর '*ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও*' (১৯৭৯) গ্রন্থে "The Poetry of Human life" নামে একটি অসঙ্কলিত কবিতা "The Bengal Annual Literary Keep sake" থেকে উদ্ধাব করে অনুবাদ সহ ছাপেন। এর ফলে গ্রন্থাকারের সঙ্কলিত কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪। ডিরোজিওর জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৭০টি কবিতা। তারপর প্রায় পৌনে দু'শো বছর অতিক্রান্ত। বিভিন্ন সঙ্কলক ও জীবনীকারের চেষ্টায় আর মাত্র ২৪টি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে।

ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সম্পাদক অধীর কুমার এবং বর্তমান লেখক ডিরোজিওর অগ্রন্থিত কবিতার খোঁজে ঠিক এরপর থেকে যাত্রা শুরু করে ডিরোজিও অনুরাগীদের জন্য কিছু সুসংবাদ তুলে আনতে পেরেছেন। সংক্ষেপে সেই প্রাপ্তির কথাই এখানে নিবেদন করা হল। ১৯০৭ সালে দায়িত্বশীল সঙ্কলক বি.বি.শাহ ডিরোজিওর সঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন

"It would be next to impossible to recover all Derozio's verses which are scattered through the newspaper and periodicals of eighty years ago."

তারপর আরও ৯৩ বছর কেটে গেছে। সুতরাং সে সব কবিতা খুঁজে পাওয়া আরও কত দুষ্কর তা সহজেই অনুমেয়। তা সত্ত্বেও ১৮/১৯টি নতুন কবিতা উদ্ধার করা হয়েছে যা পাঠকের দৃষ্টির বাইরে পড়েছিল পৌনে দুশো বছর ধরে। উদ্ধারীকৃত কবিতাগুলির নাম, প্রথম ছত্র, ছত্র সংখ্যা, রচনাস্থান ও তারিখ, কি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি চুম্বক চিত্র নীচে দেওয়া হল।

কবিতাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে কলকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে। ন্যাশানাল লাইব্রেরির পত্র-পত্রিকা বিভাগ, দুর্লভ পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগ এবং কম্পিউটার বিভাগের সাহায্য না পেলে এগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হত না। পৌনে দুশো বছরের পুরনো পত্র-পত্রিকা সব পাওয়া সম্ভব নয়। যা আছে তাদের অবস্থাও খুব খারাপ। সেগুলির কিছু কিছু মাইক্রোফিল্ম করা হয়েছে। কিছু C.D. করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকা, মাইক্রোফিল্ম ও C.D. তিন রকম জায়গাতেই আমাদের তন্ন তন্ন করতে হয়েছে। ন্যাশানাল লাইব্রেরির কম্পিউটার বিভাগকে ধন্যবাদ তাঁরা পুরনো "Calcutta Monthly Journal" এর অনেকগুলি খণ্ড CD করে সেগুলি দেখতে আমাদের সাহায্য করেছেন। "India Gazette" বা অন্যান্য পত্রিকা থেকে "Calcutta Monthly Journal" পত্রিকা তখন রচনাটি নিয়মিত পুণর্মুদ্রিত করত। সেই সূত্রে 'জুভেনিস' বা অন্যান্য ছদ্মনামে বিভিন্ন পাত্রকায় প্রকাশিত ডিরোজিওর লেখা পত্রিকাটি

পুণর্মুদ্রিত করেছিল। প্রধানত "Calcutta Monthly Journal" এর CD থেকে খুঁজতে খুঁজতে অধিকাংশ কবিতা আমরা পেয়েছি। মাইক্রোফিল্ম থেকেও দু'একটি কবিতা পাওয়া গেছে। সেগুলি উদ্ধার করার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ন্যাশানাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর অসিত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অনুমতি দিয়ে ডিরোজিও-অনুবাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অগ্রন্থিত যে কবিতাগুলি উদ্ধার করা গেছে সেগুলিব দু'রকম মূল্যায়ণ হতে পারে। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। যোগ্যজনেরা তা করবেন। এই উদ্ধারের ফলে ডিরোজিও চর্চার ইতিহাস যে একটু নতুন মাত্রা পাবে তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে

১. ডিরোজিও ভাগলপুর থেকে প্রথম যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন (৮ জুন, ১৮২৫ তারিখে ছোট্ট একটি চিঠি সহ) তা পাঠকরা চাক্ষুষ কবতে পারবেন।
২. ডিরোজিওর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতার নিদর্শন এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে।
৩. ১৮৪৩ সালে তার সি.জে খণ্ডেও একটি অস্বাক্ষরিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ নিবন্ধে লিখেছিলেন- "One phase of his character is remarkable. He never loved a woman. His feelins were cold in this respect." উদ্ধার করা কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায় বক্তব্যটি একেবারেই ঠিক নয়। ডিরোজিও প্রথম জীবনে আবেগগত প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। এগুলির উৎসে বাস্তব নারীর অস্তিত্ব ছিল ডিরোজিও যাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাগুলি লিখেছিলেন।

কবিতার বিচারে এর অনেকগুলি সম্পর্কে হয়তো বলা যায় 'ভালো হত আরো ভালো হলে।' মনে রাখতে হবে প্রথম তারুণ্যের অসংহত কিন্তু স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস থেকে এগুলির জন্ম। রচনাকালে কবির বয়স ছিল ১৫/১৬। সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কহীন একান্ত ব্যক্তিগত এই কবিতাগুলি অনেকের কাছে মূল্যহীনও মনে হতে পারে। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই দ্বাদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এক বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট পিটার অ্যাবেলারের কথা। পিটার অ্যাবেলার (১০৭৯-১১৪২) প্রথম বয়সে জনৈক ধর্মযাজকের ভ্রাতুস্পুত্রী এলিয়েন নাম্নী একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর ভালোবাসার গান এক সময় সেইন নদীর তীরে প্রেমিক প্রেমিকাদের কন্ঠে গুঞ্জরিত হত। কিন্তু ভালোবাসার অপরাধে অ্যাবেলারকে চরম শারীরিক নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়। ত্রোয়ার নির্জন জঙ্গলে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নির্বাসিত করা হয়। খুঁজতে খুঁজতে ছাত্ররা তাঁকে দেখতে পায় সেখানে। সেই নির্জন বনভূমি দেখতে অ্যাবেলারের সহৃদয় অধ্যাপনার যাদুতে পরিণত হয় 'প্যারা ক্লে' (বা শান্তিনিকেতন) বিশ্ববিদ্যালয়ে। হৃদয়ে ভালোবাসা না থাকলে ডিরোজিও কি টলিয়ে দিতে পারতেন তরুণ বঙ্গের মস্তিষ্ক! ডিরোজিওকে সম্পূর্ণ করে জানার জন্য এই ভালোবাসার কবিতা গুলিও ছিল অতিবাঞ্ছিত। ইতিহাসের তথ্য এইভাবেই ছুঁয়ে ফেলে জীবনের সত্যকে।

ডিরোজিওর দু'টি অগ্রন্থিত কবিতা :

ORIGINAL POETRY

To The Editor of the India Gazette.

SIR—The following original Stanzas are at your service if worthy of appearing in your Poet's corner. Should they be acceptable you will hear oftener from

Your, obdt Servant
JUVENIS

TO

I 'll break the chain that's bound me fast,
Tho 'in th' attemt I strain my heart,
I can't revoke the deeds now past-
I'll mend them it from thee I part.

'Tis hard thou'lt say, to leave thee so :-
'Tis more than hard - 'tis harsh-'tis cold-
But I have read a tale of wo,
A tale that should not be re-told-

My dream of love has past away:
The spell is broke-it was but fit
That such a vision should decay :-
And must I not to fate submit ?

If I was ever dear to thee,
If e'er thou had'st my weal at heart,
Ask not again my form to see,
But bid me fan from thee depart.

I am not worthy thee, i own -
On thee I dare not cast an eye :-
In pity, let me pine alone -
Forgotten live upheeded die !

JUVENIS

Bh-g-poor, 8th Jan. 1825

"LOVE ME AND LEAVE ME NOT."

Love thee and leave thee !-Lady first
Shall all that's keen of misery cleave me -
No-tho' this breaking heart should burst.
It still will love and never leave thee

Tho' fate thy form from me should part,
Tho' destiny our fortunes sever -
Still, Lady, this devoted heart
Will throb-and true to thee for ever

JUVENIS

Bh-g-poor, 7th May. 1825

‘ভারতমিত্র’ কলকাতার এক অবলুপ্ত হিন্দি পত্রিকা

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রথম হিন্দি পত্রিকা ‘উদন্তমার্তণ্ড’ ১৮২৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে বেশ কিছু হিন্দি পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও তাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু ১৮৭৮ সালে বাংলা পত্রিকা ‘সোমপ্রকাশ’ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র এবং ছোটুলাল মিশ্র ১৮৭৮ সালের ১৭ই মে কলকাতা থেকে হিন্দি পত্রিকা ‘ভারতমিত্র’ প্রকাশ করেন, যা পঞ্চাশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল।[১]

ক্ষেত্রমোহন মুখার্জীর সরস্বতী প্রেস, ৪৯ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট থেকে ‘ভারতমিত্র’র প্রথম সংখ্যাটি পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়। ‘ভারতমিত্র’ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, এর সদস্যরা বিনা বেতনে কাজ করতেন।[২]

‘ভারতমিত্র’র প্রথম অঙ্কের শেষে একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে, সেখানে পত্রিকাটিকে চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বসাধারণের সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়েছে, এবং ৫০০ জন গ্রাহক পাওয়া গেলে এটিকে সাপ্তাহিকে পরিণত করার আশা ব্যক্তকরা হয়েছে। দশম সংখ্যা অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ থেকে ‘ভারতমিত্র’ সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৯৭ খ্রীঃ এটি দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক পত্রটিও পৃথকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু পত্রিকাটির যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না। মাঝে মাঝেই এটি বন্ধ হয়ে যেত। ১৮৮৪-৮৫ সালে হরমুকুন্দ শাস্ত্রী ছিলেন ‘ভারতমিত্র’র দ্বিতীয় সম্পাদক। পরবর্তীকালে জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্বেদী, অমৃতলাল চক্রবর্তী, রুদ্রদত্ত শর্মা, বালমুকুন্দ গুপ্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, বাবুরাও বিষ্ণু পরাড়কর, লক্ষ্মণনারায়ণ গর্দের মত বিশিষ্ট পণ্ডিত ও লেখকরা এর সম্পাদনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, এদের অনেকেই ছিলেন অহিন্দীভাষী।

‘ভারতমিত্র’-র প্রথম সংখ্যাতে “জয়োস্তু সত্যনিষ্ঠানাং মেষাং সর্বে মনোরথা:”-এই শীর্ষবাক্যটি মুদ্রিত ছিল। পঞ্চদশতম অঙ্কে যে শীর্ষবাক্য প্রকাশিত হয় তা হল-

“সগুণ খনিএ বিচিত্র অতি ঘোলে সবকে চিত্র।
শোধে নরচরিত্র হয়ে ভারতমিত্র পবিত্র।।”

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রের ভূমিকা তথা ‘ভারতমিত্র’ প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছিল, “যে সমাজে সংবাদপত্রের প্রচলন নেই তার উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। ভুমণ্ডলে যেখানে যে বিশেষ ঘটনা ঘটে সমস্তই এর দ্বারা প্রকাশিত

হয়....সংবাদপত্র না থাকলে রাজ্যশাসন উত্তমরূপে করা সম্ভব হয় না, সেজন্য সুসভ্য প্রজাহিতৈষী রাজা সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করে উৎসাহিত করেন।" এছাড়াও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সংবাদপত্রের প্রযোজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। দেশহিতৈষী ব্যক্তির পরামর্শও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। আরো রয়েছে, হিন্দিভাষীদের জন্য কলকাতায় কোন ভাল সংবাদপত্র না থাকায় হিন্দিভাষীদের বাঙালীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, এর প্রতিকারার্থেই 'ভারতমিত্র'র প্রকাশ।

১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হলে অন্য অনেক দেশীয় ভাষায় পত্রপত্রিকার মত 'ভারতমিত্র'ও ছিল এই আইনের বিরুদ্ধে।[৩] ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জেল হলে ১৮৮৩ সালের ১০ই মে'র 'ভারতমিত্র'-তে এর প্রতিবাদে পাঁচ কলম লেখা তৎসহ পৃথক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।[৪] 'ভারতমিত্র'র ব্রিটিশবিরোধী চরিত্র বোঝা যায় ঐ পত্রিকার ২১শে জুলাই, ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ কী গ্রহদশা' রচনাটি পড়লে।[৫]

১৮৯১ সালে সহবাসসম্মতি বিল নিয়ে আন্দোলন চলাকালে বাংলা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ঐ বিলের বিরোধিতা করলে ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়।[৬] 'ভারতমিত্র'ও ঐ বিলের বিরোধিতা করে।[৭]

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে 'ভারতমিত্র' আত্মপ্রকাশ করল তার পূর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বরূপে। এই সময়ের বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা ছিল 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম'। এই পত্রগুলি চেয়েছিল ভারতীয়গণ কর্তৃক রাজশক্তির অধিগ্রহণ। ঐ সময় সমগ্র দেশে যে প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তা হিন্দি পত্র পত্রিকাকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং ঐ পত্রিকাগুলি জাতীয় আন্দোলনের প্রসারে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিল।[৮]

১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত 'ভারতমিত্র'-র সম্পাদক ছিলেন বালমুকুন্দ গুপ্ত। তিলক যুগের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রবক্তা ছিল 'মারাঠা', 'কেসরী', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', 'পাঞ্জাবী', এবং বালমুকুন্দর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ভারতমিত্র'।[৯] উল্লেখ্য যে, এর কিছুকাল পূর্বে কালাঙ্কাকরের রাজা রামপালসিংহের হিন্দি দৈনিক 'হিন্দোস্থান' থেকে বালমুকুন্দ গুপ্তের চাকরি চলে যায় ঐ পত্রিকায় তার ব্রিটিশবিরোধী রচনার জন্য।[১০]

বালমুকুন্দ ছিলেন প্রবল জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় সংস্কৃতির দৃঢ় অনুসারী এবং সনাতনধর্মের সমর্থক।" তিনি 'হিন্দি আখবার' নামে হিন্দি পত্রপত্রিকার যে ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে লিখেছিলেন, 'ভারতমিত্র' রাজনৈতিক পত্রিকা, হিন্দির প্রচারও এর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। বালমুকুন্দ যতদিন 'ভারতমিত্র'র সম্পাদক ছিলেন, উভয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতে গিয়ে বালমুকুন্দ যে সরস ব্যঙ্গাত্মক ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, তা হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। লর্ড কার্জনের অত্যাচারমূলক নীতিকে তীব্র ভাষায় তিনি আক্রমণ করেছেন 'ভারতমিত্র'তে ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত 'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা'র মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর সঙ্গে এই চিট্‌ঠাগুলির রচনারীতি সাদৃশ্য লক্ষণীয়। "শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা" লেখার সূত্রপাত অবশ্য করেছিলেন অমৃতলাল চক্রবর্তী, যিনি ১৯০১ সাল থেকে 'ভারতমিত্র' সম্পাদনায় বালমুকুন্দকে সহায়তা করতেন।[১২] পরে বালমুকুন্দ এটি লেখা শুরু করেন। তবে অমৃতলালের চিট্‌ঠাগুলি পাওয়া যায় না।[১৩] বালমুকুন্দর চিঠিগুলি ভারতের বিস্তৃত অংশে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব সঞ্চার করেছিল, এবং এগুলির আকর্ষণেই অনেকে 'ভারতমিত্র' পড়ত।[১৪]

১১ই এপ্রিল, ১৯০৩ এর 'ভারতমিত্র'তে প্রকাশিত প্রথম চিট্‌ঠায় শিবশম্ভু কার্জনকে বলছে -"...আপনি বারবার নিজের দুটি আড়ম্বরপূর্ণ কীর্তির কথা বলেন। একটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, এবং দ্বিতীয়টি দিল্লী দরবার। কিন্তু...এ গুলির দ্বারা গরীবের কষ্ট কিছু কমবে অথবা ভারতীয় প্রজাদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে, এমন নিশ্চয় আপনিও মনে করেন না।"

কার্জনের জাতিগত ঔদ্ধত্য ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তার বক্তব্য।[১৫] লর্ড কার্জনের উক্তির জবাবে শিবশম্ভু বলছে -"...এদেশ আপনার লুঠের জায়গা। কিন্তু এদেশের লাখ লাখ লোক এদেশে জন্মেও রাস্তার কুকুরের মত মরে...কখনো দু-চারটে মিঠে কথা বলে এদেশের লোকেদের উৎসাহ দেননি...গালি দিচ্ছেন কোন অধিকারে ? গোলামীর বড় জ্বালা...মি. লর্ড। এদেশের লোকেদের আপনি চাননা, এদেশের লোকেরাও আপনাকে চায়না, তবু আপনি এই দেশের শাসক, এবং একবার নয়, দু-দুবার শাসক হয়েছেন, এসব ভেবে এই ভাঙ্গখোর আধবুড়োর নেশা ছুটে যাচ্ছে।"[১৬]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিমের যে মিছিল বেরিয়েছিল সে সম্পর্কে শিবশম্ভু বলছে- "...গত ১৬ই অক্টোবর...কী একটা অপূর্ব শক্তি লোকগুলোকে এক রাখীর বাঁধনে বেঁধে দিয়েছিল।"[১৭]

বালমুকুন্দ ঐ সময়ই 'ভারতমিত্র'-তে লিখলেন 'কার্জননামা' নামক কবিতা —

"কিসনে বঙ্গভূমিকো দো টুকড়ে করকে দিখলায়া
কিসনে বেরহমী সে ভাই ভাই কো বিছড়ায়া ?
বোলে কার্জন ইসকা কর্তা হুঁ বস্ ম্যাঁয় হি অকেলা
হাম হ্যায় মেরে লোহে কে, দিল হ্যায় পাথর কা ঢেলা।"

'স্বদেশী আন্দোলন' কবিতায় বালমুকুন্দ লিখলেন —

"আও এক প্রতিজ্ঞা করেঁ, এক সাথ সব জীয়ে মরেঁ।
চাহে বঙ্গ হোয় সৌ ভাল, পর না ছুটে অপনা অনুরাগ।।
ভোগ বিলাস সভী কো ছোড়, বাবুপন সে মুঁহ লো মোড়।
ছোড়ো সভী বিদেশী মাল, অপনে ঘর কা করো খয়াল।।
অপনী চীজেঁ আপ বানাও, উনসে অপনা অঙ্গ সাজাও।।

ওযো বঙ্গমাতা কা নাম, জিসসে ভালা হোয় অঞ্জাম ।।"

স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য পূর্ববঙ্গের ছোট লাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। প্রতিবাদে বালমুকুন্দ লিখলেন — "শায়েস্ত খাঁ কা খত্-ফুলার সাবকে নাম।" খত্-এর শেষে রয়েছে-"জমানে কে বহতে দরিয়া কো লাঠী মারকে কৌই নহী রোক সকতা" অর্থাৎ "অত্যাচার দ্বারা যুগ প্রবাহকে কেউ রুদ্ধ করতে পারে না।"

এবপর ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাটি শক্তিশালী হতে থাকে। কলকাতার অনেক পত্রিকা সম্পাদক উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, তৎসহ গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। 'ভারতমিত্র' সম্পাদক বাবুরাও বিষ্ণু পরাড়কর লিখেছেন- "কলকাতা যাওয়ার আমার প্রধান উদ্দেশ্য সাংবাদিকতা ছিল না, ছিল বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দেশসেবা করা। 'ভারতমিত্র' সম্পাদনাব সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরে গুপ্ত সমিতির কাজও আমিই করতাম।"[১৮]

অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী ১৯১৯ সাল পর্যন্ত 'ভারতমিত্র'-র সম্পাদক ছিলেন। এরমধ্যে ১৯১২ সালের জুলাইতে পরাড়করজী 'ভারতমিত্র'-র সংযুক্তসম্পাদক হন, ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। দৈনিক ভারতমিত্রতে হিন্দির বিশিষ্ট সাংবাদিকবা সম্পাদনাকার্য করেছেন। এই সংবাদপত্রটি সমাজ সংস্কারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখত। পরাড়করজীর জীবনী লেখক লক্ষ্মীশঙ্কর ব্যাসের ব্যক্তিগত সংগ্রহালায় রক্ষিত 'ভারতমিত্র' এবং 'কলকাত্তা সমাচার'[১৯] এর কয়েকটি সংখ্যা দেখলে বোঝা যায় 'ভারতমিত্র' ছিল সামাজিক প্রগতিশীলতার পক্ষে এবং 'কালকাত্তা সমাচার' ছিল অনেকটাই রক্ষণশীল।

'ভারতমিত্র' হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে সমর্থন করেনি। এমনকি হিন্দু সনাতনধর্মের দৃঢ় অনুসারী 'ভাবতমিত্র' সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্তও ১৮ই আগস্ট, ১৯০৬ এর 'ভারতমিত্র'-তে প্রকাশিত "শায়েস্তা খাঁ কা খত্" এ শায়েস্তা খাঁকে দিয়ে দিয়ে বাংলার ছোটলাট ফুলারকে বলাছেন-"...তুমি বাংলার হিন্দুদের ধমকী দিয়েছ যে, শায়েস্তা খাঁয়ের জমানা নিয়ে আসবে। ...জেনে বেখো, হিন্দুদের নয়, আমি শত্রু ছিলাম ফিরাঙ্গিদের।" ১৯১৯ এর ৯ই জানুয়ারী 'ভারতমিত্র' দেখলে বোঝা যাবে যে, তখনো এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র অব্যাহত ছিল-"অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অধ্যক্ষ ফজলুল হক-এর ভাষণকে আমরা সমর্থন করছি।...মুসলিমদের প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং 'ভারতমিত্র'-র সহানুভূতি উল্লেখ করে উনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন, সেজন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'ভারতমিত্র' সেই ভারতের মিত্র যেখানে শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। সেজন্য 'ভারতমিত্র' হিন্দু-মুসলিম সকলেবই মিত্র।"

১৯১৬ সালে প্রচুর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয়েছিল, বহু ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতাব কবা হচ্ছিল, রেল-দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীবা। 'দৈনিক ভাবতমিত্র'তে এইসব ঘটনার বর্ণনা থাকত।[২০] সবকার কর্তৃক ব্যাপক নজরবন্দী করার বিরুদ্ধে 'ভাবতমিত্র' ব ১৯১৬ সালেব ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় 'নজববন্দিয়োঁ কী ধুম' শীর্ষক সম্পাদকীয়

লেখা হয়েছিল।

স্বরাজ্যের সমর্থক 'ভারতমিত্র'র ১৯১৬ সালের ২৬শে আগষ্ট সংখ্যায় লেখা হয়েছিল (ঐ সময় সম্পাদক ছিলেন অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী)- "Times of India"-র স্বরাজ্যের আন্দোলনের ফলে গায়ে জ্বালা ধরার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথমে তো অ্যানি বেসান্তের বিরুদ্ধে ঐ সংবাদপত্রটি মি. জেনকিন্সের প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, আর যখন বিবিসাহেবা তা খণ্ডন করলেন, তখন আরঐ বিষয়ে উল্লেখমাত্র করল না। এখন আবার লোকমান্য তিলকের বক্তৃতা না ছেপেই তা খণ্ডন করার জন্য অনেক অযৌক্তিক কথা লিখছে...জনসাধারণকে তিলকের প্রতি বিরূপ করার উদ্দেশ্যে যেসব কথা লিখেছে, তাতে এর আন্তরিক নীচতাই প্রমাণ হয়।" 'ভারতমিত্র' সাহসের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করত, এই বিষয়টি তারই প্রমাণ।

যখন বাংলার লোকেরা কোন গঠনমূলক উদ্যোগ না করেই বয়কটের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেই সন্তুষ্ট ছিল, তারই সমালোচনা করে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ এর 'ভারতমিত্র'-র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল-"যখন বাংলা 'বহিষ্কার' 'বহিষ্কার' করে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করছিল, সেই সময়ই বোম্বাই-এর এক ভাই দেশের সম্পদ দেশেই রাখার উদ্দেশ্যে এক বিশাল কারখানা তৈরি করে ফেললেন...সাকচি (টাটার কারখানা সেখানে অবস্থিত) কলকাতার কাছেই, কিন্তু কলকাতার ব্যবসায়ীরা এর ফায়দা ওঠতে পারছে না, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।"

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে 'ভারতমিত্র' বরাবরই তীব্র আক্রমণ করেছে। ১৯১৬ সালের ২০শে অক্টোবর অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী 'প্রেস অ্যাক্টকী ভয়ঙ্করতা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখলেন-"সরকারের উচিত সংবাদপত্রগুলির টীকাটিপ্পণী করা নিষিদ্ধ করে সেগুলিকে শুধুমাত্রে সংবাদ পরিবেশনের অধিকার দেওয়া, প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে সংবাদপত্রকে হয়রানি করা উচিত নয়, এরা এই হয়রানির দ্বাবা সংবাদ পত্রগুলির ক্ষতি করা গেলেও এর দ্বারা জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব রুদ্ধ করা যাবে না।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পাশপাশি 'ভারতমিত্র'তে সামাজিক বিষয়সমূহও থাকত। দেশে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, হত্যা ও অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনাও কম ঘটত না। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক চরিত্রটিই নয়, সমগ্র সমাজের অন্ধকার দিকটিও দৈনিক 'ভারতমিত্র'তে অনালোকিত থাকেনি। সামাজিক অপরাধীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বাঙালী, অবাঙালী, ধনী, দরিদ্র, শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ, পুরুষ, নারী সকলেই ছিল।[২১]

সখারাম গণেশ দেউস্করের জামাতা পণ্ডিত লক্ষ্মণনারায়ণ গর্দে যখন 'ভারতমিত্র'র সম্পাদক হলেন (১৯১৯-২৫), তখন 'ভাবতমিত্র'র ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেল।[২২] অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ীর "সমাচার পত্রৌ কা ইতিহাস" থেকে জানা যায়, ১৯১৯ সালের প্রথমদিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'ভারতমিত্র'-র পরিচালনা নিয়ে তার মতবিরোধ চলছিল, যার জন্য তিনি ১৯১৯ সালের ৭ই আগষ্ট 'ভারতমিত্র' ত্যাগ করেন। এরপর মাত্র কয়েক মাসের জন্য বাবুরাও বিষ্ণু পরাড়কর সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েও অবস্থার উন্নতি করতে পারেননি বলেই মনে হয়।

এই পরিস্থিতিতে গর্দেজী শক্তহাতে 'ভারতমিত্র'-র হাল ধরেছিলেন। 'ভারতমিত্র'র মাধ্যমে গর্দেজী একই সঙ্গে গান্ধীবাদ এবং সাম্যবাদপ্রচার করতেন।[২৩] ৭ই মে, ১৯১৯ সালের 'ভারতমিত্র'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বলশেভিকবাদ এবং সত্যাগ্রহধর্মের অন্তিম উদ্দেশ্য একই, কিন্তু পথ ভিন্ন।

১৯১৯ সালের 'ভারতমিত্র'তে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের উন্নতির বিষয়ে আন্দোলন করার জন্য ভারতীয় নেতাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।[২৪] কলকাতার ইংরেজী পত্রিকা The Statesman এর ভারতবিরোধী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা "ষ্টেটস্‌ম্যানকী ধৃষ্টতা" শিরোনামে 'ভারতমিত্র'র ১৯১৯ এর ২৪ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গান্ধী ক্যারিশমার দৃষ্টান্ত রয়েছে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিলের 'ভারতমিত্র'তে।[২৫] ১৯১৯ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখের 'ভারতমিত্র'তে গান্ধীর গ্রেফতারের সংবাদে বুলন্দশহরের পহাসুতে আর্যসমাজ মন্দিরে কাজী শামসুদ্দিনের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলিমের যৌথ সভায় রাওলাট বিলের বিরোধিতা করার সংবাদ আছে।

১৯১৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ভারতমিত্র থেকে জানা যায় ১লা জানুয়ারী, ১৯১৯ সালে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ভবনে নদীয়ার মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় অসবর্ণ বিবাহ বিলের বিরোধিতা করা হয়। সেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।[২৬] ঐ তারিখের 'ভারতমিত্র'তেই আলফ্রেড থিয়েটার হলে ঐ বিলের বিরুদ্ধে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই হিন্দুদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপণ রয়েছে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পাঁচকড়ি ব্যানার্জী, রামদেব চোখানি প্রভৃতি। আশ্চর্যের বিষয়, যে 'ভারতমিত্র' সামাজিক প্রগতিশীলতার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখত, এই বিলের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তার কোন মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না।

১৯১৯ এর ৪ঠা জানুয়ারী 'দৈনিক ভারতমিত্র'তে অলইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল হকের ভাষণের সারাংশ দেওয়া হয়েছে। হকের মতে, ব্রিটিশ শাসনে ভারতের মুসলিমরা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে আছে, এবং অন্য ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের ব্রিটিশশাসনকে উৎখাত করতে হবে।

১৯১৯ এর ২২শে এপ্রিলের 'ভারতমিত্র'তে ব্রিটিশ সরকারের রাওলাট অ্যাক্টের যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানানো হয়।[২৭] ঐ বছরই ১৫ই এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে রয়েছে, রাওলাট আইনের প্রতিবাদে কলকাতায় জনগণের বিক্ষোভেব দ্বিতীয় দিন শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও পরে লোকেরা পাথর ছঁড়তে থাকে। পুলিশ মেশিনগান চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। বহু নিরীহ লোকের মৃত্যু হয়। লোকেরা বলছে ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে যে ৫ জন ইউরোপীয়কে ভারতীয়রা হত্যা করেছিল ব্রিটিশরা কলকাতায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। জনগণ পাথর ছুঁড়ে অপরাধ করেছে ঠিকই, কিন্তু বেগুণ চোরকে ফাঁসি দেওয়া আমরা কোথাও শুনিনি। 'স্টেটস্‌ম্যান'এ সরকারী কার্যকলাপকে সমর্থনের প্রচেষ্টাকে 'ভারতমিত্র' তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল।

'ভারতমিত্র' রাওলাট সত্যাগ্রহকে সমর্থন করছে তা স্পষ্ট। হিংসাকেও পরোক্ষভাবে

সমর্থন করেছে। কিন্তু এবিষয়ে 'ভারতমিত্র' তার বিরোধী বক্তব্যও প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না। ১৯১৯-এর এপ্রিল সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজিকে ১২ই এপ্রিল তারিখে যে খোলা চিঠি লিখেছিলেন সেটির হিন্দি ভাষান্তর প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ অহিংস গণ-আন্দোলনেব বিপদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সততার দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে শুধু মহাপুরুষরাই পারেন, তা সাধারণ মানুষের অসাধ্য।

একই পৃষ্ঠায় 'ভারতমিত্র'-র বক্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, এবং এও দেখা যায় যে, অহিংস গণ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি, রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। 'ভারতমিত্র' এই যুক্তি দেখিছে যে, "পুলিশ যদি হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে কোন দুর্ঘটনা ঘটত না।" তৎকালীন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে সাধাবণ মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্থিতপ্রজ্ঞ দূরদর্শী বক্তব্যকে স্বীকার না করে। 'ভারতমিত্র'-র সবকারী বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনুসবণ করেছিল এটা বোঝা যায় বিক্ষোভে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ থেকে। সবকার বিবোধী বক্তব্যের জন্য 'ভাবতমিত্র'-কে ২০০০ টাকা জমানত দিতে বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ এব ২১শে জুন 'ভারতমিত্র'-র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, "প্রেস অ্যাকট সরকারকে এই অধিকার দিয়ে বেখেছে যার দ্বারা সরকার যখন ইচ্ছা যেকোন পত্রিকা বা প্রেস থেকে জমানত চাইতে পারে...ঐ যুগও 'ভারতমিত্র' দেখেছে যখন দেশীয় ভাষার পত্রিকার উপর সরকারেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, আর সেই যুগও দেখেছে যখন ১৮৮০ সালে লর্ড-রিপণ ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট রদ করলেন...মহাযুদ্ধ চলাকালে 'ভারতমিত্র'কে দমন করা অপেক্ষা তার সঙ্গে সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা সরকার বেশী দেখিয়েছিল...মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং রাওলাট বিলের প্রচলন দেশের অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন এনেছিল। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সূচনা এবং মিষ্টার গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা তৎসহ অন্যান্য কারণে দেশে যে উপদ্রব হচ্ছে তা দমনেব জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে সংবাদপত্রের উপর আক্রমণও তার একটি অঙ্গ।...দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠিত পত্র নেই যার কাছ থেকে জমানত চাওয়া হয়নি। কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার ৫০০০ টাকা জমানত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। ঐ পত্রিকা ১০,০০০ টাকার নতুন জমানত দিয়েছে। "কালকাতা সমাচার" ২০০০ টাকা জমানত দেওয়ার পরিবর্তে বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক মনে করেছে।"[২৮] 'ভারতমিত্র' লিখেছে- 'ভারতমিত্র' কে এভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। জগতে এর কোন একটি মিশন আছে, আর তা সম্পূর্ণ না করে তা বন্ধ হবে না। 'ভারতমিত্র' যে নীতির উপর নির্ভর করে এতদিন পর্যন্ত চলেছে সেই নীতিতেই চলবে। পত্রপত্রিকার কর্তব্য হল পক্ষপাতশূন্যভাবে ব্যক্তি এবং বিষয়সমূহের আলোচনা করা। সরকারের কোন কাজ যখন আমাদের দোষমুক্ত মনে হয়েছে আমরা তাকে দোষমুক্ত বলতে কখনো সঙ্কোচ করিনি...এই হল আমাদের নীতি, ভবিষ্যতেও এই নীতিই থাকবে।"

অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী লিখেছেন, ১৯২১ সালেই 'ভারতমিত্র'-র প্রচার কমতে শুরু করে। তার মতে, ঐ সময় 'ভারতমিত্র'-র প্রচাব 'স্বতন্ত্র'"২৯-র চাইতে অনেকে কমে যায়। তবে সামাজিক বিকৃতিকে তুলে ধবার ক্ষেত্রে 'ভারতমিত্র' আগেব মতই সক্রিয় ছিল।[৩০]

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়েছিল। এই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কলকাতার 'ভারতমিত্র', 'দৈনিক বসুমতী', 'দুর্মুখ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হানাফী জমায়েত' এবং 'ইসলামী জগত' পত্রিকাকে জরিমানা করা হয়েছিল।[৩১]

১৯২৮ সালের মে মাসে নাগাদ কলকাতার জগন্নাথ ঘাটের নিকটস্থ মারোয়াড়ীদের এক উপসানগৃহ গোবিন্দ ভবনের মুখ্য মহান্ত হীরালাল গোয়েঙ্কার ব্যভিচারের বিষয়টি লোকচক্ষুর সামনে আসে।[৩২] কলকাতার 'হিন্দুপঞ্চ' এবং 'মতবাল' সাপ্তাহিক গোবিন্দভবন কেলেঙ্কারীর বিষয়টি বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছিল এবং ঘটনাটিকে 'ধিকৃত করেছিল।[৩৩] এই বিষয়টিতে গান্ধীজীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিনি 'হিন্দি নবজীবন'- 'ভক্তিকে নামপর ভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানে তিনি মেয়েদের জীবিত কোনও পুরুষকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করা থেকে বিরত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৩৪]

কলকাতার হিন্দি পত্রিকাগুলির মধ্যে গোবিন্দভবন নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। 'মারবাড়ী অগ্রবাল' নামক মাসিকপত্রিকা গোবিন্দভবনের ঘটনাকে ধিক্কার জানালেও মারবাড়ী সমাজের উপর 'মতবালা'-র আক্রমণের ভঙ্গীর সমালোচনা করে। এই বিষয়ে 'ভারতমিত্র'-র দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায় 'হিন্দুপক্ষ'-এর ৩১শে মে, ১৯২৮ সালের ৪১ পৃষ্ঠা থেকে।

পরবর্তীকালে আমরা 'ভারতমিত্র'কে সামাজিক প্রগতিশীলতার স্বপক্ষে কলম ধরতে দেখি। ১৯৩৩ সালের ৩১শে আগষ্টের 'ভারতমিত্র'তে বলা হয়েছিল হরিজনদের উন্নয়ণ হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করবে।

কলকাতার চরম সরকার বিরোধী 'উচিত বক্তা' সাপ্তাহিকের[৩৫] মত না হলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'ভারতমিত্র'-র চরিত্র ছিল জাতীয়তাবাদী। তবে এর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন কোন সময় রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। তার একটি প্রমাণ সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধীতা। অন্যদিক দিয়ে দেখলে এই বিরুদ্ধাচরণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৭৮ সালের ২রা জুন এই 'ভারতমিত্র'-ই লিখেছিল, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারের আইন করা উচিত, এবং জনগণের উচিত সরকারকে সাহায্য করা। কিন্তু ১৮৯১ সালে এই মত সম্পূর্ণ পালটে গেল কেন ? ঐ সময়কার বেশীরভাগ বাংলা সংবাদপত্রের মত ছিল, মেয়েদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধির ফলে হিন্দুসমাজ ভেঙে পড়বে।[৩৬] ১৮৯১ সালের 'ভারতমিত্র' সম্পাদক রামদাস বর্মাও একই আশঙ্কা করেছিলেন বলেই অনুমান করা যায়। উনিশ শতকের শেষ দিকের সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দিভাষী মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে খুব বেশী আলাদা ছিল বলে মনে হয় না। আবার এই 'ভারতমিত্র'ই ১৮৮০ এর দশকে নির্যাতিতা বিধবাদের লেখা কিছু পত্র প্রকাশ করেছিল,[৩৭] যা নিশ্চিতভাবে এই নিপীড়িতাদের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ।

সূত্র নির্দেশ

১. কৃষ্ণবিহারী মিশ্র - হিন্দি পত্রকারিতা : জাতীয় চেতনা অউর খড়িবোলী সাহিত্য কী নির্মাণভূমি, নতুন দিল্লী, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১১৮।

২. শ্যামসুন্দর শর্মা - হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস : বঙ্গীয় খণ্ড, বারাণসী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠ ১৩১।

৩. কৃষ্ণবিহারী মিশ্র - পূর্বোক্তগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬। ২৩শে জুলাই গ্ল্যাডষ্টোন ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে এই আইনের নিন্দা করেন। বড়বাজারের জ্ঞান বর্ধিনীসভা হিন্দিতে গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতি এক অভিনন্দনপত্র প্রস্তুত করে, যা কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দি লেখক ও সাংবাদিক সদানন্দ মিশ্র পাঠ করেন। ঐ অভিনন্দন পত্র 'ভারতমিত্র'-র নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪. শ্যামসুন্দর শর্মা - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৪।

৫. "...গ্ল্যাডষ্টোন...ভারতবর্ষ বিষয়ে যে বর্তমান রাজনীতি অবলম্বিত হয়েছে তাকে যথাসাধ্য দোষ দিয়েছেন। যেমন, আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের উপর চাপানো দুর্ভিক্ষের জন্য সঞ্চিত অর্থ অন্যকাজে খরচ করা, ইনকামের পরিবর্তে লাইসেন্স করা, সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের লোকেদের 'অনুরোধে সুতী' আমদানীর উপর মাশুল কমানো, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের অপমান করা...ভারতকে নির্বীর্য করা অর্থাৎ অস্ত্র আইন প্রবর্তন করা...দেশীয় সংবাদপত্র বিষয়ে অসঙ্গত অন্যায় ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রভৃতি...ভারতের দুর্দশার চরমসীমা উপস্থিত হয়েছে।"

৬. Dr. Prem Narain - The Age of consent Bill 1891 and its Impact on India's Freedom Struggle (Quarterly Review of Historical Studies, Calcutta, Volume X, 1970-71.No. 1)

৭. কৃষ্ণবিহারী মিশ্র - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৯।

৮. ড: রামরতন ভট্টনাগর : 'আলোচনা' পত্রিকা, ইতিহাস বিশেষাঙ্কে প্রকাশিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫।

৯. কৃষ্ণবিহারী মিশ্র - 'হিন্দি পত্রকারিতা : রাজস্থানী আয়োজন কী কৃতী ভূমিকা, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩০।

১০. বনারসী দাস চতুর্বেদী রচিত প্রবন্ধ, 'কাদম্বিনী' হিন্দি মাসিক, নতুন দিল্লী, নভেম্বর, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত। আরো দ্রষ্টব্য - বনাবরমল্ল শর্মা ও বনারসী দাস চতুর্বেদী সম্পাদিত বালমুকুন্দ গুপ্ত স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৬।

১১. শ্যামসুন্দর শর্মা - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪০।

১২. বেদপ্রতাপ বৈদিক সম্পাদিত হিন্দি পত্রকারিতা : বিবিধ আয়াম, দিল্লী ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৮২১।

১৩. শিউপূজন সহায়, শিউপূজন রচনাবলী, ৪ ৫/গ, পাটনা ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১৪১। আরো দ্রষ্টব্য, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পণ্ডিত অমৃতলাল চক্রবর্তী (১৮৬৩-১৯৩৬) - এক অনন্য হিন্দি সাংবাদিক ও লেখক' : ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৩, সম্পাদনা - গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩১৩।

১৪. বালমুকুন্দ গুপ্ত স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১০।

১৫. Haridas and Uma Mukherjee :India's Fight for Freedom, P-25, কার্জন বলেছিলেন, -"that the highest ideal of truth to a large extent a Western conception." ঐ সময়ের সংবাদপত্রগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের বিষয়গুলিকে তুলে ধরত। দ্রষ্টব্য- Sumit Sarkar : The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, New Delhi, 1977, P-24.

১৬. 'আশা কা অন্ত' : 'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা': দৈনিক ভারতমিত্র, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯০৫।

১৭. 'বঙ্গবিচ্ছেদ':'শিবশম্ভু কা চিট্‌ঠা':২১শে অক্টোবর, ১৯০৫, 'ভারতমিত্র'।

১৮. লক্ষ্মীশঙ্কর ব্যাস : পরাড়করজী অউর পত্রকারিতা, বেনারস ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৩৫।

১৯। কলকাতার হিন্দি দৈনিক, ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশ।

২০. ১৯১৬ সালের ২৩শে আগস্টের 'ভারতমিত্র'তে বেলেঘাটা থানার, অন্তর্গত চড়কডাঙ্গা রোডে এক বাঙালীর বাড়ীতে একটি বাণ্ডিলের মধ্যে ২টি পিস্তল ও কার্তুজ এবং টালিগঞ্জের কালীরঞ্জন চ্যাটার্জী নামক ছাত্রের বাড়ির পুকুর থেকে ৩টি পিস্তল পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবর রয়েছে। কালীরঞ্জন গ্রেফতার হয়েছে। সালকিয়াতে পুলিশের সঙ্গে যে দলটির সংঘর্ষ হয়েছিল। এবং সুবীরকুমাব সোম ও যুগলকিশোর দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কালীরঞ্জন ঐ দলেরই সদস্য। ঐ তারিখের 'ভারতমিত্র'-তে আছে - ''গত শুক্রবার হাওড়া-আমতা রেললাইনের চণ্ডীতলা ষ্টেশনের পাশে লাইনের উপর কোনও বস্তু রেখে ট্রেন উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।''

২১. দ্রষ্টব্য 'ভারতমিত্র' ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট, ১৯১৬, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৯।

২২. নিহালচাঁদ বেরীর হস্তলিখিত আত্মজীবনী : হমারি রাম কহানি।

২৩. শ্যামসুন্দর শর্মা - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৮১।

২৪. এই রচনাটি মাসিক 'মর্যাদা' পত্রিকা, এলাহাবাদ, অক্টোবর, ১৯১৯এর ১৮১ পৃষ্ঠায় পুণর্মুদ্রিত হয়েছিল।

২৫. খিদিরপুরের দুই মুসলিম নিজেদেব মধ্যেকার মামলা মিটিয়ে নিয়েছে ''মহাত্মা গান্ধী''-র গ্রেপ্তারের খবরে। কারণ এই দুঃখের সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ রাখতে চায়নি।

২৬. সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা, সুসঙ্গের মহারাজা, মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি।

২৭. 'ভারতমিত্র'তে যেসব সংবাদ শিরোনাম বেরিয়েছিল সেগুলি হল, 'ভারত সরকারের নতুন উদ্যোগ।' 'রাওলাট আইনের ব্যাখ্যা', 'সত্যাগ্রহের প্রতি অনুচিত দোষারোপ', এবং 'আন্দোলনকারীদেব দোষ দেওয়া।' উপরোক্ত লেখাগুলি নিশ্চিত ভাবেই সরকারী বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস।

২৮. আরো যে সব পত্রিকার কাছ থেকে জমানত চাওয়া হয়েছে বলে 'ভারতমিত্র' তে লেখা হয়েছিল, সেগুলি হল মাদ্রাজেব 'হিন্দু', 'স্বদেশমিত্রন' ও 'হিন্দুনেশন', প্রয়াগের 'ইন্ডিপেনডেন্ট' এবং

'ভবিষ্য'।

২৯. ১৯২০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, যার সম্পাদক ছিলেন অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী।

৩০. এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'চাঁদ' মাসিক পত্রিকা সেপ্টেম্বর, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ৪৩৪এ 'ভারতমিত্র'-র যে সংবাদটি পুণর্মুদ্রণ করেছিল তা হল, কলকাতার নিকটস্থ এক গ্রামে এক বৃদ্ধ কর্তৃক সুন্দরী যুবতীকে বিবাহের প্রচেষ্টা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

৩১. কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মতবালা' হিন্দি সাপ্তাহিকের ৫ই জুন, ১৯২৬ সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৩২. 'হিন্দুপঞ্চ' সাপ্তাহিক, কলকাতা, ১৭ই মে, ১৯২৮।

৩৩. 'মতবালা'তে 'পর্দে মে পাপ' এবং 'হিন্দুপঞ্চ' তে 'ব্যভিচার-মন্দির' নামে ধারাবাহিকভাবে ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার মাসিক 'মারবাড়ী অগ্রবাল' এর 'বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, ১৯৮৫ বিক্রম সম্বত অঙ্কের ৭১৪ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি প্রকাশ করে ধিক্কার জানানো হয়।

৩৪. গান্ধীজির রচনাটি ১৯২৮ সালের ২৪শে মে-র 'হিন্দুপঞ্চ'-এ পুণর্মুদ্রিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, হীরালাল মারবাড়ী মেয়েদের ভুল বুঝিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে প্রচার করে তাদের উপর অত্যাচার করত।

৩৫. ১৮৮৩ সালের ১২ই মের উচিতবক্তাতে (১৮৮০-৯৫) সম্পাদক দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র লিখেছিলেন -"দেশীয় সম্পাদকোঁ! সাবধান !! কঁহী জেল কা নাম সুনকার কর্তব্যবিমূঢ় মত হো জানা, যদি ধর্ম কী রক্ষা করতে হুয়ে যদি গবর্ণমেন্টকো সৎপরামর্শ দেতে হুয়ে জেল জানা পড়ে তো ক্যা চিন্তা হ্যায়। ইসমে মানহানি নহী হোতী হ্যায়। হাকিমোঁকে জিন অন্যায় আচরণোঁসে গবর্ণমেন্ট পর সর্বসাধারণ কী অশ্রদ্ধা হো সকতী হ্যায় উনকা যথার্থ প্রতিবাদ করনেঁসে জেলতো ক্যা যদি দ্বীপান্তরিত ভী হোনা পড়ে তো ক্যা বড়ী বাত হ্যায়? ক্যা ইস সামান্য বিভীষিকা সে হমলোগ অপনা কর্তব্য ছোড় বৈঠেঁ?"

৩৬. সুনীল সেন ও প্রদীপ সিংহ : বাংলার আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস (১৮০০-১৯০০), কলকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬১।

৩৭. Vasudha Dalmiya : The Nationalization of Hindu Traditions - Bharatendu Harishchandra and Nineteenth Century Banaras, Delhi, Paperbacks, 1999, p-365.

মুসলিম বিয়ের গান : সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শেখ মকবুল ইসলাম

মুসলিম সমাজের, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক সাহিত্য নিয়ে যেটুকু গবেষণাকর্ম হয়েছে তা মূলতঃ সংগ্রহধর্মী এবং বর্ণনাধর্মী। যে কোন গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধরনের কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে যে কোন সমাজের সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত স্রোত ও সংস্কৃতির কগনিশন (Cognition) কে বুঝতে হলে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা অবশ্যই দরকার। এদেশে মুসলিম বিয়ের গানের যে সব সংগ্রহ মুদ্রিত হয়েছে তার সাধ্য শক্তিনাথ ঝা'র (দ্র:গীত) সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখ্য। পরবর্তী উল্লেখ্য লোকশ্রুতি (১৫ সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত মালিনী ভট্টাচার্য ও সোমা মুখোপাধ্যায়ের লেখা এবং ওই পত্রিকাতেই রোমেনা বিবির সংগৃহীত ২৮টি গান (দ্র: লোকশ্রুতি পৃ: ৭৮-১০২)। এছাড়া আশুতোষ ভট্টাচার্যের (দ্র: রত্নাকর পৃ: ১৩৯৮-৯৯) নাম উল্লেখ্য। বাংলাদেশের মহম্মদ আবদুল জলিল মুসলিম বিয়ের গানের উল্লেখযোগ্য সংকলন করেছেন (দ্র: মেয়েলীগীতি)। মুসলমান সমাজের ভাষা, বিশেষতঃ মুসলিম মহিলাদের মুখের ভাষার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে, এই ধরনের সংগ্রহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে মুসলিম বিয়েরগান প্রভূত উপাদান সরবরাহ করতে সক্ষম।

উদ্দেশ্যমূলক এবং বিষয়কেন্দ্রিক গবেষণার জন্য মৌখিক-সাহিত্য-সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি ও তত্ত্বগত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। লোকায়ত সমাজে প্রচলিত গানের (অন্য বিষয়েরও) পাঠ (text)হুবহু সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। তাই পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে নিজস্ব সংগৃহীত মুসলিম বিয়ের গানের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধটি নিবেদিত হল; প্রয়োজনে অন্যান্য সংগ্রহেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রবন্ধের মূল বিষয় সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মূলতঃ তিনটি স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন মূল বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা হবে। তিনটি বিষয় নিম্নরূপ :-

১. বিয়ের গানের সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

২. মুসলিম বিয়েব গানের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং

৩. বিয়ের গানে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্র

বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তাবিত আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

১. বিয়ের গানের সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

ভাষা এবং সমাজ দুটোই পবিবর্তনশীল। ভাষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় অন্বয়ের কারণে,

সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। এটা যেমন কালানুক্রমিক প্রেক্ষিতে সত্য, তেমনি সমকালিক প্রেক্ষিতেও দেখা যায়, সমাজ ভেদ হলে, ভাষার কিছু কিছু ভিন্ন লক্ষণ ফুটে উঠছে। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক মানক যেমন- ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, বৃত্তি, বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ - ইত্যাদির নিরিখে ভাষার বিশ্লেষণ করলে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যায়। একই বাংলাভাষা মুসলিম সমাজে যেমন, অমুসলিম সমাজে তেমন নয়। একই সমাজে দশ-কুড়ি বছর বয়সী ছেলেদের ভাষার ধরন, পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সী পুরুষের ভাষার থেকে আলাদা। গ্রাম সমাজে পুরুষের ভাষার সঙ্গে নারীর ভাষার পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সমাজতাত্ত্বিক মানকগুলির পরিবর্তন সাপেক্ষে ভাষার পরিবর্তনের নানা দিক বিশ্লেষণ করে তুলে ধরাই সমাজভাষাতত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

কোন সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতন্ত্র্যের একটা বড় দিক ভাষার মধ্যে ফুটে ওঠে। সংস্কৃতির মৌখিক ঐতিহ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, তখন ভাষা হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সমাজের বিয়ের গন মূলতঃ নারীর গান। এখানে স্পষ্টতই ধর্ম এবং লিঙ্গ মানকদুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার মুসলিম বিয়ের গান পশ্চাদপদ নারী সমাজই ধরে রেখেছে। এই নারী সমাজের বিরাট অংশ শিক্ষার আলো ও সামাজিক স্বাধীনতা থেকে আজও বঞ্চিত। ফলে শিক্ষা, সামাজিক সংযোগ, আত্ম বিকাশের সুযোগ ইত্যাদি নানা মানকও এ প্রসঙ্গে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।

মুসলিম সমাজের বাংলা ভাষার গঠন আলাদা নয় তবে বাক্যবন্ধে শব্দ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষার স্বাতন্ত্র আছে। এই সমাজের মুখের ভাষার আরবী, উর্দু, পার্শী শব্দের ব্যবহার অনেক বেশী। কিছু আরবী ফারসী শব্দ ভাষাবিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বাংলাভাষায় এসেছে সবার নির্বিশেষে দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এমন বেশ কিছু আরবী, ফারসী শব্দ আছে যা বাঙালী জাতির মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমান সমাজ সাপেক্ষ। এর মধ্যে বিভিন্ন আত্মীয়বাচক শব্দ, ধর্ম সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক বা আচার-কৃত্য মূলক শব্দ বিশেষ উল্লেখ্য। মুসলিম বিয়ের গানগুলিতেও এই সব শব্দগুলি পাওয়া যায়। যেমন, আত্মীয়বাচক শব্দ: শাশ বিবি (-বিবি) (শাশুড়িমা-১); খালাশাস বিবি (খালা-) (মাসী-১); খালা (মাসী-৩); দামাদ (জামাই-৬) চাচা (-জী) কাকা/জ্যাঠা-৭-১৪) চাচী (কাকী/জ্যেঠিমা-১৫) বেটি (তারামণি বেটি) (কন্যা-৯)।

বিভিন্ন বিশেষ্য পদ: আনার (ডালিম-১); আরমান (ইচ্ছা/বাসনা-১,৬); সুরৎ (রূপ-২); আসমান-জমিন (আকাশ-পাতাল-৩); শরম (লজ্জা-৩); লালচ (লোভ-৭) ইনসাফ (ইনসাফ্/বিবেচনা-৮); ডালিলাম/ডেলেচে (পেতেছে ৩, ১০, তুলনীয় হিন্দী 'ডাল দিয়া- উল্লেখ্য এদুটি বিশেষ্য নয় ক্রিয়াপদ)।

এই ধরনের শব্দের বহুল ব্যবহার মুসলিম সমাজের মুখের ভাষায় পাওয়া যায়। গান বিশ্লেষণ করে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। মুসলিম সমাজের মুখের ভাষার বা মৌখিক সাহিত্যের বাক্যগঠন রীতি বাংলার নিজস্ব। গঠনগত দিক থেকে, একটি বাক্যকে যদি বৃহৎ সংগঠন (ম্যাক্রো-স্ট্রাকচার) এবং শব্দ যদি অণু-সংগঠন (মাইক্রো স্ট্রকচার) ধরা হয় তাহলে

বলা যাবে বাক্য নির্মান রীতিতে মুসলিম সমাজের বাংলায় পরিবর্তন আছে অণু-সংগঠন স্তরে। সেখানে বাংলা ভাষা সুলভ একটি শব্দকে প্রতিস্থাপিত করা হয় আরবী বা ওই জাতীয় শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ মুসলমান সমাজের বাংলাভাষার বিশিষ্টতার মূলে রয়েছে অণুসংগঠনের পরিবর্তন রহস্য। যাকে ভাষাতত্ত্বের কোড শিফটিং (Code Shifting) বলে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, মুসলমান সমাজের মুখের ভাষার এই পরিবর্তন কেন হয় ?' কেন আরবী ফারসীর প্রতি এই ঝোঁক ? -এখানেই ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের বিশিষ্টতার (আইডেনটিটির) প্রশ্নটি জড়িত। লোকায়ত মুসলমান সমাজ তার বাংলাভাষার মধ্যেই ইসলামীয় বিশিষ্টতাকে ধরে রাখতে চেয়েছে। কেন চেয়েছে তার উত্তর বিশিষ্টতার সঙ্কট (আইডেনটিটি ক্রাইসিস) যা নাকি সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে মুসলমান সমাজের সংস্থানের ওপর নির্ভরশীল। সে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল বাংলার মুসলমানের ভাষা বাংলা-ধর্ম ইসলাম। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল্ কুরআনের ভাষা আরবী। এই সূত্রে আরবী ভাষার প্রতি মুসলমানের দুর্বলতা। তা ধর্মগ্রন্থের ভাষা। তাই আরবীর প্রতিটান। অন্যদিকে মোঘল ও সুলতানি আমলে রাজকাজে ফারসীর ব্যবহার থাকায় মুসলমান সমাজ অতীত থেকেই এই শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ পেয়েছে। ফলে মুসলমান সমাজে আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ মেনে নিয়েও বলতে হয়, বর্তমানের শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলিমদের মুখের ভাষায় এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের হার অনেক কমে এসেছে। এই পরিবর্তনও মুসলমান সমাজে সত্য।

ভাষার ক্ষেত্রে মুসলিমরা ইসলামীয় বিশিষ্টতাকে ধরে রাখতে চায় - এই কথাটাকে ঠিক এইটুকুতেই শেষ করে দিলে অনেকেরই মনে হতে পারে ঃ মুসলমান সমাজ এতই কট্টর ও গোঁড়া যে অমুসলিম সমাজের কোন কিছু তারা সহ্য করতে বা গ্রহণ করতে পারে না !! এই ভ্রান্তি দূর করতে আলোচনা আর একটু বিস্তারিত করা দরকার। যে মুসলিম সমাজকে দূর থেকে এবং নির্বিচারে অনেকে "গোঁড়া" বা "কট্টর" আখ্যা দেন। কিন্তু লোকায়ত মুসলিম সমাজের সংস্কৃতির গভীরে যে নিটোল সংহতিব বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে-সে সব কথা প্রকৃত গবেষণার দ্বারা এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। এমন দু একটি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দিক আলোচনা প্রসঙ্গে তুলে ধরতে চাই। তবে তা, তৃতীয় পর্যায়ে বিয়ের গান সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্র এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আপাততঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিয়ের গানের গঠন সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

২. মুসলিম বিয়ের গানের গঠনগত বৈশিষ্ট্য :

বিয়ের গানেব ভাষার আলোচনার সঙ্গে গানের গঠনের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হবে। মুসলিম বিয়েব গানের গঠনগত সাধারণ বৈশিষ্ট আছে। 'গঠন' শব্দটি, ভাষাবিজ্ঞানে, আপেক্ষিক অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়। "গঠন" (construction) এবং "গঠনগত উপাদান" (Constituent) (দ্র: ভাষা পৃ: ৪২২) এই দুটি ধারণা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। বিয়ের গানের একটি বাক্য- 'বলি পানখাকী ছুলা দাঁতি গ্যাঁজা খেয়েচে" (গান সংগ্রহ - ৪) এই গোটা বাক্যটিই একটি 'গঠন' বা কনসট্রাকশন। অন্যদিকে, পানখাকী, ছুলাদাঁতি,

গ্যাঁজা, খেয়েছে-এই শব্দগুলি গঠনগত উপাদান।' ব্যাপক অর্থে এরা প্রত্যেকেই গঠনএবং মূল গঠন সাপেক্ষে এরা কখনও কখনও গঠনগত উপাদান - গঠন কথাটি তাই, আপেক্ষিক।

যাইহোক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে মূলবাক্যকে অব্যবহিত গঠন অগ (ইম্মিডিয়েট কনস্ট্রাকশন/আই সি) এবং বাক্যের শেষ ধাপ শব্দের স্তরকে তথা শব্দকে চরম গঠনগত উপাদান/চগ) (আলটিমেট কনস্টিটিউয়েন্ট ইউ সি) (দ্র: ভাষা পৃ: ৪২৩) বলা হয়। এই বিভাজন মাফিক অগ [আই সি] কে যদি আমরা বৃহৎ সংগঠন (ম্যাক্রো-স্ট্রাকচার) বলি, তবে চগ ইউ সি-কে আমরা অনুসংগঠন (মাইক্রো-স্ট্রাকচার) বলবো। গঠন রহস্যের এই দুটি মৌলিক রীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বিয়ের গানের গঠনে দুটি মৌলিক নিয়ম কাজ করেছে-

১. বৃহৎ সাংগঠনিক পুনরাবৃত্তি এবং

২. অণুসাংগঠনিক পরিবর্তন।

বিষয় দুটি ব্যাখ্যা করা যাক।

এক. বৃহৎ-সাংগঠনিক (বৃস) পুনরাবৃত্তিঃ সরাসরি উদাহবণ দিয়ে শুরু করা যাক। সংগৃহীত ৪ সংখ্যক গানটিতে (বলি আসমান জমিন জুড়ে...) ক-খ-গ-ঘ এই চারটি স্বাতন্ত্র্য গঠন আছে এবং এরা প্রত্যেকেই একবার করে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। গানটির গঠনের ১-৮ পর্যন্ত স্থানে এদের পুনরাবৃত্তির ক্রম এই রকম: বৃস (১/ক-২/ক), (৩/খ-৪/খ), (৫/গ - ৬/গ) এবং (৭/ঘ - ৮/ঘ)। অনুরূপভাবে ৫ সংখ্যক গানে বলি খাকী ছুলা দাঁতি...) বৃহৎ -সাংগঠনিক পুনরাবৃত্তির ধরন এই রকম: [বৃস (১/ক - ২/ক), (৩/ঘ-৪/ঘ), (৫/গ - ৬/গ), (৭/ঘ - ৮/ঘ) এবং (৯/ঙ - ১০/ঙ-১)। ৯-এর ঙ গঠনটির একটি অণুসংগঠন (চগ/ইউসি) 'কুঁচার বদলে 'বাবরি' পবিবর্তিত হয়েছে বলে গঠন ১০ কে ঙ-১ বলা হল (দ্রঃ অণুসাংগঠনিক পরিবর্তন)। সংগৃহীত অন্যান্য গানগুলিতে এই পুনরাবৃত্তির ধরন কেমন বা গানের বৃস-সংখ্যা (বাম দিকে) এবং গঠন চিহ্ন (ডান দিকে) দেখলেই বোঝা যাবে। একটি বৃহৎ সংগঠনের এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতা মুসলিম বিয়ের গানের মস্ত বড় দিক।

দুই. অণু-সাংগঠনিক (অস) পরিবর্তনঃ বৃহৎ সংগঠনের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অণুসংগঠনের পরিবর্তন-মুসলিম বিয়ের গানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক। অণু-সংগঠন বলতে আরো ৮০ম গঠনগত উপাদানকে (চগ/ইউ সি) বা সাধারণ অংশে একটি শব্দকে বুঝবো। বৃহৎ-সংগঠন যখন পুনরাবৃত্ত হয় তখন তার সবগুলি শব্দ ঠিক থাকলে একটি দুটি শব্দ বদলে যায়। এই পরির্বতন হচ্ছে বাক্য সংগঠনের অণু-স্তরে (চগ-স্তবে)। একেই অণুসাংগঠনিক পরিবর্তন বলা হচ্ছে। সংগৃহীত-৯ সংখ্যক গান (বলি অ্যাতো সাধের তারামণি বেটি...) লক্ষ্য করা যাক। বৃস-ক এবং খ পরবর্তী ক্ষেত্রে দু বার করে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বৃস-ক যথাক্রমে ১/ক - ৩/ক-১-৫/ক-২ হয়েছে। বৃস-১/ক-এর অণুসংগঠন 'বুড়ো' পরিবর্তিত হয়ে বৃস ৩/-ক-১ এ 'গ্যাঁড়া' হয়েছে এবং ৫/ক-২তে হয়েছে 'কুঁড়ো'। ক-এর অণুসংগঠন পরিবর্তিত হয়েছে বলেই পরিবর্তিত গঠনকে ক-১/ক-২ বলে চিহ্নিত করা হল। ক-১/ক-২ এর মূল গঠন হল গঠন ক। অনুরূপভাবে কুঁড়ো গুলবার (বৃস-ঘ) স্থানে 'ম্যাড়া

বরাবর' এবং মুড়ি ভাজবার পরিবর্তন ঘটে খ-১/ঘ-২ গঠন স্থান পেয়েছে। ৯ সংখ্যক গানের ক এবং ক-১ এই দুটি গঠন এই রকমঃ

১. বলি অ্যাতো সাধের তারামণি বেটি...জামাই কেন বুড়ো গো...ক

৩. বলি অ্যাতো সাধের ... জামাই কেন গ্যাঁড়া গো...ক-১ উল্লিখিত দুটি বৃহৎ সংগঠনে একই রকম বাক্য গঠন রীতি (সিনট্যাগমেটিক সেনটেন্স স্ট্রাকচার) অনুসৃত হয়েছে। সমান্তরাল বাক্য গঠন রীতিও বলা চলে। কিন্তু ১/ক মৌলিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই একটি অণুসংগঠন (বুড়োর স্থানে গ্যাঁড়া) পরিবর্তিত হয়ে বৃস - ১/ক-১ রূপলাভ করেছে। এই পরিবর্তন মুসলিম বিয়ের গানের দ্বিতীয় মস্ত বড় দিক। একেই আমরা অণু সংগঠনের পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করেছি।

বৃহৎ-সংগঠনের পুনরাবৃত্তি ও অণু-সংগঠনের পরিবর্তনে মুসলিম বিয়ে গানের যে গঠনগত প্যাটার্ণ তৈরী হয় তা সব থেকে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে সংগৃহীত-৮ সংখ্যক গানে। বিষয়টিকে নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল:

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩/খ	বলি	কোলের	কামিনকে	জলেকে	দিয়ে	মাছের	করলে
৬/খ-১				ময়রাকে			
৮/খ-২				মুচি		জুতোর	
১০/ঘ-৩				বেহারাকে		পাল্কীর	
১০/ঘ-৪	বলি	কোলের	কামিনকে	তাঁতিকে	দিয়ে	কাপড়ের	বায়না
	=	=	=	≠	=	≠	=

['সমান' বোঝাতে (=) এবং 'সমান নয়' বোঝাতে (≠) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।]

প্রদত্ত রেখতালিকায় ৩/ক, ৬/ঘ-১ ইত্যাদি গঠনের বাক্যগঠন রীতিকে (Syntax) আনুভূমিক (Horizontal) দিক এবং প্রত্যেকটি গঠনের ১,২,৩,৪ ইত্যাদি চিহ্নিত অংশের পারস্পরিক ঊর্ধাধঃ (vertical) সম্পর্ককে শব্দার্থগত দিক (Semantic) ধরা হয়েছে। এবারে যদি আমরা আনুভূমিক ও ঊর্ধাধঃ প্রেক্ষিতে (বাক্যগঠন ও শব্দার্থ) বিচার করি তাহলে দেখা যাবে আনুভূমিক দিক থেকে বাক্যগঠন রীতিতে বৃহৎ সংগঠন গুলির [৩/খ = ৬/ঘ-১ = ৮/ঘ-২ = ১০/ঘ-৩ = ১২/ঘ-৪] প্রত্যেকটিকেই অনুরূপ বাক্যগঠন রীতি (সিনট্যাগমেটিক সেনটেন্স স্ট্রাকচার) অনুসৃত হয়েছে। অপরপক্ষে, ঊর্ধাধঃ বা নব্যার্থগত দিক থেকে প্রত্যেকটি বৃহৎ সংগঠনের (৩/ঘ - ১২/ঘ-৪ পর্যন্ত) ১,২,৩,৫, এবং ৭ সমান। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি [১: ৩/ঘ = ৬/ঘ-১ = ৮/ঘ-২ = ১০/ঘ-৩ = ১২/ঘ-৪] এবং অনুরূপ ২:৩/ঘ = ৬/ঘ-১ ইত্যাদি]। কিন্তু বৃহৎ সংগঠনগুলির ৪ এবং ৬ স্থানের অণুসংগঠগুলিব অর্থগত দিক থেকে ঊর্ধাধঃ প্রেক্ষিতে সমান নয় (প্যারাডিগমেটিক)।

অর্থাৎ: [৪,৬: ৩/ঘ ≠ ৬/ঘ-১ ≠ ৮/ঘ-২ ≠ ১০/ঘ-৩ ≠ ১২/ঘ-৪। অর্থাৎ ≠ জেলে ≠ ময়রা ≠ মুচি ≠ বেহারা ≠ তাঁতি। অনুরূপ, মাছ ≠ মিষ্টি ... ইত্যাদি। মুসলিম বিয়ের গানের গঠনের বৃহৎ সাংগঠনিক পুনরাবৃত্তি এবং অণু সাংগঠনিক পরিবর্তনের পিছনে বাক্যগঠনের সমানতা এবং একটি দুটি অণুসংগঠনের অর্থগত অসমানতার নীতিই মূলে ক্রিয়াশীল হয়েছে। বিশেষত: অণুসংগঠনের এহেন পরিবর্তন ঘটিয়ে, মূল বাক্যের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে, গানের গঠন সংপ্রয়োজন মাফিক আরও বাড়ানো সম্ভব। এবং সেই ভাবেই গনা বেড়ে চলে লোক সমাজে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অণু-সাংগঠনিক পরিবর্তনেরও একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা রয়েছে। বাক্য গঠন চিঠিতে অণুসাংগঠনিক পরিবর্তনের স্থানও খুব সুনির্দিষ্ট। এবং 'গঠনের' বাক্য বিন্যাসের ব্যাকরণিক অন্বয়ও একান্ত স্থাণু (রিজিড্)। এই কারণে পরিবর্তিত অণুসংগঠনের স্থান দুটির বদ্ধ রূপিম (বাউন্ড মরফিম) (দ্র: ভাষা পৃ: ৩৭২) যথক্রমে - ['কে'] এবং [-'র'/'-এর'] -এদের কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে মুক্ত রূপিম (ফ্রি মরফিম) (দ্র: ভাষা. পৃ: ৩৭২) দুটি বিশেষ্য পদের। অর্থাৎ পরিবর্তিত অণুসংগঠণ দুটিতে[বিশেষ্য+('-কে')] এবং বিশেষ্য + [(-'র/-এর')] এই কাঠামোর মধ্যে শুধুমাত্র বিশেষ্যপদই (মুক্ত রূপিমই) পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন বিয়ের গানের স্থাণুগঠন (রিজিড্ স্ট্রাকচারে) একটি গঠনগত নমনীয়তার সত্যকেই তুলে ধরে। যাইহোক, অণুসাংগঠনিক পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সংগৃহীত গানগুলিতেও মিলবে।

মুসলিম বিয়ের গানের গঠনগত এই বৈশিষ্ট্য শুধু হাওড়া জেলায় নয় এই বাংলা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসমিল সমাজে লক্ষ্য করা গেছে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা থেকে শক্তিনাথ ঝা সংগৃহীত গানে (দ্র: গীত সংখ্যা - ১১, ১৩, ১৫, ১৬ ইত্যাদি), বাংলাদেশের রাজসাহী থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত গানে (দ্র: রত্নাকর পৃ: ১৩৯ গান, ৫৯) মুর্শিদাবাদ থেকে মালিনী ভট্টাচার্য ও সোমা মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত গানে (দ্র: লোকশ্রুতি, গান ঃ মরি না আর বাঁচি না বা মা টিমা আমার বুড়ো পৃ: ৮৪, ৮৫) শ্রীমতী রোসেনা বিবির সংগৃহীত গান (দ্র: লোকশ্রুতি, পৃ: ৯২-১০২, গান- ২,৫,৬,১১,১৫ ইত্যাদি) এবং বাংলাদেশ থেকে মহম্মদ আবদুল জলীল সংগৃহীত (দ্র: মেয়েলীগীত) একাধিক গানে যেমন রাজসাহী থেকে ৬,৭,৮,১০; নওগাঁ থেকে ৪৪, ৪৫, ৫৩, ৬৯, পাবনা থেকে ১২৪, ১২৫ এবং রংপুর থেকে ২০২, ২০৩ ইত্যাদি) বৃহৎ সাংগঠনিক পুনরাবৃত্তি ও অণু-সাংগঠনিক পরিবর্তনের দিকটি ধরা পড়েছে। তাই মনে হয়, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ (এ বাংলা) সহ রাজসাহী, পাবনা, রংপুর (বাংলাদেশ রাষ্ট্র) ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম সমাজে বিয়ের গানের গঠনের একরূপতাও রয়েছে। তবে এই গঠনগত একরূপতার কারণ সমাজগত, না ঐতিহ্যগত তা অন্য গবেষণার বিষয়। যাইহোক এই সমাজে বিয়ের গানের গঠনের উল্লেখযোগ্য দুটি দিক হল বৃহৎ সংগঠনের পুনরাবৃত্তি ও অণু-সংগঠনের পরিবর্তন।

৩. বিয়ের গানে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্র ঃ

মুসলিম বিয়ের গানে সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহারের অণুবর্তনে, আইডেনটিটির কথা যেখানে শেষ করেছিলোম - সেখান থেকেই আবার শুরু করি। ইসলামিক আইডেনটিটির কারণে উর্দু আরবী উপাদান বাংলা ভাষায় টিকিয়ে রাখার প্রবণতা যেমন লোকায়ত মুসলমান সমাজের একটি দিক তেমনি কোনভাবেই মুসলিম সমাজ সুলভ নয় এমন বহু জিনিসও ইসলামপন্থী লোকসমাজ বাংলার সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছে। আমাদের মধ্যে কতগুলো ভ্রান্ত ধাবণা কাজ করে। অনেকে ভাবে হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্কৃতি! আসলে ধর্মাচারের হিন্দু মুসলিম থাকতে পারে-সংস্কৃতির হিন্দু মুসলিম নেই। বরং কোন একটি সংস্কৃতি ধারা হিন্দু মুসলিম উভয়ের মধ্যে প্রসারিত হয়ে উভয় সমাজের এক সূত্রে সংস্কৃতির জগতে সমন্বিত করে রেখেছে-এই সত্য আমরা সর্বদাই ধরতে পারি না। ধরতে পারি না বলেই বৃহত্তর বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম সমাজের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে - সেই কথাটা আমাদের জানার বাইরেই থেকে যায়। যাইহোক বিয়ের গানে ফুটে ওঠা এমন কয়েকটি সাংস্কৃতিক-সমন্বয়ের সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

সিঁদুর ঃ

সিঁদুরের ব্যবহার মুসলিম সমাজের প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায় না। ধারণা - ওটা হিন্দুর ব্যাপার! তাই প্রাত্যহিক জীবনে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জিত। কিন্তু মুসলিম বিয়ের স্ত্রী আচারে শাঁখা সিঁদুর একান্ত আবশ্যক। বিয়ের দিন অনেক মুসলিম মেয়ে এক দিনের জন্য সিঁদুর পরে। এই আনুষ্ঠানিকতা প্রমাণ করে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমাজের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র একদিন নিবিড় ছিল। যার স্মৃতি একদিনের সিঁদুর পরার রীতিতে এখনও বেঁচে আছে। মুসলিম বিয়ের গানেও তাই সিঁদুরের প্রসঙ্গ দেখা যায়। মৎ সংগৃহীত-গান সংখ্য-৩ এ সিঁদুর-আলতার প্রসঙ্গ আছে। ঝা সংগৃহীত গানে (দ্র: গীত, গান ৬০, ৬৩, ৭০) এবং জলিল সংগৃহীত (দ্র: মেয়েলী গীতি গান ১০৩, ৩৮৭, ৪১০,৪১২, ৪১৫ ইত্যাদি) গানেও সিঁদুরের প্রসঙ্গ রয়েছে। মুসলিম সমাজে সিঁদুরের প্রসঙ্গ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্রকেই আভাসিত করে।

বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের প্রভাব ঃ

মুসলিম ও বৈষ্ণব স্পষ্টতই পৃথক সমাজ। বৈষ্ণব সমাজের শ্রীকৃষ্ণ, যমুনানদী, মোহন বাঁশি - ইত্যাদির বিষয় মুসলিম সমাজেও অর্থবহ হয়ে উঠতে দেখা গেছে। যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ সম্পর্কিত কোন ধারণাই মুসলমান সমাজের কাছে বিধর্মী বা ইসলাম বিরোধী কিছু নয়। বরং তা বর কনের নবীন প্রেম প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ঝা সংগৃহীত গানে (দ্র; গীত গান-৭১) কনে নিজেকে প্রশ্ন করছে : শ্যাম কদমতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেন সে জলে নেমেছিল ? রোসেনা বিবি সংগৃহীত গানে লোকশ্রুতি গান=৩ কনে বলছে-'শাম (শ্যাম) গিয়েছে দুর্বা নিতে আয়না ধরে দেখবো"। ঝা সংগৃহীত (দ্র: গীত) ৭১ সংখ্যক গানে এসেছে কদম গাছের প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের বাঁশি বা বাঁশি বাজানের প্রসঙ্গও এসেছে মুসলিম বিয়ের গানে। ঝা সংগৃহীত (দ্র:গীত) ৫১ ও ১৪৬ সংখ্যক গানে শ্যামের বাঁশির প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম

গানে নারী বলছে সে যখন ধান ভানে তখন সে শহরে প্রবাসী তার নীলমণি শ্যামের বাঁশি শোনে। দ্বিতীয় গানে নারী বলছে সে বাঁশি বড় মধুর। "আগে যদি জানতাম..." "আমি ঘর কন্য ঘর ত্যাগ করে শুনতাম বাঁশের বাঁশি গো"। জলিল সংগৃহীত (৩৯১ সংখ্যক) গানে নারী বলছে- "বাঁশির শব্দে হামার/মন উতলা হে লাল/ধীরে ধীরে।'-আকুল শরীর মোর বেআকুল মন' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার এই সুরই যে ফুটে উঠেছে মুসলিম বিয়ের গানে। কৃষ্ণ তার কালোরূপে মুগ্ধ করেছিল শ্রীরাধাকে। বৈষ্ণব কবি বলেছেন- 'কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে'। অনুরূপ গ্রামসমাজের মুসলিম নারী গেয়েছে-"কালজল আনতে গিয়ে কাল পড়ে মনে রে/কাল চোখের ইশারায় আমার নয়ন ঘোরে রে - (দ্র:গীত, গান-৭৫)। ফলে দেখা যাচ্ছে লোকায়ত মুসলিম সমাজে বৈষ্ণব ভাবনার নানা দিকও স্থান পেয়েছে। সেখানে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ ধর্মের নিয়মে নয় সংস্কৃতির নিয়মে মুসলিম সমাজের আপনার হয়ে উঠেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বা তার বাঁশিকে আপন করে নিতে ধর্ম বাধা হয়ে ওঠেনি। এই সত্য সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আরও একটি সূত্রকে উন্মোচিত করে। মুসলিম বিয়ের লোকাচারের মধ্যে কিভাবে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছে - সে নিয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্র: অনুসন্ধান-১৪ পৃ: ৪৪২-৪৫১)। বর্তমানে ভাষা প্রসঙ্গে আরও খানিকটা আলোচনা করা গেল। মুসলিম বিয়ের গানের ভাষায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পাশাপাশি এ হেন সমন্বয়ের প্রবণতাও বাস্তব সত্য।

সূত্র নির্দেশ:

১. অনুসন্ধান - ইতিহাস অনুসন্ধান-১৪, সম্পাদক-গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২০০০, ফার্মা কে এল এম প্রা. লিমিটেড, কলিকাতা, দ্র: প্রবন্ধ হাওড়া জেলার মুসলিম বিবাহ: সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি দিক - শেখ মকবুল ইসলাম। পৃ: ৪৪২।

২. গীত - মুসলমান সমাজের বিয়ের গীতি, শক্তিনাথ ঝা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৬।

৩. ভাষা - সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা - ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

৪. মেয়েলী গীত - বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীতি - মহম্মদ আব্দুল জলিল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪।

৫. রত্নাকর - বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (৩ খণ্ড); শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা: লিমিটেড, ১৯৭৭।

৬. লোকশ্রুতি - লোকশ্রুতি - ১৫ (পত্রিকা)। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯।

॥ মুসলিম বিয়ের গান সংগ্রহ ॥

[বর্তমান লেখকের গবেষণা অঞ্চলে মুসলিম বিয়ের চারটি ভিন্ন অনুষ্ঠানের গান প্রচলিত আছে। (১) ক্ষীর খিলানী গান (২) গায়ে হলুদের গান, (৩) আইবুড়ো ডুবুকের গান (৪) উসোর গান। পুনরাবৃত্তি এড়াতে এখানে 'ক্ষীর খিলানী'র গান সংযোজন করা হল না (দ্র: ইতিহাস অনুসন্ধান-১৪, পৃ: ৪৪২-৪৫১)। গানগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য উচ্চারণ মাসিক বানান লেখা হল। বাম দিকে ১ সংখ্যার অর্থ সামগ্রিক

গানের এক সংখ্যক গঠন। এবং ১.২ এর অর্থ একই গঠন পর পর দুবার পুনরাবৃত্ত হবে যেমন ৩ সংখ্যক গানে লেখা হয়েছে। বাম দিকে ক, খ এর অর্থ বৃহৎ সংগঠনের (বৃস) স্বাতন্ত্র্য সূচক চিহ্ন। এক ক-১/ঘ-১ ইত্যাদির অর্থ ক এই গঠনের কোন একটি দুটি অনুসংগঠনের পরিবর্তন হয়েই ক-১ বা খ-১ হয়েছে।]

সংগ্রহ-১ ১-৪ গায়ে হলুদের গান

১.২. বলি ছাঁচি বোরোজের ধারে ধারে মিঠে আনারের গাছো যে ...ক।

৩.৪. বলি শাশবিবি আরমান করেছে জামাই কেমন দেখবে গো...খ।

৫.৬. বলি শাস বিবির হাতে আছে জামাই ভুলানো পানো (পান) গো...গ।

৭.৮. বলি ছাঁচি বোরোজের ধারে ধারে মিঠে আনারের গাছো গো...ক

৯.১০. বলি ঘালাগান বিবি আরমান করেচে জামাই কেমন দেখবো গো ...খ-১

১১.১২. বলি খালা শাশবিবির হাতে হাতে আছে জামাই ভুলোনো রুমাল গো...গ-১

বোরোজ - পান চাষের বোরোজ, আনার - ডালিম, শাশবিবি - শাশুড়ি, আরমান - ইচ্ছা খালা শাশবিবি - মাসী শাশুড়ি

সংগ্রহ - ২

১.২ বলি খুদে মেদির বলে বনে খেলাইরে মরে কামিনী - ক

৩.৪ বলি কি দিয়ে লুটবে আনন্দ অতি সুরতের কামিনী - খ

৫.৬ বলি মায়ের হাতের অনন্ত দিয়ে লুঠবে আনন্দ কামিনী - গ

৭.৮ বলি খুদে মেদির বনে বনে খেলাই রে মোর কামিনী - ক

৯.১০ বলি কি দিয়ে লুটবে আনন্দ অতি সুরতের কামিনী - খ

১১.২২ বলি ভাবীর নাকের বেওসর দিয়ে লুটবে আনন্দ কামিনী গ-১

খুদে মেদি - ক্ষুদ্র পাতাযুক্ত মেহেন্দি গাছ, সুরতের কামিনী-রূপসী নারী, বেওসর-নোলক।

সংগ্রহ - ৩

১. বলি আসমান জমিন জুড়ে ডালিম পালঙ (পালঙ্ক) রে...ক

২. বলি আসমান জমিন জুড়ে ডালিলাম পালঙ রে...ক

৩. বলি সেই না পালঙের নীচে আছে মোতিচুরের হাঁড়ি যে...খ

৪. বলি সেই না পালঙের নীচে আছে মোতিচুরের হাঁড়ি যে...খ

৫. বলি কুরীর খানা করিল চুরি সেই না মোতিচুরের হাঁড়ি যে...গ

৬. বলি কুরীর খানা করিল চুরি সেই না মোতিচুরের হাঁড়ি যে...গ

৭. বলি কোথায় ছিল আনন্দ এ যো শরমো যে ঢাকলো রে ...ঘ

৮. বলি কোথায় ছিল আনন্দ এ যো শরমো যে ঢাকলো রে...ঘ।

আসমান জমি জুড়ে...বৃহৎ পালঙ্ক যেন স্বর্গমর্ত্য জুড়ে রয়েছে। কুরী -মহিলা নাম বিশেষ, এ গো - এই যে, শরমো-শরম/লজ্জা।

সংগ্রহ - ৪

১.২ বলি পানখাকী ছুলা দাঁতি গ্যাঁজা (গাঁজা) খেয়েছে ...ক
৩.৪ বলি বাসরিয়া গ্যাঁজা কনের মা কেই বা সেজেছে...খ
৫.৬ বলি আনন্দর হাতের গুড়গুড়িয়া হুঁকে সেই বা সেজেচে...গ
৭.৮ বলি সেই গ্যাঁজা খেয়ে কনের মায়ের মাথা ধরেছে ...ঘ
৯. বলি কুঁচার হাওয়া দাওরে আনন্দ গরমি লেগেচে...ঙ
১০. বলি বাবরির হাওয়া দাওরে আনন্দ গরমি লেগেচে...ঙ-১

[পানখাকী ছুলা দাঁতি - যে পান খায়/পান খেয়ে বার দাঁত শুকনো ছোলার মত বাদামী হয়ে গেছে (ছুলা<ছোলা), বাসরিয়া - বাস/সুবাস আছে এমন গোঁজা), গুড়গুড়িয়া হুকো - ছোট্ট হুঁকো, টানলে ভিতরে কুশ গুড় গুড় করে, কুঁচার - কোঁচার/ধুতির কোঁচা, বাবরি- বাবরি চুল ।]

সংগ্রহ ৫ [আইবুড়ো ডুবুকের গান]

১. যেমনি মালা তেমনি গলা আজু সেজেচে...ক
২. কার ঘরের রসপতী (রসবতী) ছলে নেবেচে (নেমেচে)...খ
৩. জলে নেবেচে গো দিদি জলে নেবেচে...গ
৪.৫ জলের ভিতর হাঙর কুমীর গিলে খেয়েচে...খ

আইবুড়ো ডুবুক : বিস্তারিত দ্র: ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৪ পৃ: ৪৪৬

সংগ্রহ -৬ উসো গান ৬-১৪

১.২. বাবলাফুল মারি মারি গ্যাঁদাফুল দামাদ জানে না...ক
৩.৪. বলি দামাদ নাকি আরমান করেচে পাল্কী নাহালে যাবো না...খ
৫.৬. বলি দুটো দুটো পাল্কী দুটো অপিসার নাহালে সাজবে না...গ
৭.৮. বলি বাবলাপুল সারি সারি গ্যাঁদাফুল দামাদ জানে না ...ক
৯.১০. বলি দামাদ নাকি আরমান করেচে ঘড়ি নাহালে যাবো না...ঘ-১
১১.১২. বলি হবো দুবো ঘড়ি দুবো মাষ্টার না হলে সাজবে না...গ-১

[দামাদ - জামাই, আরমান - ইচ্ছা
না হালে - না হলে, দুবো - দেবো]

সংগ্রহ - ৭

১.২. বলি নদীর ধারে ভেঁসে (ভেসে) এলো ছোট ছোট মোতি গো ...ক
৩.৪. বলি মিঠাইয়ের লালচে বেঁচে (বেচে) খেলে অতি সুন্দরী বেটিগো...খ
৫.৬. বলি বাবাজীর দালানে লিখে দি যাবো জুড়া মইনা পাখী গো...গ
৭.৮. বলি বাবাজী যখন উঠবে দালানে ঝরবে দুনু তার আঁখি গো...খ
৯.১০. বলি নদীর ধারে ভেঁসে এলো ছোট ছোট মোতি গো...ক
১১.১২. বলি মিঠাইয়ের লালচে বেঁচে খেলে ওতি সুন্দরী ভাইজি গো...খ-১

১৩.১৪. বলি চাচাজীর দালানে লিখে দি যাবো জুড়া মইনা পাখী গো...গ-১

১৫.১৬. বলি চাচাজী যখন উঠবে দালানে ঝরবে দুনুতার আঁখিগো...ঘ-১

[ভেঁসে - ভেসে (+এ) - লোভে, ওতি - অতি, দি' যাবো-দিয়ে যাবো, জুড়া মইনা - জোড়া ময়না, দুনু - দুটি তুলনীয় হিন্দি দোনো আঁখ]

সংগ্রহ - ৮

১.২. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব (ইনসাফ/বিবেচনা) কী...ক

৩.৪. বলি কোলের কামিনকে (কন্যাকে) জেলেকে দিয়ে মাছের করলে বাইনা (বায়না) জী...খ

৫.৬. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব কী....ক

৬. বলি কোলের কামিনকে ময়রাকে দিয়ে মিষ্টির করলে বাইনা জী ...খ-১

৭. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব কী...ক

৮. বলি কোলের কামিনকে মুচিকে দিয়ে জুতোর করলে বাইনা জী...খ-২

৯. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব কী....ক

১০. বলি কোলের কামিনকে বেহারাকে দিয়ে পাল্কীর করলে বাইনা জী...খ-৩

১১. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব কী...ক

১২. বলি কোলের কামিনকে তাঁতিকে দিয়ে কাপড়ের করলে বাইনা জী...খ-৪

১৩. বলি ছি ছি ছি বরের বাপের ইনসাব কী....ক

[ইনসাব - বিচার/বিবেচনা (ইনসাফ)]

সংগ্রহ - ৯

১. বলি অ্যাতো সাধের তারামণি বেটি জামাই কেন বুড়ো গো...ক

২. হোক পড়ে মোর জামাই বুড়ো কুঁড়ো গুলবার ভালো গো...খ

৩. বলি অ্যাতো সাধের তারামণি বেটি জামাই কেন গ্যাঁড়া (বেঁটে) গো...ক-১

৪. হোক পড়ে মোর জামাই গ্যাঁড়া ম্যাড়া চরাবার ভালো গো...খ-১

৫. বলি অ্যাতো সাধের তারামণি বেটি জামাই কেন কুঁজো গো....ক-২

৬. হোক পড়ে তোর জামাই কুঁজো মুড়ি ভাজবার ভালো গো...খ-২

তারামণি বেটি - আদরের নাম /কন্যা, ম্যাড়া - ভেড়া (?)

[হক পড়ে মোর জামাই- 'পড়ে' আঞ্চলিক ভাষারীতি 'হোক মোর জামাই'...এই অর্থে]

সংগ্রহ - ১০

১.২. বলি চালতা তলায় চালতা ফুল চত্ত্বর দিয়েছে...ক

৩.৪. বলি সেই খানেতে কনের মা আঁচল ডেলেচে...খ

৫.৬. বলি চালতা তলায় চালতা ফুল চত্ত্বর ডেলেচে...ক

৭.৮. বলি সেইখানেতে কনের চাচী আঁচল ডেলেচে...খ-১

৯. বলি কোথায় ছিলো গ্রামের দফাদার আলে ডেলেচে.. গ

['চত্বর' দিয়েচে-বিছিয়ে রয়েছে (সীমায়ত প্রয়োগ), ঢেলেচে - দিয়েছে অর্থে]

সংগ্রহ - ১১

১.২. ও ব্যাঙ ধরতে গেনুন ধরতে গেনুন গদাইপুরের খালে...ক
৩.৪. ও ব্যাঙ ভাজতে ভালো ভাজতে ফরোদ কাঠের জ্বালে...খ
৫. ও ব্যাঙ তুলে দুবো তুলে দুবো বরের বাপের থালে...গ
৬. ও ব্যাঙ তুলে দুবো তুলে দুবো বরের বাপের গালে...গ-১

[গেনুন - গেলাম (আঞ্চলিক পরিবর্তন), ফরোদ - এক ধরনের গাছ, দুবো - দেবো, থালে - বিয়ে বাড়ীর বিশেষ থালি]

সংগ্রহ - ১২

১.২. বলি হুড়হুড়ের নদীর কূলে ভাঙলো দহ-এর হাঁড়ি গো - 'ক'
৩. (বলি) কনের বাপ দাড়ী আউলা দাড়ী জুবড়ে খায় গো ...খ
৪. (বলি) বরের বাপ লি-দেড়ে জরুর জরুর চায় গো...খ-১
৫. (বলি) কণের বাপ দাড়ী আউলা দাড়ী জুবড়ে খ্যায় গো ...খ

[হুড়হুড়ে - হুড়হুড়ে খাল (রূপনারায়ণের উপনদী), লি-দেড়ে-দাড়ী নেই যার, দাড়ী আউলা - দাড়ী আলা, জুবড়ে-জাবড়ে/ মাখামাখি করে, জরুরজরুর - মিটমিট]

সংগ্রহ - ১৩

১.২. বলি ও নাগর মশা...ক
৩.৪. অ্যাতো জ্যাগো থাকতে রেতুই কনের বাপের দাড়ী করেছিস বাঁসা...খ
৫.৬. বলি উলু ঘাসের দড়দড়াতে ভাঙবোরে তোর বাঁসা (বাসা)
৭.৮. বলি ও নাগর মশা...ক
৯.১০. বলি অ্যাতো জ্যাগো থাকতেরে তুই কনের বাপের পাছায় করেছিস বাঁসা...খ১
১১. বলি উলু ঘাসের দড় দড়াতে...ঘ

[বাঁসা-বাসা, দড়দড়াতে - খড়ে আগুন দিয়ে কীট পতঙ্গ তাড়ানোর পদ্ধতিকে দড়দড়া বলে]

সংগ্রহ - ১৪

১.২. উত্তর থেকে এলো মুরুগা মুরুগার মাথায় ফুল...ক/ক
৩.৪. মুরুগা তুই ঝুমুরি ঝুমুরি বুল...খ/খ
৫.৬. বলি কনের বাপ শুয়ে আছে তাকে লাত মেরে তুল...গ/গ
৭.৮. বলি উত্তর থেকে এল মুরুগার মাথায় ফুল...ক/ক
৯.১০. মুরুগা তুই ঝুমুরি ঝুমুরি বুল...খ/খ
১১.১২. বলি কনের চাচা শুয়ে আছে তাকে কান ধরে তুল...গ-১/গ-১

[মুরুগা - মুরুগী, বুল - ঘোর]

গানগুলি গেয়েছেন শ্রীমতী সোকর যারা বেগম (৫৩), গ্রাম-গদী, বাগনান, হাওড়া। গানগুলি রেকর্ডিং-এর তারিখ-৮/২/৯৬

আত্মমূল্যায়ণের তাগিদে মুসলিম সমাজ : উনিশ ও বিশ শতকের কিছু পুস্তিকার আলোকে

অনমিত্রা ক্রীষ্টিয়ান

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেন্সাস প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবি মহলে শুরু হয়েছিল আত্মমূল্যায়ণের এক অভিনব পর্ব। আত্মমূল্যায়ণের পাশাপাশি চলেছিল আত্মপরিচয় অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা। এর প্রতিফলন লক্ষণীয় মুসলিম সাহিত্যে যেখানে "জাতীয়তাবাদী" এবং 'সম্প্রদায়গত' (communitarian) চেতনার মিশ্রণ ঘটেছিল। ১৩১০ 'নবনূর' পত্রিকার 'সূচনায়' এমদাদ আলী লিখেছিলেন-

"সাহিত্য দ্বারা জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয় এবং যদি কখনও মুসলমান জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দন্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় তবে তাহা সাহিত্য চর্চা লব্ধ শক্তি দ্বারাই হইবে।[১]

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই "জাতীয় সাহিত্যের" অন্তর্গত কতগুলি পুস্তিকা যেখানে কৃষক সমাজের একটি বিশেষ প্রতিমূর্তিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তৎকালীন সাহিত্যে দুটি প্রধান ধারণা, "প্রগতি" এবং 'পশ্চাদপদতা'। পুস্তিকাগুলিতেও 'প্রগতি' ও 'পশ্চাদপদতার' আলোকে কৃষক সমাজ আলোচিত হয়েছে। 'প্রগতি'র ধারণা দুটি সমান্তরাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে-একদিকে বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাস, জনগণের চেতনার একটি সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রগতি আসা সম্ভব এবং এই প্রগতি আনতে পারবে সমাজের 'যুবশক্তি'। অন্যদিকে 'প্রগতি'র ধারণায় দ্বিতীয় ধারাটি ছিল অর্থনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। এটি এইজন্য তাৎপর্যপূর্ণ যে, মুসলিম পুস্তিকা রচয়িতারা অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে শুধুমাত্র কৃষি অর্থনীতির উন্নতিই বুঝতেন, বিশেষতঃ অবস্থার উন্নতিই ছিল তাদের বিষয়বস্তু। আমাদের আলোচ্য বিষয় একমাত্র কৃষকদেরই অগ্রসরতা - পশ্চাদপদতার বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে কারণ পুস্তিকার রচয়িতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কৃষকদের উন্নতির উপরেই সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি নির্ভরশীল।

পুস্তিকা রচয়িতারা আধা-শহর, আধা-গ্রামীণ বাসিন্দা। বেশ কিছু পুস্তিকা বাংলা পুঁথির ঢঙে সরল পয়ারে লেখা। লেখকদের সাহিত্যিক গুণপণা প্রকাশে কোন ভণিতা নেই। অধিকাংশ লেখার বেশীরভাগ পাঠক ছিল স্বল্প-সাক্ষর মানুষ। পদ্যছন্দে লেখাগুলি, জমায়েতে উচ্চস্বরে পড়া হতো। কিছু কিছু ভাষার 'দোভাষী'তে লেখা। সুতরাং লেখকদের উদ্দেশ্যেই হলো

প্রচারের বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। কয়েকজন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন-

"কৃষক সমাজের জন্য রচিত সাহিত্য, শিশু সাহিত্যের মতন সরল সরস হওয়া একান্ত আবশ্যক।"[২]

একথা বলা প্রয়োজন একাধারে শাস্ত্রানুযায়ী নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক যুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রগতি ও পশ্চাদপদতার ধারণার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

কৃষক সমাজের উন্নয়নের কর্মসূচী

এই কর্মসূচীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকদের ভূমিকাকে আদর্শায়িত করা।

"কৃষককুলই দেশ ও জাতির প্রাণস্বরূপ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষকের পরিশ্রম সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর মানুষের পরম শান্তি করিয়া থাকে। কৃষকেরা যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস্য না জন্মায়....তাহা হইলে দুই দিনের মধ্যে দেশে হাহাকার পড়িয়া যাইত অরাজকতার বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে...।"[৩]

এতদসত্ত্বেও কৃষক শ্রেণীই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রতম অংশ। কৃষকের দারিদ্র একটি বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশমাত্র। পুস্তিকাগুলিতে সমগ্র ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের বালাই নেই। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিস্কার নয়। তাদের ভঙ্গিমা হিতোপদেশের মত। সরাসরি কথোপকথনের ঢঙের কৃষক দারিদ্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে পুস্তিকা সাহিত্যের চরিত্রগুলি মুসলমান কৃষকদের উন্নতির যে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে তুলে ধরেছে তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

পরিধানে নাহি বস্ত্র কৌপিন সম্বল।
উদরে নাহিক অন্ন কৃশ ও দুর্ব্বল॥
রোগেতে শরীর জীর্ণ বরণ মলিন।
অনাহারে দেহখানি সৌন্দর্য বিহীন॥
এত কষ্ট স্রহিতেছে কৃষক সুজন।
এস সমাদরে তোমা করি আলিঙ্গন॥[৪]

আর একটি পদ্যে দেখানো হয়েছে কৃষকেরা কেমন করে তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রাণপাত প্রচেষ্টা করছে আর অন্যদিকে উপরতলার মানুষেরা তাদের শ্রমের ফল উপভোগ করছে।

চাষার ধনে সবাই ধনী কাঙ্গাল শুধু একাই চাষা।
বুক বাঁধে সবে চাষের আশায় চাষার নাইক কোনই আশা॥
চাষার দেওয়া চাচার টাকা খাজনা খানা ভরা।
ভাইত চাষা পায় না খেতে বেঁচে থাকতেই মরা।[৫]

শোষিত হওয়া যেন কৃষকদের বারংবার এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। অর্থনৈতিক শোষণ

ভারাক্রান্ত ক্ষোভগুলিকে আবেগদীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করার পাশাপাশি শোষক শ্রেণীকেও চিহ্নিত করা হয়েছে-শ্বেতাঙ্গ বণিক, মাড়ওয়ারী ও হিন্দু, শোষণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অথচ দুঃখ দারিদ্র সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষকদের উপরেই নির্ভরশীল। সমাজে তারা তাই অপরিহার্য্য অংশ-

আমরা চাষা, দেশের আশা
আমরাই দেশটা পালি।
আমরা আছি, তাই দেশটা আছে,
নইলে হতো খালি।
রাজ রাজারা, সব লোকেরা
খায় আমাদের চাল
চাষারা আছে, তাই সকলের
দেহে আছে প্রাণ ॥[৬]

অর্থনীতির যুক্তিটি এখানে পরিষ্কার। কৃষকদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। কৃষকদের অবস্থার উন্নতিই প্রাথমিক কর্তব্য এবং অবশ্যই তা সংস্কার মূলক।

সংস্কার কর্মসূচীতে দুটি ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ১) দারিদ্র মোচন ২) আদর্শ কৃষকের একটি মডেল তৈরী।

দারিদ্রের ধারণা

মুসলিম সাহিত্যে দারিদ্রের কারণ বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে চমকপ্রদভাবে শাস্ত্রীয় ও নৈতিক যুক্তি মিশেল দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। সুফীবাদের দারিদ্রের নৈতিক গুণগানকে প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আনার চেষ্টা হয়েছে।

"তোমরা খেয়াল কর না যে একমাত্র অভাবের তাড়নায় কতশত মোসলমান ধর্মের প্রতি কঠোর নিষেধ অন্যান্য করিয়া জীবিকা নির্বাহের জন্য কত অসৎনীতির আশ্রয় লইতেছেন। মান সম্মান ও দীন দুনিয়ার কঠোর শাস্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া চুরি ডাকাতি মিথ্যা প্রবঞ্চনার ও জুয়োচুরি প্রভৃতি কত কি নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন।"[৭]

ইসলামীয় আদর্শই মুসলিম সমাজের প্রকৃত আত্মপরিচয়। এই সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে তা ধরে রাখা একান্তই অসম্ভব।

"তিনদিনের উপবাস হইয়া কে করে নামাজ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে ? রাত্রে কিছু না খাইতে পাইলে কয়দিন রোজা রাখিতে পার ? পরিধানে বস্ত্র না থাকিলে কিরূপে ধর্ম্মাদেশ প্রতিপালিত হয় ? পরিবারের ভরণ পোষণ চালাইতে না পারিলে খোদার আদেশ রক্ষা হইল কিসে ? এই সকল কি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত কাজ নহে ?...."[৮]

সুতরাং নৈতিকতার মানদন্ডের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। অর্থোপার্জনকে আর ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

"অর্থোপার্জন কর ও অর্থসংরক্ষণে প্রাণপন যত্ন ও চেষ্টা কর এবং ধর্মের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে থাক। নতুবা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা কোন সুখ শান্তি কামনা করিতে পারিবে না।..."[৯]

অর্থোপার্জন ও মিতব্যয়িতা এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। কৃষকদের জীবনযাত্রার প্রণালীকেও দোষারোপ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে দূরদৃষ্টির অভাবে তারা অনর্থক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে, খাওয়া দাওয়ার পিছনে অতিমাত্রায় ব্যয় করে। তাই নৈতিক উপদেশের ঢঙে মিতব্যয়ী হওয়ার অর্থনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়-

"অপব্যয় পরিহার আয় পরিমাণ।
ব্যয় কর সবে ভাই হয়ে সাবধান।।
আয়ের চতুর্থ অংশ জমাইতে হইবে।
বিপদে আপদে যাহা কাজেতে লাগিবে।।
আয় বুজে ব্যয় কর ওহে ভ্রাতৃগণ।
এস এস কাছে এস করি আলিঙ্গণ।।[১০]

আজিজুল হক্‌ অবশ্য কৃষক দারিদ্রের পিছনে তাদের দূরদৃষ্টির অভাব দেখতে পাননি। মহাজন ও জমিদারদের কাছে ঋণজালে বাঁধা পড়াই তাদের দারিদ্রের অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ।

"ধার করা কি অপরিহার্য ? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে হ্যাঁ। ফসল বিক্রি না করা পর্যন্ত তাকে ধার করেই বেঁচে থাকতে হয়। কারণ তার কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই এবং কোন পুঁজি-পাটাও নেই। ফলে চাষাবাদে ও পরিবারের ভরণ পোষণের খরচের জন্য ধারণা করে তার উপায় থাকে না।..."[১১]

সুতরাং এখানে দারিদ্রের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটি অর্থনৈতিক যুক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সমস্যার সমাধানে নানান পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তার একটি হলো বিকল্প ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলে মহাজনী নির্ভরতা কমানো। আর একটি সমাধান হল মুসলিমদের সুদের কারবারে অংশগ্রহণ।

কিন্তু তথাপি গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমিদারী শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। মোহাম্মদ মোনারুজ্জমান ইসলামীবাদী তাই একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা কথা চিন্তা করেছেন যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়-

১. জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ
২. দৈব দুর্যোগের ফলে খাজনা মওকুফ করতে হবে।
৩. পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।[১২]

সুতরাং দারিদ্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুস্তিকা রচয়িতারা শুধুমাত্র কৃষক সম্প্রদায় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারই আলোচনা করেছেন। সম্পদের বহির্গমন, অবশিল্পায়ণ, বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি, সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সে যুগে যে অর্থনৈতিক সমালোচনার ধারা গড়ে উঠেছিল সেগুলি উপেক্ষিত হয়েছে তৎকালীন সাহিত্যে। অবশ্য

কৃষির পণ্যায়ণ সংক্রান্ত সমস্যাটি তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। অনেকগুলি পুস্তিকায় পাটচাষের কুফলের নিন্দা করা হয়েছে-

পাটের টাকা প্রাণে আঁকা কি করিবি জ্বরে।
জ্বর সত্ত্বেও লোভীচাষা পাটের আবাদ করে।।
যার হাতে টাকা নেই সেও একজন চাষা।
পরের টাকা করে নেবে মনে বড় আশা।।[১৩]

কিছু কিছু পুস্তিকায় আবার সম্পদের অসম বন্টনকে দারিদ্রের অন্যতম কারণ বলা হয়েছে।

"আজ মানুষের অশান্তির বড় কারণ কতিপয় ব্যক্তির জাতে ধন সঞ্চয় ও জনসাধারণের দরিদ্রতা। এই দুইয়েব বিরুদ্ধে ইসলাম আপত্তি তুলেছিল। ধনীকে ধন ব্যয় করতে হবে সমাজের সকলের সম অবস্থাপন্ন করবার জন্য দরিদ্রকে মিতাচারী হতে হবে....।"[১৪]

এর সমাধান তাদের কাজে খুবই সরল। ধনীরা দায়িত্ব নিয়ে সম্পদের সুষম বন্টন করলেই দারিদ্র দূর হতে পারে।

দেশের শিল্পায়ণের প্রতিও খুব একটা উৎসাহ দেওয়া হয়নি। শিল্পায়ণ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে, স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। শিল্প নয়। কৃষির মধ্যেই দারিদ্রমুক্তির চাবিকাঠি আছে। এই প্রসঙ্গে চলে আসে মডেল কৃষকের ধারণার বিষয়টি।

উদ্যোগী কৃষক

"বাংলাদেশ মূলতঃ ছোট চাষীর দেশ। প্রত্যেক কৃষি পরিবারই মালিক চাষী এবং আবাদের যাবতীয় কাজ প্রধানতঃ নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকে।...শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা ছোট চাষীর সমস্যার আকারেই থাকা উচিৎ। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য এমন উপকরণের বন্দোবস্ত করতে হবে, যা চাষী তার সীমিত সঙ্গতির মধ্যে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।"[১৫]

অর্থনৈতিক সমস্যা মানেই কৃষি সমস্যা এবং এর সমাধানের পথ হলো স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র কৃষিব্যবস্থা। মডেল কৃষক হতে গেলে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যতই ছোট জমি হোক না কেন কৃষককে তার সর্বোত্তম ব্যবহার জানতে হবে।

"শেষে উপযুক্ত জমি যা আছে যাহার।
একটুও ত্যাগ নাহি করিবে তাহার।।
সকল জমিতে চাষ করহ প্রচুর।
নিশ্চয়ই হইবে তাতে অর্থাভাব দূর।।
রেড়ি বৃক্ষ স্থানে স্থানে করহ রোপণ।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গণ।।[১৬]

কৃষক শুধুই ধান চাষ করবে না - নানা ধরনের শস্য উৎপাদন করতে হবে।

অনেক জেলার যত চাষী অর্বাচীন।
শুধু ধান চাষ করি কাটাইছে দিন।।

চার মাস কাল শুধু একই ফসল।
কারণ ইহার মাত্র অজ্ঞতা কেবল।।
হেন অজ্ঞতার মূল করহ ছেদন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গণ।।[১৭]

তিনিই আদর্শ কৃষক যিনি তাঁর পেশাকে সম্মান করেন।

কৃষি কাজ ঘৃণ্য নহে একিন জানিবে।
উচ্চ প্রণালীতে সবে একাজ করিবে।।
কৃষকের 'চাষা' নাম বড়ই ঘৃণিত।
ঘৃণা লব্ধ এই নাম বিদূরিত।।
আদর্শ কৃষক হও ওহে ভ্রাতৃগণ।
এস হে নিকটে স্নেহে করি আলিঙ্গণ।[১৮]

আবদুল হাই ওসমান নামে একটি উদ্যমী কৃষক চরিত্র এঁকেছেন যে অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থা থেকে নিজেকে সম্পন্ন কৃষকে উন্নীত করেছে।

"কর্ম্মবীর ওছমান বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যতগুলি গাছ ছিল উহাদের প্রত্যেকটির গোড়ায় এক একটি পানের চারা রোপন করিয়া দিল (আসাম দেশের প্রথায়) সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া মরিচ গাছের চারা রোপণ করিল।...মরিচ গাছের মাঝে মাঝে ঐ যে এক হাত হইতে তিন বা সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত উঁচু প্রায় পাঁচশত চা গাছ দেখা যাইতেছে...ওগুলি আম এবং কাঁটালের ছোট চারা। বৈশাখ মাস আসিলে ওছমান এই চারা গুলি উঠাইয়া যথাস্থানে আবশ্যক মত রোপণ করত: অবশিষ্ট চারাগুলি হাট বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে।"[১৯]

ওছমান অলস ভাবে দিন কাটায় না -

"এই সমস্ত শক্ত ও বেশী পরিশ্রমের কাজে সে যখন বড় হয়রান হইয়া পড়ে তখন সে অলস কৃষকের ন্যায় তামাক না টানিয়া মরিচ গাছের তলা হইতে আগাছাগুলি টানিয়া দূর করে নিজে নিজে তাহার পুকুর কাটে।২০

কৃষিকার্য্য করতে গিয়ে ওসমান তার ধর্মীয় কর্তব্যকে ভোলেনি। সকালবেলা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে-এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সে কাজে নামে। তার উদ্যম সফল হয়েছে। বর্তমানে সে একজন ধনী এবং ঋণমুক্ত মানুষ।

এই হলো মডেল কৃষকের ছবি। যে নিজের জমি নিজে চাষ করে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং দারিদ্র দূর করতে কৃষকের চাই উদ্যম উদ্যোগ এবং দূরদৃষ্টি।

কিন্তু যুদ্ধ, কৃষিপণ্যের দামের ওঠানামা কৃষির পণ্যায়ন প্রভৃতির প্রতিক্রিয়ার ফলে উচ্চবর্ণীয় চিন্তার এই মডেল কৃষক, বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। স্বপ্নই রয়ে গিয়েছিল। তাই বাজার দরের ওঠানামা বুঝতে অসমর্থ হয়ে পুস্তিকা রচয়িতারা আবার অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয়ে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার স্মরণ নেয়। প্রগতি একমাত্র সম্ভব তখনই যখন মুসলিমরা পরস্পরকে ভাই বলে মনে করতে পারবে এবং শাস্ত্র ও নৈতিকতার পথ ধরে চলবে।

উপসংহার : প্রগতি ও নৈতিকতা

কৃষক শোষণের কাহিনী বর্ণনা এবং আদর্শ কৃষকের মডেল যার খাড়া করার পিছনে পুস্তিকা রচয়িতাদের একটি উদ্দেশ্য পরিস্কার মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করা। প্রগতি একমাত্র এই ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই আসতে পারে কারণ ইসলামেই রয়েছে সমতার আদর্শ এবং মুসলিমরা একমাত্র ইসলামেই আত্মপরিচয় পেতে পারে। নানা ধরনের উপমা ও রূপকের মাধ্যমে এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে প্রকাশ করা হয়েছে-

মুসলমান মাত্রেই যে পরস্পর ভাই।
একথা ভুলা না ভুলা নাহি চাই ॥
একের হিতেতে হিত, জানহ অপরে।
দুঃখে দুঃখ সুখে ভাব পরস্পরে ॥
একের বেদনে নিজে ভাবহ বেদন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥[২১]

প্রগতি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আসে না তার জন্য চাই সমবেত উদ্যোগ-

দশে মিলে করিলে মহাকার্য্য হয়।
তৃণের সন্ততি রজ্জু হয়ে বান্ধে রয় ॥
কবির একথা প্রতি করহ খেয়াল।
একতায় শক্তি তব হইবে 'বা হাল'॥
শক্তি বলে মহাশক্তি করহ সাধন।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গন ॥

এই ভাবে ব্যক্তির উন্নতি এবং সম্প্রদায়ের উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আয়ের চৌষট্টী ভাগ হতে এক ভাগ।
কওমী কাজেতে দাও করে অনুরাগ ॥
টাকার একটী পয়সা কর সবে দান।
যাতে হবে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ॥
এ কাজেতে কেহ নাহি হইবে কৃপণ।
এস হে কৃষক ভাই করি আলিঙ্গণ ॥[১৩]

এইভাবে সম্প্রদায়গত ভ্রাতৃত্বের চেতনা ও প্রগতিকে একসূত্রে বাঁধা হয়েছে। ইসলামিক সমতার ধারণা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা প্রচার করে ধনী ও দরিদ্র মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত ঐক্য আনার চেষ্টা হয়েছে। পুস্তিকা রচয়িতাদের আশা ছিল সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্বের এই নীতি অচিরেই মুসলমানদের দুর্দশা মোচন করতে সাহায্য করবে।

তথ্য-সূত্র

১। মৌলভী এমদাদ আলী, "সূচনা" নবনূর ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৩ কলিকাতা, কড়েয়া রোড, নবনূর কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২।

২। মৌলবী শেখ ইদ্রিস আহমেদ, "নিবেদন", "কৃষকের মর্ম্মবাণী" - মালদহ, মৌলবী শেখ ইদ্রিশ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২১

৩। মোহাম্মদ মোয়েজ্জদীন হামেদী, কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দশার প্রতীকার' খুলনা, মোয়েজ্জদীন হামেদী কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৩৬ পৃষ্ঠা ২।

৪। গরীব শায়ের, 'কৃষক বন্ধু' কলিকাতা কড়েয়া রোড ১৯১০ পৃষ্ঠা ২২।

৫। ইদ্রিস আহমেদ। 'কৃষকের মর্ম্মবাণী', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১।

৬। এ এফ এম আব্দুল হাই 'আদর্শ কৃষক', [ময়মনসিংহ, আবদুল হাই কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২১] পৃষ্ঠা ৫০।

৭। মৌলবী আহমদউল্লা, 'মোছলেম সমাজ-সংস্কার' চট্টগ্রাম, আহমদউল্লা কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৬ পৃষ্ঠা ২৫।

৮। ঐ পৃষ্ঠা ২৬।

৯। ঐ পৃষ্ঠা ২৭।

১০। গরীব শায়ের, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯।

১১। এম আজিজুল হক, 'বাংলার কৃষক' পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১।

১২। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, "অভিভাষণ" কলকাতা (সম্ভবত ১৯৩১) উদ্ধৃত শাহাজাহান মুনির 'বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা' (১৯১৯ -১৯৪০), ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৩০ পৃষ্ঠা ৩০৭।

১৩। আবেদ আলী মিঞা, 'কলী-চিত্র', দ্বিতীয় সংস্করণ রঙপুর ১৯২৬ পৃষ্ঠা ৫।

১৪। আবদুল হুসেন, "মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি" আব্দুস কাদের সম্পাদিত "আবুল হুসেনের রচনাবলী প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, বর্ণ মিছিল ১৩৮৩ উদ্ধৃত শাহাজাহান মুনির। পূর্ব্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১০।

১৫। এম. আজিজুল হক। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

১৬। গরীব শায়ের, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩।

১৭। ঐ পৃষ্ঠা ৫২।

১৮। ঐ পৃষ্ঠা ৫৩।

১৯। আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪, ২৫।

২০। ঐ পৃষ্ঠা ২৫।

২১। গরীব শায়ের পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।

২২। ঐ পৃষ্ঠা ৪১।

২৩। ঐ পৃষ্ঠা ৪১।

বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস ১৯০১-১৯১১

ইমরান হোসেন

ইংরেজদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে নিদারুণ অবক্ষয়। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোঁড়ামি, দারিদ্র ও সুযোগের অভাবে আধুনিক শিক্ষায় তারা প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে।[১] তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ নেতাদের প্রয়াস ও সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে, বিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটে। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। এই নব গঠিত প্রদেশে বাংলার মুসলিম সমাজে দ্রুত আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। আলোচ্য নিবন্ধে ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয় তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৮৭১ সালে বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত এক প্রস্তাব পাশ করে।[২] মূলত: এই সময় থেকে বাংলায় মুসলিম শিক্ষার বিস্তার শুরু হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকেও মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮২ সালে বৃটিশ সরকার উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০০) সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা। এই কমিশনের নিকট মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি, সাক্ষ্য প্রদান ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে উইলিয়াম হান্টার ১৮৮৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁর রিপোর্টে 'মুসলিম শিক্ষা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে প্রস্তাবাকারে ১৭টি সুপারিশ পেশ করেন[৩]। হান্টারের সুপারিশ সমূহকে মুসলিম শিক্ষাবিদ স্যার আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭) বাংলার মুসলমানের শিক্ষা অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[৪]

হান্টার কমিশনের সুপারিশ সমূহ, নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী কর্তৃক সরকারের নিকট স্মারকলিপি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাদের ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন

বিবেচনা করে ১৮৮৫ সালে বড়লাট ডাফরিন (১৮২৬-১৯০০) মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে কিছু প্রস্তাব পাশ করেন। এইসব প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে এবং তা হতে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা জেনে সময়োচিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। মুসলিম উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং মক্তব গুলোতে গ্রান্টস-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা হয়। তবে স্থানীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেসব মক্তব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শুধু সেসব প্রতিষ্ঠানকেই গ্রান্টস-ইন-এইড দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৫] সৈয়দ আমির আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাব সমূহকে মুসলিম অধিকারের Magna Charter হিসেবে অভিনন্দিত করেন।[৬]

১৮৮৫ সালে সরকারি প্রস্তাবসমূহ বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষার অগ্রগতিতে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করে। এই সময় বাংলাদেশে পাঠ চাষ ও পাটের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৯৪ সালের দিকে পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানি ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। পাটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলতঃ মুসলিম প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়েছিল।[৭] এই অর্থকরী ফসলের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মুসলিম চাষীরা নগদ অর্থের মুখ দেখতে পায়। তাতে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধক যে দারিদ্র, তা ধীরে ধীরে অপসাবিত হতে থাকে এবং অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রয়াস, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসহ আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা অনেকাংশে অপসারিত হয় এবং শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৮৭১ সাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ১২১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২৬১১০ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[৮] পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে পূর্বের ১০ বছরের তুলনায় মুসলিম শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৫%-এ উন্নীত হয়।[৯]

বিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কনফারেন্স, কমিটি গঠন ইত্যাদি মাধ্যমে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে কলকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল রোজের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহবান করা হয়। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩), খান বাহাদুর আ.ফ.ম. আবদুর রহমান, আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) মোহাম্মদ ইব্রাহীম, মৌলভী আবদুল লতিফ এবং মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাকসহ আরো কয়েকজন। সভায় মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এবং

যেসব বক্তব্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদেরকে সরকারি সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব কবা হয়।[১০] সভার সুপারিশক্রমে শিক্ষা পরিচালক আলেকজাণ্ডার পেডলার ১৯০৪ সালের ১ জুলাই মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক স্কীম পেশ করেন। এই স্কীমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল : (১) বেশ কিছু মডেল মক্তব প্রতিষ্ঠা; (২) মক্তবে সাহায্য প্রদান; (৩) বেশ কিছু পরিদর্শক মৌলভী নিয়োগ।[১০]

অতঃপর সরকার ১৯০৫ সালে ২২ সেপ্টেম্বর পেডলারের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের অনুমোদন দেন।[১২] এই নির্দেশের আওতায় ৭টি মডেল মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়, ৬ জন মৌলভী পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় এবং ১৪৭৫০ টাকা বিভিন্ন জেলাব মক্তবে বরাদ্দ দেয়া হয়।[১৩] এছাড়া মক্তবসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভক্ত করে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পেডলারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে মক্তবের সিলেবাসকেও পরিমার্জন করা হয়। সরকারেব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে অনেক মক্তব জনশিক্ষা বিভাগের শিক্ষা কোর্স গ্রহণ করে এবং মক্তবের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[১৪]

১৯০৮ সালে ২২ এপ্রিল জনশিক্ষা পরিচালক আর্ল মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতে মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১) পাঁচজন অতিরিক্ত মৌলভী পরিদর্শক নিয়োগ কবা;

২) অনুদানবিহীন মক্তবগুলোকে অনুদানের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আরও অতিরিক্ত ৭০০০ টাকা বরাদ্দ করা;

৩) যে সব স্থানে মক্তব ও কোরআনভিত্তিক স্কুলের সংখ্য ৯০ এর বেশি সে সব অঞ্চলেব ৯টি জেলায় আবও ৯ জন পরিদর্শক নিয়োগ করা এবং তাদের মাসিক বেতন ৫০ টাকা নির্ধারণ করা;

৪) বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরও ১৪টি সরকারি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা;

৫) ১৭টি গুরু প্রশিক্ষণ স্কুলকে মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলে রূপান্তর করা;

৬) সংস্কারকৃত সিলেবাস মক্তবগুলোতে সরকারের মাধ্যমে কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে প্রবর্তন করা।[১৫] আর্ল স্কীমে মক্তবগুলোকে অনুমোদিত ও অননুমোদিত-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯০৮ সালেব ২৭ আগষ্ট আর্ল স্কীম সরকারি অনুমোদন লাভ করে।[১৬] তবে আর্ল স্কীম শুধু পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে।[১৭]

এদিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এ সময় নতুন প্রদেশের সরকার মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথাঃ (১) মনোনীত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উর্দু প্রচলন; (২) উদার অনুদান; (৩) বৃত্তি সংরক্ষণ; (৪) আবাসিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৫) শিক্ষা বিভাগে বেশি করে মুসলিম নিয়োগ দান।[১৮]

নতুন প্রদেশ গঠনের পর মুসলিম শিক্ষা পর্যালোচনা কবতে ১৯০৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর লে. গভর্নব ব্যামফিল্ড ফুলাবেব (১৮৫০-১৯৩১) সভাপতিত্বে বরিশালে একটি শিক্ষা

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব নেয়া হয় যে, পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়ে মুসলমানদের জন্য পঠনযোগ্য বিষয় প্রবর্তনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ ক্লাসে উর্দু শিক্ষা অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে শিক্ষকগণ ইচ্ছা করলে কোরআন শিক্ষা দিতে পারবেন।[১৯] উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ফলে মুসলমানরা উর্দুতে লেখা ইংরেজি বই পড়তে পারেএবং তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্র সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়।[২০]

নব গঠিত প্রদেশে অনেক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পূর্ব বাংলা ও আসামের সকল জেলায় যাতে প্রতি নয় মাইলে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তদুদ্দেশ্যে সরকাব জেলা বোর্ডকে সাহায্য করেন।[২১] যেহেতু পূর্ব বাংলা ও আসাম ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, সেহেতু এসব উন্নয়নের ফল মুসলমানরাই বেশি ভোগ করে।

মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এসময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সভা-সমিতি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৯০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়।[২২] আলোচ্য সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সম্মেলনে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গের পব এই সমিতির অনুরূপ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) এর সভাপতি এবং নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) সেক্রেটারি মনোনীত হন।[২৩] ১৯০৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় এ সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর ইত্যাদি স্থানে এই সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সম্মেলনে মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টার ফলে আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলমানিদের প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়ঃ

সারণি - ১

বাংলায় মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২

সাল	অঞ্চল	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	মোট ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	মুসলিম হার
১৯০৬-০৭	পূর্ব বাংলা ও আসাম	১৭৫৩১	৫৬০৭১১	৩০১২৭৯	৫৩.৭৩
১৯১১-১২	ঐ	১৭৭২৩	৭০৪৩৫৩	৩৯৪৫৮২	৫৬.০২
১৯০৬-০৭	পশ্চিম বাংলা*	---	---	---	---
১৯১১-১২	ঐ	১৪৩৪৮	৫১১২৪৪	৮৭৯৮৮	১৭.২

সূত্রঃ *Report on the Progress of Eduation in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p.89, Supplement to the Progress of Education in Bengal*, 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review, pp. 70-71.* তথ্য পাওয়া যায়নি।

উক্ত তথ্যে বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক। পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার হার কম হলেও সে সময়ের জনসংখ্যার তুলনায় তা আশানুরূপ বলা যায়।[২৫] মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার এই উল্লেখযোগ্য বিস্তারের পিছনে বাংলার মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সরকারি সহযোগিতা ব্যাপকভাবে কাজ করেছে।

বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ১৯০৩-০৪ সালের সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে জানা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলার মুসলিম ছাত্রদের হার মাত্র ৯%। এই পশ্চাৎপদতর জন্য শিক্ষা বিপোর্টে মুসলমানদের গোঁড়ামী ও অনীহাকে দায়ী করা হয়।[২৬] ১৯০৫ সালের পর নতুন প্রদেশে মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। জনশিক্ষা পরিচালক মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমকে আধুনিক উপায়ে সংশোধন করে। নতুন পাঠক্রমে কোন কোন বিষয়ে কথোপথনের (Conversation) জোর দেয়া হয়। কিছু বিষয়ে যেমন, ভূগোল ও ইতিহাস মৌখিক ও পঠনের (oral & reading) ক্ষেত্র বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইংরেজি শেখানোর জন্য (Conversation) -এর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।[২৭]

সবকার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন।[২৮] ১৯১১ সালে এই কলেজ হতে ৩৭ জন ডিগ্রী লাভ করে যার মধ্যে ৯ জন ছিল মুসলিম এবং ২৮ জন হিন্দু।[২৯] শিক্ষকদের সুবিধার জন্য সরকার সরকারি-বেসরকারি সকল স্কুল শিক্ষকদের জন্য বেতন বৃদ্ধি করেন। ১৯০৬ সালের দিকে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল ২৫০ টাকা।[৩০] ১৯১১-১২ সালের দিকে এই বেতন ৪০০ টাকায় উন্নীত হয়।[৩১] বেতন বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার অনেক সমস্যা দূর হয় এবং শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে উৎসাহিত হন।

মুসলিম ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ও ফারসী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৯০৫ সালের বরিশাল সম্মেলনে এ বিষয়টির উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এ প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেনঃ "জেলা বোর্ড বা সরকারি বিভাগ হতে এই সকল বিদ্যালয়ে মঞ্জুরী প্রদানের পূর্বে এই শর্ত আরোপ করতে হবে যে, মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ও ফারসী শিক্ষাদানের জন্য একজন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে"।[৩২] সম্মেলনের সভাপতি লে. গভর্নর ফুলার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

নতুন প্রদেশের সরকার কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সালে ঢাকার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের ছাত্রদের সুবিধার্থে আরমানিটোলায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৩] ১৯০৮ সালে কক্সবাজারের পশ্চাৎপদ মুসলমান ছাত্রদের উন্নতির জন্য সেখানকার অনুদানপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়।[৩৪] সুরমা উপত্যকার স্কুলটি এ সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করে। সরকার মাধ্যমিক স্কুলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেন। যেমন ১৯১১ সালে ১,৫০,০০০ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়।[৩৫]

তবে পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের জন্য শহরে প্রতিষ্ঠিত এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা সমস্যার সৃষ্টি হত। যেহেতু মুসলমানদের সিংহভাগ ছিল কৃষিজীবি এবং তারা গ্রামে বাস করত। এই সমস্যার সমাধানে সরকার প্রদেশের বড় বড় শহরের বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংযুক্ত হোস্টেল বা ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। ফলে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।[৩৬]

আবাসিক সমাধান ব্যতীত সরকার মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনের পরিমাণ ১৩%-এ বর্ধিত করা হয় এবং এগুলো হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৮:৫ অনুপাতে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৩৭] সরকারের এসব সংস্কার কার্যের ফলে পূর্ব বাংলা ও আসামে মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়ঃ

সারণি-২

নতুন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রের অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২

	১৯০৬-০৭			১৯১১-১২			
প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	মোট ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	মোট ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	বৃদ্ধির হার
উচ্চ বিদ্যালয়	২১২	৪৭,১৩০	৮৮৬৯	২২৪	৭৪৫৫৭	২০৭২৯	১৩৩.৭
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৫১১	৪১,৯৭৩	১৪১০০	৭৩৮	৮৮২১৯	৩৮৬৯৫	১৭৪.৪

সূত্র: *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p, 89.

উক্ত পরিসংখ্যানে মাধ্যমিক স্কুলে মুসলমান ছাত্রের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। এই বৃদ্ধির আনুপাতিক হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মধ্য ইংরেজি স্কুলে। এতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে ১৯১১-১২ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

সারণি-৩

পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা, ১৯১১-১২

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	মোট ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	মুসলিম হার
উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০	৭৬১৪৭	৭৫৫৬	৯.৯২
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৫৭০	৪৮১৪৩	৬৭৭৮	১৪.১২

সূত্রঃ Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review, p. 70-71. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assasm, 1906-07 to 1911-12, Vol. II, p. 89.

উক্ত তথ্যেও পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা আশানুরূপ বলা যায়। এ পরিসংখ্যানেও মধ্য ইংরেজি স্কুলে মুসলিম ছাত্রের হার বেশি দেখা যাচ্ছে। জনশিক্ষা পরিচালক ১৯০৬-০৭ সাল থেকে উক্তসময় পর্যন্ত মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় তুলনামূলক অগ্রগতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[৩৮]

বাংলা বিভাগের পূর্বে পূর্ব-বাংলার কলেজ শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। সরকারি কলেজগুলোর আবাসিক ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত, ব্যবস্থাপনা দুর্বল এবং শিক্ষক ছিল কম। বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা ছিল আরো শোচনীয় এবং সেগুলো চালানোই ছিল কষ্টকর।[৩৯] লে. গভর্নর হেয়ার (১৮৪৯-১৯২২) নব প্রদেশের কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুব খারাপ এবং বেসরকারি কলেজগুলো আরো শোচনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৪০] এই অবস্থায় সরকার কলেজগুলোর উন্নতির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা চালান। এজন্য সরকারকে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে (১৯০৪) বিবেচনা করতে হয়। কারণ এ আইনে উচ্চ শিক্ষার বিধি ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে ন্যস্ত ছিল।[৪১] তাই সরকার এ শর্তে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব নেন যে, যেসব কলেজের ভাল ভবন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ভবন সংস্কার, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি যোগান দেয়া হবে।[৪২]

চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ ডিগ্রী মানের কোন কলেজ ছিল না। লে. গভর্নর হেয়ার ১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম সফর করলে সেখানকার স্থানীয় মুসলমানরা তাঁর নিকট প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। মুসলমানরা এর পেছনে যুক্তি দেখায় যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং চট্টগ্রামেই ছাত্র সংখ্যা বেশি। এর ফলে ১৯১০ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম কলেজকে প্রথম স্তরের কলেজে পরিণত করা হয়।[৪৩] আসামের গৌহাটি কলেজেও ১৯০৯-১০ সালে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়।[৪৪] এ ছাড়া, ঢাকা ও রাজশাহী কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয় এবং কলা ও বিজ্ঞান অনুষঙ্গদের বিভিন্ন বিষয়ে এম. এ. ক্লাস প্রচলন করা হয়।[৪৫] কলেজের পঠিত বিষয়সমূহ ছিল ফার্সি, সংস্কৃত, অংক, পদার্থ, রসায়ন, ইংরেজি, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ও ইতিহাস। পাঠের বিষয় হিসেবে ইতিহাসকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে লে. গভর্নর বলেন যে, ইতিহাস পাঠ সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভাল ধারণা নিতে সাহায্য করবে।[৪৬]

সরকারি কলেজগুলোর পাশাপাশি প্রাইভেট কলেজগুলোকেও উন্নয়নের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। সরকার বেসরকারি কলেজগুলোর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন।[৪৭] অনুদানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার দুটি শর্ত বসিয়ে দেন। প্রথমত: প্রতি কলেজে আরবি, ফারসী বা উর্দু পড়ানোর জন্য মাসিক কমপক্ষে ৭৫ টাকার বিনিময়ে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ করা এবং দ্বিতীয়তঃ নির্মাণাধীন হোস্টেলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা।[৪৮] আমরা এতে ধারণা করতে পারি যে, কলেজগুলোতে অনুদান দেয়ার ফলে মুসলমান ছাত্ররা যাতে উৎসাহিত হয় তার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন। এ ছাড়া মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানকল্পে সরকার প্রতি কলেজে মুসলিম

ছাত্রাবাস স্থাপন করেন।[৪৯] আবাসিক সমাধান ব্যতীত মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯১০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য ১৫টি বৃত্তি বরাদ্দ দেয়া হয়।[৫০] সরকারি প্রচেষ্টা ও মুসলমানদের উৎসাহের ফলে আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলিম উচ্চ শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়ঃ

সারণি-৪

বাংলায় মুসলিম উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২

সাল	অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	মুসলিম হার
১৯০৬-০৭	পূর্ব বাংলা ও আসাম	আর্টস কলেজ	১১৯৭	৭১	৫.৯৩
১৯১১-১২	ঐ	ঐ	২৯৮৯	৩৬০	১২.০
১৯০৬-০৭	পশ্চিম বাংলা*	---	---	---	---
১৯১১-১২	ঐ	ঐ	৮২৮৬	৪৬৭	৫.৬৩

সূত্রঃ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, Vol. II. p.80 *Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17* Fifth Quinquennial Review, pp. 70-71. * তথ্য পাওয়া যায়নি।

উক্ত পরিসংখ্যানে আর্টস কলেজে মুসলমানদের সংখ্যা কম হলেও পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে এর বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়। পশ্চিম বাংলায়ও উচ্চ শিক্ষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের অবস্থা আশানুরূপ বলা যায়। ১৯০৬-০৭ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম শিক্ষার বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও জনশিক্ষক পরিচালকের মতে, সেই সময় হতে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫১]

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) মুসলীম নারী শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার অগ্রগতিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর বেগম রোকেয়া মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে তিনি বিভিন্ন সমস্যার কারণে ১৯১০ সালে ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।[৫২] অতঃপর ১৯১১ সালে তিনি ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলসহ (১৮৭০-১৯১৭) অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ওয়ালিউল্লাহ লেনের ছোট বাড়িতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী ও দুইখানা বেঞ্চ নিয়ে পুনরায় 'সাখাওয়াত স্কুলের' কাজ শুরু করেন। স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেগম রোকেয়া নানা সুবিধা প্রদান করে ছাত্রী সংগ্রহ করেন[৫৩] এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত করেন।[৫৪] প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, যানবাহন সমস্যা, এমনকি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব থাকা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে স্কুলের

উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এই স্কুলটি মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়।[৫৫]

সাখাওয়াত স্কুল ব্যতীত ১৯০৯ সালে কলকাতায় 'সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়' নামে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আকতার বানু প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইসরয় পত্নী লেডী মিন্টু।[৫৬]

আলোচ্য সময়ে বাংলার সরকারও নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারী শিক্ষার সমস্যা অনুসন্ধান ও উন্নয়নের সুপারিশ পেশ করার জন্য নতুন প্রদেশের সরকার একটি 'নারী শিক্ষা কমিটি' গঠন করেন। সর্বস্তরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংস্কার সাধনের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়া ছাড়াও এই কমিটি স্কুলের পরিদর্শন, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার, ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন, মেয়েদের শিক্ষা অর্জনে উৎসাহী করতে 'লেডিস কমিটি গঠন' এবং জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার কাজে ব্রতী হয়।[৫৭] এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আলোচ্য সময়ে বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়ঃ

সারণি-৫

পূর্ব বাংলা ও আসামে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারী সমাজের অগ্রগতি

সাল	শিক্ষার স্তর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	মুসলিম হার
১৯০৬-০৭	প্রাথমিক	২৭৮১	৫১১৮০	২২২২৩	৪৩.৪২
১৯১১-১২	ঐ	৪৯৫৬	১১০৮১৭	৫৬৫৭৫	৫১.০৫
১৯০৬-০৭	মাধ্যমিক	১৮	১৫০৩	৪৮	৩.১৯
১৯১১-১২	ঐ	২২	২৪৮০	১০৮	৪.৩৫

সূত্রঃ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p.89.*

উক্ত সারণিতে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা সন্তোষজনক বলা যায়। তবে মাধ্যমিক শিক্ষায় সেরূপ না হলেও পাঁচ বছরে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ১৯১১-১২ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম নারীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

সারণি-৬

পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা, ১৯১১-১২

শিক্ষার স্তর	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	মুসলিম হার
প্রাথমিক	১৮৫৭	৪৯০৮৫	২০৮৫০	৪২.৪৭
মাধ্যমিক	৩৪	৪১৩১	৬৫	১.৫৭

সূত্রঃ *Supplement to the Progress of Education in Bengal*, 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review, p. 70-71. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1906-07 to 1911-12, Vol. II. p. 89.

উক্ত পরিসংখ্যানেও প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা মোটেই আশানুরূপ ছিল না। এ ছাড়া আলোচ্য সময়ে কলেজ শিক্ষায় সমগ্র বাংলায় মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র একজন।[৫৮] পর্দা প্রথা, গোঁড়ামি, বালিকা স্কুল-কলেজের স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষিকার অভাব, যাতায়াত ও আবাসিক সমস্যা, দারিদ্র ইত্যাদি কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলিম নারীগণ অগ্রসর হতে পারেনি।

আমরা লক্ষ্য করেছি, উনিশ শতকের সাত এর দশক থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। ফলে বিশ শতকের প্রথম পাদে তারা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে এবং বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এঁরাই পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসেন।

সূত্র-নির্দেশ

১। মুসলমানদের ফারসী শিক্ষার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ, শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব, ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে ধর্মান্তকরণের উদ্দেশ্য, আর্থিক দুরাবস্থা ও সুযোগের অভাব, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, সমাজে যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতা ইত্যাদি কারণে উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজ ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

২। Resulotion of the Govt. of India, 7 August, 1871, para-2, India Education Proceedings, August, 1871.

৩। Report of the Indian Education Commission, 1883, pp. 505-507.

৪। মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, অনুবাদ-মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৮০১।

৫। General Report on Public Instruction in Bengal, 1890-91, p. 93.

৬। অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৭৫।

৭। Raqib Uddin Ahmed, The Progress of the Jute Industry and Trade (1855-1966), Dacca, 1966, p. 3.

৮। আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৯। Abdul Karim, Muhammadan Education in Bengal, Calcutta, 1990, Appendix,

১০। Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review, p. 156.

১১। Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977), Vol 3, Dr. M. Sekandar Ali Ibrahimy (ed.) Dhaka, 1985, p. 75.

১২। Progress of Education in Bengal, op.cit. p. 156.

১৩। Reports on Islamic Education and Madrash Education in Bengal, op. cit., p. 75.

১৪। Progress of Education in Bengal, op.cit., p. 156.

১৫। Progress of Education in Bengal, 1907-08 to 1911-12, Fourth Quinquennial Review, pp. 148-150.

১৬। Ibid. Report on Public Instruction in Bengal, 1909-1910, p. 46.

১৭। Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, op.cit., pp. 76-78.

১৮। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1906-07 to 1911-12, Vol. I, p. 117.

১৯। M.K.U. Molla, The New Province of Eastern Bengal and Assam, Rajshahi University, IBS, 1981, pp. 199-200.

২০। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, op.cit., p. 117.

২১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮ই মাঘ, ১৩১৫।

২২। এস. ডব্লিউ হোসেন, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', ইসলাম প্রচারক, পঞ্চম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা ও ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০।

২৩। মোহাম্মদ ইসমাইল সলিমাবাদী, 'নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ', মাসিক মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৭, পৃ. ৪০।

২৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৫ই এপ্রিল, ১৯০৬।

২৫। ১৯১১-১২ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৭.০৬%। দেখুন, Progress of Education in Bengal, op.cit., p. 146.

২৬। Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review,pp 153,159.

২৭। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam. op.cit., p.50.

২৮। Ibid

২৯। Ibid.

৩০। P.C. Lyon, Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, to Government of India, Home Department, No. 1137E, Shillong, 18 May, 1908: Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1908.

৩১। Progress of Education in India, 1907 to 1912, Vol. II, Parliamentary Papers (House of Commons), 1914, cd. 7486, Vol. 6, p. 243.

৩২। Proceedings of Muhammadan Educational Conference, 19 December, 1905, para-5, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, June, 1906.

৩৩। M.K.U. Molla, op.cit., p.188.

৩৪। Ibid.

৩৫। Government of India E.D., to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, Telegram No. 7, 13, January, 1911, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1911.

৩৬। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, op.cit., p. 119.

৩৭। Ibid., pp. 118-19.

৩৮। Progress of Education in Bengal, 1907-08 to 1911-12, Fourth Quinquennial Review, p.147.

৩৯। Report on the Progress of Education in India, 1901-1902, Parliamentary Papers 1904, cd. 2181, Vol. 65, p.51.

৪০। Hare to Viceroy, 20 February, 1911 (Private and Confidential), Hardinge Papers, Vol. 113,p.23.

৪১। Sufi Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dacca, 1974, p. 95-96. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৪২। M.K.U. Molla, op.cit., p.162.

৪৩। Ibid., p.166.

৪৪। Ibid., p.167.

৪৫। Report on the Progress of Education in Eastem Bengal and Assam, op.cit., p.27-28.

৪৬। Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, to Secretary,Government of India, Home Department, No. 4836, Shillong, 12 May, 1910, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1910.

৪৭। D.P.I., Eastern Bengal and Assam, to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, No. 203, Shillong, 4 April, 1907, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1907.

৪৮। M.K.U. Molla, op.cit.,p.176.

৪৯। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, op.cit., p.119.

৫০। Report of the Fourth Session of the Provincial Mahomedan Educational Conference, Held at Rangpur, April, 1911, p.60.

৫১। Progress of Education in Bengal, op.cit., p.147.

৫২। মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ৩৭।

৫৩। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.৫৩৯।

৫৪। শামসুন নাহার, রোকেয়া জীবনী, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৪২-৪৩।

৫৫। The Mussalman, Vol. XXVII, T.W Edition, Vol. IV, September 20, 1928, No. 108, p.6.

৫৬। বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ২৬০-২৬১।

৫৭। Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, op.cit., p.92.

৫৮। Suppliment to the Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review,p. 71.

উইলিয়াম এ্যাডামের এদেশবাসীর শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা

ভবতোষ কুন্ডু

I

উইলিয়াম এ্যাডামের জন্ম স্কটল্যান্ডের Dunfarm tine -এ। তিনি ভারতে ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল অবধি কুড়ি বছর কাটিয়েছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৮১৮ সালের ১৯শে মার্চ শ্রীরামপুরে এসেছিলেন। খুব শীঘ্রই তিনি মিশনারী কার্যকলাপ ত্যাগ করে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮২১ সালে তিনি রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং Trinity-এর ধারণা পরিত্যাগ করে Unitarianism-এর ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের উদ্যোগে বেঙ্গল হরকরা অফিসের উপরতলায় এ্যাডামের সাপ্তাহিক উপাসনা সভার আয়োজন হয়েছিল - যে সভায় রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা যোগ দিতেন।[১] ১৮২২ সালে রামমোহন এ্যাডামের সহযোগিতায় কলকাতায় এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[২] ১৮২৮ সালে জন গ্রান্ট ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে সরে যান এবং ১৮২৯ সালে এ্যাডাম ঐ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩৪ সাল অবধি ঐ পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন।[৩] উল্লেখ্য তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের নরমপন্থী ও আপোষমূলক মনোভাব এবং ইয়ং বেঙ্গলের কোন কোন সদস্যের যৌবনোজ্জ্বল বাড়াবাড়ির সমালোচনা প্রতিফলিত হয়েছিল।[৪] ১৮৩২ সালে পত্রিকার একটি সংখ্যায় তিনি Colonization এবং Free Trade -এর পথে মত প্রদান করেছিলেন[৫] -যার বিরোধিতা রামমোহনের ন্যায় সংস্কারপন্থী ভারতীয়রা করেননি। তিনি ১৮৩৮ সালে আমেরিকা যান এবং আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে পৌঁছান ১৮৪১ সালে। ইতিমধ্যে লন্ডনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার মূল লক্ষ্য ছিল Theory of Natural Identity of Interests-এর অন্তরালে ভারতে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারের সম্প্রসারণ। ইংল্যান্ডের শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি এবং ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক আধিপত্য ও স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং তার বিনিময়ে ভারতে কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করা।[৬] তিনি এই সোসাইটির মুখপত্র ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাডভোকেটের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৪১ সালে। সাংবিধানিক উপায়ে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের সাথে তিনি ভারতে থাকাতেই আলোচনা করতেন।[৭] এহেন Indophie Britisher ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক কর্তৃক

দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের কাজে। তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে কতকগুলি প্রস্তাব ও মন্তব্য প্রদান করেছিলেন।

II

যে পটভূমিতে বেন্টিঙ্ক এ্যাডামকে এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধান চালাবার জন্য কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ইংল্যান্ডের চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩) এবং উইলিয়াম উইলবারফোর্সের (১৭৫৯-১৮৩৩) নেতৃত্বাধীন Evangelical গোষ্ঠী কোম্পানীর প্রাচ্য নীতির এবং এদেশের ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ হানে এবং এদেশে ইংরেজী শিক্ষা, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা এবং সব কিছু ইংরেজী প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। তারা ভেবেছিলেন এর ফলে এদেশবাসী আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় শিক্ষিত হবে এবং ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি তাদের রুচি বৃদ্ধি পাবে।[৮] কিন্তু ইংল্যান্ডের Conservative গোষ্ঠী অর্থাৎ টমাস মানরো, মনস্টুয়ার্ট এলফিস্টোন, জন ম্যালকম এবং স্যার চার্লস মেটকাফের ন্যায় ইংরেজগণ Evangelica গোষ্ঠীর আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা ধীরে ধীরে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি চেয়েছিলেন।[৯] তাঁদের বিরোধিতা হেতু ১৮১৩ সালে চার্টার এ্যাক্টের নবীকরণের সময় Evangelica গোষ্ঠীর আন্দোলন সীমিত সাফল্য লাভ করেছিল। পরে উনিশ শতকের কুড়ির দশকের গোড়ার দিক থেকে Evangelica গোষ্ঠীর আন্দোলন জোরদার হয়, কেননা ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে উত্তরোত্তর শক্তিশালী Free Traders এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। মেকলে সাহেব, যিনি জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি এবং গভর্ণর জেনারালের কাউন্সিলের আইন সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। Evangelica আন্দোলনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বেন্টিঙ্কের উপর প্রভাব ফেলেছিলেন।[১০] অন্যদিকে উপযোগবাদী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন জেমস মিল। তিনি Evangelica গোষ্ঠীর ন্যায় হিন্দু ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ হানলেও ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্তে সরকার এবং আইনের মৌলিক পরিবর্তনজনিত সংস্কারকে এদেশবাসীর অগ্রগতির প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। কিন্তু ভারতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান প্রবর্তনের উপর মিলের, বিশেষ করে উপযোগবদী শিক্ষা প্রবর্তনের ধারণা এবং সরকার চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যয় সঙ্কোচনের তত্ত্ব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব ফেলে।[১১] কোর্ট অফ ডিরেক্টরস মিলের উপযোগবাদের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এদেশে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উপর জোর দিয়েছিল। অন্যদিকে মিলের Economy-এর তত্ত্বানুযায়ী কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশীয় যুবককে সরকারী চাকুরীর যোগ্য করে তুলে খরচ কমাতে চেয়েছিল। যদিও মিল সরকারী চাকুরীতে এদেশীয়দের নিয়োগের পক্ষে ছিলেন না।[১২] এই প্রেক্ষাপটে বেন্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষাকে "A pancea for the regeneration of India" মনে করতেন[১৩] এবং মূলতঃ শাসন খরচ কমানোর জন্য ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে Native Agency গড়ে তুলতে[১৪] এবং বিচার ও শাসনকার্যের অন্যান্য সহায়ক সুবিধার জন্য ইংরেজী শিক্ষা

চালু করতে চেয়েছিলেন[১৫]। কিন্তু শিক্ষক কমিটিতে (জেনারাল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনে) সংবাদপত্র এবং জনসভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হওয়ায় বেন্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এ্যাডামকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা এবং জনমানস বোঝার জন্য রিপোর্ট তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[১৬]

III

এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১৭] কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল তা ঐ রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কিভাবে প্রাথমিক স্তরে স্কুল শিক্ষক ও স্কলারগণকে বিভিন্ন castes ও races থেকে নেওয়া হত।[১৮] তিনি শিক্ষা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাবের উল্লেখ করেছেন।[১৯] পারসীক এবং আরবী শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[২০] সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি প্রদান করেছেন তা সে যুগে ছিল বিরল।[২১] "Hindu schools of Learning" প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে- There were sufficient materials for a Hindu University in which all branches of Sanskrit learning might be taught."[২২]

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে (যে ব্যবস্থায় তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ কায়স্থ গুরুমহাশয় শিক্ষা প্রদান করতেন এবং বালকদের শিক্ষা দেবার আগ্রহ পিতামাতাদের, এমনকি নিম্নশ্রেণীর পিতামাতাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল) মন্তব্য করতে গিয়ে এ্যাডাম লিখেছেন যে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশবাসীর নৈতিক ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে হবে-"These are the institutions, closely interwoven with the habits of the people and customs of the country through which, primarily, although not exclusively. We may hope to improve the morals and intellects of the native population."[২৩] প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃরুজ্জীবনের জন্য তিনি পাঠ্যসূচীতে নৈতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন - যে শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নিকট উপযোগী হবে না।[২৪] অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনের চিন্তা তাঁর ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধীরে ধীরে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎকৃষ্ট মানে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল শিক্ষার বিষয়ে এদেশবাসীর মনে প্রয়োজনীয় stimulus প্রদান করা এবং নিজেদের উন্নতির জন্য এদেশবাসীকে চেষ্টায় লিপ্ত রাখা।[২৫] তিনি অবশ্য চেয়েছিলেন যে সরকার দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব দিক এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।[২৬] কিন্তু তিনি সরকারের বেতনভোগী প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে নূতন স্কুল গড়ার ধারণার বিরোধী ছিলেন।[২৭]

স্কুলগুলির শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যে তিনি বলেছিলেন- "European knowledge must be the chief matter of instruction"[২৮] এক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষিত হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের আগ্রহ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য

তাৎপর্যপূর্ণ।[২৯] কেননা ইহা নূতন শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের ঔদাসীন্য সম্পর্কে সরকারী অভিযোগকে খন্ডন করে। যাইহোক, তিনি মনে করতেন না যে ইংরেজী ভাষা এদেশীদের শিক্ষার একমাত্র বা প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিত।[৩০]

তিনি সেকালের Filtration তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ ছিল যে ঐ ধারণা সমগ্র এদেশীয় অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার অবহেলার সামিল।[৩১] এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

The plan assumes that the country is to be indebted to us for schools teachers, books everything necessary for its moral and intellectuals improvement and that in the prosecution of our views we are to reject all the aids which the ancient institutions of the country and the actual attainment of the people afford towards their advancement.[৩২]

এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে এদেশে তাদেরকে হিন্দু ও মুসলিমদের সাথে Deal করতে হবে। হিন্দুরা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার স্রস্টা আর মুসলিমরা ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার বিখ্যাত উদ্যোক্তা। এবং উভয়েই এমন কি তাদের সভ্যতার বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায়। শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী।[৩৩]

এ্যাডাম মনে করতেন যে শিক্ষার superstructure-কে উন্নত ও দৃঢ় করতে হলে Foundation-কে Broad ও Deep করতে হবে- "Thus building from the foundation, all classes of institutions and every grade of instruction may be combined with harmonious and salutory effect."[৩৪] এক্ষেত্রে এ্যাডাম এদেশবাসীর শিক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণের কথা ভেবেছিলেন।

তবে তিনি মনে করতেন যে এদেশের জনগণের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হল এদেশের প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিকে উন্নীত করা।[৩৫]

তিনি মনে করতেন যে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।[৩৬]

তিনি জনগণের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন।[৩৭] তাঁর মতে জনগণের মধ্যে শিক্ষার অভাবহেতু Crime বা অপরাধ বৃদ্ধি পায়।[৩৮] তিনি তাঁর মতের পক্ষে মানরো এবং এলফিনষ্টোনের জনগণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার যুক্তিগুলিকে তুলে ধরেছিলেন।[৩৯] এ বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে ছিল জনগণের সুবিধার্থে বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় পুস্তক রচনা। নর্ম্যাল স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষকদের মাঝে মাঝে ট্রেনিং ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তত্বাবধানের জন্য ইনস্পেকটর নিয়োগ ইত্যাদি।[৪০] উল্লেখ্য তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা, বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় গ্রন্থ এবং ইনস্পেকটর নিয়োগ প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রামগোপাল ঘোষের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া যায়।[৪১] বিদ্যাসাগরের নর্ম্যাল ও মডেল স্কুলের ধারণার মধ্যে এ্যাডামের নর্ম্যাল স্কুলের প্রস্তাব প্রতিফলিত।[৪২]

যাইহোক, এ্যাডাম মেকলের Aglicint Zeal-এর অংশীদার ছিলেন না। সেজন্য যে

প্রতিবেদনে গভর্ণর-জেনারাল-ইন-কাউন্সিল এ্যাডামকে নিয়োগ করেছিলেন তাতে মেকলের স্বাক্ষর ছিল না।[৪৩] মেকলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেন্টিঙ্ক এ্যাডামের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৮৩৫ সালে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে Resolution পাশ করেছিলেন। কিন্তু মি.এইচ. ফিলপস লিখেছেন যে-"The detailed proposals of the government which finally emerged in February, 1835, were more cautions than Macaulay's Minute had urged."[৪৪]

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে এ্যাডামের জনগণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করার এক প্রয়াস সাধিত হয়েছিল। বিভিন্ন জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ১০১টি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের উৎসাহের অভাবে ও অন্যান্য কারণে স্কুলগুলির মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।[৪৫]

এ্যাডামের মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রস্তাব শুধু ঔপনিবেশিক ভারতে নয় স্বাধীনতার প্রায় ৫৩ বছর পরও আজকের ভারতে বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেনি। আমি আশা করব নূতন শতাব্দীর সূচনার সময় এ বিষয়ে বৃহত্তর প্রয়াস ও আন্দোলন সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সাধিত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ এই সাধু প্রয়াসের সাথে যুক্ত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। পালিত, চিত্তব্রত, নিউ ভিউপয়েন্টস অন নাইনটিন্থ সেনচুরি বেঙ্গল, কলিকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮০, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

২। কলেট, এস. ডি., লাইফ এ্যান্ড লেটারস অফ রাজা রামমোহন রায়। বিশ্বাস, ডি.কে ও গাঙ্গুলি, পি.সি. সম্পাদিত। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ: ১১৪।

৩। চন্দ, মৃণাল কান্তি, হিস্টরি অফ দি ইংলিশ প্রেস ইন বেঙ্গল, ১৭৮০-১৮৫৭, কলিকাতা, কে.পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭, পৃ: ৬-৭।

৪। দি ইন্ডিয়া গেজেট, অক্টোবর ২১,২৫,২৯,১৮৩১।

৫। ঐ, জানুয়ারী ২৭, ১৮৩২।

৬। মেহরোত্রা, এস.আর, দি ইমারজেন্স অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেস, দিল্লী, বিকাশ ১৯৭১, পৃ: ১৭।

৭। পালিত, চিত্তব্রত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৫-১৫৬।

৮। স্টোকস, এরিক, দি ইংলিশ ইউটিলিট্যারিয়্যানস এ্যান্ড ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড, ক্লেয়ারেন্ডন প্রেস, ১৯৫৯, পৃ: ২৭-৪০।

৯। ঐ, পৃ: ৮-৯, ১৮, ২২-২৪, ফিলিপস, সি. এইচ, দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১৭৮৪-১৮৩৪, বোম্বে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬১, পৃ:২২৭, ২৪২, ২৪৯; এ্যাডাম, উইলিয়াম। রিপোর্টস অন দি স্টেট অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৩৫ ও ১৮৩৮), বসু, অনাথ নাথ সম্পাদিত, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১, পৃ: ৩৬৬-৩৬৭,

৩৭০-৩৭১।

১০। স্টোকস, এরিক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩-৪৬, ৫৭; মজুমদার, আর.সি. সম্পাদিত। দি হিস্টরি এ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিওপল, ভলিউম ১০, ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি এ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেশাঁস, পার্ট ২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), বোম্বে, ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৮১, পৃ: ৪৬।

১১। স্টোকস, এরিক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৬-৭৭।

১২। ফিলিপস, সি. এইচ. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪৭-২৪৮; কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের শিকার মাধ্যমে যোগ্য দেশীয় প্রার্থী তৈরীর নীতিকে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটি সমর্থন করেছিল-পার্লামেন্টারী পেপারস, এইচ.সি. রিপোর্ট ফ্রম কমিটিস, ভলিউম ৯, ১৮৩১-৩২, পেপার নং ৭৩৫১, পৃ: ১৮।

১৩। ফিলিপস, সি.এইচ. সম্পাদিত দি করসপন্ডেন্স অফ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিক, ভলিউম ২ (১৮৩২-১৮৩৫), কলিকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৭, পৃ: ১২৮৭।

১৪। ফিলিপস, সি.এইচ., দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পৃ: ২৬২; মজুমদার, আর.সি. সম্পাদিত দি করসপন্ডেন্স অফ উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক, ভলিউম ১ (১৮২৮-১৮৩১), কলিকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৭, পৃ: ৫১৫, ৫২৫-৫২৬, ৫৩১।

১৫। ফিলিপস, সি,এইচ. সম্পাদিত পূর্বোক্তপৃ: ৫২৬; মজুমদার, আর.সি. গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল ইন দি নাইনটিন্থ সেনচুরি, কলিকাতা, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, পৃ: ৪৪; এ হানড্রেড ইয়ারস অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা (সেন্টিনারি এডিশন), পৃ: ১৬-১৭।

১৬। ফিলিপস, সি. এইচ. সম্পাদিত পূর্বোক্ত, ভলিউম ১, ভূমিকা XLi, ভলিউম ২, পৃ: ১২৮৭, ১৩৯৫-১৩৯৬।

১৭। সেকেন্ড রিপোর্ট, ১৮৩৬, সেকশন ২, "এলিমেন্টারি ইনস্ট্রাকশন", এ্যাডাম, উইলিয়াম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

১৮। থার্ড রিপোর্ট, ১৮৩৮, চ্যাপটার ১, সেকসন ৬, 'বেঙ্গলী এ্যাণ্ড হিন্দী স্কুলস্', ঐ পৃ: ২২৮

১৯। ঐ, পৃ: ২৫১

২০। থার্ড রিপোর্ট, ১৮৩৮, চ্যাপটার ১, সেকসন ১০, 'জেনারাল রিমার্কস অন দি স্টেট অফ পার্সিয়ান এ্যান্ড অ্যারাবিক ইনস্ট্রাকশন, ঐ, পৃ: ২৯০-২৯৬।

২১। থার্ড রিপোর্ট, চ্যাপটার ২, সেকশন ৩, "Sanskrit Education", ঐ পৃ: ৪২৯।

২২। সেকেন্ড রিপোর্ট, সেকসন ৩, "Hindu Schools of Learning", ঐ, পৃ; ১৬৯।

২৩। ফার্স্ট রিপোর্ট, ১৮৩৫, সেকশন ১, 'দি টোয়েন্টি ফোর পরগনাশ ইনক্লুডিং ক্যালকাটা, ঐ, পৃ: ৭।

২৪। সেকেন্ড রিপোর্ট, সেকশন ২, 'এলিমেন্টারি ইনস্ট্রাকসন', ঐ, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

২৫। সেকেন্ড রিপোর্ট, সেকশন ৭, 'স্টেট অফ মেডিক্যাল প্রাক্টিশনারস্', ঐ পৃ: ২০১।

২৬। থার্ড রিপোর্ট, সেকেন্ড চ্যাপটার, সেকশন ১, 'প্রিলিমিনারি কনসিডারেসনস', ঐ, পৃ: ৩৫০।

২৭। ঐ, পৃ: ৩৫৩-৩৫৪।

২৮। থার্ড রিপোর্ট, ফার্স্ট চ্যাপটার, সেকশন ২, 'জেনরাল রিমার্কস অন দি স্টেট অফ ইনস্ট্রাকসন ইন দি স্কুলস', ঐ, পৃ: ৩০৮।

২৯। থার্ড রিপোর্ট চ্যাপটার ২, সেকশন ৪, 'এ্যাপ্লিকেশন অফ দি প্ল্যান টু দি ইমপ্রুভমেন্ট এ্যান্ড এক্সটেসান অফ ইনস্ট্রাকসন এ্যামোং দি মুসলমান পপুলেশন', ঐ, পৃ: ৪৪১।

৩০। থার্ড রিপোর্ট, চ্যাপটার ১, সেকশন ১২, ঐ পৃ: ৩০৮।

৩১। থার্ড রিপোর্ট, সেকেন্ড চ্যাপটার, সেকশন, প্রিলিমিনারি কনসিডারেসনস', ঐ পৃ: ৩৫৭।

৩২। ঐ

৩৩। ঐ

৩৪। ঐ, পৃ: ৩৫৮।

৩৫। থার্ড রিপোর্ট, চ্যাপটার ২, সেকসন ২, 'প্ল্যান, প্রোপাজাল এ্যান্ড ইটস্ এ্যাপ্লিকেশন টু দি ইমপ্রুভমেন্ট এ্যান্ড এক্সটেনসন অফ টু ভার্নাকুলার এডুকেশন, ঐ, পৃ: ৩৫৭-৩৫৯,. ভূমিকা XLiii

৩৬। ঐ, পৃ: ৪১৭

৩৭। ঐ পৃ: ৩৫৮-৪১৮

৩৮। থার্ড রিপোর্ট চ্যাপটার ১, সেকসন ১৯, 'দি স্টেট অফ ক্রাইম ভিউড ইন কানেকসন উইথ দি স্টেট অফ ইনস্ট্রাকশন', ঐ, পৃ: ৩৪১-৩৪৭।

৩৯। থার্ড রিপোর্ট, চ্যাপটার ২, সেকশন ২, ঐ, পৃ: ৩৬৬-৩৬৯।

৪০। ঐ, পৃ: ৩৬৯, ৩৮৫-৩৮৬, ৪১৪।

৪১। মিত্র, প্যারীচাঁদ, 'দি জমিন্দার এ্যান্ড দি রায়ত', দি ক্যালকাটা রিভিউ, ভলিউম ৬, ১৮৪৬, প: ৩৪৯-৩৫০; এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট (জেনারাল)। ভলিউম ১১৩, Proceedings dated March 5, 1855, পৃ: ৪৭২-৪৭৬।

৪২। সরকার, সুমিত, "বিদ্যাসাগর এ্যান্ড ব্রাহ্মানিক্যাল (Brahmanical) সোসাইটি, রাইটিং সোসাল হিস্টরি, কলিকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭, পৃ: ২৫১।

৪৩। এ্যাডাম, উইলিয়াম, পূর্বোক্ত, ভূমিকা xxx।

৪৪। ফিলিপস, সি. এইচ. সম্পাদিত দি করসপন্ডেন্স অফ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক, ভলিউম ১, ভূমিকা XLii

৪৫। এ্যাডাম, উইলিয়াম, পূর্বোক্ত, ভূমিকা Xviii.

বেথুন সোসাইটি - একটি পর্যালোচনা

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব বিষয় ও সমাজোন্নতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। বেথুন সোসাইটি তার মধ্যে অন্যতম। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তান ও ইংরাজ কর্মচারীরা বাঙালির উন্নতি সাধনে নানাভাবে ছোট করে গেছেন। বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে সাময়িক পত্র পত্রিকা অবশ্য পাঠ্য। বিশেষ করে বেথুন সোসাইটি সম্বন্ধে বিশদ জানতে গেলে আমাদের The Bengal Hurkaru, India Gagette, The Englishman, India Mirror প্রভৃতি পত্রিকার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ছাড়া বেথুন সোসাইটির প্রসিডিংস ও 'ট্রানজ্যাকসনস্' থেকেও এ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। এ যুগের সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই স্বাভাবিক আলোচনা অপরিহার্য।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারতে এবং নব্যশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলার সমাজে বিপুল আলোড়ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক আলোচনা দ্বারা এই আলোড়নকে শান্ত, সংযত ও নব্যশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে দৃঢ় ও সংযত করার প্রয়াস চলে।[১]

পূর্বে যে সমস্ত সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল তাকে কোন ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা হয়নি। কিন্তু বেথুন সোসাইটি নামকরণের একমাত্র কারণ 'বেথুনের মত উদারচেতা, ভারত হিতৈষী ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে রাখা বেথুন স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর চারমাস পরে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর থেকে যোগ্য নাম আর পরিচালকদের স্মরণে সীমিত।

বেথুন সোসাইটি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম কুড়ি বছরে এই সভা নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে চলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৮-৫৯ সালে প্রকাশিত ট্রানজ্যাকশনস্ থেকে। এই পুস্তকে বেথুন সোসাইটির কৃতকর্মের কথা অনেকটা জানা যায়। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালে সোসাইটির পুনর্গঠন পর্যন্ত এর কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়[২]। তবে এই সোসাইটির বিস্তৃত কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজন তৎকালীন পত্রপত্রিকা যেখানে বিশদভাবে সোসাইটির কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়েছিল। সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জন অনেকেই এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তাঁরা প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতাদান, আলোচনা-বিতর্ক প্রভৃতিতে সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেথুনের মৃত্যুকালে শিক্ষা সমাজের সেক্রেটারী ছিলেন ড: এফ. জে. মৌত্রট। সভার শুরুতে তিনি যে বক্তৃতা দেন অনেকে এই সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা খানিকটা জানতে পারি। কোলকাতায তখন এশিয়াটিক সোসাইটি। হর্টি কালচার সোসাইটি ও অনেক সভা-সমিতি ছিল। কিন্তু এ গুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনেব মেলামেশা এবং সাধারণের হিতকর বিষয়ে আলোচনা সম্ভব ছিল না। মৌত্রট দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডেব বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ও বড় বড় উৎকর্ষতামূলক প্রতিষ্ঠানাদির কথা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, ধর্ম ও রাজনীতি ছাড়া সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয়ই এখানে আলোচনা করা যাবে। পরিচালনার ব্যয় তিনি একবছর নিজেই কমাবেন বলে ঘোষণা করেন।[৩]

তাঁর আলোচনার পর, এই প্রস্তাবেব স্বপক্ষে যারা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: স্প্রেংগার, জেমস্ লঙ্, ড:গুডিৎ চক্রবর্তী। আলোচনার পব প্রস্তাবিত সভা স্থাপনে সকলে একমত হলে কয়েকটি নিয়ম ধার্য করা হল।

"That a society be established under the name of the Bethune Society, on consideration and discussion of questions connected with literature and science."

এটা স্পষ্ট যে এই সভার উদ্দেশ্য ঠিক হল সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা গবেষণা। ধর্ম ও রাজনীতি থেকে এই সোসাইটি শত হস্তে দূরে ছিল। প্রথম সভাপতি ড: মৌত্রট ও সম্পাদক হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

বেথুন সোসাইটিব দ্বিতীয় সভা হয় মেডিক্যাল কলেজে ১৮০২ সালে। এখানে মূল কয়েকটি নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। মূল কয়েকটি নিয়ম হল ! প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন হবে, সদস্য হতে হলে আগের সভার দুজন সদস্য কর্তৃক তাঁর নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হতে হবে। ইংরাজী, বাংলা বা উর্দু তিন ভাষাতেই প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা দান ও আলোচনাদি কবা যাবে। পাঠ ও প্রবন্ধ সভার স্বত্ব হবে।

এই সভার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল ড: গুডিৎ চক্রবর্তীর "On the sanitary improvement of calcutta" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কলিকাতা রিভুাউ' বেথুন সোসাইটির আবির্ভাব কাহিনীর প্রসঙ্গে এই প্রথম বক্তৃতার ও আংশিক আলোচনায় পাওয়া যায়।[৪] সোসাইটিব প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, এফ. জে. মৌত্রট, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিশ্র, আনন্দরাম ফুকন, জেমস্ লঙ, জি.টি. মার্শাল, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, ক্লিন্ট, ড: স্প্রেঙ্গার, ড: গুডিৎ চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সরকার, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যাবীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাস চন্দ্র বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, প্রসন্নকুমার মিত্র ও গোপাল চন্দ্র দত্ত'ৰ নাম থেকে বোঝা যায় এই সভার গুরুত্ব ছিল সমধিক।[৫] এছাড়া ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশনাথ রায়, শচীন্দ্র মিত্র ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

এরপর শুধু কোলকাতা থেকে নয়, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর ও ঢাকা থেকেও কয়েক জনের নামের প্রস্তাব আসে। ঢাকায় সোসাইটির দুজন সদস্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও রামশঙ্কর সেন। তাঁরা সোসাইটিকে একটি চিঠি লিখে বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদের জন্য আবেদন জানান। তাঁরা আরো অনুরোধ করেন। ঢাকার এই শাখাকে ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি নাম দেবার অনুমতির জন্য।

মাসিক অধিবেশনের মুখ্যকর্ম্ম প্রবন্ধ পাঠ। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সব পঠিত হত। বাৎসরিক বিবরণে পরিষ্কার ভাবে সোসাইটিব উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, "The Bethune Society was established to promote among the educated Natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits and encourage a freerer intellectual intercourse that cannot be accomplished by other means in the existing state of the Native Society :

এক বছরের মধ্যে এই সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ১৩১ জন। এদের মধ্যে ১০৬ জন ভারতীয়। এক বছরের প্রবন্ধ পত্রিকার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা জানতে পারব কি বিচিত্র বিষয়ের উপর এখানে আলোচনা হয়। অনুসন্ধিৎসার জন্য এক বছরের কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১) On the sanitary improvement of Calcutta by Dr. S.G. Chakraborty.

২) On Sanskrit Poetry by Rev. K.M. Banerjee

৩) On the Bangali viewed with reference to his physical social, intellectual and moral habits, past and present by Isswar Chandra Mitra.

৪) On Bengali Poetry by Hur Chunder Dutta.

৫) On the Tragedy of Macbeth by Mr. Lewis, Principal, Dacca College

৬) On a comparative view of the European and Hindu dramas by Koylas Chunder Bose.

৭) On the education and Training of Children in Bengal - by Peary Charan Sircar

৮) On the present state and future prospect of Agriculture in Bengal by Ramsankaer Sein

৯) On the relation and absorvate advantage of Science and Literature in a Collegiate Education by Prosunna Koomer Surbadhikaree[৬]

এই বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে, ড: ম্যাকক্লেল্যান্ড ভূতত্ত্ব, এফ.জি. সিডসম, রামায়ন এবং আর জোন্‌স অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধে চিত্র সহকারে বক্তৃতা দিতে রাজী হয়েছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি প্রবন্ধ On the Sanskrit Language and literature in English and Bengalee বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এটি "Hindu Intelligence" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর'[৭] লেখে "বীটন

সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাগ্রে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপি নৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল বুৎপত্তি প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই। যে সকল মহাশয়রা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"[৮]

তৃতীয় বর্ষে সোসাইটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৪ জন, এর মধ্যে ৮৮ জন নতুন সদস্য। এ বছরেও প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞান দশটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এর মধ্যে অন্যতম ছিল On the Women of Bengal by Koylas Chunder Bose।

পরের বছর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আলোচিত হয় On the Remarriage of Hindu Widows in Bengal by Tarak Nath Dutt সহ-সভাপতি কর্ণেল গুডউইন তাঁর প্রবন্ধে বাংলায় একটি শিক্ষাবিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করেন; চারুশিল্প স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পরিকল্পনাটি পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল: দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং অনুসন্ধানে নিয়মিতভাবে নির্দেশ ও প্রেরণাদান, ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির সংঙ্গে যোগদান, শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাধারণের উৎসাহের উদ্রেক এবং এর উন্নতির পথে যে সব বাধা আছে তা দূর করার জন্য ঐ সভা স্থাপনেব প্রস্তাব করেন গুডউইন। মূল উদ্দেশ্য গঠনের জন্য তিনি আরও কয়েকটি উপায়ের কথা বলেন:- ১) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা, ২) শিল্পীদের তৈরী শিল্পকর্ম, মডেল প্রভৃতির প্রদর্শনী, ৩) শিল্পীদের পুরস্কার ও বৃত্তি দান, ৪) শিল্পবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ, ৫) একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ৬) চিত্র ও মডেলের একটি মিউজিয়াম এবং ৭) কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের শিল্প-বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি প্রয়াস।[৯]

১৮৫৭ সালে সোসাইটি ষষ্ঠ বর্ষে পড়ল। এই সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-বৈরিতা প্রচন্ডভাবে দেখা যায়। কিন্তু বেথুন সোসাইটি তবুও আপন আদর্শে সচেতন থাকল। উভয় সম্প্রদায় মিলিত ভাবে সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করেন :-

১) "On the Mormons and their leader Joseph Smith, by the Rev. C.H.A. Dau".
২) On the moral spiritt of Early Greek Poetry, by Mr. G. Smith.
৩) On Electro-Magnetism, illustrated with various experiments and some diagrams. by Mr. Sterling.
৪) On Meteorology, by Dr. H. Hallewer.
৫) On Chemistry as applied to Agriculture Mr. G. Evans.
৬) On landed tenure in Bengal, by Nobin Kristo Bose.
৭) On Modern enterprizes of benevolence in Gl. Britain, by Mr. Mcleod Wylie.

১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সালে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠও আলোচিত হয়। মহেন্দ্রলাল সরকার, এস.এইচ. ডাল, কাশীকুমার দাস, হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী, প্রফেসর কর্ণেল প্রভৃতির প্রবন্ধগুলি খুবই উঁচু স্তরের ছিল। এর বিস্তৃত তালিকায় দেখা যায় সে যুগের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা সাগ্রহে সোসাইটির কাজে যোগদিতেন।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় বেথুন সোসাইটি নতুন কর্মসূচী নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। যে নতুন কর্মসূচী নিয়ে সোসাইটি কাজ আরম্ভ করলেন তা ভাবী কালের আলোচনা গবেষণার পথিকৃৎ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই এখানে উৎসাহের অভাব দেখা যায় ১৮৬২ সালে 'সোসাইটি কর্তৃক শেষ "Transactions" বা প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত যা ছিল এই ধরনের শেষ গ্রন্থ।

দীর্ঘ তের বছর যাবৎ বেথুন সোসাইটি দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সমাজের কল্যাণকর নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এখানে হত। এই সব আলোচনার ভিত্তিতে, কোলকাতায় কতকগুলি সুফলপ্রদ প্রতিষ্ঠান ও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। যেমন সরকারী আর্টস্কুল। বোম্বাইতে কোন কোন বিদ্বান ও সমাজ নেতা এখানে এসে বক্তৃতা দিয়ে যান। এরপর জেমস থিয়ার "Women Teachers for Women" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কুমারী মেরী কার্পেন্টার এই সময় এদেশে বালিকাদের মধ্যে যথাযথ শিক্ষা প্রসার ও তাদের উন্নতির জন্য একটি 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' আন্দোলন শুরু করেন। এরপর ব্রাহ্ম নেতা কেশব চন্দ্র সেন "পাঞ্জাব পরিদর্শন" সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এই রূপে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত বেথুন সোসাইটির অধিবেশন সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যায় Indian Mirror পত্রিকায় ১৩টি প্রবন্ধে বেথুন সোসাইটি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আছে। তা একটি পুস্তক রূপে প্রকাশ পেলে গবেষকদের সুবিধা হত।

এইভাবে উনিশ শতকের শেষে বাঙালী জীবনের উন্নত চিন্তা ও উন্নয়ন কাজে সোসাইটি যেরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল এমন একক কোন একটি প্রতিষ্ঠান করে ছিল বলে আমাদের জানা নেই। বাঙালী চিত্তে প্রধান ও প্রথম ভাবনার সংযোগ ও সংমিশ্রণে যে নবজাগরণের উদ্ভব হয় তার মূলে বেথুন সোসাইটির দান পথিকৃতের।[১০]

সূত্র নির্দেশ

১। বেথুন সোসাইটি - যোগেশ চন্দ্র বাগল, কলি, পৃ:১

২। The proceedings of the Bethune Society for the sessions of 1859-60, 1860-61, "Introduction" pp-i-viii.

৩। The Bengal Harkaru, 20th January, ১৮৫২

৪। The Bengal Harkaru, July-Dacca, 1851 pp. 499-500

৫। Ibid 20th January 1852.

৬। Ibid 11th December, 1852.

৭। সংবাদ প্রভাকর, ১২ই মার্চ, ১৮৫৩।

৮। ঐ

৯। বেথুন সোসাইটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১০। ঐ, পৃ. ১২০।

শ্রীনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস

নন্দিনী শৈল দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনকালে (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীনে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী নগর কলকাতার ধনী, সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ পরিবারে, বাংলাদেশের গ্রামের লোকের দুঃখদৈন্য এবং বিবিধ সমস্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বছর বয়সে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে জমিদারি পরিচালনার কাজে গিয়ে গ্রাম বাংলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

সেই সময় অবিভক্ত বাংলার নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় ঠাকুর পরিবারে বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "শিলাইদা, পতিসর এইসব অঞ্চলে যখন বাস করতুম তখন প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি-নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটীর-আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।... তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম-কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনার দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।"[১] এখানেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর দ্বৈতরূপ দেখলেন একদিকে পল্লীর অসীম সৌন্দর্য, অন্যদিকে মানুষের দুর্বহ দারিদ্র। পল্লীজীবনের দারিদ্র ও চিত্তদৈন্য তাঁর চেতনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং কর্মপ্রয়াসের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন তথা গ্রাম পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনার উৎস এখানেই। রবীন্দ্রনাই এখানেই প্রথম অনুভব করতে পারেন-ভারতের আত্মা গ্রামেই নিহিত। গান্ধীজীও বিশ্বাস করতেন এযুগ বিজ্ঞানের যুগ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুফলকে গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামের উন্নয়নের জন্য, গান্ধীজী সেখানে পশ্চিমী বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে এড়িয়ে চরকার মতো পুরনো গ্রামীণ পদ্ধতিকেই আঁকড়ে থেকে গ্রামের তথা দেশের উন্নতিতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি শুধু শিল্পধ্যানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, একে তিনি ব্যবহারিক রূপ দেবারও চেষ্টা করেছেন। নিজের জমিদারিতে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরিক্ষা এবং পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে তাঁর পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস একথার প্রমাণ। পরে অনেকে নানামুখী পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াসে হাত

দিয়েছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হলে রবীন্দ্রনাথকেই তা দিতে হয়। তিনি লিখেছেন, "আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বন্ধন থেকে তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটা ছোট আদর্শ তৈরি হবে...।"[২]

শিলাইদা-পতিসর যুগে একদিকে যেমন তিনি বিচিত্র স্বাদের সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে জমিদারির মধ্যে কৃষির ও পল্লীবাসীর অবস্থার উন্নতির জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন প্রয়াসও নিয়েছেন। কিন্তু শিলাইদা-পতিসরের জমিদারিতে পল্লীউন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের ও অভিজ্ঞতার অভাবে তা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন প্রয়াসের নতুন দিগন্ত খুলে যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে Elmhirst-এর সহযোগিতায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

শ্রীনিকেতনে পরিকল্পিত ব্যবস্থার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান হলো গ্রামবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন ও শিক্ষার বিকিরণ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন - শিক্ষার অভাবই আত্মশক্তির উদ্বোধনের প্রধান অন্তরায়। এই শিক্ষা অবশ্য নোটবই মুখস্ত করা কলেজী শিক্ষা নয়-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে-চলার শিক্ষা যা মানুষের মনকে করে সংস্কারমুক্ত এবং চিন্তাকে করে স্বাধীন। শ্রীনিকেতনে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাচিন্তার মূর্ত প্রতীক। রাশিয়া ভ্রমণকালে সেখানকার শিক্ষা বিস্তার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এমনকি তিনি বলেছিলেন, "আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল-শান্তিনিকেতনে শুধুমাত্র প্রকৃতির কোলে আনন্দঘন পরিবেশে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; তিনি অর্থকরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায়ও বিশ্বাস করতেন। তিনি ক্রমেই উপলব্ধি করলেন যে, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা দেশের বিরাট সামাজিক জীবনের সঙ্গে জুড়ে না দিতে পারলে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার এও একটা বড় কারণ।

বিজ্ঞানের নব নব জ্ঞান কৃষিক্ষেত্রে যে আনতেই হবে এব্যাপারে তিনি বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন। তিনি "পল্লী প্রকৃতি"-তে বলেছেন, "আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। যান্ত্রিক সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না - এটা তাঁর বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ছাড়া দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাই "পল্লীপ্রকৃতি"-তে তাঁকে বলতে দেখি - "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। ...তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা। ...এযুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব। এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী।"[৪]

শ্রীনিকেতনের হাতে-কলমে শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মাধ্যমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে গ্রামবাসীদের পরিচয় করে দেবার ব্যবস্থা ছিল। পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার বিরাট সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে বারবার আকর্ষণ করেছে। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধু-পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং জামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে বিভিন্ন সময়ে বিদেশে

পাঠিয়েছেন কৃষিবিদ্যা ও গোপালন বিদ্যার নবতম জ্ঞান লাভ করবার জন্যে ও পরে দেশের ফিরে তাঁর পরিকল্পিত পল্লীসংগঠনের কাজে তা প্রয়োগ করবার জন্যে।[৫]

একটা কথা মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ধরে নিয়েই তাঁর গ্রামসংগঠনের কর্মপ্রণালী দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। রাষ্ট্রের ভূমিকা বাদ দিয়েই পল্লীনির্ভর সমাজব্যবস্থা স্থাপনে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তখনকারদিনের রাজনীতিবিদদের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেলপথ যখন বর্ধমান থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হল তখন তার তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্তইংরেজ এঞ্জিনীয়রের কার্যালয় ও বাসভবন তৈরি হয় সে সময়ের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুরুলের পাশে। পরে বোলপুর ষ্টেশন তৈরি হওয়ায় ঐ বাড়ি পরিত্যক্তহলে রায়পুরের জমিদার সিংহরা সস্তায় কিনে নেন, কিন্তু কোনো কাজে লাগাতে পারেননি। সেই ভুতুড়ে বাড়ি ও সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ কুড়ি বিঘা জমি রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে কিনে নেন।[৬] "...এই বাড়িটা কিনেছিলুম, ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছিলুম এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।....আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো, তার একটি সফল হবে...সব জিনিসেরই তখন অভাব। তারপর আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।"[৭]

উপরোক্ত সুরুল কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে শুরু হলো শ্রীনিকেতনের গ্রামপুনর্গঠনের কাজ। শ্রীনিকেতনের প্রথম ডিরেক্টর বা পরিচালক ছিলেন Leonard K. Elmhirst। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে Elmhirst শান্তিনিকেতনের কলেজের ১০ জন যুবক ছাত্র, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ২ জন কর্মী এবং রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করেন।

শিলাইদা-পতিসর যুগে গ্রামোন্নয়ণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাটি ছিল বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর অভাব। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে গ্রামপুনর্গঠনের যে কর্মযজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন সেখানে এই অভাব অনেকটা দূরীভূত হল। কারণ, আমেরিকায় Cornell University-তে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত ইংরেজ যুবক Elmhirst রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রীনিকেতনে এসে Village Reconstruction-এর দায়িত্বভার নিয়েছেন। Elmhirst-এর সহযোগী হিসাবে যোগ দিলেন বিদেশ-আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, যিনিও ইতিপূর্বে বিদেশ-আমেরিকা থেকে গো-পালন বিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও ছিলেন কবির কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী যাঁর কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে বীরভূমের গ্রামসংগঠনের Elmhirst-এর পরেই স্থান ছিল কালীমোহন ঘোষের। বীরভূমের প্রায়ই প্রত্যেক বড় গ্রাম ও শহরের পাশে একটি বা একাধিক সাঁওতাল পল্লী আছে। গ্রামবাসীরা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ধানকলের ও বাড়ি তৈরির মজুর। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কালীমোহন ঘোষ স্থানীয় গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিকেতন সংলগ্ন পাঁচটি সাঁওতাল কেন্দ্র ও পল্লীসেবা

সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনের সঙ্গে যখন অধিকসংখ্যক গ্রাম যুক্ত হলো তখন যুক্ত গ্রামগুলির বালকদেরকে গ্রামের কাজে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কারণ, প্রত্যেক গ্রামে কর্মী বা শিক্ষক নিয়োগ করার মত আর্থিক সংস্থান ছিল না।

সুতরাং, Baden Powell প্রবর্তিত Scouting ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হল, শান্তিনিকেতনের দুই জন ছাত্রকে তৎকালীন Central Province -এ পাঠিয়ে Scoutmaster হবার জন্য বিশেষ শিক্ষা দিয়ে আনা হল। তারপর তারা ফিরে এলে তাদেরই অধিনায়কত্বে গঠন করা হলো ব্রতীবালকদল। গ্রামের এইসব ব্রতীবালকেরা আগুন নেবানোর কাজে, First Aid দেওয়ার ব্যাপারে, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কুইনিন প্রয়োগ করায়, খেলাধূলায়, শাক-সবজির চাষে বিশেষ শিক্ষা বা অনুশীলন পেতে লাগল।

এছাড়া শ্রীনিকেতনের Institute of Rural Reconstruction -এর পরিচালনায় ছেলেদের জন্য নাইট স্কুল, মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয়, সমাজসেবার শিক্ষণ শিবির এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার আর ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল।[৮]

শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে গ্রাম পুনগঠনের কাজে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল বিশেষ কোনো গ্রামের পূর্ণাঙ্গ 'সার্ভে' করা।[৯] রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলতেন যে, গ্রামের জীবনকে সব মিলিয়ে দেখতে হবে - অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি আলাদা করে দেখলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন - শ্রীনিকেতনের হাতে-কলমে শিক্ষা ও বিভিন্ন সমবায়িক প্রচেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, আনন্দের প্রাচুর্যে গ্রামবাসীদের সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তুলতে। তিনি মনে করতেন যে, যেদিন এইভাবে গ্রাম জাগ্রত হয়ে উঠবে, সেদিন দেশ সত্য-সত্যই সমৃদ্ধ হবে। নগরকে তিনি উপেক্ষাও করেননি আবার গ্রামকে শোষণ করে নগরের স্ফীতি তিনি মেনে নিতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। এটা সত্যিই সন্তোষের বিষয় যে আমাদের দেশনেতারা গ্রামপুনর্গঠন ও পেশাভিত্তিক শিক্ষাদান কর্মসূচীর বিস্তারের আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উৎসাহ ও সাহায্যে অনেক সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষের তৈরি নানা হস্তশিল্পের কাজ দেখে আমাদের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই মানুষটিকে, যিনি ছিলেন এই বিরাট কর্মকান্ডের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের আগে এদেশে অনেক বড় কবি জন্মেছেন। এসেছেন অনেক বলিষ্ঠ লেখক, প্রখ্যাত নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক কিংবা সংগীতকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি, যাঁর মধ্যে এতরকম বিবিধগুণের সমাহার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিক্ষক তথা নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী। তাই আমরা আজ তাঁকে সম্মান করি শুধু একজন কবি এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে নয়, একজন মহান পল্লীসংগঠক হিসাবে।

সূত্র নির্দেশঃ

১। পল্লীপ্রকৃতি (বিশ্বভারতী, ১৯৬২) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। পল্লীপ্রকৃতি (বিশ্বভারতী, ১৯৬২) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। "রাশিয়ার চিঠি", রবীন্দ্ররচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতীর, ১০ম খণ্ড।
৪। পল্লীপ্রকৃতি (বিশ্বভারতী, ১৯৬২) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫। শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্রভবন আরকাইভস্" - এ সংরক্ষিত বাংলা চিঠিপত্রের file -এর মধ্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা চিঠি।
৬। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবন আরকাইভসে' সংরক্ষিত বাংলা চিঠিপত্রের ফাইলের মধ্যে সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী - ফাইলে - ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি।
৭। পল্লীপ্রকৃতি
৮। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনের বিভাগে সংরক্ষিত "Sriniketan Papers"
৯। শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী বল্লভপুর গ্রামের সার্ভে - কালীমোহন ঘোষ সম্পাদিত (বিশ্বভারতী, ১৯২৬)।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান

অসিত দত্ত

কথাপ্রসঙ্গ:

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসর্জন নাটক প্রকাশ করেন। এর আগে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজর্ষি উপন্যাস প্রকাশ করেন। এ উপন্যাসের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে 'বিসর্জন' নাটকটি রচিত হলেও তার মৌলিক আবেদন ভিন্নতর, আবেগ উচ্ছ্বাসের, জীবনবোধের মাত্রা নাট্যবৃত্তকে অনুসরণ করে বিবর্তিত। জীবনের মৌলিকরূপকে আশ্রয় করে, কয়েকটি সামাজিক উপাদান নাটকটির কাঠামোকে বিন্যস্ত করেছে। যেমনঃ

১) সন্তানহীনা রাণী গুণবতীর সন্তান কামনায় দেবীর পায়ে বলি প্রদানের অঙ্গীকারে একটি ধর্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে - এ বোধে সমাজভাবনার বস্তুভিত্তিক রূপ প্রকটিত হয়নি। কার্য-কারণ সম্পর্কের বিজ্ঞানমনস্কতা নেই, আছে মধ্যযুগীয় চেতনার প্রকাশ, জীবনবোধের তমসাচ্ছন্ন রূপ। এটা নাটকটির অংশমাত্র। ভিন্নমাত্রিক জীবন দর্শনে পৌঁছনোর সোপান সদৃশ। কারণ, নাটকটি উনবিংশ শতকের রেনেসাঁস উদ্ভাসিত সময়কালে রচিত। সুতরাং মধ্যযুগীয় সামাজিক উপাদানের সামগ্রিক উপস্থিতি ঘটবে না ঐতিহাসিক কারণে। বস্তুতঃ সমকালীন উৎপাদন সম্পর্ক মধ্যযুগীয় জীবনে সাঙ্গীকৃত অনেক উপকরণকে ধারণ করলেও এ জীবনধারার মৌলিক স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, ইতিহাসের গতিমুখকে পরিবর্তন করতে অপারগ হবে।

দ্বিতীয় উপাদান হল :

পশুবলি নিষিদ্ধ করণের মধ্যদিয়ে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মবোধ ও দর্শন বিরোধী মূল্যবোধের প্রকাশ, যা একটি সংগ্রাম মুখর জীবনবোধকে দ্যোতিত করে। এ বোধ সহজগম্যতার পথ ধরে আসেনি। নানা বিরোধ প্রতিরোধ, সংগ্রাম, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চক্রান্ত একদিকে, অন্যদিকে মমত্ববোধ, প্রীতিস্নিগ্ধ মুগ্ধতা, ঔদার্য্য একটি জীবনের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে, কিন্তু একটির সমাপ্তি অন্যটির শুরু এমন সরলীকৃত সূত্র ধরে আসেনি। বিরোধ প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং একটি শ্রেণীর উন্মেষ ও তার আধিপত্য প্রয়োগের পথ ধরে এসেছে। পুঁজির অনুপ্রবেশ, পুঁজিপতির আবির্ভাব এবং তার বৈষয়িক শর্ত শ্রমশক্তির বিকাশকে পথ করে দিতে

হয়েছে। যদিও মধ্যযুগীয় অবশেষ পূর্বের সর্বময় আধিপত্য হারালেও অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে তার প্রভাব জারী করতে এগিয়ে এসেছে। সুতরাং 'বিসর্জন' নাটকে একটি সময়ের সামাজিক জীবনের ছবি যেমন আছে, তেমনি একটি সমাজের দ্বন্দ্বময় গতিপ্রকৃতির রূপরেখার, দার্শনিক উত্তরণের বিকাশ আছে। একদিকে একটি বিলীয়মান সমাজ ও সমাজসম্পর্কের প্রাধান্যশূন্য, প্রতিষ্ঠাহীন রূপ, অন্যদিকে নতুন যুগ ভাবনার উন্মেষের উদ্ভাসিত আলোর বিচ্ছুরণ সমাজটিকে শুধু যুগচিহ্নিত করেনি, প্রগতিশীল জীবনদর্শনের অন্যতম প্রকাশরূপে অভিষিক্ত করেছে। তার সামগ্রিক পরিচয় 'বিসর্জন' নাটকে অংকন করেছেন রবীন্দ্রনথ। রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধের ছবি এঁকেছেন, প্রতিক্রিয়াশীলতাব চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন। একটি অনগ্রসর ধর্মান্ধ, জীবনবিমুখ জীবনেব ছবি এটা:

"এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
তিন শত ছাগ।"

রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সন্তানহীনা রাণীর আর্তিকে এ নাটকে তুলে ধরতে চাননি। জীবন বিমুখ কোন জীবনবোধকে জীবনাদর্শের পবাকাষ্ঠা রূপে ভাস্বর করতে চাননি। আবার জয়সিংহেব মমত্ববোধ সিঞ্চিত দেবীব প্রতি আনুগত্য কবির অভিপ্রায় নয়ঃ

"আপনি নিয়েছ
যাবে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায় ?"

এ বিশ্বমাতা অনগ্রসর জীবনবোধের সঙ্গে অন্বিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার রেনেসাঁসের প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বমাতার বোধ একাত্ম নয়। জয়সিংহের ঔদার্য্য আবার দেবীর প্রতি অকুন্ঠ আনুগত্য ও একালেব জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত নয়:

"মহারাজ
আপনাব প্রাণ-অংশ দিযে যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহাবে নিয়েছেন - আমি তারে আর ফিরাব কেমনে ?"

মধ্যযুগের ছবিকে প্রতিক্রিয়ার জায়গায় রেখে নতুন যুগের আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। কি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলতা ধিকৃত হয়েছে কবির লেখায় !

"মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তারে !"

কবি অপর্ণার ভৎসনায় নতুন যুগের উন্মেষের দাবিকে তুলে ধরতে চাইছেন।

অপর্ণা ! "মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রেব ধন ! রাজা যদি চুরি

করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা, তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার ! মহারাজ, বলো তুমি —"

অপর্ণা এখানে রেনেঁসাস উদ্ভাসিত জীবন বোধ ও দর্শনের প্রতিভূ। অনগ্রসর মধ্যযুগীয় জীবনচর্চার প্রতীক দেবীর উদ্দেশে বলি, রক্তপাত। একে কেন্দ্র করে যে বোধ, প্রত্যয়, জীবনায়ন তার দিকেই। অপর্ণার আক্রমণের গতিমুখ। জয়সিংহ ও দ্বিধান্বিত হচ্ছে; এতদিনের আনুগত্যের অমোঘতা বুঝি অবুঝ থাকছে না

"আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর।"

রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগের ছবি আঁকতে চাইছেন; কিন্তু নতুন যুগে যেতে হলে অস্তায়মান যুগের পাহাড়কে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে, নতুন দ্বন্দ্ব পুরাতনকে নির্জিত করে উন্মেষিত হবে।

প্রতিক্রিয়াশীলতারও একটি যৌক্তিক অবস্থান আছে। রঘুপতি এ অবস্থানের নিয়ন্ত্রক।

"এতদিন
সহিল কী করে ? সহস্র বৎসর ধ'রে ।।
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি !"

অর্থাৎ সামন্ত সম্পর্কে সুদীর্ঘ অবস্থানে ও আধিপত্যে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেননি। রাজা-পুরোহিত সমাজের জীবনদর্শনের একদিকে প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন জীবনবোধের স্ফুরণ ঘটেছে, সমাজ সম্পর্ক পরিবর্তনের হাত ধরে। পুঁজিবিকাশ সামন্তসম্পর্ককে আঘাত হেনেছে, পর্যুদস্ত করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে, আন্তর্জাতিক সমাজ সম্পর্কের বিন্যাসের পরিমণ্ডল অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতবর্ষের মাটি থেকে সামন্তসম্পর্ক উৎপাটিত হয়। তার জন্যই সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলি অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণ তৈরী করেও নতুন জীবনাদর্শের পাশেই অবস্থান করছে। তাই রঘুপতি প্রতিক্রিয়ার ছত্রতলে অবস্থান করে নতুন যুগের আহ্বানকে অস্বীকার করতে চাইছে।

রঘুপতি: একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার। অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই।

রঘুপতি সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল তূণ থেকে সবচেয়ে মারাত্মক এবং সমাজ সম্পর্কোদ্ভূত নতুন জীবনবোধ চিহ্নিত অস্ত্রটি প্রগতিভাবনার শরিকের দিকে ছুঁড়ে মারলেন: "পাষন্ড, নাস্তিক তুমি।" প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে কি অসাধারণ যুক্তিজাল বিস্তার করল রাজ্যের মন্ত্রী।

"পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে সে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে ?"

অর্থাৎ রক্তপাত, পশুবলিকেন্দ্রিক জীবনবোধ ও সমাজসম্পর্ক রেনেসাঁস চিহ্নিত জীবনবোধের কাছে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি, বরং জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছে। নতুন নুতন সমাজ জীবনেব বিরুদ্ধে। তাই চক্রান্তকারী নক্ষত্র রায়ের মুখে একই কথা :

"ভেবে দেখো মহারাজ
যুগে যুগে সে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।"

প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত কোন স্তরে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত এরূপ:

"রঘুপতি: দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই - শ্রাবণের শেষ রাত্রে !
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা-জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী
তখন সময় আর নাই বিচারের।"

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত সম্পর্কের এ বাতাবরণ, পরিমন্ডলে তৈরী করেছেন রেনেসাঁসোজ্জ্বল জীবনের ছবি আঁকবার জন্য। ভিন্নধর্মী ছবিটি রঘুপতির মুখ দিয়েই বলিয়াছেন : "অহংকার, অভিমান দেবতা ব্রাহ্মণে সব যাক ! তুই আয়।"

রাজা গোবিন্দমাণিক্য যে শূন্যবোধকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য রেনেসাঁসে ভাস্বর, সমকালীন বুর্জোয়া ঔদার্য্যে উদ্ভাসিত। রাজা, অপর্ণা, জয়সিংহ নতুন সমাজাদর্শের প্রবক্তা, নুতন যুগধর্মের প্রতীক। গুণবতী, রঘুপতি নক্ষত্ররায় প্রতিক্রিয়াশীল জীবনভাবনার শরিক। কিন্তু তাদের অবস্থান কখনই গতিশীল সমাজজীবনে অনড় থাকতে পারেনি। জয়সিংহের আত্মদান প্রতীক মাত্র, নতুন জীবনায়ণের অভিমুখে গতিসঞ্চারের সঙ্গে একাত্ম। বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কের সঙ্গে অন্বিত মমত্ববোধ, অপত্যস্নেহ 'বিসর্জন' নাটকের পরিচালিকা শক্তি, প্রধান আশ্রয়। নাটকটির প্রধান আকর্ষণ, মৌলিক আবেদন হৃদয়ের কাছে মানবপ্রেমের কাছে। সামন্ত সম্পর্ক প্রভাবিত ধর্মানুষ্ঠান ধিকৃত হয়েছে। পশুবলি শুধু বন্ধ হয়নি, দেবীর মূর্তি বিসর্জিত হয়েছে গোমতীর জলে। এখানে ইতিহাস বুর্জোয়া ঔদার্য্যে চিহ্নিত। গোবিন্দমানিক্য একটি শ্রেণীর প্রতিভূ। সেখান থেকে তিনি সরে আসেননি। পুঁজিবিকাশের ফলে যে বুর্জোয়া ঔদার্য্যের বিকাশ ঘটে, সামন্তপ্রভু নিয়ন্ত্রিত জীবনের নিগড় ভেঙে যায়। কিছুটা মুক্তি আসে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে এবং ব্যক্তিউদারতার বিকাশ ঘটে। তার পটভূমিতে 'বিসর্জন' নাটককে দেখতে হবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

এ ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ 'বিসর্জন' নাটক। রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের ঔজ্জ্বল্যে একাত্নি করে নাটকটি লিখেছিলেন।

সূত্র : রবীন্দ্রবচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড - বিশ্বভারতী, প্রকাশ ১৩৪৮ -পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৩।

চিত্তরঞ্জন : ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জনের জীবনে দুটি সমান্তরাল ধারা ছিল - একটি ধর্মপ্রাণতা এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশেষত সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন, "তিনি শাক্ত, তিনি বৈদান্তিক ও তিনি বৈষ্ণব, আবার তিনি এই তিনেরই সংমিশ্রণ। ধর্মের উদারতায় তিনি কোন ধর্মই অশ্রদ্ধা করিতেন না বটে, কিন্তু শক্তি-ভক্তির সমন্বয়ে তাঁহার চরিত্রে বৈষ্ণবী প্রেমের যে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।'[১]

চিত্তরঞ্জনের ধর্মচেতনার পিছনে বহুবিধ প্রভাব ছিল। দেশবন্ধুর পূর্বপুরুষগণের জন্ম শাক্তবংশে। বিক্রমপুর ছিল শক্তিসাধনার পীঠভূমি। সেখানকার ভূম্যধিকারী কেদার রায় প্রবল প্রতাপ মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার সাহস দেখিয়েছিলেন। সেই শোণিত ও শৌর্যের ধারক ছিলেন চিত্তরঞ্জন। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্ম পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃব্য দুর্গামোহন দাশ অতি গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, তখনকার সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তাঁর ছিল। বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় তিনি নিজের বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন।[২] সমাজ-সংস্কারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিজের স্ত্রীকে জনসমক্ষে বার করতে ও মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে ও কায়স্থ পরিবারে বিবাহ দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ কিন্তু ছিলেন উদারচেতা ব্রাহ্ম, যিনি আধ্যাত্মিক বা তত্ত্বগত দিকের চেয়ে নৈতিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ পরিবারের পরিবেশ ব্রাহ্মের চেয়ে হিন্দুভাবাপন্ন ছিল বেশি। সেখানে কোন ব্রাহ্মমন্ত্র বা হিন্দু উপাচারের দ্বারা নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর এক পিতৃব্য কালীমোহন পরিণত বয়সে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসা রোডের বাড়িতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন।[৩] শিশুকাল থেকে এমন উদার পরিবেশে গড়ে ওঠার ফলে চিত্তরঞ্জনের মনে কোন ধর্মতাত্ত্বিক পক্ষপাতদুষ্টতা বা পূর্ব-আসক্তি ছিল না। তিনি দেখেছিলেন জননীর অকপট হরিভক্তি এবং অন্যদিকে ব্রাহ্ম সমাজের গোঁড়ামি ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, যা তাঁকে ঐ সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি কখনো একাত্মতা বোধ করেননি। এই সময় তাঁর 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থে এই বীতস্পৃহ মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়-

"অসার সকল জ্ঞান ? ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী
তবে তুমি কর কার এত অহঙ্কার,
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী

আপনার মনে আনে ঘোর অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি ক্ষীণ প্রাণ কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্তশক্তি মহাদেবতার...'

চিত্তরঞ্জনের মালঞ্চের কবিতার জন্য সনাতন ব্রাহ্মসমাজ তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছিল এবং ব্রাহ্মমতে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধানের জন্য ঐ সমাজের কোন কর্তাব্যক্তিকে পাওয়া কঠিন হয়েছিল।[৪] সেই সময় তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ের সত্যকে বিসর্জন দিয়ে প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান ও কপটতা দেখে এতই বিরক্ত হন যে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'একদিকে শাক্তের পঞ্চমাকার, অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুকনো মালার ঠকঠকি, আর চারিদিকে যত শৈবের দল ধর্মের নামে ধর্মকে একেবারে বিসর্জন দিতেছিল।'[৫] তৃতীয়ত, কলকাতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পাঠ এবং ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষার দ্বারা নিজ বুদ্ধিবৃত্তির আলোয় চিত্তরঞ্জন তাঁর ধর্মমতকে গড়ে তুলেছিলেন। ইংলন্ডে পাঠকালীন স্বাধীন চিন্তা (Free thought) এবং হার্বাট স্পেনসারেব অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism)-এর দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন।[৬]

বিংশ শতকের প্রথম দিকেই চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মসমাজেব প্রতি ঘনিষ্ঠ হন। সেই সময় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রভাবে এক নতুন ব্রাহ্মগোষ্ঠী গড়ে উঠছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল রামমোহনের ব্রহ্মবাদেব সংকীর্ণতা থেকে ও উনিশ শতকের যুক্তিবাদী তাত্ত্বিকতার বিজাতীয় গোঁড়ামি থেকে ব্রাহ্মসমাজকে মুক্ত করা। এই নতুন চিন্তাধারা দেশবন্ধুকে আকৃষ্ট করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে এই চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায় এবং হিন্দুত্ব ও জাতীয়ত্বের মিশ্রণে যে নব্য জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর বঙ্কিমচন্দ্রে প্রথম দেখা যায় সেই বিকশিত আদর্শবাদের অনুপ্রেরণা চিত্তরঞ্জনের জাতীয় চেতনাকে দৃঢ়তর করে তাঁকে এক পূর্ণতর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছিল। বিপিন চন্দ্র পাল এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "His religion now became a part of his politics, and his politics became an organic element of his religious life, and...freedom continued to be its central note.।"[৭] স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন সিস্টার নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন এবং নিবেদিতার আবেগময়তা, ভাবপ্রবণতা, চিন্তাশক্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাৎসিনির মত তাঁর জাতীয়তাবাদ অতিপ্রাকৃত অর্থে নয়, গভীর আবেগ, স্বদেশপ্রীতি ও ভক্তির অর্থে ধর্মের স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

এই হিন্দু-ব্রাহ্ম ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বেদান্তের প্রভাবও চিত্তরঞ্জনের ধর্মচেতনায় মিশ্রিত হয়ে তাঁর ধর্মমতের বিকাশে সহায়তা করেছিল। গীতার কর্মযোগেব বাণী তাঁর জীবনে শাশ্বত স্থান অধিকার করেছিল। গীতায় 'স্বধর্ম'র বাণী তাঁকে জাতীয় স্বাতন্ত্র রক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু বৈদান্তিক মায়াবাদ ও পশ্চিমী অজ্ঞেয়তাবাদ তাঁর অন্তরের আকুতিকে তৃপ্ত করতে পারেনি। নীরস বেদান্তের মধ্য দিয়ে তাঁর বৈষ্ণবের প্রেমধর্মে আগমনের কথা সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।[৮] এই বৈষ্ণবধর্মেই তিনি পরমার্থের সন্ধান পান। তাঁর 'সাগরসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে 'মালঞ্চের' মানসিক অস্থিরতা ও অবিশ্বাসের অবসান, অসীমের সন্ধান প্রাপ্তি ও প্রাণপূর্ণতার তৃপ্তির পরিচয় রয়েছে। তাঁব কবিতা তারই সাক্ষ্য বহন করে-

'হে অনন্ত হে সম্পূর্ণ নীরবে নিভৃতে

নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।'

বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে অনন্ত মহানকে উপলব্ধির এই যে আধ্যাত্মিকতা, যার বীজ সাগর সঙ্গীতে মুকুলিত, সেখানে থেকে বৈষ্ণবিক আদর্শবাদে তাঁর উত্তরণ ছিল এরই ফলশ্রুতি।

বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে দেশবন্ধুর জীবন গ্রথিত ছিল। এই ঐতিহ্যের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য হল, সুভাষচন্দ্রের মতানুসারে, তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম, নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র।[১০] 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৈষ্ণবধর্মের মত শাক্তধর্মেরও অনুশীলন হত, একথা সুভাষচন্দ্রের রচনা থেকে জানা যায়। তন্ত্রের সারকথা শক্তিপূজা ও তারই প্রভাব দেশবন্ধুর চরিত্রেব তেজস্বিতায় প্রতিফলিত। ন্যায়শাস্ত্রের প্রভাব তাঁর তর্কশক্তিকে বিকশিত করে আইনজীবী রূপে তাঁর সাফল্যের হাতিয়ার হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুকে ছাপিয়ে তিনি ভক্তিবাদের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মকেই মনপ্রাণ দিয়ে অবলম্বন করেছিলেন।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ছিল 'মেকি বেদান্তবাদের' উপর প্রতিষ্ঠিত, বেদান্ত বা উপনিষদের নির্গুণে ব্রহ্মবাদের উপর নয়।[১১] তাই তিনি ও দেবেন্দ্রনাথ সংবেদনশীল বাঙালী হৃদয়কে আলোড়িত করতে পারেননি। কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র গৌড়ীয় ভক্তিবাদের বদলে খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের দিকে চালিত হলেন সম্ভবত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন। শিশির ঘোষ চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করলেন। এঁরা ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনের প্রচলন করেন। এ সবের ফলে ভক্তিবাদের পুনরুত্থান হল এবং সেই প্রেম-ভক্তিবাদের জোয়ার স্রোতে চিত্তরঞ্জন ভাসমান হলেন। জ্ঞানমার্গের শুষ্ক পথে তিনি মনের শান্তি পাননি, হয়নি তাঁর অন্তরের নিগূঢ় বাসনার তৃপ্তি, মেলেনি জীবন দেবতার সন্ধান। নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত একটি গানে এই অতৃপ্তির পরিচয় মেলে-

'নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার!
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁফিয়ে ওঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই তো হাতে মোহন বাঁশী
সেই মূরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী।'

তাঁর 'অন্তর্যামী' কাব্যগ্রন্থ এই ভক্তিআকুল হৃদয়ের অর্ঘ্য। চৈতন্যদেবের মত তিনি জ্ঞান মার্গের শুষ্ক নীরস পথ পরিহার করে ভক্তিমার্গের কোমল মধুর পথকে আশ্রয় করলেন। তিনি রূপান্তরিত হলেন পরম বৈষ্ণবে। 'এই সুগভীর বৈষ্ণবতাই তাঁকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও অপূর্ব

মানবতাবোধের প্রতীকে পরিণত করেছিল।'[১২] সুতরাং পশ্চিমী বস্তুবাদ থেকে বৈদান্তিক মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ ও শাক্তধর্ম থেকে ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জনের ধর্মমতের বিবর্তন ঘটেছিল। বৈষ্ণব দর্শনে যে মানবতার প্রকাশ, মানুষের মধ্যে, সর্বজীবের মধ্যেই ঈশ্বরের মহিমা উদ্ভাসিত তা চিত্তরঞ্জনকে পূর্ববর্তী ধর্মভাবনা থেকে সরিয়ে এনে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, যে পথের দিশারী চণ্ডীদাসের কাব্য, রামপ্রসাদের গান, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী, বঙ্কিমের দেশজননীর বন্দনা এবং সর্বোপরি প্রেমময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের গৌরবময় জীবনালেখ্য। চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবদের বাহ্যিক আচার-আচরণ, তিলক কাটা, কণ্ঠী ধারণ প্রভৃতি মানতেন না, কিন্তু 'অন্তরে অন্তরে জীবনসত্তার সর্বস্তরে' তিনি একজন খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর মতে, ত্যাগই বৈষ্ণবের ধর্ম। আইন ব্যবসা ত্যাগ করার ইচ্ছা বহুদিন থেকে তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে তিনি এই পদক্ষেপ নেন, এ ধারণা ভুল একথা তিনি নিজেই বলে গেছেন।[১৩] আইন ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর ভূমে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হলে এই বেঠিক তুলনার জন্য তিনি ক্ষোভে ও লজ্জায় অশ্রু বিসর্জন দেন।[১৪] প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেব ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। কীর্তন গানের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত, সে গানে তিনি বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁর এই অত্যধিক বৈষ্ণবতার জন্যই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি বিমুখ ছিলেন। চণ্ডীদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি মনে করতেন এবং তাঁর শাশ্বত বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য' চিত্তরঞ্জনেরও মর্মের কথা। তাঁর কাছে বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবের প্রাণ। তাঁর মতে 'বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা নহে, বৈষ্ণবের রাধা তাহাদের জীবনের প্রাণের মর্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগল রূপই বাংলার শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার মধ্যে শত শত বিচিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ রূপক নয়।...ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। সেই আদর্শ অতি-পুরুষকে ভগবান বলিয়া ভারতের আপামর জনসাধারণ মানিয়া আসিতেছে। তাঁর লীলার মধ্য দিয়া ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।...ইহা ঐতিহাসিক সত্য।'[১৫]

সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, 'তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়।...দেশবন্ধু বিশ্ব সংসারকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন'। সেজন্য এই আধ্যাত্মিক জীবন ছেড়ে দেশবন্ধু লৌকিক জীবনে প্রবেশ করেছিলেন এবং তা জাতির মুক্তির জন্য। বুদ্ধদেবের মত তিনি ব্যক্তিগত মুক্তিকে বড় করে দেখেননি। 'জাতির মুক্তির জন্য নিজ মুক্তির ভ্রূক্ষেপ, রাজনীতির জন্য পরমানন্দ ত্যাগই দেশবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ'।[১৬] এইখানে নিহিত আছে তাঁর জীবনের আর একটি ধারা - ধর্ম নিরপেক্ষতা। গান্ধীর মধ্যে ধর্ম, নৈতিকতা, মিস্টিকতা, জাতীয়তা, রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, যে কথা চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর রাজনীতি একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত ছিল। সেইটি ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা। হয়তো 'গণদেবতার সেবার' মধ্যে তিনি মানব সেবার প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন,[১৭] গান্ধীর মতই।

দেশবন্ধু ধুরন্ধর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও বিপিন পাল লিখেছিলেন দেশবন্ধুর রাজনীতি তাঁর ধর্মজীবনের অঙ্গীভূত হয়েছিল এবং চিত্তরঞ্জন স্বয়ং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় ময়মনসিংহের ভাষণে (১০ই অক্টোবর ১৯১৭) বলেছিলেন, 'দেশের স্বার্থে যখনই আমার সেবার প্রয়োজন হয়েছে আমি পিছিয়ে থাকিনি। আমার দেশসেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ মাত্র নহে, ইহা আমার ধর্মের অংশ, আমার জীবনের আদর্শবাদের অঙ্গীভূত,'[১৮] কিন্তু এক্ষেত্রে 'ধর্ম' শব্দটি তাত্ত্বিক বা লৌকিক অর্থে নয়, সাধারণ জীবনরীতি ও সুগভীর দেশভক্তির অর্থেই গ্রহণীয়। জহরলাল নেহরু লিখেছিলেন, গান্ধীর 'ধর্মের নিশ্চিত অর্থ জীবন সম্বন্ধে এক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি...কিন্তু মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু দাশ, লালা লাজপত বায় শব্দটির (ধর্ম) মূল অর্থে ধর্মীয় মানুষ ছিলেন না। তাঁরা রাজনৈতিক ভূমিতে রাজনৈতিক সমস্যাকে বিবেচনা করতেন। তাঁদের প্রকাশ্য ভাষণে তাঁরা ধর্মকে টেনে আনেননি।'[১৯] এই মন্তব্য সঠিক। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, গান্ধী ছিলেন প্রধানত আদর্শবাদী, যেখানে দেশবন্ধুর মধ্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের এক নিখুঁত সমন্বয় ঘটেছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনীতিতে কতকগুলি আদর্শ ও সাধারণ নীতির দ্বারা যেমন চালিত হতেন, তেমনই বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতেন ও তাঁর কর্মকৌশল নির্ধারণ করতেন। তাঁর ধর্মভাবনা কখনই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে চালিত করেনি ও আচ্ছন্ন করেনি। সেইখানে তিনি সেকুলার। অসহযোগ আন্দোলনের নেতা রূপে, বঙ্গীয় বিধানসভায় স্বরাজ্য দলের নেতার ভূমিকায়, কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র রূপে, বেঙ্গল হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের হোতা রূপে তাঁর বাস্তববাদী সেকুলার রাজনীতিজ্ঞের রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল। বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণের দিক থেকে ও রাজনৈতিক স্ট্রাটেজির প্রশ্নে বারবার তাঁর সঙ্গে গান্ধীর মতভেদ ঘটেছে গান্ধীর অত্যধিক নৈতিক আদর্শবাদের জন্য যাকে দেশবন্ধু বাস্তববিমুখ মনে করেছিলেন। গান্ধীর মতই চিত্তরঞ্জন অহিংসায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ভারতের মত দেশে যেখানে জনগণ অশিক্ষিত ও রাজনীতিতে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের অনুপযোগী, সেখানে অহিংসার বাস্তব সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিল। অহিংসা গান্ধীর কাছে ছিল পরম ধর্ম, যাকে তিনি স্বরাজের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তা করেননি, তিনি স্বরাজকে জাতির চরমতম আকাঙ্খা ও লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। আবার গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহকে তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক ধর্মীয় আন্দোলন ও প্রেমের আন্দোলন রূপে মুক্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং বাস্তব রাজনীতিতে (তারকেশ্বর ও চারমনিয়ার আন্দোলন) তাঁকে প্রয়োগ করে সফলতা দান করেন।[২০] অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন প্রথম দিকে স্কুল কলেজ বয়কটের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেননি কারণ তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে পূর্ব প্রস্তুতি অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষালয় গঠনের পূর্বে এই বর্জন সফল হবে না। অথচ গান্ধীজি বলেছিলেন, "Necessity is the mother of invention"। তিনি এই সমস্যার আর্থিক দিক এবং ছাত্র ও অভিভাবকদের মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। পরবর্তী ঘটনাবলী চিত্তরঞ্জনের মত সঠিক প্রমাণিত করেছিল।[২১] গান্ধী মনে করতেন চরকার দ্বারা ভারতে স্বরাজ আসবে ও সকল আর্থিক

সমস্যাব সমাধান হবে। কিন্তু দাশ ও অনেক স্বরাজী নেতা চরকা সম্বন্ধে সন্ধিহান ছিলেন। দাশ চরকাকে 'কুটীরে আর্থিক স্বনির্ভরতার অস্ত্ররূপে' বিশ্বাস করতেন, কিন্তু জাতীয় সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার রূপে নয়।[২২] কাউন্সিল প্রবেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে গান্ধীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রচণ্ড সংঘাত ঘটেছিল। দাশের কর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিল শত্রুর সকল ঘাঁটি দখল করে আক্রমণ চালানো এবং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অচল করে দেওয়া। দাশ মনে করতেন কাউন্সিলগুলি আমলাতন্ত্রের দুর্গ এবং সেখানে ঢুকে তাদেব বিনাশ সাধনের দ্বারা স্বরাজের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু গান্ধীর মতে কাউন্সিল প্রবেশ অসহযোগেব পরিপন্থী, অনৈতিক এবং এই পদ্ধতির দ্বারা ব্রিটিশদের টলানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত স্বরাজ্য দল ১৯২৩ সালের নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে কাউন্সিল অভিযানের মাবফৎ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে দ্বৈত-শাসনকে অচল করে দিয়ে তাদের পদ্ধতির আংশিক সাফল্য প্রদর্শন করেছিল, যাকে গান্ধীও শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[২৩] গান্ধীর কট্টর নৈতিকতা ও দাশের বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এইখানে।

দেশবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তায ধর্মচেতনা ছায়া ফেলেনি। তাঁর রাষ্ট্রভাবনা ছিল স্বচ্ছ, ধর্মনিরপেক্ষ। স্বরাজ্য দলের আবির্ভাবের পর তিনি যে স্বরাজ পরিকল্পনা[২৪] উপস্থাপিত করেন তাতে রাষ্ট্রকাঠামো ছিল জনকল্যাণমুখী, স্বায়ত্তশাসিত বিকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র। তা প্রাচীন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৌধ। গান্ধীর ধর্মভিত্তিক, বৃহৎ শিল্প বিমুখ, অতীতমুখী রামরাজ্যের আদর্শের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রভাবনা তাঁর সমাজচিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। যেহেতু তাঁর কাছে জীবন ছিল সামগ্রিক, অবিভাজ্য ও পূর্ণাঙ্গ বস্তু, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত নয়, সেজন্য তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রাজনৈতিক সংস্কার সমাজ-সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো সফল হতে পারে না। তিনি বলেছিলেন 'আমি সামাজিক ক্ষেত্রে বাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না। সমাজের সকল সংস্কার আসবে অভ্যন্তর থেকে...সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাল রেখে।'[২৫] তাঁয় সমাজ সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল নারী মুক্তি, অস্পৃশ্যতার অবসান, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কায়েস্থ পরিবারে ও কনিষ্ঠা কন্যাকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন। অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়। ভগবানের মন্দিরে ভগবানেরই সৃষ্টি জীবের অপমান। তাই এদের মনোভাব আজ বিদ্রোহমূলক। ভাবি যারা এমন করে প্রতিনিয়ত মানুষের অবমাননা করেন, তারা পাবার প্রত্যাশাই বা কেমন করে করেন ?'[২৬] গান্ধীর মত তিনিও মনে করতেন এই সামাজিক অবিচার রোধ করতে না পারলে স্বরাজ অর্থহীন। তিনি আগামী জন্মে চণ্ডাল হয়ে জন্মাবার কথা প্রায়ই বলতেন। মেয়র থাকাকালীন তিনি রসিকলাল বিশ্বাস নামক এক নম:শূদ্র স্নাতককে কলকাতা পুরসভার লাইসেন্স বিভাগে চাকরি দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে পুরসভাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকরি দেন। বসিকলাল এই নমঃশূদ্র বিধবা নারীকে

বিবাহ করেছিল যে বিবাহে দেশবন্ধু অর্থদান করেন।[২৭] একদিকে আইনসভায় তিনি ব্রিটিশ শাসকদের কূটকৌশলে বারবার পর্যুদস্ত করেছিলেন, অন্যদিকে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেযর রূপে সর্বভারতীয় জাতি গঠনের আদর্শ তুলে ধরেন এবং তাঁর প্রগতিশীল নগর-উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কার্যাবলীর মধ্যে এক সৃজনধর্মী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতার রূপ দেখা গিয়েছিল। তিনি অনেক মুসলমানকে পুরসভায় বিভিন্ন পদে বহাল কবেন।

দেশবন্ধু স্বপ্ন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতে এক সর্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন। তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন স্বরাজের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই হবে আমাদের কাছে।' এজন্য তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট রচনা করেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে দেশবন্ধু ধর্মের দিক থেকে দেখেননি, দেখেছিলেন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে। শিক্ষা ও চাকরিতে অনগ্রসর মুসলমানদের আস্থা অর্জনের জন্য ও তাদের হিন্দু-ভীতি কাটাবার জন্য তিনি ঐ প্যাক্টে বাঙালী মুসলমানদের কিছু অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পথে একটি পদক্ষেপ। তাছাড়া তিনি জানতেন যে ধর্ম ও কৃষ্টিতে বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও এক জায়গায় উভয় সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে - তা আমলাতন্ত্রের বিরোধিতায়। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু মুসলমানের সাম্মিলিত শক্তি ছাড়া বুরোক্রেসীকে বাধা প্রদান অসম্ভব।"[২৮] সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত শক্তিকে তিনি বুরোক্রেসীর উচ্ছেদকল্পে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, যেটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মপন্থার অঙ্গ। '১৯২১ সালে জেলের ভেতর ইদ উপলক্ষ্যে একই রান্নাঘরে মাংস রান্না করে একই সঙ্গে বসে হিন্দু-মুসলমান বন্দীরা খেয়েছিলেন। একাজে উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সহযোগী সুভাষচন্দ্র বসু।'[২৯]

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে ধর্ম যেমন গান্ধীর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল, চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে ঠিক তা ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপেব মধ্যে এক সেকুলার নেতৃত্বের পরিচয় ছিল। আবার তাঁর ধর্ম ও রাজনীতি দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধারা, একথা বলাও ঠিক হবে না। উভয়ের এক উৎস, তা হল বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম। সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি ভালবাসা, নিপীড়িত শ্রেণীদের উন্নয়নের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ, পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতা, সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা, এ সকলেরই সেই একই উৎস - বৈষ্ণবিক মানবতা ও প্রেমশক্তি যা তাঁর রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশবন্ধুর সকল কাজই বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সুসমঞ্জস - সুভাষচন্দ্রের এই উক্তির যথার্থতা অনস্বীকার্য। সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে আরও বলেছেন 'ইসলামের এত বড় বন্ধু' আর কেউ ছিলেন না এবং 'তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল।'[৩০] বেঙ্গল প্যাক্ট দেশবন্ধুর ধর্মীয় উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

সূত্র নির্দেশ

১। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধুস্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ: ৩০৯
২। বিপিন চন্দ্র পাল, Chittaranjan's Religion, Forward, দেশবন্ধু নং, ১লা জুলাই, ১৯২৭,

পৃ: ৩; ঐ সংখ্যায় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের Vaishnava Chittaranjan দ্রষ্টব্য

৩। মণি বাগচি, দেশবন্ধু, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ: ২৫।

৪। বিপিন চন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত।

৫। হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১১।

৬। বিপিনচন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত

৭। পূর্বোক্ত।

৮। সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী, সম্পাদক শিশির কুমার বসু, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃ: ৩০৪।

৯। দেশবন্ধু রচনা সমগ্র, মনীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৮৫, পৃ: ১১০-১৩১।

১০। সুভাষচন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত।

১১। বিষ্ণু সরস্বতী, বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন, Calcutta Municipal Gazette, ৯১ খণ্ড, ১৯৭০-৭২, Deshbandhu Birth Centenary Supplement Issue, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ: ৪০।

১২। পূর্বোক্ত।

১৩। মঞ্জুগোপাল মুখোপধ্যায়, C.R. Das and the Swaraj Party, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

১৪। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২৯।

১৫। উদ্ধৃত, বিষ্ণু সরস্বতী, পূর্বোক্ত।

১৬। উদ্ধৃত, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৯

১৭। চিত্তরঞ্জনের ধর্ম চেতনা, সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধুস্মৃতি, সম্পাদক দিলদার, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃ: ৫২।

১৮। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১।

১৯। জহরলাল নেহরু, An Autobiography, লন্ডন, ১৯৩৬, পৃ: ৭২।

২০। মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ্য দল ও সত্যাগ্রহ, ইতিহাস অনুসন্ধান, সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, খণ্ড ১৩, কলিকাতা, ১৯৯৯।

২১। মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, পূর্বোক্ত।

২২। The Bombay Chronicle, ১৫মে ১৯২৩।

২৩। Young India, ২৯ অক্টোবর ১৯২৪; Collected Works of Gandhi, খণ্ড ২৩; Indian Annual Register, ১৯২৪, খণ্ড ২।

২৪। Indian Annual Register, ১৯২৩, খণ্ড ২।

২৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, Deshbandhu as Social Reformer, Forward, পূর্বোক্ত।

২৬। উদ্ধৃত, হেনা চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনবেদ, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ: ১৭৪।

২৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত।

২৮। উদ্ধৃত, হেনা চৌধুরী, পূর্বোক্ত।

২৯। গৌরীশঙ্কর দাসের চিঠি, প্রতিদিন, ৫-২-১৯৯৮

৩০। সুভাষচন্দ্র রচনাবলী, পৃ: ৩০২।

উনিশ শতকে বাঙালির পরিচয়ের সংকট - মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩)

শ্যামলী সুর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের ভূমিকা বহু আলোচিত। কিন্তু তিনি তো শুধু কবিই নন, 'আচার-আচরণে তাঁর ঔদ্ধত্য, সনাতন মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, জীবন ও সাহিত্যের প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি বিদ্রোহ সবই তাঁকে চারদিকের জনতা থেকে একেবারে আসমান-জমিন ফারাক করেছে।'[১] তাঁর জীবনচর্যার স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদন সচেতনভাবে সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তথা ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পর্বের নায়ক।[২]

মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর দেশ ও কালের বহুমাত্রিক সম্পর্ক এবং তাঁর স্বাজাত্যবোধের জটিল চরিত্র ইতিহাসমনস্ক বাঙালির মনোযোগ দাবি করে। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'আশার ছলনে ভুলি' শীর্ষক মধুজীবনীটিতে গোলাম মুরশিদ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-থাকা উপকরণগুলিকে কাজে লাগিয়ে কবির জীবন সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে মধুসূদনের রচনা, পত্রাবলী, এবং গোলাম মুরশিদ রচিত গ্রন্থ এবং পূর্ববর্তী জীবনীগ্রন্থগুলির ভিত্তিতে তাঁর স্বাজাত্যবোধের উৎস ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হয়েছে; নায়ক-কল্প এই কবির জীবন ও সাধনায় বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই নিবন্ধের তিনটি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে -১) মধুসূদনের মানসগঠনে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি উপাদান, ২) তথাকথিত অতীতচারিতার পাশাপাশি অধঃপতিত বর্তমানের বিশ্লেষণ, ৩) প্রধানত পাশ্চাত্য অনুপ্রেরণায় পাশ্চাত্য মান অনুসারে জাতীয় সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলা এবং শেষত ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবিন্যাসে, সমকালীন দেশীয় খ্রিস্টান সমাজে বা হিন্দু সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং মৃত্যুবরণ।

১) মধুসূদনের মানস গঠন প্রক্রিয়া সমকালীন বাঙালি মননের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ বিস্তারের প্রথম ও প্রধান ভিত্তিভূমিরূপে হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক অভিঘাতের প্রধান কেন্দ্রস্থল।[৩] পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত ইংরেজি শিক্ষিত এই সাংস্কৃতিক আক্রমণের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তাঁদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উৎস অনুসন্ধান করলেন। স্বাজাত্যবোধের উন্মেষপর্বে ঐতিহাসিকরা ব্যাপৃত হলেন জাতির অতীত অনুসন্ধানে; কবির চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জাতি-সত্তার শৈল্পিক রূপ। কিন্তু এই স্বাজাত্যবোধের ধারণা স্পষ্টতই পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দান এবং এই অনুসন্ধান, এই সংকট প্রধানত 'কলকাতিয়া মধ্যবিত্তে'র

মধ্যেই সীমায়িত।

কলকাতার সংকীর্ণ ভৌগোলিক গন্ডির বাইরে বয়ে চলেছিল অষ্টাদশ শতকীয় লৌকিক জীবনের অন্তঃশীল স্রোত।[৪] কলকাতার সাংস্কৃতিক সংঘাত থেকে অনেক দূরে যশোহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে জন্মালেন শিশু মধুসূদন। পূর্ববঙ্গের একান্ত আপন লৌকিক সাহিত্যের ছায়ায় জীবন আরম্ভ করলেন তিনি। মাতা জাহ্নবী দেবীর কাছ থেকে মুখে মুখে পরিচয় ঘটেছিল চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে। অনুমান কবা যায় যশোহরের কপোতাক্ষ নদী ও উন্মুক্ত প্রকৃতিব পাশাপাশি কবিগান - তর্জা-কথকতার লোকায়ত ধারা পোষণ কবেছিল মধুসূদনের শিশুমনকে।

মধুসূদন একটু বড় হতেই তাঁব বাবা ও আত্মীয়েরা তাঁকে ফাবসি শিখিয়ে পারিবারিক আইন ব্যবসায় নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মাত্র আট-নয় বছর বয়সে বালক মধুকে এক মাইল পথ হেঁটে ফারসি শিখতে যেতে হতো। ইতিমধ্যে সরকারী ভাষা রূপে ফাবসির গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে ইংরেজি হয়ে উঠল সরকাবী ভাষা। তাই ফারসি শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁকে ইংরেজি শেখার জন্য কলকাতা চলে যেতে হয়। তবু এই অসম্পূর্ণ শিক্ষাই তাঁকে ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। মধ্যযুগের পরাজিত মুসলমান নারী শাসক 'রাজিয়া' সম্পর্কে তাঁর অসমাপ্ত রচনা এই প্রীতি বহন করে।[৫]

১৮৩৩ সালে নয়-দশ বছর বয়সে মধু এলেন কলকাতায়। এর দু'বছরের মধ্যেই মেকলের বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই শিক্ষাখাতে অনুদান বরাদ্দ করা হল। ১৮৩৭ সালে মধু ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে।

১৮৩১ সালে ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) মৃত্যু হয়েছিল। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভাবতীয়ের পরিচয়ের প্রথম সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় কবি ডিরোজিও-র জীবনে। তাঁর পিতা পর্তুগীজ, মাতা ভারতীয়। তিনি ইউরোপীয়, অথচ তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষ, তাঁর মাতা ভারতীয় ইউরোপীয় সমাজে তিনি ব্রাত্য। তিনি তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও রক্ত ধারার বিপরীতমুখী স্রোতে অনুভব করেছিলেন তাঁর পরিচযের সংকট। তাই হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের সমকালীন ভাবতীয় সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ইউবোপীয় যুক্তিবাদ ও সমাজ সচেতনতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন; অথচ তাঁর শিকড় খুঁজেছিলেন ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতে।[৬] তাঁর অন্তরঙ্গ ছাত্রদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন এই আত্মিক সংকট এড়ানোর জন্য গ্র্যান্ট ডাফের কাছে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আবেদন জানিয়েছিলেন অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৭]

ভারতীয় সত্ত্বার সংকটের ডিরোজিও-অনুসারী ঐতিহ্য মধুসূদন পেয়েছিলেন নিতান্ত পরোক্ষভাবে। যে সময়ে মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়তে এলেন তখনও পর্যন্ত ডিরোজিও পন্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্য আদর্শ স্থুল হয়ে ছিল। তিনি এই আদর্শ আত্মসাৎ করেন।

প্রত্যাখ্যাত, কবিযশোপ্রার্থী মধুসূদন নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের (১৮০১ ৬৫) ভক্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক মতের দিক থেকে রক্ষণ শীল হলেও রিচার্ডসন ছিলেন একজন প্রকৃত সাহিত্য প্রেমিক। তাঁরই অনুপ্রেরণায় একদিকে রোম্যান্টিক কাব্যশৈলী

এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন মধু।

ইংলন্ডে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে মধুসূদন কাব্যযশ লাভ করতে চেয়েছিলেন। মূলত সেই কারণে এবং বাল্য বিবাহ এড়ানোর জন্য মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করেন ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী।[৮] বিশপস কলেজে শিক্ষালাভের সময়ে একদিকে শেক্সপীয়র ও মিল্টনের ধ্রুপদী কাব্যশৈলী এবং ল্যাটিন কাব্যশৈলীর সংস্পর্শে তাঁর শিল্পীসত্ত্বা সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে।

বিদেশি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভারতীয় তৎসম সংস্কৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে দেরিতে হলেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। মাদ্রাজ প্রবাসে সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে বাংলায় সাহিত্য রচনার তাগিদে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। প্যারীচাঁদ মিত্রকে তিনি কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে বলেছিলেন, "সংস্কৃত থেকে ব্যাপকভাবে আহরণ না করলে এটি (বাংলা ভাষা) জেলেদের ভাষা হয়েই থাকবে।"[৯] কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ছিল গ্রহণ বর্জনের। একদিকে তিনি বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে বাংলাভাষার ওজস্বিতা বাড়ান, অন্যদিকে তিনি সচেতনভাবে নাট্যশাস্ত্রের কঠোর নিগড় থেকে মুক্ত করে বাংলা নাটককে পাশ্চাত্য আধুনিকতার দিকে এগিয়ে দিলেন।

বাল্যে মঙ্গলকাব্য - মহাভারতের পুরাণকথায় মধুসূদনের স্বদেশ চেতনার উন্মেষ - কৈশোরের রোম্যান্টিকতায় তার বিস্তার - পরিণত বয়সে দেশ কালের দ্বন্দ্বে দীর্ণ কবির পরিণতি বিয়োগান্তক নাটক এবং ট্র্যাজিক মহাকাব্যেব ধ্রুপদী চেতনায়।

২) এক অনির্দেশ্য অতীতচারিতা থেকে মধুসূদনের যাত্রা। এই অতীতচারিতা বহুলাংশে ডিরোজিওর উত্তরাধিকার। আবার এই অতীতচারিতার বাতাবরণ নির্মিত হয়েছিল প্রাচ্যবাদী ভারত বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে। প্রাচ্যবাদীর চোখে প্রাচ্য তথা ভারত পাশ্চাত্যের বাইরে, "অপর", অন্য রকমের যার ওপর ক্ষমতা বিস্তার করা যায়। ভারতের অতীত প্রায় পরা-বাস্তব।[১০] এটি আর্যঅতীত - না, পৌরাণিক অতীত তার স্থিরতা নেই। এই অতীতচারিতার সঙ্গে বস্তুত বিধিবদ্ধ ইতিহাসের কোনও সম্পর্কও নেই। ঔপনিবেশিক ভারতীয়ের চেতনায় এই অতীত গৌরব এক বিমূর্ত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল।

মধুসূদনের প্রাথমিক রচনাগুলিতে ঐতিহাসিক, আধা-ঐতিহাসিক-পৌরাণিক বিষয়বস্তুর পৌণঃপুনিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত King Porus - A Legend Of the Old নামক দীর্ঘ কবিতার নায়ক পুরু পরাজিত হলেও বীর - সমকালীন ভারতবর্ষের উপযুক্ত নায়ক। এই বছরেই জর্জ থমসনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির 'চক্রবর্তী পরিচালিত অংশ' বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করল। প্রথম রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ জড়িয়ে আছে আলোচ্য গাথার শেষাংশে প্রকাশিত যুগপৎ প্রচীন গৌরব ও স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় ?

"সুন্দরী স্বাধীনতা তুমি কোথায়! একদিন তুমি ছিলে, ভারতের সূর্যস্নাত আবহের দেবী। তখন তার ভ্রমন্ডলের চারদিকে ঝলমল করত গৌরবের জ্যোতির্বলয়। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মতো সেও সিংহাসনে আসীন নীল মেঘকে, সূর্যমন্ডলকে চুম্বন করার জন্য অনন্তে উড্ডীণ।

স্বপ্নের মতো, স্রোতস্বিনীর ওপর ছলকে - ওঠা উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির মতো সেই গৌরব এখন গোধূলির ধূসর আঁখিপাতে পলাতক।"[১১]

যেহেতু এই গৌরবের ছবি নিতান্তই প্রাচ্যবাদীর তৈরি করা, এই গৌরব অতীত ঔপনিবেশিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবির একমাত্র পরিচয়স্থল হয়ে উঠতে পারেনি। বারে বারেই তার চোখ পড়েছে অধঃপতিত বর্তমানে।

১৮৫৪ সালে রচিত Anglo Saxons & the Hindus পুস্তিকাটিতে মধুসূদন লিখছেন তোমার সম্মুখে দন্ডায়মান হিন্দু এক অধঃপতিত সত্ত্বা, -একদা শ্যামল, সুন্দর, দীর্ঘ, মহিমান্বিত, পুষ্প শোভিত যে বৃক্ষটি ছিল - সেটি এখন বজ্রাঘাতে ধ্বস্ত।"[১২] এই বজ্রদগ্ধ বৃক্ষটিতে প্রাণসঞ্চার করতে পারে অ্যাঙ্গলো - স্যাক্সন জাতি - প্রচারিত খ্রিস্ট ধর্ম কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকেও সম্পূর্ণ সরে এসেছিলেন।

মাদ্রাজে সাংবাদিকতার পর্বে তিনি এই অধঃপতনের নানা কারণ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৫০ সালে ২১ নভেম্বর মাদ্রাজ হিন্দু ক্রনিকলের "The Native Character" প্রবন্ধটিতে তিনি ভারতীয়তের চরিত্রগত লোভ, অসাধুতা প্রভৃতি সম্পর্কে ইংরেজদের বক্তব্যের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, তিনি ইংরেজদের অনুকরণে সব কিছুর জন্যই মধ্যযুগীয় এশীয় স্বৈরতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। দ্বিতীয়ত, উচ্চতর পদগুলি ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় স্বল্পবেতনভোগী দেশীয় কর্মচারীরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, ইউরোপীয় বিলাসদ্রব্যের আমদানি, বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেই পণ্যের আকর্ষণ অধিক অর্থের প্রয়োজন। কাজেই প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে ভারতীয়রা তাদের পূর্বপুরুষের সরল জীবন যাপন করবে।[১৩]

মধুসূদন বিমূর্ত স্তরে গৌরবময় অতীতের স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করলেন, অথচ প্রাত্যহিকতার স্তরে রাজধর্ম অবলম্বন করলেন, স্বীকার করে নিলেন ইউরোপীয় ভোগবাদকে, পণ্যরতিকে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর অবিচল আস্থা, অথচ মাদ্রাজ-প্রবাসী মধুসূদন সম্মানজনক পদ লাভ করতে পারেননি। জীবনে-মননে মধুসূদনের এই তীব্র দোটান তাঁর সমকালীন অন্য কবিকে এতটা ক্লিষ্ট করেনি।

মধুসূদনের বাল্যবন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭) সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ভীমসিংহের মাধ্যমে বাংলাভাষায় প্রথম স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন,

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?"[১৪]

টমাস মূরের রচনা অবলম্বনে রচিত এই সরলীকৃত মুসলমান বিরোধী স্বাধীনতা চেতনার বিপরীত মেরুতেই ছিল ইংরেজ-পূজা। সিপাহী-বিদ্রোহের পাপ-স্খালন করার উদ্দেশ্যে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী কাব্যের'র শেষে লিখছেন-

'ভারতের ভাগ্যজোর দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর ঐ
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানুপ্রভায় প্রচার ।।
শান্তির সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহরাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে ।।
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ।।''[১৫]

গৌরবময় হিন্দু শাসন-স্বৈরতান্ত্রিক মুসলমান শাসন এবং মঙ্গলময় ইংরেজ শাসনের সরলরৈখিক প্রকল্পে রঙ্গলাল আস্থা রাখতে পারলেও মধুসূদন পারেননি। মাদ্রাজ প্রবাসে তিনি সাংবাদিকের তর্জনী তুলে ধরেছেন ইংরেজ রাজের ভ্রান্ত ন্যায়ের দিকে।

৩) ১৮৫৬ সালে মধুসূদন প্রত্যাবর্তন করলেন এক সংক্ষুব্ধ বাংলায়। ১৮৫৬ সালে গৃহীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের প্রতি সমর্থন নিতান্ত সীমিত হলেও, সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কমবেশি নীরব থাকলেও , ১৮৫৯ সালের নীলবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রথম বাংলার উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সম্মিলিতভাবে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধতা করে। এরই পাশপাশি একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্যদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নেতৃত্বে বাংলা গদ্যভাষা গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৯ থেকে '৬২ সালের মধ্যে মধুসূদনের সৃষ্টির উল্লাস হয়তো এই সামাজিক আন্দোলনের পরোক্ষ ফল।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত ''রত্নাবলী'' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে মধুসূদন আকস্মিক বাংলায় নাটক রচনা করতে অনুপ্রাণিত হ'ন। নাট্যরচনার মাধ্যমে মধুসূদন সচেতনভাবে জাতীয় সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হলেন। এই প্রবর্তন যে সম্পূর্ণ আকস্মিক বা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব তাও নয়। প্রায় দশ বছর আগে ১৮৪৯ সালে গৌরদাস বসাক মারফৎ Captive Ladie উপহার পেয়ে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বেথুন রাজশক্তির মানদন্ডে এ দেশের উচ্চতর সংস্কৃতি ও নিম্নতর সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করছেন এবং কবিকে দেশীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যের স্থূলতা ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে, এমন কি তর্জমার মাধ্যমেও শাসকের উচ্চতর সংস্কৃতিকে মাতৃভাষায় সংস্থাপিত করে জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার নির্দেশ দেন[১৬]।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকেই নব্যবঙ্গীয় যুবকসমাজ নিম্নতর সংস্কৃতির পরিচায়ক দেশীয় কবি গানকে ঘৃণাই করত। শেষে এই দলের প্রভাবেই কবিগান কলকাতা থেকে গ্রামে নির্বাসিত হয়। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্ত কবির গান বাঁধতেন। এমনকি ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহধন্য রঙ্গলাল ও তরুণ বয়সে আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের কবিদলের 'কবি' নিযুক্তহয়েছিলেন।[১৭]

মধুসূদন বাংলাকাব্যে তাঁর পূর্বতন ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তৎসম সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং পাশ্চাত্য ধ্রুপদী উত্তরাধিকারের সমন্বয়ে আধুনিক বাংলা জাতীয় সাহিত্যের

মান প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ঔপনিবেশিক প্রাচ্যে জাতীয় কবির সংকট অত্যন্ত জটিল। তাঁকে জাতিসত্ত্বাকে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে পূর্ন নির্মাণ করতে হবে, কিন্তু সরাসরি বিদেশী সংস্কৃতিকে অনুসরণ করলে জাতিটি তার বিশিষ্টতা হারাবে। কাজেই জাতীয় সংস্কৃতিকে এমনভাবে পুণর্গঠন করতে হবে যাতে আধুনিকতার দাবি মিটিয়েও জাতি তার বিশিষ্টতা রক্ষা করতে পারে।

মধুসূদনের এই প্রচেষ্টা নিরন্তর স্ববিরোধে আকীর্ণ-অণুকরণমূলক আবার অণুকরণের আদর্শেব প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। যুগপৎ দেশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উন্নয়নের অন্তরায় বলে ত্যাগ করা আবার জাতিসত্ত্বার চিহ্ন বলে দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরা। তাই প্রাচ্য জাতীয়তাবাদকে 'বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ' আখ্যা দেওয়া যায়[১৮]।

বাস্তবে, এই 'বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ' এক বিশিষ্ট রূপলাভ করে। প্রাক-শিল্পায়িত আঞ্চলিক কৌমজীবনের জটিল-বিচিত্র সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় ঔপনিবেশিক শাসক প্রবর্তিত উচ্চ-সংস্কৃতি। এই একমাত্রিক উচ্চতর জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিমা নির্মাণে শাসক শ্রেণীব সহযোগিতা করে ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি।১৯

মধুসূদন সচেতনভাবে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন অথচ তাঁর মনের গহনে রয়ে গেল বিলীয়মান প্রাচীন কৃষিসমাজের লৌকিক সংস্কৃতি হারানোর বেদনা। এই বেদনাই ভাষা পেল মধুসূদনের রচনায়।

কৃত্তিবাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের পূর্বতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার কবে "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯) নাটকে মধুসূদন নতুন নাট্যরুচি গড়ে তুললেন,

"কোথায় বাল্মিকী, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"[২০]

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬০ সালে মধুসূদন নব্যবঙ্গীয়দের বিদ্রুপ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' এবং প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ জমিদারের ভ্রষ্টাচারকে বিদ্রুপ কবে 'বুড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোঁ" নামক দুটি প্রহসন রচনাকরে তিনি প্রবীন ও নবীন উভয় পক্ষেরই বিরাগভাজন হ'ন।

১৮৬১ সালে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের সীমানা অতিক্রম করে মধুসূদন গ্রীক নাটক ইফিগেনাব আদর্শে প্রথম বাংলা বিয়োগান্তক নাটক "কৃষ্ণকুমারী" বচনা করন। কৃষ্ণকুমারী প্রধানত বংশমর্যাদার জন্য প্রাণ বিসর্জন করলেও এই ট্র্যাজেডিতে সুপ্ত রয়েছে দেশপ্রেমের আদর্শ। এই বছরেই জেমস লঙের নামে 'নীলদর্পণ' নাটকের তর্জমা করার জন্য মধুসূদনের ভাগ্যে জুটেছিল শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থের তিরস্কার। তাঁকে চাকরিও খোওয়াতে হয়েছিল।

বন্ধু রাজনারায়ণ বসু অধঃপতিত দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার জন্য বাঙালির সিংহল বিজয় বিষয়ে মধুসূদনকে একটি মহাকাব্য রচনা করতে বলেছিলেন।[২১] সেই সিংহলের কথাই তিনি লিখলেন, কিন্তু তা নবপ্রতিষ্ঠার কাহিনী নয়, তা ধ্বংসের কাহিনী।[২২]

মাইকেল তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোয় পৌরাণিক রামায়ণকে পুনর্গঠন করলেন।

পরাজিত রাবণই 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের (১৮৬১) নায়ক। মেঘনাদের মৃত্যু ট্র্যাজেডিকে পুষ্ট করেছে মাত্র।[২৩] মূল ট্র্যাজেডি সমকালীন ভারতীয়ের। বিদেশী শাসক সংস্কৃতির প্রভাবও আছে, আবার দেশজ ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতির পিছুটানও আছে এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের রুদ্ধশ্বাস প্রকাশ ঘটেছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। পয়ার ও ত্রিপদীব বন্ধন থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্ত করে মধুসূদন জাতির অব্যক্ত বেদনাকে আধুনিক কাব্যভাষায় প্রকাশিত করলেন।

৪) ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্যেব অন্যতম প্রথম নির্মাতা এবং অন্যতম প্রথম আধুনিক ভারতীয় মুধসূদ্দন ঔপনিবেশিক এলিট মানসের বিরোধাভাসের প্রতীক হয়ে উঠলেন। এই ভারতীয় এলিট বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন আর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে তার যুগপৎ প্রীতি ও বিদ্বেষের জটিল সম্পর্ক।

মধুসূদনের একদিকে দুর্মর কবিযশকামনা ও সাফল্য, অন্যদিকে নিরন্তর আর্থিক দৈন্য ও ক্লিষ্টতা, একদিকে কলকাতার সাবস্বত সমাজে প্রতিষ্ঠা অথচ বৃহত্তব হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা তিনি একদিকে পাশ্চাত্যেব জ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনে মুগ্ধ, অন্যদিকে ভাবতে ইংরেজ শাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন। তিনি মেনে নিতে পারেননি খ্রিস্ট ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে অথবা হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামিকে। তিনি সব দিক থেকে একজন আধুনিক ইউরোপীয় হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন অথচ তাঁকে প্রতি পদে পদে উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের কাছে এবং মুৎসুদ্দি বেনিয়ান শ্রেণীর নব্যধনীদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। যে জাতীয় সংস্কৃতির তিনি নায়ক, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে তার কোনও উৎপাদনশীল আর্থ সামাজিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। কাজেই মিল হয়নি চেতনায় ও জীবনচর্যায়। বেদনার্ত কবি স্বেচ্ছাধ্বংস স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আলবিয়নের তীরে কবিযশ লাভ করার স্বপ্ন দিয়ে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার শেষ আশ্রয় 'কপোতাক্ষ নদ' আর 'ঈশ্বরী পাটনী'র স্মৃতি। তাঁর শেষ "পরিচয়" ভারতীর সন্তানরূপে।

"যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত
কাননে;-
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী
যুবতী;
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে;-
সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;
তেঁই প্রেমদাস আমি ওলো
বরাঙ্গণে।"[১৪]

মধুসূদনের শ্যামল মাতৃমূর্তি "শ্যামা জন্মদে" বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় শস্যশ্যামলা দেশমাতৃকায় পূর্ণতা লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পৃথক। ঊনবিংশ শতকের শেষে হিন্দু পুণর্জাগরণবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র দেশজ হিন্দু ঐতিহ্যে তাঁর শিকড় প্রোথিত রেখে ক্ষমতার আঙিনায় ইংরেজ রাজশক্তিকে দ্বৈরথে আহ্বান করলেন।[২৫] তাঁর আহ্বান দেশীয় ইতিহাস নির্মাণের, তাঁর আহ্বান মাতৃমূর্তি কল্পনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নিশ্চিতি মধুসূদনের ছিল না। সামাজিক জীবনে কর্মজীবনে পরবর্তী সাহিত্যবথী যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা ছিন্নমূল মধুসূদনের

অনায়ত্তই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় যেভাবে মধুসূদন নির্দেশ করেছিলেন তা বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি তথা পরিচয়ের অন্বেষণ সম্পূর্ণ হতো কি ?

সূত্র নির্দেশ

১। গোলাম মুরশিদ, "আশার ছলনে ভুলি", ১৯৯৭ পৃ: ১৩।

২। প্রমথনাথ বিশী, "মাইকেল মধুসূদন-জীবন ভাষ্য" ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পৃ: ১০৩।

৩। Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983, p. ৫৫. প্রশাসনিক বিভাগগুলি কালক্রমে মাতৃভূমির মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

৪। সব্যসাচী ভট্টাচার্য 'এ যুগের বাঙালি' সহস্রায়ণ, দেশ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ: ৯৯।

৫। গোলাম মুরশিদ, তদেব, পৃ: ২৩।

৬। Susobhan Sarkar, Derozio and Young Bengal, Bengal Renaissance and other Essays, 1970, p. 109.

৭। David Kopf, British Orientalism and Bengal Renaissance, 1969, p. 263.

৮। গোলাম মুরশিদ, তদেব, পৃ: ৬৫।

৯। নগেন্দ্রনাথ সোম, "মধুস্মৃতি" ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫৬।

১০। Edward W. Said, Orientalism, ১৯৮৫, pp. ২১-২৩.

১১। নগেন্দ্রনাথ সোম, তদেব, পৃ: ৪৬।

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, ১৯৬৫, পৃ: ৫২৫।

১৩। নগেন্দ্রনাথ সোম, তদেব, পৃ: ৪৩০।

১৪। ড: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত রঙ্গলাল রচনাবলী, ১৬৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৬৪।

১৫। ড: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, তদেব, পৃ: ১৭২।

১৬। যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ১৯৮৩, পৃ: ১১৬।

১৭। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ: ৪০-৪৪।

১৮। John Plamenatz Two Types of Nationalism in Engene Kamenka ed. Nationalism : The Nature and evolution of an Idea, 1976, pp. 23-36.

১৯। Ernest Gellner, Nations and Nationalism,1983, p. 57।

২০। যোগীন্দ্রনাথ বসু, তদেব, পৃ: ১৭২।

২১। যোগীন্দ্রনাথ বসু, তদেব, পৃ: ১১৬।

২২। শীতাংশু মৈত্র, যুগন্ধর মধুসূদন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৭১।

২৩। মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন কাব্য ও কবিচরিত, ১৯৬৫, পৃ: ২৩-২৪।

২৪। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মাইকেল রচনা সম্ভার, "চতুর্দশপদী কবিতাবলী", 'পরিচয়' ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫১৪।

২৫। Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World :: A Derivative Discourse ? 3rd chapter The Moment of Departure : Culture and Power in the Thought of Bankimchandra, 1986, pp. 54-84.

বিবেকানন্দ — একটি অনুসন্ধান

গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশ-কাল ভেদে এমন কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁদের কৃতিত্ব ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী প্রজন্মে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের অবদানকে সমকালের প্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়ণ করে সমাজ ও সভ্যতা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। অথচ আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এই ধারার ব্যতিক্রম ঘটে এসেছে চিরকাল। এই দেশে অনেক ধীমান প্রখর প্রজ্ঞা ও মেধাসম্পন্ন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁদের সমকালে জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে স্বীয় ব্যক্তিত্বে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় যে, পরবর্তী কালে তাঁদের কীর্তির মূল্যায়ণ ও বিচার বিবেচনার দায়িত্ব স্বঘোষিতভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মত ঐ সব ব্যতিক্রমী মনীষীকে একচেটিয়া অধিকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে তাঁদের সুনামকে ব্যবসায়ের 'পেটেন্ট' হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফল দাঁড়ায় এই যে, ভারতের মত বেশির ভাগ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং মূর্খ মানুষদের কাছে তিনি 'দেবতা' হয়ে ওঠেন এবং মর্মর মূর্তি ও আলোকচিত্রে মাল্যভূষিত হয়ে মন্দিরে বা গৃহে বন্দী হয়ে থাকেন। দেশের কাছে যা বৃহত্তর সমাজে তাঁর দ্বারা কোন স্থায়ী উন্নতি বা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সামাজিক ভাবে কোন আদর্শের নিশানা হয়ে উঠতে দেখা যায় না।

আলোচ্য নিবন্ধে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করা হয়েছে সেই স্বামী বিবেকানন্দকে পুঁজি করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেশবাসীর কাছে উজ্জ্বলভাবে অপ্রকাশিত করে রাখা হয়েছি। আলোচনায় দেখা যাবে যে, বিবেকানন্দের চরিত্রের কেবলমাত্র সেই দিকগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট। অথচ বিবেকানন্দের মত প্রবল প্রতিভাধর মানুষের মননেও নানা বিষয়ে প্রচুর স্ববিরোধিতা ছিল। এই স্ববিরোধিতাগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থার

এক নিদারুণ চিত্র এবং পাশাপাশি এই অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্টরা তাঁকে সাক্ষাৎ 'শিব' বানিয়ে রেখে বিবেকানন্দের দেশ গঠনের উক্তিগুলিকে আধুনিক প্রজন্মের নৈতিক চরিত্র গঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি আলোচিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। সেই উপাদানগুলি আলোচ্য নিবন্ধে ক্রমোল্লিখিত হল।

ভারতবর্ষের স্বরূপ জানতে বিবেকানন্দ দুটি দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। এক, ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম; দুই, ভারতবর্ষীয় লোকসমাজ। সনাতন হিন্দুধর্ম জানতে তাঁকে বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, পুরাণ, সূত্রগ্রন্থগুলি গভীর ভাবে পড়তে হয়েছিল। স্নাতক নরেন ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস জেনেছেন। আবার ভারতবর্ষীয় লোকসমাজকে জানতে তিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা পরিব্রাজক হয়ে দেখেছেন। এই দুই ধারাই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই দুই ধারার মধ্যেই সত্য - অসত্য, স্বাভাবিকতা কৃত্রিমতা যেমন তাঁর কাছে ধরা পড়েছে, তেমনি সেই সব অসঙ্গতি, স্ববিরোধিতার কথা তাঁর অকপট মন থেকে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি যখন সংস্কৃত ভাষায় বেদ-উপনিষদ বা অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ পড়েন, তখন তিনি নিজেকে একজন 'বৈদিক' বলতেন। তখন তিনি বলেন, 'বেদ ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি', 'আধ্যাত্মিক সত্য', 'সাক্ষাৎ উপলব্ধি', 'অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার', ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি যে অবাস্তব বা কাল্পনিক কথা তা তাঁরাই কথা দিয়েই, প্রমাণ করা যায়। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'সম্ভবত আমি স্বপ্নচারী এবং শান্তিপ্রিয়, আমি আজন্ম আদর্শবাদ, স্বপ্নজগতেই আমার বাস, বাস্তবের সংস্পর্শে আমার স্বপ্নের বিঘ্ন ঘটায় এবং আমাকে অসুখী করে তোলে। ..... আমার জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ।'[২]

কিন্তু এই পুঁথি-পড়া ভাবুক মন যখন লক্ষ-কোটি নিরন্ন ভারতবাসীকে দেখে, নিরক্ষর ভারতবাসীকে দেখে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তামাম ভারতবর্ষকে দেখে, তখন সেই কল্পবিলাসী, প্রাচীন সংস্কারপন্থী বৈদিক বিবেকানন্দ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সেই বিদ্রোহী মন বলে ওঠে — ''আমাদের উপনিষদ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি — আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। ..... আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা এক সঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিনজন এক সঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা — আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি।''[৩]

বিদ্রোহীমন গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে ১৯.৩.১৮৯৪ তারিখে চিঠিতে লিখেছেন ঃ

''দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, ... তাদের দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি,

এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না' — গুরুদেব বলতেন না? ঐ গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; ... গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নেই।''[৪]

বিদ্রোহীমন বৈপ্লবিক কথায় বলে ওঠেন — ''দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয় — ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো ঘন্টা নাড়ান, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি জোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে, — হায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে![৫]

গুরু রামকৃষ্ণর 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' মন্ত্র বা নির্দেশকে কার্যে রূপ দিতে বিবেকানন্দ মনযোগী হন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীব জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।'[৬] তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? এটা, মানুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু নয়।'[৭] যে আত্মা-পরমাত্মা' ইহলোক-পরলোক' বিষয় পুঁথির সাহায্যে ওকালতি করেছেন, সেই বিবেকানন্দ বললেন, ''ইহলোক'' এবং ''পরলোক'' এই-সব শব্দ শুধু শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য। সব কিছু 'এখানে'।[৮] অথচ এই বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রশ্ন উঠিয়াছে — ধর্ম কি মানুষের জন্য সত্যই কিছু করিতে পারে? পারে। ধর্ম কি সত্যই মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে? অবশ্যই পারে।'[৯] আবার স্ববিরোধিতায় বললেন, 'যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম?' .... 'যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচিক নৃত্য!'[১০]

এই যেসব কথাবার্তা, এগুলির উদ্ভব কীভাবে ঘটল? ধর্মবীর বিবেকানন্দ, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে সক্ষম স্বামী বিবেকানন্দ, কিন্তু ধর্মের স্বরূপ উদঘাটন করলেন এইভাবে — 'স্বার্থ বুদ্ধি না থাকিলে কোন ধর্মমত গড়িয়া উঠিত না। মানুষের নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে

তোমরা কি মনে কর যে, তাহার এই সব প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি থাকিত? হয়তো যা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অপর কিছু দেখিয়া কখন কখন সামান্য একটু স্তুতি করিত, ইহা ছাড়া সে কখনই ঈশ্বরের কথা ভাবিত না।[১১] অথবা, 'গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁহারা কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী। ইহাই মানুষের ইতিহাস।[১২]

স্বামী বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। গুরু রামকৃষ্ণের নির্দেশে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' জীবনের আদর্শ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর জানা ছিল — 'আজকাল সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে ঠকবাজী চলিতেছে,'[১৩]। সন্ন্যাস জীবনের রূপরেখা গঠন করতে তিনি বললেন, 'সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন।[১৪]

এই যে 'কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন' বললেন, এর পটভূমিকাটি কী ছিল? সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি অনালোচিত থেকে গেছে। তিনি বললেন, 'প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এটি — রাজ্যশাসন ও দণ্ডবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার করিয়া।.... কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? শিক্ষা — জবাব পাইলাম।'[১৫]

এই জন্য দেখা যায়, প্রথমবার আমেরিকা বিলেত ঘুরে এসে তিনি পুনরায় ইউরোপ-আমেরিকার দ্বারস্থ হতে সেই সব দেশে যান। কীসের জন্য দ্বারস্থ হওয়া? তাঁর প্রিয় ভারতবর্ষীয় জনগণের শিক্ষা প্রসারের জন্য। সেই প্রিয় ভারতবর্ষীয় জনগণ কারা? তাঁরই কথায় বহু জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে সেই সব মানুষের কথা। তাঁরা হলেন, 'মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী'। এইজন্য তিনি বললেন, 'নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।'[১৬] তাই তিনি তৈরী করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। কী উদ্দেশ্য ছিল এই মঠ ও মিশনের? তাঁর নির্দেশের ভাষায় জানা যাক সে কথা। 'ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন'[১৭]

পরবর্তী কালে আমরা কী দেখলাম? রামকৃষ্ণ মিশন যত বিদ্যালয় স্থাপন করেছে, তার মোট ছাত্র সংখ্যার অনুল্লেখযোগ্য নগণ্য সংখ্যা বিবেকানন্দের প্রিয় জনগণ। ভাগলপুরে

এরকম এক বিদ্যালয় স্থাপন করে জনগণকে শিক্ষিত করবার জন্য মিশন উদ্যোগী হয়। সেকথা বড় আনন্দ করে স্বামী অখণ্ডানন্দ আমেরিকায় বিবেকানন্দকে চিঠি লিখে জানালেন। ২১.২.১৯০০ তারিখে তার উত্তরে বিবেকানন্দ লিখলেন, 'কিন্তু আমাদের মিশন হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।'[১৮] তিনি জানতেন, ভদ্রলোকরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত জনগণ। তাই তাঁকে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থ ব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থব্যয় কর। দুর্বলকে আগে সাহায্য কর; কারণ দুর্বলকে সাহায্য করাই প্রথম আবশ্যক।'[১৯] .... 'চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের ধর্ম। The poor, The down trodden, the ignorant, let these be your God,'[২০]

এই যে পিছিয়ে পড়া ভারতবাসী, যার সংখ্যা আজও অনুপাত হিসাবে বিবেকানন্দের সময় থেকে খুব উল্লেখযোগ্য কমেনি, তাদেরকেই তিনি গুরুর মন্ত্র 'জীবে প্রেম' হিসাবে গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশন গড়েছিলেন। কিন্তু হায়? একজন সৃষ্টি করেন, অন্যরা 'ভোগ ' করে। এ ভোগ কীরকম ছিল? তাঁরই কথায় জানা যাক। 'বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে রামকৃষ্ণ' বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করতে না পারো।.... গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান — কায়মনোবাক্যে 'জগদ্বিতায়' দিতে হইবে।'[২১]

এই রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তাঁর কী ভবিষ্যত বাণী ছিল? দেখা যাক তাঁর পরম শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে সেই বাণীর কথা: "শিষ্যঃ তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং সেইজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা কালে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায় সকল গঠন করিয়া থাকে?

স্বামীজী: হ্যাঁ, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই।

শিষ্য: তবে কি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় হইবে?

স্বামীজী: হবে বই কি।"[২২]

এই সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর মনোভাব শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে —

'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা, এই সুন্দর

পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে.....।'[২৩]

এবং সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ বাণী হল — 'কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর যেদিন হইতে ধনীদের তোষণ করা আরম্ভ, সেদিন হইতে ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসও আরম্ভ হয়।'[২৪]

আর একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান উৎসব রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব —যাকে বলা মহোৎসব'। সেই উৎসবে মানুষের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা বিষয়, তাঁর স্পষ্ট লিখিত নির্দেশ ছিল ঃ 'যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে তাদের (অর্থাৎ যাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যায় যতই কম হয়, ততই মঙ্গল।... প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি শত শত বেশ্যা আসুক, তাঁর পায়েমাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর-ডাকাত সদলে আসুক — তাঁর অবারিত দ্বার।'[২৫]

এই স্বামী বিবেকানন্দকে আড়াল করা হয়েছে, এই প্রকৃত সন্ন্যাসীকে উল্লেখযোগ্যভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়নি। এমনকী, যাঁরা ধর্মব্যবসায়ী, তাঁরা সব কিছু জেনেও ধর্মকে আফিঙের নেশার মত জনগণের মধ্যে নানা কৌশলে , নানা প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে শক্ত ভিতের ওপর খাড়া করেই চলেছেন। বিবেকানন্দ এদের মূর্খ বলেছেন, বলেছেন কূপমন্ডুক বিবেকানন্দ এদের চিনতেন। তাই মিশন গড়তে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে ডলার-পাউণ্ড আয় করতে জীবনবলি দিয়েছেন। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন — ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত, স্বার্থপরতার মূর্তি — তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব।'[২৬] তিনি স্বীকার করে গেছেন, 'কয়েকজন ইউরোপীয় ও আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতায় নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে।'[২৭]

মিশন পরিচালন বিষয়ে তিনি শেষে হতাশ হয়ে বললেন, 'কাজের শেষটা যেন বড় তমশাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য এমনি প্রত্যাশা করেছিলাম।'[৩০]

শেষ পর্যায়ে বৈদিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, — নির্ভীক, অকপট বিবেকানন্দের কৃষ্ণ ও গীতা সম্পর্কে মনোভাব উল্লেখযোগ্যভাবে ধামা চাপা দেওয়া মনোভাবটি নিবেদন করা যাক ঃ

'শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন, বৃন্দাবনে প্রেম।'[২৮] স্ববিরোধিতায় বললেন, 'ভগবান কৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা, জানি না।'[২৯] অথবা, কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কিনা তার কোনই প্রমাণ নেই।'[৩২] 'গীতা' সম্পর্কে তাঁর মতামত ঃ 'যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন Short hand writer

উপস্থিত ছিলেন, যিনি সে সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপকমাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সদশৎ প্রকৃতির সংগ্রাম।'

'গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশ বিশেষ?...

শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে গীতা সর্বসাধারণের বিশেষ পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে ছিল। শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশ বিশেষ উক্ত বোধায়ণ-কৃত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দস্বামী প্রায় নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষে খুঁজিয়া এপর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। বেদান্তের বোধায়ণ-ভাষ্যেই যখন এতদূর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে মনে করেন, গীতাখানি শঙ্করাচার্য-প্রণীত। তাঁহাদের মতে — তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন।'[৩৩]

আমার মূল নিবন্ধটির নাম — 'বিবেকানন্দ — একটি অনুসন্ধান।' সূত্রগুলি বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশনা কার্যালয় উদ্বোধন' কর্তৃক বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী সংস্করণ দশ খণ্ডে বিবেকানন্দ রচনাবলী।' এই দশটি খণ্ডের পাতায় পাতায় অনেক কথা রয়েছে যেগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক সঠিক পর্যালোচনার দাবি রাখে। আমি কেবল এক নমুনা সমীক্ষা-কার্য করেছি মাত্র।

স্ববিরোধিতা স্বাভাবিক মানসিকতারই অঙ্গ। জীবন-যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ ক্রমশ অভিজ্ঞতা অর্জন করে একজন সৎ বস্তুনিষ্ঠ মানুষ তার সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা, সংস্কার প্রভৃতিকে পরিশীলন ও পরিমার্জনা করে, বৃহত্তর জীবনবোধে উন্নীত হয়। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছিল? সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে পুষ্ট হয়েও তিনি উন্নত মানসিকতার নিরীখে তাঁর যাবতীয় ধারণাকে যাচাই করেছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক, মেধাবী ও মননশীল মানুষ — প্রাতিষ্ঠানিক দেবত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ 'স্বামী' বা 'ভগবান' নয়। কারণ তিনি বলে গেছেন, 'আমরা ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। কেহই চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, কখনও করিবেন না। কাহারও মধ্যে ঈশ্বর নাই।'[৩৪]

সূত্র নির্দেশ

(সূত্র : বিবেকানন্দ রচনাবলী (শতবর্ষ, সংস্করণ), প্রকাশক: উদ্বোধন)

ক্রমিক সংখ্যা	খণ্ড	পৃষ্ঠা	ক্রমিক সংখ্যা	খণ্ড	পৃষ্ঠা
১	১	১৪	১৭	৯	৬৩
	৫	১৬	১৮	৮	
	৫	৬৪	১৯	৫	১৩৮
২	৭	২২০	২০	৭	৭৬
৩	৫	১৩৩	২১	৭	৩০
৪	৬	৪১১	২২	৯	১১১
৫	৯	২৩৫	২৩	১	১০
৬	৯	২৩৭	২৪	১০	২৭৬
৭	৭	২৪৬	২৫	১০	২৬২
৮	১০	২৭৪	২৬	৬	৪১৩
৯	৩	২৪৭	২৭	১০	২৬২
১০	৬	৪১১	২৮	৮	২১৬
১১	৩	৩৮৯	২৯	৭	৪৪
১২	৩	৩৯১	৩০	৮	৮৭
১৩	৬	৩৩৩	৩১	৭	৪৪
১৪	১০	১৭৩	৩২	৭	১৬২
১৫	৭	৩২৬	৩৩	৫	২৪৮
১৬	৯	৬০	৩৪	১০	১৩৬

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব

সতী দত্ত

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসান হলেও তাঁর বাণী ও আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রবলভাবে অণুপ্রাণিত করেছিল। আবার, তিনি যে আত্মমোক্ষ ও জনহিতের মধ্যে আপাত বিরোধ ঘুচিয়ে নরনারায়ণের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের উপায় জানিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষিত যুবসমাজের একাংশ নিরন্ন ও নিপীড়িত মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়, — এবং দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের উপর এই ভাবধারার প্রভাব সকলের জানা আছে। কিন্তু তাঁর সাম্যবাদী, তথ্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দ্বারা উত্তরযুগের আন্দোলনকারীরা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষত তাঁর বাণী অবিভক্ত-বঙ্গের দুটি বিশেষ জেলার (যশোহর-খুলনা) আন্দোলনকারী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল — এই প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৮৮৫ সালে তাঁর গুরুর দেহাবসানের পর আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূখণ্ড পরিভ্রমণকালে অগণিত মানুষের অবিশ্বাস্য দারিদ্র ও দুর্গতি তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। তিনি বুঝেছিলেন, আমাদের এই অসংখ্য মানুষের উন্নতি ব্যতীত সমগ্র দেশের, অর্থাৎ ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার শোষণ বিরোধী, তাঁর লক্ষ্যই ছিল ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন।

ভারতের অধিবাসীদের তিনি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন — বিত্তবান বা উচ্চশ্রেণী এবং নির্বিত্ত বা নিম্নশ্রেণী। এই শেষোক্ত-শ্রেণীকে তিনি অভিহিত করেছিলেন জনতারূপে — তারাই ভারতের শ্রমজীবি শ্রেণী — সাম্যের ভিত্তিতে এই জনসাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশই চিরকালের মত পরের কাঠকাটা বা জল আহরণের দাসই থেকে যাবে বলে বিশ্বাস ছিল স্বামীজির। যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদীর ন্যায় সকল বিষয়ে আমাদের নরনারীর সমানাধিকার অত্যন্ত জোরের সহিত তিনি সমর্থন করিয়াছেন। দরিদ্র জনগণের উপর মুষ্টিমেয় ধনিকের প্রাধান্য, অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর উপর উচ্চশ্রেণীর প্রভুত্ব, সমষ্টির উপর ব্যষ্টির কর্তৃত্ব — তিনি কোনদিনই সমর্থন করেন নি।

পাহাড়, পর্বত, অরণ্য হাটবাজার ও দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে ভবিষ্যৎ ভারতের অভ্যুদয় স্বামীজি কামনা করেছেন, বলেছেন, "... নূতন ভারত বেরুক; বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালী মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে বেরুক, মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে ....। তারা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে....।[১] স্বামীজির মতে দেশপ্রেমিক হওয়ার প্রথম সোপান হল ক্ষুধার্ত জনগণের প্রতি সহমর্মিতা। কারুর জন্য বিশেষ সুবিধা নয়, সকলের সমান সুযোগ;— তরুণ সমাজকে এই জাগরণের বাণী সাম্যের বাণী প্রচার করতে হবে; ১৮৯৬ সালে তিনি নিজেকে সোস্যালিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন।[২]

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন অকস্মাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ার পর যুবসমাজের মধ্যে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কার্যাবলীর মধ্যে। এছাড়া অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য, যা পরবর্তীকালেও বেশ কিছুদিন তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, তা হলো, গান্ধীজির গঠনমূলক কার্যক্রম অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামে-গঞ্জে, ছোট ছোট আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা। এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ছিল, সাধারণ মানুষের রুজি রোজগার বা উপার্জন বৃদ্ধি করা এবং নিরক্ষতা দুরীকরণের ব্যবস্থাগ্রহণ। এদের মধ্যে কাজ করতে নেমে ছাত্রযুবকেরা দেশের নিদারুণ দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সংস্পর্শে আসে। বাংলাদেশে তখন এই যুবআন্দোলন প্রবল। এই পর্বে যশোহর ও খুলনা জেলাতেও বহু সংগঠনের জন্ম হয়। সেই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যশোহর-খুলনা যুবসংঘ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩] এই জনপ্রিয়তা লাভের একমাত্র কারণ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকা। অবিভক্ত ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে, এই সংঘের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিকভাবে তা আজ স্বীকৃত।

এই সংঘের নেতৃবৃন্দ, বিশেষত প্রমথ নাথ ভৌমিক, নির্মল চন্দ্র দাস, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখ যুবকেরা ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। দেশের সর্বত্রই উক্তপ্ত সময়ে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সম্পর্কে ছিল ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস, ভীতি ও অজ্ঞতা। তাই ডাঃ দত্ত, স্বামীজির সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় যুবসম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দের গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বাণী ও উক্তি সমূহকে একত্রিত করে, 'Vivekananda, the Socialist' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[৪] জনগণের উন্নতি সাধন ও তাদের সেবাকার্যের জন্য স্বামীজি ভারতের তরুণ সমাজের প্রতি যে আবেদন জানিয়ে গেছেন তা, উৎসাহী তরুণ-কর্মীদের শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়েই উক্তপ্তব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

I.B. Report অনুযায়ী, এই পুস্তিকাটির প্রকাশক ছিলেন প্রমথ নাথ ভৌমিক। যিনি যশোর-খুলনা যুবসংঘের প্রধান সংগঠক এবং সর্বাপেক্ষা গতিশীল ব্যক্তিত্ব। উক্ত সংঘের প্রধান অফিস খালিশপুর স্বরাজ আশ্রম থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়। এর মুখবন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বামীজির সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন[৫]। পুস্তিকাটি ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বহুল পরিমাণে প্রচার করা হয় এবং অতি দ্রুত তা নিঃশেষিত হয়[৬]। তখন গণ-আন্দোলনে নিযুক্ত তরুণ কর্মীদের মধ্যে এই পুস্তকটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং তাঁরা স্বামীজির বাণীর মধ্যে নিজেদের কর্মপন্থার সমর্থন খুঁজে পান। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ এই পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় ৫০ বছর বাদে ডাঃ দত্ত লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক গ্রন্থে এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরও মতে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিযুক্ত কর্মীদের, এই পুস্তিকাটি বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তোলে জাতীয় জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মবলিদানে।[৭]

পুলিশের দলিলে লিখিত আছে —"The main booklet "Vivekananda, the Socialist" contains only 45 pages... Dr. Bhupendra Nath Dutta has written in the Foreward, that Swamiji was a Socialist... the object of the book is to preach socialism in the country in the name of Vivekananda.[৮]"

এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালে ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের প্রচারিত সাম্যবাদী আদর্শ প্রমথ নাথ ভৌমিক প্রমুখ কতিপয় নেতৃস্থানীয় কর্মীর মাধ্যমে যশোহর-খুলনার বিভিন্ন সেবামূলক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সম্প্রচারিত হতে শুরু করে[৯]। ভূপেন্দ্রনাথের মতে — বিপ্লববাদ জনসাধারণের হৃদয়ে ভিত্তিস্থাপন করে নি, তাই দেশের সাধারণ জনগণ স্বাধীনতাবাদের মর্মও বোঝে নি। ... জনগণ — এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিল। সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণ যারা আর্থিক, সামাজিক, প্রভৃতি নানা ধরনের অবিচারের মধ্যে দিনাতিপাত করে, তারা এই রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের মুক্তিকে অনুভব না করতে পারার ফলে উক্ত সংগ্রাম কখনই গণসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করতে পারে নি।[১০]

স্বামীজির এই ভাবধারায় যুবসম্প্রদায় কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ১৯২৯ সালের যশোর জেলাস্থ কালিয়া সম্মেলন (২০-৬-২৯)[১১]। এই সম্মেলনে প্রধানবক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর বক্তব্যই ছিল, যে কোন আন্দোলনই সৃষ্টি হয়, অসন্তোষ ও ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে। বর্তমানে দেশের যুব আন্দোলন গড়ে উঠেছে যুবগোষ্ঠীর অসন্তোষের ফলে। সুতরাং তিনি জেলার যুবসম্প্রদায়কে নতুন স্বাধীন দেশ গড়ার জন্য স্বামীজির আদর্শে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ঘটানোর আহ্বান জানালেন এবং সংঘবদ্ধভাবে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করলেন। জেলার প্রায় সহস্রাধিক যুব-ছাত্ররা এবং মহিলারাও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনে যশোর-খুলনা

যুবসংঘের প্রাণপুরুষ প্রমথনাথ ভৌমিকের বক্তব্য ছিল যুগান্তকারী। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত, — যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হওয়ায় নিজে জাতীয় সত্তা সম্পর্কে অচেতন। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগণ কর্তৃক সংগঠিত কোন আন্দোলনের সঙ্গেই এদের কোন সংযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী অর্থাৎ বাঘা যতীনকে পুলিশের হাতে ডাকাত সন্দেহে ধরিয়ে দেয় সাধারণ গ্রামবাসীরাই।[১২] সুতরাং যুব-সম্প্রদায়কে সর্বান্তিকরণে কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান। এই চিন্তাধারা যুবসমিতির বিপুলসংখ্যক কর্মীর মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে এবং এই আদর্শে আস্থা স্থাপন করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এ কথা এখানে উল্লেখ্য যে, যশোর-খুলনার প্রকাশ্য জনসভায় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে এই সকল বক্তৃতা তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর।

অসহযোগ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত জেলার ছাত্র-যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতি অবলম্বনে জনগণের সেবা, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখলেও, এদেরই একটি অংশ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছিলেন যে, জেলার সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী কৃষককুলের উন্নতি ব্যতীত সার্বিক অত্যাচার বা শোষণের উপশম সম্ভব নয়। এই সব ঘটনাবলী দ্বারা জেলার যুবকেরা যখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে, সেই সময়েই ডাক আসে গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের, যাতে যোগ দেয় অসংখ্য যুবক, অধিকাংশই দীর্ঘ সময়ের জন্য কারান্তরালে চলে যান। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তের জেলখানায় তাঁরা স্থানান্তরিত হন এবং প্রায় ৮ বছর পর ১৯৩৮ সালে নতুন সাম্যবাদী ধ্যানধারণায় রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। পরবর্তীকালে এঁরাই সাম্যবাদীরূপে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।[১৩]

সমাজতন্ত্রবাদ বা সমাজবাদ এখন গোটা বিশ্বের একটি সুপরিচিত রাজনৈতিক আদর্শ এবং এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটাই নিঃশেষিত। সমাজবাদের মূলকথা মনুষ্যত্বের বিকাশ। অর্থাৎ মানুষের প্রতি ভালবাসার বিস্তার "Human being must first have food, clothing and shelter" – Karl Marx. বর্তমান সময়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টায় রত তখন স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন সমাজবাদের আদর্শ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সূত্রনির্দেশ

১। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাবিষয়ক স্বামীজীর উক্তি ও বাণী তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান।

২. ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সং, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ.১ এবং ৩

৩. I.B. File No. - 232/29

- Do - - 217/30

৪. I.B. File No. - 232/29

৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত- প্রাগুক্ত পৃ. ৭

I. B. File No. - 232/29

৬. সুকুমার মিত্র সম্পাদিত, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে যশোহর-খুলনা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.১৭৯

৭. ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮. I. B. File No. - 232/29

সতী দত্ত, ঔপনিবেশিক ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে খুলনা জেলা - ১৯০৫-৪৭ (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭) ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৫৯ ও ২২৯

৯. I.B. File No. - 232/29, I.B. File No. - 217/30

১০. ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ.৬৩

১১. I.B. File No. - 232/29

১২. - Do - - 232/29

১৩. সতী দত্ত, ঔপনিবেশিক ভারতের মুক্তি সংগ্রামে খুলনা জেলা - ১৯০৫-৪৭, (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, যাদবপুর, ১৯৯৭), পৃ. ১৬০-১৬৯

রাধাকমলের তাত্ত্বিক অর্থনীতি ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) মূলতঃ অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন এবং অর্থনীতিতে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করার পর মুর্শিদাবাদের কে.এন কলেজে অর্থনীতির লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই সমাজের দুর্বল শ্রেণীর দুঃখকষ্ট তাঁকে বিচলিত করে এবং বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাই রাধাকমলের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা সমাজের এবং সমাজতত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগদেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে অবসর নেন।

রাধাকমলের তাত্ত্বিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ-

১) ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা ঃ- বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুদশকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাধাকমল অনুভব করেছিলেন যে অর্থবিদ্যার নতুন ব্যাখ্যা এবং তার পুনর্গঠন জরুরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থবিদ্যার যে আধিপত্য সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং জনগণ এর 'সুমহান সূত্র' গুলি (grand laws) নির্দিধায় মেনে নিয়েছিল তার গুরুত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কমতে শুরু করে এবং বেশ কিছু মানুষের মধ্যে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে অর্থবিদ্যা মৃত।[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থবিদ্যা সম্পর্কেএই অনীহার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রাধাকমল বলেছেন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যা যেহেতু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি তাই অর্থবিদ্যার এই হতদ্দশা। পশ্চিমী লোক কেয়ার্নস (cairnes) ও বলেছিলেন যে অর্থবিদ্যা শিক্ষিত লোকের কাছে আর ফলপ্রসূ ধারণা হিসাবে পরিগণিত হয় না; বেজহট (Bagehot) ও বলেছেন যে মানুষের সজীব ধ্যানধারণার সঙ্গে অর্থবিদ্যা ঐ সময় খাপ খায় নি। ১৯২০র দশকের শেষে এবং ১৯৩০ এর দশকের প্রথমে অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অর্থবিজ্ঞানীগণ অর্থবিদ্যার এই হৃত

সম্মান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন নি।[২]

রাধাকমলের মতে রিকার্ডো, মিল, ভালরাস (walrass) ভন ভাইজার (Von Wiser), অধ্যাপক ক্লার্ক, অধ্যাপক মার্শাল এবং নিও-ক্ল্যাসিকাল গোষ্ঠীর লেখকগণ অঙ্কশাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের চিন্তাভাবনাগুলি যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন বটে, তথাপি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা যুগোপযোগী হয়ে উঠতে পারে নি। ক্ল্যাসিকাল চিন্তায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে কার্ভ- বা রেখার কথা বলা হয়েছে তা একমুখী; উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রেখার (Curve) মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করা দরকার তা ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিতে অনুপস্থিত।

এছাড়া শ্রমবিজ্ঞানের বিশেষ সুবিধাগুলি, বৃহৎ আকারে উৎপাদন ব্যবস্থা, পুঁজির গুরুত্ব, শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক লাভের কৌশল প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যার গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা হয়নি। এছাড়া ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যার উপযোগিতার যে রেখা রয়েছে তাতে ক্রমবর্ধমান উপযোগিতার বিষয়টি স্থান পায় নি।[৩]

আবার ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যা অনুপযুক্ত মনস্তত্ত্বর উপর গড়ে উঠেছিল। ভোগবাদী (hedonistic) ক্যালকুলাস ছিল এর ভিত্তি। একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত কম কষ্ট করে সবচেয়ে বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যায় এবং সুখ ও কষ্টের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। মিতব্যয়িতা, বেহিসাবী ব্যয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, দারিদ্র ও বেকারত্বের ভীতি, জীবনে নিরাপত্তার চিন্তা, সম্পত্তি সংরক্ষণে ঝুঁকি প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সমর্থকদের তাড়িত করেছিল।

এছাড়া মুক্ত এবং সীমাহীন প্রতিযোগিতাকে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যায় সমর্থন করা হয় এই যুক্তিতে যে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত প্রতিটি শরিক তাদের ন্যায্য ও যথাযথ অংশ পাবে।

রাধাকমল উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক মনস্তত্ত্বের যে অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করি তার ফলে সুখবাদী ক্যালকুলাসের সীমাবদ্ধতা প্রকট হয় এবং মানুষ যে বহুবিধ প্রবৃত্তি ও প্রেরণার দাস তা পরিস্ফুট হয়। আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্য ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কাছে হার মানতে থাকে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ আবার বিভিন্ন এজেন্সীগুলির আধিপত্য এবং হস্তক্ষেপের প্রভাবের দিকটি অনুধাবন করতে পারেন নি। রাধাকমলের মতে এই এজেন্সীগুলির ভূমিকা অর্থনীতিবিদদের স্বীকার করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক ধারণা ও বিষয়গুলির সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়।[৪]

শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যায় অসম পার্টির মধ্যে যে চুক্তিকরার স্বাধীন নীতি গ্রহণ করা হয় তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিপন্থী। অর্থনীতির 'মানুষ' (homo economicus) ধারণাটি ক্ল্যাসিকাল চিন্তায় যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নি।

পক্ষান্তরে রাধাকমল অর্থনীতির মানবিকীকরণ' (humanization of economicus) ধারণাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থনীতি ও পরিচালন ব্যবস্থায় গুরুত্ব পেয়েছে। মানবিক গতিপ্রকৃতি সমসময়িক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির ভিতকে টলিয়ে দিয়েছে।

তবে রাধাকমল পাঠক ও গবেষকদের সতর্ক করেন যে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির প্রভাব এখনও রয়েছে এবং তার জন্য সতর্ক হওয়া দরকার।

২) পাশ্চাত্য অর্থনীতি প্রাচ্যের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত

রাধাকমল পাশ্চাত্য অর্থনীতির দুটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন ক) পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃত্রিম বৌদ্ধিকতাবাদ (abstract intellectualism) সামাজিক সহমর্মিতার পরিবর্তে অহংবাদ (agoism) কে প্রশয় দেয়। এখানে বুদ্ধিপরিমাপকরেখা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে লোকায়ত (folk) জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদ করা হয়।

পক্ষান্তরে প্রাচ্যের জীবনযাত্রায় সাধারণ মানুষ ও লোকায়ত জীবনযাত্রার ঐতিহ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভাণ্ডারের আধার (reservoir) বলে রাধাকমল মন্তব্য করেছেন।

খ) পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে জীবনকে এক ছাঁচে ফেলা হয়। এর ফলে জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য, জাতিগত মূল্যবোধ এবং সামাজিক ইতিহাসের যে গুরুত্ব তা এখানে লক্ষ্য করা যায় না। পাশ্চাত্যে যে কৃত্রিম সমতা এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থা দেখা যায় তা প্রাচ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যে যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীমত প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে প্রাচ্যে গোষ্ঠীর আদর্শ আমাদের পরিচালিত করছে। এই গোষ্ঠী মানসিকতায় কে কার্যকরী নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে তা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এবং বিচ্ছিন্নতাকে রুখবার ক্ষেত্রে সক্রিয় মাধ্যম হিসাব কাজ করছে।[৬]

তৃতীয়ত, প্রাচ্যে প্রাচীন সংগঠনগুলি গ্রামীন 'কম্যুনালিজম' (Communalism) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই 'কম্যুনালিজমে'র অর্থ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতাবাদ নয়। এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং সমবায়ের ভাবনা পরিস্ফুট। পাশ্চাত্য সমাজে এই ধারণা অনুপস্থিত।

চতুর্থতঃ রাধাকমল উল্লেখ করেছেন যে প্রাচ্যে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন গ্রামীন সম্প্রদায়গুলি তা সামাল দিতে সচেষ্ট হয় এবং সম্পদের যাতে অপচয় বা ধ্বংস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে এবং পতিত জমিকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যে অসম বন্টন ছিল তা সমভাবে বন্টন করতে সক্রিয় হয়।

ভারতের উদাহরণ দিয়ে রাধাকমল বলেছেন যে এখানে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির এবং বড় বড় শহরের উত্থান একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি এবং

শহরীয় ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা দেখা যায়। গ্রামীণ উৎপাদনগুলি দেশের ভিতরেও বাইরে যাতে যথোপযুক্ত ভাবে বাজারজাত করা যায় তার ব্যবস্থাও করা হয়। রাধাকমলের মতে প্রাচ্যের এই ব্যবস্থা পশ্চিমী মডেল থেকে স্বতন্ত্র।

পঞ্চমতঃ রাধাকমলের মতে পশ্চিমী সামাজিক কাঠামোতে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে দ্বৈত সম্পর্ক রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সমাজে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মাঝখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠী, পরিবার, জাতি, সংগঠন, ধর্মীয় সংস্থা প্রভৃতি রয়েছে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির উভয়ের উপর প্রভাব ফেলে।

অবশ্য পশ্চিমী দুনিয়াতেও পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ আকাঙ্খিত সুযোগ সুবিধা ও দক্ষতা সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেখাতে না পারায় বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দুনিয়াতেও সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন, সিণ্ডিক্যালিজম, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা হয়।[৮]

ষষ্ঠতঃ পাশ্চাত্যে যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ছবি আঁকা হয়েছে তাতে ব্যক্তিকে অযৌক্তিকভাবে স্বতন্ত্র দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ড খণ্ডভাবে দেখা হয়েচে — যেমন ভূস্বামী, শ্রমজীবী মানুষ, পুঁজিবাদী মানুষ ইত্যাদি। রাধাকমল পাশ্চাত্য অর্থনীতির এই দিকটি রিকার্ডোর অর্থনৈতিক খাজনা, মজুরী, মূল্য নির্দ্ধারণ এবং ক্লার্কের নির্দিষ্ট উৎপাদন তত্ত্বের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে মানুষকে খণ্ড খণ্ডভাবে দেখা হয় না। এখানে সামগ্রিকভাবে মানুষের বিচার করা হয়।

সপ্তমতঃ পাশ্চাত্যসমাজে দখল ও লুন্ঠন করার প্রবৃত্তি সমাজকে শত্রুভাবাপন্ন স্বার্থগোষ্ঠী বা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পগুলিতে অসামাজিক পদ্ধতিতে শোষণ এবং মুনাফা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু শ্রেণী প্রচুর বেআইনী অসামাজিক অর্থের অধিকারী হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের এই শোষণ ও লুন্ঠন ব্যবস্থাকে রাধাকমল সঙ্গতকারণেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তা প্রাচ্যের আদর্শের পরিপন্থী।

অষ্ঠমতঃ - পাশ্চাত্যের ডারউইনবাদ রাধাকমল সঙ্গত কারণেই সমর্থন করেন নি। মালথাসের জনসংখ্যা থেকে ডারউইন তাঁর অস্তিত্বের লড়াই তত্ত্বটি নেন। স্পেনসার ও হাক্সলে থেকে নাৎসে ও বার্ণহার্ডি প্রমুখ দার্শনিকগণ প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম ও ধ্বংসের মাধ্যমে যে অগ্রগতির চরিত্র তুলে ধরেছেন তা প্রাচ্য তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি হতে পারে না। ভারতে গোষ্ঠীও সম্প্রদায়গুলির সহযোগিতা ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে দায়িত্বশীল সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ রাধাকমল করেছেন। পাশ্চাত্যের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে পরিহার করে 'কম্যুনালিজম' বা 'সমষ্টিগতমতবাদের' আলোকে ভারতের উন্নতি ঘটাতে হবে।[৮]

৩) অর্থবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

অর্থবিদ্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা অসমীচীন। বিভিন্ন সামাজিক, প্রাকৃতিক,

জৈবিক বিজ্ঞানের ও বিষয়গুলির প্রভাব যে অর্থনীতির উপর পড়ে ও অর্থনীতির প্রভাব যে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের উপর পড়ে তা রাধাকমল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

বস্তুতঃ পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধিকার ঘটে তার প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে লক্ষ্য করা যায়। জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্বের প্রসারিত আলোচনায় মানুষের কায়িক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং এর সামগ্রিক প্রভাব অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর উপর পড়ে এবং তা একটি অভিন্ন আলোচনায় পর্যবসিত হয়।[৯]

ফ্রয়েড, ইয়ুং-র মতবাদ যা নয়া মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে তার প্রভাবকে অর্থনীতিতে কাজে লাগাতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে আধুনিক অর্থনৈতিক সমাজে যে অশান্তি তার মূলে গোষ্ঠী চেতনার নিপীড়ন। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ।[১০]

নয়া নৃতত্ত্ব এবং জাতির মানসিকতার তথ্যগুলিতে অর্থনীতির বিকাশে ব্যবহার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রাধাকমল পশ্চিমী দুনিয়াতে ভেবলেনের বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যেখানে dolicho-blond শ্রেণীর মানুষেরা নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। অভিজাত এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধাণত এই উচ্চশ্রেণীদের মধ্যেই প্রকটিত হয় এবং শিল্পগত মূল্যগুলি মেকানিক্যাল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।[১১]

পদার্থবিদ্যার প্রভাব অর্থনীতির উপর রয়েছে বলে রাধাকমল উল্লেখ করেছেন; শ্রম এবং তার মূল্য ভোগবাদী দর্শনের সুখ ও কষ্ট তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয় না। এর জন্যে দরকার শক্তির (energy); আর শক্তি হল পদার্থবিদ্যার বিষয়।[১২]

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের সামগ্রিক প্রভাব সমাজের বিভিন্ন সম্পর্ককে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি অর্থনৈতিক পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ পক্ষে কোন রাষ্ট্রের পরিকল্পনার রূপরেখা ও তার লক্ষ্য সেই রাষ্ট্রের সরকারের চরিত্রের উপর নির্ভর করে।[১৩]

নতুন অর্থনীতিতে গোষ্ঠী জীবনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদ, সিণ্ডিকালিজম এবং সমাজতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতাগুলিতে দূর করে সমগ্র মানুষকে বিচার করতে হবে। ব্যক্তিকে গোষ্ঠীজীবনের কেন্দ্রে সংস্থাপিত করে আর ব্যক্তির জীবনকেন্দ্রে সমষ্টিগত চিন্তার বীজ বপন করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মেল বন্ধন ঘটাতে হবে।[১৪]

৪) অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক পঠনপাঠন ঃ-

অর্থনীতির আলোচনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব রাধাকমল উল্লেখ করেছেন। মানুষ্যের ভাবনাচিন্তা, ঐতিহ্য এবং সামাজিক তাগিদ ও সম্পর্ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং এর সামগ্রিক প্রভাব অর্থনৈতিক ভারসাম্য গড়ে তোলে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য হেতু প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিভিন্নতা দেখা দেয়

এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই এলাকার অর্থনৈতিক কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই যে অর্থশাস্ত্রে অভিন্ন ও অনড় নীতি গ্রহণ করা হয় তা বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় না।[১৫]

৫) জনসংখ্যা ও অর্থনীতির তত্ত্ব ঃ-

জনসংখ্যার প্রভাব-যে অর্থনীতির উপর পড়ে তা রাধাকমল গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি কোন দেশের সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের যোগান, কর্মসংস্থান, জনগণের স্বাস্থ্য, উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা, ন্যায্য চাহিদা যোগানের প্রশ্ন, বিষয়গুলি রাধাকমল আলোচনা করেছেন, যা বর্তমান সময়ে সমান প্রযোজ্য।[১৬]

৬) ধর্ম, সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা এবং অর্থনীতি ঃ-

অর্থনীতির উপর ধর্মের সংস্কৃতির প্রভাব একটি বাস্তব বিষয়, কৃষিপ্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মাটি, জল, ঋতু শস্য চাষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব গ্রামাঞ্চলে এখনও যথেষ্ট সক্রিয়। অনুরূপভাবে একজন কারিগর যন্ত্রের দেবতা হিসাবে বিশ্বকর্মাকে পূজা করে এবং তার কাজের মধ্যে সৃষ্টির দেবতার প্রভাব মেনে নেয়।

আবার আঞ্চলিক ভৌগলিক চরিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, আঞ্চলিক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মানুষের সামাজিক আর্থিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং তাত্ত্বিক অর্থনীতি এই উপাদাদনগুলিকে স্বীকার করে গড়ে তুলতে হবে।[১৭]

৭) অখণ্ড সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনীতি

রাধাকমল একটি সার্বজনীন, সংহতি সমৃদ্ধ অর্থনীতির কথা বলেছেন যেখানে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের রূপ গড়ে উঠবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় সকলের স্বার্থসংরক্ষণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠবে এবং একই সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণও এর মধ্যে নিহিত থাকবে।

রাধাকমলের এই তাত্ত্বিক অর্থনীতি বর্তমানে সমান প্রাসঙ্গিক! ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ ওতঃ প্রোতভাবে জড়িত। রাধাকমলের কৃতিত্ব হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ভাল দিকগুলির তিনি সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেন যার মধ্যে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। শুষ্ক তাত্ত্বিক অর্থনীতি নয়, কল্যাণমূলক অর্থনীতি রাধাকমলের চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৮] নোবলজয়ী অমর্ত্য সেন যে মানবের অগ্রগতির (human development) কথা আজ বলছেন এবং যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে অর্থনীতিকে গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে তা রাধাকমলের চিন্তায় অনেক আগেই বিধৃত।

সূত্রনির্দেশ

1. রাধাকমল মুখার্জী = Principles of Comparative Economics vol I page 1 & 2, London, P.S. King (1921)
2. " = ,, Chapter IV Classical Economics unworkable

3. " = ,, Page 28
4. " = Institutional Theory of Economics - Sir Kikabhai Premchand Lectures 1939-40 University of Delhi - London, Macmillan (1940)
5. " = Borderlands of Economics Page 87, London, George Allen & Unwin, (1925)
6. " = Page 88
7. " = Principles of Comparative Economics Vol I Page 46-47 (1921)
8. " = Institutional Theory of Economics Page 223 (1940)
9. " = Borderlands of Economics Page 10217 (1925)
10. " = ,, Page - 23
11. " = ,, Page - 83-85
12. " = ,, Page 197
13. " = Principle of Compasative Economics Vol Page - 76
14. " = Borderlands of Economics Page 123
15. " = Institutional Theory of Economics Page - 138
16. Ishrat Z. Hussain = (edited) Radhakamal Mukherjee Commemoration Vol. Bombay, Somaiya Pub lication, (1972)
17. রাধাকমল মুখার্জী = Vide Borderlands of Economics
18. " = The foundation of Indian Economics - London, Longmans Green & Co (1915) Vid. Conclusion

ঔপনিবেশিক বাংলার নারী, জাতপ্রথা ও কয়েকটি জরুরী সামাজিক প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের লেখায়।

গার্গী নাগ

ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজে মিশ্র সংস্কৃতি বাংলার সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষের বৌদ্ধিক জগতে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত জীবণালেখ্যর মধ্য দিয়ে - তাকেই তুলে ধরার চেষ্টা বর্তমান গবেষণাপত্রে করা হয়েছে। এই ধরনের গবেষণার আভাস আমরা খানিকটা পাই ডঃ সুদীপ্ত কবিরাজের Unhappy Conciousness গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। ডঃ কবিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাশৈলীকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত জীবনী ও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমের বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। বর্তমান আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট কিভাবে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার উপর ক্রিয়া করে, তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। আবার এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিপূরক হিসাবে শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালীন সমাজ জীবনের উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, এবং মূলতঃ তার রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের উপর তিনি কি ধরনের প্রভাব রেখে গেছেন।

বর্তমানে আলোচনায়, তাঁর দুটি উপন্যাস 'বামুনের মেয়ে (১৯২০ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত), ও 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬ সালের ২০ শে নভেম্বর প্রকাশিত) কে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার নারী, জাতপ্রথা ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জরুরী সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে সমকালীন এক মননশীল ব্যক্তি মানুষ হিসাবে শরৎচন্দ্রের বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়ার রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপন্যাসদুটির মনোযোগী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এর কতকগুলি দিক বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়। প্রথমত তৎকালীন সমাজে কৌলিন্যপ্রথার সাথে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্যের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে সামাজিক সমস্যাগুলিকে কতখানি জটিল করে তুলেছিলেন তা স্পষ্টহয়ে উঠেছে 'বামুনের মেয়েতে'। সেইসঙ্গেই যুক্তভাবে দেখা যেতে পারে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের সমস্যাকেও। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, কৌলিন্য প্রথার ভয়াবহরূপ

সম্পর্কে সকলেই কমবেশি অবহিত। কিন্তু বামুনের মেয়েতে শরৎচন্দ্র তার আরও একটি নিদারুণ দিক তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায় যে, কালীতারার বৃদ্ধ কুলীন স্বামী অর্থের লোভে তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছেন নিজের বালিকা স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রতিককালে কৌলিন্য প্রথার নানা দিক নিয়ে গবেষণা চলছে। অধ্যাপিকা Dagmer Engles কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ের সাথে সাথে এর অন্যান্য অনুষঙ্গগুলিকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। দ্বিতীয়তঃ এই 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসেই আমরা পাই তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপটের মিলিত রূপটিকে। উপন্যাসে বর্ণিত বৃদ্ধ গোলক চ্যাটুজ্জের চরিত্র যেন প্রচলিত বাহ্য আড়ম্বরসর্বস্ব, স্বাত্ত্বিকতার ভেকধারী ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভণ্ডামির মুখোশের আড়ালে লোভ, ব্যভিচার, দুর্নীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার মূর্তিমান প্রতীক। সমাজে তাঁর প্রতিপত্তির অন্যতম মূল উৎস তাঁর জাতিগত মর্যাদা আর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। অন্যদিকে রাসমণির মধ্য দিয়ে আবার তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অর্থহীন আচার সর্বস্বতা ও জটিল নিয়মের বেড়াজালের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিকটাই চোখে পড়ে।

সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলির রূপ শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং পরোক্ষে সেগুলি নিয়ে প্রশ্নও জাগাতে চেয়েছেন পাঠক -পাঠিকার মনে। কিন্তু বিপ্লবাত্মক কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত তিনি দেননি। 'বামুনের মেয়ে' তে সন্ধ্যার বৃন্দাবনে যাওয়া এবং 'অরক্ষণীয়ার' জ্ঞানদার অতুল কর্তৃক একদা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমান ভুলে অতুলের ভাবান্তরকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে মীমাংসার সমাধান মেলে তাতে বিপ্লবাত্মক বলিষ্ঠতা অন্ততঃ নেই। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধারণা করা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না যে, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কাঠামোর মধ্যে থেকে তাঁর সমকালীন সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ্যে অতিক্রম করা হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এভাবেই সমকালীন সমাজ হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বকে নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

তবে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তোলা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ পরবর্তী মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই নব-উদীয়মান ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার আড়ালে প্রায় সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কৃত সমাজ সংস্কারের সুফল তাই সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কতটা মাত্রায় পৌঁছেছিল, বা আদৌ পৌঁছেছিল কিনা এবং ব্যক্তিমানুষের জীবনকে কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল কিনা? সেই আলোচনাও গৌণ হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির এই প্রতিকূলতার মধ্যে বসে সামাজিক কুপ্রথা নিয়ে মুখ খোলা ছিল কঠিন। শরৎচন্দ্র যে এই সমস্যাগুলির দিকে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন অভিনব কৌশলে এজন্যেই তিনি প্রশংসার্হ।

তবে এও ঠিক যে, আলোচ্য সামাজিক সমস্যাগুলির মুল ছিল সমাজের অনেক

গভীরে। কারণ সমস্যাগুলি ছিল পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে তাতে ভাঙন বা ফাটল ধরানো নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না এবং রাতারাতি তা নির্মূল করাও ছিল অসম্ভব। তাই হয়তো তিনি এগুলি নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়েই নিরস্ত থেকেছেন। আবার নারীচরিত্রগুলিকে প্রায় নির্বাক, অসহায় করে গড়লেও নারী চরিত্রচিত্রণে তাঁর আন্তরিক সহমর্মিতা নিরুচ্চারিত থাকেনি। এভাবেই সাহিত্যের দর্পণের মধ্য দিয়ে নারী চরিত্রকে তিনি তাদের সামনে তুলে ধরে সম্ভবতঃ তাদের নিজেদের চিনতে শিখিয়েছেন। নিজেকে এই চেনাই আনবে সেই সচেতনতা — যার থেকে সে নিজেই নিজের উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করে নেবে। আলোচ্য উপন্যাসদুটির উপসংহারে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ক্ষীণ হলেও অস্পষ্ট নয়।

পরিশেষে, আরও একটি বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্র যেভাবে সমাজের জাতপ্রথা, কৌলিণ্যধর্ম ও তার আনুসঙ্গিক সামাজিক সমস্যা ও তার প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরেছেন -সমকালীন অন্যান্য সূত্র থেকে তার বাস্তব সমর্থন মেলে কতটুকু? এর সদুত্তর খুঁজে পেতে দেখা যেতে পারে সমকালীন যুগের 'ভারতবর্ষ', 'যমুনা', 'প্রবাসীর' মত প্রথমসারির পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত নানা গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধগুলিতে।

১৩২২ সালে 'প্রবাসীর' পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অভিমান' নামক একটি ছোট গল্পে কৌলিন্য প্রথার জোরে 'তারা' নামক একটি বিবাহিত গ্রাম্য বালিকার দুর্দশার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখিকা সরযুবালা সেনগুপ্ত লিখেছেন "... এই কৌলিন্যসিদ্ধ পত্নীব্যবসায়ী স্বামীর দুষ্প্রাপ্য কুটীরে যে তাহার স্থান হইবে না তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল।"প্রায় অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় ১৩২৪ সালের প্রবাসীর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত সীতাদেবীর লেখা গল্প 'স্মৃতিরক্ষায়'। তাছাড়া সেকালের প্রখ্যাত লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'ধর্মের কল' (১৩০৮ এ প্রকাশিত লেখক লিখেছেন — "হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের ... কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া গেল। .... পিতা বিক্রমপুর হইতে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান এক দিগগজ কুলীন আনিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। দুইবেলা মাছ-ভাত খাওয়া ছাড়া এবং সিঁদুর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আর কোনও সধবাসুখের অধিকারিণী ছিলেন না"। এছাড়া অপর খ্যাতনামা লেখক জগদীশ গুপ্তের রচনা, খ্যাতনামা নাট্যকার ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এর 'চাঁদের আলো' গল্পে ও আরোও অন্যান্য অনেক সূত্র থেকেও তৎকালীন সমাজে একইধরনের সামাজিক অনাচার এবং জাতপাতের ছুৎমার্গের কাহিনী নারীর জীবনকে যে বহুদিক থেকেই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সমস্যার তীব্রতা যতখানি বেশি উল্লিখিত হয়েছে অন্যান্যদের লেখায় তা অনুপস্থিত আবার পরিসংখ্যাণের বিচারেও অন্যান্য লেখক লেখিকার রচনার মধ্যে এধরনের লেখার সংখ্যা যথেষ্ট কম এর থেকে মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমকালীন বিভিন্ন লেখক এমনকি লেখিকা, বহুক্ষেত্রে অন্তঃপুরিকারও তৎকালীন

সমাজের প্রেক্ষাপটে। নারীদের অবদমিত অবস্থা, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্যজনিত দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছিলেন ঠিকই, এমনকি ঔপনিবেশিক সরকারও বিষয়টি নিয়ে যে খানিকটা বিচার বিবেচনা করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। Age of consent Bill ও widow Remarriage Act প্রণয়ণ। কিন্তু আলোচ্য সমস্যার এটি ছিল এমন এক ধরনের সমাধান - প্রয়াস যা আসলে অনেকটাই উপর থেকে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া এবং তা সমস্যার মূলকে সেভাবে অনুসন্ধান করতে চায়নি, আর এই মূলকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। কৌলিন্যপ্রথা বাংলার সমাজে বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত জাঁকিয়ে বসেছিল তথাকথিত ধর্মীয় হিন্দুবিধির ঢালাও সমর্থন প্রাপ্ত হয়ে। সমাজও যেন তাকে কতকটা অনুমোদন জানিয়েছিল এক্ষত্রে একধরনের সামাজিক নির্লিপ্তি, বিশেষ করে গ্রাম-সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে চালিত বিধি নিয়ম ও কুপ্রথাগুলির প্রতি প্রশ্নহীন অন্ধ আনুগত্যও সমাজ জীবনে এই অনাচারগুলিকে আরও দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় এই সমস্যাগুলির উপরে শুধু আলোকপাতই করেননি, এর মূলের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি। যদি বলা যায় তিনি কৌলিন্যপ্রথা ও তার আনুষঙ্গিক জাতপাতের বৈষম্য, বাল্যবিবাহ অকালবৈধব্য এবং নারীর উপর সামাজিক -নির্যাতনের রূপের সাথে ঔপনিবেশিক গ্রামীন বাংলার সমাজের পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের উপাদানের মধ্যে বহুবছরের সযত্নলালিত অশুভ আঁতাতের জটিল সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন তবে তা নিতান্ত অসঙ্গত ও অনৈতিহাসিক হবে না।

সূত্রনির্দেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বামুনের মেয়ে'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'অরক্ষণীয়া'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'নারীর মূল্য'

'প্রবাসী' — ১৩২২ সাল পৌষ সংখ্যা

'প্রবাসী' — ১৩২৪ সাল কার্তিক সংখ্যা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'ধর্ম্মের কল' (প্রকাশনা কাল ১৩০৫সন)

জগদীশ গুপ্ত ঃ 'দুলালের দোলা' (১৩৩৮ সন্)

ডঃ সুদীপ্ত কবিরাজঃ 'Unhappy Conciousness'

Dagmer Engles : 'Beyond Purdon

ড্যাগমার এঙ্গেলস ঃ Women in Bengal 1890-1939

ইতিহাসের ব্যাখ্যা ঃ
কাল মার্কস ও শ্রী অরবিন্দ

হীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার

সূচনা ঃ

সর্বপ্রথম ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন ইব্‌নে খাল্‌দুন (১৩৩২-১৪০৬)। তিনি উত্তর আফ্রিকার এক মুসলিম মনীষী, থাকতেন স্পেনে। তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করার চেষ্টা করেন। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থের নাম "মুকাদ্দামা"। তিনি ছিলেন একজন ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দার্শনিক। এই জগতে যেমন কার্য-কারণ সম্পর্কে নীতি রয়েছে, তেমনি ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে আমাদের সেই নীতি আবিষ্কার করতে হবে। খাল্‌দুন সমাজের ক্রমবিকাশের ধারার বিশ্লেষণ করেছেন এবং মানব সমাজের কতকগুলি স্তরের কথাও বলেছেন। প্রথমে মানুষের ছিল যাযাবর জীবন; তারপর অর্থনৈতিক কারণে মানুষ আরম্ভ করে ব্যবসা-জীবন। অর্থনৈতিক কারণেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একজন শাসকের অধীনে বাস করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী কালে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয় — বিত্তশালী ও বিত্তহীন। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে ইব্‌নে খাল্‌দুনের ইতিহাস-দর্শনের লক্ষণীয় সাদৃশ আছে।

কার্ল মার্কস মত

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) মতে, অর্থনৈতিক কারনেই সমাজ বা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। উৎপাদনের যন্ত্র, হাতিয়ার ও উৎপাদনের উপায়গুলি(means of production) পরিবর্তনে সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয় এবং তারই ফলে ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাই নির্ধারণ করে মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও সংস্কৃতি।

মার্কস সমাজের কতকগুলি স্তরের বা যুগের উল্লেখ করেছেন ঃ আদিমযুগ, দাসযুগ, সামন্তযুগ, পুঁজিবাদী যুগ, সমাজতন্ত্র যুগ। সর্বশেষ যুগটি পৃথিবীতে এখনও আসেনি যদিও রুশদেশে ও চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো — সমাজে বা রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পদ থাকবে না; সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। এই সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবাই সমান। সকলেই কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী রাষ্ট্র থেকে পাবে। নীতিটি হচ্ছেঃ "from each according to his ability, to each according to his work" এটি সমাজতন্ত্রের প্রথমস্তর। দ্বিতীয়স্তর বা কমিউনিজম্-এর নীতি হলোঃ "from each according to his ability, to each according to his needs." এটি সাম্যবাদ। সমাজতন্ত্রে সমাজ বা রাষ্ট্রই প্রধান, ব্যক্তি নয়। সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধীন।

সমাজ পরিবর্তনের যে গতি তার নাম মার্কস দিয়েছেন "dialectic process" বা দ্বন্ধ মূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির তিনটি পর্যায় থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস ও সিন্থিসিস। এ পদ্ধতিটি মার্কস গ্রহণ করেছেন দার্শনিক হেগেলের কাছ থেকে। তবে হেগেলের আরম্ভ (Starting-point)Absolute বা Spirit থেকে আর কার্ল মার্কসের আরম্ভ জড় (Matter) থেকে। মার্কসের মতে এই তিন পর্যায়ে ইতিহাস এগিয়ে চলে সরলরেখায়। মার্কস আর একটি কথা বলেছেন এই প্রসঙ্গে। তাঁর মতে প্রত্যেক যুগের সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম (Class Struggle) থাকে। সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুটি শ্রেণী — ধনী ও নির্ধন। উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম চলে। বর্তমান সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ (Capitalist Society) এই সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে পুঁজিবাদীর সঙ্গে শ্রমিকের। এর পর আসবে শ্রেণীহীন সমাজ; এই সমাজ হবে সমাজতন্ত্র যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। সমাজতন্ত্র আসবে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। এই হলো সংক্ষেপে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব।

শ্রী অরবিন্দের ইতিহাস-ব্যাখ্যা

শ্রী অরবিন্দের ইতিহাস-ব্যাখ্যা তাঁর সমাজদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ইতিহাস-ব্যাখ্যা হলো মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর চিন্তার মৌলিকতা দেখিয়েছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ The Human Cycle-এ।

কার্ল মার্কসের ইতিহাস-ব্যাখ্যা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা বলা যায় ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা কারণ অর্থকেই তিনি ইতিহাসের একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে মনে করেন। ইতিহাস-ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ও কার্ল মার্কস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। প্রসঙ্গত বলি যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজচিন্তাবিদ ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। আধুনিককালে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) মানবেন্দ্রনাথ (১৮৮৭-১৯৫৪), সরোকিন অসওয়াল্ড স্পেংলার (১৮৮০-১৯৬৩), কার্ল ল্যামপ্ প্রেক্ট, হ্যারল্ড টয়েনবি প্রমুখ ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনকে সমাজ-গতির ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে চৈতন্যই হলো চরমসত্য। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যই নিহিত। ক্রমবিকাশের ধারায় আমাদের অন্তর্নিহিত চেতনা ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। এই চেতনার পরিবর্তনে মানুষের

দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়ে এবং এর ফলে মানবসমাজ বা মানব-ইতিহাস পরিবর্তিত হতে বাধ্য। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করেন না যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে। ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয় আমাদের অন্তরে নিহিত চেতনার পরিবর্তনের দ্বারা। এই চেতনাই ইতিহাসের চালকাশক্তি। শ্রী অরবিন্দ বলেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সাহায্যকারী ঘটনা হতে পারে মাত্র। মানুষ তার গতিশীল চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে পরিবেশকে তৈরি করতে পারে কিন্তু মানুষের চেতনার গতিশীলতা বাইরের পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। মার্কস কিন্তু এর বিপরীত কথাই বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, চেতনার অগ্রগতিতে মনুষ্য সমাজেরও অগ্রগতি ও পরিবর্তন হয়। সুতরাং মানুষের চেতনাই হলো ইতিহাস-গতির নিয়ামক। আধ্যাত্মিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকেই মনুষ্যকে নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির বিবর্তন ধারা এবং এইজন্যেই প্রয়োজন চেতনার ক্রমবিকাশ।

সামাজিক বিবর্তন ধারায় শ্রীঅরবিন্দ তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন -১) In fra-rational বা যুক্তিহীন স্তর ২) Rational বা যুক্তি-বুদ্ধির স্তর এবং ৩) Suprarational বা যুক্তিউর্ধ স্তর। এখানে বলা দরকার যে, উপরি-উক্ত তিন স্তরকে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্লেষণ করে আরও ছয়টি স্তরের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর The Human Cycle গ্রন্থে। এই স্তরগুলির নাম হলো প্রতীক যুগ (Symbolic Age), প্রতিরূপযুগ (Typical Age), সামাজিক যুগ (Conventional Age) যুক্তিবাদের যুগ (Rational Age), ব্যক্তিবাদের যুগ (Individual Age) ও মানস যুগ (Subjective Age) এ যুগগুলি নাম শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছেন জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কার্ল ল্যামপ্ প্রেকট নিকট হতে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, বিবর্তনধারার প্রগতি সরল রেখায় চলে না — চলে উর্ধ্বগতির বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়ে (in upward-moving cycles)।

উর্ধ্বগতির বৃত্তাকার আবর্তন

এই প্রগতি বা বিবর্তনধারা উদ্দেশ্যমূলক (Teleological)। পূর্ণতার আদর্শ হলো এর উদ্দেশ্য।

সূত্রনির্দেশ

১। রফিক উল্লাহ্ ঃ ইসলামের ইতিহাস
২। ভারত কোষ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৩। স্ট্যালিন ঃ Dialectical and Historical Materialism
৪। E. Stepanova : Karl Marx
৫। H. N. Sarkar : Marx and Marxism
৬। Manifesto of the Communist Party
৭। Emile Burns : What is Marxism?
৮। Dictionary of Philosophy : Progress Publishes Moscow
৯। শ্রীঅরবিন্দ ঃ The Human Cycle.
১০। কিশোর গান্ধী ঃ The Social Philosophy of Sri Aurobindo.

নজরুল রচনায় ইতিহাসবোধ

মোশাররফ হোসাইন ভুঁইয়া

মানব সভ্যতার বা মানব ইতিহাসের নিয়ামক তারই ধারণকৃত পুরুষদের কর্মকাণ্ডের প্রবহমান ধারা। সেই ধারায় তাকে টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে শয়তান, দৈত্য দানব এবং স্বগোত্রীয় শোষক নিপীড়কের বিরুদ্ধে। সংগ্রামের এই ধারাই ইতিহাসের দীপ্তিমান গৌরব। আর সেই গৌরবের উপর ভর করে একটি জাতির জীবনাদর্শ বা জীবন দর্শন গড়ে উঠে। সাম্যের কবি, আর্ত-মানবতার কবি, বিপ্লবের কবি, সর্বোপরি বাংলার স্বাধীনতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনায় তাঁর স্বপ্নের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেই সমাজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সঞ্জীবনী হিসেবে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমাদের আজকের আলোচনার বিশেষ লক্ষ্য নজরুল রচনায় ইতিহাসবোধের রূপায়ণ বর্ণনা করা, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা এবং তার মূল্য বিচার করা।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বৃটিশ-বেনীয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সত্যিকার অর্থে তখন বৃটিশ সূর্য মধ্য গগন থেকে অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়েছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আলোক আভা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমন সময় বৃটিশ বাংলার এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে নজরুলের জন্ম হয়। দারিদ্রের কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু পারিবারিক ও জাতীয় ঐতিহ্য, দেশ-বিদেশে পর্যটন ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ তাঁকে অত্যন্ত সচেতন করে তোলে। পরাধীনতার গ্লানিই তাঁকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। তাই স্বাধীনতার বাণী নিয়েই তিনি সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন। তিনি অত্যন্ত সমাজ সচেতন ও ইতিহাস বোধ সম্পন্ন ছিলেন। আর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল পুরোপুরি। তিনি বাংলার এমন এক সমাজ থেকে এসেছিলেন যারা একশো বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিধ্বস্ত, পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসেছিল।

নজরুল তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ব্যঙ্গ রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুধু মুসলিম জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যই রূপায়ণ করেননি, বরং শ্যামাসঙ্গীত হিন্দু ঐতিহ্যের ব্যবহারে

হিন্দু সমাজকেও যারপরনাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষ সকলের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্যে যেমন রয়েছে অতীত সাহিত্যের ভূমিকা, তেমনি রয়েছে অতীত ইতিহাস ও ধর্মের ভূমিকা। বলতে গেলে এগুলোই ছিল নজরুল সাহিত্যের প্রাণশক্তি। সাহিত্যিকগণ ইতিহাসকে নানাভাবে ব্যবহার করেন। উপমার প্রয়োজনে, জাতীয় মানসকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে, নিজের চিন্তাদর্শের ব্যাখ্যার জন্যে এবং উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার জন্যে। শুধু উপমাই ইতিহাসবোধ নয় বরং সমকালের রূপকে চিহ্নিত করার জন্যে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এ কাজটি অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। নজরুলের অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থই মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য রূপায়ণে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'শাতইল আরব', 'খেয়াপারের তরুণী', 'কোরবানি', 'মোহররম' ইত্যাদি এ চেতনার কবিতা। এগুলোর ভাবানুষংগ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত।

সমকালীন সমাজে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে দুদর্শা অবলোকন করেছেন সে দুদর্শা একেবারেই নতুন নয় অতীতেও ছিল। তিনি উল্লেখ করছেন অতীতের মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ বিপ্লব তাদেরকে সে দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বর্তমানেও শাসক শোষকের অক্টোপাস থেকে সেভাবে সংগ্রাম-বিপ্লবের দ্বারা মুক্তি পেতে হবে। তাঁর বিখ্যাত চল্ চল্ চল্ সঙ্গীতটির শেষ তিনটি স্তবক নিম্নরূপঃ

কবে সে খেয়ালী বাদশাহী
সেই যে অতীতে আজও চাহি
যাস্ মুসাফির গান গাহি
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাকরে তখত্ তাউস।
জাগরে জাগ্ বেহুঁস।
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ।

জাগিল তারা সকল
জেগে ওঠ হীণবল।
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।

ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি একটি দেশ ও জাতি ক্ষীণ-দুর্বল অবস্থা থেকে একদিন সবল শক্তিমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, ভাল অবস্থা থেকে দুরাবস্থায় নিপতিত হয়েছে, আবার অসহায় অবস্থা থেকে পরাক্রমশালী অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অধঃপতিত ও

পশ্চাৎপদ সমাজকে তারই দৃষ্টান্ত দেখাতে নজরুল রোম,গ্রীস, রাশিয়া ও পারস্যের কথা উল্লেখ করলেন এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ধ্বংসস্তূপ থেকে তারা যদি উঠে আসতে পারে তাহলে আমরা উঠে আসতে পারবোনা কেন? সুতরাং বাদশাহী বা রাজত্ব হারানোর দুঃখে অশ্রু নিস্কাশন না করে আবার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো। পতনের পর উত্থান এটাই ইতিহাসের গতিধারা। কাজেই আমাদের উত্থান ও বিকাশ ঘটবে। হতাশার কোন কারণ নেই। তাজমহলের উদাহরণ অতীতের সমুজ্জ্বল কীর্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচায়ক। অতীতের কীর্তিশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে যে নতুন জীবন ও প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর কবিতা ও গানে তা প্রাণময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুলের ইতিহাস প্রীতি অতীতের প্রতি সামান্য অন্ধ মোহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তিনি অতীতকে স্মরণ করছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে। তাঁর কবি দৃষ্টিতে ইতিহাস চির জীবন্ত। মহররম ও কোরবানির কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর উদগত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষ্ণাতপ্ত জীবনের উপর। কামালের কীর্তি ও তাঁর অনুসারীদের আত্মদানের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে স্বদেশের শহীদদের জন্যই তাঁর বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের?
আব্ জম্‌জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কলসী বিষের
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে
দেশ বাঁচাতে আপনারি জানশেষ করেছে
বেশ করেছে।

নজরুল কাব্যের ভেতর দিয়েই বাংলা কবিতা ও গান রাজনীতি আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবন ও জগতের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মূলে কাজ করেছে রাজনীতি। তিনি নবযুগ পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়তে লিখেছেন :

"নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁর হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু পরমাণু ক্ষিপ্ত হয়ে সাড়া দিয়েছে। আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে- "পোহাল বিভাবরী/পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।" এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশীর সুর রুশিরা শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্তান; জর্জরিত নিপীড়িত শৃংখলিত ভারতবর্ষ।

সমাজ সচেতন স্বাধীনতা পাগল নজরুল বুঝেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যে ভাবে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা পরাধীনতার শেকল কেটে বেরিয়ে আসছে একই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পক্ষেও মুক্তি লাভ করা একান্ত সম্ভব। তাঁর এই উপলব্ধি এই চেতনা দিয়েই তিনি লিখনীর উজ্জ্বল মশাল জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর

বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

নজরুল যথার্থভাবেই ভেবেছিলেন এবং বুঝেছিলেন সকল দুঃশাসক ও শোষকের জুলুম-নিপীড়ন থেকে উদ্ধার পাবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্র। এই শিক্ষা তিনি ইতিহাস থেকেই লাভ করেছিলেন। ফেরাউনের হাত থেকে মুছা নবী, জাহেলিয়া যুগের কোরেশদের হাত থেকে মুহম্মদ (সঃ) যুদ্ধ করেই নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করেছিলেন। ইতিহাসই তাঁকে শিখিয়েছিল অন্যায়-অত্যাচার রোধ করতে রাবণের বিরুদ্ধে রামকে, কংসের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকে, কৌরবের বিরুদ্ধে পাণ্ডবকে, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেন (রাঃ) কে লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াই -যুদ্ধের মাধ্যমেই মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী দুষ্টচক্রের হাত থেকে রোমীয়-পারসীয়দের মুক্তি ঘটেছিল। স্বৈরাচারী জারের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছিল নির্যাতীত রুশদের, গ্রীসের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছিল নিগৃহীত তুরস্কের। তাই তিনি আমাদের এই উপমহাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধই প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বিশ্বে আজাদী লাভের জন্য মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী, দেশ জাতি বা সম্প্রদায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মানব সভ্যতার আবহমান এ রীতি আজও বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও এভাবে যুদ্ধ করেই মানুষকে টিকে থাকতে হবে। তাই নজরুল যুদ্ধকে মানব জীবন-দর্শন বলে গণ্য করেছিলেন।

আর সেজন্য ব্রিটিশ বিরোধী সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির লক্ষ্যে আধুনিক সামরিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত নজরুল ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখাতেও এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর 'ব্যথার দান' উপন্যাসে দারা ও সায়ফুল মূলক রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর বেলুচিস্তান থেকে মধ্য এশিয়ার গিয়ে 'লালফৌজে' যোগদান এবং প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। নজরুলের আরো কয়েকটি গল্পের নায়ক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। যেমন- 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন' এবং 'ঘুমের ঘোরে' ইত্যাদি। 'বাঁধন হারার' নুরুল হুদা বিদ্রোহী সৈনিক নজরুলেরই প্রতিরূপ বলে মনে হয়। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার নির্দেশে নজরুল আনন্দে উচ্ছসিত হয়েছিলেন এবং সেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন।

ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষা এবং ইতিহাসবোধই তাঁকে এই তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়েছিল। তিনি তাঁর কাব্যসহ সকল সাহিত্য শাখায় এই মহান শিক্ষাকে মজবুতভাবে মিশিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করেন। পরিশেষে একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তাহলো এই, যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নজরুল আমাদের মাঝে এসেছিলেন এবং যে মহান ও গুরু দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাতে তাঁকে আমাদের 'স্বাধীনতার কবি' না বলে খুব সংকীর্ণ অর্থে 'বিদ্রোহী কবি' বললে আসল সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক যেমনিভাবে আসল সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক যেমনিভাবে আসল সত্যের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় ১৮৫৭ সালের মহান 'স্বাধীনতা সংগ্রামকে' সংকীর্ণ অর্থে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে।

বাংলায় গণসংগীতের জোয়ার ঃ ষাট ও সত্তরের দশক

জলি বাগচী

গণসংগীত বা প্রতিবাদীগান বা ক্রান্তিকারী সংগীতের আগেও শোষিত জনগণের সংগীত ধ্বনিত হয়েছিল। তবে সেগুলো মূলতঃ স্বদেশ চেতনা, দেশপ্রেম, পরাধীনতার গ্লানী ও বেদনা বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল। এই ধরনের সংগীতকে স্বদেশী সংগীত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে দেশাত্ববোধক সংগীতে ধর্ম, মাতৃকাশক্তি ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় চিন্তায়, ভাবনায় দেশের সামগ্রিক মুক্তির সাথে, শ্রমজীবি জনগণের মুক্তির সাথে শোষণমুক্তির মিলন ঘটেনি। গণসংগীতের জন্ম একটি বিশেষ লগ্নে যার সাথে দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস জড়িয়ে।

কোন সংগীতকে গণসংগীত বলবো, সমাজে গণসংগীত কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করছে এইসব নিয়ে ইতিপূর্বে যারা আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা রেখেছেন, তাদের ভাবনাও বক্তব্যের মধ্যে একটা মূলত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতামতকে মাথায় রেখে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর ও মেহনতী মানুষেরা সংগ্রামী চেতনা যখন আন্তর্জাতিক বোধে উদ্বুদ্ধ তখনই প্রকৃত অর্থে গণসংগীত তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

গণসংগীত মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের জীবনের কথা, সংগ্রামী চেতনা শোষণমুক্তির তীব্র আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। সেই কারণে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে গণসংগীতের ধারাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন যে ভাবে জোয়ার - ভাটা ও নানা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে গণসংগীতের ওপর তার ছাপ সেইভাবে পড়েছে।

৪০ ও ৫০-র দশকে মার্কসীয় গণসাংস্কৃতিক আন্দোলন যে সব সংগঠনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল, তারা হচ্ছে, — বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি। গণনাট্য সংঘ মূলতঃ নাটক ও সংগীত শিল্পীদের জন্য সংগঠন। সমসাময়িক ঘটনাবলী ছিল গণ সংগীতের বিষয়বস্তু যেমন —ভারতের সীমান্তে জাপানী আক্রমণ ও বোমাতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ নৌবিদ্রোহ;

হরতাল ও ধর্মঘট; তেভাগা ও তেলেঙ্গানার আন্দোলন; দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি।

৪০ ও ৫০ দশকের গণসংগীতের ওপর ইতিপূর্বে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তা থেকে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি, যেমন — সুধী প্রধান, ডঃ অনুরাধা রায়, ডঃ সুস্নাত দাস। আমার আলোচনার ভরকেন্দ্র হচ্চে ৬০ ও ৭০ দশকের গণ সংগীতের ওপর।

১৯৪৮-র পর থেকে কমিউনিষ্ট আন্দোলন একদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও অন্যদিকে বাম-বিচ্যুতি এই দুটোর টানাপোড়েনে ভুগছিল ফলে গণ সংগীত ও নতুন সমাজগড়ার অঙ্গীকার থেকে, সৃজনশীলতা থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। ১৯৫০-এ বিশ্বজুড়ে শুরু হল শান্তির আন্দোলন, ১৯৫২-তে কমিউনিষ্ট কর্মীরা নির্বাচনের ঘোরে আচ্ছন্ন। গণসংগীতেও শান্তি, নির্বাচন ইত্যাদির কথা সামনে চলে এসেছিল।

৬০-র দশকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ গণসাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যেও নানা প্রশ্ন, নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সোভিয়েত-চীন বিতর্কে জড়িয়ে ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভাজন সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও বিভক্ত করে দেয়। বিপ্লব প্রতি-বিপ্লবের কৃত্রিম সীমারেখা টেনে বিপ্লবী গোষ্ঠী ও প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীর তলায় একই সংসদ সর্বস্বতা থেকে গেল - শ্রেণী সংগ্রাম গড়ার প্রচেষ্টা সুদূরে চলে গেল। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনেও পড়লো ভাটা। সময় গড়িয়ে চললো, ১৯৬৬ সালে শুরু হল খাদ্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের শহীদ হয়েছিল, আনন্দ, নুরুল, আশীষ ও জব্বর। এই আন্দোলনকে ঘিরে সেই সময় বেশ কিছু গণসংগীত রচিত হয়েছিল। বলা চলে ৬০-র দশকের প্রথম উদ্দীপ্ত করার মত গণসংগীত। যেমন —

১) ও নুরুলের মা......
২) এ প্রাণের মূল্য তোকে দিতেই হবে... } গণনাট্য সংঘ।

৩) অন্ন চাই, অন্ন চাই....
৪) এতদিন তোর বুকের খুন.....
৫) অত্যাচারীর চাবুক... } ঋত্বিক।

১৯৬৬ সালে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব যার প্রভাব আমাদের দেশের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপরও পড়েছিল। তার পরিচয় আমরা পরবর্তীকালের গণসংগীতের মধ্যে পাই। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনকে পুঁজি করে করে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সেই সময় থেকে কমিউনিষ্ট দলের অভ্যন্তরে শুরু হয় নীতির লড়াই। তারই ফলশ্রুত হিসেবে ১৯৬৭ সালের 'মে' মাসে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে সংগঠিত হলো নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুদয় সেই সময় পিকিং রেডিও যাকে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' বলে অভিহিত করেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বাসী কবির

কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল

"উত্তরের পলাশফোটা মাঠে

এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ।।

সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদী যারা তেভাগা, তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনকে বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে চেয়েছিলেন তাদের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে কবি লিখেছিলেন

"বিরাট কালের অজ্ঞাতবাসের বৃহন্নলার বেশ ছাড়ি

গাণ্ডীবে টংকার দিল নকশালবাড়ী।"...

১৯৬৯ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি আবার হলো বিভক্ত। নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই সময় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে নতুন ধাঁচের, নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে অসংখ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক দ্বারা রচিত হলো গণসংগীত। তৈরী হলো ছোট ছোট গণসংগীতের দল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ সেই সব সংগীত বহুল প্রচার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ৭০-র দশকের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হলো। ১৯৬৮ সাল থেকে কল কারখানায় শ্রমিকদের ওপর যে সন্ত্রাস চলেছিল তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ, লড়াই-র রূপ পেল ১৯৭৪-র রেল ধর্মঘটে। ১৯৭৫ সালে জারী হল জরুরী অবস্থা — প্রকাশ্য আন্দোলন হল স্তব্ধ। কিন্তু গণসংগীত রচনা থেমে থাকেনি — যদিও তার সংখ্যা কম। ১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থা অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গে শুরু হল বন্দীমুক্তির আন্দোলন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর চারদিকে আগের চাইতে খোলামেলা পরিবেশ তৈরী হল। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০-র গোড়ার দিক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য গণসংগীত দলের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমস্ত গণসংগীত তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকার দরুণ জনসমক্ষে আসার সুযোগ পায়নি ১৯৭৭-এ সে বাঁধ ভেঙ্গে গেল — গণসংগীতের জগতে আসলো নতুন জোয়ার।

যাই হোক, ১৯৬৭ থেকে গণসংগীতের জগতে সৃজনশীল কাজে দুটো বিভাজন লক্ষ্য করা যায় যেমন এক, সরকারমুখী দুই, সরকার বি-মুখী। অনেকেই অবশ্য খুব সুনিপুণভাবে এই বিভাজনের দ্বিতীয় ভাগটির সৃজনশীল কাজের ওপর কোন রকম গুরুত্ব দিতে চান না এবং এড়িয়ে যায়। তবে ৬০ ও ৭০-র দশকের সত্যিকার গণসংগীতের সংকলন প্রস্তুত করতে হলে দ্বিতীয় বিভাগটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দেবার দরকার আছে বলে মনে হয়। ১৯৬০-১৯৮০-র গোড়ার দিক পর্যন্ত যে সব গণসংগীতের দল, বিভিন্ন ব্যক্তি সুরকার গীতিকার হিসেবে সামনে উঠে এসেছিল তাদের মধ্য থেকে স্থানভাবে স্বল্প সংখ্যকের কথা উল্লেখ করা হলো — (গণনাট্য সংঘ বাদে) ক্রান্তি শিল্পী সংঘ; ঋত্বিক; পথিকৃত; পদাতিক; অরণি; গণকিষাণ; অবহি; পুবের আওয়াজ; অগ্নিবীনা; ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার; ক্যালকাটা পিপলস্ কয়্যার; মাস সিঙ্গার; স্কুল অব্ পিপলস্ আর্ট; সমতান

ইত্যাদি।

১৯৬০-র দশকে কৃষকজীবন ও ১৯৬৭-র নকশাল আন্দোলনকে ঘিরে যে সব গান রচিত হয়েছিল তার কিছু নমুনা।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় ঃ
১) মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি
২) আমার মাগো তোর চোখে কেন জলের
৩) জন্মিলে মরিতে হবে রে
৪) দাবানল জ্বলুক, দাবানল
৫) বোকা বুড়োর পাঁচালী
৬) চেয়ে দেখ আজ ভারতের গ্রামে
৭) লাল হৃদয়ের লাল আগুনে
৮) রাইফেল তুলে বলছে যারা।।

সুরেশ বিশ্বাস :
১) অহল্যা গো মা জননী,

দিলীপ বাগচী ঃ
১) হিমালয়ের সোনা গলা জলের,
২) সুবর্ণ রেখার সোনা সোনা জলে,

মেঘনাদ ঃ
১) মোর জান প্রাণ ঐ লাল ধান,

কথা ঃ সমীর রায় ঃ
সুর ঃ অনুপ মুখোপাধ্যায়,
১) জননী গো কাঁদো,

কথা ঃ শ্যামসুন্দর বসু,
সুর ঃ অজ্ঞাত,
১) আগুন লেগেছে অগ্নিঝড়

কথা ঃ শান্তনু ঘোষ ঃ
সুর ঃ অজিত পাণ্ডে,
১) তরাই কান্দে গো,

কথা ও সুর ঃ মুরারী রায় চৌধুরী
১) ঝোড়ে হাওয়ায় খবর আসে,

কথা ঃ সমর বসু মল্লিক,
সুর ঃ প্রচলিত মুন্ডা,
১) কাটে না আঁধার রাত,

কথা ও সুর ঃ সাগর চক্রবর্তী ঃ
১) ফাঁসী দেওয়ার চাষী বধূ,

কথা ঃ রাজা চ্যাটার্জী,
সুর ঃ সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১) সোনা বৌ সোনা বৌ রে।

১৯৬০-৮০ দশকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের ওপর ভিন্ন স্বাদের গান ঃ

সুরেশ বিশ্বাস ঃ
১) বদল ডালো এ দুনিয়া, সমরেশ বন্দোপাধ্যায় ঃ
২) আমরা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মজদুর
৩) দুঃখের দিন মোদের আর
৪) আগে বড়ো আগে বড়ো মজদুর

৫) মজদুর কি হ্যায় জিন্দেগানী
৬) জীনা হ্যায় তো সব মিলকর,
সুবীর মুখার্জী,
মূল কথা ঃ ব্রেখ্‌ট, অনুবাদ ঃ রাজা মিত্র ৭) আমাদের জামা যখন ছিঁড়তে থাকে,
সুর ঃ জলি বাগচী, মূল গান ঃ ৮) Which side are you on
কোনদিক সাথী,
অনুবাদ ঃ সুনীত সেন,
কথা ও সুর ঃ নুর মহম্মদ ঃ ৯) জুলমো কি আগ মে ,
কথাও সুর ঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায় ১০) কারখানায় কারখানায়
১১) লড়াই করো .....

১৯৭৪ — রেল ধর্মঘটঃ
কথাঃ সুনীত সেন ঃ ১) আমরা রেলের মজদুর
সুর ঃ শর্মীলা রায় চৌধুরী,
কথা ও সুর ঃ অলোক সান্যাল ২) গুনগুনাইয়া ভোমরা ওড়ে ১৯৭৫ —
জরুরী অবস্থা ঃ
কথা ঃ নিবারন পণ্ডিত, ১) মুর্খ গীদাল...
সুর ঃ প্রচলিত (ভাওয়াইয়া)
কথা ঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায়, ২) ভয় পাসনে ছেলে,
সুর ঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায়,
কথা ঃ সজল রায় চৌধুরী ৩) বললেন মন্দিরা ঠান্‌দি...
সুর ঃ জলি বাগচী

১৯৭৭-র বন্দীমুক্তি আন্দোলন থেকে ১৯৮০র প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গণসংগীতের ছোট্ট তালিকা ঃ বন্দী মুক্তি আন্দোলন ঃ
কথা ও সুর ঃ বিপুল চক্রবর্তী ঃ ১) ওরা ভগত সিং-র ভাই,
কথা ও সুর ঃ অমিতেশ সরকার ২) চাইরে চাইরে চাই মুক্তি।
খরা ও বন্যা ঃ
কথা ও সুর ঃ বিপুল চক্রবর্তী ১) ও ম্যাঘ বৃষ্টি দে রে
২) কেন খরা ও বন্যা আসে বছর
কথা ঃ সুদী চক্রবর্তী ঃ ৩) আজি পরাণের বড় দুখ,
সুর ঃ প্রচলিত (জলপাইগুড়ী)
কথা ঃ পার্থ বন্দোপাধ্যায় ৪) আকাশে কালো মেঘ বৃষ্টি অবিরাম
সুর ঃ সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('৬ষ্ঠ-র দশক)

যুদ্ধ বিরোধী ঃ

কথা ও সুর ঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায় ঃ ১) যুদ্ধকে মুছে ফেলতে

কথা ও সুর ঃ অপরূপ রায় ২) আমরা সেইদিন চাইবো না যুদ্ধ

কথাঃ সজল রায় চৌধুরী ৩) ধ্বংসদূতের মৃত্যু এখন বাকী

সুর ঃ জলি বাগচী

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঃ

কথা ও সুর ঃ বিপুল চক্রবর্তী ঃ বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে।।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ঃ

কথা ঃ সজল রায় চৌধুরী ১) হাতে হাত রেখে,

সুর ঃ বিপুল চক্রবর্তী,

কথা ঃ সুবীর মুখার্জী ২) কলকি বাত ভুল যাও

সুর ঃ জলি বাগচী ও সুধীর মুখার্জী,

কৃষক আন্দোলন ঃ

কথা ও সুর ঃ বিপুল চক্রবর্তী ঃ ১) আন্ধারে কেগো

কথা সুর ঃ জলি বাগচী ঃ শুন শুন শুন সবে... (গম্ভীরশা-র ওপর ব্যালাড)

কথা ঃ সুবীর মুখার্জী এমন দ্যাশে জনম মোদের

সুর ঃ প্রচলিত (ভাওয়াইয়া),

বিবিধ ঃ

কথা ও সুর ঃ সমরেশ বন্দোপাধ্যায়ঃ যারা কাফেতে মোড়েতে বসে আছো....

কথা ঃ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিতে ...

সুরঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায়ঃ

কথা ঃ সুর (প্রচলিত)

সুবীর মুখার্জী দেখো আ গয়া ক্যায়সা জমানা (দ্রব্যমূল্য)

কথা ঃ সুর (প্রচলিত) সুবীর মুখার্জী,

কথা ঃ জর্জ মীরজাফর গোস্বামীঃ, আমি আগে করি পয়গম্বরের ..

সুর ঃ কাজী গানের সুর অবলম্বনে,

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ

কথা ঃ সজল রায় চৌধুরী ঃ কী অপূর্ব দিল্লীর মেলা ....

সুর ঃ প্রচলিত,

কথা ও সুর ঃ সাগর চক্রবর্তী ঃ হাতে আমার গণতন্ত্রের লাঠি,

কথা ঃ অপরূপ রায়, আজ তুঝে এক কহানী,

সুরঃ প্রচলিত (ভাংরা)।

একটা কথা চারপাশে প্রায়ই শোনা যায় যে, ৪০ ও ৫০ দশকের আর তেমনভাবে

গণসংগীত রচিত হয়নি বা যতটুকু হয়েছে তা শুধু ৪০ ও ৫০-র দশকের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কথাটা মনে হয় ঠিক নয়। কারণ ৬০ ও ৭০ দশকের গণসংগীত সংকলনের কাজ ইতিপূর্বে করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ৪০ ও ৫০ দশকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল যার পরিচালনায় ও সাহায্যে গণসংগীত সৃষ্টি, প্রচারও প্রসারের সুযোগ পেয়েছিল। অন্যদিকে ৬০ ও ৭০ দশকে কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার উদ্দোগ নিলেও বাস্তবে তা রূপ পায়নি। ফলে গণসংগীত কখন, কোথায় সৃষ্টি হচ্ছে লালিত পালিত হচ্ছে তার চেহারার কোন সার্বিক ছবি পাওয়া সম্ভব ছিল না। ৪০ ও ৫০ -র দশকে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল ব্রিটিশরাজ ও তদানীন্তন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্দে এবং গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছিল ঐ দিকে তাকিয়ে, আক্রমণের বর্শামুখ একদিকেই ঘোরানো ছিল। কিন্তু ৬০ ও ৭০ দশকের চেহারা ছিল ভিন্ন, কমিউনিষ্ট পার্টি দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত, আক্রমণের বর্শামুখ ছিল সুবিধাবাদ শোধনবাদ, সংস্কারবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, ৭০-র দশকে নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার ফলে, ধরে রাখার মত কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকার ফলে, সেই সময়কার গণসংগীতের ফলগুলো জোয়ারের টানে যা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছিল ভাটার টানে গুটি কয়েক দল ছাড়া বাকী গুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই সময় অনেকটাই স্বতস্ফূর্ত ও আবেগের তাড়নায় হয়েছিল। ৪০ ও ৫০র দশকে গণসংগীত জন্ম নিয়ে সংগীত জগতে নিজেকে পৃথক একটি ধারা প্রথিত করলো এবং সেই ঐতিহ্য এখনও প্রবহমান। তবে একটা মন্তব্য করলে মনে হয় ভূল হবে না যে, ৭০-র দশকেই গণসংগীত সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছুতে সমর্থ হয়েছিল।

বর্তমানে গণসংগীতের কৌলিন্য বেড়েছে বলে শোনা যায় এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোও গণসংগীতকে মর্যাদা দিচ্ছে। গণসংগীত আজ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের অবসর বিনোদনের বিলাসবহুল সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে। তবে গণসংগীতের জগতে নতুন নতুন বিষয় বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে যেমন — সমাজ মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, জাতপাত, সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের নিপীড়নের করুণ কাহিনী ইত্যাদি।

কিন্তু যখন ৮০-র দশকে সারা পৃথিবীব্যাপী কমিউনিষ্ট আন্দোলন মার খেলো সাথে সাথে গণসংগীতের জগতও খেলো প্রচণ্ড ধাক্কা, সৃজনশীলতাও কমলো। উদাত্তকণ্ঠে বিপ্লবের ডাক যা রাজনীতিতে রইল না তা গণসংগীতেও ধরা দিল না।

তবে এটাই শেষ কথা নয় — কারণ যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর সমাজবাদের তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। সুতরাং আপততঃ পিছু হটা থাকলেও, আপাততঃ স্তিমিত অবস্থা এবং ভাঁটার টান থাকলেও এই সময় টিকে থাকাটাই বড় কথা — আর টিকে থাকলে আবার আন্দোলনের জোয়ারে গণসংগীত নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে, নতুন নতুন সুরের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে, নুতন আঙ্গিকে শ্রমিক, কৃষক মেহনতী

জনগণের গান হয়ে উঠবে। সেটাই হবে সত্যিকার জীবনের গান।।

সূত্রনির্দেশ

১) সুধী প্রধান ঃ The Marxist Cultural Movement in Inda. V.I.

২) অনুরাধা রায় ঃ চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন

৩) সুস্নাত দাশ ঃ ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা।

৪) Hanns Eisler : A Rebel of Music.

৫) হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঃ লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ঃ বাংলা ও আসাম।

৬) জলি বাগচী ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি

৭) সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ঃ গণসংগীত সংকলন

৮) ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী দ্বারা প্রকাশিত ঃ নবজীবনের গান।

৯) সংগীত বার্তা — ১লা মার্চ, ১৯৮৫ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী

১০) জলার্ক ঃ বিশেষ সংখ্যা ঃ গণসংগীত - ১ ও ২ নম্বর

১১) অণীক ঃ " ঃ নকশাল বাড়ী

১২) " ঃ " ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

বোলান গানের রং পাঁচালীতে সমাজ ভাবনা

অসীম কুমার পাল

ইতিহাসের স্রোতে সদা প্রবাহমান বোলান সমসাময়িক বাস্তব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাই সমাজ-রাজনীতি বোলানে কোন প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়, তার অপরিহার্য বিষয়। বিশেষ করে বোলান গানের রং পাঁচালীতে থাকে নানা সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে মন্তব্য ও রঙ্গব্যঙ্গ। বস্তুত বোলান গানের পাঁচালী অংশ হল সর্বাংশেই সমাজ ভিত্তিক গান। এই গানের মাধ্যমে সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরা হয় জনসমক্ষে। এটাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন আখ্যানমূলক রচনামাত্রকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলা হত। আদিতে একটানা কাহিনীরূপেই এটা নৃত্য ও সংগীত সহযোগে পরিবেশন করা হত, ক্রমে তার মধ্যে গীতময় সংলাপ এসে প্রবেশ করেছে এবং সব মিলিয়ে পাঁচালী একটি লৌকিক রূপলাভ করেছে।[১] বোলান গানের পাঁচালী অংশে আমরা এই লৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করি।

বাংলার লোকজীবনে 'পাঁচালী' শব্দটি বিশেষ ভাবে পরিচিত। সত্যপীরের পাঁচালী, মানিকপীরের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি দেবদেবী ও ব্রতকথা কেন্দ্রিক পাঁচালী বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু এইব ক্ষেত্রে পাঁচালী শব্দের যে অর্থ, আলোচ্য বোলানের পাঁচালী প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্য নয়।

বোলানের ক্ষেত্রে এই পাঁচালী শব্দটি দুভাবে প্রয়োগ হয়। ১) মূলপালার কাহিনীকে শ্রোতাদের উপযোগী করে সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক উদাহরণসহ আরো ব্যাখ্যা করা; এগুলি যেন পালার পরিপূরক এবং ২) সমাজের নানা দোষত্রুটি বিষয়ে ব্যঙ্গধর্মী গান।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পাঁচালীকে রং পাঁচালী বলা হয়ে থাকে। বোলান গানের এই অংশটি তার অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বোলান গানের মূল পাঁচালী অংশে থাকে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যবিষয়ক আখ্যান আর এই রং পাঁচালীতে থাকে লৌকিক পাত্রপাত্রীদের সমাজবিষয়ক গান। রং পাঁচালীর ভাষাও মূল পাঁচালীর ভাষা থেকে আলাদা, রচনা হয় লঘু ভঙ্গিতে এবং গানগুলিও গাওয়া হয় লঘু সুরে। সমসাময়িক কোন কৌতুককর ঘটনা হয় এর প্রধান উপজীব্য। এছাড়া প্রেম বিষয়ক গান, যা সুগভীর প্রেম নয়, তাও

এই রং পাঁচালীতে গাওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের গান অনেক সময় সমাজ অনুমোদিত শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে যায়। আর থাকে নানা সামাজিক সমস্যা বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়। একান্ত সাম্প্রতিক ব্যাপার হলেও সেগুলি রং পাঁচালীর বিষয়বস্তু হয়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের বিবিধ সংগীত পর্যায়ে এই রং পাঁচালীর কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন "বোলান গান ও পাঁচালী গাওয়ার পর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কতকগুলি লঘু বিষয়ক পাঁচালী গাওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য সামাজিক জীবনের আচার ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ও নানাবিধ রসের কথা থাকে। ইহাদিগকে 'রং পাঁচালী বলে।'"[৩]

মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত একটি রং পাঁচালী তাঁর গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে, যার সূচনা হল ঃ

স্ত্রী।। যদি ভাল না লাগে তবে ভালোবেসো না।
ভালোবেসো না হে বন্ধু, কাছে এসোনা।।
পুরুষ।। ভালো যে বাসি না আমি, কি করে বুঝলে তুমি।
ভালোবাসায় কিসের কমি, পেলে নিশানা।।
স্ত্রী।। সপ্তাহ হইল গত, আছি চাতকিনীর মত।
এতদিন করলে নাথ, কার উপাসনা।।
পুরুষ।। করতে সাহিত নূতন খাতায়, গিয়েছিলাম কলকাতায়,
বিশ্বাস রেখো আমার কথায়, যেন বিশ আনা।।

এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর ভঙ্গিতে গানটি গীত হতে থাকে এবং শেষ কালে উপসংহারে শোনা যায়ঃ

পুরুষ।। বলো এখন কি করিব, কোন নৌকাতে দু পা দিব,
যা বলবে তা মেনে নিব, দাও হে মন্ত্রণা।।
স্ত্রী।। আমায় যদি বলতে বলো, পরের আশা মুছে ফেল,
মাথার জিনিষ মাথায় তোল, পায়ে ঠেলোনা।।
পুরুষ।। শক্তিহীন সতীশের বাণী, ধনির কথা ধন্য মানি,
বদন ভরে হরির ধ্বনি, দেনগো দশজনা।।[৪]

অঞ্চল ভেদে বোলান গানের রং পাঁচালীর আবার নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। এই রং পাঁচালী যেমন এককভাবে গাওয়া হয়, তেমনি দুজন বা দুয়ের অধিক চরিত্র মিলেও গাওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশের গ্রামগুলিতে যেমন মালিহাটি, কাঁদরা, টেঁয়া, বন্দিপুর, দক্ষিণখণ্ড,সোনারন্দি, প্রভৃতি জায়গায় প্রচলিত আছে দু-উক্তি পাঁচালী। নদীয়া ও বর্ধমানের গ্রাম গুলিতে আধ্যাত্মিক পাঁচালী গাওয়া হয়। বোলানপ্রিয় গ্রামগুলির শ্রোতারা বোলানের এই অংশটির জন্য নিজেদের পছন্দমত রং পাঁচালী গাইতে দলের লোকদিগকে অনুরোধ

জানায়, প্রতিটি দলের নিকট থাকে একাধিক রং পাঁচালী। তারা শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী রং পাঁচালী শুরু করে কখনও আধ্যাত্মিক ধরনের, কখনও সরস কৌতুকের, আবার কখনও সামাজিক সঙ্কটের বিষয় নিয়ে।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুর অঞ্চলের মালিহাটি গ্রামের বোলান রচয়িতা জহর দাস একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ভোজনের শেষে চাটনী না দিলে যেমন অতিথিদের খাওয়া পরিতৃপ্ত হয়না, তেমনি শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্যে রং পাঁচালী গাওয়া না হলে শ্রোতারা পরিতৃপ্ত হয় না।[৫] আবার ভরতপুর অঞ্চলের একডালিয়া গ্রামের বোলান রচয়িতা বিদ্যাসাগর ঘোষ বলেন, কবিগান করলে যেমন বোল করতে হয়, কীর্তনগানের পর যেমন কুঞ্জভঙ্গ, বোলানের পর তেমনি রং পাঁচালী হয়।[৬]

এই ধরনের পাঁচালী গাওয়ার পদ্ধতিও বেশ আকর্ষণীয়। মূল বোলানদাররা বোলান গান শেষ করে গাজনতলার আসরে গোল হয়ে বসে থাকে। এই সময়ে রং পাঁচালীর শিল্পীরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাজনার তালে নৃত্য সহযোগে গান শুরু করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বোলান দলেই থাকে নারীবেশী কিছু কিশোর ও যুবক সদস্য। গানের এই অংশে তারা দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখ্য ভমিকা গ্রহণ করে। পরিচিত সাধারণ জীবনের ঘটনা নিয়ে চটকদারী সুরে গান শুরু হয় ও বসে থাকা অন্যান্য বোলানদাররা সেই গানের দোহার করে। বোলানের মূল পাঁচালী অংশে পৌরাণিক পালার যে সীতা বা শৈবারা শ্রোতাদের এতক্ষন কাঁদিয়ে ছেড়েছিল এখন সেই সীতা বা শৈবারাই বোলানের এই অংশে শ্রোতাদের হাসতে সাহায্য করে, অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়।

প্রতিটি রং পাঁচালীর চরিত্র হিসেবে স্ত্রী পুরুষ তো থাকেই, আবার কখনও কখনও পুরুষে পুরুষেও রং পাঁচালী গাওয়া হয়। রং পাঁচালীর চরিত্রে যারা গান করে তাদের প্রত্যেকেরই চোখে থাকে রোদ চশমা, তা রাত বা দিন যাই হোক না কেন। এতে তাদের রৌদ্র নিবারণের থেকে লজ্জা নিবারণের ইচ্ছাই বেশী কাজ করে বলে মনে হয়। রং পাঁচালীর গানগুলি সাময়িকভাবে আসরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

সরস কৌতুকের একটি রং পাঁচালীর নমুনা হলঃ

ধুয়োঃ পুরুষ।। ভেবে মরি ও সুন্দরী তুমি এলে আমার বাড়ী,
আমার মনের বেদনা, তুমি কেন বোঝনা
একলা ঘরে কোনমতে থাকতে পারিনা।।

কলি - (১) পুরুষ।। আঁধার ঘরে হবে আলো, দূরে যাবে ভাবনাগুলো
সকল কথায় এলোমেলো হয় যে দেখনা।।

কলি - (২) মেয়ে।। আমার বয়স বড় কাঁচা, ভাল নয় প্রেম পীরিত মজা,
এইতো সবে কলার মোচা, আঁটা ছাড়ল না।[৭]

এই সরস কৌতুকের রং পাঁচালীতে রচয়িতা একটি কিশোরের প্রেম ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রী চরিত্রের মুখে সাবধানী বাণী শুনিয়েছেন, যে, কিশোর বয়সের প্রেমভালবাসা ভাল জিনিস নয়। এই ভাবে রচয়িতা সরস কৌতুকের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথাও শুনিয়েছেন বোলান শ্রোতাদের।[৮]

কেবল সরস কৌতুক নয়, বোলানের রং পাঁচালীতে সুগভীর প্রেমের বিষয়ও থাকে। একে আধ্যাত্মিক পাঁচালী বলা হয়। এই গান গুলি বিশেষ করে বোলানপ্রিয় গ্রামগুলির বয়স্ক শ্রোতাদের জন্য। এই গান গুলি হয় অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি স্মর্তব্য — "বাংলার লোকসংগীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সংগীতের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়না। রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত পুরানের আর কোন চরিত্র বাংলার প্রেমসংগীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই।"[৯] তবে এই ধরনের রং পাঁচালী' বলা হলেও আসলে এগুলিতে মানবিক প্রেমের সুখদুঃখের নানা দিকই প্রকাশ পায়। তাই এদের আবেদন আজো বহুব্যাপ্ত ও গভীর। এই রকম একটি বোলান গানের নমুনা হলঃ

পীরিতের কেমন রীতি তুমি তা জান না
বন্ধু, তুমি জান না
যে ফিরে ধবলীর সনে
পেলাম গো বড় যন্ত্রনা।।[১০]

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রং পাঁচালী রচিত হয়। কৃষ্ণ রাধার প্রেম বিরহ থেকে শুরু করে সেকাল একাল, দিদিমা নাতনি, বর্তমান সমাজে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, চাকরী করা মেয়েদের ও কলেজে পড়া মেয়েদের চালচলন, বধূ হত্যা, স্বামীর বিদেশ যাত্রায় স্ত্রীর অবৈধ প্রেম, পণ প্রথা, বেশী বয়সে বিয়ে, এছাড়া সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক সমসাময়িক নানা ঘটনা নিয়ে রং পাঁচালী রচিত হয়। এর সঙ্গে আছে বন্যা, খরা, ঝড়, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনা। রং পাঁচালীর সামাজিক তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। রং পাঁচালীর কোন কোন বিষয় স্থানীয় ঘটনা হয়েও বহুজনীন আবেদন লাভ করেছে। আধুনিক সমাজে বিবাহ সংকট, পণ প্রথা, বেকার সমস্যা, লোডশেডিং, খাদ্যাভাব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে রচিত রং পাঁচালী গুলি মোটেই সংকীর্ণ স্থানীয় চরিত্রের নয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত রং পাঁচালীর একটি নমুনা হল ঃ

যা ঘটে এবার ঊনষাট সালে
ভগবান পেতেছে কামান আসমানেতে কৌশলে
যা ঘটে এবার ঊনষাট সালে।
শ্রাবণ মাস ভরা / হল চাষের কাজ সারা
সুখী হয়ে বেড়ায় চাষা নিড়েয় বেচারা
যা ঘটে এবার ঊনষাট সালে।

ভাদ্র মাস গত/মাঠে ধান পাকে তত
বাজে কাজে মাঝে মাঝে বাজ পড়ার মত
ভগবান পেতেছে কামান আসমানেতে কৌশলে।[১১]

বীরভূমের লাভপুর অঞ্চল থেকে গানটি সংগৃহীত হয়েছে। কাছাকাছি বিশাল অঞ্চলে গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলার গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক কারণে চাষের ক্ষতির ফলে কৃষকদের অবস্থা কি ভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে তা এই রং পাঁচালীতে প্রকাশ পেয়েছে। খরার প্রকোপ প্রায় বৎসরই দেখা যায় এবং তার ফলে মাঠে ধানের কি রূপ অবস্থা হয় তার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন রচয়িতা। এই গান কেবল বীরভূম জেলার লাভপুর অঞ্চলের চাষীদের নয়, এ যেন সকল জেলারই গ্রামের চাষীদের মনের কথা এবং গানটি অতীতে রচিত হলেও এর বক্তব্য আজও আবেদনময়।

আবার বন্যা কবলিত গ্রামের মানুষের জীবনে কিভাবে অভিশাপ নেমে আসে তারও বর্ণনা রয়েচে রং পাঁচালীতে। ১৯৭৮ সালে তারা পশ্চিম বাংলায় যে বন্যার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর অঞ্চলে বন্যা কবলিত মানুষের দুঃখ যন্ত্রনা ফুটে উঠেছে এই গানটিতে (স্থানাভাবে গানটির মোট আটটি কলির কয়েকটি উদাহরণ রূপে উল্লেখিত হল।)ঃ

ধুয়া - হে হরি কালে কালে ঘটালে কি ঝকমারি
বন্যাতে দিলে হে ফেলে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ী।

কলি - ১
একজন নয় দুজন নয় বহু লোকে ঘর ছাড়া,
মনের দুঃখে শুয়ে শুয়ে গুনছে আকাশের তারা
হলরে ভাই সর্বনাশ বন্যাতে দিলে পাছায় বাঁশ,
চাষা ভূষি সব কুপোকাৎ হল যে পুরুষ নারী।।

কলি -৩
রিলিফ বাবু গ্রাম সেবক, বুকের উপর বসে
চাষী ভাইদের রিলিফটুকু সব নিচ্ছে শুষে
অধ্যক্ষ ভাই জোঁকের মত দুঃখের কথা কব কত
রিলিফের গম এলো যত, ঢুকালো তাদের বাড়ী।

কলি - ৫
মাঠ ঘাট সব ডুবে গেল হাগ্‌তে যাবার জায়গা নাই
কেউবা যাচ্ছে কলার মাড়ে, কেউ বা যাচ্ছে তালের ডুঙ্গায়।
বন্যাতে গেছে ঘর পড়ে, কেউ হাগচে চালের উপরে
কেউ ভাই মাচান করে, ধরে বসে কাবারী।।

কলি - ৭
চিন্তা করে বলুন দাদা, এসব কি সইতে পারে
কাঁসা পিতল সবই গেল বন্ধকী সুদ্ কারবারে
বাকি আছে চাল আর তুলো, তাছাড়া সব গহ্বরে গেল
গয়না বন্ধক দিতে হল, কেঁদে মল শাশুড়ী।

কলি - ৮ কোলে ছেলে পিঠে ছেলে, বলছে বাবা মা খাবো
আর কটা দিন থাম না গোপাল আই আর এইট্ লাগাবো।
বিবি আমার বলছে দুঃখে পাটে দে তেল ঢাল মুখে
কাজ কি বল বেঁচে থেকে জুটে না গলায় দড়ি।।[১২]

এই গানটিতে বোলান রচয়িতা এক দিকে যেমন বন্যা কবলিত গ্রামের মানুষের করুণ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন অন্য দিকে তেমনি সরকারী ত্রাণের ত্রুটি ও রিলিফ বাবুদের আচরণ তুলে ধরেছেন। আবার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় চাষীর কঠোর সংগ্রাম ও পারিবারিক জীবনের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নানা টানাপোড়েনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে গানটিতে। এ গানের আবেদনেও তাই রচনার স্থান ও কালকে অতিক্রম করে যায়।।

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ও নানা সামাজিক সমস্যা নিয়েও রং পাঁচালী রচনা করেন বোলান রচয়িতারা। কিন্তু এই ধরনের গানে রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ বর্ণনা থাকেনা পরিবর্তে সমাজের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার কথাই এর মধ্যে প্রকাশ পায়। বিনোদনই বোলানের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও এই ভাবে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর অঞ্চলের মালিহাটি গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত রং পাঁচালী উদ্ধৃত হল। এটি ১৯৭৮ সালে রচিত হয়েছিল। নতুন সরকারের ক্ষমতায় আসায় গানটিতে জনমনের আশার প্রতিফলন ঘটেছে।

কংগ্রেস সরকার হেরে গেল, হেরে গেল, জনতার কাছে,
খানিক বাজারের দর কমে গো গেছে, কমে গো গেছে,
খাজনা আজি যাদের ওগো, তিনগুণ ছিল, তিনগুণ ছিল,
জনতার দাবীতে দেড়গুণ হলো, দেড়গুণ হলো।।
গরমেন্ট কর্মচারীদের, মজা হলো তাদের, মজা হলো তাদের,
নতুন সরকার হয়ে গিয়ে বেতন বাড়লো তাদের
(আবার) বেকার ভাতা দেবে তাদের, চাকরি আজি নেইকো যাদের, নেইকো যাদের,
(বলছে) দশ বৎসরের মধ্যে বেকার কাউকে রাখবো না।।১৩

আবার অতি সম্প্রতিকালে রাজনৈতিক, সামাজিক নানা ঘটনা সম্বলিত একটি রং পাঁচালীর নমুনা দেওয়া হল যেখানে রচয়িতা সেই ঘটনাগুলো সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনজনের গাওয়া এই রং পাঁচালীটি হল (স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি কলি উল্লেখিত হল—সম্পাদক) ঃ

ধুয়া ঃ - হায়গো বর্তমানের সর্বস্থানের ঘটনা,
মাটি বিটি পাশাপাশী গোল বেঁধেছে দেখনা
কলি -৩ কয় দিন আগে শুনতে পেলাম সরকারের এক ঘোষণা,

সকল মানুষ সাক্ষর হবে নিরক্ষর আর রবে না
বিনা পয়সায় খাটতে হবে, কেমন করে খাটা যাবে
আপনারা সব বলুন ভেবে, আমার শুনিবারে বাসনা।
হয়গো বর্তমানে সর্বস্থানের ঘটনা।।

কলি -৫
কন্ট্রোলেতে দিচ্ছে চিনি, যৎসামান্য কেরোসিন
রাতে বেরতে পাস হয়ে যায়, মাঠে চলে পাম্প মেসিন।
নাইকো বেতন পাকা বাড়ী, রাতে দিনে হিসেব করি
আবার কেজিপ্রতি ১০০ মারি, পাকা বাড়ি হবে না।
হায়গো বর্তমানের সর্বস্থানের ঘটনা।।

কলি -৬
থানায় যিনি বড় বাবু বলতে কথা ভয় করি
যেকোন এক কেস পেলে ভাই মনটা খুশি হয় ভারী।
গোপনে হয় আলোচনা, টাকা ছাড়া কেস নেবেনা
মার্ডার করলে সাজা হয়না, আইন ধারা বুঝিনা।
হায়গো বর্তমানের সর্বস্থানের ঘটনা।।

কলি -১২
এই পর্যন্ত হল ক্ষান্ত, রং পাঁচালী ভাই সমাধান
সুভাষ ঘোষ গান বেঁধেছিল, যা চলছে ভাই বর্তমান
সুরখানা ভাই ছিল জানা, দরকারে হল না টানা
কড়েয়াতে সবার ঠিকানা, ভুলের করুন মার্জনা
হায়গো বর্তমানের সর্বস্থানের ঘটনা।।[১৪]

কেবল সরস কৌতুক বা সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মন্তব্যই শুধু নয়, বোলান রচয়িতারা বিনোদনের ছলে লোক শিক্ষার কাজেও লাগিয়েছেন রং পাঁচালীকে। এখানে বোলানের রচয়িতারা প্রচারকের ভূমিকা নেয়। আজকাল রেডিও, টিভি, প্রায় তিনটি পল্লীতেই পৌঁছিয়েছে। রেডি ও টিভি মাধ্যমে বোলানদাররা সাম্প্রতিক কালের বিষয়ে অবহিত হয় ও কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা ও প্রচারকে বোলান গানের বিষয় করে তোলে। গানের মাধ্যমে প্রত্যেক মাকে শিশুপালন সম্পর্কে, যথা পাল্‌স পোলিও সম্পর্কে, সচেতন করে তোলা হয়, ঠিক যেমন সাক্ষরতার গুরুত্ব বোঝাতে পুতুল নাচের পালা, জন্মনিয়ন্ত্রণ শেখাতে কবি তরজার লড়াই, শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে আলকাপের রচয়িতাদের প্রয়াস দেখা যায়।'

সাক্ষরতা যে ভাল জিনিস তা সকল শ্রোতার নিকট বোধগম্য করে তোলা হয় রং পাঁচালীর মাধ্যমে। ১৯৯৬ সালে পয়ার ছন্দে বাঁধা সাক্ষরতা বিষয়ক একটি রং পাঁচালী ঃ

শুনুন শুনুন সকল শ্রোতা শুন দিয়া মন
ভারতের সাক্ষরতা কেন প্রয়োজন।
বড় বড় মহাপুরুষেরই ভারত জন্মস্থান

দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন শহীদ ক্ষুদিরাম
বিদেশীরই অত্যাচারে ছিলাম পরাধীন
বহু তাজা প্রাণ দিয়ে পেয়েছি স্বাধীন.....
সাক্ষরতার জন্য এ দেশ পাগল কেন আজ
সাক্ষরতা ছাড়া দেশে হয়না মহৎ কাজ
চীন দেখ, রাশিয়া দেখ, দেখ ভিয়েৎনাম
সব দেশে দেখতে পাবো শিক্ষার উঁচু মান
সব দেশে উন্নতি আছে ভারতে দেখা যায়
লেখা পড়ায় ভারত শুধু পিছিয়ে শুধু যায়।[১৬]

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সকল রং পাঁচালীর যে একটি ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বোলান রচয়িতারা বিনোদনের ছলে এ কাজ করে থাকেন। বলা বাহুল্য তার সমাজ সচেতন মনই তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নেয়। আর সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত যে সব রং পাঁচালী রচিত হয়, সেগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হল সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি তুলে ধরা। এ ব্যাপারে তারা কোন সমাধানের পথ বাৎলে দিতে পারেনা বা রাজনৈতিক সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার মতো উচ্চকাঙ্খা নিয়ে গান গুলি রচিত ও গীত হয় না। এসব গানে আমরা পাই Critical realism । কিন্তু এর প্রভাব পড়ে গ্রাম্য মানুষের মনে। সামাজিক রাজনৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি গুলির কথা গানের মাধ্যমে শুনে ও নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের মিলিয়ে সমালোচক মন জেগে ওঠে।

তাই বোলান গান শুধু বিনোদন নয়, সমাজ মনের প্রতিফলনও বটে। যে সমাজের মধ্যে বোলানের সৃজন ও পরিপুষ্টি দীর্ঘদিন ধরে বোলান সেই সমাজেরই পরিচয় বহন করে নিয়ে চলেছে। বোলানের এই সমাজ-মনস্কতার জন্যই হয়ত সে বাইরের শত ঝড়েও ভেঙে পড়েনি বরং এই সমাজ থেকে রস আহরণ করে আজও বিবর্তিত হয়ে টিকে থাকতে পারছে।

সূত্রনির্দেশ

১) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ ৬৮৪।

২) শ্রী শ্রীহর্ষমল্লিক - বোলান কথা, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৩।

৩) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ৬৮৭।

৪) ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৬৮৭-৮৮।

৫) সাক্ষাৎকার - জহর দাস (বোলান রচয়িতা), মালিহাটি, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩-৫-৯৭।

৬) সাক্ষাৎকার - বিদ্যাসাগর ঘোষ (বোলান রচয়িতা), একডালিয়া, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩-৪-৯৭।

৭) শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিক - বোলান কথা, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৪-৭৫

৮) শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিক - বোলান কথা, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৫।

৯) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খন্ড), পৃঃ ৫৩৩।

১০) স্বপন মুখোপাধ্যায়, 'লোকগীতির অঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গ', নিরীক্ষক সহযোগ মুখপত্র।

১১) শ্রী শ্রীহর্ষমল্লিক - বোলান কথা, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৭৭।

১২) বোলান রচয়িতা বিদ্যাসাগর ঘোষের সৌজন্যে একডালিয়া, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৩) বোলান রচয়িতা জহর দাসের সৌজন্যে, মালিহাটী, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৪) বোলানের দলপতি জয়দেব চ্যাটার্জীর সৌজন্যে, কড়েয়া, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৫) ক্ষেত্র গুপ্ত - 'গনসংযোগ এবং লোকসংস্কৃতি', লোকসংস্কৃতি গবেষণা ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃঃ ৪২।

১৬) রচনা ঃ জহর দাস, মালিহাটি, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ বাঙালির আন্তর্জাতিক মননের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় (১৯৪১ - ৪৭)

সুস্নাত দাশ

১৯১৭ সালের নভেম্বরে জারশাসিত রাশিয়ায় বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট বিপ্লব বাঙালি মানসকে আধুনিক কালে বোধকরি সবথেকে বেশি নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৯-এর ১৪ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিশিষ্ট জাতীয়বাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেন। অবশ্য তারও পূর্বে রুশ বি প্লবের বিজয়লাভের সংবাদে উৎফুল্ল কাজী নজরুল ইসলাম করাচীর সেনানিবাসে উৎসবের আয়োজন করেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাঙালি তথা ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আজ জানা ইতিহাস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। পাঞ্জাবের বহু বিপ্লবী গদর পার্টির মাধ্যমে যেমন আমেরিকায় সক্রিয় ছিলেন তেমনি বার্লিন কমিটির মাধ্যমে জার্মানীতেও অনেক বাঙালি বিপ্লবী যেমন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা), ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা), অবনী মুখার্জি, জিতেন লাহিড়ি প্রমুখ সচেষ্ট ছিলেন। লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কথা কিংবা ১৯০৭ সালে স্টুট্গার্টে সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাদাম কামার ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে অবিস্মরনীয় বক্তৃতা ও ভূমিকার কথা স্মরনযোগ্য। পাশাপাশি স্মরনীয় বিপ্লবী প্রমথ দত্ত-র কথা যিনি দাউদ আলি ছদ্মনামে তুর্কী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। কিংবা জাপানে অবস্থানকারী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর এবং তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ' গঠনের (১৯২০) অন্যতম নায়ক (যিনি ছিলেন মেক্সিকোর কমিউনিষ্ট পার্টিরও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা) মানবেন্দ্রনাথ রায় (প্রকৃতনাথ ভট্টাচার্য) এর নামও এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কি ভাবে বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লববাদী নেতারা আন্তর্জাতিক

যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন সে ইতিহাস সকলেরই আজ জানা — তা পুনর্বার তুলে ধরা বর্তমান গবেষনা নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ভূমিকাংশ রূপে এই বিবরণটি সামান্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল বাঙলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম বা সেই সূত্রে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠনের পরিপ্রেক্ষিতটির সামান্য আভাস দেওয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালির আন্তর্জাতিক সংযোগ — চেতনা ও মননের যে সকল ঘটনা ঘটতে থাকে নানাভাবে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' (Friends of Soviet Union) প্রতিষ্ঠা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে তারই শেষ প্রচেষ্টা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এইভাবে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর [১] বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের একটা অংশের মধ্যে সাম্যবাদী প্রভাব ক্রমশ - বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির রচনা ১৯২০ এর দশকেই বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে (যেমন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'মা' উপন্যাস) জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। [২]অবশ্য বিপরীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মদতে সোভিয়েত ও কমিউনিষ্ট বিরোধী বিকৃত প্রচার ও এই সময় চলতে থাকে। রাশিয়ায় কমিউনিষ্টরা নারীদের জাতীয়করণ করে নিয়ে সকলে মিলে তাদের ভোগ করে কিংবা লেনিন সকালে কচি শিশুদের কাঁচা মুণ্ডু চিবিয়ে প্রাতঃরাশ সারেন- এইজাতীয় কিম্ভুত আষাঢ়ে গল্পও বহু লোকে বিশ্বাস করতো। এটি ছিল সোভিয়েত বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ারই একটি অঙ্গ।

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহন করা ছিল অনেকের কাছেই অচিন্তনীয় ঘটনা। অনেক হিতৈষী-শুভানুধ্যায়ী বা কমিউনিস্ট বিরোধী সে সময় কবিকে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে যেতে নিষেধও করেছিলেন, ব্রিটিশ প্রশাসনও এই ভ্রমণকে ভাল চোখে নেন নি — বিশেষতঃ সে সময় ভারতে চলছিল 'মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা'র মতন আন্তর্জাতিক ঘটনা — সবকিছু উপেক্ষা করেও তিনি রাশিয়ায় গেলেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) এবং লিখলেন সেই অমর বাণী : "আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০) প্রকাশিত হওয়ার পরেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বিরোধীদের ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও জনমত গড়ে উঠতে থাকে। 'পরিচয়' পত্রিকায় (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত) প্রকাশিত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কিত রচনাগুলি ও বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে (কমিউনিস্টদের বাইরে) সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সেখানকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কৌতূহলী ও উৎসাহী করে তুলতে সাহায্য করেছিল।[৩]

এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর পটভূমিকা রূপে এই মুখবন্ধর অর্থ এই নয় যে বাঙলা

ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রাজনৈতিক সচেতনতা, আগ্রহ বা উৎসাহ কিছু কম ছিল। ১৯১৭-র নভেম্বরে বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মাদ্রাজ থেকে একটি ইংরাজি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, 'দি লেসন্‌স ফ্রম রাশিয়া' নামে। তাতে লেখা হয়েছিল ঃ ''রুশ বিপ্লব ভারতে আমাদের অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করেছে।'' (ন্যাশনাল আর্কাইভ, হোম রুল সিরিজ নং ২৩, হোম/পল/নভেঃ, ১৯১৭) বোম্বাই প্রদেশেও এবং পাঞ্জাবেও রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি বহু ভারতীয় বিপ্লবীকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু অবিভক্ত বাঙলায় যেভাবে রাজনীতির পাশাপাশি শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে চিন্তার জগতে 'সোভিয়েত চর্চা' ১৯৩০-এর দশক থেকে শূন্য উদ্যানে শুরু হয়েছিল তা ভারতের অপর কোনো প্রদেশে ঘটেছিল বলে অন্তত আমার কাছে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। এটিকে একান্তভাবেই বাঙালির আন্তর্জাতিক মননের স্বকীয়তা রূপেই চিহ্নিত করা যায়।

দুই

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নাৎসী জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বে-আইনী এবং কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধর নীতি তখনও গৃহীত হয়নি। যুদ্ধের প্রকৃতি ও তার চরিত্র নিয়ে পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলেছিল ছয়মাস। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যেই বাঙলাদেশের প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিরা প্রায় প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমতই গঠন করার কাজে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাঙলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজের একাংশের মধ্যে সোভিয়েত একাংশের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি একটা উচ্চধারনা ও সহানুভূতি প্রথমাবধি ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়া পরিভ্রমণ' এবং 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশের (১৯৩০) পর বহু অমার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও রাশিয়া সম্পর্কে একটা ভালো ধারণার সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্টরা ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বেশ কিছু সচেতন মানুষ সেসময় বাঙলায় ছিলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার ঘটনাটিকে অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষী ছাড়া কারো পক্ষেই সমর্থন জানানো সম্ভব ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশেষতঃ জওহরলাল নেহরু নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত (২২ জুন, ১৯৪১) হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি গঠনের প্রারম্ভিক পর্বের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। হীরেনবাবু লিখেছেন ঃ ''কলকাতায় হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পৌছানো মাত্র আমরা কয়েকজন একটা বৈঠকে মিলিত হই।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব বন্দী রাধারমণ মিত্র এই সংবাদ শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে থাকে। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনক্রমেই হারতে পারে না — তাহলে ভারতের মুক্তির কি হবে?"[৪]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার একমাসের মধ্যেই ২১ জুলাই (১৯৪১), সোমবার, বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের উদ্যোগে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের এবং সাহায্য সংগ্রহের জন্য 'সোভিয়েত দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়েছে। এর একদিন পূর্বে অর্থাৎ ২০ জুলাই (১৯৪১) **মানব কল্যাণে সোভিয়েতের অবদান ঃ নাৎসী সামরিক অভিযানে পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বাংলার মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি' —** এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রায় একশত লেখক-শিল্পী ও মনীষীদের এক আবেদনমূলক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদ ছিলো এরকম ঃ "সোভিয়েত ইউনিয়নের ..... এই সংকটকালে আমরা মনে করি নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য।.........কুড়ি বৎসর প্রবল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন, তথাপি সোভিয়েতে অন্ততঃ আমাদের শুভ কামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি।"

এই ঐতিহাসিক বিবৃতি ও আবেদনের শেষে শতাধিক স্বাক্ষরকারীর প্রথমেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম বড় করে ছাপা হয়। এছাড়া তৎকালীন বাঙলাদেশের এমন খুব কমই আইনজীবি, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবি ও লেখক-সাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন নি।

এর আগের দিন ১৯ জুলাই (১৯৪৯) নিখিল ভারত কিষাণ সভার অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্যিক গোপাল হালদার লন্ডনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কির কাছে নিম্নলিখিত মর্মে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন।[৫]

এই প্রসঙ্গে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক নেপাল মজুমদার এর মতে স্বাক্ষরকারী বুদ্ধিজীবিদের অধিকাংশই ছিলেন অরাজনৈতিক এমনকি কেউ কেউ মার্কসবাদ-বিরোধীও। তথাপি ফ্যাসিস্ত বিরোধিতার গণমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে এঁদের আটকায় নি। বাঙলার সাংস্কৃতিক চৈতন্যর বিশ্বজনীনতার এটা এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

যাহোক, পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুসারে ২১ জুলাই (১৯৪১) সারা দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য 'সোভিয়েত-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলিই ছিল এর প্রধান

উদ্যোক্তা। ঐ দিনই 'সোভিয়েত-দিবস' উপলক্ষে কলিকাতা 'টাউন হল'-এ বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের একটি বিশাল জনসভা হয়। এই সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বা 'Friends of the Soviet Union'। এই সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠভ্রাতা, আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মার্কসবাদী পন্ডিত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্নেহাংশুকান্ত আচার্য নির্বাচিত হন যুগ্ম সম্পাদক রূপে, সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন মনোরঞ্জন রায়, ধীরেন ধর এবং সুনীল সেন এবং কোষাধ্যক্ষ হন তৎকালীন সময়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' স্বনামখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। অন্য যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সমিতির সদস্য হয়েছিলেন তঁরা হলেন মৌলবি সৈয়দ নৌশের আলি, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী, মীরা দত্তগুপ্তা, নির্মল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জ্যোতি বসু, শ্রীমতি কমলা দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি বসু, ডাঃ চারু ব্যানার্জী, মিসেস স্টেলা ব্রাউন, বিনয় ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চিরঞ্জীলাল স্রফ, বীণা দাশ, মিঃ এ. আর. মালিহাবাদী, এন দত্ত মজুমদার, আবু সৈয়দ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, মণিকুন্তলা সেন, বিবেকানন্দ মুখার্জী।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী "জানা গিয়াছে যে স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুকূল হইলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির পৃষ্ট-পোষকরূপে কাজ করিবেন। ... কলকাতায় এই সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগঠন কমিটিই সমিতির সদস্য সংগ্রহ করিবেন, শাখা সমিতি গঠন করিবেন এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিবেন।"[৯]

আমাদের দেশের মূলধারার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্তে 'ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' সংক্রান্ত কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না। অথচ হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে দেশের বামপন্থীদের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত, যামিনী রায় প্রমুখ বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক-শিল্পীরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

সন্দেহ নেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠন এবং তার কর্মোদ্যোগ ছিল সেইসময় বাঙলা তথা ভারতবর্ষব্যাপী পরিচালিত ফ্যাসিস্ত বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচার আন্দোলনেরই একটি অংশ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'জনযুদ্ধ' বা 'People's War' নীতি গ্রহণ করার বহু পূর্বেই বাঙলার বুদ্ধিজীবি সমাজ সোভিয়েতের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন — যা ছিল এক বিরল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং আন্তর্জাতিক চেতনার প্রকাশ। অবশ্য হীরেন মুখার্জির বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট যে এর পশ্চাতে তাঁর, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (ময়মনসিংহের রাজপরিবারের সন্তান), রাধারমণ মিত্র প্রমুখ কমিউনিস্টের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪১-এর ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নাৎসীবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী অবস্থাতেই কংগ্রেসের অভ্যান্তরে থেকে প্রচন্ড সংগ্রাম চালাচ্ছে। যুদ্ধের প্রকৃতি ও তার চরিত্র নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যান্তরে বিতর্ক চলেছিল প্রায় ছয় মাস। অবশেষে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধের লাইন' গ্রহন করে এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা না করার পুরানো নীতি থেকে সরে আসে। প্রধানতঃ কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠা 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (২৮ মার্চ, ১৯৪২) সেই সময়কালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' (F.S.U.)-এর কর্মসূচীতেও নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গতঃ এই দুটি সংগঠনই পরিচালিত হত ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের কার্যালয় থেকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী এই অবস্থান এবং সেই সূত্রে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করার সিদ্ধান্ত ছিল সেই সময়কালে জাতীয় আন্দোলনের প্রবহমান স্রোতের বিরুদ্ধে একটি অবস্থান এবং তা ছিল দুঃসাহসিক। এরই ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে কংগ্রেস প্রস্তাবিত 'ভারত ছাড় আন্দোলনের' বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে (এবং আজও) জাতীয়তাবাদীদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বমানবতার স্বার্থে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা (যার সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল বলে তৎকালে কমিউনিস্টরা সুনিশ্চিত ভাবে মনে করতো এবং বিষয়টি যে নেহাৎই স্বকপোলকল্পিত ছিল না তার প্রমাণ ও তথ্যাদি পরবর্তীকালে উদঘাটিত হয়েছে।[৭]

এটা সত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) প্রথমদিকে যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়ের সংবাদে ভারতের মতো একটি ব্রিটিশাধীন কলোনির অধিবাসীরূপে সাধারণ মানুষের, এমনকি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবির মধ্যেও চাপা আনন্দও উল্লাস প্রকাশ পেয়েছিল। হিটলার এবং মুসোলিনী সম্পর্কেও একশ্রেনীর মানুষের মনে অহেতুক উচ্চ ধারণা ও আশাবাদ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নাৎসী জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের সংবাদ এঁদের অনেকেরই মোহভঙ্গ করেছিল এবং ক্রমশঃ অধিকাংশ সচেতন ভারতবাসীর সমর্থন ও সহানুভূতি রাশিয়ার দিকেই ধাবিত হতে থাকে। কেন অধিকাংশ ভারতবাসী এই যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ কামনা করেছিল — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর এক যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'মর্ডান রিভ্যু'-তে নাতিদীর্ঘ অলোচনা করেন। (আগস্ট, ১৯৪১)।

তিন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্যর যুগ্ম সম্পাদকীয় নেতৃত্বে

'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র সাংগঠনিক কমিটি প্রথমে কাজ শুরু করে কলকাতার ২৭ নম্বর বেকার রোডে সমিতির স্থায়ী অফিস থেকে। ১লা আগস্ট (১৯৪১) এই অফিসেই অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভা। এই সভায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংঘের শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর অনতিকাল পরেই প্রথমে অবিভক্ত বাঙলার কয়েকটি জেলায় ও অঞ্চলে গড়ে ওঠে সংঘের ছোট বড় নানা শাখা কমিটি।

সাংগঠনিক কমিটি পর্যায়ে নানাধরনের প্রকাশনা ছিল সমিতির উল্লেখযোগ্য কাজ। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' তার প্রচার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 'সোভিয়েত সিরিজের' চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এগুলি হল বুদ্ধদেব বসুর 'সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি', গোপাল হালদার রচিত 'সোভিয়েত যুদ্ধের তিন মাস', বীনা দাস রচিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী' এবং ধরণী গোস্বামী-র 'সোভিয়েত কৃষক'। এছাড়াও 'সোভিয়েত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ' এবং 'সোভিয়েত কী লড়াই ওর হামারা কর্ত্তব্য (হিন্দি)' নামক দুটি প্রচারপুস্তিকা প্রকাশিত হয়[৮]।

গোপাল হালদার প্রণীত 'সোভিয়েত যুদ্ধের তিন মাস' (এই সিরিজের পুস্তিকা নম্বর ২) নামক যে পুস্তিকাটি সচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে (অন্যগুলি একেবারেই প্রায় দুষ্প্রাপ্য) তা সমিতির পক্ষ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ঃ দুই আনা। হালকা হলুদ রঙের কভার পেপারে ছোট একটি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে — কাস্তে — হাতুড়ি ও তারার। পুস্তিকাটিতে প্রকাশকাল নেই, তবে মনে হয় ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ এটির রচনা শুরু হয়েছিল ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৪১) যা পুস্তিকাটিতে লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় কভার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো সতেরো। চতুর্থ কভারে বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র উদ্দেশ্য ঃ

"দেশবাসীর মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তার নানা দিককার অপূর্ব সংগঠনের কথা, বিশেষ করে এশিয়াস্থ সোভিয়েত জাতিদের উন্নতির কথা জানানো — বর্তমান সোভিয়েত যুদ্ধের মূল কি, যুদ্ধ কিরূপ চলছে, এই যুদ্ধের ফলাফল সকল দেশ ও জাতির পক্ষে কি হতে পারে, দেশবাসীকে তা বোঝানো — ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায়, তার জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে সরাসরি যতটা সম্ভব সোভিয়েত রাষ্ট্রে আমাদের সাহায্য পৌঁছানো -" এরপর ছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' তে যোগদানের আবেদন।

১৯৪১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে কলকাতায় দুটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। একটি 'দি ল্যান্ড অব দি সোভিয়েতস্' (ইংরাজি) এবং অপরটি 'সোভিয়েত দেশ' (বাংলায়)। সংকলন দুটির প্রচ্ছদে দিমিত্রি শ্যাপলিমের তৈরি লাল ফৌজের দৃঢ়চেতা এবং গুরুগম্ভীর সংগ্রামী সৈনিকের প্রতিমূর্তির চিত্র মুদ্রিত করা হয়। হীরেন মুখার্জি লিখেছেন[৯] ঃ 'জওহরলাল নেহেরু তখন জেলে ছিলেন। তাঁর কাছে এই-সব পুস্তিকা পাঠানো হতো। পরে তিনি আমাদের বলেছিলেন যে

তিনি সেগুলো খুবই পছন্দ করতেন।' ইন্দোসোভিয়েত জার্নাল, নামে এইসময়ের পর থেকেই একটি ইংরাজি মাসিক প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করা হতে থাকে। প্রথম কয়েকমাস তার সম্পাদক ছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। পরে হ'ন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই জার্নাল থেকে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও ছাত্র-বুদ্ধিজীবি সমাজ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারতেন। আমাদের দেশে কমিউনিজমের সাফল্য প্রচারে জার্নালটির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যাইহোক ক'লকাতা থেকে নিয়মিত তিন বছর চলার পর জার্নালটি ১৯৪৪ সাল বোম্বাইতে স্থানান্তরিত হয়েছিল — কারণ এইসময় থেকে 'ফ্রেন্ডস্ অব সোভিয়েত ইউনিয়নে'-র সদর দপ্তরও বোম্বাইতে (বর্তমানে মুম্বাই) উঠে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে নভেম্বর মাসে (১৯৪১) 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র উদ্যোগেই নিখিল ভারত সম্মেলন আহ্বান করা হয় কলকাতায়। এই উপলক্ষে সোভিয়েত বিপ্লবের দিনটি অর্থাৎ ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনেক জায়গায় সভাসমিতি হয়, শোভাযাত্রা আর পোষ্টার-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৬ নভেম্বর পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দিনের সভাপতিত্বে। এই কনফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, রাধাকৃষ্ণাণ, অধ্যাপক কোশাম্বি, অধ্যাপক কে. টি. শাহ, অধ্যাপক ধ্যানচাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। সম্মেলনের সাফল্য ছিল আশাতিরিক্ত, সোভিয়েতকে উদ্দেশ্য করে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠাবার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল (পরবর্তীকালে নানা কারণে তা সম্ভবপর হয়নি)। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এই সম্মেলন থেকে সারা দেশে সমিতির কাজ চালানোর জন্য একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকটি প্রদেশ এমনকি সুদূর সিংহলেও (এবং কাশ্মীরেও) স্থাপিত হয়েছিল সমিতির শাখা। তখনও পর্যন্ত প্রাদেশিক কমিটিগুলি স্বায়ত্বশাসিত ভাবেই নিজ নিজ কাজ চালাতো[১০]।

'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন'-এর সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সর্বভারতীয় কিষাণ আন্দোলনের তরুণ নেতা জগজিৎ সিং। হীরেন মুখার্জি হন যুগ্ম সম্পাদক। বাংলাদেশের প্রাদেশিক কমিটির ও এই সময় থেকে রদবদল ঘটে। নতুন প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন (সদ্য) লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার এবং কমিউনিস্ট হয়ে আসা তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জ্যোতি বসু (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা)।

অবিভক্ত বাঙলায় জ্যোতি বসুর সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগঠিত অন্দোলনেরই সহযোগী রূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। বাঙলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই সমিতির কিছু কিছু কাজ হয়েছিল। ২৪ পরগণা, হাওড়া, বীরভূম, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি,

খুলনা, যশোর, নোয়াখালি — এই জেলাগুলির সঙ্গে প্রাদেশিক সমিতির নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, নদীয়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাগুলিতেও সমিতি গঠিত হয়েছিল। কলকাতা শহরে উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এলাকায় কাজের সুবিধার জন্য আলাদা কমিটি ছিল।

এইসকল অঞ্চলে সমিতির পক্ষ থেকে সভা, শোভাযাত্রা (যেখানে সম্ভব), ঘরোয়া বৈঠক এবং পাঠচক্রের ব্যবস্থা এবং প্রবন্ধ, প্রচার পত্র, বুলেটিন, পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় বাংলা ও ইংরাজি উভয়ভাষাতেই। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সর্বহারার শ্রেষ্ঠ নেতা' (স্তালিনের উপর রচিত পুস্তিকাটির রচয়িতা ছিলেন হীরেন মুখার্জি), 'ক্লেম ভরোশিলভ্' (বিখ্যাত সোভিয়েত সেনাপতিকে নিয়ে রচনা করেন মনসুর হাবিব)। এছাড়া ইংরাজি রচনাগুলির মধ্যে ছিল ঃ 'Europe against Hitler' (R.P. Dutt), 'China Calling' (Hiren Mukherjee), 'Freedom and second Front' (Bhupesh Gupta), 'US – A People's symposiumed' (Hiren Mukherjee), 'Soviet Schools Today' (Deana Levin), 'Light on Soviet Land' (Pat Sloan), 'Soviet Literature' (Nicolai Nikitin) প্রভৃতি।[১১]

প্রকাশনা ছাড়াও নিয়মিত পোষ্টার প্রদর্শনী এবং চিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থার করা হতো। ইতিমধ্যে 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখকশিল্পী সংঘ'-র সঙ্গে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র অফিস ও ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের (বর্তমানে লেনিন সরণী) স্থানান্তরিত হয়। মস্কোর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদপ্তরের খবরদারি ও বাধাদান সত্ত্বেও ৪৬ নম্বরের ঠিকানায় মস্কো থেকে অতি সুন্দর সুন্দর এবং পর্যাপ্ত সোভিয়েত সাহিত্য ও প্রচার পুস্তিকা, প্রদর্শনীর উপকরণ এবং যুদ্ধবিষয়ক ১৬ এবং ৩৫ মিলি মিটারের ফিল্ম প্রভৃতি আসতে থাকে VOKS এর মাধ্যমে ভক্সের বুলেটিন (গোড়ায় ছিল সাইক্লোস্টাইল করা) ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১১]

তবে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (FSU)'র সংগঠন গড়ার কাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তখনও সারা দেশে বেআইনী (পার্টি আইনসঙ্গত হয় জুলাই, ১৯৪২)। অথচ ফ্যাসিস্ত - বিরোধী এই আন্দোলনের এবং 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এরাই। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে এই কাজ করা ছিল খুবই কঠিন। অন্ততঃ ১৯৪২ এর জুলাইতে কমিউনিস্ট পার্টি আইন সঙ্গত না হওয়া পর্যন্ত।

এতদসত্ত্বেও সেইসময়ে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত নন এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের 'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' কাছে টেনে নিতে সক্ষমই শুধু হয়নি তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতাও লাভ করেছিল। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি.ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, হোমী ভাবা, ডি.ডি. কোশাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ,

ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর যামিনী রায় অনেকসময়ে সমিতির সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের স্বাক্ষরযুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হতো। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জওহরলাল নেহরু কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। সেইসময় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এক প্রতিনিধি দল জ্যোতি বসু, হীরেন মুখার্জী-র নেতৃত্বে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এই আন্দোলনে তিনি উৎসাহ প্রদান করেন।[১৩] এছাড়াও অন্যান্য অনেক অকমিউনিস্ট নেতা যেমন জে.সি. গুপ্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, আবুল হাসেম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সম্মেলনে যোগদান করতেম এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতপার্থক্য প্রকাশ করেও যুদ্ধে সোভিয়েতের রাশিয়ার বিজয় কামনা করতেন। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ.আই.সি.সি) এক বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত 'বীরত্বপূর্ণ লড়াই' এর প্রশংসা করেন। বস্তুতই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠনের পর থেকেই তা প্রকৃতই দলমত নির্বিশেষে এক ব্যাপক ভিত্তি লাভ করেছিল। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'জনযুদ্ধ'র ১৭ জুন, ১৯৪২ তারিখের সংখ্যায় একটি বিশেষ প্রতিবেদনে হীরেন মুখার্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

"সকলেই অবশ্য কর্মী নন। সভাসমিতি অনেকের ধাতে সয় না, বিপ্লবী আওয়াজ তোলা স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁরা অনেকেই সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই আজ ফ্যাসিজমের ছোবল থেকে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টায় সাধ্যানুযায়ী লাগতে চাইছেন। সাম্যবাদী কর্মীদের উপর নির্ভর না করে। যে ব্যাপক সমর্থন সমিতি প্রথম থেকে পেয়েছে, তাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই আজ প্রধান কর্তব্য।"

এই নীতি গ্রহণ করার ফলেই 'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাঙলার বাইরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রী হট্টে যে প্রথম সম্মেলনটি হয় তাতে ভাষণ দেন সাহিত্যিক ও কৃষক সভার নেতা গোপাল হালদার (১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪১)। সুরম্য উপত্যকা শিলং এও বিস্তৃত হয় সমিতির কাজ। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' এর একটি প্রতিনিধিদলের আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার কথা হয়েছিল এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, হুসেন জাহির (পরে ডাইরেক্টর জেনারেল, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) কে এজন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। বঙ্গীয় আইন সভার একমাত্র কমিউনিষ্ট সদস্য বঙ্কিম মুখার্জীর মস্কো যাবার কথা ছিল। কিন্তু নানান বাধার ফলে সেই যাত্রা বাতিল হয়। তবে ১৯৪৩ সালের ৬ই জানুয়ারি এফ.এস.ইউ-এর শ্রীনগর শাখার (কাশ্মীর) পথে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডি. পি. ধর (পরবর্তীকালে মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) একটি বার্তা প্রেরণ করেন। যুদ্ধের সময় ভারত থেকে প্রেরিত এই রকম অনেক

চিঠিপত্র ও বানী সোভিয়েত মহাফেজখানায় জমা আছে। এইসব চিঠিপত্র মস্কোয় পৌঁছোতো নানা দুর্গম পথে — প্রধানতঃ কাবুলের মধ্য দিয়ে।[১৪]

'ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েত ইউনিয়নের' পূর্নাঙ্গ সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় বোম্বাইয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রায় একবছর পরে বোম্বাই আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো। এফ. এস. ইউ - এর এই সম্মেলনে পৌরাহিত্য করেন শ্রীমতি বিজয়লক্ষী পণ্ডিত (পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত)। সরোজিনী নাইডু, এন.এম. যোশী, এস.এ. ব্রেলভি, খাজা আহমদ আব্বাস প্রমুখ বিশিষ্ঠ নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবি যোগদান করেন। প্রসঙ্গতঃ ১৯৪৪-এর ২১-২৩ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় লেখক - শিল্পী- বুদ্ধিজীবি - ক্রীড়াবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৪- এর বোম্বাই সর্বভারতীয় সম্মেলনে সম্পাদক নির্বাচিত হন আর এম জাম্বেকার । ইনি 'ইন্দো -সোভিয়েত জার্নালের'ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফলে এই জার্নাল ১৯৪৪ এর মে মাস থেকে কলকাতার পরিবর্তে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হতে থাকে — যা 'অল ইণ্ডিয়া ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখপাত্র রূপে কাজ করত। বস্তুত ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ১৯৪৪ এর নির্বাচিত কমিটিই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কাজ করে। ১৯৪৭ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির' বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা এবং সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু। বস্তুত এটা কোনো বিস্ময়ের বিস্ময় ছিল না। কারণ ১৯৪২ -এর আগস্টে জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারতছাড়' প্রস্তাবের মধ্যেই ব্রিটিশদের সামরিকমিত্র হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছিল।

বাঙালীর আন্তর্জাতিক মননে সোভিয়েত চেতনার সঞ্চারের এইভাবে নিঃসন্দেহে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বা 'ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছিল। বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়াত নেতা চিন্মোহণ সেহানবীশ যথার্থই বলেছিলেন যে "সোভিয়েত সভ্যতা, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ডর সঙ্গে বাঙলাদেশের মানুষের তখনও পরিচয় ছিল যৎসামান্য। .....তখনকার যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়ার মুখে সেদিন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির' বাঙলাদেশের মানুষের কাছে সোভিয়েতের রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে।"[১৬]

আর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট গবেষক ধনঞ্জয় দাশ সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ "'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির' মাধ্যমেই ভাঁটাপড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুণর্বার জোয়ারের বেগ সঞ্চারিত হল। .... আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সোভিয়েত সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমিতিই সেদিন বাঙলার জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবিদের ব্যাপক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।"

সূত্র-নির্দেশ

১. গৌতম চট্টোপাধ্যায়; সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন; কলকাতা, ১৯৯২; পৃঃ ৮ এবং ৮২ দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য সুস্নাত দাশ-এর নিবন্ধ 'ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব ঃ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩০-৪৭); ইতিহাস অনুসন্ধান-১৪; পৃঃ ৫৯৫; পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত, ১৯৯৯।

৩. 'পরিচয়' পত্রিকার সুশোভন সরকার সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'বাংলা সাহিত্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা'; সুস্নাত দাশ; বাংলা আকাদেমি পত্রিকা - ৯ দ্রষ্টব্য।

৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; কলোত্তীর্ণ সম্পদ' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা; ২০ জুলাই, ১৯৪১।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা; ৩১ জুলাই, ১৯৪১।

৭. প্রসঙ্গত কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবির নাম করা যায় যাঁরা কমিউনিজম পছন্দ করতেন না কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত জেনেও 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বা 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'-র সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে দ্বিধা করেন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত বিচারে। এঁদের কয়েকজন হলেন বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, যামিনী রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হুমায়ুন কবীর, কালিদাস নাগ, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, উদয়শংকর, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুস্নাত দাশ-এর 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা; কলকাতা, ১৯৮৯।

৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ভারত - সোভিয়েত মৈত্রীর ৪০ বছর স্মারক সংকলন; ১৯৮১।

৯. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০. সরোজ মুখোপাধ্যায় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' এবং জ্যোতি বসুর 'যতদূর মনে পড়ে' দ্রষ্টব্য।

১১. তথ্য সূত্র ৮ নং টীকার অনুসারী।

১২. তথ্যসূত্র ৯ নং টীকার অনুসারী।

১৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং জ্যোতি বসুর স্মৃতিচারণ।

১৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং চিন্মোহন সেহানবীশ এর সাক্ষাৎকার।

১৫. তদেব।

১৬. চিন্মোহন সেহানবীশ; ৪৬ নং ঃ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে; ১৯৮৬, পৃঃ ৪-৫।

১৭. ধনঞ্জয় দাশ; মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক; ১ম খণ্ডঃ পৃঃ উনত্রিশ।

সমরবাদ ঃ স্থান-কাল-পাত্রে

চৈতালী চৌধুরী

"Imperialism is the highest stage of Capitalism"— লেনিন সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে এটি হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় যেখানে বিভিন্ন বুর্জোয়া সরকারের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডেকে আনে যুদ্ধকে। অন্যভাবে ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যায় যে পুঁজিবাদ — এই তিনটি একই সূত্রে গ্রথিত।

যে কোন যুদ্ধের জন্য 'militarism' বা সমরবাদের আদর্শের প্রভাব একান্তভাবে অপরিহার্য। একথাও সত্যি যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই 'যুদ্ধ' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তা সে প্রাচীনকালে রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বসনিয়া হার্জেগোভিনা। তবে ১৮৭০ সালের পর থেকেই আমরা 'যুদ্ধ' সম্পর্কিত ধারণাটির গুণগত পরিবর্তন ঘটে যেতে দেখি। ইউরোপের ইতিহাসে ১৮৭০-১৯৪৫ এই সময়কাল প্রত্যক্ষ করেছে নানা ছোট-বড় যুদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (যথাক্রমে ১৯১৪ ও ১৯৩৯) এই সময় প্রায় প্রত্যেকটি দেশই বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে, স্থল-জল-নৌ — তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের মধ্যে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সৈন্যধ্যক্ষরা নিয়ন্ত্রণ করেছেন সরকারকে এবং সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে। ফলশ্রুতি হিসাবে ইউরোপ হয়ে পড়ে একের পর এক যুদ্ধে ক্লান্ত।

'Militarism' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'spirit, vendencies of the professional soldier' অথবা 'undue prevalence of military spirit or ideals' এই শব্দটিকে দুটি অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে সেখানে শুধুমাত্র 'war for wars sake' অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের লড়াই অথবা দুর্বল প্রতিপক্ষের উপর সবল প্রতিপক্ষের আক্রমণ। এবং এর পেছনে থাকে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা। কিন্তু যখন এই 'সমরবাদ' হয়ে ওঠে, নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার হাতিয়ার তখন তার ভিন্ন রূপ। যেমন ধরা যাক ভারতে বিংশ শতব্দীর দ্বিতীয় দশকে 'militarism' বা 'militant nationalism' -এর কথা, যখন যতীন দাস, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর মত দেশ প্রেমিকরা এই সমরবাদকেই তাদের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও এই সমরবাদকে যুদ্ধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, বরঞ্চ এটাকে একটা কৌশল হিসাবে ধরা যেতে

পারে; অথবা মনে করা যাক, ৪০-এর দশকের সেই উত্তাল সময়ের কথা যখন নেতাজী ডাক দিয়েছিলেন সশস্ত্র আক্রমণের, কিম্বা অতি সাম্প্রতিক কালের কারগিলের যুদ্ধে প্রাণ দিল যেসব সৈন্যরা — তাও তো সামরিক কৃৎ-কৌশলেরই সাহায্যে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তন হয় এই সমরবাদী চরিত্রের যা এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রায় সব দেশেই যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই। এক্ষত্রে সমাজতন্ত্রীদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় যারা একটি anti-war propaganda— তৈরী করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এর সঙ্গে যোগ দেয় মার্কসবাদীরা। প্রথম আন্তর্জাতিক গঠনের পর থেকেই কমিউনিস্টদের যুদ্ধে কিরূপ ভূমিকা হওয়া উচিত, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। তাঁরা অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে দুই স্বৈরাচারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করে। এক্ষেত্রে তাদের কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না, মার্কসবাদীরা সুনির্দিষ্ট ভাবে এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের সঙ্গে তারা সামাজিক ঘটনা হিসাবে যুদ্ধ নামক বিষয়টিরও অবলুপ্তি চান। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন কংগ্রেসে war-credit এর বিপক্ষে এবং নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে ভোট দেওয়ার দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৩০-র Parish Conference -এRosa Lukcembrug -এর নেতৃত্বে ঔপনিবেশবাদ ও সমরবাদের বিপক্ষে একটি Resolution (প্রস্তাব)গ্রহন করা হয়। ১৯০৭ সালে যখন Stultgart Congress অনুষ্ঠিত হয় তখন ইতিমধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। এই কংগ্রেসে যুদ্ধবিরোধী চারটি প্রস্তাবের খসড়া রচিত হয় যা পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত কোপেনহেগেন এবং বেসিল Conference -এ গ্রহন করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় আসন্ন যুদ্ধে প্রত্যেকটি সমাজতন্ত্রী দেশের কাজ হবে এই যুদ্ধকে তরান্বিত না করতে দেওয়া এবং যুদ্ধকে শেষ করার জন্য যুদ্ধ করা। কিন্তু এসব স্বত্বেও ১৯১৪ সালের ১৪ই জুন শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ যা চলে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে এর ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু ভারত তখন ছিল ব্রিটিশ কলোনীর অন্তর্ভুক্ত, সেক্ষেত্রে তাকেও যুদ্ধরত দেশ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছিল যদিও জার্মানীর বিপক্ষে ভারতের কোনরকম প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল না। অবাক কাণ্ড ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই নীতিকে সমর্থন জানায়। এই প্রেক্ষাপটে ' Militant Nationalist' দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যারা গোপনে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তারা এক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির সাহায্যও চেয়েছিলেন। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই যুদ্ধ তাদের কাছে 'Heavensent opportunity হিসাবে দেখা দেয়। তারা 'enemey of the enimies' বা শত্রুর শত্রু নীতি গ্রহন করেন। জার্মানী থেকে অস্ত্র আনয়নের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন, যদিও এ কাজে তাঁরা সফল

হননি। এখানে আমরা যে সমরবাদের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তা অবশ্যই গুনগত দিক দিয়ে পৃথক, অন্ততঃ এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের নামগন্ধও ছিলনা। অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে সমরবাদ সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীভূত নয়, এবং এর প্রেক্ষিত ও আলাদা।

১৯১৮ সালে মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে বোঝা গিয়েছিল যে জার্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ১৯১৯ সালে President Wilson বিখ্যাত ১৪ দফা দাবী পেশ করেন ভার্সাই নগরীতে। কিন্তু চুক্তির গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেখা গেল নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ - এর বীভৎস রূপ। সমরবাদের বিকৃতরূপ প্রত্যক্ষ করল পৃথিবীর মানুষ। প্রতিবাদে সোচ্চার হল সারা পৃথিবীর মানুষ। একই সময়ে যদি আমরা ভারতের দিকে চোখ ফেরাই, দেখা যায় একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে, অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে প্রতিবাদী আন্দোলন গুলি অনেক বেশী তীব্রতর (Sharpes) হয়ে উঠেছে। গান্ধীজী ইউরোপের নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করলেও একই সঙ্গে চেয়েছিলেন যে ইংরেজদের অবশ্যই ভারত ত্যাগ করা উচিত। কারণ ভারত স্বাধীন না হলে ফ্যাসিবাদের ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে জন্মভূমিকে বাঁচানো সম্ভব হবেনা।

এ সময়ে সুভাষ তাঁর অন্তরীন অবস্থা থেকে পালিয়ে গেলেন ভারত থেকে এবং গঠন করলেন আজাদ - হিন্দ - ফৌজ — তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জন্মভূমিকে স্বাধীন করা। কিন্তু তাঁর এই পথ অনেক জাতীয়তাবাদী নেতারই পছন্দ হয়নি। অনেকের মতে তিনি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই জাপান ও জার্মানীর মত দেশের কাছে সহায়তা চেয়েছিলেন, এবং সুভাষ যদি এ কার্যে সফল হতেন তা হলে হয়তো ফ্যাসিবাদের জালে ভারতও আটকে পড়ত। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্নই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে in theory বা in practice তিনি এই ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করেননি, তিনি ছিলেন একজন সমাজবাদী। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে সকল বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে সর্বপ্রথম কাজ ছিল যথাশীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশদের হাত থেকে তাঁর মাতৃভুমিকে মুক্ত করা। তিনি সশস্ত্র উপায়ে এই কাজ সমাধান করতে চেয়েছিলেন জাতীয় আন্দোলনের মধ্য থেকেই। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া না পাওয়ায় তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশদের যুদ্ধ- ক্লান্ত অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার কথাটি চিন্তা করেন। নিজ দেশকে স্বাধীন করার জন্য অক্ষ - শক্তির শুধুমাত্র সাহায্য চান, তাঁদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র কোন মোহ ছিল না অথবা ফ্যাসিজমের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না।

সমরবাদ 'Militarism' বা এর অর্থ সময় বিশেষে, দেশ বিশেষে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বদলে যেতে পারে। সবসময় এই মত গ্রহন করা যায়না যে সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদ একে অপরের পরিপূরক। মানবতা রক্ষার খাতিরে, নিজ মাতৃভূমির জন্য অনেক সময় 'সমরবাদ' কে গ্রহন করার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে 'সমরবাদ' অনেক

ব্যাপক অর্থ গ্রহন করে। সামরিক কর্মীরা এখানে শুধুমাত্র সংকীর্ন অর্থে সৈন্য নয় তারা দেশ প্রেমিক। কিন্তু এরই পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মত বিকৃত সমরবাদ আমরা কখনই সমর্থন করতে পারিনা। শুধুমাত্র যুদ্ধের জনাই যুদ্ধ এটা যেমন মেনে নেওয়া যায়না, তেমনই নিজ অধিকার রক্ষার্থে লড়াই, সেটা সম্পূর্ন আলাদা। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মনে প্রানে যুদ্ধবিরোধী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তিনি 'বিশ্বপাপ' বা World sin (war is a ratrifution visiting sinful society) বলে অভিহিত করেন, সেই তিনিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যখন Spain এর মত ছোট দেশটি ফ্যাসিবাদের পদসঞ্চারে দিশাহারা তখন মানবতাবাদী, বিবেকবান মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল ঃ

"Help the peoples front in spain, help the government of the people, cry in million voices, 'half' to reaction, come in millions to the aid of democracy to the succour of civilization and culture".

46

ওষুধের উপনিবেশবাদ ও আধুনিক বাংলা

সুব্রত পাহাড়ী

বিশিষ্ট ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন ইতিহাসের সংজ্ঞা নিরুপন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন,

History is indeed little more than the register of the crimes, follies and the misfortunes of mankind.[১]

বর্তমান নিবন্ধেও আশ্চর্যজনকভাবে বহুলাংশে গিবনের ধারনারই প্রতিফলন ঘটেছে। কারন 'ওষুধের উপনিবেশবাদ' কথাটির অর্থই হল- বিভিন্ন, ধরনের রোগ নিরাময়কারী জীবনদায়ী ওষুধ ও ওষুধের উপাদানগুলির উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য ও বাজারের উপর কোন কোন বিশেষ সংস্থা বা রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রন, যা পরিনামে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা বা রাষ্ট্রগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় এবং আমদানিকারী দেশগুলির চরম ক্ষতিসাধন করে। ওষুধের উপনিবেশবাদ বা ড্রাগ ইম্পিরিয়ালীজম কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেকটর জেনারেল ডাঃ হাফডান মালার তিনি বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলির অথনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রন এবং আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ্য করে বলেছিলেন এ হল ওষুধের উপনিবেশবাদ, এর কবল থেকে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।[২]

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মত একদা চিকিৎসা শাস্ত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র ভারতবর্ষও আজ ওষুধের উপনিবেশবাদের সবচেয়ে বড় শিকার। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সর্বনাশা ও ক্ষতিকর প্রবনতার কথাগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারনা।

(ক) এদেশে প্রচলিত ওষুধ বিজ্ঞানের ধারা ঃ

ভারতবর্ষে ওষুধ বিদ্যাচর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন। যুগযুগ ধরে এদেশের লোকজন রোগযন্ত্রনার নিরাময়ে আশে পাশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের ভেষজ, জান্তব ও খনিজ উপাদান নিয়ে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে, সে কারনে ওষুধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধিকাংশ আকরগ্রন্থগুলি যেমন অথর্ববেদ কৌশিকসূত্র, চরকসংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা,

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, রসরত্নাকর, দ্রব্যগুনসংগ্রহ ও জ্ঞানপ্রকাশ ভারতীয়দেরই রচনা। আবার বহু প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের নিম জায়ফল জৈত্রী ও দারুচিনি বিভিন্ন দ্বীপরাজ্যে রপ্তানি শুরু হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে, এদেশের শাসকেরা ছিলেন ভীষন ভাবে উৎসাহী কারন ওষুধ বিজ্ঞানের গবেষনার জন্য তারা বৈদ্য সন্তানদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করত এবং গবেষনার প্রয়োজনে রোমথা, স্বাস্থ্যবান কয়েদী সরবরাহ করত।[৫] প্রাচীন ভারতে ওষুধ বিজ্ঞান গবেষণা এমনই উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল যে শুধুমাত্র ওষুধের ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র আত্রেয় সম্প্রদায় (বনৌষধি ব্যবহারকারী) ও রসৌসধি সম্প্রদায় (ধাতব রসায়ণ ব্যবহারকারী) এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর মহামতি চরকের বিশিষ্ট শিষ্য জীবক বলেছিলেন যে তাঁর আশে পাশে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত লতা, গুল্মও বৃক্ষরাজিই কোন না কোন ঔষধিগুণ বিশিষ্ট।

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান এদেশে এলে এদেশের ওষুধ বিজ্ঞাপন আরো সমৃদ্ধ হয়। কারণ আফিং, মৌরি, কাবাবচিনি ও ত্রিফলা প্রভৃতির সেরেফ দাওয়া (কেবলমাত্র ওষুধ) এবং সালফা, সরবৎ মোরব্বা প্রভৃতি গেজায়ে দাওয়াইর (খাদ্য অথচ ওষুধ) ব্যবহার শুরু হয়। এই সময়েই কবিরাজ গোবিন্দ দাস সদর্পে ঘোষণা করছিলেন,

ন দোষানাং ন রোগানাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষনম্
ন দেশনাং ন বলিনাং কার্য্যং রস চিকিৎসতে।[৫]

অর্থাৎ দেশ-কাল দোক্ষ-দুষ্য, রোগ- রোগী ও ধাতুর (বায়ু পিত্ত ও কফ) প্রকোপ নির্বিশেষে ধাতব রসায়ণ ব্যবহারে সমস্ত ধরনের অসুখই সারে লক্ষণীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে জনগণের কল্যানসাধন, সেক্ষেত্রে শাসকবর্গ ও চিকিৎসক সম্প্রদায় উভয়েরই অবদান ছিল অপরিসীম, কিন্তু আধুনিক ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও ওষুধবিজ্ঞান দুটি বিষয়ই ঔপনিবেশিক সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। যা এক কথায় ওষুধের উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত।

(খ) ঔপনিবেশিক বাংলায় ওষুধের উপনিবেশবাদ ঃ—

ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে ওষুধের উপনিবেশবাদের সূত্রপাত ঠিক কবে? তা আলোচনা করলে দেখা যাবে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়া দখল করে সেখানকার খ্রীষ্টান প্রজাদের এলোপ্যাথি ব্যবহারে বাধ্য করার মাধ্যমেই এধরনের ঔপনিবেশিকতার সূচনা, কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াটি একটি পরিকল্পিত রাজনীতির রূপনেয় বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এক্ষেত্রে (১) ১৮৩৫ র ৭ই মার্চের অধ্যাদেশ (যাতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা চর্চার অবসান ঘটানোর নির্দেশ দেওয়া আছে।[৫] ১৮৩৬-র ১০ই জানুয়ারী মতান্তরে ২৮ শে অক্টোবর পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তকে শবব্যবচ্ছেদ করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ৫০ বার তোপধ্বনি

করে অভিনন্দন জানানর ঘটনা[৭] দেশীয় ভেষজ্যাবলী থেকে মূলবান ভেষজগুলির পরিচয়ও গুণাগুণ ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় অন্তর্ভুক্তি করণ, নামমাত্র মূল্যে দেশীয় ভেষজগুলি ইউরোপে পাঠিয়ে ওষুধ বানিয়ে উপনিবেশগুলির বাজারে বিক্রি করে দ্বিমুখী মুনাফা অর্জন[৮] এবং দেশীয় চিকিৎসা ব্যবসাগুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলে[৯] অচল করে দেবার ষড়যন্ত্রকে বিশেষ বিশেষ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এদেশে ওষুধ বিজ্ঞান চর্চাকে এবং রোগ ব্যাধিও মহামারী গুলির প্রতিরোধ ও প্রতিকার মূলক কর্মসূচিগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবহেলা করা। উদ্দেশ্য—তাহলে ইউরোপীয় ওষুধপত্রের বাজারে মন্দা নেমে আসবে। বিষয়টিকে আরো পরিস্কারভাবে বললে যা দাঁড়ায় তাহল — কোম্পানি এদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করলে এর ভেষজবিদ্যাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি। কারণ দেশীয় নিম, গোলঞ্চ, চিরতাও নাটাগিল ইউরোপীয় সিংকোনা, সরসপেরিলা ও, ইপকাকুয়ানুয়ার চেয়ে দামে সস্তা কিন্তু সমান ঔষধিগুন সম্পন্ন। কারণ ১ পাইট সরস পেরিলার দাম যেখানে ১ টাকা সেখানে দেশীয় চিরতা কিনতে প্রায় কিছুই লাগত না।[১০] অথচ সিংকোনা এবং চিরতা সমান গুণসম্পন্ন। সেজন্য কোম্পানি এক ঢিলে পাখী মারতে শুরু করল। অর্থাৎ নামমাত্র মূলে চিরতা নাটাগিল, ও কুচিলা কিনে ইউরোপের ওষুধ কোম্পানিগুলিকে চড়াদামে বিক্রি করা। আবার দেশীয় ভেষজজাত ওষুধ সস্তাদামে আমদানি করে চড়াদামে এদেশের বাজারে বিক্রি করা। যেমন উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ৩২ লক্ষ টাকায় কেনা বনৌষধি, ২ কোটি টাকার ওষুধ হয়ে এদেশে ফিরে আসত।[১১] সুতরাং লাভের অংক বেশ ঈর্ষা করারই মতো পরের দিকে এই মুনাফার কথা বিবেচনা করে এদেশের চাষীদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ করে আফিং সিংকোনা চাষে বাধ্য করে। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ শুধুমাত্র বাংলায় সিংকোনা চাষের জমির পরিমান দাঁড়ায় ১৫ হাজার একর।[১২]

এছাড়া আয়ুর্বেদীয় ভেষজ্যাবলী থেকে মূল্যবান ভেষজগুলির পরিচয় ও গুণাগুন ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণও ছিল ওষুদের উপনিবেশবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কারণ উইলিয়ম জোনস, রক্সবার্গ, গার্সিয়া ডিওটা ও হোয়াইট এনস্লের রচনা পড়ে সরকার জেনে গেছিল যে এদেশের ভেষজগুলি প্রবল ঔষধিগুণ সম্পন্ন এবং শুধুমাত্র আয়ুর্বেদীয় ভেষজ্যাবলীতেই এগুলির একটি সুসংবদ্ধ তালিকা দেওয়া আছে সেজন্য যদি কোনভাবে এগুলিকে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে ভবিষ্যতে এগুলির কৃতিস্বত্ব (patent) দাবি করা যাবে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ১৮৪৪-এ সম্পাদনা করলেন 'বেঙ্গল ফার্মাকোপিয়া' এবং ১৮৬৪-তে ডঃ ওয়ার্নিং প্রকাশ করলেন ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া ১৮৮১-র লণ্ডন ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসে এগুলিকে ফার্মাকোপিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়।[১৩]

এদেশের ওষুধের বাজারকে স্থায়ীও সুসংহত করার জন্য কোম্পানি দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিক বলে ঘোষণা করে এবং দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়ন সংক্রান্ত

সুপারিশকে 'তহবিলের অভাব' অজুহাতে কৌশলে অগ্রাহ্য করে। শুধু তাই নয়, একইভাবে মহামারী প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুপারিশগুলি কোম্পানির জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকর্তা আর. এম. মার্টিনের এড়িয়ে যাওয়া হয়।[১৪] সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ওষুধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন গবেষণাকেই তদানীন্তন ভারত সরকার উৎসাহ দেননি। বরং বিভিন্ন ধরনের মেডিক্যাল এ্যাকট (১৯১৬-র মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেসান এ্যাকট ও ১৯২৫-র পয়জন এ্যাকট) প্রণয়ণ করে দেশীয় চিকিৎসকদের প্রাকটিস বন্ধ করে দিতে চাওয়া হয়। একসময় আয়ুর্বেদীয় ওষুধে অ্যালকোহল মিশ্রিত আছে মিথ্যা অভিযোগে কয়েকজন কবিরাজকে গ্রেফতারও করা হয়।[১৬] দেশীয় প্রজাদের সস্তায় ওষুধ সরবরাহের জন্য ১৮৮১ নাগাদ কর্ণেল হেণ্ডারসন উড়িষ্যার নীলগিরিতে একটি কারখানা খুলে বিভিন্ন ধরনের রাসায়ণিক উৎপাদনের পরামর্শ দেন সরকার সে বিষয়ে আদৌ কর্ণপাত করেনি।[১৭] এমনকি ঐ একই উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে রাসায়নিক উৎপাদনের জন্য মেসার্স আর বাটর্নট সরকারি অনুমোদন চাইলে সরকার অনুমোদন দেননি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়- হেনরী ফিপস নামে জনৈক আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবী ওষুধ বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে ১ লক্ষ ডলার ভারত সরকারকে দিয়েছিলেন, সরকার তা ইকো-সায়েন্স সেন্টার নির্মাণে তা ব্যয় করে দেন।[১৮] একই ভাবে বোম্বাইয়ের গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজে ওষুধ বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে একটি শাখা খুলতে চাওয়া হলে সেই প্রতিষ্ঠানের ইংরেজ অধ্যক্ষ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দেন। এই ভাবে দেখা যাবে যে এলোপ্যাথিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ১৮৩৫-এ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলেও ওষুধের উপনিবেশবাদ কে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তি দেবার জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানে ওষুধ বিজ্ঞান চর্চার জন্য নতুন শাখা খোলা হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ১০০ বছর পরে।

(গ) ওষুধ শিল্প বা ফার্মেসী ঃ—

এবার আসা যাক ওষুধ শিল্পের কথায়। ঔপনিবেশিক বাংলায় কোম্পানি আমদানি ভিত্তিক ওষুধ নীতি অনুসরণ করে চললেও বাংলায় কোন ওষুধ শিল্প বা ফার্মেসী গড়ে ওঠেনি এমন নয় এ ব্যাপারে ১৮১২ থেকে বার্থগেট, স্মিথ স্ট্যানিষ্ট্রীট, রবিনসনও উইলকিনসন প্রভৃতি ডিরেকটর বিদেশ থেকে ওষুধ আনিয়ে দোকান পাতলেও বটকৃষ্ণ পাল, ঈশ্বরচন্দ্র কুন্ডু, ও কার্তিকচন্দ্র বসু প্রমুখ বাঙালী এই ব্যবসায়ে সামিল হন এবং পরে পরে ডেভিড ওয়লিডেই (১৮৭৮) কাশীপুরে রাসায়নিক কারখানা, খোলার পর থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, মিনার্ভা কেমিক্যালও ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রভৃতি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, বিশের শতকে আরো ব্যাপকভাবে ওষুধ উৎপাদন শুরু হয়। এগুলির মধ্যে বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইণ্ডিয়ান ড্রাগস, হিন্দুস্থান এন্টি বায়োটিক্স ও ইস্টইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ছিল প্রধান। শুধুমাত্র এলোপ্যাথি ওষুধই নয়, মার্টিন হনিগবার্গার, ডাঃ টনেরে, রাজেন্দ্র দত্ত, লোকনাথ মৈত্র ও মহেন্দ্রলাল সরকারের চেষ্টায় হোমিওপ্যাথি জনপ্রিয় হয়ে উঠলে কিং কোং আমেরিকা থেকে, এ. হিলার ইতালী থেকে,

রিঙ্গার ইংল্যাণ্ড থেকে এবং হ্যানিম্যান জার্মানী থেকে সরবরাহ করতে শুরু করে। পরে অবশ্য হোমিওপ্যাথি এদেশেই প্রস্তুত করা শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল হোমিওহোম, ইকনোমিক ফার্মেসী, শেঠএগুদে, এলেন, এবং কুণ্ড হোমিও হল ছিল প্রধান। ঔপনিবেশিক বাংলায় কবিরাজি ওষুধ উদ্যোগ ছিল আরো ব্যাপক। কারণ ১৮৩৬-এ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কবিরাজি চিকিৎসার উদ্দেশ্য প্রণোদিত অবসান ঘোষণা (ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ৫০ বার তোপধ্বনি করে) করলে আচার্য গঙ্গাধর রায় কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে এবং কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কলকাতা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় যে বিপ্লব নিয়ে আসেন, তার ফলশ্রুতি হিসেবে কলকাতা ও মফঃস্বলে গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় সি. কে সেন এন্ড কোং, ডাবর, মায়াপুর রসায়ন, সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ওষধালয় ও বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদিক ঔষুধালয় ও এন. এন. সেন এণ্ড কোং গড়ে ওঠে এরা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওষুধ বানিয়ে কৌটায় পুরে লেবেলজাত করে দেশ বিদেশে সাপ্লাই দিত। বিশের শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এদের কর্মচারী সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ১৫০০/২০০০ একইভাবে ইউনানী ওষুধ উৎপাদনেও ব্যাপক গতিশীলতা আসে এগুলির মধ্যে খালারি ফার্মেসী, গণি দারূখানা, রেহাতি দাবাখানা, জলিল ক্লিনিক ও ইয়াকুব ক্লিনিক ছিল প্রধান।[১৯]

ফলাফল ঃ-

প্রায় দুশো বছরের বেশি সময় ধরে ওষুধপত্রের অবাধ ব্যবসা, অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও ভেষজ উপাদানগুলির অবাধ লুণ্ঠন বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, মেধাক্ষেত্রে ও নৈতিকজীবনে চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। বর্তমানে এই সর্বনাশা প্রভাব আরো জটিলতর হয়ে একরকম দূরারোগ্য ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসতে হয় জনস্বাস্থ্যের কথায়। কারণ প্রচলিত এলোপ্যাথি ওষুধগুলি যদিও আশুরোগ নিবারক কিন্তু এগুলির বেশির ভাগই মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত। কারণ উপনিবেশগুলির বাজার সহজে জয় করার জন্য পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানগুলি নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার) সত্ত্বেও এধরনের ওষুধ উৎপাদন করে চলেছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মানুষের নজর কাড়ে কুইনাইন। ম্যালেরিয়া বা যে কোন বিষম জ্বরে এটি একটি অব্যর্থ ওষুধ বলে বিবেচিত, কিন্তু কুইনাইন বেশিদিন খেলে মাথা ঘোরা, স্নায়বিক দুর্বলতা ও যকৃতের নানাভাবে ক্ষতি করতে পারে। সেজন্য উনিশ শতকেই ইউরোপের (ইটালী)[২০] বিভিন্নদেশে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে তখন কুইনাইনের বাজার বেশ রমরমিয়ে চলছে শুধু মাত্র কুইনাইনই নয়, উনিশ শতকের ইউরোপীয় পোর্ট ব্রাণ্ডিও পারাঘটিত সমস্ত ওষুধ এবং বিশের শতকের অ্যানাবলিক স্টেরয়ড মিশ্রিত ম্যাক্সাফর্ম, এন্টারোকুইনল, স্ট্রীকনীন, ক্লোরাম ফেনিকল প্রভৃতি বহুপ্রচলিত ওষুধগুলি তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যুক্ত। কারন অ্যানালজেসিক ব্যবহারে পাকস্থলীতে ঘা, স্ট্রীকনীন ব্যবহারে মাথাঘোরা, স্টেরয়ড ব্যবহারে স্নায়বিক দুর্বলতাসহ নানাবিধ শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়[২১]। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা এগুলির উৎপাদনে

নিষেধ করেছে কিন্তু নাম পরিবর্তন করে এবং মোড়ক পাল্টে ওষুধ কোম্পানিগুলি দিব্যি এগুলির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে ৫,১৫০ টি সংস্থা এধরনের প্রায় ৭,৫০০ রকম ওষুধ তৈরী করেছে[২২]। এ ছাড়া বলকারক ভিটামিন, স্বাস্থ্যবর্ধক টনিক ও বিভিন্ন ধরনের জন্ম নিরোধক এবং ট্রাঙ্কুলাইজার ওষুধ তো আছেই। শুধুমাত্র এলোপ্যাথি ওষুধই নয় কবিরাজেরাও ওষুধে ভেজাল (চ্যবনপ্রাশে রাঙালু সেদ্ধ এবং পাচনে সোনাপুরি আটা)[২৩] দিয়ে কবিরাজি ওষুধে এলোপ্যাথি ওষুধ মিশিয়ে এবং হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীগুলিরও ওষুধে ডিস্টিল ওয়াটার মিশিয়ে বেচাকেনা করতে বিন্দুমাত্র বিবেকে বাধছেনা। তবে এধরনের অভিযোগ এলোপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রে যতটা গুরুতর বাকিদের ক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক নয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ওষুধের উপনিবেশবাদের প্রভাব আরো মারাত্মক। কারন এদেশীয় ভেষজ উপাদানগুলি নামমাত্র মূল্যে কিনে সরকার তা বিগত একশ বছরে বিপুল মুনাফা কামিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ৩২ লক্ষ টাকার কুচিলা ৩২ কোটি টাকার ষ্ট্রীকনিন হয়ে এদেশে ফিরে আসত[২৪] ১৯৫০ নাগাদ এদেশে আমদানিকৃত ওষুধের পরিমান ছিল ২০ মিলিয়ন ডলার[২৫] ভেষজ গুলির মুনাফা লক্ষ্যকরে কোম্পানি এদেশেই আফিং, সিঙ্কোনা ও সরস পেরিলার চাষশুরু করে। সেক্ষেত্রে দেশীয় চাষীদের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য তন্ডুলজাতীয় শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে ভেষজ চাষ করতে বাধ্য করা হয়। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলায় প্রায় ১৫ হাজার একর জমিতে সিংকোনা চাষ করা হয় এবং ২,২৫০ হাজার টন আফিং ভারত থেকে চীনে রপ্তানি করা হয়[২৬]। বর্তমানে এদেশে ওষুধ আমদানি করতে ১০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। লক্ষনীয় যে এই সমস্ত ওষুধ মানুষকে ব্যবহারে বাধ্য করার জন্য, এরা যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে চলেছে তাহল ডক্তার ও ওষুধ দোকানগুলিকে প্রলোভন দেখিয়ে (১০০ কার্টুন বিক্রি করলে ১০ কার্টুন ফ্রি কিংবা ১ বছর নির্দিষ্ট ওষুধটি প্রেসক্রিপসানে লিখলে হিরো হণ্ডা বা মারুতী ফ্রি) রাজীকরে। এছাড়া খবরকাগজে দূরদর্শনে কিংবা জনবহুল স্থানে হোর্ডিং তো আছেই। এছাড়া নানাধরনের প্যাথলোজিক্যাল টেষ্ট তো আছেই। প্রয়োজন হোক আর না হোক, কেস পাঠাবেন, পুষিয়ে দেবো। এভাবে ডাক্তারদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্লিনিকের সমঝোতায় রফা থাকে। এরফলে ডাক্তারেরা একের পর এক ওষুধের নাম এবং টেষ্টের নির্দেশ দিয়ে (প্রয়োজন হোক বা না হোক) প্রেসক্রিপশানে বিরাট কাহিনী সাজিয়ে দেন। ফলে একটু মারাত্মক ওসুখ হলেই রোগীকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। এরকম নৈরাজ্য বাংলায় এমনই জাঁকিয়ে বসেছে যে বর্তমানে বাংলার চিকিৎসা ব্যবসায় মানুষের আস্থা একেবারে চলে গেছে, কোন রকম রাহা খরচ যোগাড় করতে পারলেই বাঙালী প্রজারা দক্ষিণে এবং মন্ত্রী ও আমলারা বিলেত পাড়ি দিচ্ছেন।

ওষুধের উপনিবেশবাদ নৈতিকমূল্যবোধের অবক্ষয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে দায়ী। কারণ পশ্চিমী ওষুধের সঙ্গে খুব সন্তর্পনে যে অভিশাপ এদেশের চিকিৎসাজগতে ঢুকে

পড়েছে তাহল বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য, উত্তেজক পানীয় ও চেতনা নাশক ড্রাগ। প্রথমদিকে এগুলি নিদ্রাবর্ধক, আরামদায়ক ও শক্তি বর্ধক হিসেবে এদেশে আসে কিন্তু পরবর্তী কালে এগুলিতে মেশান ড্রাগ ধীরে ধীরে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। এধরনের কতগুলি ওষুধহল ম্যানডেকস, কেমপোজ, নাইট্রোসেন ৫/১০ ও টিউজিমিক প্রভৃতি[২৭]। আর মাদক বা ড্রাগ হল হোরোইন, ব্রাউন সুগার মারিজুয়ানা, কোকেন ও চরস প্রভৃতি। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৯০,০০০ যুবক যুবতী এবং পৃথিবীর ১৮ মিলিয়ন লোক মাদক সেবনে অভ্যস্ত।[২৮] আর ব্রাণ্ডি, হুইস্কি ও রাম প্রভৃতি উত্তেজক পানীয়ের ব্যবহার যে কি হারে বেড়েছে তা রাস্তার ধারে ওয়াইন মার্ট গুলিতে লম্বা লাইন দেখলে সহজে অনুমান করা যায়। শুরুতে এগুলি ডকটরস ব্র্যাণ্ডি বলে বিক্রি হত, বর্তমানে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মাদক সেবন অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বীকার করতেই হয় সে সোমরস, সিদ্ধি, গাঁজা, ভাঙ্গ ও পান-তামাকের ব্যবহার এদেশে বহুকাল আগে থেকেই ছিল কিন্তু ব্যবসায়ী মুনাফালাভের জন্যে মাদকের পন্য হিসেবে ব্যবহার ঔপনিবেশিক যুগেই শুরু হয়েছে।[২৯]

মেধা নিষ্ক্রমন হল ওষুধের উপনিবেশবাদের অন্যতম ক্ষতিকর ফলশ্রুতি। কারন বহুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় মুনি ঋষিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অকাতরে চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান বিতরণ করলেও কেউ কোনদিন এগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান বলে দাবী করেনি, কিন্তু কোম্পানি আয়ুর্বেদের মেটিরিয়ামেডিকা (নিদান) থেকে ব্রিটিশ ফার্মোকো-পিয়ায় এগুলি চুরি করার পর থেকেই নিম, হলুদ, সজনে শাক, করলা, বেগুন ও জামের কৃতিস্বত্ব বা পেটেন্ট বিভিন্ন দেশ দাবী করতে শুরু করেছে[৩০]। এক্ষেত্রে সরকার শুধু হলুদের পেটেন্ট রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, বাকীগুলো চিরদিনের জন্য হাত ছাড়া হয়েছে এ ব্যাপারে সরকার যদি আরো মনযোগী না হন, তবে রসুন, সজনে, থানকুনি, কুমড়া ও নাটাগিল সব যাবে এমনকি দারিদ্রের কারণে এ দেশের মেধাবী যুবকেরা একে একে দেশছাড়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে দেশীয় বিজ্ঞান ও দেশীয় ভেজষ যদি বিদেশীদের কুক্ষীগত হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময় এগুলি ব্যবহারের অধিকার, আমাদের থাকবে না। ফলে মেধা সম্পদ ও ভেষজ সম্পদ সবকিছুই হারাতে হবে।

এখন দেখা যাক ঔপনিবেশিক সরকার ও বর্তমান সরকার সমস্ত ব্যাপারটিকে কেমন ভাবে নিয়েছিলেন বা নিচ্ছেন। প্রথমেই বলতেই হয় যে কোম্পানি সরকার প্রথম দিকে এ বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৮৮১ নাগাদ ইউরোপে যখন প্রচলিত ওষুধগুলির মান নির্ধারণ করে ব্যবহার বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে তখন একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকারের যোগ সাজসে এদেশে সেগুলির ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে চলছে। ১৯২৫ শে জেনিভা কংগ্রেসে 'পয়জন এ্যাকেটর' প্রণয়ণ হলে ব্রিটিশ সরকার যদিও ১৯৩০-এ এদেশে অনুরূপ একরকমের এ্যাকট চালু করেছিল, তা ছিল একেবারে খাতা কলমে সীমাবদ্ধ। এরপর দেশ স্বাধীন হলে ১৯২৫ প্রণীত হয় 'দি হ্যাণ্ডবুক অব ড্রাগ ল' কিন্তু তাও ছিল

খাতা কলমে সীমাবদ্ধ, ইতিমধ্যে নানাপ্রকার ক্ষতিকর ওষুধে এদেশের বাজার ছেয়ে গেলে এবং ডাক্তার ও ফার্মেসীগুলিকে নানা ধরনের বদভ্যাস পেয়ে বসলে ১৯৭০-এ হাতী কমিটি কিছুটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা চেষ্টা করেন, কিন্তু সরকারের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনে সামঞ্জস্য না থাকায় এবং একশ্রেণীর আমলার পরোক্ষ মদতে বর্তমান ভারতবর্ষ ওষুধের উপনিবেশিকদের মুক্ত বাজারে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৭০,০০০ রকমের ক্ষতিকর ওষুধ খোলা বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে।[৩১]

সবশেষে যদি ওষুধের উপনিবেশ রদ সংক্রান্ত দুষ্ট ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেতে হয়। তবে সমস্ত বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে যেগুলি হল,

১. অধিকাংশ জীবনদায়ী ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করতে হবে।

২. প্রত্যেক ওষুধ বাজারে ছাড়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিতে হবে।

৩. উৎপাদিত ওষুধ মারাত্মক প্রমাণিত হলে উৎপাদনকারী ও অনুমতি দাতাকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে।

৪. দেশীয় ভেষজগুলির পেটেন্ট সংরক্ষনে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

৫. সমস্ত রকমের দেশী ও বিদেশী মাদক দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে

৬. প্রচলিত সব রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে সরকারকে যত্নবান হতে হবে।

৭. ওষুধের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে দেশবাসীকে সচেতন করতে হবে

৮. সরকার প্রণীত ড্রাগ ল'র সঠিক রূপায়ণ করতে হবে

৯. প্রচলিত রোগব্যাধি ও মহামারীগুলির প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের জন্য ভীষণ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

১০. ওষুধ বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে দেশীয় বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা বিদেশে চলে না যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১. Edward Gibbon :- The Decline and Fall of the Roman Empire, London 1913, Vol-VI,

২. Mike Muller : The Health of Nation : A North South Investigation, London, 1982 pp 19-20

৩. সুশীল রায় - বঙ্গপ্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ-১১০

৪. P.K. Sanyal : A story of Medicine and Pharmacy in India,

Calcutta, 1964, P-73

৫. আয়ুর্বেদভারতী ৪র্থ বর্ষ, ১৩৭১-৭২, পৃ-৫৬

৬. H. Sharp: Selection from Educational Records 1781-1839, Part I Cacutta, 1920, p 316

৭. W.C.B Eatwell: On the Rise and Progress of Rational Medical Education in Bengal, 1860, Calcutta, P-21

৮. অসীমা চট্টোপাধ্যায় ভারতের বনৌষধি, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ-৪২-৪৩

৯. Proceedings Municipal Dept (Medical Branch) April- 1901 no- 54

১০. The Friend of India - 7th December, 1854

১১. অসীমা চট্টোপাধ্যায়-পূর্বোক্ত

১২. Anil Kumar : Medicine and the Raj, Newdelhi, 1998, P-III

১৩. K.L. Dey : The Indigenous Drugs in India (2nd edition) Delhi, 1973, p xxxviii

১৪. R.M. Martin : The Indian Empire Product, London, vol-I pp 486-91

১৫. Proceedings Municipal Dept (Br Medical), September, 1908

১৬. আয়ুর্বেদ, আষাঢ়, ১৩২৫, ২য় বর্ষ, ১০ সংখ্যা, পৃ - ২৪০ দ্রঃ আয়ুর্বেদের উপর আবগারী

১৭. Anil Kumar op. cit p 112

১৮. তদেব

১৯. সুব্রত পাহাড়ী—উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ - সমগ্র

২০. A. B. Fry The First Report on Malaria in Bengal Cacutta, 1912, p-25

২১. চিকিৎসক, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১২৯৭, পৃ-৯৩, অনুবীক্ষণ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮২, পৌষ, পৃ-১৮৯, O.L. Wadeb L, Belly : Adverse Reactions of Drugs, London, 1976, Passim

২২. Indian Pharmaceutical Guide, Vol-34, New Delhi, 1996,pp 1-5

২৩. আয়ুর্বেদ, আশ্বিন-অগ্রহায়ন ১৩২৪, পৃ-১৩৫, চিকিৎসাতত্ত্বাবিজ্ঞান ও সমীরন ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ১৩০০-১৩০১,

২৪. অসীমা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত

২৫. S. B. Pradhan : International Pharmaceutical Marketing, U.S.A. 1983, pp-205-6

২৬. Ben Whitaker : The Global Connection: The Crisis of Drugs Addiction. London, 1987 p-17

২৭. V. V. Ghosh : Drug Addiction' in Science and Culture, Vol-65 no. 7-8. July. August, 1999, Caloutta, p-205

২৮. Ben Whitaker: op.cit-p-70

২৯. Ibid:p-18

৩০. The Statesman, 16 July, 1919, Friday, বর্তমান, ১৭ই আগষ্ট ১৯৯৯ দ্রঃ জনমত

৩১. কমলেশ সেন : ওষুধের উপনিবেশবাদ কলকাতা, ১৯৯১, পৃ-৬

স্বাধীনতা পূর্ব ডুয়ার্স এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

তনয় মণ্ডল
দেবাশিস নন্দী

রাজ্যে উঠিল তোলং-তোষং
নামিলেক বাহান,
কালাজ্বরে মরেছে মানষি
ধূমেরই মতন।
কাহারো মল্লেক বুড়ি মাঠ্যা,
কাহারো ছোট ভাই।
কালাজ্বরও মরিল মানষি
ন্যাখ্যা-জোখা নাই।।

(রাজবংশি সম্প্রদায়ের গৌরীনাথ বা গোরক্ষনাথের গান)[১]

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ডুয়ার্স ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পাণ্ডব বর্জিত এই অঞ্চলে আবহমান কাল ধরে ছিল গভীর ভিজে মাটির জঙ্গল বা 'ওয়েট মিক্সড' ফরেষ্ট। অধিক উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের দরুন মাটি ছিল স্যাঁতসেঁতে। এই অঞ্চলের বরফগলা জলে পুষ্ট নদীসমূহে প্রতি বছরই বন্যা দেখা দিত।[২] বন্যা অধ্যুষিত এই অঞ্চল ছিল কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, গুটি বসন্ত, গলগণ্ড, টেরাই ফিভার, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি মারণ রোগের বাসভূমি। প্রাক-চা শিল্প গড়ে ওঠার পূর্বে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব না থাকায় ঔপনিবেশিক সরকার এই অঞ্চল সম্পর্কে ছিল উদাসীন। শাসক শ্রেণীর এই উদাসিনীতার ফলে প্রাক-চা শিল্প পর্বে এই অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতীর গতি ছিল খুবই মন্থর। পর্যাপ্ত সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকলেও এই সময়কালে এই অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসিরা নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কারের মাধ্যমে উল্লিখিত মারণ রোগ গুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল।

রাজবংশি, মেচ (বোড়ো), কোচ (রাভা), ইত্যাদি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত

এতদঅঞ্চলে রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও একটি অন্তর্নিহিত মিল লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যা গরিষ্ঠ রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গান এবং প্রবাদ-বচনগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। যেমন-

খায়্যা দায়্যা কোঁকায়
কুম্বা দিয়া ঝোকায়।

অর্থাৎ, এখানে বলা হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার পর যদি কারো কোঁকানী এবং কাঁপুনি শুরু হয় তাহলে সেটা জ্বরের পূর্ব লক্ষণ বলে ধরে নিতে হবে। এই প্রবাদটি থেকে এটাই মনে হয় যে, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এই অঞ্চলের মানুষ রোগটির নাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলেও তার লক্ষণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই জনগোষ্ঠির মানুষ জ্বরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জ্বরকে চারটি ভাগে ভাগ করতেন - ১) ভাণ্ডী জ্বরা- রাজবংশি ভাষায় ভাণ্ডি কথার অর্থ ভাল্লুক। অর্থাৎ, ভাল্লুকের যেমন হঠাৎ হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে এই রোগেরও অনুরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ২) বাতা জ্বরা - এই জ্বরের লক্ষণ হল, 'দেহাবাতানী' অর্থাৎ দেহের পেশীতে প্রচণ্ড ব্যথা সঙ্গে জ্বর থাকবে। ৩) গরম-জ্বরা - হঠাৎ করে শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসবে এবং কিছুক্ষণ পরে তাপমাত্রা কমে গিয়ে প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে যাবে। এবং ৪) অহ-জ্বরা- সারা দিন অল্প অল্প জ্বর থাকবে এবং রাত্রে তা বৃদ্ধি পাবে। এই চার প্রকার জ্বরের কারণ হিসেবে রক্ত দূষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গ জ্বর সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের মানুষের ভীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত প্রবাদটির মধ্য দিয়ে-

পার্বতী আজা বান্ধ-ঘর,
নাউ না দিলে হবে জ্বর,
দ্যাও বায় একটা নাউ।

এখানে পার্বতী রাজা ভীতির সঞ্চার করে বলছেন যদি তাকে লাউ না দেওয়া হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জ্বর হবে। এখানে উল্লেখ্য জ্বর থেকে অব্যবহতি পাওয়ার জন্য 'দ্যাও' অর্থাৎ জ্বর দেবীর পূজা হত বা 'স্যাবা' দেওয়া নামে পরিচিত ছিল। এছাড়াও স্থানীয় কবিরাজদের দেওয়া লতা-পাতার পাচন রোগীকে খাওয়ানো হত।

মশা অধ্যুষিত এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে মশারীর প্রচলন ছিল। একটি গানের (মেছেনীর গান) মধ্যে দিয়ে যার প্রমাণ মেলে।

ছাতির তলত মুশুরী টাঙ্গানু রে,
তারে তলত শুইয়া নিদ্রা গেনু রে।

এই গানের মধ্য দিয়ে মশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা থাকলেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যার থেকে মনে হতে পারে যে, তারা মশা বাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিল।

রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হাড়ী' জাতির মহিলারাই' দাইয়ের কাজে লিপ্ত ছিলেন। শুধুমাত্র মহিলারাই এই কাজে লিপ্ত ছিলেন তার প্রমান নিম্নোক্ত শিশু ভোলান ছড়াটির

মধ্যে পাওয়া যায়।

চাতরী মাই, চাতরী মাই
তোর মাও কোঠে গেইয়ে?
ঝাল্লা মাথাত দিয়া
নাড়ী কাটির গেইসে।

সেই সময় দাইয়েরা কিভাবে প্রসব কার্য সম্পন্ন করতেন তার একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় মেছেনীর গানের মধ্য দিয়ে।

দাইয়ানী আসিলেক বাড়ী,
আরো পাছে পাটার বন্দী,
নয় ভূতি কড়ি, বুড়ি চাইর নেঙ্গুল সূতা দিয়া
বান্দিলেক নাড়ীর গোট
কাটিলেক ছুচকিনী দিয়া।

অর্থাৎ দাই পাট (যা তুলার কাজ করত), ভূতি (যা আগুন জ্বালানোর কাজ করত) নিয়ে প্রসব করাতে যেতেন। চার আঙ্গুল পরিমান সূতো দিয়ে নাড়ীর গোট বাঁধা হত। নাড়ী কাটা হত ছুচকিনী বা বাঁশের ধারালো চাটা দিয়ে। প্রসব কার্য সমাধা হলে দাই নব জাতকের গলায় একটি মাদুলী পরিয়ে দিতেন এবং স্তন দুগ্ধ পান করাতেন। এই কারণে দাইকে মাতৃত্বের সম্মান দেওয়া হত। রাজবংশি সমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ বচন থেকে ব্যাপারটি পরিস্কার হয়।

পত্তি মানষি তিন মাও
গাই, ধাই, নিজ মাও।

গুটি ব্যারাম (বসন্ত) রোগের প্রাদুর্ভাবও এই সময় দেখা যেত। কবিরাজ চিকিৎসা করলেও 'খ্যাবা' দিয়ে মন্ত্রপূত 'ঘোট' বা ঘট-এর ওপরে একটি বাতি দিন-রাত রোগীর ঘরে জ্বালানো থাকত। রোগ সেরে গেলে গারামের' থানে পাঁঠাবলীর রেওয়াজ ছিল। এছাড়া রোগীর বাড়িতে দিনের বেলা কেউ যেত না। রাত্রিবেলা আত্মীয়স্বজন দেখা করতে যেত। এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সত্যপীরের পূজা দিত এবং শ্রীবৎস চিন্তার গান গাওয়া হত।

রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে কলেরা রোগ ধূম নামে পরিচিত ছিল। ডি, এইচ,ই স্যাণ্ডারের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় কলেরার হাত থেকে বাঁচার জন্য চণ্ডী ঠাকুরাণীর পূজা দেওয়া হত। পূজায় ছাগ এবং মোষ বলি দেওয়া হত। পূজারী পূজোর সময় তাঁর বাঁ পায়ে দুধ ঢালতেন। সেই চুঁইয়ে পড়া দুধ একটি পাত্রে গৃহীত হত। সেই দুধ সারা গ্রামে ছিটিয়ে দিলে ঐ গ্রাম থেকে কলেরা দূরীভূত হবে বলে বিশ্বাস করা হত। ওষুধ হিসেবে লবন পড়া, চিনির সাথে মিশিয়ে অনেক জলে ফোটানো হত। তার পর সেই জল মাটির হাড়িতে ঠাণ্ডা করে রোগীকে বারে বারে খাওয়ানো হত।

সেই সময় 'ধাহেন' নামে একটি রোগের কথা জানা যায়। যার লক্ষণগুলির মধ্যে

গলা ব্যথা, খেতে বা পান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা থেকে অনুমান করা যায় ডিপথেরিয়াই রাজবংশিদের কাছে 'বাহেন' নামে পরিচিত ছিল।

রাজবংশিদের মধ্যে যৌন রোগ হিসেবে 'মেহ' ছিল অন্যতম। কেউ এই রোগাক্রান্ত কি-না তা বুঝতে একটি কলাগাছের ওপরের অংশ কেটে তার গোড়ায় মূত্র ত্যাগ করতে হত। যদি ঐ গাছ নতুন করে গজিয়ে না উঠত তবে মূত্র ত্যাগকারী ব্যক্তি মেহ রোগাক্রান্ত বলে প্রমাণিত হত। এই রোগের লক্ষণগুলি ছিল শারিরীক দুর্বলতা এবং যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই রোগে আক্রান্ত হত।

উপরি উক্ত রোগগুলি ছাড়াও ঘ্যাঘ (গলগণ্ড), কাউন (জন্ডিস, দু'ধরনের মাটিয়া কাউন এবং হলুদ কাউন), গোহেলী (পক্ষাঘাত), পিলাই (যার লক্ষণ ছিল পেট ব্যথা, বমি, হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি), সাওঝারা (আমাশা), ডাকা (কৃমি সংক্রান্ত রোগ) প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের কথাও জানা যায়। প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে ঠাকুর দেবতার ওপর যেমন নির্ভর করা হত, তেমনি ওঝাদের ঝাড়-ফুকের ওপর বা স্বপ্নাদেশের ওপরও নির্ভর করা হত। মুষ্টিমেয় কবিরাজ লতা-গুল্মের সাহায্যে পাচন জাতীয় ওষুধ দিতেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নির্ভর করা হত পূজা, মন্ত্র শক্তি, ঝাড়ফুক, তেলপড়া, জল পড়া প্রভৃতির ওপর, এই সংক্রান্ত প্রচলিত মন্ত্রগুলির কোন অর্থ নেই। এবং এতে কোন উপকার পাওয়া যেত কি-না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। এই সময় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত এই অঞ্চলের গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ মন্ত্র, ঝাড়ফুক প্রভৃতির ওপর শুধু যে নির্ভরশীল ছিল তাই নয়, তাদের গভীর বিশ্বাস বোধও এর পেছনে কাজ করত। কীট দংশনের মন্ত্র হিসেবে প্রচলিত ছিল

হরি হরি বৈকুণ্ঠ হরি, জোটাই সোনা, টোটাই সোনা।
ভাটি ছারি উজান ধাইল, ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাইল,
শির বঙ্গুং গরুর পাও।
বন্দী করিবি কামাখ্যা মাও।

তেল পড়া হিসেবে প্রচলিত ছিল —

ইজুজু টিজুজু ক্যান্যার আসিল জিভ
মন্তে হাংদিনু, মন্তে পাংদিছ
স্বপনের ত্যালেডে জিউ বসাহু। প্রভৃতি

এই ধরনের আরো বহু মন্ত্র সাপের বিষ নামানো, সুখ প্রসব সহ বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হত। প্রসঙ্গত রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 'আখেরা ছাওয়া' ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থা রোগীর রোগ নির্ণয়কারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার আবার দুইটি পর্যায়। প্রথম পর্যায় 'আখেরা দেখা'। এই পর্যায়ে ওঝা ভুত, প্রেত, অপদেবতা সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কি অসুখ হয়েছে এবং কিভাবে সেই অসুখ সারবে। কিংবা আদতে সেই অসুখ সারবে কি-না। এমনকি রোগী আদৌ বাঁচবে কি-না তাও ওঝা এই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জানতে পারতেন। দ্বিতীয়

পর্যায়টি পরিচিত ছিল 'আখেরাচালী' নামে। যখন দেখা যেত ওঝার কোন মন্ত্র বা ওষুধে কাজ হচ্ছে না তখন ওঝা 'আখেরা চালীর' বিধান দিতেন। এই বিধান দেওয়ার পর আর কোন চিকিৎসা করা হত না। তার মৃত্যু অবধারীত ধরে নিয়ে বাড়ীর লোকজন তাকে ভালমন্দ খাওয়াতো, কোন কিছু জানার থাকলে জেনে নিত। সেই সময় 'ছলনা' বা স্ট্রোকেও মানুষের মৃত্যু হত। তবে সেই সময় বিশ্বাস করা হত যে রোগীর ওপর হঠাৎ করে দেবতা ভর করায় ঐ দেবতার কোপেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

এতদঞ্চলে সেই সময় মেচ, কোচ, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। এর পেছনের দারিদ্রতাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন দেবদেবী, সংস্কার এবং ওঝাদের ঝাড়ফুঁকের ওপরই তারা আস্থাশীল ছিল। রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ অসুখ-বিসুখ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের আরাধ্য দেবী 'রুণতুকের' কাছে মানত করত। বোড়ো জাতির মধ্যে 'ঘ্যাঘ' বা গলগণ্ড রোগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেত। তাদের বিশ্বাস ছিল হাত মুখ না ধুয়ে খেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেচ জনগোষ্ঠির লোকদের প্রসব করানোর কাজ করতেন 'যাঁথীন খল্‌মগ্রা' অর্থাৎ ধাই। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর নাড়ী কাটা হত। কাটা অংশে তুলো, পাট বা এন্ডি সিল্ক সূতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। এবং অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ছাই বা শুকনো মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হত। অরণ্যবাসী কোচ ও রাভাদের অধিকাংশ মানুষের ছিল জীর্ণ-শীর্ণ তাতে অপুষ্টির ছাপ ছিল স্পষ্ট। এর পেছনে কারণ হিসেবে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশেষতঃ বর্ষাকালে তাদের গৃহপালিত পশু শূকর, গরু, হাঁস, মুরগীর মল মূত্রে ও বাসস্থানের কাদায় সমস্ত বস্তিগুলো নরকতুল্য হয়ে ওঠা এবং পানীয় জল ও খাদ্যবস্তু সেই সবের সংস্পর্শে বিষাক্ত হয়ে ওঠা কাজ করত। ফলে ডাইরিয়া, কলেরা মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করত। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা লাভে বঞ্চিত এবং এ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় তারা ওঝাদের ঝাড়ফুঁক, দেবদেবীর পূজো এবং সর্বোপরি ভাগ্যের হাতেই তাদের জীবন সঁপে দিত। তারা বিভিন্ন রোগের ও ব্যাধির কারণ রূপে 'দ্যাও' ধরা কে (অপদেবতা - 'গাজি মিদাই') প্রাধান্য দিত। রোজা কাঠি গুণে মাটিতে আঁক জোক কেটে কোন 'দ্যাও' ধরেছে তা নির্ণয় করে জল কষা ও তেল পড়া দিত। রোগারোগ্য হলে অপদেবতার তুষ্টির জন্য পূজা ও পশু উৎসর্গ করা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সেই সময় মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুকের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষেরা তিব্বতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যও গ্রহণ করতেন। ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভুটান রাজ্যের হাত থেকে এই অঞ্চল জয় করার পূর্বে ভুটানী শাসনকালে এই অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে তিব্বতীয়দের যাতায়াত ছিল। সেই সূত্র ধরে এই অঞ্চলে তিব্বতী চিকিৎসার সূত্রপাত ঘটে। তিব্বতীয়রা বিভিন্ন ধরনের গাছপালার শেকড়, হিং, শিলাজিৎ, সুরমা প্রভৃতি নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তা বিক্রী করতেন, সাধারণ মানুষ ওষুধ হিসেবে ঐ সব দ্রব্যাদি কিনতেন। মূলত, স্ত্রী পুরুষের যৌন চিকিৎসার কাজেই তিব্বতী ওষুধগুলি ব্যবহৃত হত।

এই পর্বে এতদঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার অপর একটি ধারা হিসেবে বেদেয়ালী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ানো এই সম্প্রদায়ের মানুষদের অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা। তাদের বিভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে ছিল - সাপে কাটা, নাভি ও পিত্ত-শূল (গ্যাসট্রিক বা গলব্লাডার স্টোন জাতীয় অসুখ) ও জলধরা (হাত-পা ফুলে যাওয়া)। এদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় দেবদেবীর প্রভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। এরা ঝাড়ফুক, তাবিজ-কবজ এবং বিভিন্ন প্রকার ভেষজ, নিশাদল, বিভিন্ন প্রকার লবণ, তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ডুয়ার্স এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চল সম্বন্ধে তাদের সাবেকি চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রশাসনিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গড়ে ওঠার আগে ১৮৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী ঔপনিবেশিক সরকার জলপাইগুড়ি শহরে একজন ডাক্তার নিয়ে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। এই পর্বে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে। যেমন- পৌরসভা, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে জন স্বাস্থ্য উন্নয়নে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, যদিও তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। ১৮৮৭ সালের ৩রা মে এক সরকারী ঘোষনা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড গড়ে ওঠে। জেলার পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থায় জেলা বোর্ডের অবদান ছিল। উল্লেখযোগ্য, ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য আইন পাশ হবার পর ১৯২১ সালে জেলা বোর্ড সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিকট হেলথ অফিসার নিয়োগ করে। ১৯২৮ সালে প্রতি থানায় একটি করে পাবলিক হেলথ সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যদিও এর পূর্বে ১৮৯১ সাল থেকেই জেলা বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন শুরু করেছিল। ১৯১৮ সালে বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, রাজগঞ্জ, মাল, শামুকতলা প্রভৃতি স্থানের, দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিকে আরো উন্নত করা হয়। ১৯২১ সালে প্রত্যেক থানায় অন্তত একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে জেলা বোর্ড জলপাইগুড়ি শহরে পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে এবং ১৯৩৮ সাল থেকে ঐ ল্যাবরেটরিতে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮৯ সালে জলপাইগুড়ি পৌরসভা (১৮৮৫ সালে স্থাপিত) প্রথম বসন্তরোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তখন মানুষের মন ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিশুদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে যেমন আতঙ্ক ছিল তেমনি রোগ প্রতিরোধের জন্য নানা অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা (যেমন বাংলা টিকা, বসন্তের লাসিকা থেকেই এই টিকার ব্যবস্থা করা হত) গ্রহণ করত। এই কল্যাণমূলক কাজকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ণে বাধ্য হন।[১৮]

১৮৭৪-৭৫ সালে ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করলে এই অঞ্চলের

চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিছুটা গতি সঞ্চারিত হয়। কারণ, চা-বাগিচাগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রয়োজনে প্রতিটি বাগানেই চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ফলে শুধু চা বাগিচাগুলিই নয় তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি এর সুফল লাভ করতে থাকে।

এই সময় ঔপনিবেশিক সরকার এতদঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ১৮৮৭-৮৮' সালে তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মহামারী প্রতিরোধ নিমিত্ত 'ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স মার্কেট ফাণ্ড' গঠন[১৯]। এর উদ্দেশ্য ছিল, জলপাইগুড়ি জেলার ৪৯ টি হাট এলাকায় জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে শৌচাগার নির্মান, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি। সরকারী পোষ্ট অফিসগুলির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কুইনাইন সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, শুধু তাই নয় ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রেলস্টেশন, রেলগাড়ীর কামরা এবং সরকারী অফিসগুলিতে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে লেখা থাকত — 'ম্যালেরিয়া বাংলার মৃত্যুদণ্ড', 'ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে বাড়ীতে হাঁস পুষুন' প্রভৃতি।

বিভিন্ন রোগ অধ্যুষিত এই অঞ্চলে ডাক্তারের অভাব এই সময় ভীষণভাবে, অনুভূত হওয়ার ঔপনিবেশিক সরকার ১৯৩০ সালে জলপাইগুড়ি শহরে 'জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল' স্থাপন করেন। সরকারী পরিচালনাধীন এই স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জেন ডাঃ ইয়ং। এই স্কুলে প্রতি বছর চল্লিশ জন ছাত্র নেওয়া হত। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই ছাত্র আসত। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন চা বাগান এবং বিভিন্ন জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের দায়িত্ব এই সব L.M.F ডিপ্লোমাধারী ছাত্ররা গ্রহণ করতেন। এতদঞ্চলে এই বিদ্যালয়ের সাফল্য অর্জনকারী ছাত্ররা জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ১৮৯১ সালে জলপাইগুড়ি শহরে প্রথম বেসরকারী ডাক্তারখানা চালু হয় এবং ১৯৩০ সালের পর বহু L.M.F ডিপ্লোমাধারী ডাক্তাররা নিজ উদ্যোগে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী ভাবে ডাক্তারখানা গড়ে তুলতে থাকেন। এইসব ডাক্তারখানাগুলিতে রোগীর চিকিৎসার সাথে সাথে ওষুধ বিক্রীও চলত। এই ডাক্তারখানাগুলিতে প্রসবকার্য ও ছোটখাট শল্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এতদঞ্চলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা যে খুব বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল তা নয়। সাধারণ মানুষ এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি খুব একটা বিশ্বাসীও ছিল না। এ প্রসঙ্গে সেই সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ওই ওষুধের নাই রে দিসা,
কি করিবেন টাকা পাইসা,
যদি জনম যায় রে বৃথা —
তবুও না করো এই চিকিৎসা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে ১৮৭৪-৭৫ সালে ডুয়ার্সে চা শিল্প স্থাপনের ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অঞ্চলে শ্রমিক হিসেবে আসতে থাকে। তাদের হাত ধরে তাদের নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থাও এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সাঁওতালরা কোন মহামারী দেখা দিলে বা কোন ব্যক্তি দূরারোগ্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে একজন গুনিনের নেতৃত্বে দল বেঁধে 'মাদল' নিয়ে নাচতে নাচতে বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো। গুনিনের হাতে থাকত মন্ত্রপড়া জল। গুনিন এই জলপড়া তার নির্বাচিত কোন একজনের গায়ে ছিটিয়ে দিতেন, এর ফলে ঐ ব্যক্তির ওপর দেবতা ভর করত এবং তার মধ্যে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দিত। এই সময় গুনিন তার কাছ থেকে মহামারী বা ব্যাধি উপশমের উপায় জেনে নিতেন এবং সেই অনুসারে চিকিৎসা করতেন। সাঁওতালদের এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা এই অঞ্চলের কোচ, মেচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষদেরও আকৃষ্ট করেছিল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে প্রাক স্বাধীনতাযুগে ডুয়ার্স এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার যে বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাকে স্পষ্টতই দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি প্রাক্ চা শিল্প পর্বে স্থানীয় মানুষদের অবৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং অপরটি হল চা-শিল্পোত্তর পর্বে ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়তায় গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। যদিও মনে রাখতে হবে ঔপনিবেশিক শাসক স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করেনি। এই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই এই অঞ্চলকে উন্নতর চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাক -স্বাধীনতা যুগে যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার সুফল খুব কম মানুষই পেয়েছিল। এর পেছনে স্থানীয় মানুষদের কুসংস্কার, ভয় যেমন কাজ করেছিল [উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজবংশি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যদি কোন 'দ্যাও' বা ভুত-প্রেতের কোপে রোগী অুসস্থ হয়ে থাকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বা চিকিৎসার প্রয়োজনে দেহে কোন ক্ষতের সৃষ্টি করলে (সুচ ফোটান ইত্যাদি) সেই ব্যক্তির 'দেহা বুটা' বা শরীর অপবিত্র হয়ে যাবে এবং ঐ অসুখ আর সারবে না] তেমনি সরকারী তরফে সদিচ্ছাও সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে এতদঞ্চলে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হওয়ার বহু দিন পরেও এই অঞ্চলের জাতি এবং উপজাতিগুলির মধ্যে তাদের চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিই রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আমাদের প্রবন্ধের বহু-বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে পারি নি। আশা করব ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত এবং তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা হবে এবং প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ডুয়ার্স ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

সূত্র নির্দেশ

১) বাচ্চামোহন রায়, ময়নাগুড়ি, বয়স - ৭০ বছর। বিধায়ক।

২) জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক পরিচয়, প্রণব কুমার চক্রবর্তী, মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা।

৩) জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা বাগান, ডঃ মানস দাশগুপ্ত।

৪) Acentary of Public Health Service in the land of Kala-Azar and Black-water fearer (1870-1970) - Dr. M. N. Nandy (জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

৫) শ্রী রতিকান্ত রায়, রাজবংশি গিদাল, বয়স- প্রায় ১০০ বছর, বাগজান, ময়নাগুড়ি।

৬) উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য ও উপকথা - ডঃ গিরিজা শংকর রায়।

৭) সংস্কৃতির মিলনত বাবা জন্মেনা - শ্রী হরিপদ রায়।

৮) জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী শারদ গ্রন্থ। ধনসিং রায়ের সাক্ষাতকার।

৯) আফিরুদ্দিন আহমেদ, জেলা-পাকড়ী, বয়স - ৬৯ বছর।

১০) ডি, এইচ, আই সাণ্ডারের প্রতিবেদন।

১১) শ্রী গেদু রায়, বাগজান, বয়স - ৮১ বছর।

১২) শ্রী দীগেন রায়, আমগুড়ি, বয়স - ৭০ বছর।

১৩) রাভা ও তাদের দেবী 'রণ্‌তুক-বাসেক', শ্রী সুনীল পাল, জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

১৪) জলপাইগুড়ি জেলার কোচ-রাভা সমাজ, ডঃ রেবতী মোহন সাহা, মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি বিশেষ সংখ্যা।

১৫) সদামান সাপুড়িয়া, বেদেয়ালী চিকিৎসক, বয়স ৮৪ বছর (আনু.)।

১৬) শতবর্ষে জন কল্যাণ। ডাঃ স্মরজিৎ বাগচী, জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

১৭) শতবর্ষের দর্পনে জেলার স্বায়ত্ব শাসন। শ্রী সন্তোষ ঘোষ। ঐ

১৮) একটি হাইকোর্টের রিপোর্ট।

১৯) শ্রী গণেশ ব্যানার্জী, সংবাদ দাতা-আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মেখলীগঞ্জ, বয়স - ৭২ বছর।

২০) ডা. নিরঞ্জন গুপ্ত, L.M.F. বয়স ৮২ বছর, ময়নাগুড়ি।

২১) শ্রী ধীরেন্দ্র নার্জিনারী, মেচ সম্প্রদায়ভুক্ত। বয়স - ৬৯ বছর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ, রীডার, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

মানুষের একটা প্রধান চাহিদা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। ঔপনিবেশিক আমলে সে পরিষেবা পান নি এদেশের সাধারণ মানুষ। স্বাধীনোত্তর কালেও যে এক্ষেত্রে বিরাট কিছু বদল ঘটল তা নয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছল না। যারা পেলেন তারাও শিকার হলেন স্বাস্থ্য-দুর্নীতির। বিভিন্ন বিপজ্জনক ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ এমনকি নিষিদ্ধ ওষুধের ব্যবহার, নানান পরীক্ষার পেছনে কার্যকর দালালচক্র, সরকারি হাসপাতালে নৈরাজ্য আর বেসরকারি নার্সিং হোমের ব্যবসার মধ্যে দিনাতিপাত বিভ্রান্ত অসহায় জনসাধারণের।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.) -র স্বাস্থ্য সংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) গঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর U.N.O-র সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় মানবাধিকার সনদ। সেই সনদে স্বাক্ষরকারী ভারতও অঙ্গীকার করে, নাগরিকদের বাঁচার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য — এই পাঁচটি বিষয়ের ব্যবস্থার ভার রাষ্ট্রের। এরপর ১৯৭৮ সালে আলমা আটা শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ শপথ নিয়ে ঘোষণা করে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' রূপায়নের কথা। ঘোষণাপত্রে বলা হল ২000 সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল লোকের জন্য এমন এক স্বাস্থ্যমান অর্জন করতে হবে, যাতে তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সৃজনশীল জীবনের অধিকারী হয়; আর '২000 এর মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'র লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে বলা হয় — ১) প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রবর্তন, ২) স্বাস্থ্য শিক্ষা ৩) খাদ্য সরবরাহ ও উপযুক্ত পুষ্টির বিধান, ৪) পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ জল এবং সাধারণ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ৫) স্থানীয় প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকাদান ৬) স্থানীয় ব্যাধিগুলির প্রতিষেধক ও নিয়ন্ত্রণ, ৭) সাধারণ ব্যাধি ও দুর্ঘটনার যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ৮) প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ।[১]

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কাজ কি একা সরকারের পক্ষে করা সম্ভব ? প্রধান উদ্যোগ নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের কিন্তু পাশাপাশি সহযোগিতা দরকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতা। বস্তুতঃ তারাই চাপ সৃষ্টিকারি গোষ্ঠি হিসাবে সরকারকে

তার দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব দিতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাদের লক্ষ্য চিকিৎসা করা নয় বরং মানুষকে স্বাস্থ্য-সচেতন করে তোলা। স্বাস্থ্ সচেতনতা বিকাশের লক্ষ্যে সংস্থা এর আগেও গড়ে ওঠেছে, যেমন ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পাভলভ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (১৯৫১) কিন্তু তার লক্ষ্য শুধু সচেতনতা সৃষ্টি ছিল না। তারা পাভলভীয় পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসাও করতেন। অন্যদিকে আশির দশকে গড়ে ওঠা সংস্থাগুলোর অভিনবত্ব এখানেই যে চিকিৎসকরা যুক্ত থাকলেও এদের লক্ষ্য চিকিৎসা করা নয় বরং সঠিক অর্থে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-র সঠিক রূপায়ন যার পন্থা জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

এই ধারার প্রথম সংগঠন : 'নর্মাল বেথুন জনস্বাস্থ্য অন্দোলন'। এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ৪ মার্চ ১৯৮৩ তে। বিশিষ্ট চিকিৎসক নর্মান বেথুন (০৪/০৩/১৮৯০ — ১২/১১/১৯৩৯)-এর অনুপ্রেরণায় শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক, চাকুরীজীবি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার কিছু মানুষ এই সংগঠন গড়ে তোলেন।[২] নর্মান বেথুন এমন এক চিকিৎসক যাঁর বক্তব্য ছিল ঃ 'আহতদের জন্য হাসপাতালে অপেক্ষায় থেকোনা, রণক্ষেত্রে আহত দের কাছে যাও'। স্পেনের ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই আর চীনের জাপবিরোধী সংগ্রামের সহাযোগী ডা. বেথুন বিশ্বাস করতেন 'অসাম্যের অর্থনীতিই স্বাস্থ্যহীনতা প্রসব করে'।[৩]

কাজেই, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়; সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় র‍্যাডিকাল পরিবর্তন আনার জন্য যে মূলস্রোতের আন্দোলন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন তারই অঙ্গ। তাঁরা নিজেরাও একথা বলেছেন[৪]। তেমনই এদের ইশতেহারের ভূমিকা লেখার সময় নর্মান বেথুনের সহযোগী ডাক্তার বিজয় কুমার বসু লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন মানুষকে নিয়ে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলে অন্যায় সমাজ কাঠামো বদলের বৃহত্তর সংগ্রামে সাহায্য করবে।[৫]

স্বাস্থ্য মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল, সমাজে বাঁচার মত উপযুক্ত পরিবেশ (পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন বাসস্থান) না থাকলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। অথচ সম্পদের অসম বন্টন, তীব্র অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে সমাজের সবাই ভাল নেই। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে প্রসারিত হচ্ছে নিরাপত্তা হীনতা, অস্থিরতা, ফলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল নেই। আর সুস্থতার সংজ্ঞা তো অনেক ব্যাপক, শুধু তো আর রোগের অনুপস্থিতি নয়।[৬]

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসাব্যবস্থা পরিণত হয়েছে পণ্যে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটলেও শ্রেণীসমাজে স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শাসকশ্রেণী। এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে। রোগ হলেই আমরা চিন্তিত। সর্ব সময়ে স্বাস্থ্য বিচার্য নয়, এদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে বড় সমস্যা হল দারিদ্র। গরীব মানুষ অসহায়, সকলের জন্য স্যানিটেশনের ব্যবস্থাই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কোথায় পরিচ্ছন্নতা? ফলে পেটের

অসুখের শেষ নেই। ১৯৮০ সালের হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পাঁচ বছরের কম বয়সের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শিশু অর্থাৎ প্রতি মিনিটে দশ জন করে শিশু এই রোগে মারা যাচ্ছে — যার মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে মৃত্যুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ।[৭]

তীব্র সামাজিক অসাম্যই নানান অসুখের জন্য দায়ী। যতদিন পর্যন্ত দারিদ্র, অপুষ্টি, বেকারী থাকবে ততদিন অসুখও থাকবে, থাকবে অপরিণত মৃত্যু। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যে টাকা নেই অথচ সামরিক যাতে খরচ বাড়ছে। চলছে যুদ্ধের মহড়া। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কি করে ভাল থাকবে? সুস্থ থাকবে?

প্রকৃত লক্ষ্য তো সামাজিক অসাম্য দূর করা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়লেও সমাজের উপকার হবে। আর সেটাই লক্ষ্য 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'-এর। এজন্য জনস্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব, লক্ষ্য ও কর্তব্য হল — ১) স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থার মৌল সামাজিক কারণগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা। ২) বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের দাবিতে জনগণকে আন্দোলনে সংগঠিত করা। ৩) সর্বজনীন শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রবর্তন করার দাবি করা। ৪) চিকিৎসাব্যবস্থাকে দুর্বোধ্যতামুক্ত করার আওয়াজ তোলা। ৫) অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ ও চিকিৎসা নিষিদ্ধ করার সপক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা। এবং ৬) মানুষকে পরীক্ষামূলক প্রাণী হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা।[৮] সামগ্রিক ভাবে এই লক্ষ্যে কাজ করেছে নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।[৯]

আর মূলতঃ ওষুধ, পরে পেটেন্ট আইন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক নিয়ে কাজ শুরু করে ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম। ১৯৮৪-র এপ্রিলে এর প্রতিষ্ঠা। যদিও এর রেজিস্ট্রেশন হয় ১৩ জুন ১৯৮৬-তে।[১০] সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানকর্মী এবং সমাজকর্মীরা। প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি ছিলেন ডাঃ অরুণ সেন, সহ সভাপতি ডা. পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ডাঃ সুজিত দাশ। ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম এর কাজ হল — মানুষের স্বাস্থ্যহানি ও চিকিৎসার বিষয়ে জড়িত সমস্যাগুলিকে ঠিকঠাক বুঝে তার চিত্রটা জনসমক্ষে তুলে ধরা, এই ক্ষেত্রের অনাচার ও দুর্নীতির স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া এবং সমস্যা গুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেওয়া। ফোরাম কাজ করতে গিয়ে দেখেছে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার নানা সমস্যার উৎসগুলি নিহিত রয়েছে মূলতঃ দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধান্দাবাজির মধ্যে, সেই সম কারণগুলি দূর করার পথে বাধা হল — জনগণের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞাত এবং ক্ষমতাহীনতা। এই বাধাগুলি অপসারণের জন্য যা যা করা দরকার, ফোরাম সেই কাজগুলি করতে আগ্রহী।[১১] ফোরাম কাজ করতে গিয়ে মানবকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের অংশ হিসেবে জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নের জন্য চাপ দিয়েছে। জোর দিয়েছে দরকারি ওষুধের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার ওপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে ভারতে

সরকার নিযুক্ত হাতি কমিটি ১১৭টি দরকারি ওষুধের একটি তালিকা বানায় এবং দাবি করে বেশির ভাগ রোগের চিকিৎসার জন্য এই তালিকার ওষুধগুলিই যথেষ্ট। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০টি ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে এবং তাকে একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে। ঘোষণা করা হয় একটি দেশের অধিকাংশ মানুষের রোগভোগের মোকাবিলা করা যায় যে ওষুধগুলি দিয়ে তাই হল দরকারি ওষুধ।[১২]

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম বিপজ্জনক অবৈজ্ঞানিক ওষুধ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার কাজ করে চলেছে। রোগের চিকিৎসা এবং ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা দু রকমের, ১) ওষুধের বাজারে অধিকাংশ ওষুধই অকেজো বা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর। ২) প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনা প্রয়োজনে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হয় এবং তার ফলে রোগীর টাকা নষ্ট হয় এবং শারীরিক ক্ষতি হয়। এই যে অনাচার চলছে তার পেছনে রয়েছে ওষুধ সাম্রাজ্যবাদ, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির বাজার দখলের চেষ্টা।[১৩] প্রচারপত্র, সভাসমিতি মারফৎ ওষুধ ঘিরে অনাচারের কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্যোগ নেয় ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম। এই উদ্দেশ্যে ফোরাম বেশ কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করে যার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ মানুষের জন্য ওষুধ, না ওষুধের জন্য মানুষ; নিষিদ্ধ ওষুধ, ওষুধ বা ভেল্‌কি, দরকারি ওষুধ প্রভৃতি। ওষুধ সংক্রান্ত ছাড়াও স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য বই ফোরাম প্রকাশ করেছে, যেমন- জন্মনিয়ন্ত্রণ বৃত্তান্ত ও জনসংখ্যার রাজনীতি, ডাক্তার বনাম রোগী, এইডস্-এর কথা। ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষাতেও ফোরাম বই প্রকাশ করেছে। 'Drug Disease Doctor' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও '৮৮ সাল থেকে নিয়মিত বের করছে ফোরাম। সমাজের ভালর জন্য পরিচালিত যে কোন গণ আন্দোলনে (যেমন, পরমাণু-অস্ত্র বিরোধী প্রচারাভিযান) ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম সহযোগী। কাজেই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম কাজ করে চলেছে।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখে সরকারও এগিয়ে এসেছে নিজের মতো করে জনস্বাস্থ্য কমিটি গড়ে আন্দোলনে সামিল হতে। বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রীকে উপদেষ্টা রেখে এবং শাসক দলের বিধায়ক, ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে সরকারি পৃষ্ঠপোশকতায় ১৯৮৮-র ৯ মে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে একটি কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে জনস্বাস্থ্য কমিটি।[১৪] এই কমিটি ১৯৮৮র অক্টোবর মাসে 'জনস্বাস্থ্য' নামক সদস্যদের জন্য একটি বুলেটিন প্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন, পরে বের হয় 'জনস্বাস্থ্য কথা' পত্রিকা। এই কমিটি আন্দোলন করেছে খাদ্যে, ভোজ্য তেলে ভেজাল (বেহালা)-এর বিরুদ্ধে, প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য চেতনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পর এরা সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিকে মন দেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় '৯০ এর অক্টোবরে এবং '৯৩ এর মার্চে। নাগরিক কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষে এক যোগে কাজ করে জনস্বাস্থ্য কমিটি। '৯০ এর দশকে কলেজ স্কোয়ারে নিয়মিত জনস্বাস্থ্য মেলা আয়োজিত হয়েছে এই কমিটির উদ্যোগে।

শরীর স্বাস্থ্য ঘিরে কুসংস্কার ভাঙা, বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রচার করা প্রভৃতি লক্ষ্যে আন্দোলনও আশির দশকে হয়েছে। এ কাজে নিয়োজিত' উৎস মানুষ' পত্রিকা (১৯৮০), ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (১৯৮৫) প্রমুখ। এই কাজের অনুকূল আইন, ড্রাগ অ্যাণ্ড ম্যাজিক রেমেডিস্ (অবজেকশন্যাবল্ অ্যাভারটাইজমেন্ট) অ্যাকট ১৯৫৪, থাকলেও বাস্তবে তা খুব একটা প্রয়োগ হয় না। উপরোক্ত সংগঠন এক গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজও এই দশকে হয়েছে। এর অগ্রনায়ক : অ্যাসেসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৮০)। ১৯৮৬ সালের ২৫ শে মার্চ পশ্চিবঙ্গ বিধানসভায় স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনকে দৃঢ় করার জন্য একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।[২৫] চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির লক্ষ্যে এবং কুসংস্কার ভাঙার জন্য মৃত্যুর পর দেহ ও চক্ষু দানের উদ্দেশ্যে এই দশকে বিকশিত হয় মরণোত্তর চক্ষুদান ও মরণোত্তর দেহদান আন্দোলন, এই আন্দোলনের হোতা ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাঙ্ক (১৯৮০) এবং গণদর্পন (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৭-এ কিন্তু এই লক্ষ্যে কাজ শুরু ১৯৮৬-তে)। বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকাতে স্বাস্থ্য নিয়ে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। আর শুধু এই নিয়ে ১৯৮৭-তে বের হয় একটি পত্রিকা : 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' (১৯৮৭)। '৯০ এর দশকে স্বাস্থ্য / চিকিৎসা পত্রিকার বাণিজ্যকরণ ঘটে। পণ্যসংস্কৃতি, বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনের চাপের ছাপ পড়ে এই সমস্ত পত্রিকার পাতায়। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ যথারীতি তার লক্ষ্য স্থির রেখে প্রকাশিত হচ্ছে।

২০০০-এ পা দিলাম আমরা। কিন্তু সকলের জন্য স্বাস্থ্যের স্লোগান বাস্তবায়িত হল না। বরং ২০০০-এ অবস্থা আরো ঘোরালো। ওষুধ সাম্রাজ্যবাদ, নতুন পেটেন্ট আইন (১৯৯৮), বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির বাজার দখলের চেষ্টা, বিভিন্ন পরীক্ষার (এক্সরে, আলট্রা সোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান প্রভৃতি) চক্র আর সরকারি হাসপাতালে অবহেলা/অব্যবস্থা — এই নিয়ে আমাদের ঘর করা। উনিশ শতকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন — 'রেতে মশা দিনে মাছি / এই নিয়ে কলকেতায় আছি।' এখনও এ শহরের প্রধান সমস্যা : ম্যালেরিয়া। গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভয়াবহ। সাপে কাটার অ্যান্টি ভেনাম সেরাম (এ.ভি.এম.) মেলে না গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, কাজেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অবৈজ্ঞানিক হাতুড়ে চিকিৎসা, অলৌকিক নিরাময়ের প্রচার,

দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণীত হয় ১৯৮২-তে, সংসদে তা গৃহীত হয় ১৯৮৩ সালে। এতে বলা হয়েছে — এতদিন পর্যন্ত অত্যন্ত ভুলভাবে ব্রিটিশ অনুকরণে রোগ নিরাময়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রোগ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।[২৬] এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিষয় ঘটল — ১) রাষ্ট্রের তরফে সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণের যে অভিযোগ জনগণের মধ্যে ছিল তা সরকারের তরফে স্বীকার করে নেওয়া

হল। এবং ২) নতুন করে আবার সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। প্রতিরোধের মানে শুরু হল মানুষকে ভয় দেখিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসা। উদাহরণ হিসেবে হেপাটাইটিস বি-র টীকা করণের কথা বলা চলে। অথচ প্রতিরোধ মাত্রে কিন্তু চিকিৎসা বন্ধ নয়। বরং প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা — একে অন্যের পরিপূরক। সীমাহীন দুর্নীতি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে দিয়েছে। বিদেশী টাকা পুষ্ট এন.জি.ও. গুলো অনেকক্ষেত্রেই বহুজাতিকদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর। এরই মাঝে একা কুম্ভের মত অল্প সাধ্য (অর্থবল এবং লোকবল) নিয়ে লড়ে যাচ্ছে আশির দশকের গণস্বাস্থ্য সংস্থাগুলো। এদের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কিছু মানুষকে নিশ্চয়ই সচেতন করেছে। কিন্তু সকলের জন্যস্বাস্থ্য-র আদর্শ তাতে বাস্তবায়িত হয় নি। স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছায় নি। এই ব্যবস্থা বদলানোর জন্য দরকার সমাজ বদল। কিন্তু সেটা হবে কবে? কিভাবে? আশির দশকের জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তুলেছে; স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের আদর্শ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নেওয়ার সাধ্যতো এদের নেই; এরা কাজ করতে পারে সহযোগী রূপে।

সূত্র নির্দেশ

১. 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা', নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন প্রকাশিত, (এই সংস্থার বিভিন্ন বইতে সংযোজিত অংশ; ব্যবহৃত বই 'ডাঃ নর্মান বেথুন, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৬৭)

২. 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন', উপরোক্ত বইতে পৃষ্ঠা - ৭৩, পৃথক পুস্তিকা হিসেবেও লভ্য

৩. ডঃ রণতোষ চক্রবর্তী, ডা. নর্মান বেথুন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা - ১৪-৩৪

৪. পিপলস্ হেলথ্ মুভমেন্ট — ম্যানিফেস্টো' (প্রধান সংগঠক — ডা. সুখময় ভট্টাচা ´ও ডা. জ্ঞানব্রত শীল), কলকাতা, ১৯৮৬

৫. পূর্বোল্লেখিত — ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১

৬. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্বাস্থ্য বলতে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা বোঝায়।

৭. ডাঃ তাপস সেন, 'পেটের অসুখ', ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাধারণের অসুখ বিসুখ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৫০

৮. পূর্বোল্লেখিত '................. এ ম্যানিফেস্টো' ' পৃষ্ঠা - ১২

৯. বেশ কিছু পুস্তিকা বের করেছে যা 'জনস্বাস্থ্য সংকলন'-এর তিনটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। প্রকাশকাল - ১৯৯০-'৯৩

১০. মেমোর‍্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন (এস/৫২৮৬৭)

১১. ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম -এর প্রচারপত্র

১২. 'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা : পরিষেবা, কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ে কর্মশালা'র আলোচ্য পুস্তিকা, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১০

১৩. ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম -এর প্রচারপত্র

১৪. ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পটভূমি ও জনস্বাস্থ্য কমিটি, জনস্বাস্থ্য মেলা স্মরণিকা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৯১

১৫. দেবব্রত রায়, 'পশ্চিমবাংলা স্বেচ্ছা রক্তদান আজ একটি সামাজিক আন্দোলন', স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মীদের ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন-এর স্মরণিকা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৯৯৯।

১৬. প্রদীপ বসু, 'স্বাস্থ্য চালচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ', গণবিজ্ঞান ভাবনা, হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ, হালিশহর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৪৩।

ভারতে জাতীয়তাবাদী সংবাদসংস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

অঞ্জন বেরা

ভূমিকা

সাংবাদিকতা সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় সংবাদ সংস্থার ভূমিকা ও গুরুত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। আধুনিক সাংবাদিকতায় তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থার সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদ সংস্থা প্রায় নির্ধারক ভূমিকা পালন করে চলেছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। প্রাক-সংবাদ সংস্থা যুগের সংবাদপ্রবাহের প্রেক্ষাপট ও পরিধির সঙ্গে সংবাদ সংস্থার আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ের কোন তুলনাই চলে না। সংবাদ সংস্থার স্থান আধুনিক সাংবাদিকতার কেন্দ্রে।

খুব সংক্ষেপে বললে, সংবাদ সংস্থা হলো এক সংস্থা, তার কাজ সংবাদ সংগ্রহ করা এবং মূলতঃ সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরবরাহ করা। সংবাদ নিয়ে কাজ করলেও সংবাদ সংস্থা সংবাদ মাধ্যম নয়। তার কাজ সংবাদ মাধ্যমকে (সংবাদপত্র,টিভি, বেতার) সংবাদের যোগান দেওয়া; বাণিজ্যিক শর্ত মেনে। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সংবাদমাধ্যমই সংবাদ সংস্থার পরিষেবার গ্রাহক। সংবাদ মাধ্যমের জন্য সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ সরবরাহ, সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সংবাদ এমনই প্রভাব ফেলেছে যে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি স্মিথ বলেছেন "The invention of the news agency was the most important single development in the newspaper industry of the early ninteenth century apart perhaps from the rotary press. It altered the whole scope of news dissemination."

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সংবাদ সংস্থার জন্ম হয়নি। সংবাদপত্র জন্ম দেবারও প্রায় দুশতক পর সংবাদ সংস্থার আবির্ভাব। অর্থাৎ, সংবাদসংস্থার জন্মাবার আগে সাংবাদিকতা হয়নি, এমন কথা বলা যায় না। আসলে সাংবাদিকতা বিকাশের একটা স্তরেই সংবাদ সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করি, ইউরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে সংবাদসংস্থা জন্ম নিয়েছে, গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের পিঠোপিঠি। এখানে

সংবাদপত্রের গণপ্রচার বা Mass circulation বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। যে প্রক্রি(য়া আমরা ঐ দেশগুলিকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ল( ) করে থাকি। গণপ্রচারিত সংবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, তত্ত্ব বা মতামতের চেয়েও, তথ্য বা সংবাদ তার কাছে বেশি গু(ত্বপূর্ণ। তার দরকার খবর, তাজা খবর, প্রতিনিয়ত এবং যত দ্রুত সম্ভব। 'কড়া খবর' or 'Hard News' তার প্রধান উপকরন।

ফলতঃ দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্তারের সঙ্গে সংবাদ সংস্থার প্রসারের একটা সম্পর্ক আছে। কারণ তাজা খবর নিয়ে গণপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের প(ই সম্ভব। যথেষ্ট সংখ্যক গণপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের আবির্ভাব না হলে সংবাদ সংস্থার পরিষেবা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত(গ্রাহক ভিত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গ স্মর্তব্য যে, এই যে দ্রুত খবর লেনদেন, তাজা খবরের বিনিময় তখনই সম্ভব যখন দূর সংযোগের প্রযুক্তি(গত ভিত্তি সম্ভব হয়েছে। তাই আমরা ল( ) করি যে, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাই আধুনিক সংবাদ সংস্থার প্রচারকে বাস্তবে সম্ভব করেছিল। টেলিগ্রাফ না আসা পর্যন্ত সংবাদ সংস্থার প(বিরাট অঞ্চল জুড়ে সংবাদ প্রেরণ ও সংগ্রহ এবং দ্রুত তা বিনিময় করা সম্ভব ছিল না।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, ইউরোপে এবং আমেরিকাতেই সংবাদ সংস্থার প্রথম আবির্ভাব। প্রথম সংস্থার জন্ম ফ্রান্সে — নাম ছিল হাভাস এজেন্সি, প্রতিষ্ঠাতা চার্লস হাভাসের (১৭৮৩-১৮৫৮) নামে। এরপর সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রে। ১৮০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরের ছটি দৈনিক সংবাদপত্র সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন হার্বার নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, যা আজকের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি'র পূর্বসূরী। ১৮৪৯ সালে জার্মানিতে সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন হাভাসের প্রাক্ত(ন কর্মী বার্নার্ড উলফ্। হাভাসেরই অপর এক কর্মী জার্মান বংশোদ্ভূত পল জুলিয়াস রয়টার প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটেনের সংবাদসংস্থা 'রয়টার'। লন্ডনে রয়্যাল এক্সচেঞ্জ ভবনে ১৮৫১ সালে কাজ শু(করেছিল 'রয়টার'। তারপর ক্র(মশঃ 'রয়টার' তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিল একের পর এক ব্রিটিশ উপনিবেশে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ মূলতঃ ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সংবাদসংস্থা সম্প্রসারণের কাল বিশেষত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি(গুলি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক (ে ত্রের মতো সংবাদপ্রবাহের (ে ত্রেও একচেটিয়া প্রাধান্য লাভে স(ম হয়েছিল। ইউরোপ এবং আমেরিকার বাইরে প্রথম সংবাদ সংস্থা গঠিত হয় এশিয়ার দেশ জাপানে-১৮৮৬ সালে। লাতিন আমেরিকায় প্রথম জাতীয় সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় আর্জেন্টিনায়, ১৯০০ সালে। আফ্রিকার মহাদেশে দ(িণ আফ্রিকায় প্রথম সংবাদসংস্থা গঠিত হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রয়টারের উদ্যোগে তার সহযোগী সংস্থা হিসেবে।

ভারতে সংবাদসংস্থা

ভারতের সঙ্গে সংবাদসংস্থার যোগসূত্র স্থাপিত হয় স্বভাবতঃই রয়টারের সূত্রে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে এদেশ ছিল ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা রয়টারের একচেটিয়া বিচরণ (ত্র। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ব্রিটেনের এই বৃহত্তম উপনিবেশের দিকে রয়টারের নজর পড়ে। নজর পড়ার প্রাথমিক কারণ ছিল ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ও পাঠক মহলের আগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থবাহী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র গুলির কাছে ভারতের বাইরের, বিশেষতঃ ব্রিটিশের খবরাখবরের সূত্র হিসেবে রয়টারের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। ১৮৫৭-র সিপাহী যুদ্ধের সময় রয়টারের সেদিনকার সালে তাজা খবর নিয়মিত পাঠাতো লণ্ডনে। এবং সেই সূত্রে গোটা পৃথিবীর লোক সিপাহী বিদ্রোহকে দেখেছে মূলতঃ রয়টারের চোখ দিয়েই। সে সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে টেলিগ্রাফ লাইন ব্রিটিশরা পেতে ফেলেছিল। এর ফলে 'বিদ্রোহ' দমনে উপনিবেশিক সরকারের যেমন সুবিধা হয়েছিল, তেমনই সুবিধা পেয়েছিল সংবাদ সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম। ১৮৬৫ সাল নাগাদ ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সরাসরি টেলিগ্রাফ লাইন পাতা গিয়েছিল সমুদ্রতল দিয়ে। এরও ফয়দা তুলেছিল 'রয়টার' ।

ভারত থেকে প্রকাশিত প্রথম যে সংবাদপত্র 'রয়টার'-এর গ্রাহক হয়েছিল তার নাম 'বম্বে টাইমস'। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ। ১৮৬১ সালে বম্বে টাইমস প্রথম রয়টারের গ্রাহক হয়। ভারতে রয়টারের ব্যবসা আরো ছড়িয়েছে ১৮৬৬ সাল থেকে। ঐ বছর রয়টার ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নিজস্ব অফিস খোলে বোম্বাইয়ে। ত্র(মশঃ ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র গুলিও রয়টারের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে শু(করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁর সম্পাদিত 'দ্য বেঙ্গলী 'ই নাকি প্রথম ভারতীয় মালকিনাধীন সংবাদপত্র হিসেবে ১৯০০ সালে রয়টারের গ্রাহক হয়েছিল।[২] কিন্তু ১৮৭০-র দশকে অমৃতবাজার পত্রিকাতেই রয়টারের খবর পাতা জুড়ে বেরিয়েছে। বিদেশী খবর মাত্রই তা সরবরাহ করতো রয়টার। ভারতে রয়টারের একচেটিয়া বাণিজ্যের তিনটি দিক ছিল। প্রথমতঃ ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি বিদেশী সংবাদের জন্য নির্ভরশীল ছিল রয়টারের উপর। ভারতের খবর বিদেশে পাঠানোর (ত্রেও সংবাদ সংস্থা হিসেবে একচেটিয়া অধিকার ছিল রয়টারের। এছাড়া এদেশে দপ্তর খোলার পর থেকে ভারতের মধ্যেকার সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করত সংবাদ সংস্থা হিসেবে একা রয়টার। তাছাড়া শুধু সংবাদ পাঠানোই নয়, ১৮৭১ সালে ভারত থেকে লণ্ডন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নিজস্ব টেলিগ্রাফ সার্ভিস শু(করেছিল রয়টার। সংবাদ ব্যবসার পাশাপাশি এই বেসরকারী টেলিগ্রাফ ব্যবসা ছিল দা(ণ লাভজনক। সর্বোপরি ভারতকে কেন্দ্র করে রয়টারের এই ব্যবসায় পুরোপুরি সাহায্য ও মদত ছিল ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের। ভারতে রয়টার কখনই একটি নিরপে(সংবাদ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেনি, তা ছিল সর্বাগ্রেই একটি ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান। গ্রাহাম স্টোরি তাঁর 'রয়টারস সেঞ্চুরি ১৮৫১-১৯৫১' বইয়ে লিখেছেন যে উনিশ শতকের বেশির ভাগ সময় জুড়ে রয়টার ছিল 'essentially part of the British scheme of things in India' একই মূল্যায়ণ সাম্প্রতিককালে

ডোনাল্ড রীডেরও। রয়টার কর্তৃক কপিরাইট সংরক্ষিত বই 'দি পাওয়ার অব নিউজ দি হিস্ট্রি অব রয়টার'-এ রীড লিখেছেন যে 'imperial institution' হিসেবেই রয়টারের উত্থান হয়েছিল - "...... as an un-official but important part of the world wide machinery of the British Empire."

রয়টার ভারতে অফিস খুলেছিল ১৮৬৬ সালে। আর ১৮৬৭ সাল থেকেই ভারত সরকার রয়টারের কাছ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা মারফত সংবাদ কিনতেন। এই ব্যবস্থা আসলে ছিল রয়টারকে বকলমে দেওয়া ভারত সরকারের ভরতুকি।

ফলতঃ, উনিশ শতকের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংহতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে রয়টারের সম্পর্কে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হতে থাকে। জাতীয়তাবাদী মহল ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র মহল রয়টারকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে শুরু করে। ক্রমশঃ যা বৈরীতামূলক দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় রয়টারের জাতীয়তাবাদী বিকল্প নির্মাণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়।

জাতীয়তাবাদীদের চোখে

ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়টার জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়তে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ দশকেই। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তাকে যে সংহতি ও সংগঠিত রূপ দিতে শুরু করেছিল তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল সর্বস্তরেই। ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্বার্থের সংঘাত সর্বক্ষেত্রেই তীব্রতর হতে শুরু করেছিল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্র বিশেষত সংবাদ সংস্থার ক্ষেত্রটাও এর বাইরে থাকেনি। এ ব্যাপারে নানা নজির রয়েছে। এর মধ্যে রয়টার সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মহলের প্রতিক্রিয়া উনিশ শতকের শেষ দশকে চমৎকার ধরা পড়ে কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নৌরজিকে লেখা বোম্বাই প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা দিনশ ওয়াচা'র (১৮৪৪-১৯৩৬) চিঠিপত্রে। দাদাভাই তখন ইংল্যাণ্ডে। ১৮৯৬ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখ দেওয়া একটি চিঠিতে ওয়াচা লেখেন দাদাভাইকে — "Reuter, a Tory is subisidited - that is my very strong suspicion ... It is a matter of regret that sometimes Reuter, as a party man, puts obstacles in our way"[৫] রয়টারের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা করছেন ওয়াচা।

ওয়াচা না-হয় ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত কি ধারণা পোষণ করতেন রয়টার সম্পর্কে তার প্রমাণ মেলে শিষ্যা মিস মেরী হেলকে লেখা (৩০ শে অক্টোবর ১৮৯৯) একটি চিঠিতে —There has been a reign of terror in India for same years ... we are in a terrible gloom – where is the hard? ... Suppose you simply publish this letter the law just passed in India with allow. The English Government in India to drag me ..... and kill me use that trial ... And I know all your

christian Governments will only rejoice, because we are heathens... They don't think it worth while to write these terrible things as news items even! It Nessary, the news agent of Reuter gives the exactly opposit news fabricated ot order!"[৬]

এরকম অবস্থানের প্রে(াপটেই এদেশে বিকল্প একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

ভারতীয় সংবাদসংস্থা

এই প্রে(াপটে ভারতের মাটিতে এবং ভারতীয়দের হাতে প্রথম একটি সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে। সংস্থার নাম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া বা এ পি আই। প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র রায় (১৮৭৪-১৯৩১)। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন সর্বভারতীয় সংগঠিত ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী গণসংগ্রামের রূপ নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রেরও প্রসার ঘটেছে। এ অবস্থায় রয়টারের বিকল্প একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও তৈরি হয়েছিল। জাতীয় মুক্তি(আন্দোলনের আনুভূমিক ও উল্লম্ব প্রসারনই জাতীয়তাবাদী একটি সংবাদ সংস্থার চাহিদা তৈরি করেছিল। এ পি আই শুধু যে ভারতে প্রথম একটি ঘরোয়া (domestic) সংবাদ সংস্থা ছিল তাই নয় বি্রের উপনিবেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম এরকম একটি সংবাদ সংস্থার জন্ম হয়েছিল। পরাধীন অবস্থায় আর মাত্র একটি দেশে এরকম একটি ঘরোয়া সংবাদ সংস্থার জন্ম হয়েছিল। তা হলো ইন্দোনেশিয়ায়।[৭] ১৯১৭ সালে সেখানে গঠিত হয়েছিল পি আই - আনেটা নামে একটি সংবাদ সংস্থা।

কিন্তু এ পি আই গঠিত হবার পরও রয়টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সহজ কাজ ছিল না। প্রথমতঃ রয়টার ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের সাহায্যপুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ রয়টারের বিরাট সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক থাকায় পরিষেবার (ে ত্রে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছিল শক্ত(। রায় প্রচণ্ড আর্থিক সংকটেও ভুগেছিলেন। শেষপর্যন্ত রয়টার কিনে নেয় এ পি আই। প্রথম বি্রযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৯ সালে রায় নিজেও পাকাপাকিভাবে যোগ দেন। আমৃত্যু তিনি রয়টারের অধিগৃহীত এ পি আইতেই ছিলেন। এ পি আই পরিণত হয়েছিল রয়টারের ভারতীয় সংবাদ পরিষেবা সংস্থায়। ব্রিটিশ সরকার রায়কে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যও করেছিল। রায় রয়টার কর্তৃপ(র আস্থাভাজন ছিলেন। আবার জাতীয়বাদী মহলেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল যথেষ্ট। রায়ের মৃত্যুর পর গান্ধীজী স্বয়ং যে শোকবার্তা প্রকাশ করেছিলেন—নোট এ প্রসঙ্গে ল(্য করার মতো—"Mr Roy's death is painful shock to me. Indian journalism has sufferered a grievous loss. I preserve very pleasant recollections of Mr. Roy's high charactor and happy manners."[৮] (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বম্বে ৯-৯-১৯৩১)।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে এ পি আইকে রয়টার অধিগ্রহণ করে নেওয়ায় রয়টারের

জাতীয়তাবাদী বিকল্প গঠনের প্রচেষ্টা ধাক্কা খায়। রয়টারের একচেটিয়া ব্যবসা আরো জোরদার হয়ে উঠে।

ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া

কিন্তু এর মধ্যেও জাতীয়তাবাদী বিকল্প সংবাদ সংস্থা গঠনের উদ্যোগ একেবারে স্বব্ধ হয়ে যায়নি। কারণ, রয়টার এবং তার ভারতীয় সহযোগী এপি আই জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্র গুলির চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলতঃ এপি আই'র জায়গায় আর একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা শু(হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালে বোম্বাইতে এম সদানন্দ (১৯০০-১৯৫৩) প্রতিষ্ঠা করেন সংবাদ সংস্থা 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া বা এফ পি আই। এ পি আইর চাকরি ছেড়ে সদানন্দ ১৯২১-২২ সালে সদানন্দ এলাহাবাদে গিয়ে মতিলাল নেহ(র 'ইণ্ডিপেণ্ডেট' কাগজে কাজ নিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রি(য়ভাবে অংশ নেওয়া সদানন্দ জাতীয়তাবাদী শিল্পপতি ও জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকার সাহায্য নিয়ে ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়াকে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। এফ পি আই এর পরিচালন বোর্ডে ছিলেন ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, জি ডি বিড়লা, ফিরোজ শেঠনা, পু(ষোত্তম দাস ঠাকুরদাস (সভাপতি), এম আর জয়াকার প্রমুখ।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন এফ পি আই'কে স্তব্ধ করতে দ্রুত তৎপর হয়ে উঠেছিল। রয়টার / এ পি আই'র প(থেকেও এফ পি আই'কে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন ভারতে এলে নিতান্ত রাজনৈতিক কারনেই এফ পি আই সাংবাদিককে কমিশনের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া সরকারের চাপে সদানন্দের শিল্পপতি পৃষ্ঠপোষকরাও সরে যেতে শু(করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরোও উল্লেখ্য, এফ পি আই'র বৈদেশিক সংবাদ সার্ভিস। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ করার জন্য এফ পি আই ফরেন সার্ভিস আনুষ্ঠানিক ভাবে শু(হয় ১৯২৭ সালের নভেম্বরে। লণ্ডনে এজন্য এফ পি আইর অফিস খোলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, কলকাতায় সংগঠিত ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট্স অ্যাসোসিয়েশনও ১৯২৮ সালে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির জন্য বৈদেশিক সংবাদ সংস্থা চালুর চেষ্টা করেছিল। এজন্য তারা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্য চায়। সৌমেন্দ্রনাথ তখন বার্লিনে ছিলেন। এ ব্যাপারে আই. জে. এ. মার্কিন লেখিকা ও সাংবাদিক শ্রীমতী অ্যাগনেস স্মেডলির সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিল। তবে তা খুব বেশি দূর এগোয়নি।

সদানন্দ সফল হন নি আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে। ১৯৩৫-র জুলাই মাসে এফ পি আই পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ইউ পি আই

এফ পি আই যখন বন্ধ হবে বলেই সবাই ধরে নিয়েছে তেমন এক সময় কলকাতায় সংগঠিত হয় আর একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া বা ইউ পি আই। ১৯৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউ পি আই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শু(

করেছিল। ইউ পি আই'র পরিচালন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন বিধান চন্দ্র রায়। ম্যানেজিং ডিরেকটর বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ছিলেন এফ পি আই'র কলকাতা প্রতিনিধি। এফ পি আই ছেড়ে তিনি উদ্যোগ নেন কলকাতা-ভিত্তিক একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থা গঠন করার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফরোয়ার্ড (শরৎ বোস), আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, দ্য অ্যাডভান্স, হিন্দি দৈনিক বিশ্বামিত্র এই উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরিচালন বোর্ডে ছিলেন সুরেশ মজুমদার, তুষার কান্তি ঘোষ, জে সি গুপ্ত।[১০]

কলকাতা ও লাহোরের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ইউ পি আই অন্তত টিঁকে থাকতে পেরেছিল। তবে রয়টারের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা নিশ্চিন্তভাবেই ছিল অসম। বিশেষত, ১৯১৭ সাল থেকে রয়টার টেলিপ্রিন্টার মারফত খবর পাঠাতে শুরু করেছিল গ্রাহকদের কাছে। এর ফলে পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পেয়েছিল এ পি আই-রয়টার। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইউ পি আই'কে টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস ব্যবহারে সুযোগ দিতে চায়নি। ইউ পি আই টেলিপ্রিন্টার সংযোগ পেয়েছিল স্বাধীনতার পর। ১৯৪৮-র ৫ই মে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইউ পি আই'র টেলিপ্রিন্টার সার্কিটের উদ্বোধন করেন।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ইউ পি আই' নিজস্ব উদ্যোগে বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহ, এমনকি বিলেতের কিছু কিছু কাগজকে ভারতীয় সংবাদ পাঠাতো। শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালে ইউ পি আই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ইউ পি আই'র উত্তরসূরী হিসেবে ১৯৬১ সালে গঠিত হয় ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া বা ইউ এন আই।

পরাধীনভারতে জাতীয়তাবাদী সংবাদসংস্থা হিসেবে ইউ পি আই' শুধু সবচেয়ে বেশি সময় নয়, তুলনামূলক ভাবে সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল।

এ পি আই'র মালিকানা বদল

ব্রিটিশ শাসনে ঔপনিবেশিক সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শুধু জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থা সংগঠিত হয়নি। তিরিশের দশক পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি রয়টার এ পি আই'র মালিকানা কাঠামোর সংস্কারের কোনো দাবি বা প্রস্তাব ওঠে নি। জাতীয়তাবাদী মহল বিকল্প হিসেবে জাতীয়তাবাদী সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু গত চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে দাবি উঠল যে এ পি আই'র মালিকানা রয়টার ছেড়ে দিক ভাবতীয় সংবাদপত্রগুলির হাতে।

এই দাবির পিছনে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমতঃ, ১৯৪১ সালে ব্রিটেনে রয়টারের মালিকানায় পরিবর্তন এসেছিল। ঐ বছরের অকেটাবর ব্রিটেনের প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল পাবলিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে তুলে দেওয়া হয় রয়টারকে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির যৌথ মালিকানায় গঠিত একটি ট্রাষ্ট রয়টার

পরিচালনার ভার পায়। ভারতেও ইতিমধ্যে সংবাদপত্রগুলি অভিন্ন একটি মঞ্চ সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটি বা আই ই এন এস। যা এখন আই এন এস' নামে পরিচিত। ভারতীয় সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন। ভারতীয় সংবাদপত্র বলতে কিন্তু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। প্রথম চার বছর আই ই এন এস'র সভাপতি ছিলেন দি সেস্টসম্যান দৈনিকের উদারপন্থী সম্পাদক আর্থার মুর (১৮৮০-১৯৬২)। আই ই এন এস গঠিত হবার পরের বছর (১৯৪০) গঠিত হয়েছিল ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদের সর্বভারতীয় সংগঠন-অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপার এডিটরস্ কনফারেন্স বা 'এ আই এন ই সি'। আর্থার মুর এ আই এন ই সি'র প্রথম সম্মেলনে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দ্য হিন্দু'র সম্পাদক কে শ্রীনিবাসন। জাতীয়তাবাদী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দুধরনের কাগজই এই দুটি সংগঠনে প্রতিনিধিত্ব করলেও, বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিই নীতি নির্ধারণের ([ত্রে চূড়ান্ত কথা বলার জায়গায় ছিল।

এ পি আই'র মালিকানা বদলের প্র(েটি প্রথম উঠে ১৯৪১-র ডিসেম্বরে আই ই এন এস'র একটি বৈঠকে। বৈঠকে সভাপতি আর্থার মুর দাবি তোলেন, রয়টারের ([ত্রে যা হয়েছে এ পি আই'র ([ত্রেও সেভাবে মালিকানা বদলানো হোক। রয়টার কর্তৃপ(আই ই এন এস'র দাবি খারিজ করে দেয়নি। তবে তাদের যুক্তি(ছিল দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধ চলাকালীন বিষয়টি উত্থাপন না-করাই ভালো।

রয়টার কর্তৃপ(চেষ্টা করেছিল ভারতে বাণিজ্যিক স্বার্থ যতটা সম্ভব র(া করতে। এ পি আই'র মালিকানা ও রয়টার পুরোটা ছাড়তে চায়নি। যুদ্ধ চলাকালীন এ ব্যাপারে নিষ্পত্তিও কিছু হয়নি। আই ই এন এস যদিও ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থার দাবি থেকে সরেনি। ১৯৪৭-র ফেব্রয়ারিতে আই ই এন এস প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (পিটি আই) প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। নেহ(র নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারও আই ই এন এস'র দাবিকে সমর্থন জানায়। শেষপর্যন্ত এ পি আই' মালিকানা রয়টার তুলে দেয় পি টি আই'র হাতে। কিন্তু প্রথমের দিকে শুধুমাত্র ভারতীয় সংবাদের ([ত্রটাকেই ছেড়ে দিয়েছিল রয়টার। বিদেশী সংবাদের ([ত্রে একচেটিয়া প্রাধান্য রয়টার কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায়নি। রয়টারের প্রস্তাব ছিল পি টি আই'কে বিদেশী সংবাদ সরবরাহ করবে শুধুমাত্র তারাই। আই ই এন এস এবং পি টি আই কর্তৃপ(রয়টারের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। তারপর থেকে বিদেশী সংবাদ সংগ্রহের ([ত্রে পি টি আই স্বাধীন ভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়।[১১]

উপসংহার

ঔপনিবেশিক সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন সার্বভৌম ব্যবস্থাপনায় এই উত্তরণ সংবাদ প্রবাহ ও সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা, সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার ([ত্রে,

উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ঔপনিবেশগুলির মধ্যে সর্বত্রই এভাবে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ঔপনিবেশিক জমানাতেই এদেশে জাতীয়তাবাদী মহল বিকল্প সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই। বলাবাহুল্য, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তা এক ইতিবাচক মতাদর্শকেও উন্মোচিত করেছিল। নগ্ন করেছিল ঔপনিবেশিক উপরিকাঠামোর অন্তর্লীন অসঙ্গতিকেও।

সূত্র নির্দেশ

১। স্মিথ, অ্যান্টনি, জিওপলিটিকস অফ্ ইনফরমেশান, (বস্টন কনস্টেবল, ১৯৭৮), পৃষ্ঠা ৭৫

২। ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ, এ নেশান ইন মেকিং, (কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ১৬৩

৩। স্টোরি, ব্রাহাম, রয়টারস সেঞ্চুরি (লন্ডন ম্যাকস প্যারিশ, ১৯৫১) পৃষ্ঠা ১২৩

৪। রীড, ডোনাল্ড, দি পাওয়ার অফ্ নিউজ (নিউইয়র্ক ও ইউ পি, ১৯৯২) পৃষ্ঠা ২৮

৫। পট্টবর্ধন, আর আর (সম্পা)- দাদাভাই নওরোজিস্, করসপণ্ডেন্স, ভলিউম ২, পার্ট২ (বম্বে অ্যালায়াভ পাবলিশার্স, ১৯৭৭ পৃষ্ঠা ৫১৭-৫১৮)

৬। স্বামী বিবেকানন্দ, কালেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম - ৮ (কলকাতা আর কে এম আই সি, ১৯৮০) পৃষ্ঠা ৪৭৭

৭। নিউজ এজেন্সিজ — দেয়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড অপারেশন (প্যারিস ইউনেসকো, ১৯৫৩)

৮। টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া, বম্বে, ৯-৯-১৯৩১

৯। ইজরায়েল, মিলটন, কমিউনিকেশনস্ অ্যান্ড পাওয়ার (নয়াদিল্লি ফাউন্ডেশন বুকস্, ১৯৯৪) পৃষ্ঠা ১২৭-১৫৫

১০। সেনগুপ্ত, বিধুভূষণ, সাংবাদিকের স্মৃতিকথা (কলকাতা ঃ ডি এম লাইব্রেরি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

১১। রাঘবন, জি এন এস, পি টি আই স্টোরি — অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অব্ দ্য ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যান্ড দ্য নিউজ এজেন্সি (নয়াদিল্লি পিটি আই, ১৯৮৭)

ভগৎ-সিং-এর চেতনায় প্রেম

প্রগতি মাইতি

১৯০৭-১৯৩১, মাত্র ২৪ বছরের যুবক ভগৎ সিং তাঁর সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যক্তি জীবনের প্রেম, দেশপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উন্নত চির মূল্যবান মন্তব্য রেখে গেছেন। মাণিক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ভগৎ-সিং রচনা সংগ্রহে এর নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রেম সম্পর্কে তাঁর এই চেতনা এমন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল যে তিনি দেশের ও বিপ্লবের প্রেমে আপ্লুত হয়ে হাসিমুখে প্রাণের মত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটিও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর জন্য যিনি প্রস্তুত — তাঁর কাছে তো মৃত্যু হার মেনে যায় — তিনি হয়ে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই তো তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল — 'বিপ্লবের বেদীতলে আমি আমার যৌবনকে ধূপের মত জ্বালিয়ে দিয়ে যাব'।

বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দিলীপ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা বর্ধমান বিভাগের উত্তর অংশে অবস্থিত। বীরভূমের উত্তর পশ্চিম দিকে বিহারের সাঁওতাল পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা। পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছু অংশ। দক্ষিণে অজয় নদী প্রবাহিত। স্যার হান্টারের মতে ল্যান্ড অফ হিরোস (বীরভূম)।[১] অন্য এক দলের মতে সাঁওতালি ভাষায় বীর অর্থে গভীর বনভূমি নিয়ে যে অঞ্চল। যাইহোক বীরভূমের ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হিসেবে সাঁওতাল আন্দোলনকে আমরা ধরতে পারি। বিদেশে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বীরভূমে অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। যদি ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম আন্দোলন ধরা হয় তা হলে বীরভূমে তার আগেই সাঁওতাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা বলা যায় — " The most interesting event in the subsequent history of Birbhum is the Santal rebellion of 1855, which broke out in the Santal Parganas and spread to this district."[2]

বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় একদিকে অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, একদিকে সমাজসংস্কারমূলক কাজ আবার অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান পাশাপাশি চলতে থাকে। এর একটি হল বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত 'খাদি আগার', অন্যটি বোলপুরের অদূরে বল্লভপুরে 'আমার কুটীর' স্থাপন। প্রথমটির নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লববাদী নেতাগণ। সমাজসংস্কারমূলক কাজের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও চতুর্দিকবর্তী গ্রামকে কেন্দ্র করে গ্রামে সমাজের পুনর্গঠন প্রয়াস। আবার লাভপুরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায়ের নেতৃত্বে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অধ্যায় বলা যায়। বলাবাহুল্য বীরভূমের কীর্ণাহার নিবাসী দেবনাথ দাস নেতাজীর ডাকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইসব আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ক্ষেত্রে সব সময় সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা হয় নি অথবা ধরা পড়ে না। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, সমাজসেবামূলক কাজ ইত্যাদি মিলে মিশে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বোলপুরে দেবেন্দ্রগঞ্জ নিবাসী বালেশ্বরভকত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার উল্লেখযোগ্য।* তিনি ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীভকত বীরভূমের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী অমর সরকারের * মাধ্যমে রেভোলিউশন পার্টির সংসর্গে আসেন এবং অনুশীলন দলে যোগদান করেন বঙ্কীমলের * সঙ্গে। গান্ধীজির আহ্বানে ভকত মহাশয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে আন্দোলনে এসেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যতীনচন্দ্র, নেপাল রায় ইত্যাদি কোর্টে পিকেটিং করেন, কোর্ট বন্ধ হয়। এই পিকেটিংএ উকিল ধূর্জটি চ্যাটার্জী মহাশয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সনে বোলপুরে লেবার সত্যাগ্রহ হয়। ১৯৩৩ সনে নভেম্বর মাসে বীরভূমে যড়যন্ত্র আন্দোলনে অনেকে গ্রেপ্তার হন।

এছাড়া বীরভূমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। বীরভূমের নানুর থানার কীর্ণাহারের নিকটবর্তী সরডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী কমরেড আব্দুল হালিম হচ্ছেন এর প্রধান নেতা। এই সময় ১৯৩৮ সনে লাভপুর থানার করুনহারে কৃষকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশ রক্তপতাকা উত্তোলন করেন মীরাট যড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সামসুল হুদা এবং উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আবদুল মোমিন। উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কামাদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সিউড়ি জেলে বন্দী জাতীয়তাবাদী ও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রেবতী বর্মনের* কাছে তারাশঙ্কর মার্কসবাদী প্রেরণা পেয়েছেন বলে অনেকে মনে করেন।

বলা-বাহুনীয় অখন্ড বীরভূমের অপেক্ষা বোলপুর-লাভপুর-নানুর এই ত্রয়ীর বলয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি খন্ড রূপরেখার মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন কিছু ঘটনা বোঝার চেষ্টা হয়েছে। যার গতি অধিকাংশ সময় সমন্বয়ের অনুযায়ী ও কর্মসূচী সমাজপরিবর্তনের দিশারী। তাই কখনও অসহযোগ, আইন অমান্য আবার কখনও সন্ত্রাসবাদী ধারা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা আবার অনেক সময় সমাজসেবা মূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাধীন ও স্বনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়।

বীরভূমের অন্যতম সন্তান তারাশঙ্করের মধ্যে উক্ত সকল প্রকার ধারার প্রভাব পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের চরিত্রে স্বাদেশিকতার মন্ত্র অতিবাল্যকালেই সঞ্চারিত হয়। বঙ্গভঙ্গের কালে রাখি বন্ধনের অনুষ্ঠান তাঁর বাড়ীতে হয়। ১৯০৫ সনে লাভপুরের স্কুলে বন্দে-মাতরম ধ্বনি মুখরিত হয়। পরবর্তীকালে পড়াশুনোর জন্য তিনি কলকাতায় গমন

করেন। ১৯১৫ সনে তিনি সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলকাতায় থাকাকালীন গুপ্ত সমিতির রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ১৯১৬ সনে বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বীরভূমে ফিরে এসে নানা ঘটনায় তাঁর ঐ ধরনের কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সনে তিনি আবার কলকাতায় যান ও সাউথ সুবার্বন কলেজে ভর্তি হন। এই সময়কালে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবী নলিনী বাগচী (১৮৯৬ - ১৯১৫) এবং নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণদেবতার নজরবন্দীবাবু যতীন) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের প্রভাবে তারাশঙ্কব ছাত্রাবস্থায় জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেন।[৭] যার ফলে তাঁর অন্যতম উপন্যাস ধাত্রী দেবতার শিবনাথ প্রথমে সন্ত্রাসবাদী ও পরে গান্ধীবাদী আন্দোলনের অংশীদার। এই শিবনাথই বীরভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে নানা সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতির পুনর্গঠন। এই সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সমাজসেবামূলক কাজ আরম্ভ করেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই জমিদার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেও সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিকল্প পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর লিখিত উপন্যাস গুলি বিশেষভাবে ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ইত্যাদির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। একটি সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন , আবার স্বাধীন সমাজ কেমন হবে তার আর্দশ হিসেবে বেশকিছু পাত্রপাত্রী ও তাদের ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে তার পরিচয় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র সনৎ কুমার বন্দ্যোপধ্যায় তাঁর পিতৃপ্রণাম প্রবন্ধে বলেছেন - 'তাঁরই জন্য তিনি মানুষের সেবা করেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, রাজনীতি করেছেন'।[৮] ১৯১৭ সনে সাউথ সুবারবন কলেজে ভর্তি হন এবং রাজনৈতিক কারনে এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে মানসিক একাত্মতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদসাপদ গহণ করেন। ১৯২১ সনে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুলিশের খাতায় নাম উঠল। লাভপুর থানায় তাঁর নথি আজও রয়েছে। ১৯২৩ সনে গ্রামীণ শিক্ষা প্রসারের ও বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থানীয় মন্ডলীগ্রামে ভূমিখন্ড দান করেন। এই সময় লাভপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাঁর যে কার্যকলাপ তাঁর পটভূমি ছিল ঐ সময়ে বীরভূমের কলেরা মহামারী দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তিনি ঐ সমাজের এক জন হিসেবে ঐ সব বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ও সক্রিয় অংশ গহণের মাধ্যমে তার উন্নতি ঘটাতে

চেয়েছিলেন। যেমন 'আমার কথা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, '১৯৪২ সনে আমাদের অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সে আক্রমণ ব্যাপক। মাসখানেক ও মাস দেড়েক মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে গোটা অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি একটি সেবাসমিতি গঠন করে সেবাকার্য করেছিলাম।'[৮]

এছাড়া এই সময় বোলপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচী ও শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা তারাশঙ্করের সামনে ছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর গ্রন্থ সমালোচনা আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রবন্ধে তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলেছেন, 'গান্ধীবাদী রাজনীতির আকর্ষণ, অন্যদিকে ঐ বলয়ে অবস্থিত রবীন্দনাথের পল্লীউন্নয়ন প্রয়াসে সহযোগিতার প্রবল অভিপ্রায় ছাড়াও পারিবারিক উত্তরাধিকার লব্ধ জমিদারি তাঁকে গ্রামসমাজের নানা বর্গের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌছে দিয়েছিল'। বলা বাঞ্ছনীয় যে গ্রাম পুনর্গঠনের ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের অনুসারী হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা গান্ধীজীর পথ অধিকমাত্রায় অনুসরণকারী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্য ধরা পড়ে। কারণ অসহযোগ আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সে আন্দোলনের প্রভাব পড়ুক এটা চাননি। পক্ষান্তরে তারাশঙ্কর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সনে জমিদারতন্ত্রের পরিবর্তনের কথা বলেছেন তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্কর অসহযোগ আন্দোলনে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় তিনি এই আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সিউড়ির এস-ডি-ও মনি সেন তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দেশকে আমি ভালবাসি, আপনি একে নোংরা কাজ বলছেন, ছি।' ১৯৩০ সনে মহাত্মাগান্ধী আইনঅমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন।[১০] ১৯৩০ সনে ৬ই আগষ্ট তারাশঙ্কর লাভপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হলেন। তারাশঙ্করকে বিচারের জন্য সিউড়ী শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারে তাঁর জেল হয়। সি ক্লাশ বন্দীরূপে তাঁকে রাখা হয়। কারাদন্ড ভোগ করেন কয়েকমাস। ১৯৩০ সনে জেল থেকে বেরিয়ে বীরভূমের বোলপুরে কাছারী পটিতে প্রেস স্থাপন করেন। কিন্তু ব্রতচারী বিষয়ে জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে বিরোধ ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা ও স্থানীয় আন্দোলনকে সংগঠিত করার অভিপ্রায় প্রকাশিত হলে অল্পকাল পরে তা নিষিদ্ধ হলো। বলা বাহুল্য ১৯৩০ সনে বোলপুরে লেবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। কোর্টে পিকেটিং হয়। বোলপুরে তাঁর অবস্থান স্থায়ী হলো না অল্পকাল পরে আবার লাভপুরে ফিরে আসতে হলো। এই সময় বোলপুর

স্টেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা ও কথা হয়। নেতাজী বলেন, 'প্রেস উঠিয়ে দিন। তবু বংড দেবেন না, জামিনও দেবেন না।' আরও বলা দরকার কারাগারে তারাশঙ্কর .সুভাষপন্থী ছিলেন।

এই সময় ১৯৩২ সনে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ লাভ করেন। বীরভূমের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তারাশঙ্করের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষত বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ধারাকে বীরভূমে একত্রিত করার কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি গ্রামের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৩৫ সনে লাভপুরে প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে তারাশঙ্কর লাভপুর ১নং ওয়ার্ড-এ ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। সভাপতি ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর ছিলেন সহসভাপতি। ১৯৪৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারাশঙ্কর সহসভাপতি ছিলেন। নির্মলশিববাবুর মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে তারাশঙ্কর সভাপতি নির্বাচিত হন। অবশ্য এই পদে বেশীদিন বহাল ছিলেন না। কারণ তিনি ১৯৪৬ সন থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। [১১]

১৯৩৮-৩৯ সন থেকে তারাশঙ্কব ক্রমশ কমিউনিজম সম্পর্কে পরিচিত হচ্ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে অহীন্দ্র, বিজয়দা ও বিশ্বনাথ মূলত সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই অল্পকাল মধ্যে তিনি কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায় আরও অনেকের সঙ্গে তার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪২ সনে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপিত হলে তার সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। ঐ বৎসর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মূল অধিবেশনে তিনি সভাপতি হলেন। ১৯৪৪ সনে এর দ্বিতীয় সন্মেলনে সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায় বলেন, 'আমরা মানবজাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ তারই বিরুদ্ধে।' এই সময় অবশ্য তিনি কলকাতাবাসী হয়েছেন কিন্তু বীরভূমের সঙ্গেঁ তার যোগাযোগ অটুট ছিল। তাই স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনের দিন তিনি বীরভূমেই উপস্থিত ছিলেন। তারাশঙ্কর আমার কথায় লিখেছেন - "১৫ই আগষ্ট আমি কলকাতায় ছিলাম না। কলকাতার যে সমারোহ, সে বিপুল জীবনোচ্ছ্বাস আমি দেখিনি। তার জন্য কোন খেদ নেই আমার। লাভপুর থেকে আমার ডাক এসেছিল। চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল - লোকে চেয়েছিল - তোমাকে আসতে হবে। লাভপুরে স্বাধীনতার পতাকা তোমাকেই তুলতে হবে।[১২] " নির্দিষ্ট দিন মধ্য রাত্রির সময় শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে তারাশঙ্কর পতাকা তুললেন, স্বাধীন হল লাভপুর - বীরভূম - ভারতবর্ষ।

সূত্রনির্দেশ

১) L.S.S.O. Malley, *Annals of Rural Bengal*. Bengal D -28

২) *Bengal District Gazetters: Birbhum.* Page - 28

৩) বালেশ্বর ভকত বোলপুর দেবেন্দ্রগঞ্জ। ১৯০৫ সনে হিন্দু ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। (সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ধর্মদাস সাহা মহাশয়)

৪) অমর সরকার : বীরভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী।

৫) বস্তীমল : বোলপুর নিবাসী যুবক, ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন।

৬) অরুন চৌধুরী : তারাশঙ্কর যেমন জেনেছি ও বুঝেছি। পৃ ২৪

৭) অরুন চৌধুরী : তারাশঙ্কর যেমন জেনেছি ও বুঝেছি। পৃ ২৪

৮) সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পিতৃপ্রণাম। পৃ ৯
পশ্চিম বঙ্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা।

৯) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা।

১০) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : অন্তরঙ্গ তারাশঙ্কর। পৃ - ৪২

১১) চিন্তামনি মুখোপাধ্যায় : ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি তারাশঙ্কর। পৃ - ৯৬

১২) সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার পিতা তারাশঙ্কর। পৃ - ১২, ১৩

বিপিন চন্দ্র পাল ও স্বদেশী আন্দোলন

ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানত চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায় - নরমপন্থী, স্বাদেশিক বা আত্মোন্নতি, চরমপন্থী ও সশস্ত্র পথ। চরমপন্থী মতাদর্শের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। এই আদর্শের অপর দুই প্রবক্তা লালা লাজপত রায় ও বালগঙ্গাধর তিলকের কাজের ক্ষেত্র বাংলাদেশ না হওয়ায় আপাতত এক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের বিষয়টি আলোচনা পরিধির অন্তর্ভুক্ত করছি না। কিন্তু বিপিন চন্দ্র পাল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের নরমপন্থী পথ ও নেতৃত্বকে আক্রমণ করেন। দেশপ্রেমের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা বিপিন পাল ক্রমেই গড়ে তুলছিলেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় প্রকাশও করছিলেন। তাঁর কাছে দেশপ্রেমের অর্থ ছিল দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার। বিদেশী শাসকদের প্রতি আনুগত্য এবং দেশপ্রেম সেজন্যই তাঁর মতে একই সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। ১৯০২ সালের ১৭ই জুলাই লিখিত [দি টেস্ট অফ পেট্রিয়টিজম] প্রবন্ধে পাল লেখেন যে আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির নতুন একটা নাম হয়েছে ক্ষোভ প্রকাশ - বা 'agitation' কিন্তু ইংলন্ডে ব্রিটিশ জনগনের ক্ষোভ প্রকাশ আর আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ সমার্থক নয়। কারণ ব্রিটিশ জনগনের হাতে আসল রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, তারা পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রন করে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর মন্ত্রীদের কাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সুতরাং তারা দাবী করে, সেই দাবী পূরণ না হলে সাংববিধানিকভাবেই তারা তাদের দাবী পূরণের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু আমরা কেবল মাত্র প্রার্থনা বা ভিক্ষা করতে পারি মাত্র। আমরা আবেদন করি এবং আবেদন মঞ্জুর না হলে কান্নাকাটি করি মাত্র। এখানেই আমাদের সব প্রচেষ্টার শেষ। সুতরাং তাঁর নিজের ভাষায় "Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice; and the time perhaps is coming, faster than we had thought, when Indian patriotism will be put to this test".[১] এই একই যুক্তি তিনি দেখিয়েছিলেন ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'ভান্ডার' পত্রিকায়, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ উত্থাপিত প্রশ্নের 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদনুসারে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনের প্রণালী

আমাদের দেশে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কি না? অথবা আমাদিগের অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কি না?' র – উত্তরে।

মডারেট নেতাদের ভিক্ষা বৃত্তি সুলভ আন্দোলনের পদ্ধতিকে বিপিন চন্দ্রই সবচেয়ে বেশী তীব্র ও তীক্ষ্মভাবে আক্রমণ করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অন্যান্য জমিদার নেতৃবৃন্দ ভারত সচিবের কাছে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন পত্র পাঠালে বিপিন পাল অত্যন্ত সুষ্ঠ ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। ' দি পার্টিশান অ্যাজিটেশন ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ১৯০৫ সালের ৫ই আগষ্ট বিপিন চন্দ্র লেখেন যে আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে যদি তাঁরা সরকারকে লিখতেন এবং এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে না নিলে সমস্ত সরকারী কাজ কর্মকেই অচল করে দিয়ে প্রশাসনকে নতজানু করার কথা ঘোষণা করতে পারতেন তাহলে এই ব্যাক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের যথার্থতা থাকতো। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা যা করেছেন তাকে পাল লিখলেন - "But what will these cringing feminine prayers, or all this foolish and false agitation do, except proving our want of worth before those who are at present the masters of our political destiny." ঐ প্রবন্ধেই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তোলেন "They have ignored us. Why can't we, so far as it lies in our power, ignore the .ı also?"[২] ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এই প্রকার সম দৃষ্টিভঙ্গি সুলভ দৃষ্টিকোণ তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে অভাবনীয় ছিল। বিপিন পালের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সমতাকেও অতিক্রম করে আমাদের শক্তির প্রাধান্যকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিপিন চন্দ্রের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ আরও বেশী আশ্চর্যের কারণ তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিব নাথ শাস্ত্রীর মত মডারেট চিন্তার ধারক বাহকরা। শুধু রাজনৈতিক গুরুই নন, এঁদের প্রভাব বিপিন চন্দ্রের জীবনে, তার গড়ে ওঠায় ছিল ব্যাপক।

১৮৭৬ সাল থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে ব্যাক্তিগত, ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় স্বাধীনতার শপথ বাক্যও পাঠ করান। ফলে নিষ্ঠাবান হিন্দু পিতা রামচন্দ্র পালের সঙ্গে সম্পর্ক-চ্ছেদ। অপর দিকে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন এই সময়েই প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্রদের রাজনৈতিক সংগঠন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশান। সুরেন্দ্রনাথ এই সংগঠনে যোগ দেন এবং তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতাশক্তি ও দেশপ্রেমের দ্বারা সমগ্র ছাত্র ও যুব সমাজের অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন। বিপিন পালও এই সময়ে কলকাতায় পড়াশুনা করছিলেন। তিনিও সুরেন্দ্রনাথ দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর দৃষ্টি গোচরও হলেন। বিপিন পালের অসাধারণ বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের গুরু সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৯৮ সালে বিপিন পালের বিলাত যাত্রার জন্য অর্থ যোগান সুরেন্দ্রনাথ।[*] ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতায়

অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনেই বিপিন চন্দ্র শ্রীহট্টের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। সেই থেকেই আজীবন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ সাল থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতের বৈপরীত্য দেখা যায়। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক সভায় টাউন হলে বিপিন চন্দ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে - " শাসক জাতির সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের স্বার্থের সংঘাত " হিসাবে চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করেন।[৪] ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতাদর্শগত পার্থক্য প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স'-এর পথে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বিপিন পাল দেশবাসীর কাছে আবেদন করেন। ১৯০৬ সালের ২৯শে জুলাই নরমপন্থী ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক পদ্ধতিকে একেবারে ব্যর্থ বলে বিপিন পাল বর্ণনা করেন।[৫] ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিপিন পাল, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, তিলক, লাজপৎ রায় প্রমুখ এক নতুন জোটে আবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে তিলককে সভাপতি নির্বাচিত করে বিপিন পাল তার তথা তাদের চরমপন্থী নীতিকেই কংগ্রেসের নীতিতে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হন।

বিপিন চন্দ পাল স্বরাজ এর তত্ত্বকে ব্রিটিশ শাসন থেকে পুরোপুরি মুক্তি বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনিই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ কে প্রথম উপস্থিত করেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী 'স্বরাজ' কথাটি উল্লেখ করে বলেন, "Self-government as in the United kingdom or in the Colonies, that is Swaraj " বিপিন পাল নৌরজীর এই 'as in the United kingdom or in the Colonies'[৬] অংশটিকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে এই অংশটি সংযোজনের ফলেই স্বরাজকে কোন মতেই Self-government under British Paramountcy বলা যাবে না। তিনি দেখান যে ১৯০৫ সালের অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি ছিল ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির মধ্যে স্ব শাসন প্রতিষ্ঠার। এবং নৌরজীও ইংল্যান্ড থেকে তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে পত্রগুচ্ছ পাঠান তাতে তিনিও এই দাবীই করেন। কিন্তু বিপিন পালের মতে স্বশাসন ও ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির উপস্থিতি একই সঙ্গে কখনো সম্ভব নয়। কারন স্বশাসনের অর্থ যদি হয় আমাদের নিজেদের সরকার, নিজেদের কর প্রদানের অধিকার, নিজেদের আইন প্রণয়ন ইত্যাদি তাহলে পালের ভাষায় — "Would it mean - the self-government under British paramountcy - these and other essential rights and privileges of other self-governing communities? If it means all these, where would the paramountcy come in?"[৭]

গোখেল সহ মডারেট নেতারা স্বরাজ-এর তত্ত্বকে অবাস্তব বলে ব্যাখ্যা করেন, কারণ ব্রিটিশ জনগণ স্বরাজ বোঝে না। গোখেলের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বশাসন ব্যাপারটা

ব্রিটিশরা বোঝে ও মানে তাই সেই ব্যবস্থাটা ভারতবর্ষের জন্য আমরা চাইতে পারি। এর জবাবে মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে বিপিন চন্দ্র গোখেলের কথার অসারতা প্রমাণ করে দিয়ে বলেন ব্রিটিশ শাসকরা কোন প্রকার স্বশাসন তো দূরের কথা ভারতবর্ষের শাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মতামত বা কোন প্রকার বক্তব্যকে বিন্দুমাত্র স্বীকার-এ সম্মত নয়। মর্লের বাজেট বক্তৃতার অংশ বিশেষ তিনি উদ্ধৃত করেন। তিনি স্পষ্টই বলেন, যে তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না তা কোন তত্ত্বই নয়। সুতরাং গোখেল যখন বলেন যে স্বরাজ বাস্তবে প্রয়োগ হতে পারে না তাহলে এটা একটা স্বপ্ন বা ধারনা মাত্র হতে পারে কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে তাকে স্বীকার করা যাবে না। বিপিন পাল গোখেলের এই যুক্তি পুরোপুরি খন্ডন করে প্রমাণকরেন যে বরং গোখেল যে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে স্ব-শাসনের কথা বলছেন সেটাই বাস্তবে প্রযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু স্বরাজকে 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার পাতায় যথার্থভাবে সর্ব প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে স্পষ্টই বলা হয় " **We desire to make it autonomous absolutely free of the British Control".** ৮

বিপিন চন্দ্র স্বরাজের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশও তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। ২রা মে থেকে ৯ই মে তিনি মাদ্রাজ শহরে ছিলেন এবং একাধিক বক্তৃতায় তাঁর স্বরাজ ' স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ হিসাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স'এর তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু এর অনেক আগে 'বন্দে মাতরম ' পত্রিকায় অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব ব্যাখ্যারও আগে ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসের ' নিউ ইন্ডিয়া.' বিপিন পাল এই তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ করেন।[৯] বিপিন চন্দ্র বলেন যে ইংরেজ শাসনকে যদি আমরা সার্বিকভাবে অস্বীকার করি এবং প্রশাসনিক কোন কাজে অংশগ্রহণ না করি তাহলেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে যাবে। কারন এত বড় একটা দেশে এত ব্যাপক প্রশাসনিক কাজ ব্রিটেন থেকে লোক এসে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র প্রশাসনে কয়েকজন মাত্র ইংরেজ। কিন্তু আসল প্রশাসনিক কাজ করে ভারতীয় জনগণই। সুতরাং সবাই যদি তার কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলেই শাসক ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। এই ব্যবস্থাকেই বা আন্দোলনের পদ্ধতিকেই তিনি বলেছেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। তিনি দেখিয়েছেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা বিচারক বিদেশী কিন্তু প্রশাসনিক কাজের জন্য জেলা শাসককে, শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য এস. পি. কে, বিচারকাজের জন্য বিচারককে নির্ভর করতে হয় যথাক্রমে হাকিম, সেরেস্তাদার ইত্যাদি, ইনসপেকটার, সাব-ইনসপেকটার থেকে কনস্টেবল, চৌকিদার এবং বিচারের ক্ষেত্রে সহায়করা, উকীল ইত্যাদির উপর। এরা সবাই ভারতীয়। সুতরাং পালের ভাষায় — **"The aliens sit on the top, receive the fattest pay, but we do the most troublesome, the orduous, the most difficult, complex and complicated work. The administrative machinery would**

come to a stand-still, if we do draw ourselves away from it." [১০]
অতএব, ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বিতাড়নের জন্য ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যা এবং সরকারী সম্পত্তি ও টাকা ধ্বংস ও লুট করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পর্বে বিপিন পালের উপর অরবিন্দের প্রভাব ছিল। এবং অরবিন্দের অন্তত প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল সশস্ত্র আন্দোলন ধারার প্রতি। তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় বিপিন পালের কন্ঠেও যখন তিনি বলেন ইংরেজ সরকার আমাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর বলপ্রয়োগ করলে সরকারী আক্রমণের প্রতিবাদের জন্য আন্দোলনকারীরা যেকোন পন্থা গ্রহণ করতে পারে।

সশস্ত্র আন্দোলনকারীরা সঙ্গে আরও একটি ক্ষেত্রে বিপিন চন্দ্রের আত্মিক মিল লক্ষ্য করার মতো। চরমপন্থীরা বিপিন পাল ছাড়া আর কেউ এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। নরমপন্থীরা তো ননই। বিষয়টি হচ্ছে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন ধারার সঙ্গেঁ মিলিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। বিপিন পাল মনে করতেন যে শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একই ধারায় মিলিত হলে উভয় আন্দোলনই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই দেখি ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একাধিক শিল্প ধর্মঘট সংগঠনেও অংশ গ্রহণ করেছেন বিপিন চন্দ্র। সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের অন্যতম প্রোগ্রাম ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত করা।[১১] ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর-এ ভারত সরকারের প্রেসের মুদ্রণকর্মী ও কম্পজিটাররা ধর্মঘট করে, অক্টোবরে বাংলা সেক্রেটারিয়েট প্রেসের উক্ত কর্মীরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করেছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল ও অপূর্ব ঘোষ।[১২] পূর্ব ভারতের রেল ধর্মঘটের বিষয়ে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় অপূর্ব ঘোষের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা পত্রিকার কার্যালয়ে। সেই সভায় বিপিন পাল ধর্মঘটীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াও ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রাণ পুরুষ পুলিন বিহারী দাসের আত্মজীবনীর সূত্রে জানা যায় যে, ১৯০৬ সালে ঢাকার কিছু উৎসাহী যুবক বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে বক্তৃতার জন্য বিপিন পালকে আহ্বান করেন। ট্রেনেই বিপিন পাল পেয়ে যান ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রকে। বিপিন পালই পি. মিত্রকে ঢাকার যুবকদের সঙ্গেঁ পরিচিত করান এবং তাঁরই অনুরোধে পি. মিত্র ঢাকায় নামেন এবং বিপিন পাল ও পি. মিত্র-এর দ্বারা ঢাকায় একাধিক সভা হয় এবং প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকা অনুশীলন সমিতি।

শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়টি কিন্তু বিপিন চন্দ্র ১৯০৫ এর ব্যাপক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাবেননি। ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে আসাম চা বাগানের শ্রমিকদের মাহিনা বৃদ্ধির বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য তিনিই প্রস্তাব উথ্থাপন করেন। তাঁর এই ভূমিকা যুগপৎ তাঁর শ্রমিক দরদী মন এবং ইংরেজ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থায় শ্রমিক সমস্যার সমাধানের বিশ্বাস প্রমাণ করে। শুধু শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয় যাবতীয় মতাদর্শের প্রসঙ্গেই লক্ষ্যকরলে দেখা যায় যে চরমপন্থার অন্যতম জনক, স্বরাজের প্রবক্তা,

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ প্রদর্শক এই ব্যক্তির এই সকল কিছুই পরিণত চিন্তার সাক্ষ্য। কিন্তু শুরুতে তিনিও ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় নীতি ও বিচারপরায়ণতার প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল। ১৮৮৮ সালে তিনি অকল্যান্ড-হিউম বির্তকে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণকে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক ঘটনা বলেই শুধু উল্লেখ করেননি এমনকি এই মত প্রকাশ করেছিলেন " 'জনগণের সরকার', জনগণ পরিচালিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করতে, প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে, ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন আছে।"[১৩] বিপিন চন্দ্রের এই ব্রিটিশ ভক্তি ধাক্কা খায় যখন তিনি দেখেন বঙ্গচ্ছেদ বিষয়ে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ভারতীয় জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদে সরকার কোন রকম কর্ণপাত করে না। বরং প্রকাশ্যেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বক্তৃতায় এবং প্রকাশ্য নানা বক্তব্যে ইংরেজ শাসকেরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ভারতবর্ষের শাসনকাজের ক্ষেত্রে ভারতীয় কোন বক্তব্যকেই তারা স্বীকার করবে না। অর্থাৎ তাদের কাছে ভারতীদের কোন বক্তব্যের বিন্দুমাত্রও মূল্য নেই। তখনই তিনি এই শাসনের প্রকৃত চেহারা বুঝতে পারেন এবং ভারতীয়দের ক্ষমতার প্রসঙ্গটিও তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডারেই সঞ্চিত ছিল। সুতরাং ক্রম বিবর্তনের ধাপেই এই একদা রক্ষণশীল চিন্তাধারার মানুষটি উত্তরিত হয়ে যান চরমপন্থার আদর্শে। এই পরিণতিতে আমরা দেখি তাঁর চিন্তার অগ্রগতির স্তরগুলি। যেমন ১৯০২ সালে শিবাজী উৎসবের বক্তৃতায় বিপিন পাল বলেন, — "To us, he is a great Hindu nation builder. He is to us, the only incarnation, so to say, of the civic ideals and possibilities of the great Hindu people. Not as Bangalees, therefore, but as Hindus, really, we commemorate him to-day." .[১৪] ঐ বছরই ঐ উৎসবেই প্রদত্ত দ্বিতীয় একটি বক্তৃতায় তিনি এও বলেন — "Sivaji represents a movement, an idea, a national ideal .... That idea was the idea of a Hindu Rastra, which would unite under the political bond, the whole of the Hindu people, united already by communities of traditions and scriptures" (20th July, 1902). [১৫]

"Sivaji was a Hindu - he symbolised the religio-political ideal of the Hindu people. In honouring Sivaji, we honour that Hindu ideal. But in doing so we do not desire in the least to separate ourselves from the other Indian communities .... We shall be glad, ... and hope we shall soon have it - to have an Akbar celebration as well; for he too is one of our great men, one of the representatives of the great Indian Nation." [১৬] সুতরাং ১৯০৫ সালে বিপিন পাল আন্তরিকভাবেই

বিশ্বাস করতেন যে নতুন ভারত গঠিত হবে তা যে পরিমাণে হিন্দুর হবে সে পরিমাণেই মুসলমানের এবং অন্যান্য ধর্মমতের মানুষদেরও দেশ হবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা অতীতে একত্রে ও শান্তিতেই বসবাস করতো, ইংরেজরাই এখনই তাদের মধ্যে বিভেদ এনেছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, "If England safety depends upon a perpetuation of our mutual jealousies ... our own future as a nation depends equally upon our capacity to kill those jealousies." [১১]

চিন্তার জগতে বিপিন পালের এই উত্তরণ যেমন অবশ্যই তাঁর অভিজ্ঞতার দান তেমনি প্রধানত ভাবাবেগে চালিত এই মানুষটির মতাদর্শগত পরিবর্তনের মানসিকতা সঞ্জাতও। তিনি নিজেই অনেকক্ষেত্রে তাঁর মত পরিবর্তনের কারণও বলেছেন। কিন্তু মানসিক এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল তাঁর প্রচুর পড়াশুনা ও প্রগাঢ় পান্ডিত্যের কারণেও। শিশুকালে স্কুল জীবনে মেধাবী ছাত্রের স্বাক্ষর রাখলেও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় তিনি নিয়মিত ক্লাশে ফাঁকি দিতেন। একমাত্র শৃংখলাপরায়ণ অধ্যক্ষের ক্লাশটি করতেন বৃত্তি বাঁচানোর দায়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃত্তি ধরে রাখতে তো পারেনইনি। দুবারের চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও করতলগত হয়নি। কিন্তু ক্লাশে ফাঁকি দিয়ে হাজির হতেন প্রিয় একটি বইয়ের দোকানে যার মালিকের অনুমতিতে সেখানে বসে পড়তেন দোকানের প্রায় সব জাতীয় বইই। পরবর্তী জীবনে স্বল্পস্থায়ী হলেও কলকাতার ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারে চাকুরীর সূত্রে পেয়েছিলেন বইয়ের খনি। এছাড়া স্বভাবেই তিনি ছিলেন প্রচন্ড পড়ুয়া। ফলে দেশ বিদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেব তত্ত্ব , ইতিহাস, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনী, কর্মজীবন সবই ছিল তাঁর করায়ত্ত। এত ব্যাপক পাঠ তাঁকে স্বভাবতই যেকোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। চিন্তাধারায় বিপিন চন্দ্র কখনোই সনাতনপন্থী বা অনড় মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। প্রতিবাদী ও সমালোচনার মনোভাবের কাঠামোর উপরই তাঁর বৌদ্ধিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। কোন নিগড়েই তিনি নিজেকে বেঁধে ফেলতে চাননি। ব্যক্তিগত জীবনে বারবার নানা স্থানী হওয়া, ভিন্ন ভিন্ন কাজে এবং নানাবিধ পত্রিকার প্রকাশ কাজে যুক্ত হওয়া তাঁর মনের প্রকোষ্ঠগুলিকে সদা উদ্জীবিত ও জাগ্রত রেখেছিল। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস যাই থাক না কেন হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্ম ধর্ম কোন ধর্মেরই গোঁড়মি তাঁকে স্পর্শ করতে কখনো পারেনি। ১৯০৯ সালে অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতায় বিপিন পালকে উল্লেখ করেছিলেন "One of the mightiest prophets of Nationalism" বলে। রাজনৈতিক ভবিষ্যতদ্রষ্টা বিষয়ে বিপিন চন্দ্র পাল নিজেই ১৯০৫ সালের ২২শে এপ্রিল 'সিভিক ফ্রিডম এন্ড ইনডিভিজুয়াল পারফেকশান' শীর্ষক এক প্রবন্ধে কাউন্ট টলস্টয় প্রসঙ্গেঁ লিখেছিলেন, "The prophet is a seer, not a builder, his divine intuitions reveal to him the soul of truth, but not the methods by which it can be embodied in the life and institu-

tions of society."[১৮] – কথাকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একারণে যে স্বদেশী আন্দোলনে আমরাও বিপিন পালকে দেখি নানা তাত্বিক আলোচনার ও উদ্দীপনাময় বক্তৃতা প্রদানের নেতৃত্বে। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি খুঁজে পাইনা প্রায় আন্দোলনের মাঠে ময়দানে। তবে কি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বিপিন চন্দ্র পাল তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব নন ? – একথা বলা যাবে না কারণ, তিনিই নির্মান করে দিয়েছিলেন স্বরাজের তত্ব, প্রবর্তন করেছিলেন প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স -এর পথ। যে পথ ধরে যে লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছিল একান্ত তাঁর না হলেও, তাঁদেরই নির্দিষ্ট চরমপন্থী আন্দোলন ধারা। স্বদেশী আন্দোলনের মাঠে ময়দানে বিপিন পাল অনুপস্থিত থাকলেও স্বদেশী আন্দোলনকে তাত্বিক শক্তি যুগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বিপিন পালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের তাত্বিক নেতা হিসাবে বিপিন চন্দ্র পালের অবদান তাই অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১) The Test of Patriotism - Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal. 1954.

২) The Partition Agitation — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal. 1954 .

৩) The Swadeshi Movement in Bengal 1903 - 1908 — Sumit Sarkar, New Delhi, 1973.

৪) New India, Feb., 4, 1904 (ক্রোড়পত্র)– বিপিন চন্দ্র পাল, সরল কুমার চট্টোপাধ্যায়, নতুন দিল্লী, ১৯৯৪।

৫) তদেব।

৬) The Gospel of Swaraj — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal. 1954.

৭) তদেব।

৮) তদেব।

৯) বিপিন চন্দ্র পাল, সরল কুমার চট্টোপাধ্যায়, নতুন দিল্লী, ১৯৯৪।

১০) The New Movement - Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal – Cal. — 1953.

১১) বন্দেমাতরম, ৬ই জুন , ১৯০৭ — বেঙ্গল নেটিভ নিউজ পেপার রিপোর্ট — Political Protest in Bengal - Boycott & Terrioism 1905-1908, — Hiren Chakraborty, Cal. 1992.

১২) ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম - ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কলি, ১৯৪৯।

১৩) Speeches on Congress Resolution For the Repeal of The Arms Act (1887) — Writings & Speeches Vol-I. —B. C. Pal, Cal.— 1958.

১৪) The Sivaji Festival — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal.— 1954.

১৫) The Sivaji Festival-II — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal.— 1954.

১৬) The Sivaji Festival-III — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal.— 1954.

১৭) Composite Patriotism — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal. —1954.

১৮) Civic Freedom and Individual Perfection — Swadeshi & Swaraj — B. C. Pal, Cal.— 1954.

সাপুরজী সাকলাৎওয়ালা - ১৮৭৪-১৯৩৬
একটি মূল্যায়ন

অশোক মুস্তাফি

মানবিক অধিকারের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা এবং পশ্চিম ও পূর্বের প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম যোগসূত্র হিসাবে এখনও এদেশের এবং ওদেশের উদারনৈতিকবাদী এবং সাম্যবাদীরা সাকলাৎওয়ালাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর তিনি ভারতে অতিবাহিত করেছিলেন পরাধীন দেশের শিল্পায়ন ও স্বাতন্ত্র্যসাধনার নেপথ্য সাক্ষী হয়ে। যাবতীয় সামন্ততন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতায় বিলাতে তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ ব্যয়িত হয়েছিল। পৃথিবীর তাবৎ নিঃস্ব এবং অত্যাচারিত মানুষের সপক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন নিরলস সাম্যবাদী সদস্য হিসাবে।

১৯২৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে আয়ার্ল্যান্ডের বিভাজনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে লেবার মান্থলি পত্রিকায় তাঁর একটি মূল্যবান এবং সময়োপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় — "Indian Round Table Conference" শিরোনামে। এই প্রবন্ধে সাইমন কমিশন রিপোর্ট-এর অপরিপূর্তি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, রাজন্যদের সমস্যা এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রিক কাঠামোর উপযুক্ততা সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছিলেন। প্রসঙ্গত শোলাপুর, চট্টগ্রাম এবং পেশোয়ারের সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে তিনি অহিংস সংগ্রামের পাশাপাশি সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মেহনতী মানুষের অর্থাৎ প্রকৃত জনগনের বিপ্লবের একটি প্রচেষ্টা হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রমিকদলনের বিষয়টিকে নানান দৃষ্টান্ত সহকারে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন এবং এদেশে সরকারী সন্ত্রাসবাদের নগ্নরূপটিকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন ব্রিটিশ জনমতের সামনে। প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ, জাতীয় মুক্তিসাধনা এবং ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের একজন প্রোজ্জ্বল নায়ক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিংশ শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে। ইংল্যান্ডের North-

battersea নামক শ্রমিকপ্রধান এলাকা থেকে স্থানীয় শ্রমিকদলের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে প্রথমে এবং পরে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর পর দুইবার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টে প্রদত্ত যাবতীয় ভাষণে তিনি উপনিবেশিক মানুষদের স্বার্থরক্ষা করতে জোরালো সওয়াল করেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে তিনি আমৃত্যু সক্রিয়ভাবে লিপ্ত-ছিলেন। মুখ্যত এই কারণেই ইংল্যান্ডের বিদেশ দপ্তর তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিতে যথেষ্ট টালবাহানা করেছিল। অবশেষে ১৯২৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি এদেশে আসতে সমর্থ হন এবং এসে দেশের মেহনতী মানুষের নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেন। নারী এবং সংখ্যালঘুদের সমস্যাব বিষয়েও তিনি দেশবাসীকে অবহিত করেন। সর্বত্র সাম্যবাদ এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রবক্তা হিসাবে তিনি বহু বক্তৃতা করেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন — এইগুলির উপজীব্য ছিল প্রধানত ভারতীয় জনগণের অপরিসীম দারিদ্র এবং অশিক্ষা। শুধু সমাজকল্যাণে ব্রতী থাকলে হবে না বরং বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমাদের পরবশ অর্থনীতিকে আমূল পরিবর্তন করা যে প্রয়োজন, সেটা তিনি জীবনের প্রথমভাগে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শুধু ভারতের নয়, দারিদ্রতা হল সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকদেরই মূল সমস্যা। সেই কারণেই তিনি এই বিশ্বাসে অঙ্গীকৃত হন যে এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন হল সমাজতন্ত্রের সাধনা এবং সর্বত্র ধনিকশ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এই কারনে বিপুল সম্পদশালী টাটার মতো ধনিক পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, Independent Labour Partyর সদস্যহিসাবে ফলত স্বাভাবিক ভাবে ভারতের ও ইংল্যান্ডের কায়েমী স্বার্থের প্রভৃত বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে চিহ্নিত করে একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে। বস্তুত তিনি ছিলেন বর্ণবাদের এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের একজন প্রতিশ্রুত শত্রু।

১৯২৭ - এর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সাকলাৎওয়ালা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে গান্ধীজীর কাছে লিখিত কয়েকটি চিঠিতে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। পারস্পরিক এই পত্রালাপে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলন, খদ্দর এবং চরকাকে কেন্দ্র করে তার প্রচারণা, শিল্পশ্রমিক সংগঠনের বিন্যাস, ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের আসন্নতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসেছিল। সাকলাৎওয়ালার উদ্দেশ্য ছিল যে যুক্তির দ্বারা গান্ধীজীর মতের পরিবর্তন সাধন করা। বলা বাহুল্য প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী তাঁকে জানান, তাঁদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হল মেরুপ্রমাণ। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে উভয়ের এই ঐতিহাসিক পত্রালাপ সংশয়াতীত ভাবে কতকগুলি গুরুতর জাতীয় সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমালোচকরা ভারত তথা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে সাকলাৎওয়ালার অবদানকে স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন যে ধর্ম এবং সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা খানিকটা ছিল অকমিউনিষ্টসুলভ। তাছাড়া আন্দোলনের মানুষ হলেও, কঠোর অর্থে সাকলাৎওয়ালা সংগঠনের মানুষ ছিলেন না। একথাও ঠিক যে, সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কিছুটা শিথিল এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সূক্ষ্ম বিচারে সাকলাৎওয়ালা ছিলেন একজন প্রান্তিক মানুষ, কিছুটা প্রক্ষিপ্তও বটে। তাই সাম্যবাদী প্রচারণার ক্ষেত্রে তিনি যে নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন সে নিষ্ঠা দলীয় নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু ফলপ্রসূ হয়নি। সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী চেতনাকে অতিক্রম করে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পার্শী ভারতের মুক্তি সাধনায় ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নৌরজী, মাদাম কামা এবং সাকলাৎওয়ালা। সন্দেহ নেই যে ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষাবিস্তার, আধুনিকীকরণ তথা গণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে এরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে লিপ্ত করেছিলেন। তৎকালীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এঁদের তৎপরতায় কিছুটা পরিপুষ্ট হয়েছিল। এই সব পার্শী অগ্রপথিকদের মধ্যে সাকলাৎওয়ালা ছিলেন স্বভাবত স্বতন্ত্র। এমনকি সাম্যবাদী হিসাবেও তিনি ছিলেন কিছুটা ভিন্ন জাতের। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি ছিলেন একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব। কেননা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সার্বিক ভূমিকার বিশেষ করে পার্লামেন্টের বাইরে ইংরেজ ভাবাপন্ন ভারতীয়দের ভূমিকায় নিন্দায় তিনি ছিলেন সোচ্চার। পার্লামেন্টে তাঁকে বহিরাগত বলেই মনে করা হত। আর ভারতে সাম্যবাদের বীজ রোপণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন এবং ভারতীয় সাম্যবাদীদের মধ্যে বেশ খানিকটা গুরুত্ব লাভ করলেও ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট পাম দত্তের মত দলীয় যন্ত্রে তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিতে পারেননি। টাটাদের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য টাকা আদায় করার জন্য গান্ধীজীকে লেখা তাঁর চিঠি তাঁর সমধর্মীদের মনে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। C.P.G.Bর অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীতে তাঁর স্থান হয়নি, যদিও নিজস্ব নির্বাচনের কেন্দ্রে তাঁর একটা স্বতন্ত্র স্থান ছিল। পৃথিবীর প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর প্রোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলার শ্রমিকরা সাকলাৎওয়ালা দিবস পালন করেন। ১৯৩৭ সালে এবং ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবীরা স্পেনের গৃহযুদ্ধে সাকলাৎওয়ালা ব্যাটালিয়নের পক্ষে সংগ্রাম করেন। ব্রিটেনের ভারতীয়দের তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন থেকে আগত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন, বিশেষ করে ছাত্রদের সঙ্গে। নেহেরু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে বরাবর তিনি একটি সখ্যতার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। পার্লামেন্টে ভারত সমস্যার বিশ্লেষণের জন্য মতিলাল নেহরুকে আমন্ত্রণের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে।

সাহায্যকারী গ্রন্থ

১) Working Class of India — Sukomal Sen, K.P. Bagchi & Co. Calcutta, 1979.

২) The Fifth Commandment — Shri Saklatwala, National Book Agency Ltd. , Calcutta, 1996.

৩) Working Class and The Nationalist Movement in India — Rakhahari Chatterji, South Asian Publishers Ltd. New Delhi, 1984.

কাঁথি মহকুমায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন

'১৯৩২'

বিমল কুমার শীট

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা তিরিশের দশক থেকে শুরু হয়। তবে আন্দোলনের তীব্রতা প্রদেশ, জেলা ও মহকুমা সর্বস্তরে সমান ছিল না। মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা অহিংস ও সহিংস উভয় ধারা ছিল প্রায় সমান। জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে চলছিল বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ। ১৯৩২ খ্রীঃ কাঁথি মহকুমায় গঠনমূলক কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন। এই প্রবন্ধে আমি নিছক অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের বিবরণ বর্ণনা করিনি। জেলায় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, আন্দোলনের গতিধারা, সেই সঙ্গে আন্দোলনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৩২ খ্রী. অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলেও বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ বসুর কাজ জেলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭০ খ্রীঃ কাঁথি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিত দ্বারকানাথ ঘোষ এর প্রার্থনা সমাজ পরে যা ব্রাহ্ম সমাজ হয় তার ভূমিকা যথেষ্ট ছিল।[১] বিংশ শতাব্দীর ২য় দশকে জেলায় পন্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তবে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মনে উচ্চ শ্রেণীগুলির ঘৃণা, অবহেলা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রের সাহায্যে এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন।[২] পন্ডিত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, জাতিভেদ, শূদ্রের পূজা, বেদাধিকার, জলচল স্পর্শ, দোষ বিচার, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি পুস্তকের মাধ্যমে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র

আঘাত করেছিলেন।[৩] ১৯১৮ খ্রী পর থেকে তিনি খেজুরী, নন্দীগ্রাম, সূতাহাটা প্রভৃতি থানার সমাজসেবীগণের আহ্বানে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিলেন। মোট কথা মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের আগে জেলার কাঁথি মহকুমায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, জমিদার, প্রভৃতির মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা গড়ে উঠে ছিল। তবে ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বলতে গেলে ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের কথা বলতে হয়। তাঁর সবচাইতে বড় অবদান হল অস্পৃশ্যতা যে অভিশাপ কলঙ্কিত করে রেখেছে। আমাদের ভারতবর্ষীয় জীবনকে সেই অস্পৃশ্যতাকে একে একে উৎপাটিত করে দেওয়া।[৪]

১৬ই আগষ্ট ১৯৩২ খ্রী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা ঘোষণা করেন গান্ধীজী। ১৮ই আগষ্ট গান্ধীজী প্রধান মন্ত্রীকে জানালেন ধর্ম ও নীতির দিক থেকে হিন্দু ঐক্যের ওপর এতবড় আঘাত তিনি সহ্য করবেন না। ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন,[৫] গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে সাড়া ফেলে দেয়। তাঁর এই আন্দোলনের পিছনে নিছক কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না সে বির্তকে না গিয়ে একথা বলা যায় যে কাঁথি মহকুমায় আন্দোলন বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সরে থাকলেও গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তিনি দেশবাসীকে লক্ষ্য করে বলেন যে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ মহাত্মাগান্ধী ইংলান্ডের প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের অধিকারের প্রতিবাদ কল্পে অনশনব্রত অবলম্বন করবেন এবং সরকার ঐ পৃথক নির্বাচন নাকচ না করলে গান্ধীজী ঐ ভাবেই প্রাণত্যাগ করবেন বলে দৃঢ়পণ করেছেন।[৬] তিনি আরও বলেন - "আমি আশাকরি কাঁথির তথা সমগ্র মেদিনীপুর জেলার সকল সাধারণ মন্দির তথাকথিত অনুনত সম্প্রদায়ের জন্য ঐ ২০শে তারিখ হইতে খোলা থাকিবে। এতদিন যে অনুন্নত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের হাতে নৈবেদ্য ইত্যাদি দিতে পারে নাই। আজ যেন তাহাদিগকে সেই অধিকার দেওয়া হয়। এই প্রকার অধিকার না দিলে অনুন্নত সম্প্রদায় হিন্দু জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ...."[৭]

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ মহাত্মাজীর অনশন আরম্ভের দিন সকাল ৭টায় কাঁথি শহরের শিবালয় মন্ডপে উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে সমবেত প্রার্থনা হয়। শহরের মধ্যস্থিত কালিমন্দিরের সেবায়েৎগণ মহাত্মাজীর অনশনে বিচলিত হয়ে মন্দিরের দ্বার অনুন্নতদের জন্য খুলে দেয়। বেলা প্রায় ২টার সময় হাড়ি, মুচি, ডোম ও ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে নৈবেদ্য ও পুষ্পাঞ্জলি দেয়। কাঁথি শহরের ১ মাইল পূর্বে বন্দেমাতরম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিকল্পিত কপালকুন্ডলার কালিমন্দিরে ঐ দিন বিকালে হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি অনুন্নত জাতির লোকেরা পুষ্পাঞ্জলি ও নৈবেদ্য দেয়।[৮]

কাঁথি শহর শুধু নয় কাঁথি থানার বিভিন্ন শাখায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি গোপাল আচারীর নির্দেশে অস্পৃশ্যতা বিরোধী কাজকর্ম চলছিল। বানতনিয়া শাখায় ২০.৯.১৯৩২ তারিখে ১৯নং ইউনিয়নে কাপুয়া গ্রামের শিবালয় মন্দিরে উক্ত গ্রামের তথাকথিত উচ্চ নীচ বর্ণের হিন্দুগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে মহাত্মাজীর জীবন কামনা করেন এবং সমবেত ভাবে প্রসাদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতাভাব দুর করেন। ওতে স্থানীয় জমিদার গোপীনাথ পন্ডা পৌরহিত্য করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রায় ২শত গ্রামবাসী যোগদান করেছিলেন।[৯] তেঘরিগহিরাবোড় গ্রামেও অস্পৃশ্যতা বিরোধী সভা হয়। ঐ গ্রামে মহাদেব মন্দিরে তথাকথিত উন্নত ও অনুন্নত প্রায় ২৫০ জন হিন্দু নরনারী উপস্থিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলী ও নৈবেদ্য প্রদান করেছিল। তারমধ্যে ধোপা, জেলে, পৌন্ড ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০ - ৮০ জন উপস্থিত হয়েছিল। পুরোহিত নিজ হাতে এদের মাথায় চন্দন ও হাতে ফুল প্রদান করেছিলেন। নৈবেদ্য প্রদানের পর ব্রাহ্মণ এবং অনান্য সম্প্রদায় মিলিত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণা বাবদ পুরোহিত যা পেয়েছিলেন তা তিনি নিজে গ্রহণ না করে স্থানীয় কংগ্রেসকে দান করেছিলেন।[১০] ১৪নং ইউনিয়নের রসলপুর, দুরমুট, বেনমুন্ডি, রামচন্দ্রপুর, যশাবিকা, ফতেপুর ও দইশাই গ্রামের সর্ববর্ণের হিন্দুগণ নিজ নিজ গ্রামের শীতলা মন্দিরে ও মহাদেব মন্দিরে সমবেত ভাবে মহাত্মাজীর দীর্ঘ জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা প্রার্থনা করেছিলেন। রসলপুরবাসীগণ সত্যনারায়ণ পূজা করে সকলেই এক পংক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহন করেছিলেন।[১১] ২৬নং ইউনিয়নের বপু গ্রামে স্থানীয় শীতলা মন্দিরে ও মহাদেব মন্দিরে গ্রামের সকল বর্ণের হিন্দুগণ সমবেত প্রর্থনা করেছিলেন এবং নৈবেদ্য প্রদান করেছিলেন। সারদা ও হিঞ্চি গ্রামের শীতলা মন্দিরে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুগণ সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলী ও নৈবেদ্য প্রদান করেছিলেন। অনেকেই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করেছিলেন। ফুলেশ্বর, দুরমুট গ্রামের রাজরাজেশ্বরী মন্ডপে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য ব্রাহ্মণ করণ, ধোপা, কামিলা, হাড়ি প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করেছিলেন। নৈবেদ্য প্রদানের পর তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর দ্বারা প্রসাদ বিতরন করা হলে সকলে এক পংক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহন করেছিলেন।[১২]

পিছাবনী শাখাতে তালপুর হাটের উপর মহাত্মাজীর অনশন ব্রত গ্রহণ উপলক্ষ্যে এক সভা হয়েছিল। সভায় লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০ জন, বহু নরনারী উপবাস করেছিলেন। মহাদেব মন্দিরে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ধোপা, রাজু, হাড়ি, করোঙ্গা নমশূদ্র ও কোদমা এই সকল জাতি নির্বিবাদে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছিলেন।[১৩] ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রী কাঁথির সরস্বতী তলায় অস্পৃশ্যতা বর্জনের এক বিরাট সভা হয়। এতে প্রায় ১৫০০ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। স্থানীয় জমিদার বিরাজচরণ নন্দ এই মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় মহাত্মাজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করার পর পন্ডিত দেবেন্দ্রনাথ কাব্যপুরাণ স্মৃতি তীর্থ হিন্দু জাতির এই ধ্বংসের ও অবনতির কারন কি এবং গোঁড়া সমাজ চালকদের অত্যন্ত নীচপ্রথার নিন্দাবাদ করে

বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। সভার শেষে কাঁথি মহকুমার অস্পৃশ্যতা সমস্যা সমাধানের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[১৪]

চন্ডীভেটী শাখায় সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় সতীশচন্দ্র দীন্ডার সভাপতিত্বে সভা হয়। পুরোহিত রাসবিহারী পন্ডা অস্পৃশ্যতা বর্জনে সমাজে ব্রাহ্মণ সমাজকে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বক্তৃতার পর হেরম্বকুমার শাসমল উপস্থিত জনমন্ডলীকে পংক্তি ভোজনের জন্য আহ্বান জানান। এর ফলে প্রায় শতাধিক মহিলা এবং আটশত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু এক পংক্তিতে বসে মায়ের অন্নভোগ গ্রহণ করেন।[১৫]

পিছাবনীতে ১.১০.১৯৩২ তারিখ মহানবমী শেষ হওয়ার পর হাড়ি, ডোম, বাগদি, ধোপা, কোদমা, করণ, মাহিষ্য, একাদশি তিলি, রাজু প্রভৃতি উচ্চ ও নিম্নবর্ণের প্রায় ছয়শত হিন্দু এক পংক্তিতে বসে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।[১৬] বাণীপুকুর পাড়ে নবমীর দিন সার্বজনীন দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়। দেবেন্দ্র পন্ডা উক্ত পূজায় পৌরহিত্য করেন। তথাকথিত অবনত শ্রেণীর হিন্দুগণ প্রসাদ বিতরণ করলে প্রায় তিনশত হিন্দুতা সানন্দে গ্রহণ করেন।[১৭]

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্মণ শ্রেণী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রায় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরা পৌরহিত্য করেছিলেন তা কিন্তু নয়। তাই বুলেটিনে মন্তব্য করা হয়, চারিদিকে উন্নত অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে পংক্তি ভোজনের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে। ইহাতে কেহ কেহ ভাবিতেছেন দেশে আবার অনাচার আরম্ভ হইল।[১৮] পংক্তি ভোজন সকলকে করতে হবে এমন বাধ্য বাধ্যকতা ছিল না। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মাছ, মাংস, রসুন, পেঁয়াজ খান না। অনেকে অপরের পরিপক্ক অন্ন স্পর্শ করেন না। তাদের কে পংক্তি ভোজনে বাধ্য বাধকতা ছিল না।[১৯] পংক্তি ভোজনে ঘৃণার স্থান ছিল না। যাঁদের কোন নিষ্ঠা নেই, যারা সব খাদ্য ভোজন করেন, যাঁরা হোটেলে আহার করেন, ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন ভোজন করেন তাদের পংক্তি ভোজনে আপত্তি ভন্ডামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুখ হতে যখন শোনা যায় অস্পৃশ্যদের ছোঁয়া জিনিষ খেলে অথবা তাদের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করলে অনিষ্ট হয়, তখন তাঁরা এর পক্ষে কোন যুক্তি কি শাস্ত্র কি অন্য কিছুই প্রমান খাড়া করতে পারেন না।[২০] তবে আধ্যাত্ম বিজ্ঞান যে চরম মত পোষণ করে তা এই "যে কোন অসৎচরিত্র, নীতিহীন (অস্পৃশ্য বলিয়া নহে) ব্যাক্তি যদি কোন সাধু পবিত্র হৃদয় ব্যক্তির খাদ্য স্পর্শ করে তাহা হইলে ও সাধুর পবিত্র মনোভাবের উপর অপবিত্র মনোভাব বিস্তার করে।"[২১]

বুলেটিনে পুনরায় মন্তব্য করা হয়, " এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যাহাদের কোন খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, খাদ্যের স্থানেরও কোন বিচার নাই , যাহারা বিড়ালের মুখ দেওয়া খাদ্য, মাছি ময়লার দ্বারা পুষ্ট খাদ্য খাইতে যাহার কিছু মাত্র দ্বিধা হয় না তাহারা অন্যের ছোঁয়া দ্রব্য খাইবেন না কেন?"[২২]

এর ফলে রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীরা অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের কোন অনিষ্ট করতে পারেনি। মেদিনীপুর জেলা ছিল মাহিষ্য প্রধান। ব্রাহ্মণ এবং অনান্য উচ্চবর্ণের সংখ্যা ছিল তুলনা মূলক হিসাবে অনান্য জেলা অপেক্ষা কম। এর ফলে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন প্রকৃত জন জোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিল তারা সমাজের একটি অংশ, সমাজে তাদেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পূর্বের হীনমন্যতা ভুলে গিয়ে নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের পাশে এসে দাঁড়াল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নবর্ণের লোকের অস্তিত্বর বুঝতে শিখল। আগের তুলনায় অনেক বেশী। বঙ্গের অনান্য জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুর জেলা গঠন মূলক কাজের দিক দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল ।[২৩] Union Board বিরোধী আন্দোলনের পর স্বরাজ্য দল গঠিত হলে গঠনমূলক কাজও চলতে থাকে। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কারের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর (১৯২৫ খ্রী) পল্লীসংস্কারের জন্য - 'দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি'র কাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। নিমতৌড়ি অন্যতম কেন্দ্র হলেও অন্যান্য কেন্দ্র ও ছিল। গঠন মূলক কাজে এইসব কেন্দ্রের ভূমিকা যথেষ্ট ছিল। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় নয়, আন্দোলনের ভাঁটার সময়ও এই সমস্ত গঠনমূলক কাজ, সমাজসংস্কার মূলক কাজে জনসাধারণ যুক্ত থাকতেন। ফলে এই সমস্ত সচেতন সক্রিয় জনসাধারণকে যে কোনও আন্দোলনে ডাক দিলে তারা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিত। এছাড়া আন্দোলনের গোপনীয়তা এর ফলে রাখা ও সহজ হয়েছিল। মহকুমায় আন্দোলন এতখানি জনভিত্তিক হওয়ার পিছনে অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রভৃতি আন্দোলন ছিল অন্যতম।

সূত্রনির্দেশ

১) কাঁথি ব্রাহ্ম সমাজ - সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, ১৯৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

২) বসন্ত কুমার দাস - স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর
প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ Vol.-1 P.396

৩) ফণীন্দ্রনাথ মন্ডল - বঙ্গে দিগিন্দ্র নারায়ণ
প্রথম প্রকাশ 1926, P. 25

৪) ডঃ বি. আর আম্বেদকর - শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ P.-16

৫) অমলেশ ত্রিপাঠী - স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ - ১৯৪৭
প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৭ P-202

৬) পথের আলো বুলেটিন - ৫ই আশ্বিন ১৩৩৯ সন, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ কাঁথি থানার রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

৭) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

৮) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

৯) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১০) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১১) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১২) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১৩) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১৪) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

১৫) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

১৬) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

১৭) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

১৮) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

১৯) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

২০) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

২১) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

২২) পথের আলো বুলেটিন - Ibid. ১লা অক্টোবর ১৯৩২

২৩) দেশ – কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা ১৮৮৫ - ১৯৮৫ P - 42.

মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩২ - ৩৪

সাহানা খাতুন

ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে মেদিনীপুরের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় যে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাব ছিল দীর্ঘদিন। এর পর হতেই মেদিনীপুরের ইতিহাস হয় ঘটনাবহুল। ১৯১২ সালে মহরমের মিছিলে পুলিশের গুপ্ত সংবাদদাতা আব্দুর রহমানের উপর বোমা নিক্ষেপ, ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে কোনটাই-এ ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন, ১৯২৯ সালে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন, ১৯৩০ সালে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও পুলিশ অফিসার অনিরুদ্ধ সামন্ত হত্যা এবং নরঘাট লবন সত্যাগ্রহ, ১৯৩১ সালে কালেক্টর পেডীকে হত্যা, ১৯৩২ সালে জেলা কালেক্টর ডগলাস হত্যা ও ১৯৩৩ সালে জেলা প্রশাসক বার্জ হত্যা ছিল বিশ ও ত্রিশ-এর দশকে মেদিনীপুরের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন। এ সকল ঘটনার মধ্যে ১৯৩২-৩৪ সালে মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। উল্লেখ যে, এই প্রবন্ধের ব্যবহৃত তথ্যাবলী বাংলাদেশের জাতীয় মহাফেজখানায় তথা ন্যাশানাল আরকাইভস্-এ পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধী উদ্ভাবিত আইন অমান্য মেদিনীপুরের আন্দোলন ছিল তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নীতিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলনসমূহ ছিল অহিংস এবং এই আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল প্রধানত খাজনা প্রদান না করা ও অনৈতিক আইন অমান্য করা। ১৯১৭ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কমপক্ষে আট বার আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। এসব আন্দোলন সমূহের মধ্যে চম্পারন সত্যাগ্রহ (১৯১৭), গুজরাটের খেদা অথবা কৈরা সত্যাগ্রহ (১৯১৯), রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ (১৯১৯), অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), লবন সত্যাগ্রহ (১৯৩০), অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহ (১৯৩১-৩৪), ব্যক্তিগত বা একক সত্যাগ্রহ (১৯৪০) এবং

ভারত ছাড় আন্দোলনের জন্য পরিচালিত সত্যাগ্রহ (১৯৪২) ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] ১৯৩০-এর দশকে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা। এসময় কংগ্রসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯৩০ সাল হতে মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং এ সময় হতেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩২ সালের প্রথম দিক হতেই ডেবরা থানার এই আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে।[২] সাধারণভাবে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী সভা-সমাবেশ, মিছিল, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি ছিল প্রায় নিয়মিত ঘটনা। এছাড়া এই আন্দোলনের একটা বিশেষ বিষয় ছিল সপ্তাহে একদিন কংগ্রেসের পতাকা থানার উপরে উত্তোলন। থানার উপরে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলনের অর্থ যেন কংগ্রেস সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেছে।[৩] এছাড়া কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রচার পত্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে কংগ্রেস জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। কংগ্রেস পরিচালিত খাজনা প্রদান না করার আন্দোলনের ফলে ডেবরা থানা হতে ব্রিটিশ সরকার কেবলমাত্র এক- চতুর্থাংশ কর আদায়ে সক্ষম হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাট ও মেলায় কংগ্রেস কর্মীদের পিকেটিং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। ১৯৩২ সালে বালিচকের সবচেয়ে বড় হাটটি কংগ্রেস কর্মীরা বন্ধ করে দেয়। একই সাথে অন্য একটি এলাকায় বিকল্প একটি হাট বসানো হয় যেখানে কেবলমাত্র স্বদেশী দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে। ডেবরা থানার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে ব্যবসায়িগণ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীদের ভয়ে সরকারী হাট বর্জন করতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন হাটে বানিজ্যিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করলেও তা জনসমর্থন লাভ করেনি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ধারনা যে, বালিচক হাট বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সরকারের প্রচুর রাজস্ব ক্ষতি হবে। ডেবরা থানার আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ১৯৩২ সালে প্রণীত অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হলেও অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় তীব্রভাবে প্রকাশ পায়নি, কিন্তু এই জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহনের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। ১৯৩২ সালে জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের গতিধারা নিম্নোক্ত ছক হতে পাওয়া যাবে।[৪]

জেলা - মেদিনীপুর

থানা - ডেবরা

ইউনিয়নের নম্বর	গ্রামের নাম	ঘটনার তারিখ	ঘটনার বিবরন
১	হনুমানডিহি	৪.৬.১৯৩২	কর প্রদানের বিরুদ্ধে সমাবেশ
২	পরচিনন্তার খোলা	১৬.৭.১৯৩২ ও	কর প্রদানের বিরুদ্ধে সভা ও সমাবেশ
		২০.১০.১৯৩২	কর প্রদানের বিরুদ্ধে সভা ও সমাবেশ
৩	আদবালীপুর	৫.২.১৯৩২	কর প্রদানের বিরুদ্ধে সভা ও সমাবেশ
	মরাতলা	৭.৪.১৯৩২ ও ৯.৯.১৯৩২	শোভাযাত্রা
৪	মধ্যম সেতাকোনা	২৪.১.১৯৩২	খাজনা দানের বিরুদ্ধে সভা ও বয়কট
৫	ডেবরা ও সমুদ্রপথ	১৫.২.১৯৩২ হতে ২৭.১১.১৯৩২-এর বিভিন্ন তারিখে	শোভাযাত্রা ও মিছিল, থানায় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন, বয়কট, খাজনা প্রদান না করার জন্য সভা-সমাবেশ ইত্যাদি
৬	রামপুর ও কেদার	৭.১.১৯৩২ ও ১৫.১.১৯৩২	বয়কট, জনসভা ও মিছিল
৭	শ্রীপুর ও পূর্বধরখোলা	২৮.৪.১৯৩২ হতে ১৯.১১.১৯৩২-এর বিভিন্ন তারিখে	সভা-সমাবেশ, মিছিল এবং বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য যাত্রা অনুষ্ঠান পন্ড করা

৮	পেনুয়া	১২.৩.১৯৩২	লবন তৈরীর মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন
৯	লাউদা	৭.৩.১৯৩২ ৯.৪.১৯৩২	সভা-সমাবেশ ও মিছিল
১০	বালিচক	১৫.২.১৯৩২ হতে ৪.১.১৯৩৩ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে	হরতাল, সভা-সমাবেশ, মিছিল ও লবন সত্যাগ্রহ
১১	রাধামোহনপুর	১৮৬.১৯৩২	১৯৩০ সালে খিরাই থানায় পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদদের জন্য স্মরন সভা
	হিজলডালা	৩১.৮.১৯৩২	সভা-সমাবেশ, বয়কট ও খাজনা না দেবার জন্য আন্দোলন
	পানিগুই	১১.৯.১৯৩২	বয়কট, সভা-সমাবেশ, খাজনা না দেবার জন্য আন্দোলন

ডেবরা থানাকে বিপদজনক ঘোষনা করে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েনেব জন্য মেদিনীপুর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রধান যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন তা হলো -

ক. থানার উপর কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন, সমাবেশ ও মিছিল

খ. বালিচক হাট বন্ধ করে দেবার ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি

গ. চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান না করা।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের বাঙালী ডেপুটি সেক্রেটারী মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসকের বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করেন নি। তাঁর মতে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য ডেবরাকে বিপদজনক বলা সঠিক নয়। ডেবরা থানায় ৬১৪টি গ্রাম রয়েছে এবং এর মধ্যে ১৮টি গ্রামে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল মনে করেন যে ৫৯৬টি গ্রামের

অধিবাসীদের উপর অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়; কেবলমাত্র যেসব গ্রাম আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছে সেখানেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা যেতে পারে।[৫] একইভাবে বালিচক হাটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান না করার আন্দোলন সম্পর্কেও এই বাঙালী অফিসার ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবরণ অনুযায়ী মোট চৌকিদারী ট্যাক্সের এক-চতুর্থাংশ আদায় হয়েছে। কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে ট্যাক্স আদায়ের প্রতি ঐ স্থানের অধিবাসিগণ বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। অধিকন্তু ১৯৩২ সালে প্রণীত বঙ্গীয় জন নিরাপত্তা আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে (chapter IV of the Bengal Public safety Act; 1932) চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারা ও ব্যবস্থা রয়েছে যা প্রয়োজনে কার্যকর করা যায়। তিনি মনে করেন যে মেদিনীপুরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমষ্টিগত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে চান।

পুলিশের এই বাঙালী অফিসারের নাম বি. আর. সেন। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ প্রশাসনের সাথে জড়িত থেকেও তিনি ডেবরা থানার সকল অধিবাসিদের উপর নির্বিচারে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ হতে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাঙালী অফিসার বি. আর সেন মন্তব্য করেন যে মেদিনীপুরের ঘটনা ও পরিস্থিতি কেবলমাত্র স্থানীয় নয় বরং কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[৬] অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের তথ্য উল্লেখ করে তিনি জানান যে কংগ্রেস পরবর্তী অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে পারে সেক্ষেত্রে ডেবরা থানায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ৬৮,০০০টাকা কর আরোপ করা যুক্তিসংগত নয়, বিশেষভাবে যখন অর্থনৈতিক মন্দার কারনে সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। এই পরিস্থিতিতে বি. আর. সেন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য নতুন প্রস্তাব পেশ না করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

পুলিশ বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর মতামতের বিপরীত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ডেবরা থানার পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য সমর্থন করে মত প্রকাশ করেন যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন ডেবরা থানার সকল গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কোন গ্রামকে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত কর আদায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায় না।[৭] তবে তিনি মনে করেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত কর প্রদান হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। পুলিশ বিভাগের প্রধান তথ্য উপস্থাপন করেন যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন কোন সময় জনসমাবেশ ও সভা নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেও সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বল প্রয়োগ করে এসব সভা ও সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। যাই হোক, তিনি ডেবরা থানায় কিছু সংখক সৈন্য মোতায়েন করার

প্রস্তাব দেন।

১৯৩৩ সালের শুরুতে ডেবরা থানায় আইন অমান্য আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯৩৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী ডেবরা থানায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। উল্লেখ্য যে ১৯২৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী লাহোরে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা হয়। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা দাবীর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা এবং তখন হতেই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসারে পরিচিত হয়। ডেবরা থানার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ছিল প্রত্যুষে শঙ্খ ধ্বনি করা এবং কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন। বিকেল বেলা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৫০০ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল ডাকবাংলা পর্যন্ত পরিভ্রমন করে। তাদের সাথে ছিল জাতীয় ব্যানার এবং কংগ্রেসের স্লোগান দেয়। পরে তারা একটি সভা অনুষ্ঠান করে। ফেব্রুয়ারী মাসে ডেবরা থানার বিভিন্ন স্থানে খাজনা ও কর প্রদানের বিরুদ্ধে সভা ও প্রচারনা চলে। বালিচক হাট সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত থাকে। একই সময়ে কংগ্রেসের অর্থ সংগ্রহ প্রয়াস চলতে থাকে। মার্চ মাসে লবন আইন অমান্য করা হয় এবং খাজনা ও কর না দেবার প্রচারনা অব্যাহত থাকে। এটি পরিস্থিতিতে ১৯৩৩ সালের ১০ই এপ্রিল মেদিনীপুরের ডেবরা থানাকে বিপজ্জনক ঘোষনা করে তথায় এক বছরের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ডেবরা থানার অধিবাসীদের প্রদান করতে হবে।[৮]

'পিউনিটিভ পুলিশ'[৯] সমকালীন বাংলা নথিপত্রে 'পিটুনী পুলিশ' হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পিটুনী পুলিশ নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে যে ভেদনীতির আশ্রয় নেয় তা এক প্রকার কূটনীতি। আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের প্রতি সকল শ্রেনীর জনগণের সমর্থন যাতে গড়ে উঠতে না পারে এজন্য অতিরিক্ত পুলিশ কর আদায়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহন করা হয়। কোন কোন সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবর্গকে অতিরিক্ত পুলিশ কর প্রদান হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। নিম্নোক্ত তালিকায় উল্লেখিত সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবর্গ অতিরিক্ত পুলিশ কর আদায় হতে অব্যাহতি পায়।

ক) মুসলমান, খ) খ্রীষ্টান, গ) সরকারী কর্মচারী, ঘ) সরকারী পেনশনভোগী, ঙ) সরকারী খেতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং চ) ৫৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, ৫৮ জন ব্যক্তির অনেকেই ছিলেন ভূস্বামী ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক।[৯]

অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের জন্য আরোপিত কর থেকে অব্যহতির তালিকা দৃষ্টে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কংগ্রেসের এই আন্দোলনের প্রতি জনগনের সমর্থনের ক্ষেত্রে কূটনৈতিকভাবে বাধা প্রদানই ছিল ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। একদিকে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে

সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উজ্জীবিত করা এবং অন্যদিকে সরকারী কর্মচারী, পেনশনভোগী, খেতাবধারী ও ভূস্বামীদের বাদ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী শক্তিকে সমুন্নত রাখাই ছিল এই ভেদনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় ১৯৩০ সাল হতেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং এজন্য অতিরিক্ত চৌকিদারী ট্যাক্স ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করা হয়। মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি থানার ত্রিশ-এর দশকে মোতায়েনকৃত অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগনের উপর আরোপিত অর্থের পরিমান ও মাথাপিছু আনুপাতিক হার এবং পূর্বে আরোপিত চৌকিদারী ট্যাক্সের পরিমান নিম্নোক্ত সারণী হতে জানা যাবে।[১০]

থানার নাম	অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের সময়কাল	অতিরিক্ত অর্থের পরিমান (টাকা)	চৌকিদারী ট্যাক্সের পরিমান (টাকা)	আনুপাতিক অংশ (টাকা)
ভগবানপুর ও নন্দীগ্রাম	১৯৩০	৫,৯৩৪	১,৮৬৫	৪.০৫
কোনটাই, রামনগর ও পলাশপুর	১৯৩০	৬৫,৯২১	৫১,৮৫৫	১.২৭
দাশপুর	১৯৩০	৩১,৫৩৬	৭,৫৪৫	৪.১৭
কেশবপুর	১৯৩২	১৪,০৬৪	৯,১৩৪	১.৫৩
নন্দীগ্রাম	১৯৩২	১৩,৩৪৭	১৫,৫৩৩	০.৮৬
সূতাহাটা	১৯৩২	১৩,৯৮৬	৭,৭২৫	১.৮১
ডেবরা	১৯৩৩	৬৮,০৮৬	১১,৭৯৯	৫.৭৭

১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে ডেবরা থানার রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায় এবং এরই ফলে মোতায়েনের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য অতিরিক্ত কর আদায়ের বিষয়টি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। ডেবরা থানার মোট ৮৮৭৯টি পরিবারের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য হয়। অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয় নির্বাহের পর ১,৪৯২ টাকা ৯ আনা উদ্বৃত্ত থাকে কর্তৃপক্ষের নিকট। পিটুনি পুলিশের জন্য প্রণীত আইন অতিরিক্ত অর্থ আদায়কে সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যার্পণই ছিল একমাত্র নিয়ম স্বীকৃত পন্থা। কিন্তু আদায়কৃত অর্থ প্রত্যার্পণে ছিল বিবিধ বাধা। কেননা বিভিন্ন হারে ও বিভিন্ন কিস্তিতে ডেবরার অধিবাসীদের নিকট হতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং সেক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশ ভাগ ছিল নিঃসন্দেহে ছিল সুকঠিন। যাই হোক, এ বিষয়ে পরবর্তী কালে কোন সরকারী বিবরণী বা তথ্য পাওয়া যায় না।

সূত্রনির্দেশ

১. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, S. H Patil, **Gandhi and Swaraj**, New Delhi: Deep and Deep Publications, 1983; N. K. Bose and P. Partwardhan, **Gandhi in Indian Politics**, Bombay: Lavani Publishing House, 1967; Buddhdeva Bhattacharyya (et. al.), *Satyagrahas in Bengal, 1921-29*, Calcutta: Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd, 1977; Asha Rani, **Gandhian Non-violence and India's Freedom Struggle**, Delhi: shree Publishing House, 1981; Y. B. Mathur, **Quit India Movement**, Delhi: Pragati Publications, 1979.

২. মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী. **Government of Bengal, B — Proceedings, Home Department, Political Branch, Bangladesh National Archives, Bundle - 11, August 1934, Proceedings No. 250.** (এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল সরকারী নথিপত্র উপরোক্ত উৎস হতে নেয়া হয়েছে।)

৩. " .... includes processions taken out to demonstrate against Government, meetings at which non-payment of taxes , boycott of foreign article and general opposition to Government were impressed upon the audiences, and weekly attempts to hoist Congress flags on

the P.S. as a sign that Congress had taken over the functions of Government." বাংলার চীফ সেক্রেটারীর নিকট মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিনটেন্ডেটের পত্র, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৬১।

৪. পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৭৭।

৫. Why, it may well be questioned, should be (614-18=596) villages of Debra police station be called upon to bear cost of additional police when the only incidents which can be cited are aginst only 18 other villages in the area? Why again, it may be noted, should so many villages of the area be called upon to pay the cost of additional police when the only instances of disturbance that can be cited are against a few neighbouring villages which happened so many months, some about a year, back? The only villages on which additional police can be quartered for anti-Government demonstrations, processions etc., with reasonable justification are perhaps Debra and Balichak in the area in question." স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী বাঙালী বি. আর. সেনের অফিসিয়াল নোট, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩, পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৭৯।

৬. "The situation at Midnapore is not purely local affair. It is the outcome of the Civil Disobedience movement of the Congress which is an All-India movement. From all reports the movement now appears to be a spent up force. It can therefore be reasonably expected that before long the situation at Midnapore so far as Civil Disobedience is concerned will improve". পূর্বোক্ত।

৭. "In his letter the S.P. has drawn attention to the success of the no-tax campaign in this jurisdiction and also to the fact that there have had been frequent arrests of Congress messengers throughout the whole elaka. He also tells me that Congress volunteers move about throughout the jurisdiction of Debra urging people not to pay taxes. The situation, therefore, appears to be the same

throughout the whole jurisdiction of Debra P.S. and no village can be exempted. There will probably be certain specific cases of exemption of individuals but those will be dealt with by the local authorities in due course. The area liable is the whole of the P.S. jurisdiction and this has been very clearly stated in the draft notification which is attached to the S.P.'s letter." পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিস নোট, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩, পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৮১।

৮. Midnapore. No. 1822PI. 10th April 1933. In exercise of the powers conferred by section 15 of the Police Act, 1861 (Act V of 1961), the Governor in Council is pleased to declare that the whole of the area within the jurisdiction of the Debra police-station in the Sadar Subdivision of the district of Midnapore has been found to be in a disturbed and dangerous state and that the conduct of the inhabitants of the aforesaid area, has rendered it expedient to increase the number of police by the appointment of an additional police force to be quartered in the said area at the cost of the inhabitants thereof, subject to any orders which may be passed exempting any person or class or section of the inhabitants.

This proclamation shall remain in force for a period of one year.

G.P. HOGG, Chief Secy. to the Govt. of Bengal (offg.)

পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৮৫।

৯. পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৯০।

১০. মেদিনীপুর জেলা প্রশাসকের নিকট স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর পত্র, ১৭ জুলাই, ১৯৩৩। পূর্বোক্ত, প্রসিডিংস নং ২৯২।

বাংলায় মুসলিম লীগ রাজনীতি : ১৯৩৭ - ১৯৪৭

বিশ্বরূপ ঘোষ

সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির কুফল বর্তমান ভারতীয় জনজীবনে সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট। ইতিহাসের গতিপথে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রচলন বা রাজনৈতিক জীবনে ধর্মকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার এ দেশে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের খন্ডিত স্বাধীনতা ও এই উপমহাদেশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনেও অর্ধশতাব্দ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক ও ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রভাব বহুলাংশে দায়ী। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এক দশক অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের বাংলায় মুসলিম রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের অপব্যবহারই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সেই সময় রাজনীতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র মুসলিম লীগের কার্যকলাপের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কারণ সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার উৎস রূপে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল এবং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই দল বাংলার রাজনীতিকে বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষবাষ্পে জর্জরিত করেছিল।

বাংলার মাটিতে নগণ্যভাবে শুরু করে ক্রমশ : লীগ একান্তভাবে মুসলিমদের পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে উগ্র ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে বাংলার মুসলিম জনজীবনে লীগের প্রবেশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে বাংলায় বিভেদপন্থী মুসলিম লীগ ক্ষমতাশীল হয়। এই সময় থেকেই সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণমাত্রায় বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে প্রবেশ করতে থাকে এবং এর কুপ্রভাব শহরে-গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রাদেশিক রাজনীতিতে লীগের প্রভাবও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে এই দল বাংলায় প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব গোড়া থেকেই তাঁদের দলকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে পরিচালিত করতে থাকেন এবং ক্রমশ এটি একটি সাম্প্রদায়িক শক্তিরূপে বেড়ে ওঠে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কংগ্রেস সে সময় একটি প্রভাবশালী তথা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল।[১] তাই মুসলিমদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুন্ন করার জন্য লীগ সাম্প্রদায়িক প্রচারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে থাকে।

এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সুযোগে লীগ নেতৃত্ব মুসলিমদের মধ্যে লীগের প্রভাব বৃদ্ধি করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেস " মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচী " গ্রহণ করে মুসলমানদের আরও কাছাকাছি পৌছানোর প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের এই কার্যক্রম সফলতা লাভ করেনি। এটিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস-লীগ দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অভিযোগ করে যে এই গণসংযোগ গড়ে তোলার নামে হিন্দু কংগ্রেস ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।[২] লীগ নেতৃত্ব নিজের দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ধর্মকে প্রধান হাতিয়ার করে অগ্রসর হয় এবং সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী গ্রহণ করে তারা মুসলিমদের মধ্যে লীগের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। এর জন্য তারা অনান্য ধর্মীয় স্লোগানের সঙ্গে ' ইসলাম বিপন্ন ' এই রব তুলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পুরোমাত্রায় করতে শুরু করে।

তাছাড়া মুসলিমদের বোঝানো হয় যে কংগ্রেস হল একান্তভাবে হিন্দু সংগঠন। সেখানে তাদের কোনো স্থান নেই। কংগ্রেস শুধুমাত্র হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করে। তারা দেশে হিন্দুরাজ কায়েম চেষ্টা করেছে। এই কথার সমর্থনে লীগ নেতৃত্ব বন্দেমাতরম সঙ্গীত, কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা, বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা ও হিন্দী-উর্দু সমস্যা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি করে। তারা সুপরিকল্পিত ভাবে এই বিষয়গুলি তুলে ধরে ধর্মের দোহাই দিয়ে সহজেই সাধারণ মুসলিম জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে, অর্থাৎ বাংলায় প্রজা-লীগ সরকারের শাসনকালে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর সংহতি দৃঢ় হয়। সরকারী নীতির ফলে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে চাকরীতে ও অনান্য পেশায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩] অর্থ, সম্পদ ও শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে নব্য মধ্যশ্রেণী অধিকতর মাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে লীগ বাংলার মুসলিম জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার সময় ও সুযোগ লাভ করে।[৪]

ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব করার জন্য এবং তাদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করতে লীগ নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় যা পীরপুর রিপোর্ট বলে খ্যাত। কংগ্রেস সরকার দ্বারা শাসিত বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিমদের প্রতি অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন ও অত্যাচারের অভিযোগের এক দীর্ঘ

তালিকা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও এইসব প্রদেশে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ ও মহাত্মা গান্ধীর ছবির সামনে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। লীগ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে ইসলাম বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছিল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলিমদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের অতিরঞ্জিত ও বহুলাংশে কল্পিত ঘটনা বর্ণনা করে লীগ গোটা সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করে। এইসব বিষয় অবলম্বন করে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও প্রতীকটিকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক শুরু হয়।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে "কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরবস্থা " এই শিরোনামে ফজলুল হক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পীরপুর রিপোর্টের মতোই এখানে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এইসব ঘটনার ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে, কংগ্রেস মুসলিম জনসমর্থন হারাতে থাকে এবং বাংলার মাটিতে লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাংলায় সে সময় মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। সংখ্যালঘু হলেও বর্ণহিন্দুরা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর। আবার কৃষকদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাই ছিল অধিক। অন্য দিকে জমিদার-মহাজনদের মধ্যে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। বাংলার এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে লীগ নেতৃত্ব নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা চরিতার্থ করতে সুকৌশলে কাজে লাগায়। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে ঘোর সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া এর ফলে তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। এইভাবে ধর্মীয় তথা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচারের ক্ষেত্রে লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও বাংলার মুসলিমদের বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবর্গীয় মুসলিমদের মধ্যে, হিন্দু প্রাধান্যের ভীতি জাগ্রত করে লীগ নেতৃত্ব ধর্মীয় ভাবাবেগকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। প্রজা-লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর তারা এই ভাবাবেগকে হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারের ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বারবার ব্যবহার করতে থাকে। একই সঙ্গে বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজনদের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে মুসলিম লীগ-তপশীলী হিন্দু ঐক্যের প্রচেষ্টাও করেত তারা।[৫] অনেক ক্ষেত্রে এই ধরণের জোট গঠন করতে লীগ নেতৃত্ব সক্ষমও হয়েছিল।

রাজনৈতিকভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলিম লীগ বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন শ্রেণী ও কংগ্রেসকে কোনঠাসা করার এবং নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা

চালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বে তখন বর্ণহিন্দুদেরই প্রাধান্য এবং জমিদারদের প্রভাব ছিল। এর ফলে কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ দেখা দল বলে প্রচার করতে লীগ নেতৃত্বের বিশেষ সুবিধা হয়। এইসব কারণবশত বাংলার মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশ কংগ্রেসের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে।

মুসলিম লীগকে বাংলার মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের লীগ নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে এবং লীগের গুন্ডাবাহিনী তাদের অপমানিত ও নিগৃহীত করতে থাকে।[৬] ব্রিটিশ শাসকগণও জাতীয়তাবাদী মুসলিম চিন্তাবিদ - রাজনীতিকদের সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে লীগ নেতৃত্বকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া তৎকালীন বাংলার মুসলিম রাজনীতির ধারাও ছিল লীগের অনুকূল। তাছাড়া লীগপন্থীরা বাংলায় তাদের ক্ষমতা নানাভাবে দৃঢ় করতে নানান প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপিত হয়। এ সময়েই জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। তারা ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা - সব দিক থেকেই আলাদা। তাই মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন।[৭] এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা বাংলার মুসলিম জনমানসে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এসময় বাংলার লীগ সংগঠনে অবাঙালী মুসলিম নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। তারাই ছিল প্রাদেশিক লীগের মূল পরিচালক। লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে ধামাচাপা দিতেই লীগ নেতৃত্ব ধর্মীয় আবেগকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই অধিকতর গুরুত্ব দান করতে থাকে। তাছাড়া বাংলার লীগপন্থী মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান প্রস্তাবকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে 'মুসলিম সংস্কৃতি' ও 'হিন্দু সংস্কৃতি' থেকে পৃথক। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সাংস্কৃতিক বিভাজন বাংলার ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি।

১৯৪১-৪৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ - ফজলুল হক জোট মন্ত্রীসভার কালে এবং ১৯৪৩ সালে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাংলার জনজীবনকে দূষিত করে তোলে। এমন কী দুর্ভিক্ষের কঠিন দিনগুলিতেও লীগ নেতারা পাকিস্তানের দাবীতে সোচ্চার ছিলেন। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী কয়েক বছরে বাংলায় লীগের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময় কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পার্টিকে সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং লীগ মঞ্চ থেকে ইসলামীয় আদর্শ প্রচার করে বিপুল সংখক মুসলমানকে এর পতাকাতলে সমবেত করা।[৮]

১৯৪৩ সাল থেকেই মুসলিম ছাত্র ও যুবকদের সহায়তায় বাংলায় লীগের সংগঠনাকে প্রাদেশিক স্তর থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে। এর ফলে বাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে লীগের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এবং এর গণভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বাংলার মুসলিম নেতৃত্ব এবং কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান এই পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে। শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গেই ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক লোক লীগের সদস্য হয়। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা দশ লক্ষে পৌছয় এবং এই দল মুসলমান জনসাধারণের পার্টিতে পরিণত হয়।[৯]

ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ ও প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্র গুলিতেও প্রকট হয়েছিল। উদাহরণ-স্বরূপ :- মোহাম্মদ আক্রম খাঁ সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ'। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এই সংবাদপত্রটি বাংলার মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করেছিল। রাজনৈতিক ও জাতিগত বিদ্বেষ প্রচারেও এটি বিশেষভাবে দায়ী ছিল। মুসলিম সংস্কৃতি যে হিন্দু সংস্কৃতির থেকে পৃথক এবং মুসলিম ও হিন্দুরা যে দুটি আলাদা জাতি এই মনোভাব সাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ এই ধারণাকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেন। বাংলার মুসলমানের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, বিশেষভাবে তারই প্রভাব উচ্চ, মধ্য তথা নিম্নবর্গের মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে।[১০]

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকষি করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগ-সুবিধা যতটা সম্ভব আদায় করতেই লীগ সচেষ্ট ছিল। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারান্তরালে থাকার ফলে এই সময় সাম্প্রদায়িকতা ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করে। কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করে লীগ ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকষির রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেয়। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারও লীগের সাম্প্রদায়িক দাবীসমূহকে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার রাজনীতির মধ্যেই লীগের কার্যকলাপ এই সময় সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বও পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে কোনোরকম গঠনমূলক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ বাংলায় একক বৃহত্তম দলে

পরিণত হয়। তার ক্ষমতাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনেও লীগ যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে। এর ফলে লীগ নেতৃত্ব একথা বলতে শুরু করে যে এই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে ভারতের মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে এবং লীগই তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন। নির্বাচনে সাফল্যলাভ করতে লীগ নেতারা সাধারণের মধ্যে ইসলামের তত্ত্ব প্রচার করেন। তারা ইসলামীয় আদর্শ অবলম্বন করে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। এর ফলেও পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয় হতে থাকে। সমগ্র মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে লীগের ছত্রছায়ায় আনার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। সেই সঙ্গে লীগ রাজনীতিতে ধর্মীয় উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা আরও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই সময় ধর্মীয় আবেগকে উজ্জীবিত করে মুসলিম জনসাধারণকে লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রয়াস চলেছিল তাতে রাজনীতিতে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার সময় জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেন তাতে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের (উলেমা) সঙ্গে লীগ নেতৃত্বের সংযোগের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়।[১১]

পাকিস্তান দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য এইসব উলেমার (একবচনে আলিম) সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এদের লেখা ও বক্তৃতাসমূহ থেকে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ইসলামীয় আদর্শ প্রচারিত হয়, তা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ পাকিস্তান আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর লীগ নেতৃত্ব এই ধর্মতত্ত্ববিদদের পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল করতে উদ্যোগী হয়। বাংলায় জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দের প্রভাবকে খর্ব করে পাকিস্তানের সমর্থনে জনসংযোগ তৈরী করতে লীগ সমর্থক উলেমা সম্প্রদায় তাদের অনুগামীদের মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠন করে।

১৯৪০ সালে লীগ দ্বারা লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এর ফলস্বরূপ লীগ নেতৃত্ব জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ সংগঠনে ভাঙন ধরিয়ে ১৯৪৫ সালে নতুন প্রতিষ্ঠান জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই নতুন সংগঠনটি মুসলিম লীগের সমর্থনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে সারা ভারত জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলামের অধিবেশনে লীগ সমর্থক মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ পাকিস্তানের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু মুসলিম এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিল।[১২]

১৯৪৬ সালের মার্চ - এপ্রিল মাসে নির্বাচনের সময় লীগ রাজনীতিবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে উগ্র ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্দীপ্ত করেছিলেন। 'হিন্দু কংগ্রেস', 'হিন্দু জমিদার' ও 'হিন্দু ব্যবসায়ী - শিল্পপতি' তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়।

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬'এ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' উদ্‌যাপনের বিষয়ে লীগ পত্র-পত্রিকায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এতে বলা হয় ভারতে ইসলাম বিপন্ন এবং বলপূর্বক পাকিস্তান অর্জন করা গেলেই একমাত্র হিন্দু কংগ্রেসের আধিপত্য থেকে মুসলিমদের মুক্তি হবে ; কারণ একমাত্র পাকিস্তানই হতে পারে প্রকৃত ইসলাম ও শরিয়ত নির্ভর রাষ্ট্র।[১৩]

১৯৪৬-৪৭ সালের সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লীগ নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'মুসলিম জাতীয় রক্ষীদল'-কে সংগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। এই সময়েই এই বাহিনীর সক্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোনোরকম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষের সময় এই জাতীয়রক্ষীবাহিনী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতো। এছাড়া ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির কুফলস্বরূপ দেখা যায় বহু দুষ্কৃতী ও অপরাধী এই সময় ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে লীগ সংগঠনে যোগদান করেছিল এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। আবার এই সময়েই লীগ নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ লড়াই করে পাকিস্তান গঠনের আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে চলছিল।[১৪]

এইভাবে লীগ নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় এবং মুসলিম রাজনীতি ক্রমশ ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠতে থাকে। ইসলাম অবলম্বন করে যে ধর্মনির্ভর রাজনীতি বাংলার মুসলিম জনজীবনে প্রবেশ করে তার ফলে ধর্মীয় দাবীগুলি প্রবলতর হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয়। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশের ফলে অখন্ড জাতীযতাবাদের প্রভাব মুসলিমদের মধ্যে হ্রাস পেতে থাকে এবং ভারত ক্রমশ বিভাজনের পথে এগিয়ে যায়।[১৫] সুতরাং মুসলিম লীগ পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনে ধর্মের তথা ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

১) ভারত সরকাব সংস্কার কার্যালয় / নির্বাচন
Result of Election under Govt. of India Act 1935.

২) Indian Annual Register Jan-Jun 1937 Vol. I Chronicle of events. Editor N.N. Mitra.

৩) আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.৭.৪০; Bengal Legislative Council Proceedings Vol 2 No. 1 1940; Home (Appointment) Deptt. File No. 6E/20/1937.

৪) অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা (১৯৭৪) পৃ ২৮১।

৫) I.B. F/N 580A - 44; Transfer of Power Vol VIII No. 303.

৬) Calcutta Municipal Gazetteer 4.2.1939; Star of India 5.12.1941.

৭) Muslim League Resolution on Pakistan. National Archives of India File No 163/40R.

৮) আবুল হাশিম - আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, পৃ - ৪৬।

৯) কামরুদ্দীন আহ্‌মদ - বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৭ - ২৮; আবুল হাশিম - প্রাগুক্ত পৃ ৮৯; কামরুদ্দীন আহ্‌মদ - পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি পৃ : ৬৫। Abul Hashim: In Retrospection, Dacca, (1974).

১০) সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃ. ৫৪।

১১) Jamiluddin Ahmed: Speeches and Writings of Mr. Jinnah, Lahore, 1960. Vol.I, pp. 143-163.

১২) Amalendu De: Islam in Modern Bengal, Calcutta, (1982), pp. 214 - 229.

১৩) National Archives of India File No. 17/1/1946.

১৪) গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ইতিহাস অনুসন্ধান খন্ড ১৪, কলিকাতা, (২০০০) পৃ. - ২৯০-২৯১। Also see the paper entitled "Religion and Politics in Bengal : the History of Muslim League National Guards 1937 - 1947" presented by the author at the Calicut Session of the Indian History Congress, Calicut University, December (1999).

১৫) অমলেন্দু দে: ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা, কলিকাতা, (১৯৯২), পৃ: ১০৭-১০৮।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন - গান্ধীর রণকৌশল

গিরিশচন্দ্র মাইতি

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধী। আন্দোলনের মূল স্লোগান (গান্ধীর ভাষায় 'মন্ত্র') 'সিদ্ধি অথবা মৃত্যু ' তাঁরই দেওয়া। তাঁরই প্রবল আগ্রহে ৮ই আগস্ট ১৯৪২-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে এই আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে গান্ধীকে অনুরোধ জানানো হয়, আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি জাতিকে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলিতে পরিচালিত করুন।[১] এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কয়েক মাস আগে থেকেই গান্ধীর নানান ধরণের লেখা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি থেকে মনে হয়, তিনি শুরু করতে চাইছেন এমন এক আন্দোলন যা তাঁর আগের সব আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ৯ই আগস্ট, ১৯৪২-এ গান্ধী-সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের হঠাৎ গ্রেপ্তারের ফলে জনগণের মধ্যে তাৎক্ষণিক এক তীব্র প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয়ে যাওয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিঃসন্দেহে গান্ধীর আগের আন্দোলনগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের, কিন্তু গান্ধী জেল থেকে সেই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপগুলিও আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁর আগের বক্তব্যের পুরোপুরি বিপরীত। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে : গান্ধীর পরিকল্পনা বা রণকৌশল তা হলে কী ছিল ? বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গান্ধী ঘোষনা করেছিলেন, 'আমি ঠিক এখনই ভারতের মুক্তির কথা ভাবছি না।' পরে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার সময় তিনি পরামর্শ দেন , ব্রিটেনকে নিঃশর্ত সমর্থন জানানো উচিত এবং তা অবশ্যই অহিংস ভিত্তিতে।[২] তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে কংগ্রস ব্রিটিশকে বিব্রত না করার নীতিই গ্রহণ করে।[৩] গান্ধী ভেবেছিলেন ব্রিটেনের বিপদের সময় তাদের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে আপসে স্বাধীনতার দাবি আদায় করতে পারবেন। ১৯৪০ -এর ১৬ই জানুয়ারি তিনি স্বীকার করেন : 'আমি লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ নই। আমি একে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে সত্য যাই হোক না কেন, আমি সুভাষবাবুর অভিযোগ মেনে নিচ্ছি যে আমি

ব্রিটেনের সঙ্গে আপস করতে আগ্রহী যদি এটা সম্মানের সঙ্গে হয়। বস্তুত সত্যাগ্রহ এটাই দাবী করে। ... ব্রিটেনের ওপর আমি আস্থা হারাইনি।'[৪] পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী তখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলে তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন।[৫] বলা বাহুল্য তাঁর সে আশা অপূর্ণই থেকে যায়। তাঁর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনও নিষ্ফল হয়।

গান্ধীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক এই পরিস্থিতির অবসান ঘটল ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ জাপান আচমকা পার্ল হারবার দখল করে নিয়ে অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের পর। ১৯৪২-এর মার্চ মাসের মধ্যে বার্মা-সহ গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জাপানের পদানত হয়। ফলে যুদ্ধ এসে পৌঁছল ভারতের দোরগোড়ায় । জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তার প্রভাবশালী সদস্য ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠাল শাসন সংস্কার সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব দিয়ে। ২২শে মার্চ ভারতে পৌঁছে ক্রিপ্‌স্‌ তাঁর প্রস্তাব নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন তিন সপ্তাহ ধরে। কিন্তু তাঁর মিশন ব্যর্থ হল। গান্ধী প্রথম থেকেই ক্রিপ্‌স্‌ মিশনকে আমল দেননি। তাঁর ভারতে আসার কয়েকদিন আগে ১৪ই মার্চ গান্ধীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই জি. ডি. বিড়লাকে লেখেন : 'ক্রিপ্‌স্‌ আসতে চাইলে আসুন। বাপুর কাছ থেকে তিনি কী পাওয়ার আশা করেন ? তাঁর ব্যস্ত থাকা উচিত জওহরলাল ও রাজাজিকে তোয়াজ করতে।'[৬] গান্ধী যে আর কোনও আপস আলোচনায় যেতে চান না তা এতে স্পষ্ট। ২৭শে মার্চ ক্রিপ্‌সের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধী তাঁকে পরবর্তী বিমানে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন।[৭] ক্রিপ্‌স্‌কে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন , কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করবে না[৮] এবং জওহরলালকে লেখেন, 'আমার স্পষ্ট মত, এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারি না।'[৯] ৩১ শে মার্চ কুপল্যান্ড তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, গান্ধী ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'দেউলিয়া ব্যাঙ্কের পোষ্ট-ডেটেড চেক' (a post-dated cheque on a bank which is obviously going broke)।[১০]

এতদিন সত্যাগ্রহী গান্ধী ব্রিটিশের সঙ্গে আপসে আগ্রহী ছিলেন। এবার তিনি প্রস্তুত হন সংগ্রামের জন্য, যুদ্ধের কারণে স্বাধীনতাব জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিতেও তাঁর আস্থা নেই। শুধু তাই নয়, এতকাল লালিত অহিংসাকে তিনি ত্যাগ করতে কুন্ঠিত নন এমন কথাও বললেন। গান্ধীর এই অবস্থান পরিবর্তনের মূলে ছিল তাঁর দুটি ভাবনা। একটি হল, মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয় সম্পর্কে তাঁর অনাস্থা। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সেই সময়কার কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের এই ধারণা হয়েছিল।[১১] গান্ধীর নিজের লেখায়ও আমরা এই মনোভাবের পরিচয় দেখব। গান্ধীর অন্য ভাবনাটা এসেছিল দেশের মানুষের মেজাজ দেখে। 'লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী' তাঁর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন: 'কোনও মীমাংসা নয়, মীমাংসায় যাবেন না।'[১২] তিনি আরও লক্ষ করেছিলেন, জনসাধারণের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব

এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, জাপান ভারত আক্রমণ করলে তাঁরা জাপানকে সমর্থন করতে পিছপা হবেন না। দিল্লী থেকে ওয়ার্ধার পথে ট্রেনে ৫ এপ্রিল তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন . 'জাপানিরা ঘোষনা করেছে যে ভারত সম্বন্ধে তাদের কোনও অভিসন্ধি নেই। তাদের বিবাদ কেবলমাত্র ব্রিটিশের সঙ্গে। এ ব্যাপারে জাপানে আছেন এমন কিছু ভারতীয় তাদের সাহায্য করছেন। এক বিশাল সংখক মানুষ, তাঁরা কতজন অনুমান করা শক্ত, তাদের এই ঘোষনায় বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে তারা দেশকে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করবে এবং বিদায় নেবে। যদি সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে, তাঁদের ব্রিটিশ দাসত্বজনিত মানসিক অবসাদ এতই গুরুতর যে তাঁরা একটা পরিবর্তনের জন্য জাপানী দাসত্বকেই স্বাগত জানাবেন।'[13]

আজাদও লিখেছেন, ব্রিটিশের ভারত অধিকারের বিরুদ্ধে জাপানের প্রচার ও প্রতিশ্রুতিতে অনেক ভারতবাসী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একই সময় বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর বেতার বক্তৃতারও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী জাপানের প্রচার ও সুভাষচন্দ্রের বেতার বক্তৃতা ভারতের বহু সংখক লোকের মনে ছাপ ফেলেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন জাপানি আক্রমন যেহেতু ব্রিটিশ শক্তিকে দুর্বল করছে অতএব তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক এবং এই পরিস্থিতির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা উচিত।[14] এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের বেতার বক্তৃতার মূল কথা।[15] সমসাময়িক বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিবরণেও গান্ধী ও আজাদের বক্তব্য সমর্থিত। আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশার লিখেছেন, সেবাগ্রাম আশ্রমে ৫ই জুন, ১৯৪২-এ গান্ধীর বিশ্বস্ত অনুগামিনী জওহরলাল অনুরাগিনী খুরশেদ নওরোজি তাঁকে বলেন, সুভাষ বসু যদি সৈনাবাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি সমগ্র দেশের মানুষকে একত্রিত করতে পারবেন। জাপান সম্বন্ধেও তিনি আস্থার মনোভাব প্রকাশ করেন। খুরশেদ তাঁকে আরও জানান, নেহেরুর তুলনায় বসু বেশি জনপ্রিয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর আবেদন গান্ধীর চাইতেও বলিষ্ঠ। সমাজতন্ত্রী নেতা নরেন্দ্র দেব ও গান্ধীবাদী আর্যনায়কম ফিশারকে বলেন, দেশের জনসাধারণ নাৎসিদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁরা ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ও 'রিপালস' ডুবে যাওয়াতে সবচেয়ে খুশী। এমনকি গান্ধী ফিশারের সঙ্গে কথাবার্তায় গণতান্ত্রিক শিবির আর ফ্যাসিবাদী শিবিরের মধ্যে পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি।[16] আর এক আমেরিকান সাংবাদিক এডগার স্নো সেই সময় ভারতে এসেছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, জাপান ভারত আক্রমণ করলে ভারতের মানুষ বাধা দিতেন না এবং 'সুভাষ বসুর সুসংগঠিত পঞ্চম বাহিনী শত্রুকে সাহায্য করত।'[17]

এই পরিস্থিতিতে গান্ধী মনে করেছিলেন দেশের মানুষের মনে জাপানের প্রতি সহানুভূতির যে অন্তঃসলিলা স্রোত ফুলে ফেঁপে উঠছে তা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হল ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান। ভারত ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হলে জাপানের প্রতি জনগণের আর

সহানুভূতি থাকবে না এবং জাপান ও ভারত আক্রমন করবে না। কারন, তার বিবাদ ব্রিটিশের সঙ্গে।'[১৮] এইভাবে তিনি জাপানের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও ঠেকাতে চেয়েছিলেন। ১৫ই মে বোম্বাই শহরগুলি ও গুজরাটের কংগ্রেসীদের এক-বৈঠকে গান্ধী বলেন : 'বাস্তবিকই আমি মনে করি যে, সুভাষ বসুকে আমাদের ঠেকাতে হবে। আমার কাছে প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার ধারনা ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের দারুণ সংগঠন আছে।'[১৯] ফরওয়ার্ড ব্লকের দারুণ সংগঠন বলতে গান্ধী সম্ভবত দেশব্যাপী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য প্রভাবের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

গান্ধী সুভাষকে ঠেকাতে চাইলেও তাঁর অবস্থান পরিবর্তনের পেছনে সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের ব্যাপারটার সম্ভবত একটা ভূমিকা ছিল। তিনি এই কথা কখনও স্বীকার করেননি, কিন্তু আজাদ এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'তাঁর নানা মন্তব্য শুনে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে, ভারত থেকে পালানোর ব্যাপারে সুভাষ বসু যে সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা গান্ধীজির মন কেড়েছিল। সুভাষ বসু সম্পর্কে তাঁর গুনগ্রাহিতা তাঁর অজান্তে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজির মতামতকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। ভারতে ক্রিপ্‌স্ মিশন আসার পর যে আলোচনা চলে তা ঘোলাটে হওয়ার পেছনে এই মুগ্ধতাও কিছুটা কাজ করেছিল।'[২০] বিদেশের সাহায্য নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার সঙ্গে গান্ধী একমত না হলেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুভাষ যে ব্রিটিশকে বেশ বিপদে ফেলেছেন এটা সম্ভবত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তিনিও যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশকে নতি স্বীকারে বাধ্য করার কথা ভাবেন।

ক্রিপ্‌স্ দেশে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই গান্ধীর নতুন রণকৌশল রচনার কাজ শুরু হয়। ২২ এপ্রিল তাঁর কোয়েকার বন্ধু এবং ব্রিটেনের সরকার ও তাঁর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ইন্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপের হোরেশ আলেকজান্ডারকে গান্ধী জানিয়ে দেন: 'আমার দৃঢ় অভিমত, ব্রিটিশের এখন সুশৃঙ্খলভাবে ভারত ছাড়া উচিত এবং সিঙ্গাপুর, মালয় ও বার্মাতে যেমন ঝুঁকি তারা নিয়েছিল তেমন না নেওয়াই উচিত।'[২১] একই কথা আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন ১৯ এপ্রিল লেখা এবং ২৬ এপ্রিল 'হরিজন' -এ প্রকাশিত ' ভারতে বিদেশী সৈন্য ' শীর্ষক প্রবন্ধে : 'ব্রিটিশ যদি ভারতকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় যেমন তাদের সিঙ্গাপুর ছাড়তে হয়েছে অহিংস ভারতের হারানোর কিছু থাকবে না। সম্ভবত জাপান ভারতকে একা থাকতে দেবে। ... ভারতের ক্ষেত্রে পরিণতি যাই হোক না কেন, ভারতের এবং ব্রিটেনেরও নিরাপত্তা নির্ভর করে ভারত থেকে ব্রিটিশের সুশৃঙ্খল ও সময়োচিত বিদায় গ্রহণের ওপর।'[২২] ২৭ এপ্রিল থেকে ১মে পর্যন্ত এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন চলে। সেখানে না গিয়ে গান্ধী প্রস্তাবের যে খসড়া পাঠান তার বক্তব্য ছিল : জাপানের বিবাদ ভারতের সঙ্গে নয়। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভারত যদি স্বাধীন হয় তার প্রথম পদক্ষেপ হবে জাপানের

সঙ্গে বোঝাপড়া। ব্রিটিশ ভারত ছাড়লে জাপানী বা অন্য কোনও আগ্রাসী শক্তিকে ভারত ঠেকাতে পারবে অহিংস অসহযোগ পদ্ধতিতে। অতএব কংগ্রেস চায় ব্রিটিশ ভারত ছাড়ুক। ব্রিটেনের ও ভারতের নিরাপত্তা এবং বিশ্বশান্তির জন্য এটা দরকার।[২৩] গান্ধীর প্রস্তাবের ওপর তীব্র বিতর্ক হয়। জওহরলাল মন্তব্য করেন, জাপান ও জার্মানি যুদ্ধে জিতবে এই ভাবনা গান্ধীর প্রস্তাবের পেছনে কাজ করছে। শেষ পর্যন্ত যে সমঝোতা প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে গান্ধীর মূল বক্তব্যেরই জয় হয়।

এরপর গান্ধী তাঁর ভারত ছাড়ো প্রস্তাব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন প্রধানত 'হরিজন' পত্রিকায় ও অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকদের কাছে। জাপানের ভারত আক্রমণের সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখালেন : ভারতের মালিক যখন ভারতবাসীরা নন, ব্রিটেন, তখন জাপানের সমস্ত অধিকার রয়েছে তার শত্রু ব্রিটেনের সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালানোর। অতএব ভারতবাসীদের পক্ষে সঠিক পন্থা হচ্ছে অবৈধ দখলদারকে দেশ খালি করে দিতে বলা।[২৪] ১৪মে 'নিউজ ক্রনিক্‌ল' এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতকে ভগবানের হাতে অথবা আধুনিক ভাষায় অরাজকতার হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন।[২৫] ১৬মে সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি ঘোষনা করেন, যে 'সুশৃঙ্খল অরাজকতা' চলছে তার অবসান ঘটাতে তিনি আর এক অরাজকতার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কয়েকদিন পরে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : গত বাইশ-তেইশ বছর ধরে তিনি শুধু অহিংস আন্দোলনের কথাই ভেবেছেন, কিন্তু তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। আন্দোলনে যদি হিংসা দেখা দেয় তিনি তা বন্ধ করবেন না।[২৬] জুন মাসে লুই ফিশারের সঙ্গে কথাবার্তায়ও অরাজকতা ও হিংসার প্রশ্নে তিনি একই মনোভাব প্রকাশ করেন।[২৭] এই সময় গান্ধী আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন। তিনি বারবার বলতে থাকেন, ভারত থেকে ব্রিটিশ বিদায় না নিলে হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত ঐক্য আসবে না। কারন, সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যাপারটা ব্রিটিশের সৃষ্টি।[২৮] ভারতের বিভাজনকে তিনি 'পাপ' বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন , যখন জাপানি আক্রমনের সম্ভবনা থাকবে না তখন সময় আসবে পাকিস্তান ও অন্য স্থান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান অথবা লড়াইয়ের।[২৯]

গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে : 'অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই।' আবেদন ব্যর্থ হলে শুরু হবে গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে ৭ আগস্ট বোম্বাইয়ে।[৩০] ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার সময় জওহরলাল ও আজাদ আন্দোলনের প্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এতে গান্ধী খুব কঠোর মনোভাব নেন। তিনি জওহরলালকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে এবং আজাদকে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে বলেন।[৩১] ব্যাপারটা অবশ্য বেশি দূর গড়ায়নি। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে তাঁরা গান্ধীকেই সমর্থন

করেন। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে ওই দিন এবং পরের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে গান্ধী ঘোষনা করেন : ব্রিটিশের চলে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার কোনও সুযোগ নেই; প্রস্তাবিত আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণের কর্মসূচি থাকবে না ; আন্দোলন হবে 'যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র' 'এটি একটি অহিংস প্রকৃতির প্রকাশ্য বিদ্রোহ '; আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন, কিন্তু যদি দেখেন ব্রিটিশ সরকার কিংবা মিত্রপক্ষকে নাড়া দেওয়া যাচ্ছে না তবে তিনি 'চরম সীমায়' যেতে দ্বিধা করবেন না; এটা তাঁর 'সর্ববৃহৎ আন্দোলন।'[৩২]

৭ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্বনির্ধারিত অধিবেশনে গান্ধী ঘোষনা করেন, তিনি আগের মতো অহিংস নীতিই আঁকড়ে রয়েছেন। পরের দিন ভারত ছাড়ো প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তিনি বলেন : সম্ভব হলে তিনি এখনই এই রাতেই স্বাধীনতা চান, কিন্তু আন্দোলন এখনই শুরু হচ্ছে না। তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে বলবেন। এতে দু-তিন সপ্তাহ সময় লাগবে।[৩৩] কিন্তু সরকার গান্ধীকে সে সুযোগ দেয়নি। পরের দিন ভোরে গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে যে আন্দোলন শুরু হয় তা প্রধানত হিংসাত্মক রূপই গ্রহণ করে। বড়লাট লিনলিথগো একে '১৮৫৭-এর পর সবচেয়ে মারাত্মক বিদ্রোহ ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৩৪] প্রকৃতপক্ষে গভীরতা ও ব্যাপ্তির বিচারে এটি অতিক্রম করে গিয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ-সহ অতীতের সমস্ত জাতীয় সংগ্রামকে।

গান্ধী এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। জেল থেকে ১৪ আগস্ট বড়লাটকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন : 'ভারত সরকার সঙ্কট ত্বরান্বিত করে ভুল করেছে। ... আমি প্রকাশ্যে বলেছিলাম যে, বাস্তব ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমি আপনাকে একটি চিঠি পাঠানোর কথা ভাবছি। কংগ্রেসের দাবি নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনার জন্য এটি আপনার কাছে একটি আবেদন হত।' আন্দোলনের কোনও পর্যায়ে যে হিংসার কথা ভাবা হয়নি তাও তিনি জানান।[৩৫] ২৩ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবকে লেখা চিঠিতে তিনি জনগণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে 'বিপর্যয়' এবং 'পরিতাপজনক ধ্বংসলীলা' বলে অভিহিত করে প্রস্তাব রাখেন : 'আমার মনে হয় সরকারের পক্ষে সঠিক পন্থা হচ্ছে নেতাদের মুক্তি দেওয়া, সমস্ত পীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা এবং মীমাংসার উপায় খুঁজে বার করা।'[৩৬] ১৯৪৪-এর ৬মে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বলেন : আন্দোলন শুরুই হয়নি এবং তিনি নতুন করে তা শুরু করতে পারেন না; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে না, ১৯৪২-এর পরিস্থিতি আর নেই; তিনি চান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে, বাধা দিতে নয়।[৩৭] বড়লাটের সঙ্গে দেখা করা এবং একটা 'সম্মানজনক মীমাংসায়' আসার জন্য তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জিন্নার সঙ্গেও মিটমাটের তিনি চেষ্টা করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত রাজাগোপালাচারীর

ভারতবিভাজন প্রস্তাবে জেলে থাকার সময়ই তিনি সম্মতি জানিয়েছিলেন।[৩৮] পরে তিনিই উদ্যোগী হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তখন তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতভাগের প্রস্তাব নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে জিন্নার কাছে একটি ফরমূলা পেশ করেন।[৩৯] জিন্না অবশ্য তা প্রত্যাখ্যান করেন। জওহরলাল তাঁর জেল ডায়েরিতে গান্ধীর এই পরিবর্তিত ভূমিকাকে 'বড়লাট ও জিন্নার সামনে লুটিয়ে পড়া' বলে বর্ণনা করেছেন।[৪০]

ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরুর আগে এবং পরে গান্ধীর ভূমিকার এই পর্যালোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে , আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পেছনে তাঁর মূল রণকৌশল ছিল গতানুগতিক নয় এমন এক আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে ব্রিটিশকে স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে অথবা যতটা সম্ভব সুবিধাজনক শর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করা। এইভাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি এবং রাজন্যবর্গের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নকে অকার্যকর করে দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে ভারতের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। একই সঙ্গে জাপানি আক্রমনের সম্ভবনা নস্যাৎ হবে এবং সুভাষকে ও ঠেকানো যাবে। জাপানিরা যখন ভারতের দোরগোড়ায় তখন ব্রিটিশ চাইবে না কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘাতে যেতে। তা ছাড়া তিনি আশা করেছিলেন মিত্রপক্ষ বিশেষ করে আমেরিকা ব্রিটেনের ওপর চাপ দেবে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। ১৫ জুলাই ও ৫ আগস্ট সাংবাদিক সম্মেলনেও গান্ধী এই আশা প্রকাশ করেছিলেন।[৪১]

গান্ধী সম্ভবত এও ভেবেছিলেন, আন্দোলনের সিদ্ধান্তে সরকার যদি নতি স্বীকার নাও করে জাপান ভারত আক্রমন করলে নিশ্চয়ই করবে। কারন, কংগ্রেসের 'সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র' আন্দোলন তখন শুরু হবে। সরকারের কাছে খবর ছিল, গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস বর্ষার পর জাপান ভারত আক্রমন করবে এবং কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করবে।[৪২] ৮ আগস্ট কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার কথা বলে সরকারকে কংগ্রেসের দাবি মেনে নেওয়ার সুযোগ দিতে এবং জাপানি আক্রমনের জন্য অপেক্ষাও করতে চেয়েছিলেন। এই কারনে ওই দিন কোনও কর্মসূচী তিনি জনসাধারণের সামনে রাখেননি, পরে জানাবেন বলেছিলেন।[৪৩] তিনি নিশ্চিত ছিলেন জাপানি আক্রমনের খাঁড়া যখন ঝুলছে তখন আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সরকার কোনও চরম ব্যবস্থা নিতে সাহস করবে না। তাঁর এই বিশ্বাস এতই গভীর ছিল যে, সরকারের কঠোর মনোভাব সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে অনেকে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেননি। ৯ আগস্ট ভোর চারটায় ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি মহাদেব দেশাইকে বলেন, 'গতকাল রাতের বক্তৃতার পর তারা আমাকে গ্রেপ্তার করবে না।'[৪৪] বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা যদি নিষ্ফল হত এবং জাপান যদি ভারত আক্রমন না করত তা হলে তিনি হয়তো মুখরক্ষার জন্য একটা আন্দোলন শুরু করতেন। সেই জন্য ৭ আগস্ট একটি কর্মসূচি তিনি প্রস্তুত করেন। বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলে তা প্রকাশ করা

হত।[৪৪] গান্ধী যদি সত্যি চাইতেন সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশকে তাড়াতে তা হলে বিস্তর সাহসী কথাবার্তা বলার পর বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব রাখতেন না। তিনি কি ভেবেছিলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে বা চিঠি লিখে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে বললে তিনি তা মেনে নেবেন এবং ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে?

গান্ধীর কৌশলটা বুঝতে সরকারের ভুল হয়নি। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি যখন ভারত ছাড়ো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে তখন বড়লাট ১১ জুলাই ভারত সচিবকে লেখেন, 'বৃদ্ধ মানুষটি' গড়িমসি করে চলবেন এবং ভয় দেখানো প্রস্তাব নেবেন, কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখলে খুব বেশি মর্যাদা না খুইয়ে কংগ্রেস যাতে ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখবেন। ওই দিন পাঞ্জাবের গভর্নর গ্ল্যান্সিকেও তিনি একই কথা লেখেন।[৪৫] আন্দোলন শুরু করা নিয়ে গান্ধী গড়িমসি করলেও সরকার তাঁকে সময় দিতে চায়নি। গ্রেপ্তারের পর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর হিসেবে বড় ভুল হয়ে গেছে। আজাদ লিখেছেন, 'আমি কখনই তাঁকে এতটা মুষড়ে পড়তে দেখি নি।'[৪৬] এরপর শুরু হয় গান্ধীর নতুন কৌশলের ছক কষা।

সূত্রনির্দেশ

১. *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (here after *C W M G*) Vol. 76, Publications Division, Govt. of India, N. Delhi, 1979, pp. 458-61.

২. *C W M G*, Vol. 70, 1977, pp. 162, 175.

৩. *C W M G*, Vol. 76, pp. 264, 400, 451; S. Gopal (ed.) *Selected Works of Jawaharlal Nehru* (hereafter *SWJN*) Vol. 13, Orient Longman, N. Delhi, 1980, p.59; *Louis Fischer, A week with Gandhi*. George Allen & Unwin Ltd., London, 1943, p.25.

৪. *C W M G*, Vol. 71, 1978, p. 114.

৫. Gandhi's article in *Harijan,* 16 December, 1939, *C W M G*, Vol. 71, p. 23; N. Mansergh (Editor-in-chief), *The Transfer of power, 1942-7* (hereafter *T P*) Vol.11, Her Majesty's Stationary Office, London, 1982, p. 132

৬. G.D. Birla, *Bapu*: *A Unique Association*, Vol. 4, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1977, p. 291.

৭. Fischer, op. cit., p. 15; D.G. Tendulkar, *Mahatma*, Vol., 6, Publications Division, Govt. of India, N. Delhi, 1969 reprint, p. 72.

৮. *TP*, Vol. 1, 1970, p. 498

৯. *CWMG,* Vol. 75, 1979, p. 440

১০. অমলেশ ত্রিপাঠী *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,* ১৮৮৫ -১৯৪৭, আনন্দ পাবলিশার্স লি. কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ২৯৭; আরও দেখুন : Edgar Snow, *People on our side*, The World Publishing Company, Cleveland, 1945, p. 27. এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সর্বপল্লী গোপাল লিখছেন: 'The phrase has gone down into history as "a post-dated cheque on a crashing bank"; but it is now known that the second part, "on a crashing bank", was the addition of an enterprising journalist.' See J. Hennessy's letter in The Spectator, 11 October, 1969, ' Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru, A Biography*, Vol. 1, 1981 reprint, p. 279, fn 4. গান্ধীর মন্তব্যের সঙ্গে 'on the crashing bank' অংশটি একজন সাংবাদিক জুড়ে দিয়ে থাকলেও গান্ধীর ওই সময়কার মনোভাব ও কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট যে মিত্রপক্ষের জয় সম্পর্কে তিনি আদৌ আশাবাদী ছিলেন না।

১১. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (Complete Version), Orient Longman, Madras, 1988, p.40

১২. *CWMG,* Vol. 76, p. 108; *TP* Vol. 2, 1971, p. 130

১৩. *CWMG,* Vol. 76, p. 5

১৪. Azad, op. cit., pp. 39-40.

১৫. সিঙ্গাপুরের পতনের পর ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২-এ বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র প্রথম যে বেতার ভাষনটি দেন তাতে তিনি বলেন ... 'We shall heartily co-operate with all those who will help us in over-

throwing the common enemy. I am confident that in this sacred struggle, the vast majority of the Indian people will be with us.' Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle, 1920-42,* Asia Publishing House, Bombay, 1964, p. 442.

১৬. Fischer, op. cit., pp. 28-9, 71-2, 58-9, 63.

১৭. Snow, op. cit., pp. 37, 52, 308, 311, 312.

১৮. *CWMG*, Vol. 76, pp. 107, 216, 224-5, 299-300, 452; Fischer, op.. cit., p. 32.

১৯. *CWMG*, Vol. 76, p. 109; *TP*. Vol. 2, 131

২০. Azad, op. cit., p. 40

২১. *CWMG*, Vol. 76, p. 61

২২ Ibid., pp. 49-50

২৩. Ibid., pp. 63 - 4

২৪. Ibid., pp. 67, 87, 106, 95.

২৫. Ibid., p 105.

২৬. Ibid., pp 114, 159-60.

২৭. Fischer, op. cit., pp. 31, 90-91, 101.

২৮. *CWMG*, Vol. 76, pp. 50, 64, 112, 139-40, 167, 433, 452; also Fischer, op. cit., pp. 43-4.

২৯. Ibid., pp. 120, 143.

৩০. Ibid., pp. 451-3

৩১. Ibid., pp. 293-4; Gopal, op.cit., p. 292; Azad, op. cit., p. 72.

৩২. *C W M G,* Vol. 76, pp. 295-9

৩৩. Ibid., pp. 377, 389, 391, 396, 401.

৩৪. *T P.* Vol.2, p. 853.

৩৫. *C W M G,* Vol. 76, pp. 406-7

৩৬. Ibid., pp. 414-5

৩৭. *C W M G,* Vol. 77, 1979, pp. 376, 413, 347-8

৩৮. Dr. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress* , Vol. 2 (1935-1947), Padma Publications Ltd. Bombay, 1947, p. 506 & fn.

৩৯. *C W M G,* Vol. 78, 1979, pp. 126-7

৪০ *S W J N,* Vol. 13, p. 457.

৪১. *C W M G,* Vol. 76, pp 264-5, 303, 372; also Fischer, op. cit., p. 83.

৪২. Home Political File No., 18/7/42, Fortnightly Report, U.P., July, 1942, cited in Arun Chandra Bhuyan, *The Quit India Movement,* Manas, New Delhi, 1975, p. 42 fn 22.

৪৩. *C W M G,* Vol. 76, pp 391

৪৪. Tendulkar, op. cit., p. 174.

৪৫. *C W M G,* Vol. 76, pp 364-7

৪৬. *T P,* Vol. 2, pp. 368-9, 368.

৪৭. Azad, op. cit. p. 88

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রীসমাজ এবং মহিলাদের ভূমিকা

কল্লোল ব্যানার্জী

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। ১৮, মীর্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (B.P.S.F) এখানকার আন্দোলনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল। রেভোলিউসনারি সোস্যালিষ্ট পার্টি (R.S.P), কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি (C.S.P), ফরওর্য়াড ব্লক, রেভোলিউসনারি কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (R.C.P.I), বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (B.L.P.I - 4th International) ইত্যাদি দলের ছাত্রকর্মীরা এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী সাব-কমিটি বা অল বেঙ্গল গালর্স স্টুডেন্টস্ সাব-কমিটি এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালে বেনারসে সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্গত একটি ছাত্রী সাব-কমিটি গঠন করার জন্য নির্মলা রায়ের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর ১৯৪০-৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অধীনে ছাত্রী সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন নির্মলা রায় এবং সেক্রেটারী ছিলেন বনলতা সেন। নির্মলা রায়, ১৯৪১ সালে সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা হিসাবে মনোনীতা হন।[১]

১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ছাত্রী সাব-কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতার বিভিন্ন বাগানে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা ও ছোরাখেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতির নরেন দাসের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন নির্মলা রায়, বনলতা সেন, প্রতিভা ভদ্র ইত্যাদিরা। এরই সঙ্গে কুমার বিশ্বনাথ রায়, যতীন চক্রবর্তী ইত্যাদিদের বাড়ীর হলঘরে, Study Circle এর ব্যবস্থা করা হয়। এখানে পরাধীন ভারতের দুঃখদুর্দশা অবসানের জন্য সংগ্রামে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নির্মলা রায়, বনলতা সেন, প্রতিভা ভদ্র ইত্যাদিরা এখানে বক্তৃতা দিতেন ও আলোচনা করতেন।

অনুশীলন সমিতির কোন কোন নেতা এসেও বক্তৃতা দিতেন। বিদ্যাসাগর কলেজ, উইমেনস্ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রী সাব-কমিটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এইসময় নির্মলা রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বনলতা সেন উইমেনস্ কলেজে পড়াশুনা করতেন। মানিকতলার কাছে বাগমারীর বস্তী অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যেও ছাত্রী সাব-কমিটির পক্ষ থেকে নৈশবিদ্যালয় খোলা হয়। এখানে তাদেরকে অক্ষরজ্ঞান শেখানো হয় এবং এরই সাথে সাথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ছাত্রী সাব-কমিটি, মীর্জাপুর স্ট্রীট ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে একযোগে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। এই সময় ছাত্র ফেডারেশনের মিছিলে মেয়েরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া প্রয়োজন হলে লিফলেট ও জরুরী কাগজপত্র এমনকি বোমা ও পিস্তল বিভিন্ন স্থানে পৌছে দিয়ে আসার কাজ মেয়েরা করতেন। নির্মলা রায় এই সময় ভবানীপুরের কাছে পি. জি. হাসপাতালের সুপারের মেয়েকে পড়াতে যেতেন। একারণে তিনি উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট থেকে হেঁটে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে যেতেন এবং এই সময়েতেই মাঝে মাঝে শাড়ী-চাদরের মধ্যে বা হাতের ব্যাগে লিফলেট বা পিস্তল নিয়ে যেতেন এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট কর্মীকে (যিনি সুপারের বাড়ীর আশেপাশে অপেক্ষা করতেন) সেগুলো দিয়ে দিতেন।[২]

নির্মলা রায়ের বোন (এবং বর্তমানে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী) সুষমা রায় মীর্জাপুর স্ট্রীট ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি গোপনে লিফলেট বিলি করার কাজেও যুক্ত ছিলেন। একবার চৌরঙ্গী এলাকার এক হোটেলে গিয়ে হুগলীর একটি ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে লিফলেট দিয়ে আসেন। সম্ভবত এই লিফলেটটি পুলিশ উদ্ধার করে - যার শিরোনাম ছিল Clarion Call to Mothers and Sisters of Bengal যা প্রচারিত হয় ১৮, মীর্জাপুর স্ট্রীট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল গার্লস স্টুডেন্টস্ কমিটির পক্ষ থেকে। এই রচনায় বাংলার মেয়েদের বৃটিশ শাসনের বিরোধিতা করতে এবং ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর, নির্মলা রায়, তাঁর দুই ভাইবোন সুষমা রায় ও অরুণ রায় এবং ছোটমামা বেঙ্গল ভলন্টিয়ার (B.V) গোষ্ঠির নেতৃস্থানীয় কর্মী দেবপ্রসাদ গুহকে সিমলা স্ট্রীটের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হবার পর নির্মলা রায় ও সুষমা রায়কে ১৫ দিন ধরে লালবাজার লকআপে রাখা হয়।

পুলিশের এই আচরণের বৈধতা নিয়ে স্থানীয় এম. এল. এ নিশীথরঞ্জন কুন্ডু (ফরওয়ার্ড ব্লক) প্রাদেশিক আইনসভাতে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এইসময় প্রতিদিন দুই বোনকে লর্ড সিন্‌হা

রোড I.B. অফিসে নিয়ে গিয়ে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত নিরন্তর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁরা দুজনেই কয়েক বছর ধরে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন।[৩]

আগষ্ট আন্দোলন শুরু হবার পর দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের প্রাতঃকালীন বিভাগে আন্দোলন সমর্থক ছাত্রীদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে - যার নেতৃস্থানীয় সদস্যা ছিলেন ছায়া গুহ, যিনি ইতিপূর্বেই লীলা রায়ের মাধ্যমে শ্রীসংঘ গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা ছাড়াও সেই কলেজে ছিলেন আন্দোলন বিরোধী কমিউনিষ্ট ছাত্রীদের একটি গোষ্ঠী। আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রচার ও জাতীয় পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ঘটতো। এছাড়া এখানকার আন্দোলন সমর্থক ছাত্রীরা হাজরা রোডের মোড়ে পথচারী ও ট্রামযাত্রীদের কাছ থেকে টাই খুলে নিয়ে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করতেন এবং বিভিন্ন পার্কে জনসভা চলাকালীন কৌটা নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৪২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হয়ে ছায়া গুহ প্রেসিডেন্সী জেলে আসবার পর সেখান থেকে লীলা রায়ের তত্ত্বাবধানে আই. এ পরীক্ষা দেন। ১৯৪৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।[৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণী ঘোষ, চিত্রা বসাক ইত্যাদি ছাত্রীরা সেখানকার আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রনেতা দিলীপকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। তাঁরা সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যু কফিহাউসে গিয়ে C.S.P নেতৃস্থানীয় কর্মী ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর অশ্বিনীকুমার গুপ্তর কাছ থেকে আন্দোলন সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহন করতেন। বাণী ঘোষ, Free India Bulletin এ নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য লিখতেন। এছাড়া নিজের উদ্যোগে কাগজ ও তুলি কিনে বাড়ীতে ইংরাজী ভাষায় British, Quit India ইত্যাদি পোস্টার লিখতেন যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নির্দিষ্ট ছাত্রকর্মীর হাতে দিতেন।[৫]

কলকাতার আন্দোলনের প্রথমদিন থেকেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীরা রাজপথে নামে। সরকারী রিপোর্টেই কলকাতার আন্দোলনের প্রথমদিন ১৯৪২ সালের ১৩ই আগস্ট সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে আসা মিছিলগুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ঐদিনই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মূল সমাবেশে আসা মিছিলে সুষমা রায় ও কল্যাণী মুখার্জ্জী ছিলেন। মিছিলের সামনের সারির নেতারা গ্রেপ্তার হবার পর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা সামনের সারিতে এসে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে পরবর্তী দিনগুলিতেও আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রীরা মিছিল বার করেন। ৫ই অক্টোবর ২০-২৫ জন মেয়েদের একটি মিছিল রাসবিহারী অ্যাভেন্যু দিয়ে গড়িয়াহাট রোড পর্যন্ত যায়। ঐদিন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাকিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ - এর সামনে পিকেটিংরত জনতার

মধ্যে চারজন মেয়েও ছিলেন।

৯ই ডিসেম্বর ছাত্রমিছিলে আভা মজুমদার সহ কয়েকজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। ঐদিন আশুতোষ কলেজের প্রাতঃকালীন বিভাগের ছাত্রীরা ক্লাশ না করে কলেজের মধ্যে পিকেটিং করেন এবং কলেজগৃহের ওপরে একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯৪৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বউবাজার স্ট্রীট ধরে শিয়ালদহ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া মিছিলটিতে ছাত্রীরাও অংশগ্রহন করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী চারজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে মহাত্মা গান্ধীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসবিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা না করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

২৩শে ফেব্রুয়ারী সুরা গার্লস স্কুলের (২৬, হরমোহন ঘোষ স্ট্রীট) ৩০ জন ছাত্রী, স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে একটি মিছিল বার করেন। ঐদিন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রীরাও ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।[৬]

ছাত্রীরা ছাড়াও নেতৃস্থানীয়া মহিলারাও কলকাতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে কারাবরণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক পরিমন্ডলে স্বনামধন্যা ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁদের মধ্যে দু-একজনের প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

বীণা দাস : বীণা দাস স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলী জ্যাকসনকে গুলিবিদ্ধ করবার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর তিনি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন। আগষ্ট আন্দোলন শুরু হবার পর সম্পাদিকা হিসেবে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় আগষ্ট প্রস্তাবে প্রচার করবার জন্য একটি জনসভা আহ্বান করেন। এই সভা বন্ধ করবার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সভা শুরু করার মুহূর্তে পুলিশ তা ভেঙে দেবার চেষ্টা করে। সেইসময় তাঁর এক সহকর্মীকে পুলিশ সার্জেন্ট নির্মমভাবে প্রহার করলে বীণা দাস সার্জেন্টের হাত শক্ত করে ধরে তাকে বাধা দেন। তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হবার পর তিনি নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে তিন বছর প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।[৭]

উজ্জ্বলা মজুমদার : ১৯৩৪ সালের বাংলার গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। কলকাতার আগষ্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। ১৯৪৬ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।[৮]

চারুপ্রভা সেনগুপ্ত : আগষ্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি এবং তাঁর একাধিক সন্তান গ্রেপ্তার হন। উত্তর কলকাতার মানিকতলার কংগ্রেস অ্যাড হক কমিটির অফিস থেকে বিভিন্ন লিফলেট বিলি বন্দোবস্ত করবার ক্ষেত্রে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। তিনি নিরাপত্তা বন্দী রূপে প্রায় দশ মাস প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন।[৯]

কমলা দাশগুপ্ত : কমলা দাশগুপ্ত ছিলেন বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারী। তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন উজ্জ্বলা মজুমদার, বীণা দাস, হেলেনা দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ ইত্যাদিরা। বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ১০ই আগষ্ট বে-আইনী ঘোষিত হবার পর তিনি গোপনে বিভিন্ন লিফলেট এবং দিল্লী থেকে চোরাপথে আসা এ. আই. সি. সি-র নির্দেশাবলী ইত্যাদি সাইক্লোস্টাইল করবার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৪২ সালের ২৭শে আগষ্ট তিনি গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে আসেন এবং ১৯৪৫ সালে মুক্তি লাভ করেন।[১০]

আভা মজুমদার : আভা মজুমদার কলকাতার আগষ্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার হ্যারিসন রোড দিয়ে অগ্রসর হওয়া, বিপ্লবী শ্লোগান দিতে থাকা একটি মিছিলে আভা মজুমদার নেতৃত্ব দেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করে - আভা মজুমদার তাঁর কংগ্রেস পতাকা ফেলে দিতে অস্বীকার করেন এবং মিছিলকে আবার নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেই স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[১১]

জেলখানায় বন্দিনীদের মন থেকে বিপ্লবচিন্তা দূর করতে প্রশাসনিক কৌশল :

আগষ্ট আন্দোলনের সময় আটক মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের সরকার বিরোধী চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটানোর জন্য জেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সুষমা রায় জানিয়েছেন যে সম্ভবতঃ তাদের মন থেকে বিপ্লবচিন্তা দূর করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে বছরে ছটা কাপড়, গন্ধতেল, সাবান ও ভালো খাদ্যদ্রব্য দিতেন, যখন কলকাতায় দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া লেগেছে।[১২]

ছায়া গুহ জানিয়েছেন জেলের মধ্যে তাঁরা যথেষ্ট ভালো খাবার পেতেন। জামাকাপড়, গন্ধতেল ইত্যাদিও তাঁরা যথেষ্ট পেতেন। অন্যদিকে সেইসময় জেলের মধ্যে আসা সংবাদপত্রগুলোতে

দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত খবরের ওপর কালি দেওয়া থাকতো – বন্দিনীদের কাছ থেকে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত খবর গোপন করার জন্য। সেকারণেই তাঁরা কেউ জানতে পারতেন না যে কলকাতায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।[১৩]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের সেন্সারনীতি সম্বন্ধে বীণা দাসও লিখেছেন - 'প্রথম কিছুদিন বাইরের কোনও খবর পেতাম না। খবরের কাগজ যদিও দিত, তার সর্বাঙ্গে কালিলেপা। শত লেবু ঘসে, শত আলোর সামনে ধরেও তার একটি বর্ণেরও পাঠোদ্ধার করা যেত না।'[১৪]

কমলা দাশগুপ্ত জেলবন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আপাত সদয় ব্যবহারের গূঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্য তখনই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ভাষায় ' .... এমন একটি বিপ্লবীও তখন বাইরে ছিলেন না, যিনি ক্ষুধার্তদের বলবেন, চালের গুদাম, ধানের গোলা, মজুদ করা খাদ্য তোমরা লুঠ করে খাও, অজস্র খাদ্যের পাশে তোমরা উপবাসে মরে যেয়ো না।' 'সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তিকে সেদিন ইংরেজ নিঃশেষে জেলে পুরে রেখেছে। .. জেলখানার বরাদ্দ তারা হ্রাস করে নি। .. যেন এরা খেয়ে পরে শান্ত থাকে। জনসাধারনের নিকট হতে বিপ্লবী শক্তিকে কঠিন হাতে তারা পৃথক করে রাখতে চায়। জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা সবই বুঝতে পারেন। বন্ধ দরজার রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষর হাহাকাব তারা শোনেন, কিন্তু দরজা ভাঙবার উপায় খুঁজে পান না। একটা শুভক্ষণ এসে বয়ে গেল, বিপ্লব আনা গেল না।'[১৫]

খাবার - পোষাকের স্বাচ্ছল্যের সাথে সাথে বন্দিনীদের 'মগজ ধোলাই' -এর অন্যান্য বন্দোবস্তের দিকেও প্রেসিডেন্সী জেল কর্তৃপক্ষের সযত্ন প্রয়াস ছিল। কমলা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে তাঁরা কার্ল মাকর্সের ক্যাপিটাল, লেনিনের রচনা, এঙ্গেলস্ - এর অ্যান্টি - ড্যুরিং ইত্যাদি গ্রন্হ, একসঙ্গে মিলে পড়তেন এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাঁর মতে জেল কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ইচ্ছা করেই এই বইগুলো সরবরাহ করতেন, যাতে জাতীয় আন্দোলনের ধারা থেকে সরে গিয়ে আগষ্ট বিপ্লবীরা কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে জনযুদ্ধনীতি সমর্থন করে এবং সেহেতু ব্রিটিশদের সামাজ্যবাদী যুদ্ধকেও সমর্থন ও সাহায্য করে। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল জাতীয় আন্দোলনকে বিভক্ত করতে, যাতে আগষ্ট বিপ্লবীরা আন্তর্জাতিকতাবাদী পথ অনুসরণ করে এবং আগষ্টবিপ্লবের বিরোধিতা করে।

কমলা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন তথাপি প্রেসিডেন্সী জেলে মার্কসবাদী রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব চর্চা করলেও আগষ্ট আন্দোলনের সময় বন্দিনী নারীদের মধ্যে কেউই কমিউনিষ্ট হন নি। রেভোলিউশনারি সোস্যালিষ্ট পার্টির (R.S.P) সমর্থক হিসাবেই নির্মলা রায়, সুষমা রায়, প্রতিভা ভদ্র, কিরন চক্রবর্তী, বনলতা সেন ইত্যাদিরা আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করে জেলে

যান এবং জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও রেভোলিউশনারি সোস্যালিষ্ট পার্টির সমর্থক থাকেন।[১৬]

হেলেনা বলও (দত্ত) জানিয়েছেন যে ১৯৪২ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকবার সময়, তিনি কমিউনিষ্ট মতাদর্শের অসংখ্য পত্রপত্রিকা ও কমিউনিষ্ট গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখেছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩২ - ৩৬ সালে হিজলী জেলে বন্দীদশায় থাকবার সময় (যে সময় কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী হিসাবে ঘোষিত ছিল) যা তিনি কখনই দেখেন নি।[১৭]

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-র দশকে বিভিন্ন জেলের মধ্যে অনেক বিপ্লবী কমিউনিষ্ট হয়ে যান, কারন কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা তাঁদের কাছে এক নতুন দিকদর্শন এবং রাজনীতি বিশ্লেষণের এক নতুন জ্ঞানশলাকা বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালে জনযুদ্ধনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা, আগষ্ট বিপ্লবীদের কাছে কোন আবেদনই রাখতে পারে নি। অন্যদিকে সরকার এই সময় মরীয়া হয়ে রাজনৈতিক বন্দীদেরকে কমিউনিষ্ট হবার জন্য সবরকম চেষ্টা চালায়, যাতে জনযুদ্ধনীতি সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাঁরা আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধিতায় মুখর হন। যদিও এই সরকারী তৎপরতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

সূত্রনির্দেশ

১। ক) কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, বসুধারা প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৭০।

খ) শ্রীমতি নির্মলা রায় (সান্যাল) - এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৫.৮.৯২।

২) তদেব।

৩) শ্রীমতি সুষমা রা. (চক্রবর্তী)-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৪.৭..৯২।

৪) শ্রীমতি ছায়া গুহ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৬.১১.৯৫।

৫) শ্রীমতি বাণী ঘোষ(সরকার)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৬.১০.৯৫।

৬) Gocvernment of Bengal Home Department, Political, District Officer's Chronicle of events of disturbances conseqent upon the All India Congress Committee Resolution of 8th August, 1942 and arrest of Congress Leaders thereafter August 1942 to middle of March 1943 (Calcutta, 1943).

Calcutta, 13th August, 5th October and 9th December, 1942; 11th, 17th & 23rd February, 1943.

৭) কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। সেদিনের জনসভায় পুলিশী হস্তক্ষেপ এবং ইংরেজ সার্জেন্টের সঙ্গে তাঁর শক্তি পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ বীণা দাস নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

দ্রষ্টব্য বীণা দাস, শৃঙ্খলঝঙ্কার, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ ১০২।

অন্যদিকে সরকারী রিপোর্টে বীণা দাস চিহ্নিত হয়েছেন notorious অভিধায়, যাকে ১৯৪২ সালের ১৫ই আগষ্ট হাজরা পার্কে জনসভা করবার সময় গ্রেপ্তার করা হয়।

District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta, 15th August, 1942.

৮) কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী।

৯)ক) তদেব।

খ) Calcutta Police, Special Branch Records, Confidential File No. CM 611/42 .

১০) শ্রীমতি কমলা দাশগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৫.৬.৯২।

১১)ক) District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta, 9th December, 1942.

খ) কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী।

১২) শ্রীমতি সুষমা রায় (চক্রবর্তী) -র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৪.৭.৯২।

১৩) শ্রীমতি ছায়া গুহ-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৬.১১.৯৫।

১৪) বীণা দাস, শৃঙ্খলঝংকার, পৃ : ১০৩।

১৫) কমলা দাশগুপ্ত, রক্তের অক্ষরে, পৃ : ১৪৩-১৪৪।

১৬) শ্রীমতি কমলা দাশগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৫.৬.৯২।

১৭) শ্রীমতি হেলেনা বল (দত্ত)র সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৩.১০.৯৫।

সংগঠিত রাজনীতি ও গণবিদ্রোহ - মেদিনীপুরে ভারতছাড়ো আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি

শুভেন্দু বিকাশ সৎপথী

এই প্রবন্ধে আমরা মেদিনীপুর জেলায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ অর্থাৎ ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে সেখানকার সংগঠিত রাজনীতি কিভাবে গনআন্দোলনের আবর্তে পরিচালিত হয়েছিল তা আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে অন্তর্দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌছায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে পরেই বিভিন্ন গোষ্ঠী এক নতুন বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়। মেদিনীপুরের অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতি ছাত্র সমাজের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এসব দলের মধ্যে সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও কর্মী নিয়োগ অব্যাহত ছিল। এইসব গোষ্ঠীর ক্ষমতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে সরকার এদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ নিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের মুখ্য নেতারা যেমন পরিমল কুমার রায়, ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এবং এন. এন. দাস ভারত প্রতিরক্ষা আইনে আটক হন।[১] অন্যদিকে বাংলার ফোর্টনাইটলী রিপোর্ট (Fortnightly Report) থেকে জানা যায় যে মেদিনীপুর জেলায় সুভাষচন্দ্র বোসের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব যথেষ্ট কমে গেছে যদিও যুব সম্প্রদায় ও ছাত্র সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ বিশেষত স্কুলছাত্রদের আস্থা এখনও সুভাষের বিপ্লবী কর্মপন্থার উপর।[২] যাইহোক না কেন কিছু আদি কংগ্রেস নেতা যেমন দেবেন্দ্রলাল খান, প্রমথ নাথ ব্যানার্জী, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ গোবিন্দলাল ভৌমিক, শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক ও অন্যান্যরা সুভাষের সঙ্গে হাত মেলান। তাঁরাই কিন্তু জেলা কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ যদিও এই কমিটি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সাথেই বেআইনি ঘোষিত হয়েছে।[৩] ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের কর্মী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে কিছু কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৪০ -এর মে মাসে সুভাষ উপজাতি অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমা পরিদর্শন করেন কিন্তু তিনি কোনরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা পাননি।[৪] তা সত্ত্বেও তাঁর দল মেদিনীপুর জেলায় কোন কোন অংশে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।[৫]

কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করে।[৬] এই দল ঘাটাল মহকুমায় প্রশিক্ষন শিবির খোলে এবং ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালায়।[৭] পার্টির প্রচার কৃষক শ্রেণীর উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, বিশেষত এই জেলার ধরন্দা পরগনায়। প্রচারে মূল বক্তব্য ছিল যে কৃষকদের দুর্দশার জন্য দায়ী কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক সরকার।[৮] ১৯৪০-এ কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কিষান সমিতির তমলুক মহকুমায় বিভিন্ন গ্রামে অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটে। প্রাক্তন বিপ্লবীরা যেমন ভূপাল পান্ডা, মোহিনী মন্ডল, দেবেন দাস, সরোজ রায়, রবি মিত্র প্রভৃতি কিষান সমিতিতে যোগ দেন।[৯]

লক্ষনীয় যে এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪০এর Fortnightly Report এ দেখা যায় যে এই জেলায় কৃষক জমিদার সংঘর্ষের ঘটনা অতি সামান্য।[১০] এই বছরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই জেলা পরিভ্রমন করেন এবং হিন্দু মহাসভাপন্থীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন।[১১] তাই আমরা দেখতে পাই যে সে সময়ে রাজনৈতিক প্রেষনা (Political Mobilization) এই জেলায় গতি লাভ করেছে, ঠিক সেই সময় গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দেন।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

লর্ড লিনলিথগোর 'আগষ্ট প্রস্তাব' প্রত্যাখানের পর গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা করেন।[১২] কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষনের পর তিনি গনআন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। সত্যাগ্রহীদের প্রথম দলটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস সাংসদদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই সত্যাগ্রহের প্রথম পর্ব আরম্ভ হয় এবং তা এবছরের শেষ পর্যন্ত অব্যহত থাকে। এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রাদেশিক, জেলা এবং তহশীল কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা এবং সদস্যরা এই পর্বে অংশগ্রহন করেন। সত্যাগ্রহের অন্তিমপর্ব আরম্ভ হয় ১৯৪১ এর এপ্রিলে। এই সময় কংগ্রেসের চারআনা চাঁদার সদস্যদের জন্য এই আন্দোলনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তৃণমূল নেতারা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গ্রামীন জনগনকে সক্রিয় করতে সফল হন। ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে বন্দীসত্যাগ্রহীদের মুক্তিদানের পরেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৩]

বাংলায় এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪০ এর ডিসেম্বর মাসে।[১৪] সত্যাগ্রহীদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাঁরা যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দেবে ও দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবে। কংগ্রেস সদস্যরা এই আন্দোলন শুরু করলেও এর প্রভাব থেকে অন্যদলের সদস্যরা মুক্ত থাকতে পারেননি। যেমন যুগান্তর দলের সদস্যরা যারা অহিংস ও আইন অমান্য পদ্ধতিতে বিশ্বাস রাখতো না, তারাও এই আন্দোলনের প্রভাবকে অস্বীকার করতে সাহস পায়নি।[১৫] সরকারী নথি অনুযায়ী শরৎ বোসের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কংগ্রেস দলও এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছে।[১৬]

ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ডব্লক দল এই প্রদেশের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিয়ে এর সদস্যরা সত্যাগ্রহীরূপে বন্দী হন।[১৭] যুদ্ধবিরোধী লিফলেট বা ইস্তেহার বিলি ও প্রচারকার্য অব্যাহত থাকে। ১৯৪১ এর প্রারম্ভে জেলার বিভিন্ন অংশে সত্যাগ্রহীদের প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষন শিবির খোলা হয়। এতে অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষনের সঙ্গে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।[১৮] এইসব কার্যাবলীর সঙ্গে সত্যাগ্রহীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। বাংলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে মেদিনীপুরেই এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করে।

গান্ধীজীর নির্বাচিত একহাজার সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহীর মধ্যে মেদিনীপুর থেকে ছিলেন পঞ্চাশ জন। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সুতাহাটা মহকুমার বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমে একটি সত্যাগ্রহী শিবিরের উদ্বোধন করেন। এই শিবির সাতদিন চলেছিল।[১৯] অন্যান্য মহকুমায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এই শিবিরে যোগদান করেন। কুড়ি জন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীর একটি তালিকা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী রূপে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য গান্ধীজীর কাছে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে গ্রামাঞ্চলে সাধারন জনগনকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবতারনা। সত্যাগ্রহীদের নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং জনগনকে অনুরোধ করে তারা যেন যুদ্ধের জন্য একপাই বা একটিও ভাই না দেয়। এতেও যদি সত্যাগ্রহীরা আটক না হন তবে তারা যেন দিল্লীর দিকে রওনা দেন। তবে বেশীর ভাগ সত্যাগ্রহীই এসময় আটক হন।[২০] বিশিষ্ট বন্দী কংগ্রেস সদস্যরা হলেন যেমন নগেন সেন, পাঁচকড়ি দে, নীলমনি হাজরা, সতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং সুশীল কুমার ধাড়া। মহিলারাও এই প্রচার অভিযানে অংশগ্রহন করেছিলেন। সুতাহাটার চারুশীলা জানা ও নন্দীগ্রাম থানার গিরিবালা, গেওন্দা বাজারে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিয়ে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তারাও বন্দী হন। তমলুক মহকুমায়ই প্রায় ছত্রিশ (৩৬) জন সত্যাগ্রহী জেলে আটক হন।[২১] এই মহকুমারই দুই বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস ও সতীশ চন্দ্র সাউ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য আটক হন ও জরিমানা দেন।[২২]

রাজনৈতিক আটক এবং বর্ষা ঋতুর আগমন এই জেলায় কংগ্রেস নেতাদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া দুরুহ করে তোলে। তাই তাঁরা গান্ধীর কাছে আবেদন করেন এই আন্দোলন বন্ধ করে গঠনমূলক কাজকর্মে ফিরে যেতে।[২৩]

গঠনমূলক কর্মসূচি

১৯৪১ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে এবং ভারত সরকার সেই সময় সত্যাগ্রহীদের মুক্ত করে দেন। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সচিব কুমার চন্দ্র জানা ও

অনান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রামাঞ্চলে গঠনমূলক কাজকর্ম শুরু করেন। তাঁরা অনান্য কর্মস্থলে যেমন ডেবরা, মহিষাদল, কাকরা এবং বাসুদেবপুর প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রম ও খাদি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতাহাটা মহকুমায় বাসুদের গান্ধী আশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠে যেখানে সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। কুমার চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী একই কেন্দ্রে থাকতেন। শতাধিক দর্শনার্থী এই কেন্দ্রে প্রতিদিন আসতেন। মহিলারাও এই দর্শনার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট সংখক ছিলেন। এদের মধ্যে রেনু, রেখা, কুমুদিনি, সুবোধবালা, সুশীলা, বাসন্তী, প্রভাবতী প্রভৃতি এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[২৪] মহিলাদের প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য এই আশ্রমে দুমাস যাবৎ একটি মহিলা প্রশিক্ষন কেন্দ্র চালানো হয়েছিল।[২৫]

মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সংগঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে খাদিই ছিল মুখ্য বিষয়। বিভিন্ন থানায় প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মীদের তত্বাবধানে খাদি কেন্দ্র খোলা হয়। সূতা প্রস্তুত কারকরা নিজেদের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদি বস্ত্র প্রস্তুত করে।[২৬] ১৯৪১ এর ডিসেম্বর মাসে জেলা কংগ্রেস কমিটি ১৩জন চরকা কর্মী নিয়োগ করে এবং তাদের উপর বিভিন্ন গঠনমূলক কেন্দ্রে সাংগঠনিক দায়িত্বও ছিল। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ যখন সুতাহাটা গান্ধী আশ্রম পরিদর্শনে যান সেখানে তাঁকে পাঁচশ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীকে দেখানো হয়। পরবর্তী কালে স্বেচ্ছাসেবীরা বিদ্যুৎবাহিনীর অংগীভূত হয়ে যান।[২৭] বিত্তবান গ্রামবাসীরা নৈতিক এবং আর্থিক দিকদিয়ে এইসব গঠনমূলক কর্মীদের সাহায্য করেন।[২৮] এই জেলার কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীজীর ১৫দফা গঠনমূলক কর্মসূচী ও নির্দেশকে গুরুত্ব সহকারে পালন করেন।[২৯] সত্যাগ্রহীরা গান্ধীর বার্তা গ্রামে গ্রামে পৌছে দেয়।[৩০]

সত্যাগ্রহীরা হরিজন ও অনান্য অস্পৃশ্য জাতিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তমলুক মহকুমাতেই স্থাপিত হয়েছিল নয়টি হরিজন স্কুল। এই স্কুলগুলির বেশীরভাগই মহাত্মাগান্ধী পরিচালিত হরিজন বোর্ডের আর্থিক সহায়তা লাভ করেছিল।[৩১] এই মহকুমাতেই বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র ও হিন্দিভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও খেলা হয়। প্রথমদিকে কিছু মহিলা ও পুরুষকে শিক্ষা দান করা হয় এবং তারাই পরে বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হন।[৩২] পূর্বেই আমরা সম্ভাব্য সত্যাগ্রহী প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলির উল্লেখ করেছি। বৎসারান্তে এই কেন্দ্রগুলিই স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এবং ব্রিটিশ ও জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হন।[৩৩] তমলুক মহকুমার কিছু মহিলাসহ প্রায় ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী আসন্ন যুদ্ধে সৈনিকরূপে নিযুক্ত হন। তারা জনগণের কাছে এই আবেদন রাখেন তারা যেন নির্ভীক হন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও নিজ অঞ্চলের খাদ্যশস্যকে বাইরে পাচার করতে বাধা দেন।[৩৪] ফলে প্রচুর অর্থ ও শস্য সংগৃহীত হয়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এক একটা খাদি কেন্দ্রে প্রায় চার হাজার কর্মী কাজ করতেন এবং উৎপাদনের অর্দ্ধেক পারিশ্রমিক নিতেন। বেশীরভাগ শ্রমিকই ছিলেন মহিলা।[৩৫]

এইসব গঠনমূলক কাজকর্ম জেলায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরও আকর্ষণ করে। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, ফরওয়ার্ড ব্লক , কমিউনিস্ট এবং হিন্দু মহাসভার সদস্যরাও এতে যোগদান করেন। বর্তমানের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের প্রয়োজনে তমলুকের হিন্দু মহাসভা আহ্বান জানায় যে বিশাল সংখ্যায় হিন্দুরা যেন হিন্দু মহাসভায় যোগ-দেয়।[৩৭] সুভাষের দলও অহিংস নীতি ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে স্বীকার করে নেয়। ফলস্বরূপ ওই দল জেলার মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন পায়।[৩৮] যেসব রাজনৈতিক দল যেমন মুসলীম লীগ, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এইসব কর্মকান্ড থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল, তাদের প্রভাব এখানে ছিল নগণ্য।[৩৯] তাই কারও মতে গান্ধী পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সবচেয়ে দুর্বল ছিল।[৪০] ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় হয়তো এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল অতি নগণ্য, কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এই আন্দোলন এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জনসাধারণের অংশগ্রহনের ব্যাপারেও এই আন্দোলন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । ১৯৪১এ এক বছরের মধ্যেই ২৬,০০০জনের জেল হয়েছিল এবং ১৯৩১-৩৪ এর আইনঅমান্য আন্দোলনে ৬০,৪৯৬ থেকে ৭০,০০০ জনের জেল হয়েছিল।[৪১] অর্থাৎ আলোচ্য সময়কাল ছিল রাজনৈতিক অতিসক্রিয়তার কাল। কংগ্রেস কর্মীরা বাড়ী ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কর্মে নিয়োজিত।[৪২] ফরওয়ার্ড ব্লক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সুভাষের সৈন্য ও জাপানীদের সহযোগিতার জন্য সেবাদল গঠনে ব্যস্ত।[৪৩] অন্যদিকে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি প্রচারে ব্যস্ত। যদিও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসে যোগ দেয়নি কিন্তু জুলাই মাসে সি. পি. আই. স্থির করে যে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও রকম আক্রমণে সাহায্য করবে না।[৪৪]

১৯৪২-র জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধীর প্রতিনিধি বাংলা পরিদর্শনে আসেন। তাঁর স্থানীয় সমর্থকরাও প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে ভবিষ্যত গান্ধীর ডাকা যেকোন আন্দোলনের ভিত্তিভূমি তৈরী করা।[৪৫] মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা বন্ধ করে দেন।[৪৬] কংগ্রেসের একটি দল যা খাদি দল নামে পরিচিত, তাও ব্রিটিশ বিরোধী গনআন্দোলন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যায়।[৪৭] এইসব কর্মকান্ডের মিলিত ফল হল মেদিনীপুরে গণরোষ এবং কংগ্রেস পতাকাই সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে। সাধারন কৃষকরা যারা পূর্বে কমিউনিস্টদের প্রচারিত শ্রেণীসংগ্রামের নীতিতে প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল, এখন পুনরায় কংগ্রেসের কাছে ফিরে আসে। সরকারী কর্মচারীরা লক্ষ্য করেন যে শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমশ বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে মোড় নেওয়ার প্রবনতা দেখা দিচ্ছে।[৪৮] মেদিনীপুর থেকে প্রচারিত লিফলেট (leaflet) এ ঘোষনা করা হয় যে ব্রিটেনের অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতেই হবে এবং তা ভারতবর্ষের মাটিকে ব্রিটিশের রক্তে রঞ্জিত করেই।[৪৯]

আরো একটি লিফলেট এ লেখা হয় যে ঔপনিবেশিক শোষককে চরম আঘাত করতে আসছেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাতে প্রত্যেকটি পুলিশ চৌকিকে অধিকার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।[৫০] এই কর্ম পদ্ধতি পরবর্তী কালে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় গৃহীত হতে দেখা যায়।

১৯৪২ এর এপ্রিল মাস নাগাদ গান্ধীজী ভারতছাড়ো আন্দোলনের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু তা শুরু করা নিয়ে দুমাস যাবৎ তিনি কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি।[৫১] মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতারাও একটি গণআন্দোলনের কথা চিন্তা করছিলেন যদিও তাদের আশা ছিল যে কংগ্রেস ও ভারত সরকারের মধ্যে হয়তো কোন সমঝোতা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ক্রীপশ্ প্রস্তাব নাকচ করার পরই গণআন্দোলনের প্রস্তুতির শেষ পর্ব শুরু হয়। আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই কংগ্রেস কর্মীদেরকে আটকই এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পলাতক সদস্যরা মেদিনীপুরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিস্তারিত নির্দেশ দেন। এতে বলা যায় যে, এই গণআন্দোলন হবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মুক্ত বিদ্রোহ, যাতে সরকারী অফিস ধ্বংস করা হবে এবং তার সহযোগীদের আটক করে রাখা হবে। কর্মীরা গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকেন এবং গোপন মিটিং করে জনসাধারনকে ভবিষ্যতে প্রতি-সরকার গঠনের জন্য তৈরী করতে থাকেন।[৫২]

মেদিনীপুর ১৯৩৯ - ৪২

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন পরিবর্তন সংযোজিত করে। এসময় ভারত প্রতিরক্ষা আইন ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক মিটিং ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ব্যাপক ধরপাকড়ও শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন উপায়ে যেমন যুদ্ধ-মেলা, চলচ্চিত্র, চ্যারিটি ক্রিকেট ম্যাচ প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সামিল করতে সচেষ্ট হয়।[৫৩] এই সময় মেদিনীপুর জেলায় সরকারী দমন ছিল চরম পর্যায়ে। জেলার দক্ষিণাংশে প্রতিরক্ষা আইনে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা হয়। সরকার অধিক রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মূল্যহার বেঁধে দেয়।[৫৪] স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করে এবং জোরকরে যুদ্ধের ঋণ পত্র বিক্রী করে। জেলাশাসক মহিষাদল রাজার কর্মচারীদের যুদ্ধ ঋণপত্র কেনার জন্য চাপ দেন। সরকারী কর্মচারীরা ব্রিটিশ পতাকাকে অভিবাদন করার জন্য চাপ দেন।[৫৫]

১৯৪১ এর প্রথমার্ধে অগ্রসরমান যুদ্ধ ছিল বহুদুরের ঘটনা। কিন্তু হঠাৎ করে এই ঘটনার পরিবর্তন ঘটে যখন জাপান পার্লহারবারে আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজের উপর বোমা বর্ষন করে এবং ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে হংকং এর ব্রিটিশ গ্যারিসনের আঠারো দিনের মধ্যে পতন ঘটে ও

সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে দু মাসের মধ্যে। ১৯৪২ এর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই রেঙ্গুন পরিত্যক্ত হয় ওবং বর্মা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয় মে মাসের মাঝামাঝি।[৫৬]

বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়া যুদ্ধ বাংলার অর্থনীতির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই প্রদেশে সৈন্যরা এসে জড়ো হতে থাকে। বর্মা থেকে প্রচুর সংখ্যায় উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে (১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলায় প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে) এবং তারা সৈন্য চলাচলের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে। তাই সরকার তাদের হাজার সংখ্যায় গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিবিরে পাঠিয়ে দেন।[৫৭] ফলে ঐসব অঞ্চলে ১৯৪১ এর জুলাই এর পর জিনিসপত্রের বাজার দর ভীষন চড়া হয়ে যায়। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এক মন চালের দাম ৬-৮, টাকা হয়েছিল, যা ঐ অঞ্চলের জন্য অস্বাভাবিক দাম।[৫৮] সবজী এবং মাছের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায়। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তমলুক মহকুমায় জনগনের দুর্দশা চরম আকার ধারন করে।[৫৯] ১৯৪২ - এর প্রথমার্ধে প্রধান প্রধান দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সাধারণ জনগণের কাছে আকাশ ছোঁয়া হয়ে দাঁড়ায়। এর ফল হলো খেটে খাওয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চরম কষ্ট ও অসন্তোষের সৃষ্টি।[৬০] জনগণের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায় যখন সরকার এই জেলায় - "চাল বর্জন নীতি" - ও - "নৌকা বর্জন নীতি" কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে। "চাল বর্জন নীতি" অনুসারে ১৯৪২ এর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে চাল ও ধানের ক্রয় এবং স্থানান্তরিতকরন শেষ হয়। বাংলা সরকার চালক্রয়ের জন্য এবং তা সংগ্রহের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করে। এই চাল সংগ্রহ করা হয় প্রধানত সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর কারখানার শ্রমিকদের প্রয়োজনের জন্য। স্বাভাবতই তা ছিল বাজার দরের চেয়ে অনেক কম।[৬১] সরকারের তরফ থেকে ধান চাল কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী নামে এক কুখ্যাত শস্য ব্যবসায়ীকে। ইস্পাহানী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক শস্য সংগ্রহ করতো। এই প্রচেষ্টা জনমানসে এক নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্ভিক্ষ ভীতি সৃষ্টি করে। অপরদিকে, ১৯৪২ এর এপ্রিলে বর্মার পতনে বাংলার সঙ্গে বর্মার ধান ও চালের ব্যবসা-বানিজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং পাটের রপ্তানীও থমকে যায়।[৬২]

এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন বাংলা সরকার ১৯৪২ এর মে মাসে ঘোষণা করে যে, যে সমস্ত নৌকা দশ জনের বেশী যাত্রী বহন করতে পারে তা অধিগ্রহন করা হল। এই "নৌকাবর্জন নীতি" হলো পোড়া মাটির নীতির একটি অংশ যা আসন্ন জাপানী আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য নেওয়া হয়েছে।[৬৩] কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তমলুক, কাঁথি এবং সদর দক্ষিণ অঞ্চলে ছোট বড় সবনৌকাই ধ্বংস করে ফেলা হয়। সরকারী তরফে যদিও সামান্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।[৬৪] কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা রাখা হয়নি।[৬৫] প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার বিমান অবতরন ক্ষেত্র ও শিবির নির্মানের জন্য প্রচুর জমি অধিগ্রহন করে। যাদের জমি অধিগ্রহন করা হয় তাদের পুনর্বাসন বা চাকুরীর কোন বিকল্প ব্যবস্থাই করা হয়নি।[৬৬] এই বাস্তুহারা ও কর্মহারারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে জাপানীরা বাংলার দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। চারদিকে গুজবের ছড়াছড়ি, জনসাধারনের ধারনা হয় যে, এই যুদ্ধে ব্রিটেন জিততে পারবে না, বর্মা প্রত্যাগত উদ্বাস্তু ও কলিকাতা থেকে অপসৃত জনগণ গ্রামাঞ্চলে এসে - কলিকাতায় ও অনান্য অঞ্চলে শত্রু বিমানে বোমাবর্ষণ কাহিনী প্রচার করে। ফলস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে এক ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।** এই সময়েই অখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সমাপ্তি এবং মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের সংবাদ মফঃস্বল অঞ্চলের কর্মীদের কাছে এসে পৌছায়। প্রতিবাদ মিছিল ও হরতালের মধ্যদিয়ে ১৪ই আগষ্ট ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হল - ১) ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সব রাজনৈতিক দলগুলোকে কংগ্রেসের পতাকাতলে এনে জড়ো করে এবং কংগ্রেসই ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন - এ সত্যটা সবদলই স্বীকার করে নেয়।

২) রাজনৈতিক প্রচার জনসাধারনের দুর্দশাকে রাজনৈতিক সমর্থনে পরিবর্তিত করে (Peoples' Suffering into political support) এবং এটাই ছিল সরকারের সঙ্গে জনগণের সরাসরি সংঘর্ষের কারন। এছাড়াও সাধারণ জনগণ এই সময়ে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের স্বাদ পেয়েছিল তার চরম পরিণতিই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাদের যোগদানের কারন। তাই তাদের প্রচেষ্টাই গড়ে তুলেছিল সমান্তরাল শাসন যার স্থায়িত্ব ছিল দু বছর।

সূত্র নির্দেশ

১) এন. এন. দাস, "হিস্ট্রি অব মিদনাপুর, পার্ট টু," কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ২১৬-২১৭।

২) গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, হোম, পলিটিক্যাল, (ইন্টারন্যাল), ফাইল নং ১৮.৪.১৯৪০, পৃ. ২৯, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া)।

৩) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৬।

৪) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.৭.১৯৪০, পৃ. ১৪৬, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৫) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.৭.১৯৪০, পৃ. ১৪৮, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৬) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৭।

৭) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.৭.১৯৪০, পৃ. ১৪৮, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৮) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৭।

৯) সুনীল সেন, পপুলার পার্টিসিপেশান ইন দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, মেদিনীপুর ১৯৪২-১৯৪৪, ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ, ভলিউম - ১২, নং ১-২, ১৯৮৬, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

১০) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.৭.১৯৪০, পৃ. ১৪৮, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১১) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৭।

১২) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ০৩.৬.১৯৪২, পৃ. ৭, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৩) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ০৩.৬.১৯৪২, পৃ. ৭, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৪) অমৃত বাজার পত্রিকা (এ.বি.পি.), কলিকাতা, এপ্রিল ৬, ১৯৪১।

১৫) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.১.১৯৪০, পৃ. ১৪৯, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৬) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.১.১৯৪০, পৃ. ১৪৯, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৭) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.১.১৯৪০, পৃ. ৩৬৬, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৮) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ১৮.১.১৯৪০, পৃ. ৩৬৬, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

১৯) সংগ্রামী পুরুষ কুমার চন্দ্র, তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি (মেদিনীপুর, ১৯৮৫), পৃ. ৯৭।

২০) বঙ্গভূষণ ভক্ত, নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম, (মেদিনীপুর, ১৯৭৩), পৃ. ৩৩।

২১) গোপীনন্দন গোস্বামী, বাংলার হলদিঘাট তমলুক, (মেদিনীপুর, ১৯৭৩), পৃ. ৩৩।

২২) বঙ্গভূষণ ভক্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩২।

২৩) অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপারস্ , ফাইল নং পি. ৫(পার্ট টু ১. ১৯৪১, নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরী, নিউ দিল্লী, (এর পর এ. আই. সি. সি. পেপারস্ এবং ফাইল নং)।

২৪) সংগ্রামী পুরুষ কুমার চন্দ্র, পৃ. ১০৬

২৫) সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও অনান্য, " আগষ্ট রেভল্যুশান এন্ড টু ইয়ার্স ন্যাশানাল গভর্নমেন্ট ইন মিদনাপুর, পার্ট-ওয়ান," (কলিকাতা, ১৯৪৬) পৃ. ৫।

২৬) সংগ্রামী পুরুষ কুমার চন্দ্র, পৃ. ৯৮।

২৭) সুশীল কুমার ধাড়া, প্রবাহ, (মেদিনীপুর, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৩-১৩৪।

২৮) তমলুক শহরের গোপীনন্দন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার, ১৯৮৯।

২৯) এ.বি.পি., জুন, ১৯৪১।

৩০) এ.বি.পি., অব, ১৯৪১।

৩১) সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও অনান্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫।

৩২) ঐ।

৩৩) সুশীল কুমার ধাড়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৩৪) সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও অনান্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯।

৩৫) বিজন মিত্র এবং ফণী চক্রবর্তী, 'রেবেল ইন্ডিয়া,' (কলিকাতা, ১৯৪৬), পৃ. ২২।

৩৬) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৪-১৭।

৩৭) এ.বি.পি., ১৯ জুন, ১৯৪১।

৩৮) এ.বি.পি., ১৯ জুন, ১৯৪১।

৩৯) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'বেঙ্গল ইলেকটোরাল পলিটিক্স এন্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল,' (নিউ দিল্লী, ১৯৮৪)।

৪০) সুমিত সরকার, 'মর্ডান ইন্ডিয়া, ১৮৮৫-১৯৪৭,' (ম্যাকমিলন ইন্ডিয়া লিমিটেড, ১৯৮৫ পুনর্মুদ্রিত), পৃ. ৩৮১।

৪১) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ০৩.৬.১৯৪২, পৃ. ৩৪।

৪২) এ. আই. সি. সি. পেপারস্ ,ফাইল নং-২২ (পার্ট-১), হোম, পল.(আই) এবং ফাইল নং- ১৮.৪.১৯৪২, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৪৩) হোম, পল. (আই) এবং ফাইল নং- ০৩.৬.১৯৪২, পৃ. ৭, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৪৪) হোম, ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, ফাইল নং- ১০২. ১৯৪২, পৃ. ২।

৪৫) হোম, পলিটিক্যাল, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, ফোর্ট নাইটলি রিপোর্ট, জুনের দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৪২ (এরপর এফ.আর., জি.বি)।

৪৬) এফ.আর., জি.বি., ১৯৪২, জুলাই এর দ্বিতীয়ার্ধ।

৪৭) এফ.আর., জি.বি., ১৯৪২, আগষ্ট এর প্রথমার্ধ।

৪৮) এফ.আর., জি.বি., ১৯৪২, জুলাই এর দ্বিতীয়ার্ধ।

৪৯) এফ.আর., জি.বি., ১৯৪২, জুলাই এর দ্বিতীয়ার্ধ।

৫০) এফ.আর., জি.বি., ১৯৪২, জুলাই এর দ্বিতীয়ার্ধ।

৫১) গভর্মেন্ট অব বেঙ্গল, হোম, ডিপার্টমেন্ট, পলিটিক্যাল ডিসট্রিক্ট অফিসার্স ক্রনিক্যালস অব ইভেন্টস, ডিস্টারবেন্সেস কনসিকুয়েনস আপন দ্য অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিস রেজোলিউশান অব এইট আগষ্ট ১৯৪২ এন্ড দ্য এরেস্ট অব কংগ্রেস লিডার্স দেয়ারআফটার - আগষ্ট ১৯৪২টু (মিডল) ১৯৪৩, আলিপুর, ১৯৪৩ (ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া প্রাপ্ত)।

৫২) ডি.ও.সি. পৃ.১৭।

৫৩) এন. এন. দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২১৫; হোম, পল.(আই) এবং ফাইল নং- ১৮.২.১৯৪১, পৃ. ৭, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া।

৫৪) সতীশ চন্দ্র সামন্ত ও অনান্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪।

৫৫) এ.বি.পি., ২৪ আগষ্ট, ১৯৪১।

৫৬) বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, 'দ্য রিট্রিট ফ্রম বার্মা,' ১৯৪১-৪২, (বোম্বাই, ১৯৫৯), ইনট্রোডাকশান এন্ড পেসিম।

৫৭) পল. আর. গ্রীনো, 'প্রস্পারিটি এন্ড মিজারী ইন মডার্ন বেঙ্গল,' (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৮২), পৃ. ৮৮।

৫৮) এ.বি.পি., ১লা জুলাই, ১৯৪১।

৫৯) এ.বি.পি., ২৪ আগষ্ট, ১৯৪১।

৬০) হোম, পল.(আই), ফাইল নং- ১৮.৭.১৯৪১, পৃ. ৪৮ এবং ১৮.৯.১৯৪০।

৬১) দ্য ফেমিন এনকোয়্যারী কমিশন রিপোর্ট অন বেঙ্গল, (কলিকাতা, ১৯৪৫) পৃ. ২৫।

৬২) পল. আর. গ্রীনো, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৮৭।

৬৩) নানাবতী পেপারস্ এভিডেন্স রেকর্ডস, ফেমিন এনকোয়্যারী কমিশন, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৫৪২-৫৪৭।

৬৪) বিজন মিত্র এবং ফণী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩।

৬৫) নানাবতী পেপারস্ , পৃ.৫৪২।

৬৬) নানাবতী পেপারস্ , পৃ.২১১।

৬৭) হোম, পল.(আই), ফাইল নং- ১৮.৪.১৯৪২, ১৮.৬.১৯৪২, ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া, এছাড়া বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অশনি সংকেত' (কলিকাতা, বিভিন্ন তারিখ)।

৬৮) হোম, পল.(আই), ফাইল নং- ১৮.১.১৯৪২।

মেদিনীপুরে ৪২-এর গণ আন্দোলন :
অহিংস এবং সহিংস ধারার সহবাস্থান ও সংঘাত

হরিপদ মাইতি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অবদান অনন্য। ২০৭ শহীদের রক্তে ধন্য পুণ্য অনন্য মেদিনীপুরের মাটি মানুষ ঐতিহ্য এবং ইতিহাস। আন্দোলনে অহিংস এবং সশস্ত্র ধারায় অবিচলিত সমান্তরালভাবে। পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের ভূমিকাও বীরত্বব্যঞ্জক। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান, কৃষক শ্রমিক সর্বশ্রেণীর জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম মেদিনীপুরের মাটিতে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে সংগ্রাম পরিচালিত এবং ভারতছাড় আন্দোলনে সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিনতি এবং বিশেষ প্রাপ্তি। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব পর্বে ঐতিহাসিক থানা অভিযান এবং তিনটি থানা - খেজুরী, পটাশপুর এবং সূতাহাটা বিনারক্তপাতে দখল মেদিনীপুরের নেতৃবৃন্দের সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং জনগনের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সরকার গঠন ও পরিচালন। খেজুরী থানা জাতীয় সরকার, পটাশপুর থানা জাতীয় সরকাব এবং কাঁথি মহকুমা - স্বরাজ পঞ্চায়েত - স্থাপিত হলেও সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রতি সরকার এবং উত্তর প্রদেশের বালিয়া জাতীয় সরকাবের মত গৌরবোজ্জ্বল মেদিনীপুরের - মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার-। সম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সর্বপ্রকার দমন পীড়ন, গোয়েন্দা দপ্তরের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ বাইশ মাস (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ - ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যধারা এক রোমাঞ্চকর গৌরবগাথা এবং অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। মেদিনীপুরের ভারতছাড় আন্দোলন এবং তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অহিংস এবং সহিংস ধারায় পরিচালিত। এক্ষেত্রে তমলুক মহকুমায় 'গরমদল'-এর সহিংস ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ থানা এবং সরকারী অফিস ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু ধ্বংস সাধন নয়, রক্তপাত জনিত মানুষ খুনের ঘটনাবলি অহিংস গণআন্দোলনে সহিংস ধারার প্রভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত। সুতরাং মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস এবং সহিংস ধারার সহবস্থান এবং আগষ্ট আন্দোলনে দুইটি ধারার সমন্বয় ও সংঘাত আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মেদিনীপুরের ভারতছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্যায় (৯ আগষ্ট ১৯৪২ - ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪২) ছিল মিটিং মিছিল, বিক্ষোভ, গণসংগঠন এবং গণচেতনার প্রসার। এই পর্যায় সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায়। পরবর্তী সংঘর্ষ পর্যায়ে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ - নভেম্বর ১৯৪২) ঐতিহাসিক থানা অভিযান, দখল এবং অন্যান্য সরকারী অফিসের ব্যাপক ধ্বংস সাধন। উক্ত ঘটনাবলী ছিল হিংসাত্মক। পুলিশের ৩৩টি বন্দুক ছাড়ান, সরকারী কর্মচারী-পুলিশ এবং খাসমহল অফিসার ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার এবং আটক ছাড়াও মোট ১৩২টি সরকারী অফিস আক্রমণ - ধ্বংসসাধন করা হয়েছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক পরিস্থিতির মোকাবিলায় সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত। তথাপি ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ খেজুরী থানা এবং খাসমহল অফিস দখল বিনারক্তপাতে। পরদিন ২৯ সেপ্টেম্বর পটাশপুর এবং সূতাহাটা থানাও বিনারক্তপাতে দখল করেছিল জনগণ। কিন্তু ঐ দিন তমলুক থানা, মহিষাদল থানা এবং ভগবানপুর থানা অভিযানে পুলিশের গুলিতে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সহ ৪০জন স্বেচ্ছাসেবক। এছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম থানা অভিযানে শহীদ হন ৫ জন। সেই সময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে পোষ্টঅফিস, ইউনিয়নবোর্ড এবং রেজেস্ট্রি অফিস প্রভৃতির ধ্বংস সাধন বিনারক্তপাতে। পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত

পোষ্ট অফিস ধ্বংস ক্ষতিসাধন	- ৩৮	আবগারি দোকান	- ১৪
ইউনিয়নবোর্ড	- ২১	সরকারী বন্দুক ছাড়ান	- ৩৩
পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন	- ২১	ব্রীজ ধ্বংস	- ৩৮
সাব-রেজেস্ট্রী অফিস	- ৭	সাব ওভারসিয়ার অফিস	- ২
ঋন সালিশী বোর্ড	- ১৩	টোল অফিস	- ২
ডাক বাংলো	- ১৭	থানা আক্রমন	- ৭

জাতীয় সরকার গঠন এবং পরিচালন

আগষ্ট বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায় হল আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি - জাতীয় সরকার গঠন এবং পরিচালন। মেদিনীপুরে মোট চারটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল। প্রথম, খেজুরী থানা জাতীয় সরকার পূর্ণেন্দু শেখর ভৌমিকের নেতৃত্বে। স্থায়িত্ব ছিল তিন মাস (অক্টোবর ৪২ - ডিসেম্বর ৪২)। দ্বিতীয়, পটাশপুর থানা জাতীয় সরকার কালিপদ রায় মহাপাত্রের নেতৃত্বে। কার্যকাল ছিল অক্টোবর ৪২ থেকে ডিসেম্বর ৪২ পর্যন্ত। তৃতীয়, মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে। কার্যকাল ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ - ১

53

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। চতুর্থ, জাতীয় সরকারটির নাম ছিল কাঁথি মহকুমা স্বরাজ পঞ্চায়েত। কান্দাল চাঁদ গিরির সভাপতিত্বে স্বরাজ পঞ্চায়েতের কার্যকাল ছিল ১৫ এপ্রিল ১৯৪৩ - ডিসেম্বর ১৯৪৩ পর্যন্ত।

উক্ত জাতীয় সরকারগুলি প্রতিষ্ঠার মূলে ঐতিহাসিক থানা আক্রমন এবং সরকারী অফিসগুলির ধ্বংস সাধনের পরে স্থানীয় ভিত্তিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুরে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পরে দুর্ভিক্ষ মহামারী, চোরাকারবারি, মজুদদারি মোকাবিলায় এবং ত্রাণ ও পুণর্গঠনে সুষ্ঠ ব্যবস্থা ছিল উদ্দেশ্য। কারণ এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসক বিদ্রোহী মেদিনীপুরের প্রতি ছিলেন উদাসীন। ঝড়ের পনের দিন পরে কলিকাতার সংবাদপত্রে সংবাদ প্রেরণ করেন সরকারী কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন জেলাশাসক নিয়াজ মহম্মদ খান (N. M. Khan) রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিকে ত্রাণকার্য বিলম্বিত করার পরামর্শ প্রদান করেন - ' Relief be withheld from the disaffected villages until the people handover the stolen guns and give an undertaking that they will take no further part in any Congress movement.' সুতরাং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বিকল্প সরকার গঠনের মাধ্যমে তৎপর হতে হয়েছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং ত্রাণ ও পুনর্গঠন কার্য পরিচালনায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের গোয়েন্দা বিভাগের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সমান্তরাল জাতীয় সরকার তাদের কার্যধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মহাশয়ের বিধান সভায় ১৫.২.৪৩ তারিখে বিবৃতি নিম্নরূপ :

' For the past five months Midnapur has not merely loomed large before the public eye but practically the political history of Bengal during this period has been the history of Midnapur. In the district of Midnapur there was a direct challenge to the Government authority which was conducted on an organized basis unknown at any rate in this province. There may be differences of opinion as to whether the alleged activities on the part of the organizers on the movement actually took place. But there is no denying the fact that their object was to paralyse the civil administration and they succeeded in doing so at least in some areas.'

১৯৪২-এর ১৭ ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে। কার্যকাল ছিল ১৯৪৪ -এর ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উক্ত জাতীয়

সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ এবং তাঁদের দপ্তর নিম্নবর্ণিত -

সতীশচন্দ্র সামন্ত	সর্বাধিনায়ক	পররাষ্ট্র বিভাগ
অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়		অর্থবিভাগ
সুশীল কুমার ধাড়া		স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা
ডাঃ প্রফুল্ল কুমার বসু		বিচার বিভাগ
সতীশ চন্দ্র সাহু		খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
প্রহ্লাদ কুমার প্রামানিক		প্রচার বিভাগ

আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা সুরক্ষায় স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভূমিকা সর্বাধিক। সেই লক্ষ্যে সর্বাধিনায়ক ১৯৪৩ -এর ২৬ জানুয়ারী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীনে তমলুক, মহিষদল, সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম থানায় প্রতিষ্ঠা করেন থানা জাতীয় সরকারের অধীনায়কদের নেতৃত্বে। এছাড়া ঐদিন অপর এক ঘোষনার দ্বারা 'বিদ্যুৎ বাহিনী এবং ভগিনী সেনা বাহিনী' একত্রিত করে জাতীয় সেনাবাহিনী (National Militia) রূপে ঘোষনা করা হয়। এই বাহিনীর অধীনে ছিল যথাক্রমে ১) যুদ্ধ বিভাগ, ২) গোয়েন্দা বিভাগ, ৩) গেরিলা বিভাগ, ৪) আইন শৃঙ্খলা বিভাগ, ৫) শুশ্রুষা বিভাগ। জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) নিয়োগ করা হয় সংগঠনের রূপকার সুশীল কুমার ধাড়াকে।

গরম দলের কার্যধারা

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের জাতীয় সেনাবাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে অপর একটি শাখাসংগঠন সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠে। সেটি হল গরমদল (Militant Action Squad)। বিদ্যুৎবাহিনী এবং ভগিনী সেনার দৃঢ়চেতা নির্ভীক; অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, দায়িত্বশীল এবং জীবনদানে অকুন্ঠচিত্ত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল গরমদল।

গরমদল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল এক বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য। ১৯৪৩ -এর ৯ জানুয়ারী মহিষাদল থানায় চন্ডীপুর, মাশুরিয়া এবং ডিহি মাশুরিয়া - তিনটি গ্রাম ঘেরাও করে পুলিশ এবং মিলিটারি মহিলাদের গণধর্ষণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ৪৬ জন। তাঁদের মধ্যে সিন্ধুবালা মাইতি বর্বর অত্যাচারে মৃত্যু হয় দুরারোগ্য অসুখে অসুস্থতার কারনে। অতঃপর জাতীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ কঠোরতা অবলম্বন করেন পরিস্থিতির মোকাবিলায়। পুলিশের বর্বরতা প্রতিরোধ, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তথ্য সংগ্রহে মোকাবিলা,

চোরাকারবারি, মজুদদারি নিয়ন্ত্রন, সরকারী ত্রাণ ও পুনর্গঠনের অর্থ নয়ছয় রোধ, দুর্ভিক্ষ মহামারীর সুযোগে সুদখোর, ঠকবাজ এবং ব্রিটিশ শাসকের সহযোগী দেশদ্রোহীদের সায়েস্তা করতে গঠিত হয়েছিল গরমদল। জাতীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক দেশদ্রোহীদের সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গ্রেপ্তার, কারাদন্ড, অর্থদন্ড, এমনকি মৃত্যুদন্ড ও প্রদান করে গরমদল। নিম্নে মৃত্যুদন্ড এবং গ্রেপ্তারের তালিকা প্রদান করা হল।

প্রাণদন্ডের তালিকা

মহিষাদল থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	বিরাজ মিশ্র	শিক্ষক	কল্যাণচক
২	ভবতোষ দাস	দফাদার	সুন্দরা
৩	ভূষণ বেরা		উত্তর কাশিমনগর
৪	ভগীরথ দাসঅধিকারী		উত্তর কাশিমনগর
৫	একজন ভিখারী		
৬	হোসেন মীর		ভান্ডার জলপাই
৭	খুরসেদমীর		ভান্ডার জলপাই
৮	শেখ রামজান	দফাদার	৭নং ইউনিয়ন
৯	শেখ কচি	ডাকাত	পুয়াদা
১০	শেখ নতি	ডাকাত	পুয়াদা
১১	সতীশ মাইতি		মান্দার গেছ্যা
১২	মনীন্দ্র মাইতি		তাড়াগেড়িয়া
১৩	...... কাঁপ	ডাকাত	হাওড়া জেলা
১৪	অচ্যুতানন্দ মিশ্র		বাড় অমৃতবেড়িয়া
১৫	হৃষীকেশ ভৌমিক		পদুমবসান
১৬	সতীশ		শ্রীকৃষ্ণপুর

১৭	ভূতনাথ বর	চৌকিদার	বাবলপুর
১৮	রত্নেশ্বর সাহু	প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত	পান্ডব বসান
১৯	— মাইতি	চৌকিদার	কোলসর
২০	খগেন		বাসুদেবপুর
২১	তারিণীচরণ মাইতি		বাসুদেবপুর
২২	গোবিন্দ দাস		বাড়অমৃতাবেড়িয়া
২৩	তরণী মন্ডল		রাজা রামপুর

সুতাহাটা থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	শেখ আজিমুদ্দিন	কুখ্যাত ডাকাত	রামচন্দ্র পুর
২	মহাদেব বেরা	দফাদার	গোবিন্দপুর
৩	শশী মাইতি		শ্রীকৃষ্ণপুর
৪	শ্রীপতি বেরা	প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত	রামগোপালচক
৫	রাধাকৃষ্ণ পন্ডিত		বসানচক
৬	বেণীমাধব ভূঁইয়া		অনন্তপুর
৭	শেখ নেমাজী		বাড়বাসুদেবপুর
৮	শেখ মেমিন	চৌকিদার	শ্রীধরপুর
৯	ইন্দ্র সামন্ত	দফাদার	মনোহরপুর
১০	বাণেশ্বর পাত্র	কোস্টেলগার্ড	কুঁকড়াহাটি
১১	বেণীমাধব বাগ		আজারপুর
১২	জনৈক মিলিটারি ব্যক্তি		

নন্দীগ্রাম থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	গিরিশ দাস	দফাদার	গোপালপুর
২	সদানন্দ গিরি		রেয়েপাড়া
৩	রমানন্দ ওঝা	দফাদার	৪নং ইউনিয়ন

তমলুক থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	কিরণলাল	তমলুক কোর্টের চাপরাশি	উত্তর নারিকেলদা
২	ননীদাস		কামারদা

গ্রেপ্তার এবং কারাদন্ড

[illegible]

নাম উল্লেখ করা হল -

মহিষাদল থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	উমাচরণ পট্টনায়ক	কবিরাজ	হরিপুর
২	শ্রীপতি আদক	প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত	চকসিমুলিয়া
৩	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভৌমিক		রাজনগর
৪	ইন্দুভূষণ প্রামানিক		বাসুদেবপুর
৫	নগেন্দ্রনাথ সামন্ত	ব্যবসায়ী	বাসুলিয়া

নন্দীগ্রাম থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	তীর্থবাস পাল		৯নং ইউনিয়ন
২	জনৈক চৌকিদার		

সুতাহাটা থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	
১	অমলেশ ত্রিপাঠি		দেভোগ
২	হৃষীকেশ ত্রিপাঠি		দেভোগ

(এদের গ্রেপ্তার করা হয়।)

তমলুক থানা

সংখ্যা	নাম	পেশা	ঠিকানা
১	ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি		ডুমরা
২	গজেন্দ্রনাথ ভক্তা		পাঁচবেড়িয়া
৩	অচ্যুতানন্দ হাজরা		বল্লুক

মেদিনীপুরের গরমদলের প্রধান নেতা ছিলেন সুশীল কুমার ধাড়া। অন্যেরা হলেন মহিষদল থানায় গোপীনন্দন গোস্বামী (গোপালপুর) ধীরেন্দ্র নাথ ঘোড়ই (খাঞ্চি) শরৎ চন্দ্র জানা (ফটা টিকরি), শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস (দুর্গাপুর - নন্দীগ্রাম), শ্রীমতী ঊষা চৌধুরী, শ্রীমতী কুমুদিনী ডাকুয়া (মহিষাদল) প্রমুখ। নন্দীগ্রাম থানায় বঙ্গ ভুষণ ভক্ত, কানাই লাল সামন্ত (ধান্যশ্রী), সুধাংশু শেখর মাইতি (গড়গ্রাম), নরেন্দ্রনাথ পড়িয়া (ডিহি কাশিমপুর) রবীন্দ্রনাথ গিরি (রেয়েপাড়া), শেখ আমিরুদ্দিন (সুলতানপুর) প্রমুখ সুতাহাটা থানা - বিধুভূষণ কুইতি (বাড় বাসুদেবপুর), যদুপতি মাইতি (চকলালপুর), শ্যামাপদ বিবয়ী (চকদ্বীপ), মন্মথনাথ সানকি (ডালিম্বচক) প্রমুখ। তমলুক থানায় - নরেন্দ্রনাথ জানা (বল্লুক), অমূল্যচরণ মাইতি (সোনাপাতা), আশুতোষ মন্ডল (ডিমারিহাট), দিবাকর ভট্টাচার্য (যোগীক্ষোপ) প্রমুখ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ১০৯ জন।

গরমদলের কার্যধারা এবং ঐতিহাসিকদের অভিমত

গরমদলের কার্যধারা এবং ঐতিহাসিকদের অভিমত পর্যালোচনা অপরিহার্য ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠায়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী মেদিনীপুরের সুসন্তান। ভারতছাড়ো আন্দোলনে গরমদল কর্তৃক গ্রেপ্তার এবং বিশহাজার টাকা প্রদানে তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন 'তাঁদের অনেক কাজেই জনসাধারনের অধিকাংশ পছন্দ করে নি, শুধু ভয়ে মেনে নিয়েছে।' কিন্তু নিম্নে পরিবেশিত তথ্য প্রমাণ করে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যধারার পশ্চাতে জনসমর্থন ছিল।

১) জেলাশাসক এম. এন. খান ১৯৪৩ -এর ৪ ফেব্রুয়ারী বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে যা রিপোর্ট প্রেরণ করেন তার ভাষা হল - ' Informaton was received that some Congress rebels were attending a camp at Chunakhali, P.S. Mahishadal. The police went to raid the camp in disguise. No sooner had they reached near about the camp than the Congress rebels took

to ther heels. Some people of the village who were working in the field & were requested by the police to help them in arrestng these rebels but in vain. The attitude of the villagers showed that they were all supporters of the rebels . Hotly pursued by the police these rebels entered the village Panisiti and disappeared. The villagers of Panisiti also failed to help the police and showed themselves rather sympathetic to the rebels.'

২) তৎকালীন বাংলার গভর্ণর R. G. Kessy লর্ড ওয়াভেলকে এক পত্রে জানান 'A high portion of inhabitants are in sympathy with the local 'National Government' or Jatiya Sarkar as it calls itself which has existed since the early days of the Congress rebellion.'

৩) ব্রিটিশ সরকার জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা আদালতে দায়ের করেছিল তার প্রত্যেকটি সাক্ষীর অভাবে খারিজ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে তা জনগনের জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি সহানুভূতির পরিচায়ক।

৪) দীর্ঘ বাইশ মাস জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্যুৎবাহিনী ও গরমদলের স্বেচ্ছাসেবকদের আহারাদি এবং আশ্রয় জনগন দিয়েছিল বলে তাদের পক্ষে আন্দোলন এবং সমান্তরাল প্রশাসন পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল বিপ্লবীদের পক্ষে।

৫) বিদেশী ইতিহাসবিদ Paul Greenough তাঁর Political Mobilization and Underground Literature of the Quit India Movement গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'Nonetheless it (National Governmemnt) managed to carry on a variety of disruptive actions through 1943 and upto August, 1944 and it seems to have enjoyed some tacit middle class and peasant support in the Sub-division.

অপর ইতিহাসবিদ সুনীল সেন Indian Historical Review পত্রিকায় (Vol 12, page 311, 1985-'86) উল্লেখ করেছেন -'The Bidyut Bahini showed its ferocious appetite for individual murder. It seems that the murder of 'Spies' acquired legitimacy. Some chowkidars including a few muslims were murdered.'

নিঃসন্দেহে বলা যায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশ হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিল। তবে তাঁরা রক্তের নেশায় আচ্ছন্ন হননি। যে সকল চৌকিদার, দফাদার এবং মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে তারা লুন্ঠন, ধর্ষণ, ডাকাতি বা গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পরেও মৃতদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ বা প্রতিহিংসামূলক আচরনের প্রমান পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া মৃতের সংখ্যা পরিবেশিত তথ্য অনুসারে ৪০জন। সুশীল ধাড়ার মতে সংখ্যা একটু বেশী - যা একশতের মত। উক্ত স্বল্প সংখ্যাকে রক্তের নেশা 'Ferocious appetite for individual murder'. বলা যায় না।

মেদিনীপুরে অহিংসা এবং হিংসার সহবস্থান ও সংঘাত

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত অহিংস এবং সশস্ত্র ধারায়। আগষ্ট আন্দোলনের পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃবৃন্দ এবং জনগন কর্তৃক সংগ্রাম প্রধানত অহিংস পথে পরিচালিত। কেবলমাত্র লবণ সত্যাগ্রহ পর্বে দাসপুর থানায় চেঁচুয়া হাটে ৩.৬.৩১ তারিখে উত্তেজিত জনতা দুইজন পুলিশ অফিসার অনিরুদ্ধ সামন্ত এবং ভোলানাথ ঘোষকে পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন। অন্যদিকে সেই সময় ১৯৩১ -৩৩ মেদিনীপুরের সশস্ত্র সংগ্রামীগণ হত্যা করেন তিনজন জেলাশাসক - মিঃ পেডি, ডগলাস এবং বার্জ সাহেবকে।

ভারতছাড়ো আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং গান্ধী নেতৃত্বের আনুগত্যাধীনে মেদিনীপুরে তমলুক মহকুমায় জাতীয় সরকার তথা গরমদলের নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশ অহিংসার পাশাপাশি হিংসাত্মক রক্তপাত ও নিধন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে আলোচিত। এক্ষেত্রে কিছু অন্যায় অবিচারও ঘটতেপারে কার্যক্ষেত্রে। কারণ যে কোন স্বৈরাচারী শাসনে প্রশাসনিক পদক্ষেপে ত্রুটি বিচ্যুতি স্বাভাবিক। গরমদলের কর্তৃপক্ষকে গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাতে কিছুক্ষেত্রে লঘু পাপে গুরু দন্ডের ঘটনাও ঘটতে পারে।

তবে মেদিনীপুরে ৪২-এর ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমস্যা ছিল প্রকট। সেই সঙ্গে থানা আক্রমণ, পুলিশের বন্দুক ছাড়ান, সরকারী অফিসের ব্যাপক ধ্বংস সাধনের পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের তীব্র দমন পীড়ন ও ত্রাণকার্যে উদাসীনতা এবং আইন শৃঙ্খলায় অব্যবস্থা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থায় কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং রক্তপাত, প্রাণদন্ড বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্ট ঘটনাবলি যা একপ্রকার অপরিহার্য ছিল। ফরাসী বিপ্লবে জ্যাকোবিনদের কার্যধারা এক্ষেত্রে উদাহরণ। ১৯২২-এ অসহযোগ আন্দোলনে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে ঘটে হিংসাত্মক ঘটনা। সেক্ষেত্রে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪২-এর গান্ধী ব্রিটিশ

বিরোধী আন্দোলনে অনেক পরিণত ও বাস্তববাদী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও হিংসাত্মক কার্য সমন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ১৯৪৫-এর ১৪ সেপ্টেম্বর পুনায় যে Resolution গ্রহণ করেছিল তা নিম্নরূপ :

'In some places the people forgot and fell away from the Congress method of peaceful and non-violent action, but realizes that the provocative action of the Government in affecting sudden and widespread arrestes of all well-known leaders, and brutal and ruthless repression of peaceful demonstraton, goaded them to rise spontaneously to resist armed might of an alien imperialist power which was trying to crush the spirit of freedom and the passionate desire of the Indian people to gain independence.'

সুতরাং ভারতছাড়ো আন্দোলনে অহিংসা এবং হিংসার সহবস্থান ও সংঘাত বাস্তব সত্য। মেদিনীপুরেও তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানার অধিবাসী বিশিষ্ট গান্ধীবাদী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রদ্ধেয় জননেতা কুমার চন্দ্র জানা। তিনি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের হিংসাত্মক কার্যের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কাঁথি মহকুমার নেতৃবৃন্দও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের তীব্র দমন পীড়ন নির্যাতন সত্ত্বেও ৪২ -এর আন্দোলনে হিংসার পথ - রক্তপাত নীতি গ্রহন করেন নি।

সবশেষে উপসংহারে বলা যায় মেদিনীপুরে ভারতছাড়ো আন্দোলনের আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত যথার্থ : ব্রিটিশেরা এখানে যা করেছে তা আমি হলে কি করতাম জানি না। তোমরা যা করেছ তা বীরোচিত এবং গৌরবময়। তবে তোমরা অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থী' প্রবণতা : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

অমিতাভ চন্দ্র

বর্তমান নিবন্ধে 'বামপন্থী' কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই এখানে যে অর্থে 'বামপন্থী' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে 'বামপন্থা' বলতে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধিতা বোঝায়। আর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এই 'বামপন্থী' আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধী বা প্রচলিত ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা প্রখর বিরোধী ধারাটিই হল কমিউনিস্ট আন্দোলন,, যার উদ্দেশ্য হল প্রচলিত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পালটে ফেলে এক নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপথ অগ্রবর্তী হয় বিশ্ববিপ্লবের অভিমুখে। কিন্তু লেনিন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ -**"Left - Wing" Communism, an Infantile Disorder** '- এ 'বামপন্থী' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন এক বিশেষ ও নির্দিষ্ট অর্থে। এই অর্থে 'বামপন্থা' হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিচ্যুতি, এক 'শিশুব্যাধি' বিশেষ। লেনিনের পূর্বোল্লিখিত বইটিতে 'বামপন্থী' বা 'বামপন্থা' কথাটি এই 'শিশুব্যাধি' রূপ বিচ্যুতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান সন্দর্ভেও লেনিন কর্তৃক ব্যবহৃত এই বিশেষ ও নির্দিষ্ট অর্থেই 'বামপন্থী' বা 'বামপন্থা' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে উল্লিখিত তাঁর এই বইটিতে লেনিন 'বামপন্থা'কে কমিউনিজমের 'শিশুব্যাধি' হিসাবে চিহ্নিত করে তীব্র ভাষায় এই বিচ্যুতিটির সমালোচনা করেছেন। তাঁর কঠোর সমালোচনার শরে বিদ্ধ হয়েছেন 'বামপন্থী' হিসাবে আখ্যায়িত অগ্নিবর্ষী কমিউনিস্টরা। আলোচ্য বইটিতে লেনিন কয়েকটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন এবং এই প্রসঙ্গগুলিতে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করে নিজস্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন — **' Should Revolutionaries Work in Reactionary Trade Unions?', 'Should We Participate in Bourgeois**

Parliaments?' এবং 'No Compromises?'।* তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সবকটির ক্ষেত্রেই লেনিনের উত্তর ছিল ইতিবাচক। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনিনের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, পরিস্থিতির বিচারে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় কমিউনিস্টদের কৌশল হিসাবে পূর্বোল্লিখিত পন্থাগুলির সব কটিই অবলম্বন করতে হবে, এ বিষয়ে কোনও ছুঁৎমার্গই চূড়ান্ত বিচারে বিপ্লবের প্রয়োজনেই বাঞ্ছনীয় নয়। কমিউনিস্টদের কৌশলের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সেই কারণেই পূর্বোক্ত প্রসঙ্গগুলির ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' হিসাবে অভিহিত কমিউনিস্টদের যান্ত্রিক ভাবে অনুসৃত অনড় নেতিবাচক অবস্থানের তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী, এহেন অতি-বিপ্লবী নঞর্থক অবস্থান ছিল তাঁর কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু। প্রয়োজনে আপস-মীমাংসার ওপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন, যদি তা পরবর্তীকালে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিতে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের অনড় নেতিবাচক অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করে তিনি সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিধাগুলি প্রয়োগ করেছিলেন : 'fundamentally wrong', 'contain nothing but empty phrases', 'ridiculous pretentiousness', 'patently wrong' * ইত্যাদি। লেনিনের লেখা থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> To accept battle at a time when it is obviously advantageous to the enemy, but not to us, is criminal; political leaders of the revolutionary class are absolutely useless if they are incapable of "changing tack, or offering conciliation and compromise" in order to take evasive action in a patently disadvantageous battle. *

একদিকে সুবিধাবাদ এবং অপরদিকে 'বামপন্থী' গোঁড়ামি — উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন লেনিন :

> It is now essential that Communists of every country should quite consciously take into account both the fundamental objections of the struggle against opportunism and "Left" doctrinairism, and the **concrete features** which this struggle assumes and must inevitably assume in each country, ...*

কমিউনিজমে 'বামপন্থা'কে বিশ্ব বিপ্লবের পরিপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে লেনিন আশা

প্রকাশ করেছিলেন যে, বিশ্ব বিপ্লবের পক্ষে পরিস্থিতি অধিকতর অনুকূল হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে নিজেকে 'বামপন্থী' কমিউনিজমের শিশুব্যাধিটি থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হবে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় লেনিনের নিজের লেখা থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা হল :

> World revolution has been so powerfully stimulated and accelerated by the horrors, vileness and abominations of the world imperialst war and by the hopelessness of the situation created by it, this revolution is developing in scope and depth with such splendid rapidity, with such a wonderful variety of changing forms, with such an instructive practical refutation of all doctrinairism, that there is every reason to hope for a rapid and complete recovery of the international communist movement from the infantile disorder of "Left-wing" communism.*

লেনিনের এই তাত্ত্বিক কাঠামোটিকে মাথায় রেখেই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'বামপন্থী' প্রবণতার বা 'বামপন্থা'র আলোচনার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাজে অগ্রসর হব। এই নিবন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে কেবলমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে (একদা ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত, তার পরে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পরবর্তী কালে বহুধা বিভক্ত) বা এই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনকেই বোঝানো হয় নি, বোঝানো হয়েছে কমিউনিজম বা মার্কসবাদী - লেনিনবাদী মতাদর্শ গ্রহণকারী সমগ্র আন্দোলনটিকেই, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী অন্যান্য দলগুলিরও কোনও-না-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বা আছে। কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই রকমই একটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইন্ডিয়া (আর সি পি আই)। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে আর সি পি আই-এর 'বামপন্থা'র আলোচনাটিকে বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থা'র বা 'বামপন্থী' প্রবণতার প্রথম প্রকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল ১৯৩০ সালে, আর তা বিদ্যমান ছিল পরবর্তী কয়েক বছর। ১৯২৮ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১ সেপ্টেম্বর অবধি মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ

কংগ্রেসে গৃহীত 'ঔপনিবেশিক তত্ত্ব' - এর এক 'বামপন্থী' ঝোঁক ছিল সুস্পষ্ট। ভারতের অত্যুৎসাহী কমিউনিস্টরা এই 'ঔপনিবেশিক তত্ত্ব'-এর এক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করে এই 'তত্ত্ব'-এর 'বামপন্থী' ঝোঁককে আরও বেশি 'বাম' দিকে নিয়ে গেলেন। সেটা ছিল ১৯৩০ সালের ঘটনা। সেই সময়কার ভারতের কমিউনিস্টদের অবস্থান বিশেষভাবেই 'বাম-সংকীর্ণতা' দোষে দুষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত সঠিক ভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর তীব্র আঘাত হেনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল যে , ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে সশস্ত্র উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই কমিউনিস্টদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু একই সঙ্গে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সংস্কারবাদী গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের 'বামপন্থী' অংশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। কংগ্রেসের 'বামপন্থী' অংশকে সর্বাপেক্ষা কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে তৎকালীন কমিউনিস্টরা তাঁদেরই 'The most harmful and dangerous obstacle to the victory of the Indian revolutions' ' হিসাবে চিহ্নিত করে বসলেন।

তৎকালীন সি পি আই-এর এই ক্ষতিকর 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থান গ্রহণের ফলে ভারতের জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বিরূপ প্রতিফলন পড়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সি পি আই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সাধারনভাবে তার 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থানের কারণে কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে সমগ্র আন্দোলনটিকেই 'বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী' আন্দোলন বলে অভিহিত করে তার বিরোধিতা করার যে নেতিবাচক ও ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেছিল , তার ফলে ক্ষতি হয়েছিল জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের, ক্ষতি হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, আর লাভ হয়েছিল কংগ্রেসের বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী নেতৃত্বের। কমিউনিস্ট পার্টি এই গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের সঠিক ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে গিয়েছিল কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের হাতে এবং তাঁরাও তাঁদের প্রয়োজনমতো এই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যদিও সি পি আই-এর এই 'বামপন্থী' যুগ চলেছিল ১৯৩৫ সালের শেষ পর্যন্ত, কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থা'র বা 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থানের তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল ১৯৩৪-৩৫ সালে। অবশ্যই এই গোটা 'বামপন্থী' পর্বে সি পি আই-এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কোনও খাদ ছিল না। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিস্ট পার্টির এই নিখাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারই পুরস্কার দিয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ও বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করে।

যেহেতু তিরিশের দশকের এই প্রথমার্ধে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ছিল সীমিত, ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই সময়কার 'বামপন্থা'র বা 'বামপন্থী' প্রবণতার প্রকাশও

ছিল সীমাবদ্ধ। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থা' বা 'বামপন্থী' প্রবণতার অনেক বেশি প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বে। এই সময়ে 'বামপন্থা'র প্রকাশ একদিকে যেমন দেখা গিয়েছিল সি পি আই-এর মধ্য দিয়ে , অপরদিকে তেমনই তা আরও উগ্র রূপে প্রকাশিত হয়েছিল পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-এর কার্যকলাপে।

মর্মান্তিক দেশবিভাগকে সঙ্গী করে, ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপ ধরে এল জাতীয় স্বাধীনতা — ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুন্ঠ সমর্থন' জানিয়ে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রারম্ভ হল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও লাইন দুটোই পাল্টাল এই কংগ্রেসে।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হলেন এক দশকেরও অধিক সময় এই পদে অবস্থানকারী , সেই সময় 'সংস্কারপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত ও সমালোচিত পি সি যোশী। তাঁর জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন 'সংগ্রামী' বি টি রণদিভে। রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত হল নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক লাইনও পরিবর্তিত হল দ্বিতীয় কংগ্রেসেই। 'জাতীয় অগ্রগতির সরকার নেহরু সরকারকে অকুন্ঠ সমর্থন' জ্ঞাপনের 'সংস্কারবাদী' অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। পরিবর্তে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত **Political Thesis** ৮-এ 'জাতীয় আত্মসমর্পণের সরকার, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সঙ্গে আপসকামীদের সরকার নেহরু সরকার' -এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের আহ্বান জানানো হল।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের এই 'সংগ্রামী' ও 'চরমপন্থী' রাজনৈতিক লাইন এই দলকে নিয়ে গেল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে 'বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান' (**'Revolutionary armed insurrection'**) -এর ডাক দেওয়ার পথে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সবকটি রিপোর্ট ও প্রস্তাবেই প্রত্যক্ষ সংঘাতের এই মেজাজটি অক্ষুন্ন রাখা হল। পার্টি কংগ্রেসের শেষে কলকাতা ময়দানের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করা হল - 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'।

দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় ২৬ মার্চ ১৯৪৮ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করল। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র গ্রেপ্তার হলেন ও হতে থাকলেন বহু কমিউনিস্ট

নেতা ও কর্মী।

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হল দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের লাইন , সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চলল অকুতোভয় জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম —— তেভাগা - তেলেঙ্গানা - কাকদ্বীপ - বড়া কমলাপুর - ডুবিরভেড়ি - অগ্নদ্বীপ, পাশে এসে দাঁড়াল চন্দনপিঁড়ি - ভাঙড় - নন্দীগ্রাম - বিষ্ণুপুর - হাঁটাল - মাসিলা। কৃষক সংগ্রাম পেল এক নতুন মাত্রা , খুলে গেল কৃষক আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত, কমিউনিস্ট আন্দোলনে সৃষ্টি হল এক সংগ্রামী মেজাজ। অপরদিকে সরকারের তরফ থেকে নেমে এল চরম দমন - নিপীড়ন।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে পরবর্তী দুই বছরের ইতিহাস একদিকে নেহ্রু - বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট দলন - দমনের ইতিহাস, আর অপর দিকে পার্টি নেতৃত্বের চরম 'আমলাতান্ত্রিকতা'র ও পার্টি লাইনের 'বাম-সংকীর্ণতা'র ইতিহাস। যোশী নেতৃত্বের চরম সংস্কারবাদ উল্টো ধাক্কায় পরিণত হল রণদিভে নেতৃত্বের গোঁড়া 'সংকীর্ণতাবাদ' -এ। কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ও নেহরু স্তুতির উল্টো রথের যাত্রায় এল প্রস্তুতিবিহীন দেশজোড়া বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের আহ্বান। এই লড়াই -এ জেলখানাও অন্যতম ফ্রন্ট, যেখানে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র ও অবরুদ্ধ অবস্থায় অসম লড়াই -এ গুলি খেয়ে মরা অনিবার্য ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টির সেই 'বামপন্থী' যুগে অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বে নির্বিচারে যাঁর-তাঁর সম্পর্কে 'সংস্কারপন্থী' আখ্যা প্রয়োগ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। 'বাম-হঠকারিতা'র এ ছিল একেবারে আদর্শ নিদর্শন। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের এই দুই বছর (১৯৪৮ - ১৯৫০) একদিকে যেমন অকুতোভয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগ, অপরদিকে তেমনই 'বামপন্থা'র যুগ - 'বাম-সংকীর্ণতা' ও 'বাম-হঠকারিতা'র যুগ।

সদ্য স্বাধীন ভারতে বেশ কিছুটা আকস্মিক ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিয়েছিল দেশজোড়া ' বৈপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ' -এর, গ্রহণ করেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন। কিন্তু তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিরও নিজস্ব প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছিল না , আর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের জনসাধারণও আশু বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ ভারতের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি তখন এই লাইন বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল ছিল না। ফলে অনিবার্য পরিণতি হিসাবে উত্তাল চল্লিশের বিপ্লব প্রয়াস অসমাপ্তই থেকে গেল , বিপ্লব আর সমাপ্ত হল না।

এই বিপ্লব প্রয়াসের ব্যর্থতা ভারতে কমিউনিস্টদের আবার নিয়ে গেল ভিন্ন পথে, যা

ছিল আগু পূর্ববর্তী পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি আবার সাংবিধানিক পথে ফিরে এল। আবার শুরু হল 'সাংবিধানিক কমিউনিজম' -এর।[৯]

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বে এই 'বামপন্থা' অর্থাৎ 'বাম - হঠকারিতা' আরও উগ্র ভাবে প্রকাশলাভ করেছিল পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-এর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। সশস্ত্র বিপ্লবের লাইন গ্রহণ এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক দেওয়ার মারফত ভারতের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সরাসরি ও মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে গিয়েছিল পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই। ১৯৪৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দমদম - বসিরহাট অভ্যুত্থান নামে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান অধিকারকারী আর সি পি আই -এর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। যদিও আর সি পি আই-এর পরিকল্পনা ছিল এই দমদম - বসিরহাট অভ্যুত্থানই সারা ভারতে বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সূত্রপাত করবে, বাস্তবে সরকারী দমন - নিপীড়ন-নির্যাতন-সন্ত্রাসের সামনে ব্যর্থ-ছত্রভঙ্গ হয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল দমদম - বসিরহাট অভ্যুত্থান, ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আর সি পি আই- এর সংগঠন। এই ধরনের প্রস্তুতিবিহীন, জনসমর্থনবিহীন হঠকারী অভ্যুত্থানের এটাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। গণ সমর্থন বিচ্ছিন্ন ভাবে সম্পূর্ণ 'বামপন্থী' হঠকারী উপায়ে দমদমের জেসপ কারখানায় চার হাজার শ্রমিক এবং বসিরহাট মহকুমার কৃষকদের উপর ভিত্তি করে সারা ভারতে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করতে গেলে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। পৃথিবীতে আর কোথাও এত সীমিত শক্তি ও জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে এত বড় একটি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-এর এই সময়কার কার্যকলাপের চেয়ে 'বামপন্থী' হঠকারিতার আর প্রকৃষ্ট ও আদর্শ উদাহরণ হয় না।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থা'র বা 'বামপন্থী' প্রবণতার সর্বশেষ নিদর্শন হিসারে আমরা ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সময়সীমা ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ কালপর্বটিকেও আবার দুটি ভাগে ভাগ করা দরকার। প্রথম পর্বটির বিস্তৃতি ছিল ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত, যখন এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থেই এক গণ আন্দোলন। কিন্তু ১৯৬৯ সাল থেকেই পথভ্রষ্ট হল এই গণ আন্দোলন, সূত্রপাত হল 'বামপন্থী' হঠকারিতার ও 'অতি-বাম' বিচ্যুতির, আর তা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল ১৯৭০-৭১ সালে। ১৯৬৯-৭১ কালপর্ব ব্যাপী এই নকশালপন্থী আন্দোলন ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থা'র আর এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

54

১৯৬৭ সালের মে মাসে মাওপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার উত্তর ভাগের এক অঞ্চল নকশালবাড়িতে সংঘটিত হয়েছিল এক সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে সুপরিচিত এই সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও সংঘটিত হয়েছিল সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন — কৃষক অভ্যুত্থান। আর এই সঙ্গেই নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র জঙ্গী বিপ্লবী আন্দোলন , যা সাধারণভাবে পরিচিত হয়ে আছে নকশাল আন্দোলন নামে। এই নকশাল আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল গঠিত ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি , যার নাম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী - লেনিনবাদী) অথবা সি পি আই (এম - এল)।

সি পি আই (এম - এল) ডাক দিয়েছিল 'সশস্ত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল' - এর, 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল'-ই ছিল শেষ কথা , কৃষি বিপ্লব ছিল তার সূত্রপাত, তার সোপান। 'কৃষি বিপ্লব'-এর পথ অনুসরণ করেই 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখল' করতে হবে, 'গ্রামকে দিয়ে শহর ঘিরতে' হবে, আর তাই ডাক ছিল 'গ্রামে চলো'র।

ভারতের রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমন করেছিল নকশালপন্থী আন্দোলন। 'শ্বেত সন্ত্রাস' এর চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছিল ভারতের রাষ্ট্রশক্তি। সারা ভারত প্রত্যক্ষ করেছিল রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদের নির্মম রূপ।

অপরদিকে বিপ্লবী নকশালপন্থী আন্দোলনও আটকে পড়েছিল সন্ত্রাসবাদের কানাগলিতে। 'গেরিলা যুদ্ধ' -এর স্থান নিয়েছিল 'খতম' অভিযান , শ্রেণী সংগ্রামের নামে শুরু হয়েছিল নিছক ব্যক্তি হত্যা , বিপ্লবী সংগ্রাম রূপ নিয়েছিল নিছক সন্ত্রাসবাদের। শুরু হয়েছিল ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ, উপদলীয় সংঘর্ষ।

ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সন্মুখীন হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল নকশালপন্থী আন্দোলন। হঠকারী অতিবামপন্থী অবস্থান গ্রহণ, সন্ত্রাসবাদী বিপথগমন , নৈরাজ্যবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ, এবং সি পি আই (এম - এল) -এর মধ্যে উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠাকামী কর্তৃত্ববাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাও চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বিপ্লবী নকশালপন্থী আন্দোলনকে। একদিকে রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদী 'শ্বেত সন্ত্রাস', এবং অপরদিকে পূর্বোল্লিখিত নানাবিধ বিচ্যুতি — এই উভয়বিধ কারণে পর্যুদস্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল নকশালপন্থী আন্দোলন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থী' প্রবণতা ও বিচ্যুতির অর্থাৎ কমিউনিজমে 'বামপন্থা'র এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই নকশালপন্থী আন্দোলন।

কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলন ও নকশালপন্থী আন্দোলনের বৈপ্লবিক শিক্ষা আজও

সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। সশস্ত্র বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই একমাত্র পথ, নিপীড়িত জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় — এই ছিল নকশালবাড়ির শিক্ষা। সি পি আই (এম-এল) নকশালবাড়ির শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের পথ ছেড়ে ধরেছিল 'ব্যক্তি হত্যা'র পথ, তাই সেই পথ দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ হয়েছিল সন্ত্রাসবাদের কানাগলিতে। নকশালবাড়ি আন্দোলন সশস্ত্র গণ সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পথনির্দেশ উপস্থিত করেছিল জনগণের কাছে , লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল গ্রামে-গ্রামান্তরে। সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকেই নকশালবাড়ি আন্দোলন ছুঁড়ে দিয়েছিল এক সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ। সমস্ত ব্যর্থতা - ত্রুটি - বিচ্যুতি - সীমাবদ্ধতা - সন্ত্রাসবাদী বিপথগমন সত্ত্বেও এখানেই নিহিত আছে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সার্থকতা , সাফল্য ও অবদান।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্ব ব্যাপী সি পি আই -এর ভূমিকা , এই কালপর্বেই পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই-এর কার্যকলাপ, এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সময়সীমা ব্যাপী , ও বিশেষতঃ নির্দিষ্ট ভাবে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সময়সীমা ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলন — ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থা' বা 'বামপন্থী' প্রবণতার নিদর্শন হিসাবে বর্তমান নিবন্ধে যেগুলির আলোচনা করা হল , সেগুলিকে একেবারে একই ছাঁচে ফেলে চরিত্রগত ভাবে সমান হিসাবে চিহ্নিত করে একাসনভুক্ত করার মত কোনও অতিসরলীকরণ এখানে করা হচ্ছে না। একথা সুবিদিত যে , চারিত্রিক ভাবে একে অপরের থেকে যথেষ্টই পৃথক ছিল। এদের গণভিত্তির মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য ছিল , 'বামপন্থা'র মাত্রার মধ্যেও ছিল বিপুল ফারাক। নিঃসন্দেহে এই তিনটি নিদর্শনের মধ্যে গণভিত্তি সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্ব ব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির , তার পরেই স্থান হল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ কালপর্বের সি পি আই (এম এল)-এর। গণভিত্তির বিচারে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ কালপর্বের আর সি পি আই ছিল সবচেয়ে পেছিয়ে , আর তাই তার 'বামপন্থা'র মাত্রাটিও ছিল সবচেয়ে তীব্র। ১৯৪৮-৫০- এর সময়ে সি পি আই-এর সঙ্গে তাও ছিল তেভাগা - তেলেঙ্গানা - কাকদ্বীপ - বড়া কমলাপুর -ডুবিরভেড়ি - অগ্রদ্বীপ - চন্দনপিঁড়ি - ভাঙড় - নন্দীগ্রাম - বিষ্ণুপুর - হাঁটাল - মাসিলা ; ১৯৬৭ -৭১ ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাও ছিল নকশালবাড়ি - শ্রীকাকুলাম - ডেবরা - গোপীবল্লভপুর - মুসাহারি - লখিমপুর। কিন্তু আর সি পি আই-এর হাতে আলোচ্য সময়ে ছিল শুধু জেসপ্ কারখানার চার হাজার শ্রমিক আর বসিরহাট সাব-ডিভিশনের কৃষক। ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর সি পি আই বা ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ ব্যাপী নকশালপন্থী আন্দোলনের থেকে আরও অনেক বেশি গণসমর্থনবিহীন ও হঠকারী ছিল আর সি পি আই-এর নেতৃত্বাধীন দমদম - বসিরহাট অভ্যুত্থান , আর চরম ব্যর্থতাই ছিল এই 'অতি-বামপন্থা'র অনিবার্য পরিণতি। অবশ্যই এই মন্তব্যের দ্বারা তাঁদের

বিপ্লবী আত্মত্যাগী মানসিকতার কোনও অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে না।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থী' প্রবণতার এই তিনটি নিদর্শনের মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'সংস্কারবাদ' -এর এক বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এই 'বামপন্থী' প্রবণতার উদ্ভব। যোশী নেতৃত্বের 'সংস্কারবাদ'-এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াতেই এসেছিল রণদিভে যুগের 'বামপন্থা' । সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অনুগামীদের 'সংস্কারপন্থী' মনোভাব এবং বিপ্লব থেকে বিচ্যুতির বিপরীত প্রতিক্রিয়াতেই পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই -এর 'অতি-বামপন্থা'। আর সরকারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রচলিত ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বর্জন করেই নকশালপন্থী আন্দোলনের আর্বিভাব। প্রবহমান গণ আন্দোলন থেকে বিচ্যুতি হিসাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 'অতি-বামপন্থা'র আবির্ভাব। আর প্রতি ক্ষেত্রেই এই 'বামপন্থা' ডেকে নিয়ে এসেছিল রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস , যা প্রবলতম আঘাত হেনেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর। 'দক্ষিণপন্থী' সংস্কারবাদ এবং 'বামপন্থী' হঠকারিতা ও সংকীর্ণতাবাদ — উভয়কেই বর্জন করে নিজের পথ ঠিক করে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে ভারত সহ প্রতিটি দেশেরই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে।

সূত্রনির্দেশ

১) V I Lenin, **"Left-Wing" Communism, an Infantile Disorder,** Progress Publishers, Moscow, 1977, pp. 1-125; V I Lenin, **"Left-Wing" Communism, an Infantile Disorder**, Foreign Languages Press, Peking, 1975, pp. i - iv + 1 - 132.

লেনিনের মূল গ্রন্থটির রাশিয়ান ভাষায় নাম হল **Detskaya Bolezn "Leviznii" ve Kommunizme** ('দেৎস্কাইয়া বলেজ্ন "লেভিজনি" ভে কম্যুনিজমে'), যার ইংরাজি অনুবাদ করা হয়েছে **"Left-Wing" Communism ,an Infantile Disorder.** ১৯২০ সালের এপ্রিল - মে মাসে লেখা লেনিনের এই বইটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালের জুন মাসে। ১৯২৩ সাল থেকেই এই বইয়ের ইংরাজি অনুবাদটি **"Left-Wing" Communism, an Infantile Disorder** নামেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রাশিয়ান - ইংরাজি অভিধানেও অনুবাদ হিসাবে পূর্বোক্ত ইংরাজি শিরোনামটিই উল্লিখিত হয়েছে : **Russko - Angliski Slovar (Russian-English Dictionary)**, Chief Editor: A I Smirnitski, **Sovietskaya**

Entsiklopedia, Moscow, 1969, p. 266. কিন্তু এই অভিধানেই "Leviznii" কথাটির অর্থ দেওয়া আছে "Leftism". সুতরাং লেনিনের লেখা মূল রাশিয়ান বইটির নামের আক্ষরিক ইংরাজি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় — **An Infantile Disorder of "Leftism" in Communism** .বাংলায় 'কমিউনিজমে "বামপন্থ"র শিশু ব্যাধি'।

বাংলা উচ্চারণ সহ লেনিনের লেখা বইটির নামের মূল রাশিয়ান পাঠটি আমায় করে দিয়েছেন প্রখ্যাত রুশ ভাষা বিশেষজ্ঞা অধ্যাপিকা পূরবী রায়। রাশিয়ান - ইংরাজি অভিধানটিও তাঁর কাছেই দেখা এবং এটির পাঠও তাঁর কাছেই নেওয়া। মূল রাশিয়ান নামের আক্ষরিক ইংরাজি অনুবাদটির ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি ১৯৯৯ সালের ৬ নভেম্বর নয়াদিল্লী থেকে অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা অধ্যাপিকা গার্গী চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত চিঠিটি থেকে। চিঠিটিকে সূত্র হিসাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অনুমতি অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পেয়েছি।

২) Lenin, op. cit., Moscow, 1977, pp. 32 - 41, 41 - 50, 51 - 62; Lenin, op. cit., Peking, 1975. pp. 36-48, 49 - 61, 62 - 76.

৩) Lenin, op. cit., Moscow, pp. 32, 41; ভিন্ন পাঠের জন্য দেখুন : Lenin, op. cit., Peking , pp. 36, 49.

৪) Lenin, op. cit., Moscow, p. 62; ভিন্ন পাঠের জন্য দেখুন : Lenin, op.cit., Peking , p. 76

৫) Lenin, op. cit., Moscow, p. 76; ভিন্ন পাঠের জন্য দেখুন : Lenin, op. cit., Peking , p. 95.

৬) Lenin, op. cit., Moscow, p. 88; ভিন্ন পাঠের জন্য দেখুন : Lenin, op. cit., Peking , p. 111.

৭) **Draft Platform of Action of the Communist Party of India,** in Horace Williamson, **India and Communism,** (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, Appendix - II, pp. 320-21.

৮) **Political Thesis of the Communist Party of India,** Adopted

at the Second Congress, February 28 - March 6, 1948, Calcutta, Published by the Communist Party of India, Bombay, July, 1948; pp. i-V + 1-118; 'Political Thesis of the Communist Party of India', Adopted at the Second Congress, February 28 to March 6, 1948, Calcutta, in M B Rao (ed.), **Documents of the History of the Communist Party of India,** Volume VII (1948-1950), People's Publishing House, New Delhi, January, 1976, pp. 1 -118.

৯) Gene D Overstreet and Marshall Windmiller, **Communism in India**, The Perennial Press, Bombay, 1960, p. 309. Overstreet and Windmiller এই পর্যায়কে আখ্যা দিয়েছেন — 'The Return to Constitutional Communism'.

স্বাধীনতার প্রাক্কালে টাটানগরের শ্রমিক আন্দোলন
(১৯৪৫ - ৪৭)

নির্বাণ বসু

১

ভারতের ইস্পাতনগরী বলে প্রসিদ্ধ বিহারের জামসেদপুর- টাটানগরে ভারতের প্রথম আধুনিক ইস্পাত কারখানা টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানীর (টিসকো) প্রতিষ্ঠা বিশ শতকের গোড়ায়। এরপর একে একে টাটানগর ফাউন্ড্রি, টিনপ্লেট কোম্পানী, কেব্‌ল কোম্পানী, ইন্ডিয়ান স্টীল ওয়্যার প্রডাক্টস্, ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন, টেলকো প্রভৃতি সহায়ক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে, টাটানগর এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এখানে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্তভাবে (১৯২০), প্রথম থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এখানকার শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের মূল ধারা সম্পৃক্ত ছিল। তার প্রতীক ছিল জামসেদপুর লেবার এসোসিয়েশন, পরবর্তীকালে যার নামকরণ হয় টাটা ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন (টি. ডব্লু ইউ)। জাতীয়তাবাদীদের বিভিন্ন ধারা একেক সময়ে ইউনিয়নের মধ্যে প্রধান হয়েছে।[১] ১৯৩৮ সাল থেকে গোঁড়া কংগ্রেসীরা এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে আসেন। সর্বোচ্চ নেতা হন আবদুল বারি। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু গান্ধীবাদী , আদর্শের ধারক বাহক ছিলেন না, ছিলেন একজন 'পপুলিক' সংগঠক। অবশ্য, প্রধান ইউনিয়নকে কখনও কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের, আবার কখনও মালিকদের পরোক্ষ সাহায্যপুষ্ট লেবার ফেডারেশনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নেতা মানেক হোমির মোকাবিলা করতে হয়েছে। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে গুজরাটের বস্ত্রশিল্প ছাড়া আর মুষ্টিমেয় যে কয়জায়গায় শ্রমিকেরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তার মধ্যে অগ্রগণ্য জামশেদপুর শ্রমিক। অবশ্য তা কতটা শ্রমিকদের উপর ইউনিয়নের প্রভাবের ফলে আর কতটা জাতীয়তাবাদী মালিকের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক নেতৃত্বের বোঝাপড়ার ফলশ্রুতি তা নিয়ে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বির্তক রয়েছে।[২]

আমরা স্বাধীনতার প্রাকাল পর্ব - অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ থেকে আগষ্ট, ১৯৪৭ এর মধ্যে আলোচ্য বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখছি। এই পর্বে সর্বত্র বিদেশী মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক

বিক্ষোভ তুংগে উঠেছিল। কিন্তু স্বদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে এই জংগী মানসিকতা কি রূপ ধারণ করেছিল, তা গভীর বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন একটা জাতীয়তাবাদী চরিত্র পেত এবং জাতীয়তাবাদী কর্মীরা সেখানে আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাকে তীব্রতর করতে প্রয়াস পেতেন। কিন্তু স্বদেশী শিল্পে তাঁরা আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে চাইতেন।

২

ভারত ছাড় আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে যাবার পর ১৯৪২ সালের শেষের দিক থেকেই টিস্কোয় মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী শ্রমিক নেতারা কারারুদ্ধ হবার পরে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ করতে কম্যুনিষ্ট, রায়বাদী রেডিকাল ডেমোক্রাট এবং মানেক হোমীর লেবার ফেডারেশন এগিয়ে আসে। যেহেতু এরা সকলেই যুদ্ধের সময়ে সরকার সমর্থক ছিল, তাই কোনো জংগী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে নি। কারান্তরালে থাকলেও টি. ডব্ল্যু ইউ র গণভিত্তি অটুট ছিল। কিন্তু তারাও নতুন করে কোনো জংগী আন্দোলন সৃষ্টির ঝুঁকি নেয় নি।

১৯৪৫ সালের গোড়া থেকেই টাটানগরের প্রায় সব কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বিশেষ করে সহায়ক কারখানাগুলিতে । যদিও তখনই কোনো ধর্মঘট হয় নি।[৩] টিস্কোতেও ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে কতকগুলি ডিপার্টমেন্ট গ্রুপ সিস্টেম পদ্ধতি চালু করার প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়।[৪] এপ্রিল মাসে বিভিন্ন বিভাগে মোট চারটি আংশিক ধর্মঘট হয় এবং সাতজন ধর্মঘটী নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এর ফলে সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ থাকে। এই সময়ে টিস্কোর প্রধান দুটি ইউনিয়ন বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাজ চালাচ্ছিল। টি. ডব্ল্যু. ইউ কোনো বৃহৎ আন্দোলনে যেতে সেই সময় প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে লেবার ফেডারেশন নেতা মানেক হোমী সর্বাত্মক ধর্মঘটের কথা বলতে থাকেন। এপ্রিলের শেষে কর্তৃপক্ষ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করলে শ্রমিক অশান্তি কিছুটা প্রশমিত হয় কিন্তু হোমি মে দিবসের ভাষণেও ধর্মঘটের হুমকি দেন। যদিও তা আদৌ কোন প্রভাব ফেলে নি।[৫]

এই সময়ে টিনপ্লেট কোম্পানীর শ্রমিকরা ১৯৪৩ সাল থেকে কিছুসংখ্যক শ্রমিককে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, বেতনহার সংস্কার, ও বর্ধিত মহার্ঘভাতার দাবীতে বিহার সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে বারবার ডেপুটেশন দেয়। কোনো ফল হয় না। মে মাসে এ. আই. টি. ইউ. সি. সভাপতি মৃণালকান্তি বসু জামশেদপুরের সব ইউনিয়নকে টিনপ্লেট শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৬] শেষ পর্যন্ত ২৪শে আগষ্ট - ২০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। মালিকপক্ষ হুঁশিয়ারী দেয় যে ২৭শে আগষ্টের মধ্যে সব বিভাগে নিয়মিত কাজ শুরু

না হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে টিনপ্লেট কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক বারি প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেফতারের পর ১৯৪৩ সাল থেকে কম্যুনিষ্টরা এই ইউনিয়নের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সাধারণ সম্পাদক হন স্থানীয় বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা কেদার দাস। অবশ্য বারিকে নামতঃ সভাপতি রেখে দেওয়া হয়।[৭] ১৯৪৪ সালে স্বাস্থ্যের কারনে বারি জেল থেকে মুক্তি পেলেও, ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে তিনি প্রথম জামসেদপুরে ফিরে আসেন। আসার পরই টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমাধানে তিনি উল্লেখযোগ্য মীমাংসকের ভূমিকা নেন। ২৮ শে আগষ্ট থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[৮]

পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সাফল্য বারির প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। টি. ডব্ল্যু. ইউর কারারুদ্ধ নেতারাও এই সময়ে মুক্তি পেয়ে বারির পাশে এসে জড় হতে শুরু করেন। বারির প্রথম কাজ ছিল টাটানগরের বিভিন্ন ইউনিয়ন গুলির পুনর্গঠন। টিসকোর ক্ষেত্রে হারানো জমি ফিরে পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু অধিকাংশ সহায়ক কারখানাগুলির শ্রমিক ইউনিয়নে যেখানে কম্যুনিষ্টরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সেখানে তাঁকে লড়াই করে জমি পুনরুদ্ধার করতে হয়। অবশ্য যুদ্ধ সমর্থক নীতির জন্য কম্যুনিষ্টরা জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন, কাজেই বারি ও তাঁর সহযোগীরা যুদ্ধোত্তর জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার দিনে কম্যুনিষ্টদের সহজেই হটিয়ে দিতে পারেন।[৯]

সেপ্টেম্বর মাস থেকে বারি নজর দেন টিস্‌কো কর্মীদের জন্য কিছুটা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করতে। আসন্ন আইনসভার নির্বাচনে জামসেদপুরের শ্রমিক আসন জয় করার জন্য তা ছিল বিশেষ দরকার। এই মাসে অনুষ্ঠিত টি. ডব্ল্যু. ইউর এক সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বারি পরিচালন কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে কোনো মুহূর্তে ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের তৈরী থাকতে হবে, তবেই কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হবে। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী অবশ্য বারি মুখে যতই গরম কথা বলুন, আসলে তিনি ভোটের আগে আপোষে কিছু সুবিধা আদায়ে উদগ্রীব ছিলেন। সম্ভবত তাঁর কাছে তথ্য ছিল যে টাটারা নিজেরাই শ্রমিকদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করতে চলেছে। বারি তার কৃতিত্ব নিজে নিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হোমি কোনোও কৃতিত্ব দাবী না করে বসেন। এই পর্বে মালিক পক্ষের মধ্যেও শ্রমিক নীতি নিয়ে কিছুটা দ্বিধা,সৃষ্টি হয়। স্থানীয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ বারির হুমকীর কাছে মাথা নত না করে হোমিকে পৃষ্ঠপোষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর বোম্বাইস্থ বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স বারির দাবী মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছিলেন। অক্টোবর মাসে বারি শ্রমিকদের সামনে ঘোষণা করেন যে বোম্বাই থেকে টাটা কোম্পানীর সর্বোচ্চ অধিকর্তা জে. আর. ডি. টাটা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তাহলে শ্রমিকদের তিন মাস ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।[১০]

বোম্বাইতে নভেম্বর মাসের গোড়ায় উভয়পক্ষের আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ বারির প্রায় সব দাবীই মেনে নেন। শ্রমিকরা যে সব প্রধান সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল তা হল : ১৫ দিনের বিশেষ বোনাস, এবং দৈনিক ২টা ১৫আনা পর্যন্ত যাদের বেতন, তাদের দৈনিক ১আনা বেতন বৃদ্ধি। সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী এই সুযোগ সুবিধাগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। বারি চেয়েছিলেন হোমী ও তাঁর লেবার ফেডারেশনকে অপদস্থ করতে। আর টাটারা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের আসন্ন ক্ষমতালাভের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। তাছাড়া সে সময়ে কোম্পানীর ব্যবসাও ভাল চলছিল, কাজেই শ্রমিকদের বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিতে অসুবিধা ছিল না। শ্রমিকরাও এই বর্ণিত সুযোগ সুবিধায় সন্তুষ্ট হয়েছিল। কাজেই, সব দিক থেকেই টি. ডব্লু. ইউর পক্ষে নির্বাচনের আগে এটি ছিল এক সুসংবাদ।[১১]

নির্বাচনের আগে টি. ডব্লু. ইউর সংকট বাইরে থেকে আসেনি, এসেছিল ভিতর থেকেই। একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অথচ সুসংবদ্ধ সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী বারির অনুমতিক্রমে টি. ডব্লু. ইউর ভিতর থেকে কাজ শুরু করে যুদ্ধের শেষ থেকে এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। নির্বাচনের আগে জামশেদপুর শ্রমিক আসনের জন্য তারা ফিরোজ খানের নাম প্রস্তাব করে জোর প্রচার চালাতে শুরু করে। কিন্তু স্বভাবতই মনোনয়ন পান টি. ডব্লু. ইউর দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব ও বারির দীর্ঘ দিনের সহযোগী মাইকেল জন। এই রকম একটা ধারণা হয়েছিল যে বারি নিজেও জনের মনোনয়ন চান নি। নভেম্বরের প্রথমার্ধে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির পরে দীর্ঘদিন তিনি জামসেদপুরে পদার্পন করেন নি এবং জনের নির্বাচন প্রচারেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন নি।[১২] আরো উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ প্রসিদ্ধ দক্ষিণপন্থী নেতা সর্দার প্যাটেল ১৩ই ডিসেম্বর টাটাদের দেওয়া বিমানে জামসেদপুরে আসেন এবং এক জনসভায় প্রকাশ্যে বারির উগ্রতার সমালোচনা করেন এবং আমেদাবাদের সূতাকলের প্রকৃত গান্ধীবাদী শ্রমিক সংগঠনের আদর্শে জামসেদপুরের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ হতে বলেন।[১৩]

যাই হোক, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে মাইকেল জন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। বিরুদ্ধ পক্ষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ভীতিপ্রদর্শনের যত অভিযোগই আনুক না কেন, এটা অসংশয়িত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে সেইসময়ে জামসেদপুরের শ্রমিকরা প্রস্তরের মত টি. ডব্লু. ইউ ও জাতীয় কংগ্রেসের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। নির্বাচনের পর ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মত বিহারেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সর্বত্র আসন্ন স্বাধীনতা বাণী ধ্বনিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, জামসেদপুর তার ব্যাতিক্রম ছিল না।

নির্বাচনের পর বারি আবার জামসেদপুরে ফিরে এসে ইউনিয়নের কাজে সক্রিয় উৎসাহ দেখাতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল টি. ডব্লু. ইউ সংগঠনে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং

সোশ্যালিষ্ট গোষ্ঠীকে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের জামসেদপুর ভ্রমনের সময় টি ডব্ল্যু ইউ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোশ্যালিষ্ট গোষ্ঠীর ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের অননুমোদিত উগ্র আচরণের পর বারি সোশ্যালিষ্ট সমর্থকদের ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করেন এবং ভবিষ্যতে তাদের ফিরে আসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৪]

এর পরে বারি নজর দেন শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নে। টিস্‌কোর চাইতে সহায়ক সংস্থাগুলিতেই শ্রমিকদের ক্ষোভ বেশী ছিল। প্রথম সংগ্রাম শুরু হয় গোলমুড়ির টিনপ্লেট কোম্পানীতে। তাদের বকেয়া দাবীগুলির মধ্যে ছিল মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, ভারতীয় ও অভারতীয় কর্মীদের প্রতি সমব্যবহার এবং ছুটি ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত নিয়মের পরিবর্তন। কর্তৃপক্ষ দাবী মানতে অস্বীকার করায় ৮,০০০ শ্রমিক ১০ই এপ্রিল থেকে ধর্মঘট শুরু করে। সরকার বিষয়টি অ্যাডজুডিকেশনে পাঠানোর পর ২৬শে এপ্রিল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[১৫] সেপ্টেম্বর মাসে এ্যাডজুডিকেটরের রায় মোটামুটি উভয়পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে।[১৬] এদিকে শ্রমিক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে মাসে মালিকরা টাটানগর ফাউন্ড্রিতে লক আউট ঘোষনা করে। সেপ্টেম্বর মাসে সরকার বিষয়টি অ্যাডজুডিকেশনে পাঠায় ও কারখানা খোলার নির্দেশ দেয়।[১৭]

ইতিমধ্যে টিসকোর ১৫,০০০ শ্রমিকের ভিতর অশান্তি চরমে ওঠে। ২৭শে আগষ্ট টি ডব্ল্যু ইউ কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্মঘটের জন্য পক্ষকাল পূর্বাহ্নে নোটিশ পাঠায়। দাবী দাওয়ার দীর্ঘ তালিকার মধ্যে প্রধান ছিল গ্রেড সিস্টেম, বর্ধিত লাভভিত্তিক বোনাস এবং আবাসনের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা। তাছাড়া গতবছরের মীমাংসা চুক্তির বেশ কয়েকটি ধারা কার্যকর না করার অভিযোগ আনা হয়।[১৮] লক্ষ্যণীয় যে এই সময় ব্রিটিশ ভারতের একমাত্র অপর ইস্পাত কারখানা বার্ণপুর কুলটিতেও ধর্মঘট চলছিল। কাজেই, টিস্‌কোতেও ধর্মঘট হলে সারা ভারতে ইস্পাত উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এই আশংকায় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।[১৯] কোম্পানী প্রথমে ধর্মঘটের কথায় তেমন গুরুত্ব না দিলেও পরে ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ উভয়েই বুঝতে পারে যে আপোষ মীমাংসা ছাড়া সংঘাত মেটাবার কোনো পথ নেই।[২০] শেষ পর্যন্ত বারি ও কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের মধ্যে চুক্তি হয় যাকে স্বাভাবিক ভাবেই বারি বিরাট সাফল্য বলে দাবী করতে পারেন।[২১] কোম্পানী সংশ্লিষ্ট বছরে চার মাসের বোনাস এবং ভবিষ্যতে লভ্যাংশের ২২১/২% বোনাস দিতে স্বীকৃত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল বেতন কাঠামোর গ্রেড সিস্টেমের প্রবর্তন - মূল বেতন, উপস্থিত ভিত্তিক বোনাস ও পারফর্মেন্স বোনাসের উপর - ভিত্তি করে এটি তৈরী হবে। ভারতীয় শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় এই ধরণের ধারণা ছিল সর্বপ্রথম।

এদিকে অন্যান্য ছোট কারখানাগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ চলতেই থাকে। কেবল কোম্পানীতে বাড়তি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। নভেম্বর মাসে কেবল কোম্পানী ইন্ডিয়ান স্টীল এন্ড আয়রন প্রোডাক্টস ওয়ার্কস এবং টেলকোতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। তবে সর্বক্ষেত্রেই বিবদমান বিষয়গুলি আর্বিট্রেশনে পাঠানোয় ধর্মঘট এড়ান সম্ভব হয়।[২২] স্বভাবতই টি ডব্লু ইউ এবং ব্যক্তিগতভাবে বারির শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এক দুর্ভাগ্যজনক পথ দুর্ঘটনায় বারির মৃত্যু ঘটে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মাইকেল জন টি ডব্লু ইউ এবং অন্যান্য ইউনিয়নগুলির সভাপতি হন। এদিকে উৎপাদনশীল বোনাস ও গ্রেড সিস্টেম নিয়ে টিসকোতে বিভ্রান্তি ও অশান্তি চরমে ওঠে। মেশিনশপ কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে সুপারভাইসরদের প্রহার করে। ইউনিয়নের নেতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাময়িক ভাবে তাদের নিরস্ত করেন। কিন্তু অচিরেই হিংসাত্মক বিক্ষোভ অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ে। ৮ই মে চারজন উচ্চপদস্থ অফিসার গুরুতর আহত হয়। গোপন সরকারী রিপোর্ট অবশ্য বলা হয় যে এইসব অফিসাররা ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত অজনপ্রিয় ছিলেন।[২৩] মাইকেল জন ও অন্যান্য ইউনিয়ন নেতারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও সরকার সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও পুলিশকে গুলী না চালাতে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে রাজী হয়। ফলে আরো বড় অশান্তি এড়ান সম্ভব হয়।[২৪] বিহার সরকারের পক্ষে মন্ত্রী বিনোদানন্দ ঝা এবং টি ডব্লু ইউর পক্ষে মাইকেল জন ১২ই মে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। পরে ঝা প্রকাশ্য শ্রমিক সমাবেশে আলোচনার বিষয়বস্তু জানিয়ে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজে ফিরে যেতে আহ্বান জানান।[২৫] ১৫ই মে টিসকোর চেয়ারম্যান জে আর ডি টাটার তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বেতন কাঠামো পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আবেদন জানানো হয় যে তার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য শ্রমিকরা এগিয়ে আসুক। বর্ধিত উৎপাদনের উপর ৪০ - ৫০ % পর্যন্ত উৎপাদন বোনাস দেবার তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে বেতন কাঠামো সংস্কার বিচারের জন্য কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।[২৬] দুমাস বাদে এই কমিটি (কে, এম মদন কমিটি নামে পরিচিত) তার রিপোর্ট পেশ করে। বেতন কাঠামো বিন্যাসের পদ্ধতিগত খুঁটি-নাটি নিয়ে বিতর্ক অবশ্য চলতেই থাকে। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে টি ডব্লু ইউ এই রিপোর্ট মেনে নেয়। ভবিষ্যতে বেতন কাঠামো সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগের বিচার করার জন্য একটি স্থায়ী জয়েন্ট রেটস কমিটি গঠিত হয়।[২৭]

টিসকোতে এইভাবে উত্তেজনার অবসান ঘটলেও ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে সহযোগী কারখানাগুলি থেকে রিপোর্ট আসে যে সুপারভাইসরী কর্মীদের উপর নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে।

মনে করা হয় যে কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীর সমর্থকরা গোপনে মদৎ দিচ্ছেন।[১৮] জুন মাসের গোড়ার দিকে টেলকোতে ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটীরা টিস্‌কোর কর্মীদের অনুরূপ বেতনহার ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দাবী করতে থাকে। কিন্তু মালিকপক্ষ নতুন প্রতিষ্ঠিত কারখানার পক্ষে ঐ ব্যয়ভার সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় এবং শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিলে তবেই আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রথমে শ্রমিকরা অনমনীয় থাকলেও জুলাই মাসের গোড়ায় নিঃশর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[১৯]

স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে টি. ডব্ল্যু. ইউর দুদিক থেকে সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে সারাভারতে কংগ্রেস সমর্থক ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিলিত হয়ে আই. এন. টি. ইউ. সি. গঠন করে। স্বভাবতই গান্ধীবাদী কংগ্রেস সমর্থকদের নেতৃত্বাধীন টি. ডব্ল্যু. ইউ. এর অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়। এর আগে টি. ডব্ল্যু. ইউ বরাবর এ. আই. টি. ইউ . সি. র অন্তর্ভুক্ত ছিল যা আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের গান্ধীবাদী মজুর মহাজন কখনও ছিল না। এখন আই. এন. টি ইউ. সি. তে যোগ দেবার প্রশ্নে টি. ডব্ল্যু. ইউ র অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী সমর্থকরা বিরোধিতা করে।[৩০] তবে এদের কারোরই সেই সময় বিশেষ শক্তি না থাকায় টি. ডব্ল্যু. ইউ নেতৃত্বে তখন বিপদে পড়ে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে সংকটের সম্ভাবনা তৈরী হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরো জটিল। ১৯৩৮ সাল থেকে আবদুল বারির নেতৃত্বে টি. ডব্ল্যু ইউ - গোষ্ঠী স্থানীয় জেলা কংগ্রেসের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বারির মৃত্যুর পর জেলা কংগ্রেসে কংগ্রেস গোষ্ঠী এবং লেবার গোষ্ঠী নামে দুই ভাগ সৃষ্টি হয়। টিস্‌কো শ্রমিকদের মধ্যে না পারলেও সহায়ক কারখানাগুলিতে কংগ্রেস গোষ্ঠী পাল্টা ইউনিয়ন গঠনে সচেষ্ট হয়। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করলেও তা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। দুটি গোষ্ঠী প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেসী উপদলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পরে।[৩১]

অবশ্য " অকংগ্রেসী শ্রমিক " এবং "অশ্রমিক কংগ্রেসী" উভয় পক্ষের সাঁড়াশি আক্রমণ সত্ত্বেও টি. ডব্ল্যু. ইউ স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন টাটানগরে শ্রমিকদের মধ্যে অগ্রণী সংগঠন বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

৩

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তেও টাটানগরে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের চরিত্র ভারতের অন্যান্য প্রায় সমস্ত জায়গার চেয়ে পৃথক ছিল। ১৯২০ সাল থেকেই জাতীয়তাবাদীরা এখানে শ্রমিকদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী বা হোমির মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাকে কখনোই বিশেষ প্রতিহত করতে পারে নি সাময়িক কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে। প্রাক-স্বাধীন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে দেশীয়

পুঁজি বনাম বিদেশী পুঁজি এবং শ্রমিক বনাম মালিক এই দুটি মূল দ্বন্দ্ব জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু টাটানগরে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল জাতীয়তাবাদীদের হাতে এবং মালিকানা ছিল জাতীয় পুঁজির হাতে, সেই জন্য শ্রমিক - মালিক দ্বন্দ্ব কখনও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর শ্রমিক - আন্দোলন সারা ভারতে যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, টাটানগরে কিন্তু তখনও তা হয় নি। অর্থনীতিবাদ (ইকনমিজম্) এবং আপোষ মীমাংসার মধ্যেই তা সীমায়ত থেকেছে। কাজেই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে টাটানগরের শ্রমিক আন্দোলন "কোলাবরেশনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম্" এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু তাই বলে টাটা ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন তার স্বাধীন চরিত্র হারিয়ে টিস্কোর কেবলমাত্র একটি "শ্রমিক বিভাগে" পরিণত হয়েছিল এ কথা বলা চলে না।[৩২] গান্ধীবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত থাকা সত্বেও বারি ও জন পরিচালিত ইউনিয়ন যেভাবে একদিকে প্রয়োজনে ধর্মঘটের হুমকী দিয়ে অন্যদিকে নিপুণ দর কষাকষির মাধ্যমে হিংসাত্মক আন্দোলন পরিহার করে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আদায় করেছে তার তুলনা নেই। স্বাধীনতা উত্তর কালেও দীর্ঘদিন টাটা ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন 'শ্রমিক আন্দোলনের স্তম্ভ হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের হাতিয়ার বলে তাঁরা মনে করেন নি, একথা যেমন সত্য , তেমনি প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সর্বোচ্চ দাবী পূরণেও তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

সূত্র নির্দেশ

১) নির্বাণ বসু - 'দ্য ইনডিজেনাস ক্যাপিটাল, দ্য ন্যাশনালিষ্ট লীডারশিপ এন্ড দ্য কলোনিয়াল স্টেট : দ্য লেবার মুভমেন্ট অফ জামসেদপুর, ১৯৩৭-৩৯'(চিত্তব্রত পালিত ও অন্যান্য সম্পাদিত 'পলিটিকাল ইকনমি এন্ড প্রটেষ্ট ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ) কলিকাতা, ১৯৯৭

২) নির্বাণ বসু - 'ন্যাশনাল আপসার্জ এন্ড দ্য ওয়ার্কিং ক্লাশ মুভমেন্ট : এ স্টাডি অফ দ্য ১৯৪২ মুভমেন্ট' (ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রসিডিংস, কলিকাতা ১৯৯০)

৩) বিহার, ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট, (পরে এফ. আর), প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ, জানুয়ারী এবং প্রথমার্ধ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

৪) ঐ - দ্বিতীয়ার্ধ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

৫) ঐ - দ্বিতীয়ার্ধ, এপ্রিল, প্রথমার্ধ, মে, ১৯৪৫

৬) অমৃতবাজার পত্রিকা - ২২.৫.১৯৪৫

৭) এ. এই. টি. ইউ. সি - ফাইল নং ৫৫ (নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী, নয়া দিল্লী)

৮) বিহার, এফ. আর., দ্বিতীয়ার্ধ, আগষ্ট , ১৯৪৫

৯) রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লেখা বারির চিঠি - ৩০.৫.৪৬: রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংগ্রহ - ফাইল নং ৩-জে ৪৬ / অফ ১৯৪৬ (ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া)

১০) বিহার, এফ. আর. — প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ, সেপ্টেম্বর, প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ, অক্টোবর, ১৯৪৫

১১) ঐ — প্রথমার্ধ, ও দ্বিতীয়ার্ধ, নভেম্বর ১৯৪৫

১২) টাটা ওয়ার্কার্স, ইউনিয়ন প্রদত্ত নোট - তাং ১৪.৫.৪৬ - রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংগ্রহ - ফাইল নং ৩-জে / ৪৬ অফ ১৯৪৬

১৩) বিহার, এফ. আর. দ্বিতীয়ার্ধ, ডিসেম্বর , ১৯৪৫

১৪) মণি ঘোষ - আওয়ার স্ট্রাগল (দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৭৩) পৃ. ৬২

১৫) বিহার, এফ. আর. দ্বিতীয়ার্ধ, এপ্রিল , ১৯৪৫

১৬) ঐ, - . দ্বিতীয়ার্ধ, সেপ্টেম্বর , ১৯৪৬

১৭) ঐ - প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ, জুন এবং দ্বিতীয়ার্ধ, সেপ্টেম্বর , ১৯৪৬

১৮) ট্রেড ইউনিয়ন রেকর্ড - ভল্যুম ৬, নং ১, সেপ্টেম্বর , ১৯৪৬

১৯) অমৃতবাজার পত্রিকা - ২.৯.৪৬

২০) মণি ঘোষ - প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২১) বিহার, এফ. আর., দ্বিতীয়ার্ধ, সেপ্টেম্বর , ১৯৪৫

২২) বিহার, মান্থলি রিপোর্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপ্যুটস, নভেম্বর, ১৯৪৬

২৩) বিহার, এফ. আর., প্রথমার্ধ, মে, ১৯৪৭

২৪) মণি ঘোষ - প্রাগুক্ত পৃ. ৬০

২৫) **হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড** - ১২.৫.৪৭

২৬) **অমৃতবাজার পত্রিকা** - ১৫.৫.৪৭

২৭) মণি ঘোষ - প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২৮) বিহার, এফ. আর., দ্বিতীয়ার্ধ, মে , ১৯৪৭

২৯) ঐ - প্রথমার্ধ, জুন, প্রথমার্ধ, জুলাই, ১৯৪৭

৩০) ঐ - দ্বিতীয়ার্ধ, জুলাই , ১৯৪৭

৩১) মণি ঘোষ - প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৩২) কে মামকোট্রাম - পলিটিক্স অফ ট্রেড ইউনিয়নস : 'এ কেস স্টাডি ইন জামশেদপুর' (অপ্রকাশিত গবেষণা - সন্দর্ভ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৭৭)

কাট্‌রা মসজিদ অভিযান, ১৯৮৮ - গণহত্যা - কিছু প্রশ্ন

বিষাণ কুমার গুপ্ত

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন, শুক্রবার, মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ও রক্তাক্ত দিন হিসাবে চিহ্নিত। ঐ দিন মুসলীম লীগের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা. ঐতিহাসিক কাট্‌রা মসজিদে স্থায়ী ভাবে নামাজ পড়ার দাবীতে এক বিশাল অভিযান চালিয়ে ছিলেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি এক রোমহর্ষক গণহত্যা। বেশ কিছু মুসলমান ঐ গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ পরম্পরাকে ঐ ঘটনা ধ্বংস করেছে। ১৯৪৬ - এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যা ছিল অকল্পনীয়, ১৯৮৮-র ২৪শে জুন তা ঘটেছিল।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই বাংলার সুবাদার মুর্শিদ কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ শহরের (লালবাগ) পূর্ব প্রান্তে (বর্তমান বহরমপুর - লালগোলা সড়কের ধারে) ইন্দো-ইরানীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন ঐ কাট্‌রা মসজিদটি নির্মান করেন। এটি একটি বিশাল মসজিদ। তা একাধারে মসজিদ এবং অপর দিকে মাদ্রাসা-মক্তব হিসাবেও একদা গড়ে উঠেছিল। মসজিদের পিছন দিকের সিঁড়ির নীচে মুর্শিদ কুলী খাঁ চির নিদ্রায় শায়িত এবং দক্ষিণ সীমানার লাগোয়া একটি শিব মন্দির আজও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ট্রাডিশনকে বহন করে চলেছে। যদিও মন্দিরটির নির্মাণকাল অনেক পরে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এইরূপ নিদর্শন বহু আছে।

অভিযানটি সফল করার জন্য মুসলীম লীগ (পরিষদীয় রাজনীতিতে ১৯৪৭ পরবর্তী কালে যার প্রায় কোন অস্তিত্ব নাই) বেশ কয়েক মাস ধরে প্রকাশ্যেই সারা জেলা ব্যাপী প্রচার চালিয়ে ছিলেন। অসংখ্য প্রচার পত্র ও পোষ্টার ছড়িয়েছিলেন জেলার গ্রামে গঞ্জে। অথচ বিস্ময়কর ভাবে জেলা প্রশাসন এবং বামপন্থী ও ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলি নীরব ছিলেন। কোন প্রতিবাদ ছিলনা এইরূপ এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে। হিন্দু মৌলবাদী শক্তিও এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাননি।[১] মুসলীম লীগ আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ কাট্‌রা

অভিযানের অনুমতি চাইলে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রকাশন সরাসরি তা নাকচ করে দেন। দীর্ঘ ৭৮ বছর পর কাট্‌রা মসজিদে নতুন করে নামাজ পড়ার অধিকারের দাবীকে খারিজ করে দেন।[২] তা সত্ত্বেও মুসলীম লীগ ঐদিন বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত (মূলতঃ ভাগীরথী নদীর পূর্ব প্রান্তের এলাকাগুলি থেকে) প্রায় ১৫,০০০ (মতান্তরে ২০ হাজার) মুসলমানের এক বিশাল জমায়েত করেন। জুম্মার নামাজ পড়ে জেলা প্রশাসনকে ডেপুটেশন দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে ফিরে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি জেলা প্রশাসনকে দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঐ প্রতিশ্রুতি রাখেন নি [৩], এবং নাটকীয় ভাবে বহরমপুর থেকে কাট্‌রা মসজিদের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করলে কাশিমবাজার এলাকায় দাঙ্গা লেগে যায়। শুরু হয় প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং এরই পরিণতিতে কাশিমবাজার সংলগ্ন এক অখ্যাত কালী মন্দিরের কাছে বেশ কিছু মুসলমান হতাহত হন।[৪] নিহত মুসলমানের সংখ্যা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী তথ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি লাশ সনাক্ত করতে কেউ এগিয়ে না আসায় অনুমান করা হয় যে তারা বাংলাদেশী নাগরিক।[৫] আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ঐ জমায়েত বা অভিযানে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম প্রান্ত বা "রাঢ়" এলাকা থেকে খুবই সামান্য সংখ্যক মুসলমান হাজির হয়েছিলেন।[৬]

ঐদিনই বিকাল ৫-৪০ নাগাদ শিয়ালদহ - লালগোলা শাখার নশীপুর রেল স্টেশনে অপর একটি নারকীয় ঘটনা ঘটে যখন ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বিপুল সংখক কাট্‌রা মসজিদ অভিযানে যোগদানকারী মুসলমান লালগোলা - ভগবানগোলার দিকে ফিরছিলেন। কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ঐ দিনে দীর্ঘক্ষন ঐ ট্রেনটিকে নশীপুর স্টেশনে আটককরে মুসলমানদের উপর নৃশংস আক্রমন চালালে বহু মুসলমান হতাহত হন।[৭] তদন্তে প্রকাশ আক্রমনকারীরা স্থানীয় চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা পদ্মার ভাঙ্গনে ভগবানগোলা থানার চর এলাকা থেকে উৎখাত হয়ে বেশকিছুদিন ধরে নশীপুর এলাকায় বসবাস করছেন। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এই চাঁই (কৃষক) সম্প্রদায় ধর্মগত দিক থেকে হিন্দু হলেও এদের মধ্যে বহু আদিবাসী সংস্কৃতি বিদ্যমান।[৮] কাশিমবাজার ও নশীপুরের ঘটনায় মোট কত মুসলমান নিহত হয়েছিলেন এনিয়ে নানা তথ্য ছড়িয়ে পড়লেও সরকারী ভাবে দুটি ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২১ বলে জানা যায়। আহতদের অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হলেও অনেকেই ভর্তি হননি।

এখন প্রশ্ন হল, বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনাধীনে পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি জেলায় যেখানে বামপন্থী সহ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সর্বক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য, যেখানে নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের সেই প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুখরিত দিনগুলিতেও কোন দাঙ্গা হয়নি, সর্বোপরি যেখানে আমুল ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেখানে মুসলীম লীগের মত একটি

মৌলবাদী ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দল পরিষদীয় রাজনীতিতে যারা প্রায় অস্তিত্বহীন,[১০] কিভাবে তাদের পক্ষে এধরনের একটি অযৌক্তিক ও কট্টর সাম্প্রদায়িক দাবীকে সামনে রেখে কাট্‌রা অভিযান তথা বিশাল মুসলীম জমায়েত সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছিলো ?

দ্বিতীয়তঃ বামফ্রন্ট তথা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি আগে থেকেই ঘটনা ও তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেননা কেন ? তারা যদি সজাগ থাকতেন অথবা রাজনৈতিকভাবে মুসলীমলীগের ঐ অন্যায় সাম্প্রদায়িক দাবীকে মোকাবিলা করতেন, তাহলে মুসলীম লীগের পক্ষে নিশ্চিন্ত ভাবেই ঐ জমায়েত বা কাট্‌রা অভিযান চালানো সম্ভব হত না।[১১]

তৃতীয়তঃ জেলা প্রশাসনই বা কেন ঐ জমায়েতের অনুমতি দিলেন ? বহু পূর্বেই তারা মুসলীম লীগের ঐ প্রয়াস বানচাল করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। করলে ঐ দুর্ভাগ্যজনক ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী এড়ানো যেত। সমস্ত প্রশ্নগুলিই আমাদের বিশেষ ভাবেই ভাবায়।[১২]

চতুর্থতঃ আরও একটি ঘটনা আমাদের কৌতূহলের সৃষ্টি করে। ঘটনার ৪ দিন পর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন, দীর্ঘ ১২ বছর পর হঠাৎ করেই তা বন্ধ করা হল কেন ?[১৩]

প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে ——

১) জেলা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে মুসলীম লীগ নেতৃত্ব কাট্‌রা অভিযান করবেন না এবং বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে জুম্মার নামাজ পড়ে নিজের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসনকে দিয়ে চলে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে।

২) জেলা প্রশাসন বা তার গোয়েন্দা দপ্তর অথবা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি আদৌ কাট্‌রা অভিযানের গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। ঐ অন্যায় ও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক অভিযান বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনকে ব্যবহার করেন নি।[১৪]

৩) জেলার মুসলীম সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ মুসলীম লীগের এই কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায় বলে মনে করেন।[১৫] ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল মুসলীম সম্প্রদায় নীতিগত ভাবে ঐ কাট্‌রা অভিযানকে সমর্থন না করলেও প্রকাশ্যে তারা তার বিরোধিতা করেন নি। অথচ একদা প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মুসলীম লীগের Two Nation Theory বা Separate Electorate এর প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মৌলভী আব্দুল সামাদ ও রেজাউল করীম।[১৬]

৪) সংসদীয় গণতন্ত্রের সুবিধাবাদী রাজনীতিতে আকন্ঠ নিমজ্জিত বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে মুসলমানদের ভোট (মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলমান) হারানোর ভয়ে কেউই মুসলীম লীগের কাট্‌রা অভিযান বা তার প্রস্তুতি পর্বকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করেননি, যেমনটি তারা করে থাকেন বাবরী মসজিদ বা ঐ ধরনের অন্যান্য ইস্যুতে। এ এক বিচিত্র পরস্পর বিরোধিতা। অথচ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অজস্র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল, পদযাত্রা, কনডেনশন, জনসভা প্রচারপত্র ইত্যাদির জোয়ার বয়ে যায়।[১৭]

৫) ১৯৫২ সাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিষদীয় রাজনীতিতে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া যে দলটির অবস্থান প্রায় শূন্যের কোঠায়।[১৮] সেই মুসলীম লীগের পক্ষে কিভাবে ঐদিন (২৪শে জুন, ১৯৮৮) বিশাল সংখক মুসলীম জনগণকে তাদের রাজনৈতিক পতাকাতলে সামিল করা সম্ভব হয়েছিল? সম্ভবত তাদের চিন্তাভাবনার সমর্থক বহুব্যক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অবস্থান করেন সুকৌশলে। একথা বলা যেতে পারে যে ১৯৪৭এর ১৮ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তি এ জেলার বহু মুসলমানই মেনে নিতে পারেনি। মুর্শিদাবাদ জেলার নবাব পরিবারভুক্ত সৈয়দ কাসেম আলী মীর্জা, যিনি প্রাক্ - স্বাধীনতা যুগে এই জেলার মুসলীম লীগের বিশিষ্ট নেতা ও বিধায়ক ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদকে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং উগ্র হিন্দু বিরোধী গোপন আন্দোলন বা কার্যকলাপ তার প্রকৃষ্ট উদাহরন।[১৯] যদিও তিনি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধায়ক নির্বাচিত হন, ১৯৫৭ সালে বিধান রায় মন্ত্রী সভায় স্থান পান এবং ১৯৭৭ খ্রীঃ বামপন্থী সমর্থনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন।[২০]

৬) স্বভাবতই একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, তাহলে আমূল ভূমি সংস্কারের দাবীতে নানা কৃষক আন্দোলন, অপারেশন বর্গা অথবা অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষকে আলোকিত বা রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেছিল বলে দাবী করা হয়, তা কি অতি কথন? নতুবা ঐ সব আন্দোলনের সাথী বহু মুসলীম জনগণ কিভাবে মুসলীম লীগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন কাট্‌রা অভিযানে সামিল হয়েছিলেন.? তাদের কয়েকজন নিহতও হন।[২১] হতে পারে, তাদের ভুল বুঝিয়ে ও নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে কাট্‌রা অভিযানে সামিল করা হয়েছিল,[২২] কিন্তু সেই ভুল ভাঙ্গানোর বহু সময় থাকা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি হাত গুটিয়ে বসেছিলেন কেন ? কিসের স্বার্থে ? অপরদিকে, এক শ্রেণীর মুসলীম নেতা (মুসলীম লীগ) নিরীহ কিছু ধর্মপ্রাণ মুসলমানের রক্তে জামা ভিজিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ গোছাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কাট্‌রা অভিযানকে এভাবেই বিশ্লেষণ করা দরকার।

সূত্রনির্দেশ

১) Unpublished Post-Doctoral Thesis submitted to the University Grants Commission by Dr. Bishan Kumar Gupta; December, 1999

২) কাট্‌রা মসজিদের সন্মুখে রক্ষিত ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে তৎকালীন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯১১ খ্রীঃ কাট্‌রা মসজিদটি অধিগ্রহন করেন। সেই সময় থেকেই ওখানে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজও সেই নির্দেশ বলবৎ আছে। বর্তমানে মসজিদটি হাজার - হাজার পর্যটকের কাছে একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধ হিসাবে চিহ্নিত।
আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৫.৬.৮৮

৩) The Statesman, Calcutta, 26.6.88; এবং
আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৬.৬.৮৮

৪) প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ; অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী R.S.P. দলের প্রধান নেতা ও বিধায়ক শ্রী অমল রায়ের বক্তব্য। জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, যা জেলার পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত। ঘটনার দুদিন পর রাজ্য সরকারের তিনজন মন্ত্রী প্রশান্ত শুর, দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় ও ওয়াহেদ রেজা মুখ্য মন্ত্রীর নির্দেশে D.I.G Police A.H. Safi সহ সরজমিন তদন্তে আসেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার সহ এই প্রতিবেদক ডঃ বিষাণ গুপ্ত এবং জেলা বামফ্রন্টের আরও দুজন নেতা ঐ সরজমিন তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় বহরমপুর সার্কিট হাউসে মন্ত্রীবর্গ ও জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ডঃ বিষাণ গুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং The Statesman, 30.6.88.

৫) The Statesman, Calcutta, 29.6.88.
আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ২৯.৬.৮৮

৬) সরকারী রিপোর্ট। এবং Unpublished Post-Doctoral Thesis of Dr. Bishan Kumar Gupta; পূর্বোক্ত

৭) The Statesman, Calcutta, 29.6.88. And 27.6.88. এবং জনমত, মুর্শিদাবাদ - বীক্ষন, মুর্শিদাবাদ সন্দেশ প্রভৃতি স্থানীয় পত্রপত্রিকা এবং ঐ অভিশপ্ত ট্রেনের যাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

৮) Gupta, Bishan Kumar; পূর্বোক্ত Post-Doctoral Thesis

৯) The Statesman, Calcutta, 29.6.88. এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকা।

১০) Election Recorder, Part I and II, West Bengal Book Front Publication, Calcutta, 1990, edited by Dilip Banerjee.

১১) মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ২০০ জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য। ওয়াকিবহাল সাধারণ মানুষেরও একই অভিজ্ঞতা। এমনকি জেলার প্রবীণ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন যে ঘটনাটা এই ভাবে মোড় নেবে এটা তাঁরা ভাবতে পারেননি। vide, The Statesman, Calcutta, 30.6.88; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০.৬.৮৮

১২) ঐ এবং ঘটনার দুদিন পর বহরমপুর সার্কিট হাউসে রাজ্যের তিন বিশিষ্ট মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন বক্তা প্রশাসনের গাফিলতির কথা বিশেষভাবেই বারংবার উল্লেখ করেন। সেই সময় প্রকাশিত কোলকাতার দৈনিক ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলিরও একই অভিজ্ঞতা। জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আব্দুস সাত্তারও ঐ দিন জেলা প্রশাসন ও মুসলীম লীগকে দায়ী করেন।

১৩) অতি সাম্প্রতিক কালে প. ব. রাজ্য সরকার কাটরা গণহত্যা এবং হরিহরপাড়ায় পুলিশি গুলিচালনার ব্যাপারে গঠিত দুটি বিচার বিভাগীয় তদন্তই অসম্পূর্ণ অবস্থায় বাতিল করেছেন। জনমত, বহরমপুর, এপ্রিল, ২০০০

১৪) Gupta, Bishan Kumar; Unpublished Post-Doctoral Thesis, Submitted to the U.G.C, December, 1999.and আনন্দবাজার পত্রিকা,; ২৯.৬.৮৮ (সাংবাদিক অনন্ত জানার প্রতিবেদন)। The Statesman, Calcutta, Special Reporting of Diptosh Mazumdar, on 30.6.88.

১৫) মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলীম জনগনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য; পূর্বোক্ত

১৬) Gupta, Bishan Kumar; Political Movements in Mushirdabad, 1920-47 (A Ph D. Dissertation); MANISHA GRANTHALAYA; Calcutta, 1992.

১৭) ২৭ শে জুন, ১৯৮৮, বেলডাঙ্গা থানা প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসন ও মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় শান্তি বৈঠকে জেলার প্রধান কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক মহম্মদ ইস্রাইল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মন্ত্রী প্রশান্ত শুরের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতার জন্যই মুর্শিদাবাদে এই অবস্থা। সব জেনেও রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের ভোট হারানোর ভয়ে টুঁ শব্দ করেননি। তাঁর এই সুস্পষ্ট অভিযোগের কেউ কোন প্রতিবাদ করেন নি। তিনি প্রকাশ্যেই জানান যে স্থানীয় C.P.M, R.S.P, F.B, Cong(I) , সব দলের নেতাদের অনেক আগে থেকেই মুসলীম লীগ ও জমাত-ই- ইসলামীর ঐ মারাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে সজাগ করা সত্বেও তাঁরা তাতে কর্ণপাত করেন নি। এছাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে প্রস্তাবিত কাট্রা অভিযানের দাবীর বিরোধীতা করে একটি ডেপুটেশন দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। C.P.I.(M) সাংসদদ্বয় জয়নাল আবেদিন ও মাসুদল হোসেন স্বাক্ষরিত একটি প্রচার পত্র কাট্রায় নামাজ পড়ার দাবীর বিরোধীতা করে লালবাগ এলাকায় ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে প্রচারিত হয়েছিল। মহম্মদ ইস্রাইলের ঐ বক্তব্য অনন্ত জানার বিশেষ প্রতিবেদনে আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.৬.৮৮ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, কাট্রা অভিযান সংগঠিত হওয়ার সময় তাকে রাজনৈতিক ভাবে প্রতিরোধ না করলেও ঘটনা ঘটার পর বেশ কিছুদিন ধরে বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল, পদযাত্রা, কনভেনশন ইত্যাদির জোয়ার বয়ে যায়। জেলা বামফ্রন্ট দুটি, বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা একটি এবং ডি. এস. ও এবং ডি. ওয়াই. ও একটি এবং যুব সংঘ একটি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার আবেদন জানিয়ে প্রচারপত্র বিতরণ করেন।

১৮) Election Recorder; পূর্বোক্ত

১৯) Report of the D.I.G. I.B (West Bengal) 6.11.47; West Bengal State Archives.

২০) Election Recorder, পূর্বোক্ত

২১) The Statesman, Calcutta, Reporting of Diptosh Ghosh, 30.6.88.

২২) মুসলীগ লীগ কাট্রা অভিযানের ঠিক পূর্বে প্রচার করেছিলো যে বোম্বাই থেকে হাজি মস্তান ঐ দিন বহরমপুর এসে ঘোষণা দেবেন যে মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করে শিল্প গড়ে তুলবেন এবং যাঁরা ঐ অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেন, তারা চাকরী পাবেন। এছাড়া

মুসলীম লীগের আবেগময়ী ধর্মীয় প্রচারও বেশ কিছু নিরীহ ধর্মান্ধ মুসলমানকে প্রভাবিত করেছিল ঐ জমায়েতে সামিল হতে। কাট্‌রা অভিযানে অংশগ্রহণকারীগণ অনেকেই গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.৬.৮৮ প্রকাশিত অনন্ত জানার প্রতিবেদন

এছাড়াও প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :-

১) "Checking the Poison", — Editorial, The Statesman, Calcutta, 30.6.88 .

২) "ধর্ম ও ভারতীয় রাজনীতি" - অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.৬.৮৮।

৩) "কাট্‌রা - ফিরে দেখা" – শঙ্খ গুপ্ত, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, জুন, ১৯৮৯, বহরমপুর।

৪) "বামপন্থা, সংগ্রামী চেতনা এবং বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছর" - দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, বহরমপুর, ১২ই জুলাই, ১৯৯৭।

৫) মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, বহরমপুর, ২৬শে জুন, ১৯৮৮ সংখ্যা।

৬) ঐ, জুলাই , ১৯৮৮ সংখ্যা।

৭) "কাট্‌রার ঘটনা যেন আর না ঘটে" - বিষাণ কুমার গুপ্ত; দৈনিক কালান্তর, কলকাতা, জুলাই , ১৯৮৮।

৮) "সাম্প্রদায়িক শক্তি, মুর্শিদাবাদ জেলা এবং লোকসভা নির্বাচন" – বিষাণ কুমার গুপ্ত, দৈনিক কালান্তর কলকাতা, ১২.১২.৮৯।

৯) "মুর্শিদাবাদ জেলার সম্প্রীতি পদযাত্রা, কিছু অভিজ্ঞতা" - বিষাণ কুমার গুপ্ত, দৈনিক কালান্তর; কলকাতা, ২১.১১.৯০।

একবিংশ শতকে বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদের পরিণতি : উগ্র সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস

রাসবিহারী মিশ্র

আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ উত্থানের ইতিহাস অতি প্রাচীন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তিবোধহীন অবৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাসই হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদ। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম - খ্রিস্ট, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের উগ্র মৌলবাদের একই সাথে দেশে দেশে আবির্ভাব ঘটেছে। এশিয়া-আফ্রিকায় শোষিত দেশগুলোর স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ইসলাম ও হিন্দু মৌলবাদের জঙ্গী অভ্যুত্থান এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের সঙ্কট এবং রুশ সমাজতন্ত্রের সাফল্যে প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যলোভী শাসকেরা প্রমাদ গণেছল। এশিয়া-আফ্রিকার পদানত দেশগুলোর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদের বীজবপন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেরই ফল।

ধরা যাক, দেশবিভাগের পরিণতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলেই রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের শরিক দেশীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসনে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ভ্রান্তনীতিই দ্বিজাতি তত্ত্বে ইন্ধন জুগিয়েছিল। মুসলিম লীগের চাপের মুখে নতিস্বীকার করে শেষপর্যন্ত দেশভাগে কংগ্রেস দলের নেতৃবর্গ সম্মত হওয়ায় ইসলাম মৌলবাদীরা পাকিস্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। প্রথমে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান — দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। দেশভাগের এই ক্ষত শুকোতে না শুকোতে পাকিস্তানের গোঁড়া ইসলামী প্রবণতায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ -এ পরিণত হয়। আজও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ইসলামী মৌলবাদী সন্ত্রাসের প্রকাশ ঘটেছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস। কাশ্মীব উপত্যকার বঞ্চিত

নিপীড়িত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য "আজাদী"-র লড়াইয়ের বিপরীতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামী উগ্র মৌলবাদীদের সশস্ত্র হামলা এক জটিল ও সংশয়াকুল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কায়েমী স্বার্থের মদতে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ড চালাচ্ছে।

দেশবিদেশে মন্দির-মসজিদ ধ্বংস, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন, গণতন্ত্র প্রিয় ও ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মানুষদের কন্ঠরোধ, দরিদ্র আদিবাসীদের বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বর্বর আক্রমণ — মৌলবাদীদের হানাদারিতে আজ সমাজ ও সভ্যতা গভীর সংকটের মুখোমুখি। সারাবিশ্বেই ধর্মীয় মৌলবাদ তীব্র আকার ধারণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর মৌলবাদের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রুশসাম্রাজ্যের অধীন চার্চগুলো বিপ্লবী সরকারকে ধর্মদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় সোভিয়েত ভূখন্ডে চার্চগুলো আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী জনগণকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বান জানায় এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর খ্রিস্টান মৌলবাদীদের নতুন উদ্যোগ শুরু হয়। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট, ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি, ক্রিশ্চিয়ান পার্টি, সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টি ইত্যাদি ইউরোপে খ্রিস্টধর্মকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক দল হিসাবে আর্বিভূত হয়। এই নতুন পার্টিগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য হাত বাড়ায়। ষাটের দশকে এই দলগুলো পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের আগে সাম্রাজ্যবাদ ও চার্চের পোষকতায় পূর্ব জার্মানিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন গঠন করে প্রতিবিপ্লবীদের সামনের সারিতে ছিল।

সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইসলাম মৌলবাদীদের মনোবল বেড়ে গিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস ও বিভক্ত হওয়ার পর ইসলাম মৌলবাদীরা আজায়বাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়ায় আধিপত্য কায়েমের মধ্য দিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করেছে। আফগানিস্তানে বিপ্লবী সরকারের পতন হওয়ার পর ইসলাম মৌলবাদীরা জয়ের নিশানা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের আশ্রয়ে থাকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নাজিবুল্লাকে জবরদস্তি বের করে প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসিতে ঝোলায়। এখানে মৌলবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয় নি। কিন্তু আফগানিস্তান পরিণত হয়েছে একটি ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্রে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মৌলবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সামনে রেখেও বি জে পি ও মুসলীম লীগের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গঠন থেকে পঞ্চায়েত নির্মাণ পর্যন্ত নানা স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভোগদখল করেছে। যেমন,

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহকে প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে বসানোর সময় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জোটের যুক্তি ছিল কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করাই সবচেয়ে বড় কাজ। এই রাজনৈতিক দলাদলিতে আখেরে লাভ হয়েছে হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক দলটিরই। সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়ার স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক উগ্রধর্মীয় পুনর্জাগরণের অনুকূল হাওয়া বইছে।

আজ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বড় বেশি প্রয়োজন 'ধর্ম' থেকে 'রাজনীতি' সব রকমের মৌলবাদী অন্ধবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করে বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা ও মনুষ্যত্বের মুক্তচিন্তাকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

মহামানব গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে উৎসারিত। এ ধর্মমত সমগ্র ভারত উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তারলাভ করলেও দেড় সহস্রাধিক বছর পর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে এই ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় তিরোহিত হয়। প্রাচীনকালেই বর্তমান বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ ঘটে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেই প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মানুসারী শাসকগণ কর্তৃক শাসিত হওয়ার ফলে কোনো সময় সনাতনধর্মের, কোনো সময় বৌদ্ধধর্মের আবার কোনো সময় ইসলামধর্মের ব্যাপকতা লাভ করে। বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম একদা বাংলাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও বর্তমানে অতি অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করছেন। তন্মধ্যে বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা প্রধান। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকালসহ বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে একটি তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার :

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাল সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর প্রমাণ না পাওয়া গেলেও প্রচলিত কিংবদন্তী, পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য, চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি পর্যালোচনা করে এর একটি আনুমানিক সময়কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। একটি প্রচলিত কিংবদন্তী মতে, বুদ্ধ হস্তীগ্রামে এসেছিলেন। সেই হস্তীগ্রাম পাটিয়ার হাইদগাঁও বলে মনে করা হয়। এখানে একটি বুদ্ধমন্দির বা কেয়াংও ছিল।[১] *সংযুক্ত নিকায়ে* তথাগত বুদ্ধের বাংলাদেশে আগমন করে শেতক নামক নগরে কিছুদিন অবস্থানের বিষয় জানা যায়। *অঙ্গুত্তর নিকায়েও* বঙ্গান্তপুত্ত নামে একজন বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা অবহিত হওয়া যায়। *থেরগাথায়* বঙ্গীশ নামক জনৈক প্রতিভাবান কবি-ভিক্ষুর জীবনী পাওয়া যায়; যিনি বঙ্গদেশের অধিবাসী বলে মনে হয়। এছাড়া সংস্কৃত দিব্যাবদান ও কাশ্মিরী কবি ক্ষেমেন্দ্রর *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী তাঁর কন্যা সুমাগধাকে বিয়ে দেন বাংলাদেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের জনৈক যুবকের সঙ্গে। সুমাগধা বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] সিংহলী পালি কাব্যগ্রন্থ *মহাবংসে* উল্লেখ আছে বঙ্গদেশের জনৈক

রাজপুত্র কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। তাঁদের সীহবাহু নামে এক পুত্র ও সহীসীবলী নামে এক কন্যার জন্ম হয়। বয়ঃকালে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের বিজয় সিংহ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই বিজয় সিংহ গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে সাত শ' অনুচর সহ সিংহলে উপনীত হয়ে সিংহল অধিকার করে এ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, বিজয় সিংহের নামানুসারে এদেশের নামকরণ করা হয় সিংহল।[৩] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, বৌদ্ধরা এদেশের আদি অধিবাসী। তারা আপনাকে ক্ষত্রীয় বা রাজবংশী পরিচয় দিয়ে থাকেন।[৪] পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীও একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণ পূর্বদেশে এসে ধর্ম প্রচার করেন এবং চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচীনতম ধর্ম।[৫] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত অনুযায়ী সম্রাট অশোকের (রাতজ্বকাল খ্রিঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) সময় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর মতে, এর পূর্বেও সম্ভবত এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[৬] খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ একখানা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ বংশসাহিত্য, *সমন্তপাসাদিকা* প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, মৌর্য সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের ভিতরে ও বহির্ভাবতে বৌদ্ধধর্ম প্রচাবকদল প্রেরণ করেছিলেন। তন্মধ্যে উত্তর ও সোন স্থবিরের নেতৃত্বে একটি প্রচারকদল সুবর্ণভূমিতে (নিম্নবার্মা) প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সুবর্ণভূমি যাবার পথে চট্টগ্রামে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং প্রচারকদের মধ্যে কয়েকজন চট্টগ্রামে থেকে গিয়েছিলেন।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বহু অনুগামী পরিবৃত হয়ে চন্দসুরিয় (চন্দ্র সূর্য-১৪৬-৯৮) নামে জনৈক সামন্তযুবক মগধ হতে এসে চট্টগ্রাম-আরাকানের সমন্বয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করেন।[৭] তখন তিনি আরাকানসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহু বিহার, প্যাগোডা, মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৬৯৯ খ্রি. ভারতবর্ষে আগমন করে পনের বছর অবস্থান করেন। তিনি তাম্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধবিহারে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যক্ষ করেন এবং তথায় দু'বছর থেকে বহু ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি করেছিলেন ও বহু বৌদ্ধমূর্তির ছবি এঁকেছিলেন।[৮] এ সময়কার বহু বৌদ্ধমূর্তি বাংলাদেশের রাজশাহী ও বগুড়াসহ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।

গুপ্তযুগের পর হর্ষযুগেও রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। এসময়ে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আগমন করে ৬২৯ খ্রিঃ থেকে ৬৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন নগরে ২০টি বৌদ্ধবিহারে তিন হাজারের উপর হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু, পো-সি-পো নামক একটি বৃহৎ বৌদ্ধ বিহারে সাত শ' ভিক্ষু, সমতট প্রদেশের রাজধানীতে ৩০টি বিহারে দু'হাজার ভিক্ষু, তাম্রলিপ্তিতে দশটি বিহারে হাজারাধিক ভিক্ষু এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি বিহারে দু'হাজারাধিক হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৯] বাংলাদেশের সমতট অঞ্চলের রাজপুত্র শীলভদ্র এ সময়ে বিখ্যাত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁর নিকট বৌদ্ধধর্ম-দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। সপ্তম শতকের

অপর দু'জন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং ও শেংচি তাম্রলিপ্তির চার সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উচ্চ জীবনাদর্শের বিবরণ দিয়েছেন। এসব বিবরণ হতে অনুমিত হয় যে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় খুব শক্তিশালী ছিল এবং বাংলার বৌদ্ধগণ জ্ঞান, ধর্মনিষ্ঠা ও আচার-ব্যবহারে সমগ্র বৌদ্ধজগতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ চার শ বছর পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তাঁরা বহু বিহার এবং ধর্মচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পালযুগেই বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। এক কথায় পাল যুগকে বাংলার বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[১০] কীর্তিমান পাল সম্রাট ধর্মপালের (৭৭০-৮১০) প্রচেষ্টায় নালন্দা মহাবিহার-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি লাভ করে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সোমপুর মহাবিহার, ত্রৈকুটক বিহার, দেবীকোট বিহার, জগদ্দল বিহার, বিক্রমশীল মহাবিহার, পট্টিকেরা বিহার ও ওদন্তপুরী মহাবিহার। এসব মহাবিহার ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও নানা ধর্ম-দর্শন চর্চার প্রধান কেন্দ্র। এ সময়কার চট্টগ্রামস্থ পণ্ডিত বিহার শিক্ষা-কেন্দ্রটি ভারতবর্ষব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিল।[১১] এ শিক্ষা কেন্দ্রের খ্যাতিমান অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে লুইপা, সবরিপা, নাড়ুপা, অবধুতপা, বুঁদ্ধপা, জ্ঞানপা, অনঙ্গবজ্র, ধর্মশ্রী, মোঘনাথ প্রভৃতি অন্যতম। উল্লেখ্য, এ সময়ে মহাযান ধর্মমতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে, তবে হীনযান ধর্মমতও চর্চা হত। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সগৌরবে বিরাজ করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের পতন

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পর থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ বিহার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভষ্মিভূত হয়, হাজার হাজার মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধভিক্ষু তুর্কী সেনাদের তরবারির আঘাতে নিহত হন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,

> মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। উহাতে ব্রাহ্মণের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু বৌদ্ধদের বদলে মুসলমান মৌলবী ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইঁয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে উহার আধিপত্য বিস্তার হইয়া পড়িল। এইরূপে বাংলার অর্ধেক মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইল। আর বৌদ্ধগণের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয়পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন — আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল।[১২]

ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ হীনবল হতে লাগল। এক সময়ে উৎপীড়িত বৌদ্ধগণ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। স্বল্পসংখ্যক মাত্র বৌদ্ধ বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হল। বর্তমানে তারা নামের পূর্বে বড়ুয়া পদবি ব্যবহার করে, এজন্য তারা বড়ুয়া বৌদ্ধ নামে পরিচিত। এছাড়া বৃহত্তর পার্বত্য জেলায় চাকমা, মারমা, চাক, প্রভৃতি উপজাতীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

বড়ুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব

বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। জনাব মাহবুব-উল-আলম *চট্টগ্রামের ইতিহাস* নামক পুস্তকে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী তুলে ধরেছেন,

> ভারতের বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে তাহাদের টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইলে বৃজ্জি বা বজ্জিকাপুত্ত উপজাতির এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সাতশ' অনুচরসহ মগধ হইতে পলায়ন করিয়া পগাঁর পথে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে আসিয়া অবস্থিত হন। বড়ুয়া শব্দটি বৃজ্জি বা বাজ্জি কথাটির রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ বড় বা উৎকৃষ্ট। চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্যে ঐ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়।[১৩]

ড: বেণীমাধব বড়ুয়া, উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী প্রভৃতি মনীষীদের মতে বৈশালীর বজ্জি বংশীয় বৌদ্ধগণ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চট্টগ্রামে আগমন করে বসবাস করেন। বৃজ্জি বা বজ্জি জাতি হতে বড়ুয়া জাতির উৎপত্তি। মগধের অন্তর্গত বৈশালীর বৃজ্জি জাতি তথাকার অভিজাত রাজবংশের বংশধর।[১৪]

বড়ুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে ড: প্রণবকুমার বড়ুয়া প্রচলিত জনশ্রুতিকে সমর্থন করে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণ শুরু হলে মগধের বৃজ্জি গোত্রের বৌদ্ধগণ পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলের স্বধর্মীদের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১৫] তারা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে হতে চট্টগ্রাম বিভাগে উপনীত হয়। চট্টগ্রাম তখন আরাকানের বৌদ্ধ রাজার অধীন ছিল। এখানে আর ধর্মলোপের ভয় ছিল না। তারা ইতিপূর্বে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মগধ থেকে আগত চন্দ্রসূর্যের সঙ্গীদের উত্তর পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়। পরবর্তীতে তারা বড়ুয়া বৌদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। নূতন চন্দ্র বড়ুয়াও প্রায় একই মতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ভারতে বৌদ্ধদের উপর উপর্যোপরি মর্মান্তিক নির্যাতন ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমূহে ধ্বংস করার ফলে সেখানে বৌদ্ধগণ ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ তিব্বত ও নেপাল চলে যায়। আর বৈশালীর বর্জ্জি বংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহুসংখ্যক অনুচরসহ মগধ হতে পলায়ন করে পঁগার পথে আসাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে এসে বসবাস করতে থাকে।[১৬]

কুমিল্লা জেলায় বসবাসরত বৌদ্ধরা সিংহ পদবী ব্যবহার করে। ধর্মরক্ষিত ভিক্ষুর মতে খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবার জন্য একদল মগধবাসী ব্রহ্মদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক পরবর্তীকালে তাদের অনেকে বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, প্রভৃতি জেলায় বসতি স্থাপন করে। বুদ্ধের অপর নাম শাক্যসিংহ-র সিংহ উপাধী তারা গ্রহণ করে। এরা মগধবাসীদের আদি বংশধর।[১৭] এ মত কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিচার সাপেক্ষ। এখানে উল্লেখ্য যে, পালি সাহিত্যের বিবরণ মতে রাজা বিরূঢ়ভ শাক্যবংশ ধ্বংস করতে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে তারা স্বদেশ ত্যাগ করেছিল বলে জানা যায় না। আমার ধারণা, প্রাচীনকালে বৌদ্ধরা হাজারী, পাল, সিংহ প্রভৃতি পদবি ব্যবহার করত। কুমিল্লা অঞ্চলের বৌদ্ধরা প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত সিংহ পদবী হয়ত ত্যাগ করেনি।

ড: আহমদ শরীফ মনে করেন যে, চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আরাকানী। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে। কারণ কিছুকাল পূর্বেও আরাকানী নাম, পোষাক, খাদ্য ইত্যাদি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কংগ্রেসী জাতীয়তার প্রভাবে এরা হিন্দু আচারাদি গ্রহণ করেছে।[১৮]

গবেষক আবদুল হক চৌধুরীর মতে, চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমন্বয়ে রাজ্যপ্রতিষ্ঠাকারী মগধাগত চন্দ্রসূর্যের (১৪৬-১৯৮) অনুগামী বৌদ্ধরা চট্টগ্রামের আরাকানী জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে এবং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই ভাবে মগধাগত বৌদ্ধ ও চট্টগ্রামের আরাকানী বৌদ্ধদের রক্ত সংমিশ্রণে প্রথম চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তিনি আরও মনে করেন যে, চট্টগ্রামের বড়ুয়া পদবিধারী বৌদ্ধরা বৈশালী থেকে আগত বৌদ্ধ ও আরাকানী বৌদ্ধদের সংমিশ্রণজাত একটি বর্ণসংকর সম্প্রদায়।[১৯]

এই উভয় অভিমতের সঙ্গে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বুদ্ধের সময়েই চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[২০] খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বাংলাদেশও তাঁর সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।[২১] কাজেই চন্দ্রসূর্যের আগমনের অন্ততঃ কয়েক শ' বছর পূর্বে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এটা ধরে নেওয়া যায়। এর পরেই আরাকানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া আরাকানীরা বড়ুয়া বৌদ্ধদের 'মামাগ্রী' নামে সম্বোধন করে থাকে, এর অর্থ বড় ভাই। এটা শ্রেষ্ঠ ও সম্মান সূচক সম্বোধন। এতে প্রমাণিত হয় যে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের (বড়ুয়া) উদ্ভব খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভের কয়েক শতক পূর্ব থেকে। তবে বৌদ্ধ সামন্ত চন্দ্রসূর্য কর্তৃক চট্টগ্রাম-আরাকানের সমন্বয়ে-রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বৌদ্ধদের অবস্থান সুদৃঢ় হয় ও ধর্ম চর্চার পথ সুগম হয়। ১৭৫৬ সাল অবধি বিছিন্নভাবে আরাকানীরা চট্টগ্রাম শাসন করেছে। তখন সমগ্র চট্টগ্রামে আরাকানী ও বাঙালি বৌদ্ধরা পাশাপাশি অবস্থান করত। এ সময়ে বাঙালি বৌদ্ধরা আরাকানী নাম, পোষাক, ধর্মীয় কিছু কিছু সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও নিজেদের স্বকীয়তা কখনো বিসর্জন দেয়নি। সামাজিক অনুমোদনে কোন বৈবাহিক সম্পর্কও হত না। কাজেই বড়ুয়া বৌদ্ধরা মিশ্র সম্প্রদায় কিংবা আরাকানী থেকে উদ্ভুত--- এ অভিমত কোনো প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রভাব ছিল। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে পুষ্যমিত্র প্রভৃতি হিন্দু রাজাদের দ্বারা ও পরে তের শতকে মুসলমান আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা আক্রান্ত হলে অনেকে সনাতনধর্ম এবং অধিকাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তখন চট্টগ্রাম আরাকানী বৌদ্ধ রাজা কর্তৃক শাসিত হত। মগধের নির্যাতিত বহু আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মানসে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এখানকার আদি বৌদ্ধদের সাথে মিশে যায়। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ পর্তগীজদের সহায়তায় চট্টগ্রাম অধিকার করলে আরাকানীদের অনেকে আরাকানে পালিয়ে যায়। মুসলমান শাসনামলে সম্ভবত অনেক চট্টগ্রামী বাঙালি বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব সেই প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু তারা নামের পরে গোত্রানুযায়ী পদবি ব্যবহার করত। বড়ুয়া পদবি ব্যবহার অনেক পরবর্তীকালে শুরু হয়।

বর্তমানে বাঙালি বৌদ্ধরা বড়ুয়া পদবি ব্যবহার করে। খুব স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধ তালুকদার, চৌধুরী, মুৎসুদ্দী, মহাজন ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করে। আবার কেউ কেউ উক্ত পদবিসহ বড়ুয়া পদবি ব্যবহার করে থাকে। বড়ুয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্রাহ্মণকুমার, যুবক, শ্রেষ্ঠ, মহান, বিত্তবান অথবা ব্রাহ্মণদের উপাধী বিশেষ।

বড়ুয়া শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে, বড় আর্য (বর অরিয়) থেকে 'বউড়গ্যা' বা বড়ুয়া শব্দটি এসেছে। চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় এখানো এ শব্দ দুটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বউড়গ্যা বড় আর্য এবং আযোয়্যা আর্যামা শব্দের বিকৃত ব্যবহার।[২২] এখনো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বড়ুয়াকে বউড়গ্যা বলা হয়। অতএব, বড় আর্য (বর অরিয়) বউড়গ্যা বড়ুয়া এভাবে উদ্ভব হওয়া সম্ভব। আবার সেকালের পরিবারের ও সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের 'বড়িয়া' সম্বোধন করা হত বলে জানা যায়। এই বড়িয়া শব্দটি কালক্রমে বড়ুয়া হয়েছে বলে কারো কারো ধারণা।[২৩] অন্যটি হচ্ছে, বজ্জি বা বৃজি শব্দ থেকে বড়ুয়া শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, ড. প্রণবকুমার বড়ুয়া প্রমুখ এই মতে বিশ্বাসী। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকে মগধের বৈশালী থেকে আগত চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী বজ্জি বংশীয় লোকেরা নিজদের নামের শেষে সম্ভ্রান্ত সূচক বজ্জি পদবি ব্যবহার করত। আর স্থানীয় বৌদ্ধরা আদিকাল থেকে নিজেদের গোত্রীয় পদবি ব্যবহার করত। কালক্রমে বৌদ্ধরা সংখ্যায় সংকুচিত হতে থাকলে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখাব জন্য স্থানীয় বৌদ্ধরাও বজ্জিদের অনুকরণে 'বজ্জি' পদবি ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীতে 'বজ্জি' শব্দ থেকে 'বড়ুয়া' শব্দের উদ্ভব হয়। তবে পঞ্চদশ শতকের শেষ অথবা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ থেকে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা 'বড়ুয়া' পদবি ব্যবহার শুরু করে বলে অনুমিত হয়। এ সময়ে অন্যান্য পদবিরও ব্যবহার ছিল; যেমন হাজারী, সিং, বিহারী, রাজবংশী, শিকদার ইত্যাদি। ড. প্রণবকুমার বড়ুয়ার মতে, উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে ঐ সকল পদবি বিলুপ্ত হয়ে একমাত্র 'বড়ুয়া' পদবি প্রচলিত থাকে। বর্তমানে বাঙালি বৌদ্ধদের সম্প্রদায়গত উপাধি হল বড়ুয়া, এরাই বাংলাদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়।[২৪] 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি যেখান থেকে যেভাবে হোক না কেন, এটা একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সম্মান সূচক শব্দ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের কবি চণ্ডীদাসের কবিতার একটি পদে 'বড়ুয়া' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তিনি বুড়া চণ্ডীদাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর কবিতার পদটি নিম্নরূপ :

'একে তুমি কুলনারী
কুলে আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধু।'

আসামে সর্বপ্রথম বড়ুয়া শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। অহোমরাজগণ সেখানে প্রশাসনিক কার্য ও সেনাবাহিনী পরিচালনা করার জন্য নানা প্রকার পদের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বড়ুয়া পদটি অন্যতম।[২৫]

পরবর্তী কালে অহোমরাজ সুসেংগফার(১৬০৩-৪১) রাজদরবারে 'বড় বড়ুয়া' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের সৃষ্টি করেন।[২৬]

ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ *রাজমালা* পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে রাজ্যের সকলেই

যোদ্ধা ও সৈনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ে পার্বত্য প্রধান ব্যক্তিরা তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের নায়ক রূপে নির্বাচন করতেন এবং তাঁদেরকে সরদার, বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতেন।[২৭] ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য (১৪৯৯-১৫১৪) ত্রিপুরার সেনা বাহিনীতে বড়ুয়া উপাধির প্রবর্তক বলে *রাজমালার* নিম্নোক্ত ছত্রটি থেকে গবেষকগণ মনে করেন:

'শ্রী ধন্যমাণিক্য রাজা তদবধি সেনা
বড়ুয়া পদবি খ্যাত করিল রচনা।'[২৮]

এতে আরো অবগত হওয়া যায় যে, বড়ুয়া উপাধি সেনাপতি পদমর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হত এবং অমরমাণিক্য (১৫৯৭-১৬১১) প্রথমে বড়ুয়া অর্থাৎ সেনাপতি পদে ও পরে মহারাজা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বড়ুয়া ছিল হাজারীর উপরিস্থ পদ; বড় শব্দ থেকে বড়ুয়া পদ সৃষ্টি হয়েছিল।[২৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চট্টগ্রাম মাঝে মাঝে ত্রিপুরাধিপতিগণ দ্বারা শাসিত হয়েছিল। কাজেই বড়ুয়া পদবি ব্যবহারে ত্রিপুরার রাজপরিবারের প্রভাবও পড়তে পারে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ত্রিপুরার বড়ুয়া পদবিধারী এক বিচারক চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর বৌদ্ধদের মধ্যে বড়ুয়া উপধি ধারণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং কালক্রমে তা জাতীয় পদবিরূপে গৃহীত হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন।[৩০] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মগধ থেকে যারা এসেছিল এবং যারা চট্টগ্রাম ও আরাকানে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা নিজেদের মাগধী বলে পরিচয় দিত। ফলে তারা অন্যধর্মীদের কাছে 'মগ' বা 'মঘ' নামে অভিহিত হতে থাকে; এটা এখনো প্রচলিত রয়েছে। চাকমাদের মধ্যেও বড়ুয়া পদবির ব্যবহার ছিল। চাকমা জাতির ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে :

> বড়ু বড়ুয়া, সাতুয়া বড়ুয়া, বড়ুয়া গোজা ইত্যাদি শব্দে বড়ুয়া জাতির সহিত চাকমা জাতির একটা সম্বন্ধ আছে মনে হয়। চাকমা রাজ সরকারে প্রাচীনকাল হইতে বড়ুয়া জাতি চাকুরী করিয়া আসিতেছে।[৩১]

বর্তমানে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে 'বড়ুয়া' পদবি ব্যতীত পূর্বেকার প্রচলিত অন্যান্য পদবির ব্যবহার খুব কম দৃষ্ট হয়। সম্ভবত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ব্যাপকভাবে বড়ুয়া পদবি ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে বড়ুয়া বলতে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বোঝায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কারণে বর্তমানে মায়ানমার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু বড়ুয়া বৌদ্ধ স্থায়ীভাবে বসবাস করছে; তারা চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের বংশধর।

সূত্র নির্দেশ

১. আলম, ওহিদুল, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল), চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃ.৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুলচন্দ্র , *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম,* কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৯।
৩. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীনযুগ), কলিকাতা, (সপ্তম সংস্করণ), ১৯৮১, পৃ.২৫।
৪. *ইসলামাবাদ,* পৃ. ১২।
৫. *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* চট্টগ্রাম, ১৯২০, পৃ. ২২।
৬. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।
৭. চৌধুরী, আবদুল হক; *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা,* ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮।
৮. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

৯. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯-২১০; বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১-৬২।
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।
১১. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১।
১২. বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ* (৩য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮৪. পৃ. ৪১২।
১৩. চট্টগ্রাম (চতুর্থ সংস্করণ), ১৯৬৫, পৃ. ৩৯।
১৪. মুচ্ছুদ্দী, উমেশ চন্দ্র; *বড়ুয়া জাতি*, চট্টগ্রাম, ১৯৫৯, পৃ. ৭।
১৫. পালোত্তর যুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় (অপ্রকাশিত -পি-এইচ, ডি. থিথিস), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২২৬-২৭।
১৬. *বড়ুয়া জাতির ইতিহাস*. চট্টগ্রাম, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫।
১৭. কুমিল্লা জেলা পরিষদ, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, ধর্ম ও ধ্যান ধারণা-এক, বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ২০৯।
১৮. চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২। শরীফ (ডঃ) আহমদ; *কালের দর্পণে স্বদেশ*, ঢাকা. ১৯৮৫, পৃ. ১১।
১৯. চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮ ও ৫৪।
২০. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৭।
২১. মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।
২২. বড়ুয়া জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।
২৩. বড়ুয়া, ডাক্তার রামচন্দ্র; *চট্টগ্রামে মগের ইতিহাস*, পৃ. ৭।
২৪. ডঃ বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩১।
২৫. *আসাম ইন দ্যা অহোম*, পৃ. ১১০ (উদ্ধৃত, চৌধুরী, পৃ. ৫৬)।
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২ (উদ্ধৃত *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬)।
২৭. ২য় লহর, পৃ. ১২১।
২৮. সেন, কালী প্রসন্ন, পৃ. ১২।
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮।
৩০. মহাস্থবির, ধর্মাধার; চট্টলে মগধ স্মৃতি (প্রবন্ধ), *বুদ্ধ জয়ন্তী স্মরণিকা* ১৯৭৯, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৩১. চাকমা, সুগত; পৃ. ৩২।

চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রাম পাহাড়-সাগর বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক প্রাচীন লীলাভূমি। সমুদ্রিক বন্দর হিসেবে অত্যাধিক বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা এবং রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে সুপ্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে 'সমন্দর',[১] ইবনে বতুতার বর্ণনায় 'সুদকাওয়ান'[২] এবং পর্তুগীজদের বিবরণে চট্টগ্রাম পোর্টো গ্রান্ডে [৩] (Porto Grande) বা 'বৃহৎ বন্দর' নামে খ্যাত। চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মগ অধ্যুষিত আরাকান রাজ্য অবস্থিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও আরাকান স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অধিকারী হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রতিবেশীক ঘনিষ্ঠতা ও সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে। তবে কখন, কিভাবে চট্টগ্রামের সাথে আরাকানের যোগসূত্র স্থাপিত হয় তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। আরাকানের রাজ ইতিবৃত্ত *রাজোয়াং* সূত্রে জানা যে, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে চন্দ্রসূর্য(১৪৬-৯৮) নামে মগধের এক সামন্ত আরাকান ও চট্টগ্রাম অধিকার করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] অতঃপর মুসলিম বিজয়ের [৫] আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম কখনো স্থানীয় সামন্ত রাজা বা আরাকান ও পঁগা রাজ প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হতো। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম তথা বাংলা-আরাকান সম্পর্ক নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। এ সময়ে আরাকানের লঙ্গিয়েত রাজবংশের শেষ রাজা মিন সুয়ামুন ওরফে নরমিখলা (১৪০৪-০৬) বর্মীরাজা মেঙসোয়ে কর্তৃক আক্রান্ত হন। যুদ্ধে মিন সুয়ামুন পরাজিত হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে সুলতান তাৎক্ষণিক আরাকান রাজাকে সাহায্য করতে পারেননি। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর গৌড়ে অবস্থানের পর ১৪৩০ খ্রি. পরবর্তী সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্ আরাকান রাজকে স্বীয় সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিণামে আরাকান বাংলার করদ রাজ্যে পরিণত হয়।[৬] তবে আরাকানের রাজারা কতদিন বাংলার করদ রাজা ছিলেন তা বলা মুস্কিল। কারণ, মিন সুয়ামনের মৃত্যুর পর রাজা মিন খারি ওরফে আলী খান (১৪৩৪-৫৯) দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু অঞ্চল এবং পরবর্তী শাসক রাজা বাসাউপিউ ওরফে কলিমা শাহ (১৪৫৯-৮২) চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত জয় করেন।[৭] উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আরাকানের সীমানায় অবস্থিত ছিল বিধায় চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই ত্রিদলীয় সংঘর্ষ সংঘটিত হতো।[৮]

তথাপি ১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রায় অংশ বাংলার সুলতানদের অধীনে ছিল। ১৫৭৬ খ্রি. বাংলার শেষ সুলতান দাউদখান কররানীর পরাজয় ও হত্যার পর মোগলরা বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় রাজা ও ভূস্বামীরা, বিশেষ করে, পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের বার ভূইঞা নামধারী ভুইঞারা স্বাধীনতা অবলম্বন করে।[৯] দেশে কেন্দ্রীয় শক্তি লোপ পায় এবং এ সুযোগে আরাকানের রাজারা চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। অতঃপর ১৬৬৬ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানের একছত্র অধীনে ছিল। ইতোমধ্যে (১৬১১) মোগল অধিকার ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় আরাকান রাজ বিচলিত হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার্থে তারা মোগলদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শত্রুতামূলক নীতি গ্রহণ করে। এমনকি, আরাকানী শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা বাংলার উপকূলীয় এলাকায় খুন, অপহরণ, লুণ্ঠতরাজসহ এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাদের অত্যাচারে বাংলার পূর্ব দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। মূলতঃ মগ-ফিরিঙ্গীদের আঁতাত এবং চট্টগ্রাম তথা উপকূলীয় এলাকায় তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মগ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসকি মহলে যথেষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। বর্মী 'মঙ',[১০] ফরাসী 'মুঘ' [১১] এবং সংস্কৃত 'মদগু' [১২] শব্দ থেকে মগ নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা একটু ব্যতিক্রম। অধ্যাপক D.G.E.Hall-এর মতে, মঙ্গোলীয় শব্দ থেকে 'মগ' শব্দটির উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আরাকানীদের চেহারাগত সাদৃশ্যের উপব জোর দিয়েছেন।[১৩] অপরদিকে, Dr. Francis Buchanan ও Sir Willam Hunter-এর মতে, আরকান ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদেরকে মগধ বা আধুনিক বিহারের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে আগত উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উত্তর পুরুষ বলে দাবী করেন। [১৪] ফলে এতদঞ্চলের বৌদ্ধ ও মাগধী একার্থবোধক হয়ে উঠে। অর্থাৎ একটি অপরটির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে 'মগ' একটি নিন্দাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ যোড়শ শতকের মধ্যভাগে এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আরাকানের অধিবাসীরা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে বাংলার অরাজকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। তাদেব এ সকল অপকর্ম বাংলার জনজীবন ও সামাজিক ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। আরাকানী জলদস্যুদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে 'মগের মুলুক' বা অরাজকতার দেশ নামে প্রবাদটি চালু হয়। অপরদিকে, পর্তুগীজরা ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। ফরাসী ফ্রাঙ্ক কথা থেকেই এর উদ্ভব। আরব ও পারস্যের লোকেরা ফরাসী ধর্মযোদ্ধাদের ফেরঙ্গ, ফ্রাঙ্ক বলে ডাকত। এটি ফ্রান্স এর বিকৃত উচ্চারণ। পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা ভারতে আসার পর তাদের ফ্রাঙ্ক এবং পরে ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত করে। [১৫] ইউরোপীয়দের মধ্যে পুর্তগীজরাই সর্বপ্রথম বাংলায় আসেন এবং ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেন। [১৬] চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনই ছিল তাদের আগমনের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাদের প্রথম অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তথাপি একই উদ্দেশ্যে তারা বার বার চট্টগ্রামে বাণিজ্যতরী পাঠাতে থাকে। স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হন। [১৭] অবশেষে সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শেরশাহের আক্রমণ (১৫৩৫) থেকে আত্মরক্ষার জন্য পর্তুগীজদের সাথে চুক্তি

করতে বাধ্য হন। বিনিময়ে পুর্তগীজরা চট্টগ্রামে কুঠি ও শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমতিসহ নানাবিধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে।[১৮] চট্টগ্রামের 'দেয়াঙ' (কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ফিরিঙ্গী বন্দর) এবং এর আরো নয় মাইল দক্ষিণে 'অঙ্গারখালী' নামক স্থানে তারা গীর্জা ও ঘাটি স্থাপন করে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত ফিরিঙ্গী বাজার এবং তৎসংলগ্ন গীর্জা ও খৃষ্টান বসতি এখনো তাদের স্মৃতি বহন করে।

ইতোমধ্যে শেরশাহ কর্তৃক বাংলা অধিকৃত হওয়ায় পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সুবিধারও অবসান ঘটে। উপরন্তু ওলান্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুবিধা করতে না পেরে পর্তুগীজরা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আরাকানের রাজার ও স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক ফিরিঙ্গী সৈনিকের পেশায় আত্মনিয়োগ করে। [১৯] এতেও তৃপ্ত না হয়ে দস্যুতা, লুন্ঠন, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। এইরূপ ঘৃণিত জীবিকায় তারা পশুতুল্য হয়ে উঠে। যদিও তারা নামে খৃষ্টান ছিল, কিন্তু তাদের আচার আচরণ বর্বর জাতি অপেক্ষা কোনরূপ উৎকৃষ্ট ছিলনা। উল্লেখ্য যে, শুধু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের জন্য পর্তুগীজরা দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হননি। তাদের চরিত্রই ছিল জঘন্য প্রকৃতির। তাদের সম্পর্কে পর্তুগীজ বিবরণেও চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। Linchoten-এর মতে,[২০] 'পর্তুগীজের সবচেয়ে খারাপ চরিত্রের কিছু লোক প্রতিবছর বঙ্গোপসাগরের বন্দরে আসতো। তাদের না ছিল কোন সভ্য সমাজ, না ছিল কোন নিয়মনিষ্ঠ সরকার। বন্যমানুষ ও অবশীভূত ঘোড়ার মত তাদের আচরণ।' কালক্রমে তারা এত বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, চট্টগ্রাম আরাকান উপকূলের অনেক ছোট ছোট দ্বীপ দখল করে নেয়। অনেক সময় তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য আরাকানরাজ তাদের কঠোর হস্তে দমন করতেও দ্বিধা করেননি।[২১] তথাপি মোঘল শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য আরাকানরাজ ফিরিঙ্গীদের চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করতঃ প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত করে। ফিরিঙ্গীদের প্রতি আরাকান রাজের এরূপ উদার মনোভাবের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে Maurice Collis বলেন, [২২]

> There were 750 Portuguese of pure of half blood, resident in Dianga and the neighbouring villages. These men were organized into companies under their captains, to whom the king of Arakan had granted estates. The Arakanese had been watching for generations the gradual expansion over India of the Mughal's power. Before its imperial administration was extended to Bengal, they used to lay claim a large parts of that region. But the Mughals, by overthrowing in 1576 the Muslim dynasty whose capital was at Gaur, had established themselves in western and central Bengal and now confined the Arakanese to the province of Chittagong. This province was purely Indian, nor was it geographically part of the Arakanese kingdom. It followed that the Mughals should hope one day to absorbe it. That was the solid reason why the king of Arakan had seen fit to retain the Portuguese in his employ, for these adventurers were the most formidable fightingmen in the East, their knowledge of firearms

and cannon being more advanced than, and their seamanship superior to, those of the forces of the Mughal.

আরাকান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপরিল্লিখিত ফিরিঙ্গীরা মগ জলদস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় দস্যুবৃত্তি, খুন, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এক বিভিষীকাময় অবস্থার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৬২১ খৃ. থেকে ১৬২৪ খৃ. মধ্যে তারা ৪২০০০ বন্দী বঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে।[২৩] মগফিরিঙ্গীদের এসকল অত্যাচারের বিভৎসরূপ দেশী বিদেশী ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকদের বিবরণে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। চট্টগ্রামে ফিরিঙ্গীদের আড্ডা এবং তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে খৃষ্টান পাদ্রী ম্যানরিকের বিবরণেও আলোকপাত করা হয়েছে। সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক নামক উক্ত পর্তুগীজ পাদ্রী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন এবং কয়েক বৎসর (১৬২৯-১৬৩৫) চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রামের 'দেয়াঙ'। মাঝে মধ্যে তিনি অঙ্গারখালীতেও অবস্থান করতেন। ১৬২৯ খৃ. ম্যানরিক অঙ্গারখালীতে অবস্থানকালীন সময় পর্তুগীজ দস্যুদের এক লোমহর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর বিবরণীতে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। ম্যানরিকের বিবরণী নিম্নরূপ :[২৪]

> ক্যাপ্টেন দীয়েগা দা সা এই দস্যু নৌবহরের নেতৃত্ব দেন। সে তার বহর নিয়ে ঢাকার কয়েক মাইল দূরে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে হামলা চালিয়ে প্রচুর ধন সম্পদ হস্তগত করে। এ লুন্ঠিত ধনসম্পদের মধ্যে একজন মোগল অভিজাত মহিলা এবং তার মেয়ে ও শাশুড়ী ছিল। পালিয়ে যাওয়ার সময় দস্যুরা তাদেরকে বন্দী করে ধনসম্পদসহ অঙ্গারখালীতে নিয়ে আসে। বিজয়ী বেশে লুন্ঠিত ধনসম্পদসহ বন্দীদের নিয়ে যখন দস্যুরা অঙ্গারখালী বন্দরে প্রবেশ করে, তখন বন্দরে অবস্থিত সুসজ্জিত জাহাজগুলো থেকে কামানের গোলা বর্ষন করে তাদের সংবর্ধিত করা হয়। যাতে তীবের লোকজন বুঝতে পারে যে, দস্যুদের মিশন সফল হয়েছে।
>
> তাছাড়া বন্দরে এ অতিরিক্ত জাঁকজমকের অন্যতম কারণ হলো — এবার তাদের বন্দীদের মধ্যে একছিল মোগল অভিজাত মহিলা। এই বন্দী মহিলা একজন মোগল হাজারী মনসবদারের মেয়ে এবং একজন দুহাজারী মনসবদারের স্ত্রী। তাঁর স্বামী একজন মির্যা। যে স্থানে তাদের বন্দী করা হয়, তাছিল মির্যার জাগীরের অংশ। বন্দী করে অঙ্গারখালীতে আনার পর জনৈক দুষ্ট প্রকৃতির পর্তুগীজ উক্ত মহিলাকে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। মহিলা তার প্রতি অনুরাগের ভাব দেখিয়ে জিহ্বায় এমন সজোরে কামড় দেন যে লোকটি গুরুতর আহত হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তথাপি, মহিলাটি বেশীদিন নিরাপদ থাকতে পারেননি। অনন্যোপায় হয়ে মহিলাটি তার মেয়ে ও শাশুড়ীসহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরপর অন্য একজন পর্তুগীজ তাকে বিয়ে করেন।

এরকম বিভৎস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও ম্যানরিক সামান্যতম বিচলিত হননি, কারণ ধর্মান্তরকরণের মহৎ কর্মটি তিনি ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। তাঁর মতে, [২৫]"**There was religious Zeal to enslave people and convert them to Christianity. Their abduction, ruin, and enslavement, degradation were spiritually an extra-ordinary piece of good fortune for them.**" ম্যানরিকের বিবরণে ধৃত বন্দীদের ধর্মান্তরকরণের পরিসংখ্যানেও পাওয়া যায়। যেমন, "**On the average 3,400 persons were kidnapped annually and brought to Dianga. Of these he was able to baptize some 2000 a year: he goes on to say that it was easier to convince these wretched beings than the residents in the Chittagong province, among whom the annual average of**

conversions was not more than 400."[২৬] তাঁর বিবরণে আরো জানা যায় যে, তাঁর পাঁচ বছরের চট্টগ্রাম অবস্থানকালে মগ-ফিরিঙ্গী দস্যুরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮,০০০ মানুষকে বন্দী করে দেয়াঙ ও অঙ্গারখালীতে নিয়ে আসে।[২৭] এক কথায় চট্টগ্রাম থেকে হুগলী পর্যন্ত কোন স্থানই তাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিলনা।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার নামক জনৈক ফরাসী চিকিৎসকের বিবরণেও মগ-ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর মতে,[২৮]

> বঙ্গের সীমান্ত আরাকান রাজ্যে (চট্টগ্রামে) পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।...এমন কোন অপকর্ম ছিলনা যা তারা করতে পারতনা। ... হত্যা, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিলনা। মোগল ভয়ে ভীত আরাকান রাজ যুদ্ধাদির প্রয়োজনে এসব ফিরিঙ্গী দস্যুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারা মগদের প্রশ্রয়ে বঙ্গের উপকূল অঞ্চলে অবাধে লুঠতরাজ ও অত্যাচার চালাতে লাগল — হাটবাজারের দিন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে লোজনদের ক্রীতদাস করার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত। উৎসব পার্বণের দিনেও এভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। ছোট বড় নির্বিশেষে মেয়েদের বন্দী করে অমানুষিক যন্ত্রণা দিত। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে অক্ষম হলে পুড়িয়ে দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দিত। নিম্ন বঙ্গের কত শত গ্রাম যে এভাবে লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচারে জনশূন্য করেছে তার হিসাব নাই। — এজন্য গঙ্গার মোহনায় যেসকল দ্বীপ পূর্বে জনাকীর্ণ ছিল, তা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং সে সকল স্থানে বাঘ, বন্যজন্তু ভিন্ন অন্য কোন অধিবাসী নাই।

মূলতঃ মগ-ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে বঙ্গের উপকূলীয় এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীর দুই কুলের জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। তাদের লুণ্ঠন ও অপহরণের ভয়ে এসকল এলাকায় রাতে বাতি পর্যন্ত জ্বালাত না।[২৯] অপরদিকে আরাকানে ক্রমশ জনবসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোগলদের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের ব্যবহার করে আরাকান রাজ কিরূপ উপকৃত হয়েছিল পাদ্রী ম্যানরিকের এক প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যানরিক বলেন,[৩০]

> পর্তুগীজ ও খ্রীষ্টানেরা এ পর্যন্ত আরাকান রাজ সরকারের জন্য কোন বিপদ কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাহারা মহাপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনার রাজ্য সীমা রক্ষা করিতেছে। শুধু তাহাই নয় সকলেই অবগত আছে তাহারা প্রত্যেক বৎসর নৌবহরসহ বাকলা, সোলেমানাবাদ (সেলিমবাদ সরকার), যশোহর, হিজলী ও উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া শত্রুর বলক্ষয় ও রাজ সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। আপনার পিতা মোগল, আসাম ও পেগুরাজ্যের সহিত বহুবিধ যুদ্ধে অসংখ্য জনক্ষয় করিয়া আরাকান রাজ্যকে প্রায় প্রজাশূন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রধানতঃ পর্তুগীজদের চেষ্টায় আপনি এদেশে আবার জনপূর্ণ দেখিতেছেন। পর্তুগীজরা সারা শহর ও গ্রাম একরকম মোগলরাজ্য হইতে উৎখাত করিয়া আপনার রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিয়াছে; এমনকি কোন কোন বৎসর বাংলাদেশ হইতে এগার হাজারের বেশি পরিবার বন্দী করিয়া আপনার রাজ্যে আনিয়াছে।

মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ ও দাসব্যবসা সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক

শিহাব-উদ-দীন তালিশের *ফতীয়া-ই-ইবরীয়া* গ্রন্থে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত এর বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ: [৩১]

> খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে একদল পর্তুগীজ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বকূলে আরাকানে আশ্রয় লয়, এবং আরাকানের মগরাজার এবং চাটগাঁর মগরাজ প্রতিনিধির অধীনে বাস করিতে থাকে। — কর্ণফুলী নদীর মুখে চাটগাঁ শহরের কাছে এই ফিরিঙ্গীদের পৃথক গ্রাম ছিল, নাম ফিরিঙ্গী বন্দর। আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গীগণ প্রতি বৎসর জলপথে বাংলায় ডাকাতি করিতে আসিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, দরিদ্র-ধনী, যাহাকে পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে পাতলা বেত চালাইয়া দিয়া বাঁধিয়া নৌকায় পাটাতনের নীচে ফেলিয়া লইয়া যাইত। যেমন খাঁচার মধ্যে মুরগীকে দানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি এদের জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাঁচা চাউল ফেলিয়া দেওয়া হইত। এ কষ্ট ও অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত; যে কয়টি 'শক্ত প্রাণ' লোক বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের চাষবাস ও অন্যান্য নীচ কাজের জন্য দাসভাবে রাখিত, অথবা ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিকদের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে (মাদ্রাজ ?) বিক্রয় করিত।
>
> এইরূপে ক্রমে মগ ও ফিরিঙ্গীগণের সংখ্যা ও সম্পদ বাড়িতে লাগিল আর বাঙ্গলা দিন দিন জনশূন্য ও উচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চাটগাঁ হইতে ঢাকা পর্যন্ত দস্যুদের যাতায়াতের পথে নদীর দুধারে একটিও বাড়ী রহিল না।
>
> সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি চাটগাঁয় ফিরিঙ্গীদের ১০০ দ্রুতগামী অস্ত্রপূর্ণ যুদ্ধপোত (নাম জলবা) ছিল। ফিরিঙ্গীরা তাঁহার চাকর এবং তাহাদের যথেষ্ট নৌকা ছিল বলিয়া, আরাকানের রাজা ইদানিং নিজের নৌকা বাঙ্গালায় পাঠাইতেন না; কেবল ফিরিঙ্গীদের দিয়া লুট করাইয়া তাহার অর্ধেক ভাগ লইতেন, ১৬৬৫ খৃ. শেষে যখন শায়েস্তা খাঁ চাটগাঁ জয় করিবার আগে ফিরিঙ্গীদের লোভ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া ঢাকায় আনিলেন, তখন প্রথম রাত্রের দরবারে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন : মগরাজ তোমাদের বাংলায় লুটতরাজের জন্য কি বেতন দিতেন ? তাহার উত্তর করিল 'মোগলরাজ্যে আমাদের বেতন ছিল। আমরা সমস্ত বাঙ্গলাকে আমাদের জাগীর বলিয়া মনে করিতাম, এবং বারো মাসে মহাসুখে আমাদের খাজনা (অর্থাৎ লুট) আদায় করিতাম। আমলা আমীন, জরীপ, জমাবন্দী, ওয়াশিল বাকীব ধার ধারিতাম না। মগরাজার সঙ্গে লুঠের আধাআধি ভাগ হইত; তাহার চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হিসাব পত্র আমাদের কাছে আছে।

বস্তুতঃ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলার উপকূলীয় এলাকায় মগ-ফিরিঙ্গীদের অব্যাহত দৌরাত্ম্য সমাজ জীবনে এক অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে, হিন্দু সমাজে, নারীদের অবস্থা করুণ পর্যায়ে উপনীত হয়। যে সকল স্ত্রীলোক কোন না কোন ভাবে মগ-ফিরিঙ্গীদের সংস্পর্শে আসত তারা সমাজে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করত। হিন্দু সমাজের এই নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেন, [৩২] 'যে সব স্ত্রীলোক পালাইবার কালে কোন প্রকারে ধৃত বা স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহারা কোন গতিকে উদ্ধার পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজ বর্জিত হইয়া থাকিত। তাহাদের স্বামী বা পিতা নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়া স্নেহের কোলে টানিয়া লইলেও, নির্দয় হিন্দুসমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি

কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাইত না।' দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখায়ও এরূপ অনেক মগ নিগৃহীত পরিবারের করুণ চিত্র পাওয়া যায়।[৩৩] মগ-ফিরিঙ্গী কর্তৃক নিগৃহীত ও নির্যাতিতদের কলঙ্ককে 'ফিরিঙ্গী বা মগো পরীবাদ' নামে অভিহিত করা হয়।

মগ-ফিরিঙ্গী স্মৃতি বিজড়িত এইসব করুণ কাহিনী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় জীবনের এক মর্মান্তিক ইতিহাস। ১৬৬৬ খৃ. শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ ওমেদ খানের নেতৃত্বে মোগল বাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ায় মগ-ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার স্তিমিত হয়ে পড়ে। তথাপি, চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা, যথা — আদিনাথ, কক্সবাজার, রামু, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে মগ-ফিরিঙ্গীদের বসতি এখনো তাদের দুর্বিষহ অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূত্র নির্দেশ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৬-৬০।

২. N.K. Bhattashali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, Cambridge, 1922, pp. 145-49.

৩. J.N. Sarkar(ed.), *History of Bengal*, Vol. II, Dhaka, 1972, p. 364.

৪. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রাম-আরাকান*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯, পৃ. ১৬।

৫. ১৩৩৮-৪০ খৃ. সোনারগাঁওয়ের সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করেন।

৬. A. P. Phayre, *History of Burma*, London, 1884, p. 78.

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, কলিকাতা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩০।

৮. J.N. Sarkar (ed.), *op. cit*, pp. 149-50.

৯. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল)*, ১ম খণ্ড, রাজশাহী, ১৯৯২, ২য় অধ্যায়।

১০. 'মঙ' হচ্ছে বর্মীদের ধর্মীয় উপাধী। *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬০।

১১. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) কোরেশী মাগন বিরচিত *চন্দ্রাবতী*, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭, পৃ. ৬।

১২. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কাজী দৌলত বিরচিত *সতীময়না* ও *লোরচন্দ্রাণী*; পৃ. ৫।

১৩. D.G.E. Hall, *History of South East Asia*, London, 1968, p. 388.

১৪. বিস্তারিত দেখুন, ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী, *প্রবাসী, (২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা)*, ভাদ্র, ১৩০৯, *পৃ. ১৯।*

১৫. J.J.A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta, 1919, p.47.

১৬. *Ibid*, pp. 26-27

১৭. *Ibid*, pp. 33-35

১৮. *Ibid*, pp. 37-35

১৯. উদাহরণস্বরূপ আরাকান রাজের সেনাপতি ফিলিপ ডি. ব্রিটো, শ্রীপুর অধিপতি কেদার রায়ের কার্ভালো ও প্রতাপাদিত্যের গোলান্দাজ সেনাপতি রুডা়র-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিত দেখুন, ফিরিঙ্গী দস্যু, *সাহিত্য*, ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৩৭৪।

২০. *Bengal Past and Present*, part- I, 1915, pp. 80-81.

২১. ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ দিয়াঙ্গে পর্তুগীজ বসতি ধ্বংস করে এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপ অধিপতি ফিরিঙ্গী প্রধান গঞ্জালেশের সঙ্গে আরাকান রাজের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে গঞ্জালেশকে সহায়তা করার জন্য গোয়ার পর্তুগীজ প্রতিনিধি কর্তৃক Don Francisco-র নেতৃত্বে ৫০টি যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত এক বিরাট বহর প্রেরণ করা হয়। আরাকানরাজ ডাচদের সহায়তায় ফিরিঙ্গীদের কঠোর হস্তে দমন করতঃ সন্দ্বীপ দখল করে নেয়। এর পর গঞ্জালেশের আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ফিরিঙ্গীদের অনেকে চট্টগ্রামে আরাকান রাজ্যের অধীনে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈনিক ও নাবিকের চাকুরী গ্রহণ করে।

বিস্তারিত দেখুন : *Bengal and Assam District Gazzetteers, Noakhali*, Allahabad, 1911, pp. 18-19.

২২. Mourice Collis, *The land of the great image being experiences of Freir Manrique in Arakan*, London, Faber and Faber, 1943, p 88.

২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১।

২৪. উক্ত মহিলার স্বামী ও পিতা উভয়েই এ ব্যাপারে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সম্রাট শাহজাহানকে নালিশ করেন, ফলে সম্রাট তাৎক্ষনিক হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নের জন্য সুবাদার কাশিম খাঁ জুযানীকে নির্দেশ দেন। অতঃপর ১৬৩২ খৃ. হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা হয়।

Luard and Hosten (tr.), *Travels of Fray Sebastien Manrique, 1629-1643*, Hakluyt Edition, Vol. II, 1927, pp. 316-321.

২৫. *Ibid.*

২৬. Maurice Collis, *Op. cit.* p. 91.

২৭. *Bengal Past and Present,* part II, 1916, p. 281.

২৮. Francois Bernier, *Travels of the Mughal Empire*, Bangabashi edition, pp. 156-57.

২৯. "The Feringhi Pirates of Chatgaon, 1665 A.D." *J.A.S.B*, 1907, pp.422-23.

৩০. ড: কালিকারঞ্জন কানুনগো, পাদ্রী ম্যানরিকের আরাকান যাত্রা, *পাঞ্চজন্য*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৩, পৃ. ১২০।

৩১. *প্রবাসী*, ৫ম ভাগ, নবম সংখ্যা, ১৩১২, পৃ. ৫৭১-৭৩।

৩২. শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৩২৯, পৃ. ১৮২।

৩৩. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালায় মঘ দৌরাত্ম্যের বিবরণ, *প্রবাসী* (চৈত্র), ১৩৫৩, পৃ. ৬০৭।

পাকিস্তানের প্রথম দশকে (১৯৪৭-৫৭) পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি

এ টি এম আতিকুর রহমান

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তানের জন্ম। প্রধানত ধর্মীয় ভাবাবেগের ফল হিসেবে নতুন দেশটির আত্মপ্রকাশ। নতুন দেশ পাকিস্তানের খণ্ডাংশ ছিল পূর্ববাংলা। এ অংশের বেশিরভাগ মানুষও ছিলেন ধর্মীয় আবেগাশ্রিত। পাকিস্তানের জন্মে তাদেরও অবদান কম ছিলনা। তাই পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি সহজে ধর্মের নামে নানামুখী প্রতিকূলতার ঘেরাটোপে অন্তরীণ থাকে দেশভাগের পর থেকে পরবর্তী একদশক। এজন্য পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন [১] হয়েও উক্ত দশকে নতুন দেশের রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু নানামুখী প্রতিকূলতা মোকাবেলায় সময়োপযোগী রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণে ব্যর্থতা অল্পসময়ে পার্টির রাজনীতিকে সীমিত ও বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলে। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম দশবে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতিতে একেবারেই প্রভাব রাখেনি বলা যাবেনা, বরং সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পবিবেশে ও পার্টি এ সময়ে যে অবদান রাখে তা বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। এ বিবেচনা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

২

১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি কার্যক্রম শুরু করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অংশ হিসেবে। দেশভাগের পরপর পার্টির অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলনের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মতে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ ছিল এ রকম: (১) দুই বাংলার জন্য থাকবে একটি প্রাদেশিক কমিটি। (২) প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার জন্য থাকবে আলাদা আলাদা কমিটি।[২] এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ববাংলা যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে অন্য দেশের কাজ পরিচালনা করতে পারেনা — এ বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ববাংলার জন্য ১৯৪৭ সালে খোকা রায়কে সম্পাদক করে একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[৩] এ কমিটি অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক কমিটি তথা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় পাকিস্তানের নতুন পরিবেশে স্বাধীনভাবে সময়োপযোগী কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হয়নি। দেশভাগের পরপর কয়েক বছর দুই বাংলার মধ্যে কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক সহযোগিতা-

যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।[৪] অবশ্য ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস পাকিস্তানে স্বতন্ত্র পার্টি গঠনের অনুমতি দেয়। এ কংগ্রেস উপলক্ষে কলকাতায় আগত পাকিস্তানের পার্টি সদস্যরা ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ দেশের বাইরে বসে গঠন করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি।[৫] একই দিনে পূর্ববাংলার পার্টি সদস্যরাও কলকাতায় আলাদাভাবে বসে গঠন করেন পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটি। এ কমিটিরও সম্পাদক নির্বাচিত হন খোকা রায়।[৬] তবে আলাদা কমিটি গঠন করেও পূর্ববাংলার কমিউনিস্টরা থাকেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নীতির অধীন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বি টি রণদিভের নেতৃত্বে জঙ্গী আন্দোলনের (সশস্ত্র সংগ্রামের) সপক্ষে যে মূল দলিল গৃহীত হয় সামান্য কিছু রদবদল করে পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তা গ্রহণ করে।[৭] তাই বাংলার প্রতিকূল পরিবেশেও এ দলিলকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টিকে অচিরেই জঙ্গী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

৩

১৯৪৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের কয়েক দিন পর ১১ মার্চ কমিউনিস্ট বিরোধী একদল গুণ্ডা ঢাকায় পার্টি অফিস এবং পার্টি নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্রফেডারেশনের অফিস তছনছ করে। এর কয়েকমাস পর ৩০ জুন ঢাকার করোনেশন পার্কে কমিউনিস্ট পার্টি এক জনসভা আহ্বান করলে তাতেও হামলা চালানো হয়। নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এ হামলা চালায়। এতে সভার কাজ শেষ হতে পারেনি। এ পরিস্থিতিতেই পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ না হয়েও কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য রাজনীতির পথ পরিহার করে রণদিভের দলিল অনুসরণে গ্রহণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন। মণি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের হাজং বা টংক আন্দোলন, ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ এবং সিলেটের সানেশ্বর এলাকায় নানকার আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এ নতুন লাইনের ব্যাপক ও সংগঠিত ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায়।[৮] পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির এরকম ভূমিকা ১৯৪৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নতুন লাইনের জন্য পূর্ববাংলা মোটেও উপযোগী ছিলনা। অধিকন্তু সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার জন্যও পার্টির ছিলনা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। এর ফলে প্রাথমিকভাবে কিছু সফলতা আসলেও সামগ্রিক বিচারে কোন সাফল্য আসেনি, বরং অপরিকল্পিত সশস্ত্র আন্দোলনের কর্মসূচি বিভিন্নাঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে। জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।[৯] নতুন লাইনে সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়াও 'দালাল হালাল করো' নীতি কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করেছিল। এ নীতি অনুযায়ী পূর্ববাংলার বিভিন্নাঞ্চলে কমিউনিস্ট বিরোধী জোতদার-সরকার সমর্থকদের হত্যা করা হয়েছিল।[১০] ফলে পূর্ববাংলায় নুরুল আমিন সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্যাপক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে তিন হাজার পার্টি সদস্যসহ হাজার হাজার কৃষক সমর্থককে জেলে অন্তরীণ করে তাঁদের প্রতি করা হয় চরম নির্যাতন। ১০০ জন পার্টি সদস্য এ সময় জেলে নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন।[১১] ফলে পার্টিতে সৃষ্টি হয় চরম বিপর্যয়। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিপর্যয় এড়ানোর প্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। এরকম বিপর্যয়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির পার্টিগত কাঠামো কোনমতে টিকে থাকলেও সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে

পড়ে।[১২] সম্ভবত এ স্থবিরতা কাটানোর লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির কমিটি ভেঙে দিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় ও সকল স্তরের কমিটিতে পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় শেখ রওশন আলীকে সম্পাদক করে তিনজনের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে রওশন আলী গ্রেফতার হয়ে গেলে আলতাব আলী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৩] কিন্তু এ কমিটি সাংগঠনিক স্থবিরতা কাটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।[১৪] অবশ্য সে সুযোগও ছিলনা। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্টদের জড়িয়ে সরকার সৃষ্ট ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও এপ্রিলে রাজশাহী জেলের 'খাপড়া ওয়ার্ডে' কমিউনিস্ট বন্দীদের গুলি করে হত্যা পার্টির জন্য আরও বৈরী পরিবেশ তৈরি করে। দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। এঁদের অনেকে ছিলেন কমিউনিস্ট। এতে পার্টি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। 'খাপড়া ওয়ার্ডে'র ঘটনার পর সরকার পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[১৫] ফলে এ পর্যায়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতাকর্মীর গোপন প্রয়াসের মধ্যেই পার্টির কাজ-কর্ম সীমিত হয়ে পড়ে। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে এ বছর নেপাল নাগকে সম্পাদক করে কমিউনিস্ট পার্টি একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে।[১৬]

৪

ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি কমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসি'তে প্রকাশিত সম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বি টি রণদিভে সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন।[১৭] ভারতের মত পূর্ববাংলার কমিউনিস্টগণও এ সময় তাঁদের অনুসৃত লাইন পরিত্যাগ করার জন্য পর্যালোচনা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক গোপন সম্মেলন। এ সম্মেলনে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে 'মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি' বলে স্বীকার করা হয় এবং নতুন মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবর্তিত অবস্থায় এ সম্মেলনেই মণি সিংহকে সম্পাদক করে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। পরে এ কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করে। এতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে মূল শত্রু ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয় এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তকে সংগঠিত করে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রামের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।[১৮] এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলায় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারের লক্ষ্যে নয়া কৌশল নেয়। এ কৌশলের অংশ হিসেবে পার্টির সদস্য, সমর্থক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে যুবলীগ গঠিত হয়।[১৯] সংগঠনটি গঠিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির জনবিচ্ছিন্নতা ও কার্যক্রমে স্থবিরতার কিছুটা অবসান ঘটে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবনা ও কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করেন। অতি দ্রুত এ সংগঠনের কলেবর বৃদ্ধি পায়। এক বছরের মধ্যে সংগঠনটি ছাত্র ও যুবসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে ব্যাপক গণসংগঠনে পরিণত হয়।[২০] ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি একটি পত্রিকা বের করারও সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের পরপর খোকা রায় ও বারীন দত্তের

সম্পাদনায় বের হয় *মার্কসবাদী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা।[২১]

পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নয়াকৌশল অবলম্বন ও কার্যক্রম গ্রহণের ফল হয়েছিল ইতিবাচক। এতে এ অঞ্চলে বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণ ও জাতীয় সংগ্রামের প্রধান সোপান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মগোপনে থেকে পার্টি অংশ নেয়। আন্দোলনে সফল ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করায় পার্টি বাঙালির জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম হয়।[২২] পার্টি প্রভাবিত যুবলীগের নেতা-কর্মীগণ প্রধানত ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। এ সময় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনটি সামন্ত বিরোধী এক নতুন বাতাবরণ তৈরির প্রয়াস চালায়। [২৩] আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ববাংলায় ধর্মাবেগ নির্ভর সামাজিক বাতাবরণ অনেক শিথিল হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতাসীনদের ধর্মের নামে এক পাকিস্তানি জাতি বিনির্মাণের প্রয়াস ভেস্তে যায়। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কার্যক্রম চালানোও অনেক সহজ হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়। এ সময় প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবলীগ বাম প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কর্মসূচি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আন্দোলনের পটভূমিতে যে সুযোগ সৃষ্টি হয় কমিউনিস্ট পার্টি তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। এ সময় গোপন কাজের সঙ্গে প্রকাশ্য কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য পার্টি গঠন করে ৪ সদস্যের একটি প্রকাশ্য টিম। জনগণের সামনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পার্টির বক্তব্য তুলে ধরাই ছিল এ টিমের প্রধান কাজ।[২৪]

৫

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের পরিধি এবং গ্রহণযোগ্যতা যখন বৃদ্ধি পায় এ রকম সময়ে পার্টির গোপন অংশ আওয়ামী মুসলিম লীগের ভেতরে থেকে কাজ করার এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি তখন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক থাকায় কমিউনিস্টদের অনেকেই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি।[২৫] এর সপক্ষে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যৌক্তিকতা খুঁজেন কমিনফর্মের মুখপত্রের বক্তব্যে। ১৯৫১ সালে কমিনফর্মের মুখপত্রে আওয়ামী লীগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতির কারণে সংগঠনটির প্রশংসা করা হয়েছিল। এ প্রশংসাকে কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগে যোগদানের ইঙ্গিত হিসেবে মনে করেন। হাজী মোহম্মদ দানেশসহ একদল কমিউনিস্টআওয়ামী লীগে যোগদানের বিরোধিতা করে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারিতে গণতন্ত্রী দল গঠন করলেও মূল পার্টি সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[২৬] এ সিদ্ধান্তে পার্টির শুধু ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ হয়নি, সাংগঠনিক ক্ষতিও সাধিত হয়। এ সময় যুবলীগের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে যায়। পরে সংগঠনটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[২৭]

১৯৫৩ সাল থেকে পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্ন সামনে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় নির্বাচন-দাবির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করে। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যমতের উপর সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি জোর দেয়।[২৮] পরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনে এবং ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করতে পার্টি ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলায় সরকার গঠন করার এক পর্যায়ে কামডানস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য কাজকর্ম শুরু করে। ১৯৫৫ সালে গভর্নরের শাসন চালু হলে আবার নিষিদ্ধ হয় কমিউনিস্ট পার্টি ।[২৯] এ সময় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রী দল ভেঙে দেয়ার এবং একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। একই সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে পার্টির নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় দলটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র স্পষ্ট হয় এবং এতে দলটিতে কমিউনিস্টদের যোগদানের পথ প্রসারিত হয়। [৩০] তবে এ পর্যায়ে ব্যাপকহারে কমিউনিস্টগণ আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ায় এবং দ্বিতীয়বারের মত পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় এর কার্যক্রমে পুনরায় স্থবিরতা দেখা দেয়।

৬

পাকিস্তানের দুই অংশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার যোগাযোগ কখনো সুদৃঢ় ছিলনা। ১৯৫৫ সালে যোগসূত্র একেবারেই ছিন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য এ সময় পূর্ববাংলায় কমিউনিস্টরা পৃথক ও স্বাধীন পার্টি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে 'পূর্বপাকিস্তান' প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠন করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির 'পূর্বপাকিস্তান' কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় গোপনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। একই সঙ্গে ফরিদপুরের প্রতিনিধি কুমার মৈত্রের 'বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের' গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা হয়। [৩১] কংগ্রেসে ১৯৫৬ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্তালিন বিরোধী শান্তিপূর্ণ বিপ্লবী তত্ত্বের অজুহাতে পূর্ববাংলার বেশিরভাগ প্রতিনিধি শ্রেণীসংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ না করে আওয়ামী লীগের মত গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার নীতিকেও সমর্থন করেন।[৩২]

পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের নৈকট্য-প্রত্যাশী হলেও আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা অনুরূপ ছিলনা। যে কারণে অল্প দিনের মধ্যেই সংগঠনটির সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ তৈরি হয়। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বন করে 'সিয়েটো' ও 'সেন্টু' সামরিক চুক্তি সমর্থন করলে এবং পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনুরূপ মনোভাব প্রদর্শন করলে এ বিরোধ স্পষ্ট হয়। এর পরিণতিতে ১৯৫৭ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ ভেঙে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামক নতুন দল।[৩৩] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ সালের পুরো সময় প্রধানত 'ন্যাপ'-এর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিকাশে কমিউনিস্ট পার্টি অবদান রাখে।

৭

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শুরুতেই পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ভিত নিজেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশে কাজ করার জন্য পার্টির ছিলনা কোন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। সময়োপযোগী সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা পার্টিতে বিবেচিত হয়নি। সাংগঠনিক এলাকা পাকিস্তানে হলেও পার্টি নীতিতে পরিবর্তন আসার পর যুবলীগ গঠন, ভাষাভিত্তিক গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ, ছাত্র

ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ নিয়ে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গণসম্পৃক্তি যথেষ্ঠ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের উপর জোর দিতে গিয়ে পার্টি প্রভাবিত বিভিন্ন শ্রেণী ও গণসংগঠন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হয়ে প্রথমে আওয়ামী লীগ ও পরে ন্যাপ-এর মধ্যে কাজ করার কৌশল নেয়ায় এ গণসম্পৃক্তি তেমন ইতিবাচক ফল দেয়নি।

রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে একাধিকবার। ১৯৪৮ সালে গৃহীত রণদিভের কর্মসূচিকে 'মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি' বলে পরবর্তী সময়ে পার্টি স্বীকার করে। এ বিচ্যুতি-ভীতি থেকে সম্ভবত ১৯৫৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে পার্টি কুমার মৈত্রের 'বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম'-এর প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হয়। অথচ পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে এটিই ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি এবং তা যথাযথ ও সময়োপযোগী। তাই প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পূর্ববাংলার পরবর্তী রাজনীতি কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে আবর্তিত হতো বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের স্থলে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টিই হতো বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে নির্ণায়ক শক্তি। তবে তা না হলেও এ বিষয়টি পরিষ্কার যে পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ, বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ স্বাধিকার ও মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি তৈরিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক।

সূত্রনির্দেশ

১. পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি শুধু একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিলনা, একই সঙ্গে পার্টি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। নতুন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক সভা-সমাবেশে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিরও প্রতিনিধিত্ব থাকতো। সূত্র: নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯।

২. সুধাংশু দাশগুপ্ত, *আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে*, পত্রভারতী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯২।

৩. নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৪. অতীশ দাশগুপ্ত, 'বাংলার কৃষক আন্দোলনে হাজংদের অবদান' অনিল বিশ্বাস(সম্পা:), *আন্দোলনের অনালোচিত অধ্যায়*, গণশক্তি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫।

৫. জগলুল আলম, *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ২৭।

৬. নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬,৮৭।

৭. অতীশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৮. ফাইজুস সালেহীন, *বাম রাজনীতির ৬২ বছর*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪।

৯. জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

১০. শরীফ আতিক-উজ-জামান (গ্রন্থিত), কৃষক নেতা *নূরজালালের স্মৃতিকথা*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯। স্মৃতিকথায় নূরজালাল উল্লেখ করেছেন, তাঁর বড়ভাই নড়াইলের নূরুল হুদা দালালের তালিকায় এক নম্বরে ছিলেন। নূরুল হুদাকে ধরে নিয়ে কমিউনিস্টদের যে দল হত্যা করে তিনি নিজেও সে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১১. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন*, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৩।

১২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (তৃতীয় খণ্ড), বইঘর, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১৫।

১৩. নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

১৪. এ কমিটি গঠন নিয়ে পার্টির বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের অভিযোগ ছিল।

সূত্র: জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
১৫. জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
১৬. বারীন দত্ত, *সংগ্রামমুখর দিনগুলি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬৭।
১৭. সুধাংশু দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮,৯৯।
১৮. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-৬০।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-৭১।
২০. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সমস্যা*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ২১।
২১. বারীন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
২২. নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯,২০।
২৩. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সমস্যা*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ. ২১।
২৪. নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৫।
২৫. বারীন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।
২৬. শাহ আহমদ রেজা, *ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম*, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৩।
২৭. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।
২৮. বারীন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।
২৯. বারীন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯,৭০।
৩০. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯।
৩২. জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫,২৬।
৩৩. বারীন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

ভাষা আন্দোলন : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাববীজ

মাহবুবুল হক

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমানের অবস্থা ছিল এক বঞ্চিত সম্প্রদায়ের।[১] ফলে উনিশ শতকে ইসলামি পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন যে কেবল ক্ষমতা ও মর্যাদা হারানো অভিজাত মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নয়, তাদের নেতৃত্বে সাধারণ মুসলমানদের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের প্রথম চার দশকে বঙ্গভঙ্গ সহ নানা রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদী চেতনায় ধর্মাচ্ছন্নতা দেখা দেয়।[২] ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকলে মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যহত হবে এবং তারা শাসন-শোষণের শিকার হয়ে বঞ্চিত সম্প্রদায় হয়েই থাকবে। এই ধারণা থেকেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি ব্যাপক মুসলমানদের সমর্থন লাভ করে। এবং ফলত ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত দ্বিজাতিতত্ত্বের[৩] ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবিভক্ত বাংলা ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ; পরিচিত হয় পূর্ব পাকিস্তান নামে।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় জাতীয়তাকে ভিত্তি করে যে পাকিস্তানের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা ভেঙে যায়। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচনা করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, অভিন্ন ধর্ম হওয়াটাই এক জাতি হওয়ার শর্ত নয়। এই বাস্তবতার স্ফুরণে অণুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে ভাষা আন্দোলন।

পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় তখন এই আশা পোষণ করেছিল যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু তা যে অলীক প্রত্যাশা ও মোহাচ্ছন্ন স্বপ্ন-কল্পনা ছিল তার লক্ষণ অচিরেই প্রকাশ পেতে শুরু করে।

পূর্ব বাংলায় ঔপনিবেশিক ধরনের শাসন-শোষণের জাল বিস্তারের জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে কিছুটা সময় লাগলেও বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেতে মোটেও দেরি হয় নি।

কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের সঙ্গে পূর্ব বাংলার যে কেবল হাজার মাইলের ব্যবধান ছিল তা নয়, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যিক ব্যবধানও ছিল দুস্তর। তদানীন্তন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ পূর্ব বাংলার হলেও নতুন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়।

পূর্ববাংলার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল প্রথমেই একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন যখন দেখা গেল, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে কব্জা করল পাকিস্তানি অবাঙালি নেতারা এবং ভারত থেকে আগত মোহাজেররা। প্রথম মন্ত্রী সভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব হল একেবারেই ক্ষীণ। মন্ত্রী সভায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) কিংবা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি-র (১৮৯২-১৯৬৩) মতো বড়ো মাপের নেতাদের ঠাঁই তো হলই না বরং রাজনৈতিক নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হল খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) প্রমুখের মতো সামন্ত-বুর্জোয়ার হাতে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম ধর্মভাইদের সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের সন্দেহের প্রথম বীজ বোনা হয়ে গেল তখনই। তাদের অনেকেই এটা বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তানের জন্মের ভেতর দিয়ে কেবল শাসক বদল হয়েছে। সাধারণভাবে বাঙালি মুসলমান আগের মতোই থেকে গেছে বঞ্চিত সম্প্রদায়।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সন্দেহ আরও প্রখর হল যখন দেখা গেল হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলায় যেসব প্রশাসনিক পদ খালি হয়েছিল সেগুলোতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগ করা হল অবাঙালি মুসলমানদের।

এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি শাসনামলের শুরুতেই উদীয়মান বাঙালি নেতৃত্বের আশাভঙ্গ ঘটল। যদিও সাধারণ বাঙালি মুসলমান তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ছিলেন মোহাচ্ছন্ন এবং তাদের আনুগত্যও ছিল নিঃসংশয়।

বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের সাময়িক আচ্ছন্নতার কুয়াশা কাটতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগে নি। পাকিস্তানের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালির মাতৃভাষার ব্যাপারটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ালে এই পরিবর্তন ঘটে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিরূপ অবস্থান নিয়েছিল প্রকাশ্যে। পাকিস্তানে প্রথম ছাপা লেফাফা, পোস্টকার্ড, ডাকটিকেট সহ বিভিন্ন নথিপত্র মুদ্রণে সচেতনভাবে বাংলা ভাষা বর্জন করে কেবল ইংরেজি ও উর্দু ভাষা ব্যবহার করা হয়। এতে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে প্রতিবাদ ওঠে। সে প্রতিবাদ প্রথম সংহত রূপ নেয় ১৯৪৭-এর নভেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে। ডিসেম্বরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিবাদ আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ নিতে থাকে।

পাকিস্তানের গণপরিষদের কার্যক্রমে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সংগঠিত প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যে কিছুটা ফাটল ধরে। বাংলা ভাষার পক্ষে সংগঠিতভাবে দাবি উঠতে থাকে এবং অবস্থা এমন হয় যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক

সমাবেশে বাংলা ভাষা বিরোধী অবস্থান নিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার কথা বললে (২৪ মার্চ ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ তার মুখের ওপরই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রতিবাদী বিক্ষোভে সামিল হয়।

পাকিস্তানের কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও শতকরা ৫৪ ভাগের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর তথা সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্রের স্বার্থরক্ষার সুদূরপ্রসারী নীল নকশারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জাতি হিসেবে বাঙালিকে পশ্চাদপদ ও পঙ্গু করে রাখা এবং পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক ধরনের সেই শোষণের স্বরূপ তখনও তত স্পষ্ট বা প্রকট না হলেও পূর্ব বাংলার ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর স্পষ্ট আঘাত হানা শুরু হয়। আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা, সার্বজনীন উর্দু শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ ইত্যাদি ছিল শাসকগোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কৌশল মাত্র। এসবেরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। সচেতন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এ সময়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি মুসলমানের যথার্থ আত্মপরিচয়ের সপক্ষে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬১) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন: 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী।'[৪]

ভাষা আন্দোলন ক্রমব্যাপ্তির পেছনে কেবল যে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্বই একমাত্র কারণ ছিল তা নয়, উর্দু ভাষা চালু হলে সরকারি চাকরিতে বাংলা ভাষাভাষীর নিয়োগ লাভের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে — এমন আশংকাও ভাষা আন্দোলনে তারুণ্যের সক্রিয়তার পেছনে কাজ করেছিল।

ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে ১৯৫২ সালে। সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটির আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সরকার দমন নীতির পথ বেছে নেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর সরকার গুলি চালালে সালাম, বরকত, ও জব্বার সহ অনেকে শহীদ হন। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে সারা পূর্ববাংলায় এত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরবর্তীকালে (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়।[৫] এভাবেই ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক মূল ধারায় বাঙালি রাজনীতিবিদদের প্রতি উপেক্ষার নীতি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তার সাংগঠনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী-র (১৮৮০-১৯৭৬) নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে (২৩ জুন ১৯৪৯)। বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে দলটি ছিল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে তৎপর। ৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে খুব অল্প সময়েই আওয়ামী মুসলিম লীগ সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিরোধিতা এবং তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতি-চেতনা বিস্তারের

লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গণসংগঠন হিসেবে যুবলীগ নামে যে সংগঠন ভাষা আন্দোলনের সময়ে জন্ম নিয়েছিল (২৭ মার্চ ১৯৫১) তা ভাষা আন্দোলনে নিয়েছিল সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা।[৬]

মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার পরিবর্তে যে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার বিকাশ ঘটে তারই আলোয় পূর্ব বাংলায় জন্ম নেয় অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (২৬ এপ্রিল ১৯৫২)। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আওয়ামী লীগ তার নাম থেকে সম্প্রদায়গত পরিচয়-চিহ্ন 'মুসলিম' কথাটি বর্জন করে এবং দলটির নতুন নামকরণ হয় আওয়ামী লীগ (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)। অনুরূপভাবে মুসলিম ছাত্র লীগও (প্রতিষ্ঠাকাল ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮)-এর নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেয়।

বস্তুত, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নীতি-অবস্থান কেবল যে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছে তা নয়, বাঙালি মুসলমানের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলন-সংগ্রামের দুয়ারও খুলে গিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি (প্রতিষ্ঠাকাল ৬ মার্চ ১৯৪৮) ও তার ছাত্র, যুব, ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ঘনিষ্ঠভাবে সক্রিয় থাকায় পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটে এবং ক্রমেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের চেতনার আর একটি ফসল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন — ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (প্রতিষ্ঠাকাল ২৭ জুলাই ১৯৫৭)।

এই সব সংগঠন ৫০ ও ৬০-এর দশকে পাকিস্তানি সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসন-শোষণের স্বরূপ উদঘাটনে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকার আদায় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলনে অগ্রসরমান ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে তা ক্রমেই সংহত ও বিকশিত হতে থাকে। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত ধারণাকে ছাপিয়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার জাতীয় মানসে একুশ হয়ে ওঠে প্রতীকী তাৎপর্যবাহী। সৃষ্টিধর্মী লেখকদের তা নাড়া দিয়েছিল ব্যাপকভাবে।[৭] এরপর প্রতি বছরই একুশকে ঘিরে রচিত হয় অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটক। রাস্তায় রাস্তায় আঁকা হয় অজস্র আল্পনা, সারা দেশে গড়ে ওঠে অসংখ্য শহীদ মিনার। একুশ মহিমা পায় চলচ্চিত্রে, ভাস্কর্যে। সব মিলিয়ে একুশের মাধ্যমে স্বাধিকারের চেতনা পায় অনন্য অভিব্যক্তি।

শুধু তাই নয়, একুশ হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার। সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে একুশ হয়ে ওঠে সংগ্রামী উজ্জীবনী প্রেরণা-বিন্দু, হয়ে অবিনাশী চেতনা : 'একুশ মানে মাথা নত না করা।'[৮]

ভাষা আন্দোলনের সময়ে ও পরে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে একাধিক

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন। উল্লেখযোগ্য হলো : ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮), চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৬-১৯ মার্চ ১৯৫১), কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (২২-২৪ আগস্ট ১৯৫২) এবং টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন (৯-১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭।

২১ শে ফেব্রুয়ারি কেবল শোকের দিন ছিল না, তা ছিল অধিকার ও লক্ষ্য অর্জনের শপথের দিন। তাই দেখা গেছে, প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সংগ্রামের শপথে বলীয়ান হয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণ, বিশেষ করে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। একুশের সংকলন প্রকাশ, প্রভাতফেরী, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের আন্দোলন, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচনাকে সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে উপস্থাপনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো — সব ক্ষেত্রেই অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশে একুশ হয়েছে সংগ্রামের প্রেরণা ও চালিকাশক্তি। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেমন জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জীবন ও সম্প্রসার ঘটেছে তেমনি সামরিক স্বৈরাচারী শাসন অবসানে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ববাংলার সংগ্রামী মানুষ একুশের পথ ধরেই চলেছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নিয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে নির্বাচনে, জয়লাভ করে। কিন্তু দেশ পরিচালনার অধিকার থেকে সুকৌশলে তাদের কেবল বঞ্চিত করা হয় নি, 'ইসলামি শাসনতন্ত্র' নামে একটি অবৈজ্ঞানিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয়। বাঙালির ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী চেতনা রোখার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশকে ঠেলে দেওয়া হয় সামরিক শাসনের বুটের তলায় (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)। সামরিক স্বৈরশাসনের সুযোগ নিয়ে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করে সমৃদ্ধ ও উন্নত করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণকে স্তব্ধ করা যায় নি। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সামরিক শাসনের মধ্যেও প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা ভাবে চলেছে আন্দোলন ও সংগ্রাম।

১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, এবং ১৯৬৯-র এগারো দফা আন্দোলন সহ সব আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন কাজ করেছে চেতনার অগ্নিমশাল হিসেবে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে অগ্নিমশাল জ্বেলেছে সে মশালের আলোর পথ চলে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সমগ্র পূর্ববাংলা এক স্বরে উচ্চারণ করেছে অভিন্ন শ্লোগান : 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রীস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান — আমরা সবাই বাঙালী।'

স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ববাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯১২-১৯৭৫)। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর সংগ্রামী মনোজগৎ, তিনি হয়ে উঠেছিলেন অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ছাড়াও আরও ছিল মওলানা ভাসানী ও মোজাফ্‌ফর আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত দুই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং কমরেড মণি সিংহের (১৯০১-১৯৮৪) নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী ভূমিকা ও অবদান। সেই সঙ্গে ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয়

গ্রুপের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা। ভাষা আন্দোলনের চেতনাতেই এসব দল ও গণ সংগঠনের জন্ম বা প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটেছিল এবং তাদের ভূমিকার ফলেই দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের মোহাচ্ছন্নতা কেবল কাটে নি, মুক্তিযুদ্ধে তাদের সক্রিয় ও সর্বাত্মক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। ফলে ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের চেতনা সেদিক থেকে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাববীজ।

সূত্র নির্দেশ

১. ঔপনিবেশিক পরিবেশে বাঙালি মুসলমানকে প্রান্তিকীকৃত (marginalised) সম্প্রদায় হিসেবেও গণ্য করেছেন কেউ কেউ। দ্র. আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাঙালী জাতিয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি', *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, (সিরাজুল ইসলাম সম্পা.), ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৩৯।

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. Abdul Hamid, *Muslim Separatism in India : A Brief Survey,* Lahore, 1967; Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslim 1871-1906 :A Quest for Identity*, Delhi, 1981.

৩. 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বে হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই সম্প্রদায়কে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে না দেখে তিনি পৃথক জাতি হিসেবে দেখেছেন। তার ভাষায় : 'We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or text of a nation . . . We have our own distinctive outlook on life and of life.' দ্র. 'Jinnah to Gandhi', 17 September 1944, *Jinnah Gandhi Talks*, Delhi, 1945 (second impression), p.56.

৪. উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৭৯-১৮০।

৫. ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাসের জন্য দ্র. আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, ঢাকা ১৯৭৬; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৭০; বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা ১৯৮৬; রফিকুল ইসলাম, *শহীদ মিনার*, ঢাকা, ১৯৮৬; হায়াৎ মামুদ, *অমর একুশে*, ঢাকা, ১৯৮৬।

৬. Talukdar Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka, 1976, p. 7.

৭. আনিসুজ্জামান, 'স্বরূপের সন্ধানে', *স্বরূপের সন্ধানে*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১০৪।

৮. *একুশ মানে মাথা নত না করা* — কথাসাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আবুল ফজলের লেখা একটি গ্রন্থের শিরোনাম।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-১৯৭৫)

মর্তুজা খালেদ

সদ্য স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া সরকার বিরোধী প্রথম বিরোধী দল ছিল এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ।[১] জন্ম মাত্র জাসদ হয়ে উঠেছিল তারুণ্য, উদ্দামতা ও প্রগতিশীলতার প্রতীক। এ দলে যোগ দিয়েছিল বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী অজস্র তরুণ। ব্যাপক সাড়া জাগান এ দল জন্ম থেকেই হটকারী রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করে ও সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। জাসদ রাজনীতির সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ জীবন বিসর্জন দেয়। সত্তর দশকের শেষে এ দলের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। আশির দশকে কর্মীদের দলত্যাগের ফলে জাসদ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে পড়ে ও অব্যাহত ভাঙনের ফলে বিভক্ত থেকে বিভক্ততর হয়ে যায়। বাংলাদেশ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিল জাসদের জন্য গৌরবোজ্জ্বল এক সময়। তাই এ প্রবন্ধে জাসদের উৎপত্তি, বিকাশ ও ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কর্মকাণ্ড সমূহ আলোচিত হয়েছে।

জাসদের উৎপত্তি

জাসদের উৎপত্তি ঘটে ছাত্র রাজনীতি থেকে। ১৯৭২ সালের ৩১ শে অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশ আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘটে। তবে এই দল সৃষ্টির বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন ছাত্র লীগের একটি অংশ বাম চিন্তা ভাবনায় পুষ্ট ছিল। যারা মনে করতেন বুর্জোয়া রাজনীতি এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশে যথার্থ সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব নয় এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। ছাত্র লীগের এই অংশের নেতা ছিলেন সিরাজুল আলম খান। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরলে ছাত্র লীগের এ অংশটি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পলিসির বিরোধিতা করতে থাকে। এদের লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবের না জাতীয়তাবাদী না সমাজতান্ত্রিক নীতি থেকে সরে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি নতুন ধারা সৃষ্টি

করা।[২] ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন ছাত্রলীগ ভেঙে নতুন একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই সময় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন ছাত্র নেতা শাজাহান সিরাজ এবং আ স ম আব্দুল রবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি অংশ পৃথকভাবে সম্মেলনের আয়োজন করে। আরো পরবর্তীতে জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রগতিশীল সব নেতা কর্মীরা ছাত্র লীগের এ অংশের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। এদের সঙ্গে যোগদেন সেনাবাহিনীর কিছু অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা।[৩] ১৯৭২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস উপলক্ষ্যে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের এক সমাবেশে বিদ্রোহী ছাত্রলীগ নেতা আসম আব্দুর রব ঘোষণা করেন, 'প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগের বিকল্প শক্তি সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।'[৪] বস্তুত এটাই ছিল জাসদ সৃষ্টির জন্য প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা।

এরপর ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে আ স ম আবদুর রব ও মেজর জলিলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম ঘোষিত হয়।[৫] জাসদ জন্মলাভের পর তার প্রথম ঘোষণাপত্রে বলে,

> বাঙালী জাতি প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তির অধিকারী, কিন্তু সমগ্র জাতির সে বিপ্লবী চেতনা আজ প্রায় সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত স্তব্ধ। মুজিব সরকার রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিচালনায় যে চরম অদক্ষতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে বাঙালী জাতি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। — শোষক ও শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বই হলো প্রধান শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং এর অবসান না হওয়া পর্যন্ত শোষণ অব্যাহত থাকবে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য, শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে সহায়ক শক্তি হিসাবে রাজনৈতিক সংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন তা উপলব্ধি করেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জন্ম লাভ করেছে এবং তা দেশের লাখ লাখ মানুষের অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে।[৬]

এছাড়া জাসদ তার ঘোষণাপত্রে ৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, ১. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম, ২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সর্বপ্রকার সহায়তা দান, ৩. সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করা, ৪. উপজাতিয়দের অধিকার সংরক্ষণ করা, ৫. সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভেঙে দেওয়া, মেহনতি জনতার ঐক্য গড়ে তোলা, ৬. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, বাংলাদেশের উপর হুমকি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাহানিকর গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তিসমূহ বাতিল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম; বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীনসহ যে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, ৭. বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা দান; ৮. সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমভাবে সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করা।[৭]

এভাবে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে জাসদের অভ্যুদয় দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সূচনা ঘটায়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মওদুদ আহমদের ভাষায়, 'এ সময় আওয়ামী লীগের যুবক কর্মীদের একটি বিরাট অংশ দলের কার্যকলাপে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। দেশে মনের মতো সংগঠন না থাকাতে নতুন এই দল তাদের বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। দলটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটাতে সক্ষম হয়।'[৮]

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কার্যক্রম ১৯৭২-৭৫

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাংবিধানিক ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী জামায়েতি ইসলাম ও মুসলিম লীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠন সমূহের প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী যে কোন সংগঠনকে এই মৌলবাদী দল সমূহের সমর্থন করা ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না।[৯] কারণ সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় প্রকাশ্যে কোন সাম্প্রদায়িক দল গঠনের কোন সুযোগ ছিল না। তদুপরি কোন সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করতে গেলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে স্থান নেওয়া বাম ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে সঙ্গে পাওয়া যেত না। তাই "ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেই সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশে 'সমাজতন্ত্রের' স্লোগান ছিল অপরিহার্য।"[১০]

জাসদ গঠিত হবার পর পরই সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলে। বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে জাসদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এ দলের সমাজতান্ত্রিক নীতি আদর্শের জন্য। হাজার হাজার তরুণ এসে জাসদে নাম লেখাতে থাকে। সব বিষয়ে আওয়ামী লীগের বিরোধিতাই হয়ে দাঁড়ায় জাসদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে শুরুতেই জাসদ কর্মীরা আওয়ামী লীগের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জাসদ ও তার অঙ্গ ছাত্রলীগের মিটিং ও মিছিলে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনে জাসদ দেশব্যাপী জাতীয় সংসদের ২৭৩ টি আসনে তাদের প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করে।

নির্বাচন-পূর্ব ইশতেহারে জাসদ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ঘোষণা করে। এতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা থেকে সরে গিয়ে সারাদেশে স্বৈরশাসন কায়েম করেছে এবং জনগণের গণতন্ত্রের পরিবর্তে চালু করেছে দলীয় স্বৈরতন্ত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ছিল পাকিস্তানি স্বৈরা শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি অর্জন করে শোষণহীন সমাজ কায়েম করা এবং একমাত্র একটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই দেশে শোষণহীন সমাজ কায়েম করা সম্ভব। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে ফেলেছে, অথচ সমাজের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে অর্থ ও ক্ষমতা। একদিকে যেমন নানারকম কালাকানুন জারী করে মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রক্ষী-বাহিনীর নির্যাতন, গুম, হত্যা চরমে উঠেছে। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকার তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ইশতেহারে জাসদ দাবী করে যে জনগণের জন্য এখন প্রয়োজন আওয়ামী লীগের বিকল্প

সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সরকার এবং জনগণের মঙ্গল আনতে পারে এমন একটি বিপ্লবী কর্মসূচী যা শুধুমাত্র জাসদ এবং তার প্রতিশ্রুতি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।[১১] এভাবে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে বিরোধী দল হিসাবে রাজনীতিতে অভ্যুদয় ঘটে জাসদের।

১৯৭৩ সালের এই নির্বাচনে জাসদ প্রার্থী আবদুস সাত্তার টাঙ্গাইল আসন থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে রাজশাহী-১১ আসন থেকে উপনির্বাচনে জাসদ প্রার্থী মঈনুদ্দীন আহমেদ মানিক নির্বাচিত হন। নির্বাচনে জাসদ দেশব্যাপী ২৩৭ টি আসনে ১২ লাখ ২৯ হাজার ১শ ১০ ভোট বা প্রদত্ত মোট ভোটের ৬.৫২ শতাংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে জাসদ উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখতে ব্যর্থ হলেও নির্বাচনোত্তর কালে ব্যাপকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৭৪ সালের ২০ জানুয়ারী জাসদ গণপ্রতিরোধ দিবস পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সরকার এ কর্মসূচী প্রতিরোধের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করে। ১৯ জানুয়ারী থেকেই শহরের বিভিন্ন স্থানে জাসদ কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। পুলিশ বাহিনী জাসদ কর্মীদের ওপর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায় ও পাঁচজন জাসদ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।[১২] সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন ১৯ জানুয়ারী জাসদের আহ্বানে ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়।

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ শেষে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করে। তাদের লক্ষ্য ছিল দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট জমা দেওয়া। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে উত্তেজিত জনতার এক সংঘর্ষ বাঁধে। এতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলি বর্ষণের ফলে ৬ জন নিহত হয়।[১৩] এ ঘটনা পরবর্তীকালে জাসদের মধ্যে যথেষ্ট বির্তক সৃষ্টি করে। বলা হয় যে, পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী গুলি করার আগেই বিক্ষোভ মিছিল থেকেই পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীকে লক্ষ্য করে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করা হয় ও এক পর্যায়ে মিছিল থেকে পুলিশের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। ফলে গোটা আন্দোলনের ধারাই হঠকারিতার ফলে নষ্ট হয়ে যায়।[১৪]

এভাবে জাসদ তার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে উগ্র সরকার বিরোধী নীতি অনুসরণ করা অব্যাহত রাখে। ১৯৭৪ সালের ২৬ শে নভেম্বর জাসদের ডাকে দেশব্যাপী সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। জাসদ মুখপত্র *গণকন্ঠের* রিপোর্ট অনুযায়ী এই হরতাল উপলক্ষ্যে দুই হাজার দলীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুলিশী হামলায় শতাধিক লোক আহত হয়। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জাসদের প্রথম সারির সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর থেকে জাসদের একাংশ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায় ও দলীয় প্রেরণায় গণবাহিনী নামে পৃথক একটি গুপ্ত সংগঠন তৈরী করে।[১৫] জাসদ কর্মীদের একাধারে মার্কসবাদী আদর্শ ও সন্ত্রাসবাদে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল গণবাহিনীর প্রধান কাজ। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রগতিশীল তরুণদের বিক্ষোভকে পুঁজি করে অল্পদিনে গণবাহিনী শক্তিশালী একটি সংগঠনে পরিণত হয়। 'কৃষকদের ন্যায্য দাবী' যথা, পাট ইক্ষু তামাকের ন্যায্য দাম, গুড়

করার অধিকার, ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য মজুরী, জোতদারদের করায়ত্ত খাস জমি অবৈধ দখলের অবসান প্রভৃতি আন্দোলনের ফলে গ্রামাঞ্চলে গণবাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত শুরু হল।'[১৬] দেশের অনেক স্থানে গণবাহিনীর উদ্যোগে সন্ত্রাসী কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। এক পর্যায়ে গণবাহিনীর একটি শাখা সেনাবাহিনীতেও সম্প্রসারিত হয় এবং গড়ে উঠে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর ৭ নভেম্বরে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা আরোহনের পেছনে এই গণবাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রবল।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে বঙ্গ-বন্ধুর খুনীরা বিতাড়িত হয় ও খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাসীন হয়। এ সংকটময় মুহূর্তে বিপ্লবী গণবাহিনী এবং জাসদ নেতা কর্ণেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী জনতা পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং গৃহবন্দী জেনারেল জিয়াউর রহমান-কে ক্ষমতাসীন করে। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান জাসদ তথা কর্ণেল তাহেরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালে কর্মীদের গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা-দায়ের, বিনা বিচারে জেল প্রভৃতি উপায়ে নির্যাতনের বুলডোজার চালায়, যা জাসদের চলার পথকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। জেনারেল জিয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপর থেকে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এতে জামাত ও মুসলিম লীগসহ পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদী শক্তি-সমূহের নিজস্ব ব্যানারে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের বাধা অপসারিত হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি যতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মঞ্চ পায়নি, ততদিন তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানধারী জাসদকে তাদের সমর্থন জুগিয়ে গেছে। কারণ তখন আওয়ামী লীগ বিরোধী আর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। মৌলবাদী শক্তিসমূহ প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকার পাবার ফলে বিকল্প 'রাজনৈতিক শক্তি' হিসাবে জাসদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।[১৭] ফলে ১৯৭৫ পরবর্তীকালে জাসদের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রধান বিরোধী দল থেকে জাসদ পরিণত হয় ক্ষুদ্র জনসমর্থনহীন এক রাজনৈতিক দলে।

এভাবে দেখা যায় সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) আত্মপ্রকাশ করলেও তা মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তা নিয়মতান্ত্রিক কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নাই। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এ দল গঠনমূলক কোন ভূমিকা রাখতে পারে নাই। উপরন্তু জাসদ তার কার্যক্রমের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত- কেই শক্তিশালী করে। মৌলবাদী শক্তি সমূহ জাসদকে আশ্রয় করে তাদের রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। সমাজতন্ত্রের কথা বলেও এ দল ১৯৭৫ সালের পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করে নিজেদের দৈন্যতার পরিচয় তুলে ধরে। মার্কসবাদের কথা বললেও জাসদের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ভিত্তি সুসংগঠিত ছিল না। ফলে ১৯৭৫ পরবর্তীতে জাসদের ভেতর মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। পরিনামে এ দল অসংখ্য খন্ড বিখন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের কথা বললেও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নেতিবাচক এক ভূমিকা নিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. শহীদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধান।' *শিক্ষাবার্তা*,

৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ২১।
২. জগলুল আলম, *বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, ১৯৪৮-৮৯*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.৮৫।
৩. জাহিদ রহমান, 'জাসদ, ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী ?', *খবরের কাগজ*, ১২ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২ নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ.২৯।
৪. *সংবাদ* ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।
৫. *বাংলার বাণী*, ১ নভেম্বর, ১৯৯২।
৬. প্রথম ঘোষণা পত্র, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, *দৈনিক সংবাদ*, ১ নভেম্বর, ১৯৭২।
৭. ঐ।
৮. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৮৬।
৯. শহিদুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।
১০. পূর্বোক্ত।
১১. *নির্বাচনী ইশতেহার*, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল— জাসদ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩।
১২. *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৩।
১৩. সরকারী প্রেসনোট, ১৭ই মার্চ, ১৯৭৩।
১৪. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৮০।
১৫. জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।
১৫. জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।
১৬. যৌথ কমিটি কর্তৃক প্রণীত, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা :৭২ থেকে ৯০* (খসড়া), ঢাকা, তারিখ নেই, পৃ. ১১।
১৭. শহিদুল ইসলাম, 'জাসদের রাজনীতি : একটি বিশ্লেষণ!', *ভোরের কাগজ*, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৯।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম : প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্ব

মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। শাসকগোষ্ঠী. তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত এই ফলাফলকে সহজভাবে মেনেও নিতে পারেনি।[১] ফলে নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয় ষড়যন্ত্র। একদিকে আওয়ামী লীগের অনুরোধে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, অন্যদিকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্য আনা শুরু হয়।[২] ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। এ সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন কার্যত আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সরকার আন্দোলন বানচালের জন্যে দমননীতির আশ্রয় নেয়। সেনাবাহিনীর গুলিতে দেশব্যাপী হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর সাথে অবাঙালিদের উস্কানি দিয়ে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতেও সচেষ্ট হয়।[৩] এ সময় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন এরকম একটি ধারণা বিস্তার লাভ করে। এ পরিস্থিতিতে ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার এবং সংলাপ শুরু করার ঘোষণা করেন। ইহা ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপ্রস্তুতির মুখে বঙ্গবন্ধুকে আকস্মিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত রাখার একটি কৌশল মাত্র। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন—'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাছাড়া তিনি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রেখে সরকারকে চাপের মুখে রাখেন। ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত চলে সংলাপের নামে প্রহসন। সংলাপ চলার সময়েই ১৮ মার্চ পাকিস্তানি সামরিকচক্র প্রণয়ন করে 'অপারেশ সার্চ লাইট' নামে বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা।[৪] ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। এ রাতেই সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে গণহত্যা শুরু করলে ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হয়। এই যুদ্ধের সূচনা পর্ব

থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকবাহিনীর আঘাতের পর পরই সারাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে পাকবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আগেই বাঙালিরা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রামকে মুক্ত অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, ঢাকায় পাকিস্তানি আক্রমণ শুরু হয় রাত সাড়ে এগারোটায়, কিন্তু চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু হয় রাত সাড়ে আটটায়। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায়কে দুভাগে ভাগ করা যায়, প্রস্তুতি পর্ব : ১ মার্চ - ২৪ মার্চ এবং সূচনা পর্ব : ২৬ মার্চ - মধ্য এপ্রিল।

প্রস্তুতি পর্ব

২৫ মার্চ রাত থেকে আকস্মিকভাবে যুদ্ধের শুরু হলেও মার্চের শুরুতে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রস্তুতি লক্ষ করা যায়।[৫] ২ মার্চ ছাত্রলীগের জেলা গ্রুপের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্যে 'মেডিক্যাল কলেজ ট্রেনিং সেন্টার' গঠন করা হয়।[৬] ২ মার্চের হরতাল শুধু ঢাকায় হওয়ার ঘোষণা হলেও স্থানীয় নেতাদের আহ্বানে চট্টগ্রামেও সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ৩-৪ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক চক্রের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে অবাঙালিরা বাঙালিদের সাথে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়।[৭] এই দাঙ্গায় ১২০ জন বাঙালি নিহত হয়, আহত হয় অসংখ্য।[৮] বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গার পর চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে সশস্ত্র ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দলের কর্মী ও সাধারণ জনগণ এখানে ট্রেনিং নিতে শুরু করে।[৯] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাহাড়ে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে UOTC-র উদ্যোগে কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১০] সশস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মধ্যমার্চ হতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা বন্দুকের দোকান, ব্যাঙ্কের গোডাউন, পুলিশ ফাঁড়ি স্কুল-কলেজের UOTC-র রাইফেল লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করে এবং মলোটভ ককটেল তৈরির জন্যে চট্টগ্রাম কলেজ ও এ. কে. খানের ম্যাচ ফ্যাক্টরী কেমিক্যাল সংগ্রহ করে।[১১] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় মলোটভ ককলেট তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়।[১২]

২০ মার্চ জে. এম. সেন হলে প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ন্যাশনাল গার্ড প্রধান শেখ মোজাফ্ফর আহ্মদের সভাপতিত্বে, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্যোগে ন্যাশনাল গার্ড, প্রাক্তন সৈনিক ও UOTC-র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[১৩] ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে শোভা পায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, লালদীঘিতে চলে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোর মহোৎসব। স্টেডিয়ামে 'জয়বাংলা বাহিনী'র প্যারাডে অভিবাদন গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ নেতা মৌলভী সৈয়দ। ২৪ মার্চ প্রাক্তন সৈনিক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্যারাডে অভিবাদন গ্রহণ করেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী।[১৪]

মার্চের অসহযোগ আন্দোলন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগের নেতৃত্বাধীন 'চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ' ও 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সর্বস্তরের জনগণ নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড, থানা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' এবং এডভোকেট আজিজুল হক চৌধুরীকে

আহ্বায়ক করে গঠিত হয় 'আইনজীবী সংগ্রাম পরিষদ'।

প্রস্তুতিপর্বে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক আবুল ফজলের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'শিল্প-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সঙ্ঘ' (৮ মার্চ)। এই সংগঠন ৯-২৪ মার্চ পর্যন্ত মমতাজ উদ্দিন আহমদের 'এবারের সংগ্রাম', 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ইত্যাদি পথ নাটক, গণসঙ্গীত, মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে সর্বস্তরের বাঙালিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় সরকারি কর্মচারীরাও আনুগত্যের বেষ্টনী পেরিয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষকেরা সর্বপ্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সভা করেন (১০ মার্চ)। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য কলেজের শিক্ষকেরা এবং সরকারি কর্মচারীরা এগিয়ে আসেন। 'সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন সমন্বয় পরিষদ', রেলওয়ের কর্মকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন (১৩ মার্চ)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভাষায় 'সবাই কিছু না কিছু করতে চাইছিলেন দেশের জন্যে। রোজই এক বা একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল— রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের, শ্রমিক ইউনিয়নের আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের, সরকারি কর্মচারীদের, নারীদের।'[১৫]

চট্টগ্রামে বাঙালি ও অবাঙালি সৈন্য ছিল যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও ছয় শত। এছাড়াও ছিল বাঙালি পুলিশ বাহিনী।[১৬] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের কয়েকজন চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (স্টেশন কমান্ডার ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক), লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরী (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ই.বি.আর.সি, চিফ ইনস্ট্রাক্টর), মেজর জিয়াউর রহমান (৮ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড) ছিলেন অন্যতম। মার্চের শুরুতেই সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসারদের অনেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন। এদের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর (ই.পি.আর) সেক্টর হেড কোয়ার্টার এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ছিলেন অগ্রণী। তিনি পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মার্চের শুরু থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সংগ্রামের কোন কর্মসূচী না থাকায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম. আর. সিদ্দিকী তাঁকে সমর্থন করেননি। তারপরও ক্যাপ্টেন রফিক ৬ মার্চ থেকে ই.পি.আর সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহ করার বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১৭] এই পরিকল্পনার সাথে কক্সবাজার, কাপ্তাই ও রামগড়ের ই. পি. আর. উইংগুলোকেও সম্পৃক্ত করা হয়।

ক্যাপ্টেন রফিক ছাড়াও লে. কর্ণেল এম. আর. চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান সহ বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. বি.আর.সি. ও ই.পি. আর-র কিছু অফিসার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মধ্যে একাধিক বৈঠক ছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়েও বৈঠক করেন। রাজনৈতিক নেতারা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে আশাবাদী ছিলেন। অন্যদিকে

58

সামরিক অফিসাররা পাকবাহিনীর প্রস্তুতি নিয়ে ঐক্যমত পোষণ করলেও সম্ভাব্য পাকিস্তানি হামলার সময় নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। তবে আক্রান্ত হলে তা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৮] সেনাবাহিনী ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ আবু জাফর।

২৪ মার্চ ২০ বালুচ রেজিমেন্টের লে. কর্ণেল ফাতেমীর কাছে সামরিক গণহত্যার নীল নক্সা 'অপারেশন সার্চ লাইট' হস্তান্তর করা হয়। তাকে কুমিল্লা থেকে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শরিফ বাহিনী এসে না পৌঁছা পর্যন্ত চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে বলা হয়। একই দিন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে কৌশলে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়।[১৯] ব্রিগেডিয়ার আনসারী মজুমদারের স্থলাভিষিক্ত হন এবং কর্ণেল শিগরীকে ক্যান্টনমেন্টের সেন্টার কমান্ড্যান্ট-র দায়িত্ব দেয়া হয়। চট্টগ্রামের সেনা প্রশাসনে এই আকস্মিক রদ বদলে বাঙালি অফিসারদের মধ্যে অনেকেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন।

সোয়াত জাহাজের ঘটনা বাঙালিদের মনে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের আশংকা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মার্চের ২য় সপ্তাহ থেকে শ্রমিক লীগের নেতৃত্বে ডক শ্রমিকেরা এম. ভি. সোয়াতে করে আনা নয় হাজার টন গোলা-বারুদ খালাস করতে অস্বীকার করে। ২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার আনসারী জোর করে অস্ত্র খালাসের চেষ্টা করলে শ্রমিকেরা সোয়াত জাহাজ ঘেরাও করে রাখে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হাজার হাজার জনতা এই ঘেরাও-র সমর্থনে বন্দর থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত অসংখ্য ব্যারিকেড দিয়ে অস্ত্র খালাস করতে বাধা দেয়। ই.বি.আর.সি-র বাঙালি সৈন্যদের ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দেয়া হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করলে ২০ জন নিহত হয়। এই ঘটনায় গোটা চট্টগ্রাম শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। ব্রিগেডিয়ার আনসারী ও কর্নেল শিগরীর তত্ত্বাবধানে ১২০ জন বাঙালি সৈনিক ২৬ মার্চ নাগাদ অস্ত্র খালাস সম্পন্ন করে। বলা বাহুল্য ২৭ মার্চ এদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এই হত্যাযজ্ঞ থেকে মাত্র ৩ জন সৈন্য পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।[২০]

সূচনা পর্ব

২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা খবর পান যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছেন এবং সেনাবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন। আতাউর রহমান খান কায়সার এবং ডা. জাফরের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিককে এই সিদ্ধান্তটি জানানো হয়। ক্যাপ্টেন রফিক রাত সাড়ে আটটায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাত পৌনে বারোটার মধ্যে বিনা রক্তপাতে প্রায় পাঁচশত অবাঙালী সৈন্যকে বন্দী করে ই. পি.আর. সেক্টর হেড কোয়ার্টার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর হালিশহর উপকূলীয় বাঁধ, রেলওয়ে হিল, ডি. সি. হিল, কোর্ট বিল্ডিং, প্রবর্তক সংঘ, বেতার কেন্দ্র, আগ্রাবাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও বিল্ডিং-এ এবং হালিশহর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে সৈন্য মোতায়েন করে তিনি রেলওয়ে হিলে স্থাপিত তাঁর সদর দপ্তরে অবস্থান নেন।[২১]

ক্যাপ্টেন রফিক আশা করেছিলেন যে, ই. বি.আর. সি. ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। কিন্তু যুদ্ধের খবর ই. বি.আর.সি.-তে পৌঁছে রাত সাড়ে

এগারোটার পর। ই. বি.আর.সি-র ২৫০০ বাঙালি সৈন্যের মধ্যে লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরীসহ প্রায় এক হাজার সৈন্য নিহত হয়; বাকীরা বন্দী হয়। এদের কয়েক জন পালিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন রফিক ও মেজর জিয়ার সাথে যোগ দেয়।[২২] যুদ্ধের খবর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে পৌঁছে রাত সাড়ে এগারোটায়। মেজর জিয়া রাত পৌনে বারোটার দিকে খবর পেয়ে বিদ্রোহ করেন এবং রাত ২টার মধ্যে কমান্ডিং অফিসারসহ সব অবাঙালি সৈন্যদের বন্দী করেন।[২৩] ই.বি.আর.সি থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা ২০ বালুচ রেজিমেন্টকে প্রতিরোধ করতে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাহায্য চেয়েছিলো। কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেকেই তাদের সীমিত অস্ত্র নিয়ে বালুচ রেজিমেন্টের মোকাবিলা করাকে আত্মঘাতি হবে বলে মত দেয়।[২৪] ফলে ২০ বালুচের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বেঙ্গল বেজিমেন্ট কালুরঘাটে অবস্থান নেয়। কক্সবাজার ও কাপ্তাই হতে ই.পি.আর সৈন্যরা বিদ্রোহ করে মেজর জিয়ার সাথে অবস্থান নেয়।[২৫] এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই ক্যান্টনমেন্ট ও নেভাল বেইস ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ব নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 'চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ' ও 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বেশ কিছু কন্ট্রোল রুম ও ক্যাম্প স্থাপন করে। সেনা ইউনিটগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, সৈন্যদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ, জনগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া — এসব কাজ কন্ট্রোল রুমগুলো হতে পরিচালনা করা হতো। জনগণ এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাবার ও বিভিন্ন খবর পৌঁছে দিতো।[২৬] ইতোমধ্যে মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা করার খবর এলে তা 'সংগ্রাম পরিষদ' রাতেই অসংখ্য লিফলেট ও মাইকে প্রচার করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামকে ৪টি সেক্টরে ভাগ করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'শহর এলাকা সেক্টর' — জহুর আহমদ চৌধুরী, এম. এ. মান্নান ও আখতারুজ্জামান চৌধুরী, 'কালুরঘাট সেক্টর' এম.এ. হান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার, ডা: এম. এ. মান্নান ও ডা: আবু জাফর, 'শুভপুর সেক্টর' — ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেক্টর-এ দায়িত্বে ছিলেন এম. এ. ওহাব।[২৭] এম. এ. ওহাব ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেন উপাচার্য ডা: এ. আর. মল্লিক।[২৮]

যুদ্ধের শুরুতেই কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রসহ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ২৬ মার্চ দুপুর আড়াইটা নাগাদ জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। এই কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। ২৭ মার্চের পর বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া ২৭,২৮ ও ৩০ তারিখে পরপর ৩টি ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানিয়ে জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসীকে বাঙালিদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ২৬ মার্চ রাত ১টার পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সামরিক চক্র গ্রেপ্তার করলেও এই বেতার কেন্দ্র থেকে 'বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করেছেন' বলেও প্রচার করা হয়। পাকিস্তানিদের আকস্মিক আক্রমণের মুখে হতবিহ্বল হয়ে পড়া বাঙালি জাতির মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্যেই এই বিভ্রান্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল।[২৯]

চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ২৬ মার্চ ভোর রাতে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট নিয়ে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দেন। পাকিস্তানি

বাহিনীকে চট্টগ্রামে প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্যে শুভপুর ব্রিজসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অসংখ্য ব্যারিকেড দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন এম. এস. এ. ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ১০২ জন সৈন্যের একটি দল কুমিরায় অবস্থান নেয়। পাক বাহিনীর অগ্রগামী ১টি দল সন্ধ্যা নাগাদ কুমিরায় পৌঁছলে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার গ্রুপের আক্রমণের মুখে পড়ে। পাকিস্তানি সূত্রেই জানা যায় যে এখানে এই দলটির কোম্পানি কমান্ডারসহ এগারো জন নিহত হয় এবং প্রচুর গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। [৩০] কুমিরার যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিমানে করে ঢাকা থেকে সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠিয়ে চট্টগ্রামে শক্তি বৃদ্ধি করে। কুমিরায় বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই চলে ৩ দিন। ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় ইকবাল শফির দলটি শহরের উপকণ্ঠে হাজিক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ২০ বালুচ রেজিমেন্টও তিন দিনের প্রচেষ্টায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে টাইগার পাসের নৌবাহিনীর কম্যুনিকেশন স্টেশন পর্যন্ত দখল করে সার্কিট হাউজে তাদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে। ২৯ মার্চ সন্ধ্যায় নেভাল বেইস, ক্যান্টনমেন্ট এবং কুমিল্লা — এই তিন স্থান থেকে অগ্রসরমান পাকাবাহিনী পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

২৬ মার্চ থেকেই নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের সমর্থন নিয়ে নৌবাহিনীর সৈন্যরা ই. পি.আর.-র অবস্থানগুলোর উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে যায়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন রফিক রেলওয়ে হিল থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে হালিশহরে প্রচন্ড আক্রমণের মুখেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের অবস্থান ৩০ তারিখ পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। ২৯ মার্চ পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্ন বাহিনীগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পর তারা হালিশহর ই.পি.আর. ঘাটি দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠে। ৩১ মার্চ ব্যাপক আর্টিলারি শেলিং, ২টি ট্যাঙ্ক, নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের গোলাবর্ষণ এবং বিমান আক্রমণের সমর্থন নিয়ে এক ব্যাটেলিয়ন পাকিস্তানি সৈন্য হামলা চালায়। ঘন্টা চারেক প্রচন্ড যুদ্ধের পর ই. পি.আর. সৈন্যরা হালিশহর থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। [৩১]

হালিশহর দখলের পর পাকিস্তানি বাহিনী একই শক্তি নিয়ে কোর্ট হিল দখলে অগ্রসর হয়। মাত্র ৩০ জন ই.পি.আর. সৈন্য ২ এপ্রিল পর্যন্ত সফল প্রতিরোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। একই দিন পাকবাহিনী দামপাড়া পুলিশ লাইনের প্রতিরোধও ভেঙে ফেলে। [৩২]

পাকবাহিনীকে সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছিলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। কালুরঘাটে অবস্থান নেয়া মুক্তিযোদ্ধারা এই বেতার কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করছিলো। পাশাপাশি তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর অবস্থানের উপর গেরিলা হামলা চালায়। [৩৩] ২৯ মার্চ পাকবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপের সাথে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তারা কালুঘাট নিয়ন্ত্রণে আনতে পরপর ৩টি ব্যর্থ অভিযান চালায়। অবশেষে ৩০ মার্চ বিমান হামলায় বেতার কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ৪ এপ্রিল শহরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর তারা কালুরঘাটে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ১১ এপ্রিল পাকবাহিনীর হাতে কালুরঘাটের পতন ঘটে। [৩৪] বিভিন্ন অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে, সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধও।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে সমগ্র দেশের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের ভূমিকা ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চরম মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাৎক্ষণিকভাবে সেনা সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে যুদ্ধ শুরু করে এবং চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে দেশ-বিদেশের

জনগণকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের কথা জানিয়ে দেওয়া। ২৬-২৯ মার্চ পর্যন্ত পুরোপুরি এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চট্টগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এবং প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। প্রাথমিক প্রস্তুতিতে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে ই.পি.আর-র ভূমিকা ছিল অগ্রণী, প্রতিরোধ যুদ্ধেও। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.বি.আর.সি-র বাঙালি সদস্যদের মধ্যে প্রতিরোধের সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা না থাকলেও তাদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তাতে পাকিস্তানি হামলা তাৎক্ষনিক ভাবে প্রতিহত করার মতো মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। ইহা প্রতিরোধের প্রাথমিক সফলতার জন্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে বাঙালি সৈন্যরা সংখ্যাগত দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাদের ছিল সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক, স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় সমর্থন। প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা অধিকাংশ সময় জয়ী হয়েছে, কিন্তু ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে পাকবাহিনীর হামলার আগেই বাঙালি সেনারা চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু করেছিল। রণাঙ্গনকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার চেষ্টাও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল। কিন্তু সেনা সদস্যদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে সমন্বয় সাধন করে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সুবিধা মতো হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছে। পর্যাপ্ত যোগাযোগ সরঞ্জামের অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে পাকবাহিনী ব্যাপকভাবে তাদের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পেলেও মুক্তিযোদ্ধারা তা পায়নি। তাই পাকবাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে তাদেরকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এই পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করতে হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

সূত্র নির্দেশ

১. সিদ্দিক সালিক, মাসুদুল হক অনূদিত — *নিয়াজীর আত্ম সমর্পণের দলিল*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৪।

২. সিদ্দিক সালিক, পৃ. ৫৩।

৩. মেজর রফিকুল ইসলাম, পি.এস. সি, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫০।

৪. সিদ্দিক সালিক, পৃ. ৭৫।

৫. সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে ৬২ সালে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগে 'নিউক্লিয়াস' নামে একটি গোপন উপদল গঠিত হয়। চট্টগ্রামে নিউক্লিয়াসের প্রভাব ছিলো বেশী; চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ রাজনীতিতে ইহা জেলাগ্রুপ নামে পরিচিত ছিল। মার্চে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ স্বাধীনতার প্রশ্নে একাত্ম হয়ে যায়। চট্টগ্রামে নিউক্লিয়াসের তৎপরতার জন্যে দ্রষ্টব্য : ডা: মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম ১৯৯৩, পৃ. ২৬৫-৭৪।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

৭. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ৬০-৬১।

৮. দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ৪,৫ মার্চ, ১৯৭১।

৯. ডা: মাহফুজুর রহমান, ঐ, পৃ. ২৪২-৪৩।

১০. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮-২৯।

১১ ডা: মাহফুজুর রহমান, পৃ. ২৪৪।
১২ আনিসুজ্জামান, ঐ।
১৩. ২ মার্চ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।
১৪ ডা: মাহফুজুর রহমান, পৃ.২৩৩। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ২১ মার্চ কর্নেল ওসমানী ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রাক্তন সৈনিকদের প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন। মেজর রফিকুল ইসলাম পি. এস. সি, পৃ. ৬৭-৬৮।
১৫. আনিসুজ্জামান, পৃ. ২৭।
১৬. *সিদ্দিক সালিক*, পৃ. ৯০।
১৭. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পৃ. ৬২-৬৭।
১৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, *দলিল পত্র*; নবম খণ্ড (পরে দলিল), পৃ. ৪০-৪২, ৫৬, ৫৭, ৬০-৬১। রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, ৭৯,৮০,৮৬।
১৯. সিদ্দিক সালিক, পৃ. ৮০-৮১।
২০. মেজর এম. এস. এ. ভূইয়া, *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১-২৭।
২১. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, ৯৪-১০৪।
২২. *দলিল*, পৃ. ৪৯-৫২।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২৪. ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে বিশেষ কোন অস্ত্র ছিলোনা। তাদের কিছু সৈন্য এডভান্স পার্টি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার প্রস্তুতি হিসেবে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র, গাড়ী জমা দিতে হয়েছিলো। খুব কম সংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র, গাড়ী বাকি সৈন্যদের কাছে ছিলো। ই.বি.আর. সি দেড়'শ রাইফেল ধার নেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাও আনা হয়নি। *দলিল*, পৃ. ৪৭।
২৫. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পৃ. ১২২।
২৬. ডা: মাহফুজুর রহমান, পৃ. ৩১৭-১৮।
২৭. *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, দৈনিক আজাদীর ৩৫ বৎসর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৫।
২৮. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৩৬-৩৭।
২৯. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২২-৪৮।
৩০. সিদ্দিক সালিক, পৃ. ৯০।
৩১. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পৃ. ১৪০-৪১।
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।
৩৩. *দলিল*, পৃ. ৬০।
৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১-২৩।

মুক্তিযুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

সুনীলকান্তি দে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ভারত সরকার, ভারতীয় রাজনৈতিক দল, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, ভারতীয় শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সর্বোপরি ভারতীয় জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক কোটী শরনার্থীর বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা, মুক্তি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান, বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ অংশ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহযোগিতা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করতে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সংগঠন।[১] তৎমধ্যে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি [২], বাংলাদেশ সংহতি বা সাহায্য সমিতি [৩], পশ্চিমবঙ্গ - বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি [৪], কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৭১-এ ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর এর ৬ দিন পর অর্থাৎ ৩ এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিনেট সদস্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ সমূহের শিক্ষকবৃন্দের এক মিলিত সভায় গঠিত হয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'। [৫] এটিই ছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে গঠিত প্রথম সংগঠন। সমিতির সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সিনেট সদস্য প্রফেসর দীলিপকুমার চক্রবর্তী। [৬] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ সমিতির অফিস স্থাপিত হয়। সমিতির দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতেন প্রফেসর জ্ঞানেশ পত্রনবিশ, যতীন চ্যাটার্জী, দীপক হাজরা এবং পি সেনশর্মা। [৭] এর সঙ্গে সহায়ক সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পি. কে. বোস, উপ-উপাচার্য (অর্থ) হীরেন্দ্রমোহন মজুমদার, প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতা বিপ্লবী ইলা মিত্র, ড. অনিরুদ্ধ রায়, অনিল সরকার, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীনা ভৌমিক, অংশুমান মল্লিক, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, দীপক হাজরা প্রমুখ। [৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ৩ এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পন এবং পরবর্তীকালে শরনার্থী প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একটানা কাজ করে যায়। সহায়ক সমিতির কর্মকাণ্ডকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব —

১) বাংলাদেশের শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা প্রদান। ২) ভারত ও বহির্বিশ্বের অ্যাকাডেমিক সমাজের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা। ৩) আর্থিক তহবিল গঠন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান। ৪) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ। ৫) মুক্তি বাহিনীকে সহযোগিতা ও ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশের শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা প্রদান

সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করা।[৯] এ উদ্দেশ্যে সমিতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের শরনার্থী শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনুরোধ জানান যে তাঁরা যেন তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত ও বর্তমান ঠিকানা জানিয়ে সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।[১০] সমিতি বাংলাদেশের শরনার্থী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ড. অনিরূদ্ধ রায়। তাঁকে সহযোগিতা করেন অনিল সরকার, অংশুমান মল্লিক এবং অনিল বসু।[১১] সহায়ক সমিতি আশ্রয়হীন শিক্ষক কর্মকর্তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা, বিভিন্ন স্থানে বাসস্থানের ব্যবস্থা,[১২] শরনার্থী শিক্ষকদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরসীপ/ লেকচারারসীপ প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল।[১৩] এ সঙ্গে সমিতি পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সারা দিয়ে যাদবপুর, কেরালা, যোধপুর, মোজাফ্ফরপুর, দিল্লি, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, Indian Institute of Technology, Indian Association for cultivation of Science, Indian Statistical Institute (Calcutta) বেশ কিছু শরনার্থী শিক্ষককে বিভিন্ন পদে নিয়োগদান করেছিল।[১৪] নিয়োগ প্রাপ্তির মধ্যে অধ্যাপক মজহারুল ইসলাম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে), ড. এ এ জিয়াউদ্দীন আহমদ (হিমাচল প্রদেশের ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজের পদার্থ বিদ্যা বিভাগে), ড. শামসুল হক (পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে), শহিদুল ইসলাম (যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে), সুব্রত মজুমদার (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে), প্রমুখ অন্যতম।[১৫] শরনার্থী শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের চাকুরীর ব্যবস্থা ছাড়াও সহায়ক সমিতি তাঁদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল।[১৫ক]

ভারত ও বহির্বিশ্বের অ্যাকাডেমিক সমাজের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা

সহায়ক সমিতি ভারত ও বহির্বিশ্বের একাডেমিক সমাজের কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক- সমিতির একটি যৌথ টিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একাডেমিক সোসাইটির সমর্থন আদায়ের জন্য প্ররোচনা চালায়। এলাহাবাদ, আলীগড়, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বে, মাদ্রাজ, কেরালা, পুনা, জয়পুর, পাটনা, অমৃতসর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে সভা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের

পক্ষে একাডেমিক সোসাইটির সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। এই যৌথ টিমে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এ. আর. মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান এবং সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে ছিলেন ড. অনিরুদ্ধ রায়, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, অনিল সরকার, সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ছিলেন সুবেদ আলী এম পি।[১৬] এছাড়া সহায়ক সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের European languages বিভাগের বিভাগীয় প্রধান Father P. Fallon-কে ভাটিকানে, জাস্টিস অরুণচন্দ্র দাসকে লণ্ডনে, ইলা মিত্রকে মস্কোতে, শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীকে আরব ও আফগানিস্তানে, পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়কে আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে পাঠান। সেখানে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং [illegible] সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা সংগঠিত করার কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হন।[১৭] এ প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, 'সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ফাদার ফিয়ারে ফেলো (রোমান ক্যাথলিক, বেলজিয়ামে জন্ম হলেও ভারতীয় নাগরিক) ছুটে গিয়েছিলেন পোপের কাছে। বাংলাদেশের পক্ষে নানা ডকুমেন্ট দেখালেন। সেখানে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন। সেদিন প্রচারে আরও অংশ নিলেন অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ব্যাশাম। তিনি তখন লেকচার দেওয়ার জন্য নিয়মিত কলকাতায় আসতেন। বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ার জন্য সেদিন এগিয়ে যান প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জি। তিনি শিক্ষক সহায়ক সমিতির সদস্য হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ার জন্য গোপনে চলে যান আফগানিস্তান ও আরব দেশগুলোতে।[১৮]

আর্থিক তহবিল গঠন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তাদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরনার্থী পরিবার ও শরনার্থী শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবং সমিতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সহায়ক সমিতির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই জন্য সহায়ক সমিতির সভাপতি উপাচার্য প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ সেন জনগণ বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সহায়ক সমিতির তহবিলে চাঁদা প্রদানের আবেদন জানান। এতে তাৎক্ষণিক ভাবে বিপুল সাড়া মেলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যবসায়ীসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মিল ফ্যাক্টরীর মালিক কর্মকর্তা-শ্রমিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ অনেকেই সহায়ক সমিতির তহবিলে দান করতে এগিয়ে আসেন।[১৯]

সহায়ক সমিতির মে ১৯৭১-এর এক রিপোর্টে জানা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীগণ সহায়ক সমিতির তহবিল গঠনে নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়োজিত রেখেছে।[২০] অর্থ দান ব্যতীত কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মুক্তিযোদ্ধা ও শরনার্থীদের জন্য পানির বোতল, কম্বল, ঔষধপত্র ইত্যাদি দান করে।[২১] সহায়ক সমিতি দেশে সাহায্য প্রদানের আবেদনের সঙ্গে বিদেশেও আবেদন জানায়। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ সমিতির তহবিলের জন্য চাঁদা (১৩,২৬৫ রূপি) পাঠান।

এতে সহযোগিতা করেন ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অতীন্দ্র মজুমদার, ড. আবদুল মজিদ খান, এবং অটগো বিশ্ববিদ্যালযের প্রফেসর প্রিয়তোষ মৈত্র।[২২] সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড পি. বি. গজেন্দ্রগাডকর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত ৬৭,০০০ রূপি সহায়ক সমিতির তহবিলে প্রদান করে। সহায়ক সমিতির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক দেয়া সর্বোচ্চ অর্থ দান। দ্বিতীয় স্থানে ছিল অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, যার পরিমাণ ছিল ৪১,০০০ রূপি।[২৩] এছাড়া সহায়ক সমিতি রবীন্দ্র সদনে চ্যারিটি শো আয়োজনের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে। নব নালন্দা গ্রুপ এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ বিনে পয়সায় এই চ্যারিটি শোতে অংশ গ্রহণ করেছিল।[২৪] সহায়ক সমিতির তহবিলের সিংহভাগ শরনার্থী শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করতে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বই পুস্তক প্রকাশের নিমিত্তে ব্যয় করেছিল।[২৫]

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ

সহায়ক সমিতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। সমিতির প্রথম এবং প্রধান প্রকাশনী ছিল বঙ্গেন্দু গাঙ্গুলী ও মীরা গাঙ্গুলী রচিত *Bangladesh—The Truth*। বইটি মে (১৯৭১) মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটিতে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশে নির্যাতন, ষাটের দশকে বাঙ্গালির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর যৌক্তিকতা, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতি তুলে ধরা হয়। পুস্তকটি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রী, সাংসদদের নিকট এবং বিদেশী সংবাদপত্রে পাঠানো হয়েছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালি নিধনের বিষয়টি বহির্বিশ্বে অবহিত করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায়।[২৬] এরপর সমিতি উল্লিখিত দুইজন লেখকের সম্পাদনায় *বাংলাদেশ-থ্রোজ অফ এ নিউ লাইফ* (*Bangladesh-Throws of a New Life*), বাংলাদেশ তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডফম্যান এবং ষ্টিফেন মারগলিনের *Conflict in East Pakistan—Background and Prospects* পুস্তিকা দুইটি প্রকাশ করে। শেষোক্ত পুস্তিকাটি বিভিন্ন দেশে বিশেষত আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। এ সঙ্গে সমিতি *Bangladesh Through Lens, Bleeding Banglodesh* নামে দুটি ছবির অ্যালবাম প্রকাশ এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ-এর ভাষণ পুনর্মুদ্রণ করে। এছাড়া সহায়ক সমিতি ওসমান জামাল লিখিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আসাদুজ্জামান রচিত *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করে।[২৭] এসব পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশে কলিকাতাস্থ ভাবত ফটো টাইপ স্টুডিও, রেডিয়েন্ট প্রসেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে।[২৮]

মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা ও ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা

সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালে সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র, মশারী, মশার

কয়েল, ঔষধ, অর্থ, অস্ত্র, কম্বল, ওয়াটার প্রুফ, রেডিও ইত্যাদি প্রদান করে সহযোগিতার হাত বাড়ায়।[২৯] মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ ও অস্ত্র যোগানের দায়িত্বে ছিলেন সহায়ক সমিতির অন্যতম নেতা স্বাধীন গুহ।[৩০] সমিতির অন্য একটি উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থী পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা। সহাযক সমিতির এক রিপোর্টে জানা যায় অক্টোবর মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাব শরনার্থী শিবিরগুলিতে ৫১টি ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেখানে ৭১৪ জন শিক্ষককে International Rescue নিয়োগ দান করা হয়। এইসব ক্যাম্প স্কুলগুলি মূলত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহযোগিতা এবং কমিটির অর্থ এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলর্বোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।[৩১]

সর্বশেষে বলা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় আলোচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতিসহ অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকা তুলে ধরা ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

সূত্র নির্দেশ

১. প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি'-এর সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার ছিলেন কার্যকরী সভাপতি এবং সহ-সভাপতি ছিলেন সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ।

৩. সি পি এম নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য সমিতি'-এর সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুধীন কুমার এবং কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কৃষ্ণপদ ঘোষ।

৪. 'বাংলদেশ সহায়ক সমিতি' প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 'ইনফরমাল কমিটি'-এর নেতৃত্বে ছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়, ডা. ত্রিগুণা সেন, শান্তিময় রায়, সন্তোষমোহন রায় প্রমুখ।

৫. *Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9. 1971* *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৬-৩৬৯। আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৬৯।

৬. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কার্যকরী পরিষদ ছিলেন নিম্নরূপ :

সভাপতি :	প্রফেসর সতেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কার্যকরী সভাপতি :	প্রফেসর পি. কে. বোস, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কোষাধ্যক্ষ :	হীরেন্দ্রমোহন মজুমদার, সহ-উপাচার্য (অর্থ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদক :	প্রফেসর দীলিপকুমার চক্রবর্তী,
যুগ্ম-সম্পাদক :	প্রফেসর ইলা মিত্র, প্রফেসর সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রফেসর এস. কে. মিত্র, প্রফেসর এস. দাশগুপ্ত।

Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Report April-December.1971. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৫০৫।

৭. সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমিতির কার্যক্রম ১৪ নং বিধান সরণীতে (কলকাতা) পরিচালিত হত। Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9, 1971 *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৭।

৮. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, পৃ. ৬৯, ৯৯-৭৮।

৯. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9. 1971*

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৬।

১০ আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, পৃ. ৬২।

১১. University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9, 1971 *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৬।

১২. বাংলাদেশের শরনার্থী শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অন্যতম নেতা অনিল সরকার বলেন, ' আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের হাজরা হোষ্টেলের অধীক্ষক ছিলাম। ঐ হোষ্টেলে অনেক শিক্ষকদের রাখার ব্যবস্থা করি। বিভিন্ন বাড়ীতেও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হাজরা রোডের হিরন্ময়ী গালর্স হোষ্টেলেও মহিলা শিক্ষিকাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।(অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৬৩)। আনিসুজ্জামান তাঁর *আমার একাত্তর* স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গে লেখেন,' বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুজন শিক্ষক সব সময়েই সহায়ক সমিতির অফিসে আসতেন, তাঁরা অনিল সরকার ও অনিরুদ্ধ রায়। হাজরা রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র হষ্টেল ছিল, অনিল ছিল তার সুপারিনটেনডেন্ট। ওই হষ্টেলে সে বহু আশ্রয়হীন শিক্ষককে জায়গা দিয়েছিল। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় সুপারের কোয়ার্টারে তাদের তুলতে শুরু করেছিল। আমার মনে পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড আবু সালেহ যখন আশ্রয় প্রার্থীরূপে সহায়ক সমিতির অফিসে পৌঁছান, তখন তার কাছে নিজের পি এইচ ডি থিসিস ও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অনিল তাঁকে নিজের কোয়ার্টারে স্থান দিয়েছিল। (আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, পৃ. ৭৮)।

১৩. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9, 1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৬-৬৭।

১৪. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-December, 1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ ৫২১।

১৫. অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ১৩; আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* পৃ.৮০।

১৫ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, খণ্ড-১২, পৃ. ৫২৭-২৮।

১৬. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-December, 1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৫১১ এ আর মল্লিক, *আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম* ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৭৮-৭৯; আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, পৃ. ৯৯-১০৩, ১৫৪।

১৭. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-December,1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ ৫১৩,৫১৮,৫২৪, অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ৪৪।

১৮. অমর সাহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১৯. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report on May 9, 1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৩৬৭ যে সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মিল-ফ্যাক্টরী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থ দান করেছিল সেসব বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-December, 1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, খণ্ড-১২, পৃ. ৫০৯,৫১১,৫২৩,৫২৬,৫২৯।

২০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, খণ্ড-১২, পৃ ৩৬৭।

২১. সহায়ক সমিতির এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় নীরদকুমার সেন পানির বোতল, দেজ মেডিকেল ষ্টোর এবং সিবা কোম্পানী ঔষধপত্র প্রদান করেন।(ঐ পৃ. ৫১১)

২২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, খণ্ড-১২, পৃ ৫১৫, ৫১৯।

২৩. ঐ, পৃ. ৫২৩-২৪।

২৪. ঐ, পৃ. ৫২২।

২৫. ঐ, পৃ. ৫০৭, ৫২৪, ৫২৬-৫২৭।

২৬. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-*

December.1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ. দলিল পত্র, খণ্ড-১২, পৃ. ৫০৯।
২৭. ঐ, পৃ. ৫০৯-৫১০, ৫১৪, ৫১৬-৫১৭।
২৮. ঐ, পৃ. ৫১০।
২৯. ঐ, পৃ. ৫১৯-৫২০।
৩০. অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ। ৮৪।
৩১. *University Bangladesh Sahayak Samiti Secretary's Report April-December.1971 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ. দলিল পত্র*. খণ্ড-১২, পৃ ৩৬৭।

বাংলাদেশে '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ভূমিকা

মো: রেজাউল করিম

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল ১৯৯০ সাল। এ বৎসর নেপাল ও পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ১৯৯০-এর শেষদিকে ঐক্যবদ্ধ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ পদচ্যুত হন। এ অভ্যুত্থানের মূল চালিকা শক্তি ছিল ছাত্র সমাজ। ছাত্ররা তাদের অতীত ঐতিহ্যের হাত ধরেই ১৯৯০ সালে এসে এক ইস্পাত কঠিন ঐক্যে উপনীত হয়। আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের উর্দ্ধে উঠে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের অভিন্ন শত্রুর মোকাবেলায় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠন করে কার্যত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে এবং আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতি দান করে।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। এর ফলে মাত্র ১২৮ দিন পূর্বে নির্বাচিত বি.এন.পি.(বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) দলীয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৮১ সালের শেষের দিক থেকে জেনারেল এরশাদের কথা-বার্তায় সামরিক শাসন প্রবর্তনের আগামবার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।[১] সে কারণে রাষ্ট্রপতি সাত্তার তাঁর কর্তৃত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন এবং পরিষ্কারভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সেনাবাহিনী সরকারের একটি অংশ, তাদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা। এর বাইরে এবং এর বেশী কোন কাজ করার প্রয়োজন নাই।[২]

রাষ্ট্রপতি সাত্তারের এ বক্তব্যের পর থেকেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের জন্য অজুহাত খুঁজতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে বি.এন.পি.-র আভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, উচ্চ পর্যায়ে বিরাজমান নৈরাজ্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, নিম্নমুখী অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির অজুহাতে জেনারেল এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারী করেন।[৩] তিনি রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন, মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন, সংবিধান স্থগিত করেন এবং নিজেকে প্রধান সমারিক আইন প্রশাসক এবং তৎকালীন বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানদ্বয়কে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। নামমাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয় বিচারপতি আবুল ফজল আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে।

এরশাদ নিজেও জানতেন ২৪ মার্চ তিনি যে পন্থায় ক্ষমতা দখল করেন তা ছিল

সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অসাংবিধানিক।[৪] সেজন্যই তিনি নিজের ও তার সরকারের বৈধতা অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রথমে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ 'গণভোট' অনুষ্ঠান করেন। এ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলি শূন্য থাকলেও ব্যালটবাক্স ঠিকই পূর্ণ হয়ে যায়।[৫] যদিও সরকারী হিসেবে ভোট প্রয়োগের হার দেখানো হয় ৭২.১৪ শতাংশ এবং জেনারেল এরশাদ প্রদত্ত ভোটের ৯৪.১৪ শতাংশ-এর সমর্থন লাভ করেন।

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় সংসদ' নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। সিভিল সমাজে এই সকল নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ছিলনা। কারণ সামরিক শাসনের বেড়াজালের মধ্যে বিরোধী দলবিহীন 'গণভোট' 'রাষ্ট্রপতি' নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক ভোটারই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।[৬] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সরকারী সূত্রে ৫৪.২৩ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে বলে দাবী করা হলেও বিরোধী দলসমূহ দাবী করে যে এ নির্বাচনে ৩ শতাংশ ভোটারও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নাই। এ নির্বাচনের পর জনগণ এরশাদকে স্ব-ঘোষিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত করে।[৭]

অন্যদিকে, সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের একাংশ নিলেও ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কারচুপি ও ভোট-ডাকাতির মধ্যদিয়ে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।[৮] আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে 'ভোট ডাকাতি' ও 'মিডিয়া ক্যু'র নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে।[৯] নির্বাচন বর্জনকারী দল সমূহও এ নির্বাচন সম্পর্কে 'তীব্র প্রতিক্রিয়া' ব্যক্ত করে।[১০] এ নির্বাচন ছিল এরশাদের 'দ্বিতীয় অভ্যুত্থান'।[১১] এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংসদে সংবিধানের '৭ম সংশোধনী বিল' পাশের মাধ্যমে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে 'সাংবিধানিক শাসন' চালু করেন। বস্তুতঃ জেনারেল এরশাদ যে প্রক্রিয়ায় তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করেন তাতে ভোটের পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশের সিভিল সমাজ তথা রাজনীতিক, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন জারীর বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্ররা।[১২] এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।[১৩] ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা এ আন্দোলন শুরু করে।[১৪] এরশাদের সামরিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড: মজিদ খান ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'গণবিরোধী' এক শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ করে ১৪টি ছাত্র সংগঠন মিলে গঠন করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।[১৫] ফলে ছাত্রদের সূচিত আন্দোলন একটা সাংগঠনিক ভিত্তি পায়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষানীতি বাতিলের দাবীতে 'শিক্ষাভবন' ঘেরাও করতে অগ্রসর হলে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় জাফর ও জয়নুল আবেদীন নামের দু'জন ছাত্র।[১৬] এ ঘটনায় দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ছাত্র হত্যাকাণ্ড জাতীয় রাজনীতিকদের চোখ খুলে দেয়। তারা প্রথমবারের মত এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে প্রকাশ্যে সংহতি প্রকাশ করে এরশাদ বিরোধী জোট গঠন প্রক্রিয়া শুরু করে।[১৭]

১৪ ফেব্রুয়ারীর পর জেনারেল এরশাদ সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে 'ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদ' আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৮৩ সালের ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে '১০-দফা' [১৮] দাবী নামা। ফলে ইস্যুভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন নির্দিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ঘোষণায় বলা হয় : সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে ১০-দফা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই ১০-দফার আন্দোলন সফলতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সামরিকতন্ত্রের অবসান।[১৯] এ ঘোষণার মধ্যদিয়েই শুরু হয় সামরিকবাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক আন্দোলন।

ইতোমধ্যে নিজের বৈধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এরশাদ স্থানীয় সরকারের একটি স্তর উপজেলা নির্বাচন ঘোষণা করে। ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপজেলা নির্বাচন বিরোধী একটি মিছিলে সরকার ট্রাকে তুলে দিয়ে হত্যা করে সেলিম ও দেলোয়ার নামের দু'জন ছাত্রকে।[২০] এ ঘটনা ছাত্র আন্দেলনকে 'গণ-আন্দোলনে' রূপান্তরিত করে।[২১] এই গণ-আন্দোলনকে গ্রামে পৌঁছে দেয় বসুনীয়া হত্যাকাণ্ড। ১৯৯৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী এরশাদ সমর্থিত 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ'-এর 'ক্যাডার'দের গুলিতে নিহত হয় রাউফুন বসুনীয়া।[২২]

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টি হলে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপর। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'নির্বাচনপন্থী' ও 'নির্বাচন বিরোধী' এ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।[২৩] ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এ বিভক্তি প্রকারান্তরে ছাত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। যার পরিণতিতে জীবন দিতে হয় বেশ ক'জন ছাত্রকে।

ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ (জু-ল), গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নসহ ৮টি ছাত্র সংগঠন মিলে গঠন করে 'সংগ্রামী ছাত্র শক্তি'।

পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেও ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও জাতীয় প্রয়োজনে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকে। এই প্রতিবাদমুখর দিনগুলিতে ছাত্র সংগঠনগুলো যুগপৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐক্য প্রয়াস চালাতে থাকে। সে কারণেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বদা স্থির থাকেনি। কখনো - কখনো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র শক্তি একত্রে '২২-ছাত্র সংগঠন' নামে আন্দোলন করেছে। কিন্তু দু-একটি ছাত্র সংগঠনের হীন দলীয়-স্বার্থের কারণে এ জোট হারিয়েছে তার স্থায়িত্ব।

অপরদিকে ছাত্র সংগঠনগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধ না থাকতে পারে সেজন্য এরশাদ কৌশল অবলম্বন করে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেন। এ অপকৌশলের শিকার হয়ে ছাত্ররা বিভক্ত থেকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে উঠে। আর তাই '৮৬ পরবর্তীকালে পারস্পরিক সংঘাতে বিদীর্ণ হতে থাকে ছাত্র ঐক্য। তা সত্বেও সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার।[২৪]

১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলো মুলতঃ নিজস্ব দাবী দাওয়া ও কর্মসূচী নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। এ সময় ছাত্র নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা স্বীকার করলেও বাস্তবে সে ঐক্য গড়ে উঠেনি, বরং সংগঠনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।[২৫]

অতঃপর স্বৈরাচারের বিদায় বার্তা নিয়ে আসে ১৯৯০ সাল। '৯০ এর ১০ অক্টোবর 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে শুরু হয় দীর্ঘ ৯ বৎসর ব্যাপী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের তুঙ্গস্পর্শী পর্যায়। ঐদিন কর্মসূচী পালনকালে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে অন্যান্যের সাথে নিহত হয় ছাত্রনেতা জাহিদ। জাহিদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ২৪ টি ছাত্র সংগঠন (ইসলামী ছাত্র শিবির বাদে) মিলে দল-মত ও আদর্শগত অনৈক্যের উর্ধ্বে উঠে 'ডাকসু'র (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নেতৃত্বে গঠন করে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য'।[২৬] অতঃপর নেতৃবৃন্দ জাহিদের রক্ত স্পর্শ করে শপথ নেয়, 'এরশাদকে না হটিয়ে আমরা ঘরে ফিরবো না। স্বৈরাচারের পতন না ঘটিয়ে ক্লাসে ঢুকবো না'[২৭] মূলতঃ এভাবেই রচিত হয় গণ-অভ্যুত্থানের ভিত।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে প্রচণ্ড গতি প্রদান করে।

১০ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর হরতাল পালনকালে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশী হামলায় প্রায় সকল সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়।[২৮] এ ঘটনায় আন্দোলন আরও দৃঢ় হয়। অতঃপর চলতে থাকে ছাত্র ঐক্যের বিরামহীন শোকদিবস, বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল সহ বিভিন্ন কর্মসূচী। আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সন্ত্রস্ত সরকার আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য ১৩ অক্টোবর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। এই অবৈধ ঘোষণাকে বৈধ করার জন্য সরকার ১৫ অক্টোবর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন-তখন বন্ধ করার অধিকার সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ জারী করে এবং ১৩ অক্টোবর থেকে অধ্যাদেশটি কার্যকর করে একটি গেজেট প্রকাশ করে। এ অধ্যাদেশটি 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ (শান্তি-শৃঙ্খলা) অধ্যাদেশ'৯০' নামে অভিহিত হয়।[২৯] এবার ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে শরীক হন শিক্ষক সমাজ। ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবে এ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং এ অবৈধ ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন।[৩০] বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ ঘোষণাকে স্বায়ত্বশাসন বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত নেয়। অবেশেষে ১১ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় সরকারী নির্দেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য প্রথম থেকেই এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্যমতের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকে। সেই সাথে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিবৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের মত রাজনৈতিক দলগুলোকে কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।[৩১] এদিকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করতে থাকে।

২৭ অক্টোবর ধর্মঘটে দেশ কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে।[৩২] রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এরশাদ অত্যন্ত ঘৃণিত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে দেশে কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালান। অবশ্য এরশাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই অজুহাতে বিভাগীয় শহরগুলিতে কার্ফু জারীর মাধ্যমে কর্তৃত্ব পুনর্বহাল করা। কিন্তু দ্বিধাহীন চিত্তে ছাত্র-ঐক্য রুখে দাঁড়ায় এবং

নস্যাৎ করে দেয় স্বৈরাচারের সকল চক্রান্ত। শুধু তাই নয়, কার্ফু ভঙ্গ করে রাজপথে সমাবেশ করে ছাত্ররা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে তবেই ঘরে ফেরার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে।[৩৩]

সরকারের দমনু নীতিতে আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে বরং উত্তরোত্তর জঙ্গীরূপ ধারণ করতে থাকে। ছাত্র ঐক্য স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও করতে অগ্রসর হয়। মজার ব্যাপার হলো — ১০ নভেম্বর সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের পতন ঘটানো হবে বলে সংকল্প ব্যক্ত করে।[৩৪] এ ঘোষণাই এরশাদের জীবনে চরম সত্য হয়ে দেখা দেয়।

১৭ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চরম সাহসিকতার সাথে 'গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস' পালন করতে গিয়ে 'মন্ত্রীপাড়া' অবরুদ্ধ করে ফেলে। এ কর্মসূচী আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৯ নভেম্বর ছিল এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সহ সর্বস্তরের জনতার চাপের মুখে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমুহের তিনটি আলাদা জোট ঐদিন ঐতিহাসিক একজোটে উপনীত হয়। এবং যৌথ ভাবে ঘোষণা করে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা'। ঘোষণায় বলা হয় : তিন জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এরশাদ ও তার অবৈধ সরকারের অধীনে কোন জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলসমূহ গ্রহণ করবে না।[৩৫] বিরোধী জোটের এ ঘোষণা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ ছাত্রদের ঐক্যের সাথে যুক্ত হয় দেশের রাজনৈতিক শক্তি।

উপায়ন্তর না দেখে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য জাতীয় পার্টির সভাসমাবেশ ডাকে। কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এই মহাসমাবেশ বানচাল করার জন্য ঐদিন হরতাল আহ্বান করলে সরকারী দল মহাসমাবেশের তারিখ দুই দিন এগিয়ে দেয়। কিন্তু ছাত্র ঐক্য সরকারের কৌশল বুঝে নিয়ে জাতীয় পার্টি যেদিন মহাসমাবেশ ডাকবে, সেদিনই সারাদেশে হরতাল পালিত হবে বলে ঘোষণা করে।[৩৬] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

ছাত্র ঐক্যের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত স্বৈরাচার এরশাদ ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য কুখ্যাত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গোলাম ফারুক অভিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তার বাহিনীকে লেলিয়ে দেন ছাত্র ঐক্যের বিরুদ্ধে। অভি-নীরু বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ চালালে ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিয়ে চরম সাহসিকতার সাথে তা প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও ২৭ নভেম্বর তাদের হিংস্রতায় নিহত হন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডা: শামসুল আলম মিলন।[৩৭] বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা। সরকার শেষ অস্ত্র হিসেবে জারী করে জরুরী অবস্থা ও সান্ধ্য আইন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জরুরী অবস্থা ভঙ্গ করে রাজপথে সমাবেশ করে।[৩৮] দেশব্যাপী শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। কার্যকারিতা হারায় জরুরী অবস্থা ও সান্ধ্য আইন। লাখ লাখ লোক রাস্তায় নামে। গণআন্দোলন রূপ নেয় 'গণ অভ্যুত্থানে'।[৩৯] সরকার আন্দোলন দমন করতে আশ্রয় নেয় হত্যা যজ্ঞের। নিহত হয় বেশ ক'জন আন্দোলন কর্মী।[৪০]

এদিকে জরুরী অবস্থার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি দেশের সকল পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। শিক্ষক সমাজ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে একযোগে পদত্যাগ করেন। ডাক্তারেরা শুরু করেন লাগাতার ধর্মঘট। আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে হাইকোর্টের আইনজীবীরা আদালত বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসেন। পাশাপাশি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কর্মীরা বর্জন করেন স্বৈরাচার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম। অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলো স্ব স্ব কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসে। ৩ ডিসেম্বর স্বয়ং সচিবালয় থেকে ২০৫ জন বি.সি. এস প্রশাসন কর্মকর্তা পদত্যাগ করে রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের সাথে যোগ দেন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। এমন কি প্রভাবমুক্ত ৫৮টি এন.জি.ও. (বেসরকারী সাহায্য সংস্থা) গণ-আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। [৪১] এক কথায় সারাদেশ একবাক্যে এরশাদের পদত্যাগের ধ্বনি তুলে। এ সময় রাজপথে টহলরত পুলিশ, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী মিছিলের প্রতি হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাতে থাকে। [৪২]

এমতাবস্থায় ৩ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল এরশাদ স্বভাব সুলভ শঠতার আশ্রয় নিয়ে শর্তসাপেক্ষে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এরশাদের এ ঘোষণা ছিল স্বৈরা শাসনকে দীর্ঘায়িত করার অপকৌশল মাত্র। কিন্তু ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থান এ ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়। এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে লাখো জনতা পুনরায় পথে নামে। বিরোধী দলসমূহ নতুনভাবে ঘোষণা করে আন্দোলনের লাগাতার কর্মসূচী।

ক্ষমতায় টিকে থাকার সকল পথ রুদ্ধ হলে জেনারেল এরশাদ ৪ ডিসেম্বর নিঃশর্ত পতদ্যাগের ঘোষণা করে দেন। রাত ১০ টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে ইংরেজী সংবাদ চলাকালীন এ ঘোষণা প্রচার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে লাখো জনতার বিজয় মিছিল বের হয় রাজপথে। ঢাকা নগরী হয়ে উঠে 'গণ-অভ্যুত্থানের নগরী'। সফল গণ-অভ্যুত্থানের বর্ণিল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে রাতের ঢাকা শহর। দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক সংবাদ উল্লাস মুখরিত এ আনন্দ মিছিলটিকে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয় অর্জনের সাথে তুলনা করে। [৪৩]

বিরোধী জোট সমূহ ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নাম ঘোষণা করে। ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করে তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। শেষ হয় এরশাদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক ৮ বছর ২৫৬ দিনের দুঃশাসন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান একটি মাইল-ফলক। এ অভ্যুত্থানের প্রথম ও শেষ কর্ণধার ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ নিঃস্বার্থভাবে দেশপ্রেমের সুমহান তাগিদে এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির জন্য সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে যোগ দেয় আপামর জনতা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাড়িয়ে দেয় গণ-অভ্যুত্থানের গতি এবং শ্রমিক সংগঠন ও পেশাজীবী সম্প্রদায় দান করে গভীরতা। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে নিয়ে আসে গণ-অভ্যুত্থানের যৌক্তিক পরিনতি। এক কথায়, সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যাপকভিত্তিক সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে মুক্তি পায় গণতন্ত্র। শুরু হয় নতুন করে গণতন্ত্রের পথ চলা।

সূত্র নির্দেশ

১. শিরীন মজিদ, *শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১১৯।

২. সংবাদ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৮১।

৩. শিরীন মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
৪. এমাজ উদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬।
৫. শিরীন মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৬. *রোববার*, ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৬।
৭. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত*, ঢাকা, ডি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯১। পৃ. ৩৫।
৮. *সংবাদ*, ৮ মে, ১৯৮৬।
৯. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, টাউন স্টোর্স, ১৯৯২, পৃ. ১৫৮।
১০. বিপুলরঞ্জন নাথ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ*,(১৯৬১ .) , ঢাকা বুক সোসাইটি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯২।
১১. মো: রুহুল আমিন, *বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা: একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ১০৪।
১২. মোহাম্মদ খোশবু, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল, *ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ*, *ফেব্রুয়ারী*, ১৯৯১, পৃ. ৩।
১৩. এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
১৪. শিরীন মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪। জেনারেল আইউব খানের আমলে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন), রিপোর্টের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাত্র বিক্ষোভে একাধিক ব্যক্তি নিহত হয়, তাই ১৭ সেপ্টেম্বরকে এ দেশের ছাত্র সমাজ প্রতি বছর 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। দ্রষ্টব্য: আবুল কাশেম, 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন: প্রকৃতি ও পরিধি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪। ১৪০২-০৪, পৃ.১২-৪৩।
১৫. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শরিক দলগুলো হলো : (i) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন ও খ.ম. জাহাঙ্গীর-এর নেতৃত্বাধীন) (ii) বাংলাদেশ ছাত্রইউনিয়ন (খোন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ও আনোয়ারুল হক-এর নেতৃত্বাধীন) (iii) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুনির উদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসিব খান)। (iv) বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী (ফজলে হোসেন বাদশা ও আতাউর রহমান ঢালী) (v) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ফজলুর রহমান পটল ও বাহালুল মজনুন চুন্নু) (vi) বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (আসাদুল্লাহ তারেক)। (vii) বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (মিজানুর রহমান মানু)। (viii) বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (আশরাফ গিরানী)। (ix) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দিন বাবলু)। (x) জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন। (xi) ছাত্রলীগ (প্রধান)। (xii) ছাত্রঐক্য ফোরাম। (xiii) সমাজবাদ ছাত্র জোট। (xiv) জাতীয় ছাত্র সংসদ। (সূত্র : মোহাম্মদ খোশবু, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদ সময়কাল*, পৃ ১২৮)
১৬. মোহাম্মদ খোশবু, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২।
১৭. ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫টি রাজনৈতিক দল মিলে গঠিত হয় '১৫ দলীয় জোট' এবং পরবর্তীতে বি.এন. পি.-র নেতৃত্বে ৭টি দল মিলে গঠিত হয় '৭ দলীয় জোট'। জোট দুটিকে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও অবাধ নির্বাচনের দাবী জানায়। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোট ভেঙ্গে '৮ দলীয় জোট' ও '৫ দলীয় জোট' গঠিত হয়।
১৮. ১০ দফার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো : সার্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাখাতে বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ, চাকুরীর বয়স সীমা ৩০ বছর নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে একজন শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিয়োগ, বিশেষ ট্রাইবুনালে এরশাদের বিচার ইত্যাদি। আরো দেখুন: খালেকুজ্জামান, *কেন ছাত্রসমাজ রাজনীতি করবে ?*, ঢাকা, ছাত্রফ্রন্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯-৪৫।
১৯. মোহাম্মদ খোশবু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
২০. তদেব, পৃ. ৩০-৩১।
২১ মেজর রফিকুল ইসলাম, পি.এস.সি. *স্বাধীনতার বাইশ বছর*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৩।
২২. শিরীন মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।
২৩. মোহাম্মদ খোশবু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
২৪. এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

২৫. রফিকুল ইসলাম, পি. এস. সি., প্রাগুক্ত, পৃ। ১৫৮।

২৬. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের শরিক দলগুলো হলো: (i) ডাকসু ; (ii) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ); (iii) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল; (iv) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ); (v) বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন; (vi) বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী; (vii) জাতীয় ছাত্রলীগ; (viii) গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন; (ix) বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন; (x) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সা-সা); (xi) বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি; (xii) বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (আবু); (xiii) বিপ্লবী ছাত্র ধারা; (xiv) বিপ্লবী ছাত্রমঞ্চ; (xv) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (লু-আ); (xvi) গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ; (xvii) গণতান্ত্রিক ছাত্রকেন্দ্র; (xviii) ছাত্র ঐক্য ফোরাম (মিণ্ড); (xix) ছাত্র ঐক্য ফোরাম (জায়েদ); (xx) গণতান্ত্রিক ছাত্র একতা; (xxi) জাতীয় ছাত্র ঐক্য; (xxii) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মোশারফ); (xxiii) জাতীয় ছাত্রদল; (xxiv) সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। (সূত্র : খালেকুজ্জামান, *কেন ছাত্র সমাজ রাজনীতি করবে?*, পৃ. ৪৭)। নোট : বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে একই নামে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ পালনকারী একাধিক সংগঠন সক্রিয় আছে। এই সংগঠনগুলোর একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করার জন্য স্ব স্ব সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নামের সাথে বন্ধনীর মধ্যে সংযুক্ত করে লেখা হয়ে থাকে।

২৭. এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ অক্টোবর, ১৯৯০।

২৯. *সংবাদ*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯০। 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ (শান্তি-শৃঙ্খলা) অধ্যাদেশ'৯০'-এ বলা হয় : আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের কাছে যদি অসন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কোন বিশৃঙ্খলা বা জন শৃঙ্খলা হানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব, শিক্ষার পরিবেশ, স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সরকার এক মাসের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করার অদেশ দিতে পারবে। এই আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সরকার আর-একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এক মাসের অধিক হবে না বৃদ্ধি করতে পারবে। অধ্যাদেশটির সংজ্ঞায় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বলতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষাদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। *সংবাদ*, *১৭ অক্টোবর*, ১৯৯০।

৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮, ১৯৯০।

৩১. *সংবাদ*, ১৬,২০, ২৪ অক্টোবর, ১৯৯০।

৩২. ঐ, ২৮, অক্টোবর, ১৯৯০।

৩৩. ঐ, ৫ নভেম্বর, ১৯৯০।

৩৪. মোহাম্মদ খোশরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

৩৫. আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, *৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, পাণ্ডুলিপি, ১৯৯১, পৃ. ১৭৫। আরো দেখুন : খালেদা হাবিব, *বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীসভা* ১৯৭১-৯১, ঢাকা, এ.আর. মুর্শেদ, ১৯৯১। পৃ. ১১৬-১১৭।

৩৬. *সংবাদ*, ২২ নভেম্বর, ১৯৯০।

৩৭. ঐ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৩৮. ঐ , ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৩৯. এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৪০. *সংবাদ*, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৪১. ঐ , ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৪২. শিরীন মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

৪৩. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

বাংলাদেশ-দর্শন : বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ

এন. এইচ. এম. আবু বকর

প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রধানত প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী দার্শনিক সম্প্রদায় ও তাদের মতবাদসমূহ নিয়েই দর্শনের চর্চা অব্যাহত ছিল। তবে মধ্যযুগে আংশিক ইসলামী দর্শনের চর্চা শুরু হলে বৈশিষ্ট্যগত কারণে তাও বাঙালির পরলোকধর্মী মোক্ষকামী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায়। উপনিবেশিক আমলে ইংরেজরা যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক দার্শনিক চিন্তাধারা তখন থেকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হতে থাকে। সমকালীন প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদসহ সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য দর্শন ও তার ইতিহাসের সঙ্গে এ সময়েই বাঙালির পরিচয় ঘটে এবং একই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অধ্যাত্ম সচেতন জীবন বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গির বদলে একটা প্রত্যক্ষবাদী, জাগতিক গুরুত্ব আরোপকারী জীবন ভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক ঐতিহ্য, কুসংস্কার ও অন্ধ লোক-বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের কারণে এই জীবন ভাবনা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় না। বিভাগ পূর্বকাল থেকে ভারতীয় মুসলিম দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য দর্শন এভাবেই পরবর্তী সময়ে বাঙালির চিন্তা চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই দার্শনিক সম্প্রদায় মূলত স্বাজাত্যবোধ থেকে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। ফলে এর গতি প্রকৃতি নিয়ে প্রথম থেকেই কিছু বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আশির দশকের শেষদিক পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের [১] মধ্যেই এই বিতর্ক তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। কিছু নতুন তথ্য উপস্থাপন ও দিক নির্দেশনার জন্য এসব প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্যের বিকাশধারা বিশ্লেষণের জন্য সব লেখা আবার সমমানেরও নয়। আলোচনায় বাঙালির নব্য-ন্যায়সহ ষড়দর্শনের নানা টীকা ভাষ্যের উল্লেখযোগ্য পারদর্শীতার ইঙ্গিতসহ এসব প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার বিশেষ দর্শন হিসেবে বৈষ্ণব, বাউল, ভক্তি, বৌদ্ধ সহজিয়া ও সূফী দর্শনের কথা যেমন আলেচিত হয়েছে তেমনি বাঙালির মানস গঠনে মার্কসীয় দর্শনসহ বিভিন্ন আধুনিক ও সমকালীন দর্শনের প্রভাবের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন লেখক-গবেষক এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ড: মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী (১৯৪২-১৯৯১)[২] উল্লেখযোগ্য। তাঁর গ্রন্থটির শিরোনাম *বাংলাদেশ-দর্শন* (মিতা ট্রেডার্স, চট্টগ্রাম, ১৩৯৮/১৯৮৮)
।

এই গ্রন্থটিতে মূলত বাঙালি জাতির মানস গঠন ও চিন্তা বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতসহ কতিপয় দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভূমিকায় লেখক গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে মন্তব্যে বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্ভুত ও অনুশীলিত দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা (পৃ. ।।) এবং সর্বোপরি প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনুশীলিত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা (পৃ.।৮)। এই গ্রন্থটির তথ্যগত উৎস সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, 'মূখ্যত তথ্য উপস্থাপনাকে প্রাধান্য দেয়া হলেও প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণও এখানে স্থান পেয়েছে'। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল লেখকের এই মন্তব্যগুলোর যথার্থতা (পৃ. ।।) এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের উৎকর্ষ ও সীমাবদ্ধতা বিচাব করা।

প্রথম অধ্যায়ে 'বাংলাদেশ-দর্শন ও প্রাসঙ্গিক সমস্যা' শিরোনামের ভূমিকায় লেখক দেশ পরিচিতির সঙ্গে অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন; সেই সঙ্গে এতে কাল নির্দেশবিহীন যুগ বিভক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে উদ্ভুত ও অনুশীলিত তত্ত্বধারার ঐতিহাসিক রূপরেখা আলোকপাত প্রসঙ্গে শুধু কোন যুগে কোন দার্শনিক-চিন্তাবিদ কী বিষয়ে চর্চা করেন পর্যায়ক্রমে তাঁদের নামোল্লেখ করেন — কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ। এতে প্রাসঙ্গিক দার্শনিক সমস্যাসহ তাঁদের তত্ত্ব ও সাহিত্যের কোন উল্লেখ লক্ষণীয় নয়। অন্যান্য অধ্যায়ে বাঙালি মানসে 'বেদান্ত দর্শন', 'প্রেম দর্শন' ইত্যাদির চর্চা ও প্রভাব এবং 'বাংলাদেশে সমাজ সংস্কার আন্দোলন', 'বুদ্ধিবাদ বা মুক্ত-বুদ্ধির আন্দোলন', 'মানবতাবাদ', 'উপযোগবাদ' ও 'মার্কসীয় দর্শন' ইত্যাদি বিষয়ে যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়। ইচ্ছে করলে আরও কম সংখ্যক অধ্যায়ে সেসব বিষয় বিন্যস্ত করা যেত। সামঞ্জস্যহীন বিন্যাসের কারণে গ্রন্থে এক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয়ে অন্য অধ্যায়ে বা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন: পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও বৈষ্ণবদের প্রেম দর্শন ইত্যাদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (বেদান্ত দর্শন) এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলন ও পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত 'সুফীবাদ' তৃতীয় অধ্যায়ে (মুসলিম দর্শন) সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা স্বাভাবিক ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থে আলোচিত বিষয় বস্তুকে উপরোক্ত দশটি অধ্যায়ের পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক ভূমিকাসহ বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, মুসলিম দর্শন, মার্কসীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন ও সমকালীন বাংলাদেশ দর্শন এই কটি অধ্যায়ে অথবা অন্য ফরমে (ভূমিকাসহ) বাঙ্গালীর ধর্ম-দর্শন, সমাজ-দর্শন, রাষ্ট্র-দর্শন, নীতি-দর্শন, প্রেম-দর্শন, মানবতাবাদী-দর্শন — এইভাবে বিষয়বস্তু, আলোচনা পদ্ধতি এবং তথ্যসমূহও বিচার্য। প্রথম দৃষ্টিতে পুস্তক-শিরোনাম, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রচুর পাদটীকা দেখে *বাংলাদেশ-দর্শন* গ্রন্থটিকে সত্যি সত্যিই লেখক বর্ণিত (পৃ.৪) 'দুর্বোধ্য তত্ত্বধারার একটি দার্শনিক গ্রন্থ বলে মনে হলে'ও পরবর্তীতে সে ধারণা টিকিয়ে রাখা যেকোন সচেতন পাঠকের পক্ষেই কষ্টকর। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর তথ্যগত উৎস সম্পর্কে লেখকের ভাষ্য যেমন সন্দেহ মুক্ত নয়, তেমনি আলোচনা পদ্ধতিতেও দর্শন চর্চার ইতিহাস রচনার ধারা অনুসরণ করা হয়নি। দ্বিতীয় (বেদান্ত দর্শন), তৃতীয় (বৌদ্ধ দর্শন) ও পঞ্চম অধ্যায় (প্রেম দর্শন) বাদ দিলে গ্রন্থটির অন্য কোন অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা তেমন নেই। প্রথমোক্ত অধ্যায় দুটিতে যথেষ্ট অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাও বিদ্যমান। এ ধরনের আলোচনা দর্শনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিষয়ক

মতবাদের সঙ্গে কোনভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়। দর্শনের ইতিহাস হচ্ছে বিশ্বের দার্শনিক জ্ঞানের প্রক্রিয়া বিশেষ, একে অবশ্যই মানুষের জ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং এর আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও যুক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বাঙালী 'মানসে বেদান্ত দর্শন' (পৃ.১৭-১৮) নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শনের অংশ হিসেবে অধিকাংশ পরিসরে বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। আলোচনায় মাধব এবং, বল্লভের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দর্শনের সংক্ষিপ্তসার বিচ্ছিন্নভাবে এলেও বাংলাদেশে বেদান্ত দর্শন আর কোন চিন্তাবিদের মাধ্যমে কখন কিভাবে অনুশীলিত হয়েছে এবং তাঁদের অনুশীলনের ধারাটাই বা কি ছিল, এসব বিষয়ে এ অধ্যায়ে তিনি আর কিছুই উল্লেখ করেননি। লেখক ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে 'বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান গ্রন্থাগারগুলোতে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়েছেন বলে উল্লেখ করলেও তাঁর লেখায় রাজা রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) যে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম বেদান্তের অনুবাদ ও আলোচনা করে একটি নবীন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গিয়েছেন এবং তাঁর পথ ধরে দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) চন্দ্রশেখর বসু (১২৪০-১৩২০ ব.), অরবিন্দ (১৮৭৩-১৯৫০), ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বেদান্ত দর্শনের চর্চা করেছেন সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। তৎপরবর্তী সময়েও আর যাঁরা বেদান্ত চর্চা করেছেন বা করছেন সে বিষয়ে লেখক কোন তথ্য উপস্থাপন করেননি। উল্লেখ্য যে, রামমোহন পূর্ব সময়ে এদেশে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই হয়েছে এবং সে সময় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, আচার্য জ্ঞানোত্তম, মধুসূদন সরস্বতী, প্রমুখ মণীষী, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে সেসবেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

তবে গ্রন্থকার রামমোহনকে বাদ দিয়েছেন তাও নয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রামমোহনের ভূমিকা ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে সমাজ সংস্কারকের, অষ্টম অধ্যায়ে তিনি উপযোগবাদী মানবতাবাদী এবং নবম অধ্যায়ে আবার তাঁকে উপযোগবাদী হিসেবে আলোচনায় টেনে আনা হয়েছে, অথচ রামমোহনের এই বহুমুখি ভূমিকার পশ্চাদ্‌পটে যে তাঁর বেদান্ত চর্চা সে বিষয়টি মোটেও উল্লেখ করা হয়নি। বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্যের সাহায্যে তিনি বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের পরিপোষক অসম্প্রদায়গত একত্ববাদ ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করেন। এর পেছনে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সংযোগ। রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থগুলো হচ্ছে, *বেদান্তগ্রন্থ* (কলিকাতা, ১৮১৫) — *ব্রহ্মসূত্রের সমূল আলোচনা, বেদান্তসার* (কলিকাতা,১৮১৫)— *ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা, তবলকারোপনিষৎ/কেনোপনিষৎ* (কলিকাতা,১৮১৬) — *মূল ও অনুবাদ*, এবং *মণ্ডুকোপনিষদ* (১৮১৯) — মূল ও অনুবাদ।[৩] এছাড়া একেশ্বরবাদ বা ব্রাহ্মবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর অন্যান্য রচনাও রয়েছে।[৪] বস্তুত রামমোহন নির্দেশিত পথেই ঊনবিংশ শতাব্দিতে মানুষকে কেবল সমাজ ও সম্প্রদায়গত দিক থেকে না দেখে একটি সার্বিক মানবিক পটভূমিতে দেখার প্রবণতা তৈরী হয়ে উঠে। পরবর্তী সময়ে স্বামী বিবেকানন্দও এই সার্বিকতা সন্ধানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। বিবেকানন্দের বেদান্ত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে *Practical Vedanta, Many and Illusion, Maya and Freedom, What is Religion* ও *Karmayoga*।[৫]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও সেই সার্বিক অনুভূতির প্রকাশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাঁর *শান্তিনিকেতন ভাষণমালা,* খণ্ড:১-১৭ (১৯০৯-১৯১৬). *Religion of Man* (1933) গ্রন্থে এই ধারণা পরিস্ফুট। বর্তমান বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গেও বেদান্তের চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

'বৌদ্ধ দর্শন' (পৃ. ২৮-৩৪) শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের কাহিনী, বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত, বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যের পরিচয়সহ বৌদ্ধ ধর্মের সার-সংক্ষেপ বিবৃত করলেও এ অধ্যায়ের শেষে মাত্র পনের লাইনে বাংলাদেশে যাঁরা বর্তমানে বৌদ্ধ দর্শন চর্চা করছেন তাঁদের নামের একটি তালিকা দিয়েছেন এবং সেটিও অসম্পূর্ণ। এ অধ্যায়ের কোথাও বাংলাদেশে বৌদ্ধ দর্শন চর্চার বৈশিষ্ট্য বা এদেশে বৌদ্ধ দর্শন চর্চার বিকাশের কোন বর্ণনা নেই। বরং বুদ্ধের জীবন আলোচনায় কিছু ভুল তথ্য লক্ষণীয়।[৬]

তবে লেখক সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ দর্শন চর্চা হয়েছিল (পৃ.৩৪) 'কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তিনি শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর ও চন্দ্রগোমীর নাম উল্লেখ ছাড়া অন্য কোন তথ্য বা নিদর্শনের উল্লেখ করেননি। বস্তুত মৌর্য সম্রাট অশোকের পূর্ব থেকেই বৌদ্ধদর্শন প্রাচীন বাংলার কোন কোন স্থানে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। সেই থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আভ্যন্তরীণ বিবর্তন ধারায় যে সব বাঙালি মনিষীর রচনা প্রাক আধুনিক যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের বিকাশে ভূমিকা রাখে তাঁদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত, কমলশীল, শান্তি দেব, কুমার বজ্র, দিবাকর চন্দ্র, জেতারী, জ্ঞানশ্রী।মত্র, রত্নাকর শান্তি, অভয়াকর গুপ্ত, দানশীল ও প্রজ্ঞাবর্মার নাম উল্লেখযোগ্য।[৭] মহাযানী ও মাধ্যমিক দর্শনের উপর অনেক টীকা-ভাষ্য, মৌলিক গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা ছাড়াও এঁদের কেউ কেউ নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার দর্শনের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।[৮] সমকালীন বাংলাদেশে যাঁরা বৌদ্ধ দর্শনের চর্চার সঙ্গে জড়িত তাঁদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে লেখক শুধু নীরু কুমার চাকমা, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ও জি. সি. দেবের কথা উল্লেখ করেছেন। নামোল্লেখেই যদি আলোচনার পূর্ণতা আসে, তবে অন্তত এই অসম্পূর্ণ তালিকায় দুই বাংলার আরও যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল তাঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেনীমাধব বড়ুয়া, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।[৯] এঁদের প্রত্যেকেরই বৌদ্ধ দর্শনের উপর এক বা একাধিক গবেষণা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'মুসলিম দর্শন' (পৃ. ৩৫-৪১) আলোচনা করতে গিয়েও লেখক তৃতীয় অধ্যায়ের মত প্রচুর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এদেশে ইসলাম প্রচারের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত যাঁরা মুসলিম দর্শনের চর্চা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে এবং তাঁদের তত্ত্বালোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা যেখানে প্রয়োজন ছিল লেখক সেখানে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম দর্শনের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস। লেখক 'বাংলাদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দী হতেই ব্যাপক অর্থে মুসলিম দর্শনের চর্চা হয়ে আসছে (পৃ.৪০) একথা উল্লেখ করলেও তা তথ্য সমর্থন পায়নি। অন্যত্র বিগত কয়েক দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী দর্শন চর্চায় অবদানের ক্ষেত্রে লেখক যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন সে তালিকায় লেখকের আলোচনা পদ্ধতি অনুসারে আরও যাঁদের নাম সংযোজন করা যেত তাঁদের মধ্যে সেরাজুল হক, এম. মিজানুর রহমান, সোলায়মান আলী সরকার, রশীদুল আলম, এ. কিউ.

ফজলুল ওয়াহিদ, আবদুল মতিন, মঈনুদ্দিন আহমদ খান, আবদুল হক, মোহাম্মদ শাহজাহান, আ. ন. ম. ওয়াহিদুর রহমান ও মো: বদিউর রহমান অন্যতম। এসব শিক্ষাবিদদের প্রত্যেকেরই মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণালব্ধ প্রকাশনা রয়েছে।[১০] এঁদের গবেষণার ধারা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার জন্য রীতিমত আলাদা গবেষণা নিবন্ধের প্রয়োজন। এছাড়া লেখক উনবিংশ শতাব্দিতে মুসলিম দর্শনের উপর যুগান্তকারী কর্মকৃতির জন্য খ্যাতিমান পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলী, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন ও রাজা রামমোহনের নামও উল্লেখ করতে পারতেন।[১১] অন্যান্য পেশায় জড়িত থেকেও সমকালীন বাংলাদেশে আরও যাঁরা মুসলিম দর্শনের উপর গ্রন্থ রচনার জন্য উল্লেখযোগ্য, তাঁদের বিষয়েও কোন তথ্য তিনি উল্লেখ করেননি।[১২]

'প্রেম দর্শন' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃ.৪২-৫৪) বাঙালির 'প্রেম দর্শন' হিসেবে লেখক বৈষ্ণববাদ, সুফীবাদ ও বাউলবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং প্রেম দর্শনের কয়েকজন মনীষী হিসেবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, জি.সি. দেব ও আবদুল মতিনের প্রেম দর্শন সম্পর্কিত বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। গ্রন্থের শুধু ঐ অধ্যায়টি তুলনামুলকভাবে তথ্যপূর্ণ হয়েছে। এধরনের একটি বিষয় উপস্থাপনের জন্য লেখক প্রশংসার দাবীদার। তবে বাঙালির প্রেম দর্শন বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য অন্তত যাঁদের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, ননীগোপাল গোস্বামী, বিমানবিহারী মজুমদার, এনামুল হক, মালাধর বসু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস, পিযুষ কান্তি মহাপাত্র, কাজি নাসির, সোলায়মান আলী সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৩] ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম-এ তিনটি অধ্যায়কে দর্শন বিষয়ক আলোচনা বলা কঠিন। যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলন' (পৃ. ৫৫-৬৯) সম্পর্কে লেখক ওয়াহাবী, ফরায়েজী ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের যে সাধারণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে বাংলাদেশের দর্শনের যোগ কোথায় তা বোঝা মুশকিল। একইভাবে সপ্তম অধ্যায়ে 'মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক উনবিংশ শতাব্দির বাংলায় মুক্তবুদ্ধির সূচনাসহ 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি', 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' ইত্যাদির কার্যক্রমের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের দার্শনিক তাৎপর্যের ধারে কাছেও যাননি। নবম অধ্যায়ে (পৃ. ১০২-১১১) লেখক বাংলায় উপযোগবাদের অনুপ্রবেশ আলোচনা করতে গিয়ে মূলত পাক-ভারত উপমহাদেশে কিভাবে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), মিল ও স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) মাধ্যমে উপযোগবাদ অনুপ্রবেশ করে তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন। 'উপযোগবাদ ও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আলোচনায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার (১৮২০-১৯৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ ১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) সতীনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ চিন্তাবিদ্দের উপর কিভাবে উপযোগবাদের প্রভাব পড়ে তা আলোচিত হলেও এঁদের উপযোগবাদের বিশিষ্ট দিকগুলোর উপর যে আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল তা বস্তুত অনুপস্থিত। বাংলায় উপযোগবাদী প্রভাবের ফলে সংঘটিত কিছু সংস্কার সম্পর্কে লেখকের আলোচনার ধরন হচ্ছে 'রাজা রামমোহন রায়ের সাথে উপযোগবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। উপযোগবাদী বেন্থামের সাথে তাঁর পত্র বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। তিনি লন্ডনে বেন্থামের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখাও

করেছিলেন। রামমোহন রায় জেমস মিলেরও প্রভাবে পড়েছিলেন। এই ধরনের আলোচনা থেকে রামমোহনের উপযোগবাদ সম্পর্কে কী ধারণা করা যায়? রামমোহনের রচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে অন্তত এধাবণাটি আছে যে বেন্থামের প্রভাবেই বামমোহন প্রকৃতি ও অধিকার প্রত্যয় মানতেন না এবং সে প্রভাবেই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন। তবে বেন্থামের সঙ্গে একটা বিষয়ে তাঁর পার্থক্য ছিল। বেন্থাম মনে করতেন, দুনিয়ার সব জাতিই দেশ, কাল, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে মূলত একই ধারায় গঠিত, যে কোন দেশের মানুষকে এই আইন দ্বারা চালিত করা যায়। পক্ষান্তরে বামমোহন বিশ্বাস করতেন, বিশ্বের সব মানুষের জীবন একই ধাঁচের আইনে চলতে পারে না। ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারেই প্রত্যেক দেশের আইন-কানুন রচিত হওয়া উচিত।[১৪] 'অক্ষয়কুমাবের উপযোগবাদ আলোচনা প্রসঙ্গেও লেখকের সীমাবদ্ধতা বয়েছে। লেখক অক্ষয়কুমারের উপাসনায় অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করার বিখ্যাত সমীকরণটি হাজির করেছেন। কিন্তু উপযোগবাদী হিসেবে অক্ষয়কুমার যে সুখকে সার্বজনীন সুখ হিসেবে দেখতেন এবং সুখকে মানুষের বিকাশেব দিক থেকে দেখাই তার উপযোগবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল[১৫] — এসব অতি প্রয়োজনীয় তথ্য পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'মানবতাবাদ' (পৃ. ৮৪-১০২)। এ অধ্যায়ে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অধ্যায়েব মতো লেখকের আলোচনায় অ-দর্শন সুলভ ব্যাখ্যার আধিক্য যে-কোন সচেতন পাঠকেরই দৃষ্টিগোচর হবে। সেই সঙ্গে এ অধ্যায়ে বাক্য গঠনে অসতর্কতা এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল পরিবেশনও রয়েছে। এ অধ্যায়ের বিষয়কে লেখক তিনভাবে ভাগ করেছেন — 'মানবতাবাদ: পাশ্চাত্য', 'মানবতাবাদ : বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশে মানবতাবাদ : কয়েকজন মনীষী'। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস থেকে এই শতাব্দির বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) পর্যন্ত মানবতাবাদী দার্শনিকদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কালক্রমের দিক থেকে বার বার উল্লম্ফন ঘটিয়েছেন। তবে পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনার চেয়ে এখানে প্রাচ্য চিন্তায় মানবতাবাদ আলোচনা অধিকতর কাম্য ছিল। যা হওয়া উচিত ছিল ভূমিকার পটভূমি, তাঁকে তিনি করেছেন বিষয়; যা হওয়া উচিত বিষয় তাঁকে তিনি টপকে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিকদের মানবতাবাদী আখ্যায়িত করতে তিনি যতটা আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য উল্লেখে ততটা আগ্রহী মনে হয়নি।

এভাবে বাংলাদেশে মানবতাবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক প্রাক্ ঐতিহাসিক কাল থেকে এদেশে পারলৌকিক মানবতাবাদ ও ইহজাগতিক মানবতাবাদ — এই দু'ধরনের চিন্তাধারা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন (পৃ.৮৬), কিন্তু কোন মানবতাবাদের কী বৈশিষ্ট্য এবং কারা কিভাবে এ দু'ধরনের মানবতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার বিবরণ ও প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য তিনি উপস্থাপিত করেননি। বরং পরস্পর বিরোধী বাক্য ব্যবহার করে বিষয়টা গুলিয়ে ফেলেছেন। যেমন: 'বাংলাদেশে মানবতাবাদ একটি নতুন দর্শন এবং প্রাক্ ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত এর উৎস এদেশে বিস্তৃত' (পৃ.৮৬)। পাঠক এখানে কোনটাকে সঠিক বলে ধরে নেবেন। মানবতাবাদ এদেশে নতুন দর্শন না পুরাতন দর্শন ? ইউরোপ ও আমেরিকায় সংঘটিত খ্রিশ্চিয়ান ইউনিটারিয়ান আন্দোলনের সময়কাল সম্পর্কেও তিনি একই অধ্যায়ে দু'রকম লিখেছেন — ১৮২০-র দশক (পৃ.৯০) এবং ১৮৩০-র দশক (পৃ.৮৫)। আসলে ১৫৫৩ সালে জেনেভায়

প্রোটেস্ট্যান্ট অধিপতি জন ক্যালভিনের হাতে খ্রিস্ট ধর্মীয় ত্রিমূর্তির বিরোধিতাকারী লেখক মিগুয়েল সার্ভিটাসের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে খ্রিশ্চিয়ান ইউনিটারিয়ান আন্দোলনের সূচনা হয়।[১৬] মিগুয়েল সার্ভিটাস ঘোষণা করেছিলেন যে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা ত্রিমূর্তি রূপে ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা একাধাবে কতক পাগলামির উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মগ্রন্থে এর কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, মানবিকতাই যীশু খ্রিস্টের প্রাণ, তার মধ্যে অমানবিকতার স্থান নেই। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর এদের বিরোধিতা করে এবং যে গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর এমত প্রচারিত হয়েছিল তা নিষিদ্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে ইউনিটারিয়ান আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রসাব লাভ করে। আমেরিকায় তার অন্যতম নেতা ছিলেন মনিষী ও লেখক এমারসন (১৮০৩-১৮৮২)। এই আন্দোলন থেকেই 'ধর্মীয় মানবতাবাদ' নামক মতবাদের উদ্ভব হয়। ১৮৩৩ সালে তারই পক্ষ থেকে 'মানবতাবাদী ইস্তাহার' প্রকাশ এক স্মরণীয় ঘটনা। ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল এ আন্দোলনের মূলমন্ত্র।[১৭] বস্তুত ১৮২০-এব দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে এই ইউনিটারিয়ান আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়ে। রাজা রামমোহন রায় এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সে সময়েই খ্রিস্টধর্মের প্রচলিত ত্রিত্ববাদ, খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ববাদ, খ্রিস্টেব রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারী মার্শম্যান ও ড. টাইলারের সাথে পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রচণ্ড মসীযুদ্ধ লেগে যায়। ঐসব তর্ক যুদ্ধ রামমোহনের অনুকূল হয়। পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডাম নিজ মত পরিত্যাগ করে রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত হন।[১৮] এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখকের বর্ণনায় আসেনি। লেখক অ্যাডাম সম্পর্কে যে একটি বাক্য ব্যবহার করেন (পৃ.৯০) তা দিয়ে কোলকাতায় সংঘটিত ইউনিটারিয়ান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ চন্দ্র দেবেব মানবতাবাদ বিষয়েও লেখকের আলোচনা থেকে তাঁদের মানবতাবাদেব স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন। গোবিন্দ চন্দ্র দেবেব মানবতাবাদ (পৃ.৯৯-১০২) আলোচনার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর জীবন কাহিনী ও প্রকাশনার বিস্তারিত তালিকা। এ থেকে তাঁর মানবতাবাদী তত্ত্বের আংশিক ধারণা পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বিষয়ক অলোচনাটিকে (পৃ ৯৫-৯৭) এক বকম ভ্রান্ত উপস্থাপনা বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা সমগ্রে বিধৃত ও ক্রমান্বয়ে বিকশিত তাঁর মানবতাবাদ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ বক্তব্যের মধ্য থেকে লেখক খণ্ডিত ভাবে যে ধরনের অস্পষ্ট প্রতিপাদ্য দাঁড় করিয়েছেন কবির প্রতি তা এক ধরনের অবিচার। লেখক 'কবির *গীতাঞ্জলী, পূরবী, চৈতালী, বলাকা* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে এবং 'ক্যাথলিক সোস্যালিজম', 'সোসালিজম' ইত্যাদি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলেন যে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন, যেহেতু তিনি বর্ণবাদ বিরোধী, সমাজতন্ত্রের সমর্থন ও নির্যাতিত সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারায় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ ও ঈশ্বর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটি আলংকারিক চিত্র পাওয়া যায় যা ধর্মীয় ও নৈয়ায়িক দিক থেকে প্রশ্ন সাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে, পরম সত্তার আদিতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্ভুত দার্শনিক তর্ক-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের মহানুভবতা উপলব্ধি করানোই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। মানুষের অতি সাধারণ জীবিকা কর্মেও / শক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি মানুষ সৃজনশীল পরম সত্তার প্রতিবিম্বমাত্র এবং মানবদেহ ঈশ্বরের সৃজনশীল পরীক্ষা নিরীক্ষার আধার। তাই

ঈশ্বর তাঁর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মকে বাহ্যজগত ও মানুষের মধ্যে মুক্তি দিয়ে দেন।[১৯] এইভাবে ব্যক্তিত্বের অন্তরেই অন্তর্যামী পরম পুরুষ বাস করেন। অর্থাৎ বাহ্যজগৎ অপেক্ষা সসীম মানুষের আত্মার মধ্যেই অসীম পরমসত্তা বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়ের এই সার্বিক ধারণা ও চেতনাই শুভ ও সুন্দরের উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষকে তার নিত্য দহনকারী শৃঙ্খলার বিভ্রান্তি, সামাজিক অনাচার ও অবক্ষয় থেকে অব্যাহতির পথ দেখায়। [২০] একজন শ্রেষ্ঠ উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও শান্তিবাদী মানব প্রেমিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আরও বিশ্বাস করতেন — মানুষের কোন পতনই চূড়ান্ত নয়; শান্তির পথে, মহৎ মানুষের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শের টানে পতিত মানুষের আত্মসংশোধন ঘটতে পারে এবং ঘটতে বাধ্য, তাঁর জন্য রক্তাক্ত বিপ্লব আবশ্যক নয়। তবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবাদী চিন্তার উত্তরণ চেষ্টা লক্ষণীয় — রাশিয়ার চিঠি এই উত্তরণ চেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। উদারনৈতকতাবাদ, শান্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ এবং শুচিশুভ্র প্রেমের বিপরীতে গণমুক্তি, সাম্য, শিক্ষা, স্বাচ্ছল্য স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন এবং বিপ্লব বিষয়ক ভাবনা তাঁকে খানিকটা দোদুল্যমান করে তোলে। তবে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি তাঁর অভ্যস্থ চিন্তার সীমানা পার হয়ে যাননি। শুধুমাত্র বিপরীত দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখে গিয়েছেন। *বিসর্জন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, চার অধ্যায়* ইত্যাদি নাটক-উপন্যাসে তাঁর দেশ ভাবনা ও কর্মধারার এই মানসিকতার পরিচয় মেলে। এসব প্রয়োজনীয় তথ্যকে পাশ কেটে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বিষয়ক আলোচনা এ বিষয়ে যে কোন প্রথম পাঠক বা শিক্ষার্থীকেই ভুল ধারণা দেবে বলে আমাদের ধারণা।

এ অধ্যায়ে লেখক একটি অবাস্তব ও স্বকপোল কল্পিত তথ্যও হাজির করেছেন। যেমন: 'বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে সংঘটিত মানবতাবাদী আন্দোলন' (পৃ.৯৫)। এধরনের ভিত্তিহীন তথ্যের পরিবেশনার কারণে লেখকের ইতিহাস সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এ অধ্যায়ে অন্য একটি বিষয় সম্পর্কেও লেখকের ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়, তা হচ্ছে মার্কসীয় মানবতাবাদ। মার্কসীয় মানবতাবাদ বলতে লেখক আগাগোড়াই মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ বা তার ভাবানুসারীদের কথা বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ বা র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদ থেকে মার্কসীয় মানবতাবাদ ভিন্ন জিনিস। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় মানবতাবাদ সামাজিক শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির মাধ্যমে সব মানুষের সুষম ও সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম বিনির্মাণের দাবী করে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মুক্তি সম্ভব।[২১] এর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের 'নব মানবতাবাদের' পার্থক্য রয়েছে। তাঁর 'নব-মানবতাবাদ' ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রবোধের প্রাধান্যসহ ব্যক্তি মানুষ ও সমাজ প্রশ্নে মার্কসীয় মতবাদ থেকে ভিন্নতর। এছাড়া 'নব-মানবতাবাদ' সম্পর্কেও লেখকের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট ও খণ্ডিত।

লেখক ব্যক্তি ও সমাজ প্রশ্নে 'নব-মানবতাবাদের' সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের বিরোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের উৎস মূলে যে মানুষের স্থায়ী মূল্যবোধ বিষয়ক চিন্তাধারা কাজ করেছে সে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেননি। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ তাঁর নব মানবতাবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির স্থান ও অধিকার শুধু সমাজে নয় পরিবারেও সবার আগে মনে করতেন। তাঁর মতে সমাজের উৎপত্তি ব্যক্তি মানুষের স্বতঃপ্রনোদিত

সংঘবদ্ধতার তাগিদেই ঘটে। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেন। তিনি মনে করতেন বিশ্ব বিবর্তন ধারায় উদ্ভূত জীবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হলো মানুষ।[২২] বস্তুত মার্কসবাদী দর্শনের ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়েও মানবেন্দ্রনাথ এভাবে মার্কস উত্তর বিশ্বে কিছু প্রাক্-মার্কসীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে স্বভাবগত যুক্তি সাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ক্রমে তাঁর নব মানবতাবাদে উপনীত হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দির বস্তুবাদীদের মতো বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, মনুষ্য চরিত্রে বহু কিছু গুণ আছে যা চিরন্তন। এর ভিত্তিতে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, অধিকার ও দায়িত্ববোধের পশ্চাদ্ভূমি হল দৃঢ় ও স্থায়ী মূল্যবোধ, উৎপাদক শক্তি সমূহের অধীনে (মার্কসীয় মতানুসারে) মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখলে তার স্বাধিকার ও সৃজনসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং নৈতিক চেতনা অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় উদ্ভূত হয় না।[২৩] এভাবেই ব্যক্তি মানুষ সংক্রান্ত সমস্যায় মানুষকে সব কিছুর মাপকাঠি মনে করে মানুষের কতকগুলো স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ এক সময় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মর্মবস্তু থেকে সরে আসেন যা পক্ষান্তরে বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদেরকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তি যোগায়। দৃষ্টিতে নীতি অপরিবর্তনীয় নয়, আপেক্ষিক এবং সমাজের গড়ন আর সমাজের স্বার্থ মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় বলে শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি দিয়েই নির্ধারিত হয় নৈতিকতা। যদিও সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি আর শ্রেণীর নীতি সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এমন কোন কোন মৌলিক আচরণ বিধি যে গড়ে ওঠে না তা নয়। তবে এসব আচরণ বিধিতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন স্বার্থ প্রকাশ পায় না, বরং মানুষের বিভিন্ন সমষ্টির নৈতিকতার সাধারণ দিকগুলো প্রকাশ পায়।[২৪] তবে নৈতিকতা সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর আচরণের নৈতিক মূল্যায়নে মার্কসীয় মানবতাবাদে মূর্ত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মিলে যা মানবেন্দ্রনাথের 'নব মানবতাবাদ' থেকে ভিন্ন। ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় উপলব্ধ এবং সংরক্ষিত এই নৈতিক মতাদর্শের বাহন হচ্ছে ইতিহাসের কারিগর জনগণ। এই মতাদর্শ মানবীয় সম্পর্ক ও আচরণ বিষয়ক নানাবিধ অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ ও সামান্যীকরণ যা মুক্ত মানব সমাজে মানুষে সম্পর্কের নিয়ামক।

এছাড়া দশম অধ্যায়েও (পৃ. ১১২-১২৬) লেখকের বক্তব্যে মার্কসীয় দর্শন সচেতনতা বিশেষ ছিলনা। এটা ঠিক যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন চর্চার সম্পর্ক রয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় মার্কসীয় দর্শন চর্চার মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত হয়। আমাদের দেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গেলেও এই সচেতনতা নিয়েই এগুতে হবে। এই শতাব্দির দ্বিতীয় দশক থেকে বা এদেশে মার্কসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মার্কসীয় দর্শন বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রবন্ধ ইত্যাদির মূল্যায়নের মাধ্যমেই এর স্বরূপ বা ইতিহাস উৎঘাটন সম্ভব। এছাড়া মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের বিভিন্ন দলিলও এদেশে মার্কসীয় দর্শনের স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম হলেও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের উপর ইতোমধ্যে প্রচুর গ্রন্থ, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়ে লেখক এদেশে মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ অনুসন্ধানে এভাবে না এগিয়ে শুধু মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে কিভাবে বিকাশ লাভ করেছে তার ত্রুটিপূর্ণ আংশিক ও

খণ্ডিত ইতিহাস বর্ণনা করেন। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দির বাংলায় সমাজতন্ত্রের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের (পৃ.১১২-১১৭) নামে যে সব বিষয় আলোচনায় নিয়ে এসেছেন তা বিষয়সূচীর সঙ্গে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। সবশেষে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তিনটি সূত্রের (এক, বিপরীত ঐক্য ও দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া; দুই, পরিমাণগত পরিবর্তন ধারায় গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়া, তিন, নিরাকরণ প্রক্রিয়া) সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে লেখক মার্কসীয় দর্শনের সারসংক্ষেপ বলে চালিয়ে দেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমন্বয়ে যে মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ঘটেছে লেখকের বক্তব্যে সে ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে লক্ষ্যণীয় যে, *বাংলাদেশ-দর্শন* গ্রন্থটির প্রায় সমগ্র পরিসর জুড়ে দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার পরিবর্তে রয়েছে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্ববিহীন এক ধরনের সরল ও অপরিপক্ক ইতিহাস চর্চার নমুনা। অবশ্য, নানাদিক থেকে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলাদেশে রচিত বাংলাদেশ দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত প্রথম গ্রন্থ, যদিও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপনা বা তথ্য বিশ্লেষণ কোনটিই এতে যথাযথভাবে স্থান পায়নি।

সূত্র নির্দেশ

১. দ্র. হাসান আজিজুল হক, 'বাংলাদেশ দর্শন', *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বারো বছর স্মারক সংকলন*, জানুয়ারী ১৯৮৪, পৃ. ৪৩-৪৮; মফিজ উদ্দীন আহমদ, বাঙালীর দার্শনিক ঐতিহ্য ও সমকাল, *মূল সভাপতির ভাষণ*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির দ্বিতীয় সাধারণ সম্মেলন, ১৯৭৫; আবদুল মতীন, 'দর্শন চর্চা ও আমাদের সমস্যা', *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির তৃতীয় সাধারণ সম্মেলনের কার্যবিবরণী* ১৯৭৭, চট্টগ্রাম, পৃ. ২২-৩৮, সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, 'বাংলাদেশ দর্শন চর্চার ঐতিহ্য', ঐ, পৃ. ১১৩, ১২২; আবদুল মতীন, 'বাংলাদেশ দর্শন চর্চার গতি প্রকৃতি . কিছু অভিযোগ, মূল সভাপতির ভাষণ, তৃতীয় সম্মেলন, বাংলাদেশ জাতীয় দর্শন সেমিনার, ৭-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭; আহমদ শরীফ, 'বাঙালীর মনন বৈশিষ্ট্য', *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রথম সাধারণ সম্মেলনের কার্যবিবরণী* ১৯৭৪, ঢাকা পৃ. ৪৩-৪৯; মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, 'বাংলাদেশ দর্শনের বৈশিষ্ট্য', দর্শন, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭৯, পৃ. ১-১৬; — 'বাংলাদেশ দর্শন', বাংলাদেশ দর্শন সমিতির ষষ্ঠ সাধারণ সম্মেলনের কার্যবিবরণী ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ১২-২০, আমিনুল ইসলাম, 'বাঙালীর দর্শন', *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সপ্তম সাধারণ সম্মেলনের কার্যবিবরণী* ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৬১; মুহাম্মদ শাহজাহান, 'বাংলাদেশে দর্শন চর্চা', ঐ, পৃ. ৭১-৭৯; বদরুল আলম খান, 'বাংলাদেশে দর্শন চর্চা একটি সমীক্ষা', *মুক্তির দিগন্ত*, সংখ্যা ১২, মার্চ ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ১-১৭।

২. মুহম্মদ আবদুল হাই ঢালী ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজে প্রায় আট বছর শিক্ষকতা করেন। এই বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তিনি ফেলোশিপ নিয়ে ১৯৮৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' থেকে অধ্যাপক ড. মফিজ উদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পি-এইচ ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল *Problems of Moral Justification with Reference to Moral Beliefs and Practices in Bangladesh*। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর এই অভিসন্দর্ভের অনুসরণে রচিত। ১৯৯১ সালের ১১ নভেম্বর ড. ঢালী দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩. ঋষি দাস, *রাজা রামমোহন*, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ২৬৫-২৭১।

৪. যেমন : '*তুহফত্-উল-মুওয়াহ্‌হিদিন* (মুর্শিদাবাদ, ১৮০৩-১৯০৪), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৯১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (?), *A Defance of Hindoo Theism (1817)* তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।' — উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২৬৫ ২৭১।

৫. ভবতোষ দত্ত, *বাঙালী মানসে বেদান্ত*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৬, ৯০-৭৪।

৬. 'সিদ্ধার্থের দাম্পত্য জীবন সুখকর ছিল না।' (পৃ. ২৯) বলে লেখায় যে প্রমাণ সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন তেমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের জানা নেই। তাঁর আর একটি তথ্য — 'একদিন সিদ্ধার্থ পায়ে হেঁটে কপিলাবস্তু নগরের পথ ভ্রমণে বের হন' (পৃ.২৯) এ তথ্যটিও ভুল। এরকম আরও ভুল তথ্য রয়েছে।

৭. দ্র সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*, কলিকাতা ১৩৬৯, পৃ. ৩০২-৩১১; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* দ্বিতীয় খণ্ড ৩য় সং, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ. ৭৪৯-৭২৯।

৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৪-৭২৫।

৯. দ্র. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ' *বৌদ্ধতন্ত্র ও দর্শন*', *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*, ঐ, পৃ. ৩০৩-৩১৬; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২৩৯-৬৬২; Beni Madhav Barua, *A Prolagomana to a History of Buddhist Philosophy,* Calcutta. 1918. - -. A *History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy,* Calcutta. 1921. Debiprasad Chattopadhyaya, 'Some Problems of Early Buddhism' *Buddhism The Marxist Approach*. New Delhi, 4th Print. 1985, pp.9-36; Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults, 3rd ed.* Calcuttta, 1969.

১০. দ্র. মুহাম্মদ শাহজাহান, 'বাংলাদেশে মুসলিম দর্শন : তথ্যের সন্ধানে', *অন্বেষণ*, ৪র্থ খণ্ড, ৯ম বর্ষ, ১৯৮৮, পৃ.১৪১-১৫৬।

১১. দেখুন, সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, রসীদুল আলম অনুদিত, ২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮৯; গিরিশ চন্দ্র সেন, *হিতোপাখ্যানমালা*. ২য়, কলিকাতা ১৮৭৬; — *নীতিমালা*. ১ম, কলিকাতা ১৮৯৯; — *ধর্ম্ম সাধন নীতি*. কলিকাতা; ১৯০৬: রাজা রামমোহন রায়, *তুহ্‌ফত্ উল মওয়াহ্‌দিন*, মুর্শিদাবাদ, ১৮০৩/১৮০৪ ?

১২. যেমন : মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব* ঢাকা ১৯৮৭, — মহাসত্যের সন্ধানে, ২য় সং, রাজশাহী, ১৯৮০, Abul Hasim, *The Creed of Islam 4th ed.*, Dhaka, 1985. আবদুর রশীদ ফকীর, *সুফীদর্শন*, ঢাকা, ১৯৮০; নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা ১৯৮২; আরজ আলী মাতুব্বর, *সত্যের সন্ধানে*, ২য় সং, ঢাকা ১৯৮৪।

১৩. দেখুন, বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান*, কলিকাতা, ১৯৫৯; ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাউল পরিচয়', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ১৩৬২, ১৩৬৩ ব; মোহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলিকাতা, ১৯৩৫; মালাধর বসু; শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, সম্পাদনায় শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর, ঢাকা, ১৯৫৪; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলিকাতা, ১৩৬৪ ব.; মতিলাল দাস ও পিযুষ কান্তি মহামাত্র সম্পাদিত, *লালন গীতিকা*, কলিকাতা, ১৯৫৮; কাজী নাসির, *হাসান রাজার গান*, ঢাকা, ১৯৭৭; মো; সোলায়মান আলী সরকার, *সুফী দর্শনের আলোকে রবীন্দ্র দর্শন*, রাজশাহী,৯৮৬ — *বাংলার বাউল দর্শন*, রাজশাহী, ১৯৮৬, Mohammad Enamul Hoq, *A History of Sufism in Bengal,* Dhaka. 1975; Shashibusan Dasgupta. *Obscure Religious Cults,* Calcutta, 1969; Sushil Kumar Dey, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal,* Calcutta, 1962.

১৪. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ২য় সং., কলিকাতা ১৯৮৬, পৃ. ১১।

১৫. ঐ, পৃ. ৩২।

১৬. বসুধা চক্রবর্তী, *মানবতাবাদ*, কলিকাতা, পৃ. ২১-২২।

১৭. ঐ, পৃ. ২২।

১৮. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, পৃ. ৪।

১৯. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা : রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ*, কলিকাতা, ১ম সং. ১৯৬৮, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।

২০. ঐ, পৃ. ৩৩৬।

২১. I. Frolov ed., *Dictionary of Philosophy,* 2nd Revised ed., Moscow,1984, p. 178

২২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা : রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ*, কলিকাতা, ১ম সং. ১৯৬৮, পৃ. ৪৩২-৪৩৩।

২৩. ঐ, পৃ. ৪৬২।

২৪. ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা*, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, অনুদিত, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ.৩৭৬।

প্রবাসী পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের স্বাস্থ্য চিত্র

মো: আনোয়ারুল ইসলাম

সাংবাদিকতা এবং জনমত পরস্পর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় একটি অপরটির পরিপূরক।[১] জনমত গঠনে সংবাদপত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে, জনমতের উদ্ভব এবং বিকাশের পথানুসরণ করেই গড়ে ওঠে সাংবাদিকতার ইতিহাস।[২] একটি দেশের সমাজ উন্নয়ন ও রাজনীতি অনেকাংশে নির্ভর করে ওই দেশের সংবাদপত্র কী ভূমিকা পালন করছে তার উপরে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর *অতীত দিনের স্মৃতি* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

> '. . . সংবাদ সাহিত্য বা জার্নালিজমের প্রভাব এখন দুনিয়ার বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী। এই প্রভাব কিছুটা অগভীর ও অস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু মানব সমাজকে এত ব্যাপকভাবে নাড়া দেবার শক্তি সাহিত্যের অন্য কোন শাখারই নাই। . . . সংবাদ সাহিত্যের প্রচারের ফলে এখন দল ভাঙ্গে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তাদের কথা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও এখন এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে যে রাষ্ট্রের চতুর্থ শক্তি বলা হয়, তা অযথার্থ নয়।[৩]

সম্ভবত এ কারণেই বলেছেন, 'সংবাদ হল আজকের মোড়কে দেয়া আগামী দিনের ইতিহাস।' অর্থাৎ ১৭৮০ সালে হিকির *বেংগল গেজেট* প্রকাশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু। তারপর ১৮১৮ সালের এপ্রিলে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগ্‌দর্শন* এবং পরের সালেই সাপ্তাহিক পত্রিকা *সমাচার দর্পণ*-এর প্রকাশ এদেশের পত্র পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে মাইলফলক।[৪] বস্তুত উনিশ শতাব্দীতে একদল সমাজহিতৈষী ও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলেই তৎকালীন বাংলায় সংবাদপত্রের আর্বিভাব ঘটে। উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে জাগ্রত করা। বলা চলে, বাঙালীদের জন্য এই আন্দোলন ছিল সমাজগত দিক থেকে আত্মচেতনা লাভের আন্দোলন। বিশেষ করে এ সময়ে বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বহু বিবাহ নিবারণ, ধর্মের নামে প্রচলিত বহু সামাজিক কুসংস্কার উচ্ছেদ এবং সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে জনমত গঠনে বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে ১৩০৮ বাংলা সালের বৈশাখ মাসে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা *প্রবাসীতে* পূর্ববঙ্গের রোগ ও মহামারী বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল তা আলোচনা করা হবে।

প্রবাসী পত্রিকার পরিচয়

প্রবাসী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ হয়েছিল বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে ভারতের এলাহাবাদ

শহর থেকে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫ খ্রী: - ১৯৪৩ খ্রী:)। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের এক কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় প্রবাসী বাঙালী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন থেকেই *প্রবাসী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য কয়েক বছর পরেই প্রবাসীর কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। সে সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলির মধ্যে *ভারতী*, *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) প্রভৃতি পত্রিকার মধ্যেও *প্রবাসী* উল্লেখযোগ্য ছিল তার বিশিষ্টতার কারণে। কেননা ওই সকল পত্রিকার মধ্যে একমাত্র *প্রবাসীতেই* 'দেশের কথা' শিরোনামে একটি বিভাগ চালু ছিল। এই বিভাগ চালু করা প্রসঙ্গে *প্রবাসী* পত্রিকাতে উল্লেখ করা হয়েছিল :

> . . .বাংলাদেশের পল্লী গ্রাম ও মফস্বলের সহিত প্রবাসীর পাঠকদের অন্তত কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে আমরা এই দেশের কথা বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কার্য্যকলাপ, মতামত, অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব। [৫]

একথা অনস্বীকার্য যে, তদানীন্তন বাংলার পল্লীসমাজের দুরবস্থার চিত্র *প্রবাসী* পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীদের পীড়িত করে তুলেছিল। এজন্য তারা একটা সর্বমানবিক স্বজনীনতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই আবেদন জানিয়ে *প্রবাসী* পত্রিকায় বলা হয়েছিল :

> . . . একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্বদেশ সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান না জন্মিলে আমাদের স্বদেশ প্রেমের বুনিয়াদ কখনই সুদৃঢ়ভিত্তি পাইবে না, . . . একথা ভুলিলে কোনমতেই চলিবেনা যে পল্লীগ্রামের সমষ্টিতেই দেশের সৃষ্টি। সুতরাং দেশের পল্লীগ্রামের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, লোকব্যবহার, উৎসব, আনন্দ, বাণিজ্য, সম্বন্ধে আমাদের যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; নতুবা দেশের কাজে আমরা আপনাদিগকে লাগাইতে পারিবনা।[৬]

'দেশের কথা' বিভাগে মফস্বলের স্বাস্থ্য বিষয়টাকে *প্রবাসী* পত্রিকা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। উনিশ শতকের পূর্বেও বাঙালীর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একশ বছরে এই চিত্র একদম পাল্টে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৮৯৬ খ্রী. থেকে ১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত মাত্র এই দশ বছরে ভারতবর্ষে শুধু প্লেগ রোগে ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার লোক মারা যায়। এছাড়াও উনিশ শতকে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক। এছাড়াও ছিল মহামারী, বিশেষ করে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া। মফঃস্বলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলোর মধ্যে পূর্ববঙ্গের কয়েকটা জেলার সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা বিষয়ে সরকারী রির্পোট গুলিতে সাধারণতঃ দেখা যায় ঢাকা জিলায় বসন্তের মারী বিশেষ হয় না। কিন্তু এখানে যক্ষ্মা ও কাশির ব্যারাম কলিকাতা ও হাওড়া ভিন্ন অন্যান্য জিলা অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আরো একটা গুরুতর কথা এই যে ঢাকা জিলায় আত্মহত্যার সংখ্যা ও হার, বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত বেশী। পুরুষের দ্বিগুণ স্ত্রী লোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা জিলার দুই শতাধিক লোক আত্মহত্যায় মারা যায়। [৭]

বরিশালের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রবাসী পত্রিকার রিপোর্টটিতে উল্লেখ

এবার বরিশালে বসন্তের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। শহরের অধিকাংশ লোকই শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। স্থূল শহরটা একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি বসন্তের প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। আবার শহরে লোকজন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।[৮]

ময়মনসিংহ জেলার ম্যালেরিয়া সম্পর্কে প্রবাসীর অভিমত ঃ

'. .. কামারের চর অঞ্চলে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রার্দুভাব হইয়াছে; প্রতিগৃহে রোগী; পথ্য দিবার লোক নাই; বিশেষতঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত মুসলমান। এই স্থানে কোন ডাক্তার নাই। মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; আমরা অবিলম্বে ঐ অঞ্চলে কয়েকজন ডাক্তার প্রেরণের জন্য লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। এখন যেরূপ মৃত্যু হইতেছে তাহাতে ডাক্তার প্রেরণে কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে। [৯]

পাবনা জেলাতেও ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ ছিল। প্রবাসী পত্রিকাতে এ প্রসঙ্গে একাধিক খবর বেরিয়েছিল। এধরনের একটি খবরে উল্লেখ করা হয়েছিল :

কলেরা বা তত্তুল্য কোন সংক্রামক ব্যাধি জেলার মধ্যে এখন নাই বটে কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিলক্ষণই আছে। বৃষ্টির জল খাল নালায় জমিয়া যাইতেছে, পয়ঃ প্রণালীর অভাবে সেগুলি বাহির হইতে পারিতেছে না, কাজেই আগাছা ও আবর্জ্জনাদি তাহাতে পচিয়া দূষিত বাষ্প ও ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিতেছে। গ্রামের জমিদারবর্গ হীনবিত্ত, বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন, অন্নক্লিষ্ট অভাবগ্রস্থ জনসাধারণ নিঃসম্বল, সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ঔষধাভাব, কাজেই জনসমাজ একরূপ নিরূপায় ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। [১০]

প্রবাসী পত্রিকাতে স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ বা প্রতিবেদনগুলো পড়লে সহজেই বোঝা যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মহামারী ছিল পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহামারীর প্রকোপ কতটা ভয়াবহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জিলা রির্পোটগুলি থেকে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৯,২৫,৫৪৬ জন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০,৬১,০৪১ জন। প্রতি বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য *প্রবাসী* পত্রিকাতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রবন্ধাদি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল যাতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, এবং সমাজের বিত্তবানরা চিকিৎসা প্রদানে উৎসাহী হয়। এ বিষয়েও *প্রবাসী* পত্রিকার কয়েকটি রির্পোট উদ্ধৃদ্ধ করা হলো :

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সদনুষ্ঠান

মিঃ আর দুধোড়িয়ার দান। — মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত আর দুধোড়িয়া মহোদয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হসপিটাল গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষে ১০০১ টাকা দান করিয়াছেন ও তত্রত্য একটি রোগীর পরিচর্য্যার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ৪০০০ টাকা জমা দিয়াছেন। ইহার দেশ হিতার্থ এই দান বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। [১১]

ময়মনসিংহ জেলার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার অপর একটি সংবাদে প্রবাসী লিখেছিল: ময়মনসিংহ জেলার অর্ন্তগত সন্তোষের ছয় আনি কোর্ট অব ওয়ার্ড স্টেটের সুযোগ্য

ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরীর উদ্যোগে কোকডহরা গ্রামে গত ৪ঠা আগস্ট এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ রোগী চিকিৎসার্থ আসিতেছে। আমরা অবগত হইলাম, সতীশ বাবুর চেষ্টায় পলানিয়া গ্রামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।[১২]

দেশের স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জেলা বোর্ড পল্লীতে পল্লীতে চিকিৎসক ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে। যশোহর জেলায় জেলাবোর্ড এধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বাংলা ১৩২৪ সালের চৈত্র মাসের *প্রবাসী* পত্রিকার এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

> যশোহর একটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জেলা, এ জেলার পল্লীবাসীরা অনেক সময় ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকায় পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীরা শহর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসিত হইতে পারে না, ফলে অনেককে বিনা চিকিৎসায় অথবা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের কু-চিকিৎসায় পঞ্চত্বলাভ করিতে হয়। যশোহর জেলাবোর্ড পল্লীবাসীগণের এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। জেলাবোর্ড মাসিক ৩৫ টাকা সাহায্য দিয়া নিম্ন লিখিত গ্রাম সমূহে কয়েকজন ডাক্তার বসাইতেছেন, ইহারা পল্লীবাসীগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশাদি দিবেন এবং যথাসম্ভব সুলভে পল্লীবাসীগণের চিকিৎসা করিবেন। নিতান্ত দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিবেন। এই নিয়মে যাহাতে যশোহরের সমস্ত পল্লীবাসী চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিতে পারে ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে, আপাততঃ যে সকল স্থানে ডাক্তার দেওয়া হইল আমরা সে সকল স্থানের নাম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।
>
> সদর মহকুমার অর্ন্তগত :—
>
> ১। বন্দবিলা, ২। বসুন্দিয়া, ৩। বাঘারপাড়া
>
> মাগুরা মহকুমা :—
>
> ৪। মহম্মদপুর, ৫। ছান্দড়া
>
> বনগ্রাম মহকুমা :—
>
> ৬। বয়ড়া।
>
> নড়াইল মহকুমা :—
>
> ৭। আলফাডাঙ্গা। ঝিনাইদহ, ৮। কালীগঞ্জ, ৯। সাধুহাটী
>
> জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পল্লীবাসীগণের রক্ষাকল্পে বিশেষভাবে যত্ন লইতেছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।[১৩]

তবে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণে ইংরেজ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনাও *প্রবাসী* পত্রিকাতে পাওয়া যায়। বাংলা ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় 'বাংলায় ম্যালেরিয়া ও সরকার' শীর্ষক এক সমালোচনামূলক রিপোর্টে *প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল :

> লর্ড রোনাল্ডসে বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি জানিয়াছেন বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়ায় সাড়ে তিন লক্ষ হইতে চার লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাঙ্গালা

সরকার মাত্র দুই লক্ষ পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। অথচ কলিকাতা পুলিশের গোরা সার্জেন্টদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত কেবল তাহাদের বাসস্থান নির্ম্মানের জন্যই সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন দুই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা। এইরূপ না হইলে কি আর শাসনে সুনাম হয় ?[১৪]

উপসংহার

প্রবাসী পত্রিকায় মফঃস্বলের যে স্বাস্থ্য চিত্র পাওয়া যায় তাহা একদিকে যেমন বাস্তব ও জীবন্ত তেমনি মর্মস্পর্শী। উনিশ শতকের শেষভাগে প্রতি বছরে বাংলায় সংঘটিত মহামারী প্রতিরোধে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস একমাত্র *প্রবাসী* পত্রিকাতেই লক্ষ করা যায়। *প্রবাসী* পত্রিকার মফঃস্বলের ওই সকল সংবাদ প্রকাশে শুধু যে পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নয়, কালের বিচারে এমন সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায় যাহা এ যুগের অতি প্রগতিবাদী পত্রিকাতেও দুর্লভ।

সূত্র নির্দেশ

১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, রাজশাহী : মিত্র সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৮, পৃ.৪।
২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।
৩. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃ. ৩৯-৪০।
৪. সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১০।
৫. *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ,১৩২১ (বাংলা), ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।
৬. ঐ।
৭. *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ,১৩২১ (বাংলা), ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
৮. *প্রবাসী*, আষাঢ়,১৩২১ (বাংলা), ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।
৯. ঐ।
১০. *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ,১৩২১ (বাংলা), ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
১১. *প্রবাসী*, কার্ত্তিক,১৩২৭ (বাংলা), ২০শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
১২. ঐ।
১৩. *প্রবাসী*, চৈত্র,১৩২৪ (বাংলা), ১৭শ ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১।
১৪. *প্রবাসী*, বৈশাখ,১৩২৮ (বাংলা), ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যক্তিনাম সংস্কৃতি : একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

গোলাম কিবারিয়া ভুঁইয়া

বাংলার জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ মুসলিম সম্প্রদাযের অন্তর্ভূক্ত। [১] অমুসলিমদের মধ্যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং খ্রীষ্টান রয়েছে। সাধারণভাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠী মাতৃভাষা বাংলায় ব্যক্তি নাম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ মাতৃভাষায় ব্যক্তি নাম সাধারণতঃ গ্রহণ করে না। আরবী, ফার্সী অথবা উর্দু ভাষাতেই এই সমাজ ব্যক্তি নাম গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যক্তি নাম সংস্কৃতির পটভূমি সন্ধান করা হয়েছে।

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ *কোরআন* আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ায় এবং আরবী ভাষা-ভাষী দেশগুলোতে আরবী ভাষা ভিত্তিক নাম-সংস্কৃতি গড়ে উঠায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো তা অনুসরণ করার কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিম দেশ সমূহ নিজেদের মাতৃভাষা ভিত্তিক ব্যক্তি নাম গ্রহণ করে থাকে। এমনকি ইরান আরবী ভাষা ভিত্তিক অঞ্চলের কাছাকাছি হলেও দেশটির মাতৃভাষা ফার্সীতেই ব্যক্তি নাম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আরব থেকে সুদূরে অবস্থিত হলেও বাংলা অঞ্চলে আরবী বা ফার্সী ভাষা ভিত্তিক নামের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

ফার্সী ভাষা পারস্য (ইরান) দেশের ভাষা। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে এখানে ফার্সী ভাষাকে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হতো। স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে ফার্সী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে পৃষ্ঠপোষকতা করা তৎকালীন সম্রাট বা সুলতানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাছাড়া ইসলাম ধর্ম বিষয়ক আলোচনা এবং মাদ্রাসাগুলোতে ফার্সী ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে ভারতবর্ষে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা দাপ্তরিক কাজকর্ম ছাড়া জনসাধারণ ফার্সী ভাষায় কথোপকথন করত না। অন্যদিকে উর্দু ভারতবর্ষে কিছু কিছু অঞ্চলে ব্যবহৃত হলেও খুব কম সংখ্যক সাধারণ মুসলিম এটিকে ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হলেও এই ভাষায় সবচেয়ে কম সংখ্যক পাকিস্তানী কথা বলে থাকে। [২] আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটি ভাষা বাংলার মুসলিম সমাজের নাম সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব রাখে। স্থানীয় ভাষা বাংলা প্রাত্যহিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও মুসলিম পরিবারে বাংলা অথবা সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক ব্যক্তি নাম তেমন প্রচলিত নয়।

অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম দেশে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যায়। এই দেশে ব্যক্তি নাম স্থানীয় ভাষায় হয়ে থাকে।

যেমন সুকর্ণ, সুহার্তো, সুজিপতো ইত্যাদি। এখানে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণোর মন্তব্য উল্লেখ্য। তিনি তাঁর নিজের নামকরণ প্রসঙ্গে তাঁর পিতার বক্তব্য তুলে ধরেন —

> "It was always been my prayer, he declared "for my son to be a patriot and great hero of this people. You shall be a second Karna."
>
> সুকর্ণ বলেন "The names Karna and Karno are idendentical. In Javanesea the "A" sound becomes "O". The "Su" prefix on many of our names means good best. Thus Sukarno means the best hero." Sukarno is therefore my real and only name. Some stupid newspaper men once wrote my first name was Achmed. Ridiculous. I am just Sukarno. (Sukarno : 1965,p.26)

মাতৃভাষায় অর্থবোধক ব্যক্তিনাম রাখার বিষয়ে আরব বিশ্ব যেমন অগ্রণী তেমনি অন্যান্য মুসলিম দেশেও তা লক্ষ্যনীয়। নাইজেরিয়ার মুসলিমদের নাম গাওয়ান, আফ্রিওলা, সানি আবাচা, ইত্যাদি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবেশী দেশ মালয়েশিয়াতেও 'বাহাসা মালায়া'তে নাম রাখা হয়ে থাকে যেমন, মাহাথির, আজলান অথবা মিসবুন সিদেক। চীনের মুসলমান সম্প্রদায়ও চীনা ভাষায় তাদের ব্যক্তি নাম রেখে থাকে। তুরস্কের মুসলমানদের ব্যক্তি নাম তুর্কী ভাষায় রাখা হয়ে থাকে। যেমন তুরগত ওজাল, বুলন্দ, তানসু, সিলার, বুলেন্ট এচিভিট অথবা কেনান এভরান। ইরাকের রাষ্ট্রভাষা আরবী, সুতরাং এই দেশের মুসলিম এবং অমুসলিম পরিবারগুলো স্বাভাবিক কারণেই আরবী ভাষায় নাম রেখে থাকে। একজন খ্রীষ্টান ইরাকী মন্ত্রীর নাম তারিক আজিজ। লেবাননের খ্রীষ্টান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের নাম আমিন জামায়েল, বশির জামায়েল। বলা বাহুল্য এই নামগুলো আরবী ভাষা ভিত্তিক। যে কোন ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক মাতৃভাষায় তাঁর সন্তানের নামাকরণ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানেরা যে তিনটি ভাষায় তাদের সন্তানদের নামকরণ করে থাকে সে ভাষায় কেউ কথা বলে না এবং উর্দুতে স্বল্প সংখ্যক নাগরিক কথা বলে থাকেন মাত্র।

বাংলাদেশে বা অবিভক্ত বাংলায় একজন মুসলিম শিশুর নাম মাতৃভাষায় বা বাংলায় রাখা হলে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়। বাংলা ভাষায় কথাবার্তা, দৈনিক জীবন অব্যাহত থাকলেও ব্যক্তি নাম রাখা ইসলাম বিরোধী মনে করার প্রবণতা রয়েছে।

২

কয়েক শত বছর ধরে বাংলা অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত। এই অঞ্চলটি বৃটিশ শাসন পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম শাসনাধীন ছিল। বাংলা ভাষাভাষি এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার হয় প্রধানতঃ বিভিন্ন সুফী সাধকদের মাধ্যমে। বিপুল সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বাংলার বাহির থেকেও বিভিন্ন সময়ে সরকারী এবং সামরিক কাজে নিয়োজিত কিছু মুসলিম এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। বাংলার সাধারণ মুসলিম সমাজের ব্যক্তি নাম সব সময়ই আরবী-ফার্সী ভাষা ভিত্তিক ছিল না। পুঁথি সাহিত্য নির্ভর সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে ড. রফি উদ্দিন এই অঞ্চলের মুসলিমদের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তাঁর গবেষণায় বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদের ব্যক্তি নাম লক্ষ্যণীয় —

পুরুষ বাচক নাম	মহিলা বাচক নাম
আবদাল নাস্যা	বাতাসী
অনন্ত মোল্লা	চান্দা
হারান প্রামানিক	গেন্দী
লালু নাস্যা	জহুরী
মিঠা মণ্ডল	লক্ষ্মী
সাবু শেখ	মানসী
মহিম প্রামানিক	পুঁটি
অরুন হাজি	রূপা বিবি
পবন খান	সোনা বিবি
প্রভাত মল্লিক	

এছাড়াও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিতুমীর সূচিত কৃষক আন্দোলন এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ফরাইজী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী সাধারণ মুসলিমদের নামগুলোতে একই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। সরকারী সৈন্যদের হাতে নারকেলবেড়িয়ার পতনের পর তিতুমীরের শতাধিক অনুসারীকে গ্রেফতার করে কলিকাতার আলীপুর জেলে রাখা হয়েছিল। সে সময়ে বন্দীদের যে তালিকা করা হয় এবং বিচারের জন্য অভিযোগনামা দায়ের করা হয়েছিল তাতে অনেক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যা সম্পূর্ণ আরবী-ফার্সী ভাষা নির্ভর ছিল না। নিচে কিছু নাম উদ্ধৃত করা হলো (Khan : 1977, p.23,56)।

পেয়াস	আদু	চাঁদ মণ্ডল	গোলাব
লোই	বনমালী মণ্ডল	গোপাল শেখ	বাদল
রাজিম	রাজু মণ্ডল	মানিক	কাইম
চাকো	সাওজান	ন্যায়পাল	কুরান মণ্ডল
হারু	সোনা উল্লাহ	খান্ডাই	

একইভাবে ফরাইজী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের ব্যক্তি নামও সম্পূর্ণ আরবী-ফার্সী ভাষা ভিত্তিক ছিল না। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ তনয় দুদু মিঞা এবং পৌত্র নয়া মিঞা'র নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। (Khan : 1965, p.23,56)। তিতুমীর এবং শরীয়তুল্লাহ্‌ শুদ্ধিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করলেও ব্যক্তিনামের বিষয়ে কোন মতাদর্শ বা কোন বক্তব্য দিয়েছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না।

তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে কলিকাতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব এশহরের মধ্যেই বিস্তার লাভ করে। গণ মাধ্যমের প্রধান এবং একমাত্র বাহন ছিল সংবাদপত্র। কলিকাতা কেন্দ্রিক সংবাদপত্র জগতের পরিধি এবং প্রচার সংখ্যা মূলত শহর কেন্দ্রিক হলেও এর প্রভাব ছিল গভীর। মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এ সময়ে মুসলিম সমাজ-মানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোতে তুর্কী খিলাফত রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, ইত্যাদির খবর পরিবেশিত হয় যা বাংলার মুসলমানদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের শেষার্ধে জামাল উদ্দিন আফগানীর কলিকাতা সফরও মুসলিম মানসে প্রভাব ফেলে। এসব ঘটনাবলী ছাড়াও ১৮৭২

সালের আদমশুমারী ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারী রিপোর্টে মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান প্রকাশিত হয়। এই সকল কারণসমূহ মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বকীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যা ব্যক্তি নাম গ্রহণেও প্রভাব ফেলে । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় তা উনিশ শতকের শেষে অনেক পরিবর্তিত হয়। (Ahmed: 1988: p.39-67)।

সংবাদ সাময়িক পত্রের মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য তুরস্কের সঙ্গে অমুসলিম দেশ সমূলের অব্যাহত সংঘাতের সংবাদ এবং শৌর্য-বীর্যের বিবরণ ব্যক্তি নাম সংস্কৃতিতে প্রভাব রাখে। জামাল উদ্দিন আফগানী, মোহাম্মদ আলী পাশা, রীফ নেতা আবদুল করিম, উরাধী পাশা, নব্য তুর্কী নেতা আনোয়ার পাশা, জামাল পাশা, মোস্তফা কামাল পাশা, নাজিম পাশা, খালিদা হানুম প্রমুখের নামও বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যক্তি নাম হিসাবে গ্রহণ শুরু হয়। বিশ শতকের শুরুতে তা ব্যাপকতর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং তুরস্কের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় মুসলিমদের সহানুভূতির যে চিত্র আমরা দেখি তাতে সাধারণ মুসলিম সমাজ মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। এই পটভূমিতে আমরা দেখি যে আমাদের সমাজে মুসলিম ব্যক্তি নাম ইতিহাস বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সুলতান, শাসক ও খালিফাদের নাম গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সকল নামের মধ্যে আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, আবদুল মালিক, আবদুল আজিজ, মনসুর, হারুনুর রশীদ, আমিন, মামুন, গাজী সালাহ্ উদ্দীন, আকবর, শালজাহান, কামাল উদ্দিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খুব সহজেই এই সকল নামের তালিকা দীর্ঘ করা সম্ভব।

কোন শহরের গ্রামের বা এলাকার কোন ব্যক্তি যদি নিজ যোগ্যতা বলে বিশিষ্ট হয়ে উঠেন কালক্রমে তাঁর নামটি প্রিয় হয়ে উঠে এবং তাঁর ভাবমুর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যক্তি নাম হিসাবে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। ইমাম বা সত্তরের শিক্ষকগণ বিভিন্ন সুফী-সাধকের অলৌকিক কর্মকাণ্ড সন্ধান করে থাকে এবং তাদের নাম গ্রহণে সাধারণ মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পরিবার প্রধান সাধারণতঃ ইমাম বা ধর্মীয় নেতাদের কাছে শিশুদের নামকরণ করার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে তাঁরা আরবী-ফার্সী ভাষা নির্ভর নাম পছন্দ করেন। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা এখানে থাকে অপাংতেয়। বাংলা ভাষায় পবিত্র *কোরআন* অনুদিত হয়েছে। হাদিস তফসির এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুই বাংলা ভাষায় চর্চা হচ্ছে। কিন্তু মাতৃভাষায় ব্যক্তি নাম রাখার বিষয়ে সমাজ রক্ষণশীল হয়ে আছে। বর্তমান বাংলাদেশে অমুসলিম জনগোষ্ঠী মাতৃভাষায় নাম গ্রহণ করলেও মুসলিম সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহী নয়। মাতৃভাষা ভিত্তিক ব্যক্তি নাম সংস্কৃতি একটি দেশকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে।

টীকা —

১. ১৮৭২ সালে আদম শুমারীতে বাংলা অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৪৮ জন। পরবর্তী ১০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৮৮১ সালের আদম শুমারীতে তা বর্ণিত হয়েছে। (*Report on the Census of Bengal*, 1872, p.81) ও (*Report on the Census of Bengal 1981,* Table 9, p.74)।

২. পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় লোকজন কথা বলে। যেমন - পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ, পশতু ইত্যাদি।

৩. ১৮৯০ সালে *Calcutta Review* একটি রিপোর্টে উল্লেখ করে যে বাংলার ১৯ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি পঁচিশ হাজারের মত 'আশরাফ' নামে পরিচিত ছিল। 'আশরাফ' মুসলমানেরা সাধারণত: বহিরাগত ছিল।

৪. *Report on the Census of Bengal,* 1982 এবং *Report on the Census of Bengal 1881* দ্রষ্টব্য।

সূত্রনির্দেশ

Ahmed, Rafiuddin, 1988 (2nd ed) *Bengal Muslims*, OUP, New Delhi.
Khan, Muinuddin Ahmed, 1965, History of the *Faraizi Movement*, Pakistan Historical Society, Karachi.
Khan, M.A. 1977, *Titumir and his Followers in British Indian Records*, Barna Michehil, Dacca
Sukarno, 1965, *An Autobiography*, Bobbs Meril Company, New York.

বাংলাদেশে প্রথম গবেষণা জাদুঘর

মো: আতাউর রহমান

সারংসংক্ষেপ

ইংরেজী Museum শব্দটি এসেছে ল্যাটিন-এর মাধ্যমে গ্রীক শব্দ Mouscin থেকে, যার অর্থ হল দেবীদের আবাস বা আসন।[১] The Muses গ্রীক পুরাণের কাব্য, সংগীত, নৃত্য, ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যার সংরক্ষয়িত্রী ও উৎসাহদাত্রী দেবী।[২] বাংলা পরিভাষায় মিউজিয়ামের প্রতি শব্দ হচ্ছে জাদুঘর।[৩] অর্থাৎ জাদু দেখে মানুষ যেমন অবাক হয়ে থাকে, জাদুঘর দর্শনেও তেমনি অবাক হতে হয়। তাই মিউজিয়াম বাংলায় সংগ্রহশালা বা সংরক্ষণশালা না বলে জাদুঘর বলাই অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। প্রকত পক্ষে জাদুঘর এমন একটি স্থান যেখানে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন (Documents) সম্পর্কে জানা যায় এবং সেগুলি সেখানে সংগ্রহ ও প্রদর্শিত (Displayed) হয়।[৪] পৃথিবীতে এবং একইভাবে আমাদের ভরত উপমহাদেশে বহু জাদুঘর রয়েছে। এগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা; ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নয়াদিল্লী; গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম, মাদ্রাজ; প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়াম, মুম্বাই; লেডি উইলসন মিউজিয়াম, ধরমপুর স্টেট ইত্যাদি। এগুলি ভারতের প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম।[৫] এরপর রয়েছে লাহোর মিউজিয়াম, লাহোর; জাতীয় জাদুঘর, করাচী, পাকিস্তান;[৬] পেশোয়ার মিউজিয়াম, ইসলামাবাদ[৭] ইত্যাদি। এগুলি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম। এছাড়া রয়েছে কাঠমাণ্ডু জাতীয় জাদুঘর, নেপাল। এগুলি সবই ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত জাদুঘর। এসকল জাদুঘরগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের গবেষণা কাজ করা হয়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশ এ উপমহাদেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ তবুও এখানে অনেকগুলি (৭৮টি) জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা জাদুঘর বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা; বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (পূর্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি), রাজশাহী; সোনার গাঁ লোকশিল্প জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা; জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা, ময়ময়নসিংহ; মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর, ঢাকা; বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা; জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম; ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর, সিলেট; ফরিদপুর জাদুঘর, ফরিদপুর ইত্যাদি।[৮] এর মধ্যে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী, এটি বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর (Pioneer) যা "*বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি* ও জাদুঘর হিসাবে ১৯১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয় এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি-রেজিষ্ট্রীকৃত হয় ১৯১৪ সালে, ১৮৬০ সালে সমিতি আইন অনুযায়ী।"[৯] যার নাম পরবর্তীতে হয় Varendra Research Society and Museum, আমাদের ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন গবেষকগণ জাদুঘর ও জাদুঘরে সংরক্ষিত বিষয়ের উপর গবেষণা কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে Markham

and Hargreaves লিখেছেন *Museum of India,* (1936): Naya Prokash and Dr. Dilipkumar Roy লিখেছেন *Museum and Defence Studies in India,* (1882): এরপর Firoz Mahmud and Habibur Rahman লিখেছেন *The Museums in Bangladesh, 1987);* এরপর ড: শাহানারা হোসেন লিখেছেন "*প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে বরেন্দ্রের জনজীবন*" (১৯৯৮); Dr. A.K.M. Yaqub Ali- লিখেছেন *Aspects of Society and Culture of the Varendra,(1998);* Mukhlesur Rahman লিখেছেন "*The Varendra Research Society and Museum*" Rajshahi, (1981); ড: এ. বি. এম. হোসেন লিখেছেন "*বরেন্দ্র অঞ্চলের মসজিদ স্থাপত্য*" (১৯৯৮); এই সকল পণ্ডিতগণ জাদুঘরের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে জাদুঘর গবেষণার ইতিহাসের উপর কোন গবেষণা কাজ সম্পাদন হয়নি। এই শূণ্যতা পূরনের লক্ষ্যে আমি "*বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা জাদুঘর*" প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শহর রাজশাহী। আর এই রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে ১৯১০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও প্রথম জাদুঘর যেটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর হিসাবে পরিচিত বা খ্যাত। বিশ্বেও এর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় "দিঘাপতিয়ার রাজ পরিবারের রাজা কুমার শরৎকুমার রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমা প্রসাদ চন্দ এবং আরো অনেকের প্রচেষ্টায় ১৯১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।" [১০] বর্তমানে তা বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় জাদুঘরটি বরেন্দ্র সোসাইটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। "এই সমিতির সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায়, পরিচালক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পাদক মনোনীত হন।"[১১] সংগৃহীত দ্রব্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় তাঁরা এর সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী শরৎকুমার রায় তদানীন্তন সরকারের কাছে আবেদন করেন যে প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য তিনি নিজ খরচে একটি ভবন নির্মাণ করে দিবেন। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বড় ভাই দিঘাপতিয়ার জমিদার (১৮৯৪) রাজা প্রমদনাথ রায়[১২] বর্তমান জাদুঘরের স্থানটি দান করেন। "১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক জাদুঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। তিন বছর পর ১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর বাংলার গভর্নর রোনাল্ডসে জাদুঘর ভবনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।"[১৩] জাদুঘর স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাব বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা করার সুযোগ করে দেয়া। পরবর্তীতে এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এর সঙ্গে একটি মূল্যবান লাইব্রেরীও সংযোজন করা হয়, যা গবেষকদের জন্য অদ্যাবধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জাদুঘরটির অবস্থা উনিশ বছর ধরে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়।"[১৪] অবশেষে নানা অসুবিধার মধ্যেও "ড: এ. আর. মল্লিকের প্রচেষ্টায় উপাচার্য ড:

মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সময় ১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর জাদুঘরটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ড: এ. আর. মল্লিক জাদুঘরের খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসাবে নিযুক্ত হন।"[১৫] ১৯৬৯ সালের ৩০শে আগস্ট ড: মুখলেসুর রহমান স্থায়ী কিউরেটর পদে নিয়োজিত হন।[১৬] বর্তমান পরিচালক ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকুল্যে বর্তমানে আটটি কক্ষে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শনাবলী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁরই প্রচেষ্টায় নতুন দুটি কক্ষও সংযোজিত হয়েছে — 'আবহমান বাংলা' ও 'ইসলামিক ঐতিহ্য গ্যালারি'। এছাড়া 'নগর কক্ষ' নামে আর-একটি গ্যালারীর নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে। ড: চৌধুরী আর দুটি গ্যালারীর জন্য নতুন ভবন নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কক্ষ দুটি হবে নৃ-বিজ্ঞান ও মুদ্রা বিষয়ক।[১৭]

বরেন্দ্র জাদুঘরের সংগ্রহ

"সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৬ই নভেম্বর ১৯৩৭ সালে জাদুঘরটি যখন দাতব্য বৃত্তিদানে রূপান্তরিত হল তখন সরকারী আদেশে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর শুধু তাদের বর্তমান ভবনের মালিকানা নয় বরং সংগৃহীত সকল প্রাচীন নিদর্শন, পাণ্ডুলিপি, ছাপানো পুস্তক এবং আসবাবপত্র যা তারা শুরু থেকে অধিকার করেছিলেন সবই হস্তান্তর করেন।"[১৮] শুরু থেকে এযাবৎ বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংগৃহীত প্রাচীন নিদর্শন (Antiquties)-এর সংখ্যা ৮২৯৬টি।[১৯] এগুলির মধ্যে রয়েছে পাথরের মূর্তি ও ভাস্কর্য ১২০৩টি, ধাতব মূর্তি - ৭০টি, কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি ৪টি, কাদা মাটির মূর্তি ৪টি , কামান-৪টি, খোদাই করা ইট-২১১টি, পোড়া মাটির ফলক - ৪২টি, চকচকে বা কাঁচ বসানো টাইলস্ - ২৯টি, শিলালিপি - ১৭টি, টেরাকুঠার শিলালিপি - ২৩ টি, তাম্রফলক - ১০টি, দলিল - ৪টি (কাগজের), ধর্মীয় কাজের ব্যবহৃত উপকরণ (ধাতব) ১০১টি, অলংকরণ - ৫০টি, মুদ্রা - ১০০০টি (বিভিন্ন যুগের), পোশাক পরিচ্ছদ - ৪টি, এছাড়া প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে আরো ছিল ছাপানো সংস্কৃত পাড়ুলিপি - ৩৪৪৬টি এবং বাংলা পাড়ুলিপি ১২২৩ টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

উল্লেখ থাকে যে, উপরোক্ত সংগ্রহ সামগ্রীর সবগুলিই উত্তরঅঞ্চল বা বরেন্দ্র ভূমি থেকে সংগৃহীত।

জাদুঘরের নামকরণ কেন বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর হলো

বরেন্দ্র অঞ্চল বা উত্তরাজনপদ বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। "জনপদ হিসেবে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতকে প্রসিদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত ভাষায় রচিত *রামচরিতম্* কাব্যে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রকে পাল রাজাদের 'জনক-ভূ' (পিতৃভুমি) হিসেবে উল্লেখ করে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নির্দেশ করেছেন।"[২১] প্রকৃত পক্ষে "উত্তর বঙ্গের বা বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাচীন নামই বরেন্দ্র ভূমি। এটি কোন রাজনৈতিক রাষ্ট্রের নাম নহে। আর এ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে বরেন্দ্র বলা হত।"[২২] যেহেতু এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন উপাদান (শিলালিপি, পাড়ুলিপি, পোড়ামাটি, পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব প্রভৃতি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেহেতু এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যে এই জাদুঘরটির নামকরণ হয়েছে বরেন্দ্র

জাদুঘর। আর শুরু থেকেই এখান বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা চলে আসছে তাই এটাকে বলা হয় বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।

বরেন্দ্র জাদুঘরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ইতিহাস চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে মিউজিয়ামের গুরুত্ব অত্যধিক। আর বাংলাদেশে এই বরেন্দ্র জাদুঘরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অধিক যা বর্ণনাতীত। কারণ এটি এখন দেশী ও বিদেশী গবেষকদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। জাদুঘর দর্শন করলে বিশ্বের তথা নিজ দেশের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এক কথায় জাদুঘর এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জাতির দর্পণ (Mirror) স্বরূপ। আর গবেষণা জাদুঘর এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও প্রথম জাদুঘর। বিশ্বেও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের যথেষ্ঠ খ্যাতি রয়েছে।

বরেন্দ্র জাদুঘরের গ্যালারি বিন্যাস

বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত উপাদানসমূহকে শ্রেণীভিত্তিক সাজানোর লক্ষ্যে বর্তমানে আটটি কক্ষে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নিম্নে কক্ষেব বিন্যাস সমূহের বিবরণ দেওয়া হলো :

গ্যালাবি নং এক : এ কক্ষে প্রদর্শিত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা (C.2500 B.C.), মহাস্থানগড় পাহাড়পুর (8th-12th A.D.), নালন্দা, বিহার, ভারত, বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির খেলনা, সীল, অলংকার, ও নানা ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও চীনামাটির পাত্র, বিভিন্ন ধাতুর তৈজসপত্র, সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির নমুনা, রাণী ভবানীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিসহ আরো নানা ধরনের দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।[২৩]

গ্যালারি নং দুই : এ কক্ষে প্রদর্শিত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মীয় পাথর এবং কাঠের মূর্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৪]

গ্যালারি নং তিন : এ কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে জাদুঘরের সর্বোবৃহৎ সূর্য্য-মুর্তি। এছাড়া শিব, গণেশ, বিষ্ণু, এবং তাদের অবতার সমুহ প্রদর্শিত হয়েছে।[২৫]

গ্যালারি নং চার : এ কক্ষে প্রদর্শিত মূর্তির মধ্যে দুর্গা-গৌরি উমা-পার্বতী, কালী, মাতৃকা এবং চামুণ্ডা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৬]

গ্যালারি নং পাঁচ : এ কক্ষে প্রদর্শিত মূর্তির মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ, বৌদ্ধ সত্য, তারা, জৈন তীর্থঙ্কর। এছাড়াও নানা ধরনের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে।[২৭]

গ্যালারি নং - ছয় : এ কক্ষে প্রদর্শিত মুসলিম আমলের আরবী, ফার্সী ও বাংলা শিলালিপি এবং তৎসঙ্গে অলংকার যুক্ত একটি মেহরাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্রোঞ্জ নির্মিত শেরশাহের দুটি কামান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৮]

গ্যালারি নং সাত: এ কক্ষটি "*মুসলিম ঐতিহ্য*" নামে পরিচিত। এই কক্ষে বিভিন্ন ধরনের নমুনাদি প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাতে লেখা *কুরআন*, মুসলিম যুগের চিত্র, ফরমান, ধাতবপাত্র, পোড়ামাটির ফলক, মুঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি এবং বাংলাদেশের মুসলিম যুগের বিভিন্ন ধরনের রঙ্গীন চিত্রাদি উল্লেখের দাবী রাখে।[২৯]

গ্যালারি নং আট : এ কক্ষটি মূলতঃ "*আবহমান বাংলা*" নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে

প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরনের নৌকা সম্বলিত একটি "DIORAMA" লোকবাদ্য যন্ত্র, লোকঅলংকার, উপজাতি, বিশেষ করে সাঁওতালদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী ও নানা ধরনের লোক শিল্প (Folk Art) দ্বারা সমৃদ্ধ।[৩০]

বর্তমানে আরো একটি গ্যালারিতে প্রদর্শনের কাজ চলছে। অদুর ভবিষ্যতে এর দ্বারোদ্ঘাটিত হবে বলে আশা করা যায়।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর লাইব্রেরী

জাদুঘরের সঙ্গেই রয়েছে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও দুষ্প্রাপ্য গবেষণা গ্রন্থাগার। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎকুমার রায় নিজ উদ্যোগে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাদি ও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল সমূহ দান করে এই লাইব্রেরীর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে উক্ত লাইব্রেরীতে প্রায় ২০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ রয়েছে।[৩১] এর মধ্যে প্রত্ন তত্ত্ব সার্ভে রিপোর্ট, বার্ষিক রিপোর্ট এবং Archaeological Survey of India -র স্মারক গ্রন্থাবলী, *Bengal District Gazetteers*, মূর্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি, মুদ্রার ক্যাটালগ, বেদ, পুরান, মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারত, *Epigraphia Indica, Epigraphia Indo-Moslemica; South Indian Inscriptions, Catalogues of various museum collections encyclopaedias* প্রভৃতি। এছাড়া বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের মধ্যে রয়েছে লোকশিল্প ও সংস্কৃতি, শিল্পকলা, নৃ-তত্ত্ব, ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি অন্যতম। এসমস্ত বই ১৯ শতকে প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩২] উল্লেখ্য যে প্রতিবছরই নানা বিষয়ের গবেষণা মূলক পুস্তকাদি সংগৃহীত হচ্ছে।

বরেন্দ্র জাদুঘর লাইব্রেরীর গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জাদুঘরের একটি অংশে স্থাপিত হয়েছে একটি বিশাল লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই। এছাড়া যে সকল উপাদন সমূহ এই জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলির বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তা করে থাকে। এই জাদুঘরে শুরু থেকেই বাংলা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেশী বিদেশী গবেষকগণ গবেষণা চালিয়ে আসছেন। আর প্রকাশনার ক্ষেত্রেই এর যথেষ্ট সমৃদ্ধি রয়েছে। "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি থেকে ১৯১২ সালে রমাপ্রসাদ চন্দ- এর *Gaudarajamala* ও ১৯১৬ সালে *Indo Aryan Races* প্রকাশিত হয়।[৩৩] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় আটটি জার্নাল (Journal of the Varendra Research Museum)। যার সর্বশেষটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে।[৩৪] অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে "*Inscriptions of Bengal*, vol.III, edited with translation and notes by Nani Gopal Majumdar; *Inscriptions of Bengal* vol. IV, edited with translation and notes by Maulavi Shamsuddin Ahmed; *Kasika Vivarana Panjika* (NYASA) by Jinendra Buddhi; Bhasavrtti Edited with Annotations by Srish Chandra Chakravarty (1998); Dhatupradipah Edited. Ibid. (1919); *Prayascitta Prakaranam* by Bhatta Bhavadeva (1927); *Alamkara Kaustubha* by

Kavi Kamapura with an old commentary I (1926), II(1934); *Ramacaritam* by Sandhyakaranandi (1939): *Paribhasavrtti, Jnapakasamuccata, Karakacakra* by Purusottamadeva (1946); Taratantram by Girish Chandra Vedantatirha (1914): *Bangla Puthir Talika* (List of Bengali Manuscripts in the Varendra Research Museum) Compiled by Pandit Manindramohan Chowdhury Kavyatirtha (1956): *Tararahasyavrttika* by Gaudiya Samkara (1961). *Adyaparicaya* (in Bengali) by Sheikh Zahid: *Varendra Sahitya Parisad Patrika* (1961), *Manuscripts* by Sddhanta (1979): এবং ১২টি বার্ষিক রিপোর্ট প্রতিবেদন ও ৯টি *MONGRAPHS* (31 l earned articles ইত্যাদি অন্যতম।" [৩৭] এছাড়া Mukhlesur Rahman-এব *Sculpture in the Varendra Research Museum- A descriptive Catalogue* (1998),Rajshahi. এই একটি ঐতিহাসকি দলিল বা Monumental কাজ।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯১০ ইং

বিভিন্ন সময় যাঁরা কীপার/ কিউরেটর/ প্রশাসক / পরিচালক-এর দায়িত্বপালন করেন তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১।	রমাপ্রসাদ চন্দ	কীপার	১৯১০-১৯১৭ ইং
২।	ড: রাধাগোবিন্দ বসাক	কীপার	১৯১৭-১৯১৮ ইং
৩।	ড· উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	কীপার	১৯১৮-১৯১৯ ইং
৪।	ড: রাধাগোবিন্দ বসাক	কীপার	১৯১৯-১৯২০ ইং
৫।	বিমলচরণ মৈত্র	কীপার	১৯২০-১৯২১ ইং
৬।	সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	কীপার	১৯২১-১৯২২ ইং
৭।	কুমাব হেমেন্দ্রকুমার রায়	কীপার	১৯২২-১৯২৫ ইং
৮।	ননীগোপাল মজুমদাব	কিউরেটর	১৯২৫-১৯২৭ ইং
৯।	নীরদবন্ধু সান্যাল	কিউরেটর	১৯২৭-১৯৫০ ইং
১০।	ড: ইতরাৎ হোসেন জুবেরী	কিউরেটর	১৯৫১-১৯৫৪ ইং
১১।	এম. মীর জাহান	কিউরেটর	১৯৫১-১৯৫৪ ইং
১২।	ডি. কে. চক্রবর্তী	কিউরেটর	১৯৫৪-১৯৫৫ ইং
১৩।	ড: মো: মকসুদ হেলালী	কিউরেটর	১৯৫৫-১৯৫৬ ইং
১৪।	এম. মীর. জাহান	কিউবেটর	১৯৫৬-১৯৫৯ ইং
১৫।	মুখলেসুর রহমান	কিউরেটর	১৯৫৯-১৯৬৩ ইং
১৬।	ড: এ. আর. মল্লিক	কিউরেটর	১৯৬৩-১৯৬৫ ইং
১৭।	ড. আবু ইমাম	কিউরেটর	১৯৬৩-১৯৬৫ ইং
১৮।	ড: মুখলেসুর রহমান	কিউরেটর	১৯৬৬-১৯৭৪ ইং
১৯।	ড: মুখলেসুর রহমান	পরিচালক	১৯৭৪-১৯৭৬ ইং

২০।	ড: আবু ইমাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	
২১।	ড: এ.বি. এম হোসেন	পরিচালক	১৯৭৬-১৯৭৭ ইং
২২।	ড: মুখলেসুর রহমান	পরিচালক	১৯৭৭-১৯৮৬ ইং
২৩।	ড: এ. কিউ. মোল্লা	প্রশাসক	১৯৮৬-১৯৮৮ ইং
২৪।	ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী	পবিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	
২৫।	ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী	পরিচালক	১৯৯৫ ইং বর্তমান।

এছাড়া জাদুঘরে বর্তমানে পরিচালকসহ কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫ জন। [৩৭]

বরেন্দ্র জাদুঘর খোলার সময় সূচী

বরেন্দ্র মিউজিয়ামের criteria অনুযায়ী শীতকালে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.৩০ টা, আর গ্রীষ্মকালে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৫টা। এছাড়া শুক্রবার দুপুর ২.৩০টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এটি বৃহস্পতিবার ও সরকারী ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকে। এখানে পরিদর্শনের জন্য কোন ফি নেওয়া হয় না। [৩৮]

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য দর্শনার্থী

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক জাদুঘর প্রতিষ্ঠাব পর (১৯১০) থেকে এ পর্যন্ত যে সকল বিখ্যাত বিখ্যাত ঐতিহাসিক কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছেন তাঁদের মধ্যে নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা, পারসী ব্রাউন, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডসে, লিটন, সুভাষচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায, স্যার ষ্টেলিজ্যাকসন, রায়বাহাদুর জলধর সেন, স্যার খাজানাজীমুদ্দিন, এরিক ও খৃষ্ট্রেনসান, Andre Malraux of Farce প্রমুখ। এছাড়া সম্প্রতি স্পেনের রানী সোফিয়া এই জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ লোক এই জাদুঘরটি পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে দেশ ও বিদেশের রাষ্ট্র প্রধান, প্রফেসর, কুটনীতিবিদ, গবেষকগণ, সাধারণ জনগণ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা প্রভৃতি) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যব নায়ী, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর দর্শনার্থীর আগমন লক্ষ্যনীয়। [৩৯]

উপসংহার

উপরোক্ত গবেষণা প্রবেন্ধ ঐতিহাসকি পদ্ধতি (Historical Methodology) অনুসরণ করে এই কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে যা ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়াস পাবে বলে আমার বিশ্বাস। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও প্রথম জাদুঘর। এই জাদুঘরের গুরুত্ব ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অপরিসীম। এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন গুলি সংখ্যায় ও বৈচিত্রে অনবদ্য এবং বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের বিভিন্ন ঘরানার এত নিদর্শন পৃথিবীর কোন জাদুঘরে নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক পারসী ব্রাউন ২৬শে জানুয়ারী ১৯১৫ সালে এই জাদুঘর পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন যে, "*এই জাদুঘর বঙ্গীয় শিল্প কলার সংগ্রহে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।*" [৪০] বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের যারা অনুরাগী বা যারা এক্ষেত্রে গবেষণা করেন তাদের জন্য এই সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে বিচারে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই সকল নিদর্শন সম্পর্কে বিশ্বের সকল সুধী সমাজকে অবহিত করার জন্য আরো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারি।

সূত্র নির্দেশ

১. Firoz Mahmud and Habibur Rahman *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, 1987, p.54.

২. *The New Shorter OXFORD English Dictionary*, Vol.No. 1., p. 1863.

৩. *Bangla Academy English to Bengli Dictionary*, 1993, p. 498

৪. *Encyclopaedia Britannica* Vol.No. 15 1768, p.p 1033, 1037.

৫. S.F. Markhan and Hargreaves : *The Museums of India, 1936*.

৬. *Pakistan Archaeology*, No-1, 1964.

৭. Firoz Mahmud and Habibur Rahman *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, 1987, p.p.238,239.

৮. Firoz Mahmud and Habiur Rahman . *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, 1987, p.p.238,239

৯. ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী : রমাপ্রসাদ চন্দ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ১৫।

১০. *বাংলা বিশ্বকোষ*, সম্পাদক খান বাহাদুর হাকিম (১ম সংস্করণ ১৯৭৩) তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

১১. Firoz Mohmud and Habiur Rahman *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, 1987, p. 116

১২. মো: মাহবুবর রহমান "বরন্দ্রের রাজা ও জমিদার" *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*। ১৯৯৮, পৃ. ৭৪২।

১৩. Firoz Mohmud and Habiur Rahman · *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, 1987, p. 117.

১৪. ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী "*বঙ্গীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর*" বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৯, পৃ. ২৮।

১৫. Shahiduzzaman, Courier Feature, Varendra Museum : Turning into a Relic it self, p.21.

১৬. বায়জিদ আহমেদ : *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস*, ১৯৯৩, পৃ. ৩১।

১৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এম. এ. কাইয়ুম, সিনিয়র প্রদর্শন অফিসার বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী। ০৩-০১-২০০০।

১৮. Mukhlesur Rahman : "*Varendra Research Society & Museum*" IBS Seminar Rajshahi University, vol No 2,1981, p.272.

১৯. *The Varendra Research Museum Library's Accession book-5*, 20-01-2000, Rajshahi.

২০. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫ ০১.২০০০ ইং.

২১. ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী : " প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির পরিচিতি" বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, ১৯৯৮, পৃ. ৫২৬।

২২. *বাংলা বিশ্বকোষ*, সম্পাদক খান বাহাদুর হাকিম (১ম সংস্করন) তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

২৪. Ibid. p. 5

২৫. Ibid. p. 5

২৬. Ibid. p. 5

২৭. Ibid. p. 5

২৮ Ibid. p. 5

২৯. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কতৃপক্ষের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫-০১-২০০০।

৩০. পূর্বোক্ত।
৩১. *The Varendra Research Museum Library's Accession book-5,* 20-01-2000. Rajshahi.
৩২. Mukhlesur Rahman "*Varendra Research Society & Museum*" IBS Seminar Rajshahi University, vol.No 2.1981. p 272.
৩৩. ড: সাইফুদ্দীন *রমাপ্রসাদ চন্দ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ১৬।
৩৪. *Journal of the Varendra Research Museum,* Vol No 8, 1994, Rajshahi.
৩৫. Ibid (List of Publication, 1-16), p 113.
৩৬. বায়জিদ আহমেদ : *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস,* ১৯৯৩-পৃ.-পৃ. ৩০-৩১।
৩৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়* - ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫, পৃ. ১৪০।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।
৩৯. Tareq Chwodhury, A Treasury of Bengal *Star Magazine,* January 8, 1999.p.12.
৪০. ড: সাইফুদ্দীন চৌধুরী "*বঙ্গীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর*", বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলন - ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নারী

দোয়েল দে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য মূলতঃ উভয় সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থান কেন্দ্রিক। পাশ্চাত্যে যেখানে সে পুরুষের সহধর্মী, প্রাচ্যে সে তাঁর দাসী। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নারীর স্থানও তৎকালীন অন্যান্য 'সংস্কৃতি সম্পন্ন' প্রাচ্য সভ্যতারই অনুরূপ।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নারীর স্থান জানার আগে তৎকালীন মিশরের সামাজিক পরিকাঠামো সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। মিশরীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন সমাজ ছিল ক্রমোশীল, যার শীর্ষে ছিল ঐশ্বরিক জগৎ — রাজা ছিলেন সেই জগতেরই প্রতিভূ। তিনি মনুষ্যসমাজ ও ঐশ্বরিক জগতের সংস্থাপক হিসাবে বর্তমান ছিলেন। সমাজের চোখে রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। রাজা ও রাজপরিবারের পরেই ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্থান, যাঁরা ছিলেন সমাজের আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ। সমাজের পরবর্তী স্তরে ছিল নিম্নবর্গের মানুষ। এরাই ছিল সমাজের বৃহত্তম অংশ। সমাজের শেষতম সোপানে ছিল দাস সম্প্রদায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস মূলতঃ সমাজের প্রথম দুই আলোকিত স্তরের ইতিহাস। তাই প্রাচীন মিশরের নারীর ইতিহাস পর্যালোচনা বলতে মূলতঃ এই দুই শ্রেণীর ইতিহাসকেই বোঝায়।

একথা অনস্বীকার্য যে ফ্যারাও-এর যুগের মহিলাদের সম্পর্কে বিশেষ কোন লেখা পাওয়া যায় না। তাছাড়া তাঁদের আত্মজীবনী মূলক রচনাও নেই বললেই চলে। ফলে সেই যুগের মহিলাদের সামাজিক পদমর্যাদা সম্পর্কে আজও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।[১] তবে একথা ঠিক যে প্রাচীন মিশরের রাজ পরিবারের নারীদের সামাজিক পদমর্যাদা ফ্যারাও-এর সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিবেচিত হত, যেমন — 'রাজমাতা', 'রাজকন্যা', 'রাজ মহিষী' ইত্যাদি।

বহু বছর ধরে ঐতিহাসিকগণ পুনঃ পুনঃ একথাই উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন মিশরের রাজ সিংহাসনের অধিকার মূলতঃ রাজ পরিবারের মহিলাদের উপর ভিত্তি করেই সঞ্চালিত হত, ফলে প্রত্যেক রাজাকেই নিজ অধিকারের বৈধকরণের জন্য রাজ-উত্তরাধিকারিণীকেই বিবাহ করতে হত, যিনি সাধারণ ভাবে পূর্বতন রাজারই কন্যা। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজাকেই নিজ ভগ্নী অথবা বৈমাত্রেয় ভগ্নীকেই বিবাহ করতে হত।[২] কিন্তু এ ধরনের বিবাহ রাজপরিবারের বাইরে বিরল ছিল। এই বিবাহের মধ্য দিয়েই রাজা সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখতেন। Diodors-এর মতে "It was a law in Egypt, against the custom of all other nations that brothers and sisters might marry one with another"[৩]

এছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে সিংহাসনের অধিকার বজায় রাখার জন্য ফ্যারাও নিজের কন্যাকেও বিবাহ করতে বাধ্য হতেন। উদাহরণ স্বরূপ Sneferu এবং Ramsessu II-এর নাম করা যায়।[৪]

প্রথম সাম্রাজ্যের শাসনকালে রাজ-উত্তরাধিকার ছিল পুরোপুরি পুরুষ কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্য থেকেই তা রাজ পরিবারের মহিলাদের উপর ভিত্তি করে সঞ্চালিত হতে থাকে।[৫]

একথা নিশ্চিত যে রাজা ও রানীর সামাজিক পদমর্যাদার উৎস পৌরাণিক ও ঐশ্বরিক জগৎ। "... the divine brother and sister Osiris and Isis with their son Horus represented the epitome of the family as early as the old kingdom. Osiris and Isis were sent to the earth by the supreme God to raise men from their primeval condition and announce to them God's omnipotence and goodness."[৬]

যদিও মিশরের রাজতন্ত্রে মহিলাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কিন্তু রাজদরবারের কার্যাবলী পরিচালনার কোন অধিকারই তাঁর ছিল না। অধিকাংশ রাজপরিবারের মহিলাই মেমফিসের হারেমে বাস করতেন। প্রতিটি হারেমই ছিল এক একটি স্বাধীন সংস্থা। মহিলারা মূলতঃ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ, যেমন — বস্ত্রবয়ন শিল্প ইত্যাদিতে নিজেকে নিয়োজিত করতেন।

মিশরীয় সমাজের একক ছিল পরিবার। এই পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক[৭], সুসংহত ও উন্নয়নশীল। পরিবারে মহিলাদের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় সম্পৃক্ত সুন্দর এক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। গৃহস্থালীর কাজকর্ম উভয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হত। নারীর মাতৃত্বকে সমাজে বিশেষ সম্মান দেওয়া হত। "The image of Isis seated and giving her breasts to Horus was to be seen on every domestic alter. This symbol of motherhood was worn by women and girls as an amulet of glazed faience . . . "[৮]

সাধারণভাবে এক বিবাহই (monogamy) ছিল সমাজের রীতি। স্ত্রীকে 'Dear wife', 'the lady of the house' ইত্যাদি নানা সম্মানে ভূষিত করা হত। তবে রাজপরিবারে বহুবিবাহ প্রায়শই হত। দ্বিতীয় র‍্যামসেস-এর দুজন ছিল "royal consorts." আসলে প্রাচীন মিশরীর সমাজ ছিল একটি "transition state from quasi marriage to a patriarchal system."[৯]

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাচীন কাল থেকেই স্ত্রী ও পুরুষের জীবিকার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পৃথগীকরণ লক্ষ করা যায়। এই পৃথগীকরণ শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় ও আমলাতন্ত্রে শুধু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পুরুষেরই অধিকারের দ্বারা অভিব্যক্ত।

এই আমলাতান্ত্রিক জগতের বাইরে অবশ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পড়তে ও লিখতে শেখানো হত। যার ফলে তারা নিজেদের মধ্যে যেমন পত্রালাপ করতে পারত, তেমনি পারত গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র রাখতে।

এছাড়াও পুরাতন সাম্রাজ্যের যুগে বহু মহিলা অন্যান্য মহিলার পরিচারিকা হিসাবে কিংবা জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। দ্বাদশ রাজবংশের (XII dynasty) সময়

থেকে মহিলাদের তাঁত বুনতে এবং সঙ্গীত চর্চা করতেও দেখা যায়।[১০] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে তাঁদের কাজ তাঁদের স্বামীর কৌলিন্যের উপর নির্ভর করত না।

তত্ত্বগতভাবে যদিও দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাও, কিন্তু পুরাতন রাজতন্ত্রের (Old kingdom) সময় থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা উদ্ভাবিত হয়। এই ক্ষেত্রে পুরুষের মতন মহিলাদেরও জমির বা সম্পত্তির উপর অধিকার বর্তমান ছিল, যা তাঁরা তাঁদের স্বামী বা পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা উল্লেখ্য যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মহিলারা সরাসরি সম্পত্তির অধিকারিণী হতেন না, সেক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীর উপরই নির্ভরশীল থাকতে হত।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত ও তিনসন্তানের জন্মদাত্রী মহিলার ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার আইনসিদ্ধ ছিল।[১১] কিন্তু নথিপত্র থেকে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ অধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নতুন রাজতন্ত্রের (New Kingdom) আইনি নথিপত্র একথাই প্রমাণ করে যে, তত্ত্বগত ভাবে আইনের চোখে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল। তাই মহিলাদেরও আদালতে উপস্থিত থাকতে হত। নিজের কাজের দায়ভার তাদের নিজেদেরই বহন করতে হত। অপরাধ করলে পুরুষদের সমান শাস্তি পেতে হত।

কিন্তু, একথা বলা যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলারা কখনই একটি সমজাতীয় শ্রেণী গঠন করতে পারে নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা যদিও সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন, আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার বজায় ছিল; কিন্তু সমাজের নীচুতলার মহিলারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত অসংরক্ষিত। মধ্য রাজতন্ত্রের (Middle Kingdom) সময় থেকে বিধবাদের সমাজের অন্যতম একটি 'ক্ষত' বলে মনে করা হত।[১২] এই ধরনের মহিলাদের নিজেদের কোন সম্পত্তি ছিল না, ছিল না কোন পরিবারিক সহায়তা; স্বামীর জীবিতাবস্থায় এরা স্বামীর উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন। সমাজের এই পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীর মহিলাদের অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হত না; তা ছিল পুরোপুরি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, মিশরীয় সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক, মহিলারা সমস্ত আইনি অধিকার সত্ত্বেও ছিলেন পুরোপুরি পুরুষের অধীন। জাভিদান হানুমের আত্মকথা[১৩] থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ মহিলাই বিনা প্রতিবাদে এই অধীনতা মেনে নিতেন, যাঁরা নিতেন না তাঁদের দণ্ড বিধান করা হত। কিন্তু একথাও ঠিক যে, রাজ পরিবারের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের সমাজের অপরাপর শ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন মিশরীয় সমাজে নারীর স্থান ছিল গৌণ, এবং তাদের পদমর্যাদা ও অধিকার পুরোপুরি সমাজের পুরুষদের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

সূত্রনির্দেশ

১. Leonie J. Archer, Susan Fischier and Maria Wyke (ed) . *Women in Ancient Societies, Basingstock, Hampshire*. England. Macmillan, 1994, p.25.

২. Joseph Kaster : *The Literature and Mythology of Ancient Egypt*. London,

Penguin, 1970. p.117.
৩. W.M. Plinders Petric: *Social life in Ancient Egypt*. London. 1923. p 109
৪. Ibid, p. 110
৫. Ibid, p. 111
৬. Waley-el-dine-Samith : *Daily life in Ancient Egypt*, New york. 1964. p. 106
৭. W. M. Plinders Petric. *Social life in Ancient Egypt*. London. 1923. p 99
৮. Waley-el-dine-Samith *Daily life in Ancient Egypt*, New york. 1964. p. 106
৯. W. M. Plinders Petric *Social life in Ancient Egypt*. London. 1923 p. 99
১০. Ibid. p. 27
১১. Ibid. p 118
১২. Leomic J Archer. Susan Fischler, Maria Wyke (ed): *Women in Ancient Societies. Basingstock, Hampshire*. England, Macmillan. 1994. p.38
১৩. Princes Djavidan Hanum : *Harem Life*, London. Noel, Douglan,1931. p. 89-108

নাথপন্থ ও সংস্কৃতির বিস্তার

গৌরীশংকর দে

প্রাচীন কাল থেকে যোগসাধনার ধারা ভারতে প্রবাহিত। ধারাগুলির একটি নাথপন্থ।[১] হাজার বছরেরও আগে নাথ যোগীদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল।[২] আসমুদ্র হিমাচল তাঁদের গতিবিধি ছিল বলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আজো তাঁদের কীর্তি-কাহিনী বর্তমান।[৩] ভারতের বাইরেও এক সময়ে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো নাথ সিদ্ধগণ দূর-দূরান্তে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতেন। এর আভাস পাওয়া যায় 'গোর্খ-বিজয়' কাব্যের দুটি পংক্তিতে : ''হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।''[৪]

এশিয়াটিক রিসার্চেস (১৮৯২ খ্রী:) সাময়িক পত্রে এক ঊর্ধবাহু যোগীর ব্যাপক ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়।[৫] সিংহল, কাবুল, বামিয়ান, হেরাট, মস্কো ইত্যাদি অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীর পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন। পারস্য, হামাদান, ইস্পাহান, সিরাজ কোরমানশাহ, বাহরিল, বসরা ইত্যাদি দেশ ও নগর ছিল তাঁর পর্যটন-ক্ষেত্র। মক্কা দর্শন করে তিনি ফিরে আসেন সিন্ধু ও করাচীতে। হাজির হন কাশ্মীর ও নেপালে। পরিদর্শন করেন তিব্বত ও মানস সরোবর।

খ্রীঃ সপ্তম শতকে পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কপিশাতে একজন শৈব সাধুকে দেখেছিলেন — গায়ে ছাই মাখা, মাথায় হাড়ের মালা।[৬] বর্ণনা থেকে মনে হয়, এই সাধু ছিলেন নাথ যোগী।

তামিল যোগী দীক্ষার সময় কানে চীনা মাটির কুণ্ডল ধারণ করেন। চীনা-মাটির কুণ্ডল সম্ভবতঃ ভারতীয় যোগীদের সঙ্গে তিব্বত বা চীনের কোন অতীত যোগসূত্রের চিহ্ন।[৭]

তীর্থযাত্রা বা স্নানযাত্রা উপলক্ষে যোগীগণ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে যেতেন। মিশরের নীলনদে পুণ্যস্নান করতেন।[৮] আবুল আলা মু' তারীর সঙ্গে এ-রকম একজন ভারতীয় যোগীর দেখা হয়েছিল।[৯] মিশরের সুফী যোগী জুলসুন বা জুন্নুন-এর সঙ্গে ভারতের যোগীদের যোগাযোগ ছিল।[১০] মিশরের তীর্থস্থানগুলিতে তাঁরা যেতেন।

যোগীগণ য়ুফ্রেটিস, টাইগ্রিস প্রভৃতি পবিত্র নদীতে তীর্থস্নান করতেন।[১১] টলেমি নাকি আলেকজান্ড্রিয়া নগরে বসে অনেক খবর ভারতীয় যোগীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।[১২] জ্বালামুখী তীর্থে তাঁদের যাতায়াত ছিল।[১৩] বাকু নগরে বহু ভারতীয় যোগী বাস করতেন।[১৪]

'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসে অবধূত করাচী শহরের শেষ প্রান্তে নাগনাথের আখড়ার উল্লেখ করেছেন।[১৫] তিনি লিখেছেন, ''নাগনাথের আখড়া একদা নাথ সম্প্রদায়ের সাধুরা স্থাপন করেন। সেই একদা যে কবে তার ইতিহাস জানা অসাধ্য। হিংলাজ দর্শনাভিলাষী সাধুসন্তের আশ্রয় রূপে এই আখড়া স্থাপন করা হয়েছিল।[১৬]

অবধূতের বর্ণনা অনুসারে, পরণে ছাতার কাপড়ের আলখাল্লা, বুক পর্যন্ত দাড়ি, হাতে জপের মালা — এই হলেন হিংলাজের পুরোহিত, নানী — কি-হজের পীরসাহেব, এই মহাপীঠের মোহান্ত মহারাজ। নাথ সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর উত্তরপুরুষ। বর্তমানে হিংলাজের সেবায়েৎ।[১৭]

লাহোরে নাথ সাধুদের মঠ, শিবমন্দির ও সমাধি ছিল। [১৮] কোটেশ্বরের মঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। [১৯] পেশোয়াবে ছিল 'গোরক্ষক্ষেত্র' নামে কানফাটা যোগীদের একটি মঠ। বাবরের আত্মজীবনী ও আবুল ফজলের গ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায়। [২০] শিয়ালকোটে গোরক্ষশিষ্য পুরাণ ভগতের নামে একটি কূপ পরিচিত ছিল। [২১]

পশ্চিম পাঞ্জাবের 'টিলা' নামক স্থানের মঠটি ছিল গোরক্ষনাথীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ। এই মঠ ঝিলমের পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং 'গোরক্ষটিলা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ, গোরক্ষনাথ এই টিলায় দেহরক্ষা করেন। [২২]

আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান কালেও 'বালনাথ টিলা' ভারতীয় যোগী সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র তীর্থ ছিল। [২৩] প্লুটার্কের বর্ণনা উদ্ধৃত করে কানিংহাম লিখেছেন, পুরু যখন আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করেন তখন একটি হাতী ক্ষিপ্ত হয়ে বালনাথ পাহাড়ে উঠে যায়। [২৪] জনশ্রুতি, এই পাহাড়েই যোগী গোরক্ষনাথ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। গোরক্ষ জাতি গোষ্ঠীভুক্ত বালনাথ ছিলেন গোরক্ষনাথের মন্ত্রশিষ্য।[২৫] এখানে বালনাথের মূর্তিই সূর্যবিগ্রহ রূপে উপাসিত ছিল। [২৬] বালনাথ টিলার যোগী সম্প্রদায় 'কান ফাটা যোগী' নামে পরিচিত ছিল।[২৭]

সম্রাট আকবর যোগীদের সমাদর করতেন। নওরোজ উৎসবে যোগীরা নিয়মিত যোগ দিতেন। [২৮] আকবরও একাধিকবার যোগীদের ডেরায় গিয়েছেন। [২৯] তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করেছেন। এই বহু প্রাচীন তীর্থের ব্যয় নির্বাহের জন্য আকবর নিঃশর্ত জায়গীর দান করেন। [৩০] আকবরের পূর্বে আরেক মুসলমান শাসক মহম্মদ বিন্ তুঘলক যোগীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।[৩১]

কেবল বর্তমান পাকিস্তান নয়, আফগানিস্তানেও নাথ সাধুদের যাতায়াত ছিল। আফগানিস্তানের জালালাবাদ ও কাবুলে নাথ যোগীদের মন্দির ছিল। [৩২]

প্রাচীন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বিখ্যাত স্থলপথ রেশমী সড়কের পাশে গড়ে উঠেছিল মধ্য এশিয়ার (চীনা তুর্কিস্তান) কিজিল। কিজিল ছিল আদি মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানকার শিল্পে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এ ফন লে কক (A. Von Le Co) ও তাঁর সহকর্মীগণ চীনা তুর্কীস্তানে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কিজিলে অবস্থিত 'ডিমনস কেভ' (Demon's Cave) নামক একটি গুহার দেয়াল — চিত্রে এক যোগী মূর্তি আবিষ্কার করেন। খ্রীঃ অষ্টম শতকের এই দুর্লভ চিত্রটি বর্তমানে বার্লিন জাদুঘরে (Museum fur Indische Kunst, Berlin) সংরক্ষিত। [৩৩]

কিজিলের দেয়াল-চিত্রে প্রদর্শিত আনুমানিক অষ্টম শতকের মূর্তিটি একজন যোগীর। কিজিল গুহায় যেভাবে তপস্বীর মূর্তিটি অঙ্কিত হয়েছে তাতে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই মূর্তি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ যোগী বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির। কিজিলে আরো অনেক তপস্বীর মূর্তি পাওয়া গেছে কিন্তু তাদের কোনোটিই কিজিলের তপস্বী মূর্তির মতো আকর্ষণীয়

নয়। পি. বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এই মূর্তিটি কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গৌরক্ষনাথের [৩৪]।

ভারতের অন্যতম প্রধান যোগী গোরক্ষনাথকে অনেক সময়ই বলা হতো অবধূত। সমগ্র ভারত, তিব্বত, নেপাল, আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তানে যোগী রূপে গোরক্ষনাথ সুপরিচিত ছিলেন। পেশোয়ারের মধ্য দিয়েই এক সময়ে সৈনিক, বণিক, সন্ন্যাসী, যোগী ও পর্যটকদের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি মধ্য এশিয়া ও চীনে বিস্তার লাভ করেছিল। [৩৫] জনশ্রুতি, পেশোয়ারের নিকটে গোরক্ষনাথের জন্ম। মধ্য এশিয়ায় গোরক্ষনাথের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার স্বাভাবিক কারণ ছিল।

কিজিলের দেয়ালচিত্রে অংকিত মূর্তিটির মস্তকের দিকটি বিনষ্ট। [৩৬] এই কারণে মূর্তিটির পরিচয় নির্ণয় কিছুটা কষ্টসাধ্য। কিন্তু চিত্রের যে অংশটি বর্তমান তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যা নাথ যোগীদের বৈশিষ্ট্য। মূর্তিটি নগ্ন। এর পুরুষাঙ্গ বিদ্ধ (Pierced) ও একটি ধাতুনির্মিত বলয়াকার বস্তু (ring) পুরুষাঙ্গ থেকে প্রলম্বিত। [৩৭] উইলসন তাঁর *হিন্দু রিলিজিয়নস : অর অ্যান একাউন্ট অফ দি ভ্যারিয়াস রিলিজিয়াস সেক্টস অফ ইণ্ডিয়া'* গ্রন্থে কেরা লিঙ্গিস (Kera Lingis) নামক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন যারা পুরুষাঙ্গে আংটি (ring) ধারণ করেন, শিবের উপাসক ও নগ্ন অবস্থায় থাকেন। তাঁরা জিতেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় জয়ের প্রতীক রূপে লোহার আংটি ও শিকল দিয়ে তাঁরা পুরুষাঙ্গ বেঁধে রাখেন। [৩৮] কোনারকের মন্দিরচিত্রে ব্রহ্মচর্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ পুরুষাঙ্গ নিগ্রহকারী যোগিমূর্তি দেখা যায়। [৩৯]

গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসঙ্গবিবর্জিত জ্ঞানাশ্রিত যোগ মার্গাবলম্বী।[৪০] তাঁর প্রদর্শিত নাথ পন্থে ব্রহ্মচর্যের ওপর জোর ছিল সব থেকে বেশি। [৪১] বিন্দু ধারণ করে এই যোগীগণ মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিজিল গুহার দেয়াল চিত্রে যে মহাযোগীর মূর্তি অংকিত তিনি সম্ভবত গোরক্ষনাথ, নাথ-গুরুদের মধ্যে যিনি তর্কাতীতভাবে জিতেন্দ্রিয়। [৪২]

মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষ নেপালের জাতীয় দেবতা রূপে পূজিত। [৪৩] তাঁদের মূর্তি নেপালের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত। [৪৪] নেপালের মুদ্রায় শ্রীশ্রী গোরক্ষনাথের নাম অংকিত দেখা যায়; সেখানে তাঁর পশুপতিনাথের তুল্য সম্মান। শৈব যোগী হয়েও মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালী বৌদ্ধদের কাছে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অবতার রূপে উপাসিত। [৪৫]

শ্রীশঙ্কর নাথজী প্রকাশিত *মৎস্যেন্দ্রপদ্যশতকম* কাব্যের ভূমিকা থেকে জানা যায়, নেপালের রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বন্ধুদত্ত নামে এক আচার্য কামাখ্যাপীঠ থেকে মৎসেন্দ্রনাথকে নেপালে নিয়ে আসেন। অবিলম্বে নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নেপাল রাজ সেই সময় থেকে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা শুরু করেন। [৪৬] এই রথযাত্রা এখনো নেপালের একটি প্রধান উৎসব।

ভারতবহির্ভূত দেশগুলিতে নাথ-ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারের যথেষ্ট কারণ ছিল। রসায়ন, আয়ুর্বেদ, কায়-সাধনা ও হঠযোগ সিদ্ধ [৪৭] নাথযোগীদের অধিকাংশই ছিলেন সুস্থদেহী, দীর্ঘজীবী। সহজাবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীর কাছে জন্মমৃত্যু ছিল সমান। [৪৮] এঁরা কানে নরাস্থিকুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থিমালা ও হাতে নরকপাল ধারণ করতেন। [৪৯] এই বস্তুগুলি ছিল নশ্বরতার স্মারক ও মৃত্যু-জয়ের প্রতীক। মৃত্যু-ভয় থেকে মুক্ত দুঃসাহসী যোগী স্বাভাবিক ভাবেই হতে পেরেছিলেন

যাযাবর, উৎসাহী তীর্থযাত্রী ও অক্লান্ত পর্যটক।

নাথযোগীগণ ছিলেন চারণ কবি ও ভ্রাম্যমান গায়ক। একতারা হাতে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে-গ্রামান্তরে, নগরে ও রাজধানীতে। নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করতেন হীরা রণ্‌ঝা, পুরাণ ভগত আর রাজা বসুলের কাহিনী।[৫০] তরুণ নৃপতি গুপীচন্দ্রের রাজসিংহাসন ও যুবতী পত্নীদের ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের মর্মস্পর্শী কাহিনী জনমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। গুপীচন্দ্র, ময়নামতী ও হাড়িপার কাহিনী এক সময়ে হিমালয় পার হয়ে সুদূর তিব্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাথযোগীগণ ছিলেন অবধূত। সব দেশে সবরকম মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা তাদের ছিল। গোরক্ষনাথ অবধূতের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনা অনুসারে অবধূত থাকবেন কখনো পিশাচের মতো, কখনো বা রাজার মতো। তবে তাঁর অন্তর থাকবে সর্বদা শান্ত; লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ সব কিছু সম্পর্কে উদাসীন। এই জীবনদর্শন তাঁদের দিয়েছিল আশ্চর্য গতিশীলতা, তাঁদের করে তুলেছিল মহাপর্যটক।

নাথ-ধর্ম ছিল সমন্বয়ী, নাথগুরুরা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁরা সাকার ও নিরাকার দুই-ই মানতেন। এই কারণে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখেও নাথগুরুদের কাছে যোগদীক্ষা নিতেন। তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এমন-কি মুসলমানদেরও দেখা যায়। জাত-পাত এঁরা মানতেন না। হাড়ি পা জাতিতে নিম্নশ্রেণীর শূদ্র হয়েও অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাথগুরু হতে পেরেছিলেন।

গোর্খ-বিজয় ইত্যাদি নাথ সাহিত্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনপ্রিয় ছিল। মুসলমানী সংস্করণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল হিন্দু সংস্করণ। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের রুচি মতো দেব-দেবীর বন্দনা গান করে পালা শুরু করতেন। এই বিষয়ে কবি ও গায়কদের যথেষ্ট উদারতা ছিল, তাঁরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

মধ্যযুগই সম্ভবত নাথ সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। এই সময়কার নাথ সাহিত্যে রচয়িতাদের অধিকাংশই মুসলমান। *গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস* লিখেছেন শুকুর মাহ্‌মুদ। *গোর্খ-বিজয়, মীনচেতন* আর *ময়নামতীর গান* মুসলমান কবিরই রচনা।

যোগীগণ ছিলেন মূলত নিরীশ্বরবাদী; স্থানীয়, আঞ্চলিক, বিশেষ দেব-দেবী বা দেবস্থানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বা আকর্ষণ তাঁদের ছিল না। এই কারণেই তাঁরা বাহিরকে ঘর, দূরকে নিকট করতে পেরেছিলেন।

নাথ-ধর্ম ছিল মূলতঃ সমাজের নিম্নবর্গ, দলিত জনগণের ধর্ম। মানুষের সম্মান থেকে বঞ্চিত দরিদ্র হতাশ সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা হাজির করেছিলেন এক নতুন জীবনবোধ, নতুন জীবন যাত্রা।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ইসলাম — নানা ধর্মমতের জনপ্রিয়, উদার মানবিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল নাথ-ধর্ম ও সংস্কৃতির অতি মূল্যবান ভাণ্ডার। এই কারণেই এর আবেদন পৌঁছেছিল একদিকে মহম্মদ বিন তুঘলক ও সম্রাট আকবরের মতো ব্যক্তিত্বের কাছে, অন্যদিকে সূফী সাধক, কবীর নানক প্রভৃতি সন্ত ও অসংখ্য সাধক ও কবির কাছে; দেশ-বিদেশের অগণন নর-নারীর অন্তরে। নাথ-ধর্ম ও সংস্কৃতির ভারত ও ভারত-বহির্ভূত দেশগুলিতে এই বিস্তারের ইতিহাস বহুল পরিমাণে লুপ্ত, অজ্ঞাত ও অবহেলিত। কেবল তার সামান্য

নিদর্শন টিকে আছে মরুতীর্থ হিংলাজের জনশ্রুতি, কিজিল গুহার দেয়াল-চিত্র আর নেপালের মুদ্রায়।

সূত্রনির্দেশ

১. পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পাদিত) : *গোর্খ-বিজয়*, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১-ক।
২. কল্যাণী মল্লিক : *নাথপন্থ*. কলকাতা, পৃ. ১।
৩. ঐ
৪. *গোর্খ-বিজয়*. পৃ.১-ক।
৫. এশিয়াটিক রিসার্চেস, ১৮৯২, ভল্যুম-৫, পৃ.৩৭১, অক্ষয়কুমার দত্ত : *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১২।
৬. টমাস ওয়াটারস : *অন ইউয়ান চোয়াংস ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া*, ভল্যুম-১, দিল্লী, ১৯৬১, পৃ.১২৩,১৪৯।
৭. *গোর্খ-বিজয়*, পৃ.২৫(পরিচয়)।
৮. ক্ষিতিমোহন সেন , *চিন্ময় বঙ্গ*. কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৯৫।
৯. ঐ ১০. ঐ ১১. ঐ ১২. ঐ ১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. অবধূত , *মরুতীর্থ হিংলাজ*, পৃ. ৩।
১৬. ঐ
১৭. ঐ, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
১৮. ভবনাথ সরকার, *নাথধর্ম . সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৬২।
১৯ ঐ , পৃ. ৩৩। ২০. ঐ। ২১. ঐ। ২২. ঐ।
২৩. *জেসুইট পাদ্রীর আকবর নামা*, অনুবাদ ও ভাষ্য : নির্মলকুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫২।
২৪. ঐ। ২৫. ঐ। ২৬. ঐ। ২৭. ঐ। ২৮. ঐ, পৃ. ২৫২,২৫৬।
২৯. ঐ, পৃ. ২৫২। ৩০. ঐ।
৩১. ভবনাথ সরকার. পৃ. ৩৩।
৩২. ঐ।
৩৩. *ম্যান, সোসাইটি অ্যাণ্ড নেচার* : সম্পাদক পি. বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্. কে. গুপ্ত, সিমলা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৭।
৩৪. ঐ, পৃ. ৫৪। ৩৫. ঐ। ৩৬. ঐ, চিত্র-১।
৩৭. ঐ। ৩৮. ঐ, পৃ. ৫৫।
৩৯. *গোর্খ-বিজয়*. পৃ. গ-২(পরিচয়)।
৪০. ঐ, সংকেত। ৪১. ঐ,
৪২. *ম্যান. সোসাইটি অ্যাণ্ড নেচার*. চিত্র-১।
৪৩. *গোর্খ-বিজয়*. ১-খ।
৪৪. ঐ।
৪৫. ভবনাথ সরকার, পৃ. ১২।
৪৬. রাজমোহন নাথ (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি, পৃ.১০৫।
৪৭. পুপুল জয়াকার : *দি আর্থ মাদার*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ। ৭৯।
৪৮. *গোর্খ-বিজয়*, পৃ. ১-ঘ।
৪৯. সুকুমার সেন, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*. কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৪২।
৫০. জয়াকার, পৃ. ৮০।

ব্রহ্মদেশের বাঙ্গালী সমাজ

১৮৮৬ খ্রী: হইতে ১৯৬৩ খ্রী: পর্যন্ত

হিমাংশু চক্রবর্তী

এক

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে প্রবাসী বাঙ্গালীরা ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হল ১৮৮৬ খ্রী: থেকে ১৯৬৩ খ্রী: পর্যন্ত প্রবাসী বাঙ্গালীদের উপরিউক্ত বিষয়ে অবস্থান এবং এর কারণগুলি কী ছিল। শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাঙ্গালীরা ব্রহ্মদেশে যায়নি এর পূর্বে প্রাচীনকালেও ব্রহ্মদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং প্রায় দেড়শ বছর ধরে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অনুগত সাকরেদ হিসাবে কাজ করেছিল, যদিও বাঙ্গালী কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীরাও কর্মীদের প্রতি ব্যবহার করতেন উদ্ধত মনিবেরই মত।

দুই

বর্মী নাম মায়ানমার, বাঙ্গালীরা বলতেন ব্রহ্মদেশ, বার্মা নামটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দেওয়া। ভারতে বার্মাকে বলা হত , অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার দূরবর্তী অংশ। ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যার পঁচাশি ভাগের উপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[১] বঙ্গদেশের (অবিভক্ত বঙ্গ) বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনিরা চট্টগ্রাম দিয়ে আরাকান হয়ে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই জলপথ ছাড়াও বৌদ্ধ পণ্ডিতরা অসমের স্থলপথও ব্যবহার করতেন। যেসব বর্মীরা আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসতেন বাঙ্গালীরা তাঁদেরকে 'মগ' বলতেন।

বর্মা ও বঙ্গাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। চুরুট, কেরোসিন, বার্মার চাল কাঠ ও তামাকের ব্যবসায় বর্মীজ ও বাঙ্গালীরা যুক্ত ছিলেন। সরকারী বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে বার্মা ছিল ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ১৯৯৮ সালে এই তৃতীয় বাণিজ্যিক অংশীদার তেত্রিশে এসেছে। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এর অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৮১ সালে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ত্রিশ শতাংশ বাঙ্গালী ছিলেন কিন্তু ১৯০১ সালে তা কমে পঁচিশ শতাংশে দাঁড়িয়ে ছিল।

তিন

১৮২৪-২৬ সালে ইংরেজ শাসনাধীন বঙ্গদেশের সহিত ব্রহ্মদেশের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হলে ইংরেজ প্রশাসনের চাকুরিসূত্রে বাঙ্গালীরাই প্রথম ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল অস্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। চাকরি বলতে ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক চাকরিকেই বোঝাচ্ছি। সরকারী চাকরি ছাড়াও

শিক্ষকতা, ওকালতি, চিকিৎসা সাংবাদিকতা প্রভৃতি পেশার সূত্রেও বহু বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়াও বহু বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কাঠ ব্যবসায়ী, ক্যাবিনেট শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক প্রভৃতিরা বার্মা মুল্লুকে পাড়ি দিয়েছিলেন।

ডাক্তার ও রেল বিভাগের সিংহভাগ কর্মীই ছিলেন বাঙ্গালী। শুধু ব্রহ্মদেশেই নয়, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতেও পেশাগত শ্রেণী হিসাবে একটি ভূমিকা নিয়েছিল বাঙ্গালীরা, তাই হেনরী কটনের বিখ্যাত উক্তি এসে যায় "The Bengali rules from Rangoon to Peshwar."

১৮২৪-২৬ খ্রীঃ ইঙ্গ-ব্রহ্ম প্রথম যুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ব্রহ্ম দেশের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হলেও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছিল ১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ যখন ব্রহ্মদেশকে ইংরেজ ভারত সরকার দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু এর অবশ্যম্ভবী ফল হল Standardisation of Burma's administration according to the Indian model. [৪] এটি কার্যকর করতে গিয়ে ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল এবং ভারত থেকেই ব্রহ্মদেশ শাসিত হতো। ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়াতে কার্যত কলকাতা থেকেই ব্রহ্মদেশ শাসিত হতো।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বঙ্গ-ব্রহ্মের যোগাযোগকে তিন সুনির্দিষ্ট পর্বে বিভাজন করা যেতে পারে। প্রথম ১৮২৪-২৬ থেকে ১৮৮৫-৮৬ সময় পর্ব। দ্বিতীয় ১৮৮৬ থেকে ১৯৩৫ সময় পর্ব। তিন ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৩ সময় পর্ব। ১৯৩০-এর সময় পর্বেই ব্রহ্মদেশে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য মন্দার জন্য বাঙ্গালীর সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৩৮-এর ভারত বিরোধী দাঙ্গা (Anti Indian riots) Tenancy disposal Act of 1948, জমি জাতীয় করণ আইন ১৯৪৮, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আইন১৯৪৮, বর্মা বিদেশী আইন ১৯৪৮ বাঙ্গালী স্বার্থকে বিঘ্নিত করেছিল। তাছাড়া ১৯৪৭-এর বর্মা সংবিধান বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকার না করার ফলে এদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। ১৯৩৬ সালে বার্মায় সামরিক শাসন কায়েম হলে বিদেশী হঠাও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য পর্ব থেকে বাঙ্গালীরা ব্রহ্মদেশ ছাড়তে শুরু করেছিলেন, ১৯৩৬ খ্রীঃ অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ১৯৪০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রহ্মত্যাগী উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা কম ছিলনা। বঙ্গদেশের আর্থিক ক্ষেত্রে বর্মী প্রত্যাগত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা কর্ম বিপর্যয় ডেকে আনেনি ? এই উদ্বাস্তুরা অবশ্য ইভাক্যুয়ী নামে পরিচিত লাভ করেছিলেন।

চার

রেঙ্গুন যা বর্তমানে ইয়াংগুন নামে পরিচিত সেই শহরের প্রাক স্বাধীনতাকালীন জনবিন্যাসের কাঠামোটি ছিল খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। ১৯৩০ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী রেঙ্গুন শহরের জন সংখ্যায় বাঙ্গালীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশেষভাবে সরকারী চাকরি ও পেশাগত কাজে শিক্ষক, চিকিৎসক ও উকিল হিসেবে, এই মধ্যবিত্ত ও পেশাগত বাঙ্গালীবাবুদের উদ্যোগেই ব্রহ্মদেশে ১৯০২ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তারা একটি ব্রাহ্মমন্দির রেঙ্গুন শহরে স্থাপন করেছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশে বার্মাদেশে গিয়েছিলেন. তিনি ব্রহ্মদেশ ও বার্মাদেশে বৌদ্ধধর্ম নামে ধর্মতত্ত্ব

পত্রিকায় ১৮২৭-২৯ শকাব্দে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাছাড়া রেঙ্গুন হাইকোর্টের ব্যারিস্টার জে. আর. দাস ও ইন্দভূষণ মজুমদার প্রমুখরা ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীরা বর্মাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা খুলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মদেশের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ড: প্রবোধচন্দ্র বাগচি।

ব্রহ্মদেশের বঙ্গভাষী বাসীরা ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসবিদ ড নিহাররঞ্জন রায়ও এই অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীরা রেঙ্গুনে বেঙ্গল সোসাল ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। এখানে বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চা হতো। যখন কর্মসূত্রে শরৎচন্দ্র বার্মাতে ছিলেন, তখন তিনিও এই ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বেঙ্গল একাডেমি নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রেঙ্গুনের বর্মীজবা স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের মোহিতকুমার মজুমদার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধীরচন্দ্র চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বাংলাভাষার অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র কর্মজীবনের সূচনা লগ্নে রেঙ্গুনেব হার্ডসন কলেজের পালি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র সিন্‌হা রেঙ্গুনেব রেমান ক্যাথলিক অর্ডার অব ব্রাদার্স স্যালভেসনে শিক্ষকতা করেছিলেন।

প্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা রেঙ্গুনে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। *Rangoon Rail* ছিল সুপরিচিত ইংরেজী পত্রিকা এবং এব সম্পাদক ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জনৈক বাঙ্গালী *United Burma* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন এবং পত্রিকাটি বঙ্গদেশেও আসতো। বিভিন্ন সময়ে বার্মায় গিয়ে যারা কর্মসূত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন সুপরিচিত আইনজীবী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য, কবি নবীনচন্দ্র সেন ও তার পুত্র ব্যারিস্টার নির্মল সেন, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, ব্যারিস্টার পি. সি. সেন, রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র শিল্পী সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী আভা বন্দ্যোপাধ্যায় রেঙ্গুনে কাটিয়েছেন বিবাহ পূর্বজীবন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এরা তিন বোন ছিলেন এবং সীতাদেবীর শ্বশুর মান্দালয় হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন।

কাঠের ও চালের ব্যবসা করে যাঁরা বার্মায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিল্পপতি আলামোহন দাস, চট্টগ্রামের পাটিয়া থানার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র জ্ঞানেন্দ্র লাল চৌধুরীব নাম উল্লেখযোগ্য। সুপরিচিত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ রেঙ্গুনে চালের ব্যবসা করে প্রচুর পরিমানে অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

১৯০৩ খ্রীঃ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তেরো বছর ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনে ও পেগু শহরে কাটিয়ে ছিলেন। তার ব্রহ্মদেশে অবস্থান নিয়ে গিরীন্দ্রনাথ সরকার *ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে বিবাহ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনচর্যা ও লেখনীতে বার্মার প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছিল বলে গবেষকদের অনুমান। *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে রয়েছে বার্মার কথা।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যাবে *কোরক*(শারদীয়া ১৯৬৮) সাহিত্য পত্রিকায়। এ. সা, জাগা দোখা লিখিত *ব্রহ্মদেশে রবীন্দ্রনাথ* শিরোনামের প্রবন্ধে। বিজিতকুমার দত্তের ব্রহ্মদেশ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধেও কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

বার্মার বাঙ্গালী ও বর্মীজদের কাছ থেকে কবিগুরু ১৯১৬,১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন।

ভ্রমণলেখক শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল একসময় বার্মায় ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রেও ব্রহ্মদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শিবরাম চক্রবর্তীর এক মেয়ে ও ব্যোমকেশের কাহিনীতে, বার্মার কথা আছে। বনফুলের *ডানা* উপন্যাসে জাগল অধিকৃত বার্মা থেকে উদ্বাস্তুদের চলে আসার মর্মন্তুদ কাহিনী বিধৃত আছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের *ইরাবতী* এবং শৈলেশ দের *তিন অধ্যায়ে* বার্মার কথা জানা যাবে।

সিনেমার নায়ক সুধাংশু বার্মায় ছিলেন। হিরন্ময় দাশগুপ্তের *বার্মার পথে* চলচিত্রে বার্মার বিস্তৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। সুপরিচিতা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরীর বাবা বার্মায় চাকরি করতেন এবং তাঁর শৈশবের অনেকটাই বার্মায় কেটেছিল। সুপ্রিয়া চৌধুরী নিজে লিখেছেন 'আমি তো বার্মায় বড় হয়েছি। একবার নেচে বার্মার প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছিলাম।'

পাঁচ

ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনে, বাঙ্গালীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা ঐতিহাসিক ভাবেই অনিবার্য ছিল। বার্মার ছাত্রদের সিংহভাগই কলকাতায় পড়তে আসতেন। ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত তাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হতো। ১৯২০ সালে বার্মাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে কলকাতার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হতে থাকে। তবুও ১৯৫৫-৫৬ সালেও কলকাতার কলেজগুলিতে বার্মার ছাত্রদের দেখা যেত। কলকাতায় পাঠরত বার্মার ছাত্ররা পরবর্তীকালে ইংরেজ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

অপরদিকে বঙ্গদেশের বিপ্লবী তরুণরা প্রায়ই বার্মায় আশ্রয় নিতেন; কারণ ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের প্রায়শই ব্রহ্মদেশে নির্বাসনে পাঠাতেন। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৪-২৭ সালে, কর্মী মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পূর্ণ দাস, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ মান্দালয় জেলে ছিলেন। অশোক মুস্তাফির *সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ* গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেলে বন্দী অবস্থার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতিরা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন। রাজদ্রোহমূলক সংবাদ প্রচারের অপরাধে অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশকুমার মুখোপাধ্যায় বার্মায় নির্বাসিত হয়েছিলেন।

দোবামা (আমাদের বার্মা) নামে একটি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ধাঁচে ও প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা আঙ. সান ও তার সহকর্মী হরিনারায়ণ ঘোষাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন

তিরিশের দশকেই। বর্মীজ নেতা আউংসান প্রমুখ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সাথে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগাযোগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৪০-এ আউংসান, থাকিন সো থানটুন, হরিনারায়ণ ঘোষাল, সুবোধ মুখার্জী, অমর নাগ, গোপাল মুন্সী, মাধব মুন্সী, বিজয় সেন প্রমুখ তরুণেরা গড়ে তুলেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বার্মা। বার্মায় সাম্যবাদী আন্দোলন ও দল গড়তে বাঙ্গালীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার বার্মায় গিয়েছিলেন আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে। সুভাষ অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুও বর্মীজদের নিকট খুব প্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী: শরৎ বসু রেঙ্গুনে গেলে তাকে উষ্ণ সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন বাঙ্গালী ও বর্মীজরা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও ব্রহ্মদেশের বাঙ্গালীদের নিকট খুব প্রিয় ছিলেন।

১৯৬৩ সালে বার্মায় সামরিক সাকার (Junta) স্থাপিত হলে এবং অন্যান্য কারণে বার্মা থেকে বাঙ্গালীরা দলে দলে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য জায়গায় ইভাকিউ হিসেবে আশ্রয় নেয়। বার্মা থেকে উদ্বাস্তু হয়েও ব্যাপক সংখ্যক বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বারাসাতে বার্মা থেকে আসা উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের একটি কলোনিও আছে। এইভাবে বার্মার অধিবাসি বাঙ্গালীরা উদ্বাস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। পরিসংখ্যান ও ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবারে বার্মার উদ্বাস্তুরা স্থান করে নিয়েছেন। দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নিয়ে আমরা যত খবর রাখি, বার্মার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের নিয়ে সে খবর রাখি না।

সূত্র নির্দেশ

১. *Freedom Struggle in Burma* — Kumar Badri Narain Singh

২. *Indians in Burma I*, Uma Shankar Singh

৩. *Burma and India* - Uma Shankar Singh, 1948-62

৪. D.G.E Hall -- *A History of South East Asia.*

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

১. *বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী* — জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।

২. *এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন* — জহর সেন।

৩. *কথা ও সাহিত্য*, জৈষ্ঠ্য-১৩৯৯, বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. *জাগ্রত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া* — শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

৫. অংসান - সুচির উত্তরাধিকার - এক সাংবাদিকের দিনপঞ্জিক
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, *শারদীয় কালান্তর* / অক্টোবর ১৯৯৬

৬. বর্মা মুলুকে — উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *দেশ*, শারদীয়, ১৩৯২

৭. একটি বাঙ্গালী উপনিবেশের সূর্যাস্ত : প্রসঙ্গ বার্মার বাঙ্গালী সমাজ, আনন্দ গোপাল ঘোষ, *গণদীপায়ন*, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, ১৯৯৬।

৮. ইতিহাস অনুসন্ধান -৩, ১৯৮৮, গৌতম চট্টোপাধ্যায়

৯. *British Policy and the Nationalist Movement*. Albert D. Moscotti.

এই প্রবন্ধের কাঠামো প্রস্তুতি ও তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. আনন্দ গোপাল ঘোষের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

৫২

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মূল ভূখণ্ড
এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কেন্দ্র : ১৯০০-১৯১৫

পারমিতা দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা-প্রবাহ ভারতবর্ষের বাইরে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল। এই বহির্বিশ্বের যে সকল স্থানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ড তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থাইল্যান্ড, বার্মা ও সিঙ্গাপুর মালয় অঞ্চলে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল। ভারতের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক নৈকট্য এবং রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উত্থান ভারতে কর্মরত বিপ্লবীদের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসনকারী বিপ্লবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। দুটি মাধ্যমের দ্বারা এই সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিল, গদর বিপ্লবীদের দ্বারা এবং বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারা। উভয় বিপ্লবী দলই ব্রিটেনের শত্রু জার্মানীর সহযোগিতা পেয়েছিল।

আলোচ্য অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচয়ের ইতিহাসের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। পূর্বে চৈনিকরা এই অঞ্চলকে 'farther India' বলে চিহ্নিত করত। সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত সময় ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলকে 'Indo-China' বলে অভিহিত করত অর্থাৎ যে অঞ্চল ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[১] বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্স বোঝায়।

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে যে সব ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন করেছিল তাদের দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম দলভুক্ত হল যারা পারিবারিক কারণে অথবা চাকরী সূত্রে অভিবাসন করেছিলেন। ড. মনজিৎ সিং সিধু *Sikhs in Thailand* গ্রন্থে দেখিয়েছেন থাইল্যান্ড আগমণকারী শিখদের মধ্যে ৭২ শতাংশ এসেছিলেন তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে। ১৪ শতাংশ থাইল্যাণ্ডে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে এসেছিলেন। শিখ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান, চেট্টিয়ার শ্রেণী ব্যবসায়ী মহাজন এবং শ্রমিকরা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।[২] এরা প্রধানত বার্মা ও মালয় সিঙ্গাপুর অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে।[৩] এই সকল অভিবাসনকারীর সাথে বিপ্লবের কোন সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত সেইসব ভারতীয়রা যারা বিপ্লবের কাজ নিয়ে থাইল্যাণ্ড, বার্মা ও মালয় সিঙ্গাপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের প্রচারকার্যের ফলে অনেক প্রথম দলভুক্ত অভিবাসনকারী দ্বিতীয় দলভুক্ত হয়েছিল।

ভাবতীয় বিপ্লবীদের বহির্গমনের কারণ দেশের বাইরে অনেক স্বাধীনভাবে ও উচ্চপদে

কাজ করতে পারত। এই সময় বিদেশে বসবাসকবী শিক্ষিত ভারতীয়রা যেখানকার নির্বাসিত বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসেছিল, এরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল। প্রবাসে বিপ্লবী ভারতীয়দের সাথে ভারতে কর্মরত তাদের সহযোগীদের কাজের পরিস্থিতির পার্থক্য ছিল। তাদের সাথে সহযোগীদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে প্রবাসী বিপ্লবীদেব কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতে হত। বিদেশে তারা সামাজিক নিষেধাজ্ঞা থেকেও মুক্ত ছিল। এব ফলে বিদেশে দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভারতীয়বা অনেক আগে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল। এখানে বিপ্লবীরা একে অপরের সাথে অনেক দ্রুত ও সহজে যোগাযোগ করতে পারত। এর ফলে এদেব বিপ্লবী সংগঠনগুলি অনেক প্রবাসী ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিল।[৪]

এদের আপাত উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নকে ভারতবর্ষের সীমাবদ্ধ আঙিনা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই তাদের বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রধান কাজ ছিল বিপ্লবী পত্রিকার প্রকাশনা। এই পদ্ধতিতে একদিকে দেশবাসীকে বিশেষত সেনাবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, তাদের বিপ্লবী কার্যাবলীর পক্ষে সারা বিশ্বের স্বাধীনতা ও সমর্থন চেয়েছিল। খুব শীঘ্রই বিপ্লবী সাহিত্যের সাথে আগ্নেয়াস্ত্র, বারুদ, প্রভৃতি বিদেশ থেকে ভারতে চোরা চালান হতে থাকে। বিদেশে ভারতীয়রা বোমা তৈরীর পদ্ধতি ও সামরিক প্রশিক্ষণ নেয় এবং এই শিক্ষাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে লাগায়।[৫]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে গদর পার্টির বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ও কানাডা থেকে গদর বিপ্লবীরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। এই সময় তারা ও জার্মান সহযোগীরা পরিকল্পনা করে যে যেসব গদর বিপ্লবীরা দেশে ফিরে আসছে, তাদের লোক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে একত্রিত করা হবে এবং সেখান থেকে ভারতে সশস্ত্র অভিযান পরিকল্পনা করা হবে।[৬] ভৌগোলিক সুবিধা হেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে থাইল্যাণ্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে অস্ত্র গোপনে পাচার করা সম্ভব ছিল। এর জন্য উত্তর-পশ্চিম থাইল্যাণ্ডে পাকোর (Pakoh) কাছে গুহা খনন করা হয়েছিল।[৭] এই সময় গদর বিপ্লবীদের পাশাপাশি ব্যাঙ্ককে জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. হার্টজকা (Dr. Hertzka) কয়েকটি থাই সংবাদপত্রকে ঘুষ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছিল।[৮] ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে তারা ব্যাঙ্ককে জার্মান সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, যার নাম *উনশ্যান* (*Unshan*)।[৯] প্রায় একই সময়ে হং কং-এর প্রাক্তন জার্মান কনসাল ড. ভোরেশ (Dr. Varetzsch) কে ১০০,০০০ ডয়েশমার্ক দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ভারতে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে।[১০] তিনটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে গোপন যোগসূত্র স্থাপন ও আর্থিক লেনদেনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ একই বছরে অগাস্ট মাসের মধ্যবর্তী সময় তুরস্কের গুপ্তচর কর্নেল নিয়াজী বে সাইগন থেকে ব্যাঙ্ককে এসে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারকার্য চালান ও সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবী ও সব ইসলামাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলেন।[১১] পরে অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহে থাই সরকার নিয়াজী বে-কে (Niazi Bey) নির্বাসিত করে। তবে প্রথমদিকে এই সফল পরিকল্পনার পিছনে গদর বিপ্লবী ছাড়া সেখানকার অন্যান্য বিপ্লবীদের সমর্থন ছিল না। পরেব বছর (১৯১৫) ৯ই জানুয়ারী বার্লিন থেকে বরাকাতুল্লাহ (Barakatullah) আসেন, যিনি

আমেরিকায় গদর পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই বিপ্লবীদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান। তিনি মনে করতেন যে, ভারতে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং থাইল্যান্ড থেকে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করলে চরম সাফল্য লাভ করা যাবে। [১২]

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে হেরম্বলাল গুপ্ত জার্মানীর বার্নস্টফকে (Bernstorff) অনুরোধ করেন ৮,০০০ রাইফেল, ২,০০০ বন্দুক এবং কিছু মেশিনগান স্বদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠাতে। মার্চের মাঝামাঝি সময় তিনি বিভিন্ন জার্মান সহযোগীর সাথে যোগাযোগ করেন। ঠিক হয় বোহম (Boehm) এবং স্টারনেক (Sterneck) সামরিক পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান করবে। এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে বার্নস্টফ (Bernstorff) জার্মান বিদেশ দপ্তরকে আদেশ দেয় অস্ত্র পাঠানোর জন্য। ঐ মাসের ১৬ এবং ৩০ তারিখে রিসউইজ (Reiswitz), ওয়েহেদ (Wegde) এবং উইলসন উইল-কে (Wlilson Will) ২০,০০০ ডলার করে অর্থ প্রেরণ করে অস্ত্র কিনবার জন্য। [১৩]

এই সময় বার্মায় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয় যাতে গদর বিপ্লবীদের যাবার সময় কোনরূপ বাধা না দেয়। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে সোধ সিং-কে থাইল্যাণ্ডে পাঠানো হয় পরিকল্পনাকে সংগঠিত করার জন্য। বোহম (Bowhm), অন্যান্য জার্মান সহযোগী এবং ধীরেন্দ্রনাথ সেন ১৪ই মে সান ফ্রান্সিসকো থেকে যাত্রা শুরু করেন। হেরম্বলালের নির্দেশ অনুযায়ী তারা হনুলুলুতে গিয়ে পৌঁছানোর পর জার্মান কনসালের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে ঠিক হয়। সুকুমার চ্যাটার্জ্জী ও দরিশি চেনছায়া (Darishi Chenchhaya) সংকেত চিহ্ন দেওয়ার চিঠি নেবার পর তাদের ম্যানিলায় যাবার নির্দেশ দেন। [১৪]

সেখান থেকে তারা 'Henry s' নামক জাহাজে জার্মান বেন মেয়ের অ্যান্ড কোম্পানীর (Behn Meyer & Co.) কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে রওনা দেয়। কিন্তু ইঞ্জিনের গোলযোগ হেতু কোনমতে সেলিবিসের উত্তরে প্যালেলে (Palcleh) পৌঁছানোর পর শুল্ক অধিকর্তারা জাহাজ বাজেয়াপ্ত করে। এর ফলে এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্যদিকে, সোধ সিং, সুকুমার চ্যাটার্জ্জী এবং দরিশি চেনছায়া থাইল্যাণ্ডে পৌছানোর পর থাই সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। এছাড়া ব্যঙ্ককের বাইরে ৪০ জন সশস্ত্র বিপ্লবীর থাই বার্মা সীমান্তে জার্মানীদের সাথে মিলিত হবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং থাইল্যান্ড থেকে ভারতে সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনার এখানেই সমাপ্তি ঘটে। [১৫]

গদর বিপ্লবীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক ছাউনিগুলিতে বিপ্লবী সাহিত্য ছড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আদর্শে প্রভাবিত করতে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে প্রভাবিত 130th Baluchis সাদেরকে ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার সামরিক কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছিল কঠোর হাতে।[১৬] এরপর সিঙ্গাপুরের Mahay State Guides বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। প্রধানত মুসলমানদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তুরস্কের কনসালকে তারা জানায় যে তুরস্কের স্বপক্ষে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত।[১৭] কিন্তু এই বিদ্রোহকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ Fifth Light Infantry-র বিদ্রোহকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। মুসলমান ও আমেরিকার গদর বিপ্লবীদের প্রচারকার্য এই বিদ্রোহকে প্ররোচিত করেছিল। এছাড়াও সিঙ্গ

াপুরে জার্মান যুদ্ধবন্দীদের দ্বারাও তারা উৎসাহিত হয়েছিল। তাই মনে করা হয় গদর বিপ্লবীদের প্ররোচনা ছাড়াও এই বিদ্রোহের সম্ভবনা ছিল। এই বিদ্রোহে গদর বিপ্লবী মুজতবা হুসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

যদিও Fifth Light Infantry গদর বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু হংকং-এ তাদের বদলি না করা হলে তারা হয়তো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত না। বিদ্রোহের দিন ঠিক করা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ১৭ই ফেব্রুয়ারী Nile নামক জাহাজের আসার কথা ছিল, যা এই সামরিক বাহিনীকে হংকংএ নিয়ে যাবে। কিন্তু Nile এসে পৌছায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী, এর ফলে পূর্ব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্রোহ প্রথম শুরু করে ইসমাইল খান আলেকাজান্ড্রা ছাউনিতে। এই বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল, কিন্তু অ্যাডমিরাল ভেরেসের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভব হয়। তবে একক শক্তিতে দমন করতে পারে নি, রাশিয়া, ফরাসী, জার্মানী রণপোতের সাহায্যে দমন করেছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। [১৮]

বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও প্রথম ধাপে তারা সফল হয়েছিল। এই সময় তারা জার্মান যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল এবং অনেক ইউরোপীয়দের নিহত করেছিল। কিন্তু কোন সংগঠন ও দক্ষ নেতার অভাবে খুব বেশী সফলতা অর্জন করা যায় নি। তাই এই বিদ্রোহ গদর বিপ্লবীদের সাহায্য করার পরিবর্তে সতর্ক করেছিল গদর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে। [১৯] তাই এর পরবর্তীকালে মালয়, সিঙ্গাপুর অঞ্চলে ভারতীয়দের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। [২০]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বাংলার বিপ্লবী ও জার্মানদের মধ্যে আর্থিক ও অস্ত্র বিনিময়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যুদ্ধকালীন সময়ে। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী বোসের পেশোয়ার থেকে বাংলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ব্যর্থতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীকে অনুপ্রাণিত করে ভারতে দ্বিতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য। [২১] কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন এর জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য দরকার এবং এ ব্যাপারে তিনি ব্রিটেনের শত্রু জার্মানীর সহযোগিতা নিয়েছিলেন। জার্মান চ্যান্সেলার কেন্দবা হলওয়েলের অস্ত্র সাহায্য নেবার প্রতিশ্রুতি বাংলায় বিপ্লবীদের আরো বেশী উৎসাহিত করেছিল। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Berhin-India Committee তৈরি হয়। পরে ঐ কমিটিকে Indian Independence Committee তে পরিবর্তন করা হয়। [২২] এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ১মত জার্মানী থেকে আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য লাভ ২য়ত ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করা। ভারতের উপকূল পর্যন্ত জার্মান জাহাজকে পথ দেখানোর জন্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অস্ত্র ও আর্থিক লেনদেনের পরিকল্পনার জন্য ব্যাঙ্কক, কাটভিয়া ও সাংমাইসের জার্মান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়। [২৩]

এই সময় ব্যাঙ্ককে ভারতের বিপ্লবী কেন্দ্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভোলানাথ চ্যাটার্জ্জীর মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের সাথে থাইল্যান্ডের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। ১৯১৩ সালে থাইল্যান্ডে যুগান্তর গোষ্ঠী ননী বোস ও ভোলানাথ চ্যাটার্জী নামে দুজন বিপ্লবীকে থাইল্যান্ডে পাঠায়। এরা ছাড়াও যদুগোপাল মুখার্জ্জী, সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত থাইল্যাণ্ডের বিপ্লবী কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিলেন। যেহেতু থাইল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ ছিল তাই

সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাবে ও ক্রমশঃ বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে আশা করা হয়েছিল। যুগান্তর গোষ্ঠী সেখানকার ভারতীয় উকিল কুমুদ মুখার্জ্জী এবং জার্মান ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে থাই রেলপথ নির্মাণে কর্মরত ভারতীয় মূলতঃ পাঞ্জাবীদের সাহায্যে কাজ শুরু করেছিল।[২৪] এইভাবে সেখানে জার্মানীদেব এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সাথে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়েছিল।

এই সফল বিপ্লবীদেব সাহায্যে একদিকে ব্যাঙ্কক এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে অন্যদিকে ব্যাঙ্কক ও বাংলার বিপ্লবী কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়েছিল। এইভাবে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ছদ্মনাম সি.এ মার্টিন) এবং আত্মারামের মাধ্যমে ১৯১৫ সালের জুন এবং অগাস্ট মাসের মধ্যে জার্মান আর্থিক সাহায্য ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে আসে। কলকাতা, ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার মধ্যে চারবার অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে ১৫০০০ টাকা কলকাতায় বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছায়। এর পর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সি.এ. মার্টিন) বাটাভিয়া ও ব্যাঙ্ককে জার্মান দূতের সাথে আলোচনার পর জার্মান অস্ত্র পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফিরে আসেন কলকাতায় সেই অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে।[২৫]

বাংলায বিপ্লবীরা রায মঙ্গল নামক জায়গায় অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর ব্যাঙ্কক থেকে আত্মাবামের টেলিগ্রাম আসে, যার তারিখ ছিল ১৯১৫ সালের জুন মাসের ১৩ থেকে ১৭ কলকাতাব বৌ বাজারে বি. কে. রায় এবং বেনিয়াটোলা স্ট্রীটের ভোলানাথ চ্যাটার্জ্জীকে এই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। অস্ত্র পাঠানো হয়ে গেছে এবং তা ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পৌঁছবে। সে কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই জাহাজ শেষ পর্যন্ত আর এসে পৌঁছায় নি। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে বাংলার বিপ্লবীরা জার্মানীর থেকে অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা জানতে পারে।[২৬]

পরিশেযে বলা যায়, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আদর্শের মিল থাকার জন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই সম্প্রসাবণ বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই শুরু হয়েছিল অর্থাৎ যখন ভারতে কোন বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। জাতীয়তাবাদের আঙিনায় বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভুখণ্ড বাদ যায় নি। কিন্তু ভৌগোলিক নৈকট্য ও সারা রাজনৈতিক সা তাই যথেষ্ট ছিল না জাতীয় সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্য। ভারতীয় জনগণের সক্রিয় ও জার্মান শক্তির সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর সাথে একথাও স্বীকার্য যে সামান্য পাঞ্জাবীরা বাদে দক্ষিণ ভারতীয় প্রবাসীরা বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। আবার থাইল্যাণ্ড, বাসায় এই উদাসীনতা না থাকলেও সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু তাদের ব্যর্থতার অর্থ বিপ্লবী কার্যবলীর সমাপ্তি নয়। তবে একথাও স্বীকার্য যে ব্রিটিশদের দমন ও আপোশমুখী নীতির ফলে বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী আন্দোলনের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছিল। তার সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৭ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকায় ইঙ্গ ফরাসী পক্ষে যোগদান এবং জার্মান সামরিক প্রতিশোধ স্পৃহা ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুগান্তর গোষ্ঠী বশ্যতা স্বীকার না করে তাসের কার্যবলী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।[২৭]

সূত্র নির্দেশ

১. *History of World. The Renaissance to world war I.* General Editor: Tahu Whitsaey Hall
২. *Indian Revolutiaonies Abroad, 1905-22· In the Background of Iaternational Developments.* Arun Coomer Bose.
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. ঐ
১৬. *Indian Revolutionary Movement Abroad·1905-21,* Tilak Raj Sareen
১৭. ঐ
১৮. ঐ
১৯. ঐ
২০. *Indian Revolutionaries Abroa* - Arun Coomer Bose
২১. Two Great Indian Revolutionaries Rash Behari Bose & Jyotindranath Mukherjee, Uma Mukherjee.
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. ঐ
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. ঐ

থাই ইতিহাসের আলোকে নারী ও পেশার জগৎ

তপতী রায় চৌধুরী

যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজিত বিভিন্ন গোষ্ঠী সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা স্থিরিকরণে সহায়ক বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডে শিল্পায়ন ও প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বে থাই নারীঃ পেশার ধরন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

থাইল্যাণ্ড একটি পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Patrimonial Country)। এই পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেখা যায়।[১] এখানে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারা যাবতীয় কার্যনির্বাহ হয়। আর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। এই জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ধর্ম (Patrimonial Religion) মানুষের সামাজিক কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয় এবং প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে এখানকার অধিবাসীদের সহায়তা করে। এই সূত্রেই ধর্ম বিরাজিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এক প্রকার নৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ধর্মীয় স্বীকৃতি অর্জন করার ফলে এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুসৃত যাবতীয় তত্ত্ব কোন শ্রেণীর কাছে নির্যাতনমূলক বলে মনে হলেও তা যদি গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূল হয় তবে তা অনুসরণ করা হয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর অসুবিধাকে গণ্য করা হয় প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে তাদের মানিয়ে চলার অসুবিধা রূপে।[২]

থাইল্যাণ্ডে প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বে পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী প্রাধান্য সমন্বিত সমাজব্যবস্থায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মানবসভ্যতা বিকাশের আদি পর্যায়ে সমাজ সংগঠনে ধর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক Emild Durkheim বলেছেন "...The operation of religion as uniting people into one single moral community called a Church all those who adhere to them."[৩] ফলে যেকোন অনুন্নত সমাজ ধর্মীয় সমর্থন পুষ্ট যেকোন বিধান অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। প্রাক শিল্পোন্নত থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রধান রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেখানে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রধান ধর্ম। শতকরা ৯৪ জন থাই অধিবাসী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী।[৪] যদিও উল্লেখ্য, নবাগত যেকোন ধর্মকে তার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বিরাজিত ব্যবস্থার সাথে সমাঝোতা করতে হয়।[৫] থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার আদি পর্বে (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সেখানে বিরাজিত প্রকৃতিবাদের সাথে সমাঝোতা করে চলা সহজেই গ্রহণীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে থাই অধিবাসীদের কাছে। 'রাজনৈতিক কর্তৃত্ব' (Political authority)

সম্পর্কিত বৌদ্ধ ধারণা অনুসারে বলা হয়েছে যে, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের অসম্পূর্ণতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।[৬] সেই সঙ্গে 'কর্মবাদ' অনুসারেও বলা হয় পূর্বজন্মের সুকর্মের জন্যই কোন ব্যক্তি ইহ জন্মে রাজা হতে পারেন। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান দ্বারা বৌদ্ধধর্ম রাজার কর্তৃত্বকে দৃঢ়তা দেওয়ায় থাই রাজতন্ত্র বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য ও সমর্থন জানিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। সেইসঙ্গে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় থাই সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হয় সর্বব্যাপক।

এই প্রসঙ্গে থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় ধর্ম বৌদ্ধধর্মে নারী সম্পর্কিত বিধানগুলি উল্লেখ্য। যদিও বৌদ্ধ 'কর্মবাদ' অনুসারে নারীজন্মকে পূর্ব জন্মের কুকর্মের ফলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৭] তবুও নির্বান লাভের জন্য বুদ্ধদেব স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সমান অধিকারদানের পক্ষপাতী ছিলেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা বৌদ্ধ সংঘে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সংঘের যাবতীয় বিষয়ে পুরুষ সন্ন্যাসী বা মঙ্কদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য মহিলাদের সন্ন্যাসীনী হিসাবে সংঘে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বৌদ্ধ বিধান অনুসারে ইচ্ছুক থাই মহিলাদের পরিপূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ এখনও সেখানে স্বীকৃত নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রের মতই সামাজিক জীবনেও থাই নারীরা তাদের যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পেশার জগতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

বুদ্ধ-উত্তর পর্বে থাইল্যান্ডে বৌদ্ধধর্মের এইরূপ পবিবর্তনের পশ্চাতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর হিন্দুধর্ম-র প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। থাইল্যান্ডে সুখথাই রাজবংশের পতনের পর দক্ষিণ থাইল্যান্ডে আয়ুথিয়া রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় যরমোরাজার রাজত্বকালে (১৪২৪-১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) থাইরা কম্বোডিয়া অধিকার করে। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে কম্বোডিয়া বিজয়ের পর এই অঞ্চল আয়ুথিয়ার অন্তর্গত হওয়ায় এখানকার ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কৃতি থাই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। কম্বোডিয়ার ব্রাহ্মন্যবাদও মেয়েদের পুরুষ অপেক্ষা হীন সামাজিক মর্যদার অধিকারিণীরূপে বর্ণনা করে। এমনকি তাদের কোনরূপ সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারদানেরও বিরোধী। এরফলে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে থাই সমাজ ও রাজদরবারে নারীর যে অধিকার ছিল তা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং থাই নারীর অধিকার হরণে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই সমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে।[৮]

থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম নারীকে হীন সামাজিক মর্যাদার অধিকারিণীরূপে চিহ্নিত করেছে। সেখানে এক প্রথা অনুসারে প্রত্যেক পরিবারের কিশোর পুত্র সন্তানরা সাময়িককালের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে। পরে তারা সাধারণ জীবন যাপন করে। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে এইসব পুত্রসন্তানরা বাবা মায়ের মৃত্যুর পর তাদের স্বর্গপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। এইভাবে পুত্র হিসাবে তারা বাবা মায়ের প্রতি তাদের নৈতিক কর্তব্য পালন করে। কিন্তু মেয়েরা কোনরূপ পারলৌকিক (Spiritual) ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সন্তান হিসাবে তাদের বাবা মায়ের প্রতি Gratitude বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।[৯] এরফলে প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বে সামাজিক মর্যদায় অবনমিত কন্যা সন্তানের শিক্ষাকেও তাদের অভিভাবকরা বাহুল্যতা বলে বিচার করত। থাইল্যাণ্ডে এই সময় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল বৌদ্ধ সংঘগুলি। এখানে ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। এরফলে বিভিন্ন অর্থ

উপার্জনকারী ক্ষেত্রে অশিক্ষিত অবস্থায় শিশু বয়সেই নিযুক্ত করা হত মেয়েদের। প্রাক্ শিল্পায়ন পর্বে মেয়েরা মূলত কৃষিকাজে এবং রাজদরবারে রাজা ও অভিজাতদের মনোরঞ্জনের কাজে নিযুক্ত হত।

শিল্পায়নের যুগে থাই নারীর নিয়োগের গঠনগত পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষত বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি যখন আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে সেই সময় থাইল্যাণ্ডের বর্তমান চক্রী বংশোদ্ভুত রাজারা থাইল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুযোগের সদ্বব্যবহার করে স্বদেশী ব্যক্তিগুলির সাথে সহযোগিতা করায় আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে এবং এর ফলে বহু বিদেশী রাষ্ট্রের বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে থাইল্যান্ড। এই সময় বহু বিদেশী বণিক থাইল্যান্ডের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাল নিয়ে ব্যবসা করতে আসত ফলে বিদেশী বণিকদের মনোরঞ্জনের সূত্রে থাইল্যান্ডে দেহব্যবসার বিকাশ হয়।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী আক্রমণ মোকাবিলায় মিত্র শক্তির ঘাঁটি ছিল থাইল্যাণ্ড। এই সূত্রে পশ্চিমী দেশগুলির সাথে সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহজেই গড়ে ওঠায়, বিদেশী উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এখানে। এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মহিলারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হওয়ায় মহিলাদের নিয়োগের সুযোগও ছিল প্রচুর। ফলে এই সময় নারীরা শিল্প শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন কারখানায় যোগ দেয়।[১০] Napapron Kritaya তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, থাইল্যান্ডে বিভিন্ন নিয়োগ ক্ষেত্রে এই বিশেষ কালপর্বে ৯১ শতাংশ মহিলা কর্মরত আছেন।[১১] শিল্প ক্ষেত্র ব্যতীত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থাইল্যান্ডে বসবাসকারী বিদেশী সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য দেহব্যবসা জীবিকা হিসাবে বৃদ্ধি পায়।[১২]

অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রাক শিল্পায়ন ও শিল্পায়নের যুগে থাইল্যান্ডে মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছেন তারা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য থাই অর্থনীতির পরিবর্তনের সূত্রে এবং মেয়েদের বিভিন্ন উৎপাদনী ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ থাকায়, দেশের শিল্পোন্নতির সাথে সাথে নারীশিক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে, এছাড়া সুপ্রাচীনকাল থেকে থাই নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত করায় তাদের মধ্যে এমন এক মানসিকতার সৃষ্টি করেছে যে, কখনও কখনও তারা তাদের মাতৃত্বের দায়িত্বকে অস্বীকার করে বৃত্তিরক্ষায় অতিরিক্ত আগ্রহী হয়। যেসব পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় সেইসব পরিবারের মায়েরা শিশু রক্ষাণাগারে (Child care centre) শিশুদের জমা রেখেও বৃত্তি বজায় রাখতে আগ্রহী হয়। এমনকি দরিদ্র পরিবারের স্ত্রীরা তাদের ভ্রুণ হত্যারও আশ্রয় নেয়।

এইভাবে সুপ্রাচীনকাল থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে সাথে ধর্মীয় বিধিবিধান এবং শিল্পায়ন থাই নারীর বৃত্তির জগৎকে প্রভাবিত করেছে। তবে বর্তমানে নারী শিক্ষার সুযোগ ও বৃত্তির ধরন প্রমাণ করে যে থাই সমাজে ধর্মের প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে থাই সমাজে নারীর অতিরিক্ত বৃত্তিমুখীনতা বিকৃত বৌদ্ধধর্মের মাত্রাতিরিক্ত নারী বিরোধী নীতির পরোক্ষ ফল বলা যায়।

সূত্র নির্দেশ

১. Jacobe Norman. *Modernization without Development, Thailand as on Asian Case Study*, London. 1971, p 20.

২. Lipi Ghosh. *Prostitution in Thailand Religion as a Factor in its Historical Evolution* (Unpublished seminer paper Indian History Congness 59th session.) Patiala, 1998, p 1.

৩. Allen and Unwin. *The Elementary Forms of the Religious Life* London. 1973, p.17.

৪. 1996 Population data sheet, Institution of polulation studies. Chulalongkron University, 1997

৫. *Glimpses of World Religions*, Mumbai. 1996, p 4.

৬. B.J.Terwiel(ed) *Buddhism and Society in Thailand*, Gaya, 1984. p.26.

৭. Craig J. Reynolds, *Nineteenth Century Thai Buddhist Defence of Polygamy and Some Remarks on the social History of Women in Thailand*, Bangkok, p.929

৮. B.J. Terwiel (ed) Op cit. p 72

৯. Chatsumarn Kabilsingh, *Thai Women in Buddism*, California, 1991

১০. Bencha Yoddumnern Attig et al. *Changing Roles and status of Women in Thailand A Documentary Assessment*, Thailand, 1992, p.100.

১১. Mayurce Rattanawannathip "Female Inferiority in Buddhist society" *Nation*, September, (29.1990)

১২. Donald K. Swearer, *Buddhist World of South East Asia*, New York, 1995, p.198

ভারত-ভুটান সম্পর্ক ও উলফা-বোড়ো আতঙ্কবাদী সমস্যা

দেবমিত্রা মিত্র

হিমালয় অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সম্পর্ক গভীর। ১৯৪৭ সালের পর এই রাজ্যগুলি বিশেষ করে নেপাল ও ভুটান ভারত সরকারের বিদেশ নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারত-ভুটান সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। ১৯৪৯ সালের ভারত-ভুটান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি এই দেশের বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতিসত্তাগত সমস্যা এই সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

ভারত-ভুটান সীমান্ত সিকিম থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমান্ত রেখা অনাবৃত এবং উন্মুক্ত। এই সীমান্তের নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মানুষের যাতায়াত অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন। বাণিজ্য এবং ভ্রমণ (tourism) দু দেশের যোগাযোগের মূল সূত্র।

ভুটানের ৭৫তম সংসদীয় অধিবেশনে (২০.৬.৯৭ থেকে ১৬.৭.৯৭) ভুটানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে অবাধ আন্তঃসীমান্ত যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের উলফা (ULFA) এবং বোড়ো (Bordo) সন্ত্রসবাদীরা ভুটানে প্রবেশ করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে তাদেরকে সনাক্ত কবা খুবই শক্ত। বিশেষ করে ভুটানে Immigration and Security দপ্তরের কর্মচারীরাও এই সমস্যা সমাধানে নিজেদের নিরুপায় এবং অসহায় মনে করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রচুর পরিমাণে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকার দরুন ভুটানের স্বল্পসংখ্যক নিরাপত্তা দপ্তরের পক্ষে তাদের মোকাবিলা করা দুরূহ। উগ্রপন্থীরা ভুটানের মধ্যে গভীর জঙ্গলে এমন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে যেখান থেকে ভারতবর্ষে তাদের নিজেদের গ্রামের দূরত্ব খুবই কম।[১] তাদের প্রচুর লোকবল এবং অর্থবল। পুনাখার 'চিমী' অর্থাৎ সংসদীয় সদস্য ৭৬তম সংসদীয় অধিবেশনে জানান যে কোন কোন যানবাহনের সাহায্যে উগ্রপন্থীরা অস্ত্রশস্ত্র ভুটানে সরবরাহ করছে সেইসব যানবাহন সনাক্ত করাও অতিশয় দুরূহ।[২]

উলফা-বোড়ো অনুপ্রবেশ ভুটানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর আশঙ্কা করছে যে এই সমস্যার সমাধান সময় মত না হলে কুড়িটি জেলার মধ্যে বারোটি জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যা ভুটানের মত একটি ছোট দেশের নিরপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ভীষণাকারে বিঘ্নিত করছে। সমস্যার প্রতিকূল প্রভাবের

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে আসাম থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত এই পূর্ববর্তী সীমান্তের মাধ্যমে ভারত-ভুটান ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই সন্ত্রাসবাদীদের কারণে দু দেশের মধ্যে পণ্যবাহী যানবাহনের গতি, বাণিজ্যিক এবং শিল্প সামগ্রিক আদান-প্রদান সবই ব্যহত হচ্ছে। তার মতে উলফা-বোড়ো সন্ত্রাসের কারণে যদি আসাম সরকার আসামের মধ্যে দিয়ে ভুটানের ব্যবসায়িক গতিপথ বন্ধ করে দেয় তবে সড়ক পথের মাধ্যমে মূলত যে ভারত-ভুটান ব্যবসা চলে সেই বাণিজ্যিক আদান প্রদান কেবলমাত্র ফুনসিলিং ছাড়া আর অন্য কোন পথের মাধ্যমে হতে পারবে না। ফলে সম্পূর্ণভাবে ভারত-ভুটান ব্যবসা-বাণিজ্য বিকল্প হয়ে পড়বে।[৩] তিনি আরো জানান যে এমনিতেই আসাম অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে উলফা-বোড়ো উগ্রপন্থীদের ডাকা ধর্মঘটে ভারত-ভুটানের বাণিজ্যিক যানবাহনের চলাচল ব্যহত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রী জানান যে Food Corporation of Bhutan(FCB) ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে পণ্যশস্য নিলাম করার (auction) দরুন কালিখোলা থেকে দাইফাম অঞ্চল পর্যন্ত Nu 39 million and Nu 45 million অর্থলাভ করে। বাণিজ্যিক সড়ক পথ বিকল হবার ফলে ভুটানবাসীর পণ্যশস্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের পথটিও ব্যহত হচ্ছে। এর সাথে জড়িত ভুটানের সরকারী এবং বেসরকারী শিল্পের উন্নতি সাধনও কঠিন হয়ে পড়েছে।

রাজ্য সামরিক বাহিনীর মুখ্য সচীব জানান যে এই সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে ভারত-ভুটানের যে মধুর সম্পর্ক বিরাজ করছিল, সেই সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ উলফা-বোড়ো উগ্রপন্থীরা ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পন্ন করে ভুটানে এসে আশ্রয় নিয়ে ভারত এবং ভুটানের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়। ভুটান ইতিমধ্যে নিজের দেশে এক ধরনের জাতিসত্তাগত অর্থাৎ ethnic সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যা ভুটান অধিবাসী অর্থাৎ দ্রুক গোষ্ঠী এবং দক্ষিণ ভুটান অধিবাসী নেপালিদের মধ্যে। বেশ কিছু সংখ্যক নেপালি ভুটানে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত আছে। তাদের মূল ক্ষোভ ভুটান রাজার বিরুদ্ধে কারণ তিনি তাদের ভুটানী নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন। ভুটানে এই সন্ত্রাসবাদীরা পঙ্লাপ বলে পরিচিত এবং তারা পূর্ব নেপালে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ভুটান রাজতন্ত্রের আশঙ্কা যে ভুটানে উলফা-বোড়ো সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ভুটানের সন্ত্রাসবাদী দল এক জোট হয়ে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশকে আরো ভয়ানক ভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।[৪]

ভুটানের ৭৬তম সংসদীয় অধিবেশনে (২৯.৬.৯৮ থেকে ৩০.৭.৯৮) আলোচনার বিষয়বস্তু হল যেহেতু উলফা-বোড়ো সমস্যাটি ভারত সরকারের নিজস্ব সমস্যা, সেই কারণেই এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের। যদিও সমগ্র ভুটানবাসী রাজাকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা সবরকমভাবে এই সমস্যার সমাধানার্থে রাজাকে সাহায্য করবে তবুও ভুটান মনে করে যে এই সমস্যার অবসান একমাত্র ভারত সরকারের দ্বারাই হতে পারে। উল্লেখিত সংসদীয় অধিবেশনে সদস্যদের বক্তব্য হল — "It is the responsibility of the Government of India and the ULFA Boro Militants to resolve their problems with each other and ensure that no threat is posed to a friendly neighbouring country and its people."[৫] ভারত সরকারের অভিযোগ যে ভুটান উলফা-বোড়ো উগ্রপন্থীদের তার পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় দিচ্ছে — এই অভিযোগকে

ভুটান সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। ভুটান প্রথমদিকে ভারতের সামরিক বাহিনীর উলফা-বোড়ো উগ্রপন্থীদের ভুটানের মাটি থেকে উৎখাত করে দেবার সিদ্ধান্তটিকে সর্বন্তঃকরণে সায় দিতে পারে নি। ভারত সরকারের এই ধরনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ভুটানের মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে [৬] এইটি উনিশশো সাতানব্বই সালে ৭৫তম সংসদীয় অধিবেশনে ভুটান রাজ সরকার প্রকাশ করে।

যদিও ভুটান রাজি হয়েছে যে সে ভারত সরকারকে সবরকমভাবে ভুটান থেকে উলফা-বোড়ো উৎখাত করার অভিযানে সাহায্য করবে, তৎসত্ত্বেও বেশ কয়েকটি শর্ত রাজ-সরকার এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করেছে - যেমন, "Bhutan will not allow Indian forces to enter its territory unless in hot pursuit of the insurgents."[৭] এ বিষয়ে রাজকীয় সরকার (SAARC) সার্ক declaration-এর ভিত্তিতেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত ভুটানের যৌথ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছে।[৮] তবে এই যৌথ প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এবং দীর্ঘকালীন প্রভাব — সবকিছু বিচার করেই দুই সামরিক বাহিনীর যুগ্ম প্রচেষ্টা এখনো দুই সরকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। সম্প্রতি উলফা-বোড়ো সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত ভুটানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটি সমস্যা। ভুটান সরকার মনে করছে যে ভারতের সমতা পার্টি ভুটানের বিরুদ্ধাচারণ গোষ্ঠীকে প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিচ্ছে। এখনো ভুটান সংশয়াচ্ছন্ন যে হয়তো ভারতবর্ষ ভুটান থেকে উলফা-বোড়ো উৎখাত করার প্রেক্ষাপটে এই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করবে। অপরদিকে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে আসাম সরকার মনে করছে যে, ভুটান নিজস্ব সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য উলফা-বোড়ো উগ্রপন্থীদের নিজের দেশে আশ্রয় দিচ্ছে। ফলে উলফা-বোড়ো সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত ভুটান সৌহার্দ সম্পর্কের মধ্যে বেশ জটিলতা দানা বেঁধেছে। যার ফলস্বরূপ ভুটানের বিদেশ মন্ত্রী লিওন্‌গো জিগেমী থিনলে (Lyonpo Jgme Thinley) এক সপ্তাহের জন্য এ বছরের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভারত সফরে হঠাৎ আসেন।[৯] এই সমস্যার সমাধানের তৎপরতা কখনোই আগ্রাহ্য করা যায় না, কারণ একদিকে যেমন ভারতবর্ষের মত একটি বড় রাজ্যের সাহায্য ভুটানের অবশ্যই প্রয়োজন, অপরদিকে ভুটানের ভৌগোলিক অবস্থান মূলত চীনের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদের প্রকোপ দমন করার জন্য ভারতের ভুটানের সাহায্য অপরিহার্য। বিশেষ করে যখন ভারত-ভুটান সীমান্তরেখা অনাবৃত এবং দুই দেশের মানুষের যাতায়াত ঐ সীমান্ত দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উগ্র সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারত ও ভুটানের যৌথ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। উভয় দেশের যৌথ পদক্ষেপ এ বিষয়ে কতটা কার্যকর হয় তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করছে ভারত-ভুটান সম্পর্কের সহজ ও স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি।

সূত্র নির্দেশ

১. *Translation of the Procesdings and Resolutions of the 75th Session of the National Assembly of Bhutan (20.6 97 to 16 7 97) The Secretariat. National Assembly of Bhutan*. Thimphu, p.252. 263

২. *Translation of the Procesdings and Resolutions of 16th Session of the National Assembly of Bhutan (29.6.98 to 30 7 98): The Secretariat, National Assembly of Bhutan*. Thimphu. p 321.318

৩. Ibid (p.327)

৪. Ibid (p.331)

৫. Ibid (p.319)

৬. *The Telegraph* 13.5.93 p.4

৭. *The Telegraph* 5.2.97. p.1

৮. *The Statesman* 15.5.93, p.16

৯. *The Telegraph* 17.4.2000. p 6

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রকাশ

হরপ্রসাদ রায়

চীনের আধ্যাত্মিক জগতে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা।

চীনের ইতিহাস থেকে (Hon Hanshu) থেকে জানা যায় যে হান সাম্রাজ্যের সম্রাট মিংতি (খৃ.৫৮-৭৫) স্বপ্নে এক অতি দীর্ঘকায় স্বর্ণবর্ণ পুরুষ কে প্রাসাদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখেন। সকালে তাঁর সভাসদরা সকলে একবাক্যে এই স্বর্ণ-পুরুষকে বুদ্ধদেব বলে চিহ্নিত করেন। তনদুসারে সম্রাট বৌদ্ধগ্রন্থ ও বৌদ্ধপণ্ডিতের সন্ধানে কুষান রাজ্যে(য়ুএচ্) ৎছায় ইন নামের দুত পাঠান। তাঁরা সেখান থেকে "দ্বিচত্বারিংশৎ The stra in forlytwo sechono অধ্যায় সূদ্র এবং কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন এই দুজন বৌদ্ধ পণ্ডিত (প্রচারক) নিয়ে আসেন তাদের জন্য রাজধানী লো ইয়াং-এ বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন। নাম তার 'শুভ্রঅশ্ব বিহার' (পায়মা শ্চ্) যা এখনও বর্তমান। এই ঘটনা খৃষ্টাব্দ ৬০ থেকে ৬৮ সালের মধ্যে ঘটিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্মের আগমনের এই তারিখ এখনও স্বীকৃত ছিল। [১]

কিন্তু গত কয়েক দশকের চীনা ইতিহাসের গবেষণার ফলে এই তারিখ বাতিল হয়ে গেছে। প্রায় দুবছর পূর্বে ১৯৯৮ সালে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের ২০০০ বৎসর শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বত্র পালিত হয়েছে। তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই (মধ্য) তৃতীয় খৃষ্টাব্দে য়ুহোয়ান প্রণীত 'ওয়েই ল্যু' (Brief Account of Wei Dynasty খৃ. ৩৮৬-৫৫০) উল্লিখিত আছে যে চীনের রাজকীয় একাদমির কোন বিদ্বানের এক শিক্ষানবীশ যার নাম ছিল চিংলু কুষাণরাজের চীনের রাজধানীস্থিত দুত ই-ৎছুনের কাছে বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে পাঠগ্রহণ করেন। তখন চীনে সম্রাট আয়-তির রাজত্বকাল, তারিখ খৃষ্টপূর্বাব্দ ২ সন। এই সময় চীন চিং (বা ছিন চিং শিয়েন বা চিংনী) নামে এক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক আধিকারিক (Yulin Zhonglang Jiang) ও বৌদ্ধ গ্রন্থের পাঠ নেন। গ্রন্থটির নাম বৌদ্ধধর্ম। ইৎছুন তার প্রচারক। গ্রন্থটি তৃতীয় খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপলব্ধ ছিল। কিন্তু তারপর তার হদিশ পাওয়া যায়নি। [২]

এই ঘটনার এত বেশী উল্লেখ পাওয়া যায় যে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কুষাণরা চীনা নাম য়ুয়েচ্ Yuezhi চীনের উত্তর পশ্চিমপ্রান্ত থেকে হুনদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ব্যাক্‌ট্রিয়া অর্থাৎ বাহ্লিক (বক্ষু) অঞ্চলে নিজেদের রাজ্যস্থাপন করেন। কুজুল কাও ফিসেস- এর কালে (চীনা নাম ছিউ-চিউ-ছুয়ে) কুষাণরা খুবই শক্তিশালী হন। কুজুল সমগ্র তা শিয়া (Bactrian) তৎকালীন পারস্য দেশ (Anxi), কাবুল (Gaofu), ও কাশ্মীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর আনুমানিক রাজত্বকাল খৃ. পূ. ১ম শতকের শেষ দশক থেকে খৃষ্টাব্দ

১৬ সাল [৩] এই অঞ্চল খুব সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যের জন্য এই অঞ্চলেব মহত্ব খুবই ছিল। তৎকালীন 'রেশম পথ' (Silk Route) এই অঞ্চল হয়ে চীনের রাজধানী (লো ইয়াং ও তদনন্তর ছাংআন, আধুনিক শা আনসির রাজধানী শি-আনের নিকট) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব চীন ও কুষাণদের পারস্পরিক তৎকালীন সংযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। এবং তৎকালীন নিয়ম অনুসারে উভয়ের রাজধানীতে দুই দেশের দুত বিনিময় খুবই স্বাভাবিক। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার অনেক বেড়েছে। কুষাণরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং এই ধর্মের প্রসারের জন্য তাদের প্রয়াস সর্ববিদিত।[৩] চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যে তারা আগ্রহী হবেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেই উদ্দেশে বৌদ্ধশাস্ত্রে পারংগত রাজত্বকে চীনে প্রেরণ অতি স্বাভাবিক। চীনা গ্রন্থে এই মর্মে উল্লেখ আছে। এই দুত যার নাম ই-ৎছুন তিনি বৌদ্ধধর্ম নামে এই গ্রন্থের প্রচার করেছিলেন। তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত (অর্থাৎ এই টীকাকারের সময় পর্যন্ত) এই গ্রন্থ উপলব্ধ ছিল।

তবে এতদ্‌যাবৎ বৌদ্ধধর্ম আধিকারিকস্তরে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনাটি স্বপ্নাদেশ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বপ্নাদেশ প্রতীকমাত্র।

খৃ.পূ. ২ সনের ঘটনাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করা হোত। কিন্তু চীনে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পণ্ডিতগণ বহু নজীর ও তথ্য পর্যালোচনা করে এই সন্দেহের নিরসন করেছেন। প্রথমত ওয়েইল্যু (অর্থাৎ ওয়েই সাম্রাজ্যের সিংহাবলোকন) এই গ্রন্থে (*A Brief Account of Wei Dynasty*) বৌদ্ধধর্মে ও বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে; স্বপ্নদর্শন, তাঁর পিতামাতার নির্ভুল লুম্বিনী, শুদ্ধোদন ও গৌতম মাতার উপাসক, ভন্তে, ভিক্ষু, শ্রমণ ইত্যাদি নামের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় উচ্চশ্রেণীর লোক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, বিস্তারিত জ্ঞান ছিল ও কিছু কিছু লোক উৎসাহের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। রাজকীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত না হলেও গুপ্তরূপে অল্পসংখ্যক হলেও কিছু লোক বৌদ্ধধর্ম পালন করতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫৮-৬৫ খৃষ্টাব্দ সালের পর বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ প্রচার হতে থাকে, এই ধর্মানুযায়ীরা পশ্চিমোত্তব চীনে রাজধানী ছাং আন ও লো ইয়াং এবং পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বের কিঞ্চিদ্‌ অংশেই সীমিত ছিল। খৃষ্টাব্দ ৬৫ সনের এক বৃত্তান্তে জানা যায় এই সম্রাট অর্থাৎ মিং-তির অনুজ রাজকুমার 'ইং' যিনি পূর্ব প্রান্তের অধুনা ষানতুং প্রদেশের 'ছু'-রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি নিয়মিত উপবাস করতেন, উপাসক ও শ্রমণদের নিমন্ত্রণ করে প্রত্যহ খাওয়াতেন এবং এই কারণে সম্রাট তাঁর প্রশংসা করতেন।

খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের ২ বছর পূর্বের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গ যে এক আকস্মিক ঘটনা নয় তার প্রমাণ চীনও ভারতের মধ্যে ভারতীয় ও মধ্য এশিয়ার বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের আধার যাতায়াত, যার ফলে পণ্য ও বিচার বিনিময়ের আধার অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত ছিল। এর প্রমাণ খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকেই পাওয়া যায়।

১৩৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১২২ পর্যন্ত হান সাম্রাজ্যের দুত চাং ছিয়েন মধ্য এশিয়া ও ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আফগানিস্তানে ব্যাক্‌ট্রিয়ায় এসেছিলেন। তারপর থেকে চীন হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে হুনদের পরাজিত করে চীনা সেনাপতি হু ও ছুপিং হুনদের পূজ্য দেবতা এক দীর্ঘকায় স্বর্ণমূর্তি ছিনিয়ে নিজের দেশে নিয়ে আসেন। সম্রাট উতি (WuDi) প্রত্যহ এই মূর্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন ও সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। খৃ. পূ. ১১৯ সালে চীনা দূতরা উত্তর পশ্চিম ভারতে আসেন; ১০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে তুন হুয়াং (প্রাচীন নাম চিউছোয়ান) থেকে ভারতে দুত পাঠানো হয়। দু বছর পর ১০২ সালে চীনাভিমুখী (কিংবা চীন থেকে প্রত্যাবর্তনকারী) এক ভারতীয় দুত হুনদের হাতে নিহত হন। সম্রাট উতি এই হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। ৭৩-৪৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যবর্তীকালে জনৈক ভারতীয় দুত বা ব্যবসায়ী তৎকালীন সম্রাট শুয়ান তি (Xuan Di) কে একটি মুদ্রার মত ক্ষুদ্রাকার আয়না উপহার দেন, সম্রাট এই দর্পণ হাতে বেঁধে রাখতেন। আনুমানিক ৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বিরোচন (চীনা নাম ফি-লু-চান-আ) নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী খোটানে (আধুনা শিন চিয়াং প্রদেশের যুথিয়েন) বৌদ্ধধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। ৪৮ থেকে ৩৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে কাশ্মীরের (তৎকালীন চীপীন) রাজা, হান দুত 'চাওত' কে কারারুদ্ধ করেন ও তার ৪০-এর অধিক অনুগামীকে হত্যা করেন, কিন্তু তারপরেই দুত পাঠিয়ে এই ঘটনার জন্য চীন সম্রাটের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। খৃষ্ট পূর্ব ৩৭ থেকে ৩২ সালের অন্তবর্তীকালে আবার এক দল দুত পাঠিয়ে হানসম্রাটের কাছে উপরোক্ত ঘটনার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন, এরপর কাশ্মীর ও উত্তর পূর্ব ভারতে ও আফগানিস্তানের কিছু অংশ থেকে চীনে বণিকদের গমনাগমন অব্যাহত থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে খৃষ্ট পূর্ব ২য় সালে চীনে বৌদ্ধধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রচার হয়েছিল এই অনুমান বা সিদ্ধান্ত অমূলক নয়।

সূত্র নির্দেশ

১. *Hou Han Shu* (History of the Later Han Dynasty), Taipei Reprint, p.88. পৃ. ২৯২১ দ্রষ্টব্য।

২. অধুনা লুপ্ত য়ু হোয়ান প্রনীত 'ওয়েই লুয়ে'(A Brief Account of the Wei Dynasty) গ্রন্থটির একটি অংশ এখন 'ওয়েইয়ূ' এই ইতিহাস গ্রন্থের ৩০শে অধ্যায়ে সংযোজিত। 'ওয়েইযু' (ওয়েই সাম্রাজ্যের ইতিহাস) ওয়েই সাম্রাজ্যকাল খৃ. ৩৮৬-৫৫০, এই ইতিহাসের রচনাকাল খৃ. ৫৫৪, পরিশোধিত ৫৭০ সন)। *Sanguo Zhi, Weishu, j30, Wei Luch Xirong Zhuan* পশ্চিমী বংশের আখ্যান) এর প্রণীত টীকা পৃ.Taipei Reprint. ৮৫৯ দ্রষ্টব্য।

৩. B.N.Mukherji, The Great Kushana Testament, *Indian Museum Bnllatien*, 30, 1995, p.88

চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ফেরদৌসি খাতুন

বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে এশিয়া মহাদেশের তিনটি দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবল গণ আন্দোলন গড়ে উঠে। যেমন, ১৯১৯-২০ সালে ভারতের খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, ১৯১৯ সালে কোরিয়ার ১লা মার্চ আন্দোলন এবং ১৯১৯ সালে চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন। দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার, শোষণ ও দখলদারী তৎপরতায় অতিষ্ঠ চীনারা অবশেষে ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলন কর্তৃক তাদের মাতৃভূমির একাংশকে জাপানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে ও ৪ঠা মে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এখান থেকেই শুরু হয় চীনে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন। চীনারা পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত নতুন সমাজ ও স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অবশেষে ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশে জাতীয় ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে জার্মানী চীন সরকারের নিকট থেকে শান্তুং প্রদেশের কিয়াওচাও নৌঘাঁটি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নেয়।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে কিয়াওচাও থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দিয়ে শান্তুং-এর অধিকাংশ স্থান দখল করে নেয়। এই দখলকে বৈধ করার জন্য জাপান ইতিপূর্বে উত্থাপিত ২১ দফা দাবীর[২] মধ্যে এমন কতকগুলি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে যা শান্তুং-এর উপর জাপানী দখলকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। একই সময়ে জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কতকগুলি চুক্তি সম্পাদন করে।[৩] ফলে শান্তুং প্রশ্নে এই শক্তিবর্গ জাপানকে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সমর্থন প্রদান করতে সম্মত হয়।

এদিকে ১৯১৯ সালে প্যারিসে ভার্সাই শান্তি সম্মেলন শুরু হলে চীনারা জাপান কর্তৃক ইতিপূর্বে দখলীকৃত শান্তুং ও অন্যান্য অঞ্চল ফেরত লাভের জন্য আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু সম্মেলনের তরফ থেকে কেবলমাত্র ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয় এবং শান্তুং কে আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা। বৃহৎ শক্তিবর্গ জাপানের সাথে সম্পাদিত গোপন চুক্তির ভিত্তিতে জাপানকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল প্যারিস শান্তি সম্মেলন শান্তুং প্রশ্নে জাপানের পক্ষে রায় দান করে।[৪]

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত পিকিং-এ পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এবং তাঁর আদর্শের প্রতি চীনাদের আস্থা নষ্ট হয়। এই অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক রায়ের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে ছাত্ররা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৩টি কলেজের প্রায় ৫০০০ ছাত্র সেখানে সমবেত হয়ে সুশৃংখল মিছিল নিয়ে অগ্রসর

হয়। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাও জু-লিনের বাসভবন অতিক্রম করার সময় ছাত্ররা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বাসভবনে অবস্থানরত সদস্যদের মারধর ও ভাংচুর করে। এ সময় ১০ জন ছাত্র গ্রেফতার হয়।[৫] পিকিং-এর ছাত্রসমাজ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করে। এরপর বিভিন্ন শহরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বস্তরের জনগণ এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। তারা জাপানী দ্রব্যসামগ্রী বয়কট, বন্দী ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে বিরত রাখার জন্য সরকারকে চাপ প্রদান ও জাপান সমর্থিত চীনা কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করার জন্য ঐক্যমতে পৌঁছায়। আন্দোলনের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে অসহায় পিকিং সরকার ছাত্রদের মুক্তি প্রদান করে। চীনা সরকার ছাত্রদের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করে। জাপানী নীতির সমর্থক মন্ত্রীরা সাধারণভাবে দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করেন, ফলে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কোন চীনা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

৪ঠা মে আন্দোলনের সুদূর প্রসারী দিক

প্রকৃত অর্থে চীনের ৪ঠা মে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালের অনেক আগে। ১৯১১ সালে চীনে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের[৬] মধ্য দিয়ে সেদেশে প্রকৃত অর্থে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্তু প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকের বছরগুলিতে শাসকগোষ্ঠীর নৈতিক অবনতি, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যুদ্ধবাজ সামন্তদের দৌরাত্ম্য এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতা প্রবল আকার ধারণ করে। কারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা চীনকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে এ সময় চীনকে শক্তিশালী করে তুলতে অধিকতর মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এ সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আদর্শ প্রভাবিত চীনা বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্তন অনুভব করতে থাকেন। তাঁরা সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন করার আবেদন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক নীতিশাস্ত্র, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯১৭-১৯২৩ সালের মধ্যে এই সুদুরপ্রসারী বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সংঘঠিত হয়। ফলতঃ চীনে এক নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। অনেক সময় অতিশোয়োক্তি করে এই বিপ্লবকে চীনা রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ বলা হয়ে থাকে। যুগান্তকারী এই পরিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায় ছিল ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন। এজন্য সাধারণভাবে এই যুগকে ৪ঠা মে আন্দোলনের যুগও বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সাময়িকীর ভূমিকা

১৯১৮ সালে PEITA-এর ছাত্ররা *New Tide* নামক একটি সাময়িকী প্রকার করেন। এই সাময়িকীতে সমালোচনামূলক সাহিত্য-কর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাধারা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। *New Youth, New Tide* এবং *Weekly Critic* সহ আরো অনেক সাময়িকী পুরাতন সাহিত্য কর্ম নীতিশাস্ত্র এবং কনফুসীয়বাদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকে। সাময়িকী গুলিতে পুরাতন পদ্ধতির চিন্তাধারা, প্রথা, কুসংস্কার যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্র ও Warloardism -এর সমালোচনা করে সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হতো। এসমস্ত সাময়িকী ও পত্রিকা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক কামানের গোলার মত। ফলে বিজ্ঞান,গণতন্ত্র,

বাস্তবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ শিক্ষিত চীনা মননশীলতার নিকট নতুন আবেদন সৃষ্টি করে।

সুতরাং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে চীনারা রক্ষণশীল সনাতন চিন্তাধারাকে আঁকড়ে থাকলেও পাশ্চাত্য ভাবধারায় দীক্ষিত নয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের ভাবধারার গভীর ভাবে উজ্জীবিত হয়। ৪ঠা মে আন্দোলনের পথিকৃত বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত চাও সে-সুং, মনে করেন যে, এসব আদর্শ ছিল সপ্তদশ শতকের পরবর্তী সময়ের পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ। তাঁর মতে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ইউরোপের সবগুলি ভাবধারা ৪ঠা মে আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।[৭]

কাজেই ৪ঠা মে আন্দোলন চীনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কেবলমাত্র শান্তুংকে রক্ষা করার জন্যই নয়, বরং ভার্সাই শান্তি সম্মেলনের রায়ের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ছিল বিরাজমান অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং চীনা জাতীয়তাবাদের বিস্ফোরণ। এই ঘটনা এত বেশী সুদূরপ্রসারী ছিল যে তা তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় সাড়ার সৃষ্টি করে এবং ভার্সাই-এ চীনা প্রতিনিধিদলকে শান্তি চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য করে। বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে-র ঘটনাকে চীনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটা প্লাবন হিসাবে কাজ করে। তারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই চিন্তাধারার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব, বিজ্ঞান ও তর্কবিদ্যা সংক্রান্ত দর্শন শাস্ত্র এবং চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিকতার আলোকে পূনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা মিলিতভাবে নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে।[৮]

৪ঠা মে আন্দোলন ও বিদেশী পর্যটক ও দার্শনিকদের প্রভাব

বিখ্যত মার্কিন দার্শনিক জন ডিউই ১৯১৯-১৯২১ পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করেন। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত একাধিক গণবক্তৃতা করেন। [৯] এসব বক্তৃতায় তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। ডিউই-র পরবর্তী চীন ভ্রমণকারী পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন বারট্রান্ড রাসেল। তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু জন ডিউই থেকে পৃথক ছিল। পরিবর্তিত আধুনিক পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চীনাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা না করে রাসেল চীনের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। রাসেলের বক্তৃতার মূল সুর ছিল পাশ্চাত্যকে চীনের নিকট থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং একই সাথে চীনকে পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করতে হবে। [১০] তবে তিনি চীনা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেননি। ১৯১৯ সালে বিখ্যাত আমেরিকান নারীবাদী মার্গারেট স্যাংগার এক স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে চীন ভ্রমণ করেন। তাঁর বক্তৃতায় ৪ঠা মে আন্দোলনের চিন্তাবিদরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

ছাত্রদের প্রতি গণসমর্থনের ঢেউ

একথা সত্য যে, ছাত্র সমাজ ৪ঠা মে আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পরবর্তী কালে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের প্রতি ব্যাপক জাতীয় সহানুভূতি দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমান্বয়ে চেম্বারর্স অব কমার্সের সদস্য, ব্যবসায়ী মহল, শিল্পপতি, দোকান মালিক শ্রমিক শ্রেণী প্রভৃতি ছাত্র

আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন প্রদান করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি পালন করা হয়। চীনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক ক্লাব ও অনুশীলন সেলগুলি পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনকে ফলাও করে প্রচার করে পেশাজীবী শ্রেণী এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে এটি ছাত্র আন্দোলন থেকে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। এভাবে চীনা জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং সেখানে বিদেশী বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়ে উঠে। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর নিঃসন্দেহে এটি ছিল চীনের ইতিহাসে দ্বিতীয় জন গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

৪ঠা মে আন্দোলন প্রকাশনা, সাময়িকী এবং দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা

৪ঠা মে আন্দোলনের ফলে প্রকাশনা শিল্পে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে। এসময় অসংখ্য নতুন সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। *Young China, New Society, The new Women, Plain People, Upward, Strife, People*[১১] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মাত্র তিনমাসের মধ্যে দেশীয় ভাষায় লিখিত ৪০০ নতুন সাময়িকী প্রকাশিত হয়। দেশীয় ভাষায় লিখিত এসব সাময়িকী খুব সহজেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত। সাময়িকী ও সংবাদপত্র সমূহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং এগুলি চীনে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ৪ঠা মে আন্দোলন প্রসূত সাময়িকীগুলি যদিও স্থায়ীত্ব লাভ করেনি তথাপি এগুলির নামকরণ থেকে সে সময়ের উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটছে। এগুলি মধ্যে *The Dawn, the New Student, The New Atmosphere, The New Man* ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাজনৈতিক মতবাদ, বিবাহ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য প্রথা, বিবাহ-পূর্ব প্রেম, পারিবারিক নিয়ম-কানুন, নয়া দর্শন, পশ্চিমা চিন্তাবিদদের জীবনচরিত সংক্রান্ত উপাদান, বৈদেশিক রচনাবলীর অনুবাদ, পশ্চিমা সংগীত, শিল্পকলা ও সাহিত্য, স্বাধীনতাকামী মহিলা, শ্রমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের আন্দোলন ইত্যাদি ছিল এসব সাময়িকীর বিষয়বস্তু। চিন্তাধারার বিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িকীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪ঠা মে আন্দোলন ও মার্কসবাদ

৪ঠা মে আন্দোলনের ফলে সোভিয়েত বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি চীনা বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তারা বিশ্বব্যাপী বিপ্লব বিস্তারের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস পায়। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া সরকার চীনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচার ও পন্থা অবলম্বন করে। এভাবে চীনা মার্কসবাদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা একত্রিত হয়ে ১৯১৯ সালের জুন মাসে চীনা ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে।

পরিবার ও বিবাহ পদ্ধতি

ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রভাব ছাড়াও ৪ঠা মে আন্দোলন চীনা জীবনধারার বিভিন্ন দিককেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বহু তরুণ তরুণী সনাতন পরিবার প্রথা ও বিবাহ পদ্ধতি মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং তারা নিজেদের স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করে। সমসাময়িক চীনা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

কৃষক শ্রমিক শ্রেণী

৪ঠা মে আন্দোলন থেকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিদেশীরা চীনে আধুনিক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং যেখানে একটি ক্ষুদ্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ক্রমান্বয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। ৪ঠা মে আন্দোলনের ফলে কৃষক সংগঠনের উৎপত্তি হয়। যদিও ৪ঠা মে আন্দোলনে কৃষক শ্রেণীর সম্পৃক্ততা ছিল খুবই সামান্য, তথাপি এসময় ছাত্রদের প্রতি নেতৃবৃন্দের উপদেশ ছিল 'Go to the peasantry' কেবলমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য নয়, বরং জাতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

৪ঠা মে আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। এই ১৯১৯-২০ সালে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে মার্কসবাদী চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করে। এ সময় চীনে কমিউনিস্ট মেনিফেষ্টো অনুদিত হয়। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে উঠে। বলশেভিক বিপ্লবের নেতা লেনিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে Third International বা Commintern প্রতিষ্ঠা করেন। কমিনটার্ন নেতারা চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যাচাই সাপেক্ষে পিকিং-এ লী তা-চাও-এর সাথে পরামর্শক্রমে গোপন বিপ্লবীদের ঘাঁটি সাংহাই গমন করেন এবং চেন তু-শিউ-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা চীনের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থানরত কমিউনিস্ট সেলগুলিকে একত্রিত করার দিক নির্দেশনা দান করেন। অতঃপর চীনের কমিউনিস্ট গোষ্টীগুলি মার্কসবাদের তাত্ত্বিক পাঠকেন্দ্র থেকে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। ১৯২০ সালের নভেম্বরে সাংহাই থেকে *The Communist Party* নামে একটি তাত্ত্বিক পত্রিকা বের করা হয়। একপর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ৭টি কমিউনিস্ট সেলের ১২ জন প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে ।

উপসংহার

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ৪ঠা মে আন্দোলনকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। উদারনীতিকরা এটাকে পুরাতন চিন্তাধারা নিশ্চিহ্নকরণের আন্দোলন বলে উল্লেখ করেছে। একটা নয়া সাহিত্যও লিখন পদ্ধতি গড়ে উঠা এবং সরকারীভাবে কথ্য ভাষাকে অনুসরণের সিদ্ধান্তের কারণে অনেকে ৪ঠা মে আন্দোলনকে চীনা পুনর্জাগরণ বলে অভিহিত করেছে। রক্ষণশীলদের মতে সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি এই আন্দোলনকারীদের কোন ইতিবাচক মূল্যায়ন ছিল না। তারা তরুণদের প্রতি অস্পষ্ট ও জটিল প্রভাবের সমালোচনা করেছে। অবশ্য তারা স্বীকার করেছে যে, এই আন্দোলন চীনা জাতীয়তাবাদকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করে তোলে। উগ্রপন্থীরা এই আন্দোলনের গুণকীর্তন করেছে। লি তা-চাও এই আন্দোলনের প্রশংসা করে বলেন এটা কেবলমাত্র একটি দেশপ্রেমিক আন্দোলনই ছিল না বরং তা ছিল 'আংশিকভাবে মানবতার মুক্তি' আন্দোলন। মাও সে-তু

একে ছাত্র, শ্রমিক, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতৃত্বে 'চীনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। একইভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর ঐতিহাসিকেরা ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনকে এমন একটি দিকনির্দেশনাকারী ঘটনা হিসাবে অভিহিত করেছেন যা ৮০ বছরের পুরাতন গণতন্ত্রের যুগ থেকে নয়া গণতন্ত্রের যুগকে পৃথক করেছে।

দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও ৪ঠা মে আন্দোলন ছিল নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি অর্জন এবং পাশ্চাত্যের আলোকে চীনা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণের মাধ্যমে এমন এক নয়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা যা চীনের অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে। তিনটি ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সফলতা ছিল অবিসম্বাদিত। প্রথমত সাহিত্য জগতে বিপ্লবের ফলে ১৯২০ সালে কথ্য ভাষা প্রতিষ্ঠা করে এবং মানবতাবাদ, বাস্তববাদ, রোমান্টিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশীয় পদ্ধতিতে নতুন সাহিত্য কর্ম রচিত হতে থাকে। এসময় জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ধরনের আদর্শের ও তত্ত্বের অনুপ্রবেশের ফলে জাতীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে দুটি বিবাদমান দৃষ্টিভঙ্গি উৎপত্তি হয়। একটি হচ্ছে বাস্তববাদী ও বিবর্তনবাদী পদ্ধতি যা হু-শি ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং জাতীয়তাবাদী (কুয়োমিনটাং) দল কর্তৃক তা আংশিক ভাবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মার্কিনবাদী বিপ্লবী প্রক্রিয়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তা গ্রহণ করে। ৪ঠা মে আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সাল থেকে চীনে দুটো বিবাদমান দলের সূত্রপাত ঘটে। তৃতীয়ত চীনা জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে একটা নতুন চীনের উত্থান সহজতর হয়। এই নতুন চীন সমকালীন বিশ্বে তার বিপদসংকুল অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তোলে। এভাবে চীনা মানসিকতায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ১৯৪২ সাল থেকে বিদেশীদের সাথে স্বাক্ষরিত অসম চুক্তি [১২] সমূহ বাতিল করার মানসিকতা ও দাবি আত্মপ্রকাশ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, চীনের বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদেশী আদর্শ ও রাষ্ট্র পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। ফলে বিবর্তনের মাধ্যমেই হোক অথবা বিপ্লবী পথেই হোক চূড়ান্ত লক্ষ্য একই রইল তা হলো সম্পূর্ণ রূপে আধুনিক অথচ বিশেষভাবে একটা চীনা রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে মুক্তি অর্জন।

সূত্র নির্দেশ

১. Kenneth Scott Latourette, *A Short History of the Far East*, New York, The Macmillan Company, 1964, p.427

২. Harold M. Vinack, *A History of the Far East in Modern Times* , London,1960, p 366-368.

৩. দ্রষ্টব্য C Y Hsu, *The Rise of Modern China* . New York, Oxford University Press, 1983, p.502

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪

৫. প্রাগুক্ত

৬. Paul H Clyde, *The Far East*, N.Y, Englewood Cliff, 1958, p.398-410.

৭. Edited by Immanuel C.Y Hsu, *Readings in Modern Chinese History*, New

York. Oxford University Press. 1971, p 435

৮. Immanuel Hsu, p 505

৯. জন ডিউই-র বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য : *John Dewey, New Culture in China*. Asia XXI, July. 1921.

১০. Bertrand Russell. *The Proplem of China*. London.1922.

১১. Chow Tse, The May fourth Movement Intellectual Revolution in Modern Chine,Cambridge: Harvard University Press. 1960, p 179

১২. অসম চুক্তি সমূহের জন্য দ্রষ্টব্য: Clyde, p. 117-136

ইসলামীয় মতাদর্শে 'ইজতিহাদ'-এর প্রাসঙ্গিকতা

শুকুর আলি মণ্ডল

বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষত একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বিশ্বের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বৃহত্তম জনসমাজ, ইসলাম মতাদর্শে বিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজ জীবনের বদ্ধাবস্থা বিদগ্ধ মুসলমান সমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনীতিক এবং ধর্মীয় জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই বদ্ধাবস্থার চিত্র স্পষ্ট প্রতীয়মান। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে মুসলমান সমাজে জীবনের কোন প্রগতিই হয়নি। মুসলিম চিন্তাজগতের অনেক চিন্তাশীল, ধর্ম অনুগত বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ যেমন শিবলী নুমানী, সৈয়দ আমীর আলি, স্যার মহম্মদ ইক্‌বাল, সৈয়দ আহ্‌মেদ খান, মহম্মদ আলি ড. সইয়াদায়েন এবং আরো অনেক প্রাজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ মুসলিম সমাজ জীবনের এই নিশ্চল অবস্থা সম্পর্কে বার বার সচেতন করেছেন এবং আজও মুসলমান জগতের প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা পুনরায় প্রাসঙ্গিকতার আয়নায় *কোরানের* আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করে চলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে মুসলিম সমাজের এক বিশাল অংশের মানুষ এখনও পুরাতন ধ্যান ধারণা অন্ধের মতো অনুসরণ এবং অনুকরণ করে চলেছেন। নিরক্ষরতা, দারিদ্র, অভ্যাসগত রক্ষণশীলতা আজও যেন সমাজের এক অপরিহার্য অংশ হিসাবেই সমাজ দেহে জড়িয়ে রয়েছে।[১]

সমাজ এবং মনের জীবনের পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভবী, তাই তো দার্শনিক কবি ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'ইট্ ইজ্ ওনলি রেভোলিউশন হুইচ ইজ্ পারমানেন্ট.'' আর আমরাও পবিত্র *কোরানের* ২৯:৫৫ সুরায় শুনতে পাই পরিবর্তনের সেই অমোঘ বাণী, ''. . . এভরি ডে হি ম্যানিফেস্টস হিমসেলফ্ ইন ইয়েট অ্যানাদার (ওয়ানডারাস) ওয়ে।'' ইসলামীয় মতাদর্শের আকর গ্রন্থ *কোরান* পরিবর্তনের সপক্ষে, চলমান পৃথিবীর কথাই স্বীকার করেছে।[২] অথচ গোড়া প্রাচীন পন্থীরা যে কোন রকম পরিবর্তনের বিপক্ষে। এঁদের মতে যা বলা বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা বলা আছে তার আক্ষরিক অর্থই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা উচিত এবং তাই ঐশ্বরিক বিধান এবং তার অন্ধ অনুকরণ এবং অনুসরণই একমাত্র কাম্য। *কোরানের* আত্মিক শক্তির অনুধারণ বৌদ্ধিক চিন্তার প্রয়োগ এদের কাছে আরোপিত সত্য বা নতুন সংযোজন বলেই মনে হয় বা মনে করে।

ইসলামের আকর গ্রন্থ *কোরানে* কোন 'যাজক', 'পুরোহিত' বা এই ধরনের কোন সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই।[৩] ইসলামীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজেই ইসলাম নির্দেশিত বাধ্যতামূলক ক্রিয়াকর্মগুলো নীতিগতভাবে পালন করতে বাধ্য।[৪] তার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হজরত

মহম্মদের জীবত অবস্থায় 'উলেমা' এই নামে কোন সম্প্রদায় ছিল না। তিনি এবং তাঁর 'সাহাবা'রা উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মহম্মদের শরানাপন্ন হলে হজরত মহম্মদ হয় 'ওহী'র দ্বারা যার প্রয়োগ তিনি মাঝে মাঝেই করতেন অথবা তাঁর সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে তাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তার আলোকে সমস্যার সমাধান করতেন। মহান চিন্তাবিদ হজরত মহম্মদ যুক্তি ও চিন্তা প্রক্রিয়ার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৫] *কোরান* এবং *হাদিস*ও মানুষের চিন্তা ও যুক্তির গুরুত্বের কথা বার বার বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছে। যেমন *কোরানে* বলা হয়েছে 'তোমার চোখ, তোমাব কান, তোমার হৃদয়, তোমার মন, তোমার চিন্তা এবং বৌদ্ধিক শক্তির ব্যবহার কর আর যারা এটা করতে ব্যর্থ তারা পশুর চেয়েও অধম, কিসের ইঙ্গিত? বদ্ধাবস্থা না উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তির ইঙ্গিত ? এমন কি হজরত মহম্মদ নিজেও সম্প্রসারিত পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যাবলী তীক্ষ্ণ সর্তকতার সাথে লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেইজন্যই যখন তিনি তাঁর অন্যতম সাহায্য যা যা বিন জবল, যাঁকে তৎকালীন সময়ে ইয়েমেনের প্রধান বিচারপতি করে পাঠালেন এবং যিনি গর্ভনরও ছিলেন, হজরত মহম্মদ তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি নিজেকে কেমন ভাবে পরিচালিত করবেন:-

Prophet : On what shall thous dose thy decision?
Mauadh: On the koran
Prophet: If koran does not give guidance to the purpose?
Maudh: Then upon the usage of the prophet.
Prophet: But if that also fails ?
Mauadh: Then I shall follow my own reason.

হজরত মহম্মদ এই উক্তি পরিপূর্ণ সমর্থন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে বলেছিলেন তাঁর ঈশ্বরের নির্দেশিত সঠিক পথেই তাঁর সেবক রয়েছেন,[৬] সুতরাং ইজতিহাদ এর অঙ্কুর তিনি নিজ হাতেই বপন করলেন এই ভেবে যে যেন পরবর্তী অনুসারী এবং অনুগামীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যা যুক্তি ও চিন্তার আলোকে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের বিস্তারের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তনের সাথে সাথে সেখানকার আর্থ-সামাজিক, প্রথা, রীতিনীতি অর্থাৎ 'আদত' (ট্রাডিশন এণ্ড কাস্টমারি লজ) এর প্রভাবও ইসলামীয় মতাদর্শকে প্রভাবিত করতে শুরু করল। ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হতে লাগল তার মোকাবিলার অস্ত্র সব সময় *কোরান* এবং *হাদিসে* পাওয়া সম্ভব ছিল না। খলিফারাও তাঁদের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য ঘটনাসমূহের সমাধান কল্পে সাহাবা বা সহযোগিদের সাথে সমবেত হতেন এবং সেখানে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হয় *কোরান* কিম্বা *হাদিসের* মূলনীতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতেন, অন্যথায় যৌথ বা 'সমবেত প্রজ্ঞা' (কালেকটিভ উইসডম)র দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করতেন।[৭] আর এসবের ফসল হলো কিয়াস, ইজমা এবং ইজতিহাদ। সুতরাং বলা যেতে পারে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্ভবত উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা যুক্তির প্রয়োগ করা যায় যদি কোনক্রমেই তা পবিত্র গ্রন্থ কোরান এবং হাদিসের মূলনীতি এবং তাদের আত্মিক চালিকা শক্তির বিরোধী না হয়।

বিখ্যাত ইসলামীয় চিন্তাবিদ মহম্মদ আলি তার *দি রিলিজিয়ান অফ্ ইসলাম* গ্রন্থে বলেছেন, 'ইজতিহাদ' শব্দটি আরবীয় 'জেহাদ' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো 'নিজের বা ব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রয়োগ' এবং আক্ষরিক অর্থেও যা সমান তাৎপর্যপূর্ণ। তার মতে টেকনিক্যালি 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ হয় আইন সংক্রান্ত বিষয়ে এবং তিনি 'ইজতিহাদ' কে ইসলামীয় আইনের তৃতীয় উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত ইসলামীয় পণ্ডিত মহম্মদ তাকী আমিনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ফান্ডামেন্টাল অফ্ ইজতিহাদ* গ্রন্থে বলেছেন 'ইজতিহাদ' শব্দটির অর্থ মানবজাতি সম্বন্ধীয় বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে সত্যের অনুসন্ধানে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। অন্যতম চিন্তাবিদ আসগার আলি ইন্‌জিনিয়ার 'ইজতিহাদ' শব্দটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইজতিহাদ' হলো সমস্যা সমাধানে কঠোর সংগ্রাম এবং প্রচেষ্টা। ইসলামের চিন্তার আকরগ্রন্থ *কোরান* যদিও চিন্তার অনেক উপরে 'ঐহী'র স্থান দিয়েছে, তথাপিও চিন্তার প্রয়োগের কথা কোন অংশেই কম গুরুত্ব পাইনি। *কোরানের* বিভিন্ন সুরায় যুক্তিবাদী (র‍্যাশনালিস্ট) চিন্তার অসংখ্য প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে যেমন- সুরা বাকরা, সুরা অট, আনকাবুত, সুরা আ রাফ, সুরা আনফাল, সুরা ফুরক্কান, এবং সুরা আলে ইমরান, সুরা নিসা ইত্যাদি। [৮]

'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ হজরত মহম্মদের সময়ে অপরিহার্য ছিল [৯] এবং তাঁর মৃত্যুর পরও তিনশো বছর পর্যন্ত এই নতি অত্যন্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহমান ছিল।[১০] এমনকি ইসলামীয় মতবাদের চার স্তম্ভ বিখ্যাত চিন্তাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ আইনজ্ঞ ইমাম আবু হানিফা (৬৬৯-৭৬১), ইমাম মালিক (৭১৬-৭৯৫), অল সাফিই (৭৬৭-৮২০) ইমাম হানবল (৭৮০-৮৫৬) হিজরা দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'ইংবাজী ৮ম শতাব্দীতে' উল্লেখিত পণ্ডিতগণের ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোন ইসলামীয় পণ্ডিত এঁদের চিন্তা ভাবনায় কোন ভ্রান্তি আছে বলে মনে করেন না বা করেননি এবং এই পণ্ডিতগণ 'ইজতিহাদ'-র প্রয়োগ বিভিন্নভাবে স্বীকাব করেছেন।[১১] তাহলে যাঁরা ইসলামের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করেন ইসলামের প্রারোপিত দিকের সর্বোৎকৃষ্টতা নিয়ে আলোড়ন তুলে থাকেন তাঁদের মধ্যেই বর্তমান সময়ের বিভিন্ন উলেমা বা ইমাম বলে কথিত ব্যক্তিগন 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা আস্বীকার করা বা প্রয়োগ বন্ধের কথা বলেন কোন যুক্তিতে? কোরানের মূল আত্মিক শক্তিই হচ্ছে 'ডায়নেমিক' 'স্ট্যাটিক' নয়। [১২]

ইসলামীয় মতাদর্শ বিকাশের প্রথম ৩০০ শত বছর পর্যন্ত 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং 'ইজতিহাদ'-এর দরজা বাগদাদের পতন পর্যন্ত ছিল মুক্ত। [১৩] কিন্তু হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর (ইং. ১০ম শতাব্দী) প্রথম পর্যায় থেকেই 'ইজতিহাদ'-এর ধারণার উপর আক্রমণ শুরু হয়, সৃজনশীল চিন্তা এবং যুক্তির স্থান ধীরে ধীরে দখল করে 'তক্‌লিজ'-এর ধারণা যার অর্থ (অন্ধ) অনুকরন বা অনুসর, যাকে বলা হয়েছে 'ডগমেটিক ওপিনিয়ন' এবং যা ক্রমে ক্রমে একটি 'মতবাদ'-এর রূপ গ্রহণ করেছে। 'তকলিজ' হলো সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্ম, নীতিবিজ্ঞান, দর্শন, সামাজিক রীতি প্রথা সম্পর্কে কেবলমাত্র বিশ্বাস, যুক্তি বা অনুসন্ধানের কোন বিষয়ের স্থান এরমধ্যে নেই।[১৪] অবশ্য এই 'তকলিজ' এর ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে ইসলামীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন কারণের ব্যাখ্যা করে থাকেন। এইসব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন :—

১. ইসলামের বিস্তৃতির ফলে গ্রীক চিন্তা-ভাবনার প্রভাব একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা

হয়; ২. সুফী মতবাদের প্রভাব; ৩. 'মুগজিলাইট' দর্শনের প্রভাব; ৪. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে যে সকল ইসলামীয় পণ্ডিতবর্গের আবির্ভাব হলো তাঁরা হিজরী দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীর বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তুলনায় নিজেদের হীনমন্যতায়, উদ্ভূত পরিস্থিতির যুক্তিসংগত ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন না। তাই এই সকল হতাশাগ্রস্থ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ 'ইজতিহাদ'-এর ব্যবহারকে ইসলামের চিন্তার জগতে এক আত্মঘাতী পদ্ধতি বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন; ৫. আবাসইদ শাসনকালে জ্ঞানের চরম উন্নতি হলেও অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য এবং বিলাসিতা (খলিফা, উলেমাদের বল্গাহীন বিলাসিতা) বিশেষত জাগতিক প্রাচুর্যের আকর্ষণ এবং ভোগ বিলাস ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয়, নৈতিক, শাস্ত্রসম্পর্কিত নীতি সমূহের বিষয়ে অধঃপতন এমন পর্যায়ে নেমে এসেছিল যে ইসলাম জগতেব অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইমাম গাজ্জালী পর্যন্ত 'ইজতিহাদ'-এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগের সপক্ষেই তাঁর মূল্যবান মত প্রকাশ করেছেন। এক ইসলাম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডব্লু, মন্টোগোমারী ওয়াট্ মনে করেন, 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ বন্ধ হয়েছিল ব্যক্তির উপর তৎকালীন সরকারের চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে।[১৫]

'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ বন্ধের বিষয়ে ভারতে ইসলামের জগতে প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ কয়েকজন বিদ্বজ্জনের কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলি হলো — ১. কোন বছর এবং কোন স্থানে 'ইজমা' দ্বারা 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল? ২ যে সকল উলেমা প্রাজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম, ঠিকানা এবং যোগ্যতা কতখানি ছিল? যাঁদের কাছে এই প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল তাঁরা হলেন; (ক) মৌলানা আবুল হাফিজ সালকি দার উল ইফতা, দেওবন্দ; (খ) মুফতি আজম, সাহারানপুর; (গ) মকতবা ফৈয়জ আশরফ জালালাবাদ দার উল উলুম, বেরীলি; (ঘ) মৌলানা আবু মহফুজ আল করিম মাসুমী, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা; (ঙ) মৌলানা আব্দুল রসিদ কাশমী, দেওবন্দ, এবং আরো অনেককে। যাইহোক এইসব জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনজনের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়। বাকী অন্যসকলে কোন উত্তর দেননি, কিম্বা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি বা কোন প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন নি। এঁদের মধ্যে একজন, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন তথ্য না পাওয়ায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামীয় শিক্ষার কেন্দ্রভূমি দেওবন্দের দার-উল-উলুম-এর দার উল ইফ্তা এবং মাহমুদল হাসান, মুফতি আজম, সাহারানপুর একটি উত্তরপত্র পাঠিয়েছিলেন। উত্তর পত্র নং Fatwa No.385/jecm dated 1.4.1411 Hijira i.e. 21.10.1990 এই উত্তরপত্রের মূল বক্তব্য হলো ইলহাম গোপনীয় স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত অবস্থা অর্থাৎ ডিভাইন এনলাইটেনমেন্ট বা কেবলমাত্র উলেমা-ই-হক্দের হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে পারে এর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। এবং এই ইলহাম হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই উলেমা-ই-হকদের হৃদয়ে প্রবেশ করে যাইহোক প্রেরিত প্রশ্নের এই ধরনের উত্তরের পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে স্থান, কার্যকর করার সময় উলেমাদের পরিচয় সহ প্রশ্ন আবার তাদের কাছে প্রেরণ করলে তাঁরা কোন উত্তর পাঠাননি, বরং হিজরী ২য় শতাব্দী থেকে 'ইজতিহাদ' প্রয়োগ বন্ধ হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন, যদিও এ বিষয়ে অধিকাংশ ইসলামীয় পণ্ডিতগণ সহমত পোষণ করেন না। বর্তমানে একজন টারকিশ স্কলার শেখ হুসেন আফেন্ডি

তাঁর প্রকাশিত জার্নালে হানাফী লেমারা হিজরী ৩২৮-২৯(ইংরাজী ৯ম শতাব্দী) শতকের পর 'ইজতিহাদ' প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর (ইং ১০ম শতাব্দী) 'ওকলীড'-এর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ইং ১৩শ শতাব্দী থেকেই ইসলামীয় পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিরোধিতা শুরু করেন এবং 'ইজতিহাদ'-এর পুনরুত্থান এবং তার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৭]

ইসলামের চিন্তাজগতের অচলায়তনের অর্গল ভেঙ্গে 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ আজও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নলিখিত মনীষীদের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার :— ১. ইসলামের চিন্তা জগতের স্পর্শমণি দার্শনিক অল-গাজালী (১০৫৮-১১১০ খ্রী.) এইমত প্রকাশ করেছেন যে অন্ধ বিশ্বাসে বা গোঁড়া অনুকরণ নয়, মেধাশক্তির প্রয়োগে আকর গ্রন্থ *কোরান* এবং *হাদিসের* আলোয় পুনরায় নব উদ্দমে 'ইজতিহাদ'-এর মূল শক্তিকে সজীব করে তোলার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে; ২. বিদগ্ধ চিন্তাবিদ সংস্কারক সুলতান আল-উলমা আল আইজ ইবন আব্দুস সালাম (১১৪১-১২৬২) যদিও শাফাইট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তথাপিও পরবর্তী সময়ে কোন এক নির্দিষ্ট স্কুলের প্রতি নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে ইজতিহাদ প্রয়োগের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান সময়ে ইজিপ্টে র পণ্ডিত বিশারদ রশিদ রিদা মন্তব্য করেছেন যে এই বিদগ্ধ পণ্ডিত 'ইজতিহাদ' প্রয়োগের সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; ৩. চিন্তাবিদ বিন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮) কেবলমাত্র 'তকলিড'-এর বিরোধীতাই করেননি, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের মতই। তাঁর মতে 'ইজতিহাদ' ইসলামের একটি আলোকবর্তিকা যা ভবিষ্যতেও সমানভাবেই প্রযোজ্য;

৪. সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭) বলেন 'ইসলামিক ডগমা' সংস্কার সাধনে 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ কাম্য; ৫. ইজিপ্টে র বিদগ্ধ বিদজুন সংস্কার মুফতি মহম্মদ আব্দুহ (১৮৪৯-১৯০৫) যিনি অল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ডানিস্ট শিক্ষকত হিসাবে খ্যাত, গঠিত নতুন; ধর্মীয় দল 'মালা কিয়া' মধ্যপ্রাচ্যের উলেমাদের 'কর্তৃত্ব' বাতিল 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন;

৬. ভারতবর্ষের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ইসলামীয় চিন্তাবিদ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮৭৪-১৮৯৮) এর মতে সমকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ইজতিহাদ' বা স্ব-নির্ভর বৌদ্ধিব শক্তির প্রয়োগের দরকার আছে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পবিত্র গ্রন্থ কোরান ও হাদিসের মধ্যে তার সমাধানের ইঙ্গিত অনুপস্থিত থাকে;

৭. স্বাধীন ভারতের উদার চিন্তাশীল ব্যক্তি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৪৪-১৯৫৮) যিনি প্রথম গুরুত্ব দিয়েদেন ঈশ্বর এবং কোরানের উপর, দ্বিতীয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন হজরত মহম্মদের তারপরই গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাশক্তির উপর যা আমাদের মাযাই এর সাথে হজরত মহম্মদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ বলা যায় তিনিও সময়ের সাথে সাথে 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন;

৮. প্রখ্যাত ইসলাম বিশারদ মৌলানা মহম্মদ আলি (১৮৭৬-১৯৫১) 'ইজতিহাদ' মুসলমান জাতির উপর এক মহান আশির্বাদ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি ইসলাম গ্রহনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে, পরিস্থিতিতে 'ইজতিহাদ'-

এর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, না হুজরত মহম্মদ নিজের কিম্বা তার 'সাহারা' বা কিম্বা পরবর্তী চার ইসলাম বিশারদ ইমাম কেউই কোন সময় বলেননি যে মুসলমানগণ চলমান, ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসমাজ পরিবর্তিত নতুন অবস্থা, উদ্ভুত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আপন যুক্তি চিন্তা প্রয়োগ করতে পারবে না; এবং

৯. কবি দার্শনিক ড: স্যার মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৬-১৯৩৮) 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োগ বন্ধ একটি 'বৌদ্ধিক জড়তা', অবৈজ্ঞানিক কল্পনাপ্রসূত বলে উল্লেখ করেছেন এবং মুক্তচেতা সৈয়দ আমীর আলি উল্লেখ করেছন ৯ম শতাব্দীর দৃষ্টি নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি রক্ষনশীল চিন্তাবিদদের তীব্র সমালোচনা করে 'ইজতিহাদ' এর প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৮]

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা পরিষ্কার প্রচারক এবং প্রয়োগ বিশ্বাসী তাঁরা মানুষের সৃজনশীল চিন্তা এবং যুক্তিকে 'জনশ্রুতি' 'হেয়ার সে' বলে মনে করেন; 'ইজতিহাদ' এর প্রয়োগ ধর্মীয় তত্বের বিরোধী বলে ভেবে থাকেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটা অবশ্য স্বীকার্য যে কোন শাস্ত্রবিদই যেমন নিজেকে একেবারে অভ্রান্ত বলে দাবী করতে পারেন না, ঠিক তেমনি 'ইজতিহাদ' এর তত্ত্বও পরিপূর্ণ অভ্রান্ত এবং ত্রুটিমুক্ত, দাবীও বোধ হয় সংগত নয়। প্রায়োগিক প্রাসঙ্গিকতা এবং যথার্থ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল 'ইজতিহাদ' এর গ্রহণযোগ্যতা। তাই আমরা বলতে পারি একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে মুসলিম সমাজের এই চরম পিছিয়ে পড়াব দিনে 'ইজতিহাদ' এর প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা কখনই শেষ হয়ে যাইনি বরং তার আশু প্রয়োগ দরকার।

সূত্র নির্দেশ

১ The Urgency of Ijtihad Al-Haj Moinuddin Ahmed. Kitab Bhaban. 1784. Kalan Mahal Daryaganj, New Delhi-2. p-introductory-2

২. (a) The concept of Ijtihad in Islam - Asgao Ali Engineer. Progressive perspective-oj, Volume No 07. Institute of Islamic Studies. 9B. Ist Floor. Himalaya Apartments. 6th Road. Santacruze(E) Mumbai-55 1998. p-I. (b) The Reconstruction of Religious Thought in Islam Allama Muhamad Iqbal. Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan), Reprint 1965, p 147,148

৩. Ibid (2a). p-I

৪. Ibid -(2a). p-I (b) Fundamentals of Islam Maulana Muhamad Abul Ala Mauddi. Markazai abul Ala Mauddi. Maarkazi Maktaba Islami 1353. Chitli qabar. Delhi-6, 1973. p-84 (c) Ibid-I, pose 21

৫. (a) Ibid-2a. p-I; (b) Ibid 6D. p. 73-74

৬. Ibid-2a, P-I, (B) Ibid- p-35: (c) The Religion of Islams Maulana Mahamad Ali, Motilal Banarasidad Publishers Pvt. Ltd Bungalow Road. Jawar Nagar, Delhi-7, in Association with Ahmabiyya Anjuman isha at Islam. 1315, Kingsgara Road. Columbus. Ohio, 43221. U.S.A 1994. p.73 (d) Principles of Mahomedan Law M. Hiday Atullah and A. Hidayatulloh. N.M Tripathi Pvt Ltd.,164 Samaldas Gandhi More. Bombay 400002. 1977. p.26.27.28

৭. Ibid-I, p.32-3; Ibid-2a. p-I. Ibid 6a. p 74, Ibid 6D. p 25-26; Ibid 2b p 148

৮. (a) Ibid 6C, p-72, Ibid-I. p-4.31-32; (B) Fundamentals of Ijtihad Prof Mohammad Taqi Amiri. Idarahi Adabiyati Delhi, 2009. Qasimjan Street, Delhi 6, 1986. p.I: Ibid-2a, p-2; Ibid 2b. p-148

৯. (A) Ibid -I, p-4. 32,53; Ibid 2b. p-278: Ibid-6c, p74; (B) Philosophy of

Islamic Law and the Orientalists Dr Mahammad Muslehuddin. Markazi, Maktaba Islami 1353, Chitli Qabad, Delhi 110006, 1911, p-65: Ibid-2c, p-3
১০. Ibid-I, p-3, 52; Ibid-6c, p-83; 6d-p-25,
১১. Ibid-I, p-40-41.53; 6C, p-77, 81; 6d. p-25;
১২. Ibid-I. p-2; Ibid-2a, p-I, Ibid, 2b-p-146;
১৩. Ibid-2a, p-2; Ibid-9b-p81:
১৪. Ibid-I. p-43-43.46,48: Ibid-6vm p-25;
১৫. (A) Ibid-I. p-I, 48-51,55, Ibid -2a, p-2; Ibid-2b, p-178; (B) Ashort Histlory of The Revivalist Movement in Islam Sayyhid Abul Ala Maududi. Markazi Maktaba Islami Delhi-6, 1973, p-52-53, (c) Human Rights in Islam Dr. Shaikh Shaukat Hussain, Kitab Bhaban, New Delhi-2, p-33-34
১৬. Ibid-I, p-56-60
১৭. Ibid-I, p-44: Ibid-2b, p-151-152, Ibid-6d, p-30.
১৮. Ibid-I, p-66-79, 44; Ibid-2b, p-151-152: Ibid-6d. p-30;-15b p-54.56,60,84; Ibid-bc, p-115. Ibid-2b. p-178, Ibid-8b, p-3

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পৌরহিত্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে মার্কিন ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'মাদ্রিদ' আলোচনা থেকে শুরু করে 'অসলো' চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবী ওয়াশিংটন স্বাভাবিক ভাবেই করতে পারে। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

বিশেষজ্ঞদের মতে সেভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতি এক বিশেষ রূপ নেয় যা কিনা শুধুমাত্র তেলের রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যকেইউরোপের এক বিশেষ খোলা বাজার হিসেবে দেখছে এবং সেইহেতু সে আরব ভূমির যুযুধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী। বিশেষত ইস্রায়েলের নিরাপত্তার খাতিরে এই শান্তি উদ্যোগ, কারণ পরবর্তীকালে পশ্চিম এশিয়ার খোলা বাজারের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানস রাষ্ট্র ইস্রায়েলের বণিক সভাই করবে। বিশেষ উল্লেখ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এই মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি উদ্যোগের পৌরহিত্যের ভূমিকায় ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তিকেই শরিক করেনি, কারণ ভবিষ্যতের পশ্চিম এশিয়ার খোলা বাজারের দখল সে নিজের কুক্ষিগত রাখতে চায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই একক ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ভাল চোখে দেখছে না। তারা 'অসলো' আলোচনায় অংশীদার হতে চায়, এবং হতে চায় নিজের অধিকারে।

অধিকারের প্রসঙ্গে বলা যায় ইউরোপের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্ক আবহমান-কালের এবং ঐতিহ্য মণ্ডিত। এই সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক কারণেই নয়— সাংস্কৃতিক এবং আর্থ-রাজনৈতিক কারণেও বটে। প্রাচীন ফোনেসিয়ান লেবাননের বাণিজ্যতরী একদিন ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ইউরোপীয় বন্দরগুলো মুখর করে তুলতো। আর্কিমিডিসের পদার্থবিদ্যা ও মিশরের রসায়ন শাস্ত্র একে অপরের পরিপূরক ছিল। আরব গণিতজ্ঞ অল্ জবরের অঙ্কশাস্ত্র ইউরোপে অ্যালজেব্রা হিসেবে কদর প্রাপ্ত হয়। সিন্দবাদের বাণিজ্যতরী ইউরোপের বন্দরে বন্দরে পাড়ি দিয়ে ফিরত। আধুনিক ফ্রান্সের সহযোগিতায় মিশরের সুয়েজ ক্যানেল নির্মিত হয়। এক কথায় পশ্চিম এশিয়ার সাথে ইউরোপের সম্পর্ক বহুদিনের।

মার্কিন পৌরহিত্য সত্ত্বেও 'অসলো' শান্তি উদ্যোগ প্রতি পদে বাধা পাচ্ছে। ইস্রায়েল শ্রমিক দলের নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইত্সহাক রবিনের মৃত্যুর পরেই এই উদ্যোগ মন্থর

গতি লাভ করে। ১৯৯৬ এর মে, জুন মাসে লিকুদ দল সরকার গঠন করার পর কার্যত 'অসলো' আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ লিকুদ সরকার প্যালেস্তাইনের স্বশাসন তথা স্বাধীনতায় আগ্রহী নয়। প্যালেস্তিনিয় পক্ষ মার্কিন পক্ষের উপস্থিতি উপেক্ষা না করলেও পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা ওয়াশিংটনকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না আরব ভূমির অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও। কিসিঞ্জারের ১৯৭৫-এর মধ্যপ্রাচ্য নীতিই এর জন্য দায়ী। প্যালেস্তিনিয় গোষ্ঠী ওয়াশিংটনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না বলেই ইয়াসির আরফাত ব্যক্তিগত ভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়েছিল শান্তি উদ্যোগকে তরান্বিত করার জন্য। 'একক মার্কিন পৌরোহিত্যের' বিরুদ্ধে ই.ইউ-এর অভিযোগ যে হাজার বছরের যুযুধান আরব ও ইহুদীর মধ্যে শান্তি স্থাপনের মধ্যস্থতায় একটি মাত্র রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অযৌক্তিক ভাবে ইউরোপীয় শক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে অংশীদারহীন ভাবে পশ্চিম এশিয়ার শান্তি আলোচনার একক পৌরহিত্যকারী হওয়ার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক মহল স্বীকার করেছে যে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি ইউরোপের আবহমান কালের দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব আছে তার ভূমধ্যসাগরের স্থিরতা রক্ষার। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার জন্য আজ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আর এই অস্থিরতা সমগ্র ইউরোপে কর্কট রোগের মত ছড়িয়ে পড়তে পারে — তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকেও ইউরোপের বেশী প্রয়োজন শান্তি উদ্যোগের অংশীদারীর ভূমিকা নেওয়ার। বেশী প্রয়োজন তার শরিকদারীর এই শান্তি মধ্যস্থতায়। তাই ইউরোপীয়ান সংঘের আছে নৈতিক অধিকার অংশীদার হওয়ার।

ইউরোপীয়ান সংঘ মনে করে শতাব্দী শেষের এই সন্ধিক্ষণে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগ্মভাবে কাজ করলে সত্ত্বর অধিক ফল পাওয়া যাবে, এবং সেই হিসেবে ই. ইউ. তার কার্যক্রম ঘোষণা করেছে। প্রয়োজনের তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শতাব্দীর শেষ বসন্তে ইউরোপের অংশীদারী মেনে নিয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য প্যালেস্তিনিয় গোষ্ঠী ও ইস্রায়েল দুই পক্ষই ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের শরিকদারীকে স্বাগত জানিয়েছে।

১৯৯৯-এর মে মাসে 'অসলো' চুক্তি বাতিল হওযাব কথা; কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুযুধান আরব-ইহুদীর মত বিরোধে তা কার্যকরী করা যায়নি। এই চরম সময়েই ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন 'অসলোর' হাল ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ই. ইউ. যুগ্ম ভাবে পৌরহিত্য করার সিদ্ধান্ত নেয়; এবং অসলোকে বাস্তবায়িত করার সামগ্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। ই. ইউ.-এর সরাসরি প্রভাবে ১৯৯৯-এর সেপ্টেম্বরে 'ওয়াই' চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চলতি বছরে (১৯৯৯) যুগোস্লাভিয়ায় ন্যাটোর সামরিক ভূমিকায় তৃতীয় বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ যার তিক্ত প্রভাব প্যালেস্তিনিয়দের উপর বিশেষ ভাবে পড়েছে। আর তাই তারা ই. ইউ.-এর পৌরোহিত্যে যারপর নাই খুশী।

'ওয়াই' চুক্তির গুরুত্ব অসীম। ওয়াই হল 'অসলোর' প্রায় শেষ পদক্ষেপ। 'ওয়াই' চুক্তির বাস্তবায়নের পরই সিরিয়াকে 'গোলান' ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। 'গোলান' হস্তান্তর হলে পরেই 'অসলোর' বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হবে।

'অসলো' বাস্তবায়নের সিংহভাগ কৃতিত্ব ওয়াশিংটনের উপর বর্তালেও শান্তি পৌরহিত্যের শেষ পদক্ষেপের সাফল্যে ই. ইউ.-এর প্রভাব অনুঘটকের কাজ করেছে।

আইরিশ ঈস্টার অভ্যুত্থান ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে তার প্রভাব

সোফিয়া হাইত

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রেরণার আকর হয়েছিল বিপ্লবীদের কাছে। ১৯১৬ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী 'সিন ফিন' বিদ্রোহীরা (ঈস্টার বিদ্রোহ) আইরিশ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছিল; ব্রিটিশ সরকার সে বিদ্রোহ অচিরেই দমন করে; কিন্তু ১৯২১ সালের একটি চুক্তির পর আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে সম্মত হয়। এরপর ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে আইরিশ জনসাধারণের সংগ্রাম স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় (১৯২২); আয়ার্ল্যাণ্ডকে অবশ্য ব্রিটিশরা ভাগ করে দেয়; উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনের নামে সামান্য অধিকারই দেওয়া হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের এই সংগ্রাম দ্বিতীয় প্রজন্মের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল; ডান ব্রীজের 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রীডম' গ্রন্থটি তাদের কাছে বাইবেলের মতো হয়ে উঠেছিল; ম্যাকসুইনির আমরণ অনশনের দৃষ্টান্তটিও তাদের প্রাণিত করে; যতীন দাসের মৃত্যুর পর টেলিগ্রাম এসেছিল শহীদ ম্যাকসুইনির পত্নীর কাছ থেকে, যতীন দাসকে ম্যাকসুইনির দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল; চট্টগ্রাম গোষ্ঠীর ওপর আয়ার্ল্যাণ্ডের ঘটনার প্রভাব ছিল খুবই প্রবল। ঈস্টার রাইজিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম গোষ্ঠী একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে — বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন, নিবেদিত প্রাণ একটি ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠী অভ্যুত্থান ঘটাবে, আর তার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠবে দেশ।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামী ডি ভ্যালেরা বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন বাংলার বিপ্লবীদের কাছে। ইনি ১৯৩২ সনে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে আপোষহীন বিপ্লবী কর্মদ্যোগ শুরু করেছিলেন তাকে নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে আরো বেশি সুসংগঠিত করতে তিনি এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। ভ্যালেরা তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রথম যৌবনেই যে ঈস্টার বিদ্রোহ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার বিবরণ প্রভাবিত করেছিল আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে। অতএব সমস্ত কর্মসূচি যাচাই করার জন্য সুভাষচন্দ্র ডি ভ্যালেরার সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডে ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। তাঁদের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়কে আরো কাছাকাছি নিয়ে এল। পরে ১৯৪৩ সনের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বাধীন ভারত সরকার (অস্থায়ী) গঠন করবার খবর পেয়েই ডি ভ্যালেরা

সুভাষ চন্দ্রকে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন ও এই সরকারকে পূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও জানালেন।

এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর আইরিশ ঈস্টার বিদ্রোহের প্রভাব ছিল খুবই প্রবল। সুতরাং বিদেশী এই ঘটনার ওপর কিছু আলোচনা করা যাক। বিতর্কিত ঈস্টার অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯১৬ সনের ২৪ শে এপ্রিল ঈস্টার মনডে পালন করার দিনে। এটা ছিল বেশির ভাগ দেশপ্রেমী ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের গঠিত 'সিন ফিন' অর্থাৎ 'আমরা নিজেরা' নামক সংগঠনের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সশস্ত্র বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের উৎসেবর কথা জানতে গেলে আমাদের ইতিহাসের গোড়ার দিকে ফিরে তাকাতে হবে। বহু শতাব্দী যাবৎ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড ছিল সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ ও বিদ্রোহসঙ্কুল দেশ। এর মূলে ছিল ভগ্নীসমা এই দেশের 'মঙ্গলের' জন্য তার শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার পক্ষে ইংল্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত। দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্ব কালে স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডকেও গ্রেট ব্রিটেনের অধীনস্থ একটি রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল। পরে, আর্ল অব টাইরোন, হিউ ও-নীলের পরাজয়ের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য আরও চেপে বসেছিল। এই পরাজয়ের দরুন প্রাচীন গ্যালিক বিধিনিয়মগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং এ ছাড়া পরবর্তী ইংরেজ সরকারের সংযুক্তিকরন ও উপনিবেশিকরনের নীতির জন্ম হয়েছিল। এর ফলে দুটি আয়ার্ল্যাণ্ডের আবির্ভাব হয়েছিল একটি হল ইংরেজ জমিদারদের (অ্যাংলো আইরিশ), আরেকটি উৎখাত হওয়া দেশীয় লোকেদের। তবুও আয়ার্ল্যাণ্ডের জনসাধারন সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে দুবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেইসব বিদ্রোহের যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় ও আইরিশদের বিপর্যয় এবং ইংল্যাণ্ড ও স্টটল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি আইনের দরুন, আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর ১৮৪০ সনের মধ্যেই পৃথিবীতে দরিদ্রতম জনসাধরণে পরিণত হল। আবার ১৮০৯ সালে হোম রুল জারি হওয়ার পর আইরিশ পার্লামেন্টকে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আনা হয়েছিল। এর ফলে হাউস অব কমনসে মোট ৬৫৮টি আসনের মধ্যে মাত্র ১০০টি আসনে আইরিশরা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পেল আর হাউস অব লর্ডসে শুধু কয়েকটি মাত্র আসনের জন্য তাদের অধিকার বঞ্চিত হল। এছাড়াও, নির্বাচিত আইরিশ সদস্যদের ব্রিটিশ সদস্যরা নিচু চোখে দেখত। তাদের সামাজিক অবস্থানকেও সমকক্ষ হিসাবে গন্য করত না, যদিও ডাবলিন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী এবং আয়ার্ল্যাণ্ড থেকেই ব্রিটেনে খ্রীষ্টধর্মের প্রবেশ হয়েছিল। এই অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলতে ১৮৪৫ সালে আলুর দুর্ভিক্ষ ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ আইরিশদের বিক্ষোভের আগুনে ইন্ধনের কাজ করল। গরীব আইরিশদের আলুই ছিল প্রধান খাদ্য। কিন্তু এক বছর ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভীষণ খাদ্যাভাব এবং ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা এ বিষয়ে উদাসীন রইল। এদিকে খাদ্য, বাসস্থান, কাজের অভাবে আইরিশরা দলে দলে ব্রিটেনের প্রধান দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করেছিল, ফলত আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডে বিক্ষোভের অন্যতম প্রধান আরেকটি কারণ ছিল মধ্যযুগীয় রেনেশাঁস রাজনীতি এবং ধর্মীয় যুদ্ধ। রাজা এবং পোপের মধ্যে বিবাদের দরুন যখন ব্রিটিশ জনসাধরনের মুখ্য অংশ প্রোটেস্টান্ট ধর্ম অবলম্বন করেছিল, আইরিশরা কিন্তু ক্যথলিক ধর্মকেই বিশ্বস্ত থেকেছিল। তাই, যাতে আইরিশরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক

স্পেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত না হতে পারে, ব্রিটিশ সরকার সেইজন্যে ১৬০৩ সনের গ্রেট প্ল্যানটেশানের সময় থেকে আইরিশদের জমিজমা জোর করে দখল করে নিল এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ব্রিটিশ ও স্কটিশদের — যাদের অবেঞ্জম্যান বলা হত — আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে সেই সব জমি সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার ব্যবস্থা করল। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আইরিশ ভাষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ফলে, কি সাংস্কৃতিক, কি রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে আইরিশ জাতির দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয়। বিংশশতাব্দীতে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন তিনবার পার্লামেন্টে হোমরুল আইন পাশ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে টরি জর্জ ওয়েডহ্যামের 'ল্যান্ড অ্যাক্ট' কৃষকদের ক্ষুদ্র মালিক শ্রেণীতে পরিগণিত করেছিল। মনে হল আয়ার্ল্যাণ্ড অবশেষে ইউনাইটেড কিংডমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং মনে হল দুটি দেশ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নতুন যুগে উপস্থিত হওয়ার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য হোমরুল পাশ করার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে কনজার্ভেটিভ পার্টি এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টার প্রোটেস্ট্যান্ট অরেঞ্জম্যানেরা রুখে দাঁড়ালো। এর ফলে শুধুমাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডেই নয় ইংল্যাণ্ডেও গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাইজারের জার্মানী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় হোমরুলের প্রশ্ন আপাততঃ চাপা পড়ল।

আইরিশ জাতির ইতিহাসের এমন বন্ধ্যাদশার সময় আইরিশ জনগণকে তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে এবং দুর্বল আইরিশ চেতনাকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে গ্যালিক লিগ ও গ্যালিক এ্যাথলিটিক অ্যাসোসিয়েশান নামে দুটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। ১৯১৫ সালে 'সিন ফিন' গ্যালিক লিগের অধিকাংশ আসন দখল করে এটিকে এর রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত করল। ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত বিক্ষোভগুলি সংগঠিত এবং সুসংহত রূপ পেল। এদিকে ১৯১৫ সালের ১৬ই মার্চ সেকেন্ড ডিফেন্স অব রেল্ম অ্যাক্ট নামের একটি আইন প্রণয়ন হল, যার বলে কোন আইরিশ প্রজা কোন অপরাধ করলে কেবল আইরিশ জুরিদের দ্বারাই তার বিচার করার দাবী করতে পারবে। ইংরেজ প্রজারা এর প্রতিবাদ করে কারণ তারা ভাবে যে এর ফলে আইরিশ প্রজারা খুব সহজেই যে কোন অপরাধ করেই রেহাই পেতে পারে। অপরদিকে আইরিশদের অস্ত্রবহন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

ইত্যবসরে জন রেডমন্ড, যাঁর আইরিশ পার্লামেন্টারি পার্টি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীতে আইরিশদের নিয়োগ করার ব্যাপারে মত দেন। এ সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধে আইরিশ জনসাধারণ উজ্জীবিত হয়েছিল কারণ তারা ব্রিটিশও নয়, জার্মানীও নয়, শুধু স্বদেশের জন্যেই যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী নানা প্রচার *দি স্পার্ক, অনেস্টি সিজার্স এ্যাণ্ড পেস্ট* কিংবা *দি আইরিশ রিভিউ* অথবা *ওয়ার্কার্স রিপাব্লিক* ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। বিখ্যাত আইরিশ আর্থার গ্রিফিথ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি পেশ করলেন। তিনি চাইলেন যে আইরিশরা অস্ট্রিয়ান শাসনের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির বিদ্রোহের অনুসরণে ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে আইরিশ সংসদ সদস্যরা বেরিয়ে এসে আইরিশ কাউনসিল তৈরি করুক। তিনি আরও প্রস্তাব দিলেন যে ব্রিটিশদের মতই পৃথক আইরিশ আদালত, ব্যাঙ্ক, সিভিল সার্ভিস ও স্টক

এক্সচেঞ্জ গড়ে উঠুক। কেবলমাত্র ব্রিটেনের রাজা, দ্বৈত রাজতন্ত্র ব্যবস্থায় আয়ার্ল্যাণ্ডেরও রাজা হিসাবে থাকবেন। গ্রিফিথ এই নীতির নামকরণ করেছিলেন 'সিন ফিন' অর্থাৎ আমরা আমাদের ওপর আস্থাশীল।

এই সময় পাদপ্রদীপের সামনে আসা দুটি বড় সংগঠনের একটি ছিল দি আইরিশ ভলান্টিয়ার, যা প্রধানত তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের যে বাসিন্দারা ব্রিটিশদের জোরপূর্বক বসতিস্থাপনের চেষ্টাকে বাধা দিয়েছিল তাদের দ্বারা। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আয়ার্ল্যাণ্ড আর্কেইব গ্যালিক-এর প্রফেসর জন ম্যাকলিন ছিলেন এই দলের প্রেসিডেন্ট। আর-একটি সংগঠন ছিল আইরিশ রিপাব্লিকান ব্রাদারহুড, যা ছিল ১৮৫৭ সনে আমেরিকাতে গঠিত একটি গোপন সংগঠন, যার সদস্যারা যেমন প্যাট্রিক পিয়র্স, জন ম্যাক ডার্মন্ট এবং এডমন্ড কেন্ট আইরিশ ভলান্টিয়ার সংগঠনকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য সেই সংগঠনের কার্য্যবাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য আইরিশ ওয়াকার্স ও ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারী জন লারকিনের ডাবলিন মেট্রোপলিটন পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৈরী 'আইরিশ সিটিজেন আর্মি' নামের সংগঠন কিংবা জন রেডমন্ডের নেতৃত্বে 'আইরিশ ভলান্টিয়ার'-এর বিচ্ছিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত 'ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার নামক সংগঠন। এইসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের এই সুযোগকে ব্যবহার করে জার্মানির দ্বারা আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ তথা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন। রজার ক্যাসমেন্ট নামে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট আইরিশ জার্মানিকে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডকে সাহায্য করার জন্য বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অবশেষে ইস্টার সানডেতে জার্মানীর সাহায্যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দিন স্থির হল।

সেই অনুসারে জার্মানী 'দি আউদ' এই ছদ্মনামে অস্ত্রশস্ত্র ভরা একটি সাবমেরিনকে আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঠায়। এটি ঈস্টার থার্সডেতে ট্রলি উপাসাগরে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন রাজনৈতিক আশ্রয়। গ্রহণকারী রজার ক্যাসমেন্ট এই বিদ্রোহে যোগদানে জন্য একটি জাহাজে করে পালিয়েছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুজনেই ধরা পড়ে। এই খবর পেয়ে আইরিশ ভলান্টিয়ারের প্রায় ১২০০০ সৈন্য দিয়ে গঠিত একাংশের সেনাপতি ম্যাকনিল এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকাব কবলেন। যাইহোক, আইরিশ, ভলান্টিয়ারের চরমবাদীরা এবং আইরিশ রিবেলিয়ান ব্রাদারহুডের লোকেরা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর রইল। ফলত আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসে ঈস্টার মনডে অন্যতম ঘটনা বহুল একটি দিনের সাক্ষী হয়ে রইল।

ঈস্টার মনডের দিন ঠিক সকাল সাড়ে এগারটার সময় আইরিশ ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড জেনারেল ওয়াকার্স এবং আইরিশ সিটিজেন আর্মির সদর কার্য্যালয় লিবার্টি হল স্কোয়ারের সামনে জমায়েত প্রায় দুশ পঞ্চাশ লোক এবং যুবকদের তৈরি হওয়ার জন্য আই আর-এর বাগ্লার ওইলিয়াম ওমান নির্দেশ দিলেন। প্যাট্রিক পিযার্স ছিলেন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, অন্যদিকে মি. জোসেফ প্লাঙ্কেট ছিলেন চিফ-অফ-স্টাফ যার উপর বিদ্রোহের ছক তৈরি করার দায়িত্ব ছিল। বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র বলতে ছিল কিছু পুরানো আমলের রাইফেল, কয়েকটি আধুনিক সট লি-এনফিল্ড, কয়েকটি ইতালিয়ান মার্তিনিস, বেশ কিছু একনলা সর্টগান এবং প্রধান অস্ত্র স্বরূপ একটি হাউস-মসার। এছাড়াও ছিল কিছু কুড়ুল, বর্শা, বল্লম,

কাস্তে প্রভৃতি। মোটের উপর পৃথিবীর যে কোন বিদ্রোহীদের মত তারাও ছিল আশাহীন কিন্তু মরীয়া একটি দল। বিদ্রোহের অনান্য নেতারা ছিলেন জন কনোলী, ম্যাক ডোনা (Mac Donagh), ম্যাকনীল, বালমার হবসন, জন ফিৎসগিবন (John Fitzgibbon) এবং দি ও'র‍্যাহেলী যিনি অভ্যুত্থানকে যে কোন ভাবেই রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর নাটকীয়ভাবে বিদ্রোহীদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

ঠিক হল যে স্বেচ্ছাসেবকেরা আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং ডাবলিন শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করে আইরিশ রিপাব্লিকান সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করবে। অবশেষে, বেলা প্রায় বারোটা বেজে ৪ মিনিটে সার্জেন্ট টম কেইন-এর নেতৃত্বে আইরিশ সিটিজেন আর্মি চিফ সেক্রেটারির অফিস ও আইরিশ রিপাব্লিকের প্রধান কার্য্যালয়, ডাবলিন দুর্গ আক্রমণ করল। সেখানে তখন ছিলেন ব্রিটিশ সম্রাটের আন্ডার সেক্রেটারি ফর আয়ার্ল্যাণ্ড স্যার মাথিউ নাথান, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার মেজর আইভর প্রাইস ও ডাক বিভাগের সেক্রেটারি মি.এ. এইচ নরওয়ে। ইতিমধ্যে আরেকটি বিদ্রোহী দল জেনারেল পোস্ট অফিস অবরোধ করেছিল। এ ছাড়া প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে জেকবস বিস্কুট কারখানা ও ট্রিনিটি কলেজও আক্রমন করা হয়। জি.পি.ওর ছাদে ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সাদা, সবুজ এবং কমলা রঙের সিন ফিনের পতাকা উত্তোলিত করা হয়। ছুটির দিন থাকার দরুণ বেশির ভাগ ব্রিটিশ সৈন্যরা রাস্তায় ছিলনা কিংবা ফেয়ারিহর্স দৌড় দেখতে ব্যস্ত ছিল। বিদ্রোহীরা তাই অনায়াসেই প্রধান বাড়িগুলি দখল করতে পেরেছিল। গলয়ে, লাউথ, ডাবলিন ও ওয়েক্সেক্স এই চারটি কাউন্ট্রিতে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল।

অবশেষে ২৫শে এপ্রিল এক বিশাল সেনাবাহিনী সমেত জেনারেল ফ্রেণ্ডের আগমনের পর আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশের বিদ্রোহীদের সঙ্গে দক্ষিণাংশের বিদ্রোহীদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল। রাস্তায় ভীষণ যুদ্ধের ফলে অনেক মানুষ আহত হয়েছিল। ইংরেজরা তাদের উন্নত যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রসস্ত্রের সাহায্যে বিদ্রোহীদের দমন করতে পেরেছিল, ফলে একের পর এক বিদ্রোহী নেতারা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রায় ৪৫০ জনের জীবনদান ও ২৬১৪ জনের আহত হওয়ার বিনিময়ে ৩০ শে এপ্রিল থেকে ১লা মে-র মধ্যে সমাপ্ত হল। বিদ্রোহী সেনাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহেরও সমাপ্তি হয়েছিল। ৩৪৭০ পুরুষ ও ৭৯ মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যার মধ্যে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল, এটি কেবল ডাবলিন ও কয়েকটি সীমাবদ্ধ জায়গায় সংগঠিত হয়েছিল। যখন ২৫০০ জন স্ত্রী পুরুষ ডাবলিনে বিদ্রোহের জন্য জমায়েত হয়েছিল তখন তাদের দমন করার জন্য ২৫০০ ব্রিটিশ সৈন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল যা ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়ে ৫০০০ জনে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া ১০,০০০ সশস্ত্র পুলিশ দেশের বাকি অংশের দায়িত্বে থাকায় খুব সহজেই বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটিগুলি ঘিরে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। রিপাব্লিকানরা সংখ্যায় খুব কম হওয়ায় এবং তাদের অস্ত্রের পরিমান খুব কম থাকা স্বত্ত্বেও তারা ৬ দিন যাবত ডাবলিন দখল করে রেখেছিল। এই শহরের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

কিছু আইরিশবাসী বিদ্রোহের এই প্রচেষ্টাকে এই যুক্তিতে সমালোচনা করে যে এই বিদ্রোহ আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রদানের সম্ভবনাকে অনিশ্চিত করে তুলল এবং পৃথিবীর সামনে আইরিশদের বোকা হিসাবে প্রতিপন্ন করল। কিন্তু যখন বিদ্রোহের নায়কদের

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া শুরু হল তখন সমালোচক আইরিশরাও বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল। এ ছাড়াও তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক চাল হিসাবে প্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং ডাবলিন জেলে বন্দি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আয়ার্ল্যাণ্ডে অবিলম্বে হোমরুল জারীর প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন। কাজেই এক ব্যর্থ বিদ্রোহ থেকে ঈস্টার রাইজিং ক্রমে এক সাফল্যমণ্ডিত বিদ্রোহতে উত্তীর্ণ হল এবং বিদ্রোহীদের নিন্দা করার পরিবর্তে ভাগ্যহত বীর হিসাবে চিহ্নিত করা হল।

ঈস্টার বিদ্রোহের সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল। সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্যে জাতীয় স্বাধীনতা এবং কিছু সামাজিক বিধি প্রণয়ন যা ১৯১৬ সনের ঘোষণায় উল্লেখিত সমব্যবহারের আদর্শকে সুনিশ্চিত করবে। কিন্তু দুটি নীতির একটিও লাভ করা যায়নি। বিদ্রোহ দমনের পরে প্রণীত চুক্তির ফলে আয়ার্ল্যাণ্ড যথাক্রমে ৬টি এবং ২৬টি কাউন্ট্রি দ্বারা গঠিত দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। ২৬টি কাউন্টি দ্বারা আইরিশ রিপাব্লিক গঠনের ঘোষণাও পরিস্থিতির কোন সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সমস্ত জনসাধারণের কাছে সমসুযোগের উন্মোচনের নীতি খুব সাম্প্রতিক কালেও সরকারের কাছে উপেক্ষিত থেকেছিল। কিন্তু এখন সীমান্তর উভয় দিকেই ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ৬টি কাউন্টি দ্বারা গঠিত রাজ্যে সর্বস্তরের লোকেদের মদতপ্রাপ্ত একটি জোরদার সমাধিকার আন্দোলন ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক সরকারকে সমস্যার মুখোমুখি করেছে। ২৬টি কাউন্টির রাজ্যেও সমাজবাদী নীতি স্থাপনের লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন রক্ষণশীল যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবকে ক্ষয় করছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মনে করা যেতে পারে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের লক্ষ্য চরিতার্থ হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. ম্যাক্স বলফিল্ড, *ঈস্টার রেবেলিয়ন*

২. উইলিয়াম ফিলিপ্স, *আয়ার্ল্যাণ্ড*

৩. ডি. উইলিয়ামস্, আইরিশ ইতিহাস

৪. লিওন ও, ব্রোইন, *আইল্যাণ্ড রাইজিং, ডাবলিন ক্যাসল*

৫. অমিতাভ দাশগুপ্ত (সম্পা), *পরিচয়, সুভাষচন্দ্র শতবার্ষিক সংখ্যা*

৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অগ্নিযুগের বাঙলায় বিপ্লবীমানস*

রেনফ্রুশায়ারে (স্কটল্যান্ড) শিল্প বিপ্লব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১৮৩০-৭২)

সামিনা সুলতানা নিশাত

স্কটল্যান্ড ভৌগোলিকভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত— উত্তরাঞ্চলের হাইল্যান্ড, দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চভূমি ও মধ্যাঞ্চলের নিম্নভূমি। মধ্য অঞ্চলের জমি ছিল উর্বর ও কৃষিযোগ্য। এছাড়া সেখানে লোহা ও কয়লা পাওয়া যেত। ডামবারটন, লানার্কশায়ার, এয়ারশায়ার ও রেনফ্রুশায়ার এই মধ্য অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। স্কটল্যাণ্ডের উত্তর ঢালে অবস্থিত রেনফ্রুশায়ারের অবস্থান ইউরোপের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু আমেরিকার সাথে ব্যবসার উন্নতির ফলে আটলান্টিক মহাসাগরে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রেনফ্রুশায়ারের প্রাধান্য বেড়ে যায়। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় রেনফ্রুশায়ারের (একটি কাউন্টি) জনসংখ্যা সংক্রান্ত। রেনফ্রুশায়ার কাউন্টি ১৭টি প্যারিশে বিভক্ত ছিল, যথা-ইনভারকিপ, গুরুক, পোর্ট গ্লাসগো, গ্রিনক, এরস্কিন, ইনচিনান, কিলমাকম, কিলবারচন, হাউসটন, কিলেনান, নেইলস্টোন, মিয়ার্নস, লকউইনক, রেনফ্রু, পেইজলি ইস্টউড, ক্যাথকার্ড ইত্যাদি। এদের মধ্যে পোর্ট গ্লাসগো ও গ্রিনক ছিল বন্দরনগর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রেনফ্রুশায়ার-এ, প্রচুর শিল্প গড়ে ওঠে। এর বহুবিধ কারণ ছিল। ক্লাইড নদীর জন্য রেনফ্রুশায়ারে জাহাজ ও জাহাজ তৈরীর অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ ছাড়া রেনফ্রুশায়ারে কিছু কয়লা, লোহা ও লাইম পাওয়া যেত — যদিও তা খুব উন্নতমানের ছিল না, তবুও সেগুলো এ অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়তে সাহায্য করে। সর্বোপরি এখানে বেশ কৃষিযোগ্য জমিও ছিল।

জনসংখ্যা-আয়তনের দিক দিয়ে রেনফ্রুশায়ার স্কটল্যান্ডের ৩৩টি বিভাগের মধ্যে সাতাশতম ছিল। কিন্তু জনসংখ্যানুপাতে ১৭৯১ সালে বিভাগটির স্থান ছিল দশম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এটি ষষ্ঠ আসন ও শেষ ভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ লানার্কশায়ার, এডিনবরা ও গ্লাসগোর পরেই তার স্থান ছিল। টেবিল ১এ ১৮০১ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত রেনফ্রুশায়ারের বিভিন্ন প্যারিশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চার্ট দেয়া হল।

রেনফ্রুশায়ারে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ছিল শিল্পকারখানা। শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় হাইল্যান্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যান্ডের অন্যান্য স্থান এমনকি ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর শ্রমিক রেনফ্রুশায়ারে আগমন করে। প্রকৃতিগত বৃদ্ধি ও অভিবাসন এ দুটো একত্রিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পেইজলি ও কিলবারচনে

হস্তচালিত বয়নশিল্প প্রসার লাভ করে। এছাড়া অন্যান্য শিল্প, জাহাজ ও জাহাজ তৈরিও এ এলাকায় প্রসারিত হয়। ১৮৪১ থেকে ৬০ পর্যন্ত রেনফ্রুশায়ারে বিশেষ করে পেইজলিতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। সে সময় গ্রিনক গ্লাসগোর নিকট তার শিপিং ট্রেড বা জাহাজ বাণিজ্য হারায়। যেহেতু ১৮৪১-৬০ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই সীমিত। তবু স্বল্প পরিমাণে অভিবাসন চলতে থাকে এবং পেইজলি থেকে কিছু বহির্গমনও ঘটে। ১৮৭১ সালের মধ্যে পোর্ট গ্লাসগো ও গ্রীনকে জাহাজ তৈরি পুনরায় উজ্জিবীত হয়। ফলে জনসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

১৮৭১ সালে রেনফ্রুশায়ারের আয়তন ছিল ৭৬০,০৭৭,১২০ বর্গ মাইল ও প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার হার ছিল ৭১৮.৮ জন। লানার্কশায়ারের মত উন্নত শিল্প এলাকায় প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার হার ছিল ৭১০.৪ জন। বোঝা যাচ্ছে ১৮৭১ সালের মধ্যে রেনফ্রুশায়ারের জনবহুলতা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বাড়তি জনসংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল শহরমুখিতা। ১৮৩১-৭১ সালের মধ্যে পোর্ট গ্লাসগো, গ্রিনক ও ইন্‌উড এ জনসংখ্যা দ্বিগুন হয় এবং পেইজলি ও নেইলস্টোন-এ শতকরা ৫০ শতাংশ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে রেনফ্রুশায়ারের অভিবাসীদের আগমন সমগ্র যুক্তরাজ্যের ধারা অনুযায়ীই ছিল। প্রবন্ধের সুবিধার্থে অভিবাসীদের আগমনের স্থান অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। বিশেষ করে হাইল্যান্ড ও আইরিশদের উপর বেশী আলোকপাত করা হয়েছে কারণ তারা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে এসেছিল। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীতে পুরোনো ক্ল্যান সিস্টেম ভেঙ্গে যাওয়ায় হাইল্যান্ড থেকে অভিবাসন বৃদ্ধি পায়। তারা বর্ধিত হারে গ্লাসগো, এডিনবরা সহ পেইজলি ও গ্রিনকে আগমন করে। পেইজলি, গ্রিনকও পোর্ট গ্লাসগোর শিল্প কারখানায় চাকুরী পাওয়া খুব সহজ ছিল। কারণ এসব শিল্পে (হারনেস উইভিং ছাড়া) বিশেষ করে বয়নশিল্পে খুব দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল না। হাইল্যান্ডের আরগাইল এবং বিউট থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি অভিবাসন হয়েছিল। আর. ডি. লোবান (১) এম ম্যাককার্থি ও (২) এম. গ্রে তাদের লেখনীতে দেখিয়েছেন যে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে হাইল্যান্ড থেকে রেনফ্রুশায়ারের গ্রিনক এলাকায় অভিবাসনের সুবিধা ছিল অধিক। সেজন্য গ্লাসগোর চাইতে গ্রিনকে হাইল্যান্ডের লোক বেশি ছিল। (টেবিল ২)

টেবিল - ২

স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার অনুপাতে হাইল্যান্ডের অভিবাসীদের সংখ্যা ১৮৫১-৭১

সাল	গ্রিনক	গ্লাসগো	ডামবারটন
১৮৫১	১০.৫%	৪.৭ %	—
১৮৭১	৮.৬ %	৪.০ %	৩.৯ %

উৎস-*লোবান দি মাইগ্রেশন অবদি হাইল্যান্ডার্স ইনটু লোল্যান্ড স্কটল্যান্ড, ১৭৫০-১৮৫০, উইথ পারটিকুলার রেফারেন্স টু গ্রিনক।* (পি.এইচ. ডি., থিসিস, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৯) ২৫।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে পেইজলিতে ৫৭৩০ পরিবারের মধ্যে হাইল্যান্ড জনগনের পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫৫৮ টি, এদের মধ্যে আবার ৪২৮টি পরিবারই এসেছিল আরগাইল ও বিউট থেকে আগত জনসংখ্যায় খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল -৩

১৮৫১ সালে পেইজলির একটি বিশেষ স্থানের হাইল্যান্ডে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অভিবাসীদের সংখ্যা

কাউন্টির নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
আরগাইল	৫৬	৭১	১২৭
ডামবারটন (৪টি প্যারিশ)	০১	০২	০৩
ইনভারনেস	০৯	১৩	২২
রস ও ক্রমারটি	০২	০১	০৩
স্টবলিং	০১	০০	০১
পার্থ	০৫	০৫	১০
ফাবফার, এ্যাবারডিন, বানফ	০১	০০	০১

উৎস এ, ডেনিক ডকার্টি, "দি মাইগ্রেশন অব হাইল্যান্ডার্স ইনটু লোস্যান্ড স্কটল্যান্ড, ১৭৮০-১৮৫০ উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু পেইজলি টেবিল -২ (বি.এ ডেসার টেশন, স্ট্রাডক্লাইড ইউনিভার্সিটি ১৯৭৬-৭৭), ৩৮।

সুতরাং বলা যায় সহজলভ্য কর্মসংস্থান ও ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে হাইল্যান্ড থেকে রেনফ্রুশায়ারে প্রচুর শ্রমিকের আগমন ঘটত। আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে অভিবাসীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য (টেবিল-৩ ও ৪)। কারণ মহিলাদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা বেশী তাই শিল্পকারখানাগুলোতে মহিলাদের চাহিদা বেশী ছিল। গ্রীনকে পুরুষ ও মহিলাদের বয়সের সীমা ছিল ২৫ থেকে ৩৪ বছর। ১৮০১-৭১ পর্যন্ত গ্রীনকে হাইল্যান্ড মহিলা পুরুষ ও অভিবাসীদের হার টেবিল-৪ এ দেয়া হলো :-

টেবিল-৪

গ্রিনকে পুরুষ ও মহিলা হাইল্যান্ড অভিবাসীদের সংখ্যা ১৮০১-৭১

সাল	পুরুষ	মহিলা	মোট	গ্রিনকের লোকসংখ্যানুপাতে হাইল্যান্ড অভিবাসীদের শতকরা হার
১৮০১	২৪৮৩	২৬১৭	৫১০০	২৯.০ %
১৮৪১	১৯১২	২১৪৮	৪০৬০	১১.০ %
১৮৫১	১৯৪২	২১৮২	৪১২৪	১১.০ %
১৮৭১	২৪৯১	২৬৮৭	৫১৭৪	৯.১%

উৎস *লোবান* - ৪৫৫ পৃ:

হাইল্যান্ডের অভিবাসীগণ গ্রিনকসহ রেনফ্রুশায়ারের অন্যান্য শহরের অর্থনৈতিক বিপ্লবে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ শ্রমিক ব্যতীত হাইল্যান্ড থেকে দক্ষ ও প্রায়দক্ষ শ্রমিক ও রেনফ্রুশায়ারে আসত। কাঠমিস্ত্রি, দর্জি, তাঁতী, জাহাজের কুলি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশায় তারা নিয়োজিত ছিল। বিশেষত জাহাজ শিল্প কারখানা এবং সমুদ্রে জাহাজ চালনায় হাইল্যান্ডের অভিবাসীদের অবদান ছিল বেশি।[৫] রেলওয়ে, ক্যানাল ও টার্নপাইক রাস্তায় তারা কাজ করত। ব্লিচফিল্ড, ডাই ওয়ার্ক ও ঘরের কাজে হাইল্যান্ডের মহিলারা অধিক হারে চাকুরী করত। ১৮৩৭ সনের একটি প্রেসবাইটারি রিপোর্টে বলা হয়েছে পেইজলির গ্রামের দিকে প্রিন্টওয়ার্ক, ব্লিচফিল্ডে

১৪৯০ জন হাইল্যান্ড অধিবাসী কাজ করত, তাদের বেশির ভাগই ছিল মহিলা।[৬]

এবার আইরিশ অভিবাসী সম্বন্ধে বলা যাক। আইরিশগণ ১৭৯০ থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে আগমন করতে আরম্ভ করে। জনবহুলতা, জমির অনুর্বরতা, কর্মসংস্থানের অভাব ও অনুন্নত জীবনযাত্রা আইরিশদের দেশত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল। রিচার্ড ও ডিলানের গবেষণা এ অবস্থাগুলোর কথাই নিশ্চিত করে।[৭] অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেছেন যে পূর্ববর্তী অভিবাসীদের অবস্থানের জন্যও এ সময় বহির্গমন আরম্ভ হয়। তথ্যের অভাবে হাইল্যান্ডের মত আইরিশদের ব্যাপারে কোন স্থান হতে তাদের বহির্গমন বেশি না আরম্ভ হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তথাপি পেইজলি ১৮৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট প্রমাণ করে যে যেসব স্থান থেকে আইরিশরা প্রথম বহির্গমন করে সে সমস্ত জায়গা থেকে পরবর্তীতে ও অধিক হারে অভিবাসন চলতে থাকে। (টেবিল-৫)

টেবিল - ৫

শতকরা হারে পেইজলির কয়েকটি বিশেষ স্থানের আইরিশ বিশেষ অভিবাসীদের আদি জন্মভূমির নাম ১৮০৫-৫৫।

জায়গার নাম	১৮০৮	১৮৫১	১৮৫৫
টাইরন, ডোনেগাল	৩৩	৬৯	৩৭
লন্ডনডেরি আনট্রিম	০৪	১২	১৬
ফামানাস শ্লিগো, মারো	০৪	০৫	১২
জায়গার নাম জানা যায়নি	২০	১৪	২৫
উত্তর আয়ারল্যান্ড	৬৯	৮৩	২৩১

উৎস - ব্রেনডা, ই. এ. কলিনস্ *আসপেক্টস অব আইরিশ ইমিগ্রেশন ইনটু টু স্কটিকা টাউনস (ডানডি ও পেইজলি) ডিউরিং দি মিড নাইনটিনথ সেঞ্চুরি*, (এম ফিল. থিসিস, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯), ৯৩ পৃ.।

১৭৯৮ সালে আয়ারল্যান্ডে বসবাসের অযোগ্য অবস্থাহেতু প্রচুর আইরিশ রেনফ্রুশায়ার ও লানার্কশায়ারে অনুপ্রবেশ করে। ১৮৪১ সালের মধ্যে রেনফ্রুশায়ারের আইরিশদের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা ১৩.২% যা শুধু উইগটাউনশায়ারের সংখ্যানুপাতের চাইতে কম ছিল। কিন্তু আইরিশ (২০,৫০০) জনসংখ্যার দিক দিয়ে রেনফ্রুশায়ার ছিল লানার্কশায়ারের পর দ্বিতীয় স্থানে,[৮] লানার্কশায়ারের আইরিশ জনসংখ্যা ছিল ৫৬,০০০ যা সেখানকার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩.১% ভাগ।

১৮৪৭-৪৮ সালের মহা দুর্ভিক্ষের পর আইরিশদের আরেকটি বৃহৎ দল (৪২,৮০০) রেনফ্রুশায়ারের গ্রিনকসহ বিভিন্ন শিল্প এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কারণ এসব এলাকার বৃহৎ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্প কারখানায় সাধারণ শ্রমিকের খুব চাহিদা ছিল।

১৮৬১ সনে রেনফ্রুশায়ারের ১৭৬,৫৮১ জনসংখ্যার মধ্যে আইরিশদের সংখ্যা ছিল ২৪,৯৫৫ অর্থাৎ শতকরা ১৪.১% ভাগ, সেসময় লানার্কশায়ারে তাদের আনুপাতিক হার বেশি ছিল, (৬৩১,৫৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে আইরিশ ৯৩,৩৯৪ জন অর্থাৎ শতকরা ১৪.৬% ভাগ) তথাপি তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৮৪১ সনে রেনফ্রুশায়ারের তুলনায় লানার্কশায়ারের

প্রায় তিনগুণ আইরিশ বসবাস করছিল। কিন্তু ১৮৬১ সনে তা এসে দাড়ায় প্রায় দ্বিগুণে, অর্থাৎ এসময় লানার্কশায়ারের (যা আয়তনে রেনফ্রুশায়ারের প্রায় দ্বিগুণ ছিল) তুলনায় রেনফ্রুশায়ারে আইরিশবাসীদের অভিবাসন অধিকমাত্রায় সংগঠিত হয়। ১৮৭১ সালে রেনফ্রুশায়ারে আইরিশবাসীদেব জনসংখ্যা স্বল্প বেড়ে হযেছিল শতকরা ১৪.৪% ভাগ ২৮,১৭৭ জন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন আইরিশ অভিবাসন সমগ্র কাউন্টিতে একইরকম ছিলনা। নিউ স্ট্যাটিসাটিক্যাল এ্যাকাউন্টসের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'পশ্চিমের বয়নশিল্প গ্রামগুলোর মধ্যে সেখানেই শুধু ২০০০ জনের বেশি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৬ জন আইরিশ ক্যাথলিক বসবাস করছিল।'[৯] অনেক মালিকের মতে রেনফ্রুশায়ারের চিনি শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে আইরিশ শ্রমিকদের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক।[১০]

আয়ারল্যান্ডের অভিবাসীরা প্রধানত ছিল ক্যাথলিক। অপরদিকে রেনফ্রুশায়ারের অধিবাসীগণ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। তাই কিছু সামাজিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্লাসগো-পেইজলি জনস্টোন খাল খননের ফলে বহু আইরিশ পেইজলিতে আগমণ করে। সেখানকার ফ্যান্সী বা আকর্ষণীয় সুতীবস্ত্র শিল্প তাদের আকৃষ্ট করে। ফলে এ শহরে ক্যাথলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮০৮ সালে ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৮৬১ জন, ১৮৬১ সনে তা বৃদ্ধি পেযে হয় ১০০০ জনে। ১৮২১ সনে সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী পেইজলির ৫,৭৩০ পরিবারেব মধ্যে ৬৩০টি ছিল আইরিশ ক্যাথলিক অর্থাৎ শতকরা ১০.৫% ভাগ।[১১] কিন্তু ১৮৪১-এর পর পেইজলিতে আইরিশদের সংখ্যা বাড়েনি বরং কমেছে, প্রমাণ স্বরূপ ১৮৪১ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১% ভাগ যখন রেনফ্রুশায়ারে সে হার ছিল শতকরা ১৩% ভাগ। এর কারণ ছিল সে সময় পোর্ট গ্লাসগো, গ্রিনক ও রেনফ্রুশায়ার জাহাজ তৈরি ও ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্প কারখানায় আইরিশগণ বেশি বেতনে অধিক হারে যোগাদান করত। অবশ্য পেইজলিতে কিছু জাহাজ মেরামতের কারখানা ছিল। সেখানে আইরিশ ক্যাথলিকগণের কর্ম সংস্থান হত। সুতা তৈরি শিল্পে প্রচুর মহিলা আইরিশ চাকুরী করতেন।[১২] নীচের ছকে ১৮২১ থেকে ৭১ পর্যন্ত আইরিশ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির হার দেওয়া হলঃ

টেবিল - ৬

পেইজলির আইরিশ অভিবাসীদের সংখ্যা ১৮২১-১৮৭১

সাল	সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা হার
১৮২১	৫,১৭০	১১.০ %
১৮৪১	৫,১২৪	১০.৫৮ %
১৮৫১	৪,৪৩৯	১১.৩৪ %
১৮৬১	৫,৪২৪	১৭.০ %
১৮৭১	৪,৬৪৫	১০.০ %

উৎস: এম ম্যাককার্থি, *এ সোসাল হিস্ট্রি অব পেইজলি*, (পেইজলি ১৯৬৯), এপেনডিক্স M(a) ১৬৭।

পোর্ট গ্লাসগো ও গ্রিনকে আইরিশগণ ১৮০০ সাল থেকে বসবাস করছিল। ১৮৩০ সালে গ্রিনকে ২৭,৫৭১ জনসংখ্যার মধ্যে ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৪০০০। ১৮৩৩-এর আগস্টে দুই থেকে তিন হাজার আইরিশ সপ্তাহে ক্লাইড এলাকায় আগমন করত। কোন এক

সপ্তাহে ক্রমিলতে তাদের আগমনের সংখ্যা ছিল ৭/৮ হাজার।[১৩] এদের মধ্যে অনেকেই গ্রিনকে গমন করে। উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে ইতিপূর্বে কিছু জাহাজ ব্যবসায়ী গ্রিনকে এসে বসতি বা এজেন্সি স্থাপন করেছিল। এছাড়া বিশেষ সময়ে গ্রিনকে শ্রমিকগণ আগমন করত ও কর্ম সম্পাদনের (ফসল কাটা বা অন্য স্বল্প সময়ের কাজ) অবসানে দেশে প্রত্যাবর্তন করত। এদের বলা হত মৌসুমী শ্রমিক। গ্রিনকে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৪৩০৭ জন। কিন্তু জে. ই. হ্যান্ডলির মতানুসারে এ সংখ্যা আরো অধিক ছিল। তাঁর মতে ১৮৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আইরিশ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের সংখ্যা (সংখ্যায় অল্প) ৬/৭ হাজারের কাছাকাছি ছিল।[১৩] ১৮৭১ সালে আইরিশ ক্যাথলিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,৪৬৩ যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার (৫৮,৮৯৭) শতকরা ১৬.১% ভাগ। টেবিল ৭-এ পোর্ট গ্লাসগো ও নেইলস্টন-এ ক্যাথলিকদের সংখ্যা দেওয়া হল।

টেবিল - ৭

পোর্ট গ্লাসগো ও নেইলস্টোন-এ ক্যাথলিকদের সংখ্যা ১৮৩৫-৬ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত।

১৮৩৫-৩৬				১৮৬১		
স্থান	আইরিশ	জনসংখ্যা	শতকরা হার	আইরিশ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
পোর্ট গ্লাসগো	৩৩২	৫১৯২	৬.৪ %	২৪৩১	৭,২৯৪	৩৩.৩ %
নেইলস্টোন	১০৬১	৮০৪৬	১৩.২ %	৩,০০০	১১,০১৩	২৭.২ %

উৎস: উইলিয়াম ফরেস্ট ম্যাককার্থার, *হিস্ট্রি অব পোর্ট গ্লাসগো*; ডেভিড প্রাইড, *হিস্ট্রি অব দি প্যারিশ অব নেইলস্টন*, ৮৯।

আইরিশ ও হাইল্যান্ড অধিবাসী ছাড়া গ্লাসগো, লানার্কশায়ার, এয়ারশায়ার, ডামবরটন এমনকি ইংল্যান্ড থেকে বহু অভিবাসী এ এলাকায় আগমন করে। তারা বেশিরভাগ তাঁত শিল্প কার্যে নিয়োজিত ছিল। অনেক বড় বড় শিল্পপতি পেইজলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে শিল্পের উন্নয়ন সাধন করেছেন। যেমন সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির মালিক হামফ্রি ফুলটন, ক্লার্ক ভ্রাতৃদ্বয় ও জেমস কোটস (যারা সুতার মেশিন তৈরি করেন)। এরা সবাই এয়ারশায়ার থেকে এসেছিলেন। রেনফ্রুশায়ারে শিল্প বিপ্লব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই অভিবাসী শিল্পপতিরা বিরাট অবদান রেখেছেন। পার্কহিল তাঁর রচনায় এডিনবরা ও ডামফার্মলাইন থেকে আগত তাঁতীদের অবদানের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।[১৫] ১৮২১ সালে এয়ারশায়ার থেকে আগত ৬০০ জন পেইজলির একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ও এয়ারশায়ার, ডামবরটন, লানার্কশায়ার থেকে আগত জনসংখ্যা সুতা, সুতীবস্ত্র ও বয়ন শিল্পের অন্যান্য শাখায় চাকুরী গ্রহণ করত। পার্কহিল লিখেছেন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বয়ন শিল্পকার্য নির্বাহ করার জন্য কিলমারনক সহ অন্যান্য স্থান হতে বহু জনগন পেইজলিতে আগমণ করত। সুতরাং বলা যায় পেইজলির জনসংখ্যা যেন এয়ারশায়ারের জনগণ দ্বারা পূর্ণ হত। পেইজলির শিল্পবিপ্লবে তাদের দান অপরিসীম। ১৮৫১ সনে পুরো রেনফ্রুশায়ারে স্কটল্যান্ডের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছে এরূপ ২৯,০০০ জন ও অন্যান্য স্কটিশ বিভাগের ৩৮,০০০ জন অধিবাসী বসবাস করছিল।[১৬]

টেবিল - ৮

স্থানের নাম	১৮৪১	১৮৫১	১৮৮১
১. নিকট কাউন্টিগুলো এয়ার, লানার্ক, গ্লাসগো, ডামবারটন	——	২৯	৩৮
২. ক্রফটিং কাউন্টি (হাইল্যান্ড) আরগাইল, কালটন, ইনভানেস, অর্কনি, জেটেল্যান্ড ইত্যাদি	——	১৩	০৯
৩. অন্যান্য উত্তরের কাউন্টি (হাইল্যান্ড) রসও ক্রমার্টি, সাদারল্যান্ড	৬১	০৪	০৪
৪. অন্যান্য স্কটিশ কাউন্টি (রেনফ্রুশায়ার ব্যতীত)	——	১১	১১
৫. ইংল্যান্ড	৩৪	৩৮	৩১

উৎস: *থার্ড স্টাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস*, ১১১।

আইরিশ ও হাইল্যান্ড থেকে আগত অভিবাসীরা শহর পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে কৃষি ও শিল্প বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে কোন ধরনের কাজ তারা করেছে। বলা যায় যে পয়সার জন্য বাধ্য হয়ে করেছে। কিন্তু তাদের জনসংখ্যা ছাড়া রেনফ্রুশায়ার শিল্পোন্নত এলাকায় পরিণত হতে পারত না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অঞ্চলের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য। অন্যভাবে শিল্প ছিল ফলেই বহিরাগতগণ খুব সহজেই চাকুরী পেয়ে জীবিকার্জন করেছে। কাজেই জনসংখ্যার আধিক্য প্রদেশটির উপকার করেছে। শিল্পোন্নত করেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রদেশটির কোন ক্ষতি হয়নি। বরং উপকার হয়েছে। বলতে হয়, হাইল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড থেকে আগত অভিবাসীগণ প্রদেশের বিভিন্ন শিল্পকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. আর. ডি লোবান, *দি মাইগ্রেশন অব দি হাইল্যান্ডার্স ইন টু লোল্যান্ড স্কটল্যান্ড (১৭৫০-১৮৯০) উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু গ্রিনক*, (পি.এইচ. ডি. থিসিস এডিনবরা ইউনিভার্সিটি ১৯৬৯) ২৫।
২. এম. ম্যাককারথি, *এ সোশাল হিস্ট্রি অব পেইজলি* (পেইজলি ১৯৬৯)
৩. এম. গ্রে, *দি হাইল্যান্ড ইকনমি* ১৭৫০-১৮৫০।
৪. এন মারে, এ সোশাল হিস্ট্রি অব দি স্কটিশ হ্যান্ডলুম ১৭৯০-১৮৫০, ৬৫।
৫. আর. ডি. লোবান-অপসিট, ৫৫।
৬. *এ্যাড্রেস ফ্রম দি - প্রেসবাইটারি অব পেইজলি টু ফ্রেন্ড স, এটসেট্রা*, এপ্রিল ১৮৩৭।
৭ সি. আর রিচার্ড, "আইরিশ সেটেলমেন্ট ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী ব্রাডফোর্ড" ৪০-৫৭, টি-ডিলন, 'দি আইরিশ ইন লিডস ১৮৫১-৬১', ১-২০ পৃ.
৮. জে.ই হ্যান্ডলি, *দি আইরিশ ইন স্কটল্যান্ড* ১৭৯৮-১৮৪৫, ৪৯
৯. এন.এস. এ (নিউ স্টাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস) ৩৭৯-৮০।
১০. জে. ই হ্যান্ডলি-অপসিট-৫০, ডি. ম্যাকডোনাল্ড, স্কটল্যান্ডস শিফটিং পপুলেশন (গ্লাসগো-১৯৩৭), ৮০।
১১. এম ম্যাকারথি-অপসিট-১০৭।
১২. ইবিড-১১৪।
১৩. আর মারে স্মিথ, *দি হিস্ট্রি অব-গ্রিনক*, ২৯৭।
১৪. জে. ই. হ্যান্ডলি- অপ সিট, ৫১।
১৫. জে. পার্কহিল, *হিস্ট্রি অব পেইজলি*, ৯৫।
১৬. ইবিড, ৩২।
১৭. *টি. এস. এ-থার্ড স্টাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্টস. ভলিউম I7 কাউন্ট্রি অব রেনফ্রু এণ্ড বিউট*, ১১১।

ভারত চর্চায় লেনিন

প্রদোষকুমার বাগচী

লেনিনের ভারত চর্চা নিয়ে এদেশে বহু লেখালেখি হয়েছে। সেই সমস্ত রচনা থেকে জানা যায় ভারত সম্পর্কে লেনিনের অপরিসীম কৌতূহলের কথা। অবশ্য শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বগুলিকে লেনিন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার করতেন। বিশেষতঃ প্রাচ্যের দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের আচার-আচরন, তাঁদের জীবনধারা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। বিভিন্ন দেশে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কী ভাবে প্রসারিত ও সুদৃঢ় হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ কী ভাবে বিস্তার লাভ করছে সেই সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তা ও বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়।

এশিয়ার দেশগুলিতে মানুষের মুক্তি সংগ্রাম এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিল ব্যাপক। ভারতবর্ষের জনগণের উপর ব্রিটিশ বাহিনীর সীমাহীন অত্যাচার সম্পর্ক তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শোষণের মাত্রা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে এক নব বিদ্রোহের সূচনা হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। এই সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তার তত্ত্বগত বিশ্লেষণেও প্রয়াসী হন। কোন কারণে এবং কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের উপর তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে তা ছিল তাঁর অধ্যয়নের এক অন্যতম বিষয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত *ইনফ্লেমেবল* 'মেটেরিয়াল ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স' প্রবন্ধে এশিয়ার জন-জাগরণের নানা দিকের উল্লেখ করেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের কার্যক্রমকে দাহ্য পদার্থ হিসাবে অভিহিত করেন। তাঁর প্রথম দিককার লেখা বিখ্যাত *দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া* গ্রন্থে তিনি ভারত ও রাশিয়ার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। ভারত সম্পর্কে এঙ্গেলসের মূল্যায়নের প্রতি সহমত পোষণ করে তিনি বলেছিলেন — "কৃষিতে ধনতন্ত্র মস্ত এক ধাপ এগোতে চলেছে, যা কৃষিজাত সামগ্রীর বাণিজ্যিক উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার ঘটাচ্ছে এবং বিশ্ব রঙ্গভূমিতে টেনে আনছে নতুন সব দেশকে; পুরুষ পরম্পরাগত কৃষিকে হটানো হচ্ছে তার শেষ আশ্রয় ভারতবর্ষ ও রাশিয়া থেকে।" অর্থাৎ ১৮৯৬-৯৭ সালে লিখিত এই গ্রন্থে শতবর্ষ পূর্বে ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন।[১]

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত, তার প্রকৃতি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে ভারতবর্ষের উপর লিখিত বহু পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা তিনি পাঠ করেন। অধ্যয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলোচনার মাধ্যমে তিনি ভারত সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে সমৃদ্ধ করে নিতেন। ১৯০০ সালে 'ওয়ার ইন চায়না' শীর্ষক লেখাতে নিপীড়িত জাতি সমূহের সংগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল স্পষ্ট। এই বিদ্রোহকে তিনি 'ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দেশীয় মানুষের অভ্যুত্থান' হিসাবে অভিহিত করেন। আবার ১৯০১ সালে অন্য একটি আলোচনায় বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে ভারতের অবস্থানকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করে তিনি বলেন — বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে সংযোগ গড়ে উঠেছে ভারতের স্থান সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[২]

১৯০৫-০৭ সাল, ইতিমধ্যেই রুশ দেশে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে জারের অত্যাচার চরমে উঠেছে। আবার ভারতেও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জনগণই সোচ্চার হয়েছিলেন। ''জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য'' নিয়েই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বঙ্গভঙ্গে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন পরবর্তী কালে লেনিন তাঁর রচনায় সে কথা উল্লেখ করেছেন তবে শুধু ভারতের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কেই যে খোঁজ খবর রাখতেন তা নয়, ব্রিটিশ বাহিনী অন্যায় ভাবে যখন বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে — তিনি তাঁরও প্রতিবাদ করেন। তিলককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বেতে যে শ্রমিক ধর্মঘট হয় লেনিন তাকে ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রেণী চেতনার উন্মেষ হিসাবে অভিহিত করেন। আবার ১৯১১ সালে 'ব্রিটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলন' সম্পর্কে আলোচনায় তিনি যেমন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করেন, পাশাপাশি ১৪ই এপ্রিল ১৯১৩ সালে *প্রাভদা* পত্রিকায় 'সভ্য ও ইউরোপীয় বর্বরবাসী' নিবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচারের নজির তুলে ধরেন ও তার প্রতিবাদ করেন।[৩] উল্লেখ্য *প্রভদা*-য় এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার কিছুকাল আগে থেকেই, ভারত বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করে তিনি যে নোট তৈরি করেছিলেন তাতে ভারতের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক নোট বইগুলি দেখলে বোঝা যায় যে এমন অনেক গ্রন্থ সে সময় তিনি পাঠ করেছিলেন যার আখ্যাপত্রে ভারতের উল্লেখ না থাকলেও আলোচনার একটি বিষয় হিসাবে ভারতের গুরুত্ব সেখানে কম নয়।

ভারতচর্চায় লেনিন কী ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন তা জানতে হলে ঐ পুস্তকগুলি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে তা সম্ভব নয় কিন্তু পাঠকের কৌতূহল নিবারণে সে সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললেও নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি তার বিখ্যাত *দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া* গ্রন্থে ভারতের ভূমি ব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রায় ছয়শত গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। ভারত সম্পর্কে তখন তিনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন সে সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান ব্যতীত নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখাগুলি যে তাঁর ধারণাকে সমৃদ্ধ করে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের কৃষকদের সম্পর্কে জানতে তিনি হবসনের লেখা

ইম্পিরিয়ালিজম গ্রন্থ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পান। ১৯০৪ সালে তিনি প্রথম এই গ্রন্থ পাঠ করেন। অবশ্য পরবর্তী কালেও গ্রন্থটি তিনি বেশ কয়েকবার পাঠ করেছিলেন। তা থেকে ভারত সম্পর্কে যে নোট নিয়েছিলেন তিনি তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হল।

> But millions of peasants in India are struggling to live on half an acre. There existence is a constant struggle with starvation, ending to often in defeat. Their difficulty is not to live human lives—lives upto the level of their poor standard of comfort but to live at all and not die .. we may truly say that in India, except in the irrigated tracts, famine is chronic — endemic.[8]

হবসনের এই গ্রন্থটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল লণ্ডন থেকে। তিনি যখন তাঁর *ইম্পিরিয়ালিজম দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এই গ্রন্থটি তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। সে যাইহোক, এই রকম ভাবেই তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নোট নিতেন। ১৯২২ সালে সি. পি. লুকাসের লেখা *গ্রেটার রোম অ্যাণ্ড গ্রেটার ব্রিটেন* এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল অক্সফোর্ড থেকে।[৫] লেনিন এই গ্রন্থ পাঠ করে তা থেকে ভারত সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর নোট বইয়ে তুলে নিয়েছিলেন। লুকাস এই গ্রন্থ রচনায় যে যে গ্রন্থাদির সাহায্য নিয়েছিলেন তার মধ্যে বি. ফুলার'র লেখা *স্টাডিজ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড সেন্টিমেন্ট* এবং ই. বি. ক্রোমারের লেখা *এনসিয়েন্ট অ্যাণ্ড মর্ডান ইম্পিরিয়ালিজম* গ্রন্থের উল্লেখ ছিল। লেনিন তাঁর নোট বইয়ে সেই নাম দুটি টুকে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে তা পাঠ করবার আশায়। কিন্তু *স্টাডিজ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড সেন্টিমেন্ট* গ্রন্থের সন্ধান সম্ভবত তিনি পান নি তবে ক্রোমারের লেখা গ্রন্থটি তিনি পেয়েছিলেন এবং তা থেকে ভারত সম্পর্কে তিনি নোটও নিয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত ১৪৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পাঠ করে তিনি তাঁর নোট বইয়ে লিখলেন —

> Practically nil. The pretentious chatter, with a learned appearance and endless quotations from Roman writers, of a British imperialist and bureaucratic official, who ends by pleading for India to be kept in subjection, against those who allow the idea of her separation. It would be a crime against civlization to liberate India . . etc., etc

এই গ্রন্থটি থেকে তিনি ভারতে ইংরাজী শিক্ষার হাব, ভারতের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থটির মধ্যে রমেশ দত্ত'র লেখা *ফেমিনস ইন ইণ্ডিয়া* গ্রন্থের উল্লেখ ছিল। অনুমান করা যায় যে ক্রোমারের গ্রন্থটি পাঠ করেই তিনি রমেশ দত্তের লেখা গ্রন্থটির নাম জানতে পারেন।[৬]

জুরিখ ক্যানটোনাল লাইব্রেরীতে তিনি ভারত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করেন। বোম্বে থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত *সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া* ১৯১১ গ্রন্থটির সন্ধান পান জুরিখের লাইব্রেরীতেই। এছাড়াও জুরিখের উক্ত গ্রন্থাগারে তিনি গোজ'র লেখা *ইণ্ডিয়ান সিটিজ* পাঠ করেছিলেন। গ্রন্থটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। জুরিখ লাইব্রেরীর একটা বিশেষত্ব ছিল। উক্ত গ্রন্থাগারে যে নতুন বইগুলি জমা পড়ত সেগুলির একটা তালিকা তৈরী করে রাখত। সেখানকার গ্রন্থাগার কর্মীরা তিন মাস পর পর এই তালিকা তৈরী করত। তালিকাটি মুদ্রিত আকারে ইন্ডেক্স অব

নিউ অ্যাডিশনস টু দি জুরিখ লাইব্রেরী নামে প্রকাশিত হত। লেনিন এই তালিকার ২০ তম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় কতকগুলি গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করে নিজে একটি গ্রন্থ তালিকা তৈরী করে নিয়েছিলেন। সেই তালিকায় ভারত বিষয়ক তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ ছিল। ১৯১১ সালে জি. হানসের লেখা *ইণ্ডিয়া* নামক একটি গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির নাম লেনিনের তালিকায় স্থান পায়। অপব দুটি গ্রন্থ হল ১৯১৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত '*ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া কন্ডেমড়*' এবং ভারতীয় জাতীয় পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত '*দা লয়ালিটি অব ইণ্ডিয়া* লেনিনের তালিকায় ছিল।[৭]

এছাড়াও তিনি বার্লিন থেকে প্রকাশিত শিগুার'ব লেখা *ডেভেলপমেন্ট ট্রেণ্ডস ইন ওয়ার্লড ইকনমি* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাঠ কবে ভারত সম্পর্কে নোট নেন। ১৯১০ সালে লণ্ডনের ক্যাক্সটল হলে *ন্যাশনালিটিজ অ্যান্ড সাবজেক্ট রেসেস* বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভায় ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনাও হয়েছিল। লেনিন সেই সভার প্রতিবেদনেব উপব একটি আলোচনা পাঠ কবেছিলেন। তবে সাম্রাজ্যবাদের উপর নোট নিতে গিয়ে তিনি যখন ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত *গ্রেইন ইন ওয়ার্ল্ড ট্রেড* গ্রন্থটি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলেন গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখে। ১০৪৮ পাতার এই বইটিকে তিনি 'a monumental work' হিসাবে অভিহিত করেন। ভারতে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমান সম্পর্কে জানতে পারেন তিনি এই গ্রন্থ থেকে। আবার ১৯০০ সালে নিউইয়র্ক থেকে দুই খণ্ডে মরিস-র লেখা *দ্য হিস্ট্রি অব কলোনাইজেশন* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারত সম্পর্কে জানতে এই গ্রন্থটি তাঁর কাছে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল মরিস গ্রন্থটিতে পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর আকর্ষণ যেন বেড়ে গিয়েছিল। সে কথা তিনি তাঁর নোট বইয়ে লিখেও রেখেছিলেন।

ভারত সম্পর্কে তিনি কত গভীর ভাবে ভাবতেন সে সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে ১৯১৫ সালে লিখিত বিপ্লবী নেত্রী আলেকজান্ড্রা কোলিয়ানতাইকে লিখিত এক পত্র থেকে।[৮] পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে রূপান্তরের কালপর্বে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সর্বাত্মক বিকাশের অধ্যাযটি সর্বপ্রথম তিনিই লক্ষ করেছিলেন। তবে ভারত সম্পর্কে জানবার আগ্রহে তাঁব ভাটা পড়েনি। ১৯১২ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল প্রফেসর উয়েগনার-র লেখা 'ইণ্ডিয়া টুডে দ্য বেসিস অ্যাণ্ড প্রবলেমস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষকনিবন্ধটি। নিবন্ধটি *কলোনিয়াল স্টাডিজ*-র ৬১-৬৩ নং সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। নিবন্ধটি থেকে ভাবতে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার, ভাষা বৈচিত্র্য, জাতপাত, ব্রিটিশ ভাবতে শাসন ব্যবস্থা, সৈন্য বাহিনী, মহামারী ও প্লেগ, স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস দল ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। লেনিনের মতে গ্রন্থটি থেকে 'একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'র পরিচয় পাওয়া যায়।[৯]

১৯১৬ সালে তিনি যখন পি. কিয়েভস্কির একটি রচনার সমালোচনা করেন সে সময় তিনি ভারতের মত দেশের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে জোরাল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। মার্কসবাদীদের কাছে শুধু নয়, প্রগতিশীল মানুষের কাছেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। সে সময় তিনি ভারত সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা করেছেন তা লক্ষ করলেই বোঝা যায় ভারত সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়নের

পরিমান কম নয়। তবুও যেন লেনিনের মনে হয়েছিল ভারতের মত একটি বিশাল দেশের মানুষের জীবনধারা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হলে সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করে তা সম্ভব নয়। পড়তে হবে আরও অনেক গ্রন্থ।

ইতিমধ্যে রুশ দেশে বিপ্লব সাধিত হয়। লেনিনের ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। তবুও অধ্যয়ন থেকে বিরত হন নি তিনি। তিনি তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে ছিল ৮,৪০০টি বই। তাঁর গ্রন্থাগারে ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২৮টি। ভারতের দেশীয় লেখকদের লেখা গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। এই ব্যক্তিরাও লেনিনের কাছে তথ্যের উৎস হিসাবে বিবেচিত হতেন।

নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবার পর ১৯১৮ সালের ২৩ শে নভেম্বর তার সাথে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে আবদুল জব্বার খৈরী ও আবদুল সাত্তার খৈরীর। তাঁরা ভারতের ৭০ লক্ষ মুসলমান ভাইদের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে তা লেনিনকে খুলে বলা ও রাশিয়ার সাহায্য সহযোগিতা লাভ করা। লেনিনের সাথে তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা হয়, প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনেক কথা তাঁদের কাছ থেকে জেনে নেন।[১০] তিনি যে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র কথা জানতেন তা জানা যায় জালিয়ান ওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড সাধিত হওয়ার পর। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে সংগঠিত নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় লেনিন ব্যথিত হয়েছিলেন। সে সময় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এক প্রতিনিধি লেনিনের পক্ষে একটি তারবার্তা *অমৃতবাজার পত্রিকা* সম্পাদকের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন।[১১]

১৯১৯ সালের ৭ই মে লেনিনের সাথে সাক্ষাৎ হয় মৌলানা বরকতউল্যার। এর কিছুদিন পরেই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ দলবল নিয়ে আসেন লেনিনের সাথে দেখা করতে। রাজা তাঁর লেখা *রিলিজিয়ন অব লাভ* নামে একটি গ্রন্থ লেনিনকে উপহার দেন। লেনিন জানিয়েছিলেন যে উক্ত গ্রন্থটি তিনি পূর্বেই পড়ে নিয়েছেন। এতে রাজা যে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজা তাঁর স্মৃতি চারণায় লিখেছিলেন যে গ্রন্থটি প্রসঙ্গে লেনিনের প্রতিক্রিয়া হল — 'ধর্ম ভারতীয় জনগণকে বাঁচাতে পারবে না। টলস্টয় এবং তাঁর অনুগামীরা এই ধরনের প্রয়াস নিয়েছিল কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে। বরং ভাবতে গিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের প্রচার করুন দেখবেন ভারতের স্বাধীনতা নিকটবর্তী হয়েছে।' রাজা আরও লিখলেন 'তবুও আমি আমার ভাবনা থেকে সরে না এসে বললাম যে তাঁর (টলস্টয়) মত বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই তো স্ফুরিত হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক নীতি। তাঁর প্রভাব তো শ্রমজীবী মানুষের পক্ষেই কাজ করছে।' এতে লেনিনের উত্তর ছিল — 'হতে পারে। কিন্তু সেটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত অভিমত।'[১২]

বরকতউল্যা যখন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও তার দলবলকে সাথে নিয়ে লেনিনের সাথে দেখা করেন সে সময় তাঁদের সাথে ছিল পরিচারক ইব্রাহিম। কৃষক পরিবারের সন্তান। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন যে লেনিন প্রথমে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে কথা বললেও "তারপরে ঐ দলের মধ্যে একজন কৃষক সম্প্রদায়ের লোক

আছে জেনে ঐ সব বুর্জোয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে একটি কথাও না বলে ঐ ইব্রাহিম নামের লোকটিকে আধঘন্টা ধরে পাঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা নিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন। ঐ দলের সবাই মহান মানুষটির এই আচরণে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ইব্রাহিমকে অধ্যাপক বরকতউল্যা কাবুল থেকে পরিচারক হিসাবে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ কথাটা বুঝলেন না, ভারতের সমস্যার পশ্চাৎপট বোঝবার ব্যাপারে তাঁর কাছে একজন চাষী ঐ সব বিরাট ব্যক্তিদের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।''[১৩]

আসলে ইব্রাহিমের সঙ্গে লেনিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কিছুটা ইচ্ছা করেই। তথ্যের উৎস হিসাবে বরকতউল্যা বা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের চাইতে ইব্রাহিমই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে যাই হোক একেব পর এক ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ হওয়ার সুবাদে ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও বই পড়ার নেশা যেন তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তিনি একবার আবদুর রব পোশায়ারীকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরী করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আবদুর রব পেশোয়ারী লেনিনের অনুরোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। প্রায় ৪০টি গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরী করে আবদুর রব তা তুলে দিয়েছিলেন লেনিনের হাতে। লেনিন তা থেকে কিছু বই সংগ্রহ করেছিলেন লণ্ডন থেকে। সব লণ্ডনে পাওয়া যায় নি। কারো কারো অনুমান তিনি কিছু বই কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে থাকতে পারেন। এই অনুমানের একটি কারণ ছিল। আবদুর রব যখন সেই তালিকাটি তৈরী করেন সেখানে লিখে দিয়েছিলেন — "খুব কম সংখ্যক বই ইংল্যাণ্ডে পাওয়া যাবে। তাই বইগুলোর জন্য ৬০ কর্নওয়ালিশ বিল্ডিং-এর 'কর মজুমদার অ্যাণ্ড কোং', কলকাতার ঠিকানায় অর্ডার পাঠাতে হবে।" নানা ত্রুটি বিচ্যুতি যাই থাক সে সময় আবদুর রব যে তালিকাটি তৈরী করে দিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

এখন *মুক্তির সংগ্রামে ভারত* নামক গ্রন্থে জানা যায় আবদুর রব যে গ্রন্থ তালিকা তৈরী করেছিলেন তা থেকে লেনিন মাত্র ১৫টি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।[১৪] আবার আনন্দ গুপ্ত লেনিনের ক্রেমলিনের গ্রন্থাগার থেকে ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থের যে তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন তাতে মোট ২৮টি গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। ঐ সংগ্রহের মধ্যে আবদুর রবের তালিকায় রয়েছে এমন কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ঠিকই তবে ১৫টি নয়। তার অনেক কম। কী কারণে তথ্যের এই ফারাক তা গবেষকদের চিন্তার বিষয়, তবে ভারতের উপর কোন গ্রন্থ পেলে তিনি তা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতেন। মাদ্রাজ থেকে জি. এ. নাটেসান অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বই সহ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সরোজিনী নাইডু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ইণ্ডিয়ান মুসলিম প্যাট্রিয়টস লীগ, বি.সি.পাল, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, লালা রাজপত রায়, জি অ্যান্ডারসন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর গ্রন্থাগারে ছিল। তাঁর পড়ার ঘরেও ছিল ভারত সম্পর্কিত কিছু বই।[১৫]

লেনিন এইসব গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন নানাভাবে। অনেক সময় লেখকরাও তাঁকে গ্রন্থ উপহার দিত। তিনি তা পাঠ করতেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও তিনি ভারত বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অনুরোধ রাখবার। ১৯২১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রায় লেনিনকে একটি চিঠিতে বোখারা সম্পর্কে

একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন।

ভারত থেকে পত্র মারফত কেউ তাঁর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তা মন দিয়ে পড়তেন এববং পত্রের জবাব দিতেন। তবে ভাল ইংরাজী লিখতে না পারার কারণে তাঁর আক্ষেপ ছিল। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে তিনি ভুল ইংরাজী লেখার জন্য মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলেন। চার লাইনের সেই সংক্ষিপ্ত পত্রটি এখানে তুলে ধরা হল :

"Dear comrade Chattopadhyay.

I have read your thesis I agree with you British imperialism must be destroyed When I can meet you, will be communicated to you by my secretary.

V. Ulianov (Lenin)

P.S. : Please excuse my incorrect English " [১৬]

ভারত সম্পর্কে জানবার জন্য তাঁর কী আগ্রহ ছিল তা বোঝা যায় যখন অবনী মুখার্জি লেনিনকে মালাবার রিভোল্ট নামে একটি নিবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লেনিনের একটি মন্তব্য থেকে। নিবন্ধটি পাঠ করে তিনি তাতে 'মন্দ নয়' (not bad) কথাটি লিখে প্রাভদায় ছাপতে দিয়েছিলেন। ভারতীয় লেখকদের লেখা যাতে আরো বেশী বেশী করে প্রকাশ করা যায় সে সম্পর্কেও তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল। কেন তিনি এই ভাবনা চিন্তা করেছিলেন সে কথা তিনি বুখারিনকে স্পষ্ট করে দিয়ে এক পত্রে লিখেছিলেন --

''নিবন্ধটি পাঠালাম, পড়ে দেখুন। ভারতীয় কমরেডদের লেখা (যেটা পাঠালাম শুধু সেটাই নয়, যে কোন ভাল লেখা) যত বেশী করে সম্ভব প্রকাশিত হলে ভারতীয়দের যেমন উৎসাহিত করা হবে, পাশাপাশি ভারতবর্ষ এবং সেখানকার বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা আরও বেশী বেশী করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারব, অনেক কিছু জানতে পারব।''[১৭]

এই ছিল ভারত সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। শুধু ভারত নয় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর রাখতেন। তবে ভারতের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যেন ছিল একটু বেশীই। লেনিনকে বুঝতে হলে তাই ভারত সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তা এবং কেন ও কীভাবে তিনি ভারতের ব্যাপারে জানতে উৎসাহী হয়েছিলেন তা নিয়ে আরও অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সূত্র নির্দেশ

১. *লেনিনের ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের লেনিন*, শুভ গুপ্ত , সংক্ষেপ,(সংকলন ১৯৯৪, পৃ ৪৫৯।
২. ঐ, পৃ. ৪৫৯
৩. ঐ, পৃ. ৪৬০
৪. *Collected works*. Vol 39. p 427
৫. Ibid. pp.561-63
৬. Ibid, p.572
৭. Ibid, p.763
৮. *লেনিনের ভারতবর্ষ. ভারতবর্ষের লেনিন* . পৃ. ৪৬৪
৯. *Collected works*, Vol 39, pp. 497-99
১০. *Traditions of great friendship*. p 48
১১. *লেনিনের ভারতবর্ষ. ভারতবর্ষের লেনিন* , পৃ. ৪৬৪
১২ *Lenin in India*, p. 50

১৩. *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ৩১-৩২

১৪. *মুক্তির সংগ্রাম ভারত* (২য় পরিবর্ধিত সং), পৃ. ১১০ (আবদুর রব যে তালিকা তৈরী করেছিলেন তা এখানে আছে)

১৫. আনন্দ গুপ্তের লেখা গ্রন্থের ৬০-৬২ পাতায় রয়েছে ভারত বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা

১৬. Documents of History of the communist party of India. Vol 1. ed. by G. Adhikary, p 255

১৭. *Collected works*, Vol.45. p 376

তাজিক জনমানস ও রাজনীতি সচেতনতায় ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রভাব

(সোভিয়েত যুগ)

নন্দিনী ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়)

মধ্য-এশিয়ার অতীত সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ক্ষুদ্রায়তন দেশ তাজিকিস্তান ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জাতি বৈচিত্র্যে অনন্য। আধুনিক যুগের প্রত্যুষে এ অঞ্চল রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। অতঃপর বলশেভিক বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাষ্ট্র সমগ্র মধ্য-এশিয়াকে তার নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে — তাজিকিস্তানের নিজস্ব পূর্ণমাত্রিক পরিচিতি সেই সময়ের প্রাপ্তি। তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃবর্গ তাজিকিস্তানকে সমগ্র মধ্য-এশিয়ার একমাত্র অ-তুর্কী অঞ্চলরূপে পৃথক সত্তা প্রদান করে — জাতির স্ব-শাসন অধিকার নীতি অনুসারে কিন্তু তা সময়ের নিরিখে তাজিকিস্তানকে যে কতদূর সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছিল — সে প্রশ্ন থেকে আজ অজস্র বিতর্কের জন্ম হয়েছে — এবং বর্তমানে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ ও বিভিন্ন গোষ্টিদ্বন্দ্ব 'তাজিক' স্বত্বার দৃঢ়ত্ব ও যথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাজিকিস্তানের আভ্যন্তরীণ জাতি সংগঠন ও ভৌগোলিক অঞ্চল বন্টনের বিষয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ভূ-প্রকৃতির নিরিখে তাজিকিস্তান মূলতঃ পার্বত্য প্রদেশ। তবে তারই মধ্যে রয়েছে নদী উপত্যকা, পার্বত্য মালভূমি ও কিছু কিছু সমতলভূমি — যাকে কেন্দ্র করে এই দেশের মূল জনবসতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ গড়ে উঠেছে।

তাজিকিস্তানের আধুনিক মানচিত্র অনুসারে উত্তরাংশে রয়েছে তিয়েন শাল পর্বতমালা, ফরঘনা উপত্যকার পশ্চিমাংশ এবং গোলোদনায়া স্তেপি। তবে এ অঞ্চলের আবহাওয়া কৃষিকাজের অনুকূল — বিশেষতঃ তুলো ও আঙুর ইত্যাদি উষ্ণ পরিবেশের ফসল এ অঞ্চলে ভালো উৎপন্ন হয়।

আধুনিক তাজিকিস্তানের জন্ম বহুলার্থে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি। মধ্য-এশিয়া সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবার পর প্রথম তাজিক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র বা TSSR সৃষ্টি হয় ১৯২৪-শের অক্টোবর মাসে উজবেক SSR-এর অঙ্গরূপে। তবে পাঁচ বছর বাদেই ১৯২৯-এর অক্টোবরে তাজিকিস্তান পূর্ণ স্বাধীন প্রদেশের মর্যাদা পায় ও ঐ বছরেই ৫ই ডিসেম্বর USSR-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।[১]

যাইহোক, তাজিকিস্তানের এই পৃথক সত্ত্বা প্রদান সোভিয়েত পক্ষের মতে 'জাতির

আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার' নীতির স্বীকৃতি। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধী পক্ষের সমালোচনায় এই তাজিকিস্তানের সৃষ্টি মধ্য-এশিয়ার নিজস্ব সংহতির মাঝে বিভেদনীতি রোপন।[২]

তাজিকিস্তানের আর্থ-রাজনৈতিক মানচিত্রে উত্তরাঞ্চলেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ক্ষেত্র খোজেন্ত ও কুলিয়ারের অবস্থান। রাজধানী দুশান্বেও এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

দক্ষিণ-পশ্চিম তাজিকিস্তান আবহাওয়ার দিক থেকে সর্বাধিক উষ্ণ। এ অঞ্চলে বিস্তৃত নদী-উপত্যকা ও বিভিন্ন গিরিমালা আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনেব পর থেকে এ অঞ্চলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তুর কার্পাস ও অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব তাজিকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পামীর গ্রন্থির পর্বতমালার দ্বারা আবৃত। এর পশ্চিমাংশে ভূপ্রকৃতি উপত্যকা, মরুভূমি ও স্তেপি মরুর দ্বারা আবৃত। কেবলমাত্র নদী উপত্যকাগুলিতে সামান্য কৃষিকার্য অনুকূল ভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব পামীর তাজিকিস্তানের দুর্গমতম অঞ্চল তাজিকিস্তানের শুষ্কতম ও শীতলতম জলবায়ু এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য — এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অ্যালপাইন মরু।

উজবেক তাজিক দুটি প্রতিবেশী রাজ্য। এদের পরস্পরের স্বতন্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। বরঞ্চ দুটি সংস্কৃতি পবস্পর নির্ভরশীল। সুপ্রাচীনকাল থেকেই তারা মধ্য-এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতির ধাবক ও বাহক। পাবিবারিক, বৈবাহিক ও সামাজিব বন্ধনে এদুটি জাতির নৈকট্য ছিল অনবদ্য। মধ্য-যুগীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর বুখারা ও সমরখন্দ সম্পর্কে উভয় জাতিরই যথেষ্ট অধিকারবোধ ছিল। কিন্তু সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাজিকিস্তানকে পৃথক করে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সমরখন্দ ও বুখারা দুটি শহরই উজবেকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৩] পক্ষান্তরে তাজিকিস্তানের রাজধানীরূপে নুতন একটি স্থান নির্বাচন করে যার নাম দুশান্বে। যার অর্থ সোমবার।[৪]

যাইহোক, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অবশ্য এর নামকরণ করেন 'লেনিনাবাদ' — তবে স্তালিন পরবর্তীযুগে পুনরায় 'দুশান্বে' নামটি ফিরে এসেছিল। বার্ণেট রুবিস তাঁর 'The Fragmenrtation of Tajikista ' প্রবন্ধে দুশান্বে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন।[৫]

এভাবে নবদৃষ্ট তাজিকিস্তান তার অর্বাচীন অপরিজ্ঞাত রাজধানী নিয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। একথা হয়ত সত্যি যে অঞ্চল বন্টনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ উজবেকিস্তানের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু সমগ্র মধ্য-এশিয়ার একমাত্র অ-তুর্কী অঞ্চল হিসেবে তাজিকিস্তানকে স্বাতন্ত্র্য দেবার প্রয়াসটিকে সম্পূর্ণই উদ্দেশ্যমূলক বলা যায় কি-না তা আরো গভীর পর্যালোচনার বিষয়। কারণ মধ্য-এশিয়ার একটি সামগ্রিক সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যি, কিন্তু এই সাদৃশ্যের আবরণী অতিক্রম করে উপস্থিত ছিল বিভিন্ন জাতি উপজাতির অতীত পরিচিতির সচেতনতা এবং স্থান ও অঞ্চলভেদে পারস্পরিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী। বর্তমান তাজিকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অন্তর্কলহের উৎসমূলে রয়েছে ঐ বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের ভিন্নধর্মী মনোভাব ও স্বার্থদ্বন্দ্বের উপস্থিতি। সোভিয়েত কর্তৃত্ব তাজিকিস্তান সৃষ্টি করেও সে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তবে উজবেকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে কি এই জটিলতা আরও ভয়াবহ আকার ধারন করত না? আজকের পশ্চাদ্‌পটে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন দেখা দেয়।

আধুনিক তাজিকিস্তানের সোভিয়েত আমলের অঞ্চল বিভাজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা ছিল শিল্পায়ন ও নগরায়নের একদেশদর্শিতা। একেকটি এলাকা পর্যালোচনা করলেই সেই ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে। বলশায়া সোভেতস্কায়া এনসাইক্লোপেডিয়ার বর্ণনা অনুসারে সোভিয়েত তাজিকিস্তানের এলাকা বন্টনের চিত্র ছিল নিম্নরূপ : [৬]

অঞ্চল	আয়তন বর্গ কি মি.	জনসংখ্যা	বসতির সংখ্যা	নগরের সংখ্যা	শহুরে অঞ্চলের সংখ্যা
গোর্ণোবাদামসল	৬৩,৭০০	১১২,০০০	৬	১	
কুলিয়ার অব্লাভ্	১২,১০০	৪,৩২,০০০	৮	২	৬
লেনিনাবাদ অব্লাভ্	২৬,১০০	১,০৮৮,০০০	১২	৯	২০
প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত অঞ্চল সমূহ	৪০,৪০০	১,৭৫৫,০০০	১৫	৬	২১

অর্থাৎ সর্বদা আয়তন ও লোকসংখ্যার সামঞ্জস্যে শহর বা শহরাঞ্চলের উপস্থিতি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের প্রাধান্য এই দেশের বহু ভূমি বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। তাই সে জনবহুল ও সভ্যতার অনুকূল অঞ্চলেই ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটেছে — দুর্গম ও সম্ভাবনাহীন অঞ্চলগুলি অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে গেছে। সোভিয়েত কালের সাম্যের আদর্শের পরিবেশেও ভৌগোলিক অ...ম্যকে জয় করবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। রাশিয়ার জারতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের কাল থেকে যে অঞ্চলগুলিতে কৃষিউন্নয়ন ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেই এলাকাগুলিই সোভিয়েত যুগের দ্রুত উন্নয়ন প্রচেষ্টাতে স্থান পেয়েছে। এইরকমই একটি ভাগ্যবান অঞ্চল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব তাজিকিস্তান। উত্তর তাজিকের খোজেন্ত আয়তনে খুব বড় না হলেও এটিই এদেশে সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই বিষয়ে Burnet R Rubin-এর বর্ণনা প্রণিধান যোগ্য।[৭]

বাণিজ্যপণ্য উৎপাদন, কারখানা স্থাপন ও নগরায়নেও এই অঞ্চল সহজেই অগ্রসর হতে পেরেছে। উত্তরাঞ্চলের অপর একটি বৃহত্তর সমৃদ্ধ এলাকা কুলিয়াব-অব্লাস্ত, যেখানে রাজধানী দুশান্বের অবস্থিতি। অর্থনৈতিক দিক থেকে কুলিয়াব খোজেন্ত মোটামুটি সমান সৌভাগ্যের অধিকারী। সোভিয়েত যুগের মধ্য-এশিয়া অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়নের অভিজ্ঞতায় অনুপ্রবেশ করে। কারণ সোভিয়েত ব্যবস্থা কোন অঞ্চলকেই পুরোপুরি কৃষিনির্ভর করে রাখার পক্ষপাতী ছিল না। তাই মধ্য-এশিয়ার অনুন্নত পরিবেশে দ্রুত আধুনিকীকরণ শুরু হয় শিল্পায়নের মাধ্যমে। তবে মধ্য-এশিয়ার উপস্থিত পটভূমি দ্রুত বদলানো সোভিয়েত ব্যবস্থার পরিকাঠামোতেও সম্ভবপর হয়নি। তাই কেবলমাত্র সে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে জারতন্ত্রের আবাস থেকেই ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রচলন ছিল সেই অঞ্চলগুলিকেই শিল্পনগরীতে উন্নীত করা হয়।

খোজেন্ত কুলিয়াব তাই ধীরে ধীরে পাদ প্রদীপের সামনে ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অজয় পটনায়েকের ব্যাখ্যায়, "The redistribution of industry geographically went along the regional specialization . . ." [৮] অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মধ্য-এশিয়াকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলাই ছিল সোভিয়েত ব্যবস্থার লক্ষ্য সেখানে প্রতিটি অঞ্চলে শিল্পের সমবন্টন জাতীয় কোন পূর্ণসাম্য স্থাপন পরিকল্পনা ছিল না। সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার অভ্যন্তরের স্থানীয় বৈষম্য যে এতদূর দৃঢ়প্রোথিত সেই ধারণা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের ছিল না

— তাই সচেতনভাবে শিল্প সমবন্টনের কোন প্রয়াস তাদের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। তবে সোভিয়েত ব্যবস্থাব সমালোচক গোষ্ঠীর মতে এই জাতীয় অসম অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠন একটি ইচ্ছাকৃত ভেদনীতি সৃষ্টির ধূর্ত প্রয়াস।[৯] যাইহোক, সচেতন বা অনিচ্ছাকৃত এই বৈষম্য-সৃষ্টির ফল স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের উপর।

খোজেন্ত কুলিরাব অঞ্চলের জনগণ ধীবে ধীবে এই বন্টন বৈষম্যের ফলে একটি সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একদিকে উন্নত অর্থনীতি, ফলতঃ আধুনিক জীবিকার সুযোগ, অপরদিকে নগরায়নের ফলে জীবনযাত্রাতেও আধুনিকতার দ্রুত অনুপ্রবেশ। যুগপৎ এই দুটি প্রক্রিয়া চলতে থাকায় এই অঞ্চলের তাজিক জনগণ শিক্ষিত সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। তার ফলে দুটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় — একটি সংশ্লিষ্ট অনুন্নত তাজিক অঞ্চলের সঙ্গে দূরত্ব — ও অপরটি উন্নততর প্রয়াসী রুশ ও উজবেক জনগণ, যারা তাজিকিস্তানের বিশেষ করে খোজেন্ত কুলিয়াবের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল — তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য। বস্তুতঃ তাজিকিস্তানের দ্রুত শিল্পায়ন দ্রুততর ও সহজ করবাব জন্য বহু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত রুশ ব্যক্তিবর্গকে এই অঞ্চলে নিযুক্ত করার একটি নিয়মিত প্রবণতা বলশেভিক সরকারের দেখা গিয়েছিল। এই নীতির বিরুদ্ধেও প্রখর সমালোচনা ঘটেছে।[১০] কারণ সোভিয়েত বিরোধী পক্ষের যুক্তিতে এভাবে মধ্য-এশিয়ার সর্বত্র রুশ অনুপ্রবেশ ঘটানো ও উচ্চতর পদগুলিতে তাদের নিযুক্ত করা মূলতঃ পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা — ও রাশিয়ার "big brotherhood" মানসিকতার প্রতিফলন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১-এর পরে, যে অঞ্চলগুলিতে রুশ প্রভাব বেশী ছিল — সেই খোজেন্ত কুলিয়াব কিন্তু 'কমিউনিস্ট' তন্ত্র ধরে রাখার জন্য মরীয়া, গৃহযুদ্ধের অন্যতম শরিক নাবিয়েভ 'কমিউনিস্ট' ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা — এমনকি হিংসাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপেও দ্বিধা করেননি।[১১] তবে কি ধরে নেওয়া যায়, সে মস্কো চালিত কমিউনিস্টতন্ত্র থেকে এমনকিছু সম্ভাবনা ছিল যার জন্য নাবিয়েভ গোষ্ঠী কঠোর ইসলামপন্থী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং বহুদূর আঞ্চলিক সমর্থনও লাভ করেছিল ১৯৯১-এর পরেও? বস্তুতঃ রুশ ব্যক্তিদের কর্মজগতে উচ্চপদ থাকলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তাজিক জনগণের স্বাধীন প্রতিনিধিত্বের মধ্যে দিয়েই একটি বিশেষ গোষ্ঠী পাদপ্রদীপের আলোয় অবতীর্ণ হয় — এবং এদের সঙ্গে প্রবাসী রুশ জনগণের আদান-প্রদানে তেমন দূরত্ব ছিল বলে মনে হয় না। বরং এই স্থানীয় সম্ভ্রান্ত (local elite) গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে প্রবাসী পদস্থ রুশ ব্যক্তিবর্গের একটি সমঝোতা ছিল বলেই মনে হয়। এই নৈকট্য একদিকে বলশেভিক নীতির একতা ও সফল জাতির মিলনের সম্ভাবনাকে হয়ত আপাতভাবে পূরণ করেছিল — কিন্তু অপরদিকে তা আন্তঃতাজিক সম্পর্কের মধ্যে নানা স্থানে গভীর দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। অনুন্নত অঞ্চলের মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ ও অভিমান নিয়ে খোজেন্ত কুলিয়াব-এর থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

এই বিপরীতমুখ মনোভাবের উৎপত্তিস্থল মূলতঃ অনুন্নত দুর্গম ও জনবিরল গোর্নো-বাদাখ্সাল অঞ্চল। পামীর গ্রন্থির গিরিশঙ্কুল পরিবেশ এই অঞ্চলকে বসবাসের অযোগ্য করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত সোভিয়েত ব্যবস্থাও এই প্রাকৃতিক বৈরিতাকে দূর করতে পারেনি বা দূরীকরণে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এই অঞ্চলের সে সামান্য বসতি তা আদি উপজাতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধগুলিকে আঁকড়ে ধরেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও দীর্ঘমেয়াদী সমাজতান্ত্রিক

শাসনের যুগ অতিক্রম করেছে। স্বভাবতঃই এই অঞ্চলে ধর্মের প্রতি আনুগত্যের মাত্রা আগাগোড়াই অন্যান্য এলাকার তাজিক জনগণ-অনুপাতে বেশী। কমিউনিস্টতন্ত্রের ধর্মবর্জন নীতি এই অঞ্চলের ইসমাইলি গোষ্ঠীর ইসলামিক সম্প্রদায়কে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। সোভিয়েত উত্তরকালে, এ অঞ্চলে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে কমিউনিস্টতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আফগানিস্তান এই অঞ্চলের নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় মুজাহিদীন গোষ্ঠীর প্রভাব এখানে প্রবল আকার ধারণ করেছে।[১২] এই অঞ্চলের উপজাতিক জনতা সাধারণভাবে পামীরী ও গর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাজিকিস্তানের অভ্যন্তরে এই অঞ্চল মনেপ্রাণে তাদের স্থানীয় গর্মী পামীরী পরিচিতি আঁকড়ে থেকেছে —Novie Sovetskii chelovek[১৩] হবার কোন প্রয়াস বিশেষ দেখায় নি। একসময় স্তালিন তাঁর রাষ্ট্রনীতির পদক্ষেপ হিসেবে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক অঞ্চলের জনগণকে অন্য অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য করার পদ্ধতি নিয়েছিলেন। সেই অনুসারে কিছু গর্মীকে 'কুর্গানট্যুবে' নামক দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এতে তাদের স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল।[১৪]

হয়ত এই অভিজ্ঞতার তিক্ততার কারণেই পরবর্তীকালে সোভিয়েত নীতিতে তাজিক উপজাতিগুলির মূলোৎপাটন বন্ধ রাখা হয়েছিল। রাকেশ গুপ্তার পর্যালোচনায়, কমিউনিস্ট রাজত্বের আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও সাবেক উপজাতিক বিভাজনগুলিকে মধ্য-এশিয়ার অক্ষুণ্ণই রাখা হয়েছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান করা যায় যে 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের' বিষয়ে হয় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষর অতীতের ধারণা বদলেছিল নতুবা মৌখিকভাবে এই সমস্যাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত ঘোষণা করে তারা উপস্থিত সমস্যাটির অস্তিত্বই অস্বীকার করেছিল। কারণ যে মুহূর্তে সোভিয়েত শাসন অপসারিত হল — সে আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মধ্য এশিয়ার চরম আকার ধারণ করল — তাদের অন্যতম ছিল বিভিন্ন জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব রেষারেষী ও খণ্ডযুদ্ধ। সেখানে তাজিকিস্তানের রূপ সবচেয়ে ভয়াবহ — কারণ আয়তনে ক্ষুদ্র এই দেশের জনবৈচিত্র্য সর্বাধিক। বাদাখ্‌সান এলাকার মূল অভিযোগই ছিল সোভিয়েত যুগে অবহেলিত ও অবদমিত থাকার অভিজ্ঞতা। তাই স্বাধীন হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ হয়ে উঠেছে মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট বিরোধী। এবং সোভিয়েত বিরোধী দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য মূলবোধের সন্ধানে তা উপনীত হয়েছে ইসলামের দরবারে।

এই দুটি পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রকৃতির অঞ্চলের মাঝে অবস্থান কুর্গান ট্যুবে বা কুর্গান টেপের। অর্থনৈতিক দিকথেকে এ অঞ্চল আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় যথেষ্ট সফল। তবে এ অঞ্চলের জনবসতির ধারা মিশ্র। অঞ্চলটির জনবসতি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং অনেকাংশেই সোভিয়েত যুগের সৃষ্টি, কারণ ১৯৩০ থেকে ৬০-এর দশকের মধ্যে সে নূতন অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতেই কুর্গান-ট্যুবের আধুনিক জনবসতির চরিত্র গড়ে উঠেছিল। তাজিকিস্তানের ভিতর থেকে এখানে এসেছিল কুলিয়াব থেকে শুরু করে গর্ম-এর কিছু বাসিন্দা পর্যন্ত এদের অভিবাসন ঘটানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল কার্পাস চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য শ্রমিক যোগান দেয়া।[১৬] প্রাক-সোভিয়েত জনবন্টন অনুসারে এ অঞ্চলে উজবেক জনগণেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু যেহেতু নতুন নিয়মে এ অঞ্চল তাজিকিস্তানের অঙ্গ তাই এখানে কৃত্রিম-ভাবে কিছু তাজিক জনবসতি গড়ে দেবার এক অদূরদর্শী প্রয়াস নেয় সরকারী পক্ষ। প্রবণতার বিরুদ্ধে এই সংমিশ্রণ প্রয়াস কিন্তু বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কোনদিনই কুর্গান-

ট্যুবের তাজিকরা — আদি বাসিন্দা উজবেকদের মেনে নিতে পারেনি — কারণ তারা তাদের নিজস্ব বসতি থেকে ছিন্নমূল হবার তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অঞ্চলে তাজিক হয়েও সংখ্যালঘু হয়ে থাকার হীনমন্যতা কখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সেই কারণে দেখতে পাই যে ১৯৯১-এর অরাজক প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চল থেকেই জন্ম নেয় ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি যার ধ্যান-ধারণায় সংস্কারবাদী ইসলামের সঙ্গে রয়েছে গণতন্ত্রী ভাবধারার সংমিশ্রন,[১৭] এই দশ দক্ষিণের চরমপন্থী ইসলামকে তাদের সঙ্গে সামিল করে কমিউনিস্ট উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে।

অর্থাৎ একদিকে যেমন তাজিকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও সম্ভাবনা অনুসারে তার আর্থ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে তেমনি প্রতিটি অঞ্চলের বিভিন্নতা অনুসারে তাজিক জনগণের বিচিত্র জীবিকা, প্রবণতা ও ক্ষমতার জন্ম হয়েছে। প্রাক্-সোভিয়েত পর্যায়ে জাত একটি তাজিক প্রবাদবাক্য এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, "The Pamiris dance, the Kulyabis defend, Dushambe produces and Khojent trades and rules"[১৮]

আশ্চর্যের বিষয় যে সোভিয়েত যুগের দীর্ঘ ষাট বছরের অভিজ্ঞতাতে এই আঞ্চলিক কর্ম-বিভাজনের চরিত্র খুব একটা পাল্টায়নি। পামীরী অধ্যুষিত গিরিশঙ্কুল দাক্ষিণাঞ্চল আগাগোড়া উপজাতিক জীবনযাত্রাতেই আবদ্ধ থেকেছে। এতে যে কোন উদ্দেশ্যমূলক স্বার্থসিদ্ধির ইঙ্গিত ছিল সোভিয়েত পক্ষের — তা বলা যাবে না; তবে দ্রুত আধুনিকীকরণের দাবীকে বৈপ্লবিক সাম্যের দাবীর উপরে স্থান দেওয়াতে নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট আদর্শ পালনে ত্রুটি হয়েছে। ফলতঃ আধুনিক তাজিকিস্তানে আঞ্চলিক চরিত্রবৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের তীব্র সংঘাতে।

সূত্র নির্দেশ

১. *গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া*, ম্যাকমিলান এডুকেশনাল করপোরেশন, ১৯৮০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃ. ২৮৪

২. টেরেসা র‍্যাকোওস্কা হার্মস্টোগ, *রাশিয়া অ্যাণ্ড ন্যাশনালিজম্ ইন্ সেন্ট্রাল এশিয়া*, দ্য জন্স্ হপ্কিন্স্ প্রেস, বাল্টিমোর এ্যাণ্ড লণ্ডন, ১৯৭০, পৃ.৭৬-৮২।

৩. ট.অ. স্দাঙ্কো, নাত্সিওনাল্নো, গাসুদাবস্ত্ভোন্নোয়ে রাজমেজেভনিয়ে ই প্রসেসি এত্নোচেস্কোভো রাজভিতিয়া উ নারদভ স্রিয়েদি আজিই, সোভিয়েত্স্কায়া এত্নোগ্রাফিয়া, ১৯৭২, ভল্যুম-৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, পৃ.২৭ এবং আহমেদ রসিদ, দ্য রিসারজেন্স অফ সেন্ট্রাল এশিয়া, ইসলাম অব ন্যাশনালিজম্ ? অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস (করাচী), ১৯৯৪, পৃ. ১৬১।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬১।

৫. বার্নেট আব. রুবিন, *দ্য ফ্র্যাগমেন্টেশন অব্ তাজিকিস্তান সারভাইভাল (৩৪-৪)*, উইন্টার, ১৯৯৩-৯৪, পৃ.৭৪

৬ পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৮৪।

৭. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৭৫।

৮. অজয় পট্টনায়ক, *সেন্ট্রাল এশিয়া বিটুইন মডানিটি অ্যান্ড ট্র্যাডিশন*, কোণার্ক পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃ.২০-২১।

৯. ট. র. হার্মস্টোন, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৯৫-১৪১।

১০. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৯৬-৯৯। এবং অজয় পট্টনায়ক, পূর্বোক্তসূত্র, পৃ. ২২।

১১. রকেশ গুপ্তা, তাজিকিস্তান : লকড় হর্নস্ ফর পাওয়ার, *স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিস্* ১৫(৬), সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৫২০-২৬। এবং আভা দীক্ষিত, তাজিকিস্তান এন্গাল্ফড্ বাই ফ্লেমস্ অফ আফগান সিভিল ওয়ার,

স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিস্ ১৫(৯); ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৮৭৭। এবং আহমেদ রসিদ, পূর্বোক্ত সূত্র পৃ. ১৭৫-১৮২

১২. আভা দীক্ষিত, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৮৭৫।

১৩. এর অর্থ, নতুন সোভিয়েত মানুষ যে ধারণাটি বিপ্লবোত্তর কমিউনিস্ট সরকারের সৃষ্টি-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে একাত্মতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেখানে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নাগরিক পরিচিতিই হবে অগ্রগণ্য।

১৪. বার্নেট রুবিস, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৭৫।

১৫. রাকেশ গুপ্তা, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৫২২।

১৬. জন অ্যান্ডারসন, *দ্য ইন্টার ন্যাশনাল পলিটিক্স অফ সেন্ট্রাল এশিয়া*, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভারসিটি প্রেস, ম্যাঞ্চেস্টার ও নিউইয়র্ক, পৃ. ১৭৭।

১৭. আহ্মেদ রসিদ, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৭৭।

১৮. নেজাভিসিমায়া গাজেতো, ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

NATO-এর বেলগ্রেড আক্রমণ — মানবাধিকার রক্ষা না সার্ব পুঁজিপতিদের দমন

সৈকত গুহ

NATO-র বেলগ্রেড আক্রমণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও আধুনিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়। এই আক্রমণ মানবতাকে রক্ষা করেছে না ধ্বংস করেছে বা কী উদ্দেশ্য এই আক্রমণের পেছনে নিহিত আছে তা নিয়ে জল্পনার অবকাশ নেই। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বল্কান জাতীয়তাবাদের চরিত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে স্টলিনাইজেশনের পর্বে যুগোশ্লাভ সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা ও সেই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি — এইসব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পূর্বেই বল্কান অঞ্চলে অসন্তোষ সমগ্র বিশ্বে একটি চিন্তার বিষয় ছিল। ১৯৪৮ সালের আগে আলবেনিয়া যুগোশ্লাভিয়ার অধীন ছিল। কিন্তু আলবেনিয়ার জাতীয়তাবাদ এই অধীনতা স্বীকার করতে চায়নি। দেখা গেছে ১৯৪৮ সালের পর কার্যত আলবেনিয়া পৃথক হয়ে যায়। তখন থেকেই আলবেনিয়ার বিশেষ মুসলিম জনগোষ্ঠী যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব ও ক্রোটদের থেকে পৃথক হয়ে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চায়। ফলে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা যুগোশ্লাভিয়া সংকট সৃষ্টি করে। একটু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সার্বিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কোসোভোর ৮০ শতাংশ আলবেনীয় মুসলমান যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, তার অবসান ঘটান সার্বনেতা মিলোসেভিচ। তিনি কোসোভোকে বেলগ্রেডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে সমস্যার সূত্রপাত হয়।

এখন প্রশ্ন যুগোশ্লাভিয়ার এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে NATO-র হস্তক্ষেপে অধিকার কোথা থেকে এলো? NATO-র এই হস্তক্ষেপের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বোঝা দরকার স্ট্যালিনাইজেশনের পর্বে যুগোশ্লাভ সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা ও সেই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিলো? ১৯৪০-এর দশক থেকেই যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতন্ত্রীরা স্ট্যালিন নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক পথ পরিহার করেছিল। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ায় যে রাষ্ট্রীয় আমলা পুঁজি গড়ে উঠেছিল, সে পুঁজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্ট্যালিন বিরোধিতা। এই পুঁজির প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন সার্ব ও ক্রোট জাতীয়তাবাদীরা।

টিটো যখন তার দলের প্রায় ৪০০০ স্ট্যালিনপন্থী সদস্যকে বিতাড়িত করেন ও আমলা পুঁজির বিকাশের স্বার্থে ১৯৫০ সালে কোরিয়ার মার্কিনী হামলাকে সমর্থন জানান, তখন থেকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠী যুগোশ্লাভিয়ার এই পরিবর্তনকে যথেষ্ঠ উৎসাহিত করে। এই

পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল টিটোর মাধ্যমে পূর্বদিকে সোভিয়েত আধিপত্যের প্রসার রোধ করা। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আশা ছিল যে টিটো NATO-র সাথে যোগ দেবে। কিন্তু তাদের সব আশা নিরাশ করে টিটো NATO-র সদস্য হয়নি। আবার সে সোভিয়েত রাশিয়ার ওয়ারশ চুক্তিতে যোগ দেয়নি। টিটো ছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান নেতা ও প্রবক্তা। অথচ NATO-র বিশ্বাস ছিল বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন যুগোশ্লাভিয়া একদিন তাদের সদস্য হবে। তাই যখন ওয়ারশ চুক্তি ভেঙে যায়, তখন NATO-র অন্তর্ভুক্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি যুগোশ্লাভিয়ার সার্বপুঁজিপতি গোষ্ঠীকে নিজেদের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু মার্শাল টিটো যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন গোষ্ঠী ও জাতিদ্বন্দ্বে দীর্ণ যুগোশ্লাভিয়াতে ঐক্যের চেহেরা বজায় রেখেছিলেন ও NATO এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখেন। টিটোর মৃত্যুর পর যুগোশ্লাভিয়া আবার সার্ব, ক্রোট, স্লোভাক ও মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে থাকে। বিসমার্ক যেমন জার্মনীর ঐক্য আন্দোলনের সময় প্রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি সার্বনেতা মিলোসেভিচ যুগোশ্লাভিয়ায় সার্ব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার পরিণাম যুগোশ্লাভিয়া একে একে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে আলবেনিয়া, স্লোভানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া এমনকি ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করলো।

বর্তমানে সার্বিয়া ও সান্টিনিগ্রো নিয়ে গঠিত যুগোশ্লাভিযায় কোসোভো সংকট ও তাকে কেন্দ্র করে NATO-র হস্তক্ষেপের আলোচনা প্রসঙ্গ আনার জন্য ধাপে ধাপে যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে পূর্ববর্তী অনুকূলে আলোচনা করা হল।

NATO-র বেলগ্রেড আক্রমণের পেছনে প্রচুর যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, NATO মনে করে যুগোশ্লাভিয়ায় সার্বদের আক্রমণে কোসোভোব মুসলমানরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়ে তাদের দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ফলে সমস্যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, কোসোভোর ৯০ শতাংশ আলবেনীয় মুসলমান গৃহহারা হয়েছে ও প্রাণভয়ে গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ি গাছপালার আড়ালে, গাড়ী বা ট্রাস্টরের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। তৃতীয়তঃ, ন্যাৎসী শক্তির আদর্শে দীক্ষিত সার্বসেনারা যখনই কোনো আলবেনীয় মুসলমানকে দেখছে তখনই তাদের হত্যা করছে। রাস্তায় সরাসরি মৃতদেহ ও গণকবরের স্তূপ।

আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের হিসাব অনুয়ায়ী কোসোভোর অন্তত ৭০টি শহরে ও গ্রামে সার্বিয়ার সৈন্যরা চারহাজারের বেশি লোককে গুলি করে মেরেছে। বাড়ী শুদ্ধ একেকটি পরিবারকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। রীতিমত পরিকল্পনা মাফিক এইসব ধর্ষণ ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। সার্বিয়ার সৈন্যরা কয়েক হাজর আলবেনীয় পুরুষ ও ছোটো ছেলেকে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেছে। তারপর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কোসোভো থেকে এত হাজার মাইল দূরে এসেও শরণার্থীরা সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি ভুলতে পারছেন না। তবুও, তারই মধ্যে আনন্দের ঘটনাও শোনা যাচ্ছে। নিউজার্সিতে প্রথম যে প্লেনটি এসেছিল, তার যাত্রীদের মধ্যে একজন পরদিন-ই স্থানীয় হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। লিবাইব কারলিজু নামে এই শরণার্থী মেয়েটি ও তার স্বামী তাদের ছেলের নাম

রেখেছে আমেরিকা।

কোসোভোর শরণার্থীদের নিয়ে আমেরিকার সমাজসেবী সংস্থাগুলি যেভাবে স্থানীয় সহযোগিতা পেয়েছে, সবসময় তা ঘটেনি। আমেরিকার বেশ কয়েকটি সংস্থা শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য করে। তারাও এবারের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক। জনসেবার জন্য এত সহজে স্পনসর পাওয়া যাবে, তা কেউ ভাবেনি। ক্রমাগত টিভিতে কোসোভো রিফিউজিদের দুর্গতি, বিশেষ করে শিশু আর বৃদ্ধাদের পথে পথে ঘোরার ছবি এদেশের লোকজনের মনকে স্পর্শ করেছে। আমেরিকানরা রিসেট্‌ল্‌মেন্ট এজেন্সিতে প্রচুর ডোনেশন দিয়েছে। ভলান্টিয়ার হিসাবে বহু লোক কাজ করেছে। অসহায় শরণার্থীদের জন্য খাওয়া থাকা থেকে চাকরির পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে রিফিউজি সেবার নামে সমাজসেবী সংস্থাগুলি রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমেছে। প্রত্যেকেই চাঁদা তুলে, ভলান্টিয়ার জড়ো করে সমাজসেবা শুরু করেছে। সবচেয়ে মজার বিষয় নিউইয়র্কে কোসোভো শরণার্থী সংস্থা এত কম যে, সমাজসেবী সংস্থাগুলি অতিথি বরণের কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। সারা আমেরিকাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। অত রিফিউজি আদতে আসবে কিনা সন্দেহ।

আমেরিকার শরণার্থী সেবার বিষয়টি বৈষম্য দোষে দুষ্ট — তার প্রমাণ আমেরিকা নিজেই দিয়েছে। এ দেশের কালো সমাজের কিছু লোকের ধারণা, এ হচ্ছে রঙের খেলা। ইউরোপের সাদা চামড়ার রিফিউজিদের জন্য আমেরিকার দরদ চিরকালই বেশী। কালো রিফিউজিদের বেলায়, যেমন সুদানের লোকদের বেলায় এত মায়ামমতা চোখে পড়েনি।

তবে শুধুমাত্র কালো রিফিউজিদের বেলায় আমেরিকার বৈষম্য তাও সবসময় মানা যায় না। আমেরিকার বসনিয়ার রিফিউজিদের সমানভাবে গ্রহণ করতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এত ডোনেশনও ওঠেনি।

আশ্চর্যের বিষয় যেসব শরণার্থী অন্য দেশ থেকে আমেরিকায় এসেছেন তারা এরকম আবাহন পাননি। বশকিম সালেস্ নামে উনত্রিশ বছরের এক আলবেনীয় এগারো বছর আগে এদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। তখন লোকে জানতই না যে আলবেনীয়া বলে কোনো দেশ আছে। তাই তখন রিফিউজি সেবা দূরে থাক্, সালেসের ভাগ্যে আমেরিকার করুণা এসেছিল — অন্তত সালেস্ তা মনে করে।

আরেকটি ঘটনার অবতারণা করা যাক। আবদাল্লা নামে বাইশ বছরের এক কুর্দিশ ছেলে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমেরিকায় পালিয়ে আসে। তার মতে, কুর্দিশদের উপর সাদ্দামের অত্যাচারের কথা আমেরিকায় সেভাবে প্রচার লাভ করেনি।

নানা ঘটনার নিরিখে আমেরিকার রিফিউজি সেবার ইতিহাস দেখে বিশ্লেষণ করে যদি কোসোভোর অসহায় রিফিউজিদের সেবার প্রসঙ্গটি তোলা যায় তাহলে দেখা যাবে কোসোভোর রিফিউজি সেবার যথেষ্টই আয়োজন হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের লড়াই যেসব বাংলাদেশীকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছিল, তারা অনেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ নামে মাত্র রিফিউজিদের প্রতি দরদ দেখিয়েছিল — আর রিফিউজিরা পশ্চিমবঙ্গে মানুষের, সরকারের ভালোবাসা ও আশ্রয় পেয়ে শান্তি পেয়েছিল। তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ রিফিউজিদের প্রতি উদাসীন

ছিল। এইসব ঘটনা থেকে আমেরিকার রিফিউজি সেবার ব্যাপারটি আদ্ভুত জাগে।

যাইহোক অবশেষে কোসোভো লিবারেশন আর্মি ও নেটো বাহিনীর মধ্যে ২১ শে জুন, ১৯৯৯ আনুষ্ঠানিক ভাবে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুগোশ্লাভ সেনা ও সার্ব আধা সামরিক বাহিনী কোসোভো ত্যাগ করেছে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কোসোভো লিবারেশন আর্মির রাজনৈতিক নেতা হাসিম থাচি ও নেটো কমান্ডার মাইক জ্যাকসনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে জ্যাকসন ঘোষণা করেন কোসোভোয় চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেটোর তরফে এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোসোভোর মুখপত্র বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এমন-ভাবে মজুত রাখতে হবে যাতে শান্তি বাহিনী যখন তখন পরিদর্শন করে তা দেখতে পারে।' এ উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে বেলগ্রেডে মার্কিন আক্রমণ সার্বদের যথার্থই ভীত করেছে। ধীরে ধীরে কোসোভোতে পলাতক আলবেনীয় মুসলমানরা ফিরে এসেছে। কোসোভোয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

NATO-র উদ্দেশ্য নিয়ে বেলগ্রেড আক্রমণ করেছিলো তা যথার্থই সার্থক হয়েছে। আমেরিকা মনে করে, অসহায় আলবেনীয় মুসলমানদের রক্ষার্থে NATO বেলগ্রেড আক্রমণ করে সার্বদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই পৃথিবীতে আধিপত্য বজায় রেখেছে। তাই তার যুক্তিতে ন্যায় অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা তার রয়েছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন তোলা হয় NATO-র মানবদরদী মনোভাব কারো ক্ষেত্রে খুব বেশী বা কারো ক্ষেত্রে খুব কম কেন? NATO তবে কী উত্তর দেবে! মানুষতো সবাই সমান। NATO বরং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সবাইকে জানাক। তাহলে সেই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ের সঠিক সমাধান হবে যে "NATO-র বেলগ্রেড আক্রমণ মানবাধিকার রক্ষা না সার্ব পুঁজিপতিদের দমন !"

সূত্র নির্দেশ

১. Winston Churchill, *Great Battles and Leaders of the Second World War*, Cassell Place Wellington House. London. 1995, P.268-272.

২. John. A Garraty and Piter Gay, *The Columbia History of the World*. Harper and Row, Publishers; 1972. p 1070.1075.1088

৩. John Cambell, *The Experience of World War II*. Grange Books. PLC. London, p.62,193,222,223,242.243

৪. Allan Bullock. *Hitler and Stalin. Parallal Lives*. Fontana Press. 1993. p.580,882.928.930-933. 972-973. 1011-1013,1019

৫. জয়ন্ত ভট্টাচার্য, *সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনাবলী*. ১৯৯৮, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ (নভেম্বর), পৃ. ১৬৩।

৬. আলোলিকা মুখোপাধ্যায়, কসোভো থেকে আমেরিকা, *সাপ্তাহিক বর্তমান*. ২৬শে জুন, ১৯৯৯, পৃ. ২৫-২৭

৭. সংবাদপত্র ; *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩১ মার্চ, ১৫ মে, ৭ জুন, ১৯৯৯) *The Statesman (do)*

বিশ্ব সঞ্চার ব্যবস্থার ইতিহাস

প্রবীরকুমার লাহা

যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ধারায় কয়েকটি পর্য্যায় বিদ্যমান — ১. ব্যক্তিগত, ২. ডাক ব্যবস্থা, ৩. টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ দূরভাষ (টেলিফোন), তারবার্তা (টেলিগ্রাফ), ৪. উপগ্রহ যোগাযোগ।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উন্নয়ন ও নব নব আবিস্কারের ধারায় যোগাযোগ ব্যবস্থার জয়যাত্রা সূচিত হয়, তা আজকে চরমতম উন্নয়নকে সূচিত করেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখন মহাকাশ ও বায়ুমণ্ডলকে নব প্রযুক্তির মাধ্যমে যতেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর প্রতিরোধে এখনও পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক আইন নেই। গড়ে উঠছে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা। একে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে উপগ্রহ বার্তা। নব প্রযুক্তিতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত নব উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর গুরুত্বও অন্য মাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার আবিষ্কারের মূল পর্ব দুটি ১. তারবার্তা এবং ২. দূরভাষ। এ প্রবন্ধ বিশ্ব সঞ্চার বা যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসের একটি রূপরেখা।

টেলিগ্রাফ বা তারবার্তা এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যার দ্বারা দূর থেকে দূরান্তরে তড়িৎ চৌম্বকীয় মাধ্যমের সাহায্যে লিখিত বা চিত্রিত তথ্যাদি প্রেরণ করা যায়। এর ব্যবহারও ব্যাপক, আধুনিক উপগ্রহ প্রযুক্তিতে এর অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শব্দ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বিদ্যুতের উৎপাদন হত রেসিনদণ্ডের ঘর্ষণে তখনই প্রথম লক্ষ করা যায় যে বিদ্যুৎ উৎপাদন দণ্ডটি অপর প্রান্তে ঝোলানো শোলার বলকে একটা কম্পাসে আন্দোলিত করছে। এভাবে ইংরেজী বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরকে বলগুলো বিভিন্ন অক্ষর লেখা কাগজগুলোকে স্পর্শ করে। পরে এটিকে বর্ণচেনার ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৫৩ সালে স্কটল্যাণ্ডে সি. এম. স্কেটস টেলিগ্রাফের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার পরেই এটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারায় ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সিস্ রোলাণ্ডস (১৮১৬), চার্লস হুইটস্টোন, গ্যালভানি, ভোল্টা, জন রেডম্যান কক্স (১৮১৬), হ্যারিসন গ্রেডার (১৮২৮), গাউস এবং ওয়েবার (১৮৩৩) টেলিগ্রাফ যন্ত্র তৈরী করলেও, তা কার্যকরী হয়নি।

তারবার্তা যন্ত্রের প্রথম ব্যবহারিক আবিষ্কারক হলেন স্যামুয়েল ফিন্‌লে ব্রেসে মোর্স

(১৭৯৪-১৮৭২)। তিনি প্রথমে শিল্পী, পরে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি 'সংকেত' পদ্ধতির (যা তাঁর নামানুসারে 'মস সংকেত' বলে) মাধ্যমে বার্তা প্রেরন শুরু করেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র সরলরেখার, বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমন্বয়ের দ্বারা। একাজে সহযোগী ছিলেন আলফ্রেড ভেইল অধুনা টেলিযোগ ব্যবস্থাটাই স্বয়ংক্রিয়।

কোরিয়ার আগস্ট, ১৮৮৫তে সিয়ল ও ইনকোন-এর মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়ে পরবর্তীকালে তা দেশের বিভিন্ন স্থানগুলিতে সম্প্রসাবিত হয়।

১৮৯৬ সালে চালু হয় টেলিফোন। পর্যায়ক্রমে তা বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারিত হয়। কোরিয়ার সঞ্চার ব্যবস্থার চিত্রটি হল :— ১৮৮১ হিসাবমত দূরভাষ কেন্দ্র প্রায় ৭০৯, তারবার্তা কেন্দ্র প্রায় ৩৪,০৯৬ (১৮৫৭-এ ছিল ৬২) সঞ্চার পরিষেবা ফ্যাক্স ও টেলেক্স ব্যবস্থাও বিদ্যমান।

টেলিগ্রাফ বা তারবার্তার হাত ধরে পরবর্তী সময়ে ১০ মার্চ, ১৮৭৬-এ টেলিফোন বা দূরভাষ নামে বার্তাপ্রেরণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। টেলিফোন বহুপূর্বে 'কথা বলার নল', মেগাফোন নামে ভূষিত ছিল। টোলিফোন শব্দটিও গ্রীক শব্দ। টেলি মানে দূর আর ফোন হল শব্দ। এককথায় দূরভাষ। এটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৬৬৭ সালে রবার্ট হুক চলতে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

১৮৬৭ সালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল, দূরভাষের ব্যবহার যোগ্যতা দিয়ে পেটেন্ট নেন এবং ১৮৭৪ সাল তিনিই দূরভাষ যোগাযোগের সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এর মূল ভিত্তি হল যে ধ্বনিতরঙ্গের সঙ্গে তড়িৎ প্রবাহের উত্থান পতন।

এরপূর্বে আমেরিকার সি. জে. পেজ (১৮৩৭), ফ্রান্সের চার্লস বোরসিউল(১৮৫৪), জার্মানীর জে. পি. রেইজ-এর (১৮৬০) নাম দূরভাষ আবিষ্কারের ক্ষেত্র উল্লেখ্য।

পৃথিবীর প্রথম ১০.৩.১৮৭৬ তারিখে বেল তাঁর সহযোগী টমাস এ. ওয়াটসনকে দূরভাষে বলেন, 'মি. ওয়াটসন, এখানে এসো, আমি চাইছি তোমাকে।' এরপরে চেষ্টা হয় টেলিফোন শিল্পকে বাণিজ্যিক রূপ দেওয়ার। ১৯২৫ সালে দূরভাষ আবিষ্কারক বেল দূরভাষের উন্নতির জন্য যেমন গবেষণাগার স্থাপন করেন, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের জনগণের মধ্যে যন্ত্রটি সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল।

রাণী ভিক্টোরিয়াকে দূরভাষ পথিকৃত হাতির দাঁতে তৈরী দূরভাষ যন্ত্র উপহার দেন। ১৮৭৯ বেসরকারীকে লণ্ডনে প্রথম ৮ জন গ্রাহককে নিয়ে দূরভাষ কেন্দ্র স্থাপিত হল। দীর্ঘ টালবাহানার পর ১.১.১৯১২-তে এটি সরকারী ব্যবস্থাপনায় এলো।

এরপরে একে একে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির সরকার টেলিফোন ব্যবহারে উৎসাহ দেখান। এর ফলে জার্মানীতে (৯.১১.১৮৭৭), ফ্রান্সে (১৮৮৯), সুইজারল্যাণ্ডে (১৮৮০), সুইডেন (১৮৮০), ভারতের (১৮৮১ এবং কলকাতায় ১৯১৩-তে সিমলায় প্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়)।

টেলিযোগাযোগের উন্নতি ঘটাতে ও সহযোগিতা বাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা ITO(১৮৬৭), ITU(১৯৩৪)। এর সদস্য প্রায় ৯০টি দেশ।

এরপরে দূরভাষ যন্ত্র ও ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে এটি উন্নততর হয়ে উঠেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬৪-তে দৃশ্যশ্রাব্য দূরভাষ (Vidio Telephone)।

দূরভাষ আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (১৮৪৭-১৯২২)-এর জন্ম স্কটল্যাডের এডিনবরায়, তাঁর শিক্ষা এডিনবরা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বধিরদের কথা বলার শিক্ষা পদ্ধতির একাধারে উদ্ভাবক ও অন্যদিকে এ পদ্ধতির উন্নয়ন করেন। প্রতিষ্ঠা করেন ভোল্টা গবেষণগার, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮০ সালে প্রকাশ করেন 'সায়েন্স' নামে পত্রিকাটি। তিনি ১৮৯৬-১৯০৪ পর্যন্ত ন্যাশানাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

বেল-এর মূল মডেলে সংযোগ মুক্ত এবং ছিন্ন করে যন্ত্রে বলা ও শোনাকে উন্নত করতে এমিল বার্লিনার, মৈস এ. এডিসন (১৮৭৭), ইংরেজ প্রযুক্তি প্রযুক্তিবিদ সি. এম. ম্যাকেভয়, জি. ই. পিচেট (১৮৭৭) এব ছিল অক্লান্ত ও অনলস প্রচেষ্টা। ফলাফল প্রচেষ্টা বিফলে যায় নি।

আধুনা ভূমণ্ডলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দেশে দেশে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জনপরিষেবাকে সরকারী থেকে বেসরকারীকরণ করার প্রবণতা ও প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

০৫,১১.১৮৫০ তে ভারতে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিদ্যুতিন তারবার্তা পাঠানো হয়। একাজে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন উইলিয়ম ও' শৌনেসি (Dr. O' Shaughnessy)। আর তাঁর সহযোগী ছিলেন একজন ভারতীয় শিবচন্দ্র নন্দী। শিবচন্দ্র কেরানী হলেও নিজ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে টেলিগ্রাফ কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৫১ সালে তারবার্তা পাঠানো সাফল্য অর্জন করে ও তা চালু হয়। শিবচন্দ্র নন্দীর একাজে সাফল্যের স্বীকৃতিতে সেই সময়ের বড়লাট লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং তারবার্তা সাঙ্কেতিক ধ্বনিতে শ্রী নন্দীকে অভিনন্দন জানাল। এর পরে শ্রী নন্দী তার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শন ও কিছুকাল তার কর্তা ছিলেন।

এরপরে শিবচন্দ্র জীবনবিপন্ন করে দুর্বার পদ্মানদীর উপর দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত তারবার্তা লাইন সম্প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর জন্ম জুন, ১৮২৪, জীবনাবসান ৯.৪.১৯০৩। এর পরবর্তী সময়ে ১৮৫৩ সালে কলকাতা, বরাকর, এলাহাবাদ, বারাণসী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিন্ধু, পেশোয়ার, উটী, বাঙ্গালোর স্থানগুলিতে তারবার্তা লাইন চালু হতে থাকে।

পরের সালগুলিতে বিদেশের দেশগুলিতে যেমন, ভারত-শ্রীলঙ্কা (১৮৫৮), ভারত-ইউরোপ (১৮৬৫), তারবার্তার কেবল লাইন সম্প্রসারিত হয়।

অক্টোবর, ১৮৫৪-তে ভারতে টেলিগ্রাফ আইন প্রণীত হয়। তারবার্তা প্রচলন ১৮৫৭ সিপাই বা মহাবিদ্রোহ অন্যতম কারণ বলে ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। এদেশে তারবার্তা যোগাযোগ ব্যবহার প্রথম প্রাপ্তির স্বীকৃতিতে রয়েছেন তার মহাধিকর্তা হন স্যার William O' Shaughnessy (১৮৫৭-১৮৬১), মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার Ivor Krodock Thomas, স্বাধীন ভারতে B.R. Batra এবং ডাক ও তার বিভাগের প্রথম মহাধিকর্তা Sir Charles Stewart Wilson (১৯১২-১৩) ১৮৭৩ তে আলিসুরস্থ তার কর্মশালায় নদীর জন্য তার কেবল তৈরী হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে S.T. Peters Burgh অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিকমিনিকেশন কংগ্রেসে D.G. Robinson প্রথম ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। এর পরের সালগুলিতে ১৮৭৯ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত কংগ্রেসগুলিতে ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে।

প্রথম যুগে তারমাথুল রাণী ভিক্টোরিয়া চিত্রিত তার ডাকটিকিটের মাধ্যমে দেওয়া

হত। ১৮৭৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪১ জন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন। উল্লেখ্য পি.এন.মিত্র তিনবার এবং এস. ব্যানার্জি দুবার ভারতীয় প্রতিনিধি হওয়ার সম্মান অর্জন করেন।

তার বিভাগ কে বলা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিনিকেশন বা ডট বা সঞ্চার বিভাগ। ডট-কে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ, শ্যাম পিত্রোদার অবদান স্মরণীয়। প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। এর ফলাফলে পরিস্ফুটিত হয়েছে --- ১. উপগ্রহ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা,

২. প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত এস.টি.ডি. স্থাপন করা।

৩. Fax.Hybride Mail প্রভৃতি উপগ্রহ টেলিকম প্রবর্তিত হয়েছে।

৪. ইলেকট্রনিক দূরভাষ কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দূরভাষ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে গঠিত হয়েছে।

৯৮.৭ শতাংশ দূরভাষ বা টেলিফোন কেন্দ্রের মধ্যে ৯৩ ৬ শতাংশ কেন্দ্রকে বিদ্যুতিন দূরভায ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগে ভারত এশিয়ার মহাদেশে বৃহত্তম নেট ওয়ার্কের অধিকারী। এদেশে ২৩,৩০০ দূরভাষ কেন্দ্র। দূরভাষ লাইন ও যন্ত্র সংখ্যা যথাক্রমে ২১৩ এবং ১৭.৮ মিলিয়ন। দূর দূরত্ব সঞ্চারেও ভারতীয় দূরভাষ পাশ্চাতপদ নয়। ইনস্যাট উপগ্রহের মাধ্যমে দূরভাষের দূরসঞ্চার ব্যবস্থা মানুষের বার্তাকে আরও কাছে নিয়ে এসেছে। ছবি ও কথায় দূরভাষ প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে।

নেটওয়ার্ক বিস্তৃত রেডিও ব্যবস্থায় প্রায় ১,৩৫,০০০ রুট কিলোমিটারে এবং Optical Fiber ব্যবস্থায় প্রায় ৭৬,০০০ রুট কিলোমিটার। National Subscriber Diallinscnsd সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০ বেশি। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পুরুলিয়া জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চল ঝালদা, তুলিন, রঘুনাথপুর, বলরামপুর, মানবাজার, খুঞ্চা, হুড়া, জয়পুরে আধুনিক প্রযুক্তিরও তারবার্তা পদ্ধতি চালু হয়েছে।

পি.বি.এক্স. হান্টিং কার্ড চালু হয়েছে। সঞ্চার মাসুলের হারও পরিবর্তন সঞ্চার মাশুল নির্ধারক হলো টেলিকম রেগুলেটিং অথরিটি। (ট্রাই)। আর বিদেশ সঞ্চার সঞ্চারণে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বিদেশ সঞ্চার নিগম্ (ভি.এস এন.এল.)।

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৬ মোতাবেক সংঘসূচী অনুসারে সপ্তম তফশীলের তার ও টেলিফোন ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

ভারতের দূরভাষ পরিষেবা ও পরিকাঠামোর একনজরে চিত্রটি এরূপ :—

১৯৯৯-তে তথ্যপ্রযুক্তি নামে পৃথক মন্ত্রক স্থাপিত হয়েছে। Internet-এর যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি অসুবিধা রয়েছে। এই সঞ্চার ব্যবস্থায় গোপনীয়তা কতটা রক্ষিত হয়, তাতে সংশয় রয়েছে। কুৎসা প্রচারের ও তথ্যচুরির সম্ভাবনাও রয়েছে।

এগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন আইন প্রনীত হয়নি।

Internet ব্যবস্থার ব্যবহার এখনও পর্যন্ত বেশ ব্যয়বহুল।

পরিশেষে বলাই বাহুল্য যে টেলিগ্রাফ, দূরভাষ ও সঞ্চার বা যোগাযোগ ব্যবস্থা মানব সভ্যতাকে আরও অগ্রগতির পথে পরিপূরক ও সহায়ক হয়েছে, বিশ্বজ্ঞান আদান-প্রদানের চলাচল মসলীন হয়েছে, শাসকশ্রেণীর শাসনকার্যে সুবিধা পেয়েছে।

এর পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালিত গড়েও সঞ্চার ব্যবস্থাকে বিশ্বায়নের চাপে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ফলাফলে সঞ্চার ব্যবস্থা দূর্মূল্য হয়ে জন ব্যবহারের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকবে না। সীমিত থাকবে, এর ব্যবহার কতিপয় বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে। আর এটাই যে শেষ কথা তাই কে বলবে?

সূত্র নির্দেশ

১. *বিশ্বকোষ* ১২ খণ্ড, বিশ্বকোষ পরিষদ প্রকাশনা, ১৯।

২. Story of the Indian Telegraphs Acentury of progress – Krishnacal Shridharani, Post and Telegraph Department

৩. Enclopedia of Britanica

৪. India Refence Annual, 1999 Publication Division, Ministry of Information and Broad Casting, Govt. of India.

৫. India — Anenclopadedic Survey General P.N. Gupta, S.Chand & Co.

৬. The Encyclopedia Americana - 1976, Volume 7, 26

৭. Japan Itsland, People and culture Japanese National Commission Forunesco. 1958

৮. Koreaannual, 1982. (A Hand Book), 1982

৯. A Hand Book of Korea. 1982

১০. Kondansha encyclopedia of Japan, 1983

১১. India - An Encyclopedia survey -- Editor - P.N. Chopra, 1984